"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম

(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

বিচিত্রা

দ্বাদশ বর্ষ, ২য় খণ্ড	মাঘ, ১৩৪৫	১ম সংখ্যা

মহাজন পদাবলী ও বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত

শ্রীরাধারমণ গোস্বামী বেদান্তভূষণ

শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় ও শ্রীমতী অপর্ণা দেবী সম্পাদিত কীর্ত্তন পদাবলী” নামক গ্রন্থখানি দেখিয়া আনন্দ হইল া, বহুদিন হইতে যদিও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পদাবলীর ালোচনা চলিতেছে, এ পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে কোনও মহিলার াবির্ভাব দেখা যায় নাই। পরলোকগত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, রমণীমোহন মল্লিক, শ্রীযুক্ত গেন্দ্রনাথ গুপ্ত, স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র, সতীশচন্দ্র রায়, মন কি আমাদের বিশ্ববন্দিত কবিও বৈষ্ণব কবিতার ম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, খগেন্দ্রনাথ িত্র, সুকুমার সেন প্রভৃতিও নানাভাবে বৈষ্ণব কাব্য সম্পদ াধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে একজন চ্চ শিক্ষিত মহিলাকে এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বষ্ণব সমাজ যে গৌরব বোধ করিবেন, তাহা আর বিচিত্র ক ?

তাঁহারা যে পদাবলী সম্পাদন করিয়াছেন, তাহার ম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে, কয়েকটি বিষয়ে এই সংগ্রহখানি ূতন মনে হইল। সেইজন্য ইহার আলোচনা করা প্রয়োজন নে করিতেছি। পদাবলীর বহু প্রামাণিক গ[illegible] আছে, যথা —শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত [illegible] ল বিশ্বনাথ ক্রবর্ত্তীর ক্ষণদা গীতচিন্তামণি, [illegible]বর্দাসের পদকল্পতরু, গৌরসুন্দর দাসের কীর্ত্তনানন্দ, দীনকৃষ্ণ [illegible]র সংকীর্ত্তনামৃত প্রভৃতি। এই সকল গ্রন্থই মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন হস্তলিখিত বহু পদসংগ্রহের গ্রন্থ রহিয়াছে। আধুনিক কালে যাঁহারা পদসংগ্রহ গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পূর্ববর্ত্তী মহাজনগণ নি[illegible] পন্থা মূলতঃ অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু সমালোচ্য গ্রন্থখানির পদ্ধতি অভিনব বলিয়া বোধ হইল। কি বিষয়ে এই মৌলিকতা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা বলিতেছি।

(১) গ্রন্থখানি দেখিলে আপাততঃ মনে হয় যে মহাজন পদাবলী পালাক্রমে সাজানো হইয়াছে। কিন্তু একটু প্রণিধান করিলে দেখা যায় যে তাহা নহে। গৌরচন্দ্রিকা কতকগুলি এক সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের পৌর্বাপর্য নাই। কোন গৌরচন্দ্রের পরে কোন পদটি গীত হইবে, তাহার নির্দেশ সর্বত্র নাই। এক সঙ্গে কতকগুলি ঝুমর দেওয়া হইয়াছে, তাহারও সঙ্গতি বুঝা যায় না। এক একটি পালা গান করিয়া ঝুমর গাহিবার রীতি আছে বটে, কিন্তু কোন পালার পর কোন ঝুমর তাহা নির্দেশ না করিলে ঝুমর দেওয়ার সার্থকতা কি ?

(২) কতকগুলি পালা “খণ্ড” নামে অভিহিত হইয়াছে ; যথা রূপ খণ্ড, মান খণ্ড, পূর্বরাগ খণ্ড, গোষ্ঠ খণ্ড,

ইত্যাদি। আবার পরক্ষণেই দেখিতেছি রাসলীলা, হোরি-লীলা, ঝুলন লীলা ইত্যাদি। পৌর্বাপর্য স্থির রাখিলে হয় রাস খণ্ড, ঝুলন খণ্ড লেখা উচিত ছিল। অন্যথা এই নূতনত্ব বর্জন করা উচিত ছিল। শেষের দিকে "লীলা" জুড়িয়া দেওয়াতে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে গোড়ার দিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া শেষে সম্পাদকদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল এই পদ্ধতির অসঙ্গতির দিকে।

(৩) এই খণ্ড হইতেই পুস্তকখানির 'মৌলিকত্বের' মূল অনুমান করা কঠিন নহে। সম্পাদকদ্বয় এই খণ্ড শব্দ পদ্ম পুরাণ বা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত হইতে গ্রহণ করেন নাই; গ্রহণ করিয়াছেন চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে। ঐ কৃষ্ণকীর্ত্তনে দান খণ্ড, ভাব খণ্ড, বংশী খণ্ড, জন্ম খণ্ড প্রভৃতি আছে। কিন্তু একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে চণ্ডীদাসও স্বীয় গ্রন্থে বিরহ খণ্ড নাম [illegible] নাই। তাঁহার কাব্যে রাধা বিরহই আছে। [illegible] এই পদাবলী সংকলনে চণ্ডীদাসের আদর্শ অনুসৃত হইলেও, সম্পাদকেরা বিরহ খণ্ডে মূলেরও সীমানা লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিতে হইবে।

এই চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। সাহিত্য জগতে চণ্ডীদাসকে লইয়া যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে আমরা বিচলিত হই নাই। চণ্ডীদাস তিন হউন, পাঁচ হউন বা দশ হউন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু বৈষ্ণব কাব্য হিসাবে, মহাজন পদাবলী হিসাবে আমরা দেখিতে চাই যে কোনও পদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের বিরোধী না হয়। চারি পাঁচ শত বৎসর যে ভাবধারা বৈষ্ণব সাহিত্য, সমাজ ও ধর্মমতকে পরিপুষ্ট করিয়াছে, তাহার বহির্ভূত কোনও পরিস্থিতিতে রসজ্ঞ ব্যক্তি কখনও প্রশ্রয় দিতে পারেন না। সাহিত্যের আসরে তাহা চলিলেও পদাবলী—বিশেষতঃ কীর্ত্তন পদাবলীর আসরে তাহা চলিবে না। এই কথা বিনীতভাবে আমি এই নূতনত্বের প্রচারকগণকে বলিতে চাই। সমস্ত বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে [illegible] ভাববন্যা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় সম্পাদকগণ তাঁহাদের বহুবিস্তৃত ভূমিকায়ও বুঝান নাই। সে ভাবটি কি, তাহা না জানিলে পদাবলী অনুশীলনে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' সম্বন্ধে পরে আমাদের বক্তব্য বলিতেছি। কিন্তু সমালোচ্য গ্রন্থের নূতনত্ব সম্বন্ধে এখানে এই মাত্র বলিতে চাই যে তাঁহারা কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে যে সকল পদ এই পুস্তকে ছাপিয়াছেন, সে পদগুলি অন্য কোনো সংগ্রহ গ্রন্থে এ পর্য্যন্ত স্থান পায় নাই। সে পদের প্রাচীনত্ব কতখানি, তাহা লইয়া সাহিত্যিকগণ মাথা ঘামাইতে পারেন; কিন্তু কীর্ত্তন পদাবলীতে তাহার উল্লেখ দেখিলে আমরা প্রথমতই এই বিচার করিব যে ইহা সমগ্র মহাজন পদের ভাবধারার অনুকূল অথবা পরিপন্থী।

বৈষ্ণব আচার্যগণ ধর্মশাস্ত্র রচনা করিয়া অলঙ্কার শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া নানা নাটক ও কাব্য রচনা করিয়া যে আদর্শের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিলে যে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। যাঁহারা সেই ভাব বা সংস্কৃতির সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন নহেন, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।

আদ্যোপান্ত পুস্তকখানি একাধিকবার পাঠ করিয়া আমার এই ধারণা হইয়াছে যে ইহাতে পদের কোনও বৈশিষ্ট্য নাই, পাঠান্তর নাই, ব্যাখ্যাও নাই। আছে একটি বিস্তৃত ভূমিকা আর আছে এই নূতন পদগুলি—যাহা সম্পাদকদ্বয় কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে গ্রহণ করিয়া সর্বপ্রথম মহাজন পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিলেন। বড়ু চণ্ডীদাসের কতকগুলি পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার একটি পদও এ সংগ্রহে দেখিলাম না। যে পদ কোনও গ্রন্থে নাই, তাহা দিতে অবশ্য কোনো বাধা নাই। কিন্তু সেগুলি নির্বাচনকালে দেখিতে হয় যে, বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যে যে রসধারা আছে তাহার সহিত সামঞ্জস্য আছে কি না। আমরা শুধু দেখিব চারি পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া যে পদাবলী লক্ষ লক্ষ নরনারীর আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটাইয়া আসিতেছে তাহার সহিত ইহার ভাবগত, সংস্কৃতিগত, প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে কি না। আমরা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে কৃষ্ণ কীর্ত্তন [illegible] উদ্ধৃত এই পদগুলির মধ্যে কয়েকটি ভাব ও ভাষা সব দিক দিয়াই আপত্তিজনক।

গ্রন্থের নাম [illegible] পদাবলী হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ প্রকরণ

শ্রীরাধা প্রকরণ, শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্র, শ্রীগৌরাঙ্গের স্তব, অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচার প্রভৃতি নানা বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে পদাবলীর সম্বন্ধ না থাকিলেও, কীর্ত্তনের প্রসঙ্গে হয়ত উপযোগিতা আছে, কিন্তু তদুচিত গৌরচন্দ্র নামে যে অধ্যায়টি আছে, তাহার অর্থ কি? 'তৎ' শব্দের দ্বারা পূর্ব পরামর্শ বুঝায়। ইহার পূর্বে 'শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব' বলা হইয়াছে, তাহা হইলে 'তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা' বলিতে ঐ তত্ত্ব সম্বন্ধে গৌরচন্দ্রিকা বুঝায়। কিন্তু তাহা নিশ্চয়ই সম্পাদকদ্বয়ের অভিপ্রেত নহে। তাঁহারা অন্য পদাবলী গ্রন্থে তদুচিত শব্দটি দেখিয়া হয়ত ইহাকে পারিভাষিক শব্দ মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। শ্রীমতী অপর্ণা দেবীর পিতৃদেব স্বর্গত দেশবন্ধু সম্পাদিত নারায়ণ পত্রিকায় স্বধাম প্রাপ্ত বিপিনচন্দ্র পাল লিখিত তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা প্রবন্ধ দেখিলেই আমার উক্তির সত্যতা বুঝিতে পারিবেন।

ইহার পর 'রূপখণ্ড'। 'তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা' রূপখণ্ডের অন্তর্গত হইলে সঙ্গত হইত। কারণ গ্রন্থের ভূমিকায় আছে: 'ভিন্ন ভিন্ন লীলার 'তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা দিয়াছি।'...'এই উপায়ে এই গ্রন্থকে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করিবার জন্য যত্ন লইয়াছি।' (পৃঃ ॥০) এই ভক্তির ভাষা সম্বন্ধে যাহাই বক্তব্য থাকুক না, ইহা যে রক্ষিত হয় নাই, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 'রূপখণ্ডের' পূর্বে কতকগুলি 'তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা' যদৃচ্ছাক্রমে দেওয়া হইয়াছে। রূপখণ্ড কোন লীলা? অন্য গ্রন্থে অনুরাগ, পূর্বরাগ প্রভৃতি থাকায় সে গুলিকে লীলার অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষে বাধা উপস্থিত হয় না। 'অনুরাগ খণ্ডের' পূর্বে, বংশীখণ্ডের পূর্বে, অভিসার খণ্ডের পূর্বে কোনও গৌরচন্দ্রিকা দেওয়া হয় নাই।

রূপখণ্ড দুইবার দেওয়া হইয়াছে—একবার শ্রীকৃষ্ণ প্রকরণের পরে আর একবার শ্রীরাধা প্রকরণের পরে। কিন্তু কোনটি কাহার রূপখণ্ড তাহা বলা হয় নাই। ইহাতে বুঝিবার পক্ষে বাধা জন্মিতে পারে। ইহার পরে আবার পূর্বরাগ খণ্ড, অনুরাগ খণ্ড আছে কিন্তু কাহার পূর্বরাগ বা কাহার অনুরাগ তাহারও পরিচয় না থাকায় পাঠকের অসুবিধা হইবে। এখানে প্রধান কথা এই যে, পূর্বরাগ এবং অনুরাগের পালা ব্যতীত রূপের স্বতন্ত্র কোনও প্রসঙ্গ উঠিতে পারে কি না, তাহা বিবেচ্য। কোনো গায়ক গান করিবার কালে পূর্বরাগ অনুরাগ বাদ দিয়া 'রূপখণ্ড' গান করিতে পারে কি? কিছু নূতনত্ব করিবার পূর্বে সর্বদিক বিবেচনা করা উচিত।

যাহা হউক, 'রূপখণ্ডে' প্রবেশ করিয়া প্রথমেই জয়দেব কৃত 'চন্দন চর্চিত নীল কলেবর' গানটী ধৃত হইয়াছে। ইহাতে আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। এই পদটি প্রসিদ্ধ বসন্ত রাসের পদ বটে। এই গানের মধ্যেই আছে

'রাস রসে সহ নৃত্যপরা
হরিণা যুবতী প্রশশংসে।'

ইহাতেও কি সম্পাদকের চৈতন্যোদয় হইল না? অথবা তাঁহারা হয়ত আরম্ভটি দেখিয়া এই গীতটিকে রূপের পদ বলিয়া মনে করিয়া ছাপাখানায় পাঠাইয়াছেন। কিন্তু যিনি প্রুফ দেখিয়াছেন, তাঁহার দোষে এই রাসের পদ রূপের প্রথম পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি রময়তি কামপি রামাং।' ইহা রূপের পদ? কোনো বটতলার গ্রন্থেও আমরা এরূপ বিভ্রাট দেখি নাই! 'তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা'র মধ্যে কোন গৌরচন্দ্রিকাটি গাইয়া তারপর এই পদ গান করা যাইবে, ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।

এইরূপ রসবিপর্য্যয়ের উদাহরণ আরও বহু আছে। 'আজ্ কে গো মুরলী বাজায়'—ইহা মুরলী শিক্ষার একটি প্রসিদ্ধ পদ। শ্রীরাধা আজ মুরলী বাজাইতেছেন—সখীগণ দূর হইতে তাহা দেখিয়া বলিতেছেন—আজ এ কে মুরলী বাজাইতেছে? 'এ ত' কভু নহে শ্যামরায়।'

ইহার গৌরবরণে করে আলো।
চূড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল॥

বংশীখণ্ডের মধ্যে এ পদটি আসিতে পারে কি?

যুগলমিলন লীলা বা প্রকরণের প্রথম পদটি রসোদ্গারের পদ বটে। কোনও সখী অপরা সখীকে রাধাকৃষ্ণের প্রেম বৈচিত্র্য বর্ণনা করিতেছেন। ইহা যুগলমিলন পর্যায়ে আসিতে পারে না। আর 'যুগলমিলন' ব্যাপারটি কি? যাত্রায় যুগলমিলনের কথা শুনিয়াছি বটে; পদাবলীর প্রসঙ্গে যুগলমিলন কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে

না। এই কীর্ত্তন পদাবলীতেই বোধ হয় যুগলমিলন প্রথম দেখিলাম।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে একটি গৌরচন্দ্রিকা, তারপর 'ভগবানপি তা রাত্রী' ভাগবতের এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি। তারপরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর একটি কলি মাত্র।

'রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।

ইহার সঙ্গতি কি? কোনো পদে ইহার প্রসঙ্গ বা আভাস মাত্র নাই। এরূপ পদ দিবার সার্থকতা কি?

শ্রীরাধার রূপখণ্ডের পূর্বে তদুচিত গৌরচন্দ্রিকার মধ্যে 'আইলা গৌরাঙ্গ আমার কাদম্বিনী হইয়া' পদটি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহা রূপের গৌরচন্দ্রিকা কে বলিল? কবি মাধবদাস বলিতেছেন যে 'গৌরাঙ্গ প্রেমবৃষ্টি দিয়া জগৎ ভাসাইয়াছেন, আমি মন্দভাগ্য, তাহার একবিন্দু পাইলাম না।' ইহাতে রূপের প্রসঙ্গ কোথায়? ইহা প্রার্থনার গৌরচন্দ্র হইলে বরং বুঝা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, 'নিবেদন ও প্রার্থনার খণ্ডে (?) কৌনও গৌরচন্দ্রিকা দেওয়া সম্পাদকদ্বয় তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও আবশ্যক মনে করেন নাই। এই নিবেদন ও প্রার্থনার প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়িল— 'বঁধু, কি আর বলিব আমি' দেখিলাম না। ঐ খণ্ডের প্রথমেই যে পদটি দেওয়া হইয়াছে তাহা অন্য পদ। নীলরতন বাবুর গ্রন্থে উভয় পদই দেওয়া হইয়াছে। একটি ৭৩৭, অপরটি ৭৩৯ সংখ্যক। উভয়ের আরম্ভ এক হইলেও, কবিত্ব ও রসের দিক দিয়া অনেক প্রভেদ। উৎকৃষ্ট পদটি পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট পদ দেওয়া হইল কেন?

'মানখণ্ডের মধ্যে দুইটি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, (ক) খণ্ডিতা, (খ) কলহান্তরিতা। খণ্ডিতা ও কলহান্তরিতা নায়িকার ভেদ অধ্যায়ের অন্তর্গত। মানের মধ্যে 'খণ্ডিতা' দিয়া অলঙ্কার শাস্ত্রে বহির্ভূত কার্য্য করা হইয়াছে। সম্পাদকদ্বয় যদি উজ্জ্বল নীলমণির মান প্রকরণ দেখিতেন, তাহা হইলে, 'মান' কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে পারিতেন।

দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ
স্বাভীষ্টাশ্লেষ বীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে।

পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত যে দম্পতী, তাহারা একত্র বাস করিয়া (অথবা পৃথক বাস করিয়া) পরস্পরকে অভীষ্টানুরূপ আলিঙ্গন, দর্শনাদি করিতে পারিতেছে না; যাহা বাধ জন্মাইতেছে তাহার নাম মান। ইহাতে খণ্ডিতা নায়িকার অন্য সংসর্গদূষিত নায়কের প্রতি রোষ বা শ্লেষোক্তি বুঝায় না। 'কলহান্তরিতা' সাধারণতঃ মান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা 'খণ্ডিতা'র পরিশিষ্ট বা প্রকারভেদ রূপে গণ্য হইতে পারে না। এই মানখণ্ডের আরম্ভেই উজ্জ্বল নীলমণির একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার ব্যাখ্যা যদি দেওয়া হইত, তাহা হইলেই সম্পাদকেরা বুঝিতে পারিতেন যে খণ্ডিতা তাহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

ব্যাখ্যা না দিয়া কেবল শ্লোক আওড়াইলে কোনও কোনও স্থলে কাহারও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না বটে, কিন্তু বিপদের আশঙ্কা থাকে। কেন না অপপ্রয়োগে বক্তার বিদ্যার দৌড় ধরা পড়ে। পাঠকের চিত্তভ্রান্তি ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ-দানখণ্ডের শ্লোক গ্রহণ করা যাইতে পারে। উজ্জ্বল নীলমণির একটি বচন যথারীতি উদ্ধৃত হইয়াছে

'ব্যাজেন ভূষণাদীনাং প্রদানং দানমুচ্যতে।'

উজ্জ্বলের মান প্রকরণে উক্ত হইয়াছে—যে প্রিয়া মান করিলে তাহাকে সাম দান নতি প্রভৃতি উপায়ে প্রশমিত করিতে হয়। ছলপূর্বক (ব্যাজেন) বসন-ভূষণ দিলে মানের অবসান ঘটিতে পারে। ইহাই এখানে 'দান' কথাটির তাৎপর্য। উজ্জ্বল চন্দ্রিকা হইতে যে অনুবাদ তাঁহারা উদ্ধৃত করিয়াছেন সম্পাদকেরা তাহার দিকে কিঞ্চিন্মাত্র দৃকপাত করিলেই এই মারাত্মক ভ্রমে পতিত হইতেন না।

ছলেতে কান্তারে দেয় বসন ভূষণ।
'দান' বলি তার নাম কহে কবিগণ॥

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ইহা মান প্রশমনের একটি উপায় মাত্র। দান বলিতে যাহা বুঝায় একেবারেই তাহা নহে। ভূমিকায় দেখা যায়, সম্পাদক বলিতেছেন যে পদাবলীর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে এই সমস্ত গ্রন্থের (ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি) সাহায্য আমরা অপরিহার্য বলিয়াই মনে করি। আমরাও এ বিষয়ে একমত।

কিন্তু এরূপ ভাবে 'অপরিহার্য' হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। 'দান-লীলার' 'দান' অর্থ শুল্ক বা রাজকর গ্রহণ।

সংস্কৃত না জানা অপরাধ নহে। কিন্তু সাধারণ সতর্কতা সকলের নিকটেই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। 'বাসন্তী রাস' (৩৩৯ পৃঃ) না লিখিয়া শুধু বসন্ত রাস লিখিলেই ত চলিত। 'বাসন্ত রাস'ও বলা যাইতে পারিত। বাসন্তী রাসলীলা বলিলেও ব্যাকরণ সঙ্গত হইত। রাসের পূর্বে কখনই স্ত্রী প্রত্যয়ান্ত শব্দ 'বাসন্তী' দেওয়া যায় না। সৌখ্য পদার্থটি কি? 'কীর্ত্তন গণসংযোগের অন্যতম সেতু এবং জন সৌখ্যের অনাবিল হেতু।' সুন্দর ভাষা, সুন্দর ভাব। কিন্তু ঐ একটু অন্যমনস্কতার জন্য সমস্ত মাটী হইয়া গিয়াছে। প্রথমটা মনে করিয়াছিলাম যে ইহা হয়ত ছাপার ভুল, কিন্তু এই সৌখ্য শব্দটি শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন সম্পাদিত গীতগোবিন্দে বহু বিস্তৃত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়। (পৃঃ ২০) সেই মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্পাদকদ্বয় তাঁহাদের কীর্ত্তন পদাবলীর নিবেদনে যে ভাবে সংবর্দ্ধনা করিয়াছেন (পৃঃ ॥৵০) তাহাতে তাঁহারই অনুকরণ বা প্রেরণা হয়ত এক্ষেত্রে অপরিহার্য হইয়াছে!

বিখ্যাত গীত 'চূড়াটি বান্ধিয়া উচ্চ' ইহার উপরে 'শ্রীবাশ' নধ্যম দশকুশী লিখিত হইয়াছে। কোনও কীর্ত্তনীয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়া এ পর্যন্ত শ্রীবাশের কুল-কিনারা করিতে পারি নাই।

এরূপ বহু ত্রুটী-বিচ্যুতিতে পুস্তকের কলেবর পরিপূর্ণ। সমস্তগুলি একত্র করিলে আর একখানি পুস্তক হইতে পারে। মহাপ্রভুর আস্বাদিত পদ বলিয়া কতকগুলি খণ্ডিত পদ ও শ্লোক প্রদত্ত হইয়াছে। তারপর কীর্ত্তন পদাবলীতে এরূপ গবেষণার সার্থকতা বা সঙ্গতি কি, তাহা বুঝিতে পারি না।

'আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাং' এই শ্লোকটি অন্যান্য শ্লোকের সঙ্গে মহাপ্রভুর আস্বাদিত পদ বলিয়া এক পর্যায়ে ফেলা উচিত হইয়াছে কি? ঐ শ্লোকটি মহাপ্রভুর স্বরচিত। সম্পাদকেরা কি তাহা অস্বীকার করিতে চাহেন? কিছুই বিচিত্র নয়। শ্রীরূপ গোস্বামীর পদ্যাবলী তাঁহারা নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন। সেখানে গোস্বামিপাদ 'শ্রীভগবতঃ' বলিয়া এই শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। সম্পাদকদ্বয় যদি অনভিজ্ঞতা বশতঃ এইরূপ করিয়া থাকেন, তবে তাহা ভিন্ন কথা। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া যদি এইরূপ অঘটন ঘটাইয়া থাকেন, তবে বৈষ্ণবেরা কিছুতেই তাহা মার্জনা করিবেন না।

পদাবলী সাহিত্য বটে, ইহা লইয়া গবেষণা করাও চলে না যে এমন কথা বলি না। তবে কীর্ত্তন হিসাবে পদাবলী প্রকাশিত হইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তন সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব। কৃষ্ণকীর্ত্তন চণ্ডীদাস সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে, এরূপ শুনিয়া আসিতেছি। চণ্ডীদাস একজন, অথবা তিনজন; বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, ও দীন চণ্ডীদাস তিনজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি অথবা এক, ইহা লইয়া সাহিত্য সমাজে বাদ প্রতিবাদ প্রায়ই শুনিতে পাই। কিন্তু আমাদের সে সম্বন্ধে কৌতূহল নাই। আমরা দেখিব যে, যে পদাবলী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের বিরোধী অমনি তাহা বর্জন করিব। সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ পদ জনসমাজে প্রচার করিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মকে এবং তাহার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামে যে গ্রন্থখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় অনুমান করেন যে গ্রন্থের নাম কৃষ্ণকীর্ত্তন। তিনি বলিতেছেন, "দীর্ঘকাল যাবৎ চণ্ডীদাস বিরচিত "কৃষ্ণকীর্ত্তনের" অস্তিত্ব মাত্র শুনিয়া আসিতেছিলাম, এতদিনে তাহার সমাধান হইয়া গেল। আমাদের ধারণা আলোচ্য পুঁথিই কৃষ্ণকীর্ত্তন এবং সেই হেতু উহার অনুরূপ নাম নির্দেশ করা হইল।" কিন্তু এই হেতুটি প্রবল নহে। বসন্তবাবু কোথায় এই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের নাম শুনিলেন এবং কি সূত্রে শুনিলেন, তাহা না জানিতে পারিলে তাঁহার এই উক্তির মূল্য নির্দ্ধারণ করা যায় না। আমরা কখনও শুনি নাই এবং দুই একজন গবেষণাকারী সাহিত্যিকের নিকটও জিজ্ঞাসা করিয়া সন্তোষজনক উত্তর পাই নাই।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রথমেই দেখা যায়—

ধব কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে॥

* * * *

হলী বনমালী নাম দৈবকী উদরে ॥

অর্থাৎ নারায়ণ দুইটি কেশ শ্বেত এবং কৃষ্ণ দিলেন এবং তাহাতে দৈবকীর উদরে বলরাম ও কৃষ্ণের জন্ম হইল। রায় মহাশয় ভাষাটীকাতে ভাগবত এবং মহাভারত হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া রামকৃষ্ণের কেশাবতারত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয় ঐ শ্লোকের শ্রীধরস্বামী কৃত টীকার শেষাংশ বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। স্বামিপাদ ভাগবতের ২।৭।২৬ শ্লোকের টীকায় মহাভারতের শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

তচ্চ ন কেশমাত্রাবতারাভিপ্রায়ং। কিন্তু ভারাবতারণ-রূপং কার্য্যং কিয়দেতৎ মৎ কেশাবেব কর্ত্তুং শক্তাবিতি দ্যোতনার্থং। রামকৃষ্ণয়োর্বর্ণ সূচনার্থং কেশোদ্ধরণমিতি গম্যতে। অন্যথা তত্রৈব পূর্ব্বাপরবিরোধাপত্তেঃ, ভগবান্ স্বয়ং ইতি বিরোধাচ্চ।

অর্থাৎ ইহা কেশমাত্রাবতারের অভিপ্রায়ে কথিত হয় নাই; কিন্তু ভারাবতরণ রূপ কার্য এতই সুকর যে আমার কেশদ্বয়ই তাহা করিতে সমর্থ—ইহাই প্রকাশের নিমিত্ত কেশাবতারত্বের উল্লেখ হইয়াছে। কেবল রামকৃষ্ণের বর্ণ সূচনের নিমিত্ত শুক্ল ও কৃষ্ণ কেশের কথা বলা হইয়াছে; তাহা না হইলে পূর্বাপরের বিরোধ হয় এবং কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং এই প্রসিদ্ধ বাক্যের সহিত বিরোধাপত্তি উপস্থিত হয়। এই বিষয় শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া রামকৃষ্ণের কেশাবতারত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রতিপাদ্য বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের প্রতিকূল।

ইহার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। চণ্ডীদাসের দানখণ্ড অনেকে কাব্যরসের উৎকর্ষ বলিয়া গণ্য করেন শুনিয়াছি। কিন্তু ইহাতে আছে কি? শ্রীরাধা বড়াইয়ের সহিত মথুরায় সাধারণ গোয়ালিনীর ন্যায় দধিদুগ্ধ বিক্রয়ে চলিয়াছেন আর পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ দানের ছলে তাঁহার আলিঙ্গন প্রার্থনা করিতেছেন। যথা—

শরত উদিত চান্দ বদন কমল।
খঞ্জন জিনি তাঁব তোর নয়ন যুগল॥
আধরে বন্ধুলী রাগ শোভএ সুন্দরী।
হেন রূপেঁ কাহ্নাইকে কেহ্নে পরিহরি॥
আলিঙ্গন দিআঁ যাহা সুনল সুন্দরী।
তোহ্মাতে মজিল চিত ধরিতেঁ না পারী॥

* * * *

যশোদার পোঅ আহ্মে নামে গোবিন্দ।
তোর রূপ দেখিআঁ চখুতে নাই যে নিন্দ॥

ইত্যাদি

এই পদটি কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে গৃহীত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি যে এই পদ সংগ্রহের নূতনত্ব এখানেই—কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের যে সকল কবিতা অন্য কোনও সংগ্রহকার কর্ত্তৃক সংগৃহীত হয় নাই, তাহা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তন যে প্রাচীন, তাহা প্রমাণ করিবার জন্যই বোধ হয় সম্পাদকগণ অশুদ্ধ বানান ও অপ্রচলিত শব্দ যেমন পুঁথিতে আছে তেমনই রাখিয়া দিয়াছেন। ইহাও এক অভিনব ব্যাপার। কীর্ত্তন পদাবলী গ্রন্থে এরূপভাবে প্রত্নতত্ত্ব (?) করিলে গায়ক ও শ্রোতা কাহারও সুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্যাখ্যার অভাবে মাদৃশজনের ন্যায় সাধারণ পাঠকের পক্ষে বুঝিবারও বাধা ঘটে। কিন্তু সে যাহাই হউক, আরও নূতনত্ব এই যে এই পদটি কৃষ্ণকীর্ত্তনে দানখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইলেও সম্পাদকেরা ইহাকে রূপখণ্ডের মধ্যে স্থান দিয়াছেন্। রূপ ও দান তাঁহাদের মতে কি এক-জাতীয় ব্যাপার। রূপখণ্ডের মধ্যে এমন ব্যাপার কি করিয়া আসিতে পারে? "যথা আলিঙ্গন দিয়া যাই শুনলো সুন্দরি।" (আমরা বর্ত্তমান বানান দিলাম।) এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হইয়াছে: "পূর্ব্বরাগ বাড়িয়া অনুরাগে পরিণত হয়। এই অনুরাগের প্রেরণায় অভিসারে আকুলতা জাগে। অভি-সারের পরিণতি মিলন। অতঃপর আত্মনিবেদন ও প্রার্থনা।" (পৃঃ ।৶০) কিন্তু এই পদটি যেভাবে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় কৃষ্ণরূপ দেখিয়াই সরাসরিভাবে রাধিকার নিকট আলিঙ্গন প্রার্থনা করিতেছেন। ইহা নিতান্তই অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক। পূর্বরাগের পরে লেখ প্রস্তাপন, দূতী প্রেরণ, প্রভৃতি উপায় অবলম্বনে নায়ক

নায়িকা নিজের মনোভাব পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করেন, ইহাই সনাতন প্রথা বটে। তারপর তিনি রাধিকার নিকট আপনার পরিচয় দিতেছেন; "আমি যশোদার পো, আমার নাম গোবিন্দ।" এই মাতৃ পরিচয় এখানে অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয়। পুরুষের মাতৃনামে পরিচয় দেওয়া নীচকর্মের পরিচায়ক। যাহাদের বাপের ঠিক নাই, তাহারাই মায়ের নামে পরিচয় দিয়া থাকে। মাতৃবৎ বর্ণসঙ্করাঃ। নন্দ মহারাজ জীবিত। রাধিকার নিকট নন্দ মহারাজ অপেক্ষা যশোদা অধিক পরিচিত ছিলেন, ইহা মনে করিবার কারণও নাই। সুতরাং প্রণয়প্রার্থী একজন যুবকের পক্ষে মাতার পরিচয় দেওয়া যে অত্যন্ত হীনতাসূচক সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কারণ কথিত আছে যে, মাতৃনামাধমাধমঃ। ছলে বলে কৌশলে নায়ক যেখানে নায়িকার উপভোগে উদ্যত, সেখানে মাতৃ পরিচয়ে নিজের পরিচয় প্রদান করিবার অবকাশ কোথায়?

আমার বোধ হয় সম্পাদকেরা এই নূতনত্বের মোহ পরিত্যাগ করিয়া যদি মহাজনদিগের পদবী অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে গ্রন্থখানি আদরণীয় হইতে পারিত। হয়ত সেরূপ গতানুগতিকতা সম্পাদকেরা চাহেন না। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে গতানুগতিকতাই নিরাপদ। মনে করুন 'আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপ চন্দ।' এই পদটি শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের গৌরচন্দ্রিকা। কিন্তু এই পদ শ্রীরাধার রূপখণ্ডের পূর্ব্বে উদ্ধৃত গৌরচন্দ্রিকায় প্রবিষ্ট করানো হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, সম্পাদকেরা গৌরচন্দ্রিকার অর্থ বুঝিতে গোল করিয়াছেন। তাহা না হইলেত এরূপ রস বিভ্রাটের হেতু বুঝিতে পারা যায় না।

গোস্বামীপাদেরা এবিষয়ে কতদূর সতর্ক ছিলেন, তাহা তাঁহাদের রস বিভাগ ও রস নির্ণয় হইতে প্রতিবাদে বুঝিতে পারা যায়। রসের বিশুদ্ধি ও গাম্ভীর্য রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের আগ্রহ যে কতখানি ছিল, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। কৃষ্ণকীর্ত্তনের দানখণ্ডে দেখিতে পাই রাধিকা বড়াইয়ের সঙ্গে সাধারণ গোয়ালার মেয়ের মত মথুরায় দই দুধ ঘোল বেচিতে যাইতেছেন। পথের মধ্যে তাঁহাকে একলা পাইয়া কৃষ্ণ দানীরূপে তাঁহার সঙ্গ প্রার্থনা করিতেছেন। আর গোস্বামিদিগের গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীরাধা গুরুজনের আজ্ঞায় যজ্ঞঘৃত বিক্রয় করিবার জন্য সখীগণ পরিবৃত হইয়া যজ্ঞমণ্ডপের নিকট যাইতেছেন।

'শুন সুন্দরি আজুক কথা।' এই পদের টীকায় শ্রীরাধামোহন ঠাকুর বলিতেছেন, 'এতেন দধ্যাদি বিক্রয় হেতুক দানলীলাং কেচিদনভিজ্ঞা যদ্‌বদন্তি তন্নিরস্তম্'; অর্থাৎ অনভিজ্ঞ লোকেরাই বলে যে দধ্যাদি বিক্রয়ের জন্য দানলীলা হইয়াছিল। সে ধারণা অমূলক। পূর্ব্বোক্ত পদে উক্ত হইয়াছে যে শ্রীরাধা কৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইলে কোন সখী আসিয়া বলিলেন যে কৃষ্ণদর্শন লাভের উপায় হইয়াছে। আজ প্রাতঃকালে জটিলার নিকটে ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বলিয়াছেন যে—

> গোবর্দ্ধন পাশে আসুরা হরিষে
> করি এ যজ্ঞের কাম।
> যে গোপ যুবতী ঘৃত দিবে তথি
> ইষ্টবর পাবে দান॥
> জটিলা শুনিয়া আমারে ডাকিয়া
> যতন করিয়া বৈল।
> বধূরে সাজায়া গব্য ঘৃত লৈয়া
> তুরিতে তাঁহাই চল॥

দানকেলিকৌমুদীতেও বৃন্দাদেবীর উক্তি তদনুরূপ। "অদ্য রাধা সখীভির্মণ্ডিত সনীতা গোবিন্দকুণ্ডরোধসি মখমণ্ডপে গুরুনামভ্যনুজ্ঞায়া হৈয়ঙ্গবীনং বিক্রেতুং অভিক্রমিষ্যতি।" (পৃ ১২, বহরমপুর সংস্করণ) অর্থাৎ রাধা অদ্য সখীগণ কর্তৃক পার্শ্বদেশ মণ্ডিত হইয়া গুরুজনের অনুজ্ঞা ক্রমে গোবিন্দকুণ্ডের তটবর্ত্তে যজ্ঞমণ্ডপে সদ্যঘৃত বিক্রয়ার্থে গমন করিবেন।

প্রচলিত কোনও কোনও পদে মথুরায় গমনের কথা আছে, কিন্তু ঐ সকল পদ গোস্বামিগণের অভিপ্রায়সম্মত নহে। মথুরায় দধি দুগ্ধ বিক্রয়ের জন্য যাতায়াত থাকিলে মাথুর বিরহের সঙ্গতি থাকে কোথায়? কৃষ্ণ মথুরায় গেলে ব্রজগোপীরা তাঁহাকে কোনও না কোনও সূত্রে দেখিয়া আসিতে পারিতেন।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ প্রাচীন কিনা, এবং প্রাচীন হইলে কত প্রাচীন, সে বিচার আমরা করিব না। দেখা যাইতেছে যে ইহার প্রায় সকল পদই একান্ত অপ্রচলিত। পদাবলীর কোনও গ্রন্থেই যাহা স্থান পায় নাই, তাহা চালাইতে প্রয়াসী হইলে সফলতার সম্ভাবনা নাই। আমাদের বক্তব্য এই যে, কীর্ত্তনের নামে এখনও অনেকে নাসিকা সঙ্কুচিত করেন। নেড়ানেড়ীর ব্যাপার বলিয়া এখনও ইহা অনেক স্থলে অনাদৃত, উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত। ইহার উপর আবার কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ ইহার উপর চাপাইলে লোকে পদাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা হারাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। চৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী স্পষ্টই বলিয়াছেন :

বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত আর গান রসাভাস।
যাহা শুনি মহাপ্রভুর না হয় উল্লাস॥

ভূমিকায় এমন অনেক কথা আছে, যাহা প্রমাণ সাপেক্ষ। সে সকল আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। পদাবলীর পবিত্র অঙ্গনে অনাচার দেখিলে বৈষ্ণবমাত্রেরই মনে আঘাত লাগে। সেইজন্য এত কথা বলিলাম।

শ্রীরাধারমণ গোস্বামী

আবির্ভাব

শ্রীসুপ্রভা দেবী

সে কহিল ; একদিন বেলা যায় যায়,
সিন্ধুনীরে অস্তরবি সোনার ভেলায়
চলিয়াছে পরপারে। সে কহিল ধীরে,
"যেমন প্রবাস হ'তে তরী আসে তীরে
সহস্র সঞ্চয় ভরি' অনুকূল ক্ষণে,
তেমনি জোয়ার বেগে দিক্‌দিশা হারা
আমার আশার তরী জানি পাবে কূল,
তাই দুয়ারের পাশে শুভ্র আলিম্পনে
লিখিতেছি আগমনী, স্নিগ্ধ বারিধারে
ভরেছি মঙ্গলঝারি। সাগর অকূল,
উতল পূবের ঝড়, তবু এক সাঁঝে
সুন্দর আসিবে গেহে অপরূপ সাজে।"

একদিন সত্য করি' চেয়েছিলে যাহা,
যার চেয়ে সত্য চাওয়া নাহি ছিল আর
আজি আর স্বপ্ন নয়, নহে কল্পনার
আকাশ কুসুম নয়, সত্য হোল তাহা।
তোমার মাটির ঘরে দুয়ারে তোমার
হে লক্ষ্মি, তোমারি আঁকা শুভ আলিম্পনে
পড়িল চরণ-লেখা। কুসুমে চন্দনে
মঙ্গল শঙ্খের তানে আগমনী তার
ঘোষণা করিতে নাহি কেহ কোনখানে!
এসেছে সে, তবু তার আসিবার আগে
নাহি জানি কোন্ বাণী মর্ম্মে আসি লাগে,
তোমারে নিয়েছে ডাকি মহা আহ্বানে!

তবু সেই জেগে থাকা, সে পথ চাওয়ার
সে আজি হয়েছে সত্য ভরি' গৃহদ্বার।

বিজয়িনী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

প্রথম অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

[স্থান—বোম্বাই, বিভূতির চিত্রগৃহ। বহু চিত্র, কোনটী অর্দ্ধ সমাপ্ত, কোনটী পূর্ণ, কোনটী রেখাঙ্কিত মাত্র। সমস্তই রেবার মুখ।]

প্রমথ ও রেবা

প্রমথ। (স্বগত:) সাধ ক'রে কি বিভূটা ক্ষেপে উঠেছে। একটা রূপসী বটে! তবু যা যত্নে শ্রদ্ধায় থাকে, সে তো স্বচক্ষে দেখেই এসেছি! (প্রকাশ্যে) তোমার নাম রেবা?

রেবা। (সসম্ভ্রমে) জি!

প্রমথ। বিভূতিবাবু তোমায় মাইনে দিয়ে, তোমায় দেখে ছবি আঁকেন?

রেবা। (তদ্রূপে) জি!

প্রমথ। সে টাকা তুমি কি কর? কিছু জমিয়েছ?

রেবা। (ঘাড় নাড়িয়া) না, মাইজীকে সব দিই।

প্রমথ। ও তোমার মা? তোমার বাবা আছেন?

রেবা। জি, না, আমার কেউ নেই, উনি আমায় থাকতে দেন।

প্রমথ। (স্বগত:) বা:! বিভূতি রায়ের উপযুক্ত পাত্রী বটে! (প্রকাশ্যে) শোন রেবা! তোমার যখন নিজের বলতে কেউ নেই, তখন ওই অত্যাচারী স্ত্রীলোকের হাতে পড়ে মার খেয়ে খেয়ে মরে যাওয়ার চাইতে সুখে সম্মানে স্বাধীনতায় থাকতে পারা কি মন্দ? তুমি আমার সঙ্গে চলো, আজই, এখনই চলো।

রেবা। (সাগ্রহে) বিভূতিবাবুর দেশে? তিনি বুঝি আপনাকে পাঠিয়েছেন? তাঁর মায়ের অসুখ সেরেছে? তাঁর বুঝি মত হয়েছে?

প্রমথ। কিসের মত রেবা?

রেবা। (সলজ্জে মাথা নত করিল) তিনি যে ব'লেছিলেন, মায়ের মত নিয়ে আমায় সেখানে নিয়ে যাবেন।

প্রমথ। ও:, বুঝেছি। হ্যাঁ, হ'য়েছে। তাই আমি তোমায় নিতে এসেছি।

রেবা। (আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া প্রমথর পদধূলি লইল। পরক্ষণে ম্লানভাবে) ওরা কি আমায় যেতে দেবে! না, দেবে না।

প্রমথ। সে ভার আমার! তুমি চটপট তৈরী হ'য়ে নাও গে। (স্বগত:) বিভু অন্তত: দুটো দিনও তো বাড়ী থাকবে! তবু দেরী করা ঠিক হ'বে না, আজই ওকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। সাবধানের মার নেই। যেমন ওর টেলি পৌঁছেছে, অমনি রওনা হ'য়েছে। বন্ধুর প্রতি খুব বন্ধুত্ব দেখাচ্ছি কিন্তু! না মনটা একটু খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা কিন্তু বড় চমৎকার। আমিই না শেষে 'লভে' পড়ে যাই! তা যাই-ই যদি, তাতেই বা ক্ষতি কি? স্বাতীকে তো পাবো না, আর আমি জমিদারপুত্র মহামহিম বিভূতি রায় চৌধুরী নই! যাই, রেবার রণচণ্ডী মনিব-মহিলার সঙ্গে একটা ব্যবস্থা ক'রে আসি।

পঞ্চম দৃশ্য

রেবাদের বাড়ী, তন্নজী ও রেবা

রেবা। ভাইজী! তুমি দু:খ করো না, আমায় যেতে দাও। তুমি যা বলছ সে হয় না, আমি জানি তুমি আমার দাদা। আর আমাদের নিয়মে তোমায় শ্যামাবাইকেই বিয়ে করতে হবে। আমায় করলে তোমার [illegible] যে।

তন্নজী। শ্যামাবাইকে বিয়ে করতে আমি ইচ্ছুক নই! [illegible]মি বাঙ্গালী বিয়ে করলে তোমার জাত যাবে না? তোমার [illegible]দ না যায়, আমারই বা যাবে কেন?

রেবা। (ম্লান হাস্যে) আমার জাত আছে যে যাবে? কে আছে আমার? লক্ষ্মী ভাইজী! আমায় হাসি মুখে বিদায় দাও। (হাত ধরিল)

তন্নজী। (অভিমানে মুখ ফিরাইয়া) বুঝেছি, তোমার মনের কথা। তুমি সেই পয়সাওয়ালা বাঙ্গালীটাকেই চাও। বেশ, যাও তা হ'লে, আমি বিদায় নিচ্ছি।

(রুক্মাবাই ও প্রমথ প্রবেশ করিল)

রুক্মা। রেবা আমার পেটের মেয়ের মত, তাকে ছেড়ে আমি প্রাণ ধরবো কি ক'রে প্রমথবাবু? (উভয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়াতে মুখ রোষে আরক্ত হইয়া উঠিল। কষ্টে আত্ম-দমন করিয়া) তবে হ্যাঁ, ওর যদি ভাল হয়, আপত্তিই বা করি কি ক'রে? তা আজই নিয়ে যাচ্ছেন তো? দু' ঘণ্টার মধ্যে ট্রেণ ছাড়বে কিন্তু। রেবা, তুই এই বাবুর সঙ্গে যা, খুব সুখে থাকবি, বড়লোকের বউ হবি, বিস্তর গয়না পাবি, ওরা নাকি মস্ত জমিদার, পাল্কী আছে, হাতী আছে, ঘোড়সওয়ার সঙ্গে ছোটে। যা, দেরী করিস্ নে। যাও বাবু। ওকে নিয়ে যাও। (রেবার হাত ধরিয়া হিঁচড়াইয়া প্রমথর ঘাড়ের উপর ফেলিয়া দিল) (স্বগতঃ) আপদ যে এত সহজে বিদায় হবে তা ভাবিনি; পাঁচটী শ' টাকাও ত পাওয়া গেল। তন্নজী! আমার সঙ্গে এসো, একটা ছবি উঁচু থেকে পেড়ে দিতে হবে। (ছেলেকে প্রায় টানিয়া লইয়া প্রস্থান। তন্নজী পিছনে ফিরিয়া করুণ চোখে চাহিতে চাহিতে গেল)।

প্রমথ। যাক্, এত সহজে যে হ'বে, ভার নেবার সময় স্বপ্নেও তা ভাবিনি! বোম্বাই সহরটা আর দেখা হ'ল না, নাই হোগগে, পরের ট্রেণেই বেরিয়ে পড়ি। তোমার জিনিষ পত্র নিয়ে নাও রেবা।

(রেবা চলিয়া গেল ও ছোট্ট একটী পুঁটুলী লইয়া ফিরিল)

প্রমথ। এস, আমরা যাই। (উভয়ে বাহির হইতেছে তন্নজী ছুটিয়া আসিল)।

তন্নজী। রেবা! রেবা! যাবার সময় আমার এই ক্ষুদ্র স্মৃতি-চিহ্নটুকু নিয়ে যাও। হাতী চড়ে যাবার সময় কখনো চোখে পড়লে, মনে করো, গরীব তন্নজী আজও তোমার কথা মনে ক'রে তার এই নিরানন্দ কুটিরে দিন যাপন করছে। (একটী মীনে করা লকেট রূপার শিকলী দেওয়া রেবার হাতে দিল। রেবা সেইটী মাথায় ঠেকাইয়া গলায় পরিল)।

রেবা। (প্রণামান্তে) দাদাজী! তোমার ছোট বোন সকালে ঘুম ভেঙে উঠে রোজ তোমায় প্রণাম করবে, তুমি আমায় অনেক দিয়েছ।

প্রমথ। (অগ্রসর হইয়া) এসো রেবা! দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।

(রেবা চোখ মুছিতে মুছিতে অগ্রসর হইল। তন্নজী শোকাকুলভাবে দাঁড়াইয়া থাকিল—পরে সচকিতে) ষ্টেশনে তুলে দিয়ে আসি, আর একবার দেখতে পাবো।

ষষ্ঠ দৃশ্য

জনাকীর্ণ ষ্টেশন, রেবা ও প্রমথ

প্রমথ। তুমি মেয়েদের গাড়ীতে ওঠ, আমি এই পাশেই থাকছি।

রেবা। আমি যাবো না প্রমথবাবু। আপনি কেন মিথ্যে ক'রে ও সব বল্লেন? কেন আগে আমায় বল্লেন না, আপনি আমায় কাশীতে কোন স্কুলে রাখতে নিয়ে যাচ্ছেন? এখন, এও সত্যি কিনা, আমি কিছু বুঝতে পারছিনে।

(ট্রেণ ছাড়ার ঘণ্টা পড়িল, প্রমথ রেবার হাত ধরিয়া সামনের মেয়ে গাড়ীর মধ্যে তুলিয়া দিল)

প্রমথ। আমায় অতটা অবিশ্বাস করো না রেবা! তন্নজীকে তো ঠিক এজন্য ছেড়ে দিলে; বিভুর মা তাকে তোমায় বিয়ে করতে দেবেন না। আমি যেখানে তোমায় নিয়ে যাচ্ছি খুব ভালই থাকবে। পড়াশোনা করবে, সেখানে শুধু মেয়েরা থাকে, তারা তোমার রূপ দেখে পাগল হ'বে না, তোমাকেও পাগল করবে না।

রেবা। তবে সেই ভাল। আমার আর সত্যি ভাল লাগে না। ইচ্ছা করে, মরে যাই।

প্রমথ। তুমি বড় লক্ষ্মী মেয়ে! (অন্য কামরায় উঠিতে গেল। শেষ ঘণ্টা দিয়া ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। তন্নজী হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিল।)

তন্নজী। রেবা! রেবা! কই তুমি? এই শেষ দেখা। কই তুমি? রেবা, আমায় মনে রেখো।

রেবা। (মুখ বাহির করিয়া অশ্রুপ্লুত কণ্ঠে) দাদাজী! ভাইজী! আমায় ভুলে যেও!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বিভূতিদের বাড়ীর একটা অংশ। সুসজ্জিত গৃহে স্বাতী বসিয়া কার্পেটের আসন বুনিতেছিল। গিরিজাসুন্দরী প্রবেশ করিলেন।]

গিরি। স্বাতী! এই হরিলুটের বাতাসা দু'খানা মুখে দে মা! প্রমথর তার পেয়েই পাঁচ টাকার বাতাসা এনে বার দালানে লুট দিইয়েছি। তোর পথের কাঁটা সরে গেছে। ছুঁড়িটাকে নিয়ে সে কাশী পৌঁছিয়েছে। বোর্ডিংয়ে রেখে দু'চার দিন পরে ফিরবে। (দু'খানি প্রসাদী বাতাসা হাতে দিলেন, মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। স্বাতী প্রসাদ মুখে দিয়া পায়ের কাছে প্রণাম করিল। তার মুখ হর্ষবিকশিত হইয়া উঠিল)। তোমার আলাই-বালাই সব দূর হয়ে যাক, শ্রীধর তোমায় নীরোগ ক'রে সর্ব্বমুখী করুন, দু'দিন একটু চটে থাকবে, তারপর ক্রমে সব ঠাণ্ডা হবে, তোমার গুণ বুঝবে।—তোমার হক মারবে কে? তুমি তো পরের ধন চুরি ক'রে নাওনি। সন্ধ্যে বেলা সত্য-নারায়ণ করাবার জন্যে ঠাকুর মশাইকে খবর দিয়েছি, কাল সকাল বেলা সুবচনী পুজো করতেই হবে। ঐ যা দাঁড়া গোপাল' তো করা হ'ল না! আহ্লাদে মাথা যেন গুলিয়ে গেছে। শ্রীধর! তুমিই সত্যের! এত শীগ্গির যে এমন ক'রে কাঁটা ওঠাতে পারবো মনেও করিনি। তোমার অসীম দয়া।

(কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া উদ্দেশ্যে নমস্কার ও নিষ্ক্রমণ)

স্বাতী। মা বেচারী ক'দিনে যেন আধমরা হ'য়ে গিয়েছেন। আহার নিদ্রা বলে কিছুই আর নেই। আমার এক বিপদ। বিয়ে তো হয়নি, লোক্ দেখানো দুঃখও করা যায় না, অথচ—যাক্, সব ভাল, যার শেষ ভাল। (আপন মনে গুণগুণ করিয়া গান ধরিল)

গীত

আমি তারি তরে দিন গণি, দিন গণি।
আকাশে বাতাসে শুনি, তারই পদধ্বনি।
রেখেছি কান পাতি, কাটে দিবা, কাটে রাতি,
জানিনে কবে হ'বে যে সে সুলগন্, আসিবে
আগমনী॥

প্রমথ। (প্রবিষ্ট হইয়া) স্বাতী! আষাঢ়ের মেঘ যখন কেটে যায়, শরতের আলোও সঙ্গে সঙ্গে ফুটে ওঠে, আগমনী আসতে আর দেরী কতটুক থাকে? মাসীমা কোথায়?

স্বাতী। তুমি বুঝি এই এসে পৌছলে? কাপড় তো এখনো ছাড় নি? মা ভাঁড়ারের দিকে গেছেন হয়তো। হ্যাঁ, প্রমথদা! খবর সব ভাল তো?

প্রমথ। (একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া) খবর ভালও বটে, মন্দও বটে। সমস্তটা বলি শোন,—সেই মেয়েটিকে নিয়ে তো কাশী পৌছুলাম, ধর্ম্মশালায় ওকে রেখে একটা ভাল দেখে মেয়ে স্কুলের সন্ধান করে বেড়াচ্ছি, ইতিমধ্যে কি যে হ'ল জানি না, মেয়েটা হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেল। বিস্তর খোঁজ করলাম, কোন খবর পেলাম না। পুলিসের উপর ভার যদিও দিয়ে এসেছি, কিন্তু ফল হ'বে কিনা কিছু জানিনে।

স্বাতী। সে কি? জলে ডোবেনি তো? তা হ'লে কিন্তু বড্ড খারাপ হ'ল—একটা স্ত্রী-হত্যা।

প্রমথ। হত্যা তো আমি করিনি স্বাতী! তবে হয়তো নিমিত্ত হ'তে পারি। কিন্তু খুব সম্ভব তা হয়নি। বিস্তর সন্ধানের ফলে এইটুকু জানা গেছে যে, একজন গেরুয়াপরা সাধুর সঙ্গে সঙ্গে সে ষ্টেশনের দিকে গিয়েছে। এ কি, বিভু! তুমি কখন এলে? এক্ষুণই আসছ নাকি?

বিভূতি। (ঝড়ের মত প্রবিষ্ট হইয়া উচ্চ কণ্ঠে) রেবা কই? তাঁকে কি করলে? নিশ্চয়ই এখানে আন নি? কোথা রেখে এলে?

প্রমথ। একটু ঠাণ্ডা হও, মুখ হাত ধোও, ক্রমে সবই জানতে পারবে, (উঠিয়া) এসো এইখানে, একটু বস দেখি। একটা পাখা এনে হাওয়া কর স্বাতী।

(স্বাতী উঠিয়া গেল, তার পা কাঁপিতেছিল, মুখ শঙ্কিত)

বিভূতি। (উচ্চকণ্ঠে) রেখে দাও তোমার ওসব ন্যাকামী! শুনতে চাইনে কোন ছেঁদো কথা! এক কথায় বলে ফেলো—রেবাকে কি করলে? খুন করেছ?

প্রমথ। আমায় তুমি এত বড় পাপিষ্ঠ মনে করতে পারলে বিভূ? আমি খুনে?

বিভূতি। (ভূমিতে পদাঘাতপূর্ব্বক) খুন যদি করনি তবে কি করলে তার? কোথায় গুম্ করলে?

প্রমথ। যদি না বলি?

বিভূতি। (ছুটিয়া আসিয়া প্রমথর হাত চাপিয়া ধরিল, ভীষণ কণ্ঠে কহিল) আমি তোমায় খুন করবো। বল, বল, শীগ্‌গির বল—

প্রমথ। উঃ, লাগে বিভূ! হাত ছেড়ে দাও, তুমি পাগল হয়েছ?

বিভূতি। (চীৎকার শব্দে) হ্যাঁ, হ'য়েছিই তো; আর তোমরাই তা করেছ! বিশ্বাসঘাতক, তুমি না আমার বাল্যবন্ধু!

প্রমথ। সেইজন্যেই তোমার মোহমুক্তির জন্য যেটুকু করা কর্ত্তব্য ভেবেছি, তাই করেছি। বিভূ! মাসীমার তুমি একমাত্র সন্তান, এ পৃথিবীতে তাঁর আর কেউ নেই। তারপর স্বাতী জ্ঞান হ'য়ে পর্য্যন্ত তোমাকেই স্বামী বলে জেনেছে, তার কথা কি ভাবা তোমার উচিত নয়? (পাখা হাতে স্বাতী ঘরে ঢুকিতেছিল, দাঁড়াইয়া পড়িল।)

বিভূতি। পুতুল যারা খেলেছিল, পুতুলের হিসেব রাখুক তারা, আমার তাতে কোন দায়িত্ব নেই। আর মা, যে মা ছেলের মুখ চায় না, সে গর্ভধারিণী হ'তে পারে, সে মা নয়। তার ভালবাসা স্বার্থপরতা মাত্র! প্রমথ! এখনও বল রেবা কোথায়? যদি না বল, জেনে রেখো, যে অনর্থ তার ফলে ঘটবে, অনুতাপের শেষ রাখতে পারবে না। এখনও সময় আছে; যদি ভাল চাও বল।

প্রমথ। সত্যিই আমি জানিনে বিভূ। তার জন্যে আমিও চিন্তিত। কাশীতে গিয়ে তার জন্যে বোর্ডিং স্কুল খুঁজছিলাম, হঠাৎ সে হারিয়ে গেল। বিস্তর খোঁজাখুঁজি ক'রেও সন্ধান পাইনি, আমিই সন্দেহ করছিলাম, তুমি হয়তো বা কি ক'রে জানতে পেরে কাশী এসেছিলে, ওকে দেখতে পেয়ে নিয়ে গেছ।

বিভূতি। (উচ্চ চিৎকারে) মিথ্যা কথা! ভণ্ড! প্রতারক! তুমি তাকে লুকিয়েছ। (দুই হাতে প্রমথর গলা টিপিয়া) বার করো, বার করো তাকে, না হলে তোমার মৃত্যু আমার হাতে।

(স্বাতীর হাত হইতে পাখাখানি ইতিমধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল, সে আর্ত্তনাদ করিয়া ছুটিয়া আসিল) ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, মারবেন না, প্রমথদা, সত্যিই কিছু জানেন না।

বিভূতি। (বিকট ভঙ্গীতে ফিরিয়া) সামনে থেকে দূর হ'য়ে যাও। শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল! যত নষ্টের গোড়া তো তুমিই! তোমার জন্যেই আজ আমার এ দুর্গতি।

গিরিজা। (ব্যস্ত হইয়া আসিলেন) স্বাতী! তুই কি চেঁচিয়ে উঠেছিলি? হরে, নেপ্‌লা ওরা বল্লে 'বিভূ এসেছে', কোনদিকে গেল সে? ওমা! একি বিভূ? তুমি প্রমথকে খুন করছ? (ধ্বস্তাধ্বস্তিপরায়ণ যুবকদ্বয়ের মধ্যে আসিয়া প্রমথকে ছিনাইয়া লইতে লইতে) উঃ, এত বড় অধঃপাতে গেছ তুমি? কি আর বলবো তোমায়, যে পেটে তোমায় ধরেছিলাম, তাতে আগুন ধরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

বিভূতি। (প্রমথ হইতে বিমুক্ত হইয়া তীব্র রোষে) তাই করা উচিত তোমার, নাঃ, প্রমথকে মেরে ফেল্লেও কোন লাভ নেই। এ ভৈরবী চক্রের অনুষ্ঠান তুমিই করেছ! সে তো তোমার উচ্ছিষ্টভোজী ভৃত্য মাত্র। কিন্তু জেনে রেখো মা! এই আমি চললাম, পৃথিবী উল্টে খুঁজে বেড়াবো, যদি রেবাকে পেলাম তো ভাল, আর তাকে যদি না পাই, যে জাতের জন্যে তুমি আমার এই সর্ব্বনাশ করেছ, সে জাতকে আমি কাট-খড় কিনে পুড়িয়ে ছাই ক'রে ছাড়বো। এ যদি না করি, আমার নাম বিভূতি রায় চৌধুরী নয় (বেগে প্রস্থান)—

গিরিজা। (কপালে করাঘাত করিয়া) শ্রীধর! কি খোট করলাম, কি করতে একি করলে? আমার ছেলে ফিরিয়ে আন, ঠাকুর! আমার ছেলে ফিরিয়ে আন।

প্রমথ। (মূর্চ্ছিতা স্বাতীর নিকটে বসিয়া তাহাকে ভাল করিয়া শোয়াইতে শোয়াইতে) স্বাতী, দিদি আমার! (দ্বারের বাহিরে বিস্তর লোক উঁকি মারিতেছিল তাদের

লক্ষ্য করিয়া) কেউ একটু জল নিয়ে এসো, ঐ পাখাখানা পড়ে আছে দাও। স্বাতী! স্বাতী! (স্বগতঃ) আমিই কি শেষে দু' দুটো স্ত্রীহত্যার নিমিত্ত হ'লাম নাকি? নাঃ, সংসারে ভাল করা দেখছি মন্দ কাজ করার চাইতে ঢের কঠিন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কাশী দশাশ্বমেধ ঘাট, চারিদিকে যথাপূর্ব্ব জনারণ্য, একধারে একটা জ্যোতিষী আগন্তুকগণের হাত দেখিতেছে, পয়সা লইতেছে। রেবা স্নান সারিয়া উঠিতেছিল, কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ইচ্ছা, হাতটী দেখায়। সামনে আসিতেই আর একটী মহারাষ্ট্রী মেয়ে বলিল "দাম বড় আক্রারে, দু'আনি।" রেবা হাত গুটাইয়া সরিয়া যাইতেছিল, একজন গৈরিক পরা বলিষ্ঠ সাধু আসিয়া তাহাকে দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইলেন। তার কপালের দিকে ঘন ঘন চাহিয়া ইসারায় সঙ্গে আসিতে বলিয়া অগ্রসর হইলেন। গোধূলিয়া মোড়ের কাছাকাছি আসিয়া কথা কহিলেন।]

সাধু। তুমি ঘর-ছাড়া? হাতে কি দেখাতে' চাও?

রেবা। (বিস্মিত, নীরব, ঈষৎ সলজ্জ বিষাদে নতদৃষ্টি, স্বগতঃ) কি জানতে চাই? জানি না!

সাধু। (কপালের দিকে চাহিয়া) যাকে দেখতে চাও তাকে দেখতে পাবে, কিন্তু তার পূর্ব্বে বিস্তর সাধনার প্রয়োজন। প্রস্তুত?

(রেবা মাথা হেলাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল)

সাধু। (অগ্রসর হইয়া) তবে আমার সঙ্গে এসো। (দু'জনে চকের রাস্তা ধরিল)

[পাঞ্জাব মেল মোগলসরাই অতিক্রম করিতেছিল, একটী কামরায় সেই সাধু এবং রেবা বসিয়া; রেবার পরিধানে গেরুয়া বস্ত্র।]

তৃতীয় দৃশ্য

[স্বাতী বিভূতিদের বাড়ীর পূজার ঘরে ফুল সাজাইতেছিল। সামনে রূপার টাটের উপর রূপার সিংহাসনে শালগ্রাম শিলা, বাম পার্শ্বে লক্ষ্মীর পট, দক্ষিণে রূপার গরুড় হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছে। সুসজ্জিত পূজার উপকরণসমূহ]

স্বাতী। (একটি গোলাপ ফুল তুলিয়া লইয়া) এই ফুলের গাছ আমরা দু'জনে মিলে পুঁতেছিলাম, এ আজ ফুল দিচ্ছে, আমার জীবন অফলা হ'য়ে গেল। মা আমার সঙ্গে বিয়ের কথা বলেছেন, আমি তাঁর বিষদৃষ্টিতে পড়েছি। আগে তো কিছু মন্দ বাসতেন না। (দুর্ব্বাগুলি বাছিয়া তাম্র পাত্রে রাখিয়া দিল) বোম্বাই যাওয়ার কারণও ওই, আর তার ফলে আজ এই বিপ্লব। মার পায়ে ধরে বল্লাম, আমার জন্যে আপনি ভাববেন না। ওঁকে সুখী হতে দিন। তা মা'ও শুনবেন না, মারাঠার মেয়েকে ঘরে আনতে দেবেন না এই তাঁর পণ। দিলে কি আর ক্ষতি হ'তো? এ যে কোথাকার জল কোথায় পৌছুবে ভেবে পাচ্ছি না।

গিরিজা। (প্রবেশ করিয়া) স্বাতী! তোর কাজ হ'য়েছে? আমার আসনটা পেতে দেতো মা! জপটা সেরে নিই। বগলামুখী, রুদ্রচণ্ডী, অর্গলা, সঙ্কটা, ওগুলো পড়তেও তো অনেকক্ষণ সময় যাবে। ঠাকুর মশাই এলে বলিস্ রাহু স্বস্তেনের গোমেদখানা খগেনের কাছে আছে। আর দক্ষিণা —কালীর শ্মশান-যাগ শেষ ক'রে রাত্রেই যেন খাঁড়াধোয়া জলটা এই ঘরের এক পাশে রেখে যান।

স্বাতী। (আসন পাতিয়া দিল, গিরিজাসুন্দরী বসিলেন) মা! এসব আর নাই বা করলে। শুনেছি লোকে ব'লে, 'তুক তাক্ ছ' মাস, কপালের ভোগ বার মাস; যাকে চাইছেন, তাকেই পেতে দাও মা। (স্বগতঃ) উঃ, কি সাহসই আমার বেড়েছে!

গিরিজা। (আহত বিস্ময়ে) স্বাতী! তুই এই কথা বল্লি? তা হলে তোর কি হবে?

স্বাতী। (ফুল লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে করিতে) মা! তুমিই শিখিয়েছ, মানুষ কাজ নিয়ে সব কিছু ভুলে থাকতে পারে। আমাদের দেশে কত যে বাল-বিধবা আছে, তারা কি নিয়ে থাকে?

গিরিজা। (ব্যথাক্লিষ্ট মুখে) স্বাতী! ও তুলনা দিলে, সইতে পারিনে। মা যে আমি! (ক্ষণপরে) কিন্তু বাছা! সে যাকে বিয়ে করতে চায়, সে যে একটা অনাথা মারাঠীর মেয়ে। না, সে হয় না, এত বড় বংশের বৌ হবে সে! না, হবে না।

স্বাতী। আমিও তো অনাথা মা!

গিরিজা। কি বলিস স্বাতী? কিসে আর কিসে? পুরুতঠাকুর যে তান্ত্রিক জ্যোতিষীকে এনেছেন না, তিনি বলেন সাত দিনের মধ্যে বিভূ ফিরবে আর সেই ছুঁড়িটাকে একজন লোক অনেক দূরে নিয়ে চলে গেছে; তাকে সে পাবে না। তবে তার বিবাহ স্থানে প্রচণ্ড বাধা, সেইটেই কাটাবার জন্যে খুব বেশী চেষ্টা-চরিত্র করতে হ'বে। তাই এই সব করছি। (মালা তুলিয়া লইয়া জপের উপক্রম)

খগেন। (দ্বার সমীপস্থ হইয়া উদ্বেগ-কম্পিত-কণ্ঠে) মা! ছোটবাবুর তার এসেছে।

গিরিজা। (ত্রস্তে মালা ফেলিয়া) অ্যাঁ! কি, কি খবর, খগেন! সে কি আসছে?

খগেন। (বিচলিত ভাবে) হ্যাঁ, মা!

গিরিজা। কবে, কখন? কোথা থেকে? ষ্টেশনে কেউ গেছে? গাড়ী?

খগেন। (তদবস্থ) না, তারটা পড়বো?

গিরিজা। (অধৈর্য্যভাবে) ব্যাপার কি খগেন? সে বাড়ী আসছে খবর পেয়ে তুমি তাকে আনবার ব্যবস্থা না ক'রে এলে তার পড়তে! তাই না হয় চট ক'রে পড়ো না ছাই, মুখেই বলো কি লিখেছে? কথা নেই কেন? ইংরেজী তো বুঝবো না।

খগেন। কি বলব মা! লিখেছেন, converted Christianity going home soon—খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করেছি, শীঘ্রই বাড়ী যাচ্ছি!

গিরিজা। (বিহ্বলভাবে)—খগেন কি বল্লি? ঠিক শুনেছি তো? না হয় তোর বোঝার ভুল। না হয়, আমি হয়তো ভুল শুনলাম। বিভূ খৃষ্টান হ'য়েছে, এই কথা কি তুই বল্লি? তুই হয়ত পড়তে পারিস নি।

খগেন। হয়তো মিথ্যা ক'রে ভয় দেখাবার জন্যেই লিখেছেন। ঠিক পড়েছি মা। তবে—

গিরিজা। না খগেন! মিথ্যা বলতে আমি তাকে শেখাই নি। মিথ্যা সে বলে না। যা লিখেছে তা ক'রেওছে। শোন খগেন! আমিও বলে রাখছি সেই স্বধর্ম্মত্যাগী কুলাঙ্গার আমার স্বামী শ্বশুরের ভিটেয় পা দিতে পাবে না, আমার এই হুকুম রৈল, যেন তামিল হয়।

খগেন। (ইতস্ততঃ করিয়া) কিন্তু মা! তাঁর বাড়ী, তাঁর ঘর, আমার কি সাধ্য যে, তাঁকে ঢুকতে না দিই? আমায় তিনি মানবেন কেন?

গিরিজা। আমার পঁচিশটা বরকন্দাজ কি করতে রয়েছে? সেদিন বন্দুকের পাশ বদলে আনলে না?

(খগেন ও স্বাতী শিহরিয়া উঠিল)

খগেন। (ব্যাকুলকণ্ঠে) কি বলছেন মা?

গিরিজা। কি বলছি? আমি তার মা, আমি তার দীর্ঘ জীবনের জন্য প্রত্যহ হাজার আট দুর্গা নাম, সঙ্কটা, ষষ্ঠী, বটুক ভৈরব স্তোত্র পাঠ না ক'রে জল খাই না। তুলসী দেওয়া, সত্যনারায়ণ করা, সঙ্কটার উপোস, শনির বার,—এসব আমার ওর জন্ম থেকে বাঁধা, স্বস্ত্যেন যে মাসে কত হয়, সে তুমি খুব জান। খয়ের কাঠ, চন্দন কাঠ, উনকোটি চৌষট্টি খুঁজে আনার ভার তোমারই ঘাড়ে ছিল, আজও তার শেষ হয় নি। কিন্তু আজই তার সব শেষ! জান খগেন, যে বিভূ আমার ছেলে ছিল, আমার হাকুতির পুত ছিল, সে মরে গেছে। এই মাত্র তার মৃত্যুসংবাদ তুমিই আমাকে শুনিয়েছ। ও যে বেঁচে রৈল, ও সেই আমার মরা বিভূতির প্রেত। ভূতগ্রস্ত বাড়ী আমি হ'তে দেব না। যাও, যাও সবাইকে বলে দাও গে যেন কেউ তাকে দোর খুলে না দেয়। বন্দুক নিয়ে বরকন্দাজরা দোরে দোরে পাহারা দিক। যদি দরকার হয় বন্দুক চালাতেও যেন দ্বিধা না করে। যাও অমন করে দাঁড়িয়ে থেক না, যাও। (খগেন ধীরে ধীরে চলিয়া গেল)। (বজ্রাহতা স্বাতীর দিকে ফিরিয়া) বিধবার সঙ্গে নিজের তুলনা দিয়েছিলে, মনে ব্যথা পেয়েছিলাম। ঠিক বলেছিলে তুমি। আজ থেকে তুমি বিধবাই, আমার আদেশ রৈল ইচ্ছে হ'লে তুমি বিধবা বিয়ে করতে পার। (স্বাতী দু'হাতে মুখ ঢাকিল। গিরিজাসুন্দরীর চোখে আগুনের দীপ্ত শিখা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। একটু পরেই "শ্রীধর! এই করলে" বলিয়া আসনের উপর ঢলিয়া পড়িলেন।)

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

জেনারেল রেমঁ

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, পি আর এস

জেনারেল রেমঁ (Reymond) প্রথম যুগের একজন বিখ্যাত ফরাসী ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। নিজাম রাজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ফরাসীদিগের মধ্যে বুসীর পরেই তাঁহার নাম করিতে হয়। প্রায় সার্দ্ধশতবর্ষ পরে আজিও হায়দ্রাবাদে তাঁহার নাম ভক্তিভরে উচ্চারিত হইতে দেখা যায়। ফ্রান্সের অন্তর্গত সেরিগন্যাক নগরে জনৈক বণিকের গৃহে মাইকেল জোয়াকিম মারি রেমঁর জন্ম হইয়াছিল (২০শে নভেম্বর ১৭৫৫)। প্রথম জীবনে তিনিও পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে কারবারের শাখা খুলিবার অভিপ্রায়ে বিংশতিবর্ষ বয়সে রেমঁ সর্ব্বপ্রথম এদেশে আসেন। অতঃপর তিনি আর স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তাঁহার অবশিষ্ট জীবন এদেশেই অতিবাহিত হইয়াছিল। ইউরোপ হইতে তিনি যে সকল পণ্যদ্রব্যাদি আনিয়াছিলেন অল্পকাল মধ্যে সেগুলি বিক্রয় করিয়া তিনি বিলক্ষণ লাভবান হইয়াছিলেন। অতঃপর স্বীয় "উৎসাহপূর্ণ প্রকৃতি এবং বৈচিত্র্যময় জীবনে প্রগাঢ় অনুরাগের প্রেরণায়" তিনি মহিশুর রাজ্যে ভাগ্যান্বেষণে গমন করিলেন। শ্ভেভালিয়ে দিলাসে নামক হায়দর আলির একজন ফরাসী সেনানী ছিল। তাহার দলে সেকেণ্ড-লেফটেনাণ্ট পদে রেমঁর সামরিক জীবন আরম্ভ হইয়াছিল।

কীন [রে]মঁর ভাগ্যান্বেষণে গমনের কারণ এবং সময় [অন্য]ভাবে প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে [...]র ইংরাজদিগের সহিত ফরাসীদের আবার যুদ্ধ [...] সেনাদলে যোগ দিয়াছিলেন এবং পন্দি-[চেরী]র পর কাউণ্ট লালীর জনৈক ভ্রাতুষ্পুত্র এবং [অন্য এক]জন উৎসাহী ব্যক্তির সহিত তিনি হায়দর-[এর আ]শ্রয় লইয়াছিলেন। * প্রখ্যাতনামা "কনিষ্ঠ লালী" যে কাউণ্ট লালীর কেহ ছিলেন না এবং দীর্ঘকাল পূর্ব্ব হইতে দেশীয় দরবারে ভাগ্যান্বেষণ-নিরত ছিলেন সে কথা অন্যত্র বলিয়াছি। কীনের অন্যান্য কথাও সত্য বলিয়া মনে হয় না।

ইঙ্গ-ফরাসী সমর হইতে কিরূপে ক্রমে হায়দর আলির সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছিল সে ইতিহাস ইতিপূর্ব্বে জেনারেল লালী প্রসঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে। রেমঁ এই সময়ে তাঁহার সেনাদলভুক্ত থাকিয়া বহু যুদ্ধাভিযানে উপস্থিত ছিলেন এবং মধ্যে কিছুকালের জন্য দলের অধ্যক্ষ-তাও করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু জানা না গেলেও, তিনি যে নিতান্ত অল্প কৃতিত্ব দেখান নাই সে কথা অনায়াসে মনে করা যাইতে পারে; নতুবা ফরাসী সরকার কখনই তাঁহাকে সমরমধ্যে রাজকীয় সেনাবিভাগে কাপ্তেন-পদে উন্নীত করিতেন না। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে মার্কুইস দি বুসী ফরাসী-বাহিনীর অধ্যক্ষতা লইয়া কুদ্দালুরে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীবৃন্দ এবং তাহাদের ভাষাসমূহ সম্বন্ধে রেমঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। সে কারণ বুসী তাঁহাকে টিপু সুলতানের সম্মতিক্রমে স্বীয় এডিকং পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং কুদ্দালুর অবরোধেও রেমঁ উপস্থিত ছিলেন সন্দেহ নাই। লালীপ্রসঙ্গে যুদ্ধের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

যুদ্ধনিবৃত্তির পরে রেমঁ বুসীর সহিত পন্দিচেরীতে আগমন করেন। তাঁহার পূর্ব্ব কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি আর ফিরিয়া যান নাই। বুসীর দেহান্তের পর (জানুয়ারী ১৭৮৫) ফরাসী গভর্ণরের অনুমতি লইয়া তিনি নূতন ভাগ্যান্বেষণের ক্ষেত্রের সন্ধানে নিজাম দরবারে গমন করেন। তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতঃপর নিজামের পরিচর্য্যায় হায়দ্রাবাদ রাজ্যে অতিবাহিত হয়।

---

* G. Keene: "Hindustan under Free Lances," p. 70

এই সময়ে হিন্দুস্থানে দি বইন মহাদজী সিন্ধিয়ার কর্ম্ম গ্রহণ করেন। প্রায় একই সময়ে এই দুই ভাগ্যান্বেষী সৈনিক নিজ নিজ প্রভুর জন্য পাশ্চাত্য যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত সিপাহীবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা করেন। দি বইনের মত রেমঁও প্রথমে একটি ক্ষুদ্র দল গড়িয়াছিলেন। উহাতে মাত্র ৬০০ সৈনিক ছিল। জনৈক ফরাসী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে তিনি মাসিক আট আনা হারে বন্দুকগুলি ভাড়া লইয়াছিলেন। উহাদের কার্য্য দেখিয়া নিজাম আলি সন্তুষ্ট হইলে তাঁহার আদেশে রেমঁ আরও দুইটি কোম্পানী গঠন করিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার সর্ব্বসমেত ৯০০ শিক্ষিত সিপাহী হইয়াছিল। ইংরাজরা নিজামকে জানাইয়াছিলেন যে ভবিষ্যতে ফরাসী সৈন্যদল না রাখিবার অঙ্গীকার করিয়া তিনি তাঁহাদের সহিত যে সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহার অন্যথাচরণ করা হইতেছে। কিন্তু প্রত্যুত্তরে নিজাম বলিলেন যে তাঁহার প্রতিশ্রুতি ইউরোপীয় সৈনিক সম্বন্ধে প্রযুজ্য, ইউরোপীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত দেশীয় সেনা সম্বন্ধে উহা কোনমতে আরোপিত হইতে পারে না। বিষম অনিচ্ছার সহিত ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ নিজাম কৃত ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই সময়ে পন্দিচেরীর নবাগত গভর্ণর কাউণ্ট দি কনওয়েকে রেমঁ কর্ত্তৃক লিখিত একখানি চিঠি হইতে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল,—

হায়দ্রাবাদ, ১লা ডিসেম্বর ১৭৮৭

আমার জেনারেল,

আপনার সহিত পরিচয়ের সম্মানলাভ না করিলেও, আপনার অধীনে যে সকল ফরাসী রহিয়াছে, বিশেষতঃ যাহারা আপনার আশ্রয় সুখ উপভোগ করিতেছে, তাহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য বোধে আপনাকে পত্র লিখন কার্য্য করিতে অদ্য আমি সাহসী হইয়াছি। আমি মর্ম্মে করি যে, যাঁহার বিপুল যশ এমন বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেরূপ একজন সেনাপতির আজ্ঞাধীনে থাকিতে পাওয়ার জন্য সকলেই তুল্যভাবে প্রশংসার পাত্র। ম্যসিয় কোসিনীর প্রস্থানের পূর্ব্বে আমার পত্র আপনার হস্তগত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে তাঁহার প্রদর্শিত দয়াই আমাকে আমি কে এবং আমার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আপনাকে জানাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে উৎসাহিত করিত। বিগত সমরে তাঁহার আজ্ঞাধীনে থাকিয়া লড়িবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তাঁহার চোখের সামনে বহু যুদ্ধে আমি উপস্থিত ছিলাম। দীর্ঘকাল হইতে আমি ম্যসিয় কর্ণেল দি লালীর দলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলাম এবং উহা পরিচালনও করিয়াছিলাম। পরে বিশেষ কারণ বশতঃ,—যে বিষয়ে আমি ম্যসিয় দি কোসিনীকে জানাইয়াছি—আমি ঐ কোর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। বর্ত্তমানে উক্ত দলের কোন দৃঢ় ভিত্তি আর নাই। আঠার মাস হইল তিনি আমাকে উত্তম সুপারিশ পত্রসমূহ সহ এখানে সুবেদারের নিকট পাঠাইয়াছেন। তিনি তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া আমাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার আদেশে এক ব্যাটালিয়ন সিপাহীসেনা সংগঠন করিয়াছি। উহারা এক্ষণে উত্তমরূপে শিক্ষিত এবং নিয়মানুগ হইয়াছে। দলে সাত শত সৈনিক আছে। একজন ইউরোপীয় ইহার দ্বিতীয় অধ্যক্ষ; অধস্তন অফিসরগণও সকলে ইউরোপীয়। সৈনিকগণের আচরণ এ পর্য্যন্ত আমার নিকট প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে হয়। ফরাসী সেনাদলে নির্দ্দিষ্ট রেগুলেসনাদি অনুসারে দলটী গঠিত এবং সৈনিকগণ তদনুসারে ড্রিলাদি করিয়া থাকে।

সেনাপতি মহাশয়, আমি আশা করি যে আমার আচরণ সম্বন্ধে পন্দিচেরী আপনাকে যে সংবাদ দিতে সমর্থ তাহার পর আপনি ম্যসিয় কোসিনী কর্ত্তৃক আরব্ধ কার্য্যটী আর ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিবেন না এবং আমাকে ভবদীয় আনুকুল্য এবং শুভেচ্ছা প্রদান করিবেন। আমি যদি এতাদৃশ সৌভাগ্যশালী হই যে, স্বদেশের প্রতি যে তীব্র অনুরাগ আমাকে সঞ্জীবিত রাখিতেছে এবং যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত আমি আপনার পরম বিশ্বস্ত ভৃত্য, অদৃষ্টচক্র তাহা সপ্রমাণ করিবার সামর্থ্য আমাকে দেয়, তাহা হইলে সেনাপতি মহাশয়! আপনি জানিবেন আমি সব কিছু বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছি।" *

---

* Poona Residency Correspondence, Vol III. No. 518.

ইহার পর পুনরায় টিপুর বিরুদ্ধে তৃতীয় মহিশুর সমরে (১৭৯০-৯২ খৃঃ) রেম র সৈন্যগণের পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে লালী প্রসঙ্গে যুদ্ধের কারণ এবং প্রথমাংশের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে শুধু মারাঠা এবং নিজামী সেনার অভিযানের কথা বলা যাইবে। বিখ্যাত সর্দ্দার পরশুরাম রাও পটবর্দ্ধন মারাঠা বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধীর মন্থর গতিতে অগ্রসর হইয়া মারাঠারা ধারবার নগর অবরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাদের তোপখানা ফিরিঙ্গি গোলন্দাজগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলেও কামানসমূহ অত্যন্ত পুরাতন এবং অকর্ম্মণ্যপ্রায় ছিল। বহু কষ্টে দুই একবার কামান দাগার পর দীর্ঘকাল তাহা বন্ধ থাকিত। দুর্গরক্ষীগণ সেই সুযোগে ভগ্ন স্থান সমূহের সংস্কার সাধন করিয়া লইত। দীর্ঘ সাত মাস কাল এইভাবে অবরোধ কার্য্য চলিবার পর মহিশুরীরা মুক্তির আশ্বাস পাইয়া আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারা বাহিরে আসিবামাত্র বিশ্বাসঘাতক মারাঠাদিগের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া সকলকার প্রাণবধ করিতে এতটুকুও বাধিল না! পরশুরামের চরিত্রে ইহা দুরপণেয় কলঙ্ক সন্দেহ নাই।

কাপ্তেন লুই এণ্টনি এভন (Yvon) নামক জনৈক ইংরাজজাতীয় সৈনিক পেশবার সেনাদলে একটি কোরের (corps) অধিনায়ক ছিল। অতঃপর তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে, আশা করি তাহা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে না। কাপ্তেন মুর উহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা যদি সত্য হয় এবং উহাই যদি পেশবার দরবারে ভাগ্যান্বেষী ইউরোপীয়দিগের নমুনা হয়, তবে মারাঠা কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনা শক্তির প্রশংসা করা যায় না। মুর বলেন যে "তাহার প্রকৃত নাম ছিল এভান্স, ভেলোরেই সে সর্ব্বশেষ এই নামে পরিচিত ছিল। তথায় সে মান্দ্রাজ বাহিনীর এক অশ্বারোহী পল্টনে কোয়ার্টার মাষ্টার সার্জ্জেণ্ট ছিল। তাহার সহিত সে সময় একটি ইউরোপীয় স্ত্রীলোক বাস করিত। তাহাকে সকলে উহার স্ত্রী বলিয়া জানিত। প্যাষ্ট্রি তৈয়ারী করিতে সে সুদক্ষা ছিল। এভান্সেরও তরবারি পরিচালনায় সবিশেষ নৈপুণ্য ছিল। এইরূপে তাহারা নিজ নিজ ব্যবসায় লব্ধ অর্থে সুখে বাস করিত। পরিশেষে উপরিওয়ালার সহিত বিরোধের ফলে এভান্স এবং তাহার পত্নী গোপনে ভেলোর পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তৎপূর্ব্বে আর উহার সম্বন্ধে কোন কথা শুনা যায় নাই। মধ্যের কয়েক বৎসরের তাহার কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে কিছু জানা নাই। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইবার পর তাহার পুনরায় যখন সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তখন সে যে দলটী অধুনা পরিচালন করিতেছিল তাহাতে সে সামান্য পদে অধিষ্ঠিত ছিল। টিপু এবং মারাঠাদের মধ্যে সংঘটিত একটি পূর্ব্বতন সমরে, বোধ হয় বাদামীর যুদ্ধে (২০।৫।১৭৮৬) এভান্স সবিশেষ সাহস এবং কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল এবং ফলে অচিরে যখন দলের অধ্যক্ষপদ শূন্য হইয়াছিল তখন উহা তাহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহার সঙ্গিনীর ইতোমধ্যে দেহান্ত হইয়াছিল। অতঃপর এভান্স খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী একটী দেশীয়া রমণীকে বিবাহ করিয়াছিল। কথিত আছে আহত অবস্থায় এবং অন্যান্য সময়ে তাহার পরিচর্য্যা করা এবং সদয় ব্যবহারের জন্য প্রধানতঃ স্বীয় কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ সে ঐ কার্য্য করিয়াছিল। তাহার দলে প্রায় পঞ্চাশ জন ইউরোপীয় সৈনিক ছিল।" *

এভনের স্বলিখিত বিবরণ অন্যরূপ। কাহার কথা সত্য বলা যায় না। এভন বলে তাহার নামের বানান Yvon হইলেও তাহার প্রকৃত উচ্চারণ হইল এভন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্ম গ্রহণকালে কেরাণী উচ্চারণ সাদৃশ্য হইতে ভ্রমক্রমে তাহা 'এভান্স' লিখিয়াছিল। ভ্রম সংশোধনের জন্য সে বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাতে কৃতকার্য্য হয় নাই। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর সে দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে নানা কার্য্য ব্যপদেশে কালাতিপাত করিয়াছিল। বাহুল্য বোধে তাহা আর এখানে প্রদত্ত হইল না। পরে অবস্থাচক্রে কতকটা বাধ্য হইয়াই সে পেশবার সেনাদলে প্রবেশ করিয়াছিল। পেশবার পরম বিশ্বস্ত সেনানায়কের পদলাভ করিলেও এভন ভিতরে ভিতরে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের

* A Narrative of the Operations of Captain Little's Detachment. P. 26-7.

গুপ্তচরের কার্য্য করিত এবং পুণাস্থ তাঁহাদের রেসিডেণ্ট ম্যালেটকে নিয়মিতভাবে সকল কথা জানাইত। *

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে মারাঠাদের সহিত টিপুর আবার যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। কৃষ্ণা এবং তুঙ্গভদ্রানদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে বহু-সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মারাঠা সর্দ্দারের আধিপত্য ছিল। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হায়দর উহাদের জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজ-দিগের সহিত মহিশুরাধিপতিগণের সমর কালে (১৭৮০-৮৪) সুযোগ বুঝিয়া উহারা স্বাধীনতালাভে সচেষ্ট হইয়াছিল। সমরাবসানের পর টিপু উহাদের দমন করিবার চেষ্টা করিলে তাহাদের নেতা নারগুণ্ডের সর্দ্দার মারাঠা দরবারের নিকট সাহায্য কামনা করিয়াছিলেন। (Yoon)নামা জনৈক ইংরাজ ভাগ্যান্বেষী তাঁহার সেনাধ্যক্ষ ছিল। ঐ ব্যক্তি বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু বিদ্রোহপ্রশমনে টিপুকে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় নাই। মারাঠারা স্বজাতীয়গণকে সাহায্য করাতে ক্রমে উহাদের সহিতও তাঁহার প্রকাশ্য সমর বাধিয়া উঠিয়াছিল। ১৭৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ম্যালেটকে লিখিত এভনের কয়েকখানি পত্র হইতে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য অবগত হওয়া যায়। ‡ তন্মধ্যে একখানি পত্র হইতে মারাঠা পক্ষে ভিভিয়ে (Vivier) এবং টিপুর পক্ষে দেহালিয়ে (Dehalier) নামক দুইজন ফরাসী অফিসরের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত ব্যক্তির ২১।১।১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে শিবিরে রোগে মৃত্যু হইয়াছিল।

ধারবার-অবরোধে ৬।২।১৭৯১ তারিখের যুদ্ধে এভন নিহত হইয়াছিল। অনন্তর তাহার দলের নেতৃত্ব রবিন্সন নামক জনৈক ইংরাজজাতীয় সৈনিকের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। ঐ ব্যক্তিও তাহার মতই কোম্পানীর বাহিনী হইতে পলাতক ছিল। প্রথমে সে মহীশুরী সেনাদলে প্রবেশ করে এবং ধারবার দুর্গমধ্যে অবস্থিত ছিল। অবরোধ চলিবার সময় আবার সে প্রভু পরিবর্ত্তন করিয়া মারাঠাপক্ষ অবলম্বন করে। বেগম এভন তখন অদূরে বেলগাঁওয়ে বাস করিতেছিল। এ ব্যবস্থা তাহার মনঃপূত হইল না। নিজ দাবী উপেক্ষিত হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধা বেগম ধারবারে আসিয়া রবিন্সনকে বন্দী করিয়া মৃত স্বামীর সৈনিকগণের নেতৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিল!

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে কৈম্বাটুরে ইংরাজদিগের এক বিষম বিপদপাৎ হইল ইহার পরের সর্ব্বপ্রধান উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। চামার্স নামক জনৈক ইংরাজ সেনানী সামান্য সেনাবল লইয়া তথায় অবস্থিত ছিলেন। মিগোট দেলা কোঁবি নামক ত্রিবাঙ্কুর-দরবারের ভাগ্যান্বেষণনিরত জনৈক ফরাসী সৈনিকও ২০০ দেশীয় সিপাহীসহ তাঁহার সাহায্যকল্পে তথায় প্রেরিত হইয়া আসিয়াছিলেন। কৈম্বাটুরে শত্রুপক্ষের সংখ্যাল্পতা জানিতে পারিয়া টিপু ঐ স্থান অধিকারে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। মহিশুরীদের আগমন সংবাদে ত্রিবাঙ্কুরীদের মধ্যে অনেকে মহাভয়ে দুর্গ হইতে গোপনে পলায়ন করিয়াছিল। তথাপি চামার্স এবং লা কোঁবি অসীম বীরত্বের সহিত দুই মাসেরও অধিককাল প্রবল শত্রুসেনার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১১ই আগষ্ট তারি-খের যুদ্ধ তীব্রতম হইয়াছিল। ভোরের আলো সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করিবার পূর্ব্বে শত্রু-সেনা পাঁচটী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল। লা কোঁবি রক্ষিত অঞ্চলে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ হাতাহাতি যুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি পর্য্যুদস্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছেন এমন সময় চামার্স আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। স্বল্পকাল মধ্যে বহু নূতন সৈন্য আসিয়া আক্রমণকারী পক্ষে যোগ দিলে আর কোন আশা নাই দেখিয়া চামার্স তাহাদের করে আত্মসমর্পণ করিয়া-ছিলেন। লা কোঁবি সম্বন্ধে আর কোন কথা জানা নাই।

ইতোমধ্যে নিজামী সেনা যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিল এবং বাহাদুরবেন্দা ও কোপল অধিকার করিয়া গুরুমকোণ্ডার সুদৃঢ় দুর্গ অবরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু তথায় তাহারা কিছু সুবিধা করিতে পারিতেছে না দেখিয়া ইংরাজরা তাহা-দের সাহায্য জন্য প্রাচীরবিধ্বংসী তোপখানা পাঠাইয়া-

* "Yvon was a regularly paid European spy of Malet in Peshwah's service"......Poona Residency Correspondence, Vol II. p. 20

‡ Ibid Vol. II. Nos. 43, 48, 49, 51, 53, 56; Vol. III. No. 48.

ছিল। তখন পাহাড়ের নিচেকার দুর্গটি হস্তগত হইয়াছিল। এমন সময় খবর আসিল যে, লর্ড কর্ণওয়ালিস মহিশুর রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন। লুঠের অংশে বঞ্চিত হইবার ভয়ে নিজামী ফৌজের চাঞ্চল্যের অবধি রহিল না। সৈন্যাধ্যক্ষ নবাবজাদা সেকেন্দরজাহ উপরের দুর্গটি অধিকার করিতে পারা সম্বন্ধে হতাশ হইয়া হাফিজ ফরিদুদ্দিন খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বে সামান্য একদল সৈন্য অবরোধের ভাগে ব্যাপৃত রাখিয়া ইংরাজদের সহিত যোগদানে গমন করিয়াছিলেন। হাফিজ নিতান্ত মূর্খের মত নিজ সৈন্যবল দুই ভাগে ভাগ করিয়া স্মিথ নামক একজন ফরাসী সৈনিকের অধীনে এক অংশ কিঞ্চিদ্দূরে রাখিয়াছিলেন। মহিশুরীরা সকল কথাই জানিতে পারিয়াছিল। টিপুর জ্যেষ্ঠপুত্র ফতে হায়দর একদিন অতর্কিত আক্রমণে সকলকে বন্দী করিয়াছিলেন। হাফিজ এবং স্মিথ উভয়েই ধৃত এবং নিহত হইয়াছিল।

হাফিজের প্রতি কোন কারণে টিপুর বিষম বিরাগ ছিল। তাঁহার আদেশ মতই ঐ ব্যক্তির প্রাণবধ করা হইয়াছিল, যদিও পরে তিনি অর্দ্ধ প্রচ্ছন্ন সন্তোষের সহিত তাহাতে স্বীয় অসমর্থন জানাইয়াছিলেন কিন্তু স্মিথের মৃত্যুতে তিনি স্পষ্ট উল্লাস প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার কারণ বুঝা যায় না। স্মিথ সম্বন্ধে আর কিছু জানা নাই। উহা তাহার প্রকৃত নামও নহে। কথিত আছে ঐ ব্যক্তি ছদ্মনামরূপে স্বীয় নামের ইংরাজী প্রতিশব্দ পরিগ্রহ করিয়াছিল। সে কথা সত্য হইলে বলা আবশ্যক উহার আসল নাম ছিল Forgeron। উহার সম্বন্ধে কর্ণেল উইলকস লিখিয়াছেন—"উক্ত হতভাগ্যের সামরিক অসাবধানতা তাহার সম্বন্ধে বহু অপযশকর অনুমানের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহার স্বদেশীয়গণও সকল কথা এত কম বুঝিত যে সমস্ত কৈফিয়তাদি পাইবার পরও লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রকাশ্যে লিখিয়াছিলেন যে, যে অসাবধান কার্য্যের ফলে সে প্রাণ হারাইয়াছে তাহা হইতেছে শত্রুর সহিত রাজদ্রোহকর ষড়যন্ত্র।" * এ কথার অর্থ বোধ করা কঠিন।

যুদ্ধের মধ্যে রেমঁর বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। ২৮।৮।১৭৯১ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন কেনাওয়ে কর্ণওয়ালিসকে লিখিয়াছিলেন "রেমঁ নামক একজন সচ্চরিত্র ফরাসী সৈনিকের অধীনে নিজামের সৈন্যবর্গ গুটি অবরোধ করিয়াছে। উহাদের নিকট প্রাচীর ধ্বংসোপযোগী তোপখানা নাই এবং তাহা পাইবারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। খাদ্যাভাবে আপনা হইতে উহার পতন না হইলে তাহাদের পক্ষে উহা অধিকার করা সম্ভব হইবে না।" ইহার পর ৩১।১০।১৭৯১ তারিখে লিখিত অপর একখানি পত্র হইতে প্রকাশ যে গুটি অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া নিজামী সেনা ইংরাজদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল এবং রেমঁর দল ঐ দিন আসিয়া উপনীত হইয়াছিল। †

যুদ্ধ সম্বন্ধে রেমঁর নিজের লেখা দুইখানি চিঠি পাওয়া গিয়াছে। উহা হইতে নানা তথ্য জানা যায়। দুইখানি পত্রই পন্দিচেরীর গভর্ণর কাউণ্ট কনওয়েকে লিখিত হইয়াছিল।

(১) ৩রা জানুয়ারী ১৭৯২

ম্যাসিয় পিরঁর যাত্রা করিতে কয়েকদিন বিলম্ব হওয়াতে আমি সৈন্যদলসমূহের অবস্থানে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধে তাঁহার মারফৎ আপনাকে সংবাদ পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছি। এই মাসের (ডিসেম্বর ১৭৯১) প্রারম্ভে ইংরাজ সেনা অগ্রসর হইয়া মগ অধিকার করিয়াছিল। টিপুর পুত্র ফতে হায়দর ১০০০০ অশ্বারোহীসহ মাসের ২১শে তারিখে গুরুমকোণ্ডার মোগল শিবিরে উপনীত হইয়াছিলেন। তথায় ৮০০০ সৈন্য ছিল। তিনি উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন, অবরুদ্ধগণকে আহার্য্য দ্রব্য সরবরাহ করিয়া দিয়া পিতৃসদনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

সিকন্দর জাহের সৈন্যদল এখন ফিরিয়া আসিয়াছে এবং এখন গুরুমকোণ্ডায় শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে। ইংরাজদিগের বাহিনী পাটন হইতে ১০ লিগ দূরে আছে এবং অগ্রসর হইবার জন্য উহাদের সহিত সম্মিলন প্রতীক্ষা করিতেছে। ইংরাজ সেনাকে সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইবে দেখা যাইতেছে।

* History of Mysore, Vol. II. P. 306.

† Poona Residency Correspondence, Vol. III. No. 362, 384.

গুরুমকোণ্ডার শিবিরে ক্ষতির পরিমাণ এক কোটি টাকা অনুমিত হইয়াছে। সেনাধ্যক্ষ এবং ম্যসিয় রিভিয়ের প্রমুখ আরও কয়েকজন বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী বন্দী হইয়াছেন। ম্যসিয় পির আপনাকে সকল তথ্য যাহা আপনি ইচ্ছা করেন দিতে পারেন।

(২) হায়দ্রাবাদ, ১৩ই জুলাই ১৭৯২

আমার সেনাপতি মহাশয়,

গত মাসের ১৭ই এবং ২২শে তারিখে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে যে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার প্রত্যুত্তর দুইজন হরকরা মারফৎ আপনাকে পাঠাইবার সৌভাগ্যলাভ আমার হইয়াছিল। উহাদের কোন সংবাদ এ যাবৎ আমি আর পাই নাই। আমার পত্র চেঙ্গামা, যেখানে ইংরাজরা মোগল এবং মারাঠাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়াছিল, হইতে লিখিত ছিল। শেষোক্তরাও কয়েকদিন পরে প্রস্থান করিয়াছিল। অনন্তর নিজাম আলির পীড়ার যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল তাহা তাঁহার সৈন্যদলকে এরূপ বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছিল যে এক্ষণে উহা বিশেষ আয়াসের সহিত পুনঃ সম্বদ্ধ হইয়াছে। আমাদের সর্দ্দারগণ সৈন্যদের পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, উহারাও যথাসম্ভব তৎপরতার সহিত প্রভুদের অনুগমন করিয়াছিল, প্রত্যেকেই নিজ নিজ খেয়াল মত এবং বিভিন্ন পথে।

সেনাপতি মহাশয়, টিপু যাহা হারাইয়াছেন এবং মিত্রগণের মধ্যে লুণ্ঠিত দ্রব্য বণ্টন সম্পর্কিত সন্ধিপত্র সম্বন্ধে সামান্যতম তথ্যও আপনার সুপরিজ্ঞাত বলিয়াই আমার বিশ্বাস। এবিষয়ে জনমত এবং আমার পত্রসমূহ আপনাকে সঠিক বিবরণ দিয়া থাকিবে।

আমাদের রাজা (নিজাম আলি) সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। রাজকর্ম্মচারীগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা পীড়া ভিন্ন অপর কোন কারণ নহে এবং সর্ব্বোপরি গুণ্টুর যাইবার পথে পির যে সকল অসুবিধা ভোগ করিয়াছিলেন তাহাই ইতিপূর্ব্বে আপনাকে পত্র লেখারূপ সম্মান হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। আপনাকে পির হাত দিয়া শাক সজির বীজ প্রেরণ কালেও, যাহা এতদিনে আপনি পাইয়া থাকিবেন, আমি কিছু লিখি নাই। তিনি যখন মোরোপল্লীতে ছিলেন তখন রাজার মৃত্যু সম্বন্ধে এক গুজব রটার ফলে তাঁহাকে একমাস কাল আটক থাকিতে হইয়াছিল। পঞ্চাশ জন সিপাহীসহ একজন ইংরাজ অফিসর তাঁহার প্রহরী ছিলেন। তিনি এখনও ফিরিয়া আসেন নাই, তবে আমি খবর পাইয়াছি তিনি এই নগর হইতে ৮ লিগ দূরে শিবির স্থাপন করিয়াছেন।

এখানকার দুর্দ্দশা এক আতঙ্কপ্রদ দৃশ্যের অবতারণা করে। আমি বলিতে পারি যে প্রত্যহ ২০০ ব্যক্তি অনাহারে মানবলীলা সম্বরণ করিতেছে। হায়দ্রাবাদের রাজবর্ত্ম সমূহ শবদেহে সমাকীর্ণ। যদিও গভর্ণমেণ্ট আহার্য্যাভাব দুরীকরণের চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন তথাপি সকলেই দেখিতে পাইতেছে যে আগামী ফসল গোলাজাত হইবার পূর্ব্বে অভাব প্রশমিত হইবার নহে। অধিবাসীরা দাঙ্গা হাঙ্গামার অবস্থায় উপনীত। গত মাসের ১৫ই তারিখে গোলকুণ্ডার প্রান্ত পর্য্যন্ত তাহা পৌছিয়াছিল। সমস্ত বাজারে লুঠ তরাজ করা ভিন্ন তাহারা রাজাকে প্রাসাদ মধ্যে প্রায় অবরোধ করিয়াছিল। প্রবেশ পথ রোধ করিয়া দেওয়াতে উহারা তাহা অগ্নিযোগে ভস্মসাৎ করিয়াছিল এবং অস্ত্রবলে বাধ্য না হওয়া অবধি তাহারা পশ্চাৎপদ হয় নাই। এদেশের এক সেরের ওজন ৩০ আউন্স এবং টাকায় দুই সের দরে চাল বিকাইতেছে।

দাক্ষিণাত্যে সিন্ধিয়ার আগমনের কি ফল হইবে সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে পারি না। মারাঠা-নৃপতি সবাই মাধবরাওকে সিংহাসনচ্যুত করা অথবা রাঘবের অন্যতম পুত্রকে তৎপরিবর্ত্তে বসানর উদ্দেশ্য লইয়া তিনি আসিয়াছেন। দিল্লী হইতে তিনি বাদশাহের একজন পুত্রকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা নিজাম আলি উহাকে পেইনঘাট এবং বিরার প্রদেশ প্রদান করেন। জাকাল রকমের একটি বিবাহ উপলক্ষ্যেও তিনি আসিয়াছেন। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জ কি ভাবে সমর পরিচালিত হইতে পারে সে সম্বন্ধে দূর হইতেই একটা মীমাংসায় উপনীত হইবেন। সিন্ধিয়ার পক্ষই পুণায় আধিপত্য করিবে। নিজাম আলির এখন যুদ্ধে পাঠাইবার মত

দশ সহস্র সৈনিকও নাই। এক লক্ষ উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈনিকের বিরুদ্ধে তাঁহার মন্ত্রীর মাত্র বিচক্ষণতা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবে না। ইহা হইতে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে যুদ্ধটা হয় অর্থ দ্বারা নিষ্পত্তি হইবে, নয়ত সিদ্ধিয়া যাহা চাহিতেছেন তাহা পাইবেন। এ সকল সত্বেও সমরের আয়োজন চলিতেছে।

এই সকল কারণে রাজা আমাকে সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য তাগিদ দিতেছেন। এ পর্য্যন্ত আমার ৩০০০ সশস্ত্র সৈনিক আছে। আরও এক সহস্রের উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র এবং পরিচ্ছদ ক্রয় করিবার জন্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে লে মার্সিয়েকে ২০০০০৲ টাকা পাঠাইয়াছি। সেনাপতি মহাশয়, আমার সকল উদ্যম আপনি কৃপা দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এবং তাহা আমাকে আরও একটি নূতন কার্য্যে উৎসাহিত করিতেছে। এই উদ্দেশ্য লইয়াই আমি দুইটি কামান, ১০০০ বন্দুক এবং ১০০০ সিপাহীদের উর্দ্দি প্রস্তুত করিবার ভার লইয়াছি। বন্দুকগুলি সম্বন্ধে আপনি কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করেন নাই। কামানগুলি সম্পর্কে আমি আপনার নিকট হইতে অনুরূপ সহায়তা যাচ্ঞা করি। যদি কোন বাধা থাকে তাহা হইলে লে মার্সিয়ে যেন নেগাপট্টম অথবা মান্দ্রাজে আমার জন্য ঐগুলি সংগ্রহ করিতে তাঁহার পক্ষে যাহা কিছু সম্ভব তাহা করেন। ইংরেজগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত আমার পাসপোর্ট আমাকে ক্ষমতা দিয়াছে যে, জিনিসগুলি যদি মান্দ্রাজে ক্রীত হয় তাহা হইলেও সেগুলি সমভাবে আমার নিকট পাঠাইতে দেওয়া হইবে। সেনাপতি মহাশয়, আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ অনুমোদন করিবার মত দয়াপ্রদর্শন করুন। পিরঁকে সাহায্য করিয়া আপনি ইতোমধ্যে আমার যে পরম উপকারসাধন করিয়াছেন তাহা আমি এখনও বিস্মৃত হই নাই। যদি আমার আশাগুলি পথভ্রষ্ট না হয় তাহা হইলে আমি ইহা যে কার্য্যে লাগাইব তাহা আপনাকে প্রদাতব্য আমার ধন্যবাদ সমূহের স্থল অধিকার করিতে পারিবে।

রাজধানীতে সুধু আমার সৈন্যরাই আছে। তথায় যে প্রকার অশান্তি বিরাজ করে তাহাতে আপনার নিকট যাইবার জন্য নৃপতির অনুমতি কামনা করা নিষ্ফল হইবে। আপনি যাহার যোগ্য সেইরূপ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি আপনার প্রতি তাঁহার আছে জানিবেন। ফরাসীবিপ্লবে আপনি যে যশ অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা তাঁহার সুপরিজ্ঞাত। ঐরূপ বিষম গোলযোগের মধ্যে আপনার গভর্ণমেণ্টের প্রদর্শিত বিচক্ষণতা হইতে তিনি ঠিকই বিচার করিয়াছেন যে আপনি কি না করিতে পারেন, অবশ্য শান্তি এবং সৈন্যদল পাইলে। তাঁহার হইয়া এই সুপারিশ আপনাকে আমি নির্ভয়ে পাঠাইতে পারি বলিয়াই আমি আশা করি। প্রয়োজনমাত্র কার্য্যারম্ভ করিবার মত সুপ্রচুর উপায় ভারতবর্ষে আপনার আয়ত্বমধ্যে রাখিতে যেন আমার স্বদেশবাসীগণ সম্মত হন এবং কার্য্যতঃ রাখেন আমার নিজের দিক দিয়া বলিতে ইহাই হইল আমার প্রার্থনা। আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া যে যন্ত্রটি আমি নির্ম্মাণ করিয়াছি তাহার সামান্য কর্ম্মক্ষমতা মাত্র তখনই প্রকাশ হইতে পারিবে।" *

সৈন্যসংগ্রহে রেমঁকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। নিজামের আদেশ মত অচিরেই তিনি ৫০০০ সিপাহী লইয়া গঠিত একটি পূর্ণ ব্রিগেড গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু অসুবিধা হইল তাহাদের আয়ুধ লইয়া। কর্ণওয়ালিস তাঁহাকে মান্দ্রাজের সরকারী অস্ত্রাগার হইতে অস্ত্রশস্ত্রাদি কিনিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার আবশ্যক মিটিত না। সেজন্য তাঁহাকে নিতান্ত বিব্রত বোধ করিতে হইত। পন্দিচেরীর গভর্ণরকে লিখিত পত্রগুলি হইতে তাহা সুপরিস্ফুট। মরিশস দ্বীপের গভর্ণর কর্ণেল দি ফ্রেসনেকে লিখিত পত্রসমূহেও এই প্রসঙ্গের উল্লেখ দেখা যায়।

(৪) হায়দ্রাবাদ, ১লা অক্টোবর ১৭৯১

আমার সেনাপতি,

আজ প্রায় দুইমাস হইল আমার প্রথম ব্যাটালিয়নে এডজুটাণ্টরূপে নিযুক্ত ম্যসিয় শেমিঁত্রের মধ্যবর্ত্তিতায় আপনাকে একখানি পত্রপ্রেরণের সম্মান আমার হইয়াছিল; তাহার পর এ যাবৎ উহার সম্বন্ধে কোন সংবাদ না পাইলেও

* Ibid, Nos. 519,520

আপনার মহানুভবতায় আমার বিশ্বাসের বলে আমি নিরুদ্বিগ্ন রহিয়াছি। আমার এ পর্য্যন্ত যাহা আছে তদ্ভিন্ন ৫০০০ সিপাহীরা এক কোর সংগঠনের জন্য রাজার সহিত নূতন সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া অদ্য আসিলে মার্সিয়েকে ৫০০০০৲ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছি। উক্ত কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইলে আমি আরও একলক্ষ টাকা পাঠাইতাম। তিনটি প্রধান এবং অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য হইতেছে,—ঢালাই লোহার ১০টি কামান, ফরাসী অথবা ইংরাজী নির্ম্মিত ৫০০০ বন্দুক এবং ৫০০০ সিপাহীগণের উর্দ্দি।

রাজার লেখা যে চিঠিটি আপনাকে আমার পাঠাইবার সৌভাগ্য হইতেছে, তাহা হইতে আপনি দেখিবেন যে তাঁহার একটি অভীপ্সিত কার্য্য সাধনে আপনার সহৃদয় আনুকুল্য তিনি কামনা করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী পত্রে এ বিষয়ে তিনি বিশদভাবে উল্লেখ করিবেন। আপনার সহিত নিয়মিতভাবে পত্র ব্যবহার ভিন্ন তাহা অপর কিছু নহে। প্রথমে আমি মন্ত্রী মহাশয়কে ইহাপেক্ষা স্পষ্টতর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি উত্তর দিয়াছেন যে বরাবর ফরাসীদিগের এবং তাঁহার মধ্যে যে সৌহৃদ্য ও সম্প্রীতির ভাব বিরাজ করিতেছে সে সম্বন্ধে, সেনাপতি মহাশয়, আপনার নিকট হইতে রাজার একটি সন্তোষজনক পত্র সর্ব্বাগ্রে পাওয়া প্রয়োজন। সিন্ধিয়া তাঁহার বাহিনী সহ হিন্দুস্থানের রাস্তা ধরিবামাত্র, যাহা বর্ত্তমান মাসের মধ্যেই সংঘটিত হইবে, আমার পন্দিচেরী অভিমুখে যাত্রায় যে কোন বাধা দান করা হইবে না তাহা তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন। নৃপতির এবং আমার উদ্দেশ্য যদি আপনাকে অসন্তুষ্ট না করে তাহা হইলে আমার মনে হয় আপনি অনায়াসে আপনার বন্দুকগুলি হস্তান্তর করিতে পারেন। আপনার বিশেষ আদেশানুসারেই ঈল দি ফ্রাঁস হইতে ঐগুলির পরিবর্ত্তে অন্য বন্দুক দেওয়া যাইতে পারে।

ম্যসিয় লে. মার্সিয়েকে আমি যে টাকা পাঠাইয়াছি আপনার অনুমতি ব্যতিরেকে তিনি যেন উহা খরচ না করেন। আমার নিজের দিক দিয়া বলিতে, আমার সেনাপতি মহাশয়, আপনি আমাকে যখন যে আদেশ দিবেন তাহা প্রতিপালন করা আমি আমার প্রথম কর্ত্তব্য বিবেচনা করিব। যে সকল দ্রব্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে তাহা স্থলপথে কম্মম পর্য্যন্ত লইয়া যাইবার পাসপোর্ট আমার আছে।

শান্তি সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; অন্ততঃ পক্ষে প্রধান প্রধান শক্তিপুঞ্জের পক্ষে; কারণ রাজার রাজ্যের অভ্যন্তর প্রদেশে কোন না কোন নিভৃত প্রান্তে কোন না কোন গোলযোগ লাগিয়াই থাকে; এবং পির্ এখান হইতে ১৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক স্থানে পনের শত সৈনিক সহ আটক পড়িয়াছেন। বৃষ্টির প্রাচুর্য্য বশতঃ ফসল ভাল হইবে বলিয়াই মনে হয় এবং তাহাতে আহার্য্য-বস্তুর অভাব কতকটা প্রশমিত হইবে। সেনাপতি মহাশয়, আমি আকাঙ্ক্ষা করি যে এদেশে উৎপন্ন হয় এমন কি দ্রব্য আপনার পছন্দকর আছে তাহা আপনি আমাকে জানাইবেন। আপনার প্রতি আমার যে সুগভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা আছে তদনুপাতেই আপনার আদেশ পূরণের জন্য আমার আগ্রহ থাকিবে জানিবেন।

(৫) হায়দ্রাবাদ, ৪ঠা অক্টোবর ১৭৯২

আমার সেনাপতি মহাশয়,

এ মাসের ১লা তারিখে নবাবের লিখিত একখানি পত্র পাঠাইয়া দিবার সময় আমি আপনাকে লিখিবার সম্মান লাভ করিয়াছিলাম। সে পত্রে তাঁহার লক্ষ্য অথবা আমার অভিপ্রায় সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা আমি করি নাই। ম্যসিয় শেমিতের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে, আমি যে সকল ব্যক্তিকে মান্দ্রাজ নগরের উপর হুণ্ডিসমূহের ভার দিয়াছিলাম, তাহাদিগকে আপনি লে মার্সিয়েকে আমার সম্বন্ধে শেষ আদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত সেগুলি রাখিবার আদেশ মাত্র দিয়াছি। যদি আমি কখন স্বপ্নেও ভাবিতাম যে তুল্যরূপ নিন্দনীয় এবং অসম্মানকর একটি অপরাধে আমি অপরাধী বলিয়া সন্দেহ পোষণ করা হইবে তাহা হইলে, সেনাপতি মহাশয়, আমি কখনই এতটা নির্ভরতার সহিত আপনাকে পত্র লিখিতাম না; আপনাকে প্রতারণা করিবার আমার কখনও ইচ্ছা থাকিলে আমি কখনও ঐভাবে লিখিতে পারিতাম না। পন্দিচেরীতে কি

এমন শতসংখ্যক ব্যক্তিও নাই, এমন কি বে-সামরিক অধিবাসীগণের মধ্যে, যাঁহারা পির্ঁর নিকট হইতে তাঁহারা যে অসম্মতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা আমার সততা প্রতিপন্ন করিতে পারেন?

আপনার সম্মুখে নিজের সাফাই গাহিতে বাধ্য হইতেছি সেজন্য আমি লজ্জিত। এ বিষয়ে আমি জনসাধারণের কথা ভাবিয়া সবিশেষ ব্যস্ত হইতেছি না। শুধু আপনার ধারণাই আমার সন্তোষের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। সেনাপতি মহাশয়, যে উপনিবেশ আপনি এরূপ ন্যায়পরায়ণতার সহিত শাসন করেন যদি সেখানকার এক প্রাণীও প্রমাণ করিতে পারে যে আমি পত্রের দ্বারা অথবা আমার লোকজনদের দ্বারা আমি জাতীয় স্বার্থের অথবা সেনাবিভাগের শৃঙ্খলার ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা হইলে আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে আমি নিজ আচরণের সাফাই করিবার জন্য আপনার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র পন্দিচেরীতে উপস্থিত হইব। সেনাপতি মহাশয়, আপনাকে অধিক কিছু আর লিখিতে আমার সাহস হয় না; তবুও আপনার সদাশয়তায় আমি নির্ভর করি। আমার পরিকল্পনাসমূহ জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হইলেও আপনি তাহাতে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন এমন কথা আমি বলি না। সে সম্বন্ধে আপনার আদেশ আমি সর্ব্বদাই আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি।...* কিন্তু আমার নিজের সুনাম আমার নিকট অতিশয় মূল্যবান। স্বীয় বিবেকের বাণীতে প্রশান্ত থাকিয়া, আপনার অভিপ্রায় সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া আমি নবাবের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। ইহাতে আমার স্বদেশের সুবিধা হইবে বলিয়াই আমি বিশ্বাস করিয়াছিলাম। সে প্রসঙ্গে তাঁহার লিখিত একখানি চিঠি আপনাকে আমি পাঠাইয়া দিয়াছি। এ ধরণের মিথ্যা অপবাদের ফলে যদি আমি আপনার স্নেহ হারাই শুধু যে তাহাই নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় হইবে তাহা নহে; যে নৃপতির আমি কর্ম্মাধীন যদি তাঁহার মনে আমার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধারণার সঞ্চার হয়, তাহাও হইবে।

যাহাতে তিনি আমার অনুচরবৃন্দকে তাহা জানাইতে পারেন সে জন্য লে মার্সিয়েকে আমার সম্বন্ধে আদেশ জানাইতে আমি আপনাকে অনুনয় জানাইতেছি। উহারা তদনুসারে কার্য্য করিবে এবং নবাব আমাকে বিশ্বাস করিয়া যে অর্থ প্রদান করিয়াছেন,—আমার নিকট পরম পবিত্র বস্তু,—তাহা আমার নিকট আনয়ন করিবে।

কতিপয় দুষ্টচেতা ব্যক্তি আপনাকে আমার সম্বন্ধে প্রতারিত করিয়াছে। আপনার নিকট হইতে লব্ধ পত্র সমূহের বলে আমি যে বন্দুকগুলি প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলাম তাহা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিয়া উহারা যে ক্ষতি সাধন করিয়াছে তাহা কিছুই আমি মনে করি না, যদি না আপনার সদিচ্ছাসমূহও হইতে আমি বঞ্চিত হইয়া থাকি।

(৬) হায়দ্রাবাদ, ১৭ই অক্টোবর ১৭৭২

আমার সেনাপতি,

আপনি দয়া করিয়া আমাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন ম্যাসিয় শেমিতের মারফৎ আমি তাহা পাইয়াছি। ম্যাসিয় মোরামপস্তের * চিঠিটী তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছি।

আমার অনুরোধ রক্ষায় আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে ঘটনাচক্র বাধা আনয়ন করিয়াছে তাহা আমাকে ম্যাসিয় শেমিতের মিসনের ব্যর্থতার জন্য অনুযোগ করিতে দিতেছে না। পন্দিচেরীতে যেমন মান্দ্রাজেও তদপেক্ষা অধিকতর সাফল্যলাভ ঘটে নাই। ইংরাজদিগের রাষ্ট্রনীতি যাহারা জানে তাহাদের ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। অধিকতর সুসময় সমাগম প্রতীক্ষা করিয়া আমি আমার সকল উদ্যম পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিব। ম্যসিয় লে মার্সিয়ের আপনাকে যে দুইখানি পত্র দিবার কথা তাহা হইতে এবং নবাবের পত্র হইতে তাঁহার এবং আমার ইচ্ছা আপনি অবগত হইয়া থাকিবেন। আমি বিশেষ করিয়া আর কিছু বলিব না।

আমি যে দ্রব্যগুলি চাহিয়াছিলাম তাহা আমাকে জোগানয় যে অসম্ভাব্যতা আপনি বোধ করিয়াছেন আমাকে লিখিত আপনার শেষ পত্রে আপনি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিবার পর সে প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন আমি করিলে আমি নিতান্ত নাছোড়বন্দা বলিয়া বিবেচিত হইব।"

* চিঠির এখানে কিয়দংশ বিনষ্ট হইয়াছে।

* ইহাকেও নিজাম আলি রেম্ঁর অনুরূপ সর্ত্তে এক ব্যাটালিয়ন সিপাহী সেনা গঠনের আদেশ দিয়াছিলেন।

১৩ই জুলাই তারিখে আমি আপনাকে যে পত্র লিখিবার সম্মান লাভ করিয়াছিলাম তাহাতে আমি দাক্ষিণাত্য এবং পুণা দরবার সম্বন্ধে সিন্ধিয়ার মনোভাবের উল্লেখ করিয়াছিলাম। পুণা দরবার প্রথমটায় ভীত হইয়াছিল এবং সমরের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নিজাম আলি এবং নানা ফড়ণাবিশ কতকটা নিশ্চিন্তভাবে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে হিন্দুস্থানের অনেকাংশ উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছেন। সিন্ধিয়ার অনুপস্থিতিতে পরাক্রান্ত মারাঠাসর্দ্দার হোলকর আলি বাহাদুরের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহার সমস্ত জনপদ আক্রমণ করিয়াছেন এবং স্বীয় রাজ্যরক্ষায় গমন করিবার জন্য তাঁহাকে সর্ব্ববিধ পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন। দশহরার ভোজের, যাহা মাত্র কয়েক দিবস হইল সংঘটিত হইয়াছে, পরদিন তাঁহার পুণা পরিত্যাগের কথা ছিল। কিন্তু মারাঠারা যে তাঁহাকে নিরুপদ্রবে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দিবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাঁহার সেনাবল সম্বন্ধে আমি যে শেষ পত্র পাইয়াছি তদনুসারে তাঁহার নিকট ৪০০০ সওয়ার, ৮ ব্যাটালিয়ন (যাহা হইতে ৫০০০ খারাপ সিপাহী হইতে পারে) এবং ৫২টী তোপ আছে। এতদ্ভিন্ন হিন্দুস্থানে বিভিন্ন সর্দ্দারবৃন্দের অধীনে তাঁহার আছে ৫০০০০ অশ্বারোহী, দি বইন নামক সাভোয়ার্ডজাতীয় জনৈক অফিসার পরিচালিত ১৮ ব্যাটালিয়ন সৈনিক; তাঁহার বিশাল তোপখানাও উঁহার পরিচালনাধীন। সিন্ধিয়া উঁহাকে পূর্ণ প্রত্যয় করেন। পরলোকগত সোম্বের দল উঁহার কর্তৃত্বে আছে, কিন্তু তাহা নিতান্ত নগণ্য। সেনাপতি মহাশয়, এই তথ্যসমূহ আমি আপনাকে নিশ্চিতভাবে দিতে পারি।

সিন্ধিয়ার আগমনে দাক্ষিণাত্যে অসাধারণ কিছু ঘটে নাই। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে এই ভ্রমণটি তিনি তাঁহার পক্ষে বিষম অসুবিধার সহিতই করিয়াছেন, বিশেষতঃ যদি উহারা তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকে। অচিরেই আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে সংবাদ দিতে সমর্থ হইব।

আপনার কৌতূহল উদ্রেক করে এরূপ কোন বস্তু আপনি চাহিয়া পাঠাইলে আমাকে যে বিব্রত হইতেই হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। আমার নিকট আপনার ইচ্ছা সর্ব্বদাই আদেশ থাকিবে। আমার পক্ষে তাহা অবগত হওয়াই যথেষ্ট এবং তাহা পালনের সুযোগের আমার অভাব ঘটিবে না।

আমি আন্তরিক কামনা করি যে ফ্রান্সের সুবিশাল সেনাদলসমূহ এবং তাহার সর্ব্ববিধ সাহায্যোপকরণাদি যথোচিত কার্য্যে লাগে। শুধু উত্তরের শক্তিপুঞ্জ নহে যাহারাই তাহার স্বাধীনতার শত্রুতা সাধন করিতে চাহে তাহারা সকলেই বিধ্বংস হইবে যদি, সেনাপতি মহাশয়, ফরাসী মাত্রেরই আপনার মত গুণ থাকে এবং আপনার মত প্রত্যেকেই উত্তম নাগরিক এবং মাতৃভূমির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগসম্পন্ন হয়। আমার নিজের কথা বলিতে, আমি আশা আতঙ্কের সংমিশ্রণে অবস্থান করিতেছি।

আপনি দয়া করিয়া আমার যে কার্য্যগুলি করিয়া দিতে ইচ্ছুক ছিলেন তজ্জন্য আমার ধন্যবাদ লইবেন। যাহা ঘটিয়াছে তাহা আমাকে এতদতিরিক্ত কিছু আশা করিতে দিতেছে না বলিয়া আমি যদি আপনার সদিচ্ছা লাভ করি তাহাতেই নিজেকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব।

(৭) ১লা জুন ১৭৯৩

আমার সেনাপতি,

বিগত ২৬শে মার্চ্চ আপনি আমাকে যে চিঠিখানি লিখিয়া সম্মান করিয়াছেন সুলতান নিজাম আলি খাঁ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা আমাকে প্রদান করিয়াছেন। তাহার পর আমি ভবদীয় ১২ই এপ্রিল তারিখের পত্র পাইয়াছি, উহা পরলোকগত ম্যাসিয় দুক্রোসিয়াঁর নিজস্ব দ্রব্যাদির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। হায়দ্রাবাদ হইতে ১২ লিগ দূরবর্ত্তী এক গ্রামে ৭।৮ দিনের রোগে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমি আন্তরিকভাবে উক্ত অফিসরের মৃত্যুতে শোকার্ত্ত; কিন্তু আমি এই সংবাদ পাইবার আশা করি যে তিনিই সেই ব্যক্তি নহেন যাঁহার বিষয়ে আপনি আগ্রহান্বিত এবং যাঁহার কথা আপনি আমার প্রথম পত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন। মৃত ম্যাসিয় দুক্রোসিয়াঁর সম্পত্তি সম্বন্ধে আমি কি প্রকার ব্যবস্থা করিব সে বিষয়ে আমি আপনার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছি। ইহার সহিত আপনি উহার একটি তালিকা দেখিবেন। উক্ত দুঃখজনক ঘটনার তাহাই প্রমাণ।

সেনাপতি মহাশয়, ভারতবর্ষে ফরাসীদিগের গভর্ণমেণ্টে আপনার মনোনয়ন অপেক্ষা অধিকতর আনন্দদায়ক আর কোন সংবাদ আমি পাইতে পারি না। ঘটনাচক্রে আপনার সহিত পরিচয়ের সুখ লাভ হইতে আমি বঞ্চিত; কিন্তু আপনার সুনাম আমাকে জানাইয়াছে যে সাধারণভাবে দেখিতে জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে এবং বিশেষভাবে নাগরিকগণের সন্তোষের দিক হইতে ইহা অপেক্ষা আর ভাল নির্ব্বাচন হইতে পারিত না। আমি অন্তরের সহিতই শেষোক্তদিগের অন্যতম।

আপনার আত্মীয়কে যে সুলতান হৃদ্য সম্বর্দ্ধনা দান করিবেন সে বিষয়ে আপনি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। তাঁহার নাম সম্বন্ধে আমি অজ্ঞতায় রহিয়াছি; সেও আমার নিকট এক চিন্তার বিষয়। সুলতানকে আপনি যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে ঐ তরুণ অফিসরের প্রসঙ্গমাত্র নাই। নিঃসন্দেহে আপনার ফারসী মুন্সির ভ্রম বশতঃ এ প্রসঙ্গের অথবা তাঁহার অভীপ্সিত বিষয় লাভে যে আপনারও আন্তরিক সহানুভূতি আছে সে সম্বন্ধে কিছু উল্লিখিত হয় নাই। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে যাহা জানাইয়াছেন তাহারই উপর নির্ভর করিয়া আমি উক্ত আলোচনার সাফল্য সম্বন্ধে তাঁহাকে ভরসা দিবার দায়ীত্ব গ্রহণ করিয়াছি। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে প্রথম পত্রে বিস্তারিতভাবে কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করা সুরুচি-সঙ্গত নহে এবং উক্ত প্রথম পত্রখানি আপনি শুধু গভর্ণর-পদে আপনার উন্নয়ন তাঁহাকে জ্ঞাপনার্থ লিখিয়াছেন।

যে সামগ্রীগুলি আমি দাবী করিয়াছি তাহার কত মূল্য ধরা যাইতে পারে তাহা আপনি আমাকে জানাইবামাত্র আমি মান্দ্রাজনগরের ব্যাঙ্কারদের মারফৎ আপনি যাহাদের নাম আমাকে দিবেন তাহাদের আদেশমত অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা করিব।

আমার কার্য্যসমূহ হইতে যে সকল সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে তাহা দীর্ঘকাল পূর্ব্বেই আমি বুঝাইয়া বলিয়াছি। আপনি যদি আদেশ করেন তাহা হইলে আমার অবস্থা, আমার পক্ষে যে স্বাধীনতা লাভ সম্ভব তাঁহার ফলে যে জাতীয় স্বার্থের পক্ষে কি প্রকার অনুকূল সে আশ্বাস আপনাকে দিবার সঙ্গে সঙ্গে আমি আরও একবার সেগুলি আপনার চক্ষের সম্মুখে মেলিয়া ধরিব। আমি একজন ভাল নৃপতির কর্ম্ম করিতেছি, ফরাসীজাতির প্রতি যাঁহার অনুরাগ সম্বন্ধে সন্দেহের লেশমাত্র নাই এবং তাঁহারা ইচ্ছা করিলে, তিনি সত্যকার কার্য্যকরী এমন একটি বাহিনী গঠন করিতে পারেন যাহা তাঁহাদের প্রকৃতই আবশ্যকীয় হইবে।

আমার হরকরাদের মারফৎ তাঁহার প্রত্যুত্তর আপনার সন্নিধানে প্রেরণ করিবার সন্তোষলাভ আমার হইতেছে। সেনাপতি মহাশয়, এ বিষয়ে আমি আপনাকে জানাইতে সাহস করিতেছি যে এ দলের প্রথামত ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের সহিত ভারতীয় শক্তিসমূহের পত্র ব্যবহার কালে ইহাপেক্ষা অধিক কেতাদুরস্থ ভাব অবলম্বিত হইয়া থাকে। এসিয়ার বিভিন্ন দরবারের সহিত তাঁহার আচরণে······* আপনার চরিত্র সম্বন্ধে আমার যে বিশদ-জ্ঞান আছে তাহা হইতেই আমি আপনাকে একথা লিখিলাম। ইহা ছাড়া গভর্ণমেণ্টের ব্যয়বৃদ্ধি করিয়া দিবার আমার কোন অভিপ্রায় নাই। আমাকে যে সকল আদেশ প্রদত্ত হইতে পারে তজ্জন্য আমি কিছুই চাহিব না। আমার একমাত্র কামনা এই যে, ফরাসীরা যেন ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রীবৃদ্ধি উপভোগ করিতে পারে এবং ঐ কার্য্যে আমি যদি সামান্য কিছুও করিতে পারি তাহা হইলে আমি আমার নিজের অন্তঃকরণে যে অনুভূতি পাইব তাহার তুলনায় রিপাব্লিক প্রদত্ত সব কিছু শ্লাঘ্য প্রতিদানই অকিঞ্চিৎকর। আমি রিপাব্লিকের অনুশাসনসমূহ মানিয়া চলিতে ইচ্ছুক, যদি আমি জানিতে পারি উহার প্রথম শাসনতন্ত্রে কি কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। দীর্ঘকাল পূর্ব্বে আমি জাতীয় পতাকার একটি নক্সা পাইয়াছিলাম। আমি তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকি। আমি শুনিয়াছি অন্যান্য আরও অনেক বস্তুর মত উহাও পুনরায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এ বিষয়ে কিরূপ স্থির হইয়াছে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জানাইবেন। আমি তদনুসারে চলিব। যে সৈন্যদল আমি পরিচালনা করিবার সম্মানলাভ করিয়াছি·

---

* চিঠির এই অংশ অসম্পূর্ণ।

তাহা এখনও সুইস কোম্পানী নামে অভিহিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে আপনার অনুমোদন পাইলে, আমি উহাদের 'রেমঁর ফরাসী কোরের দল' বলিয়া যে আখ্যা প্রদানের প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছি তাহাই অনুসরণ করিব। ভারতবর্ষে ১৫০০০ লোক লইয়া এ পর্য্যন্ত কোর গঠিত হয় নাই।*

ফরাসী এবং ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে আবশ্যকীয় অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হইয়া রেমঁ তাঁহার বাহিনীকে সকল বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কামান, বন্দুক, গুলি বারুদের জন্য যাহাতে অতঃপর পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে না হয় সেজন্য তিনি নিজস্ব কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হায়দ্রাবাদ নগরে সদরঘাট নামক মহল্লায় ফতেহ্ ময়দানের সম্মুখে তাঁহার কামান ঢালাইয়ের কারখানার ধ্বংসাবশেষ আজিও দেখা যায়। ম্যাথায়াস টুবান নামক ভিনিস প্রদেশের অধিবাসী জনৈক ইটালীয়ান নিজামের আর একটি কামান ঢালাইয়ের কারখানার অধ্যক্ষ ছিল। ঐ ব্যক্তি রেমঁর সাক্ষাৎভাবে অধীনস্থ ছিল না। নিপুণ শিল্পী বলিয়া তাহার সুনাম ছিল। সৈন্যদলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নিজাম আলি রেমঁকে বিহার প্রদেশে একটি বিস্তীর্ণ জায়গীর দিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের বেতনও এই সময় মাসিক পঞ্চসহস্র মুদ্রায় পরিণত হইয়াছিল। রেমঁর সাহস, বীরত্ব, সামরিক নৈপুণ্য, সংগঠন শক্তি, মানব চিত্তানুরঞ্জন ক্ষমতা,—অর্থাৎ নেতা হইবার উপযুক্ত সকল গুণই ছিল। অচিরেই তিনি সিন্ধিয়ার দরবারে দি বইনের মত নিজাম দরবারে শীর্ষস্থান পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার বাহিনী ২০ ব্যাটালিয়নে ১৫০০০ শিক্ষিত সৈনিকে পরিণত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এতাদৃশ বিশাল সৈন্যদল গঠন করা দুই এক দিনের কার্য্য ছিল না। একাদিক্রমে সুদীর্ঘ দশ বৎসরব্যাপী তাঁহার সুকঠোর সাধনার ফলেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। সে বিষয়েও সিন্ধিয়ার দুর্দ্ধর্ষ বাহিনীর নির্ম্মাতার সহিত তাঁহাকে সম আসন দিতে হয়।

দি বইনের সৈন্যদল সম্বন্ধে মারাঠা এবং ইংরাজ দফ্তরের সমসাময়িক কাগজপত্র এবং বিভিন্ন লেখকবৃন্দের রচনা হইতে অনেক তথ্য পাওয়া যায়, দুর্ভাগ্যক্রমে রেমঁর বাহিনী সম্বন্ধে সে ধরণের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। নতুবা উভয়ের কার্য্যক্রমে বেশ তুলনামূলক আলোচনা সম্ভবপর হইত। ম্যালিসন বলেন যে উহাঁদের দুইজনের কার্য্যপদ্ধতিতে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল এবং রেমঁর হস্তে ইউরোপীয়ের প্রাচুর্য্য জন্য সে বিষয়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা আবশ্যক *। ৭৫০ সিপাহী লইয়া গঠিত তাঁহার প্রত্যেক রেজিমেণ্টে ৮ জন করিয়া ইউরোপীয় অফিসর থাকিত; পক্ষান্তরে দি বইনের দলে মাত্র ৫ জন করিয়া ছিল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে খড়দা যুদ্ধের সময় তাঁহার ইউরোপীয় অফিসরগণের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ১২৪ দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়।

রেমঁর সৈনিকগণের বেতনের তালিকার কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে। তাহা আদ্যন্ত উদ্ধৃত করার স্থানাভাব। সিন্ধিয়ার সেনাপতি দি বইনের, পেশবার সেনাপতি কর্ণেল বয়েডের এবং টিপু সুলতানের সেনাপতি কাপ্তেন শাপুইয়ের সৈন্যদলে প্রদত্ত বেতনের সহিত তুলনা করিবার জন্য তাহার একাংশমাত্র দেওয়া সম্ভব হইল। * দেখা যাইবে যে উহাদের সহিত তুলনায় রেমঁর দলের বেতনই সর্ব্বনিম্ন ছিল,—

রেজিমেণ্টের ইউরোপীয় অধ্যক্ষ (সাধারণতঃ)—	মাসিক	২০০৲—৩০০৲
সার্জ্জেণ্ট-মেজর—	,,	৩০৲
ঐ দ্বিতীয়—	,,	৩০৲
ঐ প্রথম—	,,	২০৲
ফাইফ-মেজর—	,,	৩০৲
ড্রাম-মেজর—	,,	১০৲
দেশীয় এডজুটাণ্ট—	,,	১৫৲
পতাকাবাহী—	,,	১০৲
মুন্সী—	,,	১০৲
সুবেদার—	,,	২০৲
কোর্ট-হাবিলদার—	,,	৮৲
হাবিলদার—	,,	৭৲
নায়েক—	,,	৬৲
ভেরীবাদক—	,,	৯৲
ঢক্কাবাদক—	,,	১২৲
সিপাহী—	,,	৫৲
গোলন্দাজ দলের জমাদার—	,,	১২৲
গোলন্দাজ	,,	৬৲
লস্কর—	,,	৫৲

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* Ibid, Nos. 521, 522, 523, 525

* Final French struggles in India, p. 241.

* Poona Residency Correspondence, Vol IV. No. 217.

প্যারিস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র রায়বাহাদুর এম্-এ

ফরাসী দেশের 'অপেরা' খুব প্রসিদ্ধ। 'লপেরা' নামক প্রসিদ্ধ রাস্তায় অপেরার প্রকাণ্ড বাড়ী দেখলাম। কিন্তু গ্রীষ্মকালে তিনমাস অপেরা বন্ধ থাকে। দেখবার সুযোগ হ'লো না। প্যারিসের প্রসিদ্ধ রাস্তাগুলিকে 'বুলভার্দ' বলে। এইসব রাস্তার ধারে গাছ লাগানো। রাস্তাগুলি প্রশস্ত ও সুন্দর। ফুটপাথের কতকটা অংশের উপর ক্যানভাসের চাঁদোয়া টানিয়ে রেস্তরাঁ খুলেছে। অনেক জায়গায় খাবার এইরূপ মুক্ত বাতাসেই লোকে উপভোগ করে। আমি গ্রীষ্মকালে গিয়েছিলাম, শীতকালে কি রকম ব্যবস্থা হয়, তা বলতে পারিনে। তবে গ্রীষ্মকালের পক্ষে এ ব্যবস্থা বড়ই প্রীতিকর বোধ হলো। দলে দলে লোক গিয়ে রেস্তরাঁয় বসছে—অবশ্য এর মধ্যে যুবক-যুবতীই বেশী। যুবতীরা রঙ মেখে, হালকা পোষাকে, খোশ-মেজাজে এসে 'শোকোলাদ' (Chocolate) পান করছে। চা চাইলে যে না পাওয়া যায় তা নয়; তবে চ্যানেল পার হলেই চায়ের রেওয়াজ কম। প্যারিসে 'চকোলেট' খেয়েছিলাম এবং লেগেও ছিল ভাল। হোটেলে একদিন চা খেয়ে সুবিধে করতে পারিনি।

কোনও কোনও রেস্তরাঁয় দেখলাম ব্যাণ্ড বাজছে, আমাদের দেশে চলিত কথায় যাকে বলে কনসার্ট, যদিও সেটা ভুল। এখানে দেখলাম এইরূপ ব্যাণ্ডের পরিচালক নয়, পরিচালিকা একজন স্ত্রীলোক। দলে বোধহয় ৭।৮ জন ছিল। যে পিয়ানো বাজাচ্ছিল, সে পুরুষ। কিন্তু বেহালাদার সকলেই স্ত্রীলোক। প্যারিসে দেখলাম ট্রামের কনডাক্টারও স্ত্রীলোক,—বিলাতে অর্থাৎ লণ্ডনেও এতটা প্রগতি দেখিনি। যুবতী তার পানবন্ধুকে কায়ক্লেশে

রিপাব্লিক্ উদ্যান

সংযত করে তার উপর চামড়ার দলে টিকিট পাঞ্চ (punch) করবার ভারি যন্ত্র একটা কাঁধে ঝুলিয়েছে। টাকা পয়সা অর্থাৎ ফ্রাঁ সাঁতিম রাখবার জন্য অন্য কাঁধে চামড়ার ব্যাগটিও কম ভারি নয়। এই মেয়ে কনডাক্টারটিকে মন্দ লাগল না। মিষ্ট কথা, হাসিখুশী, সৌজন্য দেখে মনে হলো যে এ-চাকরী তাকে বেশ মানিয়েছে। আমি যে ট্রামে গিয়েছিলাম, তাতে ভিড়ও ছিল যথেষ্ট; কিন্তু কনডাক্টারণী দ্রুতপদে সকলের কাছে গিয়ে ঠিক পয়সা আদায় করছে—ফাঁকি দিয়ে পালাবার জো কি?

ভিকটর হিউগো তাঁদের অগ্রণী। জগতের মধ্যে দীন দুঃখীদের সংখ্যাই বেশী। বিধাতার কোন্ দুর্জ্ঞেয় বিধিবশে বিশ্বে এই বিচার বিভ্রাট ঘটে, তা কেউই বলতে পারে না। কিন্তু যারা লক্ষ্মীর কৃপায় বিলাসের ক্ষীরোদ সমুদ্রে সাঁতার কাটছে, তারা চিরদিনই এই দুঃখীদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্রূপ বর্ষণ করতেই অভ্যস্ত। আমরা ভারতবাসী জন্মান্তর ও কর্ম্মফল মানি; মেনে' কোনও মতে দুঃখ লাঞ্ছনা সহ্য করে' সারা জন্ম শরশয্যায় কাটিয়ে শেষে একদিন সেই কণ্টকের জ্বালায় অবসন্ন হ'য়ে খসে পড়ি। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে
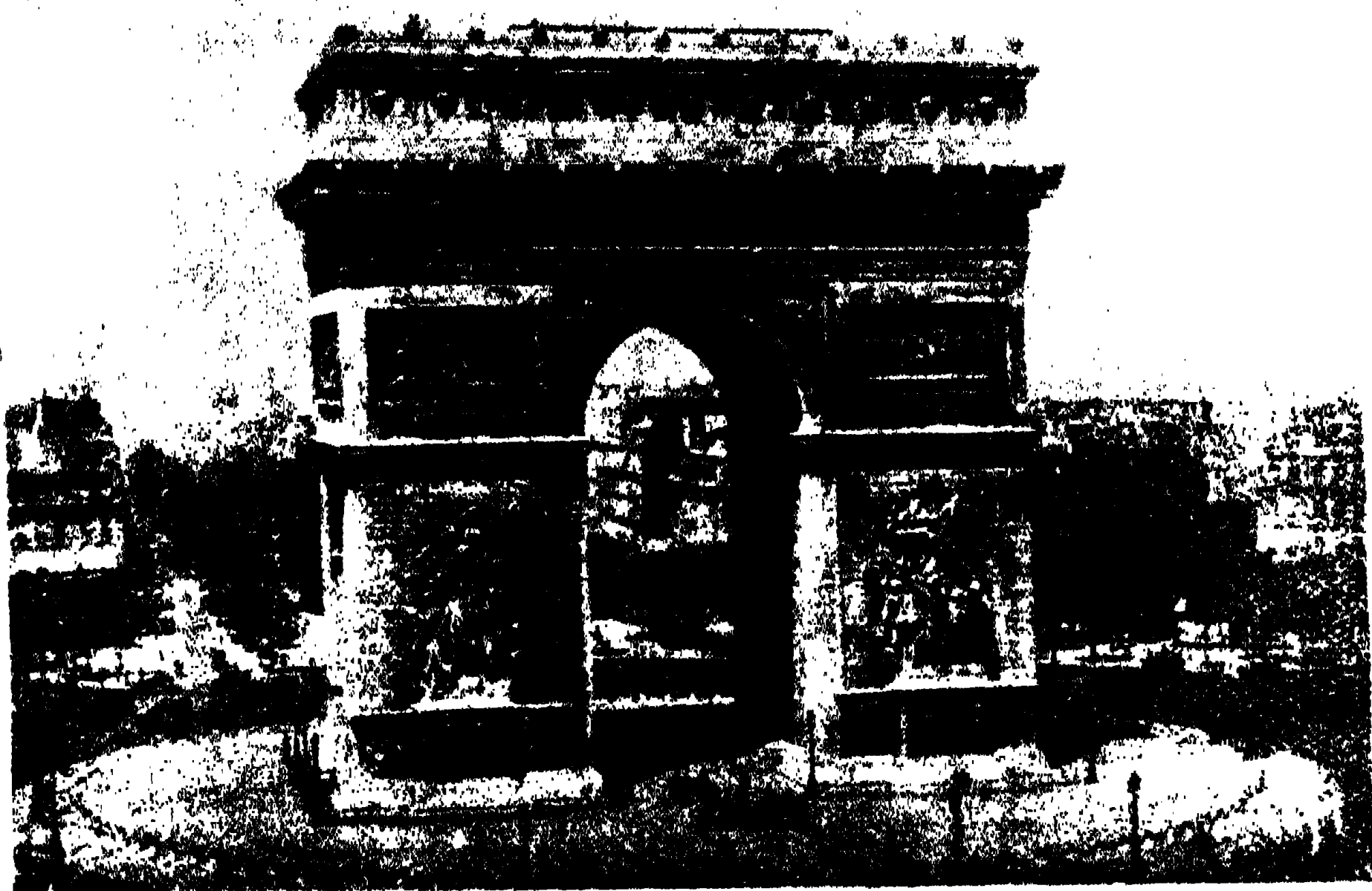
বিজয় তোরণ

বিখ্যাত নোটার ডেম্ ট্রামের রাস্তার ধারেই। ভিক্টর হুগো এই গির্জ্জার ঘণ্টাবাদক এক হাবা কুঁজো কদাকারের চরিত্র এমন ভাবে এঁকেছেন যে এই গির্জাটির নামে পৃথিবীময় বিখ্যাত হয়েছে। এই গির্জাটি সেন্ নদীর তীরেই অবস্থিত। ফরাসীরা ভিক্টর হুগোর নামে একটি বড় রাস্তার নামকরণ করেছে—এভিনিউ ভিকটর হিউগো। ঐ রাস্তায় তাঁর একটি শিল্পমণ্ডিত কীর্তিস্তম্ভও আছে। ভিক্টর হিউগো ১৮০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ফরাসী বিদ্রোহের পূর্ব্বে অত্যাচার নিপীড়িত গণমত রূপ বিরাট অজগরকে যাঁরা যুগযুগান্তের সুষুপ্তি থেকে জাগিয়ে তুলেছিলেন,

লোক দৈবের উপর বরাৎ দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে না। সেখানকার মূল মন্ত্র হচ্ছে 'আগে চল্, আগে চল ভাই'; এই মূলমন্ত্রটি বহুদিন থেকে স্বীকৃত হলেও ফরাসী বিদ্রোহের আগে তাকে কাজে লাগানো হয়নি। ভলটেয়ার, রুসো, হিউগো প্রভৃতির শিক্ষায় লোকের চৈতন্য একদিন হঠাৎ জেগে উঠে' আপনার অপরিমেয় বলের সন্ধান পেলো। তখন আর তাকে পায় কে? রাজারাণী, অভিজাতবর্গ, ধনিকবৃন্দকে কচুকাটা করে' ওরা প্যারিসে রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল। সে ত বেশী দিনের কথা নয়। দেড়শত বৎসরও হয়নি। প্যারিসে বেড়াতে বেড়াতে ব্যক্তিগত

স্বাধীনতার সেই প্রথম অবারিত উচ্ছ্বাসের কথা মনে হতে লাগলো—মনে হতে লাগলো প্রবলের অত্যাচার একদিন না একদিন তার প্রতিফল পাবেই পাবে—আবার সেই কর্ম-ফলের গণ্ডির মধ্যে চিন্তার স্রোত হারিয়ে ফেললাম। সন্ধ্যার আকাশে একটি তারকা যেমন সব চেয়ে জ্বলজ্বল করে চেয়ে থাকে, তেমনি মনের মধ্যে এই একটি চিন্তা স্ফুট হয়ে রইল যে, ফ্রান্স চিরনির্যাতিত মানবের স্বাধীনতা-বিকাশের প্রসূতিগৃহ। আমেরিকা গণতন্ত্রকে এর আগেই মেনে নিয়েছিল (১৭৭৬) : কিন্তু তার যে আবহ, সেটা ফরাসী দেশ থেকেই একদিন আটলান্টিকের উত্তাল তরঙ্গ বাহিয়া গিয়েছিল—নিশ্চয়।

ভারতবর্ষের সৈন্য গিয়ে যখন ইয়ুরোপীয় মহাসমরে ফরাসীদের আসন্ন বিপদে জার্মাণীর কামানের সম্মুখে বুক পেতে দিলো, মার্ণের যুদ্ধে যখন হাজার হাজার ভারতীয় সেনা ধ্বংসের বিনিময়ে ফ্রান্সের ইজ্জৎ রক্ষা করলো, তখন ফরাসীদের ভাবপ্রবণ হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছিল। প্যারিস মার্ণ নদী থেকে বেশী দূরে নয়। মার্ণের যুদ্ধে জার্মাণী জয়লাভ করলে, প্যারিসের পতন অবশ্যম্ভাবী ছিল। ফরাসীরা তাই বুঝে পশ্চিম সীমান্তের বোর্দো নগরীতে সরকারী দপ্তরখানা স্থানান্তরিত করেছিল। সুতরাং এই সঙ্কটে যারা ফরাসীদের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়েছিল ফরাসীরা প্রাণখুলে তাদের সম্বর্দ্ধনা, আদর যত্ন ত করবেই।
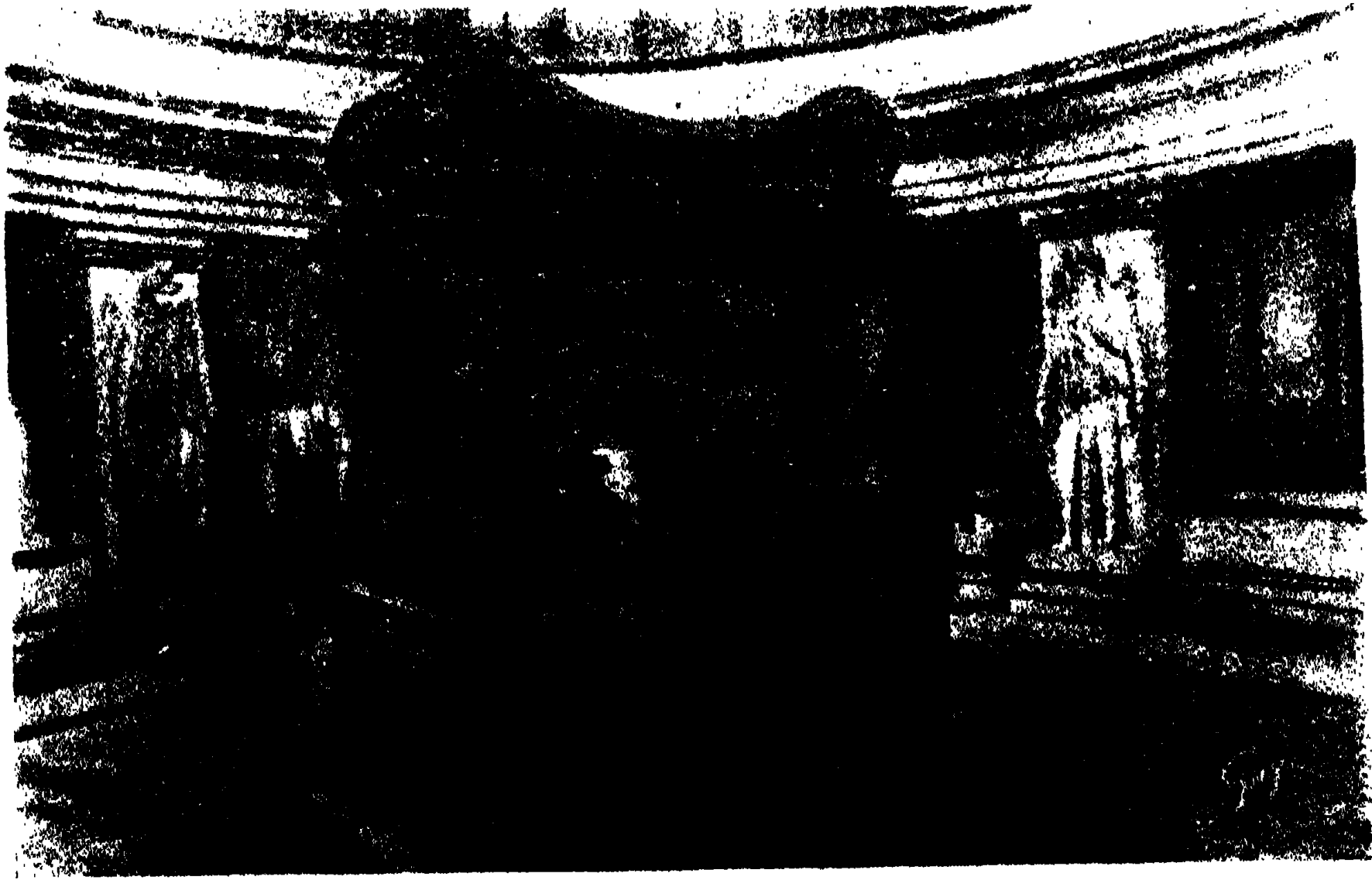
নেপোলিয়নের বিশ্রাম

ফরাসীরা চপল, বিলাসী, অমায়িক, ভাবনাশূন্য। রেস্তরায় খেতে গিয়ে দেখেছি মহিলারা অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ করতে সংকুচিত নয়—কেউ কেউ বিদেশী দেখে প্রায় গায়ে পড়ে' আলাপ করতেও কুণ্ঠিত নয়। এ বিষয় বিলাতের সঙ্গে ফরাসী দেশের বেশ একটু প্রভেদ দেখলাম। এরা গায়ের রঙ দেখে ভদ্রতার মাত্রা স্থির করে না। এদের সৌজন্যের মধ্যে অহঙ্কার নেই বলে মনে হলো। একবার শুনেছিলাম একটি গল্প, সে-টা সত্যি কিনা জানি নে। তবে যা শুনেছিলাম, তা-ই এখানে সংযমের সঙ্গে বলছি।

কিন্তু শুনেছি যে এত আদর আপ্যায়ন করা পাশ্চাত্য সভ্যজাতির পক্ষে উচিত নয়, আমাদের ইংরেজ প্রভুদের কাছে এইরূপ ধমক খেয়ে ফরাসীরা সাবধান হয়ে গিয়েছিল। প্রাণ তোমাদের আছে, তোমরা ত দেবেই। তার জন্যে আবার অত বাড়াবাড়ি কেন? এ-ত ওয়াজিব বাত!

এবারে (১৯৩৭) সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ভারত থেকে যে সকল সৈন্য প্রেরিত হয়েছিল তাদের জন্যে ব্রাইটনে একটি সম্বর্দ্ধনার আসরে মহিলাদের

প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল। পাছে কালা আদমীদের বেশী প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এই ঘটনা নিয়ে খবরের কাগজে বেশ একটু আন্দোলন হয়েছিল। সেদিনকার এই ঘটনা থেকে উপরের গল্পটির সত্যতা অনুমান করলে আশা করি সেটা মোটেই অমার্জনীয় হতে পারে না। লর্ড বেডেন পাউয়েল যে সেদিন ভারতে এসে বয়স্কাউটদের কুচকাওয়াজ দেখে আনন্দ প্রকাশ করে' গেলেন এবং ভোজ খেয়ে আমাদের কৃতকৃতার্থ করলেন, তিনিই বা ভারতীয়দের চরিত্র নিয়ে অত বড় একটা কুৎসা রটালেন কেমন করে'? এ-সবই সেই একই মনোভাবের থেকে উদ্ভূত,—জগতের দরকার আমাদের খাটো করা। আমরা নিকৃষ্ট, এ-টা প্রমাণ না করতে পারলে যে আমাদের গলায় এমন করে' শিকল পরানো চলে না,—অন্ততঃ তার একটা সঙ্গত কারণ মেলে না।

পরদিন এক পর্যটন অফিসে গিয়ে ভেয়ারসাই যাবার টিকিট কিনলাম। ভেয়ারসাই (Versailee) ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। কতবার ফ্রান্সের রাজধানী এই ভেয়ারসাই নগরীতে স্থানান্তরিত হয়েছে! সেদিনও ইয়ুরোপীয় মহাসমরের পর্য্যবসান হলো ভেয়ারসাইয়ের সন্ধিতে (১৯১৯)। এখন ভেয়ারসাইয়ের প্রাসাদ চিত্রশালারূপে দর্শকদের বিস্ময় উৎপাদন করবার জন্যে উন্মুক্ত রয়েছে। আমাদের গাড়ী সেই অফিস থেকে বেরিয়ে আর এক অফিসে গিয়ে আমাকে নামিয়ে দিলে। সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর আর একখানি বাস এসে আমাদের তুলে নিয়ে গেল। প্যারিস এভিনিউ দিয়ে আমরা ভেয়ার সাইয়ের প্যারেড ভূমিতে পৌছলাম। তার পরে সেখানে টিকিট নিয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক সহ সুবিস্তৃত মর্ম্মর প্রাঙ্গনের (marble court) মধ্য দিয়ে ভেয়ারসাইয়ের সুবিখ্যাত প্রাসাদের দ্বিতলে উঠে' চিত্রশালায় প্রবেশ করলাম। এই চিত্রশালার বর্ণনা দিতে যাওয়া আমার মত অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে বিড়ম্বনা। কিন্তু 'লুভ' দেখবার পরে ভেয়ারসাইয়ের চিত্রশালা দেখে মনে হলো যে পৃথিবীর মধ্যে বাস্তবিকই একটি দর্শনীয় স্থানে উপনীত হয়েছি। এত চিত্র, এত স্মৃতি, এত কাহিনী এই প্রাসাদের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে যে, সত্যই এমন একটি স্থান জগতে বেশী নেই। এখানে তাজের চমৎকারিত্ব নেই বটে, ভুবনেশ্বরের বিশালতা নেই বটে, আবু পাহাড়ের তেজপাল মন্দিরের গাম্ভীর্যও নেই, কিন্তু এখানে যা আছে, তাও কম বিস্ময়কর নয়। পৃথিবীর মধ্যে চতুর্দশ- লুইয়ের ন্যায় সুদর্শন, সৌখীন ও বিলাসী রাজা কম জন্মগ্রহণ করেছেন। আমার বোধ হয় শাহজাহানের সঙ্গে তাঁর তুলনা হতে পারে। এই রাজপ্রাসাদ বস্তুতঃ তাঁহার পিতা ত্রয়োদশ লুইকর্তৃক নির্মিত হয়। তারপরে চতুর্দশ লুই এই প্রাসাদকে এক বিরাট

রাজউদ্যানের দৃশ্য
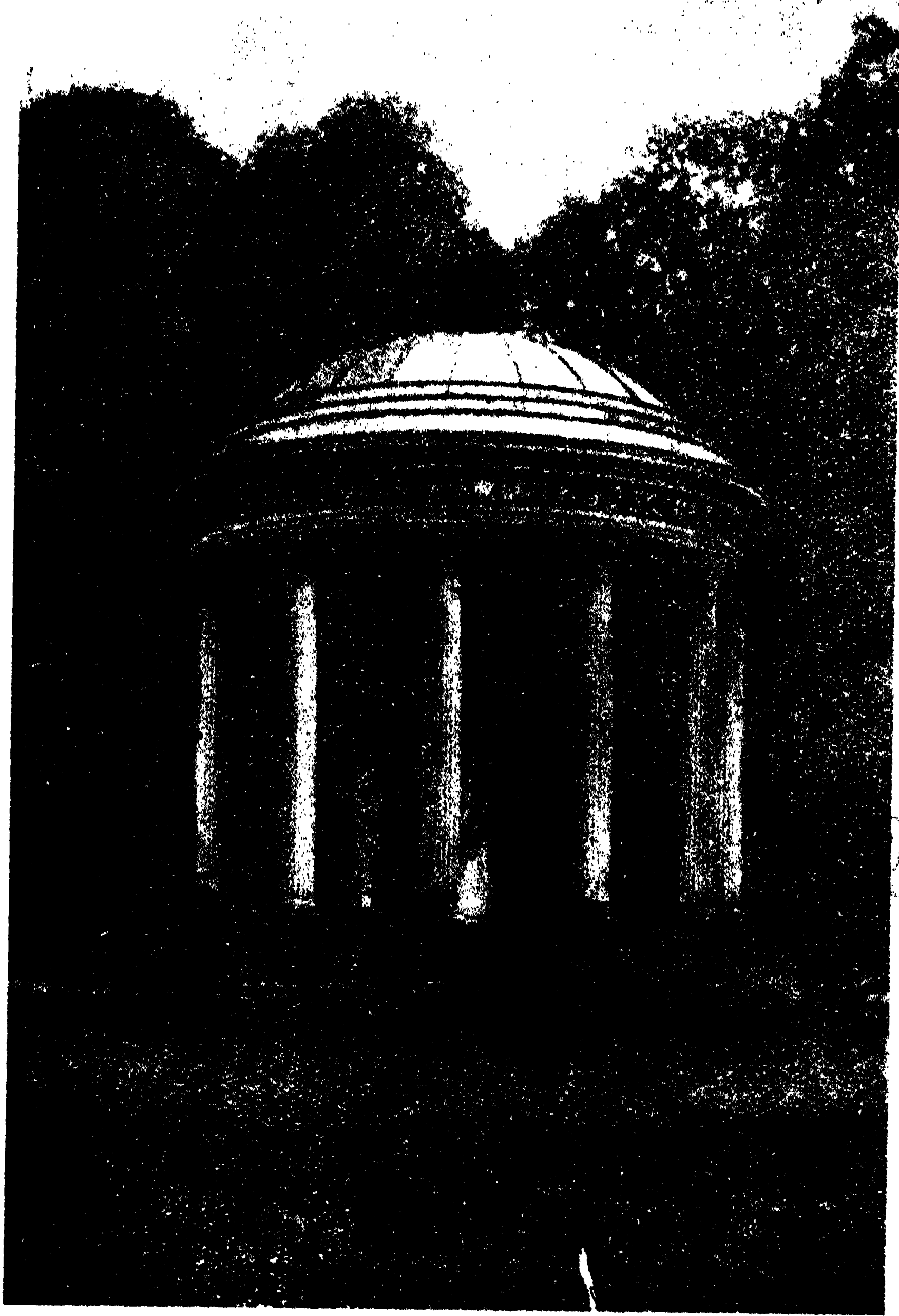
ছোট ট্রায়ানন—প্রেমের দেউল

সৌধে পরিণত করেন। পঞ্চদশ লুইও একপ্রকার কাটিয়ে ছিলেন, কিন্তু হতভাগ্য ভূপতি ১৬শ লুই এই প্রাসাদ হ'তেই বলপূর্ব্বক ধৃত ও কারারুদ্ধ হন (১৭৮৯) এবং কয়েক বৎসর পরেই (১৭৯৩) গিলোটিনে তাঁর শির ধূলিলুণ্ঠিত হয়। তাঁর পত্নী মেরী এণ্টয়নেটও গিলোটিনে প্রাণ হারালেন।

একদিন এই মেরী এণ্টয়নেট বিলাসিতার চরম করেছিলেন এই ভেয়ারসাই প্রাসাদের অনতিদূরে ছোট ট্রায়ানন নামে একটি প্রমোদ কানন তৈরী করে' মেরী তাতে অনেক সময় বাস করতেন; তাঁর সঙ্গে রাজ পারিষদেরাও থাকতেন। খেলা-ধূলা আমোদ-প্রমোদের অন্ত থাকত না। মেরীর

প্রমোদোদ্যানে একটি ছোট থিয়েটার ছিল। তাতে শ'-তিনেক লোক বসতে পারতো। মেরী নিজে সেই থিয়েটারে অভিনয় করতেন। আশপাশ থেকে চাষাভুষারা সব সেই থিয়েটার দেখতে যেতো। মেরী তাদের আনন্দ দেবার জন্যে অনেক ব্যবস্থাই করতেন। কিন্তু সে সব কেউ মনে রাখলো না। তিনি যে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে উপবনে গিয়ে আমোদ করতেন, এতে কেউ কেউ নানারূপ কথা বলতে সুরু করলো, কত কলঙ্ক কাহিনীর উদ্ভব হলো। কিন্তু হয়ত বেচারা কোনও দোষে দোষী নয়। বিদ্রোহী জনতা ক্ষেপে উঠলো এই মনে করে' যে গরীবের অর্থশোষণ করে, এই সকল রাজা রাণী বাজে আমোদ প্রমোদে ব্যয় করেছে! সুতরাং ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের

ছোট ট্রিয়ানন—রাণীর পল্লীভবন

মত ক্ষিপ্ত জনতার রাগ গিয়ে পড়লো, রাজা রাণীর উপরে। প্রাসাদের সম্মুখে বিস্তৃত মাঠ, সেই মাঠে বসে রক্তলোলুপ বিদ্রোহী জনতা রাজার মস্তক পাতিত করবার জন্য দিনের পর দিন সাগর তরঙ্গের ন্যায় গর্জন করতে লাগলো। শেষে একদিন তারা প্রাসাদ আক্রমণ করলো। ষোড়শ লুইয়ের পার্শ্বরক্ষী তখন কেবল সাত শত সুইস্ সৈন্য মাত্র ছিল। সিঁড়ির উপর তারা শৃঙ্খলার সহিত দণ্ডায়মান হয়ে রাজার প্রাণরক্ষায় তৎপর হলো। কিন্তু লুই দেখলেন যে তাঁর নিষ্কৃতি নেই কোনও মতে। অনর্থক উন্মত্ত ফরাসীদের রক্তপাত করে, ক্ষমার পথে কাঁটা দেওয়ার প্রয়োজন কি? সুইস সৈন্যদের তিনি অস্ত্র সংবরণ করতে হুকুম দিলেন। তখন সেই ক্ষিপ্ত জনমণ্ডলী ৭ শত সেনার রক্তে তাদের জিঘাংসা বৃত্তির তর্পণ করে' রাজাকে বন্দী করলো। চতুর্দশ লুই যে ঘরে শুতেন, তার পাশে একটি কামরা আছে। সেই কামরায় রাজ্যের বড় লোকেরা এসে অপেক্ষা করতো ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে। কে রাজার জামাটি এগিয়ে দেবে, কে তোয়ালে, কে ব্রুশ, এই নিয়ে রীতিমত আড়াআড়ি বেধে যেতো। আমাদের দেশে নবাবদের বিলাসের কথা শুনা যায়; কিন্তু ১৪শ লুই নবাবদের হারিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর রুচিও ছিল উঁচুদরের; বিখ্যাত চিত্রকরের চিত্র, বিখ্যাত কারিগরের শিল্প নইলে তাঁর মন উঠতো না। পৃথিবীর মধ্যে যেখানে যা কিছু ভাল, যা কিছু সুন্দর তাই এনে তিনি তাঁর রাজপ্রাসাদটি সাজিয়ে ইন্দ্রের অমরাবতীকেও হার মানিয়ে দিতেন।

তার পরে প্রাসাদের বারান্দা থেকে পার্কের দৃশ্য—কি সুন্দর। যেন একখানি নিখুঁত ছবি। বিস্তৃত উদ্যান, তার মধ্যে অসংখ্য ফোয়ারা, তারও পরে বিশাল কৃত্রিম সরোবরে জল থই থই করছে। তার তিনদিকে বিশাল অরণ্য। আরামের জন্য সৌন্দর্যের জন্য যা কিছু কল্পনা করতে পারা যায়, ভেয়ারসাইয়ে তার কিছুরই অভাব দেখলাম না।

ফরাসী বিদ্রোহের পূর্ব পর্যন্ত ফ্রান্সের রাজধানী এখানেই ছিল। তার পরে প্যারিসে উঠে যায়। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এই রাজপ্রাসাদ অস্ত্রশস্ত্রের কারখানায় পরিণত হয়। ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পতন হলে প্রুসীয় সৈন্যেরা এই রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করে। নেপোলিয়ন অনেক সময় এখানে বাস করতেন। তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্তগণ তাঁর একটি জয়স্তম্ভ তৈরী করে নেপোলিয়নকে উপহার দিয়েছিল। ভেয়ারসাইয়ের প্রাসাদের একটি কক্ষে সেই জয়স্তম্ভটি এখনও নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ঠকিয়ে নেবে। ওদের ট্যাক্সিওয়ালারা ত ভীষণ চোর। এক মাইল পথ ঘুরে আসতে দেখি ১১। [illegible] ফ্রাঁ উঠে গেছে অর্থাৎ ২ টাকা ২॥০ টাকা! উপন্যাসে ত প্রায় পড়া যায়, যে, যত জালজুয়াচুরি খুনের আড্ডা হলো প্যারিস সহর। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন। কিন্তু আমাদের প্রাচ্য দেশের ধারণায় প্যারিসের সমস্ত শোভা সৌন্দর্য যেন পাপের কাহিনীতে কলঙ্কিত হয়ে উঠেছে। পাপ চিরদিনই পাপ, এবং সেজন্যে ঘৃণার বস্তু। কিন্তু ওরা পাপকে বুদ্ধির চাতুর্যে বাহাদুরীর জিনিষ করে' তুলেছে। কর্ণেল মোব্রে

ভেয়ারসাই প্রাসাদে ঝর্ণা

১৮৮০ খৃষ্টাব্দ থেকে রাজধানী প্যারিসে উঠে গিয়েছে। প্যারিস যে রাজধানী হিসাবে একটি প্রকাণ্ড সহর সে কথা বলা বাহুল্য। লণ্ডনের মত অত বড় না হলেও প্যারিসের ন্যায় মহানগরী পৃথিবীতে বেশী নেই। আমি যে ক'দিন ছিলাম, প্যারিসের অতি সামান্য অংশই দেখেছি। কিন্তু এমন পরিপাটি, সৌখীন জায়গা খুব কমই দেখা যায়। ফরাসীরা সৌখীন বটে; তবে চরিত্র বিষয়ে ইংরেজদের মত তত মনোযোগী হয়ত নয়। আমাদের প্যারিস সম্বন্ধে যে সব ধারণা, তা নাটক নভেল থেকে, ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাস থেকে। সেইজন্য প্যারিসে খুব মন খুলে বেড়াতে পারিনি। সব সময়েই একটা আতঙ্ক হতো কোথায় হয়ত

টমসনের সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসে পড়েছিলাম যে গ্রামকে গ্রাম চোরে পরিপূর্ণ। সেখানে সবাই চোর। কর্ণেল টমসন বোধহয় আফগানিস্থান হতে' দিল্লীর অবরুদ্ধ দুর্গের উদ্ধারার্থ যে রেজিমেণ্ট আসছিল, তার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁদের খাদ্য দ্রব্য কম পড়ায় কর্ণেল টমসনের উপর ভার পড়লো, কিছু রসদ সংগ্রহ করবার। তিনি কয়েকজন সৈন্য সঙ্গে নিয়ে শিকারে বেরুলেন এবং এক দেশীয় রাজার রাজ্য থেকে হাতী ঘোড়া নিয়ে গভীর অরণ্যে হরিণ, খরগোশ, বন্য শূকর এবং পাখী শিকার করলেন। কিন্তু সে কাজে তাঁর প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল; তখন আর মূল সেনাদলে ফিরে যাওয়া সম্ভব হলো না।

তিনি পথের ধারে এক গ্রামে অতিথি হলেন। তাঁর গাইড্ বা পথ-প্রদর্শক তাঁকে বললে,—'হুজুর, এই গ্রামে আজ আপনাদের রাত্রি বাস করতে হবে; কিন্তু এ গ্রামে কেবল চোরের বাস। আপনি এ গ্রামের মোড়ল (Headman) কে আগে সন্তুষ্ট করুন।' সাহেব মোড়লকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে গোটাকয়েক হরিণ ও পাখী ভেট দিয়ে তুষ্ট করলেন। শেষে তাঁবু ফেলে সেখানে রাত্রিযাপনের আয়োজন করলেন। মোড়লের সঙ্গে তাঁর সন্ধ্যার পরে যখন দেখা হলো, তখন তিনি হাসতে হাসতে বললেন,—'আচ্ছা, শুনেছি, তোমাদের এখানে নাকি সকলেই চোর।'

মোড়ল বলিল, 'হাঁ, হুজুর।'

'সে কি? মৃত্যু-ভয় নেই।'

'না, হুজুর। আপনি পরীক্ষা করে' দেখতে পারেন যদি বলেন, আপনার ঐ ঘড়িচেন চুরি করতে চেষ্টা করি।'

'বেশ! আমার ঘড়ি এবং চেন যদি পার চুরি কোরো কিন্তু মনে রেখো, আমি একটু জানতে পেলেই গুলি কোরবো।'

'রাজি।' বলে মোড়ল সেলাম করে চলে গেল। রাত্রে কর্ণেল তাঁবুতে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করলেন। নিজের বালিশের নীচে ঘড়ি, চেন ও রিভলভার রাখলেন।

পরদিন প্রত্যুষে ঘুম ভেঙ্গে দেখেন ঘড়ি ও চেন চুরি গেছে। কিছুক্ষণ পরে মোড়ল সেই ঘড়ি চেন নিয়ে হাসতে হাসতে সাহেবের নিকট এলো। সাহেব বললেন—

আয়নার কক্ষ

সাহেব চমকে উঠে বললেন, 'সকলেই?'

'হাঁ হুজুর।'

'আচ্ছা, আমার জিনিষপত্র চুরি করবে তারা?'

'না, আপনার কোনো ভয় নেই। আপনি আমাদের অতিথি।'

'আর যদি তোমাদের আশ্রয় না পেতাম?'

'তা হলে আপনার সব চুরি যেতো।'

'কিন্তু আমার এই রিভল্‌ভার দেখ্‌ছ ত?'

'হাঁ হুজুর। কিন্তু তার জন্যে কোনো ভাবনা নেই।'

'আশ্চর্য! কিন্তু জানো, আমি জাগলেই বেচারী গুলিতে প্রাণ হারাতো।'

মোড়ল হেসে বললো, 'তাতে বিশেষ কিছু তফাৎ হতো না। যদি সে চুরি না করতে পারতো, তাহলে আমরাই তার প্রাণ দণ্ড করতাম।'

এটা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা। পাঞ্জাবের মধ্যে কোনও অখ্যাত গ্রামে এইরূপ অবস্থা ছিল হয়ত। কিন্তু এখন বোধ হয় ভারতবর্ষের কোথায়ও এরূপ নেই। সহরগুলি বাড়ছে আয়তনে ও লোক সংখ্যায় এবং তার সঙ্গে

নানা বিচিত্র রকমের পাপানুষ্ঠান হচ্চে। কিন্তু পশ্চিমের সঙ্গে এ সম্বন্ধে এখনও এদেশের কোনো তুলনাই হয় না। পশ্চিমের প্রত্যেক বড় সহরে হরেক রকমের ক্রুক্‌স্ (Crooks) আছে। আমেরিকার সহরে সহরে গ্যাংষ্টার (Gangsters), র‍্যাকেটিয়ার (Racketeer) আছে। তারা অসম্ভব রকম সাহসের সঙ্গে ও ধূর্ততার সঙ্গে চুরি ডাকাতী করে। মানুষের প্রাণ তাদের কাছে খেলার জিনিষ, সামান্যই তার মূল্য।

সেদিন পড়লাম পোল্যাণ্ডের প্রধান নগরী ওয়ার্‌সতে (Warsaw) একখানি খবরের কাগজ বেরুচ্চে, যা' নাকি কেবল চোর, সিঁধেল চোর ও ডাকাতদের জন্য; 'first professional journal for thieves, burglars and robbers.' এই সংবাদপত্রের নাম 'আমাদের জীবন' (Our Life). কেমন করে লোহার সিন্ধুক ভাঙ্গতে হয়, সিঁধ কাটতে হয় (আঙ্গুলের দাগ না রেখে) ইত্যাদি বিষয়ে বিশিষ্ট প্রবন্ধ তাতে থাক্‌বে। এ কাগজে দাগী চোর ও বদমায়েসেরা তাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবে ও চুরি ডাকাতীর নানাপ্রকার অস্ত্রপাতি সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনও তাতে থাকবে। এ-তে ওদেশে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। ভিক্টর হিউগো তাঁর নোটার ডেম্‌এ লিখেছেন প্যারিসে পঞ্চদশ শতাব্দীতে এক প্রতিষ্ঠান ছিল (Courdes Miracles), যেখানে বদমায়েসরা তাদের ব্যবসা শিখতে যেতো। যারা শিক্ষার্থী [illegible] পরীক্ষার জন্য একটা মানুষের 'ডামি' রেখে দেওয়া হতো, আর তার পকেটে থাকতো টাকা কড়ি। কিন্তু তার গায়ে [illegible]জারটি ক্ষুদ্র ঘণ্টি হালকা ভাবে ঝুলানো থাকতো। তার পকেট মারতে গিয়ে যদি কেউ একটু টুং করে' শব্দ করে' ফেলতো, তা হলে তাকে আর সে গুপ্ত সমিতিতে নেওয়া হতো না। অর্থাৎ আগে হাত পাকিয়ে তবে সেখানে শিখতে আসতো লোকে।

ওদেশে গিয়ে অনেক সময় বেশী টাকা কড়ি নিয়ে চল্‌তে হতো। কিন্তু টাকা কড়ি নিয়ে যাদের চলবার অভ্যাস নেই, তাদের পক্ষে এ যে কি ঝঞ্ঝাট, তা বলে' বুঝানো যায় না। যাই হোক, অনেকগুলি পাউণ্ড, রেজিষ্টার্ড মার্ক ও লিরি নিয়ে বেরুতে হয়েছিল কপাল ঠুকে। কিছুই চুরি যায় নি এই মস্ত ভাগ্য। আমাদের দেশের দুই একজন বড় লোকের কথা শুনেছি, তাঁরা টাকা কড়ি সমেত পাসপোর্ট হারিয়ে এসেছেন।

এই 'পাসপোর্ট' জিনিষটি টাকা কড়ির চেয়েও মূল্যবান। কারণ টাকাকড়ি হারিয়ে গেলে তোমার ব্যাঙ্কে টেলিগ্রাম করে' এনে নিতে পার। কিন্তু পাসপোর্ট হারালে চট করে' পাবার কোনো উপায় থাকে না। কাজেই একদেশ থেকে অন্য দেশে যাবার যো থাকে না।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
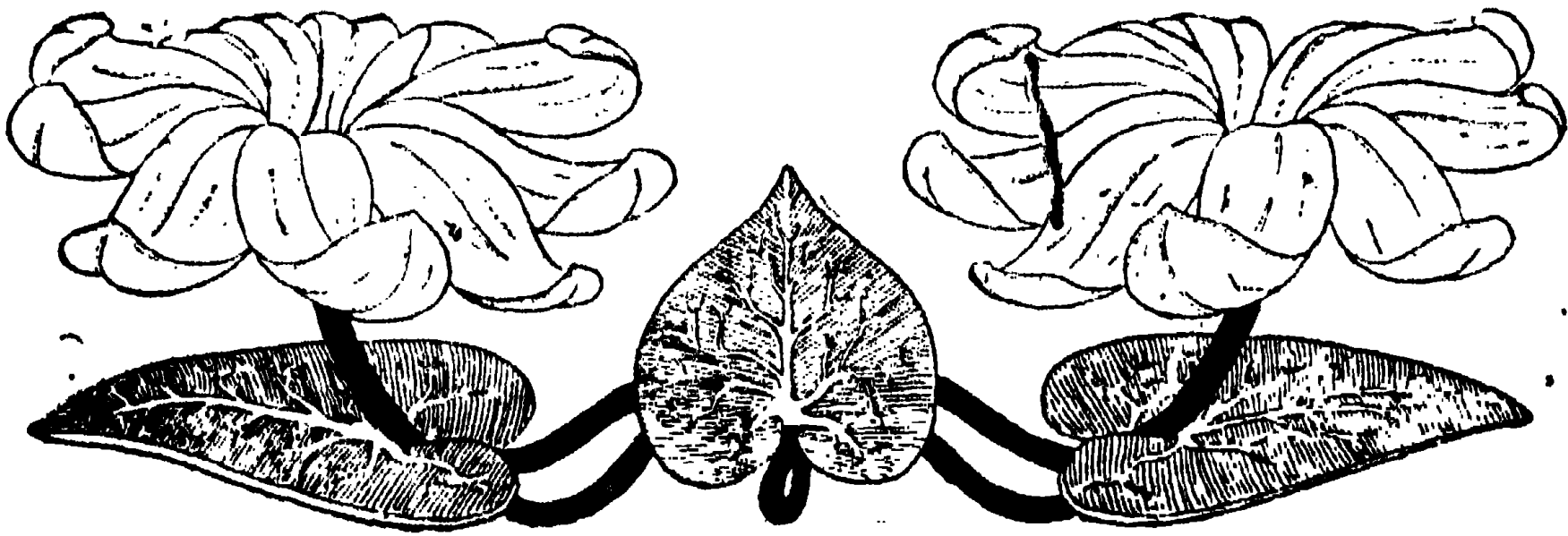
মাঝেতে বিচ্ছেদ নদী

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস আই-সি-এস

মাঝেতে বিচ্ছেদ নদী—এ পারেতে ভাবি আমি মনে
বহে যে দুঃখের স্রোত, তারে পার হ'ব বা কেমনে ;
ঘুম ভাঙ্গে কাহার আহ্বানে,
যে রহিল দূরে তার স্বপ্নমূর্ত্তি হেরি কোন্‌খানে।

সহস্র উৎকণ্ঠা নিত্য, ডাকে বান অশান্ত উচ্ছ্বলি,
আশ্রয় প্রান্তর মোর খরস্রোতে মুছে যায় চলি ;
লুপ্ত হ'ল ব্যবধান-সীমা,—
সমগ্র অম্বরে মোর ফুটে মধু স্মৃতির গরিমা।

যত ভাবি যত স্মরি প্রাণপুষ্প স্বচ্ছন্দে বিকশি'
কমনীয় হাসি হাসে, এ ভুবনে জাগে পূর্ণশশী ;
হেথাকার উদ্ভ্রান্ত সমীরে
দগ্ধ ধূপ গন্ধ সম স্নিগ্ধ শান্তি ছড়াইছে ধীরে।

সুদূর আলোক-রেখা অন্ধকারে করেছিনু ধ্যান,
নয়নে অমৃতবর্ত্তি জ্বালি তুমি দিয়েছ সন্ধান ;
লভিয়াছি তৃপ্তি আপনার,
অভীষ্ট অঙ্গুলি স্পর্শে বাজে প্রাণে ঝঙ্কার বীণার।

যে ঘরে হ'ল না খেলা

শ্রীমতী ইলা হালদার

অষ্ট্রিয়ার আঁচলে বাঁধা মস্ত এক টুক্‌রো পান্নার মত বনশ্রী-শ্যাম এই ইনস্‌ব্রুক্‌ সহর। অতি দীর্ঘ যাত্রাপথ শেষ করে যখন কৃষ্ণা ক্লান্ত অবসন্ন দেহে এখানে পৌছল বেলাশেষের মৃদু আলোয় বসন্তবিহ্বল দেশের অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যে চোখ তার স্নান করে অনুভূতিকে স্নিগ্ধ করে দিল। হোটেলের ঘরের সামনে ছোট্ট একটু ব্যালকনি—কৃষ্ণা সেখানে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে চেয়েছিল। এ পাহাড় পুরীতে সবুজের জোয়ার জেগেছে, তুষারোজ্বল পাহাড়গুলি থেকে শ্যাম বন্যা নেমেছে প্রথমে নরম ঘন দুর্বাঘাসে, তারপরে ঋজুদীর্ঘ পত্রবিরল পাইনের গন্ধময় শাখায় শাখায়, তারোপরে ঘন বনে পথে-ঘাটে মাঠে চারিদিকে সবুজের বন্যা ফুলের ফেণায় উচ্ছ্বসিত হয়ে আছড়ে পড়েছে। খুব বড় একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে কৃষ্ণা ঘরে ঢুকল স্নান করে রাত্রি ভোজনের জন্য প্রস্তুত হতে।

মস্ত বড় ভোজন কক্ষে ছোট ছোট টেবিলে বহুজাতির নর-নারী খেতে বসেছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা উর্দ্ধমুখী আলোকস্তম্ভ—বাতির চড়া আলো ওপরে প্রতি-ফলিত হয়ে নম্র মেদুর আভায় ঘরকে ভরিয়ে রেখেছে। কৃষ্ণা ঘরে ঢুকে কোথায় বসবে দেখছিল চেয়ে, প্রধান ওয়েটার সহাস্যে এসে সবিনয়ে জানালে কৃষ্ণার বন্ধুরা তার জন্যে অপেক্ষা করছেন। পথে আসতে এক অ্যামেরিকান পরিবার ও দুজন জার্ম্যানএর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—তারাও এই হোটেলে উঠেছে, তারা কলকণ্ঠে কৃষ্ণাকে আহ্বান করলে। মিসেস বেরী বল্লে—"কী এ দেশ বলত কৃষ্ণা, আমার ইচ্ছে করছে একে বাক্‌সে পুরে আমেরিকায় নিয়ে যাই।"

খাবার নির্ব্বাচন করে ওয়েটারকে খাদ্য তালিকাটা ফিরিয়ে দিয়ে কৃষ্ণা বল্লে, "তাহলে যে মস্ত বড় বাক্‌স চাই, আইরিণ আর এদের রেলে লাগেজ নেবার যা ঝঞ্ঝাট"।

খুব অল্পসময়ের আলাপ হলেও প্রকৃত অ্যামেরিকান স্বভাব সুলভতায় মিসেস বেরী সহজ নিঃসঙ্কোচতায় কৃষ্ণাকে নাম ধরে ডাকতে সুরু করেছে।

বেরী বল্লে, "রেল কোম্পানী যদি আমাদের যেতে না দিয়ে আট্‌কে রাখে ভালই হবে—দায়ে পড়ে স্বর্গবাস।"

জার্মাণ ডাক্তার লাইসগাং মধ্যবয়সী লোক, পাহাড়ের মত বিরাট বপু, স্থূল ঘাড় থেকে চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। তিনি বল্লেন, "যখন আমাদের দেশে যাবেন মিসেস বেরী, দেখবেন সেখানে খুব সুন্দর জায়গা আছে অনেক। কি বলেন ফ্রয়লিন্‌ ব্যানার্জি?"

কৃষ্ণা বল্লে, "হ্যাঁ সত্যি। রাইনল্যাণ্ডএর মধ্যে দিয়ে যেতে রাইনের দুই কুলের যা ফলেফুলে ভরা শস্য-প্রচুরা মূর্ত্তি দেখেছি তা ভোলবার নয়। ইয়োরোপের ওই নদীই, যাকে দেখে আমাদের দেশের বিপুলা গঙ্গাকে খুব বেশী মনে পড়েছে। আমাদের ভাষায় একটা কথা আছে জানেন—নদীমাতৃক দেশ—নদী মায়ের মত দাক্ষিণ্যদানে দেশকে শ্রীসম্পন্না করে তোলেন, তাই নদীকে প্রাচীন আর্য্যরা আমাদের দেশে মা বলে বন্দনা করেছেন। আপনাদের রাইন, আমাদের গঙ্গা সে বন্দনাকে সত্য করে তুলেছে।"

লাইসগাং ভাবে গদ গদ হয়ে বল্লেন, "কী অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা—আপনি ঠিক খোসা কেটে শাঁসকে বার করেছেন।"

প্রফসের স্মিড্‌ এতক্ষণ নীরব ছিলেন। ছফুট লম্বা অস্থূল সরল দেহ—নীলচে চোখ—সোণালি চুল খুব ছোট করে কাটা—বের্লিন ইয়ুনিভার্সিটিতে তিনি অতীত সভ্যতার শিক্ষা দেন। বল্লেন, "আপনারা কবির দেশের লোক

কিনা তাই সূক্ষ্ম ভাবে[illegible] এমন সহজে বুঝিয়ে বলতে পারেন। আরো কত হয়ত এইরকম আর্য্য রীতিনীতি প্রথা যা পশ্চিম থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এখনও আপনারা আচারে ব্যবহারে ভাষায় ভূষায় তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন ভাবলেও সম্ভ্রম হয়।”

আইরিণ বল্লে, “সত্যি তোমাদের কী mystic দেশ। তোমাদের কী অদ্ভুত আদর্শবাদী গান্ধী। তোমাদের কত বড় দরদী কবি। পশ্চিমের রূঢ় কর্কশ materialismএর যুগের সঙ্গে তোমাদের কোন যোগসূত্র নেই—তোমরা যেন অন্য গ্রহের দেশ।”

কৃষ্ণা অল্প হেসে বল্লে, “যখন আপাততঃ পৃথিবী নামক গ্রহটাতেই বাস করতে হচ্ছে তখন মঙ্গলবাসীদের মত মাথা-সর্বস্ব খর্ব দেহ নিয়ে চলে কি করে practical জীবনে? স্বপ্ন বুনে সময় কাটে, আদর্শ গড়ে মনটা বাড়ে কিন্তু পেট ভরে কই? সেটা আমাদের দেশের লোক ঠেকে শিখছে।”

বেরীর বৃদ্ধ পিতা ছোটখাট লোক—মাথা ভরা টাক—সোনার চসমা চোখে—তিনি এতক্ষণ এই সব কথা চুপ করে শুনছিলেন। বলে উঠলেন, “হা হা এই দেখ। এ যুগের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই যে একটা তীক্ষ্ণ cynicism—এ কোথায় ভারত কোথায় মার্কিণ সব জায়গায় সমান। জন্মে থেকেই তোমরা সতর্ক হয়ে আছ কেউ বুঝি তোমাদের ঠকালে—কেউ বুঝি তোমাদের ফাঁকি দিলে। কেউ যদি আদর করে তোমাদের গায়ে হাত বুলোলে তোমরা তখুনি ধরে নিলে সে তোমাদের আদর করতে নয়—তার নিজের হাতের সুখ পাবার জন্যে, কেউ ভালবাসল তোমরা তাকে চুল চিরে বিশ্লেষণ করে বার করে দিলে শুধু মনের ক্রিয়া এ নয়—ক্ষুধা তৃষ্ণার মত দেহেরই একটা অপরিহার্য্য ক্রিয়া। জীবনের জৌলষ গেল ঘুচে, রইল বর্ণহীন material. এতে কার লাভ হচ্ছে? আমরা পেছিয়ে যাচ্ছি সেই গুহাবাসী মানুষের যুগে যারা অত্যন্ত স্থূলভাবে বস্তুকেই বিশেষ করে বুঝেছিল!”

কৃষ্ণা সরবতের গেলাসটা নামিয়ে রেখে বৃদ্ধ বেরীর দিকে তাকালে। খুব আস্তে বল্লে, “গুহাবাসী মানব মনের সঙ্গে আমাদের তফাৎ আছে মিষ্টার বেরী। তারা সত্যও চেনেনি মিথ্যাও চেনেনি—যা দেখেছে তাকেই inevitable বলে মেনে নিয়েছে। আমরা মিথ্যাকে দেখেছি। দিনে দিনে মুহূর্তে মুহূর্তে এই মিথ্যা দেশে দেশে মনুষ্যত্বকে বিকৃত করে দিচ্ছে—লোভের রূপে, হিংসা হয়ে, ঘৃণা হয়ে, প্রতারণা হয়ে মানব মনকে বিষাক্ত করে তুলেছে। এই সহজ সুমধুর মিথ্যার ওপরে যে নির্মম নিষ্কলুষ সত্য তাকেই আয়ত্ত করার সাধনার প্রয়োজন এখন। সে সাধনা কঠোর তবু তাকেই মানতে হবে। স্বপ্ন বর্জন করে সত্যকে অর্জন করতে হবে।”

লাইসগাং টেবিলের ওপর বিরাট এক চড় মেরে বাসন পত্র ঝন্‌ঝনিয়ে বল্লেন, “ঠিক বলেছেন, স্বপ্ন দেখার দিন আর কোন দেশের নেই। আমাদের Fuehrer বলেন—কাজ কর—মেয়েছেলে জোয়ান বুড় কাজে লাগো—দেশকে গড়তে হবে তাই নিজেকে গড়ে নাও আগে—”

কৃষ্ণা বল্লে, “ওই ত মুস্কিল—দেশকে গড়তে অনেকেই উৎসুক কিন্তু নিজেকে গড়ার কোন ঝঞ্ঝাটে কেউ যেতে চায় না। দেশবাসীকে মানুষ গড়ে তোলাই দেশকে গড়া—তা নয় ত একি একতাল মাটি যে তাকে নিয়ে ভাঙ্গা গড়া চলবে।”

তাদের আলোচনায় বাধা দিয়ে তিনজন ইংরেজ, ওয়েটার পরিচালিত হয়ে তাদের টেবিলে এসে পৌছল। সব থেকে অল্পবয়সী ছেলেটি কৃষ্ণার হাত ধরে খুব ঝাঁকানি দিতে দিতে বল্ল, “দেখলে কৃষ্ণা, কেমন তোমায় খুঁজে বার করেছি। তুমি কোন হোটেলে উঠবে তা ত বলে আসনি—ছুটতে হল সঙ্কটতারণ টমাস কুকের লোকের কাছে। ভারতীয় মেয়েদের বিশিষ্ট রূপ ত এরা রোজ দেখতে পায় না—একবার দেখলে তাই ভোলে না সহজে।”

“অর্থাৎ এমন কালো রং দেখলে কি কেউ ভুলতে পারে সহজে—থাক টোনি, আর complimentএ কাজ নেই—এঁদের সঙ্গে আলাপ কর।”

টোনির সঙ্গে স্বামী স্ত্রী দুজন; হিগিন্‌স্ ব্যবসায়ী লোক—বেড়ানর বড় ধার ধারেন না। কলেজের ছুটিতে টোনিকে বেরিয়ে পড়তে দেখে তাঁদের কি রকম সখ হল। কৃষ্ণাদের খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে—টোনিরা খেয়ে এসেছে। আলাপের পালা শেষ হলে কৃষ্ণা বল্লে, “কফিটা

নিয়ে বাইরে বাগানে বসা যাক যেয়ে।" টোনি কৃষ্ণার কফির পাত্র তুলে নিয়ে চল্ল।

কোলাহলে আলোয় আতপ্ত ঘর থেকে বেরতেই বাহিরের পাইনগন্ধমন্থর স্নিগ্ধ হিমেল হাওয়া নেশার মত লাগল এসে গায়ে। নরম ঘন অন্ধকারপুঞ্জ মেঘের মত পাহাড়ে বনে ঘন হয়ে জমেছে। দূরে উর্দ্ধে পাহাড়ের গা জড়িয়ে জড়িয়ে ফিউনিকুলার রেলের রঙীন আলোগুলি রাত্রির ললাটে অগ্নিময় ললাটিকার মত জলছে নানারঙে। রূপবতী নটীর মত নগরী যেন জেগেছে রাত্রে; পথের দুপাশের দোকানগুলো আলোয় ঝলমল করছে—হাঙ্গেরিয়ান মেয়েদের সুচের কাজ করা বিচিত্র পোষাক, অদ্ভুত আকারের বড় বড় পাইপ, কাঁচের মালা—কাঠের কাজ করা নানা জিনিষপত্র—দলে দলে মেয়েরা দেখে দেখে জটলা করে ফিরছে। রাত্রি ভোজনের পর সকলে মিলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে—হাসি গল্পে পথ একেবারে মুখর হয়ে উঠেছে—কেউ বেড়াচ্ছে, কেউ আলো অন্ধকারে ঘাসের ওপর বসেছে—কোথায় খোলা জায়গায় বাজনা হচ্ছে—অনেকে শুনছে, কেউ "কুরশালে" ঢুকেছে বাজী খেলতে, হোটেলগুলোয় নৃত্যসঙ্গীত সুরু হয়েছে অনেকে নাচ আরম্ভ করেছে তার সঙ্গে। কৃষ্ণা অন্য মনে কফিতে চামচ নাড়তে নাড়তে দেখছিল চেয়ে। এ দেশে কি রোগ শোক দুঃখ ভাবনা কিছুই নেই? পশ্চিমের যত দেশে সে ঘুরেছে এদের এই সহজ খুসীর প্রাচুর্য্য, সত্যিকারের সব সময়ের আনন্দ দেখে সে অবাক হয়েছে। বিধি কি একচোখো হয়ে যত আনন্দ, সৌন্দর্য্য, যত হাসি প্রমোদপ্রিয়তা এদেরই দিয়েছেন, না এরাই জীবনের দুঃখকে উপেক্ষা করে আনন্দকে আয়ত্ত করার মন্ত্রকে শিখে নিয়েছে?

আইরিণ বেরী সিগারেটের ধূম্রজাল রচনা করে তার আড়াল থেকে সকৌতুকে লাইসগাংকে নানা প্রশ্নে অত্যন্ত বিব্রত করে তুলছিল। হিগিনস্ গৃহিণী এই প্রসাধনকুশলা সুরসিকার দিকে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন অনেকক্ষণ থেকে। তাঁর নিজের কিছু বয়স হয়েছে, তাঁর মুখের খাঁজগুলোকে ঢাকবার চেষ্টায় এলিজাবেথ আরডেন, জেন সেমুর প্রভৃতি অনেকের [illegible] রসায়নাগারে যাতায়াত করেছেন—চামড়ার খাদ্য অনেক খাইয়েছেন, লাল হলদে সবুজ অনেক পাউডার লাগালেন—চোখের পল্লব থেকে পায়ের নখের রং অনেকবার বদলে দেখলেন—চেহারার উন্নতি কিছুতেই আর হয় না। শেষে রাগ করে ওসব ছেড়ে দিয়ে এখন জগতের যাবতীয় প্রসাধনকুশলা নারীকে তিনি অবজ্ঞামিশ্রিত ঘৃণার চোখে দেখে থাকেন। দেহকে লালিত্য দেবার চেষ্টায় অনেক তিনি দড়াদড়ি বেঁধেছেন—কিন্তু অবাধ্য দেহ কোন শাসনই না মেনে যেখানে ক্ষীণ হবার কথা সেখানে অসভ্য রকম স্থূল হয়ে উঠছে! এখন তাই তন্বঙ্গী মেয়েদের তিনি অত্যন্ত বিরক্তির চোখে দেখেন। আইরিণকে অনেকক্ষণ ধরে ভাল করে নিরীক্ষণ করে করে বল্লেন, "আচ্ছা আমেরিকার মেয়েরা প্রসাধনে আর পোষাকে কত খরচ করে বলতে পারেন?" তিনি কথা বলেন একটু ক্যাঁচক্যাঁচে আওয়াজে বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে যাতে শ্রোতার মনে ভাল করে দাগ কেটে বসে যায়।

আইরিণ কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বল্লে, "যতটা তাদের সঙ্গতিতে কুলোয়।"

"কিছুটা সময় যদি তারা সমাজের নৈতিক উন্নতির কাজে দ্যায় তাহলে জগতের কত উপকার হয়।" খুব গম্ভীর হয়ে হিগিনস্ গৃহিনী বল্লেন।

বেরী বল্লে, "এ কিন্তু আপনার Presumption; মিসেস হিগিনস্—আমাদের মেয়েরা যে সামাজিক কোন কাজ করে না, এ আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন?"

হিগিনস্ গৃহিণী বল্লেন, "এবারে নেহাৎ স্বাস্থ্যের খাতিরে আসতে হয়েছে তাই—তা না হলে home ছেড়ে আমি বাইরে অন্যদেশে কখন হৈ চৈ করতে বেরতে চাই না। কিন্তু কানেও শুনেছি যে এদিকে মেয়েদের নৈতিক জীবন ক্রমশঃই নেমে যাচ্ছে। কেবল প্রজাপতির মত সাজ পোষাক করা, আর গুবরে পোকার মত নিজের তালে ঘোরা এই ত আজকাল সব দেশের মেয়েদের কাজ।"

টোনি মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে বল্লে, "তা আমি এও বলব মেয়েরা যদি সকলে চেহারা সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে

শুধু সমাজের কাজে [illegible] তাহলে সে সমাজ ছেড়ে লোকে পালাতে পথ পাবে না।”

হিগিনস্ গৃহিনী টোনির প্রতি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কি বলতে যাচ্ছিলেন—প্রফেসর স্মিড বলে উঠলেন, “তা খুব সত্যি। এই দেখুন না, ভারতবর্ষের মেয়েরা যদি তাঁদের অপূর্ব আর্য্য পরিচ্ছদটি বাঁচিয়ে না রাখতেন তাহলে জগতে অনেকখানি লালিত্য কমে যেত।”

আইরিণ উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্লে, “ঠিক বলেছেন। আমি কৃষ্ণার গতিভঙ্গী যতই দেখি, ততই মুগ্ধ হয়ে যাই। নৃত্যরতা অপ্সরার ছন্দ যেন বন্দী হয়ে আছে ওর চলার মাঝে।”

কৃষ্ণা বললে, “ওরে বাসরে, আইরিণ—আর আমি চলতেই পারব না যে—পা ফুলে কলা গাছ হয়ে যাবে।”

হিগিনস্ গৃহিণী এতক্ষণ এই ভারতবর্ষীয় মেয়েটাকে আমল দেবার দরকারই ভাবেন নি—ওরা হল প্রজার জাত [illegible]দের সঙ্গে কি সমান হয়ে মেশা যায়। এদের এই অসহ্য অতিশয়োক্তি শুনে প্রথমটা তিনি এমন অবাক হয়ে গেছলেন যে কথাই বলতে পারেন নি—এবার কর কর করে বলে উঠলেন, “তা এখন চৌদ্দ হাত লম্বা পোষাক পরে কোন সত্যিকারের কাজটা করা যায়। আমি ত ভাবি ওটা ভয়ানক clumsy পরিচ্ছদ।”

কৃষ্ণা চেয়ারটা ঘুরিয়ে তাঁর দিকে ফিরে বসে বল্লে, “তাই নাকি মিসেস হিগিনস্? পারিতে আপনি গেছেন কি সম্প্রতি? সেখানে দেখে এলেম ফলিবার্জারের প্রধানা অভিনেত্রী যোসেফিন বেকার শাড়ী পরে ষ্টেজে নেমেছেন। মার্লিন দিয়েত্রিচ্ কে শাড়ী পরা দেখেছি। পারির সব থেকে বড় দোকান গালারি লাফায়েত—সেখানে ওরা পোষাক রেখেছে যা made on saree lines. Continent এর যেখানে গেছি শাড়ীর প্রশংসায় অস্থির করে দিয়েছে। তবে এ পরিচ্ছদে ইংরেজ মেয়েদের clumsy দেখাবে কিনা বলা যায় না—সকলের সব জিনিষ সুশোভন হয় না।”

প্রফেসর স্মিড চুপ করে শুনছিলেন, খুব গম্ভীর ভাবে বললেন, “এটি খুব খাঁটী কথা। ভারতবর্ষের আর্য্যরা বহু যুগ ধরে ভেবে তাঁদের ছেলে মেয়েদের জন্যে এমন পরিচ্ছদের সৃষ্টি করেছেন যা সে দেশের মাটী—সে দেশের হাওয়ায় ঠিক খাপ খায়, সে দেশের বিশেষ রূপটিকে মূর্ত্তি দেয়। আমি ভারতীয় মেয়ে খুব কমই দেখেছি কিন্তু যা দেখেছি তা থেকে মনে হয় তাঁদের এ ছাড়া অন্য কোন বেশেই যেন মানাবে না। যেমন তাঁদের স্বপ্নময় কালো চোখ—ভারতের নিজস্ব বাণীর মত ও চোখ—ওখানে চকচকে নীল চোখ ভাবাই যায় না।”

লাইসগাং সোজাসুজি কথা বলেন, বল্লেন, “আপনার চোখ দুটি আমাদের কাছে একটা বিস্ময়ের মত। ডয়েটশ-ল্যাণ্ডের প্রান্ত হতে প্রান্তান্তরে ঘুরলেও ওরকম চোখ দেখতে পাবেন না।”

কৃষ্ণা বল্লে, “ফিয়েলেন দাঙ্ক, হের লাইসগাং। কিন্তু আপনারা আমাকে ভারতীয় specimen পেয়ে যে রকম চুল চিরে analyze করছেন, নিজেকে আমার ক্রমেই মনে হচ্ছে মেডিক্যাল স্কুলের স্কেলিটনের মত।”

লাইসগাং ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন। নৃত্যাগারে নৃত্যসঙ্গীত সুরু হতে আইরিণ উঠে পড়ে বল্লে, “তা যাই বল বাপু তোমার মত চোখ ও চুল পাবার জন্যে আমি অনেকখানি দিতে পারি।” সে লঘুপদে চলে গেল।

হিগিনস্ গৃহিণী রুদ্ধ আক্রোশে নীরব হয়ে ছিলেন। এবার অবজ্ঞার একটু বাঁকা হাসি হেসে বললেন, “এঁরা ত জানেন না যে ভারতবর্ষে কালো চোখ অতি সাধারণ জিনিষ—কোনই মূল্য নেই তার—পথে ঘাটে ছড়ান আছে।”

কৃষ্ণা বল্লে, “না, তা ত জানেন না। এই যেমন দেখুন না সাদা রং আপনাদের দেশের কয়লার খনিতেও গিস্-গিস্ করছে। কে আর তাদের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। আমাদের দেশে গেলে তবেই না তার মূল্য বাড়ে।”

হিগিনস্ গৃহিণী ভুরু তুলে কৃষ্ণার দিকে তাকালেন—আ গেল যা—এ মেয়েটা আবার জবাব দেয় দেখছি। তিনি চিবিয়ে বল্লেন, “আচ্ছা, আপনাদের দেশে শুনেছি নাকি অনেক মেয়ে কোন জামা না পরে শুধু একটা কাপড়ের টুকরো গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়?”

“তা বেড়ায় বই কি; যেটা পরে বেড়ায় সেটা ছাড়া আর দ্বিতীয় বস্ত্রও নেই, এমনই অবস্থা আমাদের দেশের

লোকের বেশীর ভাগ। আপনাদের দেশে ত তেমন কোন ইকনমিক্ কারণ নেই, তবু দেখেছেন ত মেয়েরা একটা বড় কাপড়ের টুক্‌রোর চেয়ে ঢের কম পরিধেয় পরে সকলের সামনে সমুদ্রের বালিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে।"

খুব মুরুব্বিআনা চালে হিগিনস্ গৃহিণী বল্লেন, "সেটা হল স্বাস্থ্যের কারণে। ভুলে যাবেন না আমাদের মেয়েরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষিতা। ভারতবর্ষে শুনেছি মেয়েরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—একসারসাইজ করতে জানে না—সব সময় দাসী পরিবৃতা হয়ে ঘরের কোণে খাঁচার পাখীর মত থাকতেই ভালবাসে।"

কৃষ্ণা বল্লে, "যে দেশে অর্দ্ধেকের ওপর লোকের দুবেলা আহার জোটে না, সে দেশের মেয়েদের বিনা পরিশ্রমে শরীর খারাপ হয় শুনলে হাসি আসে—তাদের স্বাস্থ্য যায় অতি পরিশ্রমে আর খাদ্যাভাবে। আর দাসীর কথা যে বলেছেন, আমাদের দেশের হাওয়ারই এমনি গুণ, মিসেস হিগিনস্, যে সব ইংরেজ মেয়েরা যায় ওখানে, যাদের বাড়ীতে এখানে পুরুষানুক্রমে চাকর রাখার রীতি নেই, তারাই ওখানে যেয়ে এমন বদলে যায় যে হাত থেকে রুমালটি খসলে সেই মুহূর্ত্তে পঁচিশ জন বেয়ারা চাপরাসি এসে তুলে না দিলে তাদের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এমন দৃষ্টান্ত আমি অনেক দ্যাখাতে পারি।"

হিগিনস্‌এর মুখ ক্রমশঃ লাল হাঁড়ির আকার ধারণ করছিল। তিনি বলে উঠলেন, "তা বলে আপনাদের দেশে লজ্জাকর পর্দা প্রথা যথেষ্ট রয়েছে এটা ত অস্বীকার করতে পারেন না।"

"মোটেই পারি না। ও প্রথা কবে কি করে এল জানতে হলে একটু ইতিহাসের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পর্দার প্রয়োজন মরে গেছে—প্রথাটা রয়ে গেছে—ব্যাধি নেই—কলঙ্ক রয়েছে—মোচন করবে কে? ইংরাজেরা? তাঁরা ত ডেমক্র্যাসির হিপোক্রিসির আড়ালে বসে আছেন—ধরবার ছোঁবার উপায় নেই। আপনাদেরই একজন বলেছেন না, India is a country with a vast complanit but nobody to complain to."

হিগিনস্ বল্লেন, "দেশকে বড় করতে হলে ডেমোক্র্যাসি তার প্রধান ওষুধ।"

"এমন করে কোন দেশ [illegible] মিষ্টার হিগিনস্। জার্মানীতে হিটলার বল্লেন বের্লিণে slum থাকবে না, তাঁর হুকুমে সেই মুহূর্ত্তে বড় বড় বাড়ী ঘর রাস্তা ভেঙে নতুন করে সব গড়া হতে লাগল। তিনি বল্লেন জার্মাণীর প্রত্যেক ছেলে স্কুলের পড়া শেষ করে অন্ততঃ ছ মাস করে দেশের কাজে উৎসর্গ করবে। কোথায় খাল কাটা হচ্ছে কোথায় রাস্তা তৈরী হচ্ছে, কোথায় জঙ্গল পরিষ্কার হচ্ছে, ধনী দরিদ্র প্রত্যেক ছেলে মজুরদের সঙ্গে সমান হয়ে সেই কাজে যোগ দেবে—নবীন জার্মাণ জাতকে কেউ কোনভাবে কোনদিকে যেন হার মানাতে না পারে—জার্মাণ যুবক-জীবন জানুক শুধু বই পড়াই শিক্ষার চূড়ান্ত নয়—কায়িক পরিশ্রমে বিমুখ বোধশক্তি নিয়ে জগতে অজেয় হওয়া যায় না। ইটালিতে দ্যুবে বললেন, অষ্ট্রিয়ার ম্যালেরিয়া মুক্ত করে আমি অমুক মাসে অমুকদিনে নতুন নগর প্রতিষ্ঠা করব। তখুনি কাজ আরম্ভ হয়ে গেল; নির্দ্দিষ্ট দিনে যেয়ে তিনি নতুন নগরীর শস্যক্ষেতে শস্য বপন করে এলেন নিজ হাতে। দেশকে বড় করতে হলে দরদী হতে হয়, শুধু সমালোচক হলে চলে না।"

টোনি মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে বল্লে, "ওরে বাবা তা হলে ডিক্‌টেটারের রাজত্ব চাও নাকি? কেউ এসে বলবেন গোঁফ রাখ ঝাঁটার মত—কেউ বলবেন চুল কাট মাথা নেড়া করে। হুকুম হবে হয়ত ইংল্যাণ্ড থেকে স্কটল্যাণ্ড রাস্তা হওয়া চাই একরাত্রে—কেম্ব্রিজ অক্‌স্‌ফোর্ডের যত ছেলে বই ফেলে কোদাল ধর—কথাটি বলা "ফের বোটেন"।—ও ডিকটেটরের রাজ্য থেকে আমার নামটি কেটে দাও।"

হিগিনস্ ভাল করে উঠে বসে বল্লে "আপনার কথা শুনে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি, মিস ব্যানার্জ্জি। আপনাদের দেশে বর্ত্তমান ডেমক্র্যাটিক ইংরেজ শাসনই অসহ্য হয়েছে লোকের, সেখানে ডিকটেটারের রেজিম চলবে ভাবেন?"

"কেন চলবে না—যদি তার পেছনে সত্যিকারের moral support থাকে। ডিকটেটার ত দেশবাসীরই সৃষ্ট জিনিষ—দেশের মঙ্গলেই তাঁর অস্তিত্ব—তিনি যদি তা থেকে বিরত হন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ডিকটেটারগিরিও শেষ

হয়ে যাবে। ইংরেজরা [illegible] দেশের hero-worshipকে প্রকাণ্ড একটা দুর্বলতা ভেবে প্রচণ্ড অবজ্ঞার সঙ্গে দেখেন। আপনারা দেখেন একটি মাত্র লোকের বাণী লক্ষ লোকে কী শ্রদ্ধায় মেনে নিচ্ছে—সে শ্রদ্ধা কি শুধু এই লোকটাকে? তিনি তাদের মাঝে যে কর্মশক্তিকে প্রবুদ্ধ করেছেন, অপমান মোচন করে সে আত্মসম্মানকে সচেতন করেছেন—এ শ্রদ্ধা ব্যক্তির ওপরের সেই বৃহতের উদ্দেশে।"

লাইসগাং ভয়ানক জোরে টেবিল ঠুকে বল্লেন, "সুন্দর কমলিন ব্যানার্জি—সুন্দর আপনার ব্যাখ্যা—আমার অভিনন্দন নিন।"

কৃষ্ণা অল্প হেসে বল্লে, "এ জিনিষটা পাশ্চাত্যের চেয়ে আমাদের কাছে সহজে ধরা দেয়—কারণ পেগ্যান আমরা—দেবতার মুর্ত্তি গড়ে পূজো করি দেখে বিদেশী মিসনারী ঘৃণায় ভয়ে শিউরে ওঠেন। তাঁদের এত শিক্ষা নেই যে বুঝবেন পূজো মাটি পাথরকে নয়—সৃষ্টিতে যিনি অনুর মাঝে অনীয়ান মহতের মাঝে মহীয়ান, পূজো তাঁকেই।"

বৃদ্ধ বেরী বল্লেন, "আপনাদের ধর্ম সম্বন্ধে আমরা যে কত অদ্ভুত কথা শুনি তা আর কি বলব। একদিকে লোমহর্ষণ নরবলি আর একদিকে বুদ্ধের বাণী—সত্যিকারের হিন্দুধর্ম কাকে বলে বুঝিয়ে দিতে পারেন?"

"না, তা পারি না—জিনিষটা এত বিরাট এত বিভিন্ন, দুকথায় তাকে বোঝাবার চেষ্টা করা ধৃষ্টতা মাত্র।"

বেরী বল্লেন, "কিন্তু সাধারণ লোকে তা বোঝে কি করে?"

"তাদের বোঝবার দরকার নেই। ধর্ম কি পেটেণ্ট ওষুধ—যে সবাইকে সমান এক এক দাগ ঢেলে খাইয়ে দিলেন—ল্যাঠা চুকে গেল? যারা সমাজের অশিক্ষিত দরিদ্র, তাদের জন্য অত্যন্ত সরল করে ধর্ম বা moralকে কত কথা কাহিনী গানে তৈরী হয়েছে। তাদের আনন্দ দেবার জন্যে, জীবনযাত্রায় একটু বৈচিত্র্য আনার জন্যে কতরকম পালা পার্ব্বণ ব্রত রয়েছে। যাঁরা শিক্ষিত—মন যাদের উদারতা পেয়েছে, তাঁরা গীতার মধ্যে কর্ম ও ধর্মর অপূর্ব সমন্বয় সন্ধান পেয়েছেন। আর যাঁরা কর্মজগৎ পেরিয়ে শুধু জ্ঞানে নিমগ্ন থাকতে চান—তাঁদের জন্যে রয়েছে উপনিষদ—যার সম্বন্ধে শোপেনহর বলেছেন, "জীবনে এই আমায় দিল শান্তি—মরণে এ দেবে অমৃত।" আমার এত বিদ্যা নেই যে এ আপনাকে দুকথায় বলে বুঝিয়ে দেব।"

হিগিনস্ গৃহিণী আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বক্রস্বরে বল্লেন, "আপনাদের অত গভীর ফিলসফি বোঝার জ্ঞান আমার ত নেই, তবে শুনেছি ধর্মের দোহাই দিয়ে আপনাদের দেশে মেয়েদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারত—আমরা ভারতবর্ষ শাসন করে তবে সেটা বন্ধ করি।"

কৃষ্ণা অল্প হেসে বল্ল, "আপনার এ তথ্য একেবারে খাঁটি। তবে দেখুন ইংল্যাণ্ডে এই সেদিনও কুইন মেরীর ক্রিশ্চান রাজ্যে কত সময়ে মানুষকে ডাইনী বলে stakeএ বেঁধে পুড়িয়ে মেরেছে—এখন কি আর তা করে? চক্র-বিপাকে আজকে যদি আমরা ইংল্যাণ্ডকে শাসন করতাম তাহলে পুড়িয়ে মারা বন্ধ করার বাহাদুরীটা আমরাই নিতাম।"

সকলের মুখ চাপা হাসিতে ভরে উঠল। হিগিনস্-গৃহিণী নিজেকে এই কৌতুকের উদ্দেশ্য ভেবে ভীষণ চটে গেলেন—তিনি কলহের সুরে বল্লেন, "তা যাই বলুন, আজকের দিনেও ধর্ম নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করাটাকে আমি বর্বরতা মনে করি—আপনাদের ও সব গোলমালের মানে কিছু আমি বুঝি না।"

কৃষ্ণা চেয়ারে এলিয়ে হেলান দিয়ে বসলে, বল্লে, "আপনি বৃথা বোঝবার চেষ্টা করবেন না মিসেস্ হিগিনস্। সকলে কি সব জিনিষই বোঝে।"

টোনি বল্লে, "কিন্তু সত্যি কৃষ্ণা, ধর্ম নিয়ে কেবল লড়াই করেই তোমাদের দেশের কোন কালে উন্নতি হচ্ছে না।"

কৃষ্ণার চোখ অন্ধকারে ঝকমকিয়ে উঠল, খুব আস্তে সে বল্লে, "চুপ কর টোনি। আমার দেশের ভালমন্দর সম্বন্ধে আমি তোমাদের কাছ থেকে শিখতে চাই না। তোমরা নিজেদের ছাড়া জগতে আর কোনো দেশের কোন জগতের ভাল দেখতে পাও কখন? তোমরা হলে এক একটি টিন গড্ নিজেদের খেলনা স্বর্গে সারাক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে বসে আছ, পাছে মানুষের সংস্পর্শে এসে তোমাদের দেবত্ব মাটি হয়ে যায়।"

ধমক খেয়ে টোনি একেবারে চুপ হয়ে গেল। হিগিনস্ সিগারেট-শেষটা ভস্মাধারে সজোরে টিপে সক্রোধে বল্লেন, "Tin Gods! হোঃ—how pxposkions! don't you believe it! Don't you believe it! হোঃ!" তিনি রাগের আতিশয্যে ফ্যাঁস করে দেশলাই জ্বালিয়ে আর একটা সিগারেট ধরালেন।

লাইসগাংএর মুখ চাপা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি বল্লেন, "আপনি যা সব উপমা দেন এমন উপযুক্ত আমি আর কখন শুনি নি ফ্রয়লিন্ ব্যানার্জি। আপনারা মাপ করবেন হের হিগিনস্ কিন্তু ইংরেজদের মত এমন আড়ষ্ট অপরিচ্ছন্ন জাত আমরা দেখে অবাক হই। লণ্ডনের chilly অনাত্মীয় আবহাওয়ার এমন গুণ যে বিদেশীকে আর ভুলতে হয় না যে সে বিদেশে আছে। আমাদের বের্লিনে যান আত্মীয়তা করার জন্যে সকলে উন্মুখ হয়ে আছে—আর কত পরিষ্কার—এক টুকরো জঞ্জাল পাবেন না সব ঝক ঝক করছে। আর লাণ্ডান্,—ওঃ কী সব slum—কী ধোঁয়া আর কালি—সব সময়ে ভুরু কুঁচকেই আছে কিনা।"

নোংরামির কথাটা যদিও অবান্তর কতকটা তবুও এই সব-পেয়েছির দেশের আত্মপ্রশংসঃ মনোভাবকে লাইসগাং একটু খোঁচা দেবার লোভ সম্বরণ করলেন না। এবং অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত প্রচণ্ড সিগারের এক মুখ ধোঁয়া সোজা হিগিনস্এর নাক মুখ চোখ লক্ষ্য করে ছেড়ে দিলেন।

হিগিনস্ রাগের ধাক্কাটা সামলে একটা উপযুক্ত উত্তর দেবার অবসর পেলেন না। আইরিন ফিরে এসে বল্লে, "কী সুন্দর রাতটা—সকলে মিলে কোন "কুরশালে" যাওয়া যাক্ বাইরে।"

টোনি উঠে কৃষ্ণার কাছে এসে বল্লে, "চল কৃষ্ণা—আজকের মত আশা করি যথেষ্ট পলিটিকস্ হয়েছে—এখন একটু ঘুরে আসা যাক্।"

কৃষ্ণা উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, "না আমার পড়া আছে। একটু না পড়লে প্রফেসরের মুখটা আমার কেবলই চোখ রাঙাবে, ঘুমতে দেবে না।"

সে চলে গেল। টোনিকে বসে ফের কাগজ পড়তে দেখে হিগিনস্ বল্লেন, "তুমি আসবে না?" মুখ না তুলে টোনি বল্লে, "নাঃ, ঘুম পাচ্ছে।" হিগিনস্ ভয়ানক গম্ভীর হয়ে চলে গেলেন।

সেদিন রাতে শুতে যেয়েই হিগিনস্-গৃহিণী বল্লেন, "ও ভারতবর্ষীয় মেয়েটা—কি খরখরে বাচাল—ওর আস্পর্দ্ধা দেখে অবাক হচ্ছি।"

হিগিনস্ বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিলেন, বল্লেন, "হ্যাঁ, আজকাল ওদের সবাইএরই আমাদের ওপর রাগ রাগ ভাব। আগে তবু ওরা আমাদের অনেক ভক্তি শ্রদ্ধা করত। কালে কালে কি যে হল।"

হিগিনস্-গৃহিণী খড়ের রংয়ের অল্প কগাছা চুলে ঘষ ঘষ করে বুরুষ ঘষতে ঘষতে বল্লেন, "এসব আমাদেরই দোষ। আমরাই ওদের লেখাপড়া শিখিয়ে এই রকম বাড়িয়ে তুলেছি। এখন ওদের কথা শুনে বোঝা দায় যে আমরা ওদের শাসন করছি না ওরা আমাদের করছে। এ সমস্ত গভর্ণমেণ্টের দুর্বলতার ফল। আমি হলে এ সব মনোভাব গজাবার আগেই তাকে শাসনের চাপে নিষ্পেষিত করে দিতাম। এখন ওরা আমাদের না করে খাতির, না করে ভয়, কিছু না।" তিনি বুরুষটা রেখে একটি সাদা কাপড়ের গোল টুপি মাথায় দিয়ে চিবুকের তলায় তার ফিতেটা বাঁধতে লাগলেন। দেখতে হল যেন নেড়া মাথায় চুণকাম করেছেন।

হিগিনস্ বল্লেন, "নাঃ, সে কিছু ভাববার নেই। আমি ত ওদের দেশে যেয়ে দেখেছি'—এখনও হাজার হাজার লোক আমাদের ঠিক পূজো করে। যতদিন তারা আছে আমাদের পায় কে। শুধু দু একজনই এই রকম বাইরে এসে আমাদের চমকটা কমে গেছে তাদের কাছে। তবে এদের সংখ্যা খুবই কম।"

তাঁর গৃহিণী শুয়ে পড়ে লেপটা ভাল করে টেনে বল্লেন, "তবু ভাল। আর এই সব কণ্টিনেণ্টাল লোকগুলো ওদের নিয়ে যা puss করে দেখে আমার হাড় জ্বলে যায়। জার্মাণগুলো ত গৌয়ারগোবিন্দ—ওদের কে বুলতে যাবে। ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান এরা সব ন্যাকা ও ঢংয়ীর দল—ওরা আধপাগলা—ওদের কথা ছেড়েই দাও। আমেরিকানরা

ত কতকটা আমাদের মত—তাদের কাছে খানিকটা sensible ব্যবহার আশা করা যায়—তাও দেখি না। মেয়েটাকে ওরাই আরো মাথায় চড়িয়েছে।”

হিগিনস্ বইটা বন্ধ করে রেখে দিয়ে বল্লেন, “But she is attractive thongh—তা অস্বীকার করতে পার না।”

হিগিনস্-গৃহিণী ফোঁস করে উঠে বল্লেন, “আহাহা, পুরুষমানুষগুলো এমনি ভেড়াই বটে—একটু কোথাও রূপ দেখেছে ত অমনি মাথা ঘুরে গেছে—নিজেদের prestige বলে একটা জিনিষ নেই। ওই টোনি ছোঁড়াটাকে দেখনা—তুই কি বলে একটা কালো মেয়েকে নিয়ে অমন নাচানাচি করছিস—তুই যে বৃটিশ আর ও যে কালোর জাত সেটা কি ভুলে গেলি নাকি? ছাখো তুমি টোনিকে এ বিষয়ে বেশ কড়া করে সাবধান করে দেবে যে সে নিজের prestige ভুলে কালো মেয়েমানুষের সঙ্গে কোনরকমে জড়িত হয় যদি আমরা তার সঙ্গে তাহলে কোন সংশ্রব রাখতে পারি না। বুঝেছ?” তিনি খটাস করে বাতিটা নিবিয়ে দিলেন।

“আচ্ছা ছাখা যাবে সে তখন—” হিগিনস্ মস্ত হাই তুলে চোখ বন্ধ করলেন। শিগ্‌গিরই সুগভীর নাসিকাধ্বনি তুলে তিনি নিদ্রাজগতে স্বপ্নরাজ্যে পৌঁছিলেন। সেখানে দ্যাখেন তিনি ভারতবর্ষে এসে পড়েছেন। পাগড়ী পরা হাজার হাজার ভারতীয় আভূমিপ্রণত হয়ে কুর্নিস করছে তাঁকে; তার মাঝে আবার ওই ইনসব্রুকের হোটেলের সে মেয়েটাও রয়েছে যে! হুঁঃ, দেখলে ত—ভারতের মাটির গুণ যাবে কোথা—দুদিন বাইরে গেলে অমন লম্বা লম্বা কথা সবাই বলে……। ইচ্ছা পরিতৃপ্তির আনন্দে তাঁর নাসিকা আরো জোরে গর্জে উঠল।

শুনে শুনে তাঁর গৃহিণীও ঘুমিয়ে পড়লেন; ঘুমিয়ে দেখেন তিনি মস্ত এক আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ত আর আপত্তিজনক ভাবে স্থূল নেই? তনুদেহের প্রত্যেক রেখাগুলি ললিত ভঙ্গীময়—অনেকটা ওই ভারতীয় মেয়েটার মত। সেও ত আয়নার মাঝে রয়েছে—না? কী ভীষণ কদাকার দেখাচ্ছে তাকে—ভয়ে বিস্ময়ে সে তাঁর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে নির্বোধের মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। তিনি অনুকম্পার ঈষৎ হাসি হেসে বল্লেন, “ভয় পেও না, আমরা তোমাদের উদ্ধার করতেই এসেছি—।”

পাশের ঘরে আইরিণও ঘুমচ্ছে। দুধের ফেনার মত সাদা নরম বালিসে গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালি চুল ছড়িয়ে আছে—অত্যন্ত শুভ্র নিটোল কণ্ঠতটে একটা হাত আলগোছে রাখা রয়েছে। তখনও তার নৃত্যের ঘোর কাটে নি—সমস্ত বিশ্ব নৃত্যদোলায় দুলছে—আইরিণ দুলছে লতার মত তার সাথীর বাহুর ওপর। ওপরে নীচে চারিদিকে শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ রামধনু দুলছে—চুল উড়ছে হাওয়ায়—একী দীর্ঘ ঘন চুল। তাকে ঢেকে তার সঙ্গীকে ঢেকে কালবৈশাখীর কালো মেঘের মত উড়ছে। মেঘের মুকুরে দ্যাখা যায় তার ধূসর চোখ ত আর নেই—হরিণের মত কালো টানা নিজের দুটি চোখের পানে চেয়ে চেয়ে নিজেরই মনে নেশা লেগে যায় যে।……

আর এক ঘরে ঘুমের ঘোরে লাইসগাং নাক ডাকাচ্ছেন কিন্তু ভাবছেন বক্তৃতামঞ্চে তিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন—“দ্যাখো ডয়েট্‌শ্‌ল্যাণ্ড বিগত যুদ্ধের পর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছল—কিন্তু ফের আমরা উঠেছি—ভাঙ্গাকে জোড়া দিয়েছি—সকলের সামনে এগিয়ে এসেছি…” শুনছে শুধু একটি অপূর্ব্ববেশা মেয়ে—কালো চোখ তার অগ্নিশিখার মত ঝলসে উঠছে—এ ত সেই পরিচিত ভারতীয় মেয়ে না? —সে বল্লে আপনার সবল দেশপ্রেম দেশকে শক্তিময় করেছে, সমস্ত জগৎকে বিস্মিত করেছে—আপনারা বীর, আপনাদের আমি শ্রদ্ধা করি।”

গর্বে আনন্দে লাইসগাং ঘুমের ঘোরে আচ্ছাদনটাকে যুত করে সরিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে শুলেন। এদিকে আকণ্ঠ দেহ যে ঠাণ্ডায় হিম হয়ে আসছে সেদিকে লক্ষ্য নেই।

প্রফেসর স্মিডও ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জেগে তিনি প্রাচীন সংস্কৃতির থিসিস লেখা নিয়ে খেটেছেন। ঘুমের ঘোরে মন তাঁর ঘুরে ফিরছে বিগত অতীতের মাঝে—অতীতের কলাশিল্প সভ্যতার জগতে যেখানে ক্রীটের মনিটারের প্রাসাদ মুখের অতি জটিল সুড়ঙ্গপথে কোন তন্বঙ্গীর শুভ্র বসন দ্যাখা দিয়ে দিয়ে মিলিয়ে যায়, মিশরে মরুপ্রান্তরের বিপুল বিরাট পিরামিডের

শুব্ধ গহন অন্তরে কার অতি সুকুমার মুখছবি দ্যাখা দিয়ে লুকিয়ে যায়—স্বপ্নময় চোখে চঞ্চল কটাক্ষ হেনে কে লঘুপদে চলে যায়। ভারতবর্ষের সমুদ্রকূলে সমুদ্রের নমস্কারনিবদ্ধ যুক্ত হস্তের মত সূর্য্যমুখী সূর্য্যমন্দিরে কোন পূজারিণী লীলায়িত ভঙ্গীতে আরক্ত বসনে অরুণ আরাধনার অর্ঘ্য নিয়ে আসত। সঙ্কট দুর্গম শিলালিপিময় গিরি গুহার ঈষদন্ধকারে কোন গৈরিকবসনা ব্রতচারিণী শুদ্ধ মনে গম্ভীর মন্ত্র শোনাত।···কোনো বসনপ্রান্তের ললিত রেখা, কারোর অঙ্গের লীলাভঙ্গী, কোন কাজলনয়নার চকিত চঞ্চল দৃষ্টি, কোন কণ্ঠের মন্দ গম্ভীর ছন্দ—এই সব বহু যুগমন্থিত বিক্ষিপ্ত স্মৃতি চিহ্নগুলো অতি ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে একটি মেয়ের সম্পূর্ণ রূপে জেগে উঠতে লাগল।...এত সেই পথের বন্ধু কৃষ্ণা নয়?···

কিছু দূরে টোনির ঘর। এরই মধ্যে যতটা সে পেরেছে ঘরটাকে অগোছাল করেছে। বই খাতা কাগজ চিঠি ছড়ান চারিদিকে। আলমারীর দরজাটা খোলা, পরিত্যক্ত কাপড়-গুলো মাটিতে টেবিলে যেখানে সেখানে ছড়ান—এক পাটি জুতো চেয়ারের ওপর, এক পাটি খাটের তলায়, জুতোগুলো যে ঘরের বাইরে বের করে দেবার কথা সে তার খেয়াল নেই—সে তখন চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখছে। সাত সমুদ্র পারে কোন রৌদ্রঝলসিত দ্বীপের দেওদার বনতলে সে বসে আছে, কলেজের যত বইখাতা সব যেন বাঁশী বেহালা ব্যাঞ্জো হয়ে ছড়িয়ে আছে চার পাশে—কী অজস্র গোলাপ ফুটেছে বনে—কিউ গার্ডনএ জুন মাসে যেমন গোলাপে গোলাপে রংয়ের আগুন জ্বলে যায় তেহনি গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপ—কোনটা ফুটন্ত, কোনটা কুঁড়ি তখনও। গোলাপের বনের মাঝে হতে বেরিয়ে এল কৃষ্ণা—হাতে তার গোলাপের আধ ফোটা কুঁড়ির মালা। টোনিকে দিলে মালা, তুলে নিলে তার বাঁশী—বল্লে, "দ্যাখো টোনি—একটা বেরাল—।" টোনি দ্যাখে আরে এ ত বেরাল নয়—ওর মুখটা যে মিসেস হিগিনস্‌এর মুখ—আঃ জ্বালালে। বিরক্ত হয়ে টোনি পাশ ফিরে শুল।

কৃষ্ণা ঘুমের ঘোরে সভয়ে ছটফট করে জেগে উঠল। তখনও সে হাঁপাচ্ছে—গলার কাছ থেকে জামাটা টেনে সরিয়ে দিল! ভয় বিস্ফারিত চোখে ভাল করে চেয়ে দেখলে এই ত তার হোটেলের ঘর—দেওয়ালের গায়ে ছোট ছোট গোলাপ কুঁড়ি ও ফরগেট-মি-নটের পাপড়ি ছড়ান ওয়াল পেপার—তিন কোণা আয়না টাঙ্গানো, এক গোছা সাদা বন ফুল সে এনে রেখেছিল—তার মৃদু গন্ধ ভরেছে ঘরে, আয়নার সামনের আসনে তার শাড়ী পরিপাটি করে ভাঁজ করা রয়েছে—ঘন মধু রংয়ের আলমারী—সেই রংয়ের খাট, নরম বিছানার নীল রেশমের লেপটা সরে গেছে গা হতে। খাটের পাশে কৃষ্ণার জরির কাজ করা চটিটা, মধু রংয়ের ছোট্ট টেবিলে তার বই খাতা। কৃষ্ণা বিছানা ছেড়ে উঠে এসে জানালার কাঁচটা খুলে দিলে—নীলবুটি দেওয়া সাদা পরদার দড়িটা টেনে পর্দা সরিয়ে দিলে—বাহিরের তুষার স্নিগ্ধ হাওয়া তার ললাটে কণ্ঠে হাত বুলিয়ে গেল। দূরে অরণ্যভরা শুব্ধ পাহাড়গুলির ওপর রহস্যভরা রাত্রি অন্ধকার হয়ে লুটিয়ে পড়ে আছে। পাহাড়ের উপরের সাদা বরফ নিদ্রাহীন চোখের মত নিষ্প্রভ হয়ে আছে। আকাশের কোয়াশার মাঝে দু একটি তারা ঝিকমিক করছে।

কৃষ্ণা এতক্ষণ ঘুরছিল নিবিড় ঘন জঙ্গলের কাঁটাভরা আঁকাবাঁকা রাস্তায়। সাড়ীটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, কাঁটায় কেটে যেয়ে গাময় ধূলোকাদা রক্ত জমে আছে—পা দুটো ভীষণ ফুলে উঠেছে—সে আর চলতে পারছে না। জনশূন্য জঙ্গলে কিসের যেন আওয়াজ শোনা গেল—কৃষ্ণার বুকে রক্তটা জমে আটকে গেল—সে আর নিশ্বাস নিতে পাচ্ছে না। শব্দ থামল না, ক্রমে কাছে আসতে লাগল—অনেক লোকের পায়ের আওয়াজ। দাঁত দিয়ে এমন জোরে কৃষ্ণা ঠোঁট কামড়ে ধরল ঠোঁট কেটে যেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল—সে কিছুই অনুভব করলে না—তার বুকে জমাট রক্তটা আটকে গেছে—নিশ্বাস নিতে পারছে না, কানের মধ্যে মাথার মধ্যে ঝিন ঝিন আওয়াজ করে স্যুচ ফুটছে। আওয়াজ খুব কাছে এসেছে—গাছের ডালপালা সরিয়ে কারা এগিয়ে আসছে। কৃষ্ণা জামার মধ্য হ'তে একটা রিভলভার বার করল—কোনদিকে না তাকিয়ে নিজের গলার ওপর তার মুখট চেপে টিগার টেনে দিলে। ···একী আটকে গেছে যে!··· কোন আওয়াজ হল না।··কৃষ্ণা শিউরে উঠে জানালার ঠাণ্ডা কাঁচে কপালটা চেপে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।······

(ক্রমশঃ)

শ্রীইলা দেবী

হে শীর্ণ সন্ন্যাসী

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

এ কথা জানিতে যদি এই তৃণাস্তীর্ণ নদীতট,
অরণ্যের ধূলিপথ, ধ্যানমৌন বৃদ্ধ তরুবট,
স্তব্ধ-চিত্ত-পান্থ-পাদপিকা,
তোমার অন্তরলোকে জাগাইবে জীবন-দীপিকা,
একদিন তবে কেন তুমি
ভীরু প্রণয়ের অর্ঘ্য নিবেদন, হৃদয় কুসুমি'
করেছিলে প্রেম-প্রতিমারে !
কেন তবে মগ্ন ছিলে নিশীথের গুপ্ত অভিসারে,
নিয়েছিলে কেন বক্ষে তারে !
আজি তার নামে বর্ষাধারা
ব্যথিত নয়ন হ'তে, সে যে নিঃস্ব, বিশ্বে পথহারা।
হে সন্ন্যাসী উগ্র দিগম্বর !
ভয়ঙ্কর
মূর্ত্তি তব উগ্র সাধনায়।
রহিয়াছ কেন একা ভ্রান্ত ধারণায়,
যোগ-বাসনায়।

হায় ওরে মানব নিষ্ঠুর !
এ সংসার
নহে তুচ্ছ, চির-উপেক্ষার,
যারে করি' দূর
এলে তাই।

বৈরাগ্যের বেশ পরি' রয়েছ সদাই
ভস্ম মাখি' হে উদাসী !
একটি জীবন তুমি ব্যর্থ করে' দিলে ভালবাসি'।
প্রাণহীন প্রেমশিখা জ্বলে,
কে জানিত, তব চিত্ততলে !

কে জানিত বসন্ত-সমীর
সঙ্গোপনে কাল্ বৈশাখীর
করিবে আহ্বান !

কে জানিত অনাঘ্রাত কুসুম-পরাণ
ক্ষণিক সম্ভোগ করি'
সর্ব্ব-পরিহরি'
আসিবে হেথায় তুমি আশাতীত ভ্রান্ত পথ ধরি'।

একদিন ছিলে প্রেমোন্মাদ,
নিশিদিন নারীর অঞ্চল
তোমারে যে করিত চঞ্চল
যৌবনের উজ্জীবনে
ক্ষণে ক্ষণে,
আজি অবসাদ
কেন এ'ল জীবনে তোমার !
ফিরে চাহিবার
নাহি কি সময় ?
একি পরমাদ !

কি সত্য পেয়েছ ত্যাগে ক্ষণ-লব্ধ সাধনার মাঝে !
উদয় অস্তের নিত্য সমারোহে কি সঙ্গীত বাজে
তব চিত্ত-বীণার ঝঙ্কারে !
দূরস্মৃত মধুময় প্রাত্যহিক জীবনের পরপারে
এই তটিনীর ধারে।

পেয়েছ কি আরাধ্য দেবতা
শুনেছ কি তাঁর কথা,
শুনেছ কি কহিতে তাঁহারে
এই বিশ্বে আছে শুধু বৈরাগ্যের জয়,
আর যারা রয়েছে সংসারে
তাহারা করিছে নিত্য পাপের সঞ্চয় !
যাঁর সৃষ্ট বিশ্ব চরাচর,
তাহারে লভিতে হবে শক্তির নির্ঝর
প্রস্তরের বক্ষ হ'তে তুলি।
সে শক্তি রয়েছে যেথা সেই পথ ভুলি
তুমি সত্য অন্বেষণ করিছ কোথায় !
আয়ু তব অস্তগত প্রায়
হে শীর্ণ সন্ন্যাসী
ফিরে যাও, ফিরে যাও, আপনার ঘরে
অন্তর-ঈশ্বরী তব যেথা রহে নিত্য উপবাসী
তোমারই তরে।
তোমার ঈশ্বর রহে বহু রূপে
ধরণীর প্রতি রোমকূপে
প্রতি ইন্দ্রিয়ের সম্ভোগের সনে
সৃষ্টির বৈচিত্র্য মাঝে অনন্তের চির জাগরণে
কর্ম্ম প্রবাহের উদ্দীপনে।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগ

ডক্টর মনোমোহন ঘোষ এম্‌-এ, পি-এইচ-ডি

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে এদেশে তুর্ক বিজয়ের সূত্রপাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসিল বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগ। কিন্তু এই যুগ সুরু হওয়ার পর প্রায় দেড়শত বৎসরের মধ্যে স্থায়ী কোন সাহিত্য সৃষ্ট হয় নাই। সাহিত্য চর্চ্চার জন্য যে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার প্রয়োজন তখনকার বাঙলা দেশে তাহা একান্ত দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ, প্রথমতঃ এক রাজশক্তির বিলোপ এবং অপর রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা এই দুইএর সন্ধিস্থলে দেশময় বিপ্লব ও অরাজকতা চলিতেছিল। দ্বিতীয়তঃ তুর্ক শাসকগণ দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হওয়ায় পরে তাঁহাদের অনুসৃত বিজাতীয় সভ্যতা ও ধর্ম্মমতের সংঘর্ষেও বাঙলার নিজস্ব (হিন্দু) সংস্কৃতি বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় দেশের সাহিত্য সৃষ্টি সাময়িক ভাবে বাধা প্রাপ্ত হইলেও তুর্ক শাসকগণের অভ্যুদয়কে দেশের নিছক দুর্ভাগ্য মনে করিলে ভুল হইবে। যেহেতু, তুর্ক শাসনের পরোক্ষ ফলে জনসাধারণের মধ্যে তৎকালীন দেশভাষায় সমাদর বাড়িয়াছিল।

সংস্কৃত ভাষা ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী রাজাদের সময়ে দেশময় যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিল বৌদ্ধ পাল রাজাদের সময়েও তাহার হ্রাস ঘটে নাই। ইহার প্রকৃত কারণ কি তাহা জানা যায় না; তবে মনে হয় পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্ব্বে এদেশে ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম সংস্কারের যে চেষ্টা চলিয়াছিল (যে চেষ্টার সূচনাতে বঙ্গদেশে পঞ্চ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন) তাহারই ফলে পাল বংশের রাজত্বকালেও ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রসার ও গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল। এই কারণেই হয়ত, সমাজের নিম্নস্তরে ধর্ম্ম চর্চ্চার মধ্য দিয়া দেশভাষায় সাহিত্যের বিকাশ হইতে আরম্ভ করিলেও উচ্চ শ্রেণীর লোক সাধারণের মধ্যে, বিশেষ ভাবে রাজসভায়, সংস্কৃত চর্চ্চাই ছিল অনুকরণীয় আদর্শ (fashion)। তাই পাল রাজাদের সভাকবি 'চণ্ড কৌশিক' নামক সংস্কৃত নাটক রচনা করিলেন এবং তাহাদেরই একের কীর্ত্তিগাথা লইয়া রচিত হইল 'রাম চরিত' কাব্য। পাল রাজাদের পরে যে ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী সেন রাজারা আসিলেন তাঁহাদের সংস্কৃত প্রিয়তা ত সর্ব্বজন বিদিত। 'পবন দূত', 'আর্য্যাসপ্তশতী' এবং 'গীত গোবিন্দ' সেন রাজাদেরই পৃষ্ঠপোষিত কবি মণ্ডলীর রচনা। তুর্ক শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় সংস্কৃত শাস্ত্র ব্যবসায়ী পুরোহিতগণ স্বধর্ম্মী রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা হারাইলেন ও তাহার ফলে সংস্কৃতের প্রভাব অনেকটা শিথিল হইল এবং ক্রমে প্রচলিত দেশভাষার সমাদর বাড়িল।

এই যুগের সংস্কৃতজ্ঞ লেখকেরাও বিশেষ ভাবে বাঙলা রচনায় হাত দিলেন। এতদিন লোকে সংস্কৃতজ্ঞ কথক ঠাকুরদের সাহায্য ভিন্ন যে রামায়ণ ও ভাগবতাদি গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারিত না, এখন তাহা সকলের নিকট অনায়াস লভ্য হইল। কিন্তু গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল ইহাতে মোটেই খুশী হইলেন না। তাঁহারা এই অভিশাপ প্রচার করিলেন যে যাহারা প্রচলিত ভাষায় পুরাণ ও রামায়ণাদি শ্রবণ করিবে তাহাদিগকে রৌরব নামক নরকে গমন করিতে হইবে। (১) সৌভাগ্যের বিষয় বাঙলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বা জনসাধারণ এই অভিশাপে ভীত হয় নাই। এ বিষয়ে তাহাদের কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইবার অবকাশও ছিল অতি অল্পই; কারণ বিদেশাগত রাজশক্তি এবং তাহাদের সাহায্যপুষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকগণের চেষ্টার ফলে দেশের

(১) অষ্টাদশপুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥

লোকমণ্ডলী তখন পদে পদে পিতৃ-পিতামহের ধর্ম হইতে বিভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা অনুভব করিতেছিল, তাই হিন্দু-সংস্কৃতিকে নিজ ভিত্তির উপর স্থির রাখিবার কাজে তাহাদিগকে মন দিতে হইল। ভাগবত পুরাণাদির ভাষানুবাদ প্রচারে এই কার্য্য যে বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

শাস্ত্র শাসন শিথিল হওয়াতে এক দিকে যেমন রামায়ণাদির অনুবাদ আরম্ভ হইলে অপরদিকে তেমনি ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রান্ত ভূমিতে অবস্থিত অনেক অবৈদিক বা লৌকিক দেবদেবীর পূজা ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিতে লাগিল। ঐ দেবদেবীর ভক্তগণ বাঙ্‌লা ভাষায় নিজ নিজ উপাস্য দেবতার চরিত্র ও মাহাত্ম্যাদি প্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে লোকপ্রিয় করিবার চেষ্টা করিলেন। এইভাবে বাঙ্‌লায় রাধাকৃষ্ণ, মনসা, চণ্ডী আদিকে লইয়া কাব্য ও গীতাদি রচিত হইতে আরম্ভ হইল।

যে চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে গীতি বা পদ সমূহ রচনা করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন তাঁহাকেই প্রাচীন (আদি ও মধ্যযুগের) বাঙ্‌লা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি মনে করা হয়। তিনি ঠিক কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইতিবৃত্ত এ সম্বন্ধে নীরব। বিবিধ অপরোক্ষ প্রমাণের বলে অনুমান করা হয় যে তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। এ সম্বন্ধে অবশ্য মতদ্বৈধ আছে; তবে পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের পূর্ব্বে যে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন এ বিষয়ে মতভেদ নাই। কারণ 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে মহাপ্রভু বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদাবলী শ্রবণে আনন্দ পাইতেন। কিন্তু প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই পদাবলীর প্রকৃত স্বরূপ কেহই জানিতেন না। পরবর্ত্তীকালের (দীন বা দ্বিজ) চণ্ডীদাস নামধেয় কোন কবির রচনাই 'প্রাচীন' চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া যাইতেছিল। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ১৩১৬ সালে অন্যূন চারি শত বৎসরের প্রাচীন একখানি নাম-পত্রহীন পদাবলীর পুঁথি আবিষ্কার করিয়া প্রচলিত ভ্রমের মূলে কুঠারাঘাত করেন। এই পদাবলী পুঁথিখানাকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নাম দিয়া উক্ত বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় উহার সম্পাদন ও প্রকাশ করেন এবং পদসমূহের ভণিতা দেখিয়া উহা চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া প্রচারিত হয়। দীর্ঘকাল যাবৎ এই পদাবলীগ্রন্থের প্রামাণ্য সম্বন্ধে বাদানুবাদ চলিলেও 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' অধুনা চৈতন্য পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণ কীর্ত্তনের আখ্যায়িকাটি নিম্নলিখিতরূপ:—একদিন নিজ সমবয়স্কা সখীগণসহ রাধা দধি দুগ্ধ বিক্রয় করিবার জন্য মথুরার পথে যাইতেছিলেন। রাধার স্বামী আইহনের বৃদ্ধা পিসী ছিলেন তাহাদের অভিভাবক। ইহাকে রাধা 'বড়ায়ি' (=দিদিমা) বলিয়া ডাকিতেন। যাইবার সময় রাধা ও তাহার সখিগণ অগ্রসর হইয়া গেলে ধীরগামী বড়ায়ি পিছনে পড়িয়া পথ হারান ও রাধাকে খুঁজিতে খুঁজিতে গিয়া দেখেন যুবা কাহ্নাই (=কৃষ্ণ) গোরু চরাইতেছেন। বড়ায়ির নিকট রাধার রূপ বর্ণনা শুনিয়া কাহ্নাই এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে সেই বৃদ্ধাকে তাঁহার দূতী হইয়া রাধার প্রেম প্রার্থনায় যাইতে হইল। রাধা সব শুনিয়া দূতীর হস্তে প্রেরিত মাল্য ও তাম্বূলে পদাঘাত করিলেন এবং দূতীর ভাগ্যে ঘটিল চপেটাঘাত। কৃষ্ণ তাহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া আর একদিন মথুরার পথে সাজিয়া বসিলেন বিক্রেয় পণ্যের 'দানী' বা শুল্ক আদায়কারী। রাধার মথুরা গমনকালে দান আদায়ের ছলে কাহ্নাঞির প্রেম-প্রার্থনা প্রকাশ হইল কিন্তু রাধা তাহাতে কর্ণপাত ত করিলেনই না বরং হাটে যাওয়া বন্ধ করিলেন পাছে কাহ্নায়ির সঙ্গে দেখা হয়। বড়ায়ি দূতীর প্ররোচনায় রাধা আবার একদিন ভিন্ন পথে মথুরার হাটে চলিলেন। কাহ্নাঞি এবার সাজিলেন খেয়ার মাঝি এবং পার করিবার কালে রাধাকে শুনিতে হইল প্রেমের কথা। আগেরই মত এই প্রেম-প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। রাধা আবার হাটে যাওয়া বন্ধ করিলেন।

এবার বড়ায়ির চক্রান্তে রাধাকে পুনর্ব্বার হাটে যাইতে হইল। কৃষ্ণ ভারবাহকরূপে রাধার দ্রব্যাদির ভার বহন এবং পরে রৌদ্রতাপ নিবারণের জন্য রাধার মস্তকে ছত্র ধারণ করিলেন। বলা বাহুল্য কাহ্নাঞি এই সকল সুযোগে রাধার নিকট প্রেম নিবেদন করিতে ছাড়িলেন না। এবার

রাধার হৃদয় ধীরে ধীরে কাহ্নাঞির প্রতি অনুকূল হইবার লক্ষণ' দেখাইল। (অতঃপর পুঁথি খণ্ডিত। অনুমান হয়, এখানে রাধা ও কৃষ্ণের অন্যোন্যানুরাগ লোক মুখে প্রচারিত হইয়া আইহনের মাতার কানে পৌছিল এবং তিনি রাধাকে চোখে চোখে রাখিলেন এই কথা আছে।) রাধার শ্বাশুড়ী রাধাকে হাটে পাঠাইতে অনিচ্ছুক হইলে বড়ায়ি তাঁহাকে এক ঘরে' করিবার ভয় দেখাইলেন। তখন রাধা হাটে যাইবার অনুমতি পাইলেন এবং সখিগণ সঙ্গে হাটে যাইবার ছলে রাধার ঘটিল বৃন্দাবনে কাহ্নাঞির নিকট অভিসার। ক্রমে গোপীগণ তাঁহার সহিত বনবিহার ও রাসলীলা করিলেন। তাহার পর হইল কালীয় দমন, জলকেলি এবং বস্ত্রহরণ লীলা। জলকেলীর সময় কৃষ্ণ কৌতুক করিয়া রাধার হার লুকাইয়া রাখিলেন। শ্বাশুড়ীর ভয়ে আকুল হইয়া রাধা করিলেন যশোদার নিকট অভিযোগ। মা যশোদা কাহ্নাঞিকে গুরুতর ভৎসনা করিলেন। কাহ্নাঞি তখন রাগিয়া গিয়া প্রতিশোধ লইবার মানসে রাধার প্রতি মদন বান ত্যাগ করিলেন। বাণের আঘাতে রাধা হইলেন মোহ-বিহ্বল। এবার রাধার ব্যাকুল অনুরোধে বড়ায়ি কাহ্নাঞিকে বন্ধন করিয়া আনিলেন। রাধা কাহ্নায়ির মিলন হইল। তাহার পর ছাড়া পাইয়া কৃষ্ণ এক মনোহর বাঁশী তৈয়ার করিয়া তাহাতে ঝঙ্কার দিলেন। সুর শুনিয়া উৎকণ্ঠায় কাতর রাধা বিহ্বলতা হইতে বাঁচিবার জন্য ঐ বাঁশী রাখিলেন লুকাইয়া। কাহ্নায়ির অনেক কাকুতি মিনতিতে রাধাকে বাঁশী ফিরাইয়া দিতে হইল। কাহ্নাঞি এবার রাধার সহিত দেখা শোনা বন্ধ করিলেন। দারুণ বিরহের তাপে রাধার দহন সুরু হইল। (পুঁথি এখানেও খণ্ডিত।)

এই উপাখ্যান হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, চৈতন্য পরবর্ত্তী পদাবলী সাহিত্যের রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর সহিত চণ্ডীদাস অবলম্বিত কাহিনীর বিস্তর প্রভেদ আছে। যথা, পরবর্ত্তী যুগের পদাবলীর কৃষ্ণ রাধার প্রথম দর্শন পাইয়াছিলেন গাভী অন্বেষণার্থ বৃষভানুপুরে গিয়া, আর চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ রাধার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বড়ায়ির মুখে তাহার রূপ বর্ণনা শুনিয়া। কেবল আখ্যানগত নহে চরিত্র চিত্রণের দিক দিয়াও দুই যুগের পদাবলীর মধ্যে প্রার্থক্য অনেক। কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধাকৃষ্ণ যথাক্রমে লক্ষ্মী ও নারায়ণের অবতার হইলেও গোয়ালার মেয়ে এবং ছেলের মত স্থূল রুচিসম্পন্ন ও গ্রাম্যভাবাপন্ন কিন্তু পরবর্ত্তী পদাবলী সাহিত্যের রাধাকৃষ্ণ গোপবংশীয় হইয়াও যথাসম্ভব মার্জ্জিতরুচিবিশিষ্ট। এই পার্থক্যের কারণ ঐতিহাসিক। কৃষ্ণ কীর্ত্তনের পদাবলী যে সময়ে রচিত, রাধাকৃষ্ণের লীলাকে ধর্ম্মসাধনের উপায় হিসাবে সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা তখনো গ্রহণ করেন নাই। কৃষ্ণকে পরমেশ্বর মনে করিয়া কৃষ্ণসঙ্গ ব্যাকুল রাধাকে ঈশ্বরপ্রেম পিপাসু মানবাত্মার প্রতীক ধরিয়া লইয়া যে ভক্তিমূলক উপাসনা তাহা তখনো সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তাই কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধা ও কৃষ্ণ যথাক্রমে গ্রাম্য চরিত্র আভীর কন্যা ও আভীর পুত্রের আদর্শে সৃষ্ট। কিন্তু চৈতন্যদেব কর্ত্তৃক রাধাকৃষ্ণের লীলা যখন উচ্চ বর্ণের জনসাধারণের ধর্ম্ম চর্চ্চার উপাদান স্বরূপে গৃহীত হইল তখন রাধাকৃষ্ণকে যথাসম্ভব মার্জ্জিতরুচি করিয়া গড়িবার চেষ্টা হইল। এই চেষ্টার ফলেই পরবর্ত্তী পদাবলী সাহিত্যের রাধা ও কৃষ্ণ, চণ্ডীদাসের রাধা ও কৃষ্ণ হইতে অন্যরূপ হইয়া পড়িয়াছেন। এই কয়টি কথা মনে রাখিলেই কৃষ্ণকীর্ত্তনের সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারে ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা অনেকটা কমিয়া যাইবে।

কৃষ্ণকীর্ত্তন বিভিন্ন ছন্দে পঠনীয় এবং বিভিন্ন সুর লয় সহকারে গেয় গীতের আকারে রচিত। প্রায়শঃ গানগুলির একটিতে উক্তি অপরটিতে প্রত্যুক্তি রহিয়াছে। মনে হয় যে কাব্যখানির রসকে গীতিনাট্যসুলভ নৃত্য ও অভিনয় দ্বারা ব্যঞ্জনা দেওয়া হইত। সুপ্রসিদ্ধ জয়দেব কবির গীত গোবিন্দও ঠিক এই শ্রেণীর রচনা। গীত হইবার জন্য রচিত বলিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনে ছন্দের বন্ধন স্থানে স্থানে শিথিল। তাহা সত্ত্বেও চণ্ডীদাসের পদসমূহ সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যে হীন নহে। প্রাকৃত জনের অর্থাৎ শিক্ষা সংস্কারে ন্যূন জনসাধারণের জন্য রচিত হইলেও ইহাতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব বর্ত্তমান। তাহার কয়েকটি পদও গীত গোবিন্দের কোন কোন পদের অনুবাদ মাত্র।

সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণ নিম্নোদ্ধৃত স্থলগুলিতে বেশ

সুস্পষ্ট বোঝা যায়। যেমন রাধার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বড়ায়ি কৃষ্ণকে বলিতেছেন :—

কেশ পাশেঁ শোভে তাঁর সুরঙ্গ সিন্দুর।
সজল জলদে যেহ্ন উইল নব সুর॥
কনক কমল রুচি বিমল বদনে।
দেখি লাজে গেলা চান্দ দুই লাখ যোজনে॥

* * * *

ললিত আলক পাঁতি কাঁতি দেখি লাজে।
তমাল কলিকাকুল রহে বনমাঝে॥
আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।
জলে বসি তপ করে নীল উতপল॥
কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে।
সত্বরে পশিলা সাগরের জল মাঝে॥

সংস্কৃতের প্রভাব যুক্ত হইলেও কৃষ্ণ কীর্ত্তন প্রাকৃত কাব্যসুলভ নিরলঙ্কার ও স্বাভাবিক সরস উক্তি প্রত্যুক্তিতে সমৃদ্ধ।

যেমন রাধার নিকট প্রেম নিবেদন করিবার জন্য কৃষ্ণ যে বার্ত্তা পাঠাইতেছেন তাহাতে রাধার বর্ণনা প্রসঙ্গে আছে :—

"চঞ্চল নয়ন তোর সিসতে (১) সিন্দুর।
বাহুত বলয়া শোভে পাএত নুপুর॥
চলিতেঁ চলিতেঁ তোর রুণু ঝুণু বাজে।
মোর মুখে সুনী মোহো গেলা দেবরাজে॥"

এবং কৃষ্ণের প্রেম প্রার্থনার উত্তরে রাধা কথনো বলিতেছেন :—

বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার ঝী।
মোর রূপ যৌবনে তোহ্মাতে কী॥
দেখিল পাকিল (২) বেল গাছের উপরে।
আরতিল (৩) কাক তাক ভখিতেঁ না পারে॥

আবার প্রেম নিবেদনে উত্যক্ত হইয়া রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন :—

কাল হাণ্ডির ভাত না খাওঁ।
কাল মেঘের ছায়া নাহি জাওঁ॥
কালিনী রাতি মো প্রদীপ জালিআঁ পোহাওঁ।
কাল গাইর ক্ষীর নাহি খাওঁ।
কাল কাজল নয়নে না লওঁ॥
কাল কানাঞ্চিঁ তোকে বড় ডরাওঁ।

(১) মাথায়, (২) পক্ক, (৩) ব্যগ্র

এবং কৃষ্ণ তাঁহার উত্তরে বলিতেছেন :—

কাল আখরেঁ তীন ভুবন বিচার!
কাল মেঘের জলে জীএ সংসার॥
কাল গাইর ক্ষীর লাগে বড় কাজে।
কাল রতনে হার শোভে দেবরাজে॥
অকারণে আল রাধা নিন্দসি কৃষ্ণ কালা।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর নান্দো যশোদার বালা॥
কাল চিকুর শোভে মাথার উপরে।
কাল ভুরুহী শোভে বদন কমলে॥
কাল ভ্রমরে কমল বন শোহে।
কাল কাজলে নারী জগজন মোহে॥"

রাধার নিকট কৃষ্ণের প্রেম জানাইলে রাধা বড়ায়িকে যে তিরস্কার করিলেন তাহাও বেশ স্বাভাবিক। রাধা বলিলেন,

এতকালে বুঢ়ী তোর কেহ্নে হেন মন।
ভাল বুলিবে তোরে শুনী কোন জন।
আদি আন্ত এখো বোল না বোলসি ভাল॥
মারিবোঁ পরাণে তোকে জানাআঁ গোআল॥
দারুণী বুঢ়ী তোর বাপেতে নাহিঁ লাজ।
তে কারণে মোক বোলসি হেন কাজ॥

এইরূপে কৃষ্ণের প্রণয় প্রত্যাখান করিয়া বড়াইকে চপেটাঘাত করিলে পর বড়াই গিয়া কৃষ্ণের নিকট যে বিলাপ করিলেন তাহাও প্রাকৃত কাব্যোচিত রসে পূর্ণ। বড়াই বলিতেছেন :—

কোপেঁ কভোঁ মোকে হাথে না
ছুইল সাসী।
গালিহো সাসুড়ী স্থানে না পাইল

তোহ্মার কারণে কাহ্নাঞি এতেক বএসে।
বড় অপমান পাইলোঁ এবে খাইবোঁ বিসে॥

কিন্তু এইরূপ সরস রচনা মাঝে মাঝে থাকিলেও কৃষ্ণকীর্ত্তনে এক প্রধান দোষ উহাতে আদিরসের বাহুল্যের সঙ্গে গ্রাম্যতা দোষ। সংস্কৃত কাব্যেও আদিরস যথেষ্ট পাওয়া যায় কিন্তু তাহা প্রায়ই অলঙ্কারাদির আবরণে অপ্রত্যক্ষ ও গ্রাম্যতাদোষ বর্জ্জিত। দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, যমুনাখণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ডাদিতেই এই গ্রাম্যতাদোষের প্রাচুর্ভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কিন্তু এই গ্রাম্যতাদোষের বাহুল্য সত্ত্বেও কৃষ্ণ কীর্ত্তনে কয়েকটি সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন উচ্চাঙ্গের পদও পাওয়া যায়। যেমন.

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইল রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হঞাঁ তার পায়ে নিশিবোঁ আপনা॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মো কৈলোঁ কোন দোষে॥
আঝোর ঝরএ মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদে বড়ায়ি হারায়িলো পরানী॥
আকুল করিতে কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ি পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিয়া লুকাওঁ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে।
বাসলী সিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥

এবং

বড়ায়ি ল।

বাঁশীর নাদ না শুনী, এবে কাহ্ন
গেলা কিবা দূরে।
প্রাণ বেআকুল ভৈল এবেঁ কেমনে
জায়িবোঁ ঘরে

বড়ায়ি ল।

তোহ্মো কি দেখিলেঁ জায়িতেঁ পথে
কাল কাহ্নাঞি চাঁচর কেশে
কুসুম শোভিত মাথে।
অহোনিশি মো আন না জানোঁ
এত দুখ কহিবোঁ কাএ।
কাহ্নের ভাবেঁ চিত্ত বেআকুল
লাজে মোঁ না কান্দো রাএ।
চারিদিগেঁ তরু পুষ্প মুকুলিল
বহে বসন্তের বাএ।
আম্ব ডালে বসি কুয়িলী কুহলে
লাগে বিষ বাণ ঘাএ॥
চান্দ সুরুজের ভেদ না জানো
চন্দন শরীর তাএ।
কাহ্ন বিনী মোর এবেঁ এক খন
এক কুল যুগ ভাএ॥

বংশীধ্বনি শ্রবণে আকুলিত রাধা রন্ধনে যে বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা অনেকটা সংস্কৃত কাব্যের নববর বা রাজপুত্রাদির দর্শনে পুরনারীদের বিভ্রম বর্ণনায় অনুরূপ; তৎসত্ত্বেও ইহা কিছু মৌলিকতার দাবী করিতে পারে।

রাধা বলিতেছেন: —

সুসর বাঁশীর নাদ শুনিআঁ বড়ায়ি
রান্ধিলোঁ যে সুনহ কাহিনী।
অম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ
সাকেঁ দিলোঁ কানা সোঁআ পানী॥

* * * *

নান্দের নন্দন কাহ্ন আড়বাঁশী বাএ
যেন পাঞ্জবের শুআ।
তা সুনিআঁ ঘৃতে মো পরলা বুলিআঁ
ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআ॥
সেই ত বাঁশীর নাদ শুনিয়া বড়ায়ি
চিত্ত মোর ভৈল আকুল।
ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোলে খোপিলোঁ
বিনি জলে চড়াইলোঁ চাউল॥

কৃষ্ণ লাভে হতাশ রাধার বিলাপে করুণ রসটি বেশ সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছে। রাধা বলিতেছেন—

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজ মুকুতার হার॥
মুছিআঁ পেলাইবোঁ সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলআ মো করিবোঁ শঙ্খচুর॥

* * * *

মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগিনীরূপ ধরি লইবোঁ দেশান্তর॥
যবে কাহ্ন না মিলিছে করমের ফলে।
হাথে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে॥

দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে
রাতিহো এ দুখ চান্দে।
কেমনে সহিব পরানে বড়ায়ি
চখুতে না আইসে নিন্দে॥
শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাওঁ
তভোঁ বিরহ না টুটে।
মেদনী বিদায় দেউ গো বড়ায়ি
লুকাওঁ তাহার পেটে॥

বর্ষা ও শরতকালে রাধার বিরহ ও বিলাপ বেশ

স্বাভাবিক কবিত্বরসে পূর্ণ। পরবর্ত্তী কালের 'বারমাসী' বা 'বারমাস্যার' নামধেয় রচনা ইহারই অনুকরণে রচিত। রাধা বলিতেছেন :—

অহোনিশি কাহ্নাঞির গুণ সোঁঅরিআ।
বজরে গঢ়িল বুক না জাএ ফুটিআ
জেঠ মাস গেল আষাঢ় পরবেশ।
সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ ॥

* * * *

আষাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।
মদনে কদন মোর নয়ন ঝুবএ ॥
পাখী জাতি নহোঁ বড়ায়ি
উড়ি জাওঁ তথাঁ।
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞি বসে যথাঁ ॥
কেমনে বঞ্চিব রে বরিষা চারি মাস।
এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস।
শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে।
সেজাত সুতিআঁ একশরী নিন্দ না আইসে ॥

* * * *

ভাদর মাঁসে অহোনিশি অন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে ॥
তাত না দেখিবোঁ যবে কাহ্নায়ির মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট জায়িবে বুক ॥

বলা বাহুল্য চণ্ডীদাসের রচনায় এরূপ রসভাবে সমৃদ্ধ উচ্চশ্রেণীর পদ বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই হয়তঃ তাহা শ্রীচৈতন্য দেবের বিশেষ প্রিয় হইয়াছিল। কিন্তু ভাষায় প্রাচীনত্ব এবং পরবর্ত্তী নবীন বৈষ্ণব ধর্ম্ম এই দুই এর জন্য চণ্ডীদাসের পদাবলী জনসাধারণের মধ্যে অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কেবল একটিমাত্র পদ ঈষৎ পরিবর্ত্তিত ভাষায় বর্ত্তমান কালের পদাবলী সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে।

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনার কিছু পরেই হয় সুপ্রসিদ্ধ কৃত্তিবাস কবির রামায়ণ রচনা। এই রচনার তারিখ নিঃসন্দেহরূপে জানিতে না পারিলেও মোটামুটি মনে হয় কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে অবশ্যই বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব কৃত্তিবাসী রামায়ণকে এই সময়ের রচনা বলিয়া ধরিয়া লইলে বিশেষ ভুল করা হইবে না। সে যাহাই হৌক কৃত্তিবাস যে বর্ত্তমান ভারতের সাহিত্যিক-বর্গের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে পৌরাণিক কাব্যের রস দেশভাষায় পরিবেশন করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ হইবার আশঙ্কা নাই। সমগ্র উত্তরভারতে বিখ্যাত তুলসীদাসের রামায়ণ তাঁহার রামায়ণের বহু পরে রচিত হইয়াছে। কিন্তু পৌরাণিক কাব্যরসকে সর্ব্বপ্রথমে দেশভাষায় সহজ লভ্য করাতেই কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব নহে। স্বীয় রচনার উৎকর্ষই তাঁহার নামকে দীর্ঘকাল বাঙালী জনসাধারণের নিকট আদৃত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উক্ত উৎকর্ষ সম্বন্ধে আলোচনায় কোন ধ্রুব ভিত্তি এ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই (১)। কৃত্তিবাসের সময়কার (এখন হইতে প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের) ভাষা কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পুঁথির ভাষারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরবর্ত্তী যুগের রামায়ণ গায়কেরাও স্থানে স্থানে নিজ রচনা কৃত্তিবাসের রচনার সহিত জুড়িয়া দিয়াছেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কাজেই, সমগ্র কৃত্তিবাসের রামায়ণ সম্বন্ধে কোন নির্ভুল সমালোচনা বর্ত্তমানে সম্ভবপর নহে। এইরূপ আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন থাকিলেও বর্ত্তমান গ্রন্থের জন্য তাহা অপরিহার্য্য নহে। প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির রচনার প্রক্ষেপ থাকিলেও সেই প্রক্ষিপ্ত রচনাসকল যে কৃত্তিবাসের প্রবন্ধশৈলীদ্বারা অনুপ্রাণিত তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কাজেই প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণকে স্থূলদৃষ্টিতে কৃত্তিবাসের রচনা ধরিয়া বিচার করিলে বাঙ্‌লা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না।

অনেকের বিশ্বাস কৃত্তিবাসের রামায়ণের সহিত বাল্মীকি রামায়ণের সম্বন্ধ খুব অল্প। কথক ঠাকুরদের মুখে রাম চরিত শুনিয়াই কৃত্তিবাস তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই বিশ্বাস নিতান্ত অজ্ঞতাপ্রসূত। কৃত্তিবাস যে সংস্কৃত জানিতেন এবং মূল রামায়ণের সহিত তাঁহার যে বিশেষ পরিচয় ছিল তাঁহার গ্রন্থে সে বিষয়ে অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। তবে তিনি কোথাও বাল্মীকির গ্রন্থের

---

(১) ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এ কাজে হাত দিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত 'আদিকাণ্ড' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

অবিকল অনুবাদ করেন নাই। তৎকালীন শ্রোতাদের রুচি ও রসবোধাদি বিবেচনা করিয়া তিনি স্থানে স্থানে উহার উপাখ্যানাদি বর্জ্জন করিয়াছেন। সংস্কৃতে রচিত বিবিধ রামচরিত সম্পর্কিত কাব্য হইতে উপাখ্যানাদি পরিবর্ত্তিত আকারে গ্রহণ করিয়াও তিনি নিজের রামায়ণকে মৌলিক রচনার পদবীতে উন্নীত করিয়াছেন। বাল্মীকির বর্ণিত যে সকল বিষয় কৃত্তিবাস পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :—কার্ত্তিকেয়ের জন্মবিবরণ, বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রের বিরোধ, বিশ্বামিত্রের তপোবল, অম্বরীষের যজ্ঞ প্রভৃতি। বাল্মীকির রামায়ণে নাই অথচ কৃত্তিবাসের রচনায় সংযোজিত হইয়াছে এরূপ উপাখ্যানাদির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখ করিবার মত :—রঘু রাজার দান কীর্ত্তি, অজরাজার বিবাহ ও ইন্দুমতীর মৃত্যু, রাবণের অত্যাচার নিবারণ কল্পে দেবতাদের ব্রহ্মাসমীপে গমন, জনক রাজার ধনুক তুলিতে অসমর্থ হইয়া রাবণের পলায়ন, রাবণ কর্ত্তৃক সীতাকে শ্রীরামের মায়ামুণ্ড প্রদর্শন, রামকর্ত্তৃক শূদ্রক তপস্বীর শিরশ্ছেদ ও অকালমৃত ব্রাহ্মণপুত্রের পুনর্জীবন এবং লবকুশের যুদ্ধ। এই বিষয়গুলিতে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, বালরামায়ণ, উত্তর রামচরিত মহাবীর চরিত প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থের অনুকরণ ও অনুসরণ বেশ সুস্পষ্ট ; এতদ্ব্যতীত নানা পুরাণ হইতেও কৃত্তিবাস উপাখ্যানাদি রচনার মালমসলা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত কাব্য ও পুরাণাদি হইতে নিজ গ্রন্থের উপকরণ গ্রহণ করিলেও কৃত্তিবাসের রচনায় সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষা বা অলঙ্কার ভারস্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে নাই। যাহা বাঙ্‌লা ভাষার ধাতে সহিবে না এমন অলঙ্কার বা রীতিকে কৃত্তিবাস সযত্নে পরিহার করিয়াছেন। সরল ভাষা, উপাখ্যানের স্বচ্ছন্দ ও অবাধ গতি, বর্ণনায় চমৎকারিত্ব এবং জনপ্রিয় আদর্শের সমাবেশ প্রভৃতি দ্বারাই কৃত্তিবাসের রচনা আপামর সাধারণের উপভোগ্য এক অপূর্ব্ব শ্রী ও সরসতায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

কৃত্তিবাসের রচনায় প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদ গুণ এবং তাঁহার বর্ণিত উপাখ্যান নিচয়ের স্বচ্ছন্দ গতি পাঠক মাত্রেরই নিকট সহজ বোধ্য। ইহার কোন সবিস্তর আলোচনা ও দৃষ্টান্ত উল্লেখ অনাবশ্যক। কিন্তু তিনি তাঁহার রামায়ণে কি ভাবে কোন জনপ্রিয় আদর্শের অবতারণা করিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। কারণ এই আদর্শ এবং তাহার প্রচারের সুনিপুণ পদ্ধতি দ্বারাই কৃত্তিবাস বাঙ্‌লার জনসাধারণের চিত্তকে এত সহজে অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সাহিত্য রস উপলব্ধির জন্য যে জীবনের সহিত নিকট যোগের প্রয়োজন আছে একথা কৃত্তিবাস ভাল করিয়া জানিতেন ; তাই স্বদেশীয় পাঠকবর্গের সহজ রস বোধকে উদ্রিক্ত করিবার জন্য তিনি বিশেষ রচনা কৌশল অবলম্বন করিলেন। বাল্মীকির রামায়ণে রাম-সীতা ছিলেন এক অজ্ঞাত কালের বিদেশী ক্ষত্রিয় রাজকুমার ও রাজবধূ যাঁহাদের আচার ব্যবহার বাঙালী পাঠকের নিকট অপরিচিত অন্ততঃ সুপরিচিত নহে। এই অবস্থায় তাঁহাদের সুখদুঃখের কাহিনী সাধারণ বাঙালীর প্রাণে সহজে পরিপূর্ণ রসোদ্রেক করিতে পারে না। তাই রাম-সীতা ও তাঁহাদের পরিজন ও প্রতিপক্ষকে বাঙ্গালীর ছাঁদে চিত্রিত করিয়া কৃত্তিবাস এমন রাম-চরিত কাব্য রচনা করিলেন যাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিল বাঙালী পাঠক পাঠিকাদের নিতান্ত পরিচিত আত্মীয় বন্ধু এবং প্রতিবেশীদেরই মূর্ত্তি। দেখা গেল সীতাদেবী বাঙ্‌লার গৃহলক্ষ্মীদেরই মত রন্ধনশালায় নিমন্ত্রিতদের জন্য অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিতেছেন এবং রন্ধনান্তে অন্নথালা লইয়া সকলকে পরিবেশন করিতেছেন। পরিবেশনের ক্রম ও উপকরণবাহুল্য ঠিক বাঙালীর ভোজেরই অনুরূপ। কারণ বর্ণনায় আছে :—

প্রথমেতে শাক দিয়া ভোজন আরম্ভ।
তার পর সুপ আদি দিলেন সানন্দ॥
ভাজা ঝোল আদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন॥
ক্রমে ক্রমে সবাকারে কৈল বিতরণ॥
শেষে অম্বলান্তে হৈল ব্যঞ্জন সমাপ্ত।
দধি পরে পরমান্ন পিষ্ঠকাদি যত॥

ভোজনের ফলে ভোজনকারীদের যে অবস্থা দাঁড়ায় তাহাতে বাঙালী 'ফলারে' বামুনদিগকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। ভরদ্বাজ আশ্রমে সৈন্যসামন্তগণের ভোজন বর্ণনায় আছে :—

ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু মধুর পায়স।
নানাবিধ মিষ্টান্ন খাইল নানারস॥

চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় সুগন্ধি আস্বাদ।
যত পায় তত খায় নাই অবসাদ॥
কণ্ঠাবধি পেট হৈল বুক পাছে ফাটে।
আচমন করি ঠাট কষ্টে উঠে খাটে।

রামায়ণে বর্ণিত বিবাহাদির ব্যাপারেও বাঙালীর বিবাহেরই প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। যথা সুমিত্রার সহিত বিবাহান্তে বাসরে রাত্রি যাপন করিয়া দশরথ বাঙালী বরের মত উত্থান কৌড়ি (=শেজতোলানী) দিতেছেন। এবং রামের জন্মের ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠীপুজা ও অষ্টমদিনে অষ্টকড়াইর উল্লেখও রহিয়াছে। উৎসবাদিতে লোকজনের নিমন্ত্রণ ব্যাপারেও বাঙালী ভদ্রলোকদেরই অবলম্বিত প্রথা অনুসৃত হইয়াছে। রামের বিবাহে জনকরাজার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:—

গলে বস্ত্র দিয়া রাজা অতি সমাদরে।
নিমন্ত্রেণ একে একে সবাকার ঘরে॥

কেবল বর্ণিত চরিত্র নিচয়ের বাঙালীত্বের জন্যই নহে, বিবিধ সাহিত্যিক রসের সমাবেশেও কৃত্তিবাসের রচনা বাঙালী জনসাধারণের খুব প্রিয় হইয়াছে। যেমন নারায়ণের নিকট ব্রহ্মা রাবণের অত্যাচার বর্ণনায় তিনি বলিতেছেন:—

দুষ্ট রাবণের ক্রিয়া করহ শ্রবণ॥
হাতে অস্ত্র সূর্য্যদেব লঙ্কার দুয়ারী।
ইন্দ্র মালা গাঁথি দেন চন্দ্র ছত্রধারী॥
আপনি ত অগ্নিদেব করেন রন্ধন।
মন্দ মন্দ বাতাস করেন সমীরণ॥
বরুণ বহিয়া জল দেন নিতি নিতি।
করেন মার্জ্জনা গৃহ নিজে বসুমতী॥
শুনিলে যমের কথা হইবেক হাস।
কাটিয়া আনেন তার ঘোটকের ঘাস॥
শনিদৃষ্টে ত্রিভুবন ভস্ম হৈয়া উড়ে।
কাপড় ধুইয়ে দেন শনি লঙ্কাপুরে॥

শক্তিশালী দেবতাগণের দুর্দ্দশা বিশেষতঃ যম ও দুষ্টগ্রহ শনির নিগ্রহ বর্ণন করিয়া কৃত্তিবাস যে অদ্ভুত রস সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বেশ উপভোগ্য। করুণ রসও তিনি ফুটাইয়াছেন স্থানে স্থানে। যেমন লক্ষ্মণ বর্জ্জনে—

হাহাকার রোদন উঠিল চতুর্দ্দিক।
বিলাপ করেন রাম বর্ণিতে অধিক॥
আমারে এড়িয়া গেলা কোথায় লক্ষ্মণ।
তোমা বিনা বিফল না রাখিব জীবন॥
সীতা বর্জ্জিলাম আমি লোক অপবাদে।
তোমা বর্জ্জিলাম ভাই কোন অপরাধে॥
লক্ষ্মণ বর্জ্জনে মোর মিথ্যা এ সংসার।
লক্ষ্মণ-সমান ভাই না পাইব আর॥
লক্ষ্মণ বিহনে আমি থাকি কি কুশলে।
যে জলে নামিল ভাই নামিব সে জলে॥

*   *   *   *

করিল বিস্তর সেবা হইয়া সদয়।
তোমা বর্জ্জিলাম আমি হইয়া নির্দ্দয়॥

এতদ্ব্যতীত সীতা হরণের পর, মায়া সীতা বধে, লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপে এবং রাম বনবাসে দশরথ ও কৌশল্যাদির বিলাপে করুণ রসের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে প্রচুর। হাস্যরসের দৃষ্টান্তও রামায়ণে একান্ত বিরল নহে। হরধনু ভঙ্গে অসমর্থ হইয়া প্রহস্তের নিকট দশানন যখন অনুচরবর্গের সহায়তায় উক্ত ধনু ভাঙিবার প্রস্তাব করিলেন তখন

প্রহস্ত বলিল শুন বীর দশানন।
তবে ত সীতার বর হবে কোন জন॥
পার বা না পার আর একবার টান।
যায় প্রাণ রাখ মান এই বাক্য মান।
রাবণ বলিল মামা শুন মোর বাণী
তুলিতে না পারি শীঘ্র রথ আন তুমি॥
ঈষৎ হাসিয়া বলে প্রহস্ত তাহারে।
রথ লয়ে এই আমি রহিলাম দ্বারে॥
আরবার রাবণ ধনুকখান টানে।
তুলিতে না পারে চায় প্রহস্তের পানে॥
কাঁকালেতে হাত দিয়া আকাশ নিরখে।
মনে ভাবে পাছে আসি ইন্দ্র বেটা দেখে॥
বুঝিয়া প্রহস্ত রথ দিল আগাইয়া।
লাফ দিয়া রথে উঠে ধনুক এড়িয়া॥
পলাইয়া চলিল লঙ্কার অধিকারী।
সকল বালক তারে দেয় টিটকারী॥

রাবণের পরাভব চিত্রণে বেশ সুন্দর হাস্যরস সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার অপর দৃষ্টান্ত, যখন পঞ্চবটী বনে সূর্পনখার প্রেম নিবেদনের পর রাম সীতাকে আশ্বাস দিয়া রাক্ষসীকে বলিলেন:—

আমার হইলে জায়া পাবে সে সতিনী।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা হও এই বড় গুণী॥

সুচারু লক্ষ্মণ ভাই মনোহর বেশ।
যৌবন সফল কর কহি উপদেশ॥

এবং রাক্ষসী লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইলে যখন—

লক্ষ্মণ বলেন আমি শ্রীরামের দাস।
সেবকের প্রতি কেন কর অভিলাষ॥
ভুবনের সার রাম অযোধ্যার রাজা।
তুমি রাণী হইলে করিবে সবে পূজা॥
কি গুণ ধরেন সীতা তোমার গোচর।
তোমায় সীতায় দেখি অধিক অন্তর॥
রামেরে ভজহ তুমি হইয়া সাবধান।
মানুষী কি করিবেক তোমা বিদ্যমান॥
উপহাস না বুঝে বচন মাত্রে ধায়।
লক্ষ্মণেরে ছাড়িয়া রামের পাশে যায়॥

তখন হাস্যরস ফুটিয়াছে প্রচুর। রাবণ কর্তৃক হনুমানের শাস্তির বিবরণ আরো কৌতুকপ্রদ। রাবণের আদেশ শুনিয়া—

কুপিত হইল বীর পবন নন্দন।
বাড়াইয়া দিল লেজ পঞ্চাশ যোজন॥
লেজ দেখি রাবণের বড় হৈল ডর।
ধর ধর ডাক ছাড়ে রাজা লঙ্কেশ্বর
হয়েছিল যে দুঃখ বালির লেজ টেনে
লেজ দেখি রাবণের তাহা পড়ে মনে॥
তিনলক্ষ রাক্ষস চাপিয়া লেজ ধরে।
সবে মিলি লেজ ফেলে ভূমির উপরে॥
ত্রিশমণ বস্ত্র সবে আনিল নিকটে।
এত বস্ত্র আনে এক বেড়ে নাহি আঁটে॥
লঙ্কার মধ্যেতে ছিল যতেক কাপড়।
ঘৃত তৈল দিয়া তাহা করিল জাবড়॥
কাপড় তিতিল লেজ পড়িল ভূতলে।
লেজে অগ্নি দিতে সব দাউ দাউ জ্বলে॥
লেজে অগ্নি দিতে দেখি হনুমান হাসে।
আপন বুদ্ধিতে বেটা পড়ে সর্ব্বনাশ॥

তাহার পরে—

ঘরে ঘরে লাফ দিয়া ভ্রমে হনুমান।
এক ঘরে অগ্নি দিতে আর ঘর জ্বলে।
কে করে নির্ব্বাণ তারে কেবা কারে বলে॥
অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে বড় ঘরের চাল।
অর্দ্ধেক স্ত্রী পুরুষের গায়ের গেল ছাল॥
উলঙ্গ উন্মত্ত কেহ পলায় ভিরড়ে।
লেজে জড়াইয়া ফেলে অগ্নির উপরে॥

মাঝে মাঝে এইরূপ বিবিধ রসের অবতারণা করিয়া কৃত্তিবাস রামায়ণী কথার করুণ কাহিনীটিকে সর্ব্ববিধ নরনারীর উপভোগ্য করিয়াছেন। তাহার উপর আদি কবির রচনায় প্রচারিত পিতৃভক্তি, অগ্রজ সেবা, পতিপ্রেম প্রভৃতির আদর্শ প্রচার করিয়াও কৃত্তিবাস নিজ কবিত্বকে সকলের আন্তরিক প্রশংসার বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন। নিজের কাব্য সম্বন্ধে তিনি যে বলিয়াছেন :—

যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিত্ব কেহ নিন্দিতে না পারে।

ইহা অযোগ্য ব্যক্তির অসার আত্মশ্লাঘা নহে। সত্যই তাঁহার কবিত্ব অনিন্দ্য।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীমনোমোহন ঘোষ
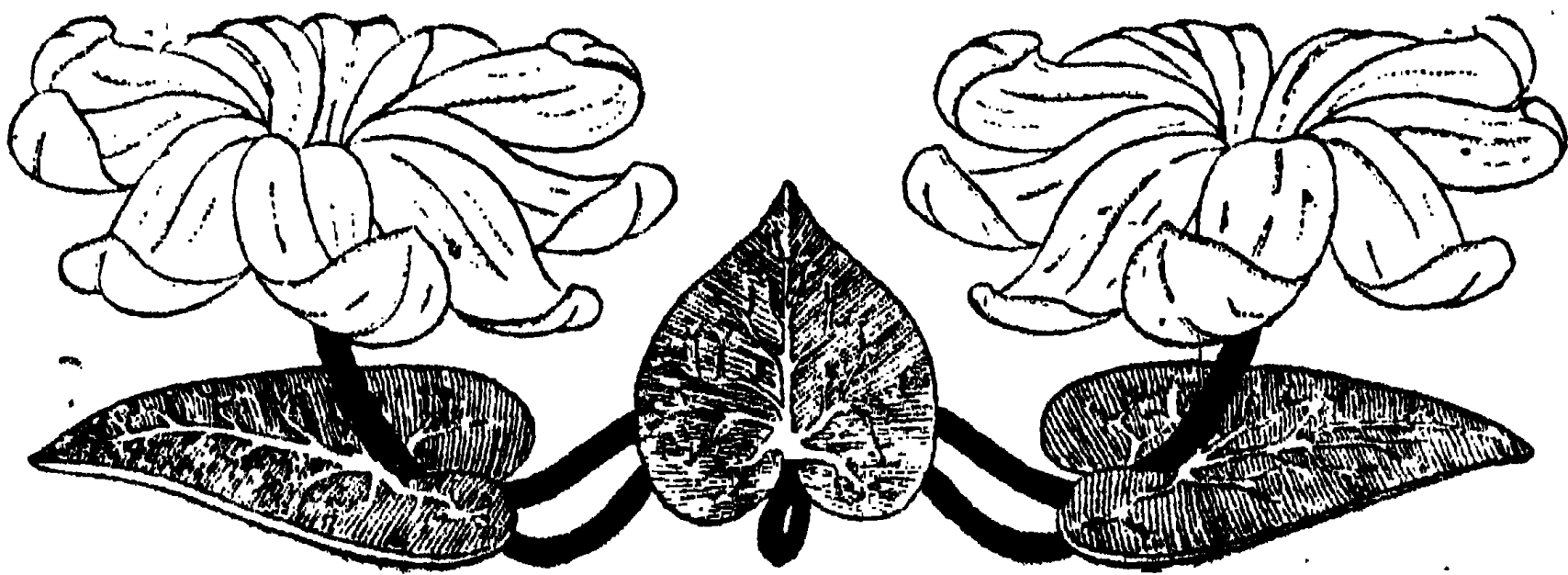
শরৎচন্দ্র

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায় এম-এ, বি-এল

শরতের চাঁদ শীতে হ'য়ে গেল হারা,
আঁধার আকাশে কাঁদিছে অযুত তারা ;
কাঁদিছে ধরণী,—ধূলায় ধূসর দেহ,—
"কোথা গেল চাঁদ, বলিতে পার কি কেহ ?

"ছিল যবে চাঁদ, ছিলনা দুখের ছায়া,
সারাটি ভুবন ছেয়ে ছিল তার মায়া ;
ধনীর আলয়ে, কাঙালের কুঁড়ে-ঘরে,
বাসর-শয়নে, শ্মশান-চুল্লী 'পরে,
সরলা বধূর তুলসী-বেদীর মূলে,
প্রমোদ-ভবনে গণিকার কালো চুলে,
সাধুর শিথানে, অসাধুর উপাধানে,
তার মায়া ছিল ছড়ায়ে সকল খানে।

"পল্লীবালার পরাণে যে-ব্যথা বাজে,
যে-ব্যথা বিরাজে নাগরীর হিয়া-মাঝে,
যে-বেদনা করে ধনীরে কাঙাল-সম,
শত্রুরে করে পরাণের প্রিয়তম,—
নিদ্রাহারা সে ব্যথার পরশ মাগি'
গভীর নিশায় সে-চাঁদ রহিত জাগি'।

"কুশ্রী-কুরূপ যত ছিল ধরা-'পর,
চাঁদের আলোয় হ'ল তারা মনোহর।
পথের ধূলায় রচিল রূপালী জাল,
পঙ্কের বুকে পরাল শঙ্খ-মাল,
পাষাণে বুলাল করুণ-কোমল কর,
'পোড়া কাঠে' ফুল ফুটাল সে থরে-থর।

"আজ নাই চাঁদ কুহেলী-ধূসর রাতে,
কাঁপে চারিদিক তুষার-ঝঞ্ঝাবাতে,
পাণ্ডুর মুখে চাহিছে তারকা-গুলি,—
শরতের চাঁদ গেল কি তাদের ভুলি' ?

"পেয়েছিনু চাঁদে দুখের সাগর সেঁচে,
চাঁদ যদি গেল, কি নিয়ে রহিব বেঁচে ?"

(পাবনা সাহিত্য সম্মেলনীর অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভায় পঠিত।)

পদ্মা : প্রমত্তা নদী

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীসুবোধ বসু

পাঁচ

পরদিন সন্ধ্যার পরই হষ্টেলে সংবাদ পাওয়া গেল : শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অন্যান্যের সঙ্গে সমর ভট্টাচার্য্য গ্রেপ্তার হইয়াছে। পরদিন প্রভাতের খবরের কাগজে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আইন অমান্যকারীদিগের সভা ও পুলিশের লাঠি চার্জ্জের সমগ্র বিবরণ বাহির হইল।

আইন অমান্যকারীদিগের আন্দোলনের তীব্রতা এবং পুলিশের দমন কার্য্য তাল ফেলিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই ঘোর উত্তেজনার মধ্যেও কংগ্রেসের স্বেচ্ছা-সেবকেরা সম্পূর্ণ অহিংস রহিল : মহাত্মা গান্ধী মানবাত্মার যে নৈতিক প্রতিবাদ জ্ঞাপনের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন তাহা হইতে এই বিরাট এবং সংগ্রামে অনভ্যস্ত স্বেচ্ছা-সৈনিকেরা ভ্রষ্ট হইল না : কিন্তু কর্তৃপক্ষকে সর্ব্বদিকে তারা উত্যক্ত করিয়া তুলিল ; আইন যত প্রকারে ভাঙ্গা যায়, যত প্রকারে কর্তৃপক্ষকে অবজ্ঞা এবং অবহেলা দেখান চলে, যত প্রকার রাজদ্রোহিতামূলক ধ্বনি করা সম্ভবপর, তাহার অনুশীলন হইতে লাগিল। টিটকিরী, বিদ্রূপ এবং নানা কারণে অকারণে পুলিসকে হয়রাণের একশেষ হইতে হইল। পুলিসের উপর কোথায়ও কোথায় ঢিলটা আশ্‌টা আসিয়া পড়িল : পুলিসের কর্তৃপক্ষ রাগিয়া আগুন হইল ; কোনও কোনও পুলিশ সার্জ্জেণ্ট মাত্রা ছাড়াইয়া রাগের মাথায় এমনও সব কাজ করিয়া বসিল যাহা খুব একটা আইন-সম্মত নয় ; বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢুকিয়া একদিন কয়টা শ্বেতাঙ্গ পুলিস সার্জ্জেণ্ট ক'টা ছেলেকে পিটাইয়া গেল। এই ব্যাপারে ছাত্রমহলে বিক্ষোভের আর অবধি রহিল না।

দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থাটা একটা দুষ্ট চক্রের গতিতে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল,—যাকে ইংরেজিতে বলে vicious circle. আইন অমান্য আন্দোলনটা যতই তীব্র হইতে লাগিল, পুলিসের দমন তত কঠোর এবং ব্যাপক হইয়া উঠিল ; এবং যেহেতু এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে দেশের অধিকাংশেরই সহানুভূতি ছিল, সেইজন্য পুলিসের দমন কার্য্য নিত্যনূতন বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়া চলিল।

অধিকাংশ ছাত্রের মতন, কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের প্রতি রজতও গভীর শ্রদ্ধান্বিত : কিন্তু কি যে সে সাহায্য করিতে পারে, নিজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া কি যে সে করিতে পারে সে সম্বন্ধে কোনও বিচারেই সে উপনীত হইতে পারিতেছিল না। কিন্তু এমন সময় সমরের গ্রেপ্তারের সংবাদ তাহাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়া সজাগ করিয়া তুলিল। সমরের নিত্য নৈমিত্তিক বাচালতা দেখিয়া কার সাধ্য বলিতে পারিত এমন অনাড়ম্বরে, এমন সহজ অবহেলার সঙ্গে সে কংগ্রেসের কার্য্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িবে, হাসিয়া কারাবরণ করিয়া লইবে! কী অদ্ভুত মনের জোর এই তর্কবাগীশ অভিনয়-প্রিয় যুবকটীর মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল। রজতের কেবলই মনে পড়িতে লাগিল সমরের সেই কথাটা—'আচ্ছা,

করে শুনিয়ে এলাম জে, এম, সেনগুপ্তকে'! সমরের জন্য একটা সুগভীর শ্রদ্ধায় রজতের বুকটা ভরিয়া উঠিল! ওর বাচালতা, ওর আহার লোলুপতা, ওর ছ্যাবলামি, ওর ছদ্মবেশ মাত্র। ছদ্মবেশ খসাইয়া সমর আজ নিজেকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে!

ব্যক্তিগত ভাবে সাহায্য করিতে না পারিয়া দেশের অন্যান্য অধিকাংশ লোকের মত রজত বিদেশী জিনিষ বর্জ্জন করিল; নাম গোপন করিয়া কংগ্রেস ভাণ্ডারে পাঠাইয়া দিল অর্থ। তবু কিন্তু রজতের কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হইতে লাগিল; কেমন যেন একটা নামগোত্রহীন লজ্জা, কেমন একটা অপরাধ-বোধ, কি যেন একটা ভীরুতার জন্য সঙ্কোচ, কি জানি একটা বিবেকের দংশন তার চৈতন্যের মধ্যে বারম্বার আঘাত করিয়া বেড়াইতে লাগিল; মনে যেন রজত কিছুতেই আর শান্তি পাইতেছে না। নিজেকে রজত কত বুঝাইল,—স্বার্থপরতাটাকে জাগ্রত করিতে চাহিল, নিজের নিরাপদ এবং সুখকর অবস্থার কথা নিজেকে জানাইল, তবু কেন যেন একটা নির্দ্দয় আত্মগ্লানি, একটা অসহায় অপমানের বিষাক্ত হুল কেবলই তাকে খোঁচা মারিয়া বেড়াইতে লাগিল। রজত কোনই পথ খুঁজিয়া পাইল না।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে পূর্ণানন্দ চুপে চুপে আসিয়া কহিল—রজত, তোমাকে একবার যেতে হবে।

রজত একটু চুপ থাকিয়া কহিল—আমি তার যোগ্য নই, পূর্ণানন্দ; আমি হতাশ করব। কোনও কাজ আমার দ্বারা হবে না,—অনর্থক তুই—

'না না, একবার তোমাকে যেতেই হবে', পূর্ণানন্দ আবেগের সঙ্গে কহিল, 'আমি তাদের বলে এসেচি; তারা আশা করে' বসে আছে।'

'কিন্তু, আমি স্বয়ং গিয়ে তাদের হতাশ করে এলে সেটা কি এমন বেশি কিছু মধুর হবে?'

'তারা ব্যর্থকাম হয় কি সফল হয়, সে ভার আমার নয়, রজত; আমার উপর আদেশ তোমাকে একবার ওদের কাছে নিয়ে যাওয়া।'

'কিন্তু তোদের পন্থাও আমি অনুমোদন করি না।'

'তা আমি শুনেচি; ওদেরও জানিয়েচি।'

'তবু, তারা একবার চেষ্টা করে দেখতে চায়, এই তো?'

'হ্যাঁ, এই।'

'কিন্তু যদি আমি রাজি না হই!'

'না হলে।'

'যদি পুলিসকে এসে সব জানিয়ে দিই!'

'সে লোক তুমি নও।'

কুমারটুলি পার হইয়া বাগবাজারের কাছাকাছি পূর্ণানন্দ রজতকে লইয়া ট্রাম হইতে নামিল; তারপর এ-গলি হইতে ও-গলি, এবং তারপর অন্য গলির একটা অখণ্ড গোলক-ধাঁধার মধ্য দিয়া রজতকে হাঁটাইয়া লইয়া চলিল। কোথা দিয়া কোন খানে এবং কোন দিকে যে যাইতেছে, এত দিন কলিকাতায় বাস করিবার পরও রজত তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না; পূর্ণানন্দের নির্দ্দেশমত দুই দিকের দুই সারি গগনস্পর্শী অট্টালিকার মধ্যদেশের সঙ্কীর্ণ গলির পথে, গ্যাসের স্তিমিত আলোয় পথ দেখিয়া কেবলই চলিতে লাগিল। এদিকে কি মানুষ জনও বেশী নাই? ক্রমে সুরকির কল বা চুণের আড়ত, গরুর গাড়ী মেরামতের কারখানা—এই সব রজত লক্ষ্য করিয়াছে; এই অদ্ভুত স্থানের কোন্ গভীর এবং দুর্গম প্রদেশে তাদের যাত্রা শেষ হইবে, রজত তাহা ভাবিয়াই উঠিতে পারিল না; কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্যটা মনে করিয়া রজত কোন প্রশ্নই করিল না,—এবং একবার অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন এক বস্তির মধ্য দিয়া পূর্ণানন্দকে অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিল।

অবশেষে পূর্ণানন্দ একটা অতি জীর্ণ আধ-ভাঙ্গা দালানের সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং সমুখের কীটদষ্ট ভগ্নপ্রায় কাঠের দরজাটায় আঙুল দিয়া তিনবার টোকা দিল। এই ভগ্নস্তূপে যে মানুষ বাস করিতে পারে, পূর্ণানন্দের উদ্দেশ্যটা না জানলে রজত কোনও দিন বিশ্বাস করিতে পারিত না। একটা অতি-পুরাতন অব্যবহার্য্য দালানকে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়া যখন কাজ অর্দ্ধ-সমাপ্ত হয়,—চুণে, ধুলায়,

ভাঙা আস্তর-খসা ইটে যখন একটা পাহাড় স্তূপের সৃষ্টি হয়, ও-বাড়ীরও সেই অবস্থা।

পূর্ণানন্দ দরজার আবার টোকা মারিল। কিন্তু বহুক্ষণ যাবৎ কোনও সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না। আরও সম্পূর্ণ পাঁচ মিনিটকাল অপেক্ষা করিয়া পূর্ণানন্দ যখন পুনর্ব্বার সঙ্কেত করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, তখন ভিতরে অতি ক্ষীণ একটা সাড়া পাওয়া গেল—যেন ইট এবং সুরকির স্তূপের মধ্য হইতে কে চেষ্টা করিয়া অগ্রসর হইতেছে। শুনিয়া পূর্ণানন্দ উৎকর্ণ হইয়া উঠিল; তারপর সামান্য একটু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভিতরের সেই রহস্যময় শব্দের উদ্দেশে কহিল—আত্মানং বিদ্ধি।

ক্র্যাচ্! ক্র্যাং! জীর্ণ কাঠ এবং শিথিল কব্জার বিকট একটা শব্দ হইল; দরজা খুলিয়া গেল। ইঙ্গিতে রজতকে সামান্য অপেক্ষা করিতে বলিয়া পূর্ণানন্দ ভিতরে প্রবেশ করিল এবং একটু পরেই বাহির হইয়া আসিয়া কহিল—এসো রজত। দরজা পুনরায় বন্ধ হইল, এবং ইলেকট্রিক টর্চ্চে পূর্ণানন্দ আলো জ্বালাইলে রজত শিহরিয়া উঠিয়া দেখিল—চতুর্দ্দিকে কেবল সুরকি, কেবল ভাঙা শ্যাওলা-ধরা ইটের স্তূপ ও চূণ; স্থানটাকে একটা কবরের অভ্যন্তর বলিয়া রজতের মনে হইতে লাগিল। হাসিয়া পূর্ণানন্দ কহিল—একটু সাবধান হতে হয়, ভাই।

'তাতো দেখতেই পাচ্চি,' রজত কহিল। 'একেবারে গোড়ের তলায় এসে ডেরা বেঁধেচিস্; আমি ভাবতেও পারিনি, এর ভেতর প্রবেশ করা যাবে—ওকি, এই সিঁড়ি নিচের দিকে কোথায় যাচ্চে?'

'মাটীর নিচে ঘর আচে।'

'নিচে!' সবিস্ময়ে রজত কহিল।

'ওপরে থাকতে না পেলেই নিচে আসতে হয়', পূর্ণানন্দ রহস্যের সুর লাগাইয়া কহিল, 'ওটা চিরকালের নিয়ম;—একটু সাবধান, এবার দুটো সিঁড়ি ভাঙা; মাটীর কিনা, সহজেই ধ্বসে যায়—'

রাত দশটার সময় রজত একা ফিরিয়া আসিল।

মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে; লাভ কিছুই হইল না, অনর্থক কতগুলি বাদানুবাদ হইল, কতগুলি ফলহীন উচ্ছ্বাস এবং কয়জনকে ভগ্নমনোরথ করিয়া আসা ছাড়া আর কিছুই হইল না। পূর্ণানন্দের উপরও বিরক্তি হইল; ওতো রজতের সমস্ত মতামত জানিতই, তবে কেন ওদের সম্প্রদায়ের কাছে এমন করিয়া লইয়া গেল? এতে কার কি লাভ হইল? দেশের দ্রুত স্বাধীনতা লাভ হউক ইহা রজত খুবই চায়, কিন্তু পূর্ণানন্দদের সমিতির পন্থায় একাধিক কারণে মন সায় দেয় না। স্পষ্ট করিয়াই রজত নিজের মত-স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে; রহস্যের প্ররোচনায় নিজের মত-গুলি এবং স্বধর্ম্ম কিছুতেই সে বিসর্জ্জন করে নাই। পূর্ণানন্দ-দের দল হয়তো খুবই আশা করিয়াছিল তাকে দলভুক্ত করি-বার; হতাশ হইয়া যে কেহ কেহ বিরক্ত হইয়াছে তাহার নিদর্শনও রজত কিছু কিছু দেখিয়া আসিয়াছে: তর্কটা দুএকবার কটু পর্য্যন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই অপ্রীতি-করতার কোনও প্রয়োজনই ছিল না: পূর্ণানন্দের উচিত ছিল একথাটা ওদের আগেই স্পষ্ট করিয়া জানান।

'ওরা হয়তো ভেবেছিলেন', রজত মনে মনে ভাবিল, 'ওদের উদ্দেশ্যটার প্রতি আমার গভীর সহানুভূতি ওদের পন্থাকে অনুমোদন করতে আমাকে সাহায্য করবে; কিন্তু আমিতো পূর্ণকে সবই জানিয়েছিলাম—বলেছিলাম, 'আমি ও পারব না; হয়তো আমি ওর যোগ্য নই, কিন্তু এটা ঠিক, আমার অন্তর ওতে সাড়া দেয় না। রজত বরঞ্চ কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসৈনিক হইতে পারে, পুলিস বাহিনীর সম্মুখীন হইতে পারে, কিন্তু ইহা সে পারিবে না; ইহাতে যেন যুদ্ধের গৌরবে-রই অভাব বোধ হয়। তা ছাড়া দুইটা পট্কা ছুটাইয়াই কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জয় করা যাইবে। সে কি সম্ভবপর কথা।

মির্জ্জাপুরের মোড়ে নামিয়াও কিন্তু রজত হষ্টেলে গেল না। মাথাটা অত্যধিক উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কলেজ স্কোয়ারের ভিতর ঢুকিয়া নির্জ্জন কোণায় একটা বেঞ্চ দেখিয়া সে বসিয়া পড়িল।

জাত হিসাবে ইংরাজদের উপর রজতের কোনও আক্রোশ নাই। ইংরাজ জাতকে বরঞ্চ সে বিশেষ শ্রদ্ধা করে। সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে কী

অপূর্ব্ব দান এই ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী জাতির ! যে জাতি আধুনিক ইতিহাসের সর্ব্বপ্রথম ডেমোক্রেসীর অগ্রদূত, হাউস্ অব্ কমন্স্ যে জাতি সৃষ্টি করিয়াছে, গণ-স্বাধীনতার জন্য যে জাতি রাজার মুণ্ড কাটিতে পারে, সে জাতির মাহাত্ম্যের তুলনা নাই। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কী বিস্ময়কর রেকর্ড এই ইংরেজ জাতির ! প্রথম ষ্টিম্, এঞ্জিন্, প্রথম ষ্টিমার, প্রথম বাষ্পের তাঁত সৃষ্টি হইয়াছিল এই ইংলণ্ডে : ওর ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ রিভোলিউশান্ সমস্ত জগতকে সভ্যতার পথ প্রদর্শন করিয়াছে। আইনের চোখে প্রত্যেকে সমান—যাকে ওরা বলে rule of law—এই ইংরাজেরই সৃষ্টি ; ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বক্তৃতার স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক চিন্তার অপূর্ব্ব প্রসার, এই ইংরেজ জাতির গৌরবজনক পরিচয়। এই ইংরেজ জাতই কি লর্ড ক্লাইভকে ধিক্কার দেয় নাই ? এই ইংরেজ জাতই কি ভারতবর্ষে অনাচারের অপরাধে ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌কে impeach করে নাই ?

কিন্তু, রজত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে স্মরণ করিল, সাম্রাজ্য-লিপ্সার দরুণ ইংরাজ তার সংস্কৃতি এবং স্বধর্ম্মবিরোধী কম কীর্ত্তি করে নাই। জগতক্ষেত্রে ইংলণ্ডের বহু আচরণ এমন বিশ্রী হইয়াছে যে প্রকৃত ইংলণ্ডের আত্মাকে তাহা ব্যথা দিয়াছে, অপমান করিয়াছে।

লোভ, স্বার্থপরতা—এরা বড় বিশ্রী জিনিষ—রজত নিজ মনে মনে বলিতে লাগিল। আত্মার দাবীর সঙ্গে দেহের দাবীর এই দ্বন্দ্ব চিরকালের ; মানুষ যেমন বহুস্থানে, বহুকর্ম্মে বহুবার দেহের এবং স্বার্থের তাড়নায় আত্মাকে নিপীড়িত করে, হতমান করে, তেমনি এক সমগ্র জাতির স্বার্থপরতাও তার আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে, অসুন্দরের পথে পরিচালিত করিতে পারে।

এই জন্যই তো রজত মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহকে এত শ্রদ্ধা করে। গান্ধীজি বলেন—ওরে, ইংরেজের গায়ে হাত তুলিস না ; তোরা নিজ দাবী জানা,—ভয় না পেয়ে, রাগ না করে ওদের কাছে গিয়ে বল্—আমাদের যা, তা আমাদের দাও ; তোমরা তা এমন করে' অধিকার করে' থাকবে কেন ? গান্ধীজি বলেন—ওরা চটে উঠবে, স্বার্থে আঘাত পেয়ে ওরা রেগে যাবে : ছুটে এসে মারবে তোদের। তোরা কিন্তু মেরে জবাব দিস্ না ; ওরা যদি মারে তো মারুক না : দেখবি, ওরা নিজেরাই একদিন চমকে জেগে উঠবে, লজ্জায় আর নিজেদের কাছেই মুখ দেখাতে পারবে না।—ইংলণ্ডের আত্মা নিজেকে ভুলে থাকবে কদিন ? ইংলণ্ড কি কারুর পরাধীনতা সইতে পারে ? পারিবে না। এ ইংলণ্ডের স্বধর্ম্ম নয়।—আমার প্রিয় স্বেচ্ছাসেবকেরা, লক্ষ্য হানো ইংরেজের মনের ওপরে, তার দেহের ওপরে নয়।

'কে, রজত না ?'

রজত চমকাইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল মনোরঞ্জন। কহিল—কি খবর ?

মনোরঞ্জন অগ্রসর হইয়া আসিল। কহিল—এতো রাত্তিরে এখানে ? করছ কি ?

'মাথাটাতে একটু হাওয়া লাগাচ্ছি।' রজত কহিল।

'বেশ বেশ ; রাতের খাওয়ার পরে রোজ আমাকে হাঁটতে হয়, তাই এখানে বেড়াতে আসি—ডিস্‌পেপসিয়ার ধাত, বুঝলে না ; তাই ব্যবস্থা হচ্চে, কি বলে তোমার, after dinner walk a mile ! সন্ধ্যাবেলা দেখলুম, পূর্ণানন্দ দাসের সঙ্গে কোথায় যাচ্ছ। তা কখন ফিরলে ?' বলিয়া মনোরঞ্জন আসনের অপরার্দ্ধে বসিয়া পড়িল।

রজত বিস্মিত হইয়া কহিল—তুমি আমাদের কোথায় দেখলে ?

মনোরঞ্জন কহিল—আমি হ্যারিসন্ রোডের মোড়ে দাঁড়িয়েছিলুম : দেখলুম দু' বন্ধুতে হাইকোর্টের ট্রামে চেপে বসলে। বেশ ছেলে পূর্ণানন্দ, কেমন ? তারপর সহসা কণ্ঠস্বর অত্যন্ত হ্রস্ব করিয়া মুখটা প্রায় রজতের কানের কাছে আনিয়া কহিল—ওদের সমিতিতে ভজাবার চেষ্টা করচে না তো ? সত্যি বটে উদ্দেশ্য আমাদের একই,—তবু ওদের সম্বন্ধে খুব উচ্চ অভিমত আমি তোমাকে দিতে পারব না।—কেবল চেপে যাওয়া, কেবল কংগ্রেসের পায়ে পায়ে চলা ওদের বদ্ দোষের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। ওরে, আগুন নিয়ে যদি খেলবি তবে এত ভীরুর মত চলা কেন—

'ওসব থাক্, মনোরঞ্জন ; আমার মাথাটা একেই খুব গরম হয়ে আছে,—তর্ক আজ আমি আর সইতে পারব না—'

'থাকবে কি হে, চৌধুরি! তোমার ওপর আমাদের সমিতির claimই যে বেশি: অনেক দিন আগে থাকৃতেই কি আমি তোমায় বলে রাখিনি? আচ্ছা, বল, তুমিই বল, স্বাধীনতা কি একটা কম বড় যজ্ঞ: কত তরুণের রক্তে—। আচ্ছা, যাক্‌,—আজ আর ওসব কথা ওঠাচ্ছি না।'

'উঠিও না। কিন্তু আমি উঠলুম;—এখনও খাইনি।' বলিয়া রজত দাঁড়াইয়া পড়িল।

মনোরঞ্জনও দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল--ওদেরই ওখানে আজ নিয়ে গিয়েছিল বুঝি? আমাদের সমিতেকে খুব গাল দিলে, না?—কিন্তু যখন আত্মত্যাগের সময় আসবে, বুকের রক্ত কারা বেশি দেয়, তা তুমি দেখো। চল, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি—কি বল্লে টল্লে ওরা?—

রজত নিঃশব্দে অগ্রসর হইল। যাহাকে সে চিরদিন বাতুল বলিয়া বিবেচনা করিয়া আসিয়াছে, আজ সহসা সে তাহার উপর সন্দেহপর হইয়া উঠিল। মনোরঞ্জন কে? ওর প্রকৃত উদ্দেশ্যটা কি? কি সংবাদ, ও কেন, সে রজতের কাছ হইতে বাহির করিয়া লইতে চায়? রজত শিহরিয়া উঠিল।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে রজত শুনিল পূর্ণানন্দ বাঁশি বাজাইতেছে: ইতিমধ্যেই কখন সে ফিরিয়া আসিয়াছে। নিজ ঘরের দিকে একান্ত ক্লান্তভাবে অগ্রসর হইতে হইতে রজত ভাবিতে লাগিল—এতটা আগুন অন্তরে পুষিয়া পূর্ণানন্দ এমন সুমিষ্ট বাঁশি বাজায় কি প্রকারে? বাঁশির সুরে যে-স্বপ্ন, যে-আশাকে সে রূপ দেয়, তার জন্য হাতে সে বজ্র ধরে কেন? রজত বারম্বার নিজ মনে বলিতে লাগিল—না, না, এ পূর্ণানন্দের পথ নয়,—এ পথ হইতে ওকে ফিরাইতে হইবে। অসহিষ্ণুতায় কোনও লাভ হয় না—ওতে শুধু ক্ষতি হয়—

ছয়

পূর্ণানন্দকে পথ-ফিরাইবার চেষ্টা করার আর অবসর হইল না। পরদিন বেলা এগারোটা সাড়ে এগারোটার সময় পুলিশের ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ আসিয়া হানা দিল। পূর্ণানন্দের ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাসী হইল, কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। তা সত্ত্বেও পুলিশ যাইবার সময় তাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল; পূর্ণানন্দ আর হষ্টেলে ফিরিয়া আসিল না।

মনোরঞ্জন দত্ত রায় সম্বন্ধে যে সন্দেহটা রজতের মনে কাল রাত্র হইতে চাপিয়া বসিয়াছিল, সে সম্বন্ধে আর কোনও সংশয় রহিল না। ব্যথায়, বিরক্তিতে এবং অস্বাচ্ছন্দ্যে রজতের মন পূর্ণ হইয়া গেল।

ইহার পর হইতে রজতের কেবলই মনে হইতে লাগিল, কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ না দিয়া ওর পক্ষে আর উপায় নাই; সমগ্র দেশ জুড়িয়া এই যে বিক্ষোভ চলিয়াছে, ইহার মধ্যে কি সেই কেবল স্থবির হইয়া বসিয়া থাকিবে? সর্ব্বক্ষণ নিজেকে তার অপরাধীর মত মনে হইতে লাগিল,—কেমন যেন ভীরু বলিয়া বোধ হইল। পূর্ণানন্দের সেই সমিতির প্রেসিডেণ্টের মুখের সমুখে সে জোর গলায় বলিয়া আসিয়াছিল,—'এ আমার ভীরুতা নয়; আমি যে-আদর্শকে বিশ্বাস করি, শুধু তার জন্যই যুদ্ধ করতে পারি, আত্মোৎসর্গ করতে পারি—মিথ্যে আমাকে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করচেন।' কিন্তু কোন্‌দিকে, কতটুকু আত্মত্যাগ সে দেখাইয়াছে? আদর্শ কি তার কিছু আছে? দেশব্যাপী এই মন্থনের মধ্যে সে উদাসীন দর্শক ছাড়া আর কে? তার যৌবন কি আরামপ্রিয় খাঁচার পাখী?—দুর্গম পথে চলিতে সে কি ভয় পায়?

কী স্বার্থকতা সুখে থাকিবার? ঐশ্বর্য্যে বিলাসে সঙ্গীতে ব্যসনে জীবনটা কাটাইয়া দেওয়ার অসহ্য গতানুগতিকতায় তার মন কি তৃপ্ত হইতে পারিবে? কি যেন তার মন একান্ত ভাবে চাহিতেছে, কি যেন একটা দুর্ব্বার ক্ষুধা তার অন্তরের দুর্গম লোকে বারম্বার নাড়া দিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তাঁকে পরিপূর্ণভাবে না জানিতে পারার অস্বস্তিতে সে শান্তি পাইতেছে না। এ কিসের অভাববোধ? সে কি প্রেম? সে কি মৃত্যু? আত্মোৎসর্গ? সংহারোন্মাদনা?

রজতের মনে আর একটুও শান্তি অবশিষ্ট রহিল না।

আশুতোষ বিল্ডিংসের প্রবেশ মুখে দোতলার প্যাসেজে মনোরঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মনোরঞ্জন মুখে গভীর দুঃখ এবং সমবেদনা মাখিয়া জিহ্বাতে খেদোক্তিসূচক শব্দ করিতে করিতে নিকটবর্ত্তী হইল। কহিল—দেখলে কাণ্ডটা? শেষে এমন করে' ধরা পড়ে গেল। নিজের দোষে নিজেকে নষ্ট করলে বৈ ত নয়। আগুন নিয়ে খেলছিস্ একটু ঢেকে ঢুকে খেলতে হয়,—না তো সব তাতেই গোয়ার্ত্তুমি! ওদের সমিতির দোষ ঐ'—বলিয়া ক অসম্ভব প্রকার নিচু করিয়া কহিল—যাকে তাকে এক মিনিটের পরিচয়ে সব গোপন কথা ফাঁস করে দেবে—হয়তো পিস্তলই একটা রাখতে দিল! বল তো,—এ কি বিবেচনার কাজ! তোমাকেও একটা গছিয়ে দিতে চাইলে না?

রজতের ইচ্ছা হইতেছিল একটা ঘুষিতে মনোরঞ্জনের বাঁকা নাকটাকে মুখের সঙ্গে সমতল করিয়া দেয়; চেষ্টা করিয়া নিজেকে সে নিবৃত্ত করিল। কহিল,—মনোরঞ্জন, ভবিষ্যতে যদি তুমি আমার কাছে কখনো আস, তোমার সঙ্গে আমি যে-ব্যবহারটা করবো, সেটা কোনওমতেই অহিংস অসহযোগ হবে না;—এবং সেই কারণে, আমার কাছ থেকে দূরে থাকা তোমার পক্ষে দূরদর্শিতার কারণ হবে।—কথাটা এখন থেকেই মনে রাখতে চেষ্টা করো।'

'এর মানে কি?' মনোরঞ্জন বিস্ময়ের স্বরে কহিল।

'এর মানে তুমিও জান, আমিও জানি। কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা কইতে আমি ঘৃণা বোধ করি।'

'না না, রজত, তুমি কোনও ভ্রম ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে বন্ধুর উপর অবিচার করছ।—আমি বলছিলাম, যে ওদের সমিতির উচিত নয়, নতুন যে—কোনও রিক্রুটকে একটা পিস্তল গছিয়ে দেওয়া;—প্রথমে তাকে বেশ কষে—

'মনোরঞ্জন।'

'বল।'

'স্পাই কাকে বলে জান?'

'স্পাই! সে কি? এ প্রসঙ্গে তার কথা ওঠে কি করে? স্পাই!' এক নিমেষে মনোরঞ্জনের মুখ ও চোখের চেহারা বদলাইয়া গেল। তোতলাইয়া কহিল—'স্পাই? হ্যাঁ, তা জানি বৈ কি; আমাদের সব সময়ে সাবধান থাকতে হয় যাতে—

'প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ না পায়, কেমন?' তীব্র ব্যঙ্গের স্বরে রজত কহিল। 'স্পাইয়ের ব্যবসাকে লোকে ঘৃণ্য মনে করে, আমি জানি। তবু সে ব্যবসারও কিছু সাফাই আছে। কিন্তু স্পাইয়ের চাইতে শতগুণ জঘন্য যার কাজ, মানুষের কাছে এবং ভগবানের কাছে যার একটু মাত্রও কৈফিয়ৎ নেই, যে মনুষ্যনামধারী নীতিজ্ঞানহীন একটা বন্য পশুমাত্র, তাকে কি বলে জান?

'কি?' মনোরঞ্জন যন্ত্রচালিতের মত কহিল।

'এজেণ্ট প্রভোকেটর।'

রজত আসিয়া আশুতোষ বিল্ডিংস্-এর ব্যাল্‌কনিতে দাঁড়াইল। কলেজ ষ্ট্রীট দিয়া মেয়েদের এক প্রসেসান কংগ্রেস পতাকা উড়াইয়া, বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইতেছে। আশে পাশে চতুর্দ্দিকে পুলিশ, কিন্তু এই মেয়ে-বাহিনীর তাতে একটু ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। যেন তারা যুদ্ধযাত্রা করিয়াছে, গোলাগুলির ভয়ে সামান্য মাত্রও বিচলিত হইবার নয়।

রজত দেখিল,—দশ বার বৎসরের মেয়ে হইতে কুড়ি বাইশ ও ততোধিক বয়সের কত তরুণী মেয়ে খদ্দরের শাড়ির আঁচল কোমরে জড়াইয়া, মাথা উঁচু করিয়া তুলিয়া অকুতোভয়ে অগ্রসর হইয়াছে। কণ্ঠে তাহাদের স্বাজাতিকতার সঙ্গীত, হাতে ত্রি-বর্ণ রঞ্জিত পতাকা।

সহসা একটা লজ্জার তরঙ্গ রজতের প্রতি শিরায় এবং প্রতি রক্ত বিন্দুতে ছুটিয়া গেল, মজ্জার মধ্যে পর্য্যন্ত তাহা প্রবাহিত হইয়া চলিল। ছি, ছি, রজত না পুরুষ; সে না শক্তিমান বলিয়া গর্ব্ব বোধ করে! অথচ এই মেয়েরা যে আজ তাকে স্পষ্ট ব্যঙ্গ করিয়া গেল, শত ধিক্কার দিয়া গেল। ওরা দুর্ব্বল, ওরা কোমল, ওরাও আজ মাতিয়া উঠিয়াছে, ওরাও আত্মত্যাগের জন্য অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে;—আর পুরুষ হইয়া রজতই শুধু দাঁড়াইয়া রহিল: এই বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া সে শুধুই ঢেউ গুনিতেছে! ছি, ছি, এই কি তার পৌরুষ! এই কি তার আদর্শবাদ! এই কি জীবনে পদ্মার আশীর্ব্বাদের পরিণতি!

রজতের চোখের সমুখের রাস্তা, জনতা, অট্টালিকাশ্রেণী সহসা ক্রমশই বিলুপ্ত হইয়া গেল, মানুষ এবং যানবাহনের

শব্দ কোলাহল শ্রবণ হইতে বিদুরিত হইল। দেখিল, জল, জল, শুধু জল। জলের ফণা বিস্তার করিয়া, ফেনিল আবর্ত্ত রচিয়া, বুদ্বুদ উড়াইয়া, হিংস্র তরঙ্গ ভঙ্গে পদ্মা শ্যামল মাটিতে আসিয়া ভীম পরাক্রমে বারম্বার আঘাত করিতেছে। দিগন্তব্যাপী চিৎকার করিয়া কহিতেছে—ভাঙ্! ভাঙ্! ভাঙ্! পদ্মার জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে রজত থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

নিচ হইতে সহসা বহুজনের মিলিত চিৎকারে রজত চমকিয়া সম্বিৎ পাইল। দেখিল, এক যুবক বাহিনী কংগ্রেসের পতাকা লইয়া সুউচ্চ নির্ঘোষে পতাকা লইয়া নগরীকে আহ্বান করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। কহিতেছে—জয়, ভারত মাতার জয়!

তাহাদের কণ্ঠে কণ্ঠে মিলাইয়া রজত চিৎকার করিয়া উঠিল—'জয় ভারত মাতার জয়।' এবং সহসা উন্মত্তের মত ছুটিতে ছুটিতে করাইডর্ এবং সিঁড়ির সারি অতিক্রম করিয়া সেই স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর মধ্যে যাইয়া মিশিয়া গেল। জয় ভারত মায়ের জয়!

ইতিমধ্যেই বিরাট জনতায় দেশবন্ধু পার্কের বিস্তৃত মাঠ অর্দ্ধেক ভরিয়া গিয়াছিল। দলে দলে নতুন স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী ও নতুন জনমণ্ডলী আসিয়া সমুদ্রে নদী স্রোতের মতন মিলিতেই লাগিল। সভা-সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে; কিন্তু আইন-ভাঙাই যাদের উদ্দেশ্য তারা এই নিষেধ মানিবে কেন। দেখিতে দেখিতে শ্যামল প্রান্তর জনসমুদ্রে রূপান্তরিত হইল। কোলাহল, উত্তেজনা, ঠাসাঠাসির অবধি নাই, অথচ প্রতিক্ষণে ইহাদের প্রকোপ বর্দ্ধিত হইয়া চলিল। রজতদের বাহিনী যখন সেই ভিড়ের মধ্যে আসিয়া মিলাইল তখন সভার কার্য্যারম্ভের উপক্রম হইয়াছে।

এই অগণিত জনমণ্ডলীর প্রান্তভাগে দাঁড়াইয়া রজত সভার প্রায় কিছুই দেখিতে পাইল না। কে বক্তা, কি বক্তৃতা, কি ব্যবস্থা, সবই তার দৃষ্টির অগোচরে রহিল। রজতের কাছে তাহাদের কোনই প্রয়োজনীয়তা ছিল না। সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সকলের সঙ্গে, তাহাদের ভাগ্যের সঙ্গে নিজ ভাগ্য সে জড়িত করিয়াছে, দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ভীরুতার বেদীতে তার আদর্শবাদকে সে বিসর্জ্জন দেয় নাই—এই অনুভূতিগুলিই তার পক্ষে যথেষ্ট। কোনও অনুশোচনা, কোনও মানসিক অশান্তি, কোনও অক্ষমতাবোধ, কোনও প্রকাশহীন লজ্জার অশ্রান্ত পীড়ন আর তার অবশিষ্ট নাই; সে যেন মুক্তি পাইয়াছে, নিজের কাছে আর নিজেকে অপরাধী মনে হইতেছে না;—এক গভীর স্বস্তিতে রজতের দেহমন যেন হাল্কা এবং তাজা হইয়া উঠিল।

এমন সময় রজতের কর্ণে যন্ত্র বর্দ্ধিত এক উচ্চ নির্ঘোষ প্রবেশ করিল। কিন্তু পরক্ষণেই অত্যন্ত হঠাৎ তাহা থামিয়া গেল। এক মিনিট কাল কোনও সাড়া শব্দই শোনা গেল না, এই অসংখ্য জনমণ্ডলী একেবারে মূক রহিল;—যেন কি একটা ব্যাপার যবনিকার অন্তরালে সংঘটিত হইতেছে, তাহা দেখা যাইতেছে না সত্য, কিন্তু তার তাৎপর্য্য এবং গুরুত্ব অতিশয় গভীর। রজত ব্যাপারটায় মনোযোগ দিবার পূর্ব্বেই এই বিরাট জনতায় সহসা বিষম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল; একটা ঠেলাঠেলি, একটা অস্বাভাবিক আলোড়নের সৃষ্টি হইল, এবং অত্যল্পকালের মধ্যে শ্রোতারা শৃঙ্খলাহীন জনতায় পরিবর্ত্তিত হইয়া হিজিবিজি মেঘের মতন সমস্ত দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। স্বেচ্ছাসেবকদের অভয়দান-বাণী শোনা গেল, শোনা গেল তাহাদের স্বাদেশিকতাসূচক ধ্বনি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উত্থিত হইল ভয় বিকৃত কণ্ঠের শব্দ, চোখে পড়িল ভীত ত্রস্ত পলায়নপর জনতার করুণ দৃশ্য—সমস্ত কিছু যেন এক মুহূর্ত্তে লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। প্রথমটায় রজত এ সকলের তাৎপর্য্যই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না,—এমনই সে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। তার পরই বুঝিল,—পুলিশ সভা এবং জনতাকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া তারপরই জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভীত জনতা পালাইবার জন্য ব্যগ্র, অথচ জনতাই জনতাকে বাধা দিতে লাগিল; হুলস্থুল বাধিয়া গেল।

পুলিশ বাহিনী জনতা বিতাড়ন করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু রজতের সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নাই; তাকাইয়া তাকাইয়া সে শুধুই দেখিতে লাগিল, কেমন অসম সাহসে নিরস্ত্র অহিংসাপন্থী কৃশকায় কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

রজত স্বেচ্ছাসেবক নয়। মাথায় ওর গান্ধী টুপি নাই, হাতে ওর ত্রিবর্ণ পতাকা নাই,—কংগ্রেসের তালিকাভুক্ত সদস্য রজত নয়। কিন্তু নাই বা হইল, কংগ্রেসের আদর্শের সঙ্গে রজতের আদর্শের তো কোনও পার্থক্য নাই। ভারতবর্ষের চিরন্তন আত্মিকশক্তির দ্বারা দেশের স্বাধীনতা অর্জনে সে বিশ্বাসী; সে দেশকে ভালবাসে, সে দেশের স্বাধীনতা চায়, দেশবাসীর কল্যাণ সে নিয়ত কামনা করে। এই কথাটাই স্পষ্ট করিয়া, দীপ্ত কণ্ঠে জানাইবার জন্য সে আসিয়াছে এইখানে; স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সহানুভূতি জানাইতে না পারিয়া তার আদর্শবাদী মন অশান্তির বেদনায় পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত ছটফট করিয়া মরিতেছিল;—তাই সে আসিয়াছে নিজের ব্যথা-জর্জ্জরিত আত্মার ইঙ্গিতে, পদ্মার আহ্বানে। যাহা মহৎ, যাহা বৃহৎ তাহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে না পারিলে রজত যে বাঁচে না! তাই স্বেচ্ছাসেবকের নিষ্ঠার সঙ্গে স্বস্থানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে কহিতে লাগিল—ভারতমাতার জয়!

'হটো, হট্ যাও,'—পিছন হইতে শব্দ ক্রমশ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। রজত নড়িল না, তাকাইয়া দেখিল না। মনে মনে কহিল—স্বেচ্ছাসেবকদের যা ভাগ্য, আমারও তা হোক্। পালাইয়া গেলে আমার মন আমাকে ক্ষমা করিবে না, আমার আত্মা আমাকে ক্ষমা করিবে না, বাঁচা আমার পক্ষে আর সম্ভব হইবে না।—আমাকে এইখানে আমার জীবনধারণের জন্যই দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে; একটুও নড়া আমার পক্ষে আত্মহত্যার সমান হইবে!

সহসা অনতিদূরে অশ্বখুরের শব্দ হইল। রজত তাকাইয়া দেখিল। দেখিল, 'বেটন'-করধৃত এক পুলিশের সার্জ্জেন্ট তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া ঘোড়া ছুটাইয়াছে। মুখে তার আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, শক্তি তার অসাধারণ, অস্ত্রবল অমোঘ। সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া রজত মনে মনে কহিল—এসো, যন্ত্র এসো; আমার বাঁচার জন্য যে তোমাকে দরকার!

এক, দুই, তিন। ঘোড়ার মুখটা শরীরের কাছ হইতে আর দূরে নাই; পিঠের উপরে রজত তার ছায়াটাকে টের পাইল। অশ্বের উত্তেজনাচঞ্চল নিঃশ্বাস ঘাড় স্পর্শ করিল। এইবার, এইবার—

'ষ্টপ্!'

'লেট্ গো।'

'ইউ ক্যাণ্ট্, ইউ ক্যাণ্ট্। অ্যারেষ্ট্ হিম্ ইফ্ ইউ উড্, বাট্ ইউ ক্যাণ্ট্ ষ্ট্রাইক্ হিম্—

'ওঃ, কাম্ অন্, মিস্—'

'ইউ ক্যাণ্ট, ইউ ক্যাণ্ট্! ল ডাস্‌নট্ এলাউ ইউ ছ্যাট্।'

চকিতে রজত ফিরিয়া তাকাইল। দেখিল, অগ্নিশিখার মত একটি তরুণী বাঙালী মেয়ে ঘোড়ার মুখের লোহার কড়াটা দক্ষিণহস্তে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কহিতেছে—ইউ ক্যাণ্ট, ইউ ক্যাণ্ট। চক্ষে তার বিদ্যুৎলেখা, মুখে তার অগ্নির দীপ্তি, কণ্ঠে আদেশ। যেন মাটি ফুঁড়িয়া কম্পমান এক শরীরী অগ্নিশিখা সহসা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, মর্ত্ত্যের মাটীতে যেন অদৃশ্যলোক হইতে এক জ্যোতির্ম্ময়ী মমতা উদিত হইল। কমলারঙের খদ্দরের শাড়ি পরা, আঁচলটা দেশসেবিকার ভঙ্গিতে কোমরে জড়ান, অবিন্যস্ত কেশজাল বাতাসে বিক্ষিপ্ত; সুগৌর মুখমণ্ডলে সূর্য্যালোক গভীর দীপ্তি লইয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। সেই মুহূর্ত্তে রজত যে সমগ্রতার দৃশ্য দেখিল, তাহা মানবী নয়, তেজোদীপ্তি!

নারীর নিকট বাধা পাইয়াই হোক্, বা নিজের কাজের অন্যায্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই হোক্, সার্জ্জেণ্ট ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে ধাবমান হইল।

'এমন করে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে মার খেতে

হয়, তা কি আপনি জানেন না!' মেয়েটি বিস্ময়ের সুর কণ্ঠে মিশাইয়া রজতকে সম্বোধন করিল।

'তা জানি বৈকি।' রজত কহিল।

'তবু দাঁড়িয়ে ছিলেন! আপনি ত স্বেচ্ছাসেবক নন্।

'স্বেচ্ছাসেবকের নিদর্শন যদি গান্ধী টুপি হয়, তবে নই। নইলে স্বেচ্ছাসেবক নয় কেন?'

মেয়েটি বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—'কই, আপনাকে তো কখনও দেখিনি।'

'আপনি কি সব স্বেচ্ছাসেবককেই চেনেন?' রজত কহিল।

মেয়েটি ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিল,—না, তা নয়, তা ঠিক নয়,—তবু, মানে, যদি আপনি—, আমি আর দাঁড়াতে পারচি না—' এবং সহসা আশঙ্কা-ত্রস্ত দৃষ্টিতে দূরে তাকাইয়া সচিৎকারে কহিয়া উঠিল,—সুলোচনা, সুলোচনা, মন্দিরা,—বাঁ দিকে তাকিয়ে চেয়ে দেখ্: ছুটে যা, ওরে ছোট্—পিঠ পেতে গিয়ে দাঁড়া—

'তুমিও এসো, সুমিত্রা-দি।' একটি মেয়ে চেঁচাইয়া কহিল।

'কেন আপনারা আমাদের এমন করে আড়াল করে দাঁড়াবেন?' রজত সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিল। 'এতে আমাদের অপমান হচ্ছে না?'

মেয়েটি প্রস্থানোদ্যত হইয়াছিল। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—অপমান? কেন?

'আপনি আমার অপরিচিতা,' রজত কহিল, 'কিন্তু রহস্যের ছায়া দেখছি আপনার মধ্যে, যুদ্ধের উন্মাদনা এবং ব্রতসাধনের দীপ্তিতে আপনি এমন অদ্ভুতরূপে প্রকাশ পেয়েছেন যে অপরিচয়ের কুণ্ঠা আপনার কাছে না করলেও চলে। কিন্তু মেয়েরা আমাদের লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচালে আমাদের পৌরুষ তাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে না; এবং যাদের কাছ থেকে আপনারা আমাদের আড়াল করছেন, তাদের কাছে এজন্য আমাদের সম্মান বর্দ্ধিত হয় না।'

'কিন্তু আইনের নামে যে জন অবৈধতার আশ্রয় নেয়, সে কোন্ গৌরবের কাজটা করচে?'

'সেটা দেখার ভার তাদের, আমাদের নয়।'

'কিন্তু আমরা তো শাস্ত্র আওড়াচ্চি না, আমরা অহিংস যুদ্ধ করচি।' মেয়েটি দৃঢ় স্বরে কহিল।

'কিন্তু আমাদের যুদ্ধ যুদ্ধ নয়; এ সত্যাগ্রহ।'

'বেশ, তবে আপনি দাঁড়িয়ে মার খান্', মেয়েটি কহিল। 'যারা মার খাওয়া পছন্দ করে না, তাদের আমি সাহায্য করতে যাই।' বলিয়া আর বাক্যব্যয় না করিয়া দাবাগ্নি শিখার মত ত্রস্তগতিতে ভিড়ের দিকে ছুটিয়া গেল, এবং পলকের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

রজত বিস্ময় এবং সম্ভ্রমে হতভম্ব হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল—একটু নড়িল না, অগ্রসর হইয়া একবার এই রহস্যময়ী তরুণীর অদ্ভুত কার্য্যাবলী প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করিল না। সমস্ত ঘটনাটা একটা অলীক স্বপ্ন বলিয়া তাহার নিকট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মনে হইল, হয়তো এমন একটা ঘটনা কোনও দিন মনে মনে রচনা করিয়াছিল; কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে বাস্তব এবং কল্পনার সীমারেখা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সে টের পায় নাই।

মিছিলকারীদের দলে যোগ দেওয়া, দেশাত্মবোধক উচ্চধ্বনি করিতে করিতে কলেজ ষ্ট্রীট হইতে দেশবন্ধু পার্ক পর্য্যন্ত নিজের প্রায় অজ্ঞাতসারে চলিয়া আসা, বিপুল জনতার সমাবেশ এবং বিশৃঙ্খল হইয়া ইতস্তত পলায়ন, পুলিস সার্জ্জেন্টের আক্রমণ, ঘোড়ার নাকের নিঃশ্বাস—সবই রজতের কাছে সহসা অবাস্তব বোধ হইতে লাগিল।

সুমিত্রা! সুমিত্রা! স্বপ্নের মধ্যেও স্বপ্ন! কোন্ উপন্যাসে পড়িয়াছি এই নাম? এই চরিত্রটি কে সৃষ্টি করিয়াছে? কেমন করিয়া রজত আসিয়া উপস্থিত হইল দেশবন্ধু পার্কের এই শ্যামল ঘাসের উপর? এইখানে দাঁড়াইয়া এই অদ্ভুত স্বপ্ন কখন্ দেখিতে আরম্ভ করিল?

হষ্টেলের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া তবে রজত টের পাইল সে বাস্-এ বসিয়া আছে। সে সজাগ হইয়া সচেতন হইয়া উঠিল। কিন্তু তারপর সহসা সমুখের বেঞ্চটাতে দৃ

পড়িতেই সে চমকাইয়া উঠিল,—মনে হইল, পুনর্ব্বার বুঝি স্বপ্ন দেখা সুরু হইবে।

দেখিল, একদল তরুণী মেয়ের মাঝখানে সহাস্য বদনে বসে আছে সুমিত্রা,—কৌতুকে গল্পে মশগুল হইয়া আছে। মূর্ত্তি তার বদ্‌লাইয়া গিয়াছে; অসমসাহসিকা, তেজোদৃপ্তা, স্ফুরিতঙ্কণা অগ্নিশিখার মত মেয়ে আর নয়, এ তার অন্য রূপ। রৌদ্রের বদলে সুমিত্রার মুখমণ্ডলে উঠিয়াছে জ্যোৎস্না; কাঠিন্যহীন, উদ্বেগহীন, লীলাময়ী তরুণীমূর্ত্তিতে সে প্রকাশিত হইয়াছে। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে এই পরিবর্ত্তন যেমন বিস্ময়কর, তেমনি অদ্ভুত। কল্পনাকে যেমন ইচ্ছামত অদলবদল করিয়া লওয়া যায়, এ-ও যেন তেমনি। স্মিতহাস্যময়ী, বুদ্ধিপ্রদীপ্ত-নয়না, কৌতুকপরায়ণা এই মেয়েটি পুনর্ব্বার রজতকে চমক লাগাইয়া দিল।

একবার রজতের বিস্ময়াপন্ন দৃষ্টির সঙ্গে মেয়েটির দৃষ্টিপাত হইয়াছিল; কোনও অস্বাভাবিক অনাবশ্যক দ্রুততার সঙ্গে সে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া লয় নাই। পরিচয়ের কোনও চিহ্ন তাহাতে ছিল না, অপরিচয়েরও নয়;—সে যেন চৈত্র জ্যোৎস্নার অপক্ষপাত চাহনি। রজত জীবনে প্রথম দিন নিজেকে বিব্রত বোধ করিল। সুমিত্রার সঙ্গিনীরা উপস্থিত না থাকিলে রজত আজ তার ক্ষণিক পূর্ব্বের রূঢ়তার জন্য ঐ অদ্ভুত মেয়েটির কাছে যাইয়া অনায়াসে ক্ষমা চাহিতে পারিত।

বাস্ কলুটোলার মোড়ে আসিয়াছে। স্বপ্নগ্রস্তের মত টলিতে টলিতে রজত নামিয়া পড়িল

সাত

সারাটা রাত রজত ঘুমাইতে পারিল না। সুমিত্রা! সুমিত্রা! কোথা হইতে উদিত হইলে সুমিত্রা এমন অকস্মাৎ, এমন রহস্যমধুর রূপে! চৈতন্যের মধ্যে এ কী বিচিত্র স্বপ্নের সূত্রপাত হইল! কোন্ মহাকাব্যের ছন্দোবদ্ধ সুরঝঙ্কৃত রহস্যলোক হইতে ছিটকাইয়া আসিয়া পড়িল এমন মধুর নাম! সুমিত্রা! সুমিত্রা! মনের মধ্যে এ কী অবর্ণনীয় অনুভূতির স্পন্দন সুরু হইল! এ কি মায়া? এ কি স্বপ্ন; এ কি মতিভ্রম?—উত্তর চরিতের ভাষায় রজত মনের কাছে শুধুই গুঞ্জন করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল।

চৈত্রজ্যোৎস্না রাতে রাজার চিত্রশালায় যার দেখা পাওয়ার কথা ছিল, আজ কি জনসমুদ্রের বিক্ষুব্ধ আলোড়নের মধ্যে, ক্ষোভতিক্ত লগ্নে, সংগ্রাম-রূঢ় পট-ভূমিকায় তার আবির্ভাব হইল? নিশ্চয়, নিশ্চয় আর সন্দেহ করিয়া ফল নাই। প্রতি জন্মে, প্রতি জন্মান্তরে চৈতন্যের মধ্যে সে অস্পষ্ট ছায়ার মত আত্মগোপন করিতে চাহিয়াছে, প্রতিবার সে ধরা পড়িয়াছে চঞ্চল পবনে, রজনী-গন্ধার গন্ধে—চন্দ্রালোকের যাদুমন্ত্রে তার যবনিকা উড়িয়া গিয়াছে। আজ কি সেই চিরন্তনীরই প্রকাশ হইল নতুন আয়োজনের মধ্যে, নতুন রূপে?

সুমিত্রা! সুমিত্রা! কোথায় পাইয়াছে সে অমন নাম, কোথায় পাইয়াছে অমন দুটী চোখ, অমন পরিবর্ত্তনশীল অপূর্ব্ব মুখমণ্ডল, অমন অগ্নিশিখার মত তেজোদৃপ্ত, ভঙ্গিশীল দেহবল্লরী?

বৃন্তহীন পুষ্প সম আপনাতে আপনি বিকশি'
কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশী?

মেয়েদের সঙ্গে মিশিবার বহু সুযোগ রজতের হইয়াছে। কত মেয়ে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বাড়াইবার জন্য কত আগ্রহ দেখাইয়াছে। কিন্তু রজতের মনে কোনও দিন কোনও দাগ পড়ে নাই। এক এক সময়ে তার মনে হইত, হয়তো জীবনে কোনও দিনই তার নারী-সাহচর্য্যের প্রয়োজন হইবে না; এমন কি কখনও কখনও মেয়েদের প্রতি সে গভীর বিতৃষ্ণা বোধ করিত। নারীর চাইতে পুরুষ বন্ধু তার কাছে চির-কালই বেশি প্রিয়; পুরুষদের মধ্যে কোনও অস্পষ্টতা নাই—পুরুষদের সে বিশ্বাস করে, ভালবাসে।

কিন্তু তার 'এমোশানের' রাজ্যে আজ এ কী অন্তর্বিপ্লবের সাড়া পড়িয়াছে! অজ্ঞাতকুলশীলা, অপরিচিতা, অজানা এই মেয়েটি কি অসম্ভব্য জোর লইয়া মনের মধ্যে একেবারে হুড়-মুড় করিয়া আসিয়া পড়িল। এ যেন পদ্মার জোয়ার: অকস্মাৎ দুর্নিবার আবেগে অজানা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তটের উপর আছড়াইয়া পড়িল;—ভঙ্গুর মাটি তাহাকে

আটকাইয়া রাখিবে কতক্ষণ! আজ এই অদ্ভুত হৃদয়াবেগের নিকট রজত নিজেকে একান্ত ভঙ্গুর বলিয়া বোধ করিল। সুমিত্রা! সুমিত্রা! কোথা হইতে এমন অকস্মাৎ তুমি উদিত হইলে?

একটা অখণ্ড স্বপ্নের মধ্যে কয়টা দিন কাটিয়া গেল। অবিশ্বাস্য সুর এবং অবর্ণনীয় রঙের ঝলমলানিতে রজত বহির্জগত বিস্মৃত হইল।

এই পাগলামি দমন করিতে রজতের বেশ কয়দিন লাগিল। হঠাৎ প্রেমে পড়া কলেজ-জীবনের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপ; এইরূপ হাস্যকরতায় রজত চিরকালই কৌতুক বোধ করিয়াছে। দলবল লইয়া এই দুর্ব্বলতার উপরে ব্যাপকভাবে হাস্য এবং কৌতুক কত যে বর্ষণ করিয়াছে, তার ইয়ত্তা নাই। তাই এই অবিশ্বাস্য রঙিন দিনগুলি ব্যাপিয়া মনে মনে যতই সে ইন্দ্রধনু রচনা করিয়া থাকুক, বর্ণনাহীন, গন্তব্যহীন, অস্তিত্বহীন পথে যতই না অভিসারে চলুক, সামান্য চাপল্যও সে দেখায় নাই। সুমিত্রার সন্ধানে মিটিং-এ যাওয়াটাকে সে অপরাধ মনে করিয়াছে; প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিজের মনে সংশয় উপস্থিত হওয়ায় ইচ্ছাসত্বেও একাধিক রাজনৈতিক সভায় যোগ দিতে পারে নাই।

অবশেষে সে একটু আত্মস্থতা লাভ করিবার পর সে মনে মনে খুব একচোট্ হাসিয়া লইল। আচ্ছা, সত্য সত্যই সে যদি প্রেমে পড়ে, তবে কি করিবে? কবিতা লিখিবে? সনেট? প্রেমে পড়িয়া যুগ যুগান্তের বহুলোক এই চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখিয়াছে। তবে যারা হৃদয়াবেগ এত অল্প পরিসরের মধ্যে আটকাইতে পারে নাই, তাদের কথা স্বতন্ত্র! প্রেমের স্তুতি যে অল্প পরিসরের মধ্যে ইতি করিতে হইবে, কবিগুরুরা তেমন কোনও নির্দ্দেশ দেন নাই। সিরিনেড্! প্রেয়সীর জানালার তলায় কাঁটাগোলাপের বনে দাঁড়াইয়া দ্বিপ্রহর রাত্রে ভাব-বিহ্বল প্রেমিকের স্তুতি গান! ছি ছি! তা সম্ভব নয়; পদ মিলাইবে রজত কেমন করিয়া! তবে, প্রেম নাকি অসাধ্যসাধন করাইতে পারে—হা হা! অন্তত; গদ্য-কবিতা লেখা যাইতে পারে! এক পাতা গদ্য লিখিয়া লাইনগুলি ইচ্ছামত অসমানভাবে সাজাইয়া দিলেই হইল! আর কি পাগলামি করে লোকে? সেও কি সে সকল আরম্ভ করিবে? প্রেম একটা অদ্ভুত ব্যাধি বটে, মানুষকে আচ্ছা বাঁদর-নাচ নাচাইয়া লয়!

এটা নিশ্চিত, রজত অপরিচিতার খোঁজে ঘুরিয়া বেড়াইবে না। যে অপরিচয়ের মধ্যে সুমিত্রা গোপন ছিল, সেখানেই সে থাকিবে। শুধু রজতের মনের এক অজ্ঞাত কোণায় এক অদ্ভুত আবেগের ক্ষীণ একটু স্মৃতি অবশিষ্ট থাকিয়া তার অহঙ্কারকে চিরকাল নমিত করিয়া রাখিবে। জীবনের কত মুহূর্ত্ত বিদ্যুতের মত ক্ষণস্থায়ী কত অদ্ভুত আবেগ, কত অপূর্ব্ব অনুভূতি, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব পুলকানন্দ বহন করিয়া আনে, যার চিরস্থায়িত্ব আশা করাই বাতুলতা। কিন্তু তাহাদের মিথ্যা বলিয়া অভিহিত করিতেও মন সাড়া দেয় না। মহাকালের অন্তহীন পথে মানুষের যাত্রা: সে পথের চিরনতুন পরিবেশ এবং নিত্য নব আবিষ্কার ও আনন্দের মধ্যে মানুষের সমাপ্তিহীন তীর্থযাত্রা চলিয়াছে। সুমিত্রার জন্য মন যদি তার একটুকাল স্বপ্ন রচনা করিয়া থাকে, কেন সে লজ্জিত হইবে? পথচলার ইতিহাসে এ তো স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু স্বপ্নকে স্বপ্নের চাইতে বেশি মূল্য সে যেন না দেয়,—হাস্যকর ও সমাহিতের মধ্যে যে ক্ষীণ অস্পষ্ট রাজ্যটি বর্ত্তমান, সেটা যেন সে কখনও লঙ্ঘন না করে, তবেই হইল—রজত মনে মনে বলিতে লাগিল।

সাত দিন পরে রজত গেল সত্যানন্দবাবুর বাড়িতে দুপুরের আহারের নিমন্ত্রণে। স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তার খদ্দরের পরিচ্ছদ দেখিয়া মন্দালিকা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে। কপট শাসন করিয়া রজত কহিল—অমন করে হাসিগুলি গেলা হচ্ছে কেন? প্রকাশ্যভাবে হাসতে কেউ মানা করছে না। কিন্তু কারণটা কি শুনি?

মন্দালিকা কোনও বাচনিক জবাব দিল না; তার হাসিটা বরঞ্চ আরও কিছু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

রজত কহিল,—খদ্দর পরাটা কারুর একচেটিয়া নয়, সেটা ভালো হোক্, মন্দ হোক, সবারই মনে রাখা উচিত।

মন্দালিকা প্রতিবাদস্বরূপ কহিল,—বাঃ রে, তাই বুঝি আমি বল্লুম ?

'নিশ্চয়ই বল্লে, একশো বার বলেছ। আকার এবং ইঙ্গিত ভাষারই অন্তর্গত—সিডিশ্যানের সেক্‌শানে স্পষ্ট করেই তা লেখা আছে।' রজত ঈষৎ কৌতুকের সুরে কহিল। কহিল,—দেখতো, মন্দ, কি চমৎকার হয়েচে এই পাঞ্জাবিটা ; কেবল আমার ধোপা ছাড়া আর সব্বাই এর প্রশংসা করে। তুইও করবি, যদি না তোকে ওপরের ছেঁড়া বোতামটা শেলাই করে দিতে বলি। কিন্তু আমি বলব।

মন্দালিকা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল,—দাঁড়াও, আমার সবগুলিই ছোট ছোট কাপড় শেলাই করবার স্ঁচ ; আগে একটা চটের স্ঁচ আনিয়ে নিই—

'থাম্ থাম্, আর গর্ব্ব করতে হবে না।' রজত কহিল। স্ঁচ দিয়ে মাকড়শার জাল ফুঁড়তে আমিও পারি। এ পাঞ্জাবি ফুঁড়তে ঢের বেশি কৃতিত্বের দরকার।' বলিয়া হাসিয়া পাঞ্জাবির দুই প্রান্তভাগ ঈষৎ টানিয়া ছাড়িয়া দিয়া পাঞ্জাবির জন্য কৃত্রিম গর্ব্ব প্রকাশপূর্ব্বক সত্যবতীর উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

সত্যবতী কহিলেন,—কী অসহ্য গরম দেখেচ তো, রজত ; এ আর সয়া যায় না। আঃ,—পাখাটা যেন চলেও না ছাই। ওরে ও গয়ারাম, শুনচিস্—

রজত আগাইয়া গিয়া কহিল,—পাখার রেগুলেটারই আমিই টেনে দিচ্চি।

'তা দাও, তুমিই দাও, বাবা। এ গরম মানুষের দেহে সয় ? আর ইরি মধ্যে তোমরা সুরু করেচ কি, শুনি ? দিব্যি খুসিমুখে চট পরতে সুরু করলে ! অবাক্ কাণ্ড ! ও কাপড় একদণ্ডও সও কি করে ? ঐ যাঃ, মাছের চপ্‌গুলি যে এবার ভাজতে বলতে হবে। ওরে, ও গয়ারাম !—সখ করে এক আধ দিন পর তো পর ; বেশি কিনে কিন্তু পয়সা জলে ফেলো না। এমন মোটা কাপড় কি ভদ্রলোকের চামড়ায় চলে ! ও হলো গিয়ে তোমার—। স্বদেশী জিনিষ কেনা ভাল, কিন্তু নিজেকে বাঁচিয়ে তবে সব কিছু। আদরে যত্নে বড় হয়ে, এ কি কারো পোষায়। ঈস্, ওগুলির দিকে চোখ পড়লেই গা কাঁটা দিয়ে উঠেচে। ওরে, ও গয়ারাম, বাইরে বসে বসে—

রজত মুচকিয়া হাসিয়া কহিল,—আপনার জন্মদিন কবে না, মাসিমা ? কিন্তু এই মাসেই, আমার মনে আছে।

খুসি হইয়া সত্যবতী কহিলেন,—দেখো একবার ছেলের কাণ্ড। কিছু যদি ভোলো ! আজ হলো গিয়ে মাসের এগারো দিন, তেইশে হবে আর কদ্দিন হলে ? হ্যাঁ, তেইশে। খুকী—ও মন্দা, কোথায় গেলি, শুনচিস্—

মন্দালিকা বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গিয়াছিল ; ঘরে আসিয়া ঢুকিল। নীল রঙের চমৎকার একটা খদ্দরের শাড়ি পরা ; গায়ে ঐ রঙের খদ্দরের ব্লাউস্। এই সামান্য সাজে তাকে এমন সুন্দর দেখা গেল যে রজত এবং সত্যবতী একই সময়ে তার দিকে সবিস্ময়ে তাকাইল।

রজত কহিল,—অনুকরণ কাকে বলে, মন্দ ?

সত্যবতী কহিলেন,—আরম্ভ করলি কি তোরা। কাণ্ডটা কি শুনি ? যা দিয়ে দরজার পর্দ্দা হতে পারে, অনায়াসে তাকে গায়ে তুলচিস্ ! সূয্যিঠাকুর কি তোদের কাছে হার মান্‌ল !

মন্দালিকা কৌতুক করিয়া কহিল,—হ্যাঁ মানলই তো। খদ্দর ভেদ করে রোদ ঢুকবে কি করে ?

'একবার', সত্যবতী শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, 'মেয়ের কথার ছিরি দেখলে, রজত ! এর পরে তো জেলেও যেতে চাইবি।'

মন্দালিকা না-দমিয়া কহিল,—তবে তো রজত-দাও চাইবে।

'হ্যাঁ, চাইবে, তোকে বলেচে। রজত-দার কি অভাবটা পড়েছে, শুনি, যে জেলে না গেলে চলচে না। জেলে যাবে। যত অলুক্ষণে কথা ! রজত-দার আর কাজ নেই—

রজত কহিল, আপনার জন্মদিনে এইবার আশ্চর্য্য একটা উপহার দেব, মাসিমা। কিন্তু যতই চেষ্টা করুন, কিছুতেই আপনি কল্পনা করতে পারবেন না, কি সে জিনিস—এমন অভূতপূর্ব্ব।

সত্যবতী কহিলেন,—খবরদার বলচি, রজত, এবার যদি তুমি অতগুলো টাকা আমার জন্য নষ্ট কর, তবে সে

উপহার আমি কিছুতেই নেব না বলচি। আগের বারের সেই—

'আপনার কোনও ভয় নেই ; এবার জোর দু'তিন টাকা নষ্ট করবো—তার এক কাণাকড়িও বেশি নয়।' রজত ভালো মানুষের মত কহিল।

শুনিয়া সত্যবতী আশ্বস্ত এবং খুসি হইলেন। ঈষৎ কৌতুক করিয়া প্রশ্ন করিলেন—কিন্তু দু'তিন টাকায় কি আশ্চর্য্য জিনিষ দেবে ?

'খদ্দরের শাড়ি'—রজত যথাসম্ভব গম্ভীর ভাবে কহিল।

শুনিয়া সত্যবতী আতঙ্কে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। মর্ম্মান্তিক ভীতির সঙ্গে কহিলেন,—ওরে সর্ব্বনাশ, এ কি কথা। অ্যা, বলচ কি তুমি ? কথা শোনো, এমন শত্রুতাটি আমার সঙ্গে ক'রো না, রজত। বুড়িকে আর এ শাস্তি দিও না, বাবা। —ওরে গয়ারাম, শুনচিস্—। ঐ যাঃ, চপ্‌গুলি এখন না ভাজলে—। কদ্দিন পরে তো তবে লোকে ছালাও পরতে আরম্ভ করবে—' বলিয়া সভয়ে বোধ করি বা চপের উদ্দেশ্যই দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

ইতিমধ্যে সোফাটার মধ্যে উপুড় হইয়া পড়িয়া মন্দালিকা অদম্য হাসিতে লুটাপুটি খাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। খদ্দরের ভয়ে মায়ের মুখমণ্ডলের যে চেহারাটা হইয়াছিল সেটা যতই তার মনে পড়িতে লাগিল, হাসির তোড়ে ততই সে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। সেই হাসির বেগ দমন করিয়া যখন সে সোজা হইয়া দাঁড়াইল, তখন তার দুই চোখ দিয়া কান্না গড়াইয়া পড়িতেছে—এমন তীব্র তার হাসি!

সারাটা দুপুর রজত মন্দালিকার সঙ্গে ক্যারম্ খেলিয়া কাটাইল। বেচারী মন্দালিকা যতই হারে, ততই সে পালাইতে চায়। কিন্তু রজতও নাছোড়বান্দা। অবশেষে মন্দালিকাকে অসম্ভবভাবে অসংখ্যবার হারাইয়া দিয়া সে কহিল,—যাঃ, এইবার পালা। এই রকম ভাবে জগতের সমস্ত মেয়ে সমস্ত পুরুষের কাছে হেরে যায়,—জানিস্!

মন্দালিকা কহিল,—ঈস্, তাই না, আরও কিছু।

'হ্যাঁ, তাই', রজত কহিল। 'একশোবার তাই। তোমরা কি পার, জানো ?'

'কি ?'

'চা বানাতে। অতএব যাও, চায়ের জোগাড় কর গিয়ে। শুধু মাত্র,—কি বলে তোমাদের চায়ের বিজ্ঞাপনে—এই 'পারিবারিক পানীয়' পান করেই এবার আমি পালাব।'

'আর চা যদি না করি ?'

'পিঠে তাল পড়বে।'

'তবু যদি সয়ে থাকি ?'

'তবে বুঝব, তুমি প্রকৃতই বঙ্গললনা,—কিল খেয়ে কিল হজম করতে পার।'

সত্যবতীর ইচ্ছা ছিল, চায়ের সময়ে সাড়ম্বরে উপস্থিত থাকিয়া খদ্দরের অপকারিতা সম্বন্ধে এক নিবন্ধ আওড়াইবেন। কিন্তু বিকাল পড়িবার ঠিক পূর্ব্বেই রজত চুপে চুপে মন্দালিকাকে দিয়া চা প্রস্তুত করাইয়া খাইয়া চম্পট দিল।

দুপুরের প্রশস্ত নিদ্রার পর নিচে নামিয়া কাণ্ড দেখিয়া তো সত্যবতী মেয়ের উপরে খড়্গহস্ত। কিন্তু মন্দাও দমিবার মেয়ে নয়। কহিল,—বাঃ রে, আমি কি করব ? নিজে আমাকে বল্লেন চা করতে, আমি বলব,—না আমি করবো না ? চা না খেয়ে তো আর যাননি ; তবে আমি শুধু শুধু গাল খেয়ে মরচি কেন ?

'গাল খেয়ে মরচি কেন!' সত্যবতী রাগতস্বরে কহিলেন, 'ওর না আছে মা, না আছে বাপ। একটু আদর-যত্ন পেতে চায়, তা কি পাবার জো আছে! নাঃ, ঘাট হয়েচে, জন্মের শিক্ষা হয়েচে! এই বংশের ইতিহাসে কেউ যা করেনি, আমি তাই করতে গেলুম ; মেয়েকে ইস্কুলে পড়িয়ে এখন তার উপযুক্ত ফল ভোগ করচি—'

মন্দা রুষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া কহিল,—কেবলই চেঁচাচ্ছ! কেন, হয়েছে কি ? মহাভারতটা এমন কোন্ অশুদ্ধ হয়েচে, শুনি ?

সত্যবতী নেপথ্যবাসী সমস্ত অশরীরী জীবদের সাক্ষ্য মানিয়া সশব্দে আক্ষেপ জানাইয়া কহিলেন,—শোন, একবার

মেয়ের কথাটা সবাই শোন। বল্লেন,—মহাভারত এমন কোন্ অশুদ্ধ হয়েচে! ওরে, হাবা মেয়ে, চা কি আবার একটা খাবার হলো নাকি? এই যে আমি বাতের শরীর নিয়ে উনানের আঁচে দুপুর পর্য্যন্ত পুড়ে সর ভাজলুম, গজা বানালুম, পান্তুয়া করলুম, এ সব কার জন্যে? বলে কিনা, চা করে' দিয়েচি! বলি, চা দিয়ে হয় কি? খাবার গেলার সাহায্য করে বলেই না,—ওরে, ও গয়ারাম, শুনচিস মুখপোড়া সমস্ত খাবার ফেলা গেল—

'হ্যাঁ, ফেলা গেল না আরও কিছু। সব আমি শেষ করচি দাঁড়াও' বলিয়া মন্দালিকা সকৌতুকে সত্যবতীর এত পরিশ্রমের মিষ্টিগুলির দিকে অগ্রসর হইল।

সত্যকথা বলিতে কি, মন্দালিকা নিজেও একদিক দিয়া বড় হতাশ বোধ করিতেছিল, এবং সেই হতাশা জটিল মনস্তত্ত্বের অন্তর্গত, কেননা, তার ব্যাখ্যা সহজ নয়। ঘটনাটা এই প্রকার:—চা খাইতে খাইতে রজত কহিয়াছিল,—'এই মন্দ, এখন গান গাইবি তো?' মন্দা জবাব দেয়,—'ঈস্, কিছুতেই না।' রজত একটু ভাবিয়া কহিয়াছিল, 'আচ্ছা, আজ থাক, আজ একটু বেরুবো।' আর পীড়াপীড়ি না করিয়াই রজত উঠিয়া গিয়াছিল।

পুনর্ব্বার অনুরুদ্ধ হইলেও হয়তো মন্দা গাহিত না; কিন্তু যে অনুরোধ আসিল না, তার জন্য এক গভীর আক্ষেপে এই কিশোরী অদ্ভুত মনোবেদনা বোধ করিতে লাগিল। রজত-দার এমন কি তাড়া যে গান শুনিবার জন্য একটুও জবরদস্তি করিবে না! এমন রাগ ধরিতেছে রজতদার ওপরে যে আর বলা যায় না। ঈস্, কত না কাজ!—

মিষ্টি এবং মায়ের বকুনি একসঙ্গে শেষ করিয়া মন্দালিকা উপরে উঠিয়া আসিল। দোতলার ছোট ব্যাল্‌কনিতে দাঁড়াইয়া খামকা সুদূর পথের দিকে চাহিয়া রহিল। বড় ক্লান্ত বোধ হইল; ঠিক করিল, চুল আর আজ বাঁধিবে না।

মা বিশেষ করিয়া তার জন্য খাবার তৈরি করিয়া রাখিয়াছে, এই কথা রজতদাকে জানাইলে সে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করিত। কিন্তু মন্দা মায়ের এই মহৎ প্রচেষ্টার কথা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল; এমন কি জিনিষগুলি না দেখিয়া কেবল মাত্র শুনিলে সে কথা তার পক্ষে প্রত্যয় করা মুস্কিল হইত। 'বাঃ রে, আমার দোষ কি! আমি বুঝি কিছু জানতাম। না খেয়েচে, বয়ে গেচে'—মন্দালিকা মনে মনে বারম্বার বলিল। কিন্তু তবু সে স্বস্তি পাইল না।

নিজের উপর রাগিয়া মন্দালিকা পড়ার ঘরে প্রবেশ করিল। দিন-পঞ্জিকার অঙ্কগুলির উপর শুভ্র সরু তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া আগামীকল্য সোমবার হইতে পরবর্ত্তী রবিবার পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলি গুনিয়া দেখিল। তারপর অকস্মাৎ চেয়ারটায় যাইয়া বসিয়া পড়িয়া টেবিলে ঝুঁকিয়া সশব্দে সুরু করিল—অস্তি কস্মিংশ্চিৎ বনোদ্দেশে দীর্ঘরাব নাম—

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুবোধ বসু

কেপ কলোনির কথা

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

কেপ কলোনি বা কেপ-প্রভিন্স রহস্যময়ী আফ্রিকার সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষিণে অবস্থিত। দক্ষিণ আফ্রিকার রাজ্য-সমূহের মধ্যে ইহা প্রধান স্থান পাইতে পারে। এই রাজ্যের উত্তরে অরেঞ্জ নামক নদ এবং পূর্ব্বে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে রুদ্র-মূর্ত্তি মহাসমুদ্রের বিরাট বারিরাশি বিরাজিত। ইহার পূর্ব্বে ভারতমহাসাগর উত্তাল তরঙ্গবাহু উত্তোলন পূর্ব্বক ভাব-মত্ত ভক্তের ন্যায় নৃত্য করিতেছে। পশ্চিমে আতলান্তিক মহাসমুদ্রের অনন্ত অম্বুরাশি গুরুগম্ভীর গর্জ্জন-গীতি গাহিয়া বিস্ময়-স্তম্ভিত অম্বরকে আলিঙ্গন করিবার জন্য সাগ্রহে বীচি-বাহু বিস্তৃত করিতেছে। চাতালের মত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত প্রান্তরসমূহ এবং মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ-দেহ পর্ব্বতপুঞ্জ —ইহাই এদেশের স্বাভাবিক স্বরূপ। এই পর্ব্বতশ্রেণীগুলি মহাদেশের প্রান্ত পর্য্যন্ত সমরেখায় প্রসারিত। "ভেলদৎ" আখ্যায় অভিহিত উচ্চ ভূমির দক্ষিণে প্রসারিত এই সকল প্রান্তর দেশীয় ভাষানুসারে "কারু" নামে খ্যাত। বৃক্ষ বর্জ্জিত রুক্ষ প্রকৃতির জন্যই ইহারা এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। অরেঞ্জ নদের উভয় তীরে স্থাপিত রেলপথে ভ্রমণ করিবার সময় আমরা পার্শ্বে দূরদিগন্ত চুম্বিত বৃক্ষবিহীন সমতল প্রান্তর আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রসারিত দেখিয়াছিলাম। অবশ্য গ্রীষ্মের সময়েও একপ্রকার পীতবর্ণ তৃণরাজির দ্বারা এই সকল প্রান্তর আচ্ছাদিত থাকে। ভেলদৎ আখ্যায় অভিহিত উচ্চ স্থানগুলি এবং উহাদের শীর্ষদেশে বিরাজিত ঝোপের শ্রেণী দেখিলে কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ মণ্ডিত মস্তক আফ্রিকান কাফ্রীদের আকৃতির সহিত সাদৃশ্য বিস্ময় উৎপাদন করে।

প্রকৃতির এই বৈচিত্র্য বিরচিত বৃক্ষবর্জ্জিত রুক্ষ মূর্ত্তি পর্য্যটকের পক্ষে বিরক্তিজনক ও দুঃখকর সন্দেহ নাই। মধ্যে মধ্যে এক একটি নিঃসঙ্গ গৃহ বিষাদ-মলিন মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া। কচিৎ কোথাও টিন-নির্ম্মিত "শান্টি"র সমষ্টি দেখা যায় উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে মেফকিং পর্য্যন্ত এইরূপ এব ঘেয়ে বা একই প্রকার দীনহীন দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল।

উত্তরে অবস্থিত যে উচ্চ ভূখণ্ড বা মালভূমিগুলির কথা আমরা বলিয়াছি উহা অতিক্রম করিলে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রসারিত প্রকাণ্ড পর্ব্বতশ্রেণী পাওয়া যায়। এই পর্ব্বত শ্রেণীর উচ্চতম শিখর কম্পাস পীকের উচ্চতা ৯ হাজার ফিট। এই পর্ব্বতপুঞ্জ এবং দক্ষিণে দণ্ডায়মান অপর একটি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত শৈলমালার মধ্যস্থলে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩ হাজার ফিট উচ্চ "গ্রেট কারু" নামক বিরাট প্রান্তর বা মালভূমি প্রসারিত। যে উচ্চতর পর্ব্বতশ্রেণীর উল্লেখ করিলাম উহা রগি ভেলদৎ, নিউ ভেলদৎ, স্নেউ ভেলদৎ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত শৈলমালার কিয়দংশ "হোয়াইট মাউন্টেন" এবং অপরাংশ "ব্লাক মাউন্টেন" আখ্যায় অভিহিত হয়

"গ্রেট কারু" অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ দিকে আরও অগ্রসর হইলে শ্বেত ও কৃষ্ণ পর্ব্বতমালা এবং উপকূলে পশ্চাতে দণ্ডায়মান অপর এক গিরিশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী "লিট্‌ল কারু" নামক প্রান্তর দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হয় এই মালভূমি হইতে অবতরণ করিলে কেপ কলোনির শস্য শ্যাম লোকালয়পূর্ণ অংশে উপনীত হওয়া যায়। বহু সমৃদ্ধ নগর ও গ্রাম এই অংশে অবস্থিত। নেত্রতর্পণ শস্য-ক্ষেত্রের পার্শ্বে এবং ছায়াশীতল তরুশ্রেণীর তলদেশে দণ্ডায়মান গোলাবাড়ীগুলি সুদক্ষ চিত্র-শিল্পীর অঙ্কিত আলেখ্যবৎ সুদর্শন। পর্ব্বতপুঞ্জ হইতে উদ্দাম আবেগে অবতীর্ণ কল নাদী নদ-নদী দৃশ্যের সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বহুগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। বেগবান বারিরাশি বাহিত বালুকার দ্বারা এই সকল নদীর মুখ প্রায়ই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

এই দেশের উপকূল রেখায় বালুকার পাহাড় পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল বালুকারাশির বক্ষে কোন কোন শাক-সব্জী জন্মিতে পারে। আমাদের দেশেও দেখা যায় কোন কোন উদ্ভিদ বালুকার মধ্যে বিশেষ বিকাশ লাভ করে। য়ুরোপের স্থান বিশেষেও রুক্ষ বালু বক্ষে তরী-তরকারি জন্মাইবার চেষ্টা সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কেপ কলোনিতে পর্য্যটন করিবার কালে আমরা ভাবুক ভ্রমণকারী অপেক্ষা বিষয়বুদ্ধিশালী পর্য্যটকই অধিক দেখিয়াছি। সকলেই যেন ব্যস্ত। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া স্বভাবের শোভা দেখিবার মত সময় বা অবকাশ যেন তাহাদের নাই। এ বিষয়ে সংশয় নাই যে কেপকলোনির অংশ বিশেষ স্বভাব-শোভায় অতিশয় সমৃদ্ধ। বিশেষ এই দেশের শৈল-শিখর ও শৈল-সানুসমূহ এবং গিরিবর্ত্মগুলির গাম্ভীর্য্যভরা সৌন্দর্য্য অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। এখানকার গভীর ও গম্ভীর গিরি-গহ্বরগুলি এবং গর্জ্জন গীতিরত ভীমকাণ্ড জলপ্রপাতসমূহও চিত্তা-কর্ষক। যাহাদিগকে অর্দ্ধমরু বলিয়া অভিহিত করা চলে এইরূপ স্থান বহু রহিলেও এই দেশে তরুলতায় পরিপূর্ণ শ্যামা বনভূমির অভাব নাই। মোটের উপর এই দেশের বিভিন্ন প্রদেশে প্রকৃতি দেবী বিভিন্ন বেশে বিরাজিত রহিয়াছেন।

পার্লিয়ামেণ্ট ভবন—কেপটাউন

এ বিষয়ে সংশয় নাই যে যেখানে সলিল সরবরাহের সুবিধা আছে সেই স্থানগুলিই শ্যামল শোভা-সম্পদে সমৃদ্ধ হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে।

এখানকার অন্যতম প্রধান অসুবিধা জলাভাব বা অনাবৃষ্টি। বৃষ্টি একেবারে হয় না তাহা নহে। মধ্যে মধ্যে এবং অংশ বিশেষে আশানুরূপ বৃষ্টি হইয়া থাকে। তবে বৃষ্টি কোন মাসে নামিবে সে সম্বন্ধে এখানে কোন স্থিরতা দেখা যায় না। কখন কখন অভ্যন্তর ভাগে এক বৎসর বা দুই বৎসর ব্যাপিয়া আদৌ বৃষ্টি হয় না বলিয়া জানা যায়। তবে সমগ্র দেশের দিক দিয়া ধরিলে প্রয়োজনানুযায়ী জলের অভাব অস্বীকার করা যায় না। এই দেশের এই নৈসর্গিক দোষ বা ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করিতেছে একটি বিশেষ কল্যাণকর গুণ। এই উপনিবেশের বিশেষত্ব ইহার উচ্চ চাতালবৎ মালভূমিগুলির বিশুদ্ধ বাতাস অতিশয় স্বাস্থ্য সঞ্চারক। বাতাসের নির্ম্মলতার জন্য এই সকল দিগন্তপ্রসারিত প্রশান্ত প্রান্তর-তলে দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিলে বহুদূরব্যাপী ব্যবধানকেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম করিব বলিয়া বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়। সমগ্র দিবস পর্য্যটন করিলে যেখানে পৌছান যায় সেইরূপ পর্ব্বতকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত বলিয়া মনে হয়।

কেপ কলোনির বক্ষে বিরাজিত এই সকল উচ্চ প্রান্তর বা স্থলভূমির বাতাস এতদূর স্বাস্থ্যকর যে ক্ষয়রোগগ্রস্ত বা যক্ষ্মারোগীর পক্ষেও পরমোপকারক হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষয়রোগী শীতের কয়েক মাস এই দেশের পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থান করিয়া যে ফল লাভ করিয়াছে তাহাকে বিস্ময়জনক বলা চলে। কেপ কলোনির মধ্যে "কারু" আখ্যায় অভিহিত স্থানগুলির আবহাওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা শুষ্ক। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে বহু উর্দ্ধে অবস্থিত এই সকল সমতল প্রান্তর বাদামি বর্ণবিশিষ্ট এবং উপলপূর্ণ হইয়া থাকে। ইহাদিগের প্রকার ধূলি-ধূসর লজ্জাবতী লতাজাতীয় তরুরাজি জন্মিতে দেখা যায়।

এই দূরদিগন্ত প্রসারিত মরুবৎ প্রান্তরের বক্ষে সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত সময়ে মায়াবীর মায়ার মত অপূর্ব্ব মহিমামণ্ডিত অপরূপ দৃশ্য অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিয়া পর্য্যটকের প্রাণে বিস্ময় বিজড়িত সম্ভ্রমের সঞ্চার করে। বিরাট বারিধি-বক্ষে সূর্য্যদেবের উদয়াস্ত যে সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রজাল রচনা করে এই সকল রৌদ্র-দগ্ধ প্রকাণ্ড প্রান্তরের বক্ষে প্রকটিত সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের শোভা তাহারই অব্যবহিত
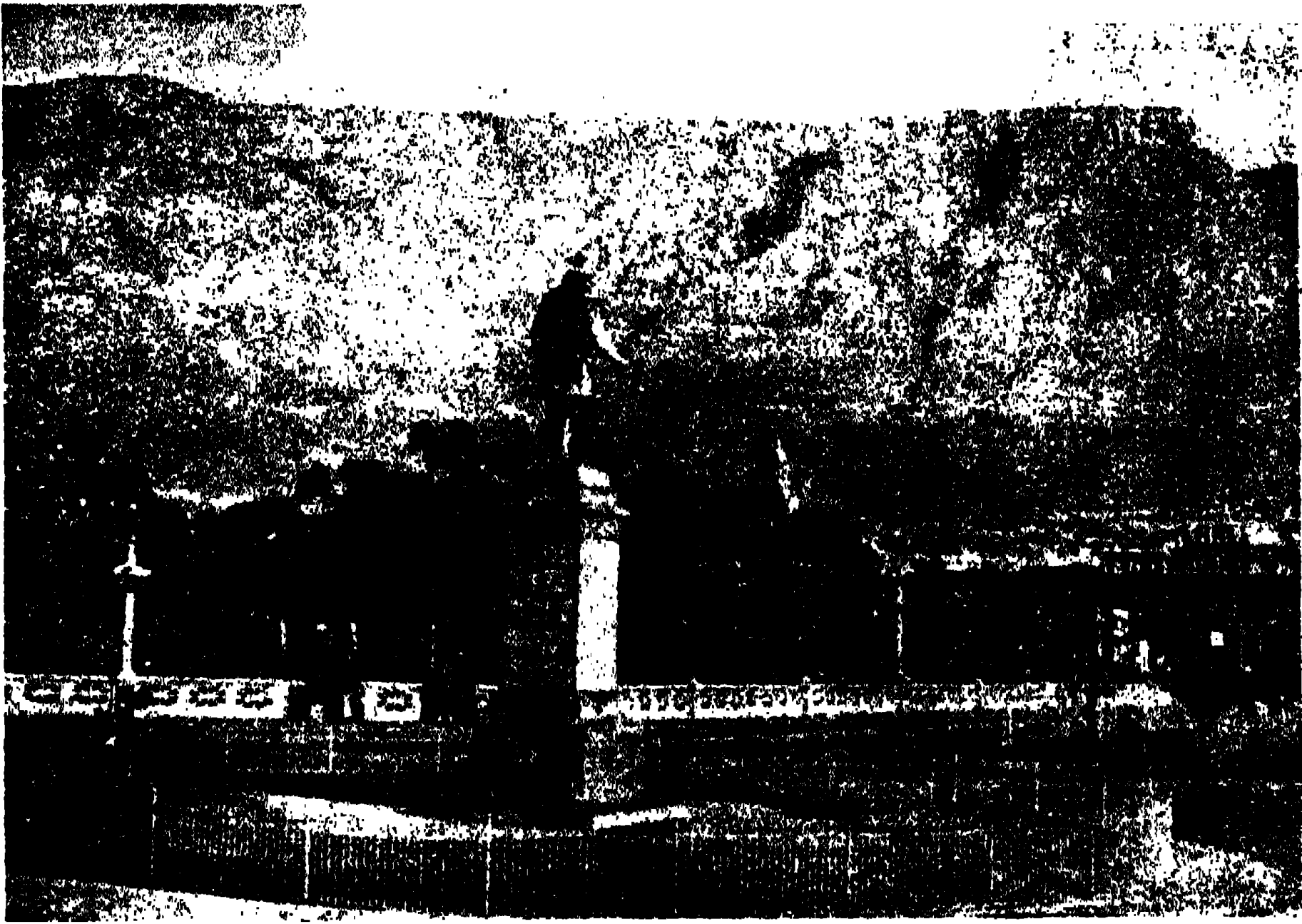
ভানরিয়েবিকের প্রতিমূর্ত্তি—কেপটাউন

রৌদ্র-দগ্ধ গাত্র ইষ্টকের মত কঠিন। যেখানে ঔপনিবেশিক দলের দ্বারা কূপাদি জলাশয় খনিত হইয়াছে তথায় সবুজ তৃণগুচ্ছ উৎপন্ন হইতে পারে। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগভীর লবণাক্ত হ্রদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিব্বতের অংশ-বিশেষের প্রকৃতির সহিত এই সকল পার্ব্বত্য প্রান্তরের প্রকৃতির কতকটা সাদৃশ্য আছে সন্দেহ নাই। লবণাক্ত হ্রদগুলি দেখিয়া মনে হয় সুদূর অতীতে এই সকল স্থানে ভূ-মধ্যবর্ত্তী সমুদ্র বিরাজিত ছিল। এই উষর প্রান্তর বক্ষে কচিৎ কোন স্রোতঃস্বিনী বিদ্যমান রহিলে তাহার গর্ভে এক নিম্নে স্থান লাভ করিতে পারে। যেন সূর্য্যদেব প্রতিদিন প্রভাতে ও সন্ধ্যায় দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরের বক্ষপটে চিত্রকরের মত বিবরণ বিভামণ্ডিত বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত করেন। জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীতেও এই সকল মরীচি-দগ্ধ মরুবৎ মালভূমি মায়াপুরীর মত মানসমোহন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভ্রমণকারীর মনকে মুগ্ধ করে। সময় সময়ে শুক্লা নিশির সকল শোভা হরণ করিয়া কৃষ্ণকায় কুহেলিকা বিরাট প্রান্তরকে প্রকাণ্ড প্রহেলিকায় পরিণত করে।

অন্যান্য মরু বা অর্দ্ধমরুর মত প্রবল বর্ষণের পর এখানেও

যে আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখা যায় তাহা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের মতই বিস্ময়জনক। যেন কোন মায়াবীর মায়া মন্ত্রের প্রভাবে মুহূর্ত্তের মধ্যে রুক্ষ মরুবক্ষে শ্যামল শষ্পসমূহ জাগিয়া উঠে এবং প্রফুল্ল পুষ্পপুঞ্জ প্রস্ফুটিত হয়। এইরূপ অবস্থাতেই পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় জলের সঞ্জীবনী বা প্রাণশক্তি কি অপরিসীম। দুঃখের বিষয় বিস্ময়কর ব্যাপারের মত সহসা সম্ভূত এই শ্যামা সুষমা প্রখর সূর্য্যকরে ঐন্দ্রজালিক কাণ্ডের মতই অতি শীঘ্রই অদৃশ্য হয়। স্থায়ী উদ্ভিদের মধ্যে একপ্রকার কঠিনকায় কণ্টকবৃক্ষ রুক্ষ মরুবক্ষে পরিলক্ষিত হয়

অষ্ট্রিচ ফার্ম্ম—কেপ কলোনি

এই রবিকরদগ্ধ তৃষ্ণার্ত্ত রুদ্র মরুমধ্যে ছাগ-মেষাদি পালিত পশুপাল প্রাণধারণের উপযোগী আহার্য্য কেমন করিয়া প্রাপ্ত হয় তাহা অনেক সময় আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া তুলে। বিশেষ করিয়া সহস্র সহস্র মেষকে এই সকল বিশাল প্রান্তরে চরিবার জন্য আনা হয়। এশিয়া মাইনর হইতে আঙ্গোরা-ছাগ এই দেশে আনীত হইবার কথাও আমরা অবগত আছি। এই সকল ছাগের লোম এই দেশ হইতে বহু পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে।

অষ্ট্রিচ বা উটপক্ষী পালন করা এখানকার একটি লাভ-জনক ব্যাপার। এই সকল পক্ষীর মূল্যবান পক্ষ এই দেশের প্রধান পণ্য-পদার্থপুঞ্জের অন্যতম। যেমন পশুদের মধ্যে অশেষ কষ্টসহ উষ্ট্রই তরুতৃণহারা তপ্ত মরুবক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতে সক্ষম তেমনই উষ্ট্র পক্ষীও এই সকল পিপাসা-পীড়িত পাদপহীন প্রকাণ্ড প্রান্তরে অনায়াসে প্রাণধারণ করিতে সমর্থ। স্রষ্টার সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের পরিচায়ক এই প্রকাণ্ড পক্ষী হজম শক্তিকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তরখণ্ড এমনকি লৌহনির্ম্মিত কাঁটি পর্য্যন্ত ভক্ষণ করে। মেষ এবং আঙ্গোরা-ছাগের লোম এখানকার অন্যতম প্রধান পণ্য এবং অষ্ট্রিচ পক্ষীর পালক পণ্য হিসাবে উহার নিম্নেই স্থান পাইয়া থাকে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন এই দেশে উৎপন্ন পদার্থসমূহের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান স্থান কাহারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকে উত্তর দিতে হইবে—মূল্যবান প্রস্তর ও ধাতু-সমূহ। রমণীয় ঋতুরাজিই এখানকার প্রধান আকর্ষণ। যেমন স্বর্ণের সন্ধানে স্পেনীয়গণ লালসালোলুপ অন্তরে দলে দলে দক্ষিণ আমেরিকার বক্ষে ছুটিয়া গিয়াছিল তেমনই ইংরেজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি জাতি রত্নের আশায় দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছিল।

উষ্ট্রপক্ষী পালনের জন্য বিস্তৃত স্থান আবশ্যক। অবশ্য এদেশে স্থানের অভাব নাই। এই পক্ষী বা ইহার ডিম্ব অন্য দেশে চালান দেওয়া আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ। একটি উটপক্ষী চালান দিতে চেষ্টা করিলে ১ শত পাউণ্ড জরিমানা দিতে হয় এবং একটি ডিম্বের জন্য ৫ পাউণ্ড পর্য্যন্ত জরিমানা হইবার কথা আমরা জানি। এই নিষেধাত্মক আইনের জন্য অষ্ট্রেলিয়ানরা পর্ত্তুগীজ বন্দর হইতে উষ্ট্রপক্ষী জাহাজ-যোগে স্বদেশে লইয়া যায়।

এই প্রকাণ্ডকায় পক্ষীর উচ্চতা ৭ ফিটের কম নহে ও সুদৃঢ় পায়ের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিয়া থাকে।

কেপ কলোনি এবং আফ্রিকার অন্যান্য অংশে এই বিশালদেহ ও বিচিত্রস্বভাব বিহগকে তার নির্ম্মিত বেড়ার দ্বারা আবদ্ধ রাখা হয়। আহার এবং ব্যায়ামের সময় ইহাদিগকে হাজার হাজার একর বিস্তৃত স্থানের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কেহ নিকটে গেলে কোন কোন রুক্ষ মেজাজ বৃদ্ধ উটপক্ষীর পক্ষে পদাঘাত করা অসম্ভব নহে। তবে ইহারা এরূপ নির্ব্বোধ এবং ইহাদের স্বভাব

কেপটাউনের নিকটবর্ত্তী বিশ্ববিদ্যালয় ভবন

পরন্তু তদপেক্ষাও উচ্চ হইয়া থাকে। ইহা উড়িতে পারে না বটে কিন্তু অশ্ব অপেক্ষা দ্রুতগতিতে দৌড়িতে সমর্থ। সর্ব্বাপেক্ষা বেগে ধাবমান হইবার সময় ইহারা অতি অল্প সময়ে অদৃশ্য হয়। এই বিপুলবপু বিহগ সাধারণতঃ কৃষ্ণকায় হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ ও সহজে ইহাদের দ্বারা কাহারও অনিষ্ট অনুষ্ঠিত হয় না। ইহারা স্বভাবতঃ লাজুক ও নির্ব্বোধ। তবে ইহাদিগকে বিশেষ বিরক্ত বা উত্তেজিত করিলে ইহারা ক্রুদ্ধ হইয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। শাবকদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তেজিত হইয়া থাকে। তখন ইহারা শত্রুকে

এতদূর ভীতিপ্রবণ যে কেহ এক গাছি সামান্য যষ্টি বা বা ক্ষুদ্র বৃক্ষ-শাখা ইহাদের সম্মুখে ধরিলে ইহারা ভীতভাবে ঘাড় ঘুরাইয়া লয়। মেষপালের ন্যায় ইহাদিগকে দলবদ্ধভাবে রাখা হয়। সময়ে সময়ে অশ্বের মত চর্ম্মনির্ম্মিত রশ্মি-রজ্জুর সাহায্যে ইহাদিগকে দূরে লইয়া যাওয়া হয়। একজন লোক ইহাদিগের পার্শ্বে অশ্বপৃষ্ঠে অগ্রসর হয় এবং ইহারা সেই অশ্বের সঙ্গে সঙ্গে বেগে ধাবিত হইয়া থাকে।

পাখা কাটিবার সময় ইহাদিগের মস্তকের উপর একটি ব্যাগ বা বাক্স রক্ষিত হয়। ঐরূপ করা হইলে ইহারা মেষের মতই শান্তভাবে মানুষের এই ব্যবহার সহ্য করে।

অবশ্য উপায় নাই বলিয়াই সহ্য করে। সে সময় এমনভাবে ইহাদের অনেকগুলিকে একত্র রাখা হয় যে ইচ্ছা থাকিলেও উত্তেজনা প্রকাশ করার উপায় থাকে না। পুরুষপক্ষী আকারে দীর্ঘতর হইয়া থাকে এবং ইহাদের পক্ষও পক্ষিনী-দের পক্ষ অপেক্ষা সুন্দরতর। উষ্ট্রপক্ষীর একটি বৈশিষ্ট্য জননী ও জনক-পক্ষী উভয়েই পালাক্রমে ডিমে তা দিয়া থাকে। মাতার ন্যায় পক্ষী পিতাও সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার সতর্কতা এমন কি কৌশল পর্য্যন্ত অবলম্বন করে।

উট পক্ষীরা যেরূপ উষর প্রান্তরবক্ষে পালিত হয় তদপেক্ষা বেবুনকে গিরি-গাত্রে নানাপ্রকার উৎকট মুখভঙ্গী ও শব্দ সহকারে বিচরণ করিতে প্রায়ই দেখা যায়। সামান্য আশঙ্কার কারণ জন্মিলেই ইহারা চারি পায়ে ভর করিয়া তৎক্ষণাৎ বেগে পলায়ন করে। ইহাদের দ্বারা শস্য-ক্ষেত্র এবং ফলের বাগানেই অশেষ অনিষ্ট অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইহারা ক্রমশঃ ছাগ ও মেষকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের দেহাভ্যন্তরস্থ দুগ্ধকোষ বাহির করিবার নিষ্ঠুর কৌশল শিক্ষা করিয়াছে।

কতিপয় বিষাক্ত সর্প এবং বৃশ্চিক কেপ কলোনির বক্ষে দেখা যায়। ভীষণ গোক্ষুর সর্পও পরিলক্ষিত হয়। এই

টেবল মাউণ্টেনের শীর্ষদেশ

কিঞ্চিৎ উর্ব্বর প্রান্তরকে চতুষ্পদ জন্তু বা পশুপালের চারণ-ভূমিরূপে ব্যবহার করা হয়। পূর্ব্বে এই সকল স্থানে হটেণ্টট এবং কাফ্রীজাতি তাহাদের পালিত পশুপাল লইয়া বাস করিত এবং প্রায়ই হিংস্র বন্য জন্তুদের দ্বারা ঐ সকল পশু আক্রান্ত ও ভক্ষিত হইত বলিয়া শুনা যায়। বর্ত্তমানে নানাপ্রকার কীট-পতঙ্গ এবং পশুমড়ক পশু-পালনের প্রধান অন্তরায়। বিষাক্ত তৃণ-গুল্ম ও পশু-পালনের পক্ষে প্রতিকূলতা করে। পার্ব্বত্য প্রদেশে পালিত পশুপালের পক্ষে একশ্রেণীর ব্যাঘ্র এবং বেবুন জাতীয় সকল সর্পের প্রধান শত্রু শূকর। শূকরের শরীরস্থ মেদের উপর গোক্ষুরাদি ভীষণতম সর্পের বিষও ব্যর্থ হইয়া থাকে। এই জন্য সর্পপূর্ণ স্থানে শূকর পাল শুধু অনায়াসে বিচরণ করিতে পারে তাহা নহে উহারা চরিতে চরিতে সর্প দেখিলে মারিয়াও ফেলে। সর্প সংহারের জন্য সেক্রেটারি বার্ড নামক এক প্রকার পক্ষী পালন করা হয়। এই সকল পক্ষীও প্রকাণ্ডকায় হইয়া থাকে। "মীর-ক্যাট" নামক এক প্রকার নকুল বা বেজি-জাতীয় জীবও সর্প সংহারের জন্য বহু গৃহে পালিত হইতে দেখা যায়। আমরা যেমন বিড়াল পুষি কেপ-কলোনিবাসীরা তেমনই এই বেজি-জাতীয়

কারু এবং ক্লুফ (Kloof) নামক সমুচ্চ উষর প্রান্তরগুলিও বসন্তকালীন বর্ষার অন্তে সহসা শষ্পাপূর্ণ ও পুষ্পিত হইয়া উঠে। তখন পিলি, ডেজি এবং ডাণ্ডিলিয়ন প্রভৃতি ফুল ফুটিয়া উঠিয়া অস্পষ্ট দৃশ্য প্রকাশ করে। অবশ্য এই দৃশ্য গ্রীষ্মকালের প্রখর রবিকর তাপে শীঘ্রই অদৃশ্য হয়। কেপ কলোনির কৃষককুলকে জলাভাবের ভয়ে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতে হয়। উপযুক্ত জল পাইলে এদেশে প্রচুর শস্য ও শাক-সব্জি জন্মিতে পারে। এখানে ভুট্টার গাছ নয় বা দশ ফিট লম্বা হইয়া থাকে। গম, যব, রাই, আলু প্রভৃতি সমস্তই এখানে ইংলণ্ড অপেক্ষা অনেক অধিক উৎপন্ন হইতে পারে।

কণ্টকাকীর্ণ ফলের বৃক্ষ এদেশে দেখা যায়। এই বৃক্ষ অন্য দেশ হইতে আনীত। এই সুদৃশ্য অথচ অনিষ্টকারী ফলের গাছ ক্ষেত্রে জন্মিয়া কৃষক কুলের শত্রুতা সাধন করে। গবাদি পালিত পশুপাল কণ্টকাকীর্ণ ফল সেবন করিলে তাহাদিগের মুখবিবরে ও উদরে এক প্রকার তীব্র জ্বালা জন্মায় বলিয়া জানা যায়।

অষ্ট্রেলিয়ার ইউকালিপটাস বৃক্ষ, ইংলণ্ডের ওক বৃক্ষ, লম্বার্ডির পপলার-পাদপ এ দেশেও বিশেষ বিকাশলাভ করে। এখন অনেক জঙ্গল কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। শুধু এই দেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলে এবং ঐ দিকের পার্ব্বত্য প্রদেশে মূল্যবান কাষ্ঠউৎপন্নকারী বনানী এখনও বিদ্যমান।

কেপটাউনের নিকটবর্ত্তী হেক্সনদের উপত্যকা

ডুমুর, কমলালেবু, লেবু, মালবেরি, দাড়িম্ব প্রভৃতি ফল দক্ষিণ য়ুরোপের মতই এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে পারে। গিরি-গাত্রে আপেল, প্লাম বা কুল, পিচার, পিচ, চেরি প্রভৃতি ইংলণ্ডসুলভ ফল ইংলণ্ড অপেক্ষা অধিক জন্মায়। এখানকার মৃত্তিকা আঙ্গুরের পক্ষেও অনুকূল। পূর্ব্বে কেপ কলোনির আঙ্গুর হইতে উৎকৃষ্ট মদ্য প্রস্তুত হইত। এক প্রকার সুগন্ধি তামাক এখানে জন্মায়। অনেকে বলেন আফ্রিকার ফলসমূহের মধ্যে গ্রেনাডিল্লা নামক ফলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই ফল কেপ কলোনির বক্ষেও উৎপন্ন হয়। প্রিকলিপিয়ার নামক এক প্রকার স্বর্ণবর্ণশালী অথচ

কেপ-টিক আখ্যায় অভিহিত সেগুন কাষ্ঠ, বক্স উড, বন্য-চেষ্টনাট প্রভৃতি বৃক্ষ বড়দিনের সময় রক্তবর্ণ পুষ্পের দ্বারা মণ্ডিত হয়। দেবদারু প্রভৃতি দীর্ঘদেহ পাদপও এদেশে জন্মায়। ইয়েলো-উড, ষ্টিঙ্ক উড, লরেল উড প্রভৃতি বৃক্ষও জন্মিয়া থাকে। আসেগাই-উড নামক বৃক্ষ হইতে কাফ্রীগণ তাহাদের কোন কোন অস্ত্র প্রস্তুত করে এবং শ্বেতাঙ্গগণ উহার দ্বারা তাহাদিগের শকটের চক্র রচনা করিয়া থাকে। এই সকল পাদপকে ব্রাশ উডের এবং নানা প্রকার গুল্ম-গাছার জঙ্গলের মধ্যে দেখা যায়। এই সকল বৃক্ষ ও জঙ্গলপূর্ণ বনানী-বক্ষে বন্য হস্তী ও মহিষ এখনও বাস করে।

এই দেশের প্রধান নগরগুলির অধিকাংশই উৎকৃষ্ট পথের দ্বারা পরস্পর সম্মিলিত। অবশ্য অংশ বিশেষে উপযুক্ত পথের অভাব অনুভূত হয়। এই সকল স্থানে পথ-রেখা মাত্র দেখা যায়। পথহারা প্রান্তরের উপর দিয়াও শকটাদি চালিত হইয়া থাকে।

কেপকলোনির বহু সহর গণ্ডগ্রাম মাত্র। তবে উপযুক্ত হাট বা বাজার এবং রেল ষ্টেশন প্রায় প্রত্যেক সহরে দেখা যায়। এই দেশের আয়তন ইংলণ্ডের চতুর্গুণ হইবে। ইহার আয়তন প্রায় ২ লক্ষ ১৭ হাজার বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা রক্ত কি পরিমাণ বিদ্যমান তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। কিছুকাল পূর্ব্বে উভয় জাতির মধ্যে বিশেষ বিদ্বেষ ভাব জন্মিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। স্বজাতি বোয়ারদের প্রতি ওলন্দাজ বা ডাচদিগের সহানুভূতি এই রাষ্ট্রনীতিক বিদ্বেষ ভাবের অন্যতম কারণ।

অধিবাসীদিগের অর্দ্ধেক খৃষ্টান। ডাচ্ রিফর্ম্ম চার্চ্চ ও চার্চ্চ অফ ইংলণ্ড এবং ওয়েসলিয়ান মেথডিষ্ট এই তিন সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান এদেশে দৃষ্ট হয়। আদিম অধিবাসীদিগের কয়েক সহস্র ব্যক্তি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। কপ্‌টিক

রসচেণ্ডাল সাইমণ্ডিয়াম—কেপটাউন

প্রায় ১৫ লক্ষ। কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসী বা আফ্রিকান এবং শ্বেতাঙ্গ উভয়ের সংখ্যা প্রায় সমান। দেশের পূর্ব্ব পার্শ্বেই কাফ্রীরা ঘন সন্নিবিষ্ট ভাবে বাস করে। পূর্ব্বে এই অংশ বৃটিশ কাফ্রীরিয়া আখ্যায় অভিহিত হইত। পূর্ব্বদিকে প্রসারিত মধ্যস্থ প্রদেশে এবং দক্ষিণে শেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকদিগের সংখ্যা অধিক। উত্তর-পশ্চিমাংশে হটেন্টট এবং বুশমেন আখ্যায় অভিহিত জাতিরা বাস করে। এই অংশে লোকালয়ের সংখ্যা অল্প।

শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক সম্প্রদায় মূলতঃ বৃটিশ এবং ওলন্দাজ জাতির দ্বারা গঠিত। কোন জাতি বা জাতীয় বা ইথিওপিয়ান চার্চ্চের অনুরূপ একপ্রকার চার্চ্চ দেশীয়দিগের দ্বারা গঠিত হইয়াছে। ইহারা তাহারই অন্তর্গত। বিশপ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পাদ্রী বা প্রচারকের কার্য্য কৃষ্ণকায় আফ্রিকানরাই করিয়া থাকে।

এই দেশের শাসন-প্রণালী ইংলণ্ডের শাসন-তন্ত্রের অনুকরণ। এখানকার পার্লিয়ামেণ্ট রাষ্ট্রীয় পরিষদ আপার এবং লোয়ার হাউস রূপ দুইটি বিভাগে বিভক্ত। সাফ্রেজ বা ভোট প্রদানের শক্তি বিশেষ বিস্তৃত। ব্যবস্থা বা আইন-কানুন রোমান ডাচ-আদর্শে প্রস্তুত। স্থানীয় বিচারালয়, সার্কিট-কোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট প্রভৃতির উপর

সকলের সমান অধিকার। দেশটি সাতটি প্রভিন্স বা প্রদেশে বিভক্ত। আমাদের দেশের মতই এক একটি প্রদেশকে বহু জিলায় বিভক্ত করা হইয়াছে। সাধারণতঃ প্রধান নগরের নামানুসারে জিলার নামকরণ করা হইয়াছে।

কেপ কলোনির পূর্ব্বস্থ প্রদেশ ও নেটালের মধ্যস্থলে অর্দ্ধ-স্বাধীন পোণ্ডোল্যাণ্ড এবং গ্রিকুয়াল্যাণ্ড ইষ্ট নামক রাজ্য-দ্বয়। ক্রমান্বয়ে কয়েকবার সঙ্ঘটিত "কাফির ওয়ার" নামক যুদ্ধের ফলে আদিম অধিবাসীরা এই পূর্ব্বস্থ প্রদেশে ঘন সন্নিবিষ্টভাবে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই পূর্ব্ব প্রদেশের পশ্চিম পার্শ্বে (বৃহৎ কী নদীর সীমার মধ্যেই) শ্বেতাঙ্গদিগের অধিকার পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। অথচ পূর্ব্ব পার্শ্বে কয়েকসহস্র শ্বেতাঙ্গ সাত লক্ষেরও কিঞ্চিদধিক কাফ্রী-গণের মধ্যে অবস্থান করে। পর্য্যটকদের দ্বারা এই দেশের দারবান পর্য্যন্ত বিস্তৃত উপকূল পর্ব্বতাকীর্ণ ও সলিলপূর্ণ ভূস্বর্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। অবশ্য যাঁহারা সমুদ্র-বক্ষ হইতে দেখেন তাঁহাদের নিকটেই কেপ কলোনির পর্ব্বত-বন্ধুর উপকূল পরম সুন্দর বলিয়া মনে হইতে পারে।

বাফেলো (Buffalo) নামক নদের মোহনায় ইষ্ট লণ্ডন আখ্যায় অভিহিত উন্নতিশীল বন্দর অবস্থিত। এই বন্দর হইতে বিস্তৃত একটি রেল রাস্তা কেপ কলোনির প্রধান রেল পথের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। বিশ হাজার লোকের বাসস্থল এই বন্দরের উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ এই রেল-রাস্তা। অপর একটি শাখা রেল-পথের উপর উইলিয়ম্টাউন নামক নগর দণ্ডায়মান। দেশের অভ্যন্তরভাগে এবং প্রধান রেলপথের ধারে কুইনষ্টাউন অবস্থিত। উভয় নগরেরই অধি-বাসী সংখ্যা দশ হাজারের বেশী হইবে না। ইহা ছাড়া ফ্রাঙ্কফোর্ট, হ্যানোভার প্রভৃতি জার্ম্মাণজাতি গঠিত উপ-নিবেশ এই প্রদেশে বিদ্যমান। এখন এই সকল উপনিবেশের অধিকাংশ অধিবাসীই বৃটিশ।

দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রদেশের রাজধানী বা প্রধান নগর পোর্ট অফ এলিজাবেথ "দক্ষিণ আফ্রিকার লিভারপুল" আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার অধিবাসী সংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার। এখান হইতে প্রচুর পশুলোম বা পশম এবং উটপক্ষীর পালক চালান যায়। এই পণ্যদ্বয়ের দিক দিয়া বিচার করিলে কেপ কলোনির রাজধানী কেপটাউন অপেক্ষা পোর্ট অফ এলিজাবেথের বাণিজ্য ব্যাপার বিস্তৃততর বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই প্রদেশের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর সহর গ্রেহামষ্টাউন। পোর্ট অফ এলিজাবেথ হইতে অভ্যন্তর ভাগের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইলে এই চিত্তাকর্ষক নগরে উপনীত হওয়া যায়। ইহার লোক সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার। সমুন্নত এবং স্বাস্থ্যকর ভূখণ্ডের উপর দণ্ডায়মান এই নগরের প্রাকৃতিক পরিস্থিতি বিশেষ প্রীতিপ্রদ। এই সহরের সরকারী সৌধসমূহ, বিদ্যামন্দির, গির্জ্জা-গৃহ প্রভৃতি দর্শকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। এক সময় এই স্বাস্থ্যকর নয়নাভিরাম নগরকে সম্মিলিত ও স্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল।

পোর্ট এলিজাবেথের পূর্ব্বে অবস্থিত পোর্ট আলফ্রেড নামক ক্ষুদ্র বন্দরের সহিত গ্রেহামষ্টাউন রেলপথের সহায়তায় সংযুক্ত। পোর্ট এলিজাবেথ হইতে একটি রেল লাইন অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ পূর্ব্বক গ্রেহামষ্টাউনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। এই রেলরাস্তাই ট্রান্সভাল যাইবার সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক পথ। এই প্রদেশের অন্তর্গত লাভডেল নামক স্থান পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ মিশন-ষ্টেশন। এই নগর একটি বিরাট খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচার-প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ফ্রি চার্চ্চ অফ স্কটল্যাণ্ডের দ্বারা এখানে শুধু ধর্ম্ম সম্পর্কীয় এবং সাধারণ শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহা নহে, নানা শিল্প-কলা সম্বন্ধেও উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করা হয়।

দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রদেশের পশ্চাতে উত্তর পূর্ব্ব প্রদেশ অবস্থিত। এই প্রদেশ আকারে বৃহত্তর কিন্তু ইহার অধিবাসী সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। এই প্রদেশের প্রধান নগর ক্রাডক গ্রেট ফিশ রিভার নামক নদের তীরদেশে বিরাজিত। এই নগরের লোক সংখ্যা ৮ হাজারের অধিক হইবে না। ইহার নিকটে গন্ধকপূর্ণ জলের উৎস সমূহ বিদ্যমান বলিয়া ভবি-ষ্যতে সুপ্রসিদ্ধ স্বাস্থ্য-নিবাসে পরিণত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। যেমন এই প্রদেশের অন্তর্গত সমারসেট ইষ্ট এবং ফোর্ট বোফোর্ট প্রভৃতি অপর নগরের নামগুলি বৃটিশ

প্রভাবের পরিচায়ক তেমনই উত্তরস্থ বাগ্যার্সডর্প, মিডেল বার্জ্জ, ইর্ম্মবার্জ্জ প্রভৃতি নগরের নামগুলি ওলন্দাজ প্রভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। মিডেল বার্জ্জ এবং ইর্ম্মবার্জ্জ উপকূল হইতে অভ্যন্তরের দিকে প্রসারিত রেলপথগুলির জংশন বা মিলন স্থান।

এই দেশের "মিডল্যাণ্ড প্রভিন্স" বা মধ্যবর্ত্তী প্রদেশটিও আকারে বৃহৎ বটে কিন্তু লোক সংখ্যা অধিক নহে। এই পশুপালনপ্রধান প্রদেশটি পর্ব্বতপুঞ্জ এবং কারু নামক প্রকাণ্ড প্রান্তরে পরিপূর্ণ। ইহার প্রধান নগরের নাম গ্রেয়াফরীনেট। আখ্যাটির অর্থ "মরু-নগর"। ইহা "সানডে রিভার" নামক নদের তটদেশে অবস্থিত। লোক সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। উইটেন হেজ নামক নগর ছাড়া এই প্রদেশে অন্য কোন বৃহৎ জনপদ নাই। গ্রেয়াফরীনেট হইতে চারিশত মাইল দূরবর্ত্তী পোর্ট অফ এলিজাবেথ পর্য্যন্ত প্রসারিত রেলপথের পার্শ্বে উইটেনহেজ অবস্থিত।

গ্রেট কারু নামক বিরাট প্রান্তরের অপর পার্শ্বে এবং কেপটাউন হইতে বিস্তৃত প্রধান রেল রাস্তার ধারে বোফোর্ট ওয়েভ নামক নগর দৃষ্ট হয়। উৎকৃষ্ট আবহাওয়ার জন্য এই স্থানটি স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত হইয়াছে।

উপকূল এবং মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের মাঝখানে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশ। এই প্রদেশের পর্ব্বতপুঞ্জের গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্য এবং শ্যামসুন্দর কান্তার সমূহের কান্তি ভ্রমণকারীর মনকে স্বতঃই মুগ্ধ করে। এই প্রদেশ কাষ্ঠ, মৎস্য, তামাক এবং একপ্রকার ব্রাণ্ডির জন্য বিখ্যাত। কোন বৃহৎ সহর এই প্রদেশে দেখা যায় না। জর্জ্জ নামক নগর নয়নরঞ্জন দৃশ্যাবলীর জন্য নানাদেশের দর্শকগণকে আকর্ষণ করে। কনিস্না শান্ত-শ্যাম কান্তার-কান্তির জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ১২ হাজার লোকের বাসস্থলী আউৎশুণ্ড "কাঙ্গো কেভ্স" আখ্যায় অভিহিত গুহা-গৃহাবলীর জন্য প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিস্ময়কর বিচিত্র গুহাগৃহগুলি একমাইল অপেক্ষাও অধিক বিস্তৃত। এই প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসী ডাচ্ বা ওলন্দাজ জাতি। ইহারা এখনও আদিম সাদাসিধা প্রণালীতে জীবন যাপন করে।

আতলান্তিক মহাসমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে মধ্যবর্ত্তী প্রদেশকে পৃথক করিতেছে অরেঞ্জ নদের অন্যতম করদ নদ হার্টি বীষ্ট নামক নদী। উত্তরে অরেঞ্জ নদের দিকে উকিয়েন নামক স্থানে বিখ্যাত তাম্রখনিসমূহ বিদ্যমান। এই স্থানটি পোর্ট নোলোথ নামক বন্দরের সহিত রেলপথের সহায়তায় সংযুক্ত। এই প্রদেশের দক্ষিণাংশ শস্য-শ্যাম বলিয়া অধিবাসীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। নয় হাজার লোকের নিবাসস্থল উরসেষ্টার নামক নগরকে কেন্দ্র করিয়া এই জন-বহুল অঞ্চলটি অবস্থিত। এই অঞ্চলের আর একটি উল্লেখনীয় নগর মালমেসবারি, যাহার পার্শ্বে কেপ কলোনির সর্ব্বোৎকৃষ্ট শস্যক্ষেত্রসমূহ বিদ্যমান। বিখ্যাতনামা "কেপওয়াগন" এবং অন্যান্য শকট প্রধানতঃ উরসেষ্টারেই প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কেপ কলোনির সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অংশ পুরাতন "পশ্চিম প্রদেশ" দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। ক্ষুদ্রতম হইলেও ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ প্রদেশ। কারণ এই রাজ্যের রাজধানী বিশ্ববিখ্যাত কেপ টাউনকে কেন্দ্র করিয়া এই পুরাতন প্রদেশটি গঠিত। এই দেশের প্রধান রেলপথ এই প্রসিদ্ধ নগর হইতে প্রসারিত হইয়া ডি-আয়ার নামক জংসনে আগমনপূর্ব্বক বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এই জংশন হইতে একটি শাখা পূর্ব্বদিকে আগাইয়া যাইয়া পোর্ট এলিজাবেথ এবং ইষ্ট লণ্ডন হইতে আগত লাইনের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। পোর্ট এলিজাবেথ ও ইষ্ট লণ্ডন হইতে বিস্তৃত ঐ লাইন ব্লুমফন্টিন এবং প্রিটোরিয়া পর্য্যন্ত প্রসারিত। উক্ত জংশন হইতে আর একটি লাইন পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া হোপটাউনের নিকট অরেঞ্জ নদ অতিক্রম করিয়া বেচুয়ানাল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া রোডেসিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে।

কেপ কলোনির হৃদয়-স্বরূপ এই প্রদেশ সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও সুন্দর অংশও বটে। সুদৃশ্য প্রাচীন ওলন্দাজ উপনিবেশগুলি এই প্রদেশে বিরাজিত। এই সকল উপনিবেশের মধ্যে নায়ার্ল নামক জনপদে ১১ হাজার নরনারী বাস করে এবং ষ্টেলেনবস্চ নামক লোকালয়ে ৫ হাজার অধিবাসী অবস্থান করিয়া থাকে। কেপ-টাউনের উপকণ্ঠস্বরূপ নগরগুলিও সুদর্শন। ইহাদের একটি আকারে বিশেষ বৃহৎ।

কেপ কলোনির রাজধানী কেপ টাউন দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নগর। অধীনস্থ লোকালয়গুলি ধরিলে এই নগরের অধিবাসী সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। এইরূপ বর্ণ-বৈচিত্র্যপূর্ণ নগর পৃথিবীতে অল্পই আছে। বর্ণ বলিতে এখানে আমরা শ্বেত, কৃষ্ণ প্রভৃতি চর্ম্মগত বর্ণের কথা বলিতেছি। দুগ্ধ-শুভ্র শরীর ইংরাজ প্রভৃতি জাতি হইতে নিকষ কৃষ্ণকায় নিগ্রো পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার বর্ণ-বিশিষ্ট নরনারী এই নগরে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। প্রত্যেক মহাদেশের নরনারী এখানে দেখা যায়। অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্ম নানা দেশের লোক এখানে একত্রিত হইয়াছে। বর্ণৈশ্বর্য্যশালী পরিচ্ছদধারী হাজার হাজার মুসলমান মালয় এখানে অবস্থান করিয়া শ্রমিকের কার্য্য করিতেছে। এখানকার পথ ঘাট অপেক্ষা প্রীতিকর প্রাকৃতিক পরিস্থিতিই পর্য্যটকদিগের দৃষ্টি অধিক আকৃষ্ট করে। ট্রামওয়ে, বৈদ্যুতিক আলোক প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সকল ব্যবস্থাই এখানে দেখা যায়। এই বৃহৎ নগরের অংশবিশেষে প্রাচীন পন্থায় প্রস্তুত অনুন্নত সমতল ছাদ বিশিষ্ট ত্রিকোণাগ্র-দেওয়ালযুক্ত ওলন্দাজী গৃহাবলীও দৃষ্ট হয়। গৃহের বারান্দাগুলি "ষ্টোয়েপ" নামে অভিহিত হয়। প্রত্যেক গৃহে ষ্টোয়েপ থাকা চাই। পথ-ঘাটের পুরাতন ডাচ বা ওলন্দাজ নামগুলি আজকাল ইংরেজী নামে পরিণত হইয়াছে।

কেপ টাউনের প্রধান পথটির নাম আভারলি ষ্ট্রীট। এই পথের পার্শ্বে প্রস্তুত গৃহগুলি বৃটিশ শিল্পাদর্শে নির্ম্মিত বলিয়া আমাদের মনে হয়। সুদৃশ্য এক বৃক্ষবীথি বিমণ্ডিত সরকারী আভিনিউর পার্শ্ববর্ত্তী প্রশান্ত গম্ভীর পার্লিয়ামেণ্ট গৃহ দর্শকমাত্রেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। এখানকার যাদুঘরও দেখিবার যোগ্য। আর দুইটি দর্শনীয় বোটানিক বাগান ও স্থানীয় গ্রন্থাগার। সুদৃশ্য প্রাচীন দুর্গ সামরিক ব্যাপারের প্রধান কার্য্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। নগরের বাহিরে সরকারী মানমন্দির বা অবজার্ভেটরি অবস্থিত। বিজ্ঞানজগতে এই মানমন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

নগরের চতুর্দ্দিকে কয়েকটি বিচিত্র দর্শনীয় দৃশ্য বিদ্যমান। "গ্রুট স্কুউর" বা গ্রেটবার্ণ নামক মহান ময়দান কেসিল রোডস কেপ টাউনকে দান করিয়াছেন। এাংলিকান বিশপের অবস্থান-স্থান বিশপস্ কোর্ট এবং সরকারী ওয়াইন ফার্ম্ম কনষ্টানসিয়াও দর্শনযোগ্য। দ্রাক্ষাকুঞ্জ, চেষ্টনাট এবং পাইনপাদপপুঞ্জ পরিশোভিত উইনবার্জ অতি সুন্দর ভ্রমণ-স্থান। সী-পয়েণ্ট এবং কাল্ক-বে সমুদ্রসলিলে স্নান করিবার স্থান। নগর হইতে সমুদ্র সৈকতে অবস্থিত এই দুইটি স্থান পর্য্যন্ত সারি সারি পল্লী ও ভিলা প্রসারিত।

কেপ টাউনের একটি নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্য বেগে প্রবাহিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব বাতাস। এই বেগবান বাতাস উদ্দাম প্রকৃতি সত্বেও স্বাস্থ্যকর বলিয়া বিবেচিত। তজ্জন্য ইহাকে "কেপ ডক্টর" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই বাতাস যখন বিপুল বেগে বহিতে থাকে তখন বারিধি বক্ষে বিশেষ বিক্ষোভ জাগিয়া উঠে এবং লোকালয়ের বক্ষেও প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

এই দক্ষিণ পূর্ব্ব বাতাস টেবল মাউণ্টেন নামক পর্ব্বতের শীর্ষদেশে টেবল ক্লথ আখ্যায় অভিহিত বিচিত্র বাষ্পরাশি বা মেঘমালা রচনা করে। এই তুষারশুভ্র জলদজাল তরঙ্গাকারে নগরের পানে প্রসারিত হইতে হইতে সমুজ্জ্বল সূর্য্য করে সহসা শূন্যে মিলাইয়া গিয়া অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রকাশিত করে।

এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে টেবল মাউণ্টেনের অবস্থিতি কেপ টাউনের সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যকে বিশেষ ভাবে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। ৩ হাজার ৫ শত ফিট উচ্চ এই শান্ত-গম্ভীর গিরির শীর্ষদেশ সমতল। কতকগুলি তুঙ্গ বা খাড়া শৃঙ্গ এই পর্ব্বতের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করিয়াছে। বৃক্ষশ্যাম গহ্বর ইহার অন্যতম চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য। এই পর্ব্বতের দুই দিকে "লায়ন্স হেড" এবং "ডেভিলস জীক" নামক সমুচ্চ শিখরদ্বয়—মধ্যে "টুয়েলভ এপসলস্" আখ্যায় অভিহিত দ্বাদশটি সূক্ষ্মাগ্র শিলাস্তূপ। এই পর্ব্বত ক্রমশঃ নামিয়া কেপ অফ গুড হোপ বা উত্তমাশা অন্তরীপের অঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এই অন্তরীপ কেপ অফ ষ্টর্ম্মস্ আখ্যায় অভিহিত হইত। এই দীর্ঘদেহ অন্তরীপের স্কন্ধদেশে (আতলান্তিক মহাসমুদ্রের দিকে) কেপ টাউনের পোতাশ্রয় টেবল-বে বিরাজিত। কেপ টাউনের পুরোভাগে এবং এই উপসাগরের বক্ষে রোবেন নামক দ্বীপ দৃষ্ট হয়। লাইট হাউস বা আলোক গৃহ এবং লেপার-হস্পিটাল বা কুষ্ঠাশ্রমের জন্য এই দ্বীপ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ।

গোধূলি

শ্রীমতী অরুণা সিংহ বি-এ

দিবস শেষের কথা আনিয়াছে আমার মাঝারে গীতি
চিরন্তন সে সুরমঞ্জীর ঝঙ্কৃত নিতিনিতি ;
আমি যত চাহি মনের গোপনে,
লুকায়ে রাখিতে অতীব যতনে,
বিশ্ব প্লাবিয়া ওঠে উছলিয়া শতধারে মম প্রীতি,
দিবস শেষের কথা গাঁথি আনে আমার মাঝারে গীতি।

থেমে যায় যাক্ বুকের ভিতর সকল আকুল কথা
মনের সহিত মনের দ্বন্দ্ব ছলনার জটিলতা ;
তপ্ত শিয়রে রাখো একবার
শান্তি-শীতল শ্রীকর তোমার,
চির বিচিত্র তমসারাত্রি আনো গো তন্দ্রাহতা,
হানি যবনিকা ভুলাইয়া দাও সকল আকুল কথা।

বাতায়ন-পথে একটি তারকা সকল রশ্মিখানি
আমারি লাগিয়া দিতেছে ঢালিয়া সুদূর বিপুল বাণী,
রূঢ় ঝঙ্কারে জীবন বীণার
সহসা মৌন হ'লো যেই তার
রসনিষিক্ত মধুরতা যেন দেছে তার 'পরে আনি',
দিবসের দাহে তুমিও আনো হে তোমার শান্তি-বাণী !

আবাহন

শ্রীমতী অরুণা সিংহ বি-এ

কতশতবার নব নব বেশে এলে মম দ্বারপথে—
কখনও আসিলে ভিখারীর মত, কভু এলে রাজপথে,
কখনও আঘাতে ছিন্ন করিলে আমার বেদনা ভয়,
স্নেহ সকরুণ সান্ত্বনা দিয়ে ভরি দিলে এ হৃদয় !
প্রভাতে আসিলে পূজা করিবারে তরুণ তাপস বেশে,
এলে সন্ধ্যায় ক্লান্ত অতিথি শ্রান্ত ধূসর কেশে—
আসিলে নিশীথে অন্তরতম টুটি' সব ব্যবধান ;
পূজার আসনে, প্রীতির প্লাবনে গাহিলে মধুর গান !

পরিপূর্ণতা লভিয়া নিঝর চলে উচ্ছ্বাস-ভরে,
পরম মুক্তি অন্বেষি' কোন সুদূর রত্নাকরে ;
অঙ্কুর যেন মাগে পরিণতি পল্লব ফুলফলে,
মহামহীরুহ বিস্তারি' ওঠে আকাশ চুমিবে ব'লে !
তেমনি করিয়া শুধু চিরদিন লভি তব পরিচয়,
কখনও হাসিতে মধুর কখনও অশ্রুবিধুর হয় !
আকাশ হইতে এমনি করিয়া তারকা চাহিয়া রহে
এমনি করিয়া ধরণীর পূজা স্বরগের পানে বহে।

———

ভিত্তি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমার যে শেষ পর্যন্ত হৈমন্তীকে বিয়ে ক'রবে, এটা কেউ কল্পনাই ক'রতে পারে নি। বন্ধু বান্ধবেরা সবিস্ময়ে চক্ষু-তারকা ঊর্ধে তুলে বললে, "তোমার মনে মনে এই ছিল!"

আত্মীয় কুটুম্বদের দল প্রতিশোধ নেবার ভঙ্গীতে টিপ্পনী সহকারে মন্তব্য ক'রলেন: "এত যা'র লম্বা লম্বা বোলচাল তা'র যে এমনি বুদ্ধি ভ্রংশ হ'বে এতো আমরা আগে থেকেই জানতুম! নইলে পিপলাকাঠির চাটুয্যেদের মেয়ে, রূপে গুণে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকরুণটি, নগদ দু'টি হাজার টাকা অবধি পণ দিতে চাইলে, বাবুর তাও পছন্দ হ'ল না! এখন কোথা থেকে কুড়িয়ে এনেছে কোন্ হাবাতে ঘরের এক ধিঙ্গী,—না আছে এক রত্তি রূপ, না পেয়েছে একটা কাণা কড়ি।"

দরজায় ছেলে বৌ এসে পৌছতেই বাপ চিত্ত বাঁড়ুয্যে সেই যে বৈঠকখানায় গিয়ে ফরশীর নল মুখে নিয়ে বসলেন, সেখান থেকে তাঁ'কে আর নড়ানো গেল না। গড়গড়ার পুঞ্জিত ধূম্রজালের মাঝখানে তাঁর যে নীরস গম্ভীর মুখশ্রী দেখা যাচ্ছিল, তা বাৎসল্য রসে অভিষিক্ত নয় বা নবাগতা পুত্রবধূর আবির্ভাবে আনন্দোদ্ভাসিতও নয়। একটা শাঁস-জলযুক্ত বেয়াই সংগ্রহ করে মোটা হাতে কিঞ্চিৎ গুছিয়ে নেওয়া এবং সম্ভব হ'লে অধিকন্তু বহু ঈপ্সীত রায় বাহাদুরীর খেতাবটি জুটিয়ে ফেলা, এই দ্বিবিধ স্বপ্ন তাঁর মস্তিষ্কে এতকাল ধ'রে কল্পনার সার সিঞ্চনে যে বিরাট মহীরুহে পরিণত হ'য়েছিল, তা'র এমনি বিনা মেঘে বজ্রপাত সদৃশ, সম্পূর্ণ আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত মূলোৎপাটনে বাঁড়ুয্যে ম'শাই ব্লাড প্রেশারের চাপটা অতি কষ্টে সামলে' নিলেন।

চিত্ত বাঁড়ুয্যে সেকেলে মেজাজের রাশভারী লোক, পিতৃত্বের আদর্শ এবং পুত্রের কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি পরশুরামের মাতৃহত্যার উল্লেখ ক'রতেন। সুতরাং একান্ত ভাবে এই অ-পরশুরাম এবং অ-পুরাণোচিত ব্যবহারে কুমারকে ত্যজ্য পুত্র করাই তাঁর মেজাজের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সে কাজ তিনি ক'রলেন না দু'টি কারণে। প্রথমতঃ কুমার তাঁ'র মুখাপেক্ষী ছিল না; দ্বিতীয় কারণ, এই বিয়ের পরে বাংলা খবরের কাগজগুলো তাঁ'র সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং অনিচ্ছাকৃত ঔদার্যকে ফলাও ক'রে তাঁ'কে সুদীর্ঘ এক কলম-ব্যাপী প্রশংসার স্বস্তি ভাষণ জানিয়েছিল, আর সেই সঙ্গে বাংলার পণলোভী পিতৃকুলকে তাঁ'র মহামহিম দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রবার অনুরোধ জ্ঞাপন ক'রেছিল। সুতরাং বাঁড়ুয্যে মশাই কিল খেয়ে কিল চুরি ক'রে গম্ভীর মৌন মুখে ব'সে রইলেন।

শুধু অভ্যর্থনা ক'রলেন মা, তাঁর না ক'রে উপায় ছিল না। কুমারের ব্যবহারে তিনি ব্যথা পেয়েছিলেন, পুত্র-বধূর মুখ দেখে' নৈরাশ্যও বড় কম হয়নি, কিন্তু যা নিতান্তই হয়ে গেছে এবং যা'কে আর কোনোক্রমেই ফেরানো চলেনা, তা'র উপর রাগ করে আজ এই উৎসবের দিনে ছেলের প্রাণে ব্যথা দেবার মতো মনের জোর তাঁ'র ছিল না। তাই পঞ্চ-প্রদীপ জালিয়ে, বরণডালা নিয়ে, ধান দূর্বা দিয়ে তিনি সাদরে বধূ-বরণ ক'রলেন, সস্নেহে হৈমন্তীর চিবুক স্পর্শ ক'রে আশীর্বাদ জানালেন, বললেন, "এসো, এসো, ঘরের লক্ষ্মী, এসো।"

কিন্তু সংসারের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে এসে' দু'দিনেই "ঘরের লক্ষ্মী" নিজের আসনটি সম্বন্ধে সজাগ হ'য়ে উঠল। সে যে এই পরিবার পরিজনের মধ্যে একেবারেই সুস্বাগত নয়, স্পষ্ট ক'রে না হলেও, ভাবে ভঙ্গীতে এবং আকারে ইঙ্গিতে এই সহজ কথাটুকু না বুঝবার মতো নির্বোধ হৈমন্তীর ছিলনা। তবে এ অবস্থায় দাসত্ব বেশ

দিন রইল না। কুমার সেবার এলাহাবাদ থেকে যখন বাড়ী এলো, তখন মা'কে স্পষ্ট ক'রেই জানালে, নানা দিক দিয়ে ওকে বহু অসুবিধেয় প'ড়তে হচ্ছে, খাওয়া দাওয়ার কষ্টটাও খুবই বেশী। তাই ও এবার হৈমন্তীকে সঙ্গে ক'রেই নিয়ে' যেতে' চায়, এলাহাবাদে বাড়ীও ঠিক ক'রে ফেলা হ'য়েছে। ছেলের অসুবিধার কথায় মা তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলেন, বাপ ভালো মন্দ কোনো উচ্চ বাচ্যই ক'রলেন না। কুমার অনুমান করলে মৌনই সম্মতির লক্ষণ।

কুমার হৈমন্তীকে নিয়ে এলাহাবাদে এলো এবং দু'জনে বাঙালি পাড়ায় ছোট্ট একটি বিরাম-নীড় রচনা ক'রলে। বাস্তবিক, বিয়ের পরে এইটেকেই ওদের সত্যিকারের 'হনিমুন' বলা চলে। বৃহৎ পরিবারের বহু মানুষের ভীড়ে দু'টি মিলন-লুব্ধ চটুল-চিত্ত তরুণ-তরুণীর মন দেওয়া-নেওয়া বারে বারে বাধা পায়, গুরু-লঘুজনের দৃষ্টি থেকে থাকতে হয় সদা সন্ত্রস্ত। ছাড়া ছাড়া মিলন আর চাপা হাসি, টুকরো কথার নানান্ জোড়াতাড়া। এক ফাঁকে আঁচলটা একটু চেপে ধ'রতেই হয়তো কোথা থেকে মাসিমা এসে উপস্থিত হন, দরজার আড়ালে অন্ধকারে তৃষিত মুখের উপর তৃষিত ঠোঁট দু'টি একটুখানি নামিয়ে আনতেই আলো হাতে পিসিমার সাড়া পাওয়া যায়। রাত্রেও দু'জনে মন খুলে গল্প করবার উপায় নেই, পাশের ঘরে বড়দা রাত জেগে গোরু চুরি আর রাহাজানির সেকশানগুলি অনুসন্ধান করেন। প্রণয়-গুঞ্জন তাঁর কাণে না যায়, সেদিকেও নজর রাখা দরকার।

বলা নিষ্প্রয়োজন, সদ্যোবিবাহিত দম্পতীর কাছে এই বাধার অত্যাচারগুলো কি রকম দুর্বিবহ ঠেকত এবং আজকে এই পরিবারের প্রয়োজনাতিরিক্ত জনতার বাইরে নিজেদের রচিত ছোট্ট একটি সংসারের অবাধ মিলনের মাঝখানে প্রবেশ করে দু'জনেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

কুমার গভীর সুরে বললে, "সত্যি হৈম, এতদিন যেন তোমাকে কাছেই পাইনি। চারদিকে কেবল বাধা আর বাধা,—বিরাট একটা মহাসাগর যেন দু'জনের মাঝখানে বিচ্ছেদ রচনা করে বসে আছে। আর আমরা চক্রবাক্ চক্রবাকীর মতো—"

হৈম হেসে ফেললে, বললে, "করো তো বাপু লেখাপড়ের কাজ, এত কাব্য কোথায় পাও বলো দেখি?"

কুমার সোফায় শুয়েছিল, এবার পিঠ সোজা করে একেবারে উঠে বসলে, বললে, "জানো হৈম, মানুষ কাব্য লিখতে পারে কখন? একঘেয়ে গতানুগতিক জীবনের মাঝখানে যখন একটা সোণার লগ্ন এসে তার মনকে দোলা দেয়, তখন সেই বৈচিত্র্য থেকেই সৃষ্টি হয় কবিতার। মনে করো, সমস্তদিন কারখানার মেশিনের গর্জনে বধির থেকে, সর্বাঙ্গে কালি-ঝুলি মেখে' সন্ধ্যার সময় মানুষ যখন কারখানা থেকে বেরিয়ে আসে, তখন যদি সে তাকিয়ে দেখে যে দিগন্তে সবুজ মাঠের পারে সন্ধ্যামাখানো তাল-বীথির মাথার ওপরে একখানা পূর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে ভেসে উঠেছে, তখনি তার পরিশ্রান্ত পীড়িত মনে কবিতার সুর গুন্ গুন্ করে ওঠে।"

হৈম সকৌতুকে বললে, "তুমি তা'হলে সত্যিই কবিতা-লেখা সুরু ক'রলে নাকি? আমাদের একটু দেখালেও না?"

কুমার বললে, "এ কবিতা বাইরে লিখে রাখতে হয়না হৈম, অন্তরে অন্তরেই এ কবিতার স্থান। তাই তোমাকে যেদিন থেকে দেখলাম, সেদিন থেকেই আমার এই অতি-বাস্তববাদী মনটাতে বেজে উঠল অবাস্তবের গান। মনে মনে কবিতার আসন ক'রলাম রচনা, আর সেই আসনে তুমি এলে মূর্তিমতী কবিতা-লক্ষ্মী হয়ে।"

হৈম ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে বললে, "হুঁ, কবিতা-লক্ষ্মীই বটে! আমি কালো, আমি বি-এ পাশ করিনি, আমাকে নিয়ে তুমি জীবনে সুখী—"

কুমার বাধা দিলে, তারপর হাত বাড়িয়ে সস্নেহে হৈমর নাকটি নেড়ে দিয়ে বললে, "গাঁয়ের লোকে যাকে কালো বলে, সেই-ই যে আমার কৃষ্ণকলি গো!"

বাস্তবিক, কুমারের সঙ্গে হৈমন্তীর বিয়ে,—এটাকে বিশ্বের অন্যতম আশ্চর্য বস্তুর মধ্যে পরিগণিত ক'রলেও অতিশয়োক্তি হয় না। যখন কুমার যখন ছাত্র জীবনের ধাপগুলো সগৌরবে অতিক্রম করে মোটা বেতনের একটা সম্মানিত সরকারী পদ জুটিয়ে ফেললে, তখন থেকেই সজ্জন এবং স্বজনেরা তাকে উদ্বাহরূপ বন্ধনে আবদ্ধ করবার চেষ্টায় একেবারে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। সম্বন্ধ আসতে লাগল বন্যাস্রোতে, কিন্তু তার কোনোটাই ধোপে টিকল না, কুমারের পছন্দই আর হ'য়ে ওঠে না।

বন্ধুরা বিরক্ত হ'য়ে বললে, "তবে তুমি কী চাও, তোমার মৎলবটা কি

কুমার মৃদু হেসে বললে, "মৎলবটা আমার মোটেই মন্দ নয়, বিয়ে না ক'রে আমার পবিত্র চরিত্র সম্বন্ধে তোমাদের অবাধ সন্দেহ এবং সমালোচনার সুযোগ দেব, সে রকম সদভিপ্রায়ও আমার নেই। আসল কথা কী জানো? এসব commonplace মেয়ে—"

—"ওঃ বাবা, তুমি আবার uncommon মেয়ের দিকে ঝুঁকেছ। আচ্ছা, কি রকম মেয়ে তুমি চাও, সেটা একবার শুনতে পাই কি?"

—"নিশ্চয়, তোমরা যখন আমার বিশ্বস্ততম বন্ধু, তখন তোমাদের ছাড়া আর কার কাছেই বা ব'লব? আমি এমন একজনকে চাই, যা'র চোখে প্রভাতী তারার স্বপ্ন, যা'র হাসিতে স্নিগ্ধ বাসন্তী আনন্দের বিকাশ, যা'র মন সংসারের আর দশটি মেয়ের মতো ছোটো নয়, যে প্রত্যেক দিনের চেনা জানার ওপারে রূপ জগতের নব নব স্বপ্ন দেখতে পাবে, যা'র কল্পনা বিরাট ও বিস্তৃত, বাইরের চাইতে অন্তরের জগতে যা'র দৃষ্টি বেশী নিবদ্ধ, চাঁদের আলোয় যে মনের দরদ এবং অনুভূতি দিয়ে ঈয়েটস্ পড়ে শোনাতে পারে—"

বন্ধুরা যোগ করে দিলেন: "যে বারো হাত কাঁকুড়ে তেরো হাত বীচি গজাতে পারে—" এ হেন স্বপ্নবাদী কুমার এবং পত্নী সম্বন্ধে যা'র কল্পনা এতখানি লাগাম-ছেঁড়া, সে হৈমন্তীর মতো অতি, অতি সাধারণ মেয়ে দেখে' যে মুগ্ধ হ'বে, এ যেন ভেল্‌কীবাজী! অথচ অবস্থা-ক্রমে এই অসম্ভবটাই সম্ভব হয়ে গেল। মুঙ্গেরে থাকতে সেবার অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে কুমার অসুস্থ হয়ে পড়ে। চাকর বাকরের সেবা-শুশ্রূষার অযত্নে যখন ওর অবস্থা দিনের পর দিন চ'লেছিল অবনতির দিকেই, তখন ওর প্রতিবেশী এক বাঙালী ভদ্রলোক এ অবস্থায় একেবারে বুক দিয়ে এসে' পড়েন। তাঁর নিজের এবং তাঁর পরিবারের মিলিত যত্নেই কুমার সে যাত্রা রক্ষা পায়। সেই প্রতিবেশীর মেয়েই এই হৈমন্তী।

ওদের প্রণয়ের পূর্বরাগ কিভাবে হ'য়েছিল এবং কেন যে তার এই বিবাহান্তক পরিণতি ঘটল সেগুলো নির্ণয় করা কঠিন নয়। রোগ শয্যায় প'ড়ে এই মেয়েটির অকুণ্ঠ স্নেহ সেবা এবং এই পরোপকারী পরিবারের প্রতি নিজের অন্তরের অসীম কৃতজ্ঞতা, এই দু'টি জিনিষ একত্রে মিলিত হ'য়েই ভালোবাসার রূপ নিয়ে প্রকটিত হ'ল। পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে একান্ত আদর্শবাদী কুমার যেন কা'র মন্ত্র বলেই ভ্রষ্টাদর্শ হ'য়ে এই কালো, অর্ধ-শিক্ষিতা, দরিদ্রের মেয়েটিকেই নিজের জীবনসঙ্গিনী ক'রবার জন্য বেছে নিলে। চাঁদের আলোয় ঈ'য়েটস্ প'ড়ে শোনানো তো দূরের কথা, ঈ'য়েটসের নামই সে কোনোদিন শুনেছে কি-না সন্দেহ।

কিন্তু তবুও কুমার খুশী হ'ল, অন্তত কোনো অংশে এতটুকু অখুশী হ'য়েছে ব'লে মনে ক'রবার কারণ ছিল না। আর হৈমন্তী? ঘুঁটে কুড়ুনির বরাতে রাতারাতি রাজপুত্র!

কপোত কপোতীর মতোই দু'জনের দিন কাটতে লাগল।

একদিন হৈমন্তী ব'ললে, "আমার ভয় করে।"

কুমার বিস্মিত হ'য়ে ব'ললে, "কিসের ভয়?"

হৈমন্তী ওর মুখের পানে তাকালে: "এত পেয়েছি, যে ভয় হয় কোন সময় তা' হারিয়ে ফেলি তুমি যদি—"

কুমার হো হো ক'রে হেসে উঠল: "ওঃ, এই ভয়? তা' এরকম ভয় আমারো মাঝে মাঝে করে হৈমন্তী। আমি ভাবি, আমাকে যদি তোমার মনে না ধ'রে থাকে, যদি তুমি আমাকে ভালোবাসতে না পারো—"

গভীর ভালোবাসা আর নিবিড় কৃতজ্ঞতায় হৈমন্তীর মুখখানা ধ'রলে অপরূপ শ্রী, গলার স্বর এলো কেমন ভিজে আর ভারী হ'য়ে: "তোমার সব তাতেই ঠাট্টা। তুমি আমাকে একেবারে ছেলেমানুষ মনে করো, না? ভাবো, আমার সব কথাই বুঝি এম্‌নি হেসে উড়িয়ে দেবার মতো।"

কুমার অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে ব'ললে, "কি সর্বনাশ, তোমাকে ছেলেমানুষ কখনো ব'লতে পারে নাকি কেউ? সংসারে এত বড় দুঃসাহসী কে আছে? ওগো ঠানদি', বলি নাতি-নাতনীদের [illegible] কুশল তো?"

কুমারের কথার ভঙ্গীতে এবার দু'জনেই হেসে গড়িয়ে পড়ল।

দূর সম্পর্কের এক মাসীমা সেদিন লিখ্‌লেন, তিনি তীর্থ পরিভ্রমণে বেরিয়েছেন। জীবনে কিছুই তো করা হ'ল না, কাজেই শেষ বয়সে এই সব তীর্থ আর দেবস্থানগুলো পর্যটন ক'রে যদি কোনো একটা পারত্রিক উপায় হয়, তিনি তা'রই চেষ্টায় আছেন। তাই তিনি এলাহাবাদে আসছেন এবং কয়েকদিনের জন্ম কুমারের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ ক'রবেন।

কুমার বিরক্ত হ'য়ে ব'ললে, "এসব কী অত্যাচার বলো দেখি?"

হৈমন্তী হেসে' ব'ললে, "তুমি কী স্বার্থপর! বুড়ো মানুষটা দু'দিনের জন্যে আস্‌ছেন তীর্থ ক'রতে, তা'কেই তুমি অত্যাচার ব'লে মনে ক'রছ?"

কুমার সামান্য একটু অপ্রতিভ হ'ল, ব'ললে, "না, না, তা' ঠিক নয়। তাঁ'র থাকার জায়গা বা খরচের দিক দিয়ে কোনো কথাই আমি ভাবিনে'। আমি শুধু ব'লছিলাম আমার বাড়ীতে এই সব সাহেবী কারবার, নানারকম খানাটানা, মাসীমা এসবের মধ্যে এসে' নিজেই বিব্রত বোধ ক'রবেন।"

হৈম ব'ললে, "সে ভাবনা তোমার ভাবতে হ'বে না, সব আমিই ঠিক ক'রে নেব, বুঝেছ? তুমি এখনি মাসীমাকে লিখে' দাও তিনি যেন যত শিগ্‌গীর পারেন, চ'লে আসেন।"

—"বেশ," ব'লে কুমার বেরিয়ে গেল।

কয়েকদিন পরেই দূর সম্পর্কের একটি ছোট ভাইপোকে সঙ্গে ক'রে মাসীমা এসে' উপস্থিত হ'লেন। কিন্তু শুধু মাসীমাই ন'ন, তাঁর সঙ্গে এলো আর একটি মেয়ে, যা'র কথা চিঠিতে লেখা ছিল না। মাসীমার এক দেবর-কন্যা, কলকাতার কোনো কলেজের ছাত্রী।

মেয়েটির নাম ঝর্ণা। ঝর্ণাই বটে! তেমনি লাফিয়ে নেচে' হাসি গল্প-গানে দু'ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ীটাকে মুখর করে তু'ললে। হৈমন্তীর গলা জড়িয়ে ধ'রে ব'ললে, "দ্যাখো ভাই, আমি ব'সে ব'সে সিভিক্‌স্‌ আর কন্‌ষ্টিটুশান মুখস্থ ক'রে মরি আর ওদিকে জ্যেঠিমা দিব্যি গোটা ভারতবর্ষটাকে পাড়ি দিতে বেরিয়ে পড়েছেন। কা'র প্রাণে এটা সহ্য হয়, বল তো দেখি? আমিও তক্ষুনি বাক্সটা গুছিয়ে হোষ্টেল থেকে ছুটে' বেরিয়ে প'ড়্‌লুম, আর একটা ট্যাক্‌সী ডেকে' একেবারে হাওড়ার ইষ্টিশানে।"

হৈম মৃদু হেসে' ব'ললে, "তোমার পড়াশুনোর ক্ষতি হ'বে তো?"

—"হোক্‌ গে' ক্ষতি। ম্যাট্রিকে না পড়েই একটা বৃত্তি পেয়েছিলুম, আই-এ তেও মোটামোটি একটা পা'বই। ওর জন্যে কে দিনরাত খাট্‌তে যাবে?"

হৈম সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে ব'ললে, "তুমি স্কলারশিপ্‌ পেয়েছ?"

—"ও কিছু নয় ভাই, পরীক্ষা দিলেই পাওয়া যায়, তুমিও পেতে' পারো। কিন্তু কী সুন্দর তোমাদের এই বাড়ীটা,—যেমন যত্ন, তেম্‌নি আর্টিষ্টিক্‌ টেষ্টের ছাপ আছে।"

কথাটা ব'লেই ঝর্ণা চঞ্চল পায়ে তড়্‌তড়্‌ ক'রে সিঁড়ী দিয়ে নেমে' গেল, তারপর সাম্‌নের বাগানটা থেকে একটা গাঢ় লাল বড় গোছের গাজীপুরী গোলাপ তুলে' আনলে। ব'ললে, "বাঃ, চমৎকার ফুলটা! এতবড় গোলাপ সচরাচর দেখতেই পাওয়া যায় না কিন্তু।"

কুমার মুখের সামনে একটা খবরের কাগজ খুলে' ব'সেছিল, কিন্তু পড়্‌ছিল না, ওর মন এবং শ্রুতি, দু'টোই উৎকর্ণ হ'য়ে ছিল অন্যদিকে। কাগজের থেকে চোখ না তু'লেই ব'ললে, "ওটা স্পেশ্যাল্‌ কোয়ালিটির, এদেশে পাওয়া যায় না। গাছটাকেও অনেক যত্নে বাঁচাতে হ'য়েছে।"

ঝর্ণা ব'ললে, "এত যত্নের ফুল আপনার, তুলে' আনলাম ব'লে রাগ ক'রলেন না তো?"

কুমার এবার ঝর্ণার মুখের দিকে চাইলে, ব'ললে, "এখনো রাগ করিনি', কিন্তু ক'রব, যদি না ফুলটাকে ঠিক মতো ব্যবহার করা হয়।"

ঝর্ণা সকৌতুক কৌতূহলে জিজ্ঞাসা ক'রলে, "কি রকম ব্যবহার, বলুন?"

কুমার ব'ললে, "এ গাছের ফুল ছিঁড়লে' সে ফুল খোঁপায় প'রতে হ'বে এমনি নিয়ম আছে।"

ঝর্ণা মৃদু হেসে' ব'ললে, "ওঃ এই নিয়ম? অবশ্য এক্ষেত্রে সিভিল্‌ ডিস্‌ওবেডিয়েন্স না হ'লেও ক্ষতি নেই। কিন্তু যা'র রূপ নেই, সে যদি খোঁপায় ফুল পরে—"

হৈম ব'ললে, "আহা কি বিনয়! তোমার তো রূপ নেই, আছে আমার! তোমার রূপের দশভাগের একভাগ পেলেও যে আমরা উদ্ধার হ'য়ে যেতুম।"

হৈমন্তীর কথা একবারে মিথ্যা নয়। ঝর্ণা সুন্দরী, নিখুঁত সুন্দরী হয়তো নয়, কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং প্রতিভার ছাপ ওর মুখ চোখকে স্বতন্ত্র একটা সৌন্দর্যে মণ্ডিত ক'রে রেখেছে। চিবুকের নীচে ছোট্ট একটা কাটার দাগ, কিন্তু সে দাগটি ওর মুখশ্রীকে এতটুকু বিকৃত তো করেইনি', বরং এমন একটা বিশিষ্টতা দান ক'রেছে যে সে মুখ একবার দেখলে আর দ্বিতীয়বার ভোলবার উপায় নেই। লঘু স্বচ্ছন্দ দেহের উপর দিয়ে পূর্ণ যৌবন যেন লীলায়িত গতিতে ব'য়ে যায়।

—ঝর্ণা!

তা'র কলধ্বনিতে এঞ্জিনীয়ার কুমারের কাজে অনিয়ম আসতে লাগল। অত্যন্ত দরকারী কতকগুলো কাগজপত্র নিয়ে বসতেই হয়তো ওঘর থেকে অর্গ্যানের সুর ভেসে এলো, গান শোনা গেল:

"তখনো চাঁদ ঘুমিয়েছিল
ভুঁই চাঁপারা কয়নি কথা,
বাজিয়ে তোমার চরণ-ধ্বনি,
জাগালে কোন্ চঞ্চলতা—"

কাগজপত্র থেকে কুমারের দৃষ্টি অপসৃত হ'ল, খোলা কলমটি টেবিলের উপরেই রইল প'ড়ে। এ ঘরে এসে বললে, "ঝর্ণা, তোমার গলাটা যেন বায়না করা। এত চমৎকার গান কোথায় শিখলে বলো তো?"

ঝর্ণা অর্গ্যানটাকে বন্ধ ক'রে হেসে বললে, "সন্দেহ হচ্ছে, কথাটা বিদ্রূপ ক'রে বলা।"

কুমারের কণ্ঠ হঠাৎ যেন কেমন আবেগে স্পন্দিত হ'য়ে উঠল: "সত্যি বলছি ঝর্ণা, তুমি ভারী সুন্দর গাইতে পারো। গানটাকে আমি এত ভালবাসি, কিন্তু—"

কী একটা কথা ঠোঁটের আগায় এসে পড়েছিল, কুমার মুহূর্তে সেটাকে সংযত ক'রে নিয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল এবং ঝর্ণা বিস্মিত চোখে ওর গতিপথের পানে তাকিয়ে রইল।

কুমার নিজের ঘরে ফিরে এল, তারপর টেবিল থেকে একটা পেনসিল তুলে নিয়ে অত্যন্ত অধীর ভাবে সেটাকে দংশন করতে লাগল।

এই ঝর্ণা! এই ঝর্ণার সঙ্গেই ওর বিয়ের কথা হয়েছিল। একটি মাত্র কথা, এতটুকু সম্মতির অবকাশ পেলেই ঝর্ণা একান্তভাবে ওর হ'য়ে যেতে পারত। কিন্তু কুমার সেদিন ঝর্ণাকে দেখবারও প্রয়োজন মনে করেনি,—ওর সমস্ত অন্তর জুড়ে সেদিন হৈমন্তীর জন্যে আসন পাতা হ'য়েছে। সেই রোগ শয্যা, সেই সেবা,—সেই কৃতজ্ঞতা!

—কৃতজ্ঞতা! এতবড় মিথ্যা, এতবড় প্রবঞ্চনা পৃথিবীতে আর সৃষ্টি হয়নি। এই মিথ্যা কৃতজ্ঞতার কুয়াসা মানুষের দৃষ্টিকে ক'রে ঘোলাটে, তা'র বিচার বুদ্ধিকে করে আচ্ছন্ন। তা'র দানের শক্তি নির্ধারণ না করেই সে নিজেকে চায় সম্পূর্ণভাবে উজাড় ক'রে দিতে এবং তা'র পরিণামে অসহ্য আত্মগ্লানি আর নিজের মূঢ়তার ধিক্কার ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

কী পেয়েছে ও, কতটুকুই বা পেয়েছে? ওর যতটুকু প্রাপ্য, যতখানি ওর দাবী এই সংসারের কাছে, তা' থেকে কী নির্মম ওর বঞ্চনা। অরূপা, অশিক্ষিতা, ইন্টেলেক্টের জগতে যা'কে খুঁজে পাওয়া যাবে না কোনোদিন। এই কী ছিল ওর স্বপ্ন আর কামনা? ও কী চেয়েছিল একজন নীরব আজ্ঞানুবর্ত্তিনী সেবিকা, বুদ্ধি এবং চিন্তা জগতে যা'র এতটুকু প্রবেশাধিকার নেই? শুধুই কী ছায়া, এতটুকুও আলো নয়?

কৃতজ্ঞতা,—কৃতজ্ঞতা! স্বরচিত এই শৃঙ্খলে ওর কণ্ঠ নিষ্পেষিত হ'তে চ'লল। আফিং খাওয়া মন একদিন ছিল ঘুমিয়ে, ঠিক মতো নির্ণয় করতে পারেনি' তা'র লাভালাভের মূল্য। কিন্তু সে যখন জেগে' উঠল, তখন শুধু উপায়হীন মর্মতাপ ছাড়া আর কোনোকিছুই ক'রবার রইল না।

কুমার অস্থিরের মতো ঘরময় পায়চারী ক'রতে লাগল।

দু'দিন পরেই ঝর্ণারা চ'লে গেল, শুধু রেখে গেল কুমারের মনে একটা অতি গভীর ক্ষত চিহ্ন।

সন্ধ্যার ট্রেণেই ওদের উঠিয়ে দিয়ে এসেছে কুমার, এবার সোজা ঘরে ঢুকে' একেবারে বিছানা নিলে।

নিঃসন্দিগ্ধা হৈমন্তী উদ্বিগ্ন ভাবে কাছে এলো: "কি হ'য়েছে তোমার ?"

—"কিছু নয়।"

—"কিছু নয় কিগো, নিশ্চয় তোমার শরীর খারাপ ক'রছে। নইলে এ ভাবে সন্ধ্যার সময় তো কখনো শুয়ে' পড়োনা।"

কুমার তিক্ত ভাবে ব'ললে, "না, না, কিছু হয়নি।"

হৈমন্তীর উৎকণ্ঠা তবুও গেল না, বললে: "মাথাটা টিপে দেব একটু ?"

—"না, না, না—" কুমার একেবারে যেন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল: "তুমি আমার সামনে থেকে স'রে যাও, এখন একটু স্বস্তিতে থাকতে দাও, বুঝেছ ? সব সময় ও রকম ঘ্যান ঘ্যান ভালো লাগে না।"

কুমার অন্যদিকে পাশ ফিরলে।

বিয়ের পরে এমন কঠিন কথা কুমার ওকে কোনোদিন বলেনি। বিস্ময়-স্তম্ভিতা ব্যথিতা হৈমন্তীর চোখ দিয়ে ব্যর্থ অভিমানের বন্যা নেমে' এলো।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সনেট

শ্রীমতী জ্যোতির্মালা দেবী

যে পথে আলোর লাগি' অদৃশ্য জনম
আপনারে মুক্তি দিল অনন্ত-বেলায়,
ধরণীর অন্ধ আঁখি সেই অনুপম
যাযাবর শুভ্রতার স্বরূপ-দোলায়
সমছন্দ সুপ্তিসম নিবিড় গহনে
ডুবিল নিস্পন্দ রেশে। যে হৈম দীপালি
জ্বলেছিল নব-নিশা-নন্দিত শয়নে
হেথা তারি বর্ত্তিকার সুরভি সঞ্চালি'
উঠে এলো সৃষ্টিধর সম্রাট-নয়ন ঃ
অনিদ্র-আবেশমাখা ইঙ্গিতে তাহার
দিকে দিকে বিকাশিল অতন্দ্র গগন।...
প্রকাশের স্রোতময়ী বৈদ্যুত-আধার
জানে না কি কারে চাহি' রাঙাল সহসা
প্রসূনের হৃদিপুটে জন্মের তমসা!

অশোকের ধর্ম

শ্রীআদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ

দেবানাং-প্রিয় প্রিয়দর্শী অশোকের ধর্মমত লইয়া যাঁহারা এতাবৎ আলোচনা চালাইয়া আসিতেছেন, অধিকাংশক্ষেত্রেই তাঁহারা স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরিয়া লইয়াছেন যে, অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আধুনিক পণ্ডিতবর্গের মধ্যে যাঁহারা বিষয়টীর উপর গবেষণা করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে হুল্‌জ [E. Hultszch Ph. D.] সাহেবের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। অশোকের প্রস্তর-লেখগুলির উপর তিনি গবেষণাপূর্ণ যে বিরাট গ্রন্থখানি Corpus Inscriptionum Indicqrum Vol I প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা রচয়িতার কর্মশক্তি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়। উহাই এবিষয়ে প্রামাণিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে দেখা যায়, পণ্ডিতপ্রবর হুল্‌জ সাহেবও, প্রস্তর-লেখগুলির প্রণেতা অশোককে বৌদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এস্থলে একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হইতেছে এই যে, দেবানাং প্রিয়ের প্রস্তর-লিপিগুলির সূক্ষ্মভাবে অর্থ-বিচার করিলে দেখা যায়, উক্ত মতবাদ সমর্থনের পক্ষে আমাদের দৃঢ় যুক্তি বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই নাই। বরং প্রস্তরলিপির মধ্যে অশোকের যে মনোভাব ফুটিয়া উঠে, তাহাতে তাঁহাকে একজন অ-বৌদ্ধ বলিয়াই মনে হয়, এবং দু-এক বিষয়ে তিনি যে একজন বিশেষভাবে বৌদ্ধ-বিরোধী ছিলেন তাহাই প্রতীয়মান হয়। যে-কয়েকটী তথাকথিত যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া পণ্ডিতগণ প্রস্তরলিপিগুলির রচয়িতা দেবানাং-প্রিয়কে বৌদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন ও প্রচার করিতে চাহেন, তাহাতে যুক্তির অতি ক্ষীণ আভাসও যে পাওয়া যায় না, তলাইয়া দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

অশোক জীবহিংসার ঘোর বিরোধী ছিলেন, এবং তাঁহার জীবে দয়ার কথার উল্লেখ প্রস্তরলিপিগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁহার এই দয়া-প্রবণতার কথা একাধিক স্থলেই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু, এই অহিংসা নীতি প্রচারের মধ্যে তাঁহার একটা বিরাট হৃদয়ের পরিচয়ই আমরা পাই; তাঁহাকে বৌদ্ধ বলিয়া মতবাদ প্রচারের পক্ষে কোনও প্রকার যুক্তি ইহাতে মিলে না। আমাদের দয়ালু-হৃদয় স্বামীজী যে-হেতু বাণী দিয়াছেন 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর', সেই কারণে যদি কেহ তাঁহাকে বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান বা অন্য কোনও অ-হিন্দু জাতীয় বলিয়া প্রচার করিবার প্রয়াস পায়, তাহা হইলে আমাদের হাসি পাইবে।

বরংচ, অহিংসা, পিতা-মাতার সেবা, আত্মীয় স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার প্রভৃতি গুণাবলী দেবানাং প্রিয় 'সাধু' বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন, বৌদ্ধ-বাণী বলিয়া নহে। এবং এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে হয়, কলিঙ্গ-বিজয়ের যুদ্ধের পরিণতিতে যে পৈশাচিক শোনিত-পাত্ ও নিদারুণ আত্মীয়-বিচ্ছেদের নিষ্ঠুর জ্বলন্ত ছবি তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার হৃদয়ে অতি গভীর ও করুণ-ভাবে রেখাপাত্ করিয়াছিল। ইহাতে তিনি যে জীব-হিংসার প্রশ্রয় দিতে পারেন নাই, এবং পারিবারিক সুখ মধুরতর করিতে ও স্বজন-প্রীতি বর্ধিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক।

সঙ্ঘ, সমাজ, পরিসা প্রভৃতি কয়েকটী শব্দের অর্থ লইয়াও গোলমাল আছে। শব্দগুলির অর্থ জোর করিয়া বৌদ্ধ রীতির আনুকূল্যে টানিয়া আনিবার একটা যুক্তিহীন প্রচেষ্টা অনেক পণ্ডিতকেই পাইয়া বসিয়াছে। শব্দের সাধারণ ও সহজ আভিধানিক অর্থ ছাড়িয়া বৌদ্ধ ধর্মানুযায়ী সংকীর্ণ ও বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিবার পক্ষে কোনও যুক্তি আমরা দেখিতে পাই না। বৌদ্ধ-মতানুসারে 'ভিক্ষুসঙ্ঘ'

অর্থ টানিয়া আনিয়া 'সঙ্ঘ' শব্দটীর সাধারণ ভাবে ব্যাখ্যা করিবার কোনও কারণ দেখি না; শব্দটীর সহজ ও সাধারণ আভিধানিক অর্থই গ্রহণ-যোগ্য। 'সমাজ' শব্দটীর হুল্‌জ সাহেব অর্থ করিয়াছেন, 'festive meeting' বা উৎসবের মেলা। এই অর্থ অনেকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু, শব্দটীর এই সংকীর্ণ বৌদ্ধ অর্থ আমাদিগের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। শব্দটীর দ্বারা, আধুনিক ক্লাবেরই [club] অনুন্নত সংস্করণের ন্যায় একটা কিছু বুঝাইতেছে বলিয়াই মনে হয়। ভব্যতা-বিহীন আলোচনা ও অশ্লীলতার প্রশ্রয় এই সকল স্থানে সাধারণ-ভাবে দেওয়া হইত। এবং সেই কারণেই সম্ভবতঃ অশোক উহা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তবে, 'সমাজ'-এর দ্বারা যে জনগণের মানসিক উৎকর্ষও সাধিত হইতে পারে, তাহা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। তাই, তিনি বলাইলেন, "...অস্তি পি তু একচা সমাজা সাধুমতা দেবানং প্রিয়স প্রিয়দসিনো রাঞো...", অর্থাৎ, দেবানাং-প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার অনুমোদিত এক-প্রকার 'সমাজ'ও আছে। বোধ হয়, ইহা এমন এক-প্রকার 'সমাজ'-এর উল্লেখ, যাহার সহিত অশোকের ব্যক্তিগত সংস্পর্শ ছিল; এবং সেই স্থানে নানা উচ্চ-চিন্তায় এবং জনগণের মঙ্গল-আলোচনায় ভাবুক চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ নিযুক্ত থাকিতেন। পরিসা শব্দটীর দ্বারা অশোকের রাজ-পরিষদের কথাই বলা হইয়াছে; অন্য অর্থে কোনও ক্রমেই শব্দটীর ব্যাখ্যা করা চলে না।

অশোককে বৌদ্ধ প্রমাণ করিবার নিমিত্ত হুল্‌জ সাহেব, ধম্মপদের সহিত তাঁহার প্রস্তর-লিপিগুলির স্থানে-স্থানে সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। কিন্তু, একটু সূক্ষ্মভাবে ব্যাপারটা বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, ইহাতে অশোককে বৌদ্ধ প্রতিপন্ন করা যায় না। কতকগুলি বিষয়ে আমরা ধম্মপদের সহিত প্রস্তর লিপিগুলির যে মিল লক্ষ্য করি, তাহা বোধ করি পৃথিবীর সর্বধর্মেই মিলিবে; এগুলিকে বৌদ্ধ-ধর্মের বা অন্য কোনও একটা ধর্মের বৈশিষ্ট্য বলিয়া ধরা চলে না। সত্যবাদিতা, ক্রোধ বর্জন, দান প্রভৃতি মানবগুণের কথা হুল্‌জ সাহেব এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এমন ধর্মের কথা জানি না, যাহাতে সত্যবাদিতা, ক্রোধ বর্জন, দান প্রভৃতি গুণগুলি বরেণ্য নহে। এ-গুলি বিশ্বমানবতার ধর্ম, অর্থাৎ এ'গুলিকে কোনও বিশেষ ধর্মের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ করা যায় না। এবং এই গুলির বিষয়ে বৌদ্ধ ধর্মের সহিত প্রস্তর-লিপিগুলির যাহা-কিছু সাদৃশ্য আমরা পাইয়া থাকি, তাহার উপর ভিত্ প্রতিষ্ঠা করিয়া গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক আলোচনা চলে না। [হুল্‌জ, li, lii পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]।

অবশ্য, ইহা আমরা জানি যে, অশোকের ধর্মলিপির কোনও কোনও নির্দেশ, ধম্মপদের অনুরূপ ভাবযুক্ত পদ সহজ ভাবেই স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সকল ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ দেবানাং প্রিয় ধম্মপদের নির্দেশকে সম্মান করিয়াছেন। কিন্তু, ইহাই ত' তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। সমগ্রভাবে তাঁহার প্রচার লিপিগুলির আলোচনা করিলে মহারাজা অশোকের যে সংস্কার-মুক্ত বিরাট হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তিনি, যাহা গ্রহণীয় তাহা পর-ধর্মের বলিয়া উপেক্ষা করিতে কোনও ক্রমেই পারেন না। প্রকৃত বরণীয় বলিয়া যদি তিনি কোনও কোনও বৌদ্ধ-নির্দেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার উদার ধর্মমতেরই পরিচয় পাওয়া যায়; এবং ইহাতে, তিনি যে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ মিলে না। বরং, ধর্মমতের এই উদারতা যে হিন্দু ধর্মেরই একটী বিশেষ লক্ষণ, তাহা এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। হুল্‌জ সাহেবও ইহা জানেন:

"......In reality Hindus have been at all times extremely tolerant to other creeds and have allowed everybody to try to attain salvation in his own fashion. ...The same tolerance was practised by Asoka......"

মহারাজা অশোক স্বয়ং, বুদ্ধদেবের জন্মস্থান 'লুংবিনি' গ্রামে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া, রুম্মিন্দেয়ি স্তম্ভ-লিপিতে [Rumindei Pillar Edict-এ] উল্লেখ আছে। এই কারণে, অশোক বৌদ্ধ-ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন,—এই ধারণা অনেক পণ্ডিতের নিকট দৃঢ়তর হইয়াছে। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়া বিচার করিলে এখানেও দেখা যায়

অশোককে বৌদ্ধ বলিয়া প্রচার করিবার পক্ষে প্রমাণ-উপাদান কিছুই নাই। দেবানাং-প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অশোক শুধু লিখাইয়াছেন,—

"দেবানং পিয়েন পিয়দসিন লাজিন বীসতি
বসাভিসিতেন অতন আগাচ মহীয়িতে হিদবুধে জাতে
সক্য মুনী তি সিলা বিগডভী চা কালাপিত
সিলাথভে চ উসপাপিতে হিদ ভগবং জাতে তি
লুংমিনি গামে উবলিকে কটে অঠভাগিয়ে চ।"

—এ ছাড়া আর কিছুই নাই।

ইহাতে, একজন মহাপুরুষ বলিয়া শাক্য বুদ্ধের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাবান ছিলেন, ইহাই আমরা মনে করিতে পারি। এবং তজ্জন্য তাঁহাকে বৌদ্ধ ঠাওরাইবার কোনও সঙ্গত হেতু নাই।

দেবানাং-প্রিয় তাঁহার সপ্তম প্রস্তর-শাসনে লিখাইয়াছেন,

"সো দেবানংপ্রিয়ো প্রিয়দসি রাজা দস বসাভিসিতো
সংতো অযায সংবোধিং......";

'But when king Devanan priya has been anointed ten years he went to Sambodhi.'

অর্থাৎ, ইহাতে এস্থলে বুঝা যাইতেছে যে, অশোক একবার সংবোধি, অর্থাৎ বুদ্ধ-দেবের বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তির স্থানে গমন করিয়াছিলেন, এবং শত সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়াছিলেন। অশোককে বৌদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইবার পক্ষে উক্ত ঘটনাটীর উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু এস্থলেও, তলাইয়া দেখিলে ইহাই বলিতে হয় যে, যে-কারণে তিনি লুংবিনি [বুদ্ধের জন্মস্থান] গমন করিয়াছিলেন, ঠিক সেই কারণেই তিনি সংবোধিও পরিদর্শন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার মহান হৃদয় একটী মহা-পুরুষের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছিল, ইহাই আমরা লক্ষ্য করি। যাঁহারা দেবানাং-প্রিয়ের এই স্বাভাবিক মনোভাবটীর উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে বৌদ্ধ বলিতে চাহেন, তাঁহারা, বলিতে হয়, মহারাজা অশোকের হৃদয়ের পরিচয় পান নাই। এবং তৎকারণে, তাঁহাদের গবেষণার গোড়াতেই রহিয়াছে গলদ।

এতৎপ্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'অযায় সংবোধিং' কথাটীর 'সংবুদ্ধ হওয়া' বা 'বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হওয়া' অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়াই অধ্যাপক বসু মহাশয় মনে করেন। অর্থাৎ, যে-স্থলে সাধারণতঃ 'অশোক সংবোধি [বুদ্ধদেবের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির স্থানে] গমন করিয়াছিলেন' বলিয়া অশোকের প্রস্তর-লিপিটীর ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে, সেখানে অধ্যাপক বসু মহাশয়ের মতে হইবে, 'অশোক [স্বয়ং] সংবুদ্ধ হইয়াছিলেন'।

অধ্যাপক বসু মহাশয়ের ভাষাই তুলিয়া দিতেছি :

"Ayáya Sambodhim—The real meaning of the phrase seems to be that Asoka himself became a Buddha after he had been consecreted ten years. We already pointed out that this is also supported by the text of the M-RE I. The conquest of Kalinga gave Asoka a religious turn of mind. He then passed two years in meditation. ......During the conquest of Kalinga the attention of Asoka was directed towards the peace and comfort of the people.... —This is the meaning of the phrase, Ayáya Sambodhim."

—'অযায সংবোধিং' কথাটীর এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে, উহার বিরুদ্ধে জোর করিয়া বলিবার কিছুই নাই।

অর্থাৎ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, অশোকের যে মনোভাবের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করিয়া তাঁহাকে বৌদ্ধ প্রতিপন্ন করা হইয়া থাকে তাহাতে বৌদ্ধ উপাদান কিছুই পাওয়া যায় না। উপরোক্ত, তাঁহার ধর্ম-লিপিগুলি বা প্রস্তর-লেখগুলি সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়ন করিলে, স্থানে স্থানে তাঁহাকে অ-বৌদ্ধ বলিয়াই দৃঢ় ধারণা জন্মে।

দেবানাং প্রিয়ের সমস্ত ধর্ম-লিপিগুলির মধ্যে কুত্রাপি 'নির্বাণ'-এর, অর্থাৎ যাহা বৌদ্ধ-ধর্মের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না; অথচ, ইহলোক-এবং পরলোক-এর [স্বর্গ] কথা তিনি তাঁহার নির্দ্দেশ-প্রচার-প্রসঙ্গে বহুবার বলিয়াছেন। তাঁহার পুত্র-সদৃশ জনগণের

ইহলোকের সাচ্ছন্দ্য ও পরলোকের পুণ্য-সুখ সম্বন্ধে যে তিনি আন্তরিকভাবে যত্নবান, তাহা তিনি জানাইয়াছেন। তিনি তাঁহার মহামাত্রদিগকে দিয়া বলাইয়াছেন,

"...সবে মুনিসে পজা মমা অথা পজায়ে ইছামি ইকং কিংতি সবেন হিত সুখেন হিদলোকিক পাললোকিকেন য়ুজেবূ তি তথা...মুনিসেসুপি ইছামি হকং..."

"...সব মানুষ আমার প্রজা [বা সন্তান], সন্তানগণের পক্ষে যেরূপ আমি সর্বতোভাবে ইহলোকের এবং পরলোকের সুখ প্রার্থনা করি, জনগণের পক্ষেও আমি সেই প্রার্থনাই করি..." [—ধৌলী পৃথক শাসন]

—এই ধরণের উক্তি তিনি বহুস্থানেই প্রয়োগ করিয়াছেন।

অর্থাৎ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, বৌদ্ধ ধর্মের 'নির্বাণ'-বাদ প্রচারের প্রসঙ্গ বা সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি সে-দিক দিয়া যান নাই। বৌদ্ধ-ধর্মের নির্বাণ-বাদ যে তিনি মানিয়া লইতে কোনওক্রমেই পারেন নাই, এ স্থলে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ইহাই মনে হইতে পারে। হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত পরলোকেই তাঁহার বিশ্বাস ছিল ; এবং বৌদ্ধ-ধর্মানুমোদিত নির্বাণ-বাদ তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্মমতের অনুকূল নহে। হুলৎজ সাহেব নিজেই বলিয়াছেন,—

In one important point Asoka's Inscriptions differ from and reflect an earlier stage in the development of Buddhistic Theology.......they do not yet know anything of the doctrines of Nirvana, but presupposes the general Hindu belief that the rewards of the practice of Dharma are happinees in this world and merit in the other world."

প্রস্তরলিপিগুলির মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে মহারাজা অশোকের যে উদারতার পরিচয় আমরা পাই, তাহাতে তাঁহাকে বৌদ্ধ বিশেষতঃ একজন নব-দীক্ষিত বৌদ্ধ বলিয়া কদাচ মনে হয় না।... [পূর্বেই ইহা প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছি, এবং আবার আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি]। তিনি জানাইয়াছেন,

"...সব পাসংডা পি মে পুজিতা বিবিধায় পূজা..."

অর্থাৎ, ইহাই বুঝা যাইতেছে যে তিনি কোনও ধর্মকেই ছোট করিয়া দেখিতে পারেন নাই। সর্বশ্রেণীর ও সকল ধর্মের উপরই অশোক নানা দিক দিয়া শ্রদ্ধাবান। তাঁহার দ্বাদশ প্রস্তর-শাসনে ইহা স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি জানাইতেছেন,

"...যো হি কো চি আত্ম পাসংডং পূজয়তি পরপাসংডংচ গরহতি সবং আত্মপাসংড-ভতিয়া কিংতি আত্মপাসংডং দীপয়েম ইতি সো চ পুন তথ করাতো আত্মপাসংডং বাঢ়তরং উপহনাতি..."

অর্থাৎ,

"...যে-কেহ আত্মধর্মের পূজা করে, এবং পর ধর্মের অপবাদ দেয় (এবং তদ্বারা) আত্মধর্মের বড়াই করে, সে উহা করিয়া আত্মধর্মের সাংঘাতিক ক্ষতি করে।..."

—তৎকালে, অর্থাৎ যে-যুগে প্রচার ও প্রভাবে মত উত্তর ভারতে বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য সেই সময়, বৌদ্ধ সঙ্ঘের ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীরা প্রচার-প্রসঙ্গে অন্য ধর্মের প্রতি যে কটাক্ষপাত করিত, এ'-স্থলে মহারাজা অশোক, সম্ভবতঃ তাহারই ইঙ্গিত দিতেছেন।

অশোকের এই মনোভাব লক্ষ্য করিয়া আমরা কখন-ই তাঁহাকে নবদীক্ষিত বৌদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। যে-ব্যক্তি নূতন করিয়া কোনও ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে, তাহার মুখে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা-সূচক কোনও উক্তি, বা ধর্ম সম্বন্ধীয় কোনও প্রকারের উদারতা কদাচ আশা করা যায় না। এইরূপ স্থলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পর ধর্মের প্রতি একটা বিদ্বেষ-ভাব বিশেষ ভাবে উগ্র হইয়া উঠে।

নানা স্থানে বৌদ্ধ সঙ্ঘের ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদের প্রতি যে-সুরে তিনি তাঁহার নির্দেশ প্রচার করিতেছেন, তাহাতে বেশ একটা বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। বোধ হয়, তৎকালে বৌদ্ধ সঙ্ঘে যে-সকল কদাচার প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা মহারাজ অশোকের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি বহুস্থানে বৌদ্ধ সঙ্ঘের ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদিগের প্রায়শ্চিত্ত নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে আজ্ঞা করিতেছেন,

"...সংঘসি নো লহি যে সংঘং ভাখতি

ভিখু বা ভিখুনি বা সে পি চা আদাতানি
দুসানি সনং ধাপয়িতু অনাবাসসি আবাসয়ি যে…”

“(তাহাকে) সঙ্ঘে লওয়া হইবে না, যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুনী সঙ্ঘ-ভঙ্গ করিবে, তাহাকে শ্বেতবাস পরিধান করিতে হইবে এবং বাসহীন অবস্থায় থাকিতে হইবে…” (ইহা সামাজিক শাস্তি)। কারণ তিনি জানাইতেছেন,

‘…ইচ্ছা হি মে কিংতি সংঘে সমগে চিলথিতীকে সিয়া তি…”।

অধ্যাপক বসু মহাশয় ইহা লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছেন :

‘Saranath Kausambi and Sanchi Edicts prove that so great were the corruptions in the Buddhistic Sangha that royal proclamations were necessary to weed them out.’’

যে-ধর্মে এইভাবে নানা কদাচার প্রবেশ করিয়াছে, সেইরূপ একটী ধর্মকে দেবানাং-প্রিয়ের ন্যায় একজন বিশিষ্ট সুনীতি-সাধক আত্মধর্ম-রূপে গ্রহণ করিবেন, ইহা অভাবনীয়। ঐস্থলে অশোক খাঁটি অ-বৌদ্ধ। এইভাবে নানাদিক দিয়া আলোচনা করিলে, স্পষ্টভাবে ইহাই দেখা যায় যে, অশোকের ধর্ম অশোকের নিজেরই ধর্ম; কোনও বিশেষ ধর্ম গণ্ডীর মধ্যে তাঁহাকে টানিয়া আনিতে পারা যায় না। তিনি ব্রাহ্মণদিগকেও শ্রদ্ধা করেন, শ্রমণদিগকেও সম্মান করেন। তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, ধর্ম সম্বন্ধীয় যে কোনও প্রকার গোঁড়ামির তিনি ঘোর বিরোধী। তিনি প্রচার করেন, তাঁহার নিকট কোনও ধর্মই উপেক্ষণীয় নহে; সকল ধর্মেই বরণীয় ও মহনীয় কিছু-না-কিছু আছেই। তাঁহার ধর্ম-প্রচারে প্রকাশ পাইয়াছে, পিতা মাতার সেবা, বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান, স্বজন-প্রীতি, দাস ও ভৃত্যের প্রতি সৌজন্য, অহিংসা, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণকে দান…প্রভৃতি গুণাবলী ধর্মাচরণ হিসাবে প্রশংসনীয়। তাঁহার ধর্মের মূল বাণী হইতেছে,

“দাস ভতকম্হি সম্যপ্রতিপতী গুরুণং অপচিতি
সাধু পাণেসু সযমো সাধু বম্ভণ সমণানং
সাধু দানং এত চ অঞ চ এতাবিসং
ধংম মংগলং নাম…”।

—এই ধরণের গুণাবলী কোনও একটী ধর্মের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইতে পারে না। এবং তৎ কারণেই একমাত্র বৌদ্ধ ধর্মেরই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে অশোকের উপরোক্ত মনোভাব দর্শাইয়া, তাঁহাকে বৌদ্ধ প্রতিপন্ন করা অসম্ভব। অথচ, ইহাই বিস্ময়ের কথা যে, যাঁহারা তাঁহাকে বৌদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, এবং জোর-গলায় তাহা প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদের যুক্তিহীন দৃঢ় ধারণার মূল কিন্তু এই খানেই। এতদবস্থায়,—অর্থাৎ যেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা সুদৃঢ় যুক্তি হিসাবে আমাদের সম্বল কিছুই নাই সেইরূপ স্থলে, কোনও সত্য-সন্ধানী সুধী ব্যক্তিই অশোককে বৌদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন না। কেবলমাত্র প্রস্তরলিপির কয়েকটী স্থানে বুদ্ধের নামোল্লেখ, এবং দু' একটী অস্পষ্ট কিংবদন্তীর উপর অস্বাভাবিক ভাবে জোর দিয়া সত্যাসত্যের যথার্থ বিচার চলে না, ইহাই আমার নিবেদন॥

শ্রীআদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়
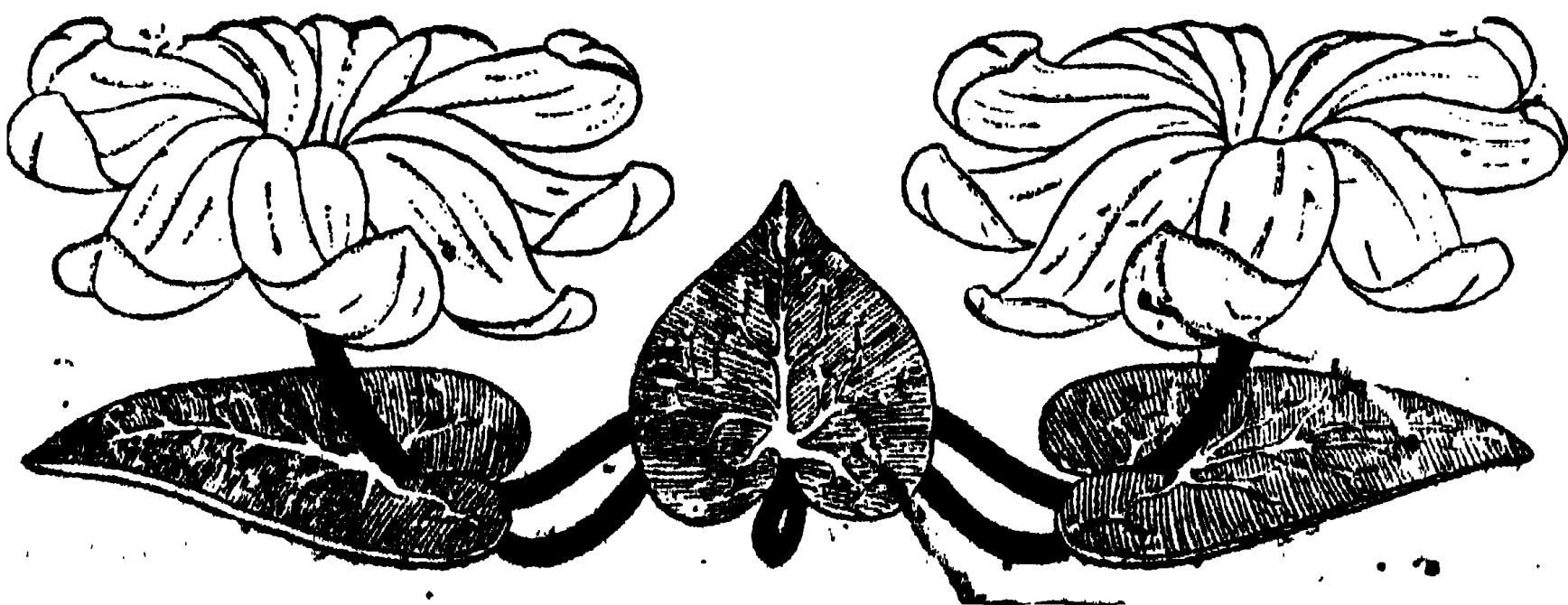
বাঁশরীর ডায়েরী

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

ব্যঙ্গ, ব্যঙ্গ, ব্যঙ্গ—কার সে তা জানিনা। যদি অদৃষ্ট মানতুম, তবে বল্‌তাম এ ব্যঙ্গ তারই। মাঝে মাঝে মনে হয় এ ব্যঙ্গ "সুষমা"র। তাকেই একদিন শাসিয়ে বলে-ছিলুম যে আইডিয়ার সঙ্গে গাঁঠছড়া বেঁধে চল্‌বে না তার দিন। যে মেয়ে পুরুষের চোখে নেশা লাগায় সে আসলে ভীরু—"সুষমা" তাদেরই একজন। কাজেই আমার কড়া কথায় ও তেড়ে উঠতে পারলে না, কিন্তু ও'র অন্তরের কোন একটি গুহায় হয়ত আমার সম্বন্ধে ও'র ব্যাথার অভিশাপ গুমরে মরছিল। সে অভিশাপ ভাষা পায়নি কিন্তু তার মানে ছিল হয়ত এই—"বাঁশরী, তোমায়ও বল্‌ছি যে অত 'খোঁচা কথার ব্যাগ' ঝুলিয়ে কাটবে না তোমার জীবন।" আজ তাই হয়েছে,—কারো সঙ্গে মেলা কথা বল্‌বার ইচ্ছা গেছে কমে। তাই নিয়েছি হাতে লেখনী—। কেন আজ আমার এমন হোল—আমার মনের জোরের ঘাট্‌তি হয়নি' কিন্তু আমার চোখের দৃষ্টির রূঢ়তা গেছে কমে। "পুরন্দর"কে আমি তেমনি তার গাম্ভীর্য্যের আবরণ অগ্রাহ্য করে দেখতে পারি, কিন্তু পারব না তাকে অতকরে কথার বেড়াজালে ফেল্‌তে। ক্ষিতীশকে আজও ক্ষিতীশই ভাবি, কিন্তু পারব না আজ তাকে অতকরে নির্দ্দয়ভাবে আস্কারা দিতে। মনের রজনীতে জড়িমা না থাকলেও কথার প্রভাতে জড়তা থাক্‌তে পারে, তা আমি আজ বুঝলাম। কিন্তু তবু বলব ব্যঙ্গ, ব্যঙ্গ, "বাঁশরীর" বাঁশী কথায় বাজবে না, বাজবে লেখায়—সঙ্গীত ফুটবে স্বরে নয়, স্বরলিপির—বাঁধা ঘাটে—ব্যঙ্গ ব্যঙ্গ আর কি?

মনে পড়ে আজ দশ বৎসর আগেকার একটা কথা—সেদিন সেই রাশিয়ান যুবকটি পিকাডেলীর ভারতীয় রেস্তরাঁয় আমাকে ডিনারে আমন্ত্রণ কল্লে। অনেক কথার মধ্যে ছেলেটি আমায় সেদিন বলেছিল "দেখ তোমরা ভারতীয় মেয়েরা মেয়ে হ'লেও ভারতীয় বটে।" আমি হেসে শ্লেষাত্মক ভাবে বলেছিলাম "উঃ কি আশ্চর্য্য তোমার বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা।" যুবকটি না দমে উত্তর দিয়েছিল—"শোন, কি বলি। আইডিয়াতে কোন মেয়ের তৃপ্তি হয় না, তোমাদেরও হয় না, কিন্তু ই'চ্ছা কল্লে তোমরা ভারতীয় মেয়ের আইডিয়াকে বস্তু বলে ভুল করে নিতে পার।" ছেলেটির অমার্জ্জনীয় স্তুতিবাক্যে আমার বাক্যপ্রপাত সে রাত্রির মত উজ্জল হয়ে উঠেছিল। আমি হেসে ভুরু কুঁচকিয়ে কাঁধ ডুটো উঁচু করে স্তাবক "শেককে"র সে রাত্তিরে যা অবস্থা করেছিলাম, আশাকরি তারপর থেকে ওর ভারতীয় মেয়েদের সম্বন্ধে ধারণা বদলে গিছল একেবারে। আমার যে কয়টি কথা সব চাইতে বেশী করে খুলেছিল ভারতীয় মেয়েদের সম্বন্ধে ওর চোখের পর্দ্দা তা ছিল এই—'দেখ শেকক, ভারতীয় মেয়েদের ভিতর জেনেছত তুমি শুধু আমাকে। যদি আমার সম্বন্ধে বলবার তোমার সাহস না থাকে তবে ভারতীয় মেয়েদের সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে বলবার ভীরুতা তুমি প্রকাশ না কল্লেই পার।' যুবকটী একেবারে মুষড়ে গিয়েছিল,—কেন না আমি জানতাম ওর কথার ভিতর ছিল যতখানি ফাঁকি আমার ভৎর্সনা গিয়ে পড়েছিল ঠিক ততখানিরই উপর। কাজেই শেকক ওর বলা কথাগুলো প্রত্যাহারের ছিদ্রমাত্র পেলে না এবং বাকী সময়টা' মুখ গুমড়ে রইল—ঠিক যেন ভাদ্র মাসের আকাশের মত—মেঘ রয়েছে কিন্তু নামতে পাচ্ছে না।

রবীন্দ্রনাথের বাঁশরী নাটিকা দ্রষ্টব্য—লেখক।

থাকৃগে রাশিয়ান ছেলের কথা। আমার মনে পড়ছিল হঠাৎ তার সেই কথাটা যে আইডিয়াকে ইচ্ছা কর্লে বস্তু বলে ভাবা যায়। পিকাডেলির রেঁস্তরায় কাঁটা চামচের ঠুনঠুনানি, কাঁচ ফটিকের ঝনঝনানি ও স্ত্রীপুরুষের রমরমানির মধ্যে কথাটা দশ বছর আগে যতটা ফাঁকি বলে মনে মনে হয়েছিল, আজ ততটা মনে হচ্ছে না। আমি নিজেই কি কর্লুম। "সোমশঙ্কর"কে পেলেত "সুষমা"ই। আর আমি কি পেলাম—না তাঁর সেই কথা কয়টি—"বাঁশি, তুমি আমাকে যা দিয়েছ, এ বিবাহ তাকে স্পর্শও কত্তে পারে না।" পাঁচ বৎসর পর আজ মনে হচ্ছে আশ্চর্য্য আমার ক্ষমতা, আশ্চর্য্য আমার ভাবের গেলাসে নিঙড়ে নিঙড়ে পান করে তৃপ্তি পাওয়া! বস্তুর থাকে আস্বাদ, ভাবের থাকে যাকে লোকে মনে করে আনন্দ! "ইলার" আজ সাতদিন হয় বেবি হয়েছে—সে সত্যি পেয়েছে স্নেহবস্তুর আস্বাদ, আর আমি বছরের পর বছর সোমশঙ্করের দেওয়া হীরা চুণীর গহনার থলে হাতড়িয়ে কি পেয়েছি—আনন্দ? হ্যাঁ তাই বটে—সুরাপায়ী যেমন তার সুরার নেশায় পায় প্রচণ্ড উত্তেজনার আনন্দ। ভাবের ধোঁয়াতে যদি নেশা না থাকৃত তবে এই হালকা পদার্থকে কেউই বরদাস্ত করত না—বোধ হয় ক্ষিতীশও করত না এবং ভাবতে আমি ভয় করি সব চাইতে এরই জন্য যে এ মানুষকে বঞ্চনা করে—তার সাদা চোখের উপরে পরিয়ে দেয় অদৃশ্য ঠুলি এবং মনের উত্তাপ তুলে দেয় মানযন্ত্রের কোঠায় ১৪৯ ডিগ্রীর উপরে। কিন্তু নেশার উত্তেজনা থাকৃতে পারে ক'দিন? লজ্জা লজ্জা যে আমিও নেশায় কাটিয়েছি এই পাঁচ বছর।

কাল সন্ধ্যাবেলা লীলাকে ঠিক এই কথাটাই বোঝাচ্ছিলাম। মেয়েটি ছিল ভাবের নেশায় মশগুল। তার সেই বন্ধুটী যে বছর দুই আগে বিলাতে গিছল উচ্চ শিক্ষার খেতাব নিতে কে নাকি লিখেছে তাকে দেখা গেছে সহাধ্যায়িনীকে নিয়ে এক সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডের হ্রদে হ্রদে বেড়াতে। আমি বল্লাম—"দে না লীলা, খুলে দে—যে টিয়ে পড়তে চায় না তার পায়ের শিকল আটকে রেখে তোর কিছু কি লাভ আছে ভাই? তুই ত বোটানী পড়েছিস, অত ভাল করে। এটা তোর শাস্ত্রে লেখে নাকি যে তোর টবে যদি ক্রিসেন্থিমামের ফুল না ধরে, সেখানে চোখের জল কিংবা বুকের শ্বাস ছড়ান বিড়ম্বনা, সেখানে ক্রিসেন্থিমাম উপড়ে ফেলে যখন পাবি সিনেরারিয়ার 'চারা' বসানই বিজ্ঞতা!" দেখলাম মেয়েটির দ্বিধা কাটল না। তার মুখে এল একটা হাসি, কিন্তু মনের ভিতর থেকে খেলে গেল একটা দুরন্ত ব্যথার ছায়া। তখন আমি আরো একটু শক্ত হয়ে বলতে সুরু কর্লাম—"দেখ, লীলা, তুই যদি ভেবে থাকিস যে আমি তোর ব্যথার সুরে সুর মেলাব তবে তুই আমাকে এখনো চিনিসনি। ব্যথা পায় লোকে কখন? যখন লোকে মনে করে যে পৃথিবীটা ঘোরা উচিত ছিল ওর নিজের orbitএ নয়, ওদের মনের orbit ধরে। বাঁশরীকে তোরা এ সব মনোজ্ঞানীর দলে ঢুকাস নে। তুই মনে কচ্ছিস লীলা যে তুই খুব মরমী, আমি ভাবছি তুই কি বোকা।" আমার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই দেখলাম লীলার চোখ দুটো জ্বলে উঠল, বুঝলাম ওর মনের তাপ এবার দহন সীমার নাগাল পেয়েছে। বল্লেও সে খানিকটা উত্তেজিত হয়ে—"তোমার মুখে এ সব কথা সাজে না বাঁশি। সুষমার সঙ্গে সোমশঙ্করের বিয়ে হ'লে তুমিই নাকি সাত কাণ্ড কর্লে। তোমার মনের সঙ্গে দিচ্ছিল না সোমশঙ্করের মতের সায়, তাইতেত যত অনর্থ।" মেয়েটার চিবুক ধরে না টেনে পার্লাম না, বল্লাম—"তুই কি মনে করিস লীলা, আমি প্রজার খাজনার সুদগুণে করি সোসিয়ালিজমের বক্তৃতা, না সাতটী সন্তানের মা হয়ে কচ্ছি Birth Control প্রচার। না গো না তোদের বাঁশির আছে বস্তুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তাই সে নিজেকে অত ফাঁকি দিতে জানে না। সত্যি কি জানিস্ লীলা আমার ক্ষোভ থাকৃত না যদি সোমশঙ্করের মন ছুটত ওর নিজের কক্ষে। কিন্তু হয়েছিল কি—না ওর মন ছিল আমার কক্ষে আর ওর মতকে ফেলা হ'ল সুষমার কক্ষে। রাজপুত ছেলেটির মনের বস্তু যদি হ'ত সুষমা, আমি হৃষ্টান্তরে ওঁদের বিবাহ সভা সাজাতাম—এতে আমার কোন গ্লানিও হোত না, জ্বালাও ত হোত না। এমন কি এতে আমি বিনা ক্লান্তিতে একটি লম্বা করে শ্বাস ত ছাড়তুম না। বুঝলে ভাই লীলা।"

মেয়েটীর কাছে আমার সব বোঝানই কাল পণ্ড হয়েছে নিশ্চয়। কারণ ও যে একেবারে জাতমরমী অর্থাৎ সেই প্রকৃতির মেয়ে যারা আইডিয়াকে আঁকড়ে থাকতেই শুধু আনন্দ পায় না, বস্তুকে ধরতে গিয়েও হাতে পায় বাধা কিংবা মনে পায় ব্যথা। অথচ আশ্চর্য্য এই যে বস্তুসেবী বর্ত্তমান জগতে এই 'লীলা' প্রকৃতির স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাও বহু। এরা সুখ চায় না, চায় ভাব—মিল খোঁজে না, খোঁজে মধুর—স্বার্থকতা চায় না, চায় ওরা শান্তি—ওরা মনে ভাবে মানুষ জন্মেছে বাঁচতে নয়, বাঁচাতে। মাঝে মাঝে মনে হয় এই সব স্ত্রী পুরুষকে ঢাকুরিয়া লেকের তীর হ'তে নির্ব্বাসন দিয়ে কেন না পাঠিয়ে দেওয়া হয় কাশ্মীরে 'ডাল্' লেকের তীরে, সেখানে পাইন বনের উতল হাওয়ায়, গোলাপ তলার রংয়ের প্রকৃতির আদিম ছবির সঙ্গে ওদের আদিম মনের চেহারা মিশবে ভাল। এই দলের পুরুষেরা মেয়েদের ভাবে নন্দনবনের শোভা, যার রূপ আছে, কিন্তু রূপের সীমানা নাই; আর এই দলের মেয়েরা ভাবে পুরুষদের চন্দ্রলোকের খসে পড়া তরু,—যদি জীবনের আবর্ত্তে কারো ভাগ্যে মিলে যায় এদের সন্ধান তবে রাখতে হবে তাদের অস্বচ্ছ মনের ছাদ আঁটা গ্রীন হাউসে পুরে। মূঢ়তার কি মাত্রা নাই?

আমার মতে রোমান্স থাকুক ছোটদের রূপকথায় কিন্তু সত্যিকার জীবনে থাকুক ইহা বহুদূরে—। কেন যে থাকে না তাইতে আমি আশ্চর্য্য হই। রূপ কথার জগত রোমান্সেরই জগত—তাতে আছে শুধু এক রাজপুত্তুর এবং এক রাজকন্যা, সেই ঘুমন্ত জগতের আর কোন সজীব বস্তুর বালাই নাই, কাজেই সেখানে একটা জগৎ সৃষ্টি কত্তে হয়, রাজপুত্রের সঙ্গে সম্বন্ধে রাজপুত্রীর এবং রাজকুমারী সম্বন্ধে রাজকুমারের মনের আইডিয়া দিয়ে। তাই সত্যিকার জীবনেও দেখতে পাই রোমান্স ফোটে নির্জ্জনতায়, নয়ত যে সব স্ত্রীপুরুষ লোকাকীর্ণ পৃথিবীতে থেকেও বাস করে আপন মনের নিঃসঙ্গতায় তাদের সেই নিভৃত জগতে। রোমান্সের ক্ষেত্র কাব্য বা আর্ট জীবনে যে শুধু তার মূল্য নাই তা নয়, এখানে আছে তার অমূল্য। দার্জ্জিলিং পাহাড়ে আছে পুরু পশমের জামার মূল্য, কিন্তু কলকাতায় সে ঘটায় শুধু বসনের ব্যাঘাত। আর্টকে আমি ভালবাসি ইহা জীবন নয় বলেই, কাজেই যদি জীবনটাকে করে তুলতে চায় আর্টের রোমান্স বিশেষ, বেচারীর জন্য আমার মায়া হয়—এত আমি অসহিষ্ণু হয়ে পড়ি। ক্ষিতীশের প্রতি আমার দরদ অনেকটা এই কারণেই।

আমার দরদে ক্ষিতীশের দেখলাম সত্যি উন্নতি হয়েছে অনেক। গেল হপ্তায় ও যখন আমার এখানে এল, তখন তার পরণে ছিল এক চুড়িদার পাইজামা ও সিল্কের সেরোয়াণী, পায়ে লক্ষ্ণৌর জুতো এবং সব চেয়ে যা আশ্চর্য্য সঙ্গে নিয়ে এসেছিল একটি কাশ্মিরী তরুণীকে যাকে আলাপ করিয়ে দিলে, ওর হালে পাওয়া বন্ধু বলে। "কেতকী মাসী"ও সেদিন বিকেলে ছিল আমার ওখানে। ক্ষিতীশের পরিবর্ত্তন দেখে ওর মিনিট দুই মুখে কথাই জুটল না। আমি হেসে জিজ্ঞেস করলুম—"কি ক্ষিতীশ, একেবারে চাদর ছেড়ে সেরোয়াণী ধরলে যে? এতে কি ভাব যে কালী লাগবার ভয় নেই?" ক্ষিতীশ বল্লে—"তা নয় কালির আঁচড় কাটাই ছিল যতদিন ব্যবসা, ততদিনই কালির দাগ লাগবার ছিল ভয়। সে চাদরই পরতাম কি সেরোয়াণীই পরতাম। দেখচনা এখন আমার কাগজ আঁচড়ানোর নেশা গেছে ছুটে।" ক্ষিতীশ সঙ্গিনীকে নিয়ে বেশীক্ষণ বসলে না, একটা ছুঁতো করে মিনিট কয়েকের মধ্যেই পালাল। বুঝলুম ও সত্যি এবার মনের 'বেড়াজাল' থেকে মুক্তি পেয়েছে।

* * *

ডায়েরী লেখা কি আমার পোষায়। ঠিক একবছর আগে সুরু করেছিলাম এই ডায়েরীর খাতা। ভেবেছিলাম যে এই মরক্কোয় বাঁধান তকৃতকে বইখানায় এঁকে রাখব আমার মনের ছাপ, কী উদ্ভট ছিল আমার সঙ্কল্প! মনের যারা ব্যবহার জানে না, তারাই খোঁজে মনের ছাপ এঁকে রাখবার ব্যবহার। আগুনের যথার্থ ছাপ থেকে যায় দহনেই—আগুন যদি এমন সঙ্কল্প করে বসে যে ওর ছাপ রেখে যাবে না পুড়িয়ে, তবে সেটা হবে বাতুলতা। কি ভাগ্যিস আমি বেঁচে গেছি এই বাতুলতার হাত হ'তে। তাই আজ প্রথমটা ইচ্ছা হয়েছিল যে বইয়ের লেখা পাতা-

গুলো ছিঁড়ে বাকীটাকে ব্রিজ খেলার স্কোর বই করেই ব্যবহার করি। এমনি সময় পেলাম ক্ষিতীশের চিঠি। সে আসবে সন্ধ্যা ছ'টায় এবং তখন আমার দিতে হবে ওকে শেষ উত্তর। আশ্চর্য্য, একদিন যে উত্তর ক্ষিতীশ পেয়েছিল নিজে জিজ্ঞেস না করে, সে উত্তর আজ পাচ্ছে না এই তিনদিন ক্রমাগত আমার কাছে কথা বলে বলে। আমার সমস্যাটা খানিকটা বৈজ্ঞানিক গোছের—যে গাছে ফুল ফোটে, ফোটা বন্ধ হ'লেই সে গাছে ফল ধরবে কি? থাকৃত যদি কাছে বোটানী পড়া লীলা তা'কে জিজ্ঞেস করতুম। কিন্তু তার কি যো আছে, সে ত ছ'মাস হোল সেই পুরোন বন্ধুটীকে বিয়ে করে আছে একেবারে কলম্বোয়। ক্ষিতীশকে বিশ্বাস করা যায় এইজন্যে যে প্রায় রিম দুই কাগজের লেখা অপ্রকাশিত নভেলগুলি কাঁচিকাটা করে পাঠিয়েছে আমার কাছে। আমি কোন মতেই ঠক্‌তে চাই না—ক্ষিতীশকে 'হ্যাঁ' করেও নয় 'না' করেও নয়। এই কাগজে লিখে রাখছি ওকে পরীক্ষা করাই আমার ইচ্ছা—দেখি ও আমার সঙ্গে জাহাজে কলম্বো যেতে রাজী হয় কি না। যদি ও এই শেষ পরীক্ষায় উত্‌রোতে পারে তবে এ ডায়রীর কটা পাত ওকে দেখাব।

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

ঘর কোথা নাই মনে

হাবীব

সেদিন প্রখর ধরণীর পানে চাহিয়াছিলাম একা

বাসনা-ব্যাকুল মনে !

প্রাণের কামনা আধেক ছায়াতে ফুটিয়া উঠিল ধীরে

সুদূর দিগঙ্গনে।

সহসা হেরিনু পথের পাশেতে হাসিয়া লুটাও তুমি

অবগুণ্ঠন খুলি,

প্রথম জীবনে হয়ত সেদিন প্রথম করিনু ভুল

—হায়রে ধরার ধূলি !

আকাশের ছায়া জড়াইয়া গেল মাটির মায়ার ফাঁদে,

চিরকাল এই হয়,

বিধাতার লিপি মানুষের বুকে দগ্ধ ক্ষতের মত

মুছিয়া ফেলার নয়।

উতলা ফুলের বন !

আমার তপ্ত বাহুর শিথানে ফুলের কুমারী মেয়ে

তুমি হলে অচেতন।

কেটে গেল কত শুভ্র দিবস কত না জোছনা রাতি—
আমাদের বিকিকিনি
জীবনের হাটে তখনো চলেছে, আমি তব লীলাময়
তুমি লীলাসঙ্গিনী।

বাতাস তখনো অন্ধ আবেগে মদির গন্ধ বহে
আকাশে রঙের মেলা—
মোদের নয়নে ঘুমের জড়তা তখনো জড়ায়ে আছে
চলে স্বপনের খেলা।

আবেশ তন্দ্রা তখনো কাটেনি তখনো মনের দ্বারে
গাহিছে প্রাণের কুহু,
তুমি যেন কেন চমকি উঠিলে কী যেন ব্যথায় আমি
বলিনু হঠাৎ "উহু"।

শাখা মর্মরে হাসিছে পিশাচ, অশুভ হিমেল বায়ু
শ্বসিছে বুকের পাশে—
শ্রান্ত নয়ন মেলিয়া শুধালে, শুনিতে পাও কি কিছু ?
আমি কহিলাম—আসে
অকল্যাণের ভয়াল রাত্রি তাহারি কুটিল হাসি
চারিদিকে পড়ে ফাটি,
শৃঙ্গার রসে ধ্বংসের বিষ তাহাতে রয়েছে ভিজা
এই ধরণীর মাটি।

বালুর চরেতে রচিত মোদের জীবনের খেলা ঘরে
আগুন ধরেছে ধীরে—
শিহরি কহিলে, "এই ছিল মনে, এখনো সময় আছে
আমি ঘরে যাই ফিরে।"

তুমি চলে যাবে, হায়রে অবোধ, হায়রে সরল প্রাণ,
তুমি বুঝ নাই বালা—
তোমারে ঘিরিয়া জ্বলিয়া উঠেছে আমারো বক্ষে এবে
সপ্ত নরক জ্বালা।

আজি চলে যাবে বক্ষে লইয়া আমার বুকের কালি
বিষ-ঝারি—

তোমার ভুলেতে আমার বক্ষে পাপ সঞ্চয় মম
দিনে দিনে যাবে বাড়ি।
দৈত্যের মত নিষ্ঠুরতায় শঙ্কিত দুই হাতে
তোমারে নিলাম বাঁধি—
সহিল না তব, অসহায় সম ব্যাকুল কণ্ঠে তুমি
গুমরি উঠিলে কাঁদি।
আমি দুরন্ত অজগর এক, চকিতা হরিণী তুমি,
এই শুধু পরিচয়—
তুমি জানিলে না আমারো জীবনে জেগেছে প্রবল ঝড়
এ আমি সে আমি নয়।
বুঝিলে না তুমি আমার বুকের পশুটা গিয়াছে মরে
ঘুরেছে মনের সাধ—
আমি ডুবে যাব রেখে যেতে চাই নীল নভতলে আঁকি
মম কলঙ্কি চাঁদ।
তুমি ফিরে গেলে ঘরেতে তোমার বাহুর বাধন মম
খুলি সন্তর্পনে।
শূন্য দুহাতে বক্ষ চাপিয়া ফিরিতে চাহিনু ঘরে—
ঘর কোথা নাই মনে।

হাবীব

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

(১)

গদ্য-সাহিত্য

বাংলা গদ্য সাহিত্যের যুগ নির্ণয় করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের নাম মনে উদিত হয়। তৎপরবর্ত্তী যুগ বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ। বঙ্কিমচন্দ্রের পর, রবীন্দ্রনাথের যুগ। ঐ যুগ এখনও চলিতেছে।

রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাংলা গদ্য সাহিত্যের যে শোচনীয় অবস্থা ছিল, উহা স্মরণ করিলে, তৎকালীন গদ্য সাহিত্যকে সাহিত্য নামে অভিহিত না করিয়া বাংলা গদ্য বলিলেই শোভন হয়। উহার দৃষ্টান্ত পরে উল্লেখ করা যাইবে এবং তদ্বারাই ঐ কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

পৃথিবীর মানব সমাজের আদিযুগে গদ্য রচনা দুর্ল্লভ, সর্ব্বত্রই কাব্যের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে ইহার অন্যথা ঘটে নাই। এই দেশে, সর্ব্বপ্রথমে কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রে নহে, অন্যান্য শাস্ত্রাদিও সংস্কৃত ভাষায় ছন্দোবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হয়। তৎপরে গদ্যে রচিত গ্রন্থাদির আমরা সাক্ষাৎ পাই। বঙ্গদেশও এ নিয়ম অতিক্রম করে নাই। বৌদ্ধযুগের পর হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই পদ্যে রচিত। বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী, কবিগান, পাঁচালী, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, বিদ্যাসুন্দর, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতির নাম করা যায়। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, হরু ঠাকুর, দাশরথি, গোবিন্দ অধিকারী, রামনিধি (নিধুবাবু), আনটুনি সাহেব, গোপাল উড়ে প্রভৃতি ঐ কালে পদ্যাদি রচনায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নে "বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। উহার দ্বিতীয় ভাগে প্রাচীন গদ্যসাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। আমি ঐ পুস্তক হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

প্রাচীন গদ্যসাহিত্যের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় বৈষ্ণবগণের "সহজিয়া সাহিত্যে।" উহার ভাষা জটিল ও দুর্ব্বোধ। তৎপরে দীনেশবাবুর উক্ত গ্রন্থে, একখানি প্রাচীন পত্র, আদালতের আরজি ও প্রাচীন পুথি হইতে উদ্ধৃত "বৃন্দাবন-পরিক্রমা" নামক একটি নিবন্ধ আছে, উহাদের ভাষা প্রায় তদ্রূপ, সহজে বোধগম্য হইবার নহে।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে কেরি সাহেবের "কথোপকথনের" ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল হইলেও, উহার মধ্যে অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা বুঝিবার জন্য কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। ঘটকালি প্রসঙ্গে ইহা লিখিত। 'ঘটক মহাশয় আমার বড় পুত্রটির বিবাহ দিব, আপনি একটি সুমানুষের কন্যা স্থির করিয়া আমুন, বিস্তর দিবস গৌণ না হয় বৈশাখে বা আষাঢ়ে হইতে চাই। আমি বিবাহ দিয়া কার্য্যস্থলে যাব, এখন না হইলে যে খরচ-পত্র আনিয়াছি সে ফুরিয়া যাবে।

ঘটক কহিলেন। ভাল মহাশয় তাহার ঠেক্ কি? ইত্যাদী। কেরি সাহেবের সমসাময়িক রামবসু রচিত "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" গ্রন্থের বাংলা গদ্যের নমুনা এইরূপ:—

"এ বঙ্গভুমিতে রাজা চন্দ্রকেও পৃভৃতি অনেক অনেক রাজাগণ উদ্ভব হইয়াছিলেন কিন্তু কদাচিত তাহারদের কেবল নামমাত্র শুনা যায় তদব্যতিরেক তাহারদের বিশেষ বিশেষণ কি মতে বৃদ্ধি কি মতে পতন নিরাকরণ কিছুই

উপস্থিত নাহি তাহাতে যে সমস্ত লোকেরা এ সকল প্রসঙ্গ শ্রবণ করে আনুপূর্ব্বক না জাননতে ক্ষোভিত হয়।”

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের “প্রবোধ চন্দ্রিকা” প্রকাশিত হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার নিকট আপনারা বাংলা গদ্যে পণ্ডিতী ভাষাই পাইবেন।

“দূরবর্ত্তী হট্টগ্রামী লোকদের শ্রবণ বিষয়ীভূত হট্টাগত ধ্বনি মাত্রাত্মক সমনস্ক শ্রবণেন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ বশতঃ বর্ণমাত্র গ্রহণ হয়। তদুত্তর বসন-ভূষণ কদলীমূলক ইত্যাদি পদমাত্র শ্রবণ হয়।”

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে মার্সমান সাহেবের প্রকাশিত “ভারতবর্ষে ইংলণ্ডীয়দের রাজবিবরণের” ভাষা এইরূপ: “এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হওন সময়ে সুপ্রিমকোর্ট ও গভর্ণমেন্টেতে যে বৈরিতাচরণ ছিল তাহা নিবৃত্তি করণাভিপ্রায়ে হেষ্টিংস সাহেব চিপজুষ্টিস সাহেবের নিমিত্ত একটা নূতন আদালত সৃষ্টি করেন এবং ঐ জাষ্টিস সাহেবকে অতি ভারি বেতন এবং অতি বাহুল্যরূপ পরাক্রম প্রদান করেন।”

উল্লিখিত উদ্ধৃত গদ্য রচনার সহিত রাজা রামমোহন রায়ের গদ্য রচনার তুলনা করিলে পার্থক্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। রাজা রামমোহন রায় লেখনী ধারণ করিবার পূর্ব্বে লেখকদের চলিত বাংলা ব্যাকরণ জানা দূরে থাকুক বর্ণশুদ্ধি জ্ঞানও ছিল না। সামান্য বিষয় কর্ম্মের উপযোগী কিছু বাংলা জানিলেই চলিত। সেকালে বাংলা গদ্য রচনার কোন প্রণালী ছিল না। কোনরূপে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইত। লেখক ও পাঠক উভয়েরই সংখ্যা ছিল নগণ্য। তৎকালে পারসি ভাষার খুব প্রচলন ছিল, আদালতের দলিলাদিতে ঐ ভাষাই ব্যবহৃত হইত। রাজা রামমোহন রায় পারসি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, কেবল পারসি ভাষা নহে আরবি, সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী, ইংরাজী প্রভৃতি বহু ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। কিন্তু স্বদেশের কল্যাণের জন্য বাংলা ভাষায় রচনায় মনোনিবেশ করেন।

মিশনারীদের অনেক পূর্ব্বে ষোড়শ বৎসর বয়সে সম্ভবতঃ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে রামমোহন পারস্য ভাষা ত্যাগ করিয়া প্রথম বাংলা গদ্য লিখিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, দেশীয় সংবাদপত্র “সংবাদ কৌমুদী”র প্রথম প্রচারক; প্রথম সমাজ সংস্কারক ও রাজনীতিজ্ঞ এবং বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়া চিরদিন পূজিত হইবেন।

১৭৮৮—১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মহামনীষী রাজা রামমোহন রায় সাধারণ পাঠোপযোগী ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বন্ধীয় অনুমান বত্রিশখানি গ্রন্থ লিখেন। ঐ সকল গ্রন্থে তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্য, ভূয়োদর্শন ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষাও প্রাঞ্জল, সুন্দর ও সুপাঠ্য। যদিও ঐ সময়ে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় এবং উহার মূলেও ছিলেন রাজা রামমোহন, তথাপি বাংলা সাহিত্যের উন্নতি না হইলে জাতীয় উন্নতি সম্ভব নহে এই ধারণার বশবর্ত্তি হইয়া রাজা রামমোহন বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার ঐরূপ যত্ন না থাকিলে বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের বহুল উন্নতি এত অল্পকাল মধ্যে সাধিত হইত না।

কিরূপ সরলভাবে তিনি বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দেখুন্।

“অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা”

১। চিত্ত শুদ্ধি হইলে পর, ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার হয়: এই হেতু তখন ব্রহ্ম বিচারের ইচ্ছা জন্মে।

১। ব্রহ্ম লক্ষ্য এবং বুদ্ধির গ্রাহ্য না হয়েন, তবে কিরূপে ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার হইতে পারে? এই সন্দেহ পর সূত্রে দূর করিতেছেন।

“জন্মাদস্য যতঃ”।

২। এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি, নাশ যাহা হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম। অর্থাৎ বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ভঙ্গ দ্বারা ব্রহ্মকে নিশ্চয় করি। যেহেতু কার্য্য থাকিলে কারণ থাকে। কার্য্য না থাকিলে কারণ থাকে না। ব্রহ্মের এই তটস্থ লক্ষণ হয়, তাহার কারণ এই জগতের দ্বারা ব্রহ্মকে নির্ণয় ইহাঁতে করেন। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বেদে কহেন যে সত্য সর্ব্বজ্ঞ এবং মিথ্যা জগৎ যাহার সত্যতা দ্বারা সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া সর্পের ন্যায় দেখায়।

কেবল বেদান্ত, উপনিষদ, প্রভৃতির অনুবাদ করিয়া রাজা রামমোহন রায় নিরস্ত ছিলেন না। তিনি সমাজনীতি, রাজনীতি, বাংলা ব্যাকারণ, জ্যামিতি, ভূগোল, খগোল প্রভৃতি এমন বিষয় নাই, যাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ না করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র 'সংবাদ-কৌমুদীর' (১৮২৪ খৃষ্টাব্দ) প্রবন্ধগুলির প্রতি দৃষ্টীপাত করিলে এ কথার যথার্থ উপলব্ধি হইবে।

১। প্রতিধ্বনি
২। অয়স্কান্ত বা চুম্বকমণি
৩। মকর মৎস্যের বিবরণ
৪। বেলুনের বিবরণ
৫। মিথ্যা কথন
৬। বিচার বিজ্ঞাপক ইতিহাস
৭। ইতিহাস

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষার বাংলা পাঠ্যপুস্তকে 'সংবাদ কৌমুদী'তে প্রকাশিত অনেকগুলি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। স্বর্গীয় ঈশান বসু কর্তৃক প্রকাশিত "রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী"তে রাজা রামমোহন রায়ের রচনা সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত দেখিতে পাওয়া যায়। 'জ্ঞানগর্ভ অমিশ্র সাহিত্য রচনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। রামমোহন রায় গদ্যরচনার বৈয়াকরণিক নিয়ম প্রথম নির্দ্ধারণ করাতে এবং কৌমুদীতে এই সকল প্রবন্ধ লেখাতে তাঁহাকে বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে হইবে।"

ধর্ম্ম সম্বন্ধে রচনার ন্যায় সামাজিক বিষয়েও রাজা রামমোহনের রচনা কিরূপ মনোরম ছিল তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিব। সতীদাহ নিবারণ কল্পে এ দেশীয় স্ত্রীলোকের স্বপক্ষে তাঁহার যুক্তিপূর্ণ উক্তি পাঠে আপনারা চমৎকৃত হইবেন।

প্রথমতঃ: বুদ্ধির বিষয় ও স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন যে তাহারদিগকে অল্প বুদ্ধি কহেন।……

আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয়। ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?

দ্বিতীয়তঃ: তাহারদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করি, কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়। তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য দ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হয়। ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, অথচ কহেন যে তাহাদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য নাই।

তৃতীয়তঃ। বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়, এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক উভয়ের চরিত্র দৃষ্ট করিলে বিদিত হইবেক।

চতুর্থতঃ: যে সানুরাগা কহিলেন, উভয়ের বিবাহ গণনাতেই ব্যক্ত আছে।……

পঞ্চমতঃ: তাহাদের ধর্ম্ম ভয় অল্প। এ অতি অধর্ম্মের কথা, দেখ কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা তাহারা কেবল ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে।

বিবাহের সময়ে স্ত্রীকে অর্দ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু ব্যবহারের সময়ে পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

তাজমহল

শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ

দুটো কারণে মনটা ভারী খুসী।

সকাল বেলা একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে কতকগুলি টাকা রোজগার হইল; আর ভাইএর চিঠি পাইলাম তাহাতে সে তাজমহল দেখিয়া যে আনন্দ পাইয়াছে তাহা সুন্দরভাবে বিতরণ করিয়াছে তার দাদা ও বৌদিকে।

ভাই আমাকে লিখিয়াছে:—মেজদা, আপনি শীতে কোথাও বেরুতে চান না, কিন্তু পথের একটু কষ্ট স্বীকার করে যদি এখানে আস্‌তেন তবে আনন্দে ভরে যেত আপনার প্রাণ। তাজমহল যে এত সুন্দর না দেখলে তাহা পরিকল্পনা করার উপায় নাই! আপনার কবি-হৃদয় হয়তো আরও আনন্দোৎসের সন্ধান পাবে এ'র চাতাল এবং গম্বুজে;—আমি অকবি হয়েও যা পেলাম পাওয়া হিসাবে তা তুচ্ছ নয়।"

আর তার বৌদিকে লিখিয়াছে:—বৌদি, তাজমহল দেখে মনে পড়ল সর্ব্বপ্রথমে তোমাকে। মমতাজের প্রেম হয়তো আমি সম্যক উপলব্ধি কর্ত্তে পাচ্ছি না কিন্তু তোমরা, যাদের জীবন ঠিক কবিতার মত উপভোগ্যভাবে যাপিত হচ্ছে এতদিন ধরে, তোমরা হয়তো এর মাধুর্য্য আরও নিবিড়-ভাবে উপভোগ কর্ত্তে পারে। বিরাট গম্বুজের দিকে নয়নপাত কল্লে হয়তো সাজাহানের মহান প্রেমের খানিকটা সন্ধানলাভ কর্ত্তে পারি কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত প্রকোষ্ঠের আনাচে কানাচে মমতাজের প্রেমের যে চটুল প্রকাশ লুক্কায়িত তাহা তোমাদের প্রেমিক চক্ষে গোপন থাকবার কথা নয়। মাসিক পত্রে তোমাদের প্রেমের যে সুন্দর চিত্রগুলি দিনের পর দিন বার হচ্ছে, তাজমহল সন্দর্শনের পর সেগুলি হবে আরও মনোজ্ঞ, আরও মর্ম্মস্পর্শী।

ছুটীর দিন। খাওয়া দাওয়া সারিয়া বিছানায় পা'টা ছড়াইয়া দিয়া নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিতে লাগিলাম। নিদ্রাদেবীর কৃপা দৃষ্টিলাভে বঞ্চিত হইয়া প্রাণের দেবীর, দূত মারফত দর্শন কামনা করিলাম। সাত বছরের মেয়ে মণিকাকে বলি, "মণিকা, তোমার মাকে গিয়ে বল, আমি ডাকছি।"

মেয়ে চলিয়া যায় পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া বলে—"মা বল্লে—যাচ্ছি।"

দশ মিনিট কাটিয়া যাওয়াতে দূতকে আবার পাঠাই-লাম; দূত পূর্ব্বের মত ফিরিয়া আসিয়া বলে—"মা বল্লে—যাচ্ছি।"

আরও দশ মিনিট কাটিল কিন্তু দেবী আবির্ভূতা হইলেন না।

এমতাবস্থায় 'বার্ক''কে মনে পড়িল, আর মনে পড়িল তাঁর বিখ্যাত উক্তি:—when conciliation fails, war remains,—ভাল কথায় যখন আসিল না তখন শয্যা ত্যাগ করিয়া গিয়া বাহুতে বন্দী করিয়া পরিমলকে ধরিয়া আনার কথা মনে হইল; কিন্তু খাবার পরে আরামদায়ক বিছানাটী ছাড়িতে ইচ্ছা হইল না। অন্য চাল চালিলাম, মনে হইল—when truth has failed, untruth may succeed. এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া দূতকে আবার পাঠাইলাম, তার মার নিকট হইতে থার্মোমিটার আনিবার জন্য। দূত দৌত্যে পাকা, সে গিয়া তার মাকে বলে 'মা, থার্মোমিটার দাও, বাবা চাচ্ছে।" দূত ব্যাপারটাকে আরও করুণ করিবার উদ্দেশ্যে হয়তো বলিল—"থার্মোমিটার দিলেই হবে, তোমাকে যাবার দরকার নেই"—বলিয়া মণিকা মুখখানা যথাসম্ভব ভারী করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল, ভাবখানা, পিতার বারম্বার ডাকা সত্ত্বেও মার না যাওয়াতে সে অত্যন্ত রুষ্টা। পরিমল মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের ভাব অনুসরণ করিয়া হাসিয়া বলে "পাকা

মেয়ে"। আদরে মেয়ের গাল দুটী টিপিয়া বলে—"এখানে বসে থাক, দেখ, ছড়ান কাপড়গুলো ঝিণ্টু টা না নষ্ট করে।"

জানিতাম যে অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। তাই দেয়ালের দিকে পাশ ফিরিয়া আস্তে আস্তে কাতরোক্তি করিতে লাগিলাম। স্ত্রী একটু চিন্তিতভাবে আসিয়া কপালে, গায়ে হাত দেয়। গা ঠাণ্ডা দেখিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া আমাকে আকর্ষণ করিয়া বলে—"কি গো। ব্যাপার কি ? গা তো ঠাণ্ডা।"

মুখখানা যথাসম্ভব ক্লিষ্ট করিয়া বলি—"কি জানি, বুকের কাছটা যেন টন্‌টন্ কচ্ছে।"

পরিমল বুকের কাছটাতে হাত দেয়। স্ত্রীর স্পর্শে কি যাদু আছে, অনবধানবশতঃ একটা আরামের নিশ্বাস নির্গত হইল। আর মুখে ভাসিয়া যেন উঠিল অন্তর্নিহিত আনন্দ। ব্যাপার দেখিয়া স্ত্রী যেন রোগ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইল; তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া বলে, "কি বল বুকটা চাপিয়া ধরি।" এই বলিয়া একটু চাপ দেয়। আমি আনন্দে তাড়াতাড়ি বলি—"হ্যাঁ, হ্যাঁ বেশ লাগছে।"

তাড়াতাড়িতে স্ত্রীর কাছে ধরা পড়িয়া গেলাম। স্ত্রী হাসিয়া বলে—"রোগ সাংঘাতিক, বুক দিয়ে চেপে না ধল্লে। কিছুতেই উপশম হবে না দেখতে পাচ্ছি।"—বলিয়া হাসিয়া বক্ষে লুটাইয়া পড়িল।

রোগের ভাণ করা আর চলে না, পরিস্কারভাবে তাই বলি—"তোমার বোঝা উচিত এমন ছুটীর দিনটা একেবারে বিফলে না যায়, এটা তোমার পক্ষে বা আমার পক্ষে কারোরই গৌরবের কথা নয়।" স্ত্রী বলে—"তাতো নয়ই; সে জন্যেই তো ছুটীর দিনটাকে চিরস্মরণীয় কর্বার উদ্দেশ্যে লেডী-ডাক্তার হতে হল।"

বলিলাম—"সত্যি, হৃদরোগে লেডীরা Specialist, ডাক্তারীতে অনভিজ্ঞ হয়েও কেমন সুন্দর ভাবে রোগটা ধরে ফেল্লে, আর ব্যবস্থা কল্লে উপযুক্ত অসুধ!"—বলিয়া সপ্রেমে পত্নীর দিকে চাহিয়া হাসিতে থাকি। আর পত্নী প্রিয়তমের বুকে মাথা রাখিয়া রোগ নির্ণয়ের আনন্দটা উপভোগ করিতে থাকে!

ঘড়িতে ৪টা বাজিল। স্ত্রী উঠিয়া পড়িয়া আসিয়া বলে "দেখলে কেন আসতে চাইছিলুম না তোমার কাছে; কি করে যে দুটো ঘণ্টা কেটে গেল টের পেলাম না"—ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলে,—"যত সব কাজ নষ্ট কর্বার ফন্দি।" তাড়াতাড়ি পরিমলকে বাহুতে বাঁধিয়া ফেলি, বলি—"হায়, কি ভোলা মন। লেডী ডাক্তারের ফীটা যে দেওয়া হয়নি!—মহাশয়া, আপনার ফী—?" স্ত্রী হাসিয়া বলে—"ফী? ষোলই তো নি' তবে আপনার অবস্থা ভাল না হ'লে যা খুসী দিন"—মুখখানা ঘুরাইয়া বলে—"চারটার কম দেবেন না অবশ্য আশা করি।"

স্ত্রীর রসিকতায় মুগ্ধ হইয়া বলি—"না, না কম দেব না; গরীব বটে তবে আমি ডাক্তারদের পুরো ফী-ই দিয়ে থাকি।"—বলিয়া ফিয়ে ফিয়ে পরিমলকে ব্যতিব্যস্ত

ভায়া হয়তো ব্যাপারটা মাসিক কাগজের মারফত অবগত হইয়া ভাবিবে—দাদা বৌদি তাজমহল না দেখিয়াই সাহিত্যের তাজমহল তৈরী করিতেছে!!

শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভুলো না

শ্রীপ্রমথনাথ কুমার

বসন্ত যদি আবার আসিয়া
দাঁড়ায় ধরার শ্যামল-ছায়,
ফুলের নূপুর চপল-চরণে ;
অলক উড়ায় দখিণ-বায় ;
কুন্দ-কুঁড়ির অমল হাসিটি
আলিপনা আঁকে অলক্ষিতে —
দেখো যেন তুমি ভুলেও ভুলো না
তখন আমায় জাগায়ে দিতে।

ফুলের আরতি, ফলের বোধন,
লতার পাতার নবীন-প্রীতি,
সুদূর-আকাশে নয়ন বিছায়ে
বধূর কণ্ঠে মধুর গীতি ;
প্রভাত যখন মিতালি পাতায়ে
আসিবে সবার বারতা নিতে—
দেখো যেন তুমি ভুলেও ভুলো না
তখন আমায় জাগায়ে দিতে।

বনের বকুল ঝরিলে ধূলায়
মনের মুকুল ফুটিবে যবে,
নিশার স্বপন দিবার আলোকে
সবার যখন সফল হ'বে ;
অশ্রু-মহলে হাস্য যখন
বিরহ মুছায় আচম্বিতে—
দেখো যেন তুমি ভুলেও ভুলো না
তখন আমায় জাগায়ে দিতে।...

কলাপরিষদের নব্য প্রদর্শনী

(ষষ্ঠ বৎসর)

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

কলিকাতার কলাপরিষদ সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত চিত্র ও মূর্ত্তির একটা বার্ষিক প্রদর্শনী উন্মুক্ত করে থাকেন। এবার এ প্রদর্শনীর ষষ্ঠ বৎসর চল্‌ছে। সম্প্রতি দ্বারবঙ্গের মহারাজ কামেশ্বর সিংহ যাদুঘরে এই প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন।

বহু বিশিষ্ট দেশীয় রাজ্যের নৃপতি এই পরিষদের সম্মানিত সভ্য। হাইদরাবাদের নিজাম বাহাদুর, বরোদার গাইকওয়ার, মহীশূরের মহারাজ, কাশ্মীরের মহারাজ, গোয়ালিয়রের মহারাজ, নেপালের মহারাজ ও প্রধান মন্ত্রী পুরস্কার প্রভৃতির দ্বারা কলাপরিষদের সহায়তা করেন। তা ছাড়া ভূপাল, ত্রিবাঙ্কুর, পাতিয়ালা, রেওয়া, বিকানীর, যোধপুর, জয়পুর, রামপুর, কপূরতলা প্রভৃতি রাজ্যের নৃপতিগণও নানাভাবে পরিষদের পোষকতা করিয়া থাকেন। এতগুলি করদ রাজ্যের সহায়তা ও সহানুভূতি লাভ যে-কোন অনুষ্ঠানের পক্ষে গৌরবজনক। কাজেই আয়োজন ও অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হয়নি।

এবার প্রায় এগার শত ছবি প্রভৃতি যাদুঘরে স্থান পেয়েছে। তা'তে চিত্রবিদ্যার সকল রকমের রচনা আছে। তেল রঙের (oil colour) ছবির সংখ্যা হয়েছে প্রায় আড়াই শত। জল রঙের ছবি, কাল সাদা ছবিও প্রচুর হয়েছে। এর ভিতর আন্তর্জাতিক বা ইউরোপীয় প্রথা এবং প্রাচ্য প্রথা—দুরকমেরই চিত্র আছে। নানা পদ্ধতির চিত্র প্রদর্শনী বলে একটা সার্ব্বভৌমিক দিক্‌ এই সংগ্রহে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

[illegible]র চেয়ে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এ ক্ষেত্রে ভারতের [illegible] প্রদেশের যোগদান। ভারত অসংখ্য ভাষায় পরিপূর্ণ। বৈচিত্র্য ও বিভেদের চিহ্ন স্বরূপ বাঙ্গলা, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম, অন্ধ্র, নেপাল প্রভৃতি দেশের ভাষা ও সাহিত্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সকলের ভাষাই এক হয়েছে—কারণ রূপের কাব্যের ভাষাতে জাতি ও দেশের সঙ্কীর্ণতা থাকে না। রূপের ভাষা আন্তর্জাতিক—তা' ছাড়া রূপের ভাষা উচ্চ নীচ বিদ্বান মূর্খ সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হয়। এজন্য ইতিহাসে খ্রীষ্টধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম যীশু ও বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ও চিত্রের সাহায্যে আত্মপ্রচারে অগ্রসর হয়।

ক্যাটাকুম্ব্‌সে (catacombs) খ্রীষ্টের চিত্রাদি মধ্যযুগের Chartries Cathedral গৃহীত গির্জ্জার যীশুমূর্ত্তি প্রভৃতি সে যুগে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করেছে প্রচুর। এ যুগেও মূর্ত্তির সাহায্যে ও চিত্রের সাহায্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হচ্ছে। আমাদের দেশে কালীঘাটের ও পুরীর দেবচিত্রাদি যেরূপ বিক্রী হয় ইউরোপে ও গ্রীসের য়্যাথস (Athos) পাহাড়ের উপরে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ একরকমের যীশুচিত্র আঁকেন যা অসংখ্য বিক্রী হয়ে থাকে। সমগ্র খ্রীষ্টানজগৎ শ্রদ্ধার সহিত এসব ছবি ক্রয় করে। বৌদ্ধজগতেও বুদ্ধের চিত্রের সাহায্যে তিব্বত, চীন, জাপান, মধ্য এসিয়া ও কোরিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার হয়েছে।

এযুগের রাষ্ট্রীয় বার্ত্তা প্রচারের জন্য জাতিগুলি চিত্রকলার সহায়তা গ্রহণ করেছে। রুষিয়ার বিপ্লবে চিত্রকলা দক্ষিণ-পবনের মত কাজ করেছে। নব্য রুষীয় চিত্রকলা এক বিপর্য্যয় উপস্থিত করেছে। বস্তুতঃ প্রচারের কাজে চিত্রকলার সাহায্য অপরিহার্য্য হয়ে উঠে। তাতে করে' যাদের আক্ষরিক বিদ্যা নেই তারাও উপকৃত হয়। বস্তুতঃ চিত্র ও ভাস্কর্য্যের প্রভাব আন্তর্জাতিক।

ঝড়ের মুখে

শিল্পী - বধূরাণী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, গৌরীপুর।

প্রাকৃতিক শোভা
শিল্পী— মিসেস হিউ গসেট।

এজন্য বর্ত্তমান প্রদর্শনীর ছবিগুলি ভারতের নানা দেশ ও জাতি হ'তে প্রেরিত হলেও সেসব বুঝতে কষ্ট হয় না। V.A. Mali, B.N. Jijja, D. Badri, V.G. Kulkarni, Mrs. Hugh Gosset, হেমেন মজুমদার, অতুল বসু প্রভৃতির ভাষা কারুও দুর্ব্বোধ্য হয়নি—বস্তুতঃ দেশকালের বাধা সম্পূর্ণ দূর হয়েছে এবং সমগ্র ভারতবর্ষ এই রূপের মন্দিরে এক অভিনব ঐক্য লাভ করেছে। এই দিক হ'তে এ শ্রেণীর বিশ্বভারতীয় রূপের মেলা উপভোগের ব্যাপার সন্দেহ নেই।

বাঙ্গালী চিত্রকরদের ভিতর যামিনী গাঙ্গুলী, অতুল বসু, হেমেন মজুমদার, সতীশ সিংহ, গৌরীপুরের ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, সুরভি চাটুয্যে, সমর ঘোষ, ইন্দুভূষণ সেন, আশু বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈতন্য চট্টোপাধ্যায়, বিমল দে, প্রমোদ চাটুয্যে, সারদা উকিল প্রভৃতি পরিচিত শিল্পীরা উপাদেয় রচনা পাঠিয়েছেন। এবার নূতন শিল্পীরাও নিজেদের অর্ঘ্য পাঠিয়েছেন—তাঁদের সংখ্যাও সামান্য নয় এবং ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা সম্ভব নয়।

প্রতীচ্য শাখায় হেমেন মজুমদারের রচনা উপাদেয় হয়েছে। এই শিল্পীর বর্ণ প্রলেপের মাধুর্য্য ও বর্ণসংহতির (ensemble) কারুতা বিশেষ সমাদরের ব্যাপার। শিল্পীর রঙের ছন্দে বিষয়টির ঐশ্বর্য্য বাড়াবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে। রসময় ভট্টাচার্য্য রঙের হাফটোনে ছবি আঁকতে সাধনা করছেন—এযুগে এ রকমের জাপানী কায়দা জগৎ গ্রহণ করেনা। অস্পষ্টতার আকর্ষণ স্থলবিশেষে উপাদেয় হয়—কিন্তু তাকে মুখ্য করে তোলাও ভাল নয়। শিল্পীর প্রতিভা আছে সন্দেহ নেই। অতুল বসুর ছবি ভালই হয়েছে। গৌরীপুরের বধুরাণী ইন্দিরাদেবীর বরফ ঢাকা পর্ব্বতের দৃশ্য উপাদেয় হয়েছে। এই শিল্পী গত বৎসর প্রাচ্যকলা বিভাগে স্বর্ণপদক পেয়েছেন। পশ্চিমের প্রথায়ও এই শিল্পীর দক্ষতা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ইন্দিরা দেবীর রচিত একখানি "প্রতিকৃতি" ও "পাহাড়ে মেয়ে" নামক ছবিও ভাল হয়েছে। নারী শিল্পীদের ভিতর ইনি উচ্চস্থান পাওয়ার অধিকার লাভ করেছেন। সুরভি চাটুয্যে প্রাচ্যকলা বিভাগ হ'তে 'পদ্ম' চিত্রের জন্য সোনার পদক পেয়েছেন। V. A. Maliর মৎসজীবী বেশ চমৎকার হয়েছে—এই শিল্পীর অন্যান্য ছবিগুলিও ভাল হয়েছে। L. M. Sen এর 'দিশি ছাতা' একটা রহস্যপূর্ণ সৃষ্টি। শিল্পী impressionist বা ছায়াপন্থী রচনায় দক্ষ। ইউরোপে ইদানীং সে যুগ আর নেই। বিমল দেবের 'বাল্মীকির গুহা' ভাল রচনা। ইন্দুভূষণের impressionistic বা ছায়াপন্থী প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণব্যঞ্জনায় সফল হয়েছে। বিজয় সেনগুপ্তের 'ফসল' চিত্রখানিতে বাঙ্গলার ধান্য-ক্ষেত্রের মাদকতা সুস্পষ্ট হয়েছে। শিল্পীর নিবিড় দৃষ্টি ধান্য-ক্ষেত্রের সৌন্দর্য্যকে রঙের জালে আবদ্ধ করেছে।

জল রঙের (water colour) ছবিতে ইউরোপীয় চিত্র-করদের বহু রচনা আছে। 'Lady Frenchএর দৃশ্য' মনোজ্ঞ হয়েছে। P. D. Mllierএর 'নৈনিতাল—বেলা দশটা' ছবিখানিতে বাহাদুরী আছে। Mrs. Hugh Gusset নীলফুল, হালকা সবুজ গাছ ও সবুজ বঙ্গভূমি নিয়ে একটা ভাল ছবি এঁকেছেন। K. C. S. Panikerএর 'Songers' ছবিখানিতে হালকা রঙের প্রাচুর্য্যের ভিতর বেশ একটা মাদকতা আছে। শিল্পী সাধারণ একটা দৃশ্য নিয়ে একটা নাট্যপ্রসঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। হেমেন মজুমদারের "আরতি"তে রঙের সূক্ষ্ম খেলা আছে—রেখায় ও লীলা-লালিত্যে ছবিখানি ভরপুর। ইন্দুভূষণের 'গিরিধির প্রপাত' মনোজ্ঞ রচনা। আশু বন্দ্যোপাধ্যায় 'আজান' চিত্রে একটা ঊর্দ্ধলোকের সম্পর্ক ঘণীভূত করেছেন। মোটামুটি জলরঙের বিভাগ সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করে।

প্রাচ্যবিভাগে মেয়েদের রচনা বেশ ভাল হ'য়েছে। সবিতা ঠাকুরের 'রাইরাজা', সুরভি চাটুয্যের 'পদ্ম' অধিক মনোজ্ঞ হয়েছে। বধূরাণী ইন্দিরা-দেবী চৌধুরাণীর 'ঝড়' রচনায় একটা উপভোগ্য সৌন্দর্য্য আছে। বধূরাণীর 'বুদ্ধের গৃহত্যাগ' রচনার ভিতর একটা নিবিড় নাট্যপ্রসঙ্গ চিত্র-খানির মর্য্যাদা বাড়িয়েছে। মহিলা শিল্পীদের ভিতর তেলরঙ, জলরঙ ও সাদা কালো সকল বিভাগেই ইন্দিরা দেবীর কৃতিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। একই শিল্পীর এরূপ সকল... প্রতিভা দুর্লভ। তটিনী মুখার্জীর 'Distressed' ছবিখা... উৎকৃষ্ট হয়েছে। রাধাচরণ বাগ্‌চীর "অর্দ্ধোদয় যোগের"

ছবিতে জনসঙ্গমের একটা রমণীয় হিল্লোল দেখতে পাওয়া যায়। বি, গুপ্তের "রজনী" ছবিখানিতে রূপকের চেষ্টা আছে। লাল ও নীল পদ্ম হাতে মেয়েটিকে সুশোভন দেখাচ্ছে। সারদা উকিলের 'জননী' শিল্পীর প্রতিভার পরিচয় দেয়; শিল্পীর "রাধাকৃষ্ণ' রচনাখানিও ভাল হয়েছে। প্রমোদ চাটুয্যের 'প্রাকৃতিক দৃশ্য', কে এম ধরের "পল্লীমেলা ভাল ছবি। এসব ছবিতে বাঙ্গলার মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য সুস্পষ্ট হয়। অপর্ণা ঘোষের 'রাধাকৃষ্ণ মিলন' আর একখানি মনোরম ছবি। সাদা কালো ছবির ভিতর সারদা ও রণদা উকিলের চিত্রগুলি চিত্তাকর্ষক হয়েছে। বিমল দের ছবিখানিতে বেশ একটা সজীবতা লক্ষ্য করা যায়। মুকুল দের কয়েকখানি ছবিও উল্লেখযোগ্য।

এসব ছাড়া বিজ্ঞপ্তি চিত্র (Poster) ক্ষেত্রে অনেক নূতন চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। বি, ভৌমিকের "মুশৌরী," জি মণ্ডলের "শিলং" উল্লেখযোগ্য। এবার অনেকগুলি চমৎকার মূর্ত্তি ও ভাস্কর্য্য প্রদর্শিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিদেশী শিল্পীরা এদেশ হ'তে বহু মুদ্রা আহরণ করে। কামাখ্যা দাসের "ব্রোঞ্জে জীবন" (Life in Bronze) ভাল রচনা। পি মল্লিক উচ্চশ্রেণীর ভাস্কর্য্যের নমুনা উপস্থিত করেছেন। কে, সি, রায়ের "School mistress" একটি উৎকৃষ্ট রচনা। চস্‌মা না দিয়েও তার আভাস দেওয়ার এরকম দৃষ্টান্ত এদেশে দেখা যায় না। মূর্ত্তিটিও শিক্ষয়িত্রী জীবনের একটা প্রামাণ্য কল্পনা সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে অন্যান্য শিল্পীদের রচনাও চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

কলাপরিষদকে এই অভিনব আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া প্রয়োজন। এদেশে ভাল কাজে বাধা বিস্তর। কলিকাতা ভারতের রাজধানীর গৌরব হ'তে বহুকাল বঞ্চিত হয়েছে। এরকমের বিশ্বভারতীয় অনুষ্ঠান হ'তে মনে হয় আবার বুঝি কলিকাতার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হল। *

বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত দুইখানি চিত্র প্রকাশিত হইল। আরও কয়েকখানি চিত্র পরে পরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

* প্রকাশিত চিত্রের প্রতিলিপিগুলি ফটোগ্র্যাফ (২৫ এ লিন্‌ড্‌সে ষ্ট্রীট) কর্ত্তৃক গৃহীত।

কণা

শ্রীসুবোধ পুরকায়স্থ

সুন্দর, তব মুখপানে চেয়ে চেয়ে
নাহি জানি, কোন ক্ষণে
ভাল ও মন্দ মম দুটি কর সম
ঠেকিয়াছে ও চরণে ॥

প্রেমেরে চিনিবে সমগ্ররূপে,
আগপথ নাহি আর।
ভাঙ যদি তবে দিবালোকসম
দীপ্তি রবেনা তার ॥

আমার দুখের কালোমেঘে কোল
তোমার চন্দ্রকর—
বিচিত্ররূপ ধর তুমি সুন্দর ॥

যাত্রায় পৌরাণিক নাটক ও অভিনয়

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্‌-এ, বি-এল্‌

ন্যূনাধিক সাত বৎসর বয়সে আমি সর্বপ্রথম যাত্রা দেখিতে যাই। তখন ভগবান আমার অন্তরের অন্তরে কি মধুর বৃত্তি দিয়াছিলেন জানি না, আমার মনে হইল আমি একটা স্বপ্নময় রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বরুণাদি দেবগণ যেন সত্য সত্যই স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাদের জ্যোতিতে দেবলোক উদ্ভাসিত। প্রজারঞ্জন, অতিথি সৎকার, সত্যানুরাগ প্রভৃতি যে তাঁহাদের মূলমন্ত্র একথা তখন আমার হৃদয়ের অন্তরতমস্থলে লিখিত ছিল। আমি রাক্ষস দেখিয়া ভয় পাইতাম, হস্তী দেখিয়া আমাদের দেশের রাজার হস্তীর সহিত তুলনা করিতাম; যুদ্ধের সময় সত্য সত্যই যেন রণস্থলে বসিয়া আছি এরূপ বোধ হইত। অত্যাচারীগণের দণ্ড না হওয়া পর্য্যন্ত মন নিরন্তর ব্যাকুল থাকিত। বাদ্যসঙ্গীত আরম্ভ হইলে লোকে কিরূপে সেখান হইতে উঠিয়া যাইতে পারে একথা আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও কল্পনায় আনিতে পারি নাই।

সেই সময় হইতে প্রায় সত্তর বৎসর পরে আমি পুনরায় যাত্রা দেখিতে গেলাম। দেখিলাম আমার সে কল্পনারাজ্য ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। যাত্রার আর সে মোহিনী-শক্তি নাই, সঙ্গীত আর তেমন ভাবে আমার চিত্ত আকর্ষণ করে না। প্রথম ঘণ্টা, দ্বিতীয় ঘণ্টা, তৃতীয় ঘণ্টা—যাহা বাজিলে আমি অজ্ঞাতসারে একটা কল্পনাময় রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিতাম তাহা কেবল ঘণ্টাবাদকের প্রক্রিয়া মাত্র; স্ত্রীগণ প্রকৃত স্ত্রীলোক নহে, পুরুষগণ ঐরূপ সাজিয়াছে; যুদ্ধ একটা ব্যঙ্গযুদ্ধ মাত্র; যুদ্ধে লোক নিহত হইলে সাজ ঘরে গিয়া পুনরায় জীবিত হইয়া উঠে; ভূত একটা মুখোস পরিহিত মানব; সন্ন্যাসী হয়ত একটা বদ্ধ মাতাল। কে আমার সোনার রাজ্য ছারখার করিয়া দিয়াছে? ভগবান! তুমি আমায় পুনরায় বালক কর এ আমার প্রার্থনা নয়, তুমি আমার সেই কল্পনা দাও। কেন তুমি আমার কল্পনা কাড়িয়া লইলে? কেন আমি পার্থিব হইলাম!

প্রায় সমস্ত বাঙ্গলা পৌরাণিক নাটকে দেখা যায় যে তাহা একটি নীতি অবলম্বনে লিখিত। কেহ কেহ বলেন ললিতকলার সহিত নীতির কোনও সংস্রব নাই। কিন্তু আমরা বোধ হয় সেকথা বলিবার যুগ অতিক্রম করিয়াছি। আমরা বলিব নীতিই সৌন্দর্য্য। তবে সে নীতিটি দান করিবার প্রকার ভেদ আছে। প্রধান গল্পের স্রোতে বাধা না দিয়া প্রকারান্তরে নীতিদানই সর্ব্বোত্তম কলানৈপুণ্য। কিন্তু প্রায় সমস্ত পৌরাণিক নাটকগুলিতে নীতিগুলি এত অধিক এবং কখনও কখনও এরূপ অপ্রাসঙ্গিকরূপে প্রদত্ত হয় যে তাহা সৌন্দর্য্যোপভোগ বিষয়ে অন্তরায় হইয়া উঠে। নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকের মধ্যে প্রভেদ এই যে শেষোক্ত ব্যক্তি একটি চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া পাঠকের সম্মুখে সাধারণভাবে বর্ণনা করিতে পারেন, কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে অবগুণ্ঠনের আড়ালে থাকিয়া পাত্রপাত্রীগণের কার্য্য ও কথোপকথনের দ্বারা চরিত্রগুলিকে পরিস্ফুট করিতে হয়। যে মুহূর্ত্তে শ্রোতা বুঝিতে পারে যে গ্রন্থকার তাহাকে সাবধানভাবে উপদেশ দিতেছে সেই মুহূর্ত্তে নাটকের মনোহারিত্ব কমিয়া যায়। বাঙ্গলা পৌরাণিক নাটকগুলিতে এরূপ ধরণের দোষ যথেষ্ট আছে। যিনি দাতা তিনি দান সম্বন্ধে, এবং যিনি ধার্ম্মিক তিনি ধার্ম্মিকত্ব সম্বন্ধে এত বেশী বক্তৃতা করেন যে শ্রোতার মনে নীতিটির ধারণা বদ্ধমূল হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃ যেন শিথিল হইয়া আসে। গ্রন্থকার মনে করেন যে পৌনঃপুণ্যের দ্বারা নীতিটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবেন, কিন্তু পৌনঃপুনিকতার দ্বারা যে লাভটুকু হয়, কলা-নৈপুণ্যের মনোহারিত্ব বিষয়ে ক্ষতি তাহা অপেক্ষা অধিক।

আমাদের পৌরাণিক নাটককারগণ কেন যে এরূপ করিতেন তাহার কারণ বোধ হয় এইরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, হিন্দুগণ ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। দ্বিতীয়তঃ, এই নাটকগুলি যখন প্রথম রচিত হয় তখন জনসাধারণ অধিকাংশ অশিক্ষিত ছিল, তাহাদের এরূপ শক্তি ছিল না যে তাহারা কেবলমাত্র কার্য্য-কলাপ দেখিয়া নীতিটি ধরিতে পারে। বিশেষতঃ যাত্রা উন্মুক্ত স্থানে হইত, সেখানে বহু সংখ্যক লোকের সমাগম হইত, তজ্জন্য তাহারা একাগ্রচিত্তে সমস্ত বিষয় শুনিতে পাইত না। এই কারণে নাটককারকে বাধ্য হইয়া পাত্র পাত্রীগণের মুখে নীতি বিষয়ক কথাগুলির পুনঃ পুনঃ অবতারণা করাইতে হইত। শুধু বাঙ্গলা নাটকে কেন, এরূপ ঘটনা আমরা ভবভূতির উত্তর রামচরিতেও দেখিতে পাই। ভবভূতি মহাবীর চরিত লিখিবার পর দেখিলেন যে তাঁহার উদ্দেশ্য কেহ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। এজন্য তিনি নিতান্ত খেদের সহিত লিখিয়াছিলেন "উৎপৎস্যতে মম কোঽপি সমানধর্ম্মা কালোহ্যয়ং নিরবধি-বিপুলা চ পৃথ্বী" এবং এইজন্যই বোধ হয় তিনি উত্তর চরিতে সীতার মুখ দিয়া রামচন্দ্রের গুণাবলীর পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করাইয়াছেন। রামচন্দ্র প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহসূচক একটি কার্য্য করিলেন, অমনিই কবি সীতার মুখ দিয়া বলাইলেন "আর্য্যপুত্র, এই জন্যই লোকে আপনাকে প্রজাবৎসল বলে" ইত্যাদি। ভবভূতি কি জানিতেন না যে এরূপ কথনের দ্বারা নাটকের কলানৈপুণ্যের উৎকর্ষ প্রভূত পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়?

পৌরাণিক নাটকের আরও একটি বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের অনুমান যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বক্তৃতাগুলির মধ্যে মধ্যে বিশেষতঃ কোনও মর্ম্মস্পর্শী ঘটনার সময়ে যে গানগুলি দেওয়া হয় তাহারও উদ্দেশ্য এই। একজন সাংসারিক লোক স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া রণস্থলে যাইতেছেন, একজন রাজা রাজভোগ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিতেছেন এ সমস্ত বিষয়ের গুরুত্ব সাধারণ লোকে—বিশেষতঃ মন যখন একাগ্র নয়—সহসা উপলব্ধি করিতে পারে না। শ্রোতাকে এইগুলি বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়া এবং তাহাদের মনে অনুভূতি ঘনীভূত করা এই গানগুলির উদ্দেশ্য। এরূপ অনুভূতি দৃঢ়ীকরণের শক্তি আমরা ইংরাজ কবি সুইনবর্ণের নাটকের গানগুলিতে প্রভূত পরিমানে দেখিতে পাই, কিন্তু এ বিষয়ে গ্রীসদেশীয় কবি সোফোক্লিসের কোরাস্‌গুলি অদ্বিতীয়।

পাত্রপাত্রীগণের প্রতি সমানুভূতি প্রকাশ, শ্রোতৃগণের মনকে বিশ্রাম দেওয়া প্রভৃতি কোরাস্‌গুলির অন্যতম উদ্দেশ্য থাকিলেও সে সম্বন্ধে আমরা এখানে কিছু না বলিয়া বাঙ্গলা যাত্রায় সেগুলি কিরূপে সাধিত হয় দেখা যাউক। অনুমান করা গেল রাম বনে যাইতেছেন, সীতাও তাঁহার সহিত যাইবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয্য দেখাইতেছেন। ঠিক এই সময়ে একটি গান আরম্ভ হইল। কি কারণে জানিনা, যাত্রায় যুড়ীদের পোষাক সম্বন্ধে একেবারেই যত্ন লওয়া হয় না। পোষাকগুলি জীর্ণ ও দীর্ণ। মুক্তস্থানে সঙ্গীতের শব্দ সহজেই বাতাসের সহিত মিলাইয়া যায় বলিয়া এবং তাহাদিগকে বালকগণের সহিত গাহিতে হয় বলিয়া তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া উচ্চস্বরে সঙ্গীত ধরিতে হয়। কিন্তু তাহাদের কণ্ঠস্বর অধিক চড়ায় উঠে না সেজন্য তাহারা সময়ে সময়ে শুধু মুখভঙ্গী ও হস্তসঞ্চালনাদি করে। সঙ্গীতের তান এবং সরগম্ ভাল অভ্যাস নাই তথাপি কানে হাত দিয়া চিবুক বাঁকাইয়া মাঝে মাঝে বিকট শব্দ করে এবং মৃৎপাত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে থাকে। দর্শকের মন স্বতঃই এই সকল অঙ্গভঙ্গীর দিকে আকৃষ্ট হয়। এই সমস্ত দেখিয়া দর্শক ইচ্ছা করে 'উকীলমোক্তারগণ' বসিয়া পড়ুক, কিন্তু সময়ের অনুরোধে তাহাদিগকে গীতগুলি বিলম্বিত করাইতে হয়। তখন দর্শকের দৃষ্টি স্বভাবতঃই পাত্রপাত্রীগণের উপর পতিত হয়। কিন্তু এদিকে আর এক ব্যাপার। রাজপুত্রের পক্ষে বনগমন বড়ই দুঃখের বিষয়, কিন্তু ইতিমধ্যে রাম ও সীতা বসিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের কি একটা হাসির কথা উঠিয়াছে, তাঁহারা হাসিতেছেন। তাহার পর রাম তামাক খাইয়া কলিকাটি সীতাকে বাড়াইয়া দিলেন, সীতা তামাক খাইতে লাগিলেন এবং তিনদিন পূর্ব্বে কামান দাড়ি পুনরায় খোঁচা খোঁচা হইয়া উঠিয়াছে কিনা হাত বুলাইয়া দেখিতে লাগিলেন। এদিকে সাজঘর হইতে একটা লোক রামের বনবাসযোগ্য পরিচ্ছদ লইয়া

আসিল দর্শক তাহাও দেখিলেন। এ সমস্ত ব্যাপারে অভিনয়ের চমৎকারিত্ব একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। গানগুলি যদি নিয়মিত প্রকারে উত্তমরূপে গীত হয় তবেই বোধ করি গানের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। তথাপি যেরূপ অসুবিধা স্বীকার করিয়া তাহারা গান গায় তাহা চিন্তা করিলে তাহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়।

রচনা ও ভাববিষয়ে এই সঙ্গীতগুলির বিশেষত্ব এই যে ইহাদের অধিকাংশ সংসারের অসারতা ও ভগবদ্ভক্তিমূলক এবং পাত্রপাত্রীর বক্তৃতার শেষকথা অবলম্বনে ইহাদের রচনারম্ভ। একজন পাত্রী বলিলেন, "হে হরি এখন কি করি?" যুড়ীও ঠিক সেই সময়ে গান ধরিলেন "হে হরি এখন কি করি, পড়েছি বিপদ পাথারে" ইত্যাদি। এইরূপ দুই চারিটি গীত হইবার পর যুড়ী উঠিলেই শ্রোতা বুঝিতে পারে যে সেই ভাব অবলম্বনে একটি গান হইবে এবং তাহার প্রথম ছত্রটি কি হইবে তাহাও অনুমান করিয়া লয়, ইহা বড়ই হাস্যোদ্দীপক। কিন্তু যুড়ীগণের বাহাদুরী এই যে তাহারা সুরযন্ত্র বাজিবার পূর্ব্বেই মুহূর্ত্তমধ্যে ঠিক যে সুরে গান ধরিতে হইবে সেই সুরে ধরিয়া ফেলে। ইহা বড় কম রেওয়াজের পরিচয় নয়।

পৌরাণিক নাটকে করুণ রসের আধিপত্য বড়ই বেশী এবং না হইবেই বা কেন? ইহা হিন্দুদের মজ্জাগত জিনিস। নায়ক অথবা নায়িকার ঈশ্বরানুরাগ প্রদর্শন জন্য তাহাদিগকে অসংখ্য বিপদের মধ্যে পাতিত করা হয় এবং প্রত্যেক পরীক্ষাতেই ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করাইয়া জয়ী করান হয়। হরি যে ছলনাময় তাহা দেখাইবার জন্য হয়ত একটি রাক্ষসকে নায়কের নিকট সন্তানের রক্তপান ভিক্ষা করাইতে হয় এবং রাক্ষস যখন সন্তানকে বধ করিতে উদ্যত হয় সেই সন্ধিস্থলে হরি আসিয়া দেখা দেন। হরি যে দর্পহারী তাহা দেখাইবার জন্য অপর একটি চরিত্রের দর্প ও পতন দেখাইতে হয়। ভগবান যে ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তের তাহা দেখাইবার জন্য কতকগুলি অধর্ম্মচারী ভণ্ডের পতন দেখাইতে হয়। প্রায় সমস্ত পৌরাণিক নাটকে এইরূপ কঠোর পরীক্ষার কার্য্যগুলি এত সাধারণ হইয়া দাঁড়ায় যে সেই সকল পরীক্ষাস্থলে নায়ক নায়িকা কি করিবে তাহা বলিয়া দেওয়া যায় এবং হরিও যে একটি জীবন মরণের সন্ধিস্থলে নিশ্চয়ই ভক্তের নিকট সশরীরে আবির্ভূত হইবেন ইহাও দর্শক জানিতে পারিয়া হরি কখন আসিবেন তাহারই জন্য যেন প্রতীক্ষা করিতে থাকে। যদি ঘটনাগুলিতে কিছু বৈচিত্র্য মিশ্রিত করা হয়, তাহা হইলে বোধহয় নাটকগুলির উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

সে যাহাই হউক করুণ দৃশ্যগুলি রঙ্গমঞ্চে এত অধিকবার প্রদর্শিত হয় এবং এত বিলম্বিত করা হয় যে তাহাদের চিত্তাকর্ষণশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। দর্শকের আর ধৈর্য্য থাকে না। অনুভূতির উত্থানের একটা সীমা আছে তাহা অতিক্রান্ত হইলে অনুভূতি শ্লথ হইয়া বিপরীতভাব ধারণ করে। হয়ত সত্যরক্ষার জন্য একজন রাজা তাঁহার পুত্রের শিরশ্ছেদন করিবেন, তখন একটি সুদীর্ঘ করুণ বক্তৃতা আরম্ভ হইল "হা পুত্র, তোকে কত করে' লালনপালন করেছি, তুই কি আর বাবা বলে ডাকবি না?" ইত্যাদি। যদি এই ঘটনাটি একটিমাত্র দৃশ্যে দেখান হইত তাহা হইলে কোনও অন্যায় ছিল না, কিন্তু যাত্রাতে ইহা কতকগুলি ধারাবাহিক দৃশ্যে দেখান হয়। পিতা পাঁচ সাতবার পুত্রের হাত ধরিয়া রঙ্গালয়ে লইয়া আসিয়া করুণ বক্তৃতা করিতে থাকেন। তাহার পর হয়ত মাতা আসিলেন। মাতা কাঁদিতেছেন অথচ এদিকে ঘন ঘন মূর্চ্ছিত হইয়া আসরের ঠিক কোনখানে পতিত হইবেন তাহা দেখিতেছেন। এইরূপ বহুক্ষণ করিবার পর নাটকের বাস্তবভাব একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়। মর্ম্মান্তিক ঘটনাগুলি একটিমাত্র দৃশ্যে শেষ হইয়া যাওয়া ভাল।

করুণ রসাত্মক বক্তৃতাগুলির আরও একটি দোষ এই যে সেগুলির অধিকাংশ সুদীর্ঘ এবং ভাবপ্রবণ। ভাবপ্রবণতা (sentimentality) স্থায়ীভাব (emotion) নহে, ইহা স্থায়ীভাবের ব্যাধি মাত্র। বিশেষতঃ মন যখন নিতান্ত দুঃখ সংক্ষুব্ধ থাকে তখন নীরব ভাষায় অথবা অল্প ভাষায় মনের ভাব যেরূপ প্রকাশ পায় একটি রোদনপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতাতে তাহা কিছুতেই হয়ত সম্ভবপর নয়। সেক্সপীয়রের নাটকের চরিত্রগণ অনেক স্থলে ভাবাধিক্যের সময় কথা বলে। ভাবাধিক্যের সময় ঐ কথা বলাই স্বাভাবিক।

সুদীর্ঘ করুণ রসাত্মক বক্তৃতা নাটকে কোনওক্রমেই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে যেমন একটি যুদ্ধের ঘটনার সঙ্গে একটি প্রেমের ঘটনা জড়িত করা নিয়মের আকার ধারণ করিয়াছে, পৌরাণিক নাটকে বিপরীত যুগ্ম-চরিত্র প্রদর্শনও তদ্রূপ। বিলাসী ও উদাসীন, নির্দ্দয় ধনী ও সদয় দরিদ্র, ভক্ত ও ভণ্ড, অত্যাচারী ও ধার্ম্মিক এইরূপ যুগ্ম যুগ্ম চরিত্র প্রদর্শিত হয়। ইহা দ্বারা চরিত্রগুলি মনের মধ্যে দৃঢ়ীভূত হয় এবং ইহার শেষ ফল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। কতকগুলি নাটকে মন্দ চরিত্রগুলির পতন দেখান হয় কিন্তু তাহা অপেক্ষা যে নাটকে তাহাদের পরিবর্ত্তন দেখান হয় তাহা—কতকগুলি সীমার মধ্যে—উচ্চতর। কিন্তু চরিত্রগুলি যুগ্মে যুগ্মে আসিলে নাটকখানি নীরস হইয়া পড়ে।

বাঙ্গলা যাত্রায় করুণ রসের অবতারণা এত অধিকবার বলিয়াই বোধ হয় হাস্যোদ্দীপক চরিত্রগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে অঙ্কিত হইলেও এত উপভোগ্য হয়। বাঙ্গলা যাত্রায় প্রধানতঃ বিদূষকের দ্বারা হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয়। সিড্‌নি স্মিথ বলেন অসামঞ্জস্যই হাস্যের কারণ। বিদূষকের পক্ষে অসামঞ্জস্য এই যে যখন রাজসভার যুদ্ধ-বিগ্রহের মত গুরুতর বিষয়ের কথাবার্ত্তা চলিতেছে তখন সে মিষ্টান্ন ভোজনের কথা ভাবিতেছে। হাস্য দুইরূপ হইতে পারে—উদ্দেশ্যপূর্ণ ও উদ্দেশ্যশূন্য। প্রথম অবস্থায় বিদূষকগণের হাস্য গোপালভাঁড়ের মত নিরুদ্দেশ্য ছিল এবং তাহার টান সাধারণতঃ আদিরসের দিকে এবং লাড্ডু ভোজনের দিকে থাকিত। বিদূষকগুলিকে পুনঃ পুনঃ নাটকে আনয়ন করায় জিনিসটি ক্রমশঃ একঘেয়ে হইয়া আসিল। নাটককারগণ সেই একই বিষয়ে নূতন কথা আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। এক বিষয়ে নূতন কথা বলিবার অক্ষমতা প্রযুক্তই হউক অথবা হাস্য চরিত্রের অনিবার্য্য গতি প্রযুক্তই হউক হাস্য চরিত্রের সামাজিক সমালোচনা আরম্ভ হইল। কিন্তু এখানেও কতকগুলি পৌরাণিক নাটককার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাহারা সাধারণতঃ গোঁড়া হিন্দু, সংস্কারাচ্ছন্ন, কাজেই—মামুলী রীতি নীতি যে ব্যক্তি সামান্য পরিমাণেও উল্লঙ্ঘন করিয়াছে সেইরূপ ব্যক্তি তাঁহাদের বিদ্রূপের স্থল হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহাদের দেশকাল পাত্র বিবেচনা নাই এবং সহানুভূতিও কম। এরূপ ধরণের হাস্যচরিত্রবিশিষ্ট নাটকের ভাগ্য যে কিরূপ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

অঙ্কনের বিষয় ছাড়িয়া দিয়া শুধু অভিনয়ের বিষয় ধরিলেও দেখা যায় যে আমাদের বিদূষকগুলি অনেকস্থলে অকৃতকার্য্য। তাহারা যে লোকজনকে হাসাইতেছে এরূপ একটা ভাব অভিনয় কালে তাহাদের প্রত্যেক আকার ইঙ্গিতে প্রকাশ পায়। চার্লি চ্যাপলিনের মত হাস্য চরিত্রের মধ্যে হাস্যের ভাব এরূপ অন্তর্নিহিত অবস্থায় থাকা আবশ্যক যে হাসির ভাবগুলি যেন চরিত্রটির অনিচ্ছাক্রমে বাহির হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে আমাদের হাস্য চরিত্রের অভিনেতাগুলির অধিকাংশই অকৃতকার্য্য।

পৌরাণিক নাটক ও যাত্রায় এতগুলি দোষ থাকা সত্ত্বেও যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে আমরা যাত্রা দেখিতে চাই কি থিয়েটার দেখিতে চাই, তাহার উত্তরে আমরা বলিব—যাত্রা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র
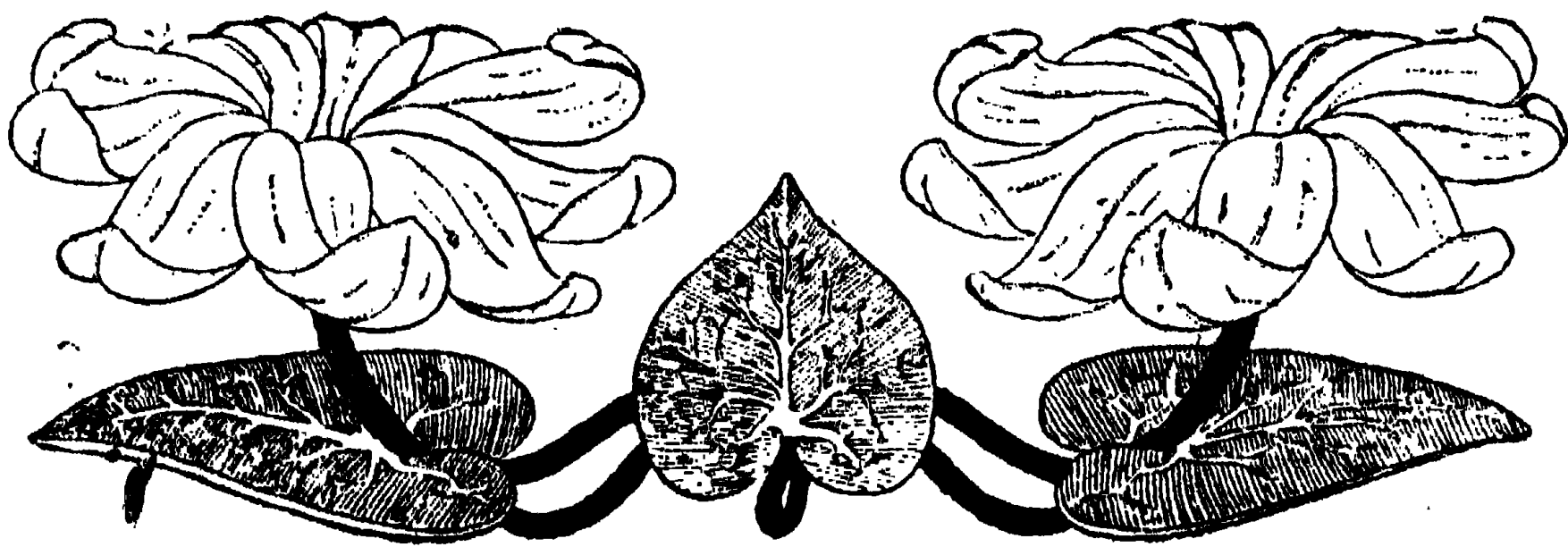
জন্মান্তর

শ্রীঅধীরকুমার রাহা

জন্মান্তরবাদে আপনাদের অনেকেয় মত আমারও বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু ত্রিদিব বাবুর ব্যাপার দেখে আমার সে অবিশ্বাস ভেঙে গেল।

জন্মান্তর মানে এখানে ইহজীবনেই পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের কথা বলছি।

বছর চারপাঁচ পরে দেশে ফিরে এসে অবাক হলাম।

মফস্বল সহরের সহরতলীতে আমাদের বাড়ী—আমার এই নাতিদীর্ঘ কয়েক বছরের অনুপস্থিতিতে সেখানে পরিবর্ত্তন ঘটেছে অনেক।

অবাক তা'তে হই নি।

পরিবর্ত্তনশীল জগতে পরিবর্ত্তন দেখে অবাক হব ?

অবাক হোলুম আজ সকালে ত্রিদিব বাবুকে দেখে।

ত্রিদিববাবু একহিসাবে আমাদের গুরুজন—নমস্য। ছেলেবেলায় নিকটবর্ত্তী সহরের স্কুলে তাঁর নিকট পড়েছি—তাঁকে ভয় করেছি, ভক্তি করেছি।

ত্রিদিববাবু ছিলেন আমাদের গণিতের শিক্ষক।

দীর্ঘ, ঋজু, বলিষ্ঠ দেহ, গায়ের রং অসম্ভব ভাবে সাদার ধার ঘেঁষে গেছে। সদা গম্ভীর বদন, কালো দাড়ীগোঁপের জঙ্গল তাকে আরও গম্ভীর ও রহস্যময় কোরে তুলেছে। পরনে খাদি-প্রতিষ্ঠানের থান, গায়ে চাদর—জামা পরতে কোনদিন দেখেছি বলে মনে হয় না। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি জুতা।

অর্থাৎ সাদা কথায় তিনি সেই বৈদিকযুগের তাপসগুরুর আধুনিককালের বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলমারা অতি-আধুনিক সংস্করণ।

ত্রিদিববাবু ভয়ানক পণ্ডিত লোক,—সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা বিশেষণে বিভূষিত কোরলেও নেহাৎ অশোভন হয় না।

কিন্তু কি শিক্ষক মহল, কি ছাত্র সম্প্রদায়, উভয়ের কাছে তিনি ছিলেন এক ঘোর রহস্য।

বয়স তেত্রিশের কাছাকাছি; বিবাহ করেন নি—চিরকুমার। কোনদিন যে কোরবেন এমন ভরসাও ছিল না।

পৃথিবীতে মাত্র একটী জিনিষের সঙ্গে তাঁর বড় বেশী ঘনিষ্ঠতা। সেটি হ'ল পুস্তক।

স্কুলে ছেলে পড়াচ্ছেন, নিজেও পড়ছেন নিরন্তর,—জ্ঞান তৃষ্ণা মেটে না তবুও বেড়েই চলেছে 'হবিষাকৃষ্ণবর্ত্মেব' মত।

যা হোক • সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে তিনি জ্ঞানের উপাসক চিরদিন।

তাঁর প্রসঙ্গ উঠলেই, তাঁর বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে এই রকম কথোপকথন চলত: ত্রিদিববাবু এই ভোগের পৃথিবীতে, এই বিলাসিতার চরমতম যুগে কেন যে এমন আত্মনিগ্রহ করে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন তার কোন কিনারা করতে না পেরে একজন বলেন: যা হোক লোকটিকে কিন্তু ভাল করে বোঝা গেল না…অত বড় লোকের ছেলে, বিয়েও করলে না, কিছুই না, কেমন যেন অদ্ভুত রকমের……

—নিশ্চয়ই ভেতরে কোন উদ্দেশ্য আছে, নতুন একটী কিছু কোরবেন বোধ হয়—যে রকম ষ্টাডি কোরছেন…

—কিন্তু বিয়েতে তার বাধা কি ?

হতাশ প্রেমিক বোধ হয়—মাঝখান্ থেকে একজন বলে ওঠেন।

—না-না, অমন শুদ্ধ, ঋষিকল্প লোকের কাছে আবার আদি রস ঘেঁষবে? ক্ষেপেছ?

আলোচনা এ পর্য্যন্ত এসেই থেমে যায়।

সেদিন বাড়ী এসে প্রথমেই গিয়েছিলাম ছাত্র জীবনের বন্ধুদের খোঁজ খবর নিতে সেই পুরাতন চায়ের আড্ডায়। কিন্তু পেলুম না কাউকেও।

তবু শুনে সুখী হোলুম যে এই বেকার সমস্যার দিনে, চাকরী নিয়ে ক্যমুনাল রায়ট বাধবার দিনেও তারা সবাই বি, এ, এম, এ পাশ করবার পর মাসিক ১৩ হতে সতেরো টাকা বেতনের, সরকারী, বেসরকারী চাকুরী নিয়ে মহাসুখে ঘরকন্না কচ্ছে। তাই ১১টার পর কারও টিকির খোঁজ পাওয়া দুষ্কর।

বন্ধুমণ্ডলীর এবংবিধ সৌভাগ্য ও কৃতকার্য্যের বার্ত্তা শ্রবণ করে মনে মনে পুলকিত হয়ে ভাবতে লাগলুম: সন্ধ্যার পর একবার সবার বাড়ী গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখলে কেমন হয়?

—এমন সময় দেখলুম সন্দীপের সঙ্গে মাঝারী বয়সের একজন ভদ্রলোক আসছেন। শুভ্র মুখমণ্ডলে সেভ করা দাড়ীগোঁপের নীলাভ চিহ্ন প্রচুর স্নো, পাউডার মেখেও যায় নি; নিখুত আধুনিক কেতাদুরস্তভাবে সাজগোজ করা পরিপাটী চেহারা।

ভদ্রলোককে কোথায় যেন দেখেছি মনে হোল?

ক্লাসের পরীক্ষার খাতায় সন্দীপের স্মৃতি-শক্তির দীনতা বার বার সুবৃহৎ 'জিরো' পেয়ে প্রমাণিত হোলেও এক্ষেত্রে দেখলুম সে চট কোরে আমায় চিনে ফেলে তীক্ষ্ণ স্মৃতি-শক্তির পরিচয় দিল।

সঙ্গের ভদ্রলোকটি কিছুক্ষণ আমাকে ভালভাবে নিরীক্ষণ কোরে বুঝলেন আমি, আমিই। বললেন: অচঞ্চল যে? কবে আসলে?

কি উত্তর দেব এর? প্রশ্নকর্ত্তাকেই যে চিনতে পারছি না। কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তাঁকে চিনবার ব্যর্থ চেষ্টা কোরে বললুম: আজ সকালেই।...

সন্দীপ বোধ হয় আমার এই মুখের দিকে চেয়ে থাকার ব্যাপারটা আঁচ কোরতে পেরেছিল। বললু: চিনতে পারিস না এঁকে—? ত্রিদিববাবুকে মনে নেই?...

ত্রিদিববাবু?

জীবনে তা হোলে কি এমন সময়ও আসে যখন নিজের চোখের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধেও সন্দিহান হোতে হয়?

প্রণাম কোরলুম। একগাদা মামুলী কথাবার্ত্তা হবার পর তিনি স্কুলে চলে গেলেন। সেখানেই যাচ্ছিলেন।

ত্রিদিববাবুর সঙ্গে কথা বলার সব সময়েই আমার ইচ্ছা হচ্ছিল একবার জিজ্ঞাসা করি তাঁর এই আকস্মিক আমূল পরিবর্ত্তনের হেতু কি? কিন্তু কেমন যেন বাধতে লাগল। পারলুম না?

সন্দীপকে এইবার একা পেয়ে জিজ্ঞাসা কোরলুম: ব্যাপার কি? তার কাছ থেকে যা শুনলাম তাতে বোঝা গেল ত্রিদিববাবু বিশেষ কোন অবস্থাবিপাকে পড়ে রীতিমত পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছেন।

২

আমাদের বাড়ীর সামনে মিউনিসিপালিটির বেশ খানিকটা জমি পড়েছিল; গ্রীষ্মকালে পাড়ার ছেলেরা সেখানে কচি কচি বাতাবী লেবুকে বলে পরিণত কোরে ফুটবল খেলত, শীতকালে নারিকেল শাখার ব্যাট, ইটের ষ্টাম্প ও টেনিস বল সহযোগে তাদের ক্রিকেট খেলা চলত। অনেক দিন হোতে সেখানে একটা গার্ল'স স্কুল বসাবার প্রস্তাব চলছিল—অবশেষে আমি চলে যাবার বছর খানেক পরে সেটী সত্যই কার্য্যে পরিণত হয়।

কামিনী ও আংশিক ভাবে কাঞ্চন ত্যাগী ত্রিদিববাবুর স্কুলে যাবার একমাত্র পথে পড়ে স্কুলটি।

নবাগতা হেডমিসট্রেস মিস্ বোসকেও রোজ ত্রিদিববাবুর গমন পথ দিয়ে স্কুলে আসতে হয়—স্কুলটির সামনে উভয়ের নিত্য সাক্ষাৎ।

মিস বোস! প্রদীপের শিখার মত সঞ্চয়মান লীলায়িত দেহতন্বী। গত শতাব্দীর যে কোন খ্যাতনামা লেখক, সমাস-সন্ধি বিশেষণ দেওয়া বড় বড় শব্দ দিয়ে চার পাঁচ পাতা ধরে সে রূপ বর্ণনা কোরেও বোধ হয় ক্লান্ত হোতেন না?

এক কথায় মেঘদূতের যক্ষ-প্রিয়ার আধুনিক সংস্করণ কিন্তু তাপস ত্রিদিববাবুকে টলায় কার সাধ্য?

তবুও কয়েকটি দিনের ঘটনায় যা ঘটল তা একেবারে অভূতপূর্ব—অভাবনীয়।

প্রথম দিনে দৃষ্টি বিনিময়।

দ্বিতীয় দিনে ত্রিদিববাবুর নির্ব্বিকারতাকে উপেক্ষা করে অপর পক্ষের চোখের কোণে বিদ্যুৎ রেখা খেলে যায়।

তৃতীয় দিনে ঠোঁটের কোণে সলজ্জ হাসির রেখা তরঙ্গায়িত হয়ে উঠে।

চতুর্থ দিনে আবার দ্বিতীয় দিনের ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি।

পঞ্চম দিন হোতে ত্রিদিববাবুর মনে রীতিমত রাসায়নিক ক্রিয়া সুরু হোয়ে গেল।

পড়াতে পড়াতে অন্যমনস্ক হোয়ে পড়েন। কাব্য-বিমুখ ত্রিদিববাবুর হাতে 'বলাকা', 'শেষের কবিতা', 'মেঘদূত' ঘোরাঘুরি করে।

তারপর—

একদিন সকলে অবাক বিস্ময়ে দেখলে, ত্রিদিববাবু ভোল বদলিয়েছেন একেবারে আমূল ভাবে। দাড়ী গোঁপ নির্ম্মূল কোরে ফিন্ ফিনে জামা কাপড় পরে, তিনি যেন একেবারে দুরন্ত অতি আধুনিক ছোকরা বনে গেছেন।

কারণ জিজ্ঞাসা কোরলে হেসে উড়িয়ে দেন। বহু পীড়াপীড়ি কোরলে বলেন: এমনি।...

সবাই ভাবে ত্রিদিববাবু কি ভয়ঙ্কর রকমের খেয়ালী।

৩

অবশেষে কয়েকদিন পরে, কয়েকজন অতি উৎসাহী বন্ধুর চেষ্টায় সব ব্যাপার পরিস্কার হোয়ে গেল।

ত্রিদিববাবু লভে পড়েছেন—এবং মিস বোসের সঙ্গে। তাঁর নীরস প্রাণে কাব্যের বান ডাকিয়েছেন তিনিই। এবং তাঁর এই অকস্মাৎ আমূল পরিবর্ত্তনের মূলেও তিনি—অর্থাৎ তাঁরই প্রীত্যর্থে ত্রিদিববাবুর আমূল পরিবর্ত্তন—বেশে, মনে ও দেহে।

কিন্তু যে মহীয়সী ত্রিদিববাবুকে এমন একটী 'জীব-বিশেষের নাচ' নাচালেন কতকদিন পরে তাঁকে আর দেখা গেল না তাঁর সেই চিরাচরিত পথে।

ত্রিদিববাবু মরিয়া হয়ে উঠলেন।

পূর্ব্বরাগের পূর্ব্বক্ষণের সূচনা চলছিল—এরই মধ্যে নায়িকার অন্তর্ধান হোলে চলবে কেন?

খোঁজ নিয়ে যা জানলেন তাতে তাঁর মাথায় গ্রহনক্ষত্র সমেত সমস্ত আকাশখানি ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম।

শীতকাল—না হোলে বজ্রপাতই হোত।

মিস্ বোস এসেছিলেন অস্থায়ীভাবে কাজ কোরতে কিন্তু সে এমন গুরুতর কিছু নয়।

সবচেয়ে মারাত্মক খবর হলো তিনি বাগদত্তা—সামনের ফাল্গুন মাসেই শুভ কার্য্য।

অতএব, তার আর কোন ভরসাই নাই।

ত্রিদিববাবু আর কাল বিলম্ব না কোরে সেই মাসেই বেছেগুছে সন্দীপের সেজ বোনকে নিজে পছন্দ কোরে সেই সনাতন প্রথায়ই জীবনের এই 'অবশ্য করনীয়' কর্ত্তব্যটি সম্পন্ন কোরেছেন।

শ্রীঅধীরকুমার রাহা

ছায়াপট

"বাণীনাথ"

অধিকার :

প্রযোজক—নিউ থিয়েটার্স লিঃ
পরিচালক—প্রমথেশ বড়ুয়া
চিত্রশিল্পী—ইউস্থফ মুলুজী
শব্দযন্ত্রী—অতুল চ্যাটার্জ্জি
সুরশিল্পী—তিমিরবরণ

চরিত্রলিপি ঃ

ইন্দিরা—যমুনা
রাধা—মেনকা
রেবা—চিত্রলেখা
নিখিলেশ—প্রমথেশ বড়ুয়া
রতন—পাহাড়ী
অম্বিকাপ্রসাদ—শৈলেন চৌধুরী
গণেশ—ইন্দু মুখার্জ্জি

নিউ থিয়েটার্সের নবতম অবদান "অধিকার" চিত্রায় গত ২১শে জানুয়ারী মুক্তিলাভ করেছে। আমরা যে সমস্ত ছবি দেখি তার মধ্যে এক শ্রেণীর ছবি শুধু নিছক আনন্দ বিতরণ করে ও আরেক রকমের ছবি আনন্দ ছাড়াও একটা নূতন পথের সন্ধান দেবার চেষ্টা করে। দর্শকদের হাসি-কান্নার সঙ্গে সুর না মিলিয়ে তাদের রুদ্ধ ভাবনার পথকে নূতন আলো ও পুলক দিয়ে জাগিয়ে তোলে। অধিকার চিত্রে সেই পথের সন্ধান দেখতে পাই। গরীব এবং ধনী সম্প্রদায়ের বিচিত্র জীবন প্রণালী, তাদের ভালবাসা, সুখ-দুঃখকে দরদী লেখক কত রকম ক'রে ভাষায় চিত্রিত করেছেন তার তুলনা নেই। ধনী ও গরীব—এই দুই সম্প্রদায়ের কথা নিয়ে অধিকার চিত্রের কাঠামো তৈরি হয়েছে। বিদেশের একটি নামজাদা কাহিনীর অবলম্বনে যদিও ছবিখানির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে, কিন্তু নিপুণ কারিগরের মত প্রমথেশ বড়ুয়া ছবির মাল মসলা ওজনদরে মেপে সকলের দৃষ্টি নিয়ে ছবিখানি সমাপ্ত করে নিজের বৈশিষ্টকে বজায় রেখেছেন। অধিকারের গল্পাংশ এইরূপ—ইন্দিরা ধনীর কন্যা আর নিখিলেশ কবি,—দুজনে প্রণয়াবদ্ধ। রাধা গরীবের মেয়ে—বস্তিতে রতন ও বিহারীর তত্ত্বাবধান ক'রে। হঠাৎ রাধা জানতে পারল ইন্দিরার পিতাই তার বাপ। তাঁর মায়ের সঙ্গে ইন্দিরার পিতার একটা অশ্লীল সম্বন্ধ ছিল। একথা ইন্দিরা কিছুমাত্র মেনে নিল না কিন্তু রাধাকে নিজের গৃহে স্থান দিয়ে উদারতার পরিচয় দিল। রাধা গরীব তাই সে অনেক কিছু চায় এবং ইন্দিরাও তাকে সেই সুযোগ দিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু রাধার চাওয়া শেষ হয় না—সে এবার বেশী কিছু চায়। নিখিলেশকে নিজের স্বামী রূপে পাবার ইচ্ছা জানাতে গিয়ে রাধা প্রথম বাধা পেল নিখিলেশের কাছ হ'তে। নিখিলেশ সত্যিই ইন্দিরাকে ভালবাসত। নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে ইন্দিরার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হ'লো একদিন এই বস্তির মেয়ে রাধা। রাধা কিন্তু সেদিন সকল নিকট আত্মীয়দের নিবিড়তম বন্ধুত্ব হ'তে ছিন্ন হয়ে পড়ল। ইন্দিরাকে সে গৃহ হতে তাড়িয়ে দিল। তার পর ভুল বুঝতে পেরে এই রাধাই রতনকে বেছে নিল নিজের জীবনসঙ্গি হিসেবে আর নিখিলেশ বিয়ে করল ইন্দিরাকে।

গতানুগতিক নীতি অনুসরণ ক'রে অধিকারের চিত্রনাট্য তৈরি হয়নি। গরীব ও বড় লোকের যে দ্বন্দ্ব এবং তার পরিণতি ছবির ভাষায় বেশ ফুটে উঠলেও প্রমথেশ বড়ুয়া যাঁদের চরিত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন তাঁদে

মাঝে বাস্তবের মোহে পড়ে মূল ছবির গতি হ'তে ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অধিকারের রাধা যেন ৺শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্রের কমলের ছোট বোন। রাধার মুখে যে বেদনাপূর্ণ বক্তৃতাগুলি দেওয়া হয়েছে সেই রাধার চরিত্র দর্শকদের কোমল মনে স্থান পায় না। ধনী ও আভিজাত্যের সত্যিকার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে নিখিলেশ ও ইন্দিরার চরিত্রে। চিত্রের পাত্র-পাত্রীদের কথা যুগিয়েছেন কবি অজয় ভট্টাচার্য্য। যে বিষয় বস্তু নিয়ে পরিচালক পর্দায় রূপ দিয়েছেন সাধারণ দর্শকদের হয়ত অবোধ্য হতে পারে, কিন্তু সঙ্গীত, সুন্দর অভিনয় এবং ছবির সংলাপ এই চিত্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মাঝে মাঝে শুধু কথার জন্যে কয়েকটি দৃশ্য তোলা হয়েছে। তারপর ইন্দিরা, রাধা ও নিখিলেশের দ্বন্দ্বের মাঝে পরিচালক বাস্তবতার সাহায্য নিয়ে দু'এক জায়গায় আর্টকে আঘাত করেছেন। রাধার মনের ইচ্ছা প্রকাশের মুখে বাচালতা না থাকলেও কঠিন চোখকেও পীড়া দেয়। ঘটনার সন্নিবেশ মন্দ নয় তবে ছবির প্রথম ভাগ তেমন কৌতূহলময় হয়নি। বর্ত্তমান যুগে বড় বড় আদর্শের বুলি অনর্গল রাধার মুখে বলান হয়েছে কিন্তু সেই সঙ্গে মেনকার চরিত্রাভিনয় খুব উৎকৃষ্ট হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি এই ভেবে যে, আভিজাত্যের কাছেই গরীবের অতি নিদারুণ পরাজয়—ইন্দিরার কাছে রাধা কত ছোট—অধিকার চিত্র তা প্রমাণ করল। সু-অভিনয়ের দিক দিয়ে নিখিলেশ, রাধা, ইন্দিরা রতন, অম্বিকাপ্রসাদ ও গণেশ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে। বড়ুয়ার অভিনয় সুন্দর হ'য়েছে। যমুনার সংযত ও সুরুচি-পূর্ণ অভিনয় ভালই হয়েছে। রাধার ভূমিকা সব চেয়ে শক্ত। প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী মেনকা সত্যিকার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছবির হাসির খোরাক জুগিয়েছেন দুই মানিক জোড় শৈলেন চৌধুরী ও ইন্দু মুখার্জ্জি। সতি, বলতে এই দুটি চরিত্র বেশ দর্শনীয় হয়েছে। রতন বেশে পাহাড়ী ও রেবার ভূমিকায় চিত্রলেখার প্রথম অভি... উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের তিনটি গান সুগীত হয়েছে। গানগুলি গেয়েছেন পঙ্কজ মল্লিক ও পাহাড়ী সান্যাল। সুরশিল্পী তিমিরবরণের অপূর্ব্ব সুর-সংযোজনা সকলকে মুগ্ধ করেছে। আলোকশিল্পী ইউসুফ মুলজী ও শব্দযন্ত্রী অতুল

অধিকার চিত্রের একটি মনোহর দৃশ্য

নিখিলেশ ও ইন্দিরা

চ্যাটার্জ্জির কাজ চমৎকার। ছবি ... শ সুরুচি ... তি হ'তে ছি ... সঙ্গত। সম্পাদনা উত্তম। ... সুর ক ... লি দে

জনকনন্দিনী

প্রযোজক—রাধা ফিল্ম কোম্পানী
কাহিনী—বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত
পরিচালনা—কবি বর্ম্মা
চিত্রশিল্পী—প্রবোধ দাস
শব্দযন্ত্রী—নৃপেন পাল ও ভূপেন ঘোষ

ভূমিকা

সীতা—সাবিত্রী দেবী
রাণী—দেববালা
রাম—সুশীল রায়
বিশ্বামিত্র—অহীন্দ্র চৌধুরী
পরশুরাম—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
জনক—তুলসী চক্রবর্ত্তী
রাবণ—জহর গাঙ্গুলি

নিউ থিয়েটার্সের অধিকার চিত্রের সঙ্গে সঙ্গেই রাং

ইন্দিরা, রাধা, নিখিলেশ ও রতন

ইন্দিরা, নিখিলেশ ও রাধা

জনক-নন্দিনী চিত্রের একটি দৃ

ফিল্ম কোম্পানীর নূতন পৌরাণিক চিত্র জনক-নন্দিনী রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করেছে। সাধারণতঃ পৌরাণিক চিত্র নির্ম্মাণ করতে চিত্র ব্যবসায়ীদের সুবিধা ও অসুবিধা দুই আছে। ধর্ম্মপ্রাণ বাংলার দর্শকরা বিংশ শতাব্দিতেও সেই পুরাকালের নরনারীদের কীর্ত্তিকলাপ রূপালি পর্দ্দায় দেখতে চায়, তার প্রমাণ দেয় চিত্র ব্যবসায়ীদের লাভের মোটা ...ম অংশ হতে। পৌরাণিক চিত্র সিনেমার নূতন টেকনিক প্রভৃতি স্বীকার করে না এবং দর্শকদের বিষয়ে ... মাথা ঘামাবার চেষ্টাও দেখা যায় না। ... পরিপূর্ণ ... আনন্দ বিতরণ করতে সক্ষম হয় তাতে কোন সন্দেহ ...। ...আজ পৌরাণিক চিত্র তুলতে ...

কর্ম্মকর্ত্তারা বিস্তর ব্যয়ের পরও সকলের মনোরঞ্জনে অসম... হন। দামী সেট, নাচ, গান, জমকালো পরিচ্ছদ এব... বিস্তর আর্টিষ্টের খোরাক জুগিয়েও আজ পর্য্যন্ত একটি শ্রে... পৌরাণিক চিত্র রূপালি পর্দ্দায় রূপ নেয়নি। এই শ্রেণী... উৎকৃষ্ট বিদেশী ছবি দেখলে মনে হয় চলচ্চিত্রের প্রগতি... পথে আমরা কতদূরে পেছিয়ে আছি। বাংলার চি... প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একমাত্র রাধা ফিল্ম কোম্পানি পৌরাণি... ছবি তুলে প্রশংসা লাভ করেছেন। তবে আরো উন্ন... ধরণের ছবি এই প্রতিষ্ঠান হতে আমরা দেখতে চাই। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন কনী বর্ম্মা। সুষ্ঠু পরিচালনা... গুণে গল্পটি বুঝতে একটুও কষ্ট হয়নি, তবে ছবির পা... পাত্রীদের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে পরিচালক মহাশয়ের বুদ্ধি...

তারিফ করতে পারলাম না। জনক-নন্দিনীর কাহিনীর নূতন করে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কাহিনীর সারাংশ—প্রপীড়িতা ধরিত্রীর কাতর ক্রন্দনে ও দেবদেবীদের অনুনয়ে স্বয়ং লক্ষ্মী ও নারায়ণ অবতীর্ণ হলেন ধরণীতে—সীতা এবং রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নর রূপ গ্রহণ করে। রাক্ষসদের অত্যাচার দমন করবার জন্যে রাজা দশরথের নিকট হতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে নিয়ে গেলেন যজ্ঞ রক্ষার জন্যে। রাম তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করলেন। যজ্ঞ শেষে বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলার পথে যাত্রা করলেন। পথে রামের চরণ স্পর্শে অহল্যা শাপ মুক্ত হ'ল। মিথিলার রাজা জনক-নন্দিনী সীতার পাণিগ্রহণের জন্য ভারতের বহু নৃপতি এলেন। কিন্তু হরধনুভঙ্গ করতে অকৃতকার্য্য হয়ে এমন কি লঙ্কেশ্বর রাবণ পর্য্যন্ত লজ্জায় সেই স্থান ত্যাগ করলেন। বিশ্বামিত্রের আদেশে রাম সেই ধনু ভেঙ্গে অতি সহজে সীতাকে পেলেন।

এই দীর্ঘ পৌরাণিক কাহিনীকে কোনওরূপ অদল বদল

আর, কে, রেডিওর "সিক্সটি গ্লোরিয়াস ইয়ারস্" চিত্রে এ্যানা নিগেল
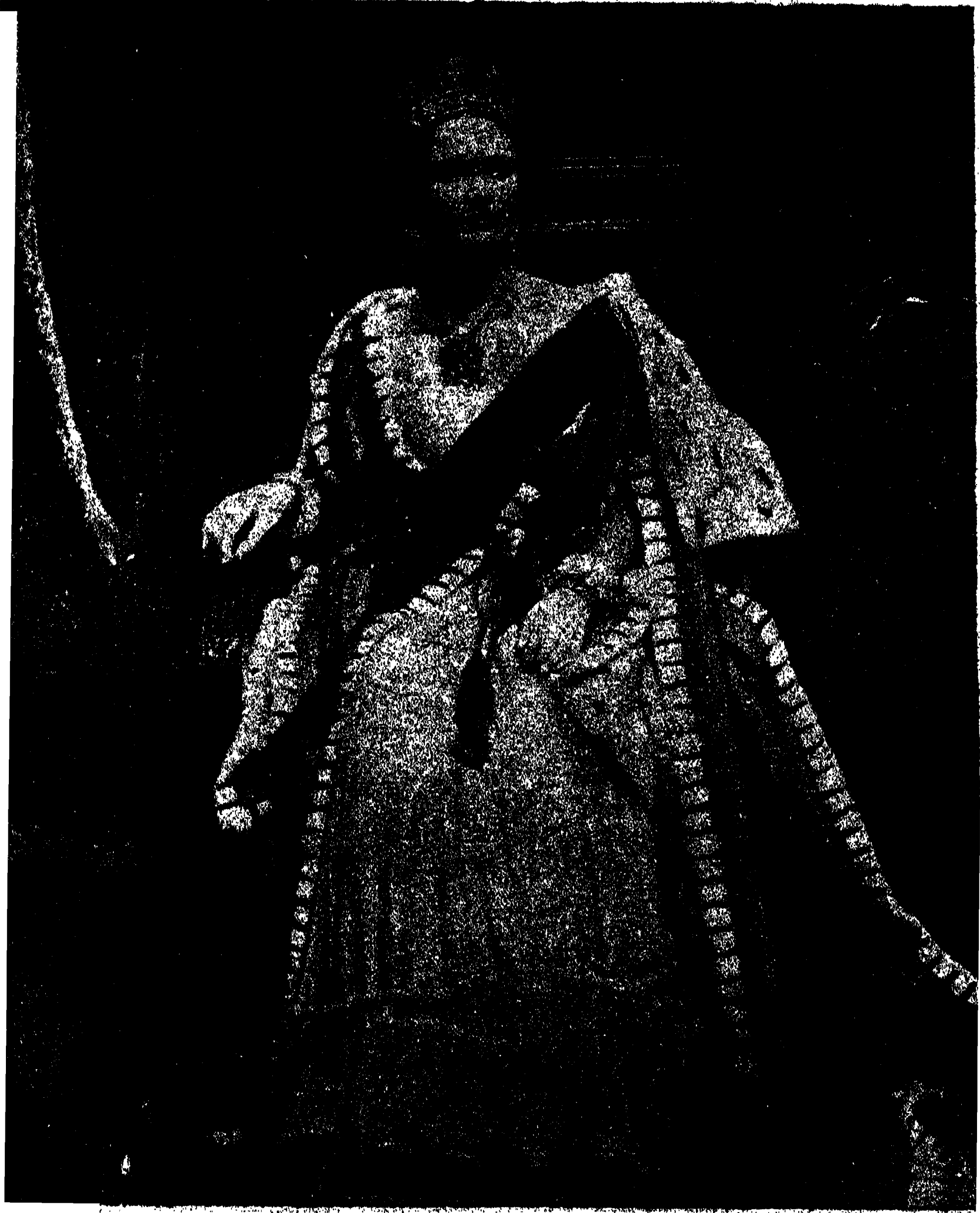
আর, কে, রেডিওর 'কেয়ারফ্রি' চিত্রে ফ্রেড এ্যাষ্টেয়ার্স

না করে ফণী বর্ম্মা আমাদের উপহার দিয়েছেন। ছবিখানিতে রঙ্গমঞ্চের প্রভাব বেশ লক্ষিত হয়। চিত্রের কাঠামো সেইভাবেই সাজান হয়েছে। পাত্র-পাত্রীদের অভিনয় তৃপ্তিকর কিন্তু দৃশ্যপটাদি ও নাচ গান তেমন আনন্দদায়ক নয়।

অহীন্দ্র চৌধুরীর বিশ্বামিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের পরশুরাম উল্লেখযোগ্য। সুশীল রায়কে রাম বেশে বেশ মানিয়েছিল, অভিনয়ও ভাল হয়েছে কিন্তু লক্ষ্মণ চরিত্রে সেই মাধুর্য্য ফুটে উঠে নাই। সীতা চরিত্রে সাবিত্রী আমাদের হতাশ করেছেন। দৃষ্টিকটু চেহারার জন্য সীতার ভূমিকায় সাবিত্রীকে একদম মানায় নি। তারপর সীতার ভূমিকায় কৃতিত্ব দেখাবার যেটুকু সুযোগ ছিল শ্রীমতী সাবিত্রী তা অবহেলা করেছেন। জনক ও রাণীর ভূমিকায় যথাক্রমে তুলসী চক্রবর্ত্তী ও দেববালা ভালই অভিনয় করেছেন। নাবিক ও বৈতালিক ভূমিকায় বীরেন দাস ও মৃণাল ঘোষের গানগুলি সুগীত হয়েছে। চণ্ডিকা ব্রাহ্মণী ও বিষ্ণুশর্ম্মার ভূমিকায় ছায়া ও কুমার মিত্রের হাস্যরসাত্মক অভিনয় উপভোগ্য, কিন্তু শেষের দিকে একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে। আলোকচিত্র ও শব্দযন্ত্র গ্রহণ মোটামুটি ভাল। প্রবোধ দাস তাড়কা বধ দৃশ্যটি তুলে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সম্পাদনা আরো উন্নত হওয়া উচিত ছিল।

"বাণীনাথ"

পল্লী-সাহিত্য

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ বি-এ

বাংলার প্রাচীন পল্লী-সাহিত্যের মূল্য অপরিসীম। বাংলার কথক, কবি, বাউল ও কীর্ত্তনীয়ার রচিত কাব্যই বাংলার প্রাচীন সাহিত্য। বাংলার বাউল গান, কীর্ত্তন, ব্রতকথা, ডাক বা খনার বচন, বারমাসীগুলি প্রাচীন সাহিত্যের উপাদান। কৃত্তিবাস, কাশীরাম, পীর লালন শা, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্রের রচিত সাহিত্যই বাংলার পল্লীর অতুলনীয় সম্পদের পরিচায়ক। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের জন্ম হইয়াছে এই পল্লী-সাহিত্য হইতে। এই জন্যই প্রাচীন পল্লী সাহিত্য অমূল্য সম্পদের আধার।

প্রাচীন পল্লীকাব্য সরস, সহজ, সুললিত ভাষায় প্রকাশিত। পল্লী-কবির ভাষায় কোনও কাঠিন্য বা কর্কশতা নাই—ভাষার ধারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রবাহিত, ভাবধারা সহজ ও সুস্পষ্ট কথায় ব্যক্ত। পল্লী-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হইতেছে—ভাবের স্বাধীনতায় ও ভাবের মাধুর্য্যে। পল্লীর কবি কোনও কাহিনী, কোনও ভাব বা কোনও বৈচিত্র্য বর্ণনা করিতেন এমন ভাষায় যাহা নিরক্ষর লোকও অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। কবি একটি কঠিন অবোধ্য ভাবকে এমন সরসভাবে বুঝাইতেন যে, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাহা বুঝিতে পারিত। পল্লীর কবি শ্রোতার মনের উপর আধিপত্য করিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কবির বর্ণনায় শ্রোতারা কখনও কাঁদিত, কখনও হাসিত। হাসিকান্নার মাঝ দিয়া শ্রোতা যে একটি অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিত, তাহা-অন্য কিছুতেই সে পাইত না। জনগণের মনের ভাব পরিবর্ত্তনে পল্লী-কবির যে এই অপূর্ব্ব শক্তি, তাহা সম্ভব হইয়াছিল—কবি হাস্যরসিকতা ও ব্যঙ্গকৌতুকে সুনিপুণ ছিলেন বলিয়া।

কবি পল্লীচিত্র, লোক চরিত্র, কঠিন ভাব এমন সহজ ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিতেন যে তাঁহার তুলনা হয় না—কোনও কঠিন ভাবকে ব্যঙ্গের কৌতুকে এমন লঘুভাবে প্রকাশ করিতেন যে, সকলেই তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত।

অশিক্ষিত হইলেও পল্লীর কবি স্বভাব-কবি। আমাদের মনে হয় বাংলার প্রকৃতিই তাঁহাদিগকে এই দুর্লভ কবিত্ব শক্তি দান করিয়াছিল। তাঁহাদের ভাষা নির্ঝরিণীর মত মুক্তপ্রাণ—কোথাও বাধাবিঘ্ন মানে নাই। উপমাগুলিও অতুলনীয়।

প্রাচীন পল্লীগীতিকার ভাবমাধুর্য্য অতি চমৎকার। এইগুলি পড়িয়া সমস্তটুকু মাধুর্য্য উপভোগ করা যায় না। গান শুনিলে সমস্ত মাধুর্য্য উপলব্ধি করা যায়। পল্লীর লোক আজও এই সকল গান ভুলিতে পারে নাই। শিক্ষিত সমাজের অনাদর অবজ্ঞা সহ্য করিয়াও পল্লীর কবি প্রাণের সমস্ত আনন্দ দিয়া বাংলার কাব্যকে বাঁচাইয়া রাখিয়া ধন্য হইয়াছেন।

আমাদের গাজন, দোল, দুর্গোৎসব, মহরম প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলির ক্রমশ অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার অনেক গৌরবের জিনিস অন্তর্হিত হইতে চলিয়াছে। বাংলার পল্লীকুটীরই প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা কেন্দ্র; পল্লীবাসী অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায়ই উহার প্রধান উৎসাহ-দাতা ও পৃষ্টপোষক ছিলেন।

বাংলার এই সব প্রাচীন গৌরবের জিনিস বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, বাংলার পল্লী-সাহিত্যকে বাঁচাইতে হইবে—তাহাকে সম্পূর্ণ সমাদর করিতে হইবে। আবার বাংলার পল্লীতে পল্লীতে যাহাতে পল্লী-সাহিত্যের আলোচনা হয়, তাহার জন্য দেশের পালপার্ব্বণগুলির পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়া কবি, বাউল প্রভৃতিকে উৎসাহ দিতে হইবে। বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বাংলা সাহিত্যের পাঠ্য পুস্তকগুলিতে প্রাচীন পল্লী-সাহিত্য ও তৎসম্বন্ধে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ-গুলি যাহাতে উপযুক্ত স্থান লাভ করে, তজ্জন্য বাংলার হিতৈষী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ

"অমৃত মন্থন

দেবাসুর সংগ্রামে, যখন দেবতাদের অবস্থা কাহিল, তখন সপ্ত সমুদ্র মন্থনে, কৌস্তুভ, উচ্চৈশ্রবা, ঐরাবত প্রভৃতি যে সকল সম্পদ উদ্ভূত হ'য়েছিল, তন্মধ্যে অমৃত ও শ্রী (লক্ষ্মী) অন্যতম। এই অমৃত পান ক'রে তবেই দেবতারা অসুর দমন ক'রবার ক্ষমতা লাভ করেছিলেন।

এই অমৃতকুম্ভ বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় ভারতের যে চার স্থানে নামান হ'য়েছিল, সেই চার স্থানেই এ যাবৎ কুম্ভমেলা হয়। সেই স্থান-গুলি আজও কতনা প্রসিদ্ধ!

সপ্ত সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত লাভ হয়েছিল, তার সঙ্গে উদ্ভূত হ'য়েছিল শ্রী। আজকের ক্ষীর সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত উদ্ভূত হয় সেও ঐ "শ্রী"। চন্দ্রের কান্তি সর্ব্বজন বিদিত। ঘৃতে যে কান্তি বাড়ে, তার কারণ চন্দ্রই সে যুগে অমৃতভাণ্ডের পরিবেশক হ'য়েছিলেন এবং নিশ্চয়ই তার ভাগ পেয়েছিলেন। ঘৃতের এই অমৃতত্বের জন্যই ঋষি ব'লেছেন "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ।"

পুরাকালে বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমণ্ডলে ননী চুরি করে খেতেন। ব্রজমণ্ডলের গোপ গোপাঙ্গনা, দুধ, মাখন ও ননীর প্রাচুর্য্য জগৎ প্রসিদ্ধ। শ্রেষ্ঠতায় আজও তার তুলনা নাই। আজকের "শ্রী" ঘৃত সেই ব্রজমণ্ডলেরই ননী উদ্ভূত। আজকের যশোদা আজকের গোপালদের সেই ননীরই তৈরী ঘৃত দিয়ে তৃপ্তি পান।

নানাকথা

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা—

হিন্দি ভাষাকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা করিয়া তুলিবার জন্য হিন্দী ভাষাভাষীগণ বহুদিন হইতে বিশেষভাবে উদ্যোগ এবং আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। উর্দু ভাষী-গণের পক্ষ হইতে যদি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকিত তাহা হইলে হিন্দিভাষীগণের এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বেগ পাইতে হইত না,—কারণ দক্ষিণ ভারতে মান্দ্রাজ প্রদেশে হিন্দির বিরুদ্ধে আন্দোলনাদি চলিলেও তাহা হিন্দু জাতির আন্দোলন, সুতরাং তাহাকে দমন করিতে মনেও বাধে না, শক্তিতেও বাধে না। কিন্তু উর্দুর সহিত সেরূপ জোর-জবরদস্তি চালাইবার উপায় নাই, সুতরাং সে ক্ষেত্রে রফার কথা উঠিয়াছে যে, হিন্দিও রাষ্ট্রভাষা হইবে না, উর্দুও রাষ্ট্রভাষা হইবে না, পরন্তু হিন্দুস্থানী নামে একটি রাষ্ট্রভাষা গঠিত করিয়া লইতে হইবে যাহার এক পদ হইবে হিন্দি এবং অপর পদ হইবে উর্দু।

এই দ্বিপদী ভাষার গতি কি প্রকার হইবে,—খঞ্জের ন্যায় মন্দ হইবে, অথবা শক্তিশালীর মত সবল গতি হইবে,—তাহা যথাকালে দেখা যাইবে; কিন্তু রাষ্ট্রভাষা নির্ধা-রণের বিচারকালে বাঙলা ভাষার দাবীর কথা নিমেষের জন্য কাহারও মনে উঠে নাই;—অবাঙালীর ত নয়ই, বাঙালীরও নয়, তথাপি ওড়িয়াগণ প্রকাশ্য সভায় ওড়িয়া ভাষার দাবী পেশ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। কিন্তু বাঙলা ভাষার বিষয়ে বাঙালী এ পর্য্যন্ত প্রায় নীরব। বাঙালী কেবল মাত্র আত্মবিস্মৃত জাতি নয়—সম্প্রতি আত্মনিন্দিত জাতি,—নিজের ত্রুটি এবং দুর্ব্বলতার বিষয়ে তার নিজের মুখই সর্ব্বাগ্রে মুখর।

কিন্তু সম্প্রতি বায়ু একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। বাঙলা ভাষার বিস্তৃততর প্রচারের ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ, এবং ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতিক অবস্থায় একান্তই যদি রাষ্ট্রভাষা নির্দিষ্ট করিতে হয় তবে বাঙলা ভাষারই সে বিষয়ে প্রবলতম দাবী আছে, এই প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য কিছুদিন হইল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে বাঙলার কয়েকজন সাহিত্যসেবীর একটি পরামর্শ-সভা হইয়াছিল। সভার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণকে লইয়া একটি শক্তিশালী সমিতি গঠিত হয়। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সভায় গৃহীত হয়:—

১। এই সভার মতে বাঙলা ভাষার বহুলতর প্রচারের জন্য নিম্নলিখিত ও অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা উচিত:—

(ক) বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন বাঙালী মাত্রেরই দৈনন্দিন কার্য্য ও ব্যবহারে বাঙলা ভাষা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

(খ) বাঙলাদেশে প্রবাসী অন্য ভাষাভাষী ব্যক্তিগণের সহিত যতদুর সম্ভব বাঙলা ভাষায় কথোপকথন ও চিন্তার বিনিময় কর্ত্তব্য।

(গ) অ-বাঙালীর মধ্যে ও বাঙলার বাহিরে যাহাতে বঙ্গসাহিত্যের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য; যথা—পরীক্ষা গ্রহণ, পুরস্কার বিতরণ, বাঙলা সাহিত্য আলোচনার প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও প্রতি-যোগিতা নির্দ্ধারণ প্রভৃতি।

২। এই সভার মতে ভারতীয় রাষ্ট্রের বর্ত্তমান অবস্থায় ভাষা নির্ধারণের চেষ্টা কালোচিত নহে এবং অসমীচীন। ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র প্রদেশের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ কর্ত্তৃক রাষ্ট্রীয় ভাষা নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।

৩। বর্ত্তমানে যদি রাষ্ট্রভাষা নির্দ্দিষ্ট করিতেই হয় তবে বঙ্গ সাহিত্যের সম্পদ ও সমৃদ্ধি এবং ঐ ভাষা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা দ্বারা প্রভাবান্বিত মনে রাখিয়া বঙ্গ ভাষাকেই রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে নির্ধারণ করা উচিত।

৪। এই সভা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, মুসলিম সাহিত্য সম্মেলন, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ও অন্যান্য বঙ্গ সাহিত্য প্রতিষ্ঠানকে এ সম্বন্ধে এক যোগে কার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ ও আহ্বান করিতেছেন।

৫। উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিবার ভার নিম্নলিখিত ভদ্রলোকদিগকে লইয়া গঠিত কমিটির উপর অর্পণ করা হইল; কমিটি প্রয়োজন মত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন :—

সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, সভ্য শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, শ্রীযুক্তা কল্যাণী মল্লিক, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু।

আমরা আশা এবং কামনা করি এই উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভেই শেষ হইবে না, এবং সমগ্র বাঙালী জাতির সমর্থন এবং সহযোগিতা লাভ করিয়া বাঙলা ভাষাকে তাহার যথার্থ স্থানে পৌছাইয়া দিতে সমর্থ হইবে।

স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র বসু—

বঙ্গবাসী কলেজ এবং স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় গত ১লা জানুয়ারী ১৯৩৯, ৮৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মত একজন শিক্ষাবিশারদ এবং স্বদেশভক্তের মৃত্যুতে বাঙলাদেশ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিতও তিনি নানাভাবে যুক্ত থাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। সে হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতিও যথেষ্ট হইল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া শ্রীযুক্ত বসু ১৮৭৬ সালে কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজে লেকচারারের পদ গ্রহণ করেন। পরে ১৮৮২ সালে ষ্টেট্ স্কলারশিপ লইয়া তিনি বিলাত গমন করেন। কৃষি সম্বন্ধে সেখানে দুই বৎসর প্রভূত জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন এবং ১৮৮৫ সালে বঙ্গবাসী স্কুল স্থাপিত করেন। দুই বৎসর পরে ১৮৮৭ সালে সেই স্কুলে একটি কলেজ বিভাগ যোগ করেন। শ্রীযুক্ত বসুর আজীবন পরিশ্রম এবং সাধনার ফলে এই দুইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইহাদের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থায় উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছে। মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত তিনি কলেজের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা করিয়াছেন।

অধ্যক্ষ বসুর উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। ক্লাসে তিনি এ বিষয়ে ছাত্রদের বাঙলা ভাষায় বক্তৃতা দিতেন, এবং এ বিষয়ে তিনি, শুধু ইংরাজি ভাষাতেই নয়, বাঙলা ভাষাতেও পুস্তক রচিত করিয়া গিয়াছেন।

পোষাক পরিচ্ছদে, চালচলনে, সদাশয়তায়, কর্মপটুতায় এবং কর্মানুরাগে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন তাহা অসাধারণ।

আমরা শ্রীযুক্ত বসুর শোক সন্তপ্ত আত্মীয়বর্গকে আমাদের ঐকান্তিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

স্বর্গীয় অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়—

পাটনা হাইকোর্টের ভুতপূর্ব বিচারপতি অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি অল্পক্ষণের সন্ন্যাস রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। তীক্ষ্ণ ধীশক্তি এবং বিচার বিষয়ে অপূর্ব দক্ষতার গুণে তিনি সাবঅর্ডিনেট জুডিশিয়াল সার্ভিসের নিম্নতম সোপান হইতে হাইকোর্টের বিচারপতির উচ্চ আসনে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতি রূপেও তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনচিত্ততা

অপক্ষপাত এবং সুনিপুণ বিচার বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়াছিলেন। আইন এবং যুক্তির প্রভাবে অমরনাথের রায়গুলি এমন পাকা হইত যে উচ্চতর আদালতে পুনর্বিচারে কদাচিৎ তাহা রদ হইতে দেখা যাইত। অমরনাথ তখন ভাগলপুরের প্রথম সবজজ। তাঁহার প্রদত্ত কোনো রায়ের বিরুদ্ধে আপীল পরিচালনা কালে পাটনা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ মানুক উক্ত রায়ের অকাট্যতা স্মরণ করিয়া পরামর্শ সভায় নিজপক্ষের উকিলদের নিকট বলিয়াছিলেন, "Dont brief me again against a decision of this Judge. He seems to be a dangerous man!"

শুধু বিচারক হিসাবেই নহে, একজন মানুষ হিসাবেও অমরনাথ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। অমায়িক, পরোপকারী, ধার্মিক, মিষ্টভাষী গৌরবর্ণ সৌম্যদর্শন অমরনাথ যুগপৎ বিহারী ও বাঙালী সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন! জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলে তাঁহাকে ভালবাসিত। হিতং মনোহারী চ দুর্লভঃ বচঃ,—কিন্তু তিনি সেই দুর্লভ বচনের অধিকারী ছিলেন।

অমরনাথের মৃত্যুতে বিহারের বাঙালী সম্প্রদায়ের যে সমূহ ক্ষতি হইল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সঙ্গীতে সাফল্য অর্জন

সুপ্রসিদ্ধ লৌহব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বিরলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কুমারী আইভি ব্যানার্জি সঙ্গীত বিদ্যায় অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারিণী। ১৯৩৬ সালের মজঃফরপুর নিখিল ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় খেয়াল ও ধ্রুপদ গানে ইনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৯৩৮ সালের প্রয়াগ নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে টিমা

কুমারী আইভি ব্যানার্জি

লয়ে একখানি খেয়াল গাহিয়া কুমারী আইভি শ্রীযুক্ত পটবর্ধন প্রমুখ খ্যাতনামা গুণীবৃন্দের উচ্চ প্রশংসা অর্জন করিতে সফল হইয়াছিলেন। উক্ত সম্মেলনে বাহির হইতে আগত তরুণ শিল্পীগণের মধ্যে মোটের উপর ইনিই শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন। ইঁহার কণ্ঠ মধুর, সতেজ এবং সুরেলা। শ্রীমতীর গাহিবার পদ্ধতি, সুর ও তানের বিস্তার যথার্থই গুণীজনোচিত। সম্প্রতি ইনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিশারদ পণ্ডিত দিলীপচাঁদ বেদীর নিকট সঙ্গীত সাধনা করিতেছেন। আমরা এই তরুণ গীতসাধিকার সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ।

খাদ্য হিসাবে চায়ের উপকারিতা

চা একটি অপকারী খাদ্য বলিয়া সাধারণ লোকের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, বৈজ্ঞানিক গবেষণাদির ফলে ক্রমশঃ তাহা কেবল অপসৃতই হয় নাই, পরন্তু এখন চা একটি উপকারী খাদ্য দ্রব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সার রবার্ট ম্যাক্‌কারিসন কিছুদিন পূর্বে বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য লইয়া একটি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পাঁচটি ইঁদুরকে তিনি খাইতে দিয়াছিলেন পাঁচটি বিভিন্ন জাতির (ইংরাজ, ফরাসী, জাপানী, পাঠান ও মাদ্রাজী) খাদ্য। একই বংশের হইলেও পাঁচটি ইঁদুর স্বাস্থ্যে ও চাল চলনে সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবে গড়িয়া উঠিল। যে ইঁদুরটাকে চা সংযুক্ত খাদ্য দেওয়া হইয়াছিল সেই ইঁদুরটাই সর্বাপেক্ষা সুস্থ, সবল ও তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।

চা সম্বন্ধে স্যার ম্যাল্‌কম্ ওয়াট্‌সন এল্ এল্ ডি, এম ডি, সি এম, ডি পি এইচ্ লিখিয়াছেন যে, সদ্যপ্রস্তুত পানীয় চায়ের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফল একটা জাতির জীবনের পক্ষে প্রভূত উপকারী।

এ সকল কথা বিবেচনা করিলে চা যে ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশের পক্ষে, কত উপকারী বস্তু, বিদেশে রপ্তানির হিসাবে এবং দেশে ব্যবহারের পক্ষে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

পুস্তক-পরিচয়

অনমিতা—শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মূল্য দুই টাকা

বঙ্গ সাহিত্যে গ্রন্থকার ছোট গল্প লিখিয়া ইতিপূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ' 'মানসী' 'কল্লোল' প্রভৃতি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় এক সময়ে ইনি নিয়মিত ভাবে গল্প লিখিতেন। কাজেই ইঁহার সম্বন্ধে নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক করে না। 'অনমিতা' লেখকের প্রথম উপন্যাস। চিত্তাকর্ষক আখ্যায়িকার মধ্যে ইঁহার লিখন শৈলীর দক্ষতার অভিব্যক্তি আছে। সময়ু, অপূর্ব্ব, অজয় প্রভৃতির চরিত্র আমাদের মনে সুন্দর ভাবে রেখাপাত করিয়াছে। ঘটনাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লেখক চমৎকার ভাবে সমাপ্তির পথে আনিয়াছেন এবং যে সব গভীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন সেগুলি অসঙ্গত নহে। প্রকাশ ভঙ্গিমার মধ্যেও বিশেষত্ব আছে। উপন্যাসখানি রসিক সমাজে সমাদৃত হইবে ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। আমাদের নিকট 'অনমিতা' ভালই লাগিয়াছে।

নারীর রূপ—শ্রীহরিপদ গুহ প্রণীত। প্রকাশক—বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য দেড়টাকা

গ্রন্থকার সাময়িক পত্রিকাগুলিতে নিয়মিত ভাবে লিখিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার বহু প্রবন্ধ কবিতা, গল্প ও উপন্যাসের সহিত

ইতিপূর্ব্বে আমাদের পরিচয় ঘটিয়াছে। এজন্য তাঁহার সম্বন্ধে নূতন করিয়া বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। আলোচ্য উপন্যাসখানি অধুনালুপ্ত 'পঞ্চপুষ্প' পত্রিকায় যবনিকা নামে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সময়ে সাগ্রহে পাঠ করিয়াছি। 'নারীর রূপে' হরিপদ বাবুর পূর্ব্বযশ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সাবলীল ভাষায় গল্পটী গুছাইয়া বলা হইয়াছে। এবং প্রত্যেকটী চরিত্র জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। 'নারীর রূপ' পড়িয়া প্রীত হইলাম এবং ইহা যে পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট আদরণীয় হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

খেয়ালের গান—শ্রীসুনীলকুমার বসু ও শ্রীসুরেশ-চন্দ্র সরকার প্রণীত। প্রকাশক—ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে বিলাতী ভাবানুসরণই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ভূমিকার মধ্যে দেখিলাম গ্রন্থকারদ্বয় ষোল হইতে কুড়ি বছর বয়সের বিভিন্ন সময়ে লিখিয়াছেন। অল্প বয়সের লেখা বলিয়া স্থানে স্থানে কাঁচা হাতের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এতদ্‌সত্ত্বেও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে ইঁহাদের চিত্ত কবি-ধর্ম্মী এবং অন্তরে যথেষ্ট কাব্য প্রেরণা আছে। কয়েকটী কবিতা আমার মনের মধ্যে চিত্র সমাবেশ করিয়াছে যেমন 'শুধু বেঁচে থাকে প্রেম, বেঁচে থাকে প্রাণ', 'সাগরের গান' 'নিশি ভ্রমণ' 'নিশীথে' এবং 'পলাতক'। 'খেয়ালের গানে'র মধ্যে উন্মাদনার পরিচয় পাই নাই, বিলাসী-কবি মনের পরিচয় পাইয়াছি। আশা করি তরুণ গ্রন্থকারদ্বয় ভবিষ্যতে কবি খ্যাতি অর্জ্জন করিবেন।

কাব্য-মুকুল—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মিত্র, বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। পাগলা শ্যামনগর, খুলনা। মূল্য আট আনা।

আলোচ্য গ্রন্থখানির মধ্যে আবেগপূর্ণ ভাষা আছে কিন্তু অধিকাংশ স্থানে ছন্দ ও যতির দোষ ঘটিয়াছে। লেখকের মোটে মিল জ্ঞান নাই।

এখানে একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় যেমন :—

'বিহগ কাকলী ঝঙ্কারে তোমার উদ্যান বীথিকা বনবনানী,
শারদ সমীর সোহাগে দোলায় সবুজ তোমার অঞ্চলখানি।'
কবি কাশীদাস কৃত্তিবাস কবে দেবভাষা সিন্ধু মন্থন করি,
আনিয়া পবিত্র কাব্য-পারিজাত সাজা'ল তোমার
সাহিত্যপুরী।

এরূপ কবিতার কোন সার্থকতা নাই। এখনও যাঁহার কাণ ঠিক হয় নাই, তাঁহার পক্ষে কবিতা লিখিয়া গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ব্যগ্র হওয়া উচিত নহে।

কিশোর-গুঞ্জন—শ্রীরাজকিশোর রায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—রাধাকুঞ্জ, পি ২৬ নং মাণিকতলা স্পার। মূল্য ছয় আনা।

প্রাচীন পদ রচয়িতাগণের অনুকরণ করিয়া যে সকল পদ গাহিবার উদ্দেশ্যে 'কিশোর গুঞ্জনে'র মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহার কোনটীর বাণী আমাদিগের অন্তরে রস সঞ্চার করিতে পারে নাই। সুরের সহিত বাণী মিশ্রিত হইলে কিরূপ হইবে বলিতে পারি না। তবে কিশোর গুঞ্জন রচনার দিক দিয়া আমাদিগকে হতাশ করিয়াছে। অত্যন্ত কাঁচা হাতের লেখা।

শ্রীউপানন্দ উপাধ্যায়

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং কলিকাতা, ২৭নং কড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, সাহিত্য-ভবন প্রেস হইতে
শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিচিত্রা

দ্বাদশ বর্ষ, ২য় খণ্ড	ফাল্গুন, ১৩৪৫	২য় সংখ্যা

সহসা

শ্রীসুপ্রভা দেবী

এমন যদিই হয়
সহসা আমারে মনে প'ড়ে যায়!
একি সুখ, একি ভয়,
গীত-মুখরিত দক্ষিণ বায়।

বাতায়নে মোর দীপ জ্বালিয়াছি, তুমি এস এস ঘরে
এস গো বন্ধু মোর।
মাঠের ফাঁকায়, বনের ছায়ায় জোনাকি জ্বলে,
আকাশের তারা প্রদীপ দেখায় পথের 'পরে,
নিশীথের বুকে কুসুমগন্ধ, এস এস অন্তরে,
এস গো বন্ধু মোর
আঁধার খনির বক্ষে যেথায় মাণিক জ্বলে।

এমন যদিই হয়
সহসা আমারে মনে পড়ে যায়!
অলকে একটি কুসুম দিয়েছি
দুলিছে অলস বায়।

বনের সীমানা পার হ'য়ে এস পর্ণ কুটীরে মোর
এস গো বন্ধু মোর।
লতায় পাতায় আলিপনা আঁকা প্রদীপের আলোছায়া
লতায় পাতায় উতলা হাওয়ায় বাঁশরী বাজে,
প্রদীপের আলো, মাধবীর ছায়া, রাত্রির ঘন মায়া
এস এস ঘরে, শোন অন্তরে বাঁশরী বাজে।

এমন যদিই হয়
সহসা আমারে মনে পড়ে যায়!
দীপশিখা দিবে সঙ্কেত, যদি
পথ ভুল হ'য়ে যায়।

কত যে রজনী এসেছে গিয়েছে, কত অচপল আঁখি
বাতায়নে দীপ রাখি'
পথের প্রান্তে হৃদয় পাতিয়া কত কাটাইল রাতি!
কত দিন, কত ক্ষণ, কত বর্ষ ফুরায়ে যায়
যুগ যুগ যায় জীবন ফুরায়, স্তিমিত প্রদীপ ভাতি,
আসেনা মিলন রাতি।

তবু তো এমন হয়,
অজানিতে কভু মনে পড়ে যায়!
হারা সুর কত ফিরে আসে না কি
চকিত গুঞ্জরণে?

শ্রীসুপ্রভা দেবী

হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজ

শ্রীঅনিলবরণ রায়

১

গীতার আদর্শ

শাস্ত্রানুসরণ সম্বন্ধে গীতার শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, আমি কয়েকটি প্রবন্ধে বিশদভাবেই তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছি। আমি দেখাইয়াছি যে, গীতার শিক্ষায় স্তরভেদ আছে। এক স্তরে শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হয়। কিন্তু ইহাই চরম মীমাংসা নহে। মানুষ এবং মানব সমাজও এমন অবস্থায় উপস্থিত হয় যখন প্রচলিত শাস্ত্রকে সম্যকভাবে মানিয়া চলা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, তখন সাত্ত্বিক বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া বিচারের দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হয়। শাস্ত্র হইতে, মহাজনের প্রদর্শিত পন্থা হইতে আমরা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে সহায়তা পাই। কিন্তু এই প্রশ্নের চরম মীমাংসা তখনই হয়, যখন আমরা হৃদিস্থিত ভগবানের সহিত সজ্ঞানে যুক্ত হই এবং তাঁহার সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ অনুসারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করি। গীতা অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছে যে, যাঁহারা ভগবানের সহিত এইরূপ যোগ সাধনের প্রয়াস করেন তাঁহারা শাস্ত্রশ্রেষ্ঠ বেদকেও অতিক্রম করেন।

জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দ ব্রহ্মাতিবর্ত্ততে।৬।৪৪

আমার এই ব্যাখ্যায় কোথায় ত্রুটি আছে, কোথায় বিরোধ আছে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহা দেখাইয়া দিতে না পারিয়া বলিয়াছেন, ইহা আমার বুঝিবার ভুল, আমি উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছি, গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছি ইত্যাদি। যুক্তি ও প্রমাণের অভাব এইরূপ শ্লেষ ও বিদ্রূপের দ্বারা পূর্ণ করিয়া বসন্তকুমার তাঁহার প্রতিবাদকে রসাত্মক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং এইভাবে নিজেকেই গভীর পঙ্কের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছেন। বসন্তকুমার নিজে কিরূপ নির্ভুল ভাবে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন, বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ শ্লোকটির ব্যাখ্যাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মহাভারতের ঐ বিখ্যাত শ্লোকটিতে বলা হইয়াছে, যে বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, এমন মুনি নাই যাঁহার মত বিভিন্ন নয়, ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত, অতএব মহাজন যে পথে গিয়াছেন তাহাই পন্থা। এই শ্লোকের অর্থ সূর্য্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট, যাহারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রাখিবে কেবল তাহারাই ইহার অর্থ দেখিতে পাইবে না—বসন্তকুমার দৃঢ়মূল সংস্কারের বশে নিজেকে এমনই অন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন যে, এই শ্লোকেও তিনি শাস্ত্র দ্বারা পন্থা নির্দ্ধারণেরই নির্দ্দেশ পাইতেছেন।

রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের এই শ্লোকটি হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়া গাহিয়াছেন,

> ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে
> পদে পদে পথ ভুলি হে।
> নানা কথার ছলে নানা মুনি বলে
> সংশয়ে তাই দুলি হে।
> তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
> তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ
> শত জনে আমার সাধে শত বাদ
> কত জনার কত বুলি হে!

বসন্তকুমার তাঁহার শাস্ত্র ব্যাখ্যার আর একটি নিদর্শন দিয়াছেন গীতার এই শ্লোকটির ব্যাখ্যায়—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং॥

এখানে তিনি "শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য" কথাটির উপরেই জোর দিয়া বলিয়াছেন শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিলে ইহকাল

পরকাল দুই-ই নষ্ট হইবে। কিন্তু এই শ্লোকটির প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে "কামকারতঃ" কথাটির উপরেও সমান জোর দিতে হইবে। বসন্তকুমার নিজের সুবিধার জন্য ঐ কথাটির দিকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। যাহারা "কামকারতঃ" অর্থাৎ রাজসিক বাসনা কামনার বশে, রিপুর বশে চালিত হইয়া শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে তাহাদেরই ইহকাল পরকাল নষ্ট হয়। সাত্ত্বিক বুদ্ধির বশে যাহারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে তাহাদের পক্ষে গীতায় এই শ্লোক কখনই প্রযুক্ত হইতে পারে না। এই শ্লোকের পরেই সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রথমে ঠিক এই কথাটিই স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে।

বসন্তকুমার বলিয়াছেন, "অনিলবাবুর মতে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা সকল অত্যন্ত অনিষ্টকর।" কিন্তু এ-রকম কথা আমি কোথাও বলি নাই, আমার বক্তব্যকে অত্যন্তভাবে বিকৃত করিয়াই বসন্তকুমার আমার উপর এই মতটি চাপাইয়াছেন এবং এই ভাবে আমার উপর বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিবার বিশেষ সুযোগ করিয়া লইয়াছেন। এইরূপ আক্রমণের জবাব দিতে গেলে কখনও তাহার শেষ হইবে না, অতএব আমি যাহা বলিয়াছি, আমার যাহা প্রকৃত মত সেইটি ধরিয়াই যদি বসন্তকুমার আলোচনা করিতে পারেন তাহা হইলে এই সব অযথা আক্রমণের উত্তর দিয়া সময় ও শক্তির অপব্যয় করিতে হয় না। ব্যক্তির ও সমাজের জীবনে শাস্ত্র বিশেষ সহায়, তবে অবস্থা বিশেষে শাস্ত্র লঙ্ঘন করিতে হয়, মহাপুরুষগণ তাহা করিয়া থাকেন, ইহাই আমার বক্তব্য। বসন্তকুমার ইহার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া কূটতর্কের আশ্রয় লইয়াছেন—সে সবের উত্তর দিয়া আমি প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাই না। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যে-শাস্ত্র অনুসরণ করিবেন, সাধারণেও সেই শাস্ত্র অনুসরণ করিবে, তাঁহারা শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া যেখানে নূতন পথ দেখাইবেন, সাধারণেও তাঁহাদের অনুসরণে সেই নূতন পথে চলিবে—তাঁহারা নিজেদের জীবনে ও কর্ম্মে যে দৃষ্টান্ত, যে প্রমাণ দেখাইবেন, সাধারণে তাহাই অনুসরণ করিবে—আমার এ-কথার মধ্যে "পরস্পরবিরোধ" কোথায় আছে? সকল মহাজন এক পথ ধরেন নাই, কিন্তু যে মহাজন তাঁহার দিব্য চরিত্র ও আদর্শ ব্যক্তিত্বের দ্বারা আমার হৃদয় মনকে আকর্ষণ করিবেন আমি তাঁহারই অনুসরণ করিব। যদি এমন মহাজন না মিলে, অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাসের সহিত গতানুগতিক ভাবে শাস্ত্র অনুসরণ না করিয়া আমাকে আমার নিজের জ্ঞানবুদ্ধির অনুসরণ করিয়াই চলিতে হইবে। এই সমস্যার চরম মীমাংসা হইবে তখন যখন আমরা হৃদয়ের মধ্যে ভগবানের বাণী শুনিতে পাইব। এ-কথা গীতার কোন অধ্যায়ে কোন শ্লোকে আছে, বসন্তবাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমার উত্তর এই যে, সমস্ত গীতাই এই শিক্ষা দিয়াছে, ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে যুক্ত হইতে হইবে,

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন।

অর্জ্জুনের রথে সারথিরূপে প্রকট হইয়া যিনি তাঁহাকে কর্ম্মের আদেশ দিয়াছিলেন, আমাদের সকলের হৃদয় রথেই তিনি সারথিরূপে বর্ত্তমান, কেমন করিয়া তাঁহাকে জানা যায়, পাওয়া যায়, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎভাবে যুক্ত হওয়া যায়—ইহাই হইতেছে গীতার সাধন।

মনুসংহিতার প্রামাণিকতা

বসন্তকুমার বলিয়াছেন, আমি মনুসংহিতাকে একটি জাল গ্রন্থ বলিয়াছি। এখানেও তিনি আমার মতটিকে ঠিকমত প্রকাশ করেন নাই, মনুসংহিতা সম্বন্ধে আমার প্রকৃত মন্তব্যটি চাপিয়া দিয়াছেন। অতএব বাধ্য হইয়া আমাকে তাহার পুনরুক্তি করিতে হইতেছে। আমি বলিয়াছি, "মনুসংহিতা যে বেদমূলক তাহা আমি স্বীকার করি, মনুসংহিতায় সমাজের উন্নতির জন্য যে-সব বিধি বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলে গ্রন্থকারের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতে হয়।" তবে আমি বলিয়াছি যে, মনুসংহিতা মনুর দ্বারা রচিত হয় নাই। সমাজের কল্যাণের জন্য দেশকালোপযোগী বিধি বিধান রচনা করিয়া প্রাচীন ঋষিদের নামে তাহা প্রচলিত করা এক সময়ে আমাদের দেশে প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল,

মনুসংহিতার উদ্ভবও সেই ভাবে হইয়াছে। ইহা আমার আবিষ্কার নহে, সকল পণ্ডিতই ইহা স্বীকার করিয়াছেন, শঙ্কর, রামানুজও যে ইহা জানিতেন না তাহার কোনও প্রমাণ নাই। মনুসংহিতা যে হিন্দুদের প্রামাণ্য ধর্ম্মশাস্ত্র সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই, কিন্তু সেজন্য যে মনুকেই ইহার রচয়িতা বলিয়া ধরিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। বস্তুতঃ মনু কে ছিলেন, মনু নামে আদৌ কোন ব্যক্তি ছিলেন কিনা, উহা কেবল একটি পদবী কিম্বা উপাধি কিনা তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। ঋগ্বেদে মনুকে বলা হইয়াছে মানব জাতির পিতা, আবার সেখানে চারি মনুর কথা বলা হইয়াছে।

গীতাতেও বলা হইয়াছে,

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।

মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥ ১০।৬

চারি মনু ভগবানের মানস পুত্র, এই জগতের সমস্ত প্রজা তাঁহাদের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। মনুসংহিতার মধ্যেই মনুকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে, স্ত্রীলোকদের যে হীন চরিত্র তাহা মনুরই সৃষ্টি (মনুসংহিতা—৯।১৭)।

পণ্ডিতেরা বর্ত্তমান মনুসংহিতার ভাষা ও রচনা পদ্ধতি হইতে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে, ইহা খৃষ্টীয় শতাব্দীর বেশী পূর্ব্বে রচিত হয় নাই—তাহা হইলে জগতের সৃষ্টি কি তখনই হইয়াছে?

মনুসংহিতা যাহার দ্বারাই রচিত হউক, ইহার যে বহু সংস্করণ, পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আমি নারদসংহিতা ও মহাভারতের প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছি। বসন্তকুমার বলিয়াছেন, বর্ত্তমান মনুসংহিতার দুই একটি শ্লোক কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেবল ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় না যে বর্ত্তমান মনুসংহিতা অতি প্রাচীন। বর্ত্তমান মনুসংহিতায় প্রাচীন মনুসংহিতার কিছু অংশ আছে। মনু নামে যদি কোন ঋষি ছিলেন, তিনি ঋগ্বেদেরও পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু আধুনিক মনুসংহিতা যে বৈদিক যুগের বহু পরে রচিত হইয়াছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব এ-বিষয়ে আর বেশী আলোচনা না করিয়া একজন শাস্ত্রজ্ঞ সনাতনী পণ্ডিতেরই মত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি: "আর্য্যদের সহিত অনার্য্যদের নিয়ত সংঘর্ষের কারণে দলবদ্ধতার প্রয়োজন হয়। এইসব ছোট ছোট দলকে গোষ্ঠী বলা হইত এবং দলের নেতাদিগকে "প্রজাপতি" বলা হইত। প্রজাপতিরা নিজ নিজ গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যে-সব নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতেন সে সকলকে "প্রজাপতি সূত্র" বলে। কালক্রমে প্রজাবৃদ্ধি হইলে প্রজাপতিগণ ধর্ম্ম শাসন বিষয়টি আপনাদিগের হাতে রাখিয়া, রাজ্য শাসন ব্যাপার সুশৃঙ্খলায় পরিচালনের জন্য "রাজা" নির্ব্বাচন করেন। ধীরে ধীরে "প্রজাপতি" নাম লুপ্ত হয়, "মনু" নামটির প্রবর্ত্তন হয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বিশেষ সমস্যা উঠিলে, তাহার সমাধানের জন্য, কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে "মনু" মনোনয়ন করা হইত—তখন, মনু বিধি দিতেন। মনুর সংখ্যাও এই জন্য বহু। মনুদিগের সময়ের প্রথম ভাগে যে সকল বিধি রচিত হয় সে সকলের নাম 'গৃহ্য সূত্র' এবং পরভাগে যে সব রচিত হয় তাহাদিগের নাম 'স্মৃতি'। ঐ প্রজাপতি সূত্র, গৃহ্য সূত্র, স্মৃতি—এ-সকলের সাধারণ নাম সংহিতা। সংহিতার সংখ্যা বহু। সমাজের প্রয়োজন ও কল্যাণ কল্পে বিধি নিষেধ অসংখ্যবার অসংখ্য প্রকারে দেশ কাল পাত্র হিসাবে পরিবর্জ্জিত, পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত হইয়াছে। যে সমন্বয়-সাধিত সর্ব্বজনগ্রাহ্য সর্ব্বজনমান্য স্মৃতিকে আমরা 'মনুসংহিতা' বলি তাহা ভৃগুবংশীয় সুমতির রচিত। ইহার অপর নাম ভৃগুসংহিতা।" —**দৈনিক বসুমতী, ১১ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৫।**

এই মতে যে সত্য রহিয়াছে তাহার প্রমাণ মনুসংহিতার মধ্যেই বার বার বলা হইয়াছে, "মনু এইরূপ বলিয়াছেন", কোথাও বা বলা হইয়াছে "মনু পুত্র ভৃগু এইরূপ বলিয়াছেন।" মনুসংহিতা যদি বাস্তবিক মনুর দ্বারাই রচিত বা সঙ্কলিত হইত তাহা হইলে এইরূপ উল্লেখ থাকিত না।

মনুসংহিতা সম্বন্ধে একজন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন—

"Probably the compilation we now posses is an irregular compendium of rules and maxims by different authors, which existed un-

written for a long period of time, and were handed down orally. An original collection is alluded to by commentators under the titles Vridha and Vrihat, which is said to have contained 1,00,000 couplets arranged under twenty-four heads in one thousand chapters; where as the existing code contains only 2685. Possibly abbreviated versions of all collections were made at successive periods, and additional matter inverted, the present text merely representing the latest compilation." (Sir Monier-Williams, Indian Wisdom, pp. 204. See also A. Weber, History of Sanskrit Literature, pp. 279).

৩

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজ

বসন্ত বাবু বলিয়াছেন "অনিলবাবুর মতে এই সকল শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার জন্য বাঙ্গলা দেশে হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে, মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে"। এখানেও বসন্ত বাবু আমার মতটিকে ঠিকমত প্রকাশ করেন নাই। আমি কতকগুলি অনিষ্টকর দেশাচারের উল্লেখ করিয়াছি, সেগুলি সবই যে শাস্ত্রীয়, ইহা বসন্ত বাবুরই মত, আমার মত নহে। বিহার যুক্ত প্রদেশ বা অন্যান্য প্রদেশে কি হইতেছে না হইতেছে তাহা এখানে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই—বাংলা দেশে আমাদের চোখের সম্মুখে কি ঘটিতেছে তাহারই কিছু উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কিছুদিন পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তর্কালঙ্কারের কন্যা নয় বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল। তাহার যৌবন উপস্থিত হইলে সে গর্ভবতী হয়। সে যদি গর্ভপাত করিতে সম্মত হইত, তাহা হইলে সমাজ তাহাতে চক্ষু বুজিয়া থাকিত, দেখিয়াও দেখিত না। কিন্তু সে তাহাতে সম্মত না হইয়া হিন্দু সমাজ হইতে বাহির হইয়া যায় এবং একজন মুসলমান যুবককে নিকা করে। তখন সমাজ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে এবং ঐ বালিকাটির ভ্রাতাগণকে সমাজচ্যুত করিতে উদ্যত হয়। তখন ভ্রাতাগণ সপরিবারে সকলে মিলিয়া মুসলমান হইবার সঙ্কল্প করে। তাহার পর কয়েকজন ভদ্রলোকের বিশেষ চেষ্টায় ব্যাপারটি মিটমাট হইয়া যায়, আর বেশী দূর গড়ায় না। স্ত্রীলোকদের মধ্যে মাতৃত্বলাভের, সংসার ধর্ম্ম পালনের জন্য তীব্র বাসনা রহিয়াছে, হিন্দু বিধবারা নিজ সমাজে ইহার সুযোগ না পাইয়া অনেকেই স্বেচ্ছায় মুসলমান হইতেছে। যাহারা স্বেচ্ছায় না যাইতেছে, মুসলমান গুণ্ডারা তাহাদের মধ্যে অনেককেই জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, কারণ তাহারা জানে যে, হিন্দু সমাজ বিধবাকে রক্ষা করিবার বিশেষ কোন চেষ্টাই করে না, একবার তাহাকে গৃহের বাহিরে টানিয়া আনিতে পারিলে হিন্দু সমাজ আর তাহাকে স্থান দিবে না, তখন তাহাকে বাধ্য হইয়া মসজিদে যাইয়া কল্‌মা পড়িতে হয়, এবং তাহার পক্ষে যতই মর্ম্মন্তুদ হউক, তাহার একজন ধর্ষণকারীকে পতিরূপে বরণ করিয়া লইতে হয়।

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা কম, ধোবা, নাপিত প্রভৃতি জাতির যুবকেরা বিবাহের জন্য নিজ জাতির মধ্যে কন্যা পায় না, তাহার জন্য তাহাদিগকে দশ বারো ক্রোশ দূরে যাইতে হয়। কিন্তু মুসলমান হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহারা উপযুক্ত পাত্রী পায়, সেইজন্য অনেকেই মুসলমান হইতেছে। হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে অনেক অনাথ বালক বালিকা রহিয়াছে, হিন্দু সমাজ তাহাদের দিকে তাকায় না, তাহাদের স্পর্শকেও ঘৃণা করে। কিন্তু মুসলমান সমাজ তাহাদিগকে বুকে করিয়া লইবার জন্য সকল সময়েই হাত বাড়াইয়া রাখিয়াছে —তাহারা মুসলমান হইলে তাহাদিগকে কাজ দিতেছে, খাইতে দিতেছে, তাহাদের শ্রান্ত ক্লান্ত বুকে আশা জাগাইয়া তুলিতেছে। হিন্দু-সভা কোথাও কোন মতে যদি একজন খ্রীষ্টান বা মুসলমানকে "শুদ্ধি" দ্বারা হিন্দু করিতেছে, তখন তাহা লইয়া কত হৈ চৈ কাগজে কত প্রচার হইতেছে। কিন্তু মুসলমানেরা গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে নীরবে নিঃশব্দে কত হিন্দুকে যে মুসলমান করিয়া লইতেছে তাহার খবর রাখা হিন্দু সমাজ প্রয়োজন মনে করে না, আর কেহ একবার কোনরূপে মুসলমান হইয়া গেলেও তাহাকে

করাইবারও কোন চেষ্টা করে না। এইভাবে যক্ষ্মা রোগীর ন্যায় হিন্দু সমাজ তিল তিল করিয়া ক্ষয় হইয়া যাইতেছে—আর আমাদের সনাতনী ভ্রাতারা তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য শাস্ত্রের বচন আওড়াইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা বাস্তবিকই যদি হিন্দুশাস্ত্রের সন্ধান রাখেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন হিন্দুশাস্ত্রকারেরা সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য, প্রজাবৃদ্ধি করিবার জন্য কি বিপুল চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহাতে প্রজা বৃদ্ধি হইতে পারে এমন কোন কাজকে তাঁহারা পাপ বলিয়া গণ্য করেন নাই।

অপ্রবৃত্তৌ চ ভূতানাং দৃষ্টিরেখা
প্রজাপতেঃ।
অতোঽন্যগমনে স্ত্রীণাং এষু
দোষো ন বিদ্যতে॥
—নারদ সংহিতা

অর্থাৎ, "প্রজাপতি (প্রজাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে) এই বিধান করিলেন যে, প্রবৃত্তি না থাকিলেও স্ত্রীগণ অন্যগামিনী হইয়া কোন দোষে দুষ্ট হইবেন না।"

প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবাদের কোন অধিকার ছিল না, পুরুষের পুত্র না থাকিলে তাহার সম্পত্তি অন্যান্য আত্মীয় বা গুরু বা শিষ্য এবং ইহারা কেহ না থাকিলে রাজা পাইতেন। মনে হয় ইহা বিধবাদের প্রতি অতিশয় অবিচার। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, প্রাচীন হিন্দু সমাজে সন্তানহীন বিধবা খুব কমই ছিল, কারণ "নিয়োগ" প্রথা প্রচলিত থাকায় বিধবারা দেবর কিম্বা অন্য কোন সপিণ্ড পুরুষের দ্বারা পুত্র উৎপাদন করিয়া লইত এবং সেই পুত্র তাহার স্বামীর সম্পত্তির অধিকারী হওয়ায় তাহার অভিভাবিকারূপে কার্য্যতঃ সেই সম্পত্তির মালিক হইত। তাহা ছাড়া বিধবারা ইচ্ছা করিলে বিবাহও করিতে পারিত। এ বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রের বিধানে কিছুমাত্র সন্দেহের স্থান নাই। আমাদের সনাতনী শাস্ত্রবিশ্বাসী ভ্রাতারা আজ হিন্দু সমাজের দুর্দ্দিনে এই সব কল্যাণকর শাস্ত্রীয় প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত আছেন কি? আমি আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, আজকাল যাঁহারা নিজদিগকে বর্ণাশ্রমী বা সনাতনপন্থী বলিয়া প্রচার করেন তাঁহারাও সেই প্রাচীন বর্ণাশ্রমের আদর্শ বা মনুর বিধান অনুসরণ করিতেছেন না।" বসন্তকুমার অনেক ফাঁকা কথাই বলিয়াছেন কিন্তু আমার এই স্পষ্ট অভিযোগটির কোন উত্তর দেন নাই, ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। আজ যদি হিন্দু সমাজ মনুর বিধান মানিয়া চলিত তাহা হইলে উল্লিখিত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গর্ভবতী বিধবা কন্যাকে কোন ব্রাহ্মণ যুবকই বিবাহ করিতে পারিত এবং সেই পুত্র 'সহোঢ়' পুত্র বলিয়া গণ্য হইত। সনাতনীরা মুখে যাহাই বলুন, বস্তুতঃ তাঁহারা মনুসংহিতা প্রভৃতি মহান্ ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুসরণ করিতেছেন না, তাঁহারা দেশাচাররূপ ভূতের ভয়েই জড়সড় হইয়া রহিয়াছেন।

আজকাল হিন্দু সমাজে সধবারা সন্তানের পর সন্তান প্রসব করিতেছে, ত্রিশ বৎসর বয়স পার না হইতেই অনেকে আট দশটি সন্তানের জননী হইতেছে, এইভাবে তাহাদের শরীর ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, সন্তানগুলিও রুগ্ন, স্বল্পায়ু হইতেছে, দারিদ্র্য, রোগ, অকালমৃত্যুতে সংসার নরকযন্ত্রণা স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে সমর্থ স্বাস্থ্যবতী বিধবারা জননী হইবার প্রবল সহজাত আকাঙ্ক্ষাকে চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়া হিন্দু সমাজে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য ভাগ্য ও বিধাতাকে অভিসম্পাত করিতেছে। নরদেব স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত, ইহা প্রাচীন সমাজে খুবই প্রচলিত ছিল। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্মৃতিশাস্ত্রবিশারদ পুরুষসিংহ স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজের বিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহ দিয়া হিন্দু সমাজের সম্মুখে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ধরিয়াছিলেন। তথাপি আজ পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজে যে বিধবা বিবাহের অবাধ প্রচলন হইল না তাহার একমাত্র কারণ হইতেছে বর্ত্তমান সমাজের জড়তা, প্রাণহীনতা, তামসিকতা। এই জড়তারূপ ঘোর অধর্ম্মকেই যাহারা আজ সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতেছেন, গীতাতে তাহাদের বুদ্ধিকে তামসী বুদ্ধি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে,

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥
—১৮।৩২

"হে পার্থ, যে বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন থাকাতে অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে করে এবং সকল বিষয়ই বিপরীত বুঝে তাহা তামসী বুদ্ধি।" এই বিপরীত বুঝা কিরূপ তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাউক। পরাশর সংহিতায় বলা হইয়াছে,

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

"পতি নষ্ট, মৃত, সন্ন্যাসী, ক্লীব অথবা পতিত—নারীর এই পঞ্চ প্রকার আপদে পত্যন্তর গ্রহণ বিহিত।" এখানে কেবল যে বিধবার বিবাহই বিহিত হইয়াছে তাহা নহে, পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় হিন্দু সমাজেও যে বিবাহ বিচ্ছেদ (divorce) প্রথা প্রচলিত ছিল, ইহা হইতে তাহা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়। এই শ্লোকটি লইয়া আমাদের সনাতনীগণ বাস্তবিকই উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছেন। পরাশর সংহিতা ঋষি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র, এইটিকে তাঁহারা ফেলিতে পারেন না, আবার উৎকট পাশ্চাত্যমুখী দেশাচারবিরোধী বিধবা বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা গ্রহণ করিবার মত প্রবৃত্তি, ক্ষমতা বা সাহসও তাঁহাদের নাই। অতএব একমাত্র পন্থা হইতেছে উক্ত শ্লোকটির বিপরীত অর্থ করা! তাই কেহ বলিতেছেন, এখানে "পতি" বলিতে বিবাহিত স্বামী বুঝাইতেছে না, কথাটি এখানে "বাগদত্তা" সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে। আর একজন সনাতনী বলিতেছেন, না, এরূপ ব্যাখ্যা একান্ত কষ্টকল্পিত, "পতি" বলিতে এখানে "পতি"ই বুঝিতে হইবে। পতি নষ্ট মৃত ইত্যাদি হইলে স্ত্রীলোক অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু সেটা ঠিক বিবাহ হইবে না, হইবে উপ-বিবাহ। কিন্তু উপ-বিবাহ বলিয়া কোন কথা হিন্দু শাস্ত্রে কোথাও নাই, আছে পুনর্ভূ- ও নিয়োগ। বিধবার পুনরায় বিবাহ হইলে তাহাকে পুনর্ভূ বলা হয়; আর বিবাহ না করিয়া অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া বিধবা যখন দেবর বা অন্য কোন সপিণ্ডের দ্বারা পুত্র উৎপাদন করাইয়া লয় তাহাকেই "নিয়োগ" বলা হয়। অতএব পরাশর হইতে উদ্ধৃত শ্লোকে আপদকালে স্ত্রীলোকের যে অন্য পতি গ্রহণ করার বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহা বিবাহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর একজন পণ্ডিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এখানে "পতি" শব্দে কেবল রক্ষক বুঝিতে হইবে। কিন্তু, ঐ শ্লোকের রচয়িতা হেঁয়ালী লিখিতে বসেন নাই। আর্য্য সমাজের জন্য বিধি বিধান প্রণয়ন করিতেছিলেন, তিনি যদি "পতি" শব্দটির দ্বারা ইহার সুবিদিত সুপ্রচলিত অর্থটি না বুঝিয়া অন্য কোন লাক্ষণিক অর্থে প্রয়োগ করিতেন তাহা হইলে সেটা তিনি নিশ্চয়ই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেন। অতএব, এইভাবে শ্লোকটির বিপরীত অর্থ করা তামসী বুদ্ধি ছাড়া আর কি হইতে পারে?

শুধু পরাশর সংহিতাতেই যে উক্ত শ্লোকটি আছে তাহা নহে, বস্তুতঃ ঐটি নারদ সংহিতা হইতেই অবিকল উদ্ধৃত করা হইয়াছে, অতএব এই শ্লোকটিতে বিহিত এবং সর্ব্বতো-ভাবে যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা যে খুবই সুপ্রচলিত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোন স্থান নাই। অবশ্য মনুসংহিতা বিধবা বিবাহ সমর্থন করে নাই; কেন করে নাই তাহা আমরা এখনই আলোচনা করিব। কিন্তু মনুসংহিতার সময়ে বিধবা বিবাহ খুবই প্রচলিত ছিল। মনুসংহিতার মধ্যেই তাহার নিশ্চিত প্রমাণ রহিয়াছে। দ্বাদশ প্রকার পুত্রের বর্ণনার প্রসঙ্গে মনু বলিয়াছেন, "যদি স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা কোন স্ত্রী অথবা কোন বিধবা স্বেচ্ছায় পুনরায় বিবাহ করে এবং সেই বিবাহ হইতে তাহার পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে সেই পুত্রকে "পৌনর্ভব" বলা হয়"—৯।১৭৫। আর যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মৃত ক্লীব বা রুগ্ন হয় এবং সেই স্ত্রীলোক রীতিমত 'নিয়োগের' দ্বারা অন্য কোন পুরুষের সঙ্গ হইতে পুত্রলাভ করে তাহা হইলে সেই পুত্রকে ক্ষেত্রজ বলা হয়।" পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ইহারা সকলেই ক্ষেত্রজ পুত্র ছিলেন, ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, তৎকালীন সমাজে এই সকল পুত্রের স্থান কত উচ্চে ছিল।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, মনুসংহিতা বৈদিক যুগের বহু পরে রচিত হইয়াছিল। যখন বৈদিক যুগ হইতে মনুসংহিতার যুগ পর্য্যন্ত বিধবা বিবাহ হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল, এবং যে অবস্থায় মনু বিধবা বিবাহ নিষেধ করিয়াছিলেন বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের আর সে অবস্থা নাই। মনুর অন্যান্য বিধি নিষেধ সকলও অপ্রচলিত হইয়া

পড়িয়াছে, তখন সমাজের কল্যাণে পুনরায় বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে?

৪

সমাজ বিকাশের ধারা

প্রাচীন কাল হইতে ভারতে বহু মুনি ঋষির আবির্ভাব হইয়াছে, বহু স্মৃতিশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্রও রচিত হইয়াছে—সর্ব্বত্র সকলেই যে এক কথা বলিয়াছেন তাহা নহে, স্মৃতিশাস্ত্রগুলির মধ্যে বিভিন্নতা ও বিরোধ অনেকই আছে। মহাভারতের উল্লিখিত শ্লোকটি সত্ত্বেও বসন্তকুমার ইহা স্বীকার করিতে চান না। শ্রীযুক্ত আশুতোষ জ্যোতিষশাস্ত্রী এইরূপ বিরোধের অনেক প্রমাণ দেখাইয়াছেন, আমি তাহারই উল্লেখ করিয়াছিলাম। বসন্তকুমার লিখিয়াছেন, ঐ ভদ্রলোকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু আশুতোষ লিখিয়াছেন, "দৃষ্টান্তস্বরূপ, আপস্তম্ব ধর্ম্ম সূত্র ও আপস্তম্ব সংহিতা মিলাইয়া দেখিলে, এ ধারণার দৃঢ়তা ঘটিবে।" মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে ঐ দুইটি গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিবার প্রবৃত্তি বসন্তকুমারের হইয়াছিল কি? আমরা এই মাত্র দেখিলাম বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে মনু সংহিতার সহিত নারদ সংহিতা ও পরাশর সংহিতার বিরোধ রহিয়াছে। ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতি অনেক স্মৃতি ও পুরাণে বলা হইয়াছে, ঔরস পুত্র ব্যতীত ক্ষেত্রজাদি পুত্রের মৃত্যুতে ও জননে সর্ব্ব বর্ণের সর্ব্বদাই ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। অন্যপক্ষে বৃদ্ধ গৌতম ও বৃহৎ মনু হইতে বুঝা যায় যে, দত্তকাদি পুত্র যদি সপিণ্ড হইতে গৃহীত হয় তাহা হইলে তাহাদের সপিণ্ডতা রহিত হয় না, অতএব তাহাদের মৃত্যুতে ও জননে পূর্ণাশৌচ পালনই বিহিত। আজ পর্য্যন্ত আমাদের স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের মধ্যে ইহা লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছে। বিধবাদের একাদশী সম্বন্ধেও স্মৃতিগুলির মধ্যে বিভিন্ন ও বিরোধী মত দেখা যায়। যমস্মৃতিতে বলা হইয়াছে যে, উপবাসের অর্থ বাহ্যিক ভোজন নিবৃত্তি নহে, "উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্ত বাসো গুণৈঃ সহ, উপবাস স বিজ্ঞেয়ো ন শরীরবিশোষণম্"। আবার কাত্যায়ন বলিয়াছেন বিধবাদের পক্ষে একাদশীতে কেবলমাত্র অন্নাহার নিষিদ্ধ। কিন্তু আমাদের দেশে দেশাচার আসিয়া দাঁড়াইয়াছে নির্জ্জলা একাদশীতে। একাদশীর দিন বিধবারা জল গ্রহণ করিতে পাইবে না। স্মৃতিশাস্ত্রের বিভিন্নতা ও পরস্পর বিরোধের দৃষ্টান্ত দিতে গেলে এ প্রবন্ধের শেষ হইবে না। কিন্তু এই বিরোধের কারণ কি? স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতা ঋষিগণের কখনই ভুল হইতে পারে না, ইহা ধরিয়া লইয়া আমাদের সনাতনীগণ যে-কোন উপায়ে সকল বিরোধের মীমাংসা করিতে প্রস্তুত। তাহাতে "পতি" শব্দে যদি "উপপতি" বুঝিতে হয়, তাহাতেও তাঁহাদের আপত্তি নাই! কিন্তু এরূপ বিপরীত ব্যাখ্যার দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্বের মীমাংসা হয় না। আমরা দেখিয়াছি, স্মৃতিশাস্ত্রগুলি সব ত্রিকালদর্শী বৈদিক ঋষিগণের দ্বারা রচিত হয় নাই, অতএব তাহাদের মধ্যে ভুলভ্রান্তি থাকিতে পারে; তাহা ছাড়া সে-সব এক দেশে বা এক যুগে রচিত হয় নাই, অতএব দেশ-কালভেদে তাহাদের মধ্যে বিভিন্নতা ও বিরোধ থাকা কিছুই বিচিত্র নহে। ভারতের অন্যত্র যে মিতাক্ষরা প্রচলিত, বাংলাদেশের দায়ভাগের সহিত অনেক বিষয়েই তাহার মিল নাই। মাতুলকন্যা বিবাহ বৈদিক রীতির বিরোধী, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের ঋষি বৌধায়ন স্বকীয় দেশের সর্ব্বত্র মাতুল কন্যা বিবাহ নির্ব্বিবাদে চলিতেছে দেখিয়া এই শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচারও সমর্থন করিয়াছেন। আগন্তুক বিপ্লব বশতঃ অনেক সময়ে সমাজের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। সেই বিপর্য্যস্ত সমাজের রক্ষণার্থ মঙ্গলকামী তত্ত্বদর্শী মুনিঋষিগণ অনেক সময় নূতন ব্যবস্থাও করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলেও দেখা যায় যে সাময়িক পরিবর্ত্তনের ফলেও সমাজে কোনরূপ যথেচ্ছাচরণের প্রশ্রয় প্রদত্ত হয় নাই।

আমাদের সনাতনী ভ্রাতাগণ গোড়ায় গলদ করিয়াছেন, তাঁহারা ধর্ম্ম ও সমাজকে অচলায়তন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। মানবজাতি যে ক্রমবিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া এক পরম ভাগবত লক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, ধর্ম্ম ও সমাজ যে এই বিবর্ত্তনের সহায় এবং বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী তাহাদিগকেও পরিবর্ত্তিত ও বিকশিত হইতে হয়, এই মহান্ সত্যটি তাঁহারা উপলব্ধি করেন নাই। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন, ভারতের প্রাচীন

ঋষিরা চিরদিনের জন্ম ধর্ম্ম ও সমাজের রূপ বাঁধিয়া দিয়াছেন, এবং স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই মানব সমাজকে কয়েকটি সুনির্দ্দিষ্ট স্তরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। জার্ম্মাণ ঐতিহাসিক লাম্প্রেক্ট * এইগুলির নাম দিয়াছেন—প্রতীকাত্মক (Symbolic), আদর্শমূলক ও আচারতান্ত্রিক (Typal and conventional), ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যমূলক (individualist) ও অন্তর্ম্মুখীন (Subjective)। ভারতীয় সমাজের প্রারম্ভ বৈদিকযুগে সবই ছিল প্রতীকাত্মক। সমাজ তখন ছিল গভীর ধর্ম্মভাবাপন্ন এবং মানুষ যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর না করিয়া বেশীরভাগ সহজাত অন্তর্বোধ ও অন্তর্দৃষ্টির উপরেই নির্ভর করিত। তাহারা দেখিত এই জগৎ ভগবানেরই প্রকাশ বা প্রতীক স্বরূপ, মানব জীবন, মানব সমাজকেও তাহারা ভগবানের প্রতীকরূপে দেখিত এবং এই বিশ্বের পশ্চাতে যে রহস্যময় শক্তির সন্ধান তাহারা পাইয়াছিল সেই জ্ঞান তাহারা প্রতীকের ভিতর দিয়াই প্রকাশ করিত। তখন ধর্ম্মমূলক অনুষ্ঠানযজ্ঞই সামাজিক জীবনকে এবং সামাজিক জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটিকে নিয়ন্ত্রিত করিত, এবং এই যজ্ঞ ছিল এক বিশ্বসত্যের রূপক, সে সত্যটি এই যে, এই বিরাট বিশ্ব-লীলা ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ স্বরূপ, ভগবানই সকল বিশ্ব-কর্ম্মের ভোক্তা ও ঈশ্বর—দেবগণ এই ভগবানেরই বিভিন্ন রূপ, যজ্ঞের ভিতর দিয়া মানুষের সহিত দেবগণের যে আদান প্রদান তাহার দ্বারাই মানুষ ক্রমশঃ দিব্য জীবনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ বিষয়ে ভারতীয় আদর্শ সকল সময়েই পুরুষ ও প্রকৃতির (বেদের নৃ ও গ্ন, বিশ্বের দেব ও দেবী তত্ত্ব) সম্বন্ধসূচক প্রতীকের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। প্রাচীনতর বৈদিক যুগে প্রকৃতিতত্ত্ব এক রকম পুরুষতত্ত্বের সমপর্য্যায় ছিল, যদিও পুরুষতত্ত্বেরই কতকটা প্রাধান্য ছিল। তখন সমাজে নারী যেমন পুরুষের অনুগামিনী ছিল, তেমনি সখীও ছিল; পরবর্ত্তীকালে প্রকৃতিতত্ত্ব যখন পুরুষতত্ত্বের অধীন হইয়া পড়িল, নারীও তখন সম্পূর্ণভাবে পুরুষের অধীন হইল, তখন তাহার জীবন ধারণ হইল শুধু পুরুষের জন্য, তাহার স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব প্রায় লুপ্ত হইয়া গেল। আর তান্ত্রিক শাক্ত ধর্ম্ম যেমন নারীতত্ত্বকেই উচ্চতম স্থান দিয়াছে, তেমনি সমাজও নারীকে উন্নীত করিতে এবং গভীর শ্রদ্ধা এমন কি পূজার বস্তু করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহার সে সামাজিক প্রয়াস এ পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ সফল হয় নাই, ঠিক যেমন তন্ত্রবাদ কখনই সম্পূর্ণভাবে বেদান্তবাদের প্রভাব ছাড়াইয়া উঠিতে সক্ষম হয় নাই।

আর একটি দৃষ্টান্ত বৈদিক চাতুর্ব্বর্ণ্যের ব্যবস্থা। যেমন অন্যান্য দেশের সমাজে তেমনিই বৈদিক সমাজেও চারি শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয়গণ এই চারি শ্রেণী বিভাগের মধ্যে ভগবানের চতুর্বিধ প্রকাশ দেখিয়াছিল—এই চারি শ্রেণী যথাক্রমে ভগবানের জ্ঞান, শক্তি, সুসঙ্গতি ও কর্ম্ম এই চারি তত্ত্বকে প্রকট করিতেছে—বেদে যে বলা হইয়াছে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ ভগবানের চারি অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা কেবল ঐ আধ্যাত্মিক সত্যেরই রূপক এই সত্যকে অনুসরণ করিয়া বৈদিক সমাজে চারি শ্রেণী চারি বর্ণরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল, গুণই ছিল এই শ্রেণী বিভাগের মূলতত্ত্ব, ঐ গুণ অনুযায়ী শিক্ষা ও কর্ম্ম ছিল তাহার আনুষঙ্গিক।

তবে বৈদিক যুগে এই শ্রেণী বিভাগে কোন কড়াকড়ি ছিল না, যাহার মধ্যে যে গুণ, যেরূপ প্রকৃতি দেখা দিত সে ইচ্ছামত তদনুরূপ কর্ম্ম গ্রহণ করিত এবং বর্ণ হইতে বর্ণান্তরে গমনে কোন বাধা ছিল না। অসবর্ণ বিবাহ তখন প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদ হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। সে যুগে আমরা কর্ম্মের মর্য্যাদা দেখিতে পাই, কর্ম্মের মধ্যে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ নাই—যাহার যেমন প্রকৃতি ও কর্ম্ম সে সেইরূপ কর্ম্ম করিবে ইহাই ছিল চাতুর্ব্বর্ণ্যের মূলনীতি। এক ঋষির পিতা চিকিৎসকের কার্য্য করিতেন এবং তাঁহার মাতা শস্য নিষ্পেষন করিতেন (ঋক—১০।১৩২। ৩)। ক্ষত্রিয় হইয়াও বিশ্বামিত্র পুরোহিতের কার্য্য করিতেন (ঋক—৩।৩৩)। মহর্ষি ভৃগুর বংশধরেরা সূত্রধর ছিলেন এবং

---

* Lamprecht

তাঁহারা রথ নির্ম্মাণ করিতে নিপুণ ছিলেন (ঋক—১০।৩৯। ১৪)। ঋষি মুদ্গলের গাভীগুলি দস্যুদল চুরি করিয়া লইয়া গেলে তিনি নিজে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নী সারথির কার্য্য করিয়াছিলেন (ঋক—১০।১০২)। তখন যুবতিগণ তাহাদের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া যুবকগণকে আকৃষ্ট করিতেন এবং প্রণয় হইলে যে-কোন বর্ণ হইতে তাহাদের পতি বাছিয়া লইতেন (ঋক ১০।৮৫।২২; ৮।৩৫।৫; ৮।৪২। ৯)। ব্রাহ্মণেরা আধ্যাত্মিক গবেষণা ও বিদ্যা চর্চ্চা করিতেন বলিয়া ক্রমশঃ তাঁহারাই সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেন (ঋক—১০।৩০।৬)।

দ্বিতীয় যুগ, যেটিকে আমরা আদর্শমূলক বলিয়া অভিহিত করিতে পারি, সেইটিতে মানসিক বুদ্ধি ও নৈতিকতাই প্রাধান্য লাভ করে, ধর্ম্মভাব ও আধ্যাত্মিকতা পিছনে পড়ে। ভগবান যে চারিবর্ণের ভিতর দিয়া নিজেকে প্রকট করিতেছেন এ ভাব আর প্রবল থাকে না। তখন চারি বর্ণ হয় চারি প্রকার মনুষ্যের আদর্শ, ব্রাহ্মণের শুচিতা ও জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সাহস ও শক্তি, বৈশ্যের উৎপাদন শক্তি ও দাক্ষিণ্য, শূদ্রের বিশ্বস্ত সেবা ও নিঃস্বার্থ অনুরক্তি। এসব আর মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না, মানুষের আভ্যন্তরীণ জীবন হইতে স্বতঃ উৎসারিত হয় না, তাহারা আচারে পরিণত হয়। শিক্ষা দীক্ষার দ্বারা সে আচার রক্ষা করিবার চেষ্টা হয়। শেষ পর্য্যন্ত তাহারা আর ততটা জীবনের বাস্তব সত্য থাকে না, থাকে শুধু মানুষের চিন্তায় বা মুখের কথায় ঐতিহ্যরূপে। প্রথমে সমাজ ব্যবস্থায় জন্মকে বেশী বা কিছুই প্রাধান্য দেওয়া হইত না, গুণ ও সামর্থ্যেরই প্রাধান্য ছিল; কিন্তু পরে যখন বর্ণের আদর্শ নির্দ্ধারিত হইল তখন শিক্ষা ও ঐতিহ্যের দ্বারা তাহাকে রক্ষা করা আবশ্যক হইল এবং শিক্ষা ও ঐতিহ্য স্বভাবতঃই বংশ পরম্পরায় ধারায় আবদ্ধ হইয়া পড়িল। এইভাবে ব্রাহ্মণের ছেলে লোকাচার অনুসারে সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য হইতে লাগিল, এবং সমাজে তাহাদের বৃত্তিও নির্দ্দিষ্ট হইল। মনুসংহিতাতে আমরা চাতুর্ব্বর্ণের এই রূপটিই দেখিতে পাই—এককালে যাহা বর্ণব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল, গুণ ও সামর্থ্য, তাহা অলঙ্কার মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বৃত্তিই হইয়াছে বর্ণ বিভাগের মূল কথা। ব্রাহ্মণের আদর্শ বিষয়ে গীতা ও মনুসংহিতার বর্ণনা তুলনা করিলেই এই পার্থক্যটি ধরা পড়ে। গীতা ব্রাহ্মণের লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছে, শম অর্থাৎ শান্ত ভাব, দম অর্থাৎ আত্মসংযম, শুচিতা, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য। আর মনুসংহিতা ব্রাহ্মণের লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছে, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা যজন, যাজন, ভিক্ষা দান, ভিক্ষা গ্রহণ। গীতার দৃষ্টি ব্রাহ্মণের গুণ ও প্রকৃতির উপর, মনুর দৃষ্টি তাহার সামাজিক বৃত্তির উপর। গীতা বলিয়াছে যাহার যেমন প্রকৃতি যেমন গুণ তদনুসারেই তাহার কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। মনু বলিয়াছেন, যাহার যেরূপ জন্ম তদনুসারেই তাহার কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। মনু সুগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন, গুণ অনুসারে সমাজের সুনির্দ্দিষ্ট শ্রেণী বিভাগ কার্য্যতঃ সম্ভব নহে, তাই জন্মানুসারে শ্রেণীবিভাগ প্রথাকেই তিনি স্থায়ী ভাব প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে কাহার কি গুণ, কি প্রকৃতি তাহার হিসাব লওয়া হয় না, তবে প্রত্যেক জাতির বৃত্তি সুনির্দ্দিষ্ট থাকায় এবং তদনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকায় সমাজের নৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে একটা শৃঙ্খলা আসে এবং ইহাই ছিল জাতিভেদের সার্থকতা। এইভাবে আদর্শমূলক যুগ স্বভাবতঃই আচারতান্ত্রিক যুগে পর্য্যবসিত হয়।

মনুসংহিতা এই আচারতন্ত্রেরই শাস্ত্র। এই যুগের প্রবৃত্তি হইতেছে দৃঢ় সংবদ্ধ করা, শক্তভাবে সাজান, নিয়মানুবর্ত্তী করা, সমাজে পদমর্য্যাদানুক্রমে কড়াকড়ি শ্রেণী বিভাগ করা, ধর্ম্মকে অচলায়তন করিয়া তোলা, শিক্ষাকে অপরিবর্ত্তনীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ করা, চিন্তাকে শাস্ত্রবাক্যের অধীন করা, তাহার নিকট যেটিকে মানব জীবনের সম্পূর্ণ পরিণতি বলিয়া মনে হয় তাহার উপর চরমতার ছাপ মারিয়া দেওয়া। আর্য্যগণকে ভারতে আসিয়া অনার্য্যদের সহিত অনেক সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, নিজেদের বাস ভূমির বিস্তার করিতে হইয়াছিল। মনুসংহিতার যুগে তাঁহারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের যে আধ্যাত্মিক আদর্শ, মানুষ যাহাতে সেইটিকে জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে পারে সেইজন্য সমাজকে নানা বিধিনিষেধের

বন্ধনে তাঁহারা বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমাজে স্ত্রীলোকের সত্তাকে পুরুষের সত্তার মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া তাঁহাদের মতে আধ্যাত্মিক আদর্শেরই অনুযায়ী হইয়াছিল এবং সমাজের শৃঙ্খলার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। পুরুষকে যে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল তাহাও চিরকাল ইন্দ্রিয়ভোগের মধ্যে পড়িয়া থাকিবার জন্য নহে—মনু যেমন বিধবাগণকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে বলিয়াছিলেন, তেমনই পুরুষকেও যথাসময়ে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন। এই সংসাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিয়া মানুষ যাহাতে প্রকৃষ্টভাবে অধ্যাত্মজীবনের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে এই বৈদিক আদর্শ ছিল মনুসংহিতার মূল নীতি। কিন্তু মনু বাহ্যিক আচার বিচারের কঠোরতার দ্বারাই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। এইভাবে কিছুদিন সমাজের খুবই উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। মানুষ ক্রমশঃ ভিতরের সত্য ভুলিয়া, আদর্শ ভুলিয়া বাহ্যিক আচারকেই ধর্ম্মের সবখানি বলিয়া মনে করে এবং এইভাবেই অন্ধকারময় ঘোর কলিযুগের উদ্ভব হয়।

মনু যে জাতিভেদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার কি দুর্গতি হইয়াছে তাহা অনুধাবন করিলেই এই পরিণতিটি বেশ বুঝা যায়। মনু ব্রাহ্মণের যে উচ্চ আদর্শ দিয়াছিলেন, সে ত্যাগ, সংযম, শুচিতা হইতে বহুকাল ব্রাহ্মণ চ্যুত হইয়াছে, আছে শুধু ব্রাহ্মণ নাম এবং গলায় পৈতা। বর্ত্তমানে যে জাতিভেদ তাহা মনুর জাতিভেদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। মনু প্রত্যেক জাতির বৃত্তি সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, এখন যে-কোন জাতি যে-কোন জাতির বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। ব্রাহ্মণ আর ভিক্ষাবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা লইয়াই ব্রতী নাই, উচ্চ গবর্ণমেণ্টের চাকুরী হইতে আরম্ভ করিয়া পাচকের কর্ম্ম করিয়া এবং চরিত্রে কেহ কেহ চণ্ডালের অধম হইয়াও সমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। আমাদের সনাতনীরা আবার সেই মনুর আদর্শ ফিরাইয়া আনিতে চাহিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা দেখিতেছেন না যে, নিজেদের জীবনেই তাঁহারা আর মনুকে সত্য করিয়া তুলিতে পারিতেছেন না। গত সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতে সেই প্রাচীন ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। অতীব শক্তিশালী অধ্যাত্ম মহাপুরুষগণের অবিরত প্রয়াসও আচারতান্ত্রিকতাগ্রস্ত সমাজের পূর্ব্বতন শক্তি ও সত্য ও তেজস্বিতাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে সক্ষম হয় নাই; কোন নূতন অধ্যাত্ম আন্দোলনের অভ্যুত্থান হইয়াছে, আবার দুই এক পুরুষের মধ্যেই আচারতান্ত্রিকতার বজ্রমুষ্টি চাপিয়া ধরিয়াছে। এখন এমন এক যুগ আসিয়াছে যখন আচার ও সত্যের মধ্যে ব্যবধান অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে, এমন সব চিন্তাশক্তিশালী লোকের আবির্ভাব হইতেছে যাঁহারা শাস্ত্রের সমস্ত বিধি বিধানকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছেন। ("the great swallowers of formulas"), তাঁহারা তেজের সহিত অথবা প্রবলভাবে অথবা বিচারবুদ্ধির শান্ত আলোকে প্রতীক ও বর্ণ ও আচার বর্জ্জন করিয়া অচলায়তনের প্রাচীর মূলে আঘাত করিয়াছেন এবং ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধি, বিবেক বা হৃদয়াবেগের দ্বারা সেই সত্যের সন্ধান করিয়াছেন, সমাজ যাহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে অথবা তাহার সহস্র সমাধিসকলের মধ্যে সমাহিত করিয়াছে। এইটিই হইতেছে ধর্ম্মে, চিন্তায়, সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক (individualist) যুগের আরম্ভ; এই যুগ যুক্তি ও বিচারের যুগ, বিদ্রোহের, প্রগতির, স্বাধীনতার যুগ। এই যুগকে আমরা কি ভাবে গ্রহণ করি তাহারই উপর ইহার পরিণতি নির্ভর করিবে—আমরা যদি দৃঢ়তম সঙ্কল্পের সহিত সত্যের অনুসরণ করিতে না পারি তাহা হইলে আবার হয়ত আর এক রকম আচারতান্ত্রিকতার গভীর গর্ত্তে পতিত হইব। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, শাস্ত্র, আচার, এ-সবই হইতেছে সাময়িক সহায় মাত্র, যতক্ষণ না আমরা ভিতরের অধ্যাত্ম সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি ততক্ষণই ইহাদের উপযোগিতা, আর ইহাদের অপব্যবহার করিলে ইহারা সহায় না হইয়া আমাদের পায়ের শৃঙ্খল হইয়া উঠে। সকলের হৃদয়ের মধ্যেই ভগবান রহিয়াছেন। রাজসিক বাসনা কামনা, তামসিক জড়তার জন্য তিনি অপ্রকাশ হইয়া রহিয়াছেন, সেই ভগবানকে হৃদয়ের মধ্যে সন্ধান করিতে হইবে। সাত্ত্বিকতার দ্বারা রাজসিকতা

ও তামসিকতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে—এইভাবে অন্তর্মুখ হইয়া যখন আমরা ভিতরে ভগবানের সহিত যুক্ত হইব, তাঁহার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আমাদের এই মানবীয় অশেষ ত্রুটিপূর্ণ প্রকৃতিকে ঠিকভাবে গড়িয়া তুলিব, তখনই আমরা হইব প্রকৃত ভাবে মুক্ত, স্বরাট, সম্রাট। তখন আর বাহিরের শাস্ত্র শাসন, আইন কানুন কিছুই প্রয়োজন হইবে না, কারণ তখন আর আমাদের পা বেতালে পড়িবে না। তখনই পৃথিবীতে প্রকৃত সত্যযুগের আরম্ভ হইবে।

উপসংহার

প্রবন্ধটি ইতিমধ্যেই অনেক দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। বসন্তকুমার গীতার সার্ব্বজনীনতা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, ভবিষ্যতে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। বৈদিক যুগ আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া খুবই বড় ছিল, কিন্তু ভারতের সামাজিক জীবনে শ্রেষ্ঠ যুগ আসিয়াছিল বুদ্ধের আবির্ভাবের পরে। আর বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই একটি শাখা, ইহার মূল রহিয়াছে উপনিষদে। ইহা যে বিশেষ রূপ গ্রহণ করিয়াছিল ভারতে তাহা স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু ইহার প্রভাব হিন্দুর ধর্ম্মে হিন্দুর সমাজে স্থায়ীভাবেই রহিয়া গিয়াছে। অনেকে শঙ্করকেই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াছেন। রাসলীলা সম্বন্ধে এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উহা প্রাকৃত রাসলীলা নহে। বসন্তকুমার নিজেই উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, যখন শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিতেছিলেন তখন গোপগণ তাঁহাদের রমণীদিগকে নিজেদের নিকটেই দেখিয়াছেন।

বসন্তকুমারের মতে যেটি আমার সর্ব্বাপেক্ষা বেফাঁস উক্তি সেইটি তিনি আমার উপর শেষ আক্রমণের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি বসন্তকুমারকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। বাহ্য কর্ম্মের উপর পাপ পুণ্য নির্ভর করে না, এই প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম ধর্ষিতা নারীর কোন পাপ হয় না, অতএব তাহার প্রায়শ্চিত্তের কোনও প্রয়োজন নাই—এ সম্বন্ধে বসন্তকুমার যদি আমার মতের সমর্থন করিতে পারিতেন তাহা হইলে সমাজের বিশেষ কল্যাণ করা হইত—সেইটি তিনি করেন নাই কেন? চীন ও আবিসিনীয়ার দুঃখে তাঁহার হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু নিজের দেশের এই সব অভাগিনীদের জন্য তাঁহার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না।

চুরি করা পাপ, এবং পাপের দ্বারা মানুষের অধোগতি হয় এ কথা আমি অস্বীকার করি নাই। এইরূপ পাপের দ্বারা মানুষ যখন এমন অবস্থায় উপস্থিত হয়, যখন তাহার আর পাপ পুণ্যের বোধ থাকে না, তখন আর সে মানুষের পর্য্যায়ে থাকে না, পশু হইয়া পড়িয়াছে। পশুর আবার পাপ কি? বিড়াল মাছ চুরি করিয়া খাইলে আমরা কি তাহাকে পাপী বলিব? মুসোলিনী ও জাপান পাপ করিতেছে কিনা তাহা তাহাদের বাহ্য কর্ম্ম দেখিয়া নির্দ্ধারণ করা যায় না। তাহারা যুদ্ধের দ্বারা দেশ জয় করিতেছে, ক্ষেত্র বিশেষে হিন্দুশাস্ত্রেই এটাকে অবশ্য কর্ত্তব্য বলা হইয়াছে, পাপ বলা হয় নাই। আর্য্যরা অনার্য্যদিগকে জয় করিয়া যদি ভারতে নিজদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের এই মহান সভ্যতা গড়িয়া উঠিত না। মুসোলিনী ও জাপান যদি অহংবুদ্ধি লইয়া, লোভের বশে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে তবে তাহারা নিশ্চয়ই পাপ করিতেছে। কিন্তু যদি তাহাদের ভিতরে এই উপলব্ধি থাকে যে, জগতের কল্যাণের জন্য ভগবদ্ প্রেরণাতেই তাহারা এই কর্ম্ম করিতেছে—তাহা হইলে তাহাদের কোনই পাপ করা হয় নাই। মুসোলিনী ও জাপানের দ্বারা যে জগতের কল্যাণ সাধিত হইতেছে না, একথা কি বসন্তকুমার জোর করিয়া বলিতে পারেন? জগতে কেমন করিয়া প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হয়, ইহাই হইতেছে মানবজাতির সম্মুখে আজ প্রধান সমস্যা—এই সমস্যার সমাধান কেমন করিয়া হইবে, মানুষ যুদ্ধের আতঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে অধ্যাত্ম বিকাশের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে—ইহা এ পর্য্যন্ত কেহই নির্দ্ধারণ করিতে পারে নাই। তবে মানুষের উপর ভগবান একজন আছেন, তিনি এই সমস্যার সমাধান করিতেছেন, কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বেই যেমন তিনি দুর্য্যোধনদিগকে মারিয়া রাখিয়াছিলেন, এখনও তিনি যাহা হইবার তাহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, মুসোলিনী,

হিটলার, জাপান কেবল তাঁহার হস্তের যন্ত্র স্বরূপ, তাঁহারা সে-বিষয়ে কতখানি সজ্ঞান তাহার উপরেই তাহাদের পাপপুণ্য নির্ভর করিতেছে। জাতি-সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আজ যদি সমগ্র পৃথিবী কয়েকটি বৃহৎ সাম্রাজ্যে বিভক্ত হয় এবং সেই সাম্রাজ্যগুলি মিলিত হইয়া এক নূতন জাতিসঙ্ঘ (Federation of Empires) গড়িয়া তোলে, এবং প্রত্যেক সাম্রাজ্য নিজের অধীনস্থ দেশগুলিকে স্বায়ত্ত শাসন * দেয়—তাহা হইলেই পৃথিবীতে শান্তি ও শৃঙ্খলার ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে এবং সেই ভিত্তির উপর ক্রমশঃ মানব জাতির সুসমঞ্জস ঐক্য গড়িয়া উঠিতে পারে। জাগতিক ঘটনাধারা এই দিক দিয়া চলিতেছে বলিয়াই মনে হয়। ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হইবে, আমরা আমাদের অজ্ঞানে ক্ষুদ্রবুদ্ধির দ্বারা পাপ পুণ্য শুভ অশুভের যে বিচার করিতেছি তাহার দ্বারা জাগতিক ঘটনা পরিচালিত হইবে না।

বসন্তবাবু স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি বাংলা দেশের বৈষ্ণব বা শাক্ত কোন সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত নহেন। কিন্তু আমি যে সহজ প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তিনি কোন শাস্ত্র, কোন আচার অনুসরণ করিতেছেন, তাহার কোন সোজা উত্তর না দিয়া তিনি আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করিয়াছেন, শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নাম কি আমি শুনি নাই? এ-সব সম্প্রদায়ের শিক্ষা কিছু কিছু জানি, কিন্তু ইহাদের কেহ যে বসন্তকুমারের স্থায় পশু বলিদান প্রথা সমর্থন করেন তাহা আমার জানা নাই। আর বেদ, পুরাণ, স্মৃতিতে বর্ণাশ্রমের যে-আদর্শ দেওয়া হইয়াছে বসন্তকুমার তাহা অনুসরণ করিতেছেন না, আমার এই স্পষ্ট অভিযোগের কোন উত্তর তিনি দেন নাই। অতএব আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হইতেছে যে, বসন্তকুমার ভারতের কোন শাস্ত্র, কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই আসেন না। সমস্ত সনাতনীদের পক্ষেই সাধারণভাবে এই কথা বলা চলে। তাঁহারা অনুসরণ করিতেছেন গতানুগতিক দেশাচার, যেখানে যে শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা ইহার সমর্থন পাইবেন বলিয়া তাঁহাদের মনে হইতেছে সেইটি ধরিয়াই তাঁহারা টানাবুনা করিতেছেন। কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের ঠিক এই অবস্থা হইয়াছিল। তামসিকতার বশে জীবনযুদ্ধ হইতে তিনি পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং পণ্ডিতের মত শাস্ত্র আওড়াইয়া তাঁহার সেই তামসিকতা ও দুর্ব্বলতাকে সমর্থন করিয়াছিলেন, প্রজ্ঞাবাদাংশ্চভাষসে। ইহা বড়ই কৌতুকাবহ যে, সনাতনীরা মোহগ্রস্ত ধর্ম্মসংমূঢ়-চিত্ত অর্জ্জুনের প্রলাপ বাক্যগুলিকেই শাস্ত্রবাক্য বলিয়া উদ্ধৃত করিতেছেন। বসন্তকুমার বলিয়াছেন, গীতাতে আছে "সঙ্করো নরকায়ৈব"। গীতাতে আছে স্বীকার করি, কিন্তু প্রথম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এই আপত্তি গ্রাহ্য করেন না। এক জাতির সহিত অন্য জাতির সহবাসে সঙ্করের উৎপত্তি হয় অর্জ্জুনেরই এই মত, শ্রীকৃষ্ণের নহে। শ্রীকৃষ্ণের মতে যখন কেহ নিজের প্রকৃতি, নিজের গুণ অনুসারে কর্ম্ম না করিয়া অন্য কর্ম্ম করিতে যায় তখনই হয় বর্ণসঙ্কর, তখনই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগরূপে পাপ করা হয়।

সনাতনী ভ্রাতাদের আমি অনেক আক্রমণ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের রক্ষণশীলতার দ্বারা তাঁহারা হিন্দু সমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন, নতুবা হয় ত ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইত। আমরা সংস্কার চাই, পরিবর্ত্তন চাই, কিন্তু বেদ, উপনিষদ আমাদের সম্মুখে যে অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ ধরিয়াছে তাহা হইতে যেন বিচ্যুত না হই। বসন্তকুমার সনাতনীদের মতটি বিশেষ দক্ষতার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে অভিবাদন জানাইতেছি। আর "বিচিত্রার" সম্পাদক মহাশয় যে আমাদের এই সুদীর্ঘ আলোচনাকে তাঁহার পত্রিকায় সাগ্রহে স্থান দিয়াছেন সেজন্য তাঁহাকেও অভিবাদন জানাইতেছি। কিন্তু এ-বিষয়ে আর অধিক বাদানুবাদে কোন লাভ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

শ্রীঅনিলবরণ রায়

* ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ কানাডা প্রভৃতি dominionsকে যেরূপ স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হইয়াছে

সংশয়

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

বুঝি বুঝি করি পারি না বুঝিতে কি আছে তোমার মনে।
হয়ত বা অকারণে
ভাবি বুঝি তুমি মোরে
দিলে সম্রাট ক'রে,
প্রিয় সে তোমার নিখিলেশ্বর সে যে!
অমনি আবার ঘনায় আঁধার, স্বপ্নঘন এ সেজে
কল্পনাবশে যে আসনখানি গড়ি,
সে রাজতক্ত হতে পুনরায় ধূলায় লুটায়ে পড়ি।

এই ভাঙাগড়া চলে অহরহ, সংশয়াকুল চিতে
মরমের সুনিভৃতে
আছে কি না মোর ঠাঁই
কেমনে বুঝিতে পাই?
প্রশ্নোত্তরে ওঠে পড়ে ঢেউ শুধু
কোনো কিনারাত মেলে না অকুল সিন্ধু করিছে ধূ ধূ।
সে অতল হ'তে আলোড়িয়া জলরাশি
গাগরী আমার শূন্য এ তটে কভু আসিবে না ভাসি?

কেন অন্তরদর্শী দৃষ্টি নয়নে আমার নাই?
অন্ধের মত তাই
রুদ্ধ দুয়ার পরে
বহু প্রতীক্ষাভরে
বসে থাকি শুধু, ডোবে রবি পশ্চিমে,
চির গৃহহারা ভিখারীর পারা আমি এ নৈশ হিমে।
পালঙ্ক 'পরে নিষুপ্ত রাজবালা,
পাশে পড়ে রয় কার তরে গাঁথা ম্লান মন্দারমালা?

বিজয়িনী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

তৃতীয়

প্রথম দৃশ্য

[স্থান—হিমালয়ের পার্ব্বত্য ভূমি, অদূরে গঙ্গার উপর দড়ির পুল দেখা যাইতেছে। নানাবিধ ফুল ফুটিয়াছে। ঝর্ণা ঝরিতেছে। সন্ন্যাসী ও রেবা হাঁটিতেছিল]

স। কষ্ট হচ্চে মা? একটু বসবে? এই পাথরটার উপর বসো।

রেবা। (হেঁট হইয়া পদতল হইতে কাঁটা ছাড়াইতে ছাড়াইতে) জি না, কষ্ট হয় নি। একটা কাঁটা বিঁধেছে।

স। (হাত ধরিয়া বসাইয়া) ভিতরে কাঁটা নেই ত? (পায়ের তলা হাত দিয়া পরীক্ষা করিলেন) নেই মনে হচ্চে। একটু জিরিয়ে নাও। (বসিলেন)

রেবা। (ব্যস্তে প্রণাম করিয়া) আমার পায়ে হাত দিলেন!

স। (হাসিয়া) দোষ না! এযে আমার মায়ের পা! (উঠিয়া গিয়া এক ঝাড় বরাস ফুল লইয়া আসিয়া সুরে) 'তুলে নে' রাঙা জবা আমার মায়ের পায়ে সাজবে ভাল।' না, না, মা! পা লুকুস্‌নি, আমায় পুজো করতে দে।

রেবা। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) আমার ভয় করচে!

স। ভয়? তুমি শক্তিস্বরূপিনী, তোমার স্পর্শে শিব শিবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, জড় চৈতন্য সম্পন্ন হয়, তুমি কা'কে ভয় করবে মা? (পাশে বসিয়া ভয়ত্রস্ত রেবাকে কাছে টানিয়া) মা!

রেবা। (কাছে সরিয়া আসিয়া) বাবা!

স। হ্যাঁ, এই তো মার মত কথা! তুমি গান গাইতে পার? ভগবানের নাম গান।

রেবা। রামজীর একটী গান জানি।

স। (মাথায় হাত বুলাইয়া) গাওত মা শুনি, ঐ শোন পাখীরাও তোমার মুখ থেকে রামজীর নাম শুনতে চাইছে।

রেবা। (প্রথমে ভগ্নকণ্ঠে আরম্ভ এবং পরে সহজ কণ্ঠে গাহিল)

মনোয়া কাহে উদাস, মনোয়া কাহে রে উদাস!
রামজীকো নাম পর রাখো বিশোয়াস্।
পংক্ষী যব শিখলায়া যাতা, উহো উন্‌হিকো নাম গাতা,
রাম নাম্‌কো স্মরণেবালে তরে মরণকো পাশ।

স। মা! বড় মধুর গান তোমার! ঠিক বলেছ, রাম নামকো স্মরণেবালে তরে মরনকো পাশ! বাঃ! (নীরব রহিলেন)

রেবা। (চারিদিকে চাহিয়া স্বগতঃ) কি চমৎকার এই সব পাহাড় জঙ্গল নদী ফুল! বিভূতিবাবু যদি থাকতেন, কত ছবিই আঁকতেন!

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বিভূতির বাড়ীর সম্মুখ দ্বার, বার জন পাইক লাঠী সড়কী লইয়া দ্বার রক্ষা করিতেছিল। দুজনের হাতে সেকালের গাদা বন্দুক]

১ম পাইক সর্দ্দার! মা ঠাকরুণ এ রকম হুকোমটা দিলেন কেনে বলতি পারিস? ইদিকে ত হাপুত যোপুত করতিছেন। কালই ও তো হরিলুঠের বাসাতা লুঠ করিছি। আজ তেনারই হুকুম যে ছাবালকে বাড়ী ঢুকতি না দেয়। এর মানেডা কি?

সর্দ্দার। মানে লিয়ে কি করবো দাদা ছেরকাল-যার হুকুমৎ মেনেচি, আজও মানতি হবে।

২য়। কিন্তু আমি পেত্যয় লিতে লারছি। নিশ্চয় এর মধ্যি কোন কারসাজি আছে। মা ঠাকরোণঝে এমন হুকুম দিবে ইতো পেত্যয় হয় না।

৩য়। তুমি ক্ষ্যাপেছ? মা হয়ে বলবে, ছাবালের বুকে গুলি ছুড়তে, সর্দ্দার?

সর্দ্দার। ছাবাল যদি মার বুকে গুলি করতি পারে, মাই বা কেন পারবে নি বলতো? ধম্ম যে বাপের ঠাকুর। ইকি একটা ঘা, তা' মা পেয়েছিস? এ মা যে সাক্ষেৎ মা দুগগো!

২য়। ঝাই বল, মোর পেত্যয় লাগে না—ঐ না ছোট-বাবু আসছেন! ঝাই, গড় করিগে, (ছুটিতে উদ্যত)

সর্দ্দার। (সড়কী দৃঢ়হস্তে ধরিয়া) খবরদার! হুঁসি-য়ার ভাই! দোর ছাড়বোনি, জান কবুল। (বিভূতি হাঁটিয়া আসিল)

বিভূতি। ষ্টেসনে গাড়ী পাঠায়নি, এত ক্লান্ত হয়েছি দাঁড়াতে পারছি নে। (অগ্রসর হইল)।

সর্দ্দার। (দ্বার চাপিয়া) ভিতরে যাবার হুকুমৎ নেই ছোট বাবু! মাফি কর্ব্বে।

বিভূতি। কী—ভেতরে যাবার হুকুম নেই, আমার? জানো এ' কার বাড়ী?

সর্দ্দার। আজ্ঞে সবই জানি। মাঠাকরোণের হুকুমৎ না পেলি দোর খুলতে লারবো।

বিভূতি। জানিস এই বেয়াদবির জন্যে কুকুরের মত টুঁটি টিপে দূর করে দেব! বেয়াদব! বদমাস, দূরহ সামনে থেকে। (দ্বার অভিমুখে অগ্রসর হইল)।

সর্দ্দার। (সবলে দ্বার চাপিয়া সড়কী উঁচাইল) গাল যত খুসী পাড়েন না কেন্নে, হুকুমৎ না পেলি দোর খোলা পাবেন নি। জান কবুল।

বিভূতি। (পিছু হটিয়া) সর্দ্দার! এর ফল কি হবে জানো?

সর্দ্দার। সব জানি তবু যার নুন খেয়েছি, কালু সর্দ্দার তার নেমকহারামী করতি পারবে নি। মাঠাকরোণের [হুকু]মৎ না পেলে দোর খোলবনি।

বিভূতি। বেশ, দেখি খুলিস্ কিনা (প্রস্থান)।

পাইকগণ। সর্দ্দার! ভাল করলে নি। ফাঁড়িদার পুলিস নিয়ে এলে তখনত খুলতি হবে!

সর্দ্দার। মাঠাকরোণের হুকুমৎ না পেলি, ফুলুস এলিই কি খোলবো না কি? আজ ফুলুস দেখবেক কালু সর্দ্দার এখনও সড়কী চালাবার কসরৎ ভুলে যায় নে।

(ভিতর হইতে ক্ষুদ্র গবাক্ষ পথে খগেন) সর্দ্দার! দোর খুলে দাও।

সর্দ্দার ও সকলে। মাঠাকরোণ কি হুকুমৎ দিলেন দাদাঠাকুর?

খগেন। না সর্দ্দার! মাঠাকরুণ হুকুম দেবার জন্যে আর অপেক্ষা করতে পারেন নি, তিনি স্বর্গে চলে গেছেন

সর্দ্দার। আঁ্যা বলেন কি নায়েব বাবু! আমাদের মাঠাকরোণ বেঁচে নেই! (সকলে অশ্রুপূর্ণ)

(বিভূতি ও একদল পুলিস প্রবেশ করিল)

সর্দ্দার। আর আটক করবো নি, ছোটবাবু! ভেতরে যেতে পারেন।

বিভূতি। হ্যাঁ এই যাচ্চি দাঁড়াও না; বাঁধুন এই বুড়ো সয়তানটাকে, এই আমার খুন করতে চেয়েছিল, এরা সব এর সহকারী।

(পুলিস হাতকড়া লইয়া সকলকে গ্রেপ্তার করিতে লাগিল, দ্বার খুলিয়া গিয়াছিল, বিভূতি ভিতরে ঢুকিল।)

সর্দ্দার। (ইন্‌স্‌পেক্‌টরের কাছে আসিয়া) হ্যান, চালান দেতে বলে হ্যান! মাঠাকরোণের হুকুমৎ পেয়েছ্যালুম তামিল করতে গেছলুম। কালু সর্দ্দার যার নুন খায় তার জন্য মরতি ডরায় না।

তৃতীয় দৃশ্য

(পূজার গৃহের সম্মুখের দালানে, শয্যাশায়িতা গিরিজাসুন্দরীর মৃতদেহ, চারিধারে শোকাকুল পৌরজন, স্বাতী বুকের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। পার্শ্বে বসিয়া পুরোহিত, হস্তে চরণামৃতের পাত্র, বিভূতি প্রবেশ করিল। অকস্মাৎ ডাকিয়া উঠিল, "মা! স্বাতী ত্রস্তে মাথা তুলিয়া নিজের অশ্রুসিক্ত অঞ্চল দিয়া মৃতার মুখ ঢাকিয়া দিল।]

বিভূতি। (মৃতদেহের দিকে অগ্রসর হইয়া) এত শীঘ্র চলে গেলে মা!

স্বাতী। (দৃঢ়কণ্ঠে) খগেনদা! পূজার দালানে যে বিধর্ম্মীর প্রবেশ নিষেধ, এ কথাটা কি তোমরা সবাই ভুলে গেছ?

খগেন। ভুলি নি, দিদি। কিন্তু……

স্বাতী। এর মধ্যে কিন্তুর কিছু নেই। যতক্ষণ মার পার্থিব দেহ এ বাড়ীতে রয়েছে ততক্ষণ তোমরা তাঁর আদেশ পালনে বাধ্য। তাঁর হয়ে আমি তোমাকে হুকুম করছি ঐ লোকটিকে এখান থেকে সরে যেতে বল।

খগেন। (অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে) ছোটবাবু……

বিভূতি। খগেনদা! আমার মাকে একবার স্পর্শ করবার অধিকারও কি আমার নেই?

খগেন। (কাঁদিয়া উঠিয়া) কি বলব ছোটবাবু। আমি যে কথা খুঁজে পাচ্ছি না। এ আপনি কি করলেন?

স্বাতী। (পুরোহিতের প্রতি চাহিয়া তীব্রকণ্ঠে) আপনিও কি কথা খুঁজে পাচ্ছেন না? এর উত্তর দেবার সাধ্য আপনার হল না?

পুরোহিত। ছোটবাবু! এর উত্তর মা ত নিজেই দিয়ে গেছেন। আমরা আর নূতন করে কি বলব। (কাঁদিয়া ফেলিলেন।)

বিভূতি। ওঃ; আমি কি করেছি! কি করেছি!

(মূহ্যমান দৃষ্টিতে মৃতদেহের প্রতি একবার চাহিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।)

চতুর্থ দৃশ্য।

[শ্মশান। গিরিজাসুন্দরীর মৃতদেহ শ্মশানে আনা হইয়াছে। তফাতে চিতা সাজান হইতেছে। দূরে মৃতদেহ সেইমাত্র রাখা হইয়াছে।—বল হরি হরিবোল ধ্বনির শেষ শব্দ তখনও মিলায় নাই। বস্ত্রাবৃত মৃতদেহের খানিকটা দেখা যাইতেছে। খগেন ও অন্য লোকজন একটা গাছের তলায় বসিল। পুরোহিত সেই দলের মধ্যে একটু স্বতন্ত্রভাবে বসিলেন। স্বাতী মৃতদেহের নিকটে একটা গাছের তলায় একাকী দাঁড়াইয়া রুক্ষ উদাস দৃষ্টিতে নদীর দিকে দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ বসিয়া পড়িল। কীর্ত্তনীয়ারা নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল। অদূরে বিভূতিকে দেখা গেল।]

পুরোহিত। খগেন বাবু, মুখাগ্নি করবার জন্যে সব চেয়ে নিকট কেউ এক জনকে খবর দেওয়া হয়েছে? কতক্ষণে এসে পৌছতে পারবেন?

খগেন। এঁদের নিকট জ্ঞাতি ত কেউ কাছাকাছির মধ্যে নেই ভটচাজ্জি মশাই। একজন মীরাটে থাকেন, তা ভিন্ন আর ত কারো কথা কখন শুনিনি। সেখান থেকে আসা ত আর সম্ভব নয়! তা হ'লে মুখাগ্নির কি ব্যবস্থা হবে?

বিভূতি। (নিকটস্থ হইয়া) খগেনদা, আমায় এখন কি করতে হবে, বলে দাও।

স্বাতী। (কাছে আসিয়া) ভটচাজ্জিমশাই, মায়ের মুখাগ্নি আমিই করব! আমায় কি করতে হবে আপনি করিয়ে নিন।

বিভূতি। আমার মার শেষ কৃত্য আমারই করবার কথা।

পুরোহিত। কিন্তু ছোটবাবু!

বিভূতি। কোনো কথা শুনতে চাই না। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান, এ অধিকার আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবার সাধ্য কারো নেই।

স্বাতী। আমার আছে। আমি তাঁর বিধবা পুত্রবধূ। তিনি নিজে আমায় এই অধিকার দিয়ে গেছেন।

খগেন। (আহতভাবে) স্বাতী দিদি!

স্বাতী। খগেন দা, জেনে শুনে তুমি না জানার ভাণ কেন করছ? মায়ের শেষ কথা ত তুমি শুনেছ। (আরি একটু কাছে আসিয়া পুরোহিতের প্রতি) বলুন, আমায় কি কি করতে হবে।

বিভূতি। (নিকটস্থ হইয়া) আমি কি আগে স্নান করে আসব? মিথ্যে আপনারা দেরী করছেন কেন?

পুরোহিত। ছোটবাবু, আমরা আপনাদের তিন পুরুষের কুলপুরোহিত; আপনাকে হতে দেখেছি আমি। আপনার সূতিকা পুজা থেকে উপনয়ন সব কিছুই আমার হাত দিয়ে হয়েছে। আজও আমি আপনার কল্যাণের জন্য মায়ের আজ্ঞামত দৈবকার্য্য করছিলুম—।

বিভূতি। (অসহিষ্ণুভাবে)। কি? কি বলতে চান আপনি?

পুরোহিত। ধর্ম্মান্তর গ্রহণকারীর শাস্ত্রীয় কার্য্য করবার কোন অধিকারই ত থাকে না ছোটবাবু।

বিভূতি। শাস্ত্রীয় কার্য্য ?

পুরোহিত। হ্যাঁ, এই পরিত্যক্ত মাতৃদেহের সম্পর্কে কোন কিছু করবার অধিকারই ত আপনি আর রাখেননি ছোটবাবু!

বিভূতি। কিন্তু তার জন্তে কি আমাদের মাতাপুত্রের সম্বন্ধ—

স্বাতী। (দৃঢ়স্বরে) হ্যাঁ লোপ পেয়ে গেছে, মা নিজে বলেছেন যে আমার যে ছেলে ছিল সে মরে গেছে।

পুরোহিত। হ্যাঁ; আমাদের শাস্ত্র এবং সমাজ এই রকমই বলে।

বিভূতি। (অবসন্নবৎ) শাস্ত্র ও সমাজ! (ভীষণ কণ্ঠে) না অনুতাপ করবার কিছু নেই। সঙ্কীর্ণ হীন গণ্ডীঘেরা এই হিন্দুধর্ম্ম আবিল পঙ্কিল জলের মতই বিষদুষ্ট, এর থেকে যত দূরে থাকতে পারা যায় ততই ভাল। যা আমি করেছি, বেশ করেছি। এর জন্য কোন অনুতাপ করবার দরকার নেই। (বেগে প্রস্থান)

(পটক্ষেপণের পরে শোনা গেল, পুরোহিত ও স্বাতীর মিলিত কণ্ঠে মন্ত্র পাঠ—

ওঁ গয়াদীনি চ তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ সরিদ্বরাং ॥
কৌশিকীং চন্দ্রভাগাঞ্চ সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্।
ভদ্রাবকাশাং গণ্ডকীং সরযুং পনসস্তথা ॥
বৈনবঞ্চ বরাহঞ্চ তীর্থং পিণ্ডারকন্তথা।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাং তথা ॥)

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

মাছ ধরা

শ্রীস্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

ঘরের কোণে লক্‌জড়ানো ছিপ্‌টা দাঁড়িয়ে আছে।
ধরলে ধরতে পারি যে মাছটা
তার কথা ভাবতে ভাবতে মন হ'ল চঞ্চল।
দিবানিদ্রার তন্দ্রালস গেল কেটে,
শয্যাত্যাগ করে করলাম গাত্রোৎপাটন,
চল্লাম ছিপ্ হাতে পুকুর ঘাটে।

বসে আছি ছাতা মাথায় দিয়ে পুকুর পাড়ে,
ভাসছে ফাৎনা পানাপুকুরের কালো জলে।
মীনকেতনের পুষ্পরথ
ভেসে চলেছে অন্তরের অন্তরীক্ষে,
আনাড়ির ছিপে ধরা দিল না একটি মাছও।

সন্ধ্যা হয়ে আসে।
তুমি এলে কলসি কাঁখে জল তুলতে।
শূন্য চুপ্‌ড়িটার পানে চেয়ে হাসলে একটু।
আস্তে আস্তে ছিপে সূতো গুটিয়ে নিই,
—দেখি টুক্‌রির মধ্যে তুমি ঢুকে মুখ বাড়িয়ে আছ,
তোমার শূন্য কলসিটা গুড়িয়ে পড়ল জলে।

আমার মাছ ধরাটা একেবারে ব্যর্থ হল না,
মীনের বদলে পেলেম মীনাক্ষীকে।

জেনারেল রেমঁ

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, পি, আর, এস

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বার্থের জন্য সাময়িকভাবে টিপুর বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইলেও নিজাম এবং মারাঠাগণ এই দুই পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষে দীর্ঘকাল সখ্যভাবে বাস করা সম্ভব ছিল না। বাদসাহী সনদের বলে দক্ষিণ ভারতবর্ষ হইতে চৌথ এবং সরদেশমুখী মারাঠারা আদায় করিত। দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশে নিজামের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে উহারা তাঁহার নিকট হইতে ঐ দুই কর পাইত। দীর্ঘকাল বাকি পড়ার ফলে মারাঠাদের নিজাম আলির নিকট হইতে বহু অর্থ প্রাপ্য হইয়াছিল। কিন্তু নিজামের দেনা পরিশোধ করিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তিনি বিভিন্ন অজুহাতে সুধু সময়ক্ষেপ করিতেছিলেন। মারাঠাপ্রতিনিধি তাঁহাকে ঐ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করিলে তিনি প্রত্যুত্তরে সুদীর্ঘ একটি দাবীনামা তাঁহাকে দিয়াছিলেন। তাহাতে পুনা দরবার সম্বন্ধে বহু অমূলক অনুযোগ করিয়া তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন তাঁহার নিকট হইতে মারাঠাদের কোন অর্থ পাওনা নাই; বরং উহাদের নিকট হইতে তিনি নিজেই নানা কারণ বাবদ বহু অর্থ পাইবেন। তাঁহার মিথ্যা অভিযোগের প্রত্যেকটি ধারা দৃঢ়তার সহিত খণ্ডন করিয়া নানা ফড়্ণাবিশ যে সুন্দর প্রত্যুত্তরটী দিয়াছিলেন তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। নির্লজ্জ নিজাম আলি অতঃপর মারাঠাদের অধিকাংশ দাবী বৈধ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; অন্যগুলি সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছু না বলিয়া তিনি জানাইলেন যে টিপুর সহিত সমরাবসানের পর তিনি ঐ বিষয়ে ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল যে নবলব্ধ মিত্র ইংরাজগণের দ্বারা মধ্যস্থতা করাইয়া তিনি কোনমতে মারাঠাদের প্রাপ্য অর্থ প্রদান করা ফাঁকি দিবেন।

নানা ও মহাদজী সিন্ধিয়ার বিরোধে এবং মহাদজীর মৃত্যুতে (১২।২।১৭৯৪) নিজাম আলি প্রহৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন অতঃপর তাঁহার বিরুদ্ধে মারাঠারা আর সম্মিলিত হইতে পারিবে না; সুতরাং তাহাদের দাবী মিটাইবার প্রয়োজন নাই। রেমঁর পরাক্রান্ত ব্রিগেডের প্রতি প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া নিজাম ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে মারাঠাদের সহিত বলপরীক্ষায় লিপ্ত হইয়াছিলেন।

মারাঠাদূত গোবিন্দরাও দরবারে দাবীর কথা পুনরায় তুলিলে উজীর মুশির-উল-মুলকের সহিত তাঁহার তীব্র বচসা হইয়া গেল। মন্ত্রী মহাশয় মহাক্রোধে বলিয়া বসিলেন যে তাঁহার জটিল হিসাব বুঝাইয়া দিবার জন্য স্বয়ং নানার হায়দ্রাবাদে আসা প্রয়োজন। গোবিন্দরাওয়ের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।—"তাঁহার অনেক কাজ। পুণা ছাড়িয়া তিনি কেমন করিয়া আসিবেন?"

ক্রুদ্ধ উজীর গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"কেমন করিয়া আসিবেন? কি করিয়া আসিতে হয় তাঁহাকে শিখাইয়া দেওয়া হইবে।"

উক্ত কটূক্তি যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। মারাঠারাও তাহা সেইভাবে লইয়াছিল। নিজাম দরবারেও যুদ্ধের নামে যথেষ্ট উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছিল। শিক্ষাদীক্ষা শৃঙ্খলাবিহীন মূর্খ উদ্ধত সৈনিকগণ (উহাদের সৈন্য বলিলে ঐ নামের অবমাননা করা হয়) সর্ব্বদা বৃথা বাগাড়ম্বর এবং অনুপস্থিত কটু প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে কদর্য্য কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিল। মূর্খ স্তাবকবৃন্দের তাণ্ডবোল্লাসে দরবার কক্ষ মুহুর্মুহু প্রকম্পিত হইতে লাগিল। এমন কি স্বয়ং উজীর মহাশয় পর্য্যন্ত ভদ্রতা এবং সভ্যতার সকল মাত্রা বিস্মৃত হইয়া প্রকাশ্য দরবারমধ্যে ঘোষণা করিলেন

"এতদিনে মোগল বীরগণ উদ্ধত দস্যুদিগের ধৃষ্টতার সমুচিত শিক্ষা দিয়া ছাড়িবে। খান্দেশ এবং বিজাপুর পুনরুদ্ধার না করিয়া আমরা প্রতিনিবৃত্ত হইব না। পেশবাকে কৌপীন পরাইয়া এবং হাতে কমণ্ডলু দিয়া গঙ্গাতটে বসিয়া পূজাপাঠ করিবার জন্য আমরা কাশীতে পাঠাইয়া দিব!"

মারাঠা রাজধানীতেও সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছিল। দৌলৎরাও সিন্ধিয়া এবং তুকোজীরাও হোলকর উভয়েই সে সময় পুণাতে উপস্থিত ছিলেন। নাগপুর হইতে ভোঁসলাও সসৈন্যে তথায় আগমন করিলেন। বরোদা হইতে গাইকবাড় তাঁহার সেনাদল পাঠাইলেন। পটবর্দ্ধন, ভিঞ্চুরকর, নিম্বলকর, রাস্তিয়া, ঘাটুগে, দফলে, পাবার প্রমুখ প্রখ্যাতনামা সর্দ্দারগণ নিজ নিজ অনুচরবৃন্দসহ পেশবার বিজয় বৈজয়ন্তী তলে সমবেত হইতে লাগিলেন। লুণ্ঠনলোলুপ দশসহস্র পিণ্ডারী ভিন্ন মারাঠা পক্ষে প্রায় ১৩০,০০০ সৈন্য সমুপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে পেশবার নিজের অথবা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার অধীনস্থ জায়গীরদারগণের সৈন্য সংখ্যা উহার প্রায় অর্দ্ধেক ছিল। সিন্ধিয়া পঁচিশ, ভোঁসলা পনের, হোলকর দশ এবং প্রধান সেনাপতি পরশুরামরাও সাত হাজার সৈন্য দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সিন্ধিয়ার পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষিত সিপাহীসেনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। পুণাতে দৌলৎরাওয়ের নিকট এ সময় পের্ঁর প্রথম ব্রিগেডের দশ, কর্ণেল মাইকেল ফিলোজের ব্রিগেডের পাঁচ এবং কর্ণেল জন হেসিঙ্গের তিন হাজার সৈন্য ছিল। উহারা সকলেই অভিযানে প্রেরিত হইয়াছিল। শ্চোভালিয়ে দুদ্রেনেক এবং মেজর বয়েড কর্ত্তৃক গঠিত হোলকরের শিক্ষিত ব্যাটালিয়নসমূহ তাঁহার বাহিনী মধ্যে ছিল। জাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে পেশবার নেতৃত্বে মারাঠাদের ইহাই শেষ সমবেত প্রচেষ্টা।

নিজামের লক্ষাধিক সৈনিকের মধ্যে ৮০০০০ অনিয়মিত পদাতিক এবং ২৫০০০ অশ্বারোহী ছিল। রেমঁর প্রায় ১১০০০ সৈনিক অভিযানে উপস্থিত ছিল। তদ্ভিন্ন কর্ণেল বয়েড এবং কর্ণেল ফিঙ্গলাসের অধীনে নিজাম আলির আরও যে দুই কোর শিক্ষিত পদাতিক ছিল তাহারাও ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। মোটের উপর উভয় পক্ষ সামরিক শক্তিতে পরস্পরের সমতুল্য ছিল বলা চলে। উভয় সেনাদলে ইউরোপীয় সৈনিকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। রেমঁর বিভিন্ন রেজিমেণ্টের সৈন্যসংখ্যা এবং অধিনায়কের নাম এই প্রকার পাওয়া গিয়াছে—

১ম রেজিমেণ্ট	ম্যাসিয় মিলার	৮৫০
২য় ,,	,, পির্ঁ	৮০০
৩য় ,,	,, মুরার	৬৪০
৪র্থ ,,	,, কাষ্টাঁ	৯৪০
৫ম ,,	,, ভালহিয়াদ	৯১০
৬ষ্ঠ ,,	,, শেমিৎ	৮৭০
৭ম ,,	,, লা বেগ্নি	৮৪০
৮ম ,,	,, গোভ্যাঁ	৮৬০
৯ম ,,	শূন্য; সার্জ্জেণ্ট-মেজর অধ্যক্ষতা করিতেছেন	৮৭০
১০ম ,,	ম্যাসিয় সালমেন	৭৫০
১১শ ,,	,, ভার্দ্দিভেল	৭৬০
১২শ ,,	,, দেভার্ণিকুর	৬৫০
১৩শ ,,	,, লে তেলিয়ে	৫২০
১৪শ ,,	,, লেজুমে	৭৩০
অশ্বারোহী (দেশীয় নিয়মিত) ম্যাসিয় মাজিওনি		৮০
সেনাপতির দল (এক প্রকারের দেহরক্ষী সেনা)		৭০
	মোট সৈন্য সংখ্যা	১০৮৪০

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে মোগল সেনা যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল। তাহার কয়েক দিন পরে পেশবাও পুণা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রসদের সুবিধার জন্য মারাঠারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে আগুয়ান হইয়াছিল। ১০ই মার্চ্চ তারিখে নিজামী বাহিনী খড়দা নামক স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছিল। এদিকে মারাঠারা অদূরে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল। উচ্চ শৈলপৃষ্ঠে স্বীয় তোপখানা সন্নিবেশ করিয়া পের্ঁ পুরিন্দা গিরিসঙ্কটের নিম্নভূমে অশ্বারোহী এবং পদাতিকদল স্থাপন করিয়া বিপক্ষের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

১২ই মার্চ্চ তারিখে ইতিহাস প্রসিদ্ধ খড়দা-যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। মোগলসেনা যখন সঙ্কীর্ণ গিরিপথ যোগে

খড়দা হইতে পুরিন্দা যাইতেছিল তখন মারাঠারা তাহাদের দক্ষিণ প্রান্তে দেখা দিয়াছিল। পরশুরামরাও কয়েক জন সর্দ্দারের সহিত চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। মারাঠাদের দেখিবা মাত্র মোগলরা আক্রমণে অগ্রসর হইল। পরশুরাম অধিকদুর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই একদল পাঠান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। উহাদের অধ্যক্ষ লাল খাঁ স্বহস্তে তাঁহার কয়েক জন দেহরক্ষীকে বিনাশ করিয়া তাঁহাকেও আহত এবং অশ্বচ্যুত করিয়াছিল। পিতার দুর্দ্দশাদৃষ্টে রাওসাহেবের জ্যেষ্ঠপুত্র বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া আসিয়া আক্রমণকারিকে বিনাশ না করিলে কিছুতেই তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইত না। সেনানায়কের পতনে মোগলরা প্রতিনিবৃত্ত হইল না; বরং তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্যই যেন অধিকতর তেজের সহিত প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিল। সে বেগ রোধ করিতে না পারিয়া মারাঠাবাহিনীর দক্ষিণ প্রান্ত বিপর্য্যস্তভাবে পশ্চাৎপদ হইল। সঙ্গে সঙ্গে রেমঁর সৈন্যগণের আক্রমণে কেন্দ্রদেশও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। স্বধু বামপ্রান্তে পেরঁর শিক্ষিত পদাতিকগণ বিপক্ষের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া দৃঢ়পদে অচঞ্চল রহিল। পলাতকগণ উহাদের পশ্চাতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। বিজয়োদ্দীপ্ত রেমঁর সৈন্যদল অতঃপর উহাদের আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিল। পেরঁ উহাদের কতকটা কাছে আসিতে দিয়াছিলেন। অকস্মাৎ শৈলগাত্রে লুক্কায়িত তাঁহার তোপখানা এক সঙ্গে শতমুখে অগ্নি উদ্‌গিরণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে মারাঠারাও অগ্রগমননিরত বিপক্ষের সওয়ারদিগের উপর "রকেট" * ছাড়িল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সুবিপুল মোগলবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। রেমঁর সৈনিকগণ কিন্তু শত্রুর প্রচণ্ড লৌহবৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া পূর্ব্ববৎ আগুয়ান হইতে লাগিল। সংগ্রাম ক্রমে এইরূপে দুই ফরাসী সেনানায়কের মধ্যে দ্বৈতযুদ্ধে পরিণত হইল। তন্মধ্যে একজন সংকীর্ণ গিরিপথ অধিকার এবং অন্যজন তাহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাহার কিরূপ ফল দাঁড়াইত বলা যায় না। কিন্তু ভীরু, দুর্ব্বলচিত্ত, অশীতিপর বৃদ্ধ নিজাম আলির জন্য সব পণ্ড হইল। তখনকার দিনের অন্যান্য সকলের মত তাঁহারও অশ্বারোহী সেনার প্রতি প্রধানতঃ আস্থা ছিল। উহাদের পলায়নপর দেখিয়া তাঁহার আশঙ্কা উদ্বেগের অবধি রহিল না। মুসলমানী প্রথামত তিনি আবার হারেম সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। সুতরাং নিজের এবং বেগমমণ্ডলীর নিরাপত্তার চিন্তা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। বিপদের সময় তিনি নবগঠিত পদাতিক বাহিনীর প্রতি নির্ভর করিতে পারিলেন না। অশ্বারোহীদের রণে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া তিনিও কর্দ্দালা অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং রেমঁর নিকট যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে কোন নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া রক্ষা করিবার জন্য বারম্বার সকাতর অনুনয় বিনয় করিয়া পাঠাইতেছিলেন। রেমঁ আর কি করিবেন? তিনি আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। বিষম অনিচ্ছার সহিত সংগ্রামে ক্ষান্ত হইয়া তিনি প্রভুর অনুসরণ করিয়াছিলেন।

পরদিবস পুনরায় বলপরীক্ষা করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু রাত্রির মধ্যে ঘটনাচক্রে মোগলবাহিনীর প্রত্যাবর্ত্তন ধ্বংসে পরিণত হইয়াছিল। নৈশান্ধকারে চরাচর পরিব্যাপ্ত হইলে পরস্পর সংযোগবিহীন, মোগল সেনার বিচ্ছিন্ন অংশসমূহের মধ্যে গোলযোগ বিশৃঙ্খলা শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। রেমঁর দল ভিন্ন আর কোথাও বশ্যতা বা শৃঙ্খলার লেশ মাত্র ছিল না। শ্রান্ত ক্লান্ত সৈনিকগণ যে যেখানে পারিল দিবসের প্রতীক্ষায় ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। গভীর রাত্রে দৈবক্রমে কয়েকজন মারাঠা সৈনিক ক্ষুদ্র একটি তটিনীতে তাহাদের অশ্বগুলিকে জলপান করাইতে লইয়া গিয়াছিল। অদূরে কয়েকজন মোগল শুইয়াছিল। অন্ধকারে শত্রু সমাগম দেখিয়া তাহারা সভয়ে বন্দুক ছুড়িয়া বসিল। তখন এক বিপর্য্যয় কাণ্ড বাধিয়া গেল। রেমঁর সৈনিকগণ নিকটেই গুলিভরা বন্দুক মাথায় দিয়া শয়ন করিয়াছিল। অকস্মাৎ গুলি-বৃষ্টির শব্দে সুপ্তোত্থিত সিপাহীগণ নিজেদের শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত মনে করিয়া দিগবিদিগজ্ঞানশূন্য হইয়া বন্দুক ছুড়িতে লাগিল। অনন্তর

* একপ্রকার ক্ষুদ্রাকৃতি আগ্নেয়াস্ত্র; তখনকার দিনে ইহার বহুল প্রচলন ছিল।

অন্ধকারে যে প্রলয়কাণ্ড বাধিয়া গেল তাহা সহজেই অনুভাব্য। মনুষ্যের সাতঙ্কচীৎকার, অশ্বের হ্রেষারব ও দ্রুতধাবনজনিত পদধ্বনি, হস্তীর বৃংহিত, ভারবাহী বলীবর্দ্দসমূহের আর্ত্তরব, বন্দুকের গুরুগম্ভীর নির্ঘোষ অন্ধকার নিশীথিনীর ভীষণতা শতগুণ ভীষণতর করিয়া তুলিল। ভীত সৈনিকগণ বারকয়েক গুলি ছুড়িয়াই যে যেদিকে পারিল পলায়ন আরম্ভ করিল। নিজাম আলির আর সে অঞ্চলে তিষ্ঠিতে সাহস হইল না। তিনি কর্দ্দালা দুর্গপ্রাচীরের অন্তরালে আশ্রয় লইতে গমন করিলেন। বাত্যাতাড়িত শুষ্ক পত্ররাশির মত তাঁহার বিশাল অনীকিনী যে কোথায় বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল তাহার কোন নিদর্শন রহিল না। পরদিবস তাহা দেখিয়া মারাঠাদের উল্লাসের অবধি রহিল না। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দুর্গ পর্য্যন্ত বহু ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া বিক্ষিপ্ত শত্রুসেনা-পরিত্যক্ত যাবতীয় দ্রব্যাদি তাহাদের হস্তগত হইল। মধুগন্ধলুব্ধ মক্ষিকার মত দূর দূরান্তর হইতে কত বিভিন্ন মারাঠাদল যে আশু তথায় আসিয়া সমুপস্থিত হইল কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? তাহার পর যখন সকলে দেখিল যে কর্দ্দালার জীর্ণ প্রাচীরের অন্তরালে মুষ্টিমেয় অনুচরসহ স্বয়ং শত্রুনরপতি অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন তখন আর তাহাদের আনন্দ উদ্দীপনা বাধা মানিল না। মহোৎসাহে তোপমঞ্চ বাঁধিয়া পের্ঁ দুর্গের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। রেমঁও তাহাকে প্রাণপণে বাধাদানে সচেষ্ট হইলেন।

কিছুতেই কিছু হইল না। দুইদিন ধরিয়া হতাশভাবে গোলা বৃষ্টি সহ্য করিয়া নিজাম সন্ধির জন্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল তাহাতে নিজাম আলি যথেষ্ট হীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। উত্তরে তাপ্তী নদী হইতে দক্ষিণে পুরিন্দা পর্য্যন্ত সমগ্র জনপদ এবং বক্রী চৌথ ও যুদ্ধ ব্যয়স্বরূপ তিন ক্রোর টাকা মারাঠারা লাভ করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন "ঘাস দানা" নামক কর বাবদ নগদ ২৯ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা আয়ের ভূখণ্ড নিজাম রঘুজী ভোঁসলাকে দিয়াছিলেন। সর্ত্ত পালনের প্রতিভূস্বরূপ তাঁহার উজীর সকল অনর্থের মূল মুসীর-উল-ওমরা মারাঠাকরে সমর্পিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে এই প্রস্তাবে নিজাম প্রথমে কিছুতে সম্মত হন নাই। স্বয়ং উজীরই তাঁহাকে বুঝাইয়া রাজি করাইয়াছিলেন, তিনি নাকি প্রভুকে বলিয়াছিলেন যে তখন তাঁহাদের যে প্রকার অবস্থা তাহাতে তাঁহারা নিতান্ত অল্প ত্যাগস্বীকার করিয়াই পরিত্রাণ পাইতেছেন, সুতরাং তাঁহাকে মারাঠাদের নিকট প্রদান করিতে নিজামের সঙ্কোচের কোন কারণ নাই। এ কথা সত্য হইলে বলা প্রয়োজন যে মন্ত্রিমহাশয় নিতান্ত নির্গুণ ছিলেন না। পেশবাকে তিনি যে অপমান করিয়াছিলেন তাহাতে মারাঠাদের নিকট হইতে তাঁহার বিন্দুমাত্র সদয় ব্যবহার প্রত্যাশা করিবার কথা নহে। তরুণ পেশবা কিন্তু বৈরনির্য্যাতনপরতন্ত্র হইয়া পতিত শত্রুর প্রতি কোন দুর্ব্যবহার করেন নাই। চতুর্দ্দিকে আনন্দোৎসবের মধ্যে তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া ফড়ণাবিশ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মধুরাও উত্তর দিয়াছিলেন, 'মোগলদের লজ্জাকর হীনতা এবং অনায়াসলব্ধ বিজয়ে আমাদের উদ্দাম উল্লাস,—উভয়পক্ষের এই শোচনীয় অধঃপতন আমার পক্ষে নিতান্ত মর্ম্মপীড়াদায়ক হইয়াছে।" *

বাস্তবিক সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ফললাভ ইতিহাসে অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। খড়দায় প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই, হইয়াছিল তাহার একটা অভিনয় মাত্র। রাত্রির এবং পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহে বহু নিজামীসেনা প্রাণ হারাইলেও প্রকৃত যেটুকু যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে উভয়পক্ষে দুই শতের অধিক লোকক্ষয় হয় নাই। মারাঠারা যুদ্ধের ফলে যে প্রকার লাভবান হইয়াছিল তাহাতে তাহাদের উল্লসিত হইবার কথা। দীর্ঘকাল পরেও মহারাষ্ট্রের গ্রামবৃদ্ধগণ খড়দার সংগ্রামে উপস্থিত ছিল বলিয়া আত্মশ্লাঘানুভব করিত।

* খড়দা যুদ্ধের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা গ্রাণ্ট-ডফের গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। Poona Residency Correspondence, Vol. IV. 178-181A, 184, 189, 212, সংখ্যক পত্রেও তাহার বিশদ বিবরণ দ্রষ্টব্য। যুদ্ধে রেমঁর ৫ জন ইউরোপীয় সৈনিক প্রাণ হারাইয়াছিলেন; অফিসরদের মধ্যে কেহ হতাহত হয় নাই। রেমঁ ২রা মে তারিখে হায়দ্রাবাদ নগরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

যুদ্ধের সময় ইংরাজরা নিজামকে রাজ্যমধ্যে শান্তিরক্ষা কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্ত দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য ধার দিয়াছিলেন। উহা নিরপেক্ষতা নীতি বিরুদ্ধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু নিজাম আলি উঁহাদের নিকট হইতে আরও বেশী সাহায্য প্রাপ্তির আশা করিতেন। সুতরাং তাঁহাদের আচরণ তাঁহার নিকট বিশ্বাস ভঙ্গের নামান্তর বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। হায়দ্রাবাদে ফিরিয়া আসিয়া মহাক্রোধে তিনি ইংরাজ সেনাদলকে বিদায় দিয়া রেমঁর প্রতি তাঁহার বাহিনী বিবর্দ্ধনের আদেশ দিয়াছিলেন। ইংরাজ রেসিডেণ্ট কার্কপ্যাট্রিকের সকল অনুরোধ উপরোধ ব্যর্থ হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রতি অনুকূল উজীর মুসীর-উল-ওমরার অন্তর্দ্ধান দরবারে বৃটীশ প্রভাব হ্রাসের অন্যতম কারণ ছিল। ক্রমবর্দ্ধমান ফরাসী প্রতিপত্তিতে তাহা এক-কালে বিলুপ্ত হইবে বলিয়াই প্রতীত হইতেছিল।

ইংরাজদিগের সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সৈন্যগণ নিজাম রাজ্যসীমা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহাতে নিজাম আলি তাহাদের পুনরাহ্বান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উত্তরাধিকারী আলিজাহ্ এই সময় বিদ্রোহী হইয়াছিলেন (জুন ১৭৯৮)। দরবারের নেতৃস্থানীয় অনেকে তাঁহার পক্ষে যোগ দিয়াছিল। টিপুর সহিতও নবাবজাদার আলাপ-আলোচনা হইতে লাগিল। বিগত সমরে মোগল অশ্বারোহী-গণের ব্যর্থতায় ক্রুদ্ধ হইয়া নিজাম একদিনে লক্ষাধিক সৈনিককে বরখাস্ত করিয়াছিলেন। উঁহাদের মধ্যে অনেকে বিদ্রোহে যোগ দিয়া নবাবজাদার বলপুষ্টি করিয়াছিল। নিজাম আলি রেমঁর প্রতি বিদ্রোহ দমনের ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। বৃটীশ ব্যাটালিয়ন দুইটি রাজ্যের অন্যত্র শান্তিরক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত রহিল। "বিদ্রোহ প্রশমনে রেমঁকে বিশেষ আয়াস পাইতে হয় নাই। সামান্য খণ্ড-যুদ্ধের পর নবাবজাদার অনুচরবৃন্দ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছিল এবং তিনি স্বয়ং আওরঙ্গাবাদে আশ্রয় লইয়া-ছিলেন।" * কম্‌টন কিন্তু কতকটা অন্য ধরণের কথা লিখিয়া গিয়াছেন;—"রেমঁ বিদ্রোহীগণের নিকট হইতে বিষম বাধা পাইয়াছিলেন এবং বাপতিস্ত নামক তাঁহার সহকারীকে সত্বর আসিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া বলপুষ্টি করিলে রেমঁ আলিজাহকে বন্দী করিয়া অভিযান সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন।" ‡ নবাবজাদাকে পিতৃসন্নিধানে লইয়া যাইবার সময় উজীরের আদেশে হাওদার চারিধার কাণাৎ দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ক্রুদ্ধ পিতার সম্মুখীন হইবার আশঙ্কা, তাহার উপর এ অপমান বন্দী নবাবজাদার মরমে বিঁধিল। তিনি গরল ভক্ষণে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ইহার পর রেমঁ মাত্র তিন বৎসর জীবিত ছিলেন। নিজামদরবারে তাঁহার ত্রয়োদশবর্ষব্যাপী কর্ম্মজীবনের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মহিশুর এবং মারাঠাসমর ভিন্ন অপর কোন যুদ্ধে তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হয় নাই। তাঁহার দেহান্ত-কালে সেনাদলে ১৫০০০ এরও অধিক সুশিক্ষিত সৈনিক ছিল। রাজপুত, জাঠ, পশ্চিমাব্রাহ্মণ, ছেত্রি, পাঞ্জাবী মুসলমান প্রভৃতি হিন্দুস্থানের সমরব্যবসায়ী জাতিবৃন্দ হইতে সংগৃহীত দিবইনের সিপাহীগণের সহিত শারীরিক উৎকর্ষে তুলনীয় না হইলেও রেমঁর তেলেঙ্গারা শিক্ষাদীক্ষা এবং শৌর্য্যবীর্যে উঁহাদের অপেক্ষা কোন অংশে অপকৃষ্ট ছিল না। গোলন্দাজবাহিনীও ইহাদের অনুরূপ ছিল। সৈনিকগণের অস্ত্র, সাজসরঞ্জাম সব কিছুই রেমঁর তত্ত্বাবধানে নিজস্ব কারখানায় নির্ম্মিত হইত। রাষ্ট্রবিপ্লবের বিখ্যাত ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা তিনি সেনাদলের কেতনরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিপাহীগণের উর্দ্দিতে বৈপ্লবিক চিহ্ন স্বাধীনতার শিরস্ত্রাণ (Cap of Liberty) অঙ্কিত থাকিত। ব্রিগেডের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নিজাম তাঁহাকে বার্ষিক ৫২ লক্ষ টাকা আয়ের জায়গীর দিয়া-ছিলেন। সুবিপুল নগদ বেতন ভিন্ন তাঁহার নিজস্ব জায়গীরের আয় ছিল লক্ষাধিক টাকা। কাণ্টনমেণ্টে রেমঁ রাজোচিতভাবে সম্বর্দ্ধিত হইতেন। স্বয়ং নিজাম আলির জন্য যতগুলি সম্মানসূচক কামান দাগা হইত তাঁহার তোপ

* Malleson :—Final French struggles in India, p. 243.

‡ Compton :—Europeàn Military Adventurers of Hindustans, p. 383,

সংখ্যাও ততগুলিই ছিল। রেম পদোচিত আড়ম্বরের সহিত বাস করিতেন। কথিত আছে তখনকার দিনে এদেশে অর্থবিনিময়ে ইউরোপীয়ের পক্ষে লভ্য সকল ভোগ-সুখের উপকরণ তিনি নিজ প্রাসাদমধ্যে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

রেমঁর অগাধ শক্তি তাঁহাকে নিজাম রাজ্যের প্রকৃত অধীশ্বরে পরিণত করিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সময় যদি নিজাম আলির দেহান্ত হইত তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে যাহাকে ইচ্ছা সিংহাসনে বসান বিন্দুমাত্র আয়াসসাধ্য হইত না। তাঁহার সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আজ্ঞাবহ ছিল। তিনি উহাদের নিজাম কর্তৃক রক্ষিত ফরাসী সেনা-বিভাগের অংশ বিবেচনা করিতেন।

বলা বাহুল্য রেমঁর শক্তি এবং প্রভাব প্রতিপত্তি ইংরাজদিগের প্রীতিকর হয় নাই। নিজাম দরবারে তাঁহার অভ্যুদয় উহাঁরা নিজেদের স্বার্থের বিষম পরিপন্থী মনে করিতেন। ফরাসীপ্রভাব কতকটা খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই কিছুকাল পরে তাঁহারা নিজাম আলির নিকট তাঁহাদের প্রতি অনুকুল ভাবাপন্ন অফিসর-পরিচালিত আরও দুইটি পৃথক "কোর" (corps) গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি ইহাতে সন্তুষ্টই হইলেন; প্রথমতঃ শিক্ষিত সেনা লাভ এবং দ্বিতীয়তঃ রেমঁকে কতকটা আয়ত্বে রাখার সম্ভাবনা ইহাতে ছিল। কর্ণেল G. P. Boyd এবং কর্ণেল ফিঙ্গলাসের নেতৃত্বে এইরূপে আরও দুইটি ব্রিগেড গঠিত হইয়াছিল। বয়েডের প্রথম জীবন সম্বন্ধে কিছু জানা নাই। ঐ ব্যক্তি জাতিতে মার্কিণ ছিলেন। ১৮০০ অভিজ্ঞ সৈনিক লইয়া পূর্ব্ব হইতে গঠিত তাঁহার নিজস্ব একটি দল ছিল। নিজাম আলি তাঁহাকে বেতনদানে কর্ম্মে পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্দ্দালার যুদ্ধে তিনি অংশ লইয়াছিলেন। পর বৎসর একবার গুজব উঠিয়াছিল যে রেমঁ বৃটীশ রেসিডেন্সী আক্রমণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহাতে বয়েড এবং ফিঙ্গলাস তৎক্ষণাৎ ইংরাজদিগের স্বার্থরক্ষাকল্পে তাঁহাকে বাধাদানের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ব্যাপারটি আর অধিক অগ্রসর না হইয়া ঐখানেই পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। কয়েক মাস পরে নিজাম দরবারের সহিত বয়েডের মনোমালিন্যের সঞ্চার হয়। রেমঁর তাহাতে প্ররোচনা থাকা অসম্ভব নহে। অতঃপর বয়েড নিজ ব্রিগেড-সহ পেশবার কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মধুরাওয়ের শোচনীয় আত্মহত্যার পরবর্ত্তী ঘটনা সমূহে, বিশেষতঃ দ্বিতীয় বাজিরাওকে গদীতে বসাইতে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন (অক্টোবর ১৭৯৬)। পর বৎসর তিনি পেশবার নিয়মিত বাহিনীর অধ্যক্ষতা লাভ করেন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে পুণার কতকগুলি স্থানীয় বিদ্রোহ প্রশমনে তাঁহার শেষ উল্লেখ দেখা যায়। দেশীয় মহলে বয়েড "বাইট সাহেব" নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার ব্রিগেডের লোক সংখ্যা ছিল মোট ১৬৮৩; উহাদের জন্য পেশবার মাসিক ব্যয় হইত ২৬৪৪২৲ টাকা; তন্মধ্যে বয়েডের নিজের বেতন ছিল তিন হাজার টাকা। অন্যান্য সেনানীগণের দলের বেতনের হারের সহিত তুলনার জন্য এখানে তালিকার কতকাংশ প্রদত্ত হইল।* দেখা যাইবে রেমঁর বাহিনীতে প্রদত্ত বেতন অপেক্ষা পেশবার দলের বেতন অনেক লোভনীয় ছিল।—

কাপ্তেন (২ জন)	প্রত্যেকে	মাসিক	৪৫০৲ টাকা
লেফটেনাণ্ট (৪ জন)	,,	,,	২৫০৲
সার্জ্জেণ্ট (৩ জন)	,,	,,	৯০৲
সুবেদার (১৪)	,,	,,	৫০৲
কুমেদান (২)	,,	,,	৮০৲
হাবিলদার (৫৫)	,,	,,	১৮৲
ঐ (আর ৪ জন)	,,	,,	১৫৲
নায়েক (৩৬)	,,	,,	১২৲
ঐ (আর ২ জন)	,,	,,	১৪৲
তাম্বুরচি (৬)	,,	,,	২০৲
ভেরিবাদক (২)	,,	,,	২০৲
বংশীবাদক (৬)	,,	,,	২০৲
জয়ঢাক বাদক (৭)	,,	,,	১২৲
পতাকা বাহক (৫)	,,	,,	১২৲

* Peshwa's Diaries, vol. V, pp. 184-187.

মশাল বাহক (৬)	প্রত্যেকে মাসিক	৬৲ টাকা
ভিস্তি (১৪)	,, ,,	৬৲
স্কাউট (৭)		৮৲
ঢালবাহক (২জন)		৬৲
কেরাণী (৩ জন)		৪০৲
তোপখানা :—		
পর্ত্তুগীজ (৮)		৬০৲
জমাদার (২)		৩০৲
হাবিলদার (২)		১৮৲
গোলন্দাজ (৪২)		১২৲
খালাসী (২৪)		১০৲
ছুতার (৫)	,,	১২৲
ঐ (আর ৪ জন)	,,	১০॥০
কামার (৮)	,, ,,	১১৲
বেলদার (১০)	,, ,,	৮৲
(বিলদার অর্থাৎ লস্কর বা শিবিরের পরিচারক)	,,	৯৲
কারখানার জমাদার	,, ,,	৩০৲
পর্ত্তুগীজ বন্দুকধারী (২০)	,,	২০৲
সাধারণ সিপাহী	,,	
অশ্বারোহী সৈনিক (১৫)	,,	৩৫৲
,, ,, জমাদার (১)	,,	

বয়েড সম্বন্ধে আর কোন কথা জানা যায় না। ফিঙ্গলাস জাতিতে ইংরাজ এবং এক কালে কোম্পানীর ১৯শ-সংখ্যক ড্রাগুন দলে কোয়ার্টার-মাষ্টার সার্জ্জেণ্ট ছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কোরে মাত্র ৮০০ সৈনিক ছিল। খড়দায় উহাদের উপস্থিতির কথা বলিয়াছি। তিন বৎসর পরে উহার সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ৬০০০ হাজারে পরিণত হইয়াছিল। রেমঁর সেনাদল ধ্বংসের পর উহাদের রাখিবার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে বলিয়া কথা উঠিলেও শেষ পর্য্যন্ত ওয়েলেসলির আদেশে নিজাম উহাদের পোষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফিঙ্গলাসের দলের অফিসরগণের নামের তালিকামধ্যে ইংরাজ, স্কচ, আইরিস, পর্ত্তুগীজ, গোয়ানিজ, স্পেনিয়ার্ড, ওলন্দাজ, জর্ম্মণ, ইউরেশীয় প্রভৃতি বহু বিভিন্ন জাতীয়ের সমাবেশ দেখা যায়। পাঠক ইচ্ছা করিলে Col. Briggs. রচিত "Our Faithful Ally the Nizam" গ্রন্থে উহাদের অনেকের নাম দেখিতে পারেন।

ইংরাজ লেখকগণ বলিয়া থাকেন রেমঁ অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং কুচক্রী ছিলেন; লোকচিত্তানুরঞ্জনকারী সুভদ্র আচরণের অন্তরাল হইতে নিজ গোপন উদ্দেশ্য সাধনের কলাবিদ্যাটি তিনি ভাল করিয়া আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে তিনি ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্র, মহিশুরের টিপু সুলতান এবং সিন্ধিয়ার ইউরোপীয় সেনানীবর্গের সহিত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন এবং উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়ে নিজাম আলির নিকট হইতে কড়াপাজেলা জায়গীর লাভে চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কারণ উক্ত প্রদেশ অধিকারে থাকিলে ভবিষ্যতে ইউরোপ হইতে সমাগত ফরাসী অভিযানের তথায় অবতরণ এবং সহযোগিতা সুগম হইত। কড়াপা প্রদেশ পূর্ব্বে মহিশুর রাজ্যভুক্ত ছিল। বিগত সমরে লব্ধ রাজ্য বণ্টন কালে উহা নিজামের ভাগে পড়িয়াছিল। রেমঁকে উহা দিতে তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু ইংরাজরা তাহাতে বাদ সাধিলেন। নিজাম আলিকে তাঁহারা বলিলেন বরং তাঁহারা উহা আক্রমণ করিয়া অধিকার করিবেন তথাপি রেমঁকে দেওয়া কোন মতে সহ্য করিবেন না। বলাবাহুল্য ভীতিপ্রদর্শন কার্য্যকর হইয়াছিল।

ইংরাজ লেখকগণ বলেন রেমঁ পন্দিচেরীর ফরাসী বন্দীগণকে কোম্পানীর অনেক সিপাহীকে এমন কি খাস বৃটিশ সৈনিকদিগকেও প্রলোভন দানে ভাঙ্গাইয়া লইতেন।* তিনি নাকি নিয়মিতভাবে ঐ কার্য্য করিতেন। মারপিলি এবং কম্বমের পথে মান্দ্রাজ অঞ্চল হইতে পলাতকগণ হায়দ্রাবাদে পৌছিত। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে একবার তাঁহার অন্যতম অফিসর তেলহাদ মান্দ্রাজ যাইবার পথে গুণ্টুর গিয়াছিলেন। ইংরাজদিগের সন্দেহ হইল যে, তিনি সৈনিক ভাঙ্গাইতে আসিয়াছেন। উহাঁরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধৃত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিল। পরে নিজামের বিশেষ সুপারিশে ঐ ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিয়াছিল। তেলহাদের বন্দীত্বের সংবাদ

* Malcolm : India, p. 176

প্রাপ্তিমাত্র রেমঁ হায়দ্রাবাদস্থ বৃটিশ রেসিডেণ্ট কার্কপ্যা-ট্রিককে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন,—

হায়দ্রাবাদ, ২১শে এপ্রিল ১৭৯৬

মহাশয়,

আপনি আমাকে আপনার মনোভাবসমূহের সহিত সুপরিচিত বিবেচনা করিলেও আমি কিন্তু সে বিষয়ে আমাকে নিরপরাধ বলিয়া মনে করি। ম্যসিয় তেলহাদের মান্দ্রাজ গমনের যে অপব্যাখা করা হইয়াছে সে সম্বন্ধেও আমি নিরপরাধ। নৃপতির স্বার্থ ভিন্ন অপর কোন উদ্দেশ্য তাঁহাকে তথায় লইয়া যায় নাই। ভবদীয় সম্মতিক্রমে ম্যসিয় দে লা হের প্রতি যে কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছিল তাহা তিনি সম্পূর্ণ সমাপ্ত না করায় তাহা সামাধা করিতে যাইবার জন্য ম্যসিয় তেলহাদ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হইয়াছে। এ সকল কথা আমি অদ্য প্রভাতে নবাব মীর আলমের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম। মহাশয়, আপনাকে আমি দুইটি কথায় ব্যাপারটি বলিতেছি; আপনি যাহা অবগত আছেন তাহা অপেক্ষা ভাল করিয়াই জানাইয়া দিতেছি। এই সময়ের মধ্যে আমি কামান, বন্দুক, বস্ত্রাদি কিনিবার জন্য ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা পাইয়াছি, যাহা গভর্ণমেণ্ট নৃপতিকে প্রদান করিয়াছেন। উক্ত অর্থের কিয়দংশ ব্যয় হইয়া গিয়াছে (ইহাই দুর্ভাগ্য)। পরিশেষে, অর্থাভাবে কামানসমূহ প্রাপ্তি সম্ভব হইল না এবং সরকার আমাকে হিসাব দিতে বাধ্য করায় আমি তাহা নিজে প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছি। সে কারণ আমি ম্যসিয় তেলহাদকে মান্দ্রাজ যাইয়া হিসাবনিকাশ করিতে এবং মহাশয়ের প্রতিনিধির আচরণ সাফাই করিতে লিখিয়াছিলাম।

হায়, মহাশয়! আমি একটি কোর পরিচালনা করিয়া থাকি, তাহার অফিসরগণ সকলেই সম্মানার্হ ব্যক্তি; আত্মসম্মান সম্বন্ধে তাঁহারা যে প্রকার অবহিত সেরূপ আর কিছুতে নহেন। তাঁহাদের সহকর্মী ঘৃণ্য অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া গুণ্টুরে বন্দী হইয়া রহিয়াছেন, ইহাতে তাঁহারা যে প্রকার চাঞ্চল্যের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন সে অভিজ্ঞতা তাঁহাদের ইতিপূর্ব্বে কখনও হয় নাই। মহাশয়, আপনি কি আমাকে স্বান্তনার কিছু কারণ দিবেন, আমাকে এমন এক-জন অফিসর দিবেন যাঁহার সাহস এবং সততা নৃপতির, (আপনাদের মিত্র) পক্ষে কার্য্যকর হইয়াছে এবং যদি আবশ্যক বিবেচনা করেন তাহা হইলে আদেশ দিবেন যে নারপেলি, মান্দ্রাজ এবং পন্দিচেরীতে আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে সবই বাজেয়াপ্ত, হস্তচ্যুত হউক? সরকার আমার প্রতি বিশ্বাস করিয়া যে অর্থ গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন আমি অকুণ্ঠিত ভাবে তাহা প্রত্যর্পণ করিব। নৃপতির কার্য্যে যুদ্ধযাত্রা করিবার আদেশসহ উক্ত অপ্রীতিকর সংবাদ অদ্য প্রাতে আমি পাইয়াছি। মহাশয়, আমি আশা করি আপনি ম্যসিয় তেলহাদের তাঁহার কোরে প্রত্যাবর্ত্তন অনুমোদন করিতে ইচ্ছা করিবেন, আমাকে একখানি পত্রপ্রেরণের দ্বারা, যাহা আমি অবিলম্বে গুণ্টুরের শিবিরে পাঠাইয়া দিব। সুগভীর অধৈর্য্যের সহিত আমি আপনার এই অনুগ্রহটির প্রতীক্ষা করিতেছি। মহাশয়, আমি এক্ষণে যে অবস্থায় রহিয়াছি তাহা আপনি ঠিক বুঝিতে পারিবেন না। এই সঙ্গে আমি আপনাকে আরও জানাইতেছি যে গভীরতম শ্রদ্ধার সহিত আমি হই,

মহাশয়,

ভবদীয় নিতান্ত হীন এবং নিতান্ত বাধ্য ভৃত্য

রেমঁ

চান্দ্র শাবন, ১৩ই

১২১০

সিন্ধিয়ার কোন কোন ইউরোপীয় অফিসরের সহিতও রেমঁর পত্র ব্যবহার ছিল। কর্ণেল মাইকেল ফিলোজ প্রভুর আদেশে স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া নানা ফড়্ণাবীশকে বন্দী করিয়াছে এ সংবাদে রেমঁ তাহাকে তিরস্কার করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। (১।৩।১৭৯৮) পত্রখানি কিন্তু যথাস্থানে পৌছে নাই; পথিমধ্যে সিন্ধিয়ার চরগণের হস্তগত হইয়া তৎসকাশে নীত হইয়াছিল। সমসাময়িক "Indian Telegraph" পত্রের ১১শ সংখ্যায় উহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। মূল

খানির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং অনুবাদ কতদূর নির্ভরযোগ্য বলিবার উপায় নাই।* চিঠিখানি এইরূপ—

"মহাশয়,

ঘটনাচক্রে আমাকে ভবদীয় স্মৃতিপথে আগমন করিবার অনুমতি দিবার পর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে। বালাজী পণ্ডিতের † বন্দীত্ব সম্বন্ধে আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা চিন্তার উদ্রেক করে। এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দিবার জন্য আমি আপনাকে এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইতেছি। আপনার যে প্রকার সুনাম তাহাতে একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, যে সন্ধিসর্ত্ত অক্ষুণ্ণ রাখায় ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ আপনি বাধ্য ছিলেন তাহার অন্যথাচরণে আপনি ব্যক্তিগত ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারেন। কিন্তু অধুনা জনরব শুনিতেছি যে, মানবের জন্মগত অধিকার এবং আপনি স্বয়ং যাহার জন্য জামীন ছিলেন সেই সন্ধিপত্র ভঙ্গ করিয়া উক্ত হতভাগ্যকে ধৃত করা হইয়াছে। স্বার্থচিন্তা বা অপর কোন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া আমি এ বিষয়ে কিছু বলিতেছি মনে করিবেন না। আমার কাছে ইউরোপীয় মাত্রের সুনাম নিতান্ত প্রাণের বস্তু। এক্ষণে উহাই আমাকে এই পত্র লিখিতে প্ররোচিত করিতেছে, কারণ এ যাবৎ আমরা কোন ইউরোপীয়কে স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে দেখি নাই। আমি আসন্ন ঝটিকার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিতেছি, শীঘ্রই ঝড় উঠিবে। তাহাতে দৌলৎরাও সিন্ধিয়ার সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। নবাব, (অর্থাৎ নিজাম) ইংরাজগণ, রঘুজী ভোঁসলা, এমন কি টিপু সুলতান ইহাঁরা সকলে বালাজী পণ্ডিতকে মুক্তি দেওয়াতে সম্পূর্ণ সক্ষম। সুতরাং আপনার সুনাম এবং অধিকার (যেহেতু আপনি সন্ধির প্রতিভূ ছিলেন) যদি উক্ত কার্য্যসাধনে সক্ষম হয় এবং আমার কথিত মুক্তি যদি আপনি দেওয়াইতে পারেন তবে তাহার ফলে একদিকে আপনি যে কি পরিমাণ সম্মান সুযশ এবং অপরদিকে সুবিধা লাভ করিবেন তাহা আমি বলিতে অসমর্থ। আমার সহিত যদি আপনি একমত হন তাহা হইলে বর্ত্তমানে আপনি সিন্ধিয়ার নিকট হইতে যাহা পাইতেছেন তাহার চতুর্থাংশ অধিক এবং বার্ষিক লক্ষ টাকা আয়ের জায়গীর আমি আপনাকে দেওয়াইতে পারিব। শীঘ্রই আমি সীমান্ত অঞ্চলে যাইব। তখন আমাদের পত্রব্যবহার সহজ হইবে।

ভবদীয় রেমঁ

পুঃ—আপনার পছন্দমত না হইলে চিঠিখানি পুড়াইয়া ফেলিবেন; কিন্তু আমাকে পত্র দিবেন।"

ইংরাজ লেখকগণ পত্রের "একমত হওয়া" কথাটীর মধ্যে রেমঁর তাঁহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের এবং ফিলোজকে স্বদলে আনিবার প্রচেষ্টা দেখিতে পান। তিনি যে আদৌ সে চেষ্টা করেন নাই এমন কথা বলা যায় না। ইংরাজ এবং ফরাসীদের মধ্যে আবহমানকাল হইতে শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল। ফরাসীদের শত্রুর অনিষ্টাচরণের চেষ্টা করা খুবই স্বাভাবিক ছিল। তজ্জন্য ইংরাজ লেখকগণ রেমঁকে যতটা প্রত্যবায়ভাগী করিবেন অপর কেহ তাহা করিবে না। কিন্তু আলোচ্য পত্রখানি মধ্যে সেরূপ কোন প্রসঙ্গ আছে বলিয়া মনে হয় না। ফিলোজকে তাঁহার নিকট সাতিশয় মূল্যবান বস্তু—ভারতবর্ষে ইউরোপীয়ের সুনাম—ক্ষুণ্ণ করিতে দেখিয়া ব্যথিত চিত্তে তাহার প্রতিবিধানে রেমঁ অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তাহাকে সুপ্রচুর পুরস্কারের আশা দিয়াছিলেন। পত্রখানিতে এতদতিরিক্ত অপর কোন কথা নাই।

রেমঁর আর সীমান্ত প্রদেশে যাওয়া হইয়া উঠে নাই। এই পত্র লেখার অল্পকাল পরে তিনি পরলোকগমন করেন (২৫।৩।১৭৯৮)। বিষ প্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া কথা উঠিয়াছিল। তাহা অসম্ভব না-ও হইতে পারে। এক বিষয়ে ভগবান তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছিলেন বলিতে হইবে। সারাজীবনের সাধনা, তাঁহার নিজ হাতে গড়া সৈন্যদলের ধ্বংস কার্য্য তাঁহাকে আর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ

* সিন্ধিয়ার হস্তগত পত্রের অনুবাদ সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার ইংরাজী সংবাদপত্রে কিরূপে প্রকাশিত হইল তাহা বুঝা কঠিন। ইহা হইতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে সিন্ধিয়ার দরবারেও ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের চরের অভাব ছিল না।

† নানার প্রকৃত নাম ছিল বালাজী জনার্দ্দন ভানু।

করিতে হয় নাই। তাঁহার দেহান্তের ছয় মাসের মধ্যেই তাঁহার প্রভু নিজাম আলি তাঁহার গঠিত সেনাদল ভাঙ্গিয়া দিয়া ইংরাজদিগের চরণে স্বাধীনতা ডালি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হায়দ্রাবাদের সুপ্রসিদ্ধ "ফরাসী কোর' ইতিহাসের কথায় পরিণত হইয়াছিল।

রেমঁর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান সহকারী জঁা আঁরি পীরঁ (Jean Henri Piron) ব্রিগেডের অধ্যক্ষতা লাভ করেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ্চ ফ্রান্সের অন্তর্গত Huningue নগরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। পীরঁর প্রথম জীবন সম্বন্ধে কোন কথা জানা নাই। অন্যান্য বহু ভাগ্যান্বেষীর মত তিনিও ফরাসী সৈনিকরূপে এদেশে প্রথম আসিয়াছিলেন মনে করা যাইতে পারে। পীরঁ সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। হায়দ্রাবাদের ইংরাজ রেসিডেণ্ট কার্ক প্যাট্রিক তাঁহাকে রেমঁ অপেক্ষা কর্ম্মঠ, উদ্যোগী এবং সামরিক জীবনে অনুরাগী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সহকারী উত্তরকালে প্রখ্যাতনামা স্যর জন ম্যালকম একেবারে অন্য কথা বলেন। পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ হইতে তাঁহার কৃত মূল্যাবধারণই প্রকৃত বলিয়া সমর্থিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন, "পীরঁ রুক্ষ প্রকৃতির উৎকট ডিমোক্রাট। রেমঁ অপেক্ষা তিনি আমাদের প্রতিকূলভাবাপন্ন, কিন্তু আমাদের পক্ষে তদপেক্ষা তিনি অল্প শঙ্কার কারণ। যে মানসিক স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য এবং লোকচিত্তানুরঞ্জনকারী প্রকৃতির জন্য রেমঁর পক্ষে বড় হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল পীরঁ তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাঁহার কোন কর্ম্মক্ষমতা নাই এবং তাঁহার নেতৃত্বও সর্ব্বজনস্বীকৃত নহে।" ইঁহাদের উভয়ের পীরঁর সহিত ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। পরবর্ত্তী যুগের লেখক ম্যালিসন বলেন "পীরঁ সরল প্রকৃতি এবং ন্যায়পরায়ণ হইলেও আদৌ পরিণামদর্শী ছিলেন না। ইংরাজদিগের প্রতি তাঁহার অন্তর্নিহিত নিদারুণ বিদ্বেষ তিনি প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিতেন না।" *

পীরঁ উৎকট জ্যাকোবিন ছিলেন। অধ্যক্ষতা লাভের অব্যবহিত পরে তিনি হিন্দুস্থানে তাঁহার প্রায় সমনামা সমধর্ম্মীর নিকট প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ রৌপ্য-নির্ম্মিত একটী "স্বাধীনতার বৃক্ষ" এবং "স্বাধীনতার টুপি" উপহার পাঠাইয়াছিলেন। মহিশুর দরবারস্থ ফরাসী ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ইংরাজগণ বলেন যে পীরঁ এবং তাঁহার অধস্তন সেনানীগণ মনে করিতেন যে নিজাম দরবারে থাকিয়া তাঁহারা দেশের কাজ করিতেছেন। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের শ্বেত, রক্ত, নীল ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা তাঁহাদের পতাকা ছিল। সিপাহীগণের উর্দ্দিতে বিপ্লবের মূলমন্ত্র লিখিত এবং প্রতীক চিহ্নাদি অঙ্কিত থাকিত। নিজেদের রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ এবং ইংরাজ বিদ্বেষ প্রচ্ছন্ন করিবার কোন চেষ্টাই উহারা করিত না। কিন্তু পতাকা বা সিপাহীগণের উর্দ্দি রেমঁর সময় হইতে চলিয়া আসিতেছিল। পীরঁ এ বিষয়ে নূতন কিছু করেন নাই। কিন্তু তাঁহার অযোগ্যতা এবং বিবেচনাশক্তির অভাব ফরাসীদের পক্ষে নিতান্ত ক্ষতির কারণ হইয়াছিল। তবে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, যে কূটনীতিবিশারদ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ক্ষিপ্রকর্ম্মা ব্যক্তি এই সময় বৃটীশ ভারতের কর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতায় স্বয়ং রেমঁ জীবিত থাকিলেও কতদূর কৃতকার্য্য হইতেন বলা সুকঠিন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

---

* Final French struggles in India, p. 245

সাহিত্য ও যুগধর্ম

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

রঙ্গপুর সারস্বত সম্মেলনের ১৩৪৫ সালের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার জন্য যখন আমার এক বিশিষ্ট সাহিত্যিক বন্ধুর নিকট হ'তে আহ্বান পত্র পেলাম তখন মনের মধ্যে সর্বপ্রথম পাশ কাটাবার প্রবৃত্তিই আবির্ভূত হয়েছিল। বহুবিধ অমোচ্য এবং দুর্মোচ্য দায়িত্বের মধ্যে দুঃখে-কষ্টে জীবন অতিবাহিত হচ্ছে, কাজ কি তার উপর আর একটা নূতন দায়িত্বের সৃষ্টি ক'রে। মনে করলাম লিখে দিই, অনুগ্রহ ক'রে মাফ করতে হচ্ছে। কিন্তু তখনি মনোযোগ আকৃষ্ট হ'ল আহ্বান-লিপির অতি ক্ষুদ্র একটি বাক্যাংশের উপর :—'ওজর-আপত্তি অচল'।

আদেশের বাণী সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তাই ব'লে তার অভিধা লক্ষণা অথবা ব্যঞ্জনা—কোনটাই সামান্য নয়। বুঝলাম আমার অসাক্ষাতেই অগ্রিম একতরফা বিচার হ'য়ে গেছে; এবং বিচার যিনি করেছেন তিনি যখন একজন সর্বজনমান্য বিচারপতি, রাজদরবারে যাঁর বিচারাধিকার স্বীকৃত, তখন এ কথাও বুঝলাম যে, সে আহ্বান-পত্র সাধারণ পত্র নয়, বস্তুত তা ডিক্রিরই প্রভাব বহন করছে। মামলার বিচার-বস্তুতে বিচারকের যখন আগ্রহাধিক্য অথবা স্বার্থের কোনো প্রকার যোগ লক্ষিত হয় তখন তাঁর নিকট সুবিচারের প্রার্থনা বৃথা; সুতরাং সে সঙ্কল্প ত্যাগ করলাম। নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল করবার মতো উচ্চতর আদালতও দৃষ্টিগোচর হ'ল না। অগত্যা ডিক্রির অখণ্ডনীয়তা স্বীকার করতে হ'ল; লিখে দিলাম, যথা আজ্ঞা,—আদেশ প্রতিপালিত হবে।

সংসারে এক শ্রেণীর মানুষ আছে যাদের ধাত ঠিক 'ওজর-আপত্তি'র নয়। তারা সহজে আত্মসমর্পণ করে, এবং আত্মসমর্পণ ক'রে আরাম পায়। আমি সেই শ্রেণীর মানুষ। সেই জন্য অনেক সময়ে অল্পস্বল্প অনুরোধ-উপরোধেও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রেই লেগে যাই। যদিচ পরে বেগতিক দেখলে কখনো কখনো ভেগেও যাই। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বর্তমান ক্ষেত্রে সেরূপ কার্য যে করিনি, তার শারীরিক প্রমাণ আপনাদের সম্মুখে পেশ করেছি।

আত্মসমর্পণ করা প্রতিপক্ষকে জয় করার অকুলীন জ্ঞাতি। নিষ্কলুষ বিজয়লক্ষ্মীর মহিমান্বিত সহোদর এ নিশ্চয়ই নয়, তথাপি এর দ্বারা প্রতিপক্ষের মনে শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত করতে সমর্থ না হ'লেও, হয়ত করুণার উদ্রেক করা যায়। কোনো মনে করুণা সঞ্চার করা যে বস্তুত সেই মনে কতকটা অধিকার স্থাপন করা, এ কথা কে অস্বীকার করবে। সুতরাং আপনাদের হৃদয় কতকটা অধিকার করেছি এই আশ্বাস মনের মধ্যে বহন ক'রে আপনাদের এই সাহিত্য অনুষ্ঠানের কার্যে ব্রতী হ'লাম।

আজ আপনারা আপনাদের এই সারস্বত সম্মেলনের অধিবেশনে আমাকে সভাপতির কর্তব্য পালন করবার জন্য আহ্বান ক'রে আমার আন্তরিক ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। এ আমন্ত্রণ আমাকে আনন্দ প্রদান করেছে তা অস্বীকার করিনে। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, সে আনন্দ উদ্বেগশূন্য নয়। অনধিকারের বস্তু লাভ করার মধ্যে যে গ্লানি অবিচ্ছেদ্যভাবে বর্তমান থাকে, আমার মন আজ সে গ্লানি থেকে বিমুক্ত নয়। তবে একটা ভরসা আছে যে, খেলতে জানলে কানাকড়ি দিয়েও খেলা যায়। আশা করি, এই দুই দিনের অনুষ্ঠান কার্যে আমার সম্পর্কে আপনারা সেই ক্রীড়াকুশলতার পরিচয় দিতে সমর্থ হবেন।

আপনাদের এই রঙ্গপুর সারস্বত সম্মেলন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান। সৎ সাহিত্যের সাধনা, সৃষ্টি এবং প্রচার এই

প্রতিষ্ঠানের মহৎ ক্রিয়াশীলতা। জাতীয় সাহিত্য জাতির শিক্ষা, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মাপকাঠি, -মানবতার পরিমাপ। সুতরাং আপনাদের এই সারস্বত সম্মেলন মানব-প্রগতির একটি নিদর্শন, মানব সভ্যতার ভাণ্ডার,—তা সে নিদর্শন এবং ভাণ্ডার যত ক্ষুদ্র যত সামান্যই হোক না কেন।

যে সাহিত্য নিয়ে আপনাদের কারবার, একদা সেই সাহিত্যের বীজোৎপত্তি হয়েছিল অবকীর্ণ মানব-চিন্তার যুক্তিকে অবলম্বন ক'রে দানা বাঁধবার মাহেন্দ্র ক্ষণে; সাহিত্য জন্মগ্রহণ করেছিল সেই যুক্তিনিরুদ্ধ চিন্তার রসাশ্রিত হ'য়ে লেখনীর মুখ দিয়ে পৌরাণিক ভূর্জপত্রে অবতরণ করবার শুভ মুহূর্তে; সাহিত্য পুষ্টিলাভ করেছে ক্রমবর্ধমান মানব সভ্যতার পুষ্টিলাভের সঙ্গে সঙ্গে।

শুধু তাই নয়। মানব সভ্যতার এই ক্রমোন্নতির সহিত সাহিত্য মোটামুটি এমন নিখুঁৎভাবে সমান তালে রূপায়িত হ'য়ে এসেছে যে, মনে হয় মানব জাতির পরিচয়স্বরূপ এই দুটি শ্রেষ্ঠ বস্তু পরস্পর এরূপ দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ যে, মানব ইতিহাসের কোনো অশুভ মুহূর্তে যদি মানব সভ্যতা আদিম বর্বরতার অভিমুখে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে তা হ'লে তৎসহিত সাহিত্যের অধোগতিও অনিবার্য হবে।

এই অনুমান এই দুশ্চিন্তা যে অমূলক নয়, বর্তমান কালের যুগলক্ষণ তা সপ্রমাণ করবার উপক্রম করেছে। ইতিহাসের এই শোচনীয় দুর্দিনে মানব সভ্যতা আজ স্তম্ভিত; বিশ্বসংস্কৃতি তার যথার্থ মূল্য হারিয়ে দেউলে হবার পথে পদার্পণ করেছে। অসঙ্গত লাভের কুৎসিৎ লোভ মানুষের মনকে এমন নির্লজ্জভাবে অধিকার ক'রে বসেছে যে, বিবেক আজ অন্তর্হিত, দয়া দাক্ষিণ্য সদাশয়তা বিদায় গ্রহণ করেছে, মানুষের চিত্তাকাশ ধূলিধূমাচ্ছন্ন, তার মধ্যে চন্দ্র-সূর্যতারকার অব্যাহত লীলা নেই, সুনির্মল সমীর-হিল্লোলের দ্বারা তা নন্দিত নয়। জাতির সহিত জাতির আজ নখ-দন্তের সংগ্রাম, সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের কণ্ঠ চেপে ধরছে, দেশ-প্রেমের নামে চলেছে পরদেশে লুঠ-তরাজ, বীরত্বের নামে হত্যা। নিরীহ উপায়হীন অযুধ্যমান নগরবাসীর মাথার উপর এসে দাঁড়াচ্ছে শত্রুপক্ষের বিমানপোত, অকুণ্ঠিত বীভৎসতায় তার উপর থেকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে ভীষণ মারণাস্ত্র; প্রাসাদ, অট্টালিকা, শিল্পভবন, ধর্মমন্দির তার নিদারুণ আঘাতে ধ্বংস হ'য়ে ধূলিসাৎ হ'য়ে যাচ্ছে; সেই ধূলিপুঞ্জে, শুধু আকাশ নয়, শুধু বাতাস নয়, নিগৃহীত মানবাত্মা পর্যন্ত মলিন হ'য়ে উঠছে; বিষবাষ্পের প্রাণান্তক কুণ্ডলীর মধ্যে বালবৃদ্ধ-বনিতা সহ সমস্ত পরিবার দম আটকে মরছে

এর জন্য দুঃখ নেই, কুণ্ঠা নেই, পরিতাপ নেই; এত বড় দুষ্কৃতির বিচার নেই, দণ্ড নেই। অন্নাভাবে কোনো ব্যক্তি অর্থের জন্য একটি মাত্র মানুষকে হত্যা করলেও রাজাজ্ঞায় তার প্রাণদণ্ড হয়, কিন্তু ঔদরিক লালসার বশবর্তী হ'য়ে রাজশক্তি যখন একটা দেশকে হত্যা করতে বসে তখন তা আর নরহত্যা থাকে না, তখন তা এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তুতে পরিণত হয়। তখন রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিরুপায়, জনমত নীরব, শুধু কবিকণ্ঠে হয়ত শোনা যায় তার সমর্থনের অসঙ্গত বাণী। নিম্ন শ্রেণীতে যার নাম গুণ্ডামি, নরহত্যা,—উচ্চ শ্রেণীতে তার নাম যুদ্ধ, শত্রুনাশ। জাপান চীনের সহিত যুদ্ধ বাধালে চীনকে সে বলে তার শত্রু; কিন্তু গৃহস্থ দস্যুর শত্রু, এ কথা সে কদাচ উচ্চারণ করে না।

পূর্বে যুদ্ধবিগ্রহ ছিল না, এমন কথা বলিনে। যুদ্ধ চির-কালই ছিল, এবং আশঙ্কা করি চিরকালই থাকবে। তখন রাজায় রাজায় যুদ্ধ হ'ত আর উলুখড়ের প্রাণ যেত; কিন্তু সে প্রাণ শারীরিক প্রাণ নয়, সে প্রাণ রূপকের প্রাণ। এখন অনেক সময়ে যুদ্ধ হয় রাজায় আর উলুখড়ে, আর সে যুদ্ধে উলুখড়ের যে প্রাণ যায় তা রূপকের প্রাণ নয়, নিতান্তই শারীরিক প্রাণ।

পুষ্পকরথে আরোহণ ক'রে নিরুপায় গৃহস্থের বাড়ির উপর বোমা নিক্ষেপ করার মত সাধু আচরণ পৌরাণিক যুগে ছিল ব'লে মনে পড়ে না। মেঘের অন্তরালে অবস্থান ক'রে ইন্দ্রজিৎ অবশ্য মায়া যুদ্ধ করতেন, কিন্তু সে তিনি করতেন শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে,—গৃহস্থের বিরুদ্ধে নয়। শক্তি-শেল, সম্মোহন বাণ প্রভৃতির মতো অসাধারণ অস্ত্র কারখা-নায় অর্ডার দিয়ে পাওয়ার উপায় ছিল না, এবং পাশুপত অস্ত্রের ন্যায় ভয়াবহ প্রহরণ যদি সমগ্র পৌরাণিক ইতিহাসের মধ্যে এক-আধবার সাময়িক ব্যবহারের জন্য পাওয়া গিয়ে

থাকে ত' কঠোর তপশ্চর্যার দ্বারা আশুতোষকে তুষ্ট ক'রেই তা পাওয়া গেছে,—শিবলোকে একটা বড় অঙ্কের চেক পাঠিয়ে নিশ্চয় পাওয়া যায় নি।

আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র, সংখ্যা এবং অনিষ্টকারিতায়, পৌরাণিক অস্ত্রকে পরাভূত করেছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই, এবং অচির ভবিষ্যতের অস্ত্র যে, ভীষণতায় এবং প্রচণ্ডতায় বর্তমানের অস্ত্রসম্ভারকে পরাভূত করবে সে কথাও নিঃসংশয়ে বলা চলে। পরীক্ষাগারে ব'সে প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক সতত ক্রিয়াশীল, কি উপায়ে নূতনতর যন্ত্র উদ্ভাবিত হ'য়ে বর্তমান যন্ত্রকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ, কি উপায়ে মানবতা দানবতার দিকে আরও খানিকটা অগ্রসর হ'তে পারে। সেই শুভদিনের দিকে হয়ত সে লোলুপ নেত্রে তাকিয়ে আছে যেদিন সে এমন একটা বিপুল আয়তনের এবং শক্তির তাড়িত যন্ত্র নির্মাণ করতে সমর্থ হবে যদ্দ্বারা নিজের দেশে ব'সেই মহাশক্তিসম্পন্ন সর্বসংহারক তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চারিত ক'রে অপর কোনো দেশের সমগ্র জনসমষ্টিকে ধ্বংস ক'রে দিতে পারবে। বোমার প্রয়োজন নেই, বিমানপোতের প্রয়োজন নেই, বিষবাষ্পের প্রয়োজন নেই,—একটি মাত্র মহাযন্ত্রেই কার্যোদ্ধার! দেশভক্ত সকৃতজ্ঞ জনসাধারণ মূর্চ্ছাহত বিদেশের অপমৃত্যু দেখে সামরিক বৈজ্ঞানিকের জয়ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করবে।

আমি সভীতি অন্তরে উপলব্ধি করছি, মানব সভ্যতার এই চরম পরিণতি হয়ত আমার অতিকল্পনা নয়।

কিছুকাল পূর্বেও দমদম বুলেট নামক বিশেষ এক শ্রেণীর বুলেটের সামরিক ব্যবহার নিষিদ্ধ হ'য়েছিল এই কারণে যে, উক্ত বুলেট আহত ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ ক'রে ভীষণ অনিষ্ট এবং যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। শত্রু হ'লেও মানুষের প্রতি অতটা নিষ্ঠুরতা হৃদয়তার দিক দিয়ে তখনকার দিনেও একটু আপত্তিজনক মনে হ'য়েছিল। আজ বোমা এবং বিষবাষ্পের প্রচলনের যুগেও যদি সেই আপত্তি বলবৎ থেকে থাকে ত' একান্তই সংস্কার বশত আছে বলতে হবে। অতিপ্রগতিশীল মনের নিকট এই সংস্কারেরই নাম কুসংস্কার।

এ ত' গেল রাষ্ট্র এবং জনসঙ্ঘের কথা। ব্যক্তিগত জীবনেও মানুষ তার আদর্শ এবং সংস্কৃতি থেকে অবতরণ করতে আরম্ভ করেছে। বিলাস-ব্যসনের প্রতি অস্বাস্থ্যকর আসক্তি, প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রয়োজনের মাত্রাতিরিক্ত দাবী, পাঁচজনকে বঞ্চিত ক'রে একজনের সঞ্চয় করবার অপরিমিত লালসা, প্রবলতর জীবনসংগ্রামের নিষ্করুণ তীক্ষ্ণতা মানুষের মন থেকে সরসতার লাঘব করেছে। সাধারণ মানুষের নিকট স্বার্থ এখন প্ররোচনার হেতু; দয়া—দুর্বলতা; দান—প্রশ্রয় দেওয়া। গতির আত্যন্তিক মোহ মানুষের মনের সেই স্থৈর্য হরণ করেছে যার অচপল দাক্ষিণ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য এবং শিল্পের জন্ম, ললিতকলার লীলায়িত পরিপুষ্টির জন্য যা একান্তভাবে অপরিহার্য। ঘণ্টায় পঁচাত্তর মাইলের কাছে ঘণ্টায় পনের মাইল আজ অপ্রতিভ; বিস্তার আজ গভীরতাকে পরাস্ত করেছে।

এই যে মানুষের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির অধোগতি, এই যে মনোভঙ্গীর অনতিবর্তনীয় পরিবর্তন, এর স্পর্শ সাহিত্য এবং শিল্পকে মলিন করবে কি-না, সেই চিন্তা জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বিচলিত করেছে। সুবিখ্যাত মনীষী Dr. Carlos Ibarguren এ বিষয়ে এইরূপ বলেছেন, "This wave of feverish rapture now involving the world is not only the outcome of the war, but has also been accentuated by other contributing factors, such as the formidable development of the inhuman technique that has led to the absorption of man by the machine, the fantastic growth of some barbarous sports whose shows intoxicate immense crowds, the arguments of many film plays that daily excite base passions and vulgar appetites, and a constant preaching of violence that influences young people. All this weakens and clouds in this troubled hour the conceptions that ennoble art and intelligence. Thought and speech are threatened, and it might be said that we are witnessing the decline of culture. Humanism, nourished in its root

by Grecó-Latin genius and unfolded at the time of the Renaissance; humanism, which lent dignity and beauty to modern thought since then, nowadays is vanishing and finishing. Present forms are losing grace and elegance; when they are not crude they fall into vulgarity; the vigour of coarseness, as well as realism in pornography, are being sought after. If literary art should descend to being an inferior tool, civilization, which is based on spiritual values, would come to an end."

সুতরাং এ কথা বললে বোধকরি অসমীচীন হবে না যে, সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে উন্নত রাখতে হ'লে সাহিত্যের আদর্শও অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। সাহিত্য যে সভ্যতার বাহন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই; সেই বাহন যদি শ্রেষ্ঠতার উচ্চ ভূমি থেকে নিম্নে অবতরণ করে, তা হ'লে তার পৃষ্ঠদেশে যে সমাসীন হ'য়ে আছে তার অধোগতিও অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু এ কথা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির সম্পর্কে যতটা সত্য, সাহিত্য এবং যুগধর্মের সম্পর্কে ততটা নয়। সাহিত্যে যুগলক্ষণ প্রতিফলিত হয়, এবং যুগধর্মের দ্বারা সাহিত্য প্রভাবিত হয়, এ কথা অস্বীকার করিনে। কিন্তু হয় ব'লেই যে, সকল ক্ষেত্রে হওয়া বাঞ্ছনীয়, সে কথাও স্বীকার করিনে। সাহিত্য যথোচিত মাত্রায় যুগনিরপেক্ষ না হ'লে তার শাশ্বতত্বের হানি হওয়ার আশঙ্কা আছে। যুগবিশেষের সময়ের শিলমোহর যার দেহের উপর সুস্পষ্ট ভাবে প'ড়ে গেল, যুগান্তরে তার অসাময়িক ব'লে বিবেচিত হ'তে অধিক বিলম্ব হয় না। যে বস্তুকে বিশেষ ভাবে আজকের পক্ষে উপযোগী ক'রে গ'ড়ে তুলি, কাল থেকে সে তার অভিনবত্ব হারাতে আরম্ভ করে। ১৮২৯ সালে লর্ড বেণ্টিঙ্ক কর্তৃক সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদকালে উক্ত প্রথা অবলম্বনে রচিত যে সাহিত্য তদানীন্তন পাঠক সমাজের চিত্তকে প্রবল ভাবে অধিকার করেছিল, আজ ১৯৩৯ সালে, অর্থাৎ কিঞ্চিদূর্ধ্ব একশত বৎসর পরে, সে সাহিত্য বর্তমান পাঠক সমাজের চিত্তে প্রায় সকল অধিকার হারিয়েছে। ললিত সাহিত্যের রসজগৎ হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে ক্রমশঃ তাকে ইতিহাসের উপকরণ-রাজ্যে প্রবেশ করতে হচ্ছে। অথচ মানব চিত্তের চিরন্তন সুখ-দুঃখের কথা অবলম্বন ক'রে রচিত কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটক ন্যূনাধিক চতুর্দশ শত বৎসর রসিক-চিত্তকে বিমুগ্ধ ক'রে এসেছে।

এখানে একটা সহজ কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। যুগ কাহিনী এবং যুগধর্ম এক বস্তু নয়। বঙ্গীয় দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ ক'রে তথায় আধুনিক বৈষ্ণব মতের প্রবর্তনা করেছিলেন, ইহা যুগ-কাহিনী, অর্থাৎ ইতিহাস; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণব মত প্রবর্তনার প্রভাবে তৎকালীন জনসাধারণের জীবন-যাপন প্রণালীতে অহিংস নীতি সুপরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল, ইহা যুগধর্ম, অর্থাৎ যুগলক্ষণ। খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধ কালে নিগৃহীত নরনারী এবং নির্যাতিত মানবাত্মা অকথ্য দুঃখ এবং দৈন্য ভোগ করেছিল, ইহা যুগকাহিনী; কিন্তু সেই নিগ্রহ এবং নির্যাতনের ফলে তদ্দেশীয় মানবচিত্তে এবং মানব প্রকৃতিতে কঠোরতা এবং নীতিবিহীনতার প্রাধান্য লক্ষিত হ'য়েছিল ইহা যুগলক্ষণ। যুগকাহিনী সাহিত্যের উপাদান বস্তু, কিন্তু যুগলক্ষণ সব সময়ে সাহিত্যের নিরাপদ রঞ্জনবস্তু নয়।

সাহিত্যের কারখানা কল্পনার মানসলোকে আমাদের প্রতিদিবসের বাস্তবলোকের সহিত যেখানে এ মানসলোকের অল্প-একটু বিচ্ছিন্নতা, সেইখানেই সাহিত্যে কলামাধুর্যের মর্মস্থল, সেইখানে তার রসভাণ্ডারের সন্ধান সেই বিচ্ছিন্নতার সোনার কাঠির স্পর্শ যে শিল্পী দিতে জানে না, জড়কে সে জাগ্রত করতে অক্ষম, পার্থিবকে সে অপার্থিবতার সুষমায় মণ্ডিত করতে পারে না।

এই সম্পর্কে আনাতোল ফ্রাঁসের একটি উক্তি বিশেষ ভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন, "Truth is not the objective of Art. It is the Sciences we must appeal to for that, as it is what they aim at not to literature, which has, and can have, no objective but beauty. * * * If we are

have a really pretty story, the bounds of every-day experience must needs be a little over-stepped." এই 'must needs be a little over-stepped'এ সেই বিচ্ছিন্নতার ইঙ্গিত।

এই ক্ষণমুহূর্তের ধূলিকর্দম আবেগ-উত্তেজনা থেকে সাহিত্য যত মুক্ত থাকবে ততই তার সার্বজনীনতা এবং সার্বদেশিকতা বৃদ্ধিলাভ করবে। সাম্প্রদায়িকতা সাহিত্যে অতীব নিন্দনীয়। ধর্মমতের সহিত ধর্মমতের বিবাদ আছে, রাষ্ট্রমতেরও সহিত রাষ্ট্রমতের বিসম্বাদ, কিন্তু সাহিত্যের সহিত সাহিত্যের বিরোধ নেই। ওমর খৈয়ামের কাব্য-সাহিত্য হিন্দুর অন্তরের সামগ্রী, রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলী মুসলমানের নিকট উপভোগের বস্তু। চার্লস্ ডিকেন্সের উপন্যাস যখন পড়ি তখন ভুলে যাই সে আমার সজাতি নয়। সাহিত্য হচ্ছে একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে বিশ্বমানব মিলিত হবার উপক্রম করছে, যেখানে মানুষের আনন্দের সহিত মানুষের আনন্দের যোগ, বেদনার সহিত বেদনার মৈত্রী।

যুগধর্মের প্রভাব সাহিত্যের কোনো উপকার করে না, তা' বলিনে। সাহিত্য বল সঞ্চয় করে যুগ-প্রভাবকে আশ্রয় ক'রে। কিন্তু এখানে সেই মাত্রাবোধ এবং ব্যবহারনীতির বিচার, যে মাত্রাবোধ এবং ব্যবহারনীতির বিচার কাল-সর্পের বিষকে সঞ্জীবন ঔষধে পরিণত করে।

বিংশ শতাব্দীর প্রচণ্ড যান্ত্রিকতার প্রভাব ইয়োরোপীয় সাহিত্যে তার ছাপ মেরেছে, রুচির প্রভেদ ঘটিয়েছে। তার ছোঁয়াচ আমাদের দেশেও এসে উপস্থিত হ'য়েছে। কার-খানার চিমনি, চিমনির ধূমপুঞ্জ, কলের চক্রনির্ঘোষ, বস্তি-জীবনের কদর্যতা এখন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-উপকরণ। পুষ্পসৌরভ, চন্দ্রকিরণ, মলয় পবন আভিজাত্যের কলঙ্কে নিন্দিত; আধুনিক কবির গণতান্ত্রিক কাব্যে এদের প্রবেশ নিষেধ। সাহিত্যে কালার বাঁশী আর বাজে না, তৎপরিবর্তে বাজে কলের বাঁশী। স্বৈরচারিণীর অব্যাহত জীবন-লীলা আজ সুস্থ প্রাণশক্তির পরিচায়ক ব'লে অভিনন্দিত; সুপ্রাচীন সতীত্বের অপবাদ বহন ক'রে অন্তঃপুরবধূ আজ অপ্রতিভ। অত্যাচার আজ শক্তির প্রতীক, সংযম দুর্বলতার।

আপত্তি নেই যদি এই বীভৎসতা এই রুদ্রতা তার শিল্পসুন্দর মূর্তি নিয়ে দেখা দেয়, অদূর ভবিষ্যতে যদি কোনো দিন মলিনতার ঘনকৃষ্ণ বেদীর উপর সুন্দরের মণিময় রত্ন-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তা যদি না হয়,—ঝঞ্ঝা যদি তার ধূলিধূসরতার বিস্তার নিয়ে আকাশকে শুধু মলিন ক'রেই রাখে, তা হ'লে বুঝতে হবে সাহিত্যের দুর্দিন, সভ্যতার দুঃসময়।

আপনাদের সারস্বত সম্মেলনের সাহিত্য প্রচেষ্টা উক্ত বিপত্তি নিবারণের পক্ষে সহায়ক হোক, ঐকান্তিক চিত্তে সেই কামনা করি।*

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

* রঙ্গপুর সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে (ফাল্গুন—১৩৩৫) পঠিত সভাপতির অভিভাষণ।

যে ঘরে হ'ল না খেলা

শ্রীমতী ইলা হালদার

মধুর সুন্দর সকালটি। তুষারচূড় পাহাড়ের তীক্ষ্ণশুভ্র শিখরগুলি ছুরির ফলার মত আকাশের স্বচ্ছ নীলে বিঁধে আছে। সোনা মাখান সবুজের রং লেগেছে বনানীতে, নিবিড় ঘন সুরার মত শিশিরস্নিগ্ধ পাইনগন্ধী হাওয়া।

টৌনি এসে বল্লে, "শোন কৃষ্ণা, আমার মাথায় চমৎকার একটা মতলব এসেছে।" আকাশে আঙ্গুল তুলে বল্লে, "চল ওই হাফেলকার পাহাড়ের বরফ দেখে আসবে।"

কৃষ্ণা পরেছে সেদিন বেগুনফুলি রংয়ের একটা শাড়ী, চুলে দিয়েছে সেই রংয়ের একগোছা ব্লুবেল। আজকের সকালের আলোয় সরস হয়ে সূর্য্যমুখী শতদলের মত মনের তার সবগুলি পাপড়ি আনন্দের দিকে উৎসুক হয়ে উঠেছে। সে উৎসাহিত হয়ে বল্লে, "চল না, খুব মজা হয় তাহলে .."

টৌনি বল্লে, "আচ্ছা, হোটেলে বলে আমাদের lunchটা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাক, ওখানে পাইন বনে বসে খাওয়া যাবে।"

কৃষ্ণা উজ্জ্বল হাসি হেসে বল্লে, "বা ভারি চমৎকার হবে—ভাগ্যে এমন brain-wave এসেছিল তোমার মাথায়।"

"ওখানে পাহাড়ের ওপর অনেক বেশী ঠাণ্ডা—তুমি খুব মোটা ওভার কোট নেবে সঙ্গে—" টৌনি খুব মুরুব্বিআনা সুরে বল্লে।

সব আয়োজন করে নিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তারা বেরল হোটেল থেকে, টৌনির ঘাড়ে মস্ত দুই ওভার কোট আর খাবারের মোড়ক। রাস্তায় যেয়ে ট্রামে উঠতেই একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি কৃষ্ণাকে আসন ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন—যদিও জায়গার কোন অভাব ছিল না। কৃষ্ণা মৃদু প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, তিনি তাকে প্রায় জোর করে বসিয়ে দিয়ে আলাপ সুরু করলেন। তিনি চেক (Czech), ইংরিজি খুব অল্পই জানেন কিন্তু তাতে আলাপ আটকাল না—সহজ আত্মীয়তায় তখনি তিনি খবর দেওয়া নেওয়া সুরু করলেন। কবে তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন, ছেলের বয়স কত, ডাক্তারী করে কত সে উপার্জ্জন করে—মেয়ে কোথায় আছে কি পড়ে সব বল্লেন এবং কৃষ্ণার দেশের খবর খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তারাও হাফেলকারের ওপরে যাচ্ছে শুনে খুব খুসী হলেন—তিনিও যাচ্ছেন সেখানে—কৃষ্ণাকে সমস্ত দেখিয়ে দেবেন বলে তিনি সগর্ব্বে অন্য সব যাত্রীদের দিকে তাকালেন। বিদেশিনীর সঙ্গে এমন সহজে তাঁর আলাপ করার দক্ষতা দেখে অন্য যাত্রীরা এতক্ষণ সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে সকৌতূহলে তাঁদের কথাবার্ত্তা শুনছিল। টৌনি গজগজ করে বল্লে, "সিন্দাবাদের বুড়োর মত এ ত আচ্ছা ঘাড়ে চড়ল দেখছি।"

কৃষ্ণা চাপা গলায় বল্লে, "আঃ, কি কর টৌনি, ইংরিজি বোঝে যে—"

টৌনি মুখ ভার করে বল্লে, "ওঃ বুঝল ত ভারি হল। বুঝে যদি নামে তবেই বাঁচি বরং—"

চেক ভদ্রলোক কিন্তু নামার কোন লক্ষণ দেখালেন না। তাঁর পরণে টিরোলিয়ান খাট কোট, মাথায় পালক দেওয়া টুপি, কাঁধে knapsack বায়নাকুলার হাতে খুব মোটা alpenstock, পায়ে পেরেক দেওয়া প্রকাণ্ড বুট, ভাল করে জাঁকিয়ে বসে বল্লেন, "মাদ্‌ময়সেল, আমার বায়নাকুলার রয়েছে, আপনাকে দেখাব পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের কী দৃশ্য।"

পাহাড়ের পাদমূলে ফিউনিকুলার রেলওয়ের ছোট্ট ষ্টেশন—অনেক লোক জমেছে সেখানে—ওপরে যাবে বলে। টৌনি টিকিট আনতে না আনতেই ট্রেণ এসে পড়ল। খেলনা গাড়ীর মত, ছোট বসবার আসনগুলো থাকে থাকে

সাজান, অন্য ট্রেণের মত মাটির ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে নেই—খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। সবাই যেয়ে হুড়মুড় উঠতেই গাড়ী ছেড়ে দিল। কৃষ্ণা চর্মাধার খুলে কয়েকটা মুদ্রা বার করে বল্লে, "আমার টিকিটের কত লাগলো টোনি ?"

টোনি রেগে বল্লে, "কেন সেটা আমি দিলে কি সৃষ্টি অশুদ্ধ হয়ে যায় ?"

"না, কিন্তু তুমি দেবে কেন ?"

"মেয়েরা দাম দিলে আমাদের লজ্জা পেতে হয়—তাদের ত দাম দেবার কথা নয়।"

"কেন কথা নয় শুনি ? মেয়েদের সব সময় এমন পরগাছা করে রাখতে চাও কেন বলত ? সর্বদা শতবাহু দিয়ে তারা তোমাদেরই জড়িয়ে থাকে—স্নেহ দিয়ে শাসন দিয়ে এই নির্ভরতাটাকে তোমরা বাঁচিয়ে রাখতে চাও। কেন ? তারাও তোমাদের মত সতেজ সনির্ভর হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াক্—ফুলে বিকশিত হোক—ফলে দান করুক দাক্ষিণ্য—এত দেখিনা, তোমাদের ইচ্ছে কেবল লতা হয়ে জড়াক তোমাদের শতপাকে, তোমাদের গতিকে করুক ব্যাহত, শক্তিকে করুক ক্ষুণ্ন সেও ভাল। তখন বলবে মেয়েরা তোমাদের বন্ধন, তোমাদেব বোঝা, তবু মনে মনে তাই ভাল লাগে।"

টোনি বল্লে, "রক্ষা কর, দাও বাপু, দাও দাম। কিন্তু তাবলে তোমার এসব অন্যায় বকুনিকে মানছি ভেব না। কোন লোকে চায় মেয়েরা মাকড়সা বাঁদরের মত ঝুলুক তার গলায়। তবে যাকে ভাল লাগে তাকে কিছু দেওয়ার, তার জন্যে কিছু করার আনন্দ পাওয়াটা বিধাতা গোড়া থেকে মানুষের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আদিম মানুষের ইচ্ছে হল বর্ষা নিয়ে একছুটে যেয়ে প্রতিবেশীর মাথাটা কেটে এনে দিলে বান্ধবীকে। এখন পুলিস কণ্টকিত যুগে এমন drastic উপহার দেওয়া ত সম্ভব নয়, তাই দোকানে যেয়ে দাম দিয়ে নেহাৎ মামুলি ভাবে জিনিষ দিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় মানুষকে। তার মানে ত এ নয় যে মেয়েরা আমাদের গলায় ঘণ্টার মত ঝুলতে থাক।"

কৃষ্ণা হেসে বল্লে, "না ঠিক তা নয় মানি। কিন্তু তোমরা মেয়েদের যখন নিকট পরিচয়ের মাঝে পেতে চাও তখন তাদের মাঝে আত্মনির্ভরতা কিছুতেই সহ্য করতে পার না। তোমাদের মনের অন্তরতমে চাও—তারা কিছু দুর্বল হোক, কিছু অসহায় হোক—বুদ্ধি থাক কিন্তু তা যেন তীক্ষ্ণ না হয়, বিদ্যা থাক সে কিন্তু তোমাদেরই appreciate করার জন্যে। জীবনে তারা যেন সকল রকমে তোমাদের কাছে হার মানতে শেখে, যেন তোমাদের অস্তিত্বে নিজেদের ডুবিয়ে রাখতে জানে।"

"ব্যাপারটা কি জান কৃষ্ণা, সেই সুরু থেকে পুরুষ মেয়েদের দেখে এসেছে তারা জয় করে আনার জিনিষ, তাদের আয়ত্ত করতে বিঘ্নজয়ী বীরত্বের প্রয়োজন, তাদের রক্ষা করতে সবল শক্তির পরীক্ষা সর্বদা—তাদের নিয়ে সংঘাত সব সময়ে কিন্তু সে ত পুরুষে মেয়েতে নয়—পুরুষে পুরুষে। মেয়েদের সে সংঘাতে যোগ দেবার কথা নয়—তারা শুধু নিমজ্জিত হয়ে থাক পৌরুষের আশ্রয়ে, পুরুষের অস্তিত্বে, তাদের মনোরঞ্জনী হয়ে।"

"মানে তারা যেন জলের তলার শেওলার দল—লতায় পাতায় বিকশিত হোক, বেড়ে উঠুক, কিন্তু সবই জলের তলায়, যেদিকে চলবে স্রোত তাদেরও গতি সেইদিকে—জল থেকে মাথা তুললেই মৃত্যু।"

"বোঝ না কৃষ্ণা, যা আমাদের মজ্জায় মিশিয়ে আছে তা কি একদিনে যায়। কত লক্ষ কোটি যুগ কেটে গেছে, এখনও মানুষ জন্মাবার আগে জীব সৃষ্টির প্রাচীনতম অধ্যায়-গুলোর মধ্যে দিয়ে এসে তবে মানুষে পরিণত হতে পারে। আর তার মনের গড়নটাই কি এক লাফে সব ডিঙিয়ে চলে আসতে পারে।"

"তাহলে তোমাদের মন থাকুক বাড়তে আর আমরা থাকি ততদিন কি করতে ?"

"তা জানি না। জানি এখন মেয়েদের জয় করার জন্যে ধনুকও ভাঙতে হয় না, ধানুকীকেও বধ করতে হয় না। তবু পুরুষের অবুঝ প্রকৃতি চায় মেয়েরা এখনও একান্তভাবে তাদেরই আয়ত্তে থাক,—তাদের জন্যে তার পৌরুষ সংগ্রাম করবে, সংঘাত সইবে, দুঃখ পাবে, কিন্তু তার প্রতিপত্তিকে প্রতিহত হতে দেবে না।"

"জয় করার অত গর্ব বার বার কেন কর ?—মেয়েরা কি ঘটি বাটি যে তাদের লুটপাট করে আনতে হবে ? ওই জয় পরাজয়ের ধাঁধা ধাঁধিয়ে রেখেছে তোমাদের চোখ—তাই ত মেয়ে পুরুষের সহজ সম্বন্ধটী তোমরা দেখতে পাও না—যেখানে তারা পরস্পরের বন্ধু, সঙ্গী, সহায়। কেড়ে নেওয়া আর হারিয়ে দেওয়া এই দ্বন্দ্বে বুদ্ধি হয়েছে বিকৃত। জোরের ওপর যার প্রতিষ্ঠা সে কখন সত্য না—হোকনা তা ভালবাসা। এতে তোমরাও ফাঁকি পড়েছ অনেক—সহজ দানের আনন্দে যে প্রাচুর্য্য, দাবীদাওয়ার পাহারা বসিয়ে নিংড়ে নিতে গেলে তা মূলেই যায় শুখিয়ে। পুরুষ মেয়ের জন্যে সংঘাত কতটা সইতে প্রস্তুত জানি না তবে তাদের প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হবার কাল্পনিক শঙ্কায় তারা সদাই সন্ত্রস্ত এটা ঠিক। তাই দ্বিতীয় ব্যক্তির ছায়া পেলেই ঈর্ষায় বনবেরালের মত ফুলে ওঠে এখনও।"

টোনি মুক্তকণ্ঠে হেসে উঠল। চেক ভদ্রলোক তাড়াহুড়োর মাঝেও কৃষ্ণাদের কক্ষে উঠতে ভুল করেন নি। এতক্ষণ তাদের তর্কের মাঝে কথা বলবার একটুও ফাঁক পাননি। টোনিকে হাসতে শুনে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "দেখুন মাদময়সেল্, এই বায়নাকুলারে নীচে ইন্ নদী কেমন ছাখাচ্ছে।"

ক্ষীণা বরফগলা নদী দুধের ফেণার মত সাদা, তীক্ষ্ণ সর্পিল স্রোতে পাহাড়ের পায়ে পায়ে চলেছে। পুরাণ একটা কাঠের সেতুর ওপর লোক চলেছে, নীচের পথঘাট, ঘরবাড়ী, পাথরের প্রাচীর ছেয়ে গোলাপের ফুল্ল লতা, পাহাড়ের পাদমূল ঢেকে ফলের বাগান—এ্যাপ্‌ল্ গাছের ডালগুলি টুকটুকে লাল ফলের ভারে ঘন সবুজ ঘাসে নত হয়ে পড়েছে, চুনিবসান চেরী গাছ, সবুজে একটু আবীর মাখান, পরিপক্ক পীচগুলি, ঘন পল্লবের তলে তলে নীলচে কালো এপ্‌রিকট—ফলন্ত বসুন্ধরার মনোহরা মূর্ত্তি। কৃষ্ণা ধন্যবাদ দিয়ে বায়নাকুলার ফিরিয়ে দিলে, ভদ্রলোক তখনি সেটা টোনিকে দেখতে দিলেন—টোনি নেহাত অনিচ্ছার সঙ্গে দেখলে একবার।

চেক ভদ্রলোক বল্লেন, "'আপনাদের হিমালয়' অভিযানে একবার আমার একজন চেনা লোক গেছলেন—শুনেছি সে নাকি আরো বিরাট ভয়ঙ্কর।"

কৃষ্ণা বল্লে, "আল্‌পস্ আর হিমালয়ের ওই তফাৎটা আমার খুব মনে লাগে। এখানের এ পাহাড় নদী বন সুন্দর সবই কিন্তু এরা প্রসাধনে সংযত। আর হিমালয় এখনও ভয়ঙ্কর—"তার সৌন্দর্য্য দুরন্ত।" এখানের ঘন অরণ্যে ঘুরতে যেয়ে পদে পদে প্রাণ হারাবার কোন ভয় জাগে না—মানুষভোজী বাঘ নেই—বীভৎস সাপ নেই, কালাজ্বর ম্যালিরিয়ার মারাত্মক মশা নেই। যে কটা ভাল্লুক ছিল মানুষ তাদের একটি একটি করে মেরেছে। এদের প্রকৃতি রূপ তার মানুষেরই মনোরঞ্জনে দিয়েছে। এখানের তুষারমৌলি গিরিশিখর—এদেরও বিস্ময় জাগান বিপুল রূপ, দুর্গম বটে, তারা কিন্তু দুর্জ্জেয় নয়—মানুষ এদের দেহকে বিঁধে বিঁধে নিজেদের জয়রথ চালিয়েছে, তুষারের শুভ্র কঠিন শুভ্রতায় নিজেদের জাতীয় পতাকা উড়িয়েছে। আর হিমালয়ের সৌন্দর্য্য কোন শাসন জানে না, কোন সংযম মানে না, অসংবরণীয় রকমে বিশাল—অজেয় রহস্যে এখনও ভয়ঙ্করী। কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরাজেয় উদ্ধত উচ্চতায় ভারতের জয় পতাকা কে ওড়াবে কবে ?

কৃষ্ণা অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছে দেখে চেক্ ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি তার হাতে বায়নাকুলারটা তুলে দিয়ে বল্লেন, "দেখুন মাদ্‌ময়্‌সেল।"

কৃষ্ণা অগত্যা আর একবার দেখে মৃদু ধন্যবাদ দিয়ে ফিরিয়ে দিল। তিনি তখন টোনির দিকে সেটা বাড়িয়ে দিলেন। টোনি বল্লে, "না, না, মাদ্‌ময়সেলকে দিন—উনি ভাল করে দেখবেন—ওঁর নিজেরটা ফেলে এসেছেন বলে দুঃখ করছিলেন—"

ভদ্রলোক সহাস্যে বল্লেন, "নিশ্চয়। আমি ত এনেছি—মাদ্‌ময়সেলের দেখার মোটেই অসুবিধা হবে না।" তিনি তখনি সেটা ফের কৃষ্ণাকে দিলেন। কৃষ্ণা একটু আপত্তি করতে গেল কিন্তু সে কথা শোনে কে। এরপর হতে তিনি ক্ষণে ক্ষণে বিনয়সহ বায়নাকুলার দিতে লাগলেন কৃষ্ণা ভদ্রতার খাতিরে প্রতিবার দেখে ধন্যবাদ দিয়ে ফিরিয়ে দিল। অবশেষে অমায়িকতার অত্যাচারে উত্যক্ত হয়ে কৃষ্ণা টোনির দিকে ভীষণ ভ্রূকুটি করে তাকালে। টোনি ততক্ষণ রুদ্ধ হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণাকে রাগতে দেখে

তাড়াতাড়ি বল্লে, "ওই যে ষ্টেশানটা এবার আসচে—ওই-খানে আমরা নেমে যাব। তা না হলে পাইন বনে বেড়ান হবে না। এর ওপরে বন শেষ হয়ে যাচ্ছে—এবার শুধু ঘাস – alpine pasture land"

ভদ্রলোক বল্লেন, "হ্যাঁ, আর ত এ রেল চলবে না, তখন থেকে Cage railway আরম্ভ হয়েছে—একটা খাঁচাকে তার দিয়ে টেনে ওপরে উঠিয়ে নেয়।"

টোনি বল্লে, "আর তারটি যদি ছেঁড়ে? অত শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে হঠাৎ পড়ে গেলে ত খুব আরাম লাগবে না।

ভদ্রলোক বল্লেন, "না, পড়বে কেন। দুটো তার পাশাপাশি গেছে, একটাতে কিছু হলে অন্যটায় আটকে যাবে। চল্লিশ বছর Cage railway যাতায়াত করছে—কোন দুর্ঘটনা কোনদিন হতে ত শুনিনি।"

ট্রেণ থামতে সকলে নেমে পড়ল। মস্তবড় লোহার খাঁচার মত একটা জিনিষ, চারিদিকে মোটা গরান লাগান—যাত্রীর দল যেয়ে তাতে উঠল। কৃষ্ণারা আসচে না দেখে চেক ভদ্রলোকটি ভারি নিরাশ হলেন। কৃষ্ণা তাঁকে আশ্বাস দিলে, "এখানে একটু বেড়িয়ে তারপর আমরাও ওপরে যাব।"

ভদ্রলোক আশান্বিত হয়ে বল্লেন, "তবে ত ফের দ্যাখা হবে—" তিনি কন্‌টিনেন্‌টাল কায়দায় কৃষ্ণার হাত চুম্বন করে তখনকার মত বিদায় নিলেন।

টোনি কৃষ্ণা পথ ছেড়ে তীক্ষ্ণোন্নত পাইনের গন্ধময় নিবিড়তায় প্রবেশ করলে। মধ্যাহ্নের দীপ্ত আলো পুঞ্জ পুঞ্জ পাতায় পড়ে ভেঙ্গে কুচিকুচি হয়ে স্বর্ণরেণুর মত ছড়িয়ে গেছে বনের মাঝে। গাছের কর্কশ কাণ্ড নরম সবুজ শ্যাওলায় শ্যামল হয়ে আছে, গাছের গোড়ায়, পাথরের গায়ে গায়ে পাহাড়ের ফাটলে বিচিত্র পাতার বিবিধ ফার্ণ ঘন হয়ে জন্মেছে। ঘাসের আড়ালে পাতার আড়ালে কত রকমের বনফুল—গোছা গোছা হেয়ারবেল, রক্তাভ নীল ফুলগুলি ক্ষীণ দীর্ঘ ডাঁটির ওপর দুলছে নতমুখে। ছোট ছোট ব্লুবেল বিষের মত নীল মঙ্কস্‌হুড, হলদে সাদা ডেসির ফুটকি, লঘু সাদা লার্কস্পারের পুষ্পিত শিষগুলি—আরো কত নাম না জানা ফুল প্রজাপতির আটকে যাওয়া ডানার মত পাতায় পাতায় আটকে আছে। কৃষ্ণা পারে ত সব ফুলগুলোই তুলে নিয়ে যায়। কতগুলো সে খোঁপায় দিলে, কয়েকটা টোনির বাটন হোলে লাগিয়ে দিলে—দুহাত ভরে ফুল ফার্ণ তুলে তবুও তার আশ মেটে না। টোনি বল্লে, "আর বোঝা বাড়িও না—শেষ পর্য্যন্ত ত ওগুলো আমাকেই বইতে হবে।"

কৃষ্ণা শেকড় শুদ্ধ কয়েকটা ফার্ণ তুলে তলার ঝুরঝুরে মাটিটা ঝাড়তে ঝাড়তে বল্লে, "তুমি একটা ফিলিষ্টাইন—ফুলের বোঝা বইতে বিরূপ হও—"

তারা আরো খানিকটা হাঁটল তারপর একটু ফাঁকা জায়গা—পাহাড়ের কিনারায় কয়েকটা বড় বড় বৃক্ষছায়ে কাঠের একটা আসন রয়েছে। সেখান থেকে নীচেটা খানিকটা দ্যাখা যায়—পাইনের সবুজ শীর্ষের তরঙ্গ-ওপরে কাচের মত মসৃণ নীল আকাশে আঁকা বাঁকা বরফের রেখা।

টোনি বেঞ্চের ওপর জিনিষপত্র নামিয়ে রেখে খাবারের মোড়কগুলো খুলতে লাগল। কৃষ্ণাকে ডাক দিয়ে বল্লে, "রাজ্যের আগাছা আর ত বেশী বাকি রইল না—এবারে খাবারে একটু মন দিলে হয় না?"

কৃষ্ণা সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলে, "দ্যাখো টোনি, দ্যাখো—তিনটি ভায়োলেট পেয়েছি—" টোনির সামনে সে হাতটা বাড়িয়ে দিলে।

টোনি ফুল দেখলে কিনা মনে নেই—সে দেখলে একখানি বঙ্কিমসুন্দর হাত—ক্রমক্ষীণায়িত আঙুলগুলি—হাতের কঙ্কনটা রোদে ঝকমক করছে। চোখ তুলে কৃষ্ণার দিকে চেয়ে তখুনি দৃষ্টি নামিয়ে সে নিজের কাজে মন দিলে। সহজ খুসীতে আজকে কৃষ্ণার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য সরে গেছে, এর মাঝে কোনো জটিলতার জড়িমাকে কেমন করে সে ফের জড়িয়ে দেবে ওর মনে।

কৃষ্ণা তার পাশে এসে বসলে, বল্লে, "Tired লাগছে টোনি—এমন চুপচাপ কেন?" ওর গলার স্বর ফুলের পাপড়ির মত এত নরম, ঈষৎ হাওয়ার মত এমন আল্‌তো হয়ে ওঠে এক এক সময়। টোনি জোর করে হেসে বল্লে, "না, না, মোটেই নয়। কত বড় বড় স্যাণ্ডউইচ্ দিয়েছে

দেখছ ? —দুটো পীচ অ্যাপল্—বিস্কিট আর চকলেট—চকলেটগুলো সব তোমার—যা মিষ্টি ওগুলো।"

কৃষ্ণা হেসে বল্লে, "বা রে—যা উনি খেতে পারবেন না তা আমায় দেওয়া—আহা কি দয়া—তা হলে অ্যাপলটা কিন্তু তোমার—অত বড়টা খাওয়া এক জ্বালা—পীচগুলো বরং ভাল।" সে একটা পীচ তুলে নিয়ে ওষ্ঠে স্পর্শ করলে, মখমলের মত কী নরম খোসাটা, রসে ফেটে পড়বে এখুনি।

টোনি একবার তাকিয়ে দেখলে পীচের রসে সিক্ত সরস ওর লাল দুটি ওষ্ঠপুট—সে মাথা নত করে পুনর্বার খাওয়ায় মন দিলে।

কৃষ্ণা বল্লে—"বা কি মজার গেলাস। জল পড়বে না ত—" শক্ত কাগজের তৈরী বেঁটে গেলাস, কৃষ্ণা বোতল থেকে খানিকটা জল ঢেলে আস্তে আস্তে পান করলে। টোনি না দেখে পারলে না—হাতীর দাঁতের মত হলদে সাদা ওর কণ্ঠের কমনীয় ভঙ্গিটি, সূক্ষ্ম নীলাভ দু একটি শিরার রেখা এঁকে বেঁকে নীচে নেমেছে কণ্ঠতট হতে। খেতে ভুলে যেয়ে টোনি হাতের বিস্কিটখানাকে অন্যমনে ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো করতে লাগল।

রৌদ্ররেণুমাখা মধ্যাহ্ন মধুমাতাল ভ্রমরের মত ঈষৎ গুঞ্জনরত। বসন্তে আতপ্ত হাওয়ায় তন্দ্রাক্ষুন্ন বনানীর ঝিঁঝির জেগেছে, অদেখা ঝরণা কোথায় একটানা ঝুমঝুমি বাজিয়ে চলেছে। রৌদ্রপুলকিত পাখী একটা ডাক দিয়ে গেল একবার। উদ্ধোৎক্ষিপ্ত বাহুর ওপর মাথা রেখে টোনি অন্যমনে একটা পুরাণো গানের সুরে আস্তে শীষ দিচ্ছিল—সোনালি চুলে আলো ছিটকে সোনার মত চিকমিক করছে। ঘড়ির দিকে চেয়ে কৃষ্ণা তার হাতে একটা নাড়া দিয়ে বল্লে, "ওঠ টোনি, ওপরে যাবে না।"

টোনি সচকিতে উঠে বসল, বল্লে, "যাবে এখুনি? তোমায় কি যে বলব ভাবছিলাম—"

কৃষ্ণা বল্লে, "না চল। এখানে বেশীক্ষণ থাকলে বনের মায়া মানুষকে নেশার মত পেয়ে বসে।" সে উঠে এগিয়ে চলুল।

অগত্যা টোনিও উঠলে, জিনিষপত্র গুছিয়ে তুলে নিয়ে তাকে অনুসরণ করলে।

আবার সেই খাঁচায় ওঠা। সকলে ভেতরে যেতেই ঘড়াং করে লোহার গরাদের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল, বেজায় আওয়াজ করে সেটা মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠতে লাগল। নীচে দ্যাখা যায় নিবিড় সবুজ পাইন বন, নেশার মত ঘন হয়ে আছে, চারি পাশে শ্যামস্বর্ণাভ পাহাড়ের প্রাচীর বক্রোন্নতগতিতে দিকে দিগন্তে চলে গেছে। আকাশের আলোকিত শূন্যতাকে শব্দে সচকিত করে চলেছে যন্ত্র কয়েকটি মানুষকে নিয়ে।

এখানেও সকলে কৃষ্ণাকে হাঁ করে দেখছে দেখে টোনি তাকে আড়াল করে দাঁড়াল। এদের এই অতিমাত্রার বিস্ময় ওকে সব সময় বিরক্ত করে তোলে। ওর অতিসংযমিত ইংরেজ মন কোন ভাবের সহজ অভিব্যক্তিকে সহ্য করতে পারে না—ব্যক্তও করতে পারে না। ওদের অবচেতন অন্তরে যে চিন্তা যখন জন্ম নেয় তাকে চেতনা হতে চেপে রেখে দেওয়াই রীতি—অন্য সমস্ত মানুষের সঙ্গে ওইখানে ওদের মূলগত পার্থক্য। মনকে নরম নমনীয় করে প্রকাশ করার শক্তিকে ওরা ভাবে স্বভাবের দুর্বল বাহুল্য সেটা। স্বভাবের সমস্ত অনুভূতি গুলোকে অক্ষয় রীতিনীতি অর্থাৎ ritual দিয়ে শক্ত করে বেঁধে আড়ষ্ট অশোভন হয়ে বসে থাকা সেও ভাল। মনের গতি যতই ব্যাহত হোক না তাতে রীতি ত রইল বজায়।

হাফেলকারের সর্ব্বোচ্চ শিখরে ছোট একটা ষ্টেশনের মত জায়গা। খাঁচাটা সেখানে আটকে যেয়ে দরজাটা সশব্দে খুলে গেল। একটুখানি ঘরের মত কাঁচের জানালা দিয়ে ঢাকা চারিদিকে, একখানা বেঞ্চ একপাশে রয়েছে যাত্রীদের জন্যে। একজন টিরোলিয়ান মেয়ে কতগুলো ছবি, বনফুল, টুপির পালক সম্বর হরিণের লোমের গোছা নিয়ে বিক্রী করছে সকলের কাছে। পরণে তার কাজ করা কাঁচুলি, রঙ্গীণ ঘাঘ্রা থাকে থাকে ছড়িয়ে আছে, মাথার টুপিতে মস্ত লম্বা পালক দুলছে। কৃষ্ণা কয়েকখানা ছবি নিলে। টোনি তার ডালা থেকে একগোছা ফুল তুলে নিয়ে বল্ল, "এ কি ফুল দেখিনি ত কখন?"

টিরোলিয়ান মেয়ে মুক্তোর পাঁতির মত ঝকমকে দাঁত

বার করে হেসে খুব ভাঙা ইংরিজিতে বল্লে, "এর নাম এডেল-উইস, আলপস্ এর সব থেকে দুষ্প্রাপ্য ফুল—তাই এর দাম এত। মাদময়সেল আপনি নিয়ে দেশে পাঠাবেন না? এ ফুল শুকিয়ে গেলেও অনেক দিন থাকে।"

ছোট ছোট সাদা তারার মত ফুল, মখমলের মত পুরু নরম পাপড়িগুলি। টোনি এক গোছা কিনে নিয়ে কৃষ্ণাকে বল্লে, 'তুমি ত ইংরেজদের মোটেই দেখতে পার না কৃষ্ণা—— এটা রইল তোমার কাছে, কখন মনে করিয়ে দেবে তারা সকলেই সব সময় নেহাৎ অসহ্য নয়।"

কৃষ্ণার চোখের পক্ষ্মগুলি নাগকেশরের কেশরের মত ঈষৎ শিহরিত হল ক্ষণেকের জন্যে। ফুলগুলো নিয়ে সে একটু হেসে বল্লে, 'মনে রাখব যারা সহনীয়, এই ফুলের মত দুষ্প্রাপ্য তারা—"

টোনি বল্ল, "চল শিগ্‌গির এখান থেকে, নইলে তোমার বাইনাকুলার বুড়ো ফের না ধরে এসে।"

ছড়ান পাথরে পিছল সঙ্কটশীর্ণ পথ—দুজনে সাবধানে ওপরে উঠতে লাগল। জায়গায় জায়গায় চূর্ণ নুনের মত বরফ ছড়ান রয়েছে। কৃষ্ণা দেখে খুসীতে চঞ্চল হয়ে জুতোর তলায় মুড়মুড় করে বরফ গুঁড়োতে লাগল।

"অমন করে বরফের ওপর ছুটো না বলছি—পা এমন ঠাণ্ডা হয়ে জমে যাবে আর হাঁটতে পারবে না—তখন আমার কাঁধে উঠতে হবে।"

"তা বই কি। উঃ কি পালোয়ান্—" খানিকটা বরফ তুলে শূন্যে ছড়িয়ে দিয়ে সে এগিয়ে চল্ল।

ওপরে অনেক যাত্রী জমেছে। একজন লোক টেলিস-কোপ নিয়ে বসে আছে, কিছু দাম দিয়ে লোকে দেখছে তাতে কোথায় দূরে দূরে সম্বর হরিণের পাল' চরছে। আর একজন লোক এক বোঝা alpenstock অর্থাৎ তলায় লোহার ফলক লাগান লাঠি বিক্রী করতে নিয়ে গেছে। কৃষ্ণারা সেখান থেকে নেমে ষ্টেশনের ঘরটার কাছে ফিরে এল। ঘরের সামনে বাইরে রেলিংএর ধারে কয়েকখানা চেয়ার দু'একটা ছোট টেবিল পেতে খাবারের কিছু আয়োজন অত ওপরেও রয়েছে। ওরা দুজনে দুখানা চেয়ার দেওয়া একটা টেবিলে বসল যেয়ে। খুব ঘন কফি ও লাঠির মত লম্বা সরু রুটি দিয়ে গেল তার সঙ্গে। এক ঝাঁক পাহাড়ী ময়না কোথা থেকে এসে তাদের ঘিরে বেজায় চেঁচামেচি লাগিয়ে দিলে। ওরা তাদের রুটির গুঁড়ো দিলে, তারা নাচতে নাচতে খুব কাছে এসে খেতে লাগল। ভয়ের কোন চিহ্ন নেই—খুব সপ্রতিভ ভাব। একটা উড়ে এসে টেবিলের ওপর বসল চকচকে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিলে লোকগুলো কেমন তারপর প্লেট থেকে রুটির টুকরো তুলে নিয়ে চলে গেল।

খাওয়া শেষ করে কৃষ্ণা টোনি উঠলে অন্য আর একদিকে যাবার জন্যে। দীপ্ত আলো এবার স্নিগ্ধ হয়ে এসেছে—বাতাসে একটু শির শিরে শীত। পান্নাসবুজ ঘন ঘাসে পা ডুবে যায়—তার ওপরে কোন দেবতার পুষ্পবৃষ্টি, হলদে, সাদা, বেগুনি। alpene গোলাপের ঝাঁকড়া ঝোপ, সরুপাতা গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপী ছোট্ট ফুলের থোকা। কৃষ্ণা বল্লে, 'আরে এই ত। এই ফুলগুলো কালকে আমরা কিনেছি—হোটেলে বিক্রী করতে এসেছিল। আইরিণকে দেব যেয়ে—সে বিশ্বাসই করবেনা আমি নিজে তুলিছি এখান থেকে।"

সুপুষ্ট বিপুল গরুর পাল চরে বেড়াচ্ছে—পরিতৃপ্তিতে অলস তাদের ভঙ্গী। বিশাল চোখে একটু বিস্ময় নিয়ে তারা ওদের দেখছিল। কৃষ্ণা কাছে যেয়ে একটা গরুর গায়ে হাত দিলে—মসৃণ পিছল দেহ—ভিজে ভোঁতা নাকটা তার হাতের ফুলের দিকে বাড়িয়ে দিলে। অতিকায় এসব গরু দেখে কৃষ্ণা নিজের দেশের কথা না ভেবে পারলে না—জীর্ণ শীর্ণ হাড়ের তৈরী গরু—গরমের দিনে শুকনো মাটি কামড়ে বেড়ায়।

টোনি তাকে ডাক দিয়ে বল্লে, "আর ওপরে যেও না কৃষ্ণা—বড্ড খাড়া, এপাশে কী ভীষণ খাদ।"

কৃষ্ণা বল্লে, "এ গাছগুলোতে আর ভাল ফুল নেই মোটে—গরুতে সব খেয়েছে। আরো ওপরে গরু যেখানে যায় না, সেখানে ফুল পাব।"

আরো খানিক ওপরে মস্তবড় পাথরের পাশে একটা বড় ঝোপ ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে। কৃষ্ণা চঞ্চল চরণে উঠে এসে ঝুঁকে পড়ে ফুল ছিঁড়তে লাগল। হঠাৎ টাল সামলাতে না

পেরে ছড়ান পাথরের টুকরোর ওপর পা'টা গেল পিছলে—পাশের গভীর খাদের দিকে গড়িয়ে পড়ল নীচে।

কয়েকটি নিমেষ মাত্র—কৃষ্ণা চেঁচিয়েছিল কিনা মনে নেই, যখন সে সামলেছে নিজেকে, টৌনির বজ্রকঠিন মুষ্টির মধ্যে হাতটা তার তখনও আটকে রয়েছে। অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে সে টৌনির দিকে তাকালে—টৌনির মুখের সমস্ত রক্ত সরে যেয়ে আপত্তিজনক ভাবে সাদা হয়ে উঠেছে।

"ভাগ্যিস তুমি ধরলে—তা না হলে আজ আর আমায় ফিরতে হত না"—কৃষ্ণা হাসলে। তার গলাটা তখনও স্থির হয়নি—হাসি কেঁপে গেল একটু। শাড়ী খানিকটা ছিঁড়েছে—জুতোর গোড়ালি গেছে মচকে।—"কিন্তু হাতটা গেল যে—"

টৌনি তার হাত ছেড়ে দিলে। পকেট থেকে রুমাল বার করে ললাট মুছে নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বল্লে, "কী যে কাণ্ড কর কৃষ্ণা তুমি—" তার নিঃশ্বাস তখনও জোরে পড়ছে।

দুজনে ঘাসের উপর বসলে। কুণ্ঠাকে কাটাবার জন্যে কৃষ্ণা হাল্কাভাবে বল্লে, "তুমি যে আমার চেয়েও চমকে গেছ—আচ্ছা ভীতু ত—"

টৌনি রেগে বল্লে, "হ্যাঁ হ্যাঁ তাইত। তুমি এখানে এসে পড়ে যেয়ে ঘাড় ভাঙ্গ আর লোকে ভাবুক আমিই তোমায় ঠেলে ফেলে দিয়েছি। কে তখন সাক্ষী দিচ্ছে শুনি?"

"আমিই দিতাম, ভয় কি। না হয় ভূত হয়ে। অপঘাতে মৃত্যুই আমার ভাগ্যে আছে মনে হয়—তা বলে তোমায় মারব না সে সঙ্গে—"

"চুপ কর"। রুক্ষস্বরে টৌনি বললে, "এখুনি মরতে বসেছিলে তা জান? ফের অপঘাত মৃত্যু নিয়ে বাহাদুরী করতে হবে না—জান কিনা ওতে আমার খারাপ লাগে। যেদিন থেকে তোমার সঙ্গে আমার দেখা—তুমি এই করেছ। আমি চেয়েছি কাছে আসতে, ভালবাসতে—তুমি চেয়েছো আমার ভালবাসা দিয়েই আমায় যন্ত্রণা দিতে। আমি চেয়েছি বিষাক্ত বাধাকে মূর্খ মতামতকে দূর করে সরিয়ে তোমার সঙ্গের সহজ সম্বন্ধ। তুমি চেয়েছ জগতের যত জঞ্জাল জড় করে আমারই ঘাড়ে ফেলে দিতে—শাসনের নামে যত অন্যায়, সেবার নামে যত অত্যাচার, বর্ণ নিয়ে যত বিবাদ সমস্তর আমিই মূর্ত্ত প্রতীক। তুমি ভেবেছ কি? আমায় কি মানুষ ভাব না?"

এতগুলো কথা এক সঙ্গে বলে টৌনি জোরে নিঃশ্বাস নিলে। তার অভিযোগের অতর্কিত আক্রমণের উত্তরে কৃষ্ণা কোন কথা বল্লে না, দুই চোখের স্থির দৃষ্টিতে টৌনির দিকে তাকিয়ে রইল।

টৌনি হঠাৎ কৃষ্ণার কাঁধে জোরে ঝাঁকানি দিয়ে বল্লে, "বল কৃষ্ণা বল—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, আমি যে তোমার পাশে পাশে এমন লোভীর মত ঘুরে বেড়াই—বোঝ না কি কিছুই? বাইরে পাই বিদ্রূপ, তোমার কাছে পাই শ্লেষ—তবু সেই সত্য এ ত বিশ্বাস হয় না? যে মেয়ে এমন মনোহরা তাকে পঙ্গু বলে কি বিশ্বাস করা যায়? যে এত শিখেছে, তার বুদ্ধি এখনও এমন বিকৃত—জাতীয়তার জীর্ণ শেকলে সে বাঁধা? যার এত তেজ, মানুষকে শুধু মানুষ রূপে দেখার তার সাহস নেই? কেন তুমি বারবার বিমুখ হও, ব্যথা দাও, ব্যর্থ কর আমায়?"

কৃষ্ণার চঞ্চলতা চলে গেছে। কি ভাবতে ভাবতে অন্য মনে ঘাসের ডাঁটা নিয়ে দাঁতে কাটছিল, শান্তভাবে বল্লে, "কিসে দুঃখ দিলাম তোমায়—কি তুমি চাও—"

"আমার চাওয়া তোমার অজানা নেই, তবে কাব্য-কথায় বল্লে যদি ভাল শোনায় শোন তবে বলি, আমি তোমায় চাই—যেমন করে রাত্রি চায় দিনকে—ব্যাপ্ত করে লুপ্ত করে নিবিড় নীরব পরিচয়ের মাঝে—" কৃষ্ণার কাঁধের ওপর টৌনির আঙুলগুলো ভীষণ জোরে দাগ দিয়ে চেপে ধরলে।

"ছাড় টৌনি, লাগে", হাতটা ছাড়িয়ে দিয়ে কৃষ্ণা ফিরে বসল, মুখামুখী হয়ে বল্লে, "তুমি জান কতটা আমার খাটতে হয়—প্রেম করে কাটাবার মত বাড়তি সময় বড় আমার নেই। তাছাড়া দেশ বর্ণ বাদ দিলেও তোমার আমার মাঝে বহু বাধা আছে—"কৃষ্ণা থেমে গেল। তারপর বল্লে, "আর আমার নৈতিক মতগুলো তোমাদের দেশে আজকের দিনে ভারি সেকেলে শোনাবে কিন্তু কি করব। বিয়ে করা

কোন কালে আমার হবে না মনে হয়, তবুও কোন ছেলের সঙ্গে বিয়ের বাইরে কোন সম্পর্ক সৃষ্টি করার সখ আমার নেই।—তাতে রুচিতে বাধে, বুদ্ধিতে বাধে—"

এই নিয়ে অনেকের সঙ্গে অনেক তর্ক হয়েছে তার। যে ভাবে বিয়ের ব্যাপারটাকে মানুষ সৃষ্টি করেছিল একটা আবরণরূপে। মেয়েপুরুষে আদিম সম্পর্কের অনাবৃত রূপ অনেক বীভৎসতায় কুৎসিৎ হয়ে গেছে, অনেক ঘৃণায় ঘুলিয়ে যেয়ে অনেক দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়ে তীক্ষ্ণধার হযে উঠেছে। তাই এক সামাজিক আবরণকে আনা হল যাতে কিছু গ্লানি ঢাকা পড়ে, কিছু তীক্ষ্ণতা মসৃণ হয়। হয়নি হয়ত তা। আবরণ শুধু বন্ধনে নেমেছে এসে। তবুও, মানব মন যত-দিন না এমন সতেজভাবে সংস্কারশূন্য হবে যখন তারা পরস্পরের সহজ সম্পর্ক বিদ্রূপবর্জিত সম্ভ্রমে সুন্দর করে মেনে নিতে পারবে, কোন দেনা পাওনার কুটিল জটিলতা শাসিত ও শাসকের নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা তাদের মুক্তিময় আত্মীয়তাকে ম্লান করতে পারবে না, ততদিন উচ্ছৃঙ্খলতার চেয়ে বরং শৃঙ্খলকেই স্বীকার করা শোভনীয়।

"আর বিয়েকে মেনে নিলে দেহ মনের কিছু নিষ্ঠাকেও মানতে হয়, তা না হলে ওটার কোন মানে থাকে না।"

"কে অমান্য করতে চায় তাকে? বিয়ে করা হবে না তোমার—কেন বল এমন? আমি কি তোমায় চাই ক্ষণিকের অতিথির মত আসতে। তোমায় চাই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নিরবকাশে নিঃশেষে—আমার চেতনাময় মনে, আমার অবচেতন অন্তরে অবলুপ্ত করে তোমায় মিলিয়ে নিতে—" আবার সে কৃষ্ণার হাতটা বেজায় জোরে চেপে ধরলে। ব্যগ্র আগ্রহে দেখলে না, কৃষ্ণার ললাটের কুটিল ভ্রুকুটি।

"তোমায় আমায় বিয়ে! বল কী যে!—তুমি কি পাগল হলে—" বিদ্রূপের হাসিতে বেঁকে উঠল কৃষ্ণার ঠোঁট, বল্লে "তুমি ভুলেছ নাকি তোমাদের সমাজের বুড়ীর দলকে? যাঁরা কেবলমাত্র নিজের সমাজের মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করেন? খাঁটি কালো ভারতীয়ের কথা দূরে থাক অন্য দেশের সাদা চামড়ার লোককে দেখেও যাঁরা নাক শিঁটকে শিকেয় তোলেন? আমায় বিয়ে করলে তুমি আমার সমাজেও ঢুকতে পারবে না, তোমার সমাজেও জায়গা পাবে না। তোমার আমার সমাজের অন্ততঃ এইখানটায় আশ্চর্য্য মিল, এমন কূপমণ্ডূকোচিত সঙ্কীর্ণতাটি অন্য কোন সমাজে ততটা বাড়তে পায় না। তাই বলেই ওদের দেশে আইন করতে হয় আন্তর্জাতিক বিয়ে বন্ধ করার জন্যে।"

"সমাজে ওরা ছাড়াও লোক আছে। ওদেরই কথার মূল্য এত বেশী করে দিতে হবে না কি? কতগুলো bigoted idiotকে ভয় করে চলতে হবে? আর যদি বিলেত নেহাতই না ভাল লাগে—আমরা ভারতবর্ষে যাব। আমি ত পরনির্ভর নই—ব্যবসায়ে আমার অংশ রয়েছে—এখানে না পোষায় সেখানের শাখায় যাব। তখন নতুন ধারায় জীবন যাবে—"

"সে ত আরো বড় ভুল হবে। এখানে ভালমন্দ এত লোকের মাঝে যেটা জোলো হয়ে মিশিয়ে আছে সেখানে সেটাই দেখবে নির্জ্জলা খাঁটি চেহারায়।" অদৃশ্য আগুনের আভায় কৃষ্ণার চোখ ঝলসে উঠল, "দেখবে মানুষের শক্তি মানুষকে কি রকম দম্ভে দুরন্ত লোভে লোলুপ করেছে। সেখানে গেলে আমাদের বর্ণগত ব্যবধান নিয়ত বাজবে পায়ে পায়ে—দেখবে আমারই দেশে কত হোটেলে ক্লাবে আমার প্রবেশ নিষেধ—কত লোকের বাড়ীতে তোমাকে আদর করে ডেকে নেবে আমার হবে অপমান। সতত এই সঙ্ঘর্ষে ক্ষয় হয়ে যাবে মনের যা কিছু মমতা—বিদ্বেষে বিষিয়ে উঠবে আমাদের বুদ্ধি।" টোনির মুখের দিকে চেয়ে তার মন কোমল হয়ে এল, বল্লে, তোমাদের যা বুঝতে দেরী লাগে, আমাদের কাছে তা আগেই ধরা পড়ে। তোমাদের মন স্বচ্ছল আলস্যে আস্তে আস্তে বাড়ে, আমাদের সে সময় নেই—দেশে যখন ঘূর্ণি জাগে, সব জিনিষই ঘোরে তখন বেগে, মানুষের বোধশক্তিও বাড়ে তাই তাড়াতাড়ি। যা একেবারে অসম্ভব—যা হয় না কখন, তা আর বৃথা বোলো না বার বার।"

টোনি নিরুত্তরে বসে রইল—হাঁটুর ওপর কনুই রেখে দুহাতের আঙুলগুলো চুলে ডুবিয়ে সে সামনে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল।

কৃষ্ণা বল্লে স্নিগ্ধস্বরে, "ব্যথা পেওনা টোনি—দোষ

তোমারও নয় আমারও নয়। বহু পুরুষ ধরে যে কলঙ্ক পড়েছে তাকে মোচন করার শক্তি যতদিন না আসে, ততদিন সে দেবে দুঃখ,—অপমান করবে—আঘাত করবে বারবার আমাদের। মিছে মন খারাপ করে কি হবে তা নিয়ে?"

হাফেলকারের তুঙ্গ শিখরে তুষারের শাণিত ঝলসানি ম্লান হয়ে এল ক্রমে, আকাশ যেন অপেক্ষা করে আছে অবগাহন করবে কোন তপস্বিনী তার স্বচ্ছ শুদ্ধতায়। বহুদূরের গৃহমুখী গরুর গলার ঘণ্টার বিন্দু বিন্দু শব্দ নিটোল নিস্তব্ধতার গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে এক একটি করে। এক একবার শুধু দিগন্ত কম্পিত করে মেঘনির্ঘোষের মত গভীর গম্ভীর ধ্বনি, বরফে বরফে ধাক্কা লাগল কোন পাহাড়ের চূড়ায়

দুজনে নির্বাক হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। কতক্ষণ পরে কৃষ্ণা টৌনির বাহুর ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে একটা টান দিয়ে বল্লে, "দেখ মন যখন কাঁচা--খুব কোমল, তখন তাতে যে ছোপ লাগে মনে হয় ছাড়বে না বুঝি এ। কিন্তু সত্যিই ত তা নয়—কত রং লাগে, ফের কত উঠে যায়। কেউ যখন কাউকে বলে, 'তোমায় বিনা ব্যর্থ হবে জীবন, সন্ন্যাসী হবে মন' শুনতে সেটা ভাল লাগে কিন্তু সেটা যে অভিভাষণ তা দুপক্ষেই জানে মনে মনে। তোমাদের দেশে রূপ ও রূপসী কোনটার অভাব নেই। আর একদিন তুমি আর একজনকে ভালবাসবে—আজকের কথা সেদিনে মনে হবে কি হবে না। মাঝ থেকে মিছে ক্ষুব্ধ হতে দিও না নিজেকে এমন সুন্দর সন্ধ্যাটাতে।"

টৌনি ব্যথিত হাসি হাসলে। বল্লে, "হতেও পারে ভাল লাগবে আর একদিন আর একজনকে। কিন্তু তাবলে মনকে এখনের মত আঘাত থেকে ত বাঁচান যায় না। উত্তরকালে বসন্তের আসার আশায় শীতের দিনে দুর্য্যোগ কি উপেক্ষা করা যায়? আজকের পাওনা বেদনা বলেই জমান থাক মনে—মিথ্যে খুশীর মুখোস পরাবার দরকার নেই তাকে—" হাতের কাছের ঘাসফুলগুলোকে সে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়াতে লাগল দুহাত দিয়ে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে কৃষ্ণা বল্লে, "চল এবারে ফিরি—" হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে চমকে উঠল—"এ কী নটা বাজছে যে—"

ব্যস্ত হয়ে উঠে তারা তাড়াতাড়ি ফিরে চল্ল।

ষ্টেশনের ঘরের কাছে এসে দ্যাখে এ কি কাণ্ড, চারিদিক চুপচাপ—কেউ ত কোথাও নেই। সমস্ত লোকজন নীচে নেমে গেছে—শেষের যাত্রীদের নিয়ে যন্ত্র কখন চলে গেছে। দুজনে স্তম্ভিত হয়ে রইল।

কৃষ্ণা বল্লে "কী হবে এখন? কি করে যাব নীচে?"

"যাওয়া আর যাবে না, আজকের মত এখানেই রাত্রিবাস।"—বিরস হেসে টৌনি বল্লে, "যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে হয়—কৃষ্ণা তোমার অদৃষ্টই মন্দ আজ।"

কৃষ্ণা চোখ তুলে তার দিকে তাকালে, বল্লে, "বাঘের ভয় আমার নেই। কেড়ে খাওয়ার রীতি তাদের নয়—সে সভ্যতা আছে তাদের এ বিশ্বাস রাখি।"

টৌনি মুখ ফিরিয়ে কি বল্লে বোঝা গেল না—বোধ হয় বিদ্রূপ করতে চায়, আঘাত করতে চায়—কিন্তু কোনটাই যথেষ্ট জোরের সঙ্গে করতে পারে না।

চারিধারে তারা অনেকক্ষণ ধরে দেখলে—কোথাও জনমানব নেই। নীচে ধূসরা ধরা নীলচে নরম কোয়াসার সাগরে ডুব দিয়েছে। বাসন্তী বেলার বিদায়ে বিধুর হয়ে উদাস বাতাস উড়ে বেড়াচ্ছে পাহাড় হতে পাহাড়ে।

কৃষ্ণা বল্লে, "কী মুস্কিলেই পড়া গেল। তখন যেন একটা ঘণ্টা বেজেছিল মনে হয়—অত ত খেয়াল করিনি—কে জানত সেটা নীচে নামার সঙ্কেত। এখানে না আছে খাবার ব্যবস্থা না আছে শোবার জায়গা—কি করে কাটবে রাত।"

"ভাব কেন কৃষ্ণা, আজকের রাত [illegible]মে থাকবে না কেটেই যাবে। কালকে খাবারের অভাব হবে না, হোটেলের সুন্দর ঘরে নরম বিছানায় আরামে ঘুমোবে, এর মধ্যে কোন অনিশ্চয়তার আশঙ্কা নেই। তবে সে আগামী আরামের আশায় সান্ত্বনা পাও না? এখনকার ভাবনা নিয়ে বৃথা ব্যস্ত হও কেন?"

টৌনির কণ্ঠের তিক্ততায় কৃষ্ণা রাগ করতে পারলে না। আবদারে ছেলের মত অন্যায় বায়না নেবে, না পেলে অভিমানে অনর্থ বাধাবে—এদের নিয়ে কী যে করা যায়।

নীচে নামার যখন কোন সম্ভাবনা নেই এখানে অগত্যা থাকারই ব্যবস্থা করতে হয়। কৃষ্ণা যেয়ে কোণের বেঞ্চের ওপর বসলে, খাবারের মোড়কগুলো খুলে খুঁজে দেখতে লাগল সকালের খাবারের কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা। চকলেটের চাপগুলো তখনও ছিল আর দু এক খানা বিস্কিট্। টৌনিকে ডেকে বল্লে, "এই নাও টৌনি সেই চকলেট। যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হল তাদের সমান—তবু এগুলো ছিল তাই ত।"

টৌনি অনিচ্ছার সঙ্গে নিলে, অন্যমনে চিবিয়ে গেল। বোতলে খানিকটা জল বাকি ছিল, দুজনে ঢেলে নিয়ে খেলে। কৃষ্ণা ওভারকোটটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে কলারটা তুলে দিলে। বেঞ্চের ওপর পা তুলে নিয়ে সে গুটিয়ে বসে ঘুমোবার আয়োজন করলে।

টৌনি উঠে দরজার কাছে যেয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল আঁধার ঢেকেছে চারিদিক, নীলাভ কালো আকাশ শুধু স্বচ্ছ নীলমণির মত স্পষ্ট হয়ে ঝলমল করছে। কী স্তব্ধ সমস্ত। কোন মহাকালের ধ্যানলীনতায় বিলীন হয়ে গেছে বিশ্বজগত। কত আর দাঁড়াবে টৌনি—পাইপটা জ্বালিয়ে যেয়ে কৃষ্ণার পাশে সে বসলে।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটল। টৌনি হঠাৎ বল্লে "কৃষ্ণা ঘুমিয়ে পড়লে? সামনে যখন ক্ষুধার্ত্ত বাঘ বসে—এমন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাও কি করে

কৃষ্ণা চোখ খুলে বল্লে "ছাখ টৌনি, তুমি ক্ষুধার্ত্ত হতে পার কিন্তু জলজ্যান্ত মানুষ—বাঘ নহে কোন কালে। মিছিমিছি melodramatic হবার চেষ্টা কোরো না।"

সে বিরক্ত হয়ে ভাবলে টৌনি যে কেন এমন অন্যায় অস্বস্তিকে অকারণে টেনে আনছে। শুঁটকি মাছের মত শুঁটকে যাওয়া মন ওদের বুড়ীদের কাছে আর যেদেশে স্ত্রীপুরুষে দ্যাখা হয় শুধু অর্দ্ধরাতে অন্ধকারে শোবার ঘরে সেখানে তাদের কাছে ওদের দুজনের আজকে রাতের এই একলা থাকাটা লোমহর্ষণ শোনাবে। যেখানে চণ্ডীমণ্ডপবাসী অলস পুরুষের দল কেঁচোর মত পরনিন্দার আবর্জনাস্তূপ তৈরী করে বসে বসে, তাদের কাছে এটা একটা নবতর নিন্দার নতুন উপাদান বলে পরম মুখরোচক মনে হবে। কিন্তু টৌনি সুস্থমনা শিক্ষিত পুরুষ আর এটা স্বাধীন দেশের সভ্যযুগের কথা। এদেশে মেয়েছেলের মেশার অধিকারে কেউ বাধা দ্যায় না। তারা উপবাসী ছারপোকাও নয়, অভুক্ত বাঘও নয়। একটা রাত একসঙ্গে একলা থাকা এমন কিছু অভাবনীয় ব্যাপার নয় যে তা নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে। কৃষ্ণা অসহিষ্ণু হয়ে বল্লে,—"dont' make a song about it for goodness sake সমস্তদিন যা ক্লান্ত হয়েছি। একটু বেশী শীত এই যা এখানে—তা ছাড়া এর চেয়ে ঢের ভয়ঙ্কর জায়গায় আমার ঘুমোন অভ্যাস আছে। আমি দিব্যি আরামে ঘুমোবো আর যদি বুদ্ধিমান হও পাগলামি রেখে তুমিও তাই করবে।"

কৃষ্ণা ভাল করে দেয়াল ঘেঁসে বসে চোখ বন্ধ করলে—খানিক বাদে সত্যিই সে ঘুমিয়ে পড়ল গভীর ভাবে।

নরম ঘন অন্ধকারে শুধু টৌনির পাইপের আগুনটা হিংস্র পশুর রক্তচোখের মত জ্বলতে লাগল।

বাহিরে দূরে কোথায় snow foxএর তীক্ষ্ণ সংক্ষিপ্ত চীৎকার ধারাল বর্ষাফলার মত নীরব রাতের গায়ে কেটে কেটে বসে গেল। ঘুমের ঘোরে কৃষ্ণা কখন পাশ ফিরে দেয়াল থেকে টৌনির গায়ে হেলান দিয়ে ঘেঁসে বসল।··· নিঝুম রাতে দুজনের বক্ষের শব্দ শোনা যায় রহস্যগুঞ্জরিত রাত্রির নিভৃত পদশব্দের মত। কৃষ্ণার গায়ের গন্ধ, চুলের গন্ধ, বাহির হতে স্ফুটনোন্মুখ ফুলের কুঁড়ির গন্ধ—টৌনির নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ করে দিতে যায়।···দাঁত দিয়ে নির্দ্দয়ভাবে ঠোঁট কামড়ে ধরে সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। গম্ভীর হিমগিরির রাত্রি কোথাও অন্ধকারে কোথাও আধছায়ায়, কখন শব্দে, কখন নিঃশব্দতায় শিহরিত হতে লাগল বারবার। আর টৌনির সারা দেহের শিরাগুলো দিয়ে অসহ অনুভূতির অসম্ভব দপ্‌দপানি বয়ে যেতে লাগল।···অন্ধকারের কালো তরঙ্গে তাকে যেন কোন অতলে তলিয়ে নিয়ে যেতে চায়।—এ কোন্ জগৎ—একে কি করে চেনা যায়, এখানে কি দিয়ে বুঝা যায়? এ কি সেই azoic যুগের শিশু পৃথিবী—পুঞ্জ পুঞ্জ নীহারিকার প্রকাণ্ড পিণ্ড—কিছু দ্যাখা যায় না চেনা যায় না, শুধু সীমাহীন সম্ভাবনা নিয়ে শূন্যকে উদ্ভাসিত করে উদ্দাম বেগে উন্মত্তের মত ঘুরছে?···

তারপরে ধীরে তার প্রাণ জেগেছে। শূন্য সশব্দ সাগরের বিন্দু বিন্দু জেলি ফিস্—তার বর্ণহীন দেহে সবুজের সোণার কাঠি একটু ছুঁয়েছে—শ্যামল শ্যাওলা রূপে। ক্রমে এল বীভৎস সরীসৃপ, আরো বিকট জন্তুর দল। অবশেষে সকলের শেষে, যখন নরম ঘন ঘাসে ঢেকেছে পৃথিবীর অনাবৃত দেহ তখন এল মানুষ। কত কোটি যুগের ওপার থেকে জেগে উঠেছে যেন আজকের এই স্মৃতিস্পন্দিত রহস্য অপরূপ রাত্রি—এইখানে এই মধ্য ইয়োরোপে মানুষের জন্ম ইতিহাসের প্রথম যুগে। যখন এখানে নিবিড় অরণ্যে বিশাল বনস্পতির নিশ্চিদ্র ছায়ায় লোমশ হস্তীযূথ, ত্রিখড়ি গণ্ডার, ভয়ঙ্কর ভাল্লুক সদর্পে ঘুরে বেড়াত। খর্বাকৃতি মানুষের দল শীতের জ্বালায় কেউ জড়িয়েছে হরিণের চামড়া, কেউ ভাল্লুকের লোম, কেউ গুহার মাঝে আগুন জ্বালিয়ে বসে সদ্য নিহত শিকারের মাংসের সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত—কেউ মাংসের বড় বড় টুকরো আগুনে পুড়াচ্ছে—কেউ কড় মড় করে হাড়গুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে মজ্জা বার করছে। দাড়ির জঙ্গলে ভরা তাদের বন্যমুখে বিদ্রূপের ব্যঙ্গ হাসি—পাথরের ভারি কুড়ুল আর হাড়ের মোটা ছুরি—এই অস্ত্র সম্বল করে তারা প্রতিদিন কত পশুকে হত্যা করেছে কত মানুষকে হত্যা করেছে—কত স্ত্রীলোককে ধরে এনেছে। আর যে যুগে সশস্ত্র শাণিত সভ্যতা, poison gasএ বাতাস বিষাক্ত—bombing aeroplaneএ আকাশ ছিন্ন ভিন্ন, সাবমেরিণে সন্ত্রাস সাগরের— সে যুগে সামান্য একটা নারীকে আয়ত্ত করা এমন অসাধ্য। হা হা হা হা……

রূঢ় কর্কশ উচ্চ হাসি ধাক্কার ওপর ধাক্কা দিয়ে টোনির বুদ্ধিকে জাগিয়ে দিলে—জড়িমা কেটে গেল।...আজকের শাণিত সভ্যতার আকাশ বাতাস পর্য্যন্ত ব্যথিত হয়ে উঠেছে—অনেক লোভ অনেক পাপ অনেক মিথ্যা জমেছে জগতে। তবু মানুষ সত্যেরও সন্ধান নিয়েছে; বারেবারে পথ হারাচ্ছে, বারেবারে বিপথে যাচ্ছে—জাতীয়তার নামে দেশ-ভক্তির দোহাই দিয়ে অনেক অত্যাচার আনন্দে বেড়েছে। দৃষ্টি তাদের লোভে ঘুলিয়ে উঠেছে বারবার, তবু মানুষ আদর্শকেই বড় করে দেখতে চাচ্ছে—উদ্দেশ্যকে উন্নত করেছে দিনে দিনে। তাদের বুদ্ধি হয়েছে একটি পরিচ্ছন্নতায় পবিত্র, রুচি হয়েছে শুচিতে সৌখীন। তাদের সভ্য মন ব্যক্তিগত বর্বরতায় বিমুখ হয়ে গেছে—অসহায়ের ওপর অত্যাচারের সহজ সুযোগে সায় দেয় না স্বভাব। এখানেই তাদের জয়—এই হল তাদের মনুষ্যত্বের চরম পরিচয়।…

সাবধানে টোনি উঠে দাঁড়াল—দেশলাই জ্বালিয়ে পাইপে পুনর্বার আগুন দিলে। দেশলাইয়ের সকম্প শিখার একটুখানি লাল আলো কৃষ্ণার ঘুমন্ত মুখের উপর বুলিয়ে গেল। একটি হাত শিথিলভাবে ঠাণ্ডা পাথরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে।—টোনি অবনত হয়ে হাতটা সন্তর্পণে তুলে নিলে। নিজের উগ্র ব্যগ্র মুঠোর মধ্যে ঠাণ্ডা হিম হাতের স্পর্শ অনুভব করলে কয়েক মুহূর্ত্ত—তার নিজের হাতের শিরাগুলো তপ্ত রক্তে দপ্ দপ্ করে উঠল। হাতটা বেঞ্চের ওপর নামিয়ে দিয়ে সে গা থেকে ওভারকোট খুলে নিয়ে কৃষ্ণার গায়ে ভাল করে ঢেকে দিল, তারপর যেয়ে অন্যপ্রান্তে সরে বসলে। সংহত মনের ওপর স্নিগ্ধ নিদ্রা ধীরে নেমে এল। কখন তার আঙুল হতে পাইপটা খসে পড়েছে—জানতে পারল না।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ার ছোঁয়ায় কৃষ্ণার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ম্লানায়মান স্মৃতির মত অবসন্ন অন্ধকার। কৃষ্ণা চোখ মেলে জানালার ঠাণ্ডা কাচে মুখ রেখে বাইরে তাকাল। গলান মণির মত টলটলে আকাশের স্বচ্ছ গোলাপী রং—তলায় তলায় পাহাড়গুলো বেগুনি স্বপ্নের মত জমে রয়েছে। কুঁকড়ে বসে কৃষ্ণার সারা অঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল—হাত পা ছড়িয়ে আলস্য ভেঙ্গে সে উঠে দাঁড়ালে। টোনির কোটটা তার গা থেকে খসে মেঝের ওপর পড়ে গেল। টোনির কথা তার খেয়াল হল, কোটটা তুলে নিয়ে তার কাছে গেল। ঠাণ্ডায় টোনির ঠোঁট নীলচে হয়ে উঠেছে—সোনালি চুলগুলো এলোমেলো হয়ে মুখে চোখে ছড়িয়ে পড়েছে—নিদ্রিত অঙ্গের একটি করুণ ভঙ্গী শিশুর মত শিথিল অসহায়। তাকে দেখে হঠাৎ একটা আবিষ্কারের মত অবাক হয়ে কৃষ্ণা দাঁড়িয়ে রইল তাকিয়ে তার দিকে।—এ যেন মানুষের সঙ্গে তার এক নতুন পরিচয়—এত অসহায় তারা, এমন নিরস্ত্র, নিরাশ্রয়, কৃষ্ণার রিভলভার যদি থাকত হাতে—একে সে

গুলি করতে পারত ? কেউ দেখত না, জানত না অতি সহজে সমস্ত শেষ হয়ে যেত—এমন অভাবিত সুযোগ। কিন্তু সে পারত কি ?……কম্পিত হাতে কোটটা টোনির গায়ে ফেলে দিয়ে সে স্খলিত পদে বাইরে এসে রেলিংএ হেলান দিয়ে দাঁড়ালে।

হত্যার মন্ত্রের সে দীক্ষা নিয়েছিল—দিনে দিনে প্রাণপণে সে মন্ত্রের সাধনা করেছিল। কী কঠোর ব্রত, কত সংহত মনে সাধনা। গীতার বাণী শুনেছে—ব্রহ্মচর্য্য পালন করেছে—জীবনের সঙ্গে মরণ নিয়ে খেলা—ভয়কে তারা জয় করতে শিখেছে। কিন্তু নিজে নারী বলে কৃষ্ণার মনের খুব গোপনে একটা লজ্জা ছিল—পাছে কোন দুর্বলতা তাকে পরাজিত করে—কোন নির্দ্দয়তায় মন বিমুখ হয়ে যায়। নিষ্ঠুরতাকে বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষিত করেছে—greatest good to greatest number। হত্যা করাকে নানা গৌরবে গৌরবান্বিত করেছে, অবুঝ মন যদি অশান্ত হয়েছে কখন তাকে শান্ত করে ঘুম পাড়িয়েছে বারবার বলে বলে, "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন—"। বিচার বুদ্ধিতে কোন বিপ্লব জাগেনি তখন, এখন এমন দ্বন্দ্ব বেধেছে কেন ?

এমন হয়নি কখন। যখন কী কষ্টে কতদিন ধরে বন হতে বনে পশুর মত বিতাড়িত হয়ে বেড়িয়েছে—মনে হয়েছে রাণা প্রতাপ শিবাজীর কাহিনী। পোড়ো বাড়ীর ভাঙ্গা ঘরে দিন কাটিয়ে নিজকে ভেবেছে দেবী চৌধুরাণী—একদিন যে জগৎ জয়ী হবে। দুর্গন্ধ অন্ধকার কারাকক্ষে বসে মনে হয়েছে সে Saint Joan—দেশের দৈন্য সেই ঘোচাবে। দুঃস্বপ্নের মত কারাগার তার বিভীষিকা নাশ করে আবির্ভাব হলেন স্বয়ং শক্তিরূপিণী দশভুজা—তাকে দিয়েছেন শক্তি, কখন এলেন চতুর্ভুজ নারায়ণ—তাকে দিলেন তাঁর চক্র—শত্রুকে হত্যা করে তারাই করবে দেশকে স্বাধীন—সন্ত্রাসবাদীর সন্ত্রাসে দেশ হবে শত্রুশূন্য। এই সব দিশা দেখে দেখে দিন কোথা দিয়ে কেটে গেছে।

তারপর এল স্বপ্ন ভাঙ্গার দিন। বিকীর্ণ সমুদ্রের মত সশস্ত্র শাসনের মাঝে কয়েকটি গোলাগুলি, কতগুলি প্রাণ বুদ্বুদের মত ফেটে মিলিয়ে গেল—যারা অবশিষ্ট রইল কে কোথায় ছড়িয়ে গেল। ছদ্মবেশে দেশ ছেড়ে পালান—কী ক্ষোভ; কী অপমান……

কোথায় তার দেবতার আবির্ভাব—কোথায় তাদের বিশ্বজয়ের বিজয় বার্ত্তা। কড়া মদের মত যে মন্ত্রের উগ্র নেশায় দুঃসহ দুঃখকে উপেক্ষা করেছে—সে মন্ত্র বিফল হয়ে গেল—নেশা গেল টুটে। এতদিন ধরে দুঃসহ দুঃখের দীক্ষা নিয়ে যে সুখের স্বপ্নে সমস্ত সহ্য করেছে তা সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। অদৃষ্টের কাছে এমন করে হার মানতে হল। কী লজ্জা……

নিরাশায় নুয়ে যেয়ে ভাঙ্গবার মেয়ে কৃষ্ণা নয়—ছদ্মনামে ছদ্মবেশে বহু কষ্টে পলায়নের পালা শেষ করে যখন সে ফের মাথা তুলে তাকাবার অবকাশ পেলে নিজেকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলে না —দুঃখ পেয়েছে বলে দুঃখ ছিল না কিন্তু দুঃখের মাঝে সুখের স্বপ্ন দেখে রইল কেন এতদিন। দেবতার তাদের বরদান—সাক্ষাৎ দেবীর দর্শন—কী মরীচিকা—নিষ্ফল ক্রোধে কৃষ্ণার কষাঘাত করতে ইচ্ছে করে নিজেকে।……

এবার হতে জীবনের দৈন্য দুঃখ দেখে ভবিষ্যতের মঙ্গল সম্ভাবনার শূন্য সান্ত্বনা কখন দেবে না মনকে। অনাবৃত বাস্তবের দিকে অকুণ্ঠ চোখে তাকাবে—কল্পনা-বিলাসী মনের দিবা সপ্ন দিয়ে তাকে নানা রঙ্গে সে রঙ্গীন করবে না আর কোন দিন। এখন যখন শোনে সুখবাদী লোকের বিবেচনাবিহীন মতবাদ—তারা ত্যাগের তর্ক তোলে, দুঃখের মহত্ব দেখাতে বসে, দুর্দ্দমনীয় বিদ্রূপে কৃষ্ণা বিষিয়ে উঠতে থাকে ভিতরে বাহিরে। যখন ছাখে ভগবানের ওপর মানুষের কত নির্ভরতা কত অন্ধ বিশ্বাস—কষ্টে সে সামলে রাখে নিজেকে—মনে হয় এখুনি চীৎকার করে হেসে উঠবে।

……কনকনে হাওয়ায় কৃষ্ণা কেঁপে উঠল। শিশিরভরা ঘাসের ঘনস্নিগ্ধ সুগন্ধে নিঃশ্বাস ভরে উঠে। শুদ্ধ শুভ্র পাহাড়ের চূড়াগুলি যুক্ত হস্তের অনন্ত প্রণামের মত উর্দ্ধে আকাশে উন্নত হয়ে আছে। হালুকা কয়েক কুচি মেঘ—কোন পূজারিণীর পূজার থালা হতে ঝরে পড়া পদ্মের পাপড়ি একমুঠো—পূর্বাকাশে তরল রঙ্গীণ রং—কার কলস হতে উপ্‌চে পড়া তীর্থবারির ধারার মত। মুখরা মাটির বহু উর্দ্ধে এই শুব্ধ প্রভাত—বেদবন্দিতা উষার একটি মৌন পুণ্যশ্লোকের মত পবিত্র ও দ্বন্দ্বে দীর্ণ, দুঃখে দোলা-

স্নিগ্ধ জীবনের ওপরে শান্ত মরণের প্রসন্ন প্রশান্তির মত পরিপূর্ণ।

……শিশিরে ভিজে উঠেছিল কৃষ্ণার হাত—অগ্নি-শিখার মত জীবনভরা হাত, হাতের তলায় চোখে পড়ল কালো একটা দাগ।—রিভলভারের নিয়ত অভ্যাসে কড়া পড়ে গেছল—এখন কড়া মিলিয়েছে, দাগ রয়ে গেছে। দাগটার দিকে চেয়ে তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল রিভলভার অভ্যাসের সময় সে একদিন একটা উড়ন্ত পায়রাকে গুলি করে মেরেছিল—পায়রার বুকের নরম সাদা পালক রক্তে ভিজে উঠল,—চোখের চাউনি তার কী ভীত অসহায়। কোন রাগ ছিল না তার মাঝে শুধু একটা ব্যথিত বিস্ময়। পায়রাটাকে মেরে কৃষ্ণার ভাল লাগেনি একটুও। কিন্তু ভাল না লাগায় তখন নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিল—তার অব্যর্থ লক্ষ্যের গুরু প্রশংসা করেছিলেন, তুমিই পারবে—পুলকে গর্বে মন উঠেছিল ভরে। কি হল তার সারকতায়? আজকে সে বাণীর মূল্য মনে নেই—মনে পড়েছে মরন্ত পাখীর ম্লান সকরুণ দৃষ্টি আর নরম শাদা পালকে রক্তের দাগ। আর মনে পড়ল টোনির ঘুমন্ত মুখের সহায়শূন্য শৈথিল্য। কৃষ্ণার সদা বিদ্যুৎ ঝলসিত চোখে আজ অকারণে জল ভরে উঠল, নিজেই সে বিস্ময় বোধ করলে দেখে কিন্তু বাধা দিলে না। তার স্বভাবের সুদৃঢ় সংযমে চোখের জল ফেলতে সে ভুলে গেছল এতদিন—আজ মনে হয় চোখের জলেরও কিছু প্রয়োজন আছে যেন কোথায়।…

ফেরবার সময় কৃষ্ণা টোনি দুজনে অন্যমনস্ক ভাবে নিজের ভাবনায় নীরব হয়ে ছিল—বিশেষ কোন কথা কেউ বল্ল না। পাহাড় থেকে নেমে ফিউনিকুলার রেল ছেড়ে যখন দুজনে বেরিয়ে বাইরে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল হঠাৎ কৃষ্ণা হাসলে।

টোনি বল্লে, "কি হোল।"

"মনে পড়ল মিসেস্ হিগিনস্‌কে।—যখন শুনবেন কাল রাতের কথা, ভাববেন কি। গেল বুঝি সব—সমস্ত soul, prestige, religion in danger—কোনটা ছেড়ে কোনটা সামলান তিনি—"

দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল।…… (ক্রমশঃ)

শ্রীইলা দেবী

করিও না অভিমান

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

মম স্মৃতি-বিলাসিনী করিও না অভিমান,
বসন্তে যদি নব উৎসবে পুরাতন তব প্রেম গৌরবে
নব প্রেমিকার গলে নব মালা করি দান।
করিও না অভিমান।

বঞ্চিত হিয়াতলে সঞ্চিত মম গান
কারো কপোলের রাঙা রঙে মিশে যেতে চায় যদি আর কোন দিশে
করে যদি নব রসে নব সুরে অভিযান,
করিও না অভিমান।

বাতায়ন হোতে এসে যদি কারো আহ্বান,
নব প্রভাতের হেমকরে নাহি, কালো নয়নের দিঠি পথ বাহি
মরমে আমার তোলে নানা ছলে কলতান,
করিও না অভিমান।

বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ কেহ যদি মোর প্রাণ
বিনুনীর পাকে, ধীরে ধীরে বাঁধে, জানালায় বসি সোহাগের সাধে
দেয় মোর বাঁধনের নব প্রেম অভিধান,
করিও না অভিমান।

নদীজলবিলাসিনী কারো নয়নের টান,
গুণ্ঠনবাধা ধীরে অপসারি, টানে এসে যদি হৃদয় আমারি,
দেখি যদি চেয়ে তার লীলারত মধু স্নান,
করিও না অভিমান।

নিবেদিত তব প্রেমে যদি করি ওগো দান
অন্তরে ঢাকা পূজার প্রসুন নূতন প্রেমের পূজায় নতুন,
আকাশে বাতাসে যদি ছুটে চলে তারি ঘ্রাণ,
করিও না অভিমান।

করি যদি তব প্রেম নব প্রেমে মহিয়ান,
শুনে যদি কারো কঙ্কণ-গীতে স্পন্দিয়া উঠে এ আমার চিতে
শোণিতের তালে তালে বাসনার নব গান
করিও না অভিমান।

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

বাঙ্‌লা সাহিত্যের মধ্য যুগ

ডক্টর মনোমোহন ঘোষ এম, এ, পি-এইচ, ডি, কাব্যতীর্থ

চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাসের পরেই এই যুগের লেখক মালাধর বসুর নাম। তিনি খৃঃ ১৪৭৩ হইতে ১৪৮০ অব্দের মধ্যে তাহার শ্রীকৃষ্ণ বিজয় (১) বা গোবিন্দবিজয় কাব্য রচনা করেন। এই গ্রন্থে শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে ভাগবতের অনুবাদের মত মনে হইলেও শ্রীকৃষ্ণ বিজয় সংস্কৃতের আক্ষরিক অনুবাদ নহে। মালাধর বসুর ভাষা কৃত্তিবাসের রামায়ণের মতই বেশ সহজ ও সরল। তাঁহার বর্ণিত কৃষ্ণলীলাও ঐ রামায়ণের উপাখ্যান সমূহের সচ্ছন্দ ও অবাধ গতিকে মনে করাইয়া দেয়। এই সকল কারণে এই কাব্য তাঁহার জীবৎকালেও বেশ সমাদর লাভ করিয়া ছিল। গৌড়েশ্বরের নিকট 'যশোরাজ খান' উপাধি লাভ সেই সমাদরের অন্যতম প্রমাণ। কিন্তু এই কাব্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদর লাভ করিয়া ছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ও কৃষ্ণ প্রেম প্রচারের পরে। চৈতন্য চরিতামৃতে মহাপ্রভুর উক্তিতে আছে :—

গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।
তাঁহা এক বাক্য তার আছে প্রেমময়॥
"নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।"
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ॥

কিন্তু মহাপ্রভুর এই প্রশংসা শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের কাব্যগুণের সমালোচনা নহে। শ্রীকৃষ্ণের চরিত বলিয়াই ইহা তাঁহার প্রিয়। তবু মহাপ্রভুর এই প্রশংসাবাদে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের লোকপ্রিয়তা যে বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার ফলে উত্তর কালে ভাগবতে আলোচিত কৃষ্ণলীলাত্মক বহু ভাষা-কাব্য রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ভক্তি ধর্ম্মের প্রচার হেতু শ্রীকৃষ্ণবিজয় লোকপ্রিয় হইলেও ইহা কাব্যাংশে হীন নহে। সহজ সরল বর্ণনায় এবং উপাখ্যানের মাধুর্য্যেও ইহা উত্তম কাব্যের সম্মান দাবী করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের শৈশব লীলার বর্ণনায় মালাধর লিখিতেছেন :—

রজনী প্রভাত হইল রাম দামোদরে।
বাছুর লইয়া যান যমুনার তীরে॥
ভোজন করিয়া সবে শিঙ্গা বাজাইয়া।
পাছু যায় শিশুগণ বৎস চালাইয়া।
একত্র হইয়া সবে যমুনার তীরে।
নানাবিধ জলক্রীড়া করি ধীরে ধীরে॥
কোথাহ মর্কটশিশু লাফ দেই রঙ্গে।
হেন মতে যান কৃষ্ণ ছাওয়ালের সঙ্গে॥
চিত্র বিচিত্র গতি ময়ুরে নৃত্য করে।
তাহা দেখি তেমত নাচে রাম দামোদরে।
কতিহো কোকিল পাখী সুস্বরনাদ পুরে।
তাহার সঙ্গে রা কাড়ে রাম দামোদরে॥

কোথাহ বুলে ফুল তুলিয়া মুরারি।
কত গলে কত কাণে কত মাথে পরি।
হেন মতে বৃন্দাবনে বিহরে গোপাল।

উদ্ধৃত স্থলে কৃষ্ণ বলরামের যে শৈশব ক্রীড়ার ছবি পাওয়া যায় তাহা বেশ মনোরম। যে স্থানে কৃষ্ণের মথুরা গমনে গোপীগণের বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে তাহাও উল্লেখযোগ্য। যথা—

আজি শূন্য হইল মোর রসের বৃন্দাবন।
শিশু সঙ্গে কেবা আর রাখিবে গোধন॥
অনাথ হইল আজ সব ব্রজবাসী।
সব সুখ নিল বিধি দিয়া দুঃখ রাশি॥

আর না দেখিব সখি সে চাঁদ বদন।

---

(১) এই গ্রন্থ এক্ষণে মুদ্রিত পাওয়া যায় না। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ, রায় বাহাদুর মহাশয় ইহার এক নূতন সংস্করণ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির করিতেছেন।

আর না করিব সখি সে মুখ চুম্বন॥
আর না যাইব সখি কল্পতরু মূলে।
আর কানু সঙ্গে সখি না গাঁথিব ফুলে॥
শিয়রে না দিব আর কানাইর হাথে।
নানা ফুল আর কৃষ্ণ না পরাবেন মাথে॥
কৃষ্ণ গেলে মরিব সখি তাহে কিবা কাজ।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ॥
অল্প ধন লোভ লোকে এড়াইতে পারে।
কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে॥

এই বিলাপ বর্ণনায় এক দিকে আমরা যেমন কবির অন্তর্নিহিত ভক্তির পরিচয় পাই অপরদিকে তেমনি লক্ষ্য করি তাঁহার কাব্যের সহজ স্ফূর্ত্তি।

নিজ কাব্যের প্রারম্ভে মালাধর বসু লিখিয়াছেন :—

ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি।
তেঁ কারণে ভাগবত গীতচ্ছন্দে গাহি।

অর্থাৎ কথক ঠাকুরদের মুখে ভাগবত শুনিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তাই ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলা যাহাতে সংস্কৃতানভিজ্ঞ গায়কদের দ্বারা গীত হইতে পারে তজ্জন্য তিনি বাঙলা পদ্যে তাহা নিবদ্ধ করেন। কৃষ্ণ চরিতের বহুলপ্রচারের জন্য তাঁহার এই উদ্যম সর্বাংশে সফল হইয়াছিল। অধিকন্তু সেকালের বঙ্গ সাহিত্যও বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছিল তাঁহার এই রচনায়।

শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের পরই বিজয় গুপ্ত রচিত 'মনসা মঙ্গলে'র নাম করিতে হয়। এই গ্রন্থ খুব সম্ভব ১৪৯১ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রচিত হয়। মনসামঙ্গলের অপর নাম 'পদ্মাপুরাণ'। নাম দেখিয়া মনে হইতে পারে যে ইহা অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত কোন পুরাণ গ্রন্থের অনুবাদ। কিন্তু তাহা সত্য নহে। এই তথা কথিত পুরাণ একখানি 'ভাষা'-গ্রন্থ। তবে পুরাণাদির মতই অদ্ভুত উপাখ্যানাদিতে পূর্ণ। মনসামঙ্গলের আখ্যানবস্তু নিম্নলিখিতরূপ—

কাশীতে মহাদেব গৌরীর (চণ্ডিকার) সহিত সুখে বাস করিতেছিলেন এমন সময় নারদ আসিয়া একদিন তাঁহাকে দিলেন দর্শন। কথাপ্রসঙ্গে মহাদেব কাশীর গৌরব ব্যাখ্যা করিলে নারদ বলিলেন যে চণ্ডিকার সৃষ্ট সরযূতীরবর্ত্তী উদ্যানে যে পুষ্প আছে তাহা কাশীতে দুর্লভ। মহাদেব তখন গোপনে সেই পুষ্প বনে যাইবার অভিপ্রায় নারদকে জানাইলেন। এদিকে কলহসৃজনপটু নারদের মুখ হইতে খবরটি দেবীর কানেও গেল। যথাকালে চণ্ডীকে ছলনা করিয়া শিব সরযূতীরের পুষ্পোদ্যানে হইলেন উপস্থিত। সেখানে বিচিত্র অবস্থার মধ্যে জন্মিলেন তাঁহার কন্যা মনসা বা পদ্মাবতী। শিবের পলায়ন টের পাইয়া চণ্ডী বিলাপানন্তর তাঁহার সন্ধানে সরযূতীরে চলিলেন। সেখানে খেয়ানী ডোমনারীর নিকট জানা গেল শিবের আগমন। দেবী তখন খেয়ানীকে বিদায় করিয়া তাহার নৌকা লইয়া ডোমনীর বেশে খেয়া ঘাটে রহিলেন। ফিরিবার পথে পার হইতে আসিয়া মহাদেব ডোমনীর রূপে হইলেন মোহিত। ফলে মহাদেব ও ডোমনীর ঘরকন্না আরম্ভ হইল। শিব ছদ্মবেশিনী ডোমনীর হস্তের রন্ধন ভোজন করিলে পর দেবী আত্ম প্রকাশ করিরা শিবকে তিরস্কার করিলেন। তারপর দেবী অন্তর্হিত হইলে শিব ফুলের সাজিতে পুরিয়া মনসাকে লইয়া ফিরিলেন কাশীতে।

সেখানে তাহাকে তিনি 'বচাই' নামক তাঁহার কোন ভক্তের বাড়িতে রাখিলেন। সুন্দরী কন্যা দেখিয়া সেই ব্যক্তি মনসাকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করিলে তিনি তাহার প্রতি হানিলেন বিষের দৃষ্টি। বচাই প্রাণ হারাইল ও তাহার মায়ের বিলাপ আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ পরে শিব আসিয়া বচাইর মাতাকে দিলেন মনসা পূজার উপদেশ। বচাইর মা পূজা করিলে মনসা বচাইকে পুনরায় বাঁচাইলেন। তাহার পরে মনসাকে লইয়া শিব গেলেন নিজের ঘরে। সেখানে শিবের সতর্কতা সত্ত্বেও চণ্ডী তাহাকে করিলেন আবিষ্কার। ফলে ঘটিল শিব ও চণ্ডীর কলহ; এবং মনসা চণ্ডীর হাতে বিস্তর প্রহার লাভ করিলেন। সপত্নী গঙ্গা আসিয়া এজন্য চণ্ডীকে করিলেন তিরস্কার। ফলে দুই সতীনে বাধিল কোন্দল। মনসা তার পর চণ্ডীকে সর্প মূর্ত্তিতে দংশন করিলেন। চণ্ডী প্রাণহীন হইলে মহাদেবের হইল শোক। অতঃপর পিতার অনুরোধে মনসা সৎমাকে জীয়াইয়া তুলিলেন। এই সকল ঘটনার পরে হইল মনসার বিবাহ। বর জরৎকার মুনি।

একদা স্বামীর সহিত কলহ হইলে মনসা সেই মুনিকেও বিষ নয়নে দেখিলেন। মুনির প্রাণ যাইতে বিলম্ব হইল না

কিন্তু শিবের অনুরোধে মনসা মুনিকে আবার জীয়াইলেন। ইহার পর মনসার আর বেশি দিন স্বামীর সঙ্গে ঘর করা হইল না। কোন এক অজুহাতে জরৎকারু মনসাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার বরে মনসা হইলেন অষ্টনাগের জননী। এই অষ্টনাগ চণ্ডীর কৌশলে মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত হইলে মহাদেব দেবগাভী সুরভির দুগ্ধে এক নদী পূর্ণ করিয়া সেই আটটি সর্পকে পোষণ করিলেন। নাগের জন্য যেই দুগ্ধে নদী পূর্ণ করা হইয়াছিল সেই দুগ্ধে ছিল বিষ। কৌতূহলবশতঃ এই দুগ্ধ পান করিয়া মহাদেব হারাইলেন প্রাণ। দেবী চণ্ডিকা স্বামী শোকে বিলাপ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মনসা আসিয়া ঝাড়ফুক করিলে পর শিব উঠিলেন বাঁচিয়া। সমুদ্র মন্থনকালে বিষ পান করিয়াও মহাদেব আবার প্রাণ হারাইলেন কিন্তু নিজ কন্যা মনসা এবারেও তাঁহাকে করিলেন পুনর্জীবিত। শিব এমন কন্যার প্রতি যে পক্ষপাত করিবেন তাহাই স্বাভাবিক কিন্তু গৌরীর চোখে তাহা সহ্য হইল না; তিনি এই ব্যাপার লইয়া শিবের সঙ্গে তুমুল কলহ করিলেন। তখন নিরুপায় শিব মনসাকে বনবাসে দেওয়ার অঙ্গীকার করিয়া তবে দেবীকে শান্ত করিলেন। বনবাসের কথায় বিচলিত মনসার হইল মাতৃভক্তির উদয়। তিনি চণ্ডীর প্রসাদ লাভের জন্য করিলেন স্তবস্তুতি কিন্তু চণ্ডী অটল রহিলেন।

শিবের তখন খুব দুঃখ হইল। দুঃখিত শিবের নেত্র জল হইতে জন্মিল মনসার অনুচরী নেতা। মনসা যথাকালে জয়ন্তী নগরে নির্বাসিত হইলেন। সঙ্গে রহিলেন এই নেতা। অচিরে মনসার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা তাহার জন্য এক পুরী তৈরী করিলেন। দেবী মনসা করিতে লাগিলেন সগৌরবে বিরাজ। ক্রমে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার হইতে আরম্ভ হইল। মনসার প্রথম কীর্ত্তি হইল প্রতিমাপূজা বিরোধী হাসন হোসেনের দমন। হোসেনের শ্যালক কাজী মনসাদেবীর ঘট ভাঙিয়া ফেলিলে সর্পের উৎপাতে মুসলমান জোলাদের পল্লীতে হাহাকার উঠিল। পরে ছদ্মবেশী নারদের উপদেশে মনসার পূজা করিলে সর্পাঘাতে মৃত জোলা ও অন্যান্য মুসলমানগণ বাঁচিয়া উঠিল।

মনসা দেবীর দ্বিতীয় ও প্রধান কীর্ত্তি চিরবিদ্বেষী চন্দ্রধর নামক বণিকরাজের নিকট পূজালাভ। কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া মনসা এক গন্ধর্বকে মানুষরূপে মর্ত্ত্যলোকে পতিত হওয়ার অভিসম্পাত দেন। ঐ গন্ধর্বও পাল্টা মনসা দেবীকে এই শাপ দেন যে মনুষ্যকুলে জন্মিয়া তিনি যদি পূজা না করেন তবে দেবী মনসা পূজা পাইবেন না। যথাকালে ঐ গন্ধর্ব চম্পক নগরে চাঁদ সদাগর নামে জন্ম লইলেন। যৌবনে তাঁহার বিবাহ হইল মনসার ভক্ত সোনেকা নামে বনিক কন্যার সহিত। কালক্রমে তাঁহাদের জন্মিল ছয় পুত্র। বাণিজ্যে বিপুল ধনলাভ করিয়া চাঁদ হইলেন মহা ধনশালী এবং তাহার পরে পুত্রদের দিলেন বিবাহ। পুত্রদের বিবাহের পরে চাঁদ পুনরায় বিদেশে বাণিজ্যে গেলেন। প্রচুর ধনরত্ন বোঝাই নৌকা ঘাটে ফিরিলে তিনি স্ত্রীর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যেন সোনেকা আসিয়া নৌকাগুলিকে বরণ করেন। যে লোক খবর লইয়া গেল সোনেকা তাহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি মনসার পূজা সারিয়া তবে নৌকাবরণে আসিবেন। এই সংবাদ পাইয়া চাঁদ সদাগর হইলেন বিষম ক্রুদ্ধ। গৃহে আসিয়া তিনি হিন্তালের যষ্টি দিয়া মনসার ঘট ভাঙ্গিলেন এবং পূজার উপকরণাদি লণ্ডভণ্ড করিলেন। দেবী মনসাকে গালাগালিও দিলেন বিস্তর। প্রতিশোধ লইবার জন্য মনসা চাঁদের বিরাট সুপুরির বাগান করিলেন ধ্বংস। চাঁদের বন্ধু শঙ্কর গাড়ুড়ীর মন্ত্রবলে সর্পদষ্ট গাছ হইল সব পুনর্জীবিত। এবার শঙ্কর গাড়ুরীর উপর হইল মনসার কোপ। মনসা গোয়ালিনীর বেশে আসিয়া শঙ্কর গাড়ুরীকে বিষমিশ্রিত দধি দান করিলেন কিন্তু গাড়ুরী সেই বিষ খাইয়াও নিজের শিষ্যদের মন্ত্রগুণে বাঁচিয়া রহিলেন। মনসা তখন ছদ্মবেশে গাড়ুরীর স্ত্রীর সহিত সখিত্ব স্থাপন করিয়া কৌশলে গাড়ুরীর নিধনের সুযোগ করিলেন আবিষ্কার, গাড়ুরী নিহত হইলেন।

তাহার পর মনসা নটীর ছদ্মবেশে চাঁদ সদাগরের নিকটে গিয়া কামকলার প্রলোভনে তাঁহার 'মহাজ্ঞান' করিলেন হরণ। এই মহাজ্ঞানের বলে চাঁদ সর্পদষ্টকে বাঁচাইতে পারিতেন। ইহার পরই তাঁহার ছয় পুত্র মরিল সর্পদংশনে। তার পরে মনসা দেবীর কার্য্য উদ্ধারের জন্য উষা ও অনিরুদ্ধের মর্ত্ত্য-

লোকে অবতরণের ব্যবস্থা হইল। এই উভয়ের দেহত্যাগের পর তাহাদের প্রাণ লইয়া যমদূত ও মনসার দূতের সঙ্গে হইল কলহ। ফলে যমরাজার সঙ্গে ঘটিল নাগনেত্রী মনসার যুদ্ধ। যুদ্ধে যমরাজা নাগপাশে বন্দী হইলেন। তারপর ব্রহ্মার দূত নারদের অনুরোধে মনসা যমকে করিলেন মুক্ত। পুত্রশোকে কাতর চাঁদ সদাগর শোক বিস্মৃত হওয়ার জন্য নৌকা সাজাইয়া আবার বিদেশে বাণিজ্যে চলিলেন। পনর ষোল বৎসর ধরিয়া বাণিজ্যে বিপুল ধন অর্জ্জনের পরে চাঁদ সদাগর দেশে ফিরিবেন সঙ্কল্প করিলেন। যথাকালে দেবতার অর্চ্চনা করিয়া যাত্রা করিবার ব্যবস্থা হইল। এমন সময় মনসা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে আসিয়া প্রার্থনা করিলেন চাঁদ সদাগরের পূজা। পূজা না করিলে জলযাত্রায় বিপদ হইবে এই ভয় দেখাইলেন। সদাগর নির্ভীকভাবে গালাগালি দিয়া মনসাকে দিলেন বিদায়। ফলে মনসার কোপে চাঁদের ধন-রত্নপূর্ণ চৌদ্দখানি নৌকা সমুদ্রের জলে ডুবিল। চাঁদ যে অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া বাঁচিলেন তাহার কারণ তাঁহাকে মারিলে মনসার পূজা জগতে প্রচার হইবে না।

এদিকে চাঁদের বাণিজ্যযাত্রার পর দশম মাসে সোনেকা এক পুত্র প্রসব করিলেন। তাহার নাম হইল লক্ষ্মীন্দর। পিতা বিদেশে থাকিতেই লক্ষ্মীন্দর যৌবনপ্রাপ্ত ও কৃতবিদ্য হইলেন।

নৌকাডুবি হইতে রক্ষা পাইয়া চাঁদ নানা বিপদের মধ্য দিয়া এমন নিঃস্ব অবস্থায় নিজগৃহে ফিরিলেন যে তাহার নিজ পত্নী সোনেকাও প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। গৃহে ফিরিয়া পুত্রমুখ দেখিয়া চাঁদের নষ্ট অর্থের শোক হ্রাস পাইল। ক্রমে তিনি পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। সোনেকা এই বিবাহে করিলেন অমত; কারণ মনসা দেবী তাহাকে এই ভয় দেখাইয়া ছিলেন যে বিবাহের রাত্রে লক্ষ্মীন্দরের হইবে সর্পদংশনে মৃত্যু। চাঁদ এই ভয়ে ভীত হইলেন না। বেহুলা নামক বণিক কন্যার সঙ্গে লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ স্থির করিলেন। বরকন্যার বাসর যাপনের জন্য এক লৌহ-নির্ম্মিত মন্দির হইল তৈরী। বিবাহের পর লক্ষ্মীন্দর-বেহুলা এই লোহার বাসরে রহিলেন। কিন্তু মনসা দেবীর আদেশে লৌহমন্দিরের নির্ম্মাতা গোপনে তাহাতে যে একটি ছিদ্র রাখিয়া ছিল তাহার ভিতর দিয়া গিয়া একটী সূতার মত সাপ বিবাহের রাত্রিতে লক্ষ্মীন্দরকে দংশন করিল। লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যু হইল। সংবাদ পাইয়া পিতামাতা বহু বিলাপ করিলেন। বেহুলার পিতামাতাও করিলেন বিলাপ। সর্পদষ্টকে দাহ করার রীতি নাই। তাই কলায় মাজুষে (ভেলায়) করিয়া লক্ষ্মীন্দরের দেহ নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। সঙ্গে বেহুলাও সেই ভেলায় চড়িলেন। পিতামাতা ও অন্য সকল আত্মীয় তাহাকে মৃতদেহের সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিলেও তিনি তাহাতে কান দিলেন না এবং মৃত স্বামীকে পুনরায় বাঁচাইবেন এই সঙ্কল্প সকলকে দৃঢ়ভাবে জানাইলেন। পথিমধ্যে অনেক বিপদ কাটাইয়া মৃত দেহের সঙ্গে কলার ভেলায় নদীর বুকে ভাসিতে ভাসিতে ছয় মাস পরে বেহুলা নেতা ধোবানীর ঘাটে গিয়া পৌঁছিলেন। এই নেতা ধোবানী মনসা দেবীর আশ্রিতা ছিলেন এবং তাঁহার কাপড় কাচিতেন।

বেহুলা লইলেন তাহার আশ্রয়। নেতা বেহুলাকে আশ্রয় দিয়াছেন জানিয়া মনসা রাগিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। তখন নেতাও ক্রুদ্ধ হইয়া দেবীকে এই বলিয়া ভয় দেখাইলেন যে তিনি নিজ ক্ষমতা বলে লক্ষ্মীন্দরকে পুনর্জীবিত করিয়া দেশে পাঠাইবেন। মনসা তখন কিছু ঠাণ্ডা হইলেন কিন্তু তাহার উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া নেতা বেহুলাকে গিয়া বলিলেন যে নৃত্য গীতে যদি সে মহাদেবকে তুষ্ট করিতে পারে তবে তাঁহার বরে স্বামীকে পুনর্জীবিত করিতে পারিবে। নেতার উপদেশ অনুসারে অতি প্রত্যুষে শিবের ভবনের সম্মুখে গিয়া বেহুলা গীত আরম্ভ করিলেন। গীত শুনিয়া মহাদেব বেহুলাকে নিজের নিকটে করিলেন আহ্বান। শিবও গৌরীর সম্মুখে বেহুলা অপূর্ব্ব নৃত্য গীত করিলে পর শিব পরিতুষ্ট হইয়া তাহার পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলেন। সমস্ত বিবরণ জানিয়া শিবের হইল দয়া। চণ্ডীরও তখনই মনে পড়িল শিবপুত্রী দুরন্ত মনসাকে। বেহুলার স্বামীকে জীয়াইবার জন্য তিনিও করিলেন মহাদেবকে অনুরোধ। শিব ও মনসাকে স্বামীদান দিতে অঙ্গীকার করিলেন। অতঃপর মনসাকে ডাকিতে

পাঠাইলেন নিজ অনুচর নন্দীকে, কিন্তু মনসা শিরোবেদনার ভান্ করিয়া আদেশ এড়াইতে চাহিলেন। তখন মহাদেব ব্যাপার বুঝিয়া পাঠাইলেন গণেশকে। গণেশও তাঁহাকে পিতার কাছে আনিতে পারিলেন না। তখন গেলেন কার্ত্তিক। কার্ত্তিকের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া মনসা আসিলেন মহাদেব নিকট। তখন বেহুলার নৃত্য চলিতেছিল এবং শিব একাগ্র ভাবে দেখিতেছিলেন সেই নৃত্য। তাহার পর বেহুলার স্বামীর প্রাণ দানের জন্য শিব করিলেন মনসাকে আদেশ। তখন মনসা লক্ষীন্দরের প্রাণনাশ ব্যাপারে নিজের কর্তৃত্ব অস্বীকার করিলেন কিন্তু বেহুলা তাহাকে স্পষ্টভাবে ঐ ব্যাপারের জন্য শিবের নিকট করিলেন অভিযুক্ত।

মহাদেব বেশ শান্ত ভাবে মনসা ও বেহুলার উক্তি প্রতুক্তি শুনিতেছেন দেখিয়া দেবী চণ্ডিকা ক্রুদ্ধ হইলেন ও মহাদেবকে ভৎর্সনা করিয়া অন্যত্র গেলেন চলিয়া। দেবীর অনুপস্থিতিতে মহাদেব নৃত্যকারিণী বেহুলার প্রেম প্রার্থনা করিলেন। বেহুলা তাঁহার এই অনুচিত ব্যবহারের প্রতিবাদ করিলে শিবের হইল চৈতন্য। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া মনসাকে আবার লক্ষীন্দরের প্রাণদানের আদেশ করিলেন। এইবার মনসা নিজকে বিব্রত বোধ করিয়া বেহুলার সহিত সদ্ভাব করিতে গেলেন। চাঁদ সদাগরের হাতে তাঁহার যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাহা তিনি একে একে বিবৃত করিলেন বেহুলার নিকট। বেহুলাও মনসাকে নিজের দুঃখের কাহিনী ও কিরূপে বিবাহের পর দিন হইতে মৃত স্বামী লইয়া নদীর বুকে ছয় মাস কাটিয়াছে তাহার করুণ বিবরণ শুনিতে হইল মনসাকে। তার পর মনসা লক্ষীন্দরকে পুনর্জীবিত করিলেন। বেহুলার প্রার্থনায় মনসা কর্তৃক চাঁদ সদাগরের অপর ছয় পুত্র এবং শঙ্কর গাড়ুরীয়ও পুনর্জীবিত হইল। কালিদহে চাঁদ সদাগর (ধন-রত্নসহ যে চৌদ্দখানি নৌকা হারাইয়া ছিলেন তাহাও মনসার কৃপায় বেহুলার নিকট আসিল। এই চৌদ্দখানি নৌকা ও ছয় ভাসুরাদিসহ বেহুলা আবার উপনীত হইলেন শ্বশুরের দেশে। নদীবক্ষে সদাগরের নৌকা দেখিয়া লোক জন ছুটিয়া চাঁদকে খবর দিল। নিজ পত্নী ও পুরোহিতাদিসহ চাঁদ নদীকূলে আসিয়া হইলেন উপস্থিত। এবার বেহুলা শ্বশুরকে বিনীতভাবে জানাইলেন যে যদি তিনি মনসাকে পূজা করেন তবেই তাহার ধন ও পুত্রাদি উপরে উঠিবে নচেৎ তাহাদিগকে আবার দেবপুরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। পুরোহিতও এ বিষয়ে চাঁদকে করিলেন অনুরোধ কিন্তু চাঁদ রহিলেন অটল। মনসাকে পূজা দিতে তিনি কিছুতেই হইলেন না স্বীকৃত। এমন সময় দৈববাণী হইল; চণ্ডী আকাশ হইতে চাঁদকে বলিলেন যে তিনি আর মনসা অভিন্ন। চাঁদ মনসাকে পূজা দিলে তাঁহাকেই পূজা দেওয়া হইবে। তাহার পর চাঁদ শূন্যে একই রথে চণ্ডী ও মনসার মূর্ত্তি দেখিলেন। দুই মূর্ত্তিতে ছিল না কোন প্রভেদ; তাই তখন চাঁদ মনসাকে পূজা দিতে হইলেন স্বীকৃত।

মনসাকে ষোড়শোপচারে পূজা দেওয়ার পর চাঁদের সাত পুত্র ও বেহুলা বাড়িতে প্রবেশ করিল। তারপর চাঁদ জ্ঞাতিদের ভোজনের করিলেন উদ্যোগ। কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতি-দের মধ্যে একজন বলিলেন যে, বেহুলা স্বামী উদ্ধার করিতে গিয়া ছয় মাস একাকিনী ও অসহায়ভাবে কাটাইয়াছে কাজেই তাহার সতীত্বের 'অগ্নি পরীক্ষা' হওয়া প্রয়োজন। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া বেহুলা জানাইলেন যে তাঁহারা স্বামী স্ত্রী শাপভ্রষ্ট অনিরুদ্ধ এবং উষা। মনসার পূজা প্রচারের জন্য তাহাদের মর্ত্ত্যে আগমন। কার্য্যান্তে তাহারা দেবপুরে করিবেন প্রস্থান। পর দিন স্বর্গ হইতে রথ আসিলে উভয়ে স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

মনসামঙ্গলের উপাখ্যান ভাগের উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত সার হইতে আমরা বিজয় গুপ্ত সৃষ্ট বিভিন্ন চরিত্রের যে পরিচয় পাই তাহাতে গ্রন্থখানিকে উচ্চ শ্রেণীর কাব্য মনে করা কষ্টকর। এক বেহুলা ও চাঁদ সদাগরের ছাড়া কাহারই চরিত্র উল্লেখ যোগ্য নহে। চাঁদ সদাগরের চরিত্র খুবই মহিমাময় ভাবে আরম্ভ করা হইয়াছিল এবং শেষ পর্য্যন্তও তাহাতে অকুণ্ঠিত বীরত্ব এবং অকুতোভয় আত্মাভিমান দেখা গিয়াছে কিন্তু তাহা সত্বেও এমন পুরুষ সিংহকে ছদ্মবেশিনী মনসার নারীকলার নিকট বলিদান করা হইয়াছে। যে সকল দেবতার চরিত্র মনসামঙ্গলে চিত্রিত হইয়াছে তাঁহারা মানুষের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবার দাবী কদাচিৎ

করিতে পারিবেন। সমুদ্র মন্থনকালে মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া শিবের আত্মবিস্মৃতি পৌরাণিক কাহিনী; কাজেই বিজয়-গুপ্ত তাঁহাকে ডোমনীর রূপ-পাশে বদ্ধ করিয়া নূতন কিছু করেন নাই, অথবা দেবাদিদেবের নৃত্যপরায়ণা বেহুলার প্রতি লোলুপতা দেখিয়াও আমরা বিস্মিত হই না। কিন্তু দেবী চণ্ডিকা মনসাকে ধরিয়া ইচ্ছামত গালাগালি ও প্রহার করিয়া তাঁহার মুখে চুণকালি মাখাইলেন এরূপ চিত্র আঁকিয়া বিজয়-গুপ্ত দেবীকে ইতর জাতীয়া নারীর দলে ফেলিয়াছেন এবং তাঁহার দেব মহিমা খর্ব্ব করিয়াছেন।

সমগ্র মনসামঙ্গলেই দেব চরিত্র এরূপ হীনভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। মনসার চরিত্র যেরূপ চিত্রিত তাহাতে তাঁহাকে দেবতা মনে করা দুঃসাধ্য। নিজ পূজা প্রচারের জন্য তাঁহার অশোভন ব্যাকুলতা ও অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে ভক্তরূপে পাইবার জন্য তাঁহার অবলম্বিত ক্রিয়াকৌশল এই উভয়ই তাঁহার চরিত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন করে। বিজয়গুপ্ত মনসাকে বড় করিতে গিয়া শিব এবং পার্ব্বতীকে তাঁহার অপেক্ষা হাস্যকর ভাবে ক্ষমতাহীন করিয়া আঁকিয়াছেন এবং মনসাকেও বড় করিতে পারেন নাই। জগৎসৃষ্টিকারিণী মহামায়াকে এবং জগৎসংহারক শিবকে মনসার বিষে বিগতপ্রাণ হইতে দেখিলে প্রচলিত সংস্কারে বড়ই আঘাত লাগে। নিজ উপাস্য দেবীকে বড় করিতে গিয়া বিজয়গুপ্ত এরূপ আঘাত দিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। এই সকল অদ্ভুতত্বের উপর রহিয়াছে বর্ণনার অসামঞ্জস্য। যেমন একবার বলা হইয়াছে চাঁদ সদাগর যখন শেষবার বাণিজ্য যাত্রা করিলেন তখন লক্ষীন্দর একমাস মাত্র মাতৃগর্ভে। আর একস্থানে তৎপরে বলা হইয়াছে পিতার যাত্রাকালে সে পাঁচ মাস মাতৃগর্ভে। কেবল এই সকলই মনসামঙ্গলের ত্রুটি নহে। স্থানে স্থানে অশ্লীলতা, গ্রাম্যতা এবং স্থূল রুচির পরিচয়ও এই কাব্যখানিকে প্রতিকূল সমালোচনার বস্তু করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও মনসামঙ্গল যে কিয়ৎ পরিমাণে জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ বেহুলার অসাধারণ পতিব্রত্যের কাহিনীর বর্ণনা। যে দেশে সীতা সাবিত্রীর আদর্শ আপামর সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল সে দেশে যে বেহুলার উপাখ্যান লোক সাধারণের মধ্যে সমাদর লাভ করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু পাতিব্রত্যের আদর্শ বর্ণনাই মনসা মঙ্গলের বহুল প্রচারের একমাত্র কারণ নহে। সর্প ভয় দূর হইবে এই আশায়ও লোকে এই মঙ্গলকাব্যের সমাদর করিয়াছে।

এই সকল কথা বিবেচনা করিলে বলিতে হয় মনসামঙ্গল একখানি লোক কাব্য (folk-poem) মাত্র এবং সেই জন্য উহাকে যথার্থ সাহিত্যের মাপ কাটিতে বিচার করা অনুচিত হইবে। লোককাব্যের হিসাবে মনসামঙ্গল মন্দ নয়। অমার্জিত রুচি প্রাকৃত জনের উপভোগ্য বস্তু ইহাতে আছে প্রচুর। যেমন সর্পাঘাতে নিহত জোলার স্ত্রীর বিলাপ বর্ণনায় বিজয় গুপ্ত লিখিয়াছেন:—

আরে আরে আরে জোলা উঠি দেখ মাউগপোলা
আচম্বিতে তোমারে হইল কি।
এইখানে বিছানায় ছিলা নানা সুখে আরো পাইলা
কোছের কাড়িয়া খাইলা পান।
জোলা ছিল বড় ধনী বুনাইয়া দিত লাল ভুনি
পরিয়া বেড়াইতাম বাড়ী বাড়ী।
মোর দুঃখের ওর নাই নিকা বসি যার ঠাঁই
মাসেক না থাকি তার ঘরে।
কত দুঃখ সব গায় দশ দিন নাহি যায়
এই মাসে তিন নিকা মোরে।
এই দুঃখে আমি কাঁদি সতরটা করি যদি
এত আদর নাহি কার হাতে।
আসিনু তোমায় ঘরে খোদায় বঞ্চিল মোরে
তোমা হারাইলাম আচম্বিতে॥
হাটে যাইতে কহি ঝাটে লড় দিয়া যাইত হাটে
বেশাতি আনিত নানা ভাইতে।
শৌল মাগুর কৈ আলু মানকচু চৈ
গুয়া পান আনিত নানা মতে॥
আদার সুন্দর ঝাল খাইতে পোড়ার গাল,
কহিতে বিদরে মোর বুক।
কি মোর হইল আজি কেন বিধি দিল বাজী
এখনে চাইব কার মুখ॥"

পুনর্বার বিবাহে সমর্থ জোলার স্ত্রীর বিলাপের কারণ খুব মোটা হাস্য রসের সৃষ্টি করিয়াছে। নৌকাডুবি হইয়া সর্ব্বস্ব হারাইবার পরে চাঁদ সদাগর এক ব্রাহ্মণের আশ্রয় চাহিলে যাহা ঘটিয়া ছিল তাহাতেও বেশ প্রাকৃত জনোচিত হাস্য রসের ছবি ফুটিয়াছে। চাঁদ আশ্রয়প্রার্থী হইলে ব্রাহ্মণ বলিলেন:—

মোর দাসী আছে বিবাহ করিয়া থাক মোর ঘর।
এতেক বলিয়া দ্বিজ চাঁদরে যায় লইয়া।
আপন পুরীর মধ্যে গেলেন চলিয়া।
দ্বিজ বলে হের আইস ছাঁছিয়া।
তোর ভগ্নী এর ঠাঁই দেও নিয়া বিয়া॥
সেই মাগী হরিষ হইল বড় ভালা।
দুইটা স্তন যেন দুইখান ছালা॥
ঝাঁটা কাটা মাথা, আঙ্গুল দুই চারি চুল।
চান্দর সম্মুখে দাঁড়ায় যেন আচাভুয়া ভূত॥
হস্ত পাতিল তখন চাঁদ সদাগর।
কত খানি তৈল আনি দিল দ্বিজবর॥
স্নান করিবারে চলে চাঁদ সদাগর।
বনের আড়ে গিয়া সাধু উঠিয়া দিল লড়॥
লড় দিয়া যায় সাধু ফিরি ফিরি চায়।
মনে মনে ভাবে চাঁদ পাছে মাগী আয়॥

বরবেশী লক্ষ্মীন্দরকে দেখিয়া নারীগণের পতিনিন্দাও বেশ মোটা রকমের হাস্য সৃষ্টি করিয়াছে। বিজয় গুপ্ত লিখিতেছেন :—

লখাইর রূপে মোহ যায় যতেক যুবতী।
মনে মনে নিন্দা করে আপনার পতি॥
কেহ বলে হরি হরি জগতের পতি।
এই স্বামী যাহার সেই ভাগ্যবতী॥

* * *

ঘরে আছে স্বামী মোর করে কিল কিল।
ইচ্ছা করে লখাইর সঙ্গে থাকি রাত্রি দিন
আর এক আইও আইল তার নাম রুই।
মস্তকে আছয়ে তার চুল গাছ দুই॥
আর এক আইও আইল তার নাম সরু।
গোয়াল ঘরে ধূমা দিতে খোপা খাইল গরু॥

* * * *

আর এক এই আইল তার নাম পাই।
চক্র চক্র দুই গাল তার, নাকের উদ্দেশ নাই॥

* * * *

আর এক আইও আইল তার নাম রাধা।
সেও বলে তার স্বামী পোষানীয়া গাধা॥
সকল গায় নাহি তার কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর রূপ।
গড়িয়া বলদ হেন শুইয়া নিদ্রা যায়।
তাহারে কাটিয়া দি লখাইর দুই পায়॥
হেন স্বামীতে সাধ নাই মাগিয়া গিয়া খাই।
মাগিতে যাচিতে যেন লখাইর দেশে যাই॥
লখাইর দেশে মাগিয়া খাই সেও বড় সুখ।
হাটিতে বসিতে দেখি লখাইর চাঁদ মুখ॥

চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর এবং বিজয়গুপ্ত ব্যতীত অপর কোন কবি এই মধ্যযুগে কিছু রচনা করিয়াছিলেন কিনা তাহা নিঃসন্দেহ রূপে জানা যায় না। কেহ কেহ মনে করেন যে খেলারামের 'ধর্ম্মমঙ্গল' এবং রমাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণ' এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। খেলারামের গ্রন্থ অধুনা দুর্লভ। আর শূন্য পুরাণের যে সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে তাহা দেখিলে মনে হয় যে গ্রন্থখানি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের পূর্ব্বেকার নহে। অতএব বাঙ্‌লা সাহিত্যের মধ্য যুগের বিচার কেবল চণ্ডীদাসাদি চারিজন লেখকের রচনা লইয়াই করিতে হইবে।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ
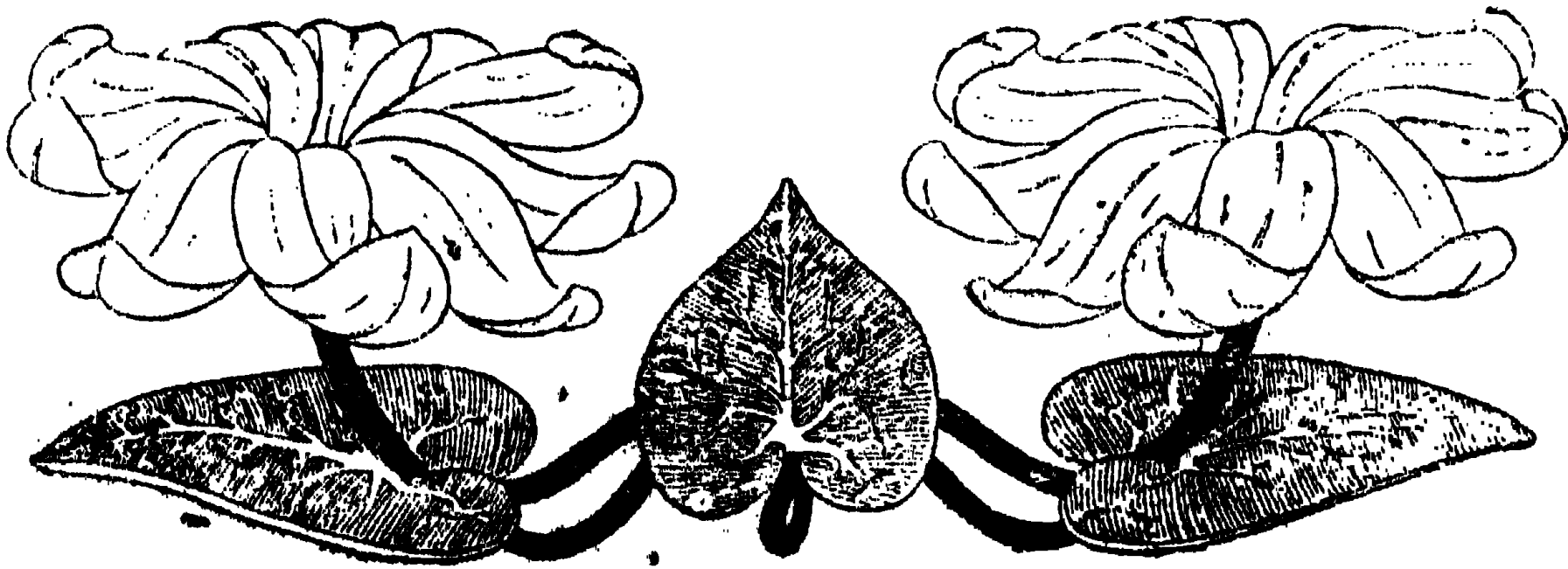
বসন্ত

শ্রীঅমিয় সেন

আবার এসেছে ফিরিয়া ধরায় ঋতুর রাজা,
নব কিশলয়ে বাজিছে তাহার নূপুর ধ্বনি,
তাহার তরেতে পুষ্প-অর্ঘ্য কাননে সাজা,
আগমনী-বাঁশী দখিনায় তার উঠিছে স্বনি'।

মৃদুল বায়েতে অলক তাহার দোদুল দোলে,
সান্ধ্য আলোকে গন্ধে ঝিমানো মহুয়া বনে,
পরসে তাহার লাজুক কুঁড়িরা ঘোমটা খোলে,
দিবস নিশির অরুণ-রাঙানো মিলন ক্ষণে।

খসিয়া পড়েছে হর্ষে ধরার আনন হ'তে,
শীতের দেওয়া সে কুয়াসা-ঘোমটাখানি,
প্রিয়তম তার এলো যে আজিকে আলোর রথে,
পরাণের ব্যথা তাই সে আজিকে ফেলেছে টানি'।

তারি আগমনে অশোককাননে লেগেছে ফাগ,
শ্যামল ধরার অশ্রু-শিশির গিয়াছে মুছি,
শীতের জীর্ণ বেদনার বাস পড়িয়া থাক্,
বহুদিন পরে হৃদয়-রাজারে পেল সে খুঁজি।

তাহার প্রিয়ের বক্ষে দুলিছে তারার হার,
শুক্লা-চাঁদিমা মণিটী তাহার প্রান্তে দোলে,
অস্ত-রবির করুণ লালিমা কপোলে তার
ফাগুণ রবির সোনালী কিরণ কিরীটে ঝলে।

সুনীল আকাশ ধরেছে ছত্র মাথায় তার,
পদতলে তার শ্যামল পৃথ্বি পুষ্পেভরা,
লুটায়ে পড়েছে দশদিকে তার অলক ভার
এসেছে সে আজ বিষাদ ধরার দুঃখ-হরা।

পদ্মা: প্রমত্তা নদী

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীসুবোধ বসু

সত্যানন্দবাবুর বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিয়া রজত দক্ষিণ দিকে হাঁটিতে আরম্ভ করিল। বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু সত্যানন্দের বাড়ির সমস্ত বিলাস-উপকরণ এবং আরাম আয়োজনপূর্ণ কক্ষের মধ্যে অকস্মাৎ রজতের অস্বস্তি বোধ হইতে আরম্ভ করিল; চতুর্দ্দিকের ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরগুলি, কৌচ চেয়ার, ছবি, আলোর ঝাড়, বিচিত্র রঙিন পর্দার গুণ্ঠনগুলি সহসা যেন নিঃশ্বাসের পথে আসিয়া দাঁড়াইল,—যেন ভগবানের দেওয়া বাতাসের প্রবাহ আটকাইবার জন্ম উহারা ষড়যন্ত্র করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর উদার বিস্তৃতির মধ্যে পালাইয়া মুক্তি পাইবার জন্য একটা দুর্দমনীয় আকাঙ্খা রজতকে পাইয়া বসিল। ইচ্ছা হইল, এক ছুট্ দিয়া এই ধূলিধূম-সমাকীর্ণ, ইষ্টক-স্তূপ-কণ্টকিত নগরীর খণ্ডিত আকাশের অভিশাপ হইতে পালাইয়া যাইয়া শস্যসুগন্ধি উন্মুক্তির মধ্য হইতে প্রাণপূর্ণ একটি নিঃশ্বাস লইয়া আসে; পদ্মার রূপালী জলরাশির মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুগ্ধস্নিগ্ধ সলিল আলোড়িত করিয়া তোলে! প্রকৃতির মধ্যে ছুটিয়া যাইবার এই প্রবৃত্তি রজতকে কখনও কখনও এমনি হঠাৎ নাচাইয়া তোলে, পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও একটু নোটিশ দেয় না।

সত্যানন্দবাবুর বাড়ি হইতে বাহির হইয়া সত্যই আর পদ্মায় পৌছান গেলনা,—এমন কি কাছাকাছি একটা গ্রামও নাই। কিন্তু বাহিরের খোলা আকাশের তলায় আসিয়া বঙ্গোপসাগর হইতে উড়িয়া আসা দক্ষিণ-বাতাসের সংস্পর্শে রজতের নিঃশ্বাস-বন্ধ হওয়া ভাবটা দূর হইয়া গেল। ভাবিতে লাগিল, ট্রাম-রাস্তায় পৌছিয়া যে কোনও একদিকের গাড়িতে চাপিয়া বসিবে, এবং ট্রাম-টর্মিনস্ হইতে হাঁটিতে হাঁটিতে যে কোনও একদিকের গ্রামের দিকে যাত্রা করিবে। অপরিচিত রাজ্যে উদ্দেশ্য-হীনভাবে চলিবার এক অদ্ভুত মাদকতা চিরকালই রজতকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। কতদিন এমনি অজানা পথে চলিতে চলিতে সে ভাবিয়াছে—একদিন পথ ভুল করি না কেন; অপরিচিত জনপদে, অরণ্যসঙ্কুল প্রান্তরে, অন্তহীন ধান-ক্ষেতের মধ্যে শুধুমাত্র তারার আলোয় পথ চলিতে চলিতে অবশেষে হয়তো এক কৃষকের মৃদু-আলো-জ্বালা কুটিরদ্বারে যাইয়া আঘাত করিব; নয়তো উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে এক রাঙা পলাশগাছের তলায় ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িব,—জোনাকী জ্বলিবে, নিভিবে, বিবিধ পতঙ্গ বিচিত্রসুরে সারারাত ধরিয়া অতি কাছাকাছি গুঞ্জন করিতে থাকিবে; প্রহরে প্রহরে কালপুরুষ স্থান বদলাইয়া চলিবে; কাঁচাধানের গন্ধ লইয়া আসিবে বাতাস; সুদূর লোকালয় হইতে কুকুরের ক্ষীণ ডাক শোনা যাইবে, কী অপূর্ব্ব হয় সত্য-সত্যই যদি একদিন জীবনে এমন ঘটনা ঘটে! সেই—'বিজন ভুঁয়ে ছিলেম শুয়ে, মেঠো-ফুলের পাশাপাশি' শুধু কবিতায় নয়, এমন অভিজ্ঞতা শৈশবে তাহার বহুবার হইয়াছে; তখন প্রকৃতির সাথে তার সংযোগ সুগভীর ছিল—ধরণীর নিজ হস্তের তত্ত্বাবধানেই সে বড় হইয়া উঠিয়াছে।

কে এই মেয়েটি ? এদিকে ম্যাডক-স্কোয়ারের কোণা, একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ, তার পরই রাস্তার উপর আগাইয়া সেই বারান্দার উপর অলস বৈকালের ধূসর আলোয় দুরন্ত অস্পষ্ট একটি তরুণী-মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া। দেখিয়া সচকিত রজত রাস্তার মধ্যখানেই থামিয়া গেল। নিজের প্রায় অগোচরে একটা কথা মুদ্রিত ওষ্ঠ ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল—সুমিত্রা। কিন্তু এ-ও কি সম্ভব ? কেমন করিয়া আসিবে সুমিত্রা! স্বপ্ন হইতে কেমন করিয়া সে এখানে আসিয়া উদিত হইবে ? মনের মধ্যে এ কী অবিশ্বাস্য মাতলামি সুরু হইল! জগতে সুমিত্রা বলিয়া তবে কি একজন সত্যই আছে! না, না,—তা সম্ভবপর নয়।

স্বপ্নগ্রস্তের মত রজত অগ্রসর হইয়া বাড়িটার নিকটবর্ত্তী হইল।

সন্দেহের আর অবকাশ নাই। রেলিঙের উপর বাঁ' হাতের কনুই ভর করিয়া হাতের পাতায় গাল হেলাইয়া সত্যসত্যই সুমিত্রা পার্কের ক্রীড়ারত শিশুদের দিকে চাহিয়া আছে। এলো খোঁপাটা পড়িয়াছে হেলিয়া, শুভ্র লম্বা লম্বা আঙুলের ডগাগুলি কেশজালের মধ্যে গোঁজা; দীর্ঘ আঁখিপল্লব এবং ঈষৎ-কুঞ্চিত ভ্রূ-যুগলের তলায় প্রত্যূষের রৌদ্রহীন আলোর মতো উজ্জ্বল চোখ দুটি যেন পার্কের শিশুদের ছাড়াইয়া বহুযোজন দূরে চলিয়া গিয়াছে।

মুগ্ধ হইয়া রজত ভাবিতে লাগিল—এত সুন্দর! এমন অপূর্ব্ব সুন্দর! এমন তুলনাহীন সুন্দর সুমিত্রা! এ তো রূপকথার অতিকোমল রাজকন্যা নয়; এ স্বমহিমাতে প্রদীপ্ত, মনন-শক্তিদ্বারা আত্মস্থা, স্বকীয়তায় অনন্যা। পূর্ব্বজন্মের কোন্ প্রদীপালোকিত অন্ধকারে ইহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল আমার ?

'দেখুন, আমি একটু কথা বলতে চাই।' রজত উপর দিকে মুখ তুলিয়া ঈষৎ উচ্চস্বরে ডাকিয়া কহিল।

রজত ছাড়া আর কেউ অপরিচিতা এক মহিলাকে এমন ভাবে আহ্বান করিতে পারিত কিনা সন্দেহ; কিন্তু রজতের দ্বারা কিছুই অসম্ভব নয়; মনে মনে যাহা সে অন্যায় বলিয়া বোধ না করে, অনায়াসেই তাহা সে করিতে পারে—ভদ্রসমাজে সেটা সচল কি অচল তাহা ওর বিচার না করিলেও চলে। রজত কহিত—'এ-অভ্যাস পদ্মার কাছে পেয়েচি; পদ্মা আদব-কায়দার ধার ধারে না।' কিন্তু রাস্তা হইতে এমন করিয়া একজন অপরিচিতকে ডাকিতে পদ্মাও হয়তো লজ্জিত বোধ করিত। কিন্তু পদ্মা তো আর প্রেমে পড়ে নাই!

'আমি একটু কথা বলতে চাই, শুনচেন।' রজত আবার হাঁকিয়া কহিল!

এইবার সুমিত্রা বিস্মিত হইয়া নিচের দিকে তাকাইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই রজতকে দেখিতে পাইল। অর্দ্ধমিনিট কাল একটা বিব্রত অবিশ্বাস ওর সুগৌর মুখমণ্ডলের উপর হাল্কা মেঘছায়ার মতো অচঞ্চল হইয়া রহিল,—দীর্ঘ আঁখি-পল্লব দুটি হইল অধিকতর উর্দ্ধায়িত, দুই চোখ সতর্ক প্রহরীর মত এক মুহূর্ত্তেই জিজ্ঞাসু হইয়া উঠিল, ঠোঁটের রেখা সামান্য কঠিনতর হইল,—তারপর সহসা স্মিত প্রসন্নতায় সুমিত্রার সারাটা মুখ প্লাবিত হইয়া গেল।

স্যাণ্ডেলের দ্রুত আঘাতে সচকিত গুঞ্জরণ উঠিল সিঁড়িতে, চুড়িবালার নিক্কণ দেওয়ালের গায়ে প্রতিধ্বনিত হইল, অবিন্যস্ত চুল এলোমেলো হইয়া বাতাসে গন্ধের স্পর্শ বিতরণ করিয়া পুনর্ব্বার ত্রস্ত আঙুলের লীলায়িত তৎপরতায় খোঁপায় বাঁধা পড়িল।

সমুখের দরজাটার এক পাট খুলিয়া দাঁড়াইয়া সুমিত্রা কহিল,—আসুন। ভেতরে আসুন।

'আপনাকে খুবই বিস্মিত করেচি, কেমন ?' রজত কৈফিয়ৎ হিসাবে কহিল। 'ভদ্রসমাজের আইন অনুসারে আমার এ আচরণ নিরতিশয় গর্হিত, এতে আপনার মতো আমারও সন্দেহ নেই।—কিন্তু আমাকে আপনি চিনতে পারছেন ?'

সুমিত্রা মৃদুস্বরে কহিল,—হ্যাঁ।

'বাঁচালেন', রজত একটুখানি হাসিয়া কহিল, 'নইলে অভদ্রতাটা আমার অধিকতর বিসদৃশ দেখাত। কিন্তু দেখুন, পদ্মার পাড়ে আমার বাড়ি, আমার কাছ থেকে ড্রয়িং-রুমের

আদবকায়দা আমল না করলে, আমার ওপর সুবিচার করা হবে।'

সুমিত্রা বিরক্ত হইয়া কহিল,—ওঃ, আপনার বাড়ি পদ্মার পাড়ে বুঝি?

'পদ্মার বুকে বললেও হয়', রজত কহিল। 'আমাদের আদিম বাড়ি পদ্মার জঠরে।—কিন্তু বংশপরিচয় দিতে আপনার কাছে আসিনি। আপনার কাছে সেদিন কিঞ্চিৎ অপরাধ করেছিলাম, এবং তার জন্য কিছু দুঃখ প্রকাশ করার ইচ্ছাও হয়েছিল; কিন্তু অবকাশ হয়নি। পথ চলতে হঠাৎ আপনার দেখা পেলাম আজ; তাই সেদিনের অপরাধটা স্বীকার করে অন্যায়ের লাঘব করতে চাই। তবে কেবলই সন্দেহ হচ্চে, একটা দোষ স্খালন করতে এসে দোষের মাত্রা অন্যদিকে বাড়িয়ে ফেলিনি তো?'

সুমিত্রা বিস্মিত হইয়া কহিল,—আপনি কোন্ অপরাধের কথা বলচেন? আর অন্য কোন দিকেই বা তার মাত্রা বাড়িয়ে ফেলবেন? বসুন এই চেয়ারটাতে।

না—বসিয়াই রজত কহিল,—অপরাধ অকৃতজ্ঞতা,—যার বড় দোষ আর নেই। নিজেকে বিপন্ন করে' আপনি যখন আমাকে মার খাওয়ার হাত থেকে সেদিন বাঁচালেন, কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন না করে আমি পৌরুষ প্রদর্শন করলাম; বল্লাম,—মার খাওয়া থেকে বাঁচিয়ে আপনি আমার অপমানের কারণ হয়েছেন।—আজ সেই রূঢ়তার জন্য আমি লজ্জিত। অকৃতজ্ঞতা পুরুষের আদিম স্বভাব, তা জানেন তো?' বলিয়া রজত হাসিয়া দিল।

সুমিত্রা ঈষৎ হাসিল। কহিল,—না, জানিনে তো!

'জানেন না? তবেই তো মুস্কিলে ফেললেন,—কৈফিয়ৎটা ঠিক টিকলো না দেখচি। কিন্তু অপরাধ স্বীকার করতে এসে অপরাধের মাত্রা বাড়াইনি তো?—'

'নিশ্চয়ই বাড়িয়েচেন। পদ্মার-পাড়ে বাড়ি বলে আদবকায়দা মানেন না,—কথাটা এমন গর্ব্বিতভাবে বলেছিলেন যে আমি প্রশ্নটায় সত্যি বলে বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু এই ক্ষমা চাওয়ার বাড়াবাড়িটা তো পদ্মার মত শোনাচ্চে না।—আপনি চেয়ারটায় বসুন, কিন্তু ক্ষমাটমার কথা থাকুক। পদ্মার সঙ্গে এসব খাপ খায় না।'

'সত্যিই নয়', বলিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইয়া রজত কাছের চেয়ারটায় বসিয়া পড়িল। কহিল—সত্যি, ক্ষমা-টমা চাওয়া আমার ধাতে পোষায় না: তবে ইচ্ছার উপর অত্যাচার করাই নাকি সভ্যতা,—আর আপনি আমাকে অসভ্য বল্লে সত্যই তা আমি সহ্য করবো না।

সুমিত্রা স্মিত হাসিয়া কহিল,—'তা বলব না,—ভয় নেই; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, রজতবাবু—।' বলিয়া হলুদ-রঙের খদ্দরে মোড়া ছোট কৌচটায় বসিয়া পড়িল।

রজতবাবু! বিস্ময়ে প্রথমটায় রজতের মুখ দিয়া কথাই বাহির হইল না। রজতবাবু! স্পষ্ট করিয়া সুমিত্রা রজতবাবু উচ্চারণ করিল! কিন্তু এ-ও কি সম্ভবপর! নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারও বুঝি এত বিস্ময়কর নহে। রজত প্রায় আকাশ হইতে পড়িয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিয়া বসিল,—আশ্চর্য্য! আপনি আমার নাম জানলেন কি করে?

ইহার সরাসরি কোনও জবাব না দিয়া সুমিত্রাও প্রশ্ন করিল,—আপনি আমার নাম জানেন?

'জানি।'

'জান্‌লেন কি করে?'

'ডাকতে শুনেচি।'

'আপনার নামও আমি ঠিক তেমনি করেই জানি।'

রজতের বিস্ময় তাহাতে কিছুমাত্র কমিল না। সে অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, সুমিত্রার সন্নিধানে কে কবে তার নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিল? সেদিনের পূর্ব্বে কি কখনও তাকে দেখিয়াছে? কেমন করিয়া সুমিত্রা শুনিল রজতের নাম!

'আপনাকে অনেক ছেলেই চেনে, দেখেছি,' সুমিত্রা কহিতে লাগিল। 'মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেদিন যখন আপনি মার খাওয়ার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন,—এইখানে সুমিত্রা সামান্য কৌতুকের হাসি হাসিল—'তখন আমাদের স্বেচ্ছাসেবক দলের একাধিক ছেলে আপনাকে সেখানে দেখে বিস্ময় বোধ করেছিল। আপনি মস্ত বড়লোক, মস্ত জমিদারি, এসব সদ্‌গুণের জন্য ওদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে আপনি সৎকার্য্যের অযোগ্য—

'চমৎকার ধারণা তো !' রজত সকৌতুকে কহিল।

'হ্যাঁ, খুব উচ্চ ধারণা,' মৃদু হাসিয়া সুমিত্রা কহিল। 'তাই মার খাওয়ার জন্য আপনার সেই ব্যগ্র লোলুপতা দেখে এক নিমেষে ওদের দৃষ্টি ভঙ্গি গেল বদলে; এমন মন্তব্য ওরা করতে লাগল যা আপনাকে যদি বলি, আমার মুখেও চাটুবাদের মতো শোনাবে, যে কারুর পক্ষেই তা গৌরবজনক।'

'আমাকে ?' রজত অপ্রতিভ হইয়া কহিল।

'হ্যাঁ, কিন্তু প্রশংসার কথা আর আমি ব্যাখ্যা করে' শোনাতে পারব না; কিন্তু আমাদের নিজেদের বাড়িতেই আপনার একজন অ্যাড্‌মায়ারার আছে—আমার সন্তু-দা। সন্তু-দা আমার পিসতুত ভাই; য়ুনিভার্সিটিতে পড়ে আপনার এক ক্লাস নিচে। আপনার সঙ্গে ওর পরিচয় নেই—কিন্তু তা বলে ওর আটকায় না; সন্তু-দাও সেদিন সঙ্গে ছিল।

'উনি কি বাড়ি আছেন ? দেখলে হয়তো আমি চিনতে পারি।' রজত শুধাইল।

'বাড়ি নেই, তবে এক্ষুনি আসবে; আপনি একটু বসুন।'

সন্তু-দার আসিবার পূর্ব্বেই রজত অনেক খবর জানিতে পারিল। সুমিত্রার বাবা পেনাঙে সরকারী চাকরি করিতেন; তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁর মৃত্যু হইলে সুমিত্রা ও তার মা কলিকাতায় আসে। পুরুষের মধ্যে বাড়িতে সুমিত্রার পিসতুত ভাই সন্তোষ। সুমিত্রার মা দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় সন্ধ্যাহ্নিক লইয়া থাকেন,—যে-জগতে তার আশা করিবার আর কিছু নাই সে-জগত হইতে দৃষ্টি অপসারণ করিয়া তিনি এক অজানা জগতের জন্য পথ হাতড়াইয়া মরিতেছেন। 'সন্ধ্যা পুজোয় বিশ্বাস আমার বড়ই ক্ষীণ,' সুমিত্রা কহিল, 'কিন্তু মায়ের সঙ্গে সব সময়েই আমি সায় দিই, সন্তু-দার মতো তর্ক করতে যাইনে; এই অদ্ভুত খেলা নিয়ে মা যদি একটু আনন্দ পান, তবে পাক্ না।' তারপর কহিল,—'সন্তু-দা পড়ে ফিলজফি, আর বড় বড় তর্ক করে; কোনও সিদ্ধান্তে পৌছতে পারে না,—এবং ওর গুরুদের মতই সহজকে ঘোলাটে করে তোলে, এবং যুক্তিজাল যখন আর কোনও স্থির সিদ্ধান্তে C দিতে পারে না, তখন মিস্‌টিসিজম্‌-এর মধ্যে আশ্রয় নিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে।—আর আমি ? কলেজেই পড়তাম, ছেড়ে দিয়েচি; আমার ধৈর্য্য বড় কম। কিছু গণ্ডগোল হলে পড়ায় আর মন বসাতে পারি না—তা সে গণ্ডগোল যে প্রকারেরই হোক।—ঐ বুঝি সন্তু-দা এল।—শুনচ সন্তু-দা, দেখে যাও কে এসেচেন; তুমি কল্পনাই করতে পারবে না—'

সন্তোষ ভিতরে প্রবেশ করিয়া সবিস্ময়ে চেঁচাইয়া উঠিল—রজতবাবু!

সুমিত্রা কৌতুক করিয়া কহিল,—চরকাকে অবজ্ঞা করতে, কেমন ? একবার চরকার ক্ষমতাটা দেখলে, সন্তু-দা! আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ!

'চরকা!' বিস্ময়ের সঙ্গে সন্তোষ কহিল। 'চরকা কি করল ?'

'কেন, রজতবাবুকে এনে হাজির করল!' এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে রজত টের পাইল দর্শন এবং রাজনীতি এ বাড়িকে সংগ্রাম-ক্ষেত্র বলিয়া বাছিয়া লইয়াছে। সন্তু-দার দর্শন এবং সুমিত্রার রাজনীতি পরস্পরকে ক্ষমা করে না,—সুগভীর ব্যঙ্গ করিয়া পরস্পরকে বাতিল করিতে চাহে।

এমন সময় সিঁড়ির কাছ হইতে অনুচ্চ আহ্বান আসিল—সুমিত্রা, কই গেলি মা। আমার ঘিয়ের প্রদীপগুলি একবার জ্বেলে দিবি। দেশলাই যেন কোথায় রাখলাম, খুঁজে পাচ্চি না।—

'যাচ্ছি, মা।' বলিয়া সাড়া দিয়া সুমিত্রা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। 'একটু বসুন', রজতের দিকে ফিরিয়া কহিল, 'আমি এখনি আসচি। মার এখন আরতি হবে কিনা, পঞ্চপ্রদীপটা জ্বালিয়ে দিয়ে আসি, কেমন ?' বলিয়া পুনর্ব্বার একটু স্মিত হাসিয়া দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিল; সঙ্গে তপঃকৃশা এক বৃদ্ধা ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তিকে প্রাণপণে সংহত করিয়া ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিলেন।

ইনি কে, রজতের বুঝিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না; সকল জপ ও আরাধনার জ্যোতি যেন এই বৃদ্ধার মুখমণ্ডল ঘিরিয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এমন প্রশান্ত সমাহিত সেই মুখ যে দেখিলেই আর সন্দেহ থাকে না যে মনের মধ্যে অসীম চিত্ত লাভ না করিলে এমন জ্যোতি ঠিকরাইয়া বাহির হয় না। সুমিত্রার ব্যক্তিত্বের উদ্ভব কোথা হইতে হইয়াছে সে-সম্বন্ধে রজতের আর সন্দেহ রহিল না।

সুমিত্রা মায়ের পিঠে আলগোছে হাত দিয়া বেষ্টন করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল,—রজতবাবু, আমার মা।—মা, এর কথা তোমাকে দেশবন্ধু পার্কের মিটিং থেকে ফিরে এসে বলেছিলাম না?' তারপর হাসিয়া কহিল, 'মার-খাওয়া থেকে বাঁচিয়েছিলাম বলে কি ওঁর রাগ!—আচ্ছা করে আমাকে ধম্‌কে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন,—'মার খেতে আমার খুব ভাল লাগে, চমৎকার লাগে।' বলেছিলেন না, রজতবাবু?—এইখেনে একটু বসো মা—এক্ষুনি আমি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেব—

বৃদ্ধা কহিলেন,—বাঃ, বড় সুন্দর ছেলেটি তো—চমৎকার ছেলে। থাক্, বাবা, থাক্,—চিরজীবি হয়ে থাক। তোমার নাম রজত, কেমন?

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'বাড়ি কোথা বাবা?'

'বিক্রমপুরে। গ্রাম,—কোটালনগর।'

'কোটালনগর!' বৃদ্ধা সামান্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া কহিলেন। 'দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরি যে গ্রাম পত্তন করে গিয়েচেন, সেই কোটালনগর?'

'দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরি আমার বাবা।' রজত অপূর্ব্ব এক গর্ব্ব যথাসাধ্য সংযত করিয়া কহিল।

'দুর্গাপ্রসন্ন-বাবুর ছেলে তুমি!' বৃদ্ধা খুসিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। 'তাই তো বলি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে চাওয়া এ তো যার তার কর্ম্ম নয়!—আমরাও ও-অঞ্চলেরই লোক, রজত। বেতবন গ্রামে আমার শ্বশুর-বাড়ি। তোমার বাবার নাম আমরা গর্ব্বের সঙ্গে স্মরণ করি।

পিতার এই প্রশংসায় রজতের প্রায় কান্না আসিবার উপক্রম হইল। এক মুহূর্ত্তে ইহাদের এত পরমাত্মীয় মনে হইল যে তাহা বলিবার নয়; মনে হইল, এমন স্বজন আর তাহার কেহ নাই। তাই বৃদ্ধা যখন উঠিয়া যাইবার প্রাক্কালে রজতকে একদিন চা-খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিবার জন্ম সুমিত্রাকে বলিয়া গেলেন, তখন রজত কিছুই বিস্ময় বোধ করিল না—মনে হইল, ইহা তার পাওনা, নিমন্ত্রণ না পাইলেই সে বিস্মিত হইত।

সুমিত্রা কহিল,—কালকে সোমবার। এই সোমবারের পরের সোমবার বিকালে কেমন? এত সব মিটিং আর কাজ আছে যে তার আগে হয়েই উঠ্‌বে না।

রজত কহিল,—বেশ। যদি ততদিন বেঁচে থাকি, নিশ্চয়ই আসব।

সুমিত্রা হাসিয়া কহিল,—যদি ততদিনে জেলে না যাই তবে নিশ্চয়ই চা পাবেন।—আর আমি না থাকলেও, তুমি এ-ভদ্রতাটুকু করতে পারবে, কেমন সন্তু-দা?

সন্তু কহিল,—কিন্তু philosophically বলতে গেলে তোমাদের এই জেলে যাওয়ার আইডিয়োলজি—

'একটা মায়া, কেমন?' বলিয়া হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে সুমিত্রা রজতকে দরজা খুলিয়া দিল।

নয়

আরব্যোপন্যাসের এক রজনীর মধ্য দিয়া হাঁটিয়া রজত হষ্টেলে উপস্থিত হইল। সহরে এত ট্রাম, এত বাস, গাড়ির অন্ত নাই—কিন্তু সে-সবের কথা ওর মনেও পড়িল না, অনাস্বাদিত পূর্ব্ব এক আনন্দের উন্মাদনায় প্রায় নৃত্য করিতে করিতে নিজের অজ্ঞাতেই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিল। সুমিত্রা! সুমিত্রা! কোথায় ছিলে এতদিন, সুমিত্রা! মনে হয়, জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়,—কালের মহাপ্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে আমি সংখ্যাতীত জন্মে তোমার ঘাটে উপস্থিত হইয়াছি; তুমি আমার অচেনা নও, তুমি পরমাত্মীয়!

মনের মধ্যে রজত বারম্বার সন্ধ্যাবেলার স্মৃতি টানিয়া আনিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল—কী সঙ্কোচ জড়তা-

হীন সুন্দর সুমিত্রার ব্যবহার। কুণ্ঠা নাই, ভীরুতা নাই, স্ত্রী-সুলভ অতি-কোমলতার ছন্দিত বিলাস নাই; পুরুষের ব্যবহারের মত তাহা অকুণ্ঠ, রৌদ্রের মত তাহা সুস্পষ্ট। অথচ তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের কি দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ, তেজো-দৃপ্ত দেহবল্লরীতে কী সুনিবিড় জীবন-প্রাচুর্য্য, মুখ-মণ্ডলে মনন-শক্তির কী অভাবনীয় বিকাশ! জ্যোৎস্নার মতো যে নারী রহস্যময়ী, নর্ম্ম-সহচরী রূপে তাহাকে পুরুষ কল্পনা করে; যে নারী রৌদ্রের মতো সুস্পষ্ট ও বিদ্যুতের মতো সহজ, সে নর্ম্ম-সহচরী নয়, সে বন্ধু—সচিব, সখী,—চৈতন্যের মধ্যে সে প্রেমাপ্লুত শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়া বসে। তার সঙ্গে প্রেমে পড়িতে ভয় হয়, অথচ নিজেকে নিবেদন না করিয়া উপায় থাকে না।

মোহগ্রস্তের মত কয়টা দিন রজতের কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল, সে টেরও পাইল না। কিন্তু ইহা সে নিশ্চিত টের পাইল, এ আবেগ তার সাময়িক নহে, এমন আবেগ তার জীবনে পূর্ব্বে কখনও আসে নাই, হয়তো এমন আর কখনও আসিবেও না। এক অদ্ভুত রস-সঞ্চারে রজতের সমস্তটা অস্তিত্ব স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে রজত সুমিত্রার সম্বন্ধে আরও খবর জানিয়া লইয়াছে। দেখিল, প্রায় সকল ছেলেই সুমিত্রার নাম জানে, অনেকেই তাহাকে চেনে; সুমিত্রার সংগঠন-ক্ষমতা, সুমিত্রার কষ্ট-সহিষ্ণুতা, সুমিত্রার অমিত সাহসের কাহিনী লোক মুখে বহুল প্রচারিত। রজতের বিস্ময় হইতে লাগিল এই ভাবিয়া যে এমন মেয়ের সম্বন্ধে সে এতকাল কি করিয়া অজ্ঞাত ছিল;—রাজনীতি হইতে দূরে থাকাই বোধ হয় এর কারণ। কিন্তু এই আবিষ্কারের আনন্দও কম নহে।

একটা অদ্ভুত গর্ব্বে রজতের বুক ভরিয়া ওঠে। এত বিখ্যাত, এত শ্রদ্ধিত দেশ-কর্ম্মিনী সুমিত্রা! অথচ একটুও তার আত্ম-গরিমা নাই,—একবারও সে নিজের কার্য্যাবলীর সামান্যতম উল্লেখ করে নাই। শুধুমাত্র তাদের বাড়ির ড্রয়িং-রুমে যদি রজত তাহাকে দেখিয়া আসিত, তবে সুমিত্রাকে সে একজন প্রখর-বুদ্ধিশালিনী মেয়েমাত্র বলিয়া মনে করিয়া আসিত; কিন্তু বুদ্ধির সঙ্গে তেজ, দীপ্তির সঙ্গে দাহ, হাসির সঙ্গে শক্তি, অনুকম্পার সঙ্গে কর্ত্তব্যবোধ কি সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে সে নিজের মধ্যে মিলাইয়া রাখিয়াছে, তাহার পরিচয়ও রজত পাইয়াছে।

সুমিত্রা! কোথায় ছিলে তুমি এতকাল সুমিত্রা! দৃষ্টি তোমাকে চাহিয়া আসিয়াছে, চৈতন্য তোমাকে ধ্যান করিয়াছে, কল্পনা তোমাকে স্বপ্ন দেখিয়াছে। সত্যই কি আমার জীবনে তোমার আবির্ভাব হইল!

সোমবার আসিতে আর কয়দিন?

এলবার্ট হলে ছাত্রদের এক আধা ঘরোয়া মিটিঙ্ ভিতরে ভিতরে বহুলভাবে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। ছাত্র-সমাজের ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের মিটিং ইহাই প্রথম নয়; তবে বিক্ষোভ যখন বর্দ্ধিততম, তখন পুনর্ব্বার একযোগে একটা সংহত বিবেচনার প্রয়োজন মনে হওয়ায় সভা আহুত হইয়াছিল।

সাধারণত রজত বিশেষ একটা মিটিঙ টিটিঙে যায় না; তারপক্ষে এ সভায় যোগদানের বিশেষ কিছু সার্থকতা আছে কিনা তাহাও সে ঠিক করিতে পারিল না। এবং অবশেষে মিটিঙের দিন দুপুর বেলায় কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া যখন এলবার্ট-বিল্ডিংস্‌এর সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল, তখন মিটিং প্রায় শেষ হইবার উপক্রম।

হলে প্রবেশ করিয়াই কিন্তু রজত চম্‌কাইয়া উঠিল, দেখিল, মঞ্চের উপরে স্থির বিদ্যুতের মত দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া একটি মেয়ে ইংরেজিতে অনর্গল বক্তৃতা দিয়া চলিয়াছে; এবং সে মেয়েটি আর কেহই নয়, সে সুমিত্রা!

রজত পলকহীন চোখে সুমিত্রার দিকে প্রায় হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল—একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। অত্যন্ত শুদ্ধ উচ্চারণ, কথাগুলি স্পষ্ট সতেজ, কণ্ঠস্বর কখনও কোমল কখনও উদ্দীপ্ত, কখনও আকুতিতে পূর্ণ, কখনও শ্লেষ-বর্ষণে নির্ম্মম। যেন সে আগুনের একটি শিখা,—কখনও জ্বলিয়া ওঠে, কখনও স্তিমিত হয়, কখনও সবুজ আলোয় চতুর্দ্দিক স্নিগ্ধ করে, এবং পরমুহূর্ত্তে রুদ্র দাহে ঝলসিয়া ওঠে।

মিটিং শেষ হইয়া গেল। অসম্ভব হাততালি এবং অজস্র চিৎকারের শব্দে হল পূর্ণ হইয়া উঠিল; একদল ছেলে সুমিত্রাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল—বক্তৃতাক্লান্ত সুমিত্রা রজতের দৃষ্টির আড়াল হইয়া গেল।

সুমিত্রা ব্যস্ত কর্ম্মিণী, সুমিত্রা বহুজনের উপদেশ-দাত্রী, স্বেচ্ছাসেবিকাদলের নায়িকা; সুমিত্রার সঙ্গে অনেকের অনেক কিছু প্রয়োজন, অনেকের সঙ্গে অনেক কাজে তাকে খাটিতে এবং মাথা ঘামাইতে হয়, শারীরিক পরিশ্রমে তার কাতর হইলে চলে না। কিন্তু কাজ করিতে হয় বলিয়া তাহাকে মুখ গম্ভীর করিতে হয় না,—হাসিয়া কাজ করিতে সে জানে, রজত শীঘ্র তাহারও পরিচয় পাইল।

গুণগ্রাহী, সহকর্ম্মী ও সহকর্ম্মিণী দ্বারা সেইখানে সুমিত্রাকে পরিবেষ্টিত দেখিয়া রজত নিচে যাইবার উদ্যোগ করিল; শুধু আক্ষেপ হইতে লাগিল, কেন সে ঐ দলের একজন হইতে পারিল না,—সামান্য দর্শকের মতই তাহাকে দূর হইতেই বিদায় লইতে হইতেছে!

সিঁড়ির কাছাকাছি আসিয়া পিছন দিক হইতে বহুজনের মিলিত কোলাহল রজতের কর্ণগোচর হইল। পিছনে চাহিয়াই দেখে দল-বেষ্টিত অবস্থায় সুমিত্রাও সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। একাধিক ছেলে এবং একাধিক মেয়ের একাধিক প্রশ্নের জবাব সুমিত্রা অতি দ্রুত কিন্তু সহজভাবেই দিতেছে—কিছুই তার অসুবিধা হইতেছে না। চলিতে চলিতেই নানা পরামর্শ হইতেছে, কর্ত্তব্যবণ্টন চলিয়াছে, এমন কি কৌতুকহাসি পর্য্যন্ত চলিতেছে।

'—তোমার আর কিছু করতে হবে না, সত্য-দা', রজত সুমিত্রাকে বলিতে শুনিতে পাইল, 'তোমাকে শুধু বিদ্যাসাগর আর রিপণের ছেলেদের দেখতে হবে, তোমার মত নিশ্চিত কেউ আর তাদের দলে টানতে পারবে না; আচ্ছা, তুমি ওদের সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়াও না তো?—ইন্দুবাবু, আপনার খদ্দর-ফেরি আর নয়, এবার সরকারী অতিথিশালায় যেতে হবে; আপনাকে একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার।—কিন্তু, রাজেন, তোমার বিশ্রামের সময় এখনও আসেনি, তোমাকে—। আচ্ছা, অজিতবাবু, আপনি তো সারা সপ্তাহের জন্য পিকেটিং করার লোক ঠিক করেছিলেন, তবে কম পড়ল কেন?—ওঃ, রজতবাবু!—নমস্কার,—ভালো তো—

রজত চমকাইয়া উঠিয়া কহিল—নমস্কার, ভালো। বক্তৃতাটা আজ—

'সত্য-দা, স্কটিশ আর বেথুনের জন্য কাকে কাকে ঠিক করা যায়, বল তো? অনন্তবাবু, আপনার ইস্কুলে এখন ক'টা তাঁত চলচে?—মাত্র!—কাপড়ের চাহিদা মেটাতে না পারলে, লোকে বিদেশী পরবে, এতে আর আশ্চর্য্য কি! বুধবারের মিটিঙটা শ্রদ্ধানন্দ পার্কেই হোক্, কেমন?

রজতকে পিছনে ফেলিয়া ওরা নিচে নামিতে লাগিল।

দলের একটি ছেলে দুষ্টুমি করিয়া কহিল,—সুমিত্রা-দি, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে তোমার অন্য একটা নাম ছিল।

বিস্মিত হইয়া সুমিত্রা কহিল, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে? কি নাম ছিল?

'দেবী চৌধুরাণী!'

সুমিত্রা হাসিয়া ছেলেটিকে কৃত্রিম শাসন করিবার ভঙ্গি করিল, তারপর কহিল, সত্য-দা, তোমার ভাইয়ের গবেষণাটা একবার দেখ—যেন দেবী চৌধুরাণী এবং বঙ্কিমচন্দ্র একই সময়ে কলকাতা সহরে বাস করতেন। তবে তোমার ভাইটি যে সত্যসত্যই একটা আস্ত ডাকাত এতে আর সন্দেহ নেই; গবর্ণমেণ্ট যে কি করে ওকে বাইরে রাখচে, আমি ভেবেই পাইনে।—ঐ দেখো, একটা খালি বাস্ যাচ্ছে,—এই রোখকে;—ডাকো না, পুরুষ মানুষ হয়ে যদি চেঁচাতেই না পারবে, তবে—

রজতের দৃষ্টির সমুখ হইতে সমস্ত বাহিনী অদৃশ্য হইল।

এইবার রজত সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল, সুমিত্রার কাছ হইতে সে কত দূরে। সুমিত্রার নিজ জনের অন্তর্গত সে নয়, কর্ত্তব্যের ক্ষেত্রে যারা সুমিত্রার নিকটতম, তারাই তাহার আত্মীয়। রজত শুধু মাত্র পরিচিত; তাহার সঙ্গে বাক্য আদানপ্রদানের অবকাশ সুমিত্রার নাই—জীবনের বৃহত্তম ক্ষেত্রে রজতকে সে অনায়াসে পাশ কাটাইয়া যাইতে পারে।

কাহারও ঔদাসীন্য রজতকে এমন করিয়া পূর্ব্বে কখনও আঘাত করে নাই। রজত সাধারণত অভিমানী নয়;

কিন্তু আজ কেবলই মনের মধ্যে অসম্ভব অভিমান ভিড় করিয়া ঠেলিয়া আসিতে লাগিল।

রজত যখন হষ্টেলে ফিরিল, মুখে তার তখন একটুও হাসি নাই।

সোমবারের চা খাওয়ার নিমন্ত্রণের কথাটা রজতের মনে আছে সত্য, কিন্তু ওদের হয়ত মনেই নাই—রজত ভাবিতে লাগিল। না থাকিবারই কথা; চায়ের নিমন্ত্রণ সুমিত্রার কাছে নিশ্চয়ই অতি সামান্য ব্যাপার। রজত ঠিক করিল, চায়ের নিমন্ত্রণ সে রক্ষা করিবে না;—অন্তত একটা মধুর সন্ধ্যার সম্পদ তার থাকুক, সুমিত্রার কর্ত্তব্যের বাধা হইয়া সে তার বিরক্তি কিছুতেই কুড়াইবে না। চা-খাওয়ার নিমন্ত্রণটা ও-পক্ষ হইতেও যে কেহ স্মরণ করাইয়া দিবে না, ক্রমে এ সম্বন্ধেও সে নিঃসন্দেহ হইল।

কিন্তু শুক্রবার দিন আশুতোষ-বিল্ডিংস্-এর করাইডরে সন্তোষ সহসা অগ্রসর হইয়া আসিয়া একটা চিঠি বাহির করিয়া হাতে দিয়া কহিল,—সুমিত্রার চিঠি!

জীবনের প্রথম প্রেম-পত্রের মতোই এই চিঠি রজতকে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিল। অথচ কিছুমাত্র কবিত্ব, কিছুমাত্র ভাষাচাতুর্য্য তাহাতে নাই। সাদাসিধা দুইটি মাত্র লাইন 'এখনও জেলে যাইনি। সোমবারে চা খেতে আসবেন।—সুমিত্রা।' তবু রজতের মনে হইল, সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাটও কোন দিন এমন গৌরবান্বিত বোধ করিবে না।

চায়ের সে-নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা রজতের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

দশ

'বক্তৃতাটা চমৎকার হয়েছিল, কেমন?'

'ভুলে গিয়েচি, সে-কথা আজ আর মনে নেই।'—রজত কহিল।

'নিশ্চয়ই আছে, শুধু প্রশংসায় কার্পণ্য করচেন—কম হিংসুটে নন তো আপনি।' বলিয়া সুমিত্রা চায়ের কেৎলির ঢাকনা উঠাইয়া চামচ দিয়া নাড়িতে লাগিল। কহিল,—'আচ্ছা, সন্তুদা, চা-পানের কোনও দার্শনিক কারণ বাতলাতে পার?'

সন্তোষ দমিবার পাত্র নয়। সে গম্ভীর স্বরে কহিল,—ওর গৈরিক বর্ণে মানুষ আধ্যাত্মিকতার স্বাদ পায়; একই কারণে আমাদের আধ্যাত্মিক দেশেই ওর প্রথম সৃষ্টি হয়।

হাসির একটা হিল্লোল উঠিল, এবং সুমিত্রা সকৌতুকে প্রশ্ন করিল,—গাঁজাও কি সাধুরা ঐ জন্যই খায়? ধুঁয়োতে বুঝি স্পিরিট্-ওয়ার্লড-এর আভাস আসে!

পুনর্ব্বার হাসি উঠিল।

রজত কহিল,—'আমি নিতান্তই জড় জগতের বাসিন্দা কাজেই সন্দেশগুলির ওপরই আমি বেশি আকৃষ্ট।' বলিয়া আস্ত একটা সন্দেশ মুখে পুরিয়া গাল ফুলাইল। এবং গালের ফুলা কমিয়া আসিবার পর কহিল,—জানেন, উত্তরাধিকার সূত্রে আমি কিন্তু অসম্ভব রকম খেতে পারি; আমার এক বৃদ্ধ প্রপিতামহ একবারে বসে একটা গোটা পাটা খেয়ে ফেলতে পারতেন, এক অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ একবারে পাঁচ হাঁড়ি দই সাবাড় করতে পারতেন, এক—

চা ঢালিতে ঢালিতে সুমিত্রা মৃদু হাসিয়া কহিল—আর তার অতিতরুণ প্রপৌত্র এমন কি লাঠি খেয়ে লাঠি পর্য্যন্ত হজম করতে পারে—ক' চামচ চিনি দেব?—আপনার চা তো কখনও তৈরি করিনি; সন্তুদা, তুমি কি ঠিক করে স্থূল খাবারগুলি কিছুতেই ছোঁবে না? আমার সন্দেহ হচ্চে, বাসি সন্দেশ শস্তায় কিনে এনে খাওয়া এড়াবার জন্য দার্শনিকতার ভড়ং করচ না তো?—

সন্তু কৃত্রিম ক্রোধে কহিল,—দাও তবে, সবগুলিকে যমপুরে পাঠিয়ে দিই!

সুমিত্রা নিজের জন্যও চা ঢালিয়া লইল; এবং পেয়ালায় এক চুমুক দিয়া কহিল,—দর্শন দিয়ে কার কি উপকার হয়, আপনিই বলুন না, রজতবাবু! বিশ্বের রহস্যের কোনও কিছুই কি তোমরা কূল কিনারা করতে পেরেচ, সন্তুদা। কোন দার্শনিক জোর করে', বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে, তার ব্যাখ্যাই প্রকৃত তত্ত্ব?—

সন্তোষ কহিল, সন্ধান না করলে কি করে আমরা Ultimate Realityতে গিয়ে পৌঁছাব?

সুমিত্রা ঈষৎ ব্যঙ্গের স্বরে কহিল,—সন্ধান করো, না করো, ultimate Realityতে না পৌঁছে কারও উপায় নেই। ভগবান আছেন কিনা জানি না। যদি তিনি থেকে থাকেন, তবে এই জগৎ বা বিশ্বের অন্যান্য অদ্ভুত বিস্ময় এই জন্য নিশ্চয়ই সৃষ্টি করেন নি যে দার্শনিকেরা তাঁর সমস্ত ফাঁকি, সৃষ্টিকর্ত্তার সমস্ত হাত সাফাই ধরে ফেলুক। যারা দৃশ্য, প্রত্যক্ষ্য, যারা তোমার হাতের কাছে, মনের কাছে, বরঞ্চ তাদের দিকে একটু দৃষ্টি দিলেই তাঁর পক্ষে আনন্দিত হওয়া স্বাভাবিক। পৃথিবীর উৎসবশালা সাজাবার ভার পেয়েচ, ইথরের জগতের খোঁজ কেন? মানুষের সমাজকে সুন্দরতর করে' গড়ে তোল, পৃথিবীকে সভ্যতর স্থান, আনন্দকর জায়গা করে তৈরি করে' তোল,—মানুষ-কীটের পক্ষে তবেই যথেষ্ট উচ্চাকাঙ্খার এবং সহজ বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হবে। তোমার philosophy আর আমার পলিটিক্‌স্‌-এ এইখানেই তো তফাৎ—

সন্তোষ প্রতিবাদ করিয়া কহিল—বিশ্বের জ্ঞানের রাজ্যে আমাদের—

'অনধিকার চর্চ্চা,' তাড়াতাড়ি সুমিত্রা হাসিয়া যোগাইল। এবং চকিতে প্রসঙ্গান্তর উঠাইয়া কহিল, আচ্ছা রজতবাবু, আপনি নাকি একবার সিনেমার কাছে একটা গুণ্ডাকে আচ্ছা করে পিটিয়ে ছিলেন,—আর একবার নিউমার্কেটে একটা মাতাল গোরা সৈন্যকে,—নিউ মার্কেটেই তো, না সন্তুদা?—সত্যি? আপনার শরীর দেখলে তো খুব গায়ের জোর মনে হয় না। আমি পুরুষ হলে, আমিও খুব ঘুষোঘুষি করতুম।

রজত সবিস্ময়ে কহিল, এ-সব সংবাদ সংগ্রহ হলো কোথা থেকে?

সুমিত্রা কহিল, এটা সন্তুদার একটা বিশেষ Scoop! আপনার কাছ থেকে এর জন্য ওর বিশেষ প্রশংসা পাওয়া উচিত; বলিয়া সন্তোষের দিকে ঈষৎ ফিরিয়া মিটিমিটি হাসিতে লাগিল। এবং বেচারী সন্তুদা অনুতাপ করিয়া মরিতে লাগিল কেন দুদিন পূর্ব্বে রজত সম্বন্ধে ঐ সংবাদ দুইটি সে অতটা গর্ব্বসহকারে সুমিত্রাকে জানাইতে গিয়াছিল।

রজত কহিল, এ-সব ঘটনাগুলি আর একটু রটিত হলে, আমি অনায়াসেই প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারি; কিন্তু আপনার ভগ্নী যেমন অবিশ্বাসের চোরা হাসি হাসচেন, সন্তুবাবু, তাতে এমন কি সত্যি হলেও ঘটনাগুলিকে নিজস্ব বলে দাবী করতে আর ভরসা হতো না।

সন্তোষ খুসি হইয়া উঠিয়া সুমিত্রার দিকে চাহিয়া কহিল,—কেমন, কথাটার ইঙ্গিত বুঝতে পারলে তো? এইবার হয়েচে?

সুমিত্রা সকৌতুকে কহিল, সেটা না হয় তুমিই একটু ব্যাখ্যা করে দাও, সন্তুদা। আর এক কাপ চা দেব, রজতবাবু?

চা-খাওয়া শেষ হইয়া গেলে সুমিত্রা কহিল, মাকে একটু খবর দিয়ে আসব? পূজোর ঘরে আছেন। আপনার বাবার নাম শুনে, বুঝলেন রজতবাবু, আপনার উপর মা বড়ই প্রসন্ন হয়ে উঠেচেন—ও কি, যাচ্ছ কোথায়, সন্তু-দা?

সন্তোষ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কহিল, একবার বাইরে তাকিয়ে আকাশের চেহারাখানা চেয়ে দেখ? হঠাৎ এত সব মেঘ এসে কোথা থেকে উপস্থিত হলো—ছেলে-পড়াতে যেতে বিঘ্ন বাধাবে দেখতে পাচ্চি! সর বোন, এত কষ্টের চাকরিটা শেষে মেঘেই না খতম করে দেয়—

বাহিরে তাকাইয়া আর সন্দেহ রহিল না। নিঃশব্দে এবং অলক্ষ্যে আকাশে যে বিরাট পরিবর্ত্তন হইয়া গেছে, তাহা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি মধুর। সাড়ম্বর ঘনঘটায় সমস্ত গগন ছাইয়া গিয়াছে; ঝড় এবং বৃষ্টি আসিল বলিয়া। কৃষ্ণচূড়ার শাখায় শাখায় পড়িল আলোড়ন; ধূলিজাল উৎক্ষিপ্ত হইয়া সন্ধ্যা ধূসর হইয়া উঠিয়াছে, এবং আকাশের এক প্রান্তে একটা শাণিত ঝলক বারম্বার উঁকি মারিয়া অন্তর্দ্ধান হইতে লাগিল। নব বর্ষার এ-রূপের তুলনা নাই—অত্যন্ত অরসিকের মনকেও এ নাড়া দিয়া তবে ছাড়ে।

সুমিত্রা কহিল,—আজ না হয় না-ই গেলে সন্তুদা; ছেলেটা একটু রক্ষা পাক্।

'নাই গেলাম!' সন্তোষ দারুণ বিস্ময়ের ভঙ্গিতে কহিল। 'চাকরিটা আমাকে কতটা চেষ্টা করে রক্ষা করতে হচ্চে,

জানিস্!? রায় 'বাহাদুরের বাড়ি; একবার যদি টের পায় আমারই ভগ্নী তার মনিবদের বিরুদ্ধে এমন শত্রুতাটা করচে, তবে কি আমার চাকরি অমনিই থাকবে? আবার তার ওপর কিনা কামাই! সর্ব্বনাশ! তুই বোস, আমিই মামী-মাকে পাঠিয়ে দিয়ে যাচ্চি। নমস্কার রজতবাবু,— চাকরিগত প্রাণ এই ক্ষীণকায় বাঙালি সন্তানের ত্রুটি ধরবেন না।—

রজতের একবার বলা উচিত ছিল—'চলুন, আমিও উঠি।' কিন্তু সে কিছুই বলিল না। উঠিবার লক্ষণমাত্র না দেখাইয়া সে যেমন ছিল, তেমনি বসিয়া রহিল। মনে মনে কহিল,—সুমিত্রা, ভদ্রতার খাতিরে এই দুর্ল্লভ সময়টুকু থেকে কিছুতেই আমি নিজেকে বঞ্চিত করবো না; এমন মুহূর্ত্ত জীবনে বেশি পাওয়া যায় না—

সন্তোষকে দরজা খুলিয়া দিয়া এবং পুনর্ব্বার বন্ধ করিয়া সুমিত্রা বসিবার ঘরে রজতের কাছে ফিরিয়া আসিল। কহিল,—চমৎকার বাদলা হবে মনে হচ্চে;—একটু গ্রামোফন বাজাব?

রজত কহিল, বেশ। কিন্তু তার আগে আমার একটা কথা বলে নেওয়া উচিত।

সুমিত্রা চোখ উঠাইয়া চাহিল।

রজত একটুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—সে-প্রসঙ্গটা আমার এখন না ওঠানই হয়তো ঠিক হতো; কিন্তু দুই কারণে তা বলে ফেলাই উচিত। প্রথম কারণ এই যে এমন দুর্ল্লভ সুযোগ জীবনে আর কবে পাব জানিনা, এবং দ্বিতীয়ত সে-কথাটা স্পষ্ট করে আপনাকে না জানিয়ে আপনার আতিথ্য ভোগ করা আমার পক্ষে অনুচিত হবে।'

এইবার সুমিত্রা ভারি বিস্মিত হইল। কহিল,—আমি কিছুই বুঝতে পারচি না, রজতবাবু। কি সে কথা?

রজত কহিল,—কথাটা এই যে আমি আপনার প্রেমে পড়েছি। শুনিয়া সুমিত্রা অসম্ভব রকম চমকাইয়া উঠিল। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চাহিয়া সামান্য তিরস্কারের স্বরে কহিল, ও কি হচ্চে, এ সব কি রজত বাবু?

রজত কহিল, যদি সত্যসত্যই প্রেমে পড়ে থাকি তবে সেটা না জানিয়ে আপনার সঙ্গ উপভোগ করা কি আমার উচিৎ হতো? এতো এমন মনোবৃত্তি নয় যে ইচ্ছে করলেই গলা টিপে শেষ করে দেওয়া যায়। সুতরাং আমার মনোভাব আপনাকে পূর্ব্বাহ্ণে জানিয়ে দেওয়া উচিৎ;—এবার ইচ্ছা হলে আপনি আমাকে দূর হয়ে যেতে বলতে পারবেন।

'রজত বাবু!—'

'আমার দিক থেকে এ-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই, শ্রীমতী সুমিত্রা। এ-হৃদয়াবেগের গতিরোধ করা আমার পক্ষে অসম্ভব; এবং মনকে আপনার কাছে প্রকাশ না করেও আমার উপায় ছিল না।' তারপর সামান্য ভীরু হাস্য করিয়া সুমিত্রার চোখের উপর চোখ রাখিয়া কহিল,— 'এবার বর দেবেন, না, শাপ দেবেন? যাই দেন্, রাগ করবো না। পরের ইচ্ছার ওপর জুলুম করা আমার স্বভাব নয়। আমি কি চলে যাব?'

সুমিত্রা ঠিক যেন তড়িৎস্পৃষ্টের মত উঠিয়া দাঁড়াইল। দৃঢ়স্বরে কহিল—এ কি ছেলেমানুষি আরম্ভ করেচেন আপনি—এ কি উচিত হচ্চে? ক'দিন আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় বলুন তো? না, না, ছি; আপনি বসুন, একটু প্রকৃতিস্থ হোন্,—আমি মাকে ডেকে নিয়ে আসি।'

রজত অনুশোচনাহীন দ্বিধাহীন দৃষ্টিতে তেমনি করিয়া চাহিয়া সামান্য ক্লিষ্টস্বরে কহিল,—একটু অপেক্ষা করলে একটা কথা বলতে পারি। দেখুন, আচম্‌কা প্রেমে পড়া আমার স্বভাব নয়; এমন কি সাধারণের চাইতে সংযম-বোধ বা ভব্যতা জ্ঞান আমার হয়তো একটু বেশিই হবে—অন্তত কম নয়।'

সুমিত্রা কহিল, তা আমি বেশ জানি; কিন্তু হঠাৎ এ কেন আরম্ভ করলেন?

রজত ঈষৎ করুণ-মধুর হাস্য করিয়া কহিল, কিন্তু এই যে আপনাকে দেখা অবধি রাত্তে আমি ঘুমোতে পারি না, জেগে জেগে সর্ব্বক্ষণ আপনাকে স্বপ্ন দেখি, সারাক্ষণ আপনার কাছে ছুটে আসতে ইচ্ছে হয়—এ ব্যাধির কী নাম, আপনি বলতে পারেন? এই যে—

সুমিত্রা বাধা দিয়া কহিল—কিন্তু ভেবে দেখুন ক'দিন—,

না, না, রজতবাবু, এ শোভন হচ্ছে না, যে কারণেই হোক্ আজ আপনি বিশেষ উত্তেজিত হয়ে উঠেচেন, তাই এমন—

রজত কহিল, না, না, বিশ্বেস করুন, তা নয়। কে বললে আপনাকে এ আকস্মিক? কে বল্লে সামান্ত ক'দিন? পেছনে কত জন্মান্তর পড়ে রয়েচে, জানেন না কি?

সুমিত্রা ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠে আহত হওয়ার সুরে কহিল—এ সব কথা আপনি আমার মুখের ওপর বলতে পারলেন?

'কেন পারবো না,' রজত না দমিয়া কহিল, 'আমার মনের এই আকুলতাকে যদি আন্তরিক বলে আমি জেনে থাকি, যদি তাকে সম্ভ্রান্ত এবং সুন্দর বলে বিশ্বেস করি, তবে সে-কথা জানাবো না কেন? আমার মন তো অভদ্র নয়; তবে তাকে প্রকাশ করলে পাপ হবে কেন?'

সুমিত্রা কহিল—অত্যন্ত অন্যায়, রজতবাবু। ও-কথা আর বলবেন না।

'সুমিত্রা', রজত কহিল, 'অসহজ হওয়াই কি ভদ্রতা? মানুষের মনটা কি এতই হেয় যে কতগুলি কৃত্রিম নিষেধ চাপিয়ে তার নড়াচড়ার পথ বন্ধ করে' দেবে? পরিচয় যদি আমাদের অনেক দিনের না-ই হয়ে থাকে শুধু এই অপরাধে আমার হৃদয়াবেগকে অন্যায় প্রতিপন্ন করতে পার কি করে?'

'দেখুন,' সহসা সুমিত্রা কহিয়া উঠিল, 'হৃদয়ের খেলা নিয়ে যারা কাল কাটাতে চায়, আমি তাদের দলে নই,—আপনি যদি আমাকে আর কিছু বেশি জানতেন তবে এ-ও আপনার অজানা থাকতো না। আচ্ছা, বলুন তো, দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কি মাতবার সময়? কত মানুষের ব্যক্তিগত তুচ্ছ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উৎসর্গ করে' আমাদের আদর্শে পৌছতে হবে। এ যদি না করি তবে আর আপনার আমার সঙ্গে একটা সাধারণ ইতর মানুষের তফাৎ কি? না, না, রজতবাবু, আসুন, একটু গান শোনা যাক।'

যেন কিছুই হয় নাই, উত্তেজনার কোনও কারণই নাই, এমনি সহজ সুরে সে কথাগুলি বলিয়া ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে রজতের দিকে চাহিল। অন্য কেহ হইলে ইহার পর আর মুখ তুলিবার সাহস থাকিত না, কিন্তু রজত নিজেকে একটুও অপরাধী বোধ করিল না—একটু লজ্জিত বোধ করিল না। মুখটা পূর্ব্বের মতই উর্দ্ধায়িত করিয়া কহিল—তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে পার সুমিত্রা। কিন্তু আমার হৃদয়াবেগের আন্তরিকতায় অবিশ্বাস করতে পারবে না; চাপল্য বলে একে অবহেলা করতে পারবে না। একে তুমি ইচ্ছে হলে অভদ্রতাও বলতে পার, কিন্তু ও-রকম ভদ্রতা আমি শিখিও নি, শিখতে পারবও না।—সুমিত্রা, ভালবেসেছি বলে তোমার ব্রত থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাব, এ-আব্দার তো করিনি; তুমি যদি বল, অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবো!—'

'কী পাগলা! ছি, ছি,—আজ কী হয়েচে বলুন তো? আসুন, চোখে মুখে একটু জল দিয়ে আসবেন; তখন নিজেরই এমন হাসি পাবে, এমন হাসি পাচ্চে আমার-

'এ কি একেবারেই অসম্ভব?'

'হ্যাঁ, অসম্ভব বৈ কি;—কিন্তু আর ও-কথা নয়। আর একটু চা আনি,—কেমন?'

'দরকার নেই',—আমি বলিয়া রজত উঠিয়া দাঁড়াইল

সুমিত্রা শঙ্কিতস্বরে কহিল, 'ক্ষেপেচেন! বাইরে চেয়ে একবার দেখুন তো কী বৃষ্টি হচ্চে! এর মধ্যে কোথায় যাবেন?'

'বৃষ্টিকে আমি ভয় পাই না।'

'ভয় আপনার কিছুতেই হয় না তা আমি জানি। কিন্তু, ছি, এ কি ছেলেমানুষি বলুন তো! শুধু ঐ উদ্দেশ্য নিয়েই আপনি আমার বাড়ি আসবেন, তাছাড়া আর কি কোন সম্পর্কই হতে পারে না? না, না, রজতবাবু, আপনি ভয়ানক মাথা-পাগলা লোক—দেখুন তো কী কাণ্ড! এই এতক্ষণ এক পাগলামী করলেন,—শেষ হতে না হতেই আবার এক নতুন ক্ষ্যাপামি।' তারপর হাসিয়া কহিল—'প্রথমটা তবু নিরাপদ ছিল, দংশনের কোন আশঙ্কা ছিল না; কিন্তু বৃষ্টি কি আর আমার মতো সহজে রেহাই দেবে! —ও কি হচ্চে,—না, কিছুতেই যেতে পারবেন না, কিছুতেই নয়,—এই জলে ভিজে কিছুতেই আমি আপনাকে যেতে দেব না—' বলিয়া টলায়মান রজতের পিছনে ছুটিয়া আসিয়া

সদর দরজায় পিঠ দিয়া দাঁড়াইল। কহিল—যান্ দেখি এবার!

'কে বাবা রজত? বাইরে যে ভারি বৃষ্টি পড়চে, এর মধ্যে যাবে কি করে?'

রজত চমকাইয়া তাকাইয়া দেখিল সিঁড়ি দিয়া ক্ষৌম-বস্ত্রপরিহিতা সুমিত্রার বৃদ্ধা মা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতে-ছেন; বুঝিল, সদ্য পূজাহ্নিক সমাপ্ত করিয়া অতিথি-সৎকারের জন্য আসিতেছেন।

'ভেতরে চলুন!'—সুমিত্রা ঈষৎ হাসিয়া কহিল।

বিনা বাক্য-ব্যয়ে রজত ঘরের ভিতর পুনঃ প্রবেশ করিল।

গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল; একবারও থামিল না। সুমিত্রার মা এই দুর্য্যোগের মধ্যে কিছুতেই রজতকে ছাড়িয়া দিবেন না; ইহাতে নাকি গৃহস্থের অকল্যাণও হয়।

সুমিত্রা দুষ্টুমি করিয়া কহিল,—ওঁর হষ্টেলে নিশ্চয়ই খিচুড়ি হয়েচে, তাই থাকতে চাইচেন না। ভয় নেই, আমিও রাঁধতে জানি; চল্লুম আমি খিচুড়ি চড়াতে। কিন্তু ওঁকে যেন পালাতে দিও না, সন্তুদা। আমার ওপর ভয়ানক চটে আছেন, সুযোগ পেলেই পালিয়ে গিয়ে আমাকে জব্দ করে' তবে ছাড়বেন।

সন্তু কহিল—যাও বৎসে তাড়াতাড়ি খিচুড়ি করে আন। আজ একটা বিরাট তর্ক জমান হবে।

'তা আর হবে না,' সুমিত্রা কহিল। রজতবাবু যেমন দাঁতে দাঁত চেপে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে বসে আছেন, একটু পরেই কথার প্লাবন ছুটিয়ে দেবেন।

রজত হতাশ হইয়া কহিল,—আচ্ছা, আপনি কি আমাকে সত্যি না রাগিয়ে ছাড়বেন না?

'তা হলে ডুবার হবে।' বলিয়া একটু মৃদু দুষ্টু হাসিয়া সুমিত্রা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সন্তোষ শুইল সুমিত্রার ঘরে, সুমিত্রা মার সঙ্গে যাইয়া শুইল; সন্তোষের বিছানায় শুইয়া রজত সারাটা রাত প্রায় জাগিয়া কাটাইল।

কী অদ্ভুত মেয়ে সুমিত্রা। কী অসীম তার ব্যক্তিত্ব! কত বড় একটা বিশ্রী ঘটনাকে নিজ মহিমায় সে কী সহজ করিয়া লইল! নিজের আচরণের বিভৎসতা রজত এতক্ষণে টের পাইতে লাগিল,—এবং তার রূঢ় অসৌজন্য কী অসীম ক্ষমায় অবজ্ঞা করিয়া যে সুমিত্রা একান্ত সহৃদয়তার সঙ্গে রজতের প্রতি অতিথিকৃত্য করিয়াছে, ভাবিতে ভাবিতে নিজের প্রতি লজ্জায় এবং সুমিত্রার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধায় রজতের মন আপ্লুত হইয়া গেল। মনে মনে রজত কেবলই বলিতে লাগিল:—

'মস্ত বড় আদর্শের জন্য যে জীবনটাকে নিবেদন করিয়া দিয়াছে, মন দেওয়া নেওয়ার তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকরতায় তাহাকে ডাকিতে গেলাম কোন্ দুঃসাহসে।'

কিন্তু তার পরই আবার পরাজিত-হওয়ার সুতীক্ষ্ণ লজ্জা রজতকে পাইয়া বসিল। ছি, ছি, মন বিলাইতে যাইয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া আসিবার অগৌরব তাহাকে জীবন ভরিয়া বহন করিয়া বেড়াইতে হইবে! অসম্ভব, এ সহ্য যায় না। এর চাইতে মৃত্যুও ভাল! উত্তেজিত হইয়া রজত বিছানার উপরে উঠিয়া বসিল। সুমিত্রার সহৃদয়তা অকস্মাৎ তাহার কাছে অসহ্য মনে হইতে লাগিল; যাহার জন্য কিছু পূর্ব্বে রজত সুমিত্রার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাকেই সহসা অসম্ভব অপমানকর মনে হইতে লাগিল। মনে হইল, এই সহৃদয়তা, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের একান্ত করুণা,—সুমিত্রার ব্যক্তিত্বের কাছে তার নিজের ব্যক্তিত্বের একান্ত পরাজয়ের অবিসংবাদী নিদর্শন। উত্তেজনার আতিশয্যে বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িয়া রজত, পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো ঘরের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ক্লান্ত হইয়া এক সময় কখন মেঝেতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; ঘুম ভাঙিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়া দেখিল প্রভাতের অজস্র আলো খোলা জানালা দিয়া কখন্ ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। এবং পরক্ষণেই শুনিতে পাইল

বাহিরে দরজার কাছে কে অতিশয় ঃ মৃদু কণ্ঠে গান গাহিতেছে—

আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলবো নাকো
গান দিয়ে দ্বার খোলাব।

‘ওঃ, রজতবাবু!’ সুমিত্রা অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি গান থামাইয়া কহিল। ‘একটুকুও শব্দ না করে’ কি করে’ দরজা খুললেন?’ তারপর হাসিয়া কহিল,—‘কেমন, গান দিয়ে দ্বার খোলালাম তো? মুখ ধুয়ে নিন্, চা হয়ে গেছে—’

চায়ের টেবিলে পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে সুমিত্রা কহিল,—আচ্ছা, সন্তুদা, দাস-দের মধ্যে যে বিবাহ হতো, তাকে কি তুমি desirable বিবাহ বলতে পার? অপমানের গ্লানিতে সে মিলন কি কখনও সুন্দর হতে পারত? হতাশায়, বেদনায়, পরাধীনতায়, অকরুণ অপমানে মানুষের যা সুন্দরতম বৃত্তি, কী মর্ম্মান্তিক ভাবে তা নিপীড়িত হতো ঐ সব মানুষ-পণ্যদের মধ্যে!

সন্তু কহিল—কিন্তু Philosophically speaking সে-বিবাহকেও একটা স্বাভাবিক ঘটনাই—

‘অত্যন্ত অস্বাভাবিক করুণ দুর্ঘটনা!’ বলিয়া সুমিত্রা গম্ভীরভাবে চায়ে চিনি মিশাইতে লাগিল।

রজত কহিল,—আপনি কখনও পদ্মা দেখেছেন সন্তোষ-বাবু?

‘হ্যাঁ, একবার দেখেছি।’

‘পদ্মায় যখন ঝড় ওঠে তখন তার আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না; মাত্‌লামি করে’, পাগ্‌লামি করে’, ক্রুর নিষ্ঠুরতায় তাণ্ডব করতে থাকে।—কিন্তু সেটাও পদ্মার সত্য রূপ নয়।—

সন্তোষ বিস্মিত হইয়া কহিল,—এ-কথার তাৎপর্য্য ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। মানে,—আপনি কি বলতে চান্, কাল রাত্রের ঝড়ে পদ্মায় সে—রকম কিছু—

‘হ্যাঁ, ঠিক্ তাই।—আমার হয়ে গেচে, আমি আজ উঠি; নমস্কার! বলিয়া রজত উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আর কোনও দিকে না চাহিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুমিত্রা নিশ্চেষ্ট স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল; নড়িল না, আগাইয়া দিতে গেল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুবোধ বসু
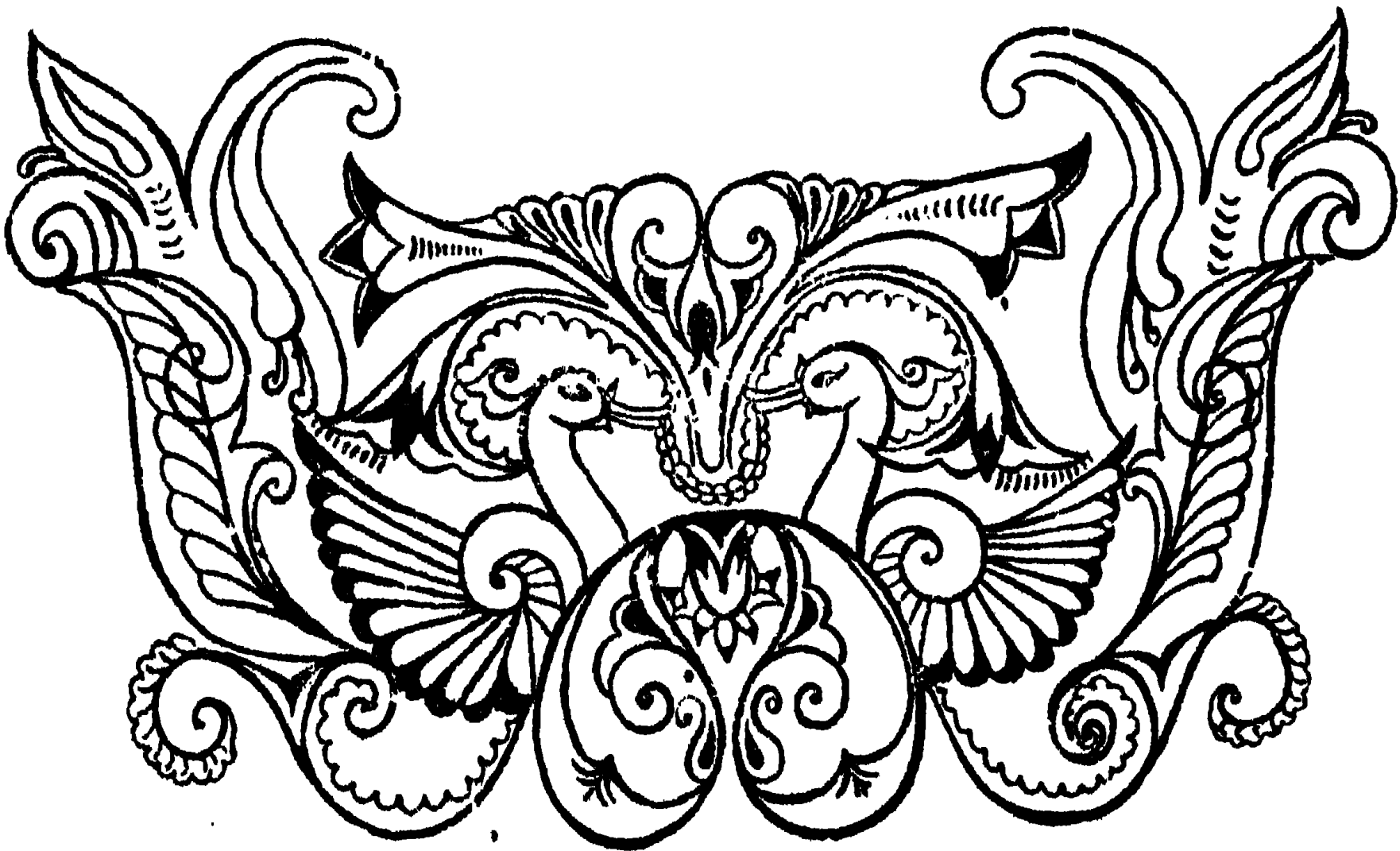
বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্

গদ্য সাহিত্য

রাজা রামমোহন রায়ের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্কযুদ্ধে একদা এক মিসনারি সাহেব হিন্দু ধর্ম্মের অনেক কটূক্তি করেন। রাজা রামমোহন রায় উহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তদুত্তরে লিখেন, "সাধারণ ভব্যতা এ সকলের অনুরূপ উত্তর দেওয়া হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে; কিন্তু আমাদিগের জানা কর্ত্তব্য যে আমরা বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিচারে উদ্যত হইয়াছি, পরস্পর দুর্ব্বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হই নাই।" এই উত্তর—কিরূপ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, সুরুচি সঙ্গত ও সুন্দর!

রাজা রামমোহন রায়ের বহু গদ্য রচনার মধ্যে কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত হইল। উহা হইতেই তাঁহার রচনায় প্রাঞ্জলতা, গাম্ভীর্য্য, সর্ব্বগ্রাহিতা, তর্কযুক্তির প্রখরতা প্রভৃতি নানাবিধ গুণের সমাবেশ লক্ষিত হয়।

গদ্য ভিন্ন রাজা রামমোহন রায় পদ্যেও সঙ্গীত রচনা করেন। আলোচ্য বিষয়ের কিঞ্চিৎ বহির্ভূত হইলেও, কেবলমাত্র তাঁহার রচিত দুইটি সঙ্গীত উল্লেখ করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনের ন্যায় ব্রাহ্ম সঙ্গীত রচনায়ও তিনি প্রথম। ঐ সকল সঙ্গীত ভাষা ও ভাবে অনুপম, এবং অদ্যাপিও ব্রাহ্ম সমাজের ও জনসাধারণের অতীব প্রিয়।

প্রথম সঙ্গীত

ভাব সেই একে, জলে স্থলে, শূন্যে
যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার,
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে।
তমীশ্বরাণাম্ পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং
পরমঞ্চ দৈবতং।
পতি পতীনাম্ পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং।

দ্বিতীয় সঙ্গীত।

মনে কর, শেষের সে দিন কি ভয়ঙ্কর;
অন্যে বাক্য কবে, কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ দেখে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন, নাড়ী ক্ষীণ, হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর।

রাজা রামমোহন রায়ের গদ্য রচনা সম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন যথার্থই বলিয়াছেন, "বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য উন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছে। যে বাঙ্গালা গদ্য ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, রামমোহন রায় উহার ভিত্তিমূল সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনা যারপরনাই প্রাঞ্জল ও সুবোধ্য। কাল সহকারে ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া রামমোহন্ রায়ের রচনা এখনকার লোকের রুচিসম্মত না হইতে পারে, কিন্তু একশত বর্ষ পূর্ব্বে উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা ছিল।"

গদ্য রচনার আর একদিকেও রাজা রামমোহন রায়ের কৃতিত্ব স্মরণযোগ্য। পূর্ব্বে বাংলা গদ্যে এক দাঁড়ি ও দুই দাঁড়ি ব্যতীত অন্য কোন যতি চিহ্নের ব্যবহার ছিল না। রাজা রামমোহনই সর্ব্বপ্রথমে কমা, সেমিকোলন, কোলন, জিজ্ঞাসাসূচক চিহ্নাদির ব্যবহার প্রচলন করেন। কেহ কেহ স্বর্গীয়

প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ঐরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের গদ্য গ্রন্থাবলী পাঠ করিলেই ঐ ভ্রম স্বতঃই নিরসন হইবে।

রাজা রামমোহন রায়ের অনুবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী যে সকল মনস্বী বাংলা গদ্য সাহিত্যকে উন্নতির পথে লইয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারিচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবি বলিয়া সমধিক প্রসিদ্ধ হইলেও গদ্য রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নাম আর এক কারণেও স্মরণীয়। তিনি অমর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম রচনার উৎসাহদাতা ও গুরু ছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রও সে ঋণ সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিয়া যথোচিত শ্রদ্ধাদানে কার্পণ্য করেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী কেশবচন্দ্র সেন ও বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেও বাংলা ভাষায় ধর্ম্মোপদেশমূলক বক্তৃতা দিতেন এবং পুস্তকাকারে সে সকল বক্তৃতা সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বাংলা গদ্যে কয়েকখানি পুস্তকও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে রা রামমোহন রায় প্রায় সার্দ্ধ শত বৎসর পূর্ব্বে বাংলা গদ্যের অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধন করেন এবং তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী গদ্য সাহিত্যসেবীগণের অগ্রগামী ও পথ নির্দ্দেশক ছিলেন। আধুনিক গদ্য সাহিত্যের অভ্যুদয়ের উচ্চশিখরে আরূঢ় হইয়া আমরা যেন মূলাধারের প্রতি লক্ষ্যহারা না হই। তাহা হইলে আমাদের কলঙ্কের সীমা থাকিবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক অনেক কবি ও সাহিত্যরথীর আবির্ভাব হয়। ক্রমশঃ তাঁহাদের বিষয়ে আলোচনা করিব।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দুইখানি পুস্তকে গদ্যসাহিত্যের উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ দুইখানি পুস্তকের নাম, ১। রাসসুন্দরীর জীবনী, ২। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী। এই দুইখানি পুস্তকের ভাষা ও ভাব অনিন্দ্যসুন্দর। রাসসুন্দরী কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল কিশোরীলাল সরকারের মাতা ছিলেন। বহুকাল পূর্ব্বের একজন প্রাচীনা বঙ্গমহিলার রচনা কিরূপ সহজ-সুন্দর হইতে পারে, তাহা পাঠ করিলে সত্যই বিস্ময়োৎফুল্ল হইতে হয়। নিম্নোদ্ধৃত অংশই তাহার প্রমাণ।

"সেই পরমেশ্বর আমাদের সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে যে যেখানে থাকিয়া ডাকে, তাহাই তিনি শুনেন, ছোট করিয়া ডাকিলেও তিনি শুনেন, বড় করিয়া ডাকিলেও তিনি শুনেন। মনে মনে ডাকিলেও তিনি শুনিয়া থাকেন। এজন্য তিনি মানুষ নহেন, পরমেশ্বর। তখন আমি বলিলাম, মা, সকল লোক যে পরমেশ্বর বলে, সেই পরমেশ্বর কি আমাদের। মা বলিলেন, হাঁ। ঐ এক পরমেশ্বর সকলেরি, সকল লোক তাঁহাকে ডাকে। তিনি আদি কর্ত্তা। এই পৃথিবীতে যত বস্তু আছে তিনি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সকলকে ভালবাসেন, তিনি সকলেরই পরমেশ্বর।"

মহর্ষির জীবনীর ভাষা আরও সুন্দর, মনোরম ও কবিত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

"এতদিন আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়া ছিলাম। তত্ত্বজ্ঞানের কিছুমাত্র আলোচনা করি নাই। ধর্ম্ম কি, ঈশ্বর কি, কিছুই জানি নাই, কিছুই শিখি নাই। শ্মশানের সেই উদাস আনন্দ মনে আর ধরে না। ভাষা সর্ব্বথা দুর্ব্বল, আমি সেই আনন্দ কিরূপে লোককে বুঝাইব? তাহা স্বাভাবিক আনন্দ। তর্ক করিয়া, যুক্তি করিয়া সেই আনন্দ কেহ পাইতে পারে না। সেই আনন্দ ঢালিবার জন্য ঈশ্বর অবসর খোঁজেন। সময় বুঝিয়াই তিনি আমাকে এ আনন্দ দিয়াছিলেন। কে বলে, ঈশ্বর নাই? এই তার অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি ত প্রস্তুত ছিলাম না। তবে কোথা হইতে এত আনন্দ পাইলাম? এই ঔদাস্য ও আনন্দ লইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় আমি বাড়ীতে আসিলাম। সে রাত্রিতে আমার আর নিদ্রা হইল না। এ অনিদ্রার কারণ আনন্দ। সারা রাত্রি যেন একটা আনন্দ-জ্যোৎস্না আমার হৃদয়ে জাগিয়া রহিল।" (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

স্মরণী

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

মনের খাতায় কবিতা লিখিনু ভাবের ফেণায় মাতি'
আকাশের আলো তারা-ঝলমল চতুর্দ্দশীর রাতি
আমার পৃথিবী ঘেরি'
প্রথম প্রিয়ার পরশের মতো বাজালো জীবন-ভেরী।
বাতায়নে আমি গোলাপ-বঁধুর মধুর অধরখানি
রাঙা করেছিনু সুখ-আলাপনে স্নেহ-চুম্বন আনি'
জ্যোৎস্না-নিশীথে,—সান্ধ্য-বাতাস কুসুম সুবাস ভরি'
অজানিতে মোর হৃদয়-আঙিনা তুলিছে মদির করি ;
সবুজ কবিতা-পাত্রে—
একখানি কার তুলনাবিহীন সোনার মুখ যে ভাসে,
চোখের কিনারে শিহরিছে তার পুরাণো রাতের সুর,
ভাষায় মুখর ওষ্ঠ-বাঁশীর স্বপ্ন সে লোভাতুর ;
ভ্রমর-নয়ন-ছায়
মোর লাগি তার স্মিত ভালবাসা কেঁপেছে কেবল হায় ;
মৃদু পদ ফেলে দাঁড়াতো সে আসি' স্বপ্ন-পরাগ মেখে,
সঙ্কোচ-ভীরু নত নয়নের অশ্রু-শিশির ঢেকে ;
আধোফোটা তার প্রাণ-শতদল ধরণীর সরসীতে
গোপনে ফুটেছে শীত-জর্জ্জর নিজেরে বিলায়ে দিতে।
আজিও যাইনি ভুলি,
সেদিনের মতো ফুল্ল-সহাস স্মৃতির কুসুমগুলি ;
আমি দেখেছিনু সে মাটির মেয়ে নবীন-অরুণ-রাগে,—
প্রথম প্রেমের সিতাংশু-রেখা লেগে দুটি আঁখি-ভাগে ;
সে স্মৃতির দোলা অনুভবি মোর উতল মনের পাখী,
আজি মধু-রাতে ক্ষণেকের তরে সে আর আসিবে নাকি ?
স্মরণ-বৃন্তে ফুটিছে কলি : দৃষ্টি-শায়ক হেনে
ক'রেছিনু প্রেম কিশোর-প্রিয়ার কুসুম-হৃদয় জেনে
মাধবী-নিশীথ-তলে,—
স্মৃতির কবিতা তারি এককোণে জোনাকীর মতো জ্বলে।

প্রাগ

(ভ্রমণ বৃত্তান্ত)

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র রায় বাহাদুর

বের্লিন থেকে বিদায় নেবার সময় দুঃখ হচ্ছিল এই যে ভাল করে' জার্মানীর রাজধানী দেখা হলো না। আমেরিকার কথা বলতে পারি নে, ইয়ুরোপের মধ্যে জার্মানী যে সব চেয়ে দ্রষ্টব্য স্থান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জার্মানী শুধু দেখবার যায়গা নয়, ভাববারও যায়গা। কেননা ইয়ুরোপের ভারকেন্দ্র গিয়ে পড়েছে ঐ বের্লিনে। প্রগতি হিসাবে জার্মানী সমস্ত ইয়ুরোপের জাতিকে ছাড়িয়ে উঠেছে। অর্থনীতি, বাণিজ্য, শ্রমিকশিল্প, কলকারখানা সংক্রান্ত ব্যাপারে জার্মানী সত্যই অনেক এগিয়ে গেছে। রাষ্ট্রনীতি হিসাবে আজ জার্মানীর স্থান সব চেয়ে উঁচুতে। তার প্রধান কারণ হচ্চে সকলেই জার্মানীকে ভয় করে' চলেছে। ফরাসী কম্পমান, ইংরেজ সন্ত্রস্ত, অষ্ট্রিয়া সন্দিগ্ধ, ইটালী শরণাগত, রাশিয়া শশব্যস্ত। সব দেশে যে 'সাজ, সাজ' রবে সাড়া পড়েছে (Re-armament), তার প্রধান হেতু জার্মানীর বিভীষিকা, এ বেশ স্পষ্ট বুঝে এসেছি। জার্মানীতে 'পাতাটি নড়িলে বা পাখীটি উড়িলে' সমগ্র ইয়ুরোপ চমকিত, ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

বের্লিনের 'এনাল্ট বানফ' ষ্টেশনে সকালে ট্রেণে চাপিলাম। ষ্টেশনটি বেশ বড়। লোকজনের ভিড়ও কম নয়। তবে সেই সময়টা এমন যে বাইরের লোকই আসছে বেশী, বের্লিনের লোক অন্যত্র বেশী যাচ্চে না। অলিম্পিক উৎসব উপলক্ষে বোধ হয় শুধু ইংলণ্ড থেকেই তিন লক্ষের উপর লোক এসেছিল বের্লিনে। আর আমি সেই সময় চলেছি বের্লিন ছেড়ে—এ কোন খেয়ালী দেবতার চক্রে, তা সেই দেবতাই বলতে পারেন। তবে আমার কৈফিয়ৎ হচ্চে এই যে, বের্লিনে আর তিনটা দিন বেশী থাকলে, আমার প্রোগ্রাম থেকে আর দুই একটি দেশ বা সহর বাদ পড়তো।

ধরুন এই প্রাগ। প্রাগ (Praha) একটি ছোট সহর। প্রাচীন এক বিশ্ববিদ্যালয় এখানে আছে, এই মাত্র জানি। কিন্তু মহাযুদ্ধের পরে চেকোশ্লোভাকিয়া একটা ছোট স্বাধীন দেশে পরিণত হয়েছে। এক ধারে জার্মানী আর এক ধারে অষ্ট্রিয়া এই দুইটি ক্ষমতাশালী দেশের মধ্যে ঐ ছোট্ট দেশটি কি ভাবে আছে, তাই জানবার জন্য বড় কৌতূহল হয়েছিল। পূর্বে এই দেশটি, অষ্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরী এই তিনটিতে মিলে এক বিশাল সাম্রাজ্য ছিল—তার নাম ছিল অষ্ট্রো-হাঙ্গেরী। রাশিয়ার নীচেই এর স্থান ছিল বিশালতার দিক দিয়ে। মহাযুদ্ধের পরে সেই স্থলে তিনটি স্বতন্ত্র দেশ হয়েছে—চেকোশ্লোভাকিয়া—রাজধানী প্রাগ, অষ্ট্রিয়া—রাজধানী ভিয়েনা, হাঙ্গেরী—রাজধানী বুডাপেষ্ট। *

বেলা ৪ টায় প্রাগে পৌঁছুলাম। গাড়ীতে লাঞ্চ খাবার ব্যবস্থা ছিল—ড্রেসডেনের ভিতর দিয়ে যখন গাড়ী এল, তখন মন ছটফট্ করছিল নামবার জন্যে। ষ্টেশনটি বেশ বড়। উপরে নীচে দু'থাক লাইন। প্লাটফরমও দোতলা। বাণিজ্য কেন্দ্রে যেমন হয় তেমনি দেখলাম অনেক গাড়ী, অনেক ইঞ্জিন। ড্রেসডেনের পাশ দিয়ে এল্বা নদী ব'য়ে গেছে।

রেলপথ দুধারে পাহাড় রেখে বিস্তৃত সমতলের উপর দিয়ে চলে গেছে সরল ভাবে। দূরে শালবনের মত অনেকগুলি বন দেখলাম—মনে হলো যেন জার্মানীর বনজ সম্পদ এগুলি। যত্নে রক্ষিত বলেই মনে হলো। দূরে—বহুদূর পর্যন্ত এই বৃক্ষের সারি চলে গেছে আর তার নীচে ছায়ায় শীতল মার্জিত বৃক্ষতল। সেখানে স্বচ্ছন্দে চড়ুইভাতি

* আমি ১৯৩৬ সালের কথা বলছি। লেখাও আমার অনেক দিনের। তার পরে যে সব পরিবর্তন ঘটেছে, আমার লেখার মধ্যে হয়ত তার কিছু পূর্বাভাস পাওয়া যাবে। —লেখক

সেখান থেকে সেই হোমাগ্নি বেলিনে পদব্রজে আনতে হবে, এই স্থির হয়েছিল। এথেন্স থেকে যে দিন সে অগ্নি বা মশাল রওনা হবার কথা, তা সকলেই জানতো। প্রাগের মধ্য দিয়ে সেই অগ্নিশিখা কখন যাবে, তা'ও আগে থেকে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। তাই লক্ষ অযুত বালক বালিকা যুবক যুবতী এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধা শীতের মধ্যে (আমাদের হিসাবে তখনও সেখানে শীত—বিশেষতঃ নিশীথ রাতে) রাস্তায় দাঁড়িয়েছেন।

পরদিন কুক কোম্পানীর অফিসে গিয়ে শফরের ব্যবস্থা করা গেল। প্রথমে আমাদের নিয়ে গেল প্রাগের রাজপ্রাসাদে। তার উপর থেকে সহরের দৃশ্যটি অতি সুন্দর দেখায়। চারিদিকে পাহাড়, যতদূর দৃষ্টি চলে পাহাড়ের সারি ঢেউ খেলে গেছে—ছোট্ট ভ্লাতাবা নদী রজত রেখার মত ঘাসের নীলের মধ্যে লুকিয়েছে।

হ্রাদচিন (Hradchin) রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষ দেখলাম—তিন তলায়। সেই কক্ষের জানালা দিয়ে ক্ষিপ্ত জনতা দু'জন গভর্ণরকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল—নীচে। গণতন্ত্র এই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেশে মাথা তুলেছে। ইংলণ্ডে গণতন্ত্রের সূত্রপাত হয়েছিল যেদিন রানিমিডের মাঠে সশস্ত্র ব্যারণরা জোর করে' সুশাসনের প্রতিজ্ঞাপত্রে রাজাকে সই করতে বাধ্য করেছিল। এর ফল ফলেছিল যখন রাজা প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ করে' প্রজারা তাদের জন্মগত অধিকার সেই রাজরক্তে ইতিহাসের পৃষ্ঠা রঞ্জিত করে' বড় বড় অক্ষরে লিখে রেখেছিল।

এখন চেকোশ্লোভাকিয়ায় গণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—রাজা আর নেই। প্রেসিডেণ্ট শুস্নিগ রাজ-প্রাসাদের এক অংশে থাকেন, সেখানে যাবার হুকুম নেই। দেখলাম প্রশস্ত প্রাঙ্গনে সৈন্যগণের কুচকাওয়াজ চলছে—গার্ড বদল হবে। সৈন্যদের দেখে নিরীহ ভদ্রলোক বলে মনে হলো। আমাদের দেশের গোরা সৈন্যদের মধ্যে যেমন একটা রুক্ষ উগ্রতা এবং শিক্ষার অভাব দেখা যায়, এদের মধ্যে যেন সে ভাবটি নেই। যেন শিক্ষিত ভদ্রলোকদের ধরে' নিয়ে' এসে' সৈন্যদলভুক্ত করেছে। এরই পিছনের দিকে প্রকাণ্ড হল্; রাজাদের আমলে এখানে রাজসভা বসতো, বড় বড় সেনাপতি যুদ্ধ জয় করে' এখানে এসে জয়মাল্য লাভ করতেন, বিদেশের রাজা রাজড়ারা এলে' এখানে তাঁদের সংবর্ধনা হ'তো। এই হলটির পাশেই আর একটি হল্ গথিক প্রণালীতে নির্ম্মিত। স্তম্ভগুলি খিলানের আকারে ছাতে গিয়ে মিশেছে। হলটি এত বড় যে ছোট একদল অশ্বারোহী সৈন্য তার মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে। পাথরের মেঝে পাথরের থাম এবং পাথরের ছাত। এখানে ঘোড়ায় চড়ে বীরেরা সাহস ও শক্তির পরীক্ষা দিতেন (Tournament), এখানেই রাজা ভ্যালটষ্টাইন বাস করতেন। ভ্যালট্ষ্টাইনের নাম এখানে প্রবাদের মত রয়েছে! হ্রাদচীন (Hradchin) প্রাসাদের নামও সুপরিচিত।

নীচের তলায় তাঁর বাথরুম, অন্ধকার ঘর। ষ্টালাকাইট পাথর শিকড়ের মত ছাত থেকে নেমেছে। মনে হয় যেন সত্যিকার কোনও পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করেছি। এই সব ষ্টালাকাইটের শিকড় দিয়ে বোধ হয় জলের ধারা নামতো এবং তাতেই রাজার স্নান হতো। এরূপ সৌখীন অথচ গম্ভীর বন্য শোভা বিশিষ্ট স্নানাগার আমি আর কখনও দেখি নি। এই বাড়ীরই একটি হলে মিউজিয়ম (দ্বিতলে)। শুনলাম ভ্যালট্ষ্টাইন বহু দেশ থেকে আশ্চর্য আশ্চর্য দ্রব্য সংগ্রহ করে তাঁর যাদুঘর সাজিয়েছিলেন। সংগ্রহ দেখেও তাই মনে হলো। রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি ইউরোপের আর কোথায়ও দেখি নি। এখানে প্রথম যুগল মূর্ত্তি দেখলাম, হনুমানজির মূর্ত্তি, শিবের মূর্ত্তিও রয়েছে। ভারতীয় ও মিশরীয় আরও অনেক নিদর্শন সেই যাদুঘরে দেখলাম।

এখান থেকে বেরিয়ে আমরা ভ্লাতাবা পার হ'লাম। সেন্ নদীর মত পার হ'বার জন্য মাঝে মাঝে পুল রয়েছে। আমরা চার্লস্ ব্রিজ দিয়ে এলাম। পুলটি পুরাতন। দুধারে অনেকগুলি প্রতিমূর্ত্তি রয়েছে। প্রতিমূর্ত্তিগুলিও প্রাচীন। প্রাগে অনেক পুরাতন রাস্তা ও বাড়ী আছে। একটি ফটক দেখলাম ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। এই রকম আটটি ফটক ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়টির গৃহ আরও পুরাতন, বোধ হয় ১৩৪৮ সালে নির্ম্মিত। টীন্ গির্জা (Tyn Church) বহুপ্রাচীন বলে' মনে হলো। বোধ হয় দশ শতকের (৯২৩) প্রারম্ভে

নির্ম্মিত। এখানে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ টাইকো ব্রাহির (Tycho Frahe) সমাধি আছে। আমরা পুল পার হয়ে একটি বাড়ীর সম্মুখে এলাম সেখানে নাকি বিটোফেন বাস করতেন। মোজার্টের বাড়ীও এখানে আছে—টাউন স্কোয়ারের কাছে। মোজার্ট এখানে বসে তাঁর 'ডন জুয়ান' (Don Juan) সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, কিন্তু সমাপ্ত করতে পারেন নি। বায়রণের প্রসিদ্ধ কবিতার মত এই সঙ্গীতও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। অনেকদিন থেকে এর সুর জানবার চেষ্টা করছি। কিন্তু এখনও সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হ'তে পারি নি

প্রাগের বাড়ী ঘর পথ ঘাট যেমন পুরাণো, ওদের মানসিক অবস্থাও তেমনই রক্ষণশীল বলে' বোধ হলো। জার্ম্মানী থেকে ধর্ম্মভাব ক্রমশঃ নির্ব্বাসিত বোধ হয়েছিল—অন্ততঃ সে দেশে ধর্ম্মভাবের বিশেষ কোনও সাড়া পাইনি। কিন্তু এখানে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রভাব বেশ প্রবলভাবেই বর্ত্তমান আছে বলে' মনে হলো। জার্মানী থেকে খৃষ্টধর্ম্মকে একরূপ বিদায় করছে, সমস্ত খৃষ্টান দেশে শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের খুব নিকট সম্বন্ধ ছিল। এ দেশে আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালীর অনেকে নিন্দা করেছেন; বলেছেন কানু ছাড়া যেমন গীত হ'তে পারে না, তেমনি ধর্ম্ম

হ্রাদচীন প্রাসাদ—প্রাগ

এখানকার সেন্ট ভাইটাস্ গির্জাও বিখ্যাত। সেন্ট-ভাইটাসের নামে একপ্রকার স্নায়বিক স্পন্দন (St. Vitus Dance) রূপ ব্যাধি প্রসিদ্ধ হয়ে' আছে। ঐ সাধু পুরুষের বোধ হয় ঐ ব্যাধি প্রথম হয়েছিল। গির্জার অভ্যন্তরে অনেক মূর্ত্তি রয়েছে দেখলাম। যে সকল কাচের জানালা আছে, তাতেও অনেক সুন্দর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। এই সকল মূর্ত্তি ও চিত্র দেখলে বুঝতে পারা যায় যে ধর্ম্মের আতপত্র তলেই ইউরোপের শিল্পকলা প্রধানতঃ গড়ে উঠেছিল।

ছাড়া কোনও শিক্ষা হ'তে পারে না। কিন্তু পশ্চিমেই এখন উল্টো হাওয়া বইছে, শিক্ষা থেকে ধর্মকে নির্ব্বাসন করবার জন্য অনেক দেশে রীতিমত চেষ্টা চলছে। জার্ম্মানীতে প্রথমে হ'লো পাদ্রীদের স্কুল তুলে দেওয়া হোক্, কেননা আর সে সকলের প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় ব্যবস্থা হলো যে-সকল স্কুলে ধর্ম্মের সংস্রব আছে (Confessional denominational schools) সেগুলি দূর করে দেওয়া হোক্; কেননা জাতীয় ঐক্যের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে সেগুলি। তার পরে হলো স্কুলের শিক্ষক পাদ্রী হ'তে পারবে না। এই-

ক্রমে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের প্রভাব থেকে জার্মানী সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন হ'বার চেষ্টা করছে। এই যে খৃষ্টধর্ম্মবর্জ্জিত জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা (Dechristianising of life) এটা ক্রমে প্রবর্ত্তিত হচ্চে। ওদিকে পোপ মশায় এর তীব্র প্রতিবাদ করছেন। কিন্তু জার্মানী তাতে কিছুমাত্র বিচলিত নয়।

প্রাগের আবহাওয়া সমস্ত খৃষ্টের ধর্মে ভরপুর বলে' মনে হলো। একটি প্রশস্ত রাজপথে টাউনহলের চূড়ায় পুরাতন এক ঘড়ি দেখলাম। এ ঘড়িটি বিশ্ববিখ্যাত। যখন ঘণ্টা বাজে, তার আগে মৃদু সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে ১২ জন মহাপুরুষ (Apostles) এক এক করে' বেরিয়ে আসেন এবং ভিতরে প্রবেশ করেন। ঘড়ির এক দিকে কাল-পুরুষ করাল মূর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে; তার হাতে একটি হাতুড়ি। সে সেই হাতুড়ি দিয়ে ঘণ্টা পিটিয়ে দেয়। আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন ১০টা বাজ্‌লো। এই অদ্ভুত ঘড়িটি ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে আইয়ন রুজ (Ion Rouge = John Rose) নামক কারিকর নির্ম্মাণ করেছিলেন। আজও সে ঘড়ি সমান চল্‌ছে, সময়ের এক চুল এদিক ওদিক হয় না। মৃত্যু যে জীবন থেকে এক একটি ঘণ্টা কেড়ে' নিয়ে' চলেছে—এ শিক্ষা রোমান ক্যাথলিকদের ধর্ম্মের একটি মূল সত্য। এবং এদিক দিয়ে হিন্দুদের ভাবধারার সঙ্গে ওদের বিলক্ষণ মিল আছে দেখলাম। যারা প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে নিঙড়ে, তার সমস্ত মধুটুকু নিঃশেষে পান করতে চায়, তাদের জীবনে বর্ত্তমানই সব, ভবিষ্যৎ অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ; তারা মৃত্যুর সম্বন্ধে উদাসীন। ধর্ম্ম তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে কিরূপে? পৃথিবীতে এসেছি আনন্দ করতে, আপনাকে জাহির করতে, সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিতে, লোকের মধ্যে দুঃখ ক্লেশের স্রোত বইয়ে দিতে, তাদের কাছে পরলোক নেই, মৃত্যুভয় নেই, অদৃষ্ট নেই, ধর্ম্মও সুতরাং নেই। আমাদের দেশের একটি সামান্য উদ্‌ভট শ্লোকে কি সুন্দর কথা শিখিয়ে দিচ্চে:

মৃত্যুঃ শরীরগোপ্তারং ভূমিরক্ষং বসুন্ধরা।
দুশ্চারিণীব হসতি ভর্ত্তারং পুত্রবৎসলং॥

বন্ধুবর পূর্ণচন্দ্র দে উদ্‌ভটসাগর মশায় এই শ্লোকটি আমায় দিয়েছিলেন। এর অর্থ হয়ত একটু শ্রুতিকটু হ'তে পারে, কিন্তু এর শিক্ষা অতি মূল্যবান। আমরা শরীরের নানা যত্ন করি, কিন্তু পাশে মৃত্যু দাঁড়িয়ে হাসেন, বলেন যে এত আমারই, দু'দিন বাদে আমার অধিকারেই আসবে, তুমি দু'দিন একটু যত্ন করে' নেও। কিন্তু আমি জানি কার

ব্লাতাভায় চার্লস্—প্রাগ

জিনিষের যত্ন কে করে! তার পরে যারা এক হাত পরিমাণ ভূমি নিয়ে লাঠালাঠি মারামারি রক্তারক্তি করে, তারা ভুলে' যায় যে কার জমি কে দখল করতে যাচ্ছে। রাজা দিগ্বিজয় করলেন, একটা জাতিকে পদানত করলেন, মনে করলেন আমার জয় জয়কার। কিন্তু সর্ব্বংসহা বসুন্ধরা পাশে দাঁড়িয়ে হাসেন। তিনি বলেন, ওরে বাপু আমার জমি আমারই থাকবে, আমার দেশ আমারই থাকবে, তুমি দু'দিন লাফালাফি করছ বইত নয়! তাই উপমা দিচ্চেন যে দুশ্চারিণী পত্নী যখন দেখে যে তার স্বামী ছেলেটিকে নিয়ে খুব নাচাচ্চেন, খেলছেন, তখন সে যেমন পাশে দাঁড়িয়ে হাসে, সেই রকম। কারণ সে ত জানে সত্যি কার ছেলে!

প্রতিদিন ৪ লক্ষ জোড়া জুতো তৈরী হয়! ৩৬৫ দিন যদি কল চলে এবং চামড়ার যদি অভাব না হয়, তা হলে আমার মনে হয়, পৃথিবীতে থাকবে শুধু জুতো। পরবার লোক থাকবে কি না, সে সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ আছে। কারণ সভ্যজগতের গতি ফিরছে ঐ কলকারখানার দিকে। বড় বড় সহরগুলি হয়েছে বড় বড় কলকারখানার ডিপো। এর দুইটি ফল: প্রথম ফল মজুর কারিগরে সহর পূর্ণ হচ্ছে, আর দ্বিতীয় ফল হচ্চে অর্থের অভাবনীয় প্রাচুর্য্য। কিন্তু সে অর্থ মজুত হচ্চে ধনীদের ঘরে। শ্রমিকরা কায়ক্লেশে বেঁচে থাকে মাত্র। কারণ তাদের মেরেই ত ধনিকেরা আরও অর্থশালী হচ্চে। মজুর কারিগর শুধু খেটে খেটেই মরে। এদিকে অর্থ আস্‌ছে জলস্রোতের মত; কিন্তু

থিয়েটার—প্রাগ

প্রাগে যে শুধু ধর্ম্মের প্রতি মামুলি অনুরাগ দেখলাম, তা নয়। আধুনিকতাও যথেষ্ট আছে। বিখ্যাত বাটা কোম্পানির কারখানাও এই প্রাগে। মিঃ বাটা সংকল্প করেছিলেন যে পৃথিবীর যাবতীয় লোককে তিনি জুতো পরিয়ে ছাড়বেন। তাঁর উদ্যম সফল হয়েছে। বাটা কোম্পানী পৃথিবীর সর্ব্বত্র জুতো দিয়ে ছেয়ে ফেলেছে—জুতোর বাজার নামিয়ে দিয়েছে—অনেক দেশে জুতোর ব্যবসায় মাটী করেছে। প্রাগের এই কারখানাটিতে শুনলাম

তাদের দুর্দ্দশা ঘোচে না। অর্থাৎ প্রাচুর্য্যের মধ্যে অনটন, অর্থ স্বচ্ছলতার মধ্যে দারিদ্র দৈন্য—এই হচ্চে বর্ত্তমান সভ্য জগতের এক বেজায় গোলক ধাঁধা। ফলে এই মুটে মজুরদের মধ্যে অনেকে অশিক্ষিত, অনেকে চরিত্রহীন, অনেকে ধর্ম্মজ্ঞান বর্জ্জিত। এদের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে প্রত্যেক রাষ্ট্রতন্ত্রে এদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান রাখতে হচ্চে। এদের আর অগ্রাহ্য করা চলে না। এই শ্রমিক সম্প্রদায় চায় ধনিক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধন করতে—এরই জন্য

ইউরোপে এক নূতন-জাতিভেদ নয় জাতিসংগ্রামের (class war) সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশের জাতিভেদ তার কাছে কিছু নয়। আমাদের দেশের জাতিভেদ নিয়ে কত ঠাট্টা বিদ্রূপ আমাদের শুনতে হয়! এখন জাতিভেদ যে আকারে আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে—এমনটা আগে ছিল না। জন্মান্তরবাদের প্রসাদে আমরা সকলেই যার যার অবস্থায় একরূপ সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু এখন নানা কারণে এই জাতিভেদের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিরোধ ঢুকেছে। এখন সকলেই উন্নত হতে চায়, অনুন্নত আর কেউ থাকতে চায় না। সাম্যবাদের প্রভাবে জাতিভেদ উঠে যায় যাক। কিন্তু সাম্যের জন্য এত বৈষম্যের আমদানী কেন? জাতি-ভেদ সম্বন্ধে আমাদের এই বাংলা দেশে সেদিনও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্পষ্ট ভাষায় বলে' গেছেন :—

যেই ভক্ত সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥
—চৈতন্যচরিতামৃত।

চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ ভজে।
বিপ্র বিপ্র নহে যদি অসৎ পথে মজে॥

বাস্তবিক সভ্যতার মাপকাঠি ত এই হওয়া উচিত। নইলে আর সভ্যতার মূল্য কি? কিন্তু বর্ত্তমান সভ্য জগতে এ মাপকাঠি অচল হয়ে' পড়েছে। তাই ভয় হয় মানুষের উন্নতি পিপীলিকার পক্ষ গজানোর মত মৃত্যুর জন্য না হয়!

হোটেলে একজন চেকোশ্লোভাকিয়ার ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাঁদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা। তিনি বললেন, 'আমরা ক্রমে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছি। এখনও সময় লাগবে।'

'আপনাদের রাষ্ট্রনীতি এখন কি ভাবে চলছে?'

'চলছে মন্দ না। তবে আমাদের এক ধারে অষ্ট্রিয়া, আর এক ধারে জার্মানী—বুঝতেই পারছেন আমাদের অবস্থা।'

'কেন, আপনারা কি যুদ্ধের আশঙ্কা করেন?'

তিনি বললেন, 'সব সময়।' একটু থেমে বললেন 'আকাশের দিকে চেয়ে থাকি, কখন এক ঝাঁক উড়ো জাহাজ এসে বোমা ফেলে আমাদের বুকের উপর।'

বুঝলাম যে, শান্তি কোথায়ও নাই। এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি যে তার নিজের উন্নতির দিকে মন দেবে, বিধাতা সে সুযোগও এদের দিচ্ছেন না।

আগে চেকোশ্লোভাকিয়ার লোকদের সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা ছিল। প্যারিস প্রভৃতি শহরে চেকদের অত্যন্ত দুর্নাম আছে; যত পকেট মার বাটপাড় নাকি এদের মধ্য থেকেই হয়। কিন্তু আমার সে ধারণা সত্য বলে' মনে করবার কোনো কারণ পাই নি। ওদের ব্যবহার ভদ্র। হোটেলের লোকগুলি পর্য্যটকদের সুবিধা করে' দেবার জন্য ব্যগ্র। এমন কি প্যারিসে ট্যাকসিওয়ালারা যে ভাবে ঠকিয়ে পয়সা নিয়েছিল, এদের রাজধানীতে সে রকমটা ঘটে নি।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বিধাতার বিদ্রূপ

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

এই নিয়ে বার দশেক হবে, আবার বাধা পড়ল। আঃ আচ্ছা জ্বালাতন!

ছুটির দিন চা খেয়ে ছোট্ট আমার পড়ার ঘরটিতে বসেচি, কাগজ কলম পেন্সিল সব সাজিয়ে। বাইরে ঘন কুয়াসা হয়েচে, ভিজে ঘাসের মাথায় মাথায় জলের ফোঁটা অস্পষ্ট সূর্য্যালোকে জ্বলচে। মৌশুমি ফুলের ডগা হতে টুপটুপ করে শিশিরকণা ঝরে পড়চে, দূরে বড় বড় গাছগুলি অস্পষ্ট আবছা আবছা দেখা যায়, লেখবার পক্ষে এমন চমৎকার আট্‌মোস্ফেয়ার আর কি পাব? একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবচি লিখব একটা চমৎকার প্রেমের গল্প, ঘরকর্ণা আর বাটনাবাটা এক ঘেয়ে বিবাহোত্তর প্রেম নয়, যার মাঝে থাকবে একটা বিরহের এবং বেদনার সুর—কত অকথিত উচ্ছ্বাসময় ব্যথা নিবেদনের ব্যর্থপ্রয়াস, মনে মনে স্বপ্নের জালবোনা আনন্দময় মুহূর্ত্তের সঞ্চয়, এই ঘন কুয়াসার মতো যে প্রেম হবে নরম মনোরম, এরি মতো গোপন, নির্জ্জন, যে প্রেম শুধু একান্তে নিভৃতে 'তারে বলা যায়—এমন সময়—

"আসতে পারি কি? আর পারাপারির ধার ধারিনে মশায়, একেবারেই এলাম। নমস্কার। এই রেঃ, কাব্যি লিখতে বসেচেন বুঝি? বাধা দিচ্চিনে ত?"

নাঃ, বাধা দেবে কেন! এমনই কি অপরাধ করেচি আমি তোমার ডিস্পেন্সারির পাশের বাড়ীটা ভাড়া নিয়ে! যখনি বসেচি একটু একান্তে, যখনি মনে এসেচে একটা সুন্দর গল্পের প্লট তখনি এমনি করে···। এই নিয়ে বার দশেক হবে। কেন তোমায় আমি সহ্য করব, হে অসাহিত্যিক, হে বেরসিক, হে ডাক্তারী শিক্ষিত বিভ্রান্ত বিমূঢ়, হে···। Inflated বন্য মহিষের সদৃশ তোমার আকার, এবং আকার সদৃশ তোমার প্রজ্ঞা—কিন্তু মুখে প্রকাশ করে ত বলা যায় না, এ সকল কথা মনেই রইল। তিন-চার কাপ চা এল, অনেক সিগারেট পুড়ল, ডাক্তার বন্ধু হিহি, হেঁ হেঁ করে প্রচুর হাসলেন, প্রচুর গল্প করলেন। প্রতিবেশী চৌধুরী মশায়ের অসুখের বর্ণনা করলেন, পরমায়ু নাকি তাঁর নিঃশেষ হয়েচে, পঁচাত্তর বছরের বুড়োকে নিউমোনিয়া থেকে বাঁচান যায়—চৌধুরী-গিন্নীর সেবা, সে নাকি একটা দেখবার বস্তু, এমন সাধ্বী আর হয় না, দিবারাত্র স্বামীর পাশে বসে আছেন, জলগ্রহণও করেন নি আজ দশ দিন···। ঘড়ির কাঁটা যখন এগারোটার ঘরে এবং ভেতর থেকে পুনঃপুনঃ স্নানের তাগিদ যখন এসেছে তখন তিনি উঠলেন, যাবার সময় আর একবার আশা করে গেলেন 'কাব্যি' লেখার কোনো ব্যাঘাত জন্মান নি।

একটা নিস্ফল ক্রোধে মনটা ভরে উঠল। মনে মনে মৎলব আঁটতে লাগলাম কাব্যিক প্রতিহিংসা নেব ও লোকটার ওপর, দেব ওর ডাক্তারিবিদ্যা ফাঁস করে, এমন একটা বিশ্রী কুৎসিত গল্প লিখব ওকে কেন্দ্র করে যা পড়ে লোকে বিভীষিকায় চমকে উঠবে, এমন একটা গল্প···কিন্তু তা আর লেখা হল না।

শুদ্ধ দ্বিপ্রহরে বেশ আরাম করে বালাপোষখানি গায়ে জড়িয়ে পা'দুটি ঢেকে শুয়ে শুয়ে ভাবচি এ পাড়া পরিত্যাগ করব। খবরের কাগজখানা পড়া হয়ে গেচে, ই, আই, রেলের দুর্ঘটনার বর্ণনা বড় বড় অক্ষরে প্রথম পাতাতে ছেপেচে—জ্বলন্ত ট্রেণে যাত্রীদের জীবন্ত চিতা, কে নাকি শুকনো ঘাসে আগুন দিয়ে ছিল, তাতেই ট্রেণ জ্বলে উঠেচে! উঃ কী ভীষণ মৃত্যু! চোখের সামনে জেগে উঠল সে দৃশ্য। লেলিহান অগ্নিশিখা, আহতদের আর্ত্তনাদ, জ্বলন্ত নরদেহের উৎকট গন্ধ!

জ্বলন্ত নরদেহের উৎকট গন্ধ!···হঠাৎ মনে হল সেই গন্ধটাই যেন পাচ্ছি—মনে হল বাতাসে সেই গন্ধটাই যেন

ভারাক্রান্ত হয়ে ভেসে আসচে! নামজাদা সাহিত্যিকদের পরিকল্পনা স্বভাবতঃই তীব্র, ভাবলাম এমন স্পষ্ট গন্ধ যখন নাকে এসে লাগচে তখন নামজাদা সাহিত্যিক হতে আমার আর দেরী নেই।…এমন সময় চাকরটা কোথা থেকে ছুটে এসে বলল চৌধুরী বাড়ীর গিন্নীঠাকরুণ কাপড়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মারা যাচ্চেন, খুব হৈ হৈ হচ্চে ওখানে।

দৌড়ে গিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম সে আর ভোলবার নয়।

বৃদ্ধ চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যু আসন্ন। চৌধুরী গিন্নী তাঁর শয্যায় বসে দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটিয়েচেন, জলগ্রহণ করেননি। সব সময় ঠিক আচ্ছন্নের মতো বসেছিলেন ঠায়। তাঁর ছেলে হরিনারায়ণের মুখে শুনলাম হঠাৎ চৌধুরীগিন্নী বললেন, পূজায় বসব। পূজার ঘরে দরোজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ বসেছিলেন। তারপর এদিকে চৌধুরী মশাই যেমন প্রাণত্যাগ করেচেন ঠিক সেই সময় ঠাকুর ঘরের জানালা থেকে আগুনের একটা ঝলক ও প্রচুর ধোঁয়া আসতে দেখে ওঁরা দরোজা ভেঙে ঢুকে দেখেন বৃদ্ধা গায়ে কেরোসীন ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেচেন।

স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। পঞ্চাশ বছর ধরে এঁদের বিবাহিত জীবন কেটেচে। আজ ইহজগতে তার পরিসমাপ্তি ঘটল। পরজগতের কথা কে জানে, কে বলতে পারে? তবু মনে হয় পরজগৎ মিথ্যা নয়, এঁদের এ প্রেমের এখানেই পরিসমাপ্তি নয়। পৃথিবীর বহু উর্দ্ধে জ্যোতির্ময় আলোক লোকের দুই অভিন্ন আত্মা হয়ত বা কোনো ভুলে দুদিন এই মরজগতে বাসা বেঁধেছিলেন, তারপর আবার ফিরে গেলেন সেই অনন্তকালের দেশে। আমরা মর্ত্তবাসী, কোনো খবরই পাই না, শুধু মাঝে মাঝে সতীদাহের এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মধ্য দিয়ে সেই অপার্থিব মানসলোকের রশ্মিচ্ছটা কদাচিৎ উদ্ভাসিত হয় আমাদের চোখের সামনে।

বাপমায়ের শ্রাদ্ধ হরিনারায়ণ খুব ঘটা করেই সম্পন্ন করলেন। লোকে শ্রদ্ধাভরে চৌধুরী বাড়ীর নাম দিল সতীবাড়ী।

তারপর আর অনেকদিন ও বাড়ীর কোনো খোঁজ খবর রাখিনি। সম্পাদক মশায়দের কঠোর তাড়ায় ডিস্পেন্সারির ডাক্তার বাবুকে যথাসম্ভব ঠেকিয়ে রেখে গল্প রচনায় মন দিয়েচি। গল্প যা লিখেচি তার চেয়ে কেটেচিই বেশী, কোনোটি আর মনের মতো হচ্চে না। কত নাম বাছাই করে নোট বইয়ে টুকে রেখেচি, ভেবেচি আমার অলিখিত ভবিষ্যৎ গল্প উপন্যাসগুলির হবে এ নাম, "দীপ নেভানো বাতায়নে", "আমারে পড়িবে মনে", "ক্লান্ত কণ্ঠে মোর সুর ফুরায়", "ফুল ফোটানো হয়নি সারা", "এখনো রহিল বাধা", "যৌবনের বেদনা", "স্বপ্ন হয়ে এস গো", "হারানো দিনেরি ভাষা"—ইত্যাদি ইত্যাদি কত নাম। কিন্তু ঐ নামেই শেষ। মাসিক পত্রিকা এলেই খুলে দেখেচি আমারই নির্বাচিত নামে কত লেখক-লেখিকা কত গল্প লিখে ফেলেচেন। আমারই কল্পনা করা প্লট নিয়ে কত সাহিত্যিক সাহিত্য রচনা করেচেন। তখন বারংবার তাড়না করেচি নিজের অলস স্বভাবকে। তাই এবার উঠে পড়ে লেগেচি আলস্য পরিত্যাগ করে। আমাদের পাড়ার এই অভাবনীয় ঘটনা নিয়ে আর কোনো সাহিত্যিক পাছে আমার আগেই গল্পটা লিখে ফেলেন সেই ভয়ে সশঙ্কিত আছি

সঙ্গে সঙ্গে আবার মস্ত এক উপন্যাস ফেঁদেচি, থাকবে তাতে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। সেদিন এক ঔপন্যাসিক বন্ধু আমায় উপদেশ দিয়েছেন যেন খুব সবিস্তারে বর্ণনা করবে নায়ক-নায়িকার প্রেম ও বিরহ, পাছে ছোট হয় সেই জন্যে গল্পের আরম্ভ করবে নায়কের জন্মগ্রহণ হতে, এবং শেষ করবে একেবারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাথে। প্রত্যেক বিবরণটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখে চলেচি। উপন্যাসকে এখন অষ্টম পরিচ্ছেদে এনে দাঁড় করিয়েচি, যেখানে নায়কের সঙ্গে হয়েচে নায়িকার দেখা। এবার ভাবচি কি করা যায়, কোন্ দিক দিয়ে গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দিলে পাঠক-মনে যথেষ্ট সহানুভূতি পাওয়া যাবে, নায়ককে বিলেত পাঠাব না জেলেই পাঠাব, নায়িকাকে অবিবাহিত রাখব, না ধঁ৷ করে একটা বিবাহ দিয়ে বিবাহোত্তর পরকীয় প্রেমের মনস্তত্ত্বপূর্ণ ভাবধারার আমদানি করব,—এহেন সময় দিবা দ্বিপ্রহরে চৌধুরী বাড়ীর খোলা জানালা দিয়ে সুতীব্র হ্রেষার মতো প্যাক পেঁকে হারমোনিয়ামের সঙ্গে আনুনাসিক সুরে নারী

কণ্ঠের গান শোনা গেল, "আজু বিহি মোরে অনুকুল হোয়ল"। এই মাটি করেচে। এই ঠিক "দুখ্ খুর" বেলা কৌন্ অভাগীর প্রতি আবার বিহি অনুকূল হলেন কে জানে!

বক্স হারমোনিয়ামের এই শ্রবণবিদারণ আওয়াজকে অত্যন্ত ভয় করি। শুনলেই মনে হয় যেন সর্ব্বনাশের আর দেরী নেই। কেন মনে হয় তা বলচি। আমাদের গ্রামের তুলসী বাঁড়ুয্যের বাপ ছিলেন সেকালের কোনো হৌসের মুৎসুদ্দী। নানারূপ ঘোরানো বুদ্ধির বিনিময়ে তিনি বহু সহস্র রজতচক্র অর্জ্জন করে লোহার সিন্দুকে তুলেছিলেন। তুলসী বসেছিল অনিদ্রযোগে প্রহর গুণে কতদিনে বাপ দুনিয়াদারিটা ফৌত করেন। এই বহুবাঞ্ছিত কার্য্যটি তিনি সমাধা করতে না করতেই তুলসী মোসাহেব এবং বাইজীবর্গ সমভিব্যাহারে ফুর্ত্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন। তখন আমার শৈশবকাল। কতবার তুলসী বাঁড়ুয্যের বৈঠকখানার খোলা জানালার মধ্য দিয়ে ভীতচোখে দেখেচি ঘরের একদিকে জলন্ত ষ্টোভের উপর চব্বিশপ্রহর কুক্কুটমাংস সুসিদ্ধ হচ্ছে, অপরদিকে রাশি রাশি মদের বোতল রসপিপাসীদের রসপরিবেশনে ব্যস্ত, এ সবের মাঝখানে মোসাহেব বেষ্টিত তুলসী বসে বক্স্ হারমোনিয়ামে নাকিসুরে 'সেঁইয়া সেঁইয়া' করে গান ধরেছেন, এবং স্থূলকায়া এক বাইজী চরণ ঠুকে ঠুকে নৃত্য করচে। তারপর মনে পড়ে একদিন যকৃতের ব্যথায় মরণাপন্ন হয়ে কপর্দ্দকশূন্য তুলসী বাঁড়ুয্যে কোন সুদূর বিদেশে প্রাণ হারালেন, তাঁর প্রকাণ্ড চকমেলানো বৈঠকখানায় চামচিকের দল ভিড় করে এল, অশ্বত্থ ও বটের গাছ ছাদ ফুঁড়ে শিকড় নামিয়ে দিল।

হরিনারায়ণের বাড়ীর গানবাজনা ক্রমে বেড়েই চলেচে। দিন নেই, রাত নেই সকল সময় সেখানে গানের আসর বসেচে, পাড়ার যত সঙ্গীতপিপাসী রসিকসুজন, বিশেষ করে সখের থিয়েটার দলের যুবকরা সেখানে সুস্থায়ী আড্ডা জমিয়েছে। শুনলাম, এই আড্ডা নাকি হরিনারায়ণের মেয়ে শ্বশুরবাড়ী পরিত্যক্তা শুভ্রাকে কেন্দ্র করে। শ্বশুরবাড়ীতে তার বনে নি কেন না তার 'রকম সকম' নাকি খারাপ। মনটা দমে গেল।

ক্রমে লোকের রসনা প্রচুর আলোড়িত হল এবং এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হল যে চৌধুরী বাড়ীর নাম উঠলেই একটা চাপাহাসির সঙ্গে কানাকানি শুনতে পেতাম, সতীবাড়ীই বটে!

ভাবলাম হরিনারায়ণ বাবুকে একটু আভাস দেওয়া অন্যায় হবে না। তাঁকে ত আমি ভাল করেই জানি, ছাত্রাবস্থায় কতবার পড়া বুঝিয়ে এনেচি। শক্ত শক্ত অঙ্ক উনি এমন সহজে কষে দিতেন যে আমার শ্রদ্ধার আর অন্ত ছিল না; আমাকেও স্নেহ করতেন অনেকখানি, তবে লেখাপড়া শিখে একটা মস্ত চাকরি বাকরি কিছুই করতে পারলাম না, এমন কি একটা পাটের দালালিও অদৃষ্টে জুটল না, হলাম কি না সাহিত্যিক, তাও ডিটেক্টিভ-সাহিত্যিক নয় যাঁদের বই বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজমান;—এতে হরিনারায়ণ আমাকে খুবই কৃপার চক্ষে দেখতেন। তবু ভাবলাম যাওয়া উচিত, হরিনারায়ণকে তাঁর মেয়ের সম্বন্ধে একটু সচেতন করানো উচিত।

গলায় চাদর ঝুলিয়ে বেরুচ্ছি দেখে গৃহিণী মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "সকাল বেলা অত সাজ সজ্জা করে যাওয়া হচ্চে কোথা শুনি?"—উত্তর শুনে বিশেষ ভঙ্গীতে ঘাড় হেলিয়ে বললেন, "দেখো গানের আসরে তোমার পায়ে ঘুঙুর আর মাথায় দর্জ্জির টুপি পরিয়ে ডান্সিং মাষ্টার না করে বসে!" আমি বললাম, "অয়ি কঙ্গললনে, মাভৈঃ। নৃত্যের বাসনা যদি আমার একান্তই জাগে তা করব তোমার প্রাঙ্গণে, তুমি বরং টিকিট করে যদি দর্শক সমাগম করতে পারো, কিঞ্চিৎ মুনাফারও ব্যবস্থা হবে।"

চৌধুরী বাড়ী গিয়ে দেখি সবাই কেমন চুপচাপ। যে হারমোনিয়াম দিবারাত্র বিশ্রাম জানেনি সেও আজ নিস্তব্ধ। বাইরের বৈঠকখানায় কয়েকজন আধাবয়েসী ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বসে আছেন। আমাকে দেখে তাঁরা আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন।

হরিনারায়ণ এলেন। তাঁর মুখ চিন্তাক্লিষ্ট, তাঁকে খুব বিপন্ন বলে বোধ হল। বললেন আজ সকাল হতে শুভ্রার কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে এও নাকি জানতে পারা গেছে যে সখের থিয়েটারের সঙ্গীত শিক্ষক মিষ্টার মোহন এমানুয়েল বিশ্বাসও নিরুদ্দেশ।

এ ঘটনা আর কোনো বাড়ীতে না ঘটে সতীবাড়ীতে ঘটল এইটেই বিধাতা পুরুষের তীব্র বিদ্রূপ।

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

মাইকেলের 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য

অধ্যাপক শ্রীহেরম্ব চক্রবর্ত্তী এম-এ, বিদ্যাবিনোদ

ব্রজাঙ্গনা মধুসূদনের বিচিত্র সৃষ্টি; কারণ তাঁহার কাব্য প্রতিভার স্বাভাবিক দুন্দুভিনাদ যেন ক্ষণকালের জন্য এখানে আসিয়া থামিয়া গিয়া শুধু সানাইর সুর ধরিয়াছে। এই কাব্যখানিতে সুমধুর তার যন্ত্রের একটি করুণ কোমল সুরই ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা বাস্তবিকই "ব্রজাঙ্গনা কাব্যে শুনি মধুর সেতার।" কাব্যের আদর্শের দিক হইতেও এই কাব্যখানি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। রোমক প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ আমরা যাঁহার মধ্যে পাইয়াছি সেই ক্লাসিক আদর্শের কবি যে প্রাচ্য বৈষ্ণব রীতিতে গীতিকবিতার ঝঙ্কার তুলিয়াছেন, ইহা একটু বিচিত্রই। তবুও মধুসূদনের কবিত্বশক্তির বিশিষ্টতাটুকু এই কাব্য হইতে বর্জ্জিত হয় নাই।

এই কাব্যখানির রচনা কাল ও অবস্থাও একটু বিচিত্র। কবি যখন 'মেঘনাদ বধ' কাব্য রচনা দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গ কবিগণের বিরুদ্ধে এবং প্রচলিত রীতিনীতি ও কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন ঠিক সেই সময়েই বৈষ্ণব কবিগণের ও নিধুবাবুর আদর্শে রাধাকৃষ্ণ প্রেম বিষয়ক কাব্য রচনার ইচ্ছা তাঁহার মনে উদিত হয়। তিনি তাঁহার বন্ধু গৌরদাস বাবুকে লিখিলেন, "I mean to try Nidhoo's odes." এবং মেঘনাদ বধ কাব্য রচনা কালেই অর্থাৎ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এই কাব্যখানি প্রণয়নে মনস্থ করিয়া তাঁহার অপর বন্ধু রাজনারায়ণ বাবুকে লিখিলেন, "I think you are rather cold towards the poor lady of Braja. Poor man! when you sit down to read poetry leave aside all religious bias. Besides Mrs. Radha is not such a bad woman after all. If she had a 'Bard' like your humble servant from the begining, she would have been a different character. It is the vile imagination of poetasters that has painted her in such colours."

বস্তুতঃ রাধার প্রেমকে এই ভাবপ্রবণ প্রেমিক কবি খুব উচ্চস্তরের বলিয়া মনে করিলেও ভক্তিভাবের অভাবে বৈষ্ণব কবিগণের আধ্যাত্মিক পদগুলির জাগতিক ব্যাখ্যা দিয়া অত্যন্ত অশ্লীল ও কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে করিতেন। নূতন যুগের আদর্শে যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া উঠিয়াছিল সেই পরিপ্রেক্ষায় মাইকেল এই বৈষ্ণব গীতিকবিতাগুলি বিচার করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রজাঙ্গনা কাব্যে আমরা প্রেমিক কবির ভাবোচ্ছ্বাস পাই অথচ ভক্ত কবির রসতন্ময়তা পাই নাই।

এই আদিরস প্রধান গীতিকবিতাগুলিতে কবি প্রেমের অপার্থিবত্ব অস্বীকার করিয়া সাধারণ মানব মানবীর মিলন-বিরহ-বৈচিত্র্য অঙ্কন করিলেও বিষয় বস্তুর বর্ণনভঙ্গি বৈষ্ণব কবিগণের আদর্শেই গ্রহণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ বিরহে রাধিকার মানসিক বৈকল্য ও ভাবান্তরের যে উজ্জ্বল চিত্র বৈষ্ণব কবিগণ পরম রমণীয় করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন মাইকেলও সেই বিরহ-প্রসঙ্গকেই তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তু স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। ছন্দের ব্যবহারেও কবি স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বত্রই প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। তবে মিত্রাক্ষর ছন্দেও তিনি স্বাধীনভাবে নূতনত্ব সম্পাদন করিয়াছেন। পয়ার এবং ত্রিপদীর গণ্ডী অতিক্রম না করিলেও উভয়ের সংমিশ্রণ ও বিচিত্রতা দ্বারা তাঁহার স্বাভাবিক ছন্দস্বাধীনত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। যমক, অনুপ্রাস, উপমা, ব্যাজস্তুতি, শ্লেষ প্রভৃতি নানা শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারেও তিনি কাব্যখানিকে সাজাইয়াছেন। বিশেষত প্রতি কবিতার শেষে ভণিতা সংযোজন-

গীতি প্রাচীন কবিগণেরই অনুরূপ। তবে বৈষ্ণব কবিগণের রচিত পদগুলি সমগ্র বিরহ বর্ণনার অংশ বিশেষ, সেগুলির পৃথক্ সত্তা অপরিস্ফুট। কিন্তু মধুসূদনের কাব্যের কবিতাগুলির বস্তু অংশের ঐক্য সত্ত্বেও প্রত্যেক কবিতাটিই স্বয়ংপূর্ণ, স্ব স্ব পরিধির মধ্যে একটি সমগ্র-ভাব-ধারা সম্বলিত।

বৈষ্ণব কবিগণের রাধা পূর্ব্বরাগাদি নানা অবস্থার ভিতর দিয়া, নানা কঠিন পরীক্ষার সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইতে বিরহে উপনীতা। মাইকেল এই ইতিবৃত্তের বিবৃতি না দিয়াই অতি অতর্কিতভাবেই বিরহব্যাকুলা রাধার বিষাদিনী মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। কিন্তু রাধার এই বিরহ-ব্যাকুলতা পরম পুরুষের জন্য পরমা প্রকৃতির ব্যাকুলতার প্রতীক নহে। তাঁহার রাধা 'মহাভাবস্বরূপিনী' 'ঠাকুরাণী'ও নহেন। তিনি সাধারণা, প্রিয় বিরহে ব্যাকুলা, প্রমোদ কাননে প্রিয়তমের সান্নিধ্যচ্যুতা উন্মাদিনী। বহিঃপ্রকৃতির সহস্র রকম ব্যঞ্জনা তাঁহার কল্পনাকে উজ্জীবিত করিয়া তোলে, তিনি প্রিয় সমাগমের আভাস পান, নিসর্গের লীলানিকেতনে নানাপ্রকার মিলন-বিরহ-বৈচিত্র্য তাঁহার বিরহ বোধকে সচেতন করিয়া রাখে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি তাঁহার কৃষ্ণানুসরণের স্পৃহা আনয়ন করে। জলধর ও কাদম্বিনীর মিলন তাঁহার বিরহাতুর হৃদয়ে ঈর্ষ্যা জাগাইয়া দেয়, যমুনার সাদৃশ্যে তিনি বিরহ দুঃখ উপশমের প্রয়াস পান। কিন্তু একটু মনোযোগের সঙ্গে কবিতাগুলি পাঠ করিলেই লক্ষ্য করা যায় যে রাধার এই চিত্তবৈকল্য যেন বহিঃপ্রকৃতির দান, তাঁহার অন্তঃ প্রকৃতির স্বরূপ নহে। বর্ণনায় এই কৃত্রিমতার জন্যই এই বিরহ গাথাগুলি আমাদের হৃদয়কে তত রসাবিষ্ট করিয়া তুলিতে পারে না যতটা অনুভূতি ও করুণ মর্ম্মস্পর্শ আমরা বৈষ্ণব কবিগণের নিকট হইতে পাইয়া থাকি। এ যেন বৈঠকখানায় (Drawing room) সজ্জিতা রাধা বাক্য বিন্যাসের সাহায্যে বিরহ দুঃখের ভাণ করিতেছেন। তাই ব্রজাঙ্গনা রাধার বিরহ-প্রকাশের করুণ কথাগুলি আমরা সশ্রদ্ধভাবে শুনিতে পারি কিন্তু চোখের জলে এই বিরহগীতিগুলিকে ধুইয়া দিবার অবকাশ পাই না। যে আত্মত্যাগে প্রেমের পরিপূর্ণতা এবং যে পরিপূর্ণ প্রেমের জন্যই চরম বিরহ পরম কাম্য হইয়া উঠে সেই আত্মত্যাগে প্রতিষ্ঠিত পরিপূর্ণ প্রেমাবেশের অভাবে ব্রজাঙ্গনার রাধা পাঠকের অকৃত্রিম অন্তরঙ্গ সহানুভূতি পায় না। কারণ গীতিকবিতার প্রধান ধর্ম্ম অকৃত্রিম সহানুভূতি (sincere sympathy) ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ (suggestive expression) হইতে এই কবিতাগুলি বঞ্চিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ বস্তুঅংশপ্রবল সুদৃঢ় কল্পনাযুক্ত মহাকাব্য লেখকের পক্ষে গীতি কবিতায় হৃদয়ের সহিত অনুভূতির অহেতুক সংযোগ রক্ষা করা সম্ভবপর হয় নাই।

তবুও তাঁহার রাধাচিত্র অসুন্দর হয় নাই। হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে ভাবের মূর্চ্ছনা সংঘটন করিতে না পারিলেও কল্পনাকে জাগাইয়া দিবার প্রেরণা ইহাতে আছে। অনুভূতির প্রবল তরঙ্গাঘাতে ভাসিয়া যাইতে না পারিলেও প্রথম বর্ষাগমের স্বল্প বর্ষণের মত ইহার রস ধারায় অভিষিক্ত হওয়া যায়। 'বসন্তে' 'প্রতিধ্বনি' 'যমুনাতটে' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় অনুভূতির নিবিড়তাও আছে, কল্পনার সাবলীল গতিও আছে। কবি Milton নাকি 'Lallegro' ও 'Ilpensoroso' নামক কবিতাদ্বয়কেই 'Paradise lost' অপেক্ষা বেশী ভালবাসিতেন। মাইকেলও 'মেঘনাদ বধ' অপেক্ষা 'ব্রজাঙ্গনা' কে বেশী পছন্দ করিতেন। অসম্ভব নয়, কারণ দুর্দ্দান্ত তেজস্বী ছেলের চেয়ে ভীতা কোমলা ছোট্ট মেয়েটিই পিতার করুণামিশ্রিত ভালবাসা লাভ করে বেশী। অবশেষে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে বিজাতীয় শিক্ষা ও ধর্ম্মভাব সম্পন্ন মহাকাব্যের লেখক যে ব্রজাঙ্গনার মত কাব্য রচনায় সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হন নাই ইহা তাঁহার অনবদ্য শিল্পচাতুর্য্য ও অপরিসীম কবিত্ব শক্তিরই পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কিন্তু মহাকাব্য রচনা সম্ভবপর হয় নাই।

শ্রীহেরম্ব চক্রবর্ত্তী

অসমাপ্ত

শ্রীকালীপদ ঘটক

হিরণ্ময়ী বাঁচলে আমার ক্ষতি ছিল না, কিন্তু তাকে রুদ্ররূপী মহাকালের হাত থেকে বাঁচাবার শক্তি আমার কোথায়! জীবনের সুধা পাত্রে স্বেচ্ছায় বিষ ঢেলে আকণ্ঠ যে পান ক'রেছে, মৃত্যুকে ফাঁকি দেবে সে কেমন ক'রে?

হিরণ্ময়ী আমার গল্পের নায়িকা। রূপে, গুণে, সৌন্দর্য্যে, সুষমায় আমি তাকে গড়ে' তুলেছিলাম কল্পলোকের এক মহিমময়ী দেবীরূপে। মুখে তার হাসি, চোখে তার মায়া, কণ্ঠে তার বিহঙ্গের কলকাকলি, অঙ্গে অঙ্গে পরিপূর্ণ যৌবনের উচ্ছল মাধুরিমা।

শিবনাথের মত দেবচরিত্র স্বামী পেয়ে হিরণ্ময়ীর নারীজন্ম সার্থক হয়েছিলো। শিবনাথের একনিষ্ঠ প্রেম অফুরন্ত ভালবাসা সব কিছু সে উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছিল হিরণ্ময়ীর পায়ে। হিরণ্ময়ীকে সে মনে প্রাণে বরণ ক'রে নিয়েছিল নিঃসঙ্গ তার জীবনপথের একমাত্র সহচরী প্রিয়তমা সঙ্গিনীরূপে।

সুখের সংসার—শান্তির নীড়, আদর্শ দাম্পত্য জীবনের নিখুঁত ছবি শিবনাথ আর হিরণ্ময়ী।

ফুটন্ত ফুল যখন অজস্র দল মেলে গাছকে আলো ক'রে ফুটে থাকে, আমরা তার শোভা দেখে মুগ্ধ হই, ভুলেও একবার ভেবে দেখিনা কাঁটার কথা, দৃষ্টিহীন মানব মনের চিরন্তন বৈশিষ্ট্যই বুঝি এইখানে।

হিরণ্ময়ীর দেহে ছিল রূপ, মুখে ছিল মধু, কিন্তু তার অন্তরে ছিল কলুষিত কামনার বিষ—ছাই ঢাকা আগুনের মত। বাইরের হাওয়া পেয়ে একদিন তা দপ করে জ্বলে উঠল, আর তারই লেলিহান শিখায় শিবনাথের সোনার সংসার অকস্মাৎ জ্বলে' পুড়ে' ছাই হ'য়ে গেল। শিবনাথের অকপট ভালবাসা, একনিষ্ঠ পত্নী প্রেম, সব কিছুকে তুচ্ছ ক'রে হিরণ্ময়ী হঠাৎ ভালবেসে ফেললে এক পরপুরুষকে।

এত বড় একটা অন্যায়কে উপেক্ষা করা চলে না, এ শুধু অন্যায় নয়—নারীর পক্ষে মহাপাপ। অন্যায়ের ক্ষমা থাকতে পারে, কিন্তু পাপের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। হিরণ্ময়ী ব্যভিচারিণী, এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত তাকে ভোগ ক'রতেই হবে।

মানুষের দুর্ব্বলতাকে যারা ক্ষমার চোখে দেখে' থাকে—হতে পারে তারা মহানুভব, কিন্তু শাস্ত্রের বিধিনিষেধ ও নীতির অনুশাসনকে অবহেলা করবার মত স্পর্দ্ধা আর যার থাকে অন্ততঃ আমার যে নাই সেটা খুব খাঁটি কথা। পাপকে পাপ বলেই জানি এবং তার ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে মনু, পরাশর, যাজ্ঞ্যবল্ক প্রমুখ আর্য্য ঋষিগণ অজ্ঞ মানব সমাজকে যথেষ্ট সচেতন ক'রে দিয়ে গেছেন। সুতরাং স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার দোহাই দিয়ে এতবড় একটা অনাচারকে তুচ্ছ বলে যদি কেউ উড়িয়ে দিতে চায়, তার সঙ্গে তর্কে কোন লাভ দেখি না।

এ ক্ষেত্রে অবশ্য তর্কের আশঙ্কা অমূলক, কারণ হিরণ্ময়ীর পাপপুণ্য বা জীবন মৃত্যুর সঙ্গে বর্ত্তমানে আমি ছাড়া আর কারো কোন সম্পর্ক নাই। হিরণ্ময়ী আমার গল্পের নায়িকা। শিবনাথের সোনার সংসারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ঐ পাপীয়সী, লালসায় অন্ধ হ'য়ে শয়তানের কাছে সে আত্মবিক্রয় ক'রেছে। আমি এর শাস্তি দিতে বাধ্য।

কেউ যদি হঠাৎ ব'লে বসেন, বাপুহে, তোমার যখন ধর্ম্মজ্ঞান এত টনটনে তখন এ ধরণের গল্প লেখা কেন? হিরণ্ময়ীকে শিবনাথের বুক থেকে ছিনিয়ে এনে একটা নেশাখোর লম্পটের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেবার কি প্রয়োজন ছিল?

উত্তরে বলা যেতে পারে,—আমি শুধু গল্পের জন্যেই গল্প

লিখতে চাই না। আমি চাই আমার লেখার মধ্যে দিয়ে শাশ্বত কল্যাণের আদর্শ প্রচার করতে, মানুষের অন্তরে শিব ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে। কিন্তু আলোর মহিমা আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি ক'রতে পারি না অন্ধকারকে একেবারে বাদ দিয়ে। সুতরাং হিরন্ময়ীকে শিবনাথের বুক থেকে ছিনিয়ে আনবার প্রয়োজন ছিল। একটা অধঃপতিতা নারীর দৃষ্টান্তে আমি চাই সমগ্র নারী সমাজকে সতর্ক ক'রে দিতে। হিরন্ময়ীর পাপের পরিণাম দেখে তারা শিউরে উঠুক।

কি শাস্তি হিরণ্ময়ীকে দেওয়া যায় ক'দিন ধরে ক্রমাগত সেই কথাই ভাবছি। অনুতাপ যথেষ্ট নয়, মার্জ্জনার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। তুষানলে দগ্ধ ক'রতে পারতাম, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ও প্রথাটা রহিত হ'য়ে গেছে। আচ্ছা, কালামুখী কলঙ্কিনীর কেশ মুণ্ডন ক'রে মাথায় খানিকটা ঘোল ঢেলে দিলে কেমন হয়? এ ব্যবস্থা হয়তো মন্দ হতো না, কিন্তু আমার গল্পের মধ্যে কৃষ্ণকান্তের মত স্বনামধন্য জমিদারের অবতারণা করা হয়নি, সুতরাং ঘোল ঢালাঢালির কল্পনাটা বাদ দেওয়াই নিরাপদ। তার চেয়ে হিরণ্ময়ীকে একেবারে সরিয়ে দেওয়াই ভাল, ওকে আর বাঁচিয়ে রাখা ঠিক নয়। 'বালবিধবা রোহিণী মরেছিল গোবিন্দলালের গুলির আঘাতে, স্বামীদ্রোহিনী হিরণ্ময়ীর অপরাধ গুরুতর, সুতরাং শাস্তিও দিতে হবে সমধিক কঠোর। কিন্তু বন্দুকের গুলির চেয়ে কঠোরতর শাস্তি আর কি হতে পারে! আত্মহত্যা! সেই ভাল, নূতন প্রণয়ীর লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য ক'রতে না পেরে হিরণ্ময়ী হয় গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়ুক, নয়ত সর্ব্বাঙ্গে কেরোসিন ঢেলে ঠেকিয়ে দি'ক জলন্ত একটা দেশলাইয়ের কাঠি, ব্যস্—একেবারে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু এবম্বিধ মৃত্যুর পর হিরণ্ময়ীর চেহারাটা কি রকম-ভাব দাঁড়াতে পারে সেটা কল্পনা ক'রতে আমার মত পাষণ্ডেরও হৃদ্‌কম্প হয়। মৃত্যুটা আর একটু সহজ ক'রে দেওয়া যায় না কি, এই যেমন আফিঙ কিম্বা আর্শেনিক?

যুক্তিটা মন্দ নয়—আফিঙ কিম্বা আর্শেনিক, চমৎকার হয়। কিন্তু আর্শেনিক সংগ্রহ ক'রতে বিশেষ একটা বেগ পেতে হয়, সুতরাং অহিফেনই প্রশস্ত। নাক চোখ বুজে' বড়জোর ভরিখানেক কোনরকমে গলার ও পাশে গলিয়ে দিতে পারলেই ছুটি। ঘণ্টাখানেক পরে প্রাণটা হয়ত আকু-পাকু ক'রে উঠবে, সর্ব্বাঙ্গে বিষের ক্রিয়া সুরু হবে, চোখ দু'টো হয়ত জড়িয়ে আসবে, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ক'রতে ক'রতে হয়ত মাটির উপর লুটিয়ে পড়তেও পারে। তার পর—তার পর আর কি হতে পারে?

তার পর যে কি হ'তে পারে আর কি যে হ'তে পারে না সেটা ঠিক আমারও জানা নেই। চোখের সামনে আফিঙ খেয়ে কোন দিন কাউকে মরতে দেখিনি, সুতরাং আফিঙ খাওয়ার পর হিরণ্ময়ীর অবস্থাটা কোন্ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত যে কোন্ পর্য্যায়ে গিয়ে দাঁড়াতে পারে তা শুধু আমি কেন আমার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষেরও অজ্ঞাত। কথাশিল্পী বলে হয়ত কিঞ্চিৎ স্পর্দ্ধা রাখলেও রাখতে পারি, কিন্তু সেই সঙ্গে যদি 'এনাটমি' আর 'ফিজিওলজিটা'ও রীতিমত আয়ত্ত থাকতো তাহলে হয়ত হিরণ্ময়ীর অপমৃত্যুর নিখুঁত ছবি এঁকে দিতে পারতাম।

গল্পটা প্রায় শেষ ক'রে ফেলেছি, খাতাখানা নিয়ে আর একবার বসতে পারলেই হয়। হিরন্ময়ীও মরে বাঁচবে, আমারও ঘাড় থেকে একটা অস্বস্তির বোঝা নেমে যাবে।

গৃহিণী কিন্তু আমার লেখার বাতিকটা কোনদিনই পছন্দ করে না। মানসিক পরিশ্রমের ফলে ওতে নাকি স্বাস্থ্য-হানি ঘটে। আমার খুব কম গল্পই এ পর্য্যন্ত গৃহিণীর মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হয়েছে। মিলনান্ত গল্প হলে তাও কতকটা রক্ষে, কিন্তু গল্প যদি বিয়োগান্ত হয়েছে তবে আর গৃহিণীকে দেখে কে! কেঁদে কেটে, বই পুঁথি ছড়িয়ে, কালি ফেলে কলম ভেঙ্গে বাড়ীশুদ্ধ মাথায় করে তুলবে। সে এক ভয়ানক কাণ্ড।

বিকেল বেলা অফিস থেকে ফিরে এসে একরাশ চা জল খাবার উদরস্থ ক'রে আরাম কেদারায় এলিয়ে পড়েছি। চাকর এসে তামাক দিয়ে গেল। গুড়গুড়িটা টানতে টানতে তন্ময় হয়ে হিরণ্ময়ীর কথাই ভাবছি, এমন সময় আমার অসমাপ্ত গল্পের খাতাখানা হাতে ক'রে গৃহিণী এসে আমার সামনে দাঁড়াল। সর্ব্বনাশ,—যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই!

দেরাজের এক কোণে খান দুই তিন ফাইল চাপা দিয়ে খাতাখানাকে যথাসাধ্য ঢেকে ঢুকে রাখবারই চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ধোপার খাতা হাতড়াতে হাতড়াতে গৃহিণীর শ্যেন দৃষ্টি যে ফাইলের স্তর ভেদ ক'রে শেষ পর্য্যন্ত আমার গল্পের খাতাখানার উপর গিয়ে পড়তে পারে—এ ধারণা কোন মতেই ক'রতে পারি নি।

খাতাখানা আমার সামনে খুলে ধরে' গৃহিণী ব'লে উঠলো,—এটা কি লেখা হচ্ছে শুনি?

সংক্ষেপে জবাব দিলাম,—গল্প।

গৃহিণীর কণ্ঠ আর একটু চড়ে' গেল, বললে,—এমন গল্প কি না লিখলেই নয়! বেচারা হিরণ্ময়ীর কি অবস্থাটাই করেছ বল দেখি! কেন তুমি শিবনাথকে বাতে পঙ্গু ক'রে ছ'মাস ধরে' বিছানায় ফেলে রেখে দিয়েছ? কেনই বা তুমি নলিনাক্ষের সঙ্গে হিরণ্ময়ীকে বাড়ী থেকে বের ক'রে দিলে? নলিনাক্ষ একটা বোম্বেটে মাতাল, হিরণ্ময়ীর এত বড় সর্ব্বনাশ ক'রবার তার কোন অধিকার নেই।

উত্তেজনার লক্ষণ গৃহিণীর মুখে চোখে ফুটে উঠতে লাগলো। বুঝিয়ে বললাম,—হিরণ্ময়ীর সর্ব্বনাশের জন্যে নলিনাক্ষকে তুমি যতখানা দায়ী মনে করছো, তার চেয়ে ঢের বেশি দায়ী হিরণ্ময়ী নিজে।

মিনতি প্রতিবাদ ক'রে বললে,—তা' কখনো হ'তে পারে না, তুমি পুরুষ তাই নলিনাক্ষের মত একটা পাষণ্ডকে ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির সাজিয়ে যতকিছু অপরাধের বোঝা অনায়াসে চাপিয়ে দিয়েছ এক নিরপরাধ অবলার ঘাড়ে।

অন্যায় অপবাদ। নারীজাতিকে আমি আজীবন শ্রদ্ধার চোখে দেখে আসছি। ক্ষুব্ধ হ'য়ে বললাম,—তুমি ভুল করছো মিনতি, আমার এ গল্পের মধ্যে হিরণ্ময়ীর অন্যায়টাকেই আমি বড় ক'রে দেখাতে চেয়েছি, নলিনাক্ষ একটা উপলক্ষ্যমাত্র। অবশ্য তারও উচিত প্রাপ্য আমি কড়ায় গণ্ডায় হিসেব করে তাকে চুকিয়ে দেব। আমি পুরুষ হলেও পুরুষের দুর্ব্বলতাকে আমি উপেক্ষা করিনি কখনো, পুরুষের অনাচারকে ক্ষমা করিনি কোনদিন। তা যদি হতো তা'হলে ব্যর্থ হতো আমার সৃষ্টি, ব্যর্থ হতো আমার সাধনা। আমার "পলাতকে"র 'ভিলেন' পাঁচু মজুমদারের কথাটা একবার ভেবে দেখ দেখি। নারীহরণ মামলায় আমি তাকে বারোটি বচ্ছর জেল খাটিয়ে ছেড়ে দিয়েছি,—রীতিমত সশ্রম কারাদণ্ড। "প্রায়শ্চিত্তে"র নায়ক ধনীপুত্র বিমলেন্দুকে মনে পড়েতো? পশ্চিমে বেড়াতে গিয়ে প্রতিবেশী এক ভদ্রলোকের কুমারী কন্যাকে গোপনে সে ভালবেসেছিল, প্রলোভনে মুগ্ধ করেছিল। তারপর সেই হতভাগিনীর সর্ব্বনাশ করে বিশ্বাসঘাতক একদিন রাতারাতি সেখান থেকে সরে' পড়ে। আমি কিন্তু তাকে দেশে ফিরতে দিইনি, পথের মাঝখানেই আকস্মিক ট্রেণ দুর্ঘটনায় ওর ভবলীলা শেষ ক'রে দিয়েছি। আমার "দোলনচাঁপা" গল্পের দশমবর্ষীয় বালক ডাংপিটে হাবলুর কথা স্মরণ কর দেখি। পাড়ার একটি সাত বছরের মেয়েকে সে ভাল বাসতো। পাঠশালা থেকে বাড়ী ফিরবার পথে একদিন সে ভালবাসার আতিশয্যে মেয়েটির গাল কামড়ে ধরে। আমি তার এই শিশু-ব্যভিচারকে পর্য্যন্ত ক্ষমা করিনি, অভিভাবকের বেতের চোটে হাবলুর সারা পিঠ লাল ক'রে দিয়েছি, ঘা শুকুতে সময় লাগে দেড় মাস। এর পরেও কি বলতে চাও আমি নারীবিদ্বেষী? আমি পুরুষজাতির ভক্ত?

কথাগুলো সত্যি, ছাপার অক্ষরে মিনতির পড়া ছিলো। আমি যে বিশেষ একটা আদর্শের পক্ষপাতী তাও সে জানতো। তথাপি আমার গল্প বা উপন্যাসের দুঃস্থ লাঞ্ছিত ও অধঃপতিত চরিত্রগুলির উপর মিনতির সহানুভূতির অন্ত ছিল না। মিনতির ধারণা আমি যেন ইচ্ছে ক'রেই তাদের উপর অবিচার ক'রে থাকি। বিশেষতঃ নারীচরিত্রের অবমাননা কিছুতেই সে সহ্য করতে পারতো না।

মিনতি একটু রেগে বললে,—হিরণ্ময়ীর যা-ই হোক, নলিনাক্ষের কিন্তু ফাঁসি হওয়া উচিত।

বললাম,—নলিনাক্ষের কথা পরে, হিরণ্ময়ীর বিচার আমি আগে শেষ করতে চাই, শাস্তি তার ভয়াবহ মৃত্যু।

মিনতি চম্‌কে উঠলো, বললে,—ওগো না—না,—এত নিষ্ঠুর তুমি হয়ো না, এ আমি কিছুতেই হ'তে দোব না।

দেখতে দেখতে মিনতির দুটি চোখ ছল্ ছল্ ক'রে

ফাল্গুন, ১৩৪৫] পল্লীবালা [শিল্পী—শ্রীইন্দু রক্ষিত]

উঠলো। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে মিনতির মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললাম,—মিনু, পৃথিবীর সব মেয়েই যদি ঠিক আমার মিনুর মত হতো!

মিনতি উঠে ব'সে বললে,—তা হলে কিন্তু ভারী মুস্কিল হতো, তোমার মত বাতিকগ্রস্ত লেখকদের গল্পের প্লট যেতো পদে পদে ভেস্তে।

খোকাকে কোলে নিয়ে ঝি এসে সামনে দাঁড়াতেই মিনতি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, বললে,—খোকার ওষুধটা মনে ক'রে নিয়ে এসো যেন, ডাক্তারকে বলো সর্দ্দিটা আজ একটু বেড়েছে।

মেয়েটা কোত্থেকে ছুটতে ছুটতে আমার কোলের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে' বললে,—আমার একটা ডলি পুতুল এনে দিয়ো বাবা, শান্তির পুতুলের সঙ্গে বিয়ে দোব।

গালে তার চুমু খেয়ে বললাম,—ডলি পুতুল না, তোকে আজ খুব ভাল দেখে দু'টো মাটির পুতুল কিনে এনে দেব,—সাবিত্রী আর সত্যবান, খুব ক'রে বিয়ে দিস এখন।

খোকার কচিকণ্ঠে প্রশ্ন হলো,—আল্ বিক্কুত?

হেসে বললাম,—আনবো; বিস্কুট, লজেঞ্চস, চকোলেট সব আনবো।

সান্ধ্য ভ্রমণের সময় উত্তীর্ণপ্রায়। তাড়াতাড়ি গল্পের খাতাখানা আলমারির ভিতর চাবি বন্ধ ক'রে চাদরটা গলায় জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

হাঁটতে হাঁটতে সহর ছেড়ে নদীর ধারে গিয়ে চুপচাপ কখন বসে পড়েছি। সন্ধ্যার ফ্যাকাসে অন্ধকার দেখতে দেখতে গাঢ় হয়ে উঠলো। এতক্ষণ বুঝতে পারিনি সেই নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে নিজেই কখন্ হারিয়ে গেছি। তিথিটা বুঝি অমাবস্থাই হবে, গা-টা ছম্‌ছম্ ক'রে উঠল। এতক্ষণ ধরে' হিরন্ময়ীর কথাই ভাবছিলাম, আজ তার অভিশপ্ত জীবনের পরিসমাপ্তি, হাঁ—আজ রাত্রেই। শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি, যেমন ক'রে হোক গল্পটা আজ শেষ ক'রে ফেলতেই হবে। মিনতির হাত থেকে খাতাখানা খুব বেঁচে গেছে, কিন্তু আর না,—আজ রাত্রেই।

ফিরবার মুখে বাজার থেকে কয়েকটি জিনিসপত্র খরিদ ক'রে নিলাম:—খুকীর পুতুল, খোকার লজেঞ্চস বিস্কুট, গৃহিণীর বরাতে লক্ষ্মীর পাঁচালী একখানা, রূপরেখা তরল আলতা একশিশি, ছোটখাটো আরও কয়েকটা জিনিসপত্র। কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ মনে পড়লো খোকার ওষুধটা আনতে ভুল হয়ে গেছে। গৃহিণী হয়ত চটে' আগুন হয়ে উঠবে, কিন্তু উপায় কি—ডাক্তারের বাড়ী ছেড়ে বহুদূর এসে পড়েছি; কাল সকাল বেলা যাহোক একটা ব্যবস্থা ক'রলেই চলবে।

মনটা কিন্তু খুঁত খুঁত ক'রতে লাগলো। আমাদের পাড়াতেই এক হাতুড়ে কবরেজের ছোটখাটো একটা ঔষধালয় ছিলো, ভাবতে ভাবতে ঢুকে পড়লাম গলির মধ্যে।

কবরেজ মশায়ের কোন্ এক পূর্ব্বপুরুষ চিকিৎসা বিদ্যায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে কোন একটা রাজসভা থেকে নাকি ধন্বন্তরী উপাধি পেয়েছিলেন। সেই থেকে বংশানুক্রমে এঁরা উপাধিটের সদ্ব্যবহার ক'রে আসছেন। পাড়ার লোকে এঁকে ধন্বন্তরী কবরেজ বলেই ডাকে।

সশরীরে গিয়ে উপস্থিত হলাম ধন্বন্তরী কবরেজের আড্ডায়। কবরেজ মশায় তখন নাকের ডগায় চশমা এঁটে জীর্ণ একখানা নূতন পঞ্জিকা পাঠ করছিলেন। লোকটার হোঁতকা চেহারা আর অসভ্য রকমের ভুঁড়ি দেখে অশ্রদ্ধায় মন ভরে' উঠে। তার উপর সামনের গোটা কয়েক দাঁত পড়ে গেছে, হাসলে মনে হয় যেন জীবন্ত একখানি ব্যঙ্গচিত্র।

আমাকে দেখেই কবরেজ মশায় লম্বাচওড়া একটা নমস্কার ক'রে বললেন,—আসুন—আসুন—আস্তাজ্ঞে হোক, তারপর হঠাৎ আজ কি মনে ক'রে?

তিন-পায়া একটা চেয়ারের উপর বসে পড়ে বললাম,—খোকার আজ তিন দিন থেকে সর্দ্দি, বেশ ভাল দেখে একটা ওষুধ দিতে পারেন,—আছে তেমন কিছু?

কবরেজ মশায় দন্তবিরল মুখখানাকে বিকৃত ক'রে খানিক হেসে উঠে বললেন,—আপনি বলেন কি মশায়! কবরেজী ক'রে মাথার চুল পাকিয়ে দিলাম, আর সর্দ্দি কাশির ওষুধ দিতে পারবো না।

কথাটা কবরেজ মিথ্যে বলেন নি, টেকো মাথার চতুস্পার্শে যে কয়েক গাছি চুল এখনো অবশিষ্ট আছে তার অধিকাংশই পাকা।

কবরেজ মশায় সগর্ব্বে বলে যেতে লাগলেন,—আমার এখানে পাওয়া যায় না কি! এই ধরুন:—বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ, অশ্বগন্ধা ঘৃত, চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, বরুণাদ্য লৌহ, চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ, হিমসাগর তৈল, নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস, কামেশ্বর মোদক, অকাল কুষ্মাণ্ড বটিকা থেকে আরম্ভ ক'রে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সম্মত যাবতীয় ঔষধ আমি নিজের হাতে তৈরি ক'রে থাকি—একেবারে বিশুদ্ধ প্রণালীতে। হেঁহেঁ মশায়, ধন্বন্তরী কবরেজকে এ অঞ্চলে না চেনে কে!

চিনবারই কথা, ধন্বন্তরীর বিরাট ভুঁড়িখানাই তাকে আর দশজনের মাঝখান থেকে অনায়াসে চিনিয়ে দেয়। আমি যদিও এ সহরে নবাগত তথাপি ঐ ভুঁড়ি দেখে ইতিপূর্ব্বেই তাকে রীতিমত চিনে ফেলেছি। আলাপ পরিচয়টাই শুধু বাকি ছিলো, কারণ চিন্তামণি মকরধ্বজ অথবা অকাল কুষ্মাণ্ড বটিকা সেবন করবার মত শাস্ত্রীয় অসুস্থতা এ পর্য্যন্ত বোধ করিনি।

বাড়ীর দিকে মন পড়েছিল, তাড়াতাড়ি বললেন,—ওষুধটা তা হলে দিয়েই দিন।

ধন্বন্তরী কবরেজের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সম্মত যাবতীয় মাল মশলা ও ঔষধ পত্রাদি একটা রঙচটা পুরাতন আলমারির মধ্যে জমা করা ছিল। তার মধ্যে থেকে গুঁড়ো একটা ওষুধের শিশি বের ক'রে কবরেজ মশায় পুরিয়া বাঁধতে লাগলেন। শিশির গায়ে মোটা হরপের লেবেল আঁটা—"পুষ্করাদি চূর্ণ",—সর্দ্দি কাশির নাকি অব্যর্থ মহৌষধ—ধন্বন্তরী কবরেজের নিজস্ব আবিষ্কার। না, লোকটার পেটে বিদ্যে আছে স্বীকার করতে হবে; পুষ্করাদি চূর্ণের প্রস্তুত প্রণালী ও গুণাগুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কবরেজ মশায় চরক সংহিতা থেকে কয়েকটা শ্লোক পর্য্যন্ত উদ্ধৃত ক'রে আমায় শুনিয়ে দিলেন।

ঔষধের দাম মিটিয়ে দিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম,—আচ্ছা কবরেজ মশায়, আপনারা সেঁকো রাখেন?

কবরেজ মশায় একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললেন,—সেঁকো!

বললাম,—হাঁ হাঁ—আর্শেনিক?

এবার বোধহয় কবরেজ মশায় একটু চটেই গেলেন, বললেন,—সেঁকো না রাখলে আমাদের চলবে কেন মশায়! রুগীর নিদানকালে যত কিছু মহাপ্রয়োগ—এই ধরুন কর্পিলেশ্বর, সুচিকাভরণ—

বাধা দিয়ে বললাম,—থাক্ থাক্ বুঝতে পেরেছি, তাহলে সেঁকো আপনারা রাখেন।

কবরেজ মশায় সগর্ব্বে জবাব দিলেন,—নিশ্চয়ই। পদার্থটি সহজ নয় মশায়; সাক্ষাৎ কালান্তক যম। একবার যদি কোন গতিকে একটুখানি পেটে পড়ে—

সাগ্রহে বলে উঠলাম,—অবধারিত মৃত্যু, না? আচ্ছা বলতে পারেন—সেঁকো খেলে কি মানুষ হাত পা ছোঁড়ে?

কবরেজ মশায় একটু বিরক্ত হয়ে বললেন,—অতশত জানি না মশায়! হাত পা ছোঁড়ে, না—গেঁজলা ভাঙ্গে, না—রক্তবমন হয়, সে-সব খবর আপনাকে দিতে পারবো না। সেঁকো খেলে মানুষ মরে, ব্যস্—এইটুকুই যথেষ্ট।

কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না হয়ে বললাম,—আফিঙ খেয়েও ত মানুষ মরে। আচ্ছা আফিঙের পরিমাণটা আনা বারোই যথেষ্ট, না,—পুরোপুরি ভরিখানেকই লাগে?

কবরেজ মহাশয়ের মুখে চোখে একটা সন্দেহের ভাব ফুটে উঠলো, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বললেন,—মশায়ের মতলবটা কি খুলে বলুন দেখি? বিষটিষ কিছু খরিদ করতে বেরিয়েছেন না-কি?

হঠাৎ বলে উঠলাম,—আজ্ঞে না, সে-সব যোগাড় হয়ে গেছে, আজ রাত্রেই ওটা প্রয়োগ করতে চাই।

কবরেজ মশায় সবিস্ময়ে বললেন,—এ্যাঁ—সেঁকো?

বললাম,—আজ্ঞে না, আফিঙ।

—সে কি মশায়, মানুষ খুন!

সহজ কণ্ঠে জবাব দিলাম,—আজ্ঞে হাঁ, তাই। অবশ্য খুন করবার ইচ্ছে আমার ছিলোনা, কিন্তু—

কবরেজ মশায় ভ্রূকুঁচকে তর্জ্জন ক'রে উঠলেন,—খবর্দ্দার ও কাযটি করবেন না মশায়, জানেন ত এটা কোম্পানির মুলুক!

বললাম,—আজ্ঞে হাঁ, খুব জানি। কিন্তু তাকে বাঁচাবার আমার উপায় নাই, মৃত্যুই তার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। সুতরাং আজ রাত্রেই—

ধন্বন্তরী কবরেজ রাগে গর্জ্জে উঠলেন,—আপনি তো

ভীষণ লোক দেখছি মশায়! কি সর্ব্বনাশ, বিষ খাইয়ে মানুষ খুন! যান যান—সরে পড়ুন এখান থেকে। আপনি বুঝি "শৈল কুটীরে" থাকেন? আচ্ছা দয়া করে আসুন তা হলে—নমস্কার।

বহুকষ্টে হাসি চেপে কোন রকমে বেরিয়ে পড়লাম। সম্ভবতঃ কবরেজের একটু মাথার গোলমালও আছে।

রাত তখন অনেক, সদর রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। চোখে আমার ঘুম নাই, গল্পটা শেষ করতে হবে। ধীরে ধীরে শয্যা ছেড়ে উঠে পড়লাম, মিনতি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু জেগে উঠতে ওর দেরি লাগে না, চাপা গলায় ডাক দিলাম,—মিনু, ঘুমলে? সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

আলমারির ভিতর থেকে গল্পের খাতাখানা বের করে এনে বেড্‌রুম লাইটের অপর্য্যাপ্ত আলোকেই সুরু করে দিলাম আমার সাহিত্য সাধনা।

আর একবার ভেবে নিলাম হিরন্ময়ীকে ক্ষমা করা চলে কিনা। মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় ভুল যদি একটা করেই থাকে,—কিন্তু এ ভুলের শাস্তি তাকে পেতে হবে, ব্যভিচারের মার্জ্জনা নাই।

ক্ষিপ্রবেগে লেখনী চালিয়ে দিলাম। এইবার হিরন্ময়ীর মৃত্যুদৃশ্য। হিরন্ময়ী মৃত্যু চায়, নলিনাক্ষের অত্যাচারে তার অসহ্য হয়ে উঠেছে। বিষের পাত্রটি হিরন্ময়ীর হাতে তুলে দিয়েছি এমন সময় মিনতি হঠাৎ ধড়মড়িয়ে জেগে উঠল। নীচে সদর দরজায় কে ডাক দিচ্ছে,—পবিত্র বাবু আছেন?

মিনতি জেগে উঠে বললে,—ওগো কোথায় গেলে?

জবাব দিলাম,—এই যে।

সুইচটা টিপে দিয়ে মিনতি বললে,—ও কপাল, তুমি ওখানে, নীচে কে ডাকছে শুনতে পাচ্ছো না! শীগগীর যাও, জামাইবাবু এসেছেন বোধ হয়।

শ্যালীপতি আসবার কথা ছিলো বটে, কিন্তু এত শীগ্‌গীর তিনি এসে পড়বেন আশা করিনি।

নীচে থেকে আবার ডাক এলো,—পবিত্র বাবু!

মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো, খাতাখানা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালাম। বিষের পাত্র হাতে নিয়ে হিরন্ময়ী এখন অপেক্ষা ক'রে থাক, আমার সপ্তপুরুষ উদ্ধার করতে অতিথি এসে সদর দোরে দাঁড়িয়ে আছেন।

মিনতি তাড়া দিয়ে বললে,—শীগ্‌গির যাওনা, জামাইবাবু এসে দাঁড়িয়ে আছেন যে!

কি কুগ্রহ, শ্যালীপতি মশায়ের কি আর একটা দিন না আসলেই চলছিল না।

চটি জুতো পায়ে দিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালাম। এমন সময় আর একটা ডাক,—বাবুজী, কেয়াড়ি খুলিয়ে।

ষ্টেশানের কুলি হবে বুঝি, বাবুর মালপত্র সব পৌছে দিতে এসেছে। জোর গলায় সাড়া দিলাম,—ঠারো, আতা হায়।

নীচে গিয়ে দরজা খুলে দেখি—কোথায় কুলি, শ্যালীপতি মহাশয়ই বা কোথায়! সামনে কয়েকজন 'বেটন'ধারী কনেষ্টবল দোর আগলে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পিছনে থানার বড় দারোগা, সঙ্গে তাঁর ধন্বন্তরী কবরেজ।

অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে গেলাম,—ব্যাপারখানা কি!

দারোগাবাবু এগিয়ে এসে বললেন,—মিঃ গাঙ্গুলী, কিছু মনে করবেন না,—আপনার বাড়ীখানা সার্চ্চ করতে চাই। আপনার against এ allegation খুব serious.

ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে উঠলো। আমার against এ কি এমন allegation থাকতে পারে যার জন্যে—

ধন্বন্তরী কবরেজ ব্যস্ত হয়ে বললে,—দারোগাবাবু, আর দেরি করবেন না—শীগ্‌গির ঢুকে পড়ুন। বিষের ক্রিয়া হয়ত এতক্ষণ সুরু হয়ে গেছে, লোকটা হয়ত ছট্‌ফট ক'রছে।

কি সর্ব্বনাশ, ইডিয়টটা বলে কি!

রহস্যটা কিছু কিছু ভেদ ক'রে ফেললাম। ধন্বন্তরী কবরেজ হয়ত থানায় গিয়ে উৎকট রকমের খবরটবর একটা কিছু দিয়ে এসেছে। ওর সঙ্গে সেঁকো আফিঙ নিয়ে আলোচনা করা ভাল হয়নি। দারোগাবাবুর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—Do you mean a murder case?

দারোগাবাবু বলে উঠলেন,—Exactly. Information পেয়েই আমরা তাড়াতাড়ি ছুটে আসছি।

আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে দারোগাবাবু সদলবলে ঢুকে পড়লেন, আমি তাঁদের আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললাম।

মিনতি ওর ভগ্নীপতির অভ্যর্থনার জন্যে নীচে তলায় বারান্দা পর্য্যন্ত নেমে এসেছিলো, সশস্ত্র পুলিস বাহিনীকে হৈ চৈ ক'রে হঠাৎ বাড়ী ঢুকতে দেখে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে আবার উপরের ঘরে উঠে গেল।

সমস্ত বাড়ীখানা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখা হলো, কিন্তু murderএর কোন চিহ্নই কারো চোখে পড়লো না। দারোগাবাবু কবরেজের উপর খাপ্পা হয়ে উঠলেন,—কিহে ধন্বন্তরী, এই বাড়ীতে নাকি মানুষ খুন হচ্ছিলো?

কবরেজ মশায় ভয়ে ভয়ে ভুঁড়ি চুলকে জবাব দিলেন, -আজ্ঞে সেই রকমই তো—

দারোগাবাবু ধমক দিয়ে বললেন,—তুমি থামো।

বাইরের ঘরে ওঁদের বসিয়ে ব্যাপারটা খুলে বললাম। বিষ প্রয়োগে যাকে আজ রাত্রে এ বাড়ীতে হত্যা করা হবে বলে' কবরেজ মশায় গিয়ে থানায় খবর দিয়ে এসেছেন সে যে আমার গল্পের এক কল্পিত চরিত্র মাত্র—একথা শুনে' দারোগাবাবু হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। পরক্ষণে তাঁর কুঞ্চিত ক্রুদ্ধ দৃষ্টি পতিত হলো ধন্বন্তরী কবরেজের উপর। অসম্পূর্ণ গল্পের খাতাখানা এনে দারোগাবাবুর সামনে ধরে' দিলাম।

কবরেজ মশায় তাড়াতাড়ি চশমা এঁটে খাতাখানার উপর চোখ বুলিয়ে বললেন,—ও,—আপনি নাটকের পালা লিখছেন বুঝি! তা 'কর্ণের দান পরীক্ষা' বা 'মহীরাবণ বধ' এই রকম একটা কিছু—

দারোগাবাবু রীতিমত তেড়ে উঠলেন,—ইউ চ্যবনপ্রাশ দি ষ্টিম রোলার বটিকা সাট আপ্।

কবরেজ মশায় থতমত খেয়ে একটু সরে' দাঁড়ালেন।

সরকারী কর্ত্তব্য সমাপনান্তে দারোগাবাবু প্রস্থানের উদ্যোগ করতেই সবিনয়ে বললাম,—প্লিজ এক মিনিট, সিগ্রেট নিয়ে আসি।

ওপরের ঘরে খাতাখানা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে সিগ্রেট কেস আর দেশলাইটা পকেটে ভরে নিলাম। দেখি মিনতি গুম্ হয়ে বিছানার এক পাশে বসে আছে। মুখে খানিকটা হাসি টেনে বললাম,—দেখেছ মিনতি, আমার সাহিত্য-খ্যাতি কি রকম ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

মিনতি রেগে আগুন হয়ে বললে,—হাসতে একটু লজ্জা করে না, কি কেলেঙ্কারিটা করলে বল দেখি!

হাসতে হাসতেই বললাম,—কেলেঙ্কারি আর হলো কৈ, এ যা হলো সে আর তোমায় কি বলবো! কল্পনার সঙ্গে এত বড় বাস্তবের সংযোগ ইতিপূর্ব্বে আর কখনো ঘটেছে কি? এর জন্যে হিরন্ময়ীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

মিনতি ঝঙ্কার দিয়ে বললে,—ঐ হিরণ্ময়ী তোমায় পাগল না ক'রে ছাড়বে না দেখছি। আচ্ছা আমিও দেখে নিচ্ছি কেমন ক'রে তুমি গল্প শেষ কর!

বাকবিতণ্ডার সময় ছিল না, রণে ভঙ্গ দিয়ে সরে পড়লাম।

বড় রাস্তার উপর দারোগা বাবুর গাড়ী অপেক্ষা করছিল। সঙ্গে সঙ্গে মোড় পর্য্যন্ত ওঁকে এগিয়ে দিতে গেলাম। যাবার সময় তিনি হো হো ক'রে আর একচোট হেসে উঠে বললেন,—What a fun Mr. Ganguly, বেশ একটা রঙ্গনাট্যের অভিনয় হয়ে গেল,—কি বলেন! আচ্ছা আসি তাহলে, good night.

সসম্ভ্রমে প্রতি নমস্কার জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করলাম

বাড়ী ফিরে দেখি আর এক বিপর্য্যয় কাণ্ড। গৃহিণী রীতিমত অসহযোগ ঘোষণা ক'রে বসে আছে। নীচের ঘরে চৌকির উপর বিছানা পেতে খোকাকে নিয়ে চুপচাপ এসে শুয়ে পড়েছে।

কাছে গিয়ে একটু নাড়া দিয়ে বললাম,—এ আবার কি ছেলেমানুষী আরম্ভ করলে! ওঠ উপরে গিয়ে শোবে চল।

মিনতি মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিলে,—আমায় আর বিরক্ত করো না, চুপচাপ একটু ঘুমুতে দাও।

অতঃপর আর কি বলা যেতে পারে। নিঃশব্দে স্থান ত্যাগ করলাম। একদিক দিয়ে অবশ্য মন্দ হলো না, গল্পটা নির্ব্বিঘ্নে শেষ করবার সুযোগ পাওয়া গেল।

উপরে গিয়ে টেবিলের উপর কলম উঁচিয়ে বসে পড়লাম। হিরণ্ময়ীর হাতে বিষের পাত্র,—হ্যাঁ,—বিষের পাত্র সে মুখের কাছে তুলে ধরেছে। কিন্তু খাতাখানা গেল কোথায়? গল্পটা আজ শেষ করা চাই-ই।

টেবিলের উপর খাতা নাই, দেরাজ আলমারি খোঁজা খুঁজি ক'রেও পাওয়া গেল না;—মিনতি হয়ত সরিয়ে ফেলেছে।

মেঝের উপর কি ওগুলো? একরাশ ছেঁড়া কাগজ এখানে ছড়িয়ে রেখেছে কে! এ্যাঁ—একি, এ যে আমারই গল্পের খাতা,—টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

ধপ্ ক'রে চেয়ারের উপর বসে পড়লাম, বুকের ভিতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠলো। উঃ কি সাংঘাতিক! এ আমি ভাবতে পারিনি।

কিন্তু এ অত্যাচার—আব্দার নয়, মিনতির এ অত্যাচার আমি সহ্য করবো না।

ক্ষিপ্রবেগে নীচে নেমে গেলাম। মিনতি দোর বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়েছে। তীব্রকণ্ঠে ডাক দিলাম,—মিনতি, দোর খোল।

সাড়া পাওয়া গেল না, উপর্য্যুপরি দরজায় ঘা দিতে লাগলাম। মিনতি ধীরে ধীরে উঠে এসে দরজা খুলে' দিলে।

ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে' পড়ে' বললাম,—আমার গল্পের খাতা কোথায়?

মিনতি জবাব দিল,—খাতা আমি ছিঁড়ে ফেলেছি।

গর্জ্জে' উঠে' বললাম,—কেন, এ অত্যাচার আমি সহ্য করবো কেন? কোন্ অধিকারে আমার মনের উপর জুলুম খাটাতে চাও তুমি? আমার স্বাধীন চিন্তাধারায় হস্তক্ষেপ করবার তুমি কে?

মিনতি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলো, ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে থেকে বললে,—ভুল ক'রেছি, ভবিষ্যতে সাবধান হ'ব।

চোখ বেয়ে তার ঝরঝর ক'রে ঝরে' পড়লো কয়েক ফোঁটা অশ্রু।

জীবনে কোনদিন তাকে শাসন করিনি, কিন্তু ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। মিনতি যে অনায়াসে আমার রচনা কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেলতে পারে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

ক্ষুব্ধ হ'য়ে বললাম,—এর চেয়ে আমার বুকের খানিকটা মাংস তুমি ছিঁড়ে নিলে না কেন, এত কষ্ট আমার হতো না।

মিনতি আমার পা দু'টো হঠাৎ জড়িয়ে ধরে' বললে,—অন্যায় করেছি, শাস্তি দাও।

মিনতির চোখে জল, দৃষ্টি তার ব্যথাকাতর। কিন্তু যে আঘাত আজ আমি পেয়েছি—

জোর ক'রে পা ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। উপরে উঠবার দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিয়ে টলতে টলতে গিয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানার উপর।

নিস্তব্ধ নিশুতি-রাত, অন্ধকারে পড়ে' পড়ে' ছট্‌ফট ক'রতে লাগলাম।

কতক্ষণ এইভাবে কেটে গেছে জানি না, দেহমন অবসন্ন হয়ে পড়েছে, চোখ বুজে' অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় নিশ্চলভাবে পড়ে' আছি। হঠাৎ কার পায়ের সাড়া, মনে হলো আমার গল্পের ছেঁড়া পাতাগুলোর উপর মড়্‌মড়্ শব্দে কে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে।

প্রবেশ পথ রুদ্ধ, নিজের হাতে দোর বন্ধ ক'রে দিয়ে এসেছি। এ তবে কিসের শব্দ! চোখ মেলে চাইতে পারছি না, সব যেন অন্ধকারে ঢাকা।

আমার মনের অন্ধকার ঠেলে সামনে এসে দাঁড়ালো এক নারীমূর্ত্তি। বিদ্যুতের মত তার রঙ, ফুলের মত তার দেহ, যৌবনের ভারে সারা অঙ্গ যেন টলমল করছে।

কে ও,—ও কে? ও যে হিরণ্ময়ী—আমারই গল্পের নায়িকা। সেই মুখ—সেই চোখ—সেই ভঙ্গিমা, আমারই কল্পনার সজীবমূর্ত্তি হিরণ্ময়ী এসে দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে।

আমি জেগে' আছি, না, ঘুমিয়ে গেছি? একি স্বপ্ন, না, আমার বিকৃত মস্তিষ্কের উদ্ভট পরিকল্পনা।

হিরণ্ময়ী আমার দিকে চেয়ে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। বিরক্ত হ'য়ে বললাম,—চলে' যাও—চলে যাও তুমি অশরীরী, কেন আমায় জ্বালাতন ক'রতে এসেছ!

আমি কি পাগল হ'য়ে গেলাম না কি? কার সঙ্গে কথা কইছি? ব্যাধিগ্রস্ত উদ্‌ভ্রান্ত আমার মনের সঙ্গে? না না—ঐ তো হিরন্ময়ী দাঁড়িয়ে; হাতে তার বিষের পাত্র, কট-মটিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে বললাম,—কি চাও,—কি চাও তুমি নারী?

হিরন্ময়ীর মুখে কথা ফুটে' উঠলো, বললে,—আমায় তুমি হত্যা করবে না?

—হত্যা? না না—মুক্ত তুমি হিরন্ময়ী, দৈব তোমায় বাঁচিয়ে দিয়েছে। তোমার সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধ নেই।

হিরন্ময়ী বিষের পাত্রটা আমার সামনে তুলে' ধরে' বললে,—এটা কি? এই দিয়ে আমায় মেরে ফেলতে চেয়েছিলে, না? কাপুরুষ!

এই বলে' হিরন্ময়ী পাত্রটা মাটীর উপর আছড়ে ভেঙ্গে ফেললে। তারপর আর একবার খিল খিল ক'রে হেসে উঠল বিদ্রূপের হাসি।

কি আশ্চর্য্য, হিরন্ময়ী আমায় ব্যঙ্গ করতে এসেছে।

বললাম,—দৈবাৎ তুমি বেঁচে গিয়েছিলে হিরন্ময়ী, কিন্তু মৃত্যুই তোমার বিধিলিপি। আমি তোমায় গলাটিপে এই খানেই শেষ ক'রে ফেলবো,—নারীসমাজের কলঙ্ক তুমি।

ক্ষিপ্রবেগে হিরণ্ময়ীর দিকে ধাওয়া করলাম। অকস্মাৎ শত শত নারীমূর্ত্তি এসে চারদিক থেকে হিরণ্ময়ীকে ঘিরে দাঁড়াল। ভয় পেয়ে বললাম,—কে—কে তোমরা?

তাদের মাঝখান থেকে হিরন্ময়ী বলে' উঠলো,—আমি।

মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই অসংখ্য নারী মূর্ত্তি হিরন্ময়ীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তাদের সমবেত ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে আমি থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলাম।

কোত্থেকে মিনতি হঠাৎ ছুটে' এসে দু'হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে' বললে,—ভয় পেয়েছ?

বুকের কাছে তাকে টেনে নিয়ে বললাম,—সরে এসো—সরে এসো মিনতি, কালনাগিনীদের বিষাক্ত নিশ্বাস লাগবে তোমার গায়ে।

হিরন্ময়ী তীব্রকণ্ঠে ডাক দিলে,—মিনতি!

মিনতি আমার বাহুবন্ধনে ছটফট করতে লাগলো, বললে, ছাড়ো—ছাড়ো—ওরা আমায় ডাকছে, আমার ঠাঁই যে ওখানে।

মিনতি গিয়ে হিরন্ময়ীর দলে মিশে গেল আর একটা হয়ে।

কি অদ্ভুত প্রহেলিকা! যে দিকে তাকাই সেই দিকেই হিরন্ময়ীর মুখ। উঃ—এতগুলো হিরন্ময়ীর ভার ধরিত্রী কেমন ক'রে বহন করছে!

হিরন্ময়ী আমায় ব্যঙ্গ ক'রে বললে—ওগো নীতিবিদ, এর মধ্যে থেকে বেছে নাও তোমার পতিপরায়ণা সতীলক্ষ্মী স্ত্রীকে।

আকুল কণ্ঠে ডাকতে লাগলাম,—মিনতি! মিনতি!

মুহূর্ত্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম সেই নারী সমুদ্রে, যেমন ক'রে হোক মিনতিকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

অকস্মাৎ তারা মিলিয়ে গেল ছায়াবাজীর মত, মিনতিকে ধরতে পারলাম না। হিরন্ময়ী ঠিক সেইভাবেই আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একা।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—এরা কোথায়?

হিরন্ময়ী জবাব দিলে,—বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে আছে। ব্যথিত হয়ে বললাম,—না না—তা হতে পারে না, ওরা মরেছে।

হিরন্ময়ী বললে,—ভুল, সৃষ্টির আদিকাল থেকে ওরা বেঁচে আছে, সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত ওরা বেঁচে থাকবে। তুমি অন্ধ তাই ওদের দেখতে পাওনা, তুমি হৃদয়হীন—তাই মানুষের হৃদয় বৃত্তিকে চিরদিন তুমি উপেক্ষাই করে এসেছো, তুমি অমানুষ—তাই মানুষের দুর্ব্বলতাকে কখনো ক্ষমা ক'রতে শেখনি।

তাই কি! এতকাল ধরে' আমি কি শুধু ভুলই ক'রে এলাম?

হিরণ্ময়ী হঠাৎ আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো,—ওগো আমায়, বাঁচাও, এই পাষণ্ডের হাত থেকে আমায় বাঁচাও।

চেয়ে দেখি,—নলিনাক্ষ। হাণ্টার দিয়ে উপর্য্যুপরি হিরণ্ময়ীকে কশাঘাত করছে নলিনাক্ষ। হিরণ্ময়ীর সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল।

উঃ, কি স্পর্দ্ধা এই লম্পটের! এ ও কি আমারই সৃষ্টি?

সরোষে গর্জ্জে উঠলাম,—সাবধান নলিনাক্ষ, হাণ্টার থামাও, নৈলে আমি তোমায় গুঁড়ো করে ফেলবো।

হিরণ্ময়ীর চোখ দিয়ে দরবিগলিত ধারে অশ্রু বয়ে যাচ্ছে। নলিনাক্ষের ভ্রূক্ষেপ নাই, তার মুখে চোখে কি যেন একটা পৈশাচিক বুভুক্ষা। হিরণ্ময়ীর মুখটাকে জোর করে সে মুখের কাছে টেনে ধরলে, উৎকট লালসায় নলিনাক্ষের ঠোঁট দু'টো মাতাল হয়ে উঠলো। হিরণ্ময়ী ধাক্কা দিয়ে নলিনাক্ষকে সরিয়ে দিতেই নলিনাক্ষ দু'হাত দিয়ে হিরণ্ময়ীর গলা টিপে ধরলে।

উঃ, এর চেয়ে যদি হিরণ্ময়ীর গায়ে যতগুলো আঘাত সে ক'রেছে, আমি গুনে তার তিন গুণো আঘাত ওকে ফিরে দোব।

বজ্রমুষ্টিতে হাণ্টার তুলে' ধরেছি এমন সময় নলিনাক্ষ ঝড়ের বেগে সেখান থেকে ছুটতে আরম্ভ করলে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পিছু পিছু ধাওয়া ক'রলাম। রাস্কেলটাকে আজ আমি শেষ করে তবে ছাড়বো।

কিছুদূর গিয়ে নলিনাক্ষ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল, আমি গিয়ে পড়েছি তার সামনে। কিন্তু কোথায় নলিনাক্ষ। সামনে আমার প্রকাণ্ড একখানা আরসি, অকস্মাৎ শূন্যে কে যেন ঝুলিয়ে দিলে।

ও কে,—আরসির মধ্যে কে ও? ও যে আমি—আরসির মধ্যে হাণ্টার হাতে করে দাঁড়িয়ে আছি আমি।

হাণ্টারের হাতল দিয়ে আরসিখানা চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে ফেললাম।

এই হাণ্টারের কশা হিরণ্ময়ীর গা-সওয়া হয়ে গেছে, নলিনাক্ষের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে হিরণ্ময়ী আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলো।

এ সব কি আমারই রচনা? হিরণ্ময়ীর উপর আমি সুবিচার করেছি কি?

আকাশ বাতাস কার যেন উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে ভারী হয়ে উঠেছে। নির্য্যাতিতা হিরণ্ময়ীর অশ্রুসজল মুখখানি কেবলই আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠতে লাগলো।

হাণ্টারটা ছুঁড়ে' ফেলে দিয়ে উন্মাদের মত ছুটে' গেলাম হিরণ্ময়ীর কাছে। হিরণ্ময়ী নাই, চারিদিক তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান ক'রলাম, হিরণ্ময়ীকে আর খুঁজে পেলাম না। ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকতে লাগলাম,—ফিরে আয়—ফিরে আয় হিরণ্ময়ী আমার অন্তরের প্রলেপ দিয়ে আমি তোর সকল ক্ষত—সকল জ্বালা জুড়িয়ে দেব।

অন্তরীক্ষে হিরণ্ময়ী সাড়া দিলে,—তুমি আমায় ডাকছো?

ব্যাগ্র হয়ে বললাম,—হাঁ-হাঁ, কাছে আয়, ধরা দে, কৈ কোথায় তুই হিরণ্ময়ী!

হিরণ্ময়ী জবাব দিলে,—আমি তোমার পাশেই আছি, খুঁজে' দেখ।

পাশে আমার কমলা, আমার পাঁচ বছরের মেয়ে কমলা,—নিশ্চিন্তে আমার কোলের কাছটিতে ঘুমিয়ে আছে।

হাত দিয়ে কমলাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিলাম। একি, এর মধ্যে যে হিরণ্ময়ীর স্পর্শ! বুক যেন জুড়িয়ে গেল। আরও নিবিড় ভাবে কমলাকে চেপে ধরলাম,—দে'—দে' মা, আমার মনের আগুন নিবিয়ে দে!

অত্যধিক উত্তেজনায় অসম্ভব ঘেমে উঠেছি। বহু কষ্টে হাত বাড়িয়ে মাথার দিকের জানালাটা খুলে দিলাম। আঃ—কি শীতল স্পর্শ! ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমায় যেন ঘুম পাড়িয়ে দিতে লাগলো। মনে হলো যেন হিরণ্ময়ী আমার শিয়রে বসে' আঁচল দিয়ে আমায় বাতাস ক'রছে।

শ্রীকালীপদ ঘটক

বনের পশু ও মনের পশু

শ্রীনীলাম্বর চট্টোপাধ্যায়

গভীর অরণ্যে—
বৃক্ষছায়ার গহীন জটিলতায়,
পুরাতন পৃথিবীর কেন্দ্রে,
প্রাগৈতিহাসিক যুগের রহস্যময় অন্ধকারে—
অশরীরি কায়া যেন সেখানে ঘুরে বেড়ায়,
বনের পশু,
রক্তের গন্ধে—ক্ষুধার্ত্ত হুঙ্কারে,
একদিন হ'য়ে উঠলো চঞ্চল !

বিংশ শতাব্দীর পৌর সভ্যতায়—
ইটের অট্টালিকা ও অভ্রভেদী অচলায়তনের তলে।
কলের ধোঁয়া ও মোটরের তেলে,
পল্লীর কোটরে কোটরে,
অসহায়ের আর্ত্তনাদে,
ধূলোয় ভরা এই বিচিত্র ধরণীর
পরিত্যক্ত প্রান্তর ও জনপদের মতো
মৌন আতঙ্কে নিভে গেল
সভ্যতার শেষ আলো !
নিঃশব্দে ঝ'রে পড়লো
শেষ গন্ধহীন একটা ফুল !

বেজে উঠলো দামামা—
দিকে দিকে রণডঙ্কা !
মনের পশু উঠলো জেগে
রক্তে নিয়ে উন্মাদনা—
পৈশাচিক কী লালসা !

হাজার হাজার মানুষ—
তালে তালে ফেললো পা,
এগিয়ে এলো নিয়ে বোমা, বারুদ আর বিষবাষ্প,
পথের ক্লান্তিতে ও অন্ধকারে
চোখে নিয়ে উগ্র দম্ভতা ও দুঃস্বপ্ন !
প্রাচীন বর্ব্বরতা ফিরে এলো

আর নিলর্জ্জ সামরিকতায় বিশ্ব হ'লো কম্পিত,
আর শিশু আর নারীর, পঙ্গু আর বৃদ্ধের,
ছিন্ন খিন্ন দেহ টুকরো টুকরো হ'য়ে গেল ছড়িয়ে

সে কী চমৎকার অভিযান !
বনের পশু যা পারতো না,
আদিম মানুষ যা পারেনি,
মানুষের সভ্য-হিংস্রতা—
লুকিয়ে থাকা মনের পশু
খসিয়ে দিয়ে সভ্যতার মুখোস—
পারলো তাই !

সুন্দরের আসন হ'লো ধ্বংস,
কৃষ্টির গৌরব দিল গুঁড়িয়ে,
শিক্ষার অহঙ্কার হলো কীর্ণ
চূর্ণ-চূর্ণ—বিদ্যায়তনের তলে !

সৃষ্টি হ'লো কলঙ্কের ইতিহাস,
কিন্তু বিচিত্র তবু যুক্তি !
মানলো না ওরা পরাজয়—
ব'ললো ঈশ্বরের অভিলাষ !

কাপুরুষতায় মৃত।
আফিংখোরের মতো আচ্ছন্ন,
ঘুমিয়ে প'ড়েছে যাদের যৌবন
মেনে নিল' তারা তাই !

আর বেজে চললো দামামা
নির্য্যাতিতের করুণ আর্ত্তনাদকে ছাপিয়ে,
আর কেঁপে উঠলো পৃথিবী
দুরু দুরু গুরু মন্ত্রে !
হে পার্থসারথি
তুমি কি শুনতে পাও
যৌবনের এ অভিশপ্ত ক্রন্দন ?

ছেঁড়া ডায়েরীর কয়েক পাতা

শ্রীপরিমলকুমার বিশ্বাস

কিছুদিন আগে বেড়াতে গিয়েছিলাম পশ্চিমের একটি ছোট সহরে। উঠেছিলাম এক ভাড়াটে বাড়ীতে। ভাড়াটে বাড়ী হলেও নেহাৎ মন্দ নয়, তবে বেশী দিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকলে যা হয়, এটার অবস্থাও সেই রকম। সামনের বাগানটা আগাছায় ভরে উঠেছে, ঘরের আশে পাশে তখনও ধুলো আবর্জ্জনা জমে রয়েছে—চারধারে কেমন একটা ছন্নছাড়া ভাব। এ ঘর ও ঘর ঘুরতে ঘুরতে পেছন দিকের বারাণ্ডার কোণে একটা ছোট ঘরে এসে ঢুকলাম। অব্যবহার্য্য বোধে এ ঘরটা তখনও সংস্কার-মুক্ত হয়নি। ঘরের মেজেয় আধ ইঞ্চিখানেক ধুলো জমেছে, দেওয়ালে কড়িকাঠে ঝুল, ওদিকের কোণে এক গাদা ছেঁড়া কাগজপত্র ধুলোয় মাখামাখি হয়ে স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। ঘরের জানালাগুলো খুলে দিতেই হাওয়া লেগে ছেঁড়া কাগজ পত্তর-গুলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো। পিন্ দিয়ে আঁটা খান কয়েক কাগজ উড়ে এসে পড়লো আমার গায়ে। কাগজগুলো ফেলে দিতে গিয়ে উল্টে পাল্টে দেখি ছেঁড়া ডায়েরীর কয়েকটা পাতা। ভারী কৌতূহল হোল। বারাণ্ডায় এসে কাগজগুলোর ধুলো ঝেড়ে গোটাটা পড়ে ফেললুম—একবার পড়ে আবার পড়লুম। ডায়েরীর আগে এবং পরে আরও কিছু ছিল কিনা জানি না। ইচ্ছে করলে হয়ত অনেক কিছুই জানতে পারতুম, কিন্তু ইচ্ছে করেই জানতে চাইনি।

আজকের সকালটা আমার বেশ ভালো লাগছে। ঘরের সব জানালাগুলো খুলে দিয়েছি। এক ফালি সোনালী রোদ আমার পায়ের ওপর এসে পড়েছে। যতখানি দৃষ্টি যায় আকাশটা স্বচ্ছ নীল। ঝিরঝিরে হাওয়া আসছে, আর তার সাথে একটা হাল্কা মিষ্টি গন্ধ। বাগানে অসংখ্য ফুল ফুটেছে। ভারী আশ্চর্য্য লাগে! একই মাটির বুকে, একই আলোর ছোঁয়াচ পেয়ে কতো রংএর ফুলই না ফুটতে পারে! আকাশ থেকে আলোর গুঁড়ো ধুলোর ওপর ছড়িয়ে পড়ে, পৃথিবীতে রংএর মেলা বসে যায়। আকাশ আর মাটির মধ্যে এই সম্পর্কটুকু সত্যিই ভারী মধুর। অনিতা, তুমি এখন কোথায় জানিনে, কিন্তু তুমি যে আজ আমার কাছে নেই—এজন্য তোমায় ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছে করছে। যদি থাকতে আমি কী করতে পারতুম? হয়ত শুধু একটি ফুল নিয়ে তোমার হাতে দিতুম। এর বেশী কিছু না। কিন্তু তুমি আজ দূরে, আমার মন তাই মুখর হোয়ে উঠেছে। কাছে থাকলে হয়ত ঠিক এমনটি হোত না। এমন করে ভাবতেও পারতুম না। তুমি যখন দূরে থাকো, আমার মন কথা কয়ে ওঠে, তোমার স্বরূপ আমি উপলব্ধি করতে পারি, তোমার দেহাতীত রূপ আমার চোখে ধরা পড়ে।

জানো অনিতা, কাল রাত্রে আমি তোমায় স্বপ্ন দেখেছি। ব্লেসেড্ ডেমোশেলের মত তোমার কান্না আমি শুনেছি। কিন্তু এতে আমার এতটা খুশী হবার কী থাকতে পারে, বুঝে উঠতে পারছি না। জানি, স্বপ্ন মিথ্যে, ওটা মনের একটা খেয়াল মাত্র। কিন্তু মিথ্যেরও একটা প্রয়োজন আছে। রামধনু মিথ্যে হতে পারে, কিন্তু তার গায়ের সাতটা রং—সেটা তো মিথ্যে নয়!

মানুষের মন যখন নিজেকে বিকাশ করতে চায়, তখনই সে একটা আশ্রয় খোঁজে। এই আশ্রয় তাকে অবলম্বন দেবে, কিন্তু তার বিকাশকে ব্যাহত করবে না। প্রেমের বৈশিষ্ট্য হোল মনকে জাগিয়ে দেওয়া, কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করা। যার কল্পনা নেই, সে কখনও ভালোবাসতে পারে না। কল্পনা আর ভালোবাসা—এরা যেন যমজ বোন, কিন্তু তাই বলে দু'টো জিনিষ এক নয়।

কী জানি কেন, ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গেই আজ মনে হয়েছিল সকালে উঠে নতুন কিছু দেখব। সত্যিই তাই, আজ আমি যা কিছু দেখছি, যা কিছু স্পর্শ করছি, সবই আমার কাছে নতুন বলে মনে হচ্ছে। সবার সাথে আজ যেন আমার নতুন করে পরিচয় হচ্ছে। এদের মাঝে যে এত বৈচিত্র, এত আনন্দ লুকিয়ে থাকতে পারে, কোনওদিন তা অনুভব করিনি। ওই যে একটা কাঠ-বিড়ালী বেড়ার ফাঁকে ছুটছে, ঘাসের ভেতর থেকে দু'একটা ফড়িং লাফিয়ে উঠছে, গাছের পাতাগুলো নড়ছে—এদের কোনওটাই আজ আমার কাছে মিথ্যে নয়। এদের প্রত্যেকের ভেতর আমি একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছি, যাকে হয়ত বলা যেতে পারে Inner Consistency. এরই ভেতর দিয়ে সুন্দরের সন্ধান করতে হবে। তোমায় ভালোবেসে আমি যদি সেই শাশ্বত সুন্দরের সন্ধান পাই, সেই তো হবে আমার প্রেমের সার্থকতা।

তোমার স্বপ্নের ছোঁয়াচ লেগে প্রভাতের এই এলোমেলো বিস্তৃতি আমার চোখে আজ অপরূপ হোয়ে উঠেছে। অনিতা, আজকের এই সুন্দর সকালটি আমি তোমার নামে উৎসর্গ করলাম।

* * * *

মানুষের মন যেন আকাশের মেঘ। ক্ষণে ক্ষণে তার রং পাল্‌টায়, ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ বদলায়। একটু আগে যে থাকে হাল্কা, উচ্ছল, খানিক পরেই সে হয়ে ওঠে গম্ভীর, মন্থর। এর জন্যে আংশিকভাবে দায়ী হয়ত প্রাকৃতিক আবেষ্টনী। অথচ প্রকৃতির কাজ সর্ব্বত্রই সমান, মানুষের মনই তার মধ্যে ভাব-বৈষম্যের সৃষ্টি করে।

নির্জ্জন দুপুরে নিজের ঘরে চুপ করে বসে আছি। হাতে কোনও কাজ নেই, থাকলেও করতুম না। মানুষ কাজ করে কর্ম্মের প্রেরণায় নয়, নিজেকে ফাঁকি দেবার জন্যে। কিন্তু ফাঁকির প্রয়োজন আমার জীবনে ফুরিয়ে গেছে। চুপ করে বসে আছি। চারদিকে একটা অখণ্ড নিস্তব্ধতা। কোথাও এতটুকু সাড়াশব্দ নেই, ব্যস্ততা নেই, চাঞ্চল্য নেই। একটা গভীর উদাস আলস্য বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে। একলা ঘরে বসে আমার মনে হচ্ছে চৈত্রের এই বিষণ্ণ মধ্যাহ্নের একটি বিশেষ রূপ আছে, এই অখণ্ড নিস্তব্ধতার একটি বিশেষ অর্থ আছে। অনিতা, কাণ পেতে শোন, শুনতে পাবে এই নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতার মাঝ থেকে কোন্ অলক্ষ্যে যেন একটা একতারার সুর রিম্‌ঝিম্ করে বাজছে।

এমন দিনে তোমার কথা ভাবতে আমার বেশ লাগে। এই অলস মধ্যাহ্নগুলি যেন তোমার কথায় ভরা। প্রত্যেকটি দুপুর যেন এক একটি রূপক—এদের মাঝে তোমার অন্তর্নিহিত রূপের আভাষ পাওয়া যায়।

খানিক আগে তোমার একটি চিঠি পড়ছিলুম। পেন্‌সিলে লেখা অনেক কালের পুরাণো চিঠি। তুমি কালি দিয়ে কখনও চিঠি লিখতে না, ঘামে ভিজে নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে। চিঠি লিখবার সময় তোমার সেই ঘর্ম্মাক্ত কপোল-খানি আমি এখনও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। পেন্‌সিলে লেখা তোমার চিঠি—ঝাপসা, ম্লান, রহস্যময়। দু' এক জায়গা মুছে গিয়ে কিছুই পড়া যায় না। সেই ফাঁকটুকু আমার কল্পনা দিয়ে আমি পূরণ করে নিই। সত্যি অনিতা, তোমার চিঠি যেন মায়াপুরী। কত রহস্য কত মায়া, কত স্বপ্ন যে সেখানে নীড় বেঁধেছে তার হিসেব নেই।

এখন তুমি কী করছ জানতে ভারী ইচ্ছে করছে। হয়ত বিছানায় শুয়ে কোনও বই পড়ছো। পড়তে পড়তে তোমার দু' চোখ ভ'রে তন্দ্রা নেমেছে। বইটা তোমার বুকের ওপর এলিয়ে পড়েছে। কিম্বা এমনও তো হ'তে পারে—তুমি ঘুমোওনি, ঠিক এই মুহূর্ত্তে আমারই লেখা কোনও বই পড়ছো। তুমি হয়ত জানো না বইটা আমারই লেখা। পড়তে পড়তে এমন এক জায়গায় এসে থামবে যেখানে আমার কথা হঠাৎ তোমার মনে পড়ে যাবে। মনে পড়ে যাবে ঠিক ওই কথাগুলোই অনেক দিন আগে আমার চিঠিতে তোমায় আমি লিখেছিলুম। আমার লেখা তুমি পড়ছো—একথা ভাবতে মনটা খুশীতে ভরে ওঠে। সত্যিই কী এমন হয় না—আমি লিখব, দূর থেকে আমার সে লেখা তুমি পড়বে। ব্যবধানের মাঝ দিয়ে আমাদের মনের সখ্যতা এম্‌নিভাবে বেড়ে চলবে?

তুমি একবার আমায় বলেছিলে, রেসম কীটের মত দিনরাত্রি কেবলই তুমি নিজের চারপাশে জাল বুনে চলেছ। এই বেলা বেরিয়ে এসো, নইলে ওই রেসমী জালের আড়াল থেকে আর বেরোতে পারবে না।

বুঝতে পারছি আজও বেরোতে পারনি। কিন্তু এতে আমার নালিশের কিছু নেই। বরং মনে হয় এ যেন ভালই হয়েছে। সব কিছুর মত জীবনটাকেও তলিয়ে দেখতে হলে একটা perspective দরকার।

তুমি হয়ত বলবে, 'এ তো জীবনকে দেখা নয়, ফাঁকি দেওয়া।' আগে বলেছি, আবার বলছি—ফাঁকির প্রয়োজন আমার জীবনে ফুরিয়ে গেছে। ভাগ্যের সঙ্গে জুয়াখেলায় আমি সবই হারিয়েছি। অনিতা, ভাগ্যিস আমার ভাগ্যের হাতে তোমায় আমি সঁপে দিই নি।

* * *

পাহাড়ের কোলে বসে সূর্য্যাস্ত দেখছি। পাহাড় বললুম, কিন্তু আসলে এটা পাহাড় নয়—বড় চাতাল বলা যেতে পারে। সামনে ছোট নদী বয়ে চলেছে। ওপাশে চাতালের গা ঘেঁসে একটি সরু রাস্তা নদীর সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর গিয়ে বাঁ দিকে সহরের দিকে বেঁকে গেছে। বাঁকের ওপারে ঝাউগাছের আড়ালে খানিকটা ঢালু জমি। সেই জমির ওপর একদল জীপ্‌সি কিছুদিন হোল তাঁবু ফেলেছে। জীপ্‌সিদের একটি ছোট মেয়ে রোজ সন্ধ্যেবেলায় এই ঘাটে জল নিতে আসে। আজও আসবে, হয়ত একটু পরে। আশ্চর্য্য এদের জীবন! কিন্তু অবাক হয়ে ভাবি এদের সঙ্গে আমার নিজের জীবনের তফাৎ কোথায়? আমিও তো ভবঘুরে।

কিন্তু এই জায়গাটি আমার বেশ লাগে। সমস্ত দিনের কোলাহলের পর দিনান্তে এই নিঝুম জায়গাটিতে এসে বসতে আমার খুব ভালো লাগে। কী জানি কেন, সামাজিক ঘনিষ্ঠতা আমার ভালো লাগে না। হয়ত এটা আমার দুর্ব্বলতা, কিন্তু অহমিকা নয়। মানুষের জীবনে এমন এক একটা মুহূর্ত্ত আসে যখন নির্জ্জনতা তার পক্ষে শুধু প্রয়োজনীয় নয়, অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে।

সূর্য্য ডুবে গেছে। জীপ্‌সি-বালিকা হয়ত জল নিয়ে ফিরে গেছে। নদীর দু'পাশে বাদুড়ের মত কালো ডানা মেলে অন্ধকার নেমে আস্‌ছে। মনের মধ্যে সূক্ষ্ম উপলব্ধির মত একটা আশ্চর্য্য বেদনা অনুভব করছি। কিন্তু এই বেদনার মূলে রয়েছে আনন্দ। আমার মনে হয়, বেদনা আর আনন্দ—এরা পরস্পরের পরিপূরক। এইটাকে বাদ দিয়ে অপরের উপলব্ধি সম্ভব নয়।

অনুভূতির রাজ্যে আমি এখন একা। না, ঠিক একা নয়। অনিতা, তুমিও আছো। তোমার এই উপস্থিতির আমি কোনও সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারি না, কিন্তু অনুভূতির ভেতর দিয়ে আমি তোমার সান্নিধ্য উপলব্ধি করি। এই নির্জ্জন অন্ধকারে বসে আমার কী মনে হচ্ছে, জানো অনিতা? যেন তোমার প্রেম বিশ্বের বৃন্তে একটি আধফোটা ফুল। হ্যাঁ আধফোটা—এ'কে ঘিরে রয়েছে অন্ধকারের রহস্য, আর কল্পনার অবকাশ। খানিক জানা, খানিক না জানা—কিছু পাওয়া, কিছু না পাওয়া—সীমা আর সীমা-হীনতার এই যে মিতালি—এইখানেই হোল তোমার প্রেমের চিরন্তনতা।

আকাশ থেকে একটি তারা খসে পড়লো, আর ঠিক এই মুহূর্ত্তেই তুমি হয়ত তোমার ঘরের জানালা গোড়ায় এসে দাঁড়ালে। দু'টোর মধ্যে কোনও কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নেই, কিন্তু তবু তুমি এসে দাঁড়ালে। জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের পানে চেয়ে মুহূর্ত্তের জন্য তুমি আত্মবিস্মৃত হলে। মুহূর্ত্তের জন্য তোমার বর্ত্তমান অতীতের কোলে আত্মসমর্পণ করলো। একটু আগে তুমি গান গাইছিলে। সেই গানের সুর বাড়তে বাড়তে অন্ধকারের স্তর বেয়ে আকাশের তারায় তারায় ছড়িয়ে পড়লো।...জানি একথা সত্যি নয়, তবু ভাবতে ভারী ভালো লাগে।

চুপ করে বসে আছি। চারপাশের অন্ধকার নিবীড় হয়ে উঠছে। আকাশের গায়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল একটা বিরাট প্রশ্ন-চিহ্নের মত দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলছে। অনিতা, বলতে পারো—সে প্রশ্নটা কী?

শ্রীপরিমলকুমার বিশ্বাস

সুশান্ত সা'

তৃতীয় পর্ব্ব

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

৬

পরের দিন বেলা ১১টায় বিচার সুরু হল। তুষারের বাপের বাড়ীর পাড়ার ৩।৪টী সাক্ষী পর পর এসে বলে গেল যে দাদার আর্ত্তনাদ শুনে তারা ছুটে ঘটনাস্থলে গিয়ে তুষারের বাপের বাড়ীর বাইরের রোয়াকে রক্তাক্ত অবস্থায় দাদার দেহ পড়ে থাকতে দেখেছিল এবং তাদের মধ্যে একজন, সম্পর্কে তুষারের খুড়তুতো ভাই, নাম জলধর, আলীমিঞাকে সেনাক্ত করে বলে গেল যে আলীমিঞা ছুটে পালিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ তার সম্মুখীন হওয়াতে পরিষ্কার চিনতে তার কোনও বাধা হয়নি কেন না ২।১ বার আগে তুষারকে বাপের বাড়ীতে আনবার জন্য সে মাধবপুরে গেলে আলীমিঞার সঙ্গে সেখানে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল।

আলীমিঞা চুপি চুপি আমাকে বললেন, "কি মিথ্যা কথা! এ লোকটির সঙ্গে কখনও আমার পরিচয় হয়নি বা সেদিন রাত্রে আমি ছুটেও পালাইনি। ঘটনাটাকে এরা একেবারে নতুন রকম করে তৈরী করেছে।"

যাইহোক এদের এবং এর পরে ডাক্তার পুলিশ দারোগা প্রভৃতির সাক্ষী—জেরা ইত্যাদি শেষ হতেই বেলা প্রায় ৪টা বাজল এবং সেদিনের মত কাজও শেষ করে জজ্‌সাহেব উঠে গেলেন।

জজ্‌সাহেব উঠে যাওয়ার আগে সরকারী উকিলকে ডেকে বললেন, "আপনার সাক্ষী প্রমাণ ত আর কিছু নেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু আপনার মোকদ্দমাটি বর্ত্তমানে যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, তাতে সুশান্তর বিরুদ্ধে আইন অনুসারে কোনও প্রমাণই নাই। সুশান্ত যে খুনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এ বিষয় ত একমাত্র approver গোলাপ মণ্ডলই বলেছে, কিন্তু তার পোষকতায় প্রমাণ কোথায়? অন্য সকলের বিরুদ্ধে প্রমাণ অবশ্য আছে, বিশ্বাস করা না করা সে পরে বিবেচনার কথা। কিন্তু আইন অনুসারে সুশান্তকে শাস্তি দেওয়া চলে না তাকে মুক্তি দিতে আমরা বাধ্য—সেটা বিবেচনা করে দেখেছেন কি?"

সরকারী উকীল বললেন, "আপনার কথার তাৎপর্য্য আমি বুঝতে পারছি। সুশান্তর বিরুদ্ধে গোলাপ মণ্ডলের কথার পোষকতায় আমার সাক্ষী ছিল—নবীন মুন্সী। কিন্তু সে ত এখানে--"

জজসাহেব বললেন, "সে ত এখানে সুশান্তকে সেনাক্ত করে না। ঘাটের পারে ষড়যন্ত্রে সুশান্ত ছিল কি না সে ত ঠিক চিনতে পারেনি বলে গেল।"

সরকারী উকীল 'হ্যাঁ' বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

জজসাহেব একটু বিবেচনা করে বললেন, "সাবিত্রীকে আপনি সাক্ষী হিসাবে ডাকছেন না কেন? গোলাপ মণ্ডলের কথা যদি সত্য হয়ত ঘাটের পারে সে ত টাকা দিতে দেখেছে। সে কথা ত সে প্রমাণ করতে পারে।"

সরকারী উকীল বললেন, "তাকে ডাকতে আমি ভরসা করি না। আসামী সুশান্তর দলের লোক সে এবং আমাদের কথা অনুসারে সুশান্তর সঙ্গে সাবিত্রীর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সে সত্য কথা বলবে বলে আমাদের বিশ্বাস হয় না।"

জজসাহেব আবার চুপ করে কি যেন বিবেচনা করতে লাগলেন। পরে বললেন, "সাবিত্রীকে এখানে সাক্ষী হিসাবে একবার ডাকার অন্যদিক দিয়েও প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয়। তাকে একবার আমাদের দেখা দরকার। সে আছে এখানে?"

সরকারী উকীল বললেন, "হ্যাঁ। আমি অন্য অন্য সাক্ষীর সঙ্গে তাকেও খুলনায় আনিয়ে রেখেছি।"

জজসাহেব বললেন, "বেশ, আমি তাকে কোর্টের সাক্ষী (court witness) হিসাবে ডাকব—সরকার পক্ষের সাক্ষী হিসাবে নয়। তাহলে আপনিও তাকে প্রয়োজন হলে জেরা করতে পারবেন, অপর পক্ষও জেরা করতে পারবে। কাল ঠিক ১১টার সময় সে যেন আদালতে হাজির থাকে।"

এই বলে জজসাহেব উঠে চলে গেলেন।

হরিশ আমার কাছে এগিয়ে এসে বললে, "আবার এক মুস্কিল হল দেখছি।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "এর মানে কি হরিশ? সাবিত্রীকে আবার সাক্ষী ডাকা হচ্ছে কেন?"

হরিশ বলল, "আমার মনে হয় জজসাহেবের মনোভাব তোমার প্রতি ভাল নয়। তাঁর বোধহয় বিশ্বাস তুমি আসলে দোষী। অথচ সাক্ষী প্রমাণের বর্ত্তমান অবস্থায় তোমাকে শাস্তি দেওয়া ঠিক হবে না। তাই একবার সাবিত্রীকে ডেকে শেষ চেষ্টা করে দেখবেন। তা ছাড়া আরও বোধহয় একটা কারণ আছে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি? কি?"

হরিশ বলল, "সাবিত্রীকে বোধহয় একবার দেখতেও চান জজসাহেব। অপর পক্ষের কথা ত জান? সাবিত্রীকে নিয়েই যত গোলমাল। তারই জন্য তুষার শেষ পর্য্যন্ত বাপের বাড়ী চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তাই তাকে দেখলে এসব কথার সত্যাসত্য সম্বন্ধে কতকটা সঠিক ধারণা করতে পারবেন বলে জজসাহেবের বিশ্বাস।"

ভীত হয়ে বললাম, "এখন কি হবে হরিশ?"

হরিশ বললে, "দেখা যাক। আজ রাত্রে একবার প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখি, সাবিত্রীকে কোনও রকমে একটা খবর পাঠাতে পারি কি না, সে যদি এসে বলে 'আমার কিছু মনে নাই'—তা হলেই ব্যাপারটা যায় চুকে।"

তারপর নিজের মনেই যেন বললে "তবে আজ রাত্রে সাবিত্রীকে ওরা বিশেষ কড়া পাহারায় রাখবে, আমাদের কাউকে সহজে ঘেঁসতে দেবে না। যাক—জেরা ত আছেই।"

এই বলে হরিশ চলে গেল। হায়রে! শেষ পর্য্যন্ত আমার জীবন মরণ নির্ভর করছে—সাবিত্রীর কথার উপর।

* * *

পরের দিন বেলা ১১টা আন্দাজ সাবিত্রী এসে নত মস্তকে দাঁড়াল সকলের চোক্ষের সম্মুখে স্তব্ধ আদালত গৃহে,—আমারই বিরুদ্ধে খুনের অপরাধ প্রমাণ করবার জন্য তাকেই হল প্রয়োজন। অদৃষ্টের এই সকরুণ পরিহাসে স্তম্ভিত হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম তারই পানে—কোনও দ্বিধা করিনি।

ইতিমধ্যে হরিশকে ডেকে চুপি চুপি প্রশ্ন করেছিলাম—সাবিত্রীকে কোনও রকম খবর পাঠানর সুবিধা হয়েছিল কিনা। হরিশ বলেছিল যে সে একেবারেই কৃতকার্য্য হয়নি। কোনও রকম কথাবার্ত্তা বলা ত দূরের কথা, সাবিত্রীর সঙ্গে চোখোচোখী হওয়ার পর্য্যন্ত সুযোগ দেয়নি সরকার পক্ষ—এত কড়া পাহারায় তাকে রেখেছিল, আগের দিন রাত্রে।

সাবিত্রীর সাক্ষ্য এ ক্ষেত্রে আইন অনুসারে নেওয়া চলে কিনা এই নিয়ে আমাদের ব্যারিষ্টারের সঙ্গে সামান্য কিছু আলোচনার পর সাবিত্রীকে প্রশ্ন করতে সুরু করলেন জজসাহেব স্বয়ং। প্রথমেই বেশ কড়া সুরে সাবিত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে সে সত্য কথা বলবার হলপ নিয়েছে আদালতে—মিথ্যা যেন সে না বলে, কোনও কথা যেন গোপন না করে।

তারপর প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তরে সাবিত্রী সহজ ভাবেই বলে গেল যে সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঘাটের পারে সে উপস্থিত ছিল যখন আলীমিঞা ২।৩টী লোক নিয়ে ঘাটের পারে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে।—

জজসাহেব তখন সাবিত্রীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "এইবার বলুন ত—ঠিক সত্য কথা বলবেন, সেদিন ঘাটের পারে কিছু টাকাকড়ি দেওয়া নেওয়া হয়েছিল?"

সাবিত্রী একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সবাই চেয়ে রইল একদৃষ্টে সাবিত্রীর মুখের পানে। সাবিত্রী যে আদালতে কিছুতেই মিথ্যাকথা বলবে না—এ ধারণা ত আমার ছিল; কিন্তু তবুও কেন জানি না, সাবিত্রীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা দেখে, প্রাণে যেন হঠাৎ একটু আশার উদ্রেক হল—হয়ত এইবার সাবিত্রী মিথ্যা দিয়ে সত্যটুকু দেবে চাপা, বুদ্ধিমতী সে, বুঝতে কি

পারেনি যে এই প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে আমার জীবন মরণের প্রশ্ন নিবিড় ভাবে জড়িত ?

বুঝতে পেরেছিল কিনা জানিনা, কিন্তু উত্তর দিল।

উত্তর দিল "হ্যাঁ।"

প্রশ্ন হল "কে কাকে টাকা দিয়েছিল ?"

উত্তর "আলীমিঞার সঙ্গে যে লোকগুলি এসেছিল, টাকাটা তাদের দেওয়া হয়েছিল।

প্রশ্ন "কে দিয়েছিল ?"

সহজভাবেই উত্তর দিল ক মনে নাই, তবে বোধহয় আলীমিঞা।

একটু জোরের সঙ্গে প্রশ্ন "ঠিক মনে করে দেখুন টাকাটা সুশান্ত দেয়নি কি ?"

সাবিত্রী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আবার প্রশ্ন হল "বলুন ?"

উত্তর "ঠিক মনে নাই।"

জজসাহেব গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ কি সব কাগজপত্র দেখতে লাগলেন। তারপর মুখ তুলে আবার প্রশ্ন করলেন "টাকাটা দেওয়ার সময় কোনও কথাবার্ত্তা হয়েছিল ?"

উত্তর "হয়েছিল।"

বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সাবিত্রী ত একটাও মিথ্যা কথা বলেনি, কাজেই সত্য কথাই বলবে—আমি ত কোনও কথা বলিনি সে সময়।

প্রশ্ন "কে কথা বলেছিল ?"

একটু ভেবে উত্তর 'তা'ত মনে নাই।"

প্রশ্ন "কি কথাবার্ত্তা হয়েছিল, তা ত মনে আছে ?"

আবার একটু ভেবে উত্তর "তাও আমার মনে নাই।"

জজসাহেব মুখ নীচু করে কাগজপত্র দেখতে দেখতে আবার কি ভাবতে লাগলেন। তারপর মুখ তুলে সরকারী উকিলের দিয়ে চেয়ে বললেন "আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করার নাই। এবার আপনার কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকে ত করুন।"

সরকারী উকীল উঠে দাঁড়িয়ে সাবিত্রীকে জেরা করতে সুরু করলেন।

প্রশ্ন—"টাকাটা কেন দেওয়া হল কিছু বুঝতে পেরেছিলেন কি ?"

সাবিত্রী মুখ তুলে সরকারী উকীলের দিকে চেয়ে রইল—কোনও উত্তর দিল না।

বিদ্রুপাত্মক সুরে প্রশ্ন—"কথাবার্ত্তা ত কিছুই মনে নাই, টাকাটা কেন দেওয়া হল কিছু বুঝতে পেরেছিলেন কি ?"

উত্তর—"না।"

প্রশ্ন—"কৌতুহল হয়নি ? রাত্রে চুপি চুপি কতগুলো লোককে টাকা দেওয়া হচ্ছে—কেন, কি ব্যাপার, জানবার কৌতুহল হয়নি ?"

উত্তর—"হয়েছিল, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি।"

প্রশ্ন—"বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন ?"

উত্তর—"না"।

প্রশ্ন—'আপনি কাউকে কোনও কথা এ নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন নি ?"

উত্তর—"না।"

প্রশ্ন—"কেন ? কৌতূহল হল অথচ বোঝবার চেষ্টা করলেন না—কেন ?

উত্তর—"কি চেষ্টা করব ?"

প্রশ্ন—"এই ধরুন কেন টাকাটা দেওয়া হল সুশান্তকে জিজ্ঞাসা ত করতে পারতেন ?"

সাবিত্রী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কোনও উত্তর দিল না।

জোরের সঙ্গে প্রশ্ন—"উত্তর দিন আমার কথার ? কেন টাকাটা দেওয়া হল, সুশান্তকে জিজ্ঞাসা করেন নি কেন ?"

উত্তর—"আমি কেন জিজ্ঞাসা করব ? বলবার হলে উনি নিজেই বলতেন।"

প্রশ্ন—"তাহলে এমন ব্যাপার যা আপনার কাছেও উনি গোপন করেছেন কেমন ?'

সাবিত্রী নীরব।

ধমকের সুরে প্রশ্ন—"চুপ করে আছেন কেন ? উত্তর দিন

জজসাহেব তখন কথা কইলেন।

সরকারী উকীলকে উদ্দেশ্য করে বললেন "তা এ প্রশ্নের উত্তর সাক্ষী কি করে দেবে ? আর আমার মনে হয় এ সব নিয়ে আপনি বৃথাই জেরা করছেন। সাক্ষী

যতটুকু যা জানে সত্যকথা বলেছে বলেই আমার বিশ্বাস। পুলিশের কাছে জমানবন্দির সঙ্গে এখানে তার কোনও কথার বিশেষ কোনও অনৈক্য নেই এবং সাক্ষী যে কোনও কথা ইচ্ছে করে গোপন করেছে—সাক্ষীকে দেখে এবং তার কথা শুনে আমার তা একেবারেই মনে হয় না।"

সরকারী উকীল বিনীত ভাবে বললেন, "আমার কথা হচ্ছে, সেদিন ঘাটের পারে কি সব কথাবার্ত্তা হয়েছিল সাক্ষীর সবই মনে আছে; ইচ্ছে করে গোপন করছে সুশান্তকে বাঁচাবার জন্য।"

জজসাহেব একটু মৃদু হেঁসে বললেন, "ইচ্ছে হয় আপনি সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কিন্তু তাতে করে আপনার মোকদ্দমার সুবিধা হবে কি? সাক্ষী সব ব্যাপারই জানে—এই যদি আপনার কথা হয়, তা হলে ত আইন অনুসারে সাক্ষীর কথার মূল্য অনেকটা যায় কমে, কেননা তাহলে ত সাক্ষী যাকে বলে accomplice আইনের চক্ষে তাই হয়ে দাঁড়ায়।"

আমাদের ব্যারিষ্টার খিল খিল করে হেসে উঠলেন। এবং সরকারী উকীল একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে "বেশ, আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাইনা" বলে বসে পড়লেন।

আমাদের ব্যারিষ্টার উঠে দাঁড়ালেন সাবিত্রীকে জেরা করবার জন্য।

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন "আপনার কথার দায়িত্ব কতখানি আপনি কি তা বুঝতে পেরেছেন?"

সাবিত্রী একবার মাত্র চোখ তুলে ব্যারিষ্টারের মুখের দিকে চেয়েই চোখ নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আবার প্রশ্ন "সুশান্তর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তাত আপনি জানেন?"

ধীরগলায় উত্তর "জানি।"

প্রশ্ন—"গুরুতর অভিযোগ ফাঁসি হতে পারে; জানেন ত?"

একটু চুপ করে থেকে শান্ত গলায় উত্তর—"জানি"।

প্রশ্ন—"সুশান্তর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হয়নি বলেই, প্রমাণ করবার জন্য আপনাকে ডাকা হয়েছে; এখন একমাত্র আপনার কথার উপরেই সুশান্তর জীবন মরণ নির্ভর করছে—এটা আপনি জানেন কি?"

সাবিত্রী মাথা নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কোনও উত্তর দিল না।

প্রশ্ন—"এইবার ত বুঝতে পারছেন আপনার কথার দায়িত্ব কতখানি?"

সাবিত্রী নীরব।

মধুর গলায় প্রশ্ন—"উত্তর দিন আমার কথার। বুঝতে পেরেছেন ত?

ভারী গলায় উত্তর—"বুঝতে পেরেছি।"

প্রশ্ন—"এখন একটা সোজা উত্তর দিন ত, এইযে ঘাটের পারে টাকা দেওয়াটার কথা বললেন, এটা পুলিশ আপনাকে ভয় দেখিয়ে বলিয়েছে—কেমন?"

সাবিত্রী স্তব্ধ হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কোনও উত্তর দিল না।

আবার প্রশ্ন—"পুলিশ এ মকোদ্দমায় আপনাকেও গ্রেপ্তার করবার ভয় দেখিয়ে, সুশান্তর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ প্রমাণ করবার জন্যই ঐ কথাটুকু আপনাকে দিয়ে বলিয়েছে—না?"

সাবিত্রী নীরব।

আবার প্রশ্ন—"আসলে কথাটা বানান, মিথ্যা—না? সুশান্ত ঘাটের পারে কোনও টাকাকড়ি দেওয়া নেওয়ার মধ্যে ছিল না—কেমন?"

সাবিত্রী প্রস্তর মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কোনও উত্তর দিল না। আমাদের ব্যারিষ্টার একটু ঝুঁকে সাবিত্রীর দিকে এক দৃষ্টে রইলেন চেয়ে উত্তরের আশায়। প্রতীক্ষার উত্তেজনায় আমার বুকের মধ্যে দ্রুতস্পন্দনে যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

আবার প্রশ্ন—"এখানে আপনার কোনও ভয় নেই। উত্তর দিন আমার কথার। সুশান্তর বিরুদ্ধে ঐ কথাটুকু মিথ্যা—না?"

ব্যাকুলভাবে উত্তর—"আমি কি বলব?"

জজ সাহেব তখন কথা কইলেন।

বললেন—"আপনি সত্য যা তাই বলবেন। আপনি সত্যকথা বলার শপথ নিয়েছেন এখানে—ভগবান সাক্ষী।"

কাতরভাবে উত্তর, "আমি ত মিথ্যা কথা বলিনি।"

হায়রে! জীবনের এই দারুণ মুহূর্ত্তে, আমারই প্রাণের বিনিময়ে একটী মাত্র মিথ্যা কথা—তাও সাবিত্রী আমাকে ভিক্ষা দিল না।

আমাদের ব্যারিষ্টার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাবিত্রীর পানে তাকিয়ে রুক্ষভাবে প্রশ্ন করলেন "মিথ্যা কথা জীবনে বলেন না বুঝি কখনও?"

সাবিত্রী নীরব।

ধমকের সুরে প্রশ্ন 'উত্তর দিন আমার কথার। জীবনে কখনও মিথ্যাকথা বলেছেন?"

অস্ফুট স্বরে উত্তর—'হয়ত বলেছি—মনে নাই।"

প্রশ্ন—"আপনার শ্বশুর বাড়ী ত গাবহাটী গ্রামে?"

অস্ফুট স্বরে উত্তর "হ্যাঁ"।

জোরের সঙ্গে প্রশ্ন—'সেখান থেকে বিতাড়িত হয়েছেন?"

সাবিত্রী নীরব।

আবার প্রশ্ন—"আপনার চরিত্রের জন্য সেখান থেকে তারা তাড়িয়ে দিয়েছে আপনাকে—কেমন?"

সাবিত্রী নীরব।

কিন্তু এ সব কি হচ্ছে! হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে কেমন কেঁপে উঠল। বুঝতে আমার দেরী হল না যে আমাদের ব্যারিষ্টার এইবার দশ জনার চক্ষের সম্মুখে সাবিত্রীকে নিদারুণ ঘৃণ্য চরিত্রে কলুষিত করে প্রতিপন্ন করতে চান যে সাবিত্রীর মত জঘন্য স্ত্রীলোকের পক্ষে নিজেকে বাঁচাবার জন্য মিথ্যাকথা দিয়ে আমার সর্ব্বনাশ করা কিছুই অস্বাভাবিক নয়। কেননা, বোঝাতে চান, একটা পাতান ভাই বোন সম্পর্ক ছাড়া আমার সঙ্গে সাবিত্রীর সত্যিকারের প্রাণের বন্ধন ত কিছুই ছিল না।

ধমকের সঙ্গে প্রশ্ন "বলুন, চুপ করে আছেন কেন? চরিত্রের দিক দিয়ে ভদ্রপরিবারে বাসের অনুপযুক্ত বলেই আপনার শ্বশুর বাড়ীর লোক আপনাকে দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে—না?"

সাবিত্রী এবার চোখ তুলে চাইল! সেই দুটো চোখ-জলে ভরা। আকুলভাবে তাকাল সোজা আমারই পানে—এই বিপদে যদি আমার মধ্যে কোনও কূল পায়!

কি তার অপরাধ? সত্য কথা বলেছে? হঠাৎ আমার কি হল জানি না—হরিশকে ডেকে পাঠালাম

বললাম "হরিশ! সাবিত্রীকে জেরা তোমরা বন্ধ করে দাও—সাবিত্রীকে জেরা করার প্রয়োজন নাই।"

হরিশ বলল "সে কি কথা? তুমি কি পাগল হলে নাকি?'

বললাম "না। সাবিত্রীকে অযথা অপমানে অপদস্থ করে আমি আমার মুক্তি চাই না। যদি তোমরা জেরা বন্ধ না কর—আমি জজ সাহেবের কাছে বলব যে সাবিত্রীর কথা সমস্ত সত্য।"

হরিশ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আর কোনও কথা না বলে গেল চলে। দুজনে একটু পরামর্শ করার পর ব্যারিষ্টার সাবিত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন "শুনুন আমি আপনাকে বলতে চাই, এই ঘাটের পারে টাকা দেওয়ার কথাটা মিথ্যা—পুলিশের ভয়ে আপনি বলতে বাধ্য হয়েছেন।"

এই বলে আর কোনও জেরা না করে বসে পড়লেন।

সোজা চেয়েছিলাম সাবিত্রীরই পানে। সাবিত্রীও চেয়েছিল সোজা আমারই মুখের দিকে—অপলক নেত্রে।

জজ সাহেব সাবিত্রীকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলেন, কিন্তু সাবিত্রী নড়ল না—স্তব্ধভাবে চেয়েই রইল, আমারই পানে। হঠাৎ এ কি হল? তার চোখের চাহনি কেমন যেন অস্বাভাবিক বলে মনে হল আমার, এবং পরমুহূর্ত্তেই সাবিত্রী সশব্দে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল—সাক্ষীমঞ্চের তলায়—মেজের উপরে!

* * * *

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

সুভাষচন্দ্রের জয়লাভ—

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় আমরা তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। এবারকার নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বমূলক হওয়ায়, সুভাষচন্দ্রের জয়লাভে এই কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সমগ্র ভারতের রাজনীতিক মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তিদের যাঁহারা প্রতিনিধি তাঁহাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোকের মতে সুভাষচন্দ্র বর্ত্তমান অবস্থায় দেশকে পরিচালিত করিবার পক্ষে যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। ইহা বাংলার পক্ষে গৌরবের কথা। মোট প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৩,৩২৯ জন, ইহার মধ্যে কোন না কোন পক্ষে যাঁহারা ভোট দিয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা ছিল ২৯৫১, ইহার মধ্যে সুভাষবাবুর পক্ষে বাংলার ভোটদাতা প্রতিনিধিরা সংখ্যায় ৪০৪ জন ছিলেন। বাংলার বাহিরেও সুভাষচন্দ্র বহু জনের সমর্থন পাইয়াছেন। সর্দ্দার বল্লভভাই প্রমুখ মহাত্মাজীর প্রভাবপুষ্ট ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ যদি সুভাষচন্দ্রের অন্যায় বিরুদ্ধতা না করিতেন তাহা হইলে তাঁহার আরও বেশী ভোট পাইবার সম্ভাবনা ছিল। জনসাধারণের মনোভাবের কথা বিবেচনা করিলে একথা প্রায় নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, ভোট গ্রহণ যদি প্রতিনিধিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সমস্ত দেশের মধ্যে প্রসারিত হইত তাহা হইলে সুভাষচন্দ্রের সমর্থকদিগের সংখ্যা আরও অনেক বেশী দেখা যাইত। সুভাষচন্দ্রের উপর দেশবাসী যে বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়াছেন গণসংগ্রামকে অধিকতর সংহত ও শক্তিশালী করিয়া; স্বাধীনতাকে নিকটবর্ত্তী করিয়া এবং কংগ্রেসের শক্তি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া তিনি তাহার উপযুক্ততার প্রমাণ দিতে পারিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি।

সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচনের আর একটা দিক

নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে সুভাষচন্দ্রের জয়লাভে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থীদের বর্দ্ধিত শক্তির সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস অহিংস গণসংগ্রামের পথে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জনকে লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং কংগ্রেস বর্ত্তমানে যে শক্তির অধিকারী হইয়াছে তাহারও মূলে রহিয়াছে অসহযোগ আন্দোলন ও দুই পর্য্যায়ের আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ের গণসংগ্রাম। সংগ্রামের মধ্য দিয়া কংগ্রেসের যে শক্তিলাভ হইয়াছে তাহাতে কংগ্রেসের মর্য্যাদা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কংগ্রেসের এই বর্দ্ধিত মর্য্যাদা এমন অনেক লোককে কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে যাঁহারা সংগ্রামের পক্ষপাতী নহেন এবং সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতও নহেন। কংগ্রেসের বর্ত্তমান কার্য্যাবলী যাহাতে নিয়মতান্ত্রিকতার খাদে প্রবাহিত হয় ইঁহারা স্বভাবতঃই সেজন্য চেষ্টা করিতেছেন। পূর্ব্বে যাঁহারা সংগ্রামের নেতা এমন অনেকেও মুখে স্বীকার না করিলেও কার্য্যতঃ নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। অপর অনেকে এখনও পূর্ব্বের ন্যায় বিশ্বাস করেন যে গণ-সংগ্রামই একমাত্র পথ এবং এইজন্য গণশক্তিকে সংঘবদ্ধ করা এবং সংগ্রামশীল করিয়া তোলাই সকল কংগ্রেসী সদস্যেরই প্রধান কর্ত্তব্য। শেষোক্ত দল আরও মনে করিতেছিলেন যে, ফেডারেশনকে বাধাদান করিবার জন্য এখনই কংগ্রেসের কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সময় আসিয়াছে। সুভাষবাবু এই দলেরই নেতা ও প্রতিনিধি। ফেডারেশনকে বাধাদানের প্রশ্নের উপর দাঁড়াইয়াই সুভাষচন্দ্র নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কাজেই, সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্ব্বাচনে

এই কথা নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য ফেডারেশনকে বাধা দিবার জন্য সংগ্রাম-মূলক পন্থার পক্ষপাতী এবং যাঁহারা নিয়মতান্ত্রিকতার পথে যাইতে চাহিতেছেন তাঁহাদের পশ্চাতে দেশের সমর্থন নাই।

সুভাষচন্দ্রের জয়লাভে যাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়াছেন তাঁহাদের মনে রাখা দরকার যে কংগ্রেস গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। ইহার নীতি ও কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ জ্ঞাতসারে ও মতানুসারে হওয়াই বিধেয়। বিশেষ কোন লোককে সভাপতি নির্ব্বাচন করা তাঁহার বিশেষ কর্ম্মপন্থার অনুমোদন করা। সুভাষচন্দ্র দেশবাসীকে এই সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

বাঙ্গালীরা অন্যান্য প্রদেশে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো লইয়া গিয়াছেন

বাঙ্গালীরা প্রধানতঃ বিদ্বজ্জনোচিত ব্যবসা ও চাকুরি উপলক্ষ্যেই বিভিন্ন প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ইঁহাদের অনেকে নিজ নিজ কর্ম্মভূমির স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া গিয়াছিলেন। এই সব প্রবাসী বাঙ্গালীরা নিজ নিজ প্রবাসভূমির উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন এবং ভারতের অনেক প্রদেশের অগ্রগতির জন্য প্রবাসী বাঙ্গালীদের নিকট বহু ঋণ রহিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীরা এই প্রকারে স্বভাবতঃ যে পদমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাহা নানাস্থানে স্থানীয় অধিবাসীদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করিয়াছে এবং বিহার আসাম প্রভৃতি প্রদেশে ইহা নিতান্ত কুৎসিত আকার ধারণ করিয়াছে। এই ঈর্ষ্যার ফলে ঐতিহাসিক তথ্য হইলেও বাঙ্গালীদের দানের কথা অন্যান্য প্রদেশবাসীরা ভুলিতে চাহিতেছেন এবং এ বিষয়ে বাঙ্গালীদের দাবীকে তাঁহারা প্রাদেশিকতা দোষ দুষ্ট মনে করিতেছেন। অবাঙ্গালী প্রধান ব্যক্তিদের এ সম্পর্কিত সত্য ও ন্যায়ানুমোদিত উক্তি বাংলার বাহিরে বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে বর্দ্ধমান ভুল ধারণার অপসারণে বিশেষ সহায়তা করিবে।

সার তেজ বাহাদুর সাপ্রু নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠাশালী প্রধান ব্যক্তিদের অন্যতম। তিনি এলাহাবাদ য়্যাংলো-বেঙ্গলী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় বাঙ্গালীদের অবদান সম্পর্কে বলিয়াছেন: Bengalees had indeed been torch-bearers of learning and enlightenment. বাস্তবিক পক্ষে বাঙ্গালীরা শিক্ষা ও জ্ঞানের বর্ত্তিকা বহন করিয়া আনিয়াছেন। ভারতবর্ষের কোন স্থানেই বাঙ্গালীদের প্রতি বিদেশীর ন্যায় আচরণ সার তেজ বাহাদুর সাপ্রু নিষেধ করিয়াছেন এবং বিহারী বাঙ্গালী সমস্যাকে জাতীয়তার পক্ষে শোচনীয় গ্লানি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সার সাপ্রুর এই স্পষ্ট উক্তি ও সত্যভাষণের জন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। প্রবাসী বাঙ্গালীরা কোনও অতিরিক্ত বা বিশেষ সুবিধা চাহেন না তবে যে সব প্রদেশকে তাঁহারা কর্ম্ম ও সেবার দ্বারা আপন করিয়া লইয়াছেন সে সকল প্রদেশে প্রদেশবাসীর ন্যায় অধিকার তাঁহারা ন্যায়সঙ্গত ভাবে পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারেন। যেথানেই তাঁহারা অধিক সংখ্যায় আছেন নিজেদের মাতৃভাষা শিক্ষা করিবার সুবিধা পাইবার অধিকারও সেখানেই তাঁহাদের আছে। বাঙ্গালীরা অন্যদের এই সকল সুবিধা দিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই এবং বাঙ্গালী ব্যতীত অন্যেরা, নিজ প্রদেশের বাহিরে যে সকল স্থানে বাঙ্গালীদের সহিত খারাপ ব্যবহার করা হইতেছে সে সকল স্থানেও খারাপ ব্যবহার পান না। বাঙ্গালীদের উপর এই প্রকার অন্যায় ব্যবহার যে জাতীয়তাবিরোধী ও সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা দোষ দুষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। সার তেজ বাহাদুর সাপ্রুর ন্যায় অন্য প্রদেশবাসী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যদি দৃঢ়তার সহিত এই মনোভাবের বিরুদ্ধতা করেন তাহা হইলে আমাদের জাতীয়তা এই শোচনীয় গ্লানি হইতে মুক্ত হইতে পারে। বাঙ্গালীদের অবশ্য এ বিষয়ে বিশেষ ধীরতা ও বিবেচনার সহিত কাজ করিতে হইবে এবং উত্তেজনার মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে হইবে।

ভারতের সাধারণ ভাষা ও বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের উদ্যম—

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের একটি সম্মেলনে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, যদি এখনই ভারতের সাধারণ ভাষা নির্ণয় করিতে হয় তবে বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষের কথা বিবেচনা করিয়া বাংলাকেই সেই আসন দান করা উচিত হইবে। এই সঙ্গে বাংলা ভাষার প্রসারের জন্য অন্যান্য প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একটি শক্তিশালী সমিতি গঠিত হইয়াছে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। আজ শুধু আমরা এই শুভ প্রচেষ্টার উদ্যোক্তাদের অভিনন্দিত করিতেছি।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

রাজভাষা

শ্রীকমলাকান্ত বসু

রাজঃ ভাষা ইতি রাজভাষা। প্রায় দুই শতাব্দী অতিবাহিত হইতে চলিল ইংরাজ আমাদের রাজা। ইংরাজ বলিতে ইংলণ্ডের অধিবাসীদিগকে বুঝায়। এই ইংলণ্ডবাসী-দিগের যিনি রাজা, বর্ত্তমানে তিনি ভারতবর্ষেরও রাজা। সমগ্র পৃথিবীর প্রায় এক পঞ্চমাংশ স্থান ব্যাপিয়া ইংরাজ-দিগের (প্রকৃতপক্ষে বৃটিশজাতির) উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যের বিস্তার। সন্ধি, যুদ্ধ বিগ্রহ, বাণিজ্যব্যবসায়, উপনিবেশ স্থাপন, দেশজয় প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য্যসূত্রে সমগ্র পৃথিবীর সহিত আজ ইংরাজদিগের বহুবিধ সম্বন্ধ। অতএব ইংরাজ-দিগের ভাষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা কেবল পশ্চিম ইউরোপে আটলান্টিক মহাসাগরের একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে—বস্তুতঃ উহা বিশ্বব্যাপী। অধুনা ইংরাজদিগের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ, তাহা কেবল রাজা-প্রজা সম্বন্ধ নহে—ভাষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতারও সম্বন্ধ। সংস্কৃতি ও সভ্যতা ভাষার সহিত ওতপ্রোত। সে হিসাবে বিদেশীয় ভাষার প্রচলনের সহিত বিদেশীয় ভাবধারা (সংস্কৃতি ও সভ্যতা) যে প্রচলিত হইতে বাধ্য, তাহা না বলিলেও চলে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা রাজভাষা বলিতে ইংরাজী ভাষাকেই বুঝাই-তেছি। এখন দেখা যাউক ইংরাজী ভাষা কিভাবে এ দেশে প্রবেশ, প্রসার ও প্রভাব লাভ করিল।

খৃঃ ১৫৫৮ হইতে ১৬০৩ অব্দ পর্য্যন্ত রাণী এলিজাবেথ ইংলণ্ডের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল ইংরাজদিগের জাতীয় জীবনের এক যুগসন্ধি—ইংলণ্ডের এই যুগের ইতিহাস ইংরাজজাতির প্রগতির ইতিহাস। সে বহুমুখী প্রগতির ইতিহাস আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নহে, তবে এইটুকু বলিতে হইবে যে, তাঁহারই সুদীর্ঘ রাজত্বকালে ইংলণ্ডের বহির্ভাগে ইংরাজশক্তি প্রসারের সূচনা হয়। তাঁহার সময়ে ফ্রোবিশার, গিলবার্ট, ড্রেক, র‍্যালে, হকিন্স ও ডেভিস্ প্রমুখ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নৌ-পর্য্যটকদিগের বিভিন্ন জলপথ আবিষ্কারের ফলে ইংলণ্ডে বহির্বাণিজ্য দ্রুত প্রসারলাভ করিতে থাকে। আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশের সহিত বাণিজ্য-সংযোগ স্থাপনের ফলে জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় এবং প্রাচ্যদেশের সহিত অনুরূপ সম্পর্ক স্থাপনের আকুলতা জাগিয়া উঠে।

খৃঃ ১৫৯৯ অব্দের শেষদিন রাণী এলিজাবেথ লণ্ডনে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে গঠিত এক ইংরাজ বণিকসঙ্ঘকে ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থ এক সনন্দ প্রদান করেন। এই সনন্দের একটী অন্যতম প্রধান সর্ত্ত ছিল—"কোম্পানী ইচ্ছা করিলে, প্রাচ্যদেশে ভূমিক্রয় বা অন্য কোন কায়েমী ব্যবস্থায় জমী দখল করিয়া বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিবেন।" ১৫ বৎসরের জন্য কোম্পানীকে এই অবাধ বাণিজ্যাধিকার দেওয়া হয়।

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষের সহিত প্রতীচ্য ভূখণ্ডসমূহের বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল। পশ্চিম ইউরোপের ব্যবসায়িগণ ভারতের সহিত সরাসরি বাণিজ্য স্থাপনে সচেষ্ট হইলে, পর্ত্তুগীজ (১৫০০ খৃঃ), দিনেমার (১৫৯৮ খৃঃ), ওলন্দাজ (১৬০০ খৃঃ), ইংরাজ (১৬১২ খৃঃ) ও ফরাসী (১৬৬৮ খৃঃ) ব্যবসায়িগণ ক্রমান্বয়ে ভারতবর্ষে বাণিজ্য আরম্ভ করেন। ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া এই সকল বিজাতী বণিককে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় কিরূপ উগ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইতে হইয়াছিল তাহা ইতিহাসে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। একস্থানে একাধিক জাতি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে বিবাদ-বিসংবাদ অনিবার্য্য। এক সময়ে ওলন্দাজগণ বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় সকলকে পরাভূত করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সিংহল ও পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনে সমধিক ব্যস্ত হইলেও, ইংরা

ও ফরাসীগণই এ দেশে প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে থাকেন।

পর্ত্তুগীজ প্রমুখ ইউরোপীয় ব্যবসায়িগণ যে সময় এ দেশে বাণিজ্য করিতে আসেন, সে সময় এ দেশে মুসলমান রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৭০৭ খৃঃ অব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হইলে ভারতবর্ষে মোগলশক্তির অধঃপতন ও মহারাষ্ট্রশক্তির অভ্যুদয় সঙ্ঘটিত হয়। এই সময় ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় আপনাদিগের অস্তিত্ব ও স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন এবং ক্রমশঃ অরাজকতার সুযোগে তাঁহাদিগের সকলেই এ দেশে রাজ্য স্থাপন করিয়া একে অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করিতে থাকেন। ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে যে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতে ক'একটী বিশেষ কারণে ইংরাজশক্তির প্রাধান্যই স্থাপিত হয়। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে পলাশীর আম্রকাননে ইতিহাসবিশ্রুত সংগ্রামের অবসানে বাঙ্গালার নবাব সিরাজদ্দৌলা ধৃত হইয়া নির্ম্মমভাবে নিহত হইলে বঙ্গের রাজলক্ষ্মী ইংরাজের করতলগত হয়। ইহার পর ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামশেষ বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী-সনন্দ লাভ করিলে ভারতবর্ষে ইংরাজশক্তি-অভ্যুদয়ের ভিত্তিভূমি দৃঢ় হয়। এত দিনে—

"বণিকের মানদণ্ড
দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে
পোহালে শর্ব্বরী।"

অতঃপর ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেবল বাণিজ্য সঙ্ঘরূপে পরিগণিত না হইয়া রাষ্ট্র শক্তি বলিয়াও বিবেচিত হইতে থাকে। দেখিতে দেখিতে কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতকের মধ্যে (১৭৫৭—১৮২৩ খৃঃ) ভারতবর্ষের অধিকাংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত হইয়া পড়ে। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ ভারতবর্ষ শাসনের ভার ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপর ফেলিয়া রাখা সমীচীন নহে বুঝিলে ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুকালে (১৯০১ খৃঃ) কেবল যে ভারতবর্ষেই ইংরাজ শাসন সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল তাহা নহে, কানাডা হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় এই সময়েই বৃটিশ প্রাধান্য স্থাপিত হয়। যে জাতির গৌরব দিগ্বিদিকে সুবিস্তৃত, সে জাতির ভাষাও যে দিগ্বিদিকে সুবিস্তৃত হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

মনস্বী স্পেন্সার বলিয়াছেন—"It hath ever been the use of the conqueror to despise the language of the conquered and to force him by all means to learn his." এই উক্তিটী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কতদূর প্রযোজ্য তাহাই এখন দেখা যাউক

ভাষার সহিত জাতীয় সংস্কৃতি ওতপ্রোত। ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি তথা সভ্যতা অতি সুপ্রাচীন, অতএব তাহার ভাষাও অতি সুপ্রাচীন,—কেবল সুপ্রাচীন নহে, সুসমৃদ্ধও। অধুনা আর্য্য বলিতে প্রাচ্য-প্রতীচ্য অনেক জাতিকেই বুঝায়, কিন্তু ভারতীয় আর্য্য সংস্কৃতিই স্মরণাতীত কালে জগৎপূজ্য হইয়াছিল—এ যুগেও তাহা প্রাচী-প্রতীচীর পরম বিস্ময়। বিশ্বের বিরাট রঙ্গমঞ্চে মিশর, ব্যাবিলন কালডিয়া, ফিনিশিয়া, মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় সভ্যতা আবির্ভূত হইয়াছে, আবার দেখিতে দেখিতে চির-অন্তর্হিত হইয়াছে—কিন্তু হিন্দুর সভ্যতা তেমন ক্ষণভঙ্গুর নহে। জাতীয় সভ্যতার প্রধান মানদণ্ড—ভাষা। ভাষাই সংস্কৃতির বাহন—ভাষার সঞ্জীবনী শক্তির প্রভাবে জাতীয় সভ্যতা সজীব থাকে। যে অমৃতময়ী ভাষার উৎসধারায় অবগাহন করিয়া হিন্দুজাতি একদিন শৌর্য্যে বীর্য্যে চিত্তের ঐশ্বর্য্যে বিশ্ব-বরেণ্য হইয়াছিল, সে তাহার মাতৃভাষা, যাহাকে বলি দেবভাষা—আর্য্যভাষা—সংস্কৃত ভাষা। কালের বিবর্ত্তনে "ভূতকালের সে পূত ভাষা" এখন আর আমাদের জাতীয় ভাষা নহে। অধুনা ভারতে বহুবিধ ভাষা প্রচলিত বটে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার সমাদর সর্ব্বত্রই। ভারতবর্ষের অধিকাংশ কথিত ভাষা সংস্কৃত হইতেই উৎপন্ন। বাঙ্গালা, হিন্দী, মরাঠি, গুজরাটী, উড়িয়া ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ভাষা আর্য্যভাষা হইতেই উদ্ভূত—

ামিল তেলেগু প্রভৃতি ভাষায়ও বহু সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ খো যায়। অতএব বলা চলে, হিন্দুর ভাষা শত নর্য্যাতন সহিয়া মুমূর্ষু জাতির প্রাচীন সভ্যতা আজিও প্রাণবন্ত রাখিয়াছে।

প্রাচীন পারসীক, গ্রীক, শক ও হুনগণ এ দেশে াসিয়া রাজত্ব করিলেও হিন্দুর সমাজ ধর্ম্মের প্রভাবে াহারা ভারতবাসীদিগের সহিত এমনভাবে মিশিয়া গয়াছিলেন যে, ভাবে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে তাহাদিগের স্বতন্ত্র াত্তা ছিল না। তুর্কী আফগানবংশীয় মুসলমানদিগের ধর্ম্ম র্ম্ম ও সামাজিক আচারের সহিত ভারতীয় ভাবধারার র্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ ছিল। কিন্তু সুদীর্ঘ তিন শতাব্দী িরিয়া দুইটী সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করার ফলে এই াতন্ত্র্য খর্ব্ব হওয়াই স্বাভাবিক। মুসলমানগণ যে সকল হিন্দুকে দীক্ষা দিতেন। তাঁহারা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণের পর পূর্ব্ব আত্মীয়দিগের সহিত সম্পর্কচ্ছেদও যেমন করিতেন না, তদ্রূপ তাঁহাদিগের পূর্ব্ব সংস্কারও সম্পূর্ণ পরিহার করিতে পারেন নাই।

ইহার উপর আবার কোন কোন মুসলমান রাজা ও সেনাপতি হিন্দু নারীর পাণিগ্রহণ করার ফলে তৎকালীন মুসলমান সমাজে হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাব এত সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, ফিরুজশাহ (১৩৫১—১৩৮৮ খৃঃ) ইহার দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন—তিনি নিজে কিন্তু হিন্দু রাজকন্যার গর্ভজাত ছিলেন। এই সময় মুসলমান আচার যাহাতে হিন্দু ধর্ম্মে প্রবেশ করিতে না পারে, সে বিষয়ে রঘুনন্দন প্রমুখ স্মার্ত্তগণ সবিশেষ অবহিত হইয়া উঠেন। কিন্তু দেখা যায় রামানন্দ, চৈতন্য, একনাথ, কবীর ও নানক প্রমুখ উদারমতবাদী ধর্ম্মপ্রচারকদিগের প্রচেষ্টায় হিন্দু ম্লেচ্ছ বিভেদ উঠিয়া যাইবার উপক্রম হয়। উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের সেই সন্ধিক্ষণে বাবরের আক্রমণে সব উল্টাইয়া যায়। সে যাহাই হউক, বিদ্যোৎসাহী মুসলমান পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষার অনুশীলন করিতেন—অনেক হিন্দুও রাজদরবারে প্রতিপত্তি লাভের জন্য পারসী ভাষা আয়ত্ত করিতেন। আকবরের যুগে কতিপয় মুসলমান মনীষী সংস্কৃত সাহিত্যে বুৎপত্তি লাভ করেন—বাদশাহ আকবর স্বয়ং হিন্দুধর্ম্মের, হিন্দুর শাস্ত্র-সাহিত্যের এতদূর অনুরাগী ছিলেন যে, তিনি অথর্ব্ববেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও লীলাবতী গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনূদিত করাইয়াছিলেন। ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম শতবর্ষের মধ্যেও সার চার্লস্ উইলকিন্স, সার উইলিয়ম জোন্স, হেন্‌রী টমাস কোলব্রুক, হোরেস হেম্যান উইলসন, রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ্, সার মণিয়ার মণিয়ার-উইলিয়ম্‌স্, চার্লস্ এচ টনী প্রমুখ কতিপয় প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী ইংরাজ এ দেশে আসিয়া সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষা তথা প্রাচীন শাস্ত্র-সাহিত্যের গবেষণা, অনুবাদ ও অধ্যাপনা করেন।

ইংরাজ এ দেশ যখন অধিকার করেন, তখন সংস্কৃত ও পারসী ভাষার অপ্রতিহত প্রচলন। এই জন্যই দেখা যায় ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ প্রণীত রেগুলেটিং অ্যাক্টএর বিধান অনুযায়ী বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষে কোম্পানীর রাজ্যশাসন কার্য্যে প্রথম হস্তক্ষেপ করিলে, বাঙ্গালার ফোর্ট উইলিয়মের প্রথম গবর্ণর-জেনারল ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ সাধারণের পারসী শিক্ষার জন্য রাজধানী কলিকাতায় একটী মাদ্রাসা স্থাপন করেন (১৭৮১ খৃঃ) এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস্ হিন্দু ধর্ম্মের পুণ্যকেন্দ্র কাশীধামে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য একটী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন (১৭৯২ খৃঃ)।

উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত যে একটী বিশাল দেশ শাসন করা অসম্ভব, তাহা ভারত শাসন করিবার সময় লর্ড ওয়েলেশলি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ভারতে যে বৃটিশ সাম্রাজ্য ক্লাইভ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ওয়ারেণ হেষ্টিংস আশু বিনাশ হইতে রক্ষা করেন, ওয়েলেশলি তাহার প্রসার বৃদ্ধি করেন। এই সুপ্রতিষ্ঠিত বৃটিশ প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য তিনি সিভিলিয়ানদিগের শিক্ষাবিধান কল্পে ১৮০০ খৃঃ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন। তখন আদালতের ভাষা ছিল পারসী—দলিলপত্র ও সওয়াল জবাব পারসীতেই হইত; অবশ্য বাঙ্গালাতেও অনেক দলিল লেখা হইত। ওয়েলেশলি আদেশ প্রচার করেন—"আদালতে বিচারপতির পদ পাইতে হইলে বৃটিশ কর্ম্মচারীদিগকে হিন্দী, পারসী ও বাঙ্গালা ভাষায় পরীক্ষা দিয়া ঐ স

ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেই হইবে।" অন্যান্য রাজকর্ম্ম সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা হয়। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারই পরামর্শ ক্রমে ইংলণ্ডেও একটী কলেজ স্থাপিত হয়—হেলিবেরী কলেজ নামে তাহা প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

কিন্তু যে সময়ে এ দেশে সিভিলিয়ানদিগের দেশীয় ভাষা শিক্ষার কথা উঠে, তখন উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক, ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধানের অভাবে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করা সহজসাধ্য ছিল না—সুসমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষার কথা আমরা বলিতেছি না। বাঙ্গালার তো তখন শোচনীয় অবস্থা।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য অনেক বাঙ্গালা পুস্তক ও ইংরাজী ভাষায় লিখিত বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—'১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হালহেড নামক এক সিবিলিয়ান্ সাহেব বঙ্গভাষায় এক ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। তখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। চার্লস উইলকিন্স নামক হালহেড সাহেবের এক বন্ধু স্বহস্তে ক্ষুদিয়া ঢালিয়া এক সাট বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করেন। এই অক্ষরে হালহেড সাহেবের ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস বাহাদুর যে সকল আইন সংগৃহীত করেন, ফরষ্টর নামক এক সাহেব তাহা বাঙ্গালাতে অনুবাদ করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মাসন, ওয়ার্ড প্রভৃতি মিসনরী শ্রীরামপুরে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন। ইঁহারা শ্রীরামপুরে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া দেবনাগর, বাঙ্গালা প্রভৃতি নানা অক্ষর প্রস্তুত করেন এবং সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি, উড়িয়া প্রভৃতি নানা ভাষায় বাইবেল অনুবাদিত করিয়া, ঐ যন্ত্রে মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি বাঙ্গালার প্রাচীন গ্রন্থ সকলও উহাতে মুদ্রিত হইতে লাগিল।"

এই শ্রীরামপুরের মিশনরীগণ দেশীয় ভাষা শিক্ষার পথ সুগম করিলেও এবং দেশীয় ভাষার উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করিলেও তাঁহাদের উদ্দেশ্যটী ভুলিলে চলিবে না। তাঁহারা যে সময়ে এ দেশে আসিয়াছিলেন তখন দেশে বহুবিধ কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। এই মিশনরীদিগের ধর্ম্ম খৃষ্ট ধর্ম্ম—ইহা বহুদেববাদ তথা হিন্দুর শাস্ত্র সম্মত উপাসনা পদ্ধতির পরম বিরোধী। দেশকে কুসংস্কার মুক্ত করিয়া ক্রমশঃ স্বধর্ম্মে আকর্ষণ করা এই ধর্ম্ম প্রচারকদিগের একক অভিপ্রায় ছিল। এই অভিপ্রায় ক্রত কার্য্যে পরিণত করিবার জন্যই তাঁহারা দেশীয় ভাষা শিক্ষায় আত্ম-নিয়োগ করেন এবং দেশীয় শিক্ষা পদ্ধতির উপর প্রভাব বিস্তার করেন। যে সময় তাঁহারা এ দেশে আসেন সে সময়ে তাঁহাদিগের মাতৃভূমি ইংলণ্ড আজিকার মত জ্ঞান বিজ্ঞানে সমুন্নত ছিল না—১৮৩৩ খৃঃ অব্দে গ্রেট বৃটেনে প্রথম জাতীয় শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে ব্যয় মঞ্জুর হইবার পূর্ব্বে দেশময় অজ্ঞান ও অশিক্ষা এরূপ ব্যাপক ছিল যে বিংশ শতাব্দীতে তাহা অনুমান করাও সহজ নহে। মিশনরীগণ এ দেশে আসিয়া অনুরূপ অবস্থাই দেখিতে পান—কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই আক্ষরিক শিক্ষায় দেশ অনগ্রসর হইলেও হিন্দুর দেশে হিন্দু ধর্ম্মের মূলনীতি হিন্দুদিগের অস্থিমজ্জায় ওতপ্রোত। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে পর্ব্বত প্রমাণ অজ্ঞতা লইয়া তাঁহারা স্বধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করেন নাই—মুসলমানদিগের ন্যায় তাঁহারাও দীক্ষা কার্য্যে সোৎসাহে লাগিয়া গেলেন।

উপর্য্যুপরি বৈদেশিক আক্রমণের ফলে হিন্দুর সামাজিক বিধি ব্যবস্থায় যে বিস্তর গলদ প্রবেশ করিয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মিশনরীগণ এমন ভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন যে, লোকে এই সকল গলদ হৃদয়ঙ্গম করিয়া সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা গভীর ভাবে অনুভব করিতে থাকে। ১৮১৩ খৃঃ অব্দে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে নূতন সনন্দ লাভ করেন, তাহাতে ভারতবর্ষে ধর্ম্ম ও শিক্ষা প্রচার কল্পে সাহায্য দানের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ফলে ১৮১৭ খৃঃ অব্দে বিশপস্ কলেজ, ১৮১৮ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুর কলেজ, ১৮৩০ খৃঃ অব্দে জেনারল এসেমব্লিক ইনষ্টিটিউশন ও ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে ফ্রী চার্চ্চ অব স্কটলণ্ড কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু পাশ্চাত্য ধর্ম্ম ও শিক্ষায় দেশবাসীকে আকৃষ্ট করিতে মিশনারী সম্প্রদায়ের দীর্ঘ দিন লাগে নাই। ১৮১৭ খৃঃ অব্দেই ডেভিড হেয়ারের প্রস্তাবে রামমোহন রায়,

দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কতিপয় মনীষী দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারকল্পে দেশবাসীর অর্থসাহায্যে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। দেখিতে দেখিতে বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে মিশনরী-দিগের প্রচেষ্টায় অসংখ্য ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে "স্কুলবুক সোসাইটী" ও ১৮২০ খৃঃ অব্দে "ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটী" স্থাপিত হইলে ইঁহাদিগের ও বহু মিশনরীর চেষ্টায় বিস্তর বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দের মে মাসে বীটন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই বিদ্যালয় সংস্থাপন কার্য্যে বীটন সাহেবের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। বীটন সাহেবের মৃত্যুর পর (১৮৫৬ খৃঃ) গভর্ণমেণ্ট তদীয় বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু সে সময় বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় তথা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী আন্দোলনের ফলে দেশের সমস্ত বালিকা-বিদ্যালয়ই প্রকৃতপক্ষে শিশুবিদ্যালয় ছিল। এই স্থলে বলিয়া রাখি, রাধাকান্ত দেব, রামমোহন ও বিদ্যাসাগর প্রভৃতির ন্যায় স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন, কিন্তু বালিকা-বিদ্যালয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না। বস্তুতঃ ১৮১৯ খৃঃ অব্দে রামমোহন রায়ের "সহমরণ-বিষয়ক প্রস্তাব' ও ১৮২০ খৃঃ অব্দে রাধাকান্ত দেবের "স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়ক" গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ব্যাপকভাবে এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের কোনও চেষ্টাই দেখা যায় নাই

১৮২৩ খৃঃ অব্দে "কমিটী অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন" প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার সমর্থনকারী দুইটী দলের মধ্যে দ্বাদশবর্ষব্যাপী এক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় আলেকজাণ্ডার ডাফ, ডেভিড হেয়ার, রামমোহন রায় প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারের পরম পক্ষপাতী ছিলেন; হোরেশ হেম্যান উইলসন, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রমুখ বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রাচ্যভাষা ও সাহিত্যের প্রচারকামী ছিলেন। দেশীয় শিক্ষাপদ্ধতির সমর্থনকারী দলের উদ্যোগে গভর্ণমেণ্ট একটী সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিবার জন্য অর্থপ্রদানে প্রতিশ্রুত হইলে, রামমোহন রায় তৎকালীন গবর্ণর জেনারল লর্ড আমহার্ষ্টকে যে বিরাট পত্র লিখেন তাহার একস্থলে তিনি বলিয়াছিলেন—"We find that the Government are establishing a Sanscrit school under Hindu pandits to impart such knowledge as is already current in India. The Sanscrit language is so difficult that almost a life time is necessary for its acquisition and the learning is far from suffiicient to reward the labour of acquiring it. The Sanscrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness." আলেকজাণ্ডার ডাফ বলেন—'প্রাচ্যভাষাসমূহ সমুদ্র সদৃশ অসীম অতল অপার; কিন্তু সুদীর্ঘ অন্বেষণেও আমি ইহাতে মুক্তার দর্শন পাইলাম না।' লর্ড মেকলের ন্যায় মহাপণ্ডিতের মুখেও শুনা গিয়াছিল—"A single shelf of a good European library is worth the whole native literature of India and Arabia." শুধু তাহাই নহে,—"I doubt whether the Sanskrit literature be as valuable as that of our Saxon and Norman progenitors." তখন ইংরাজী শিক্ষার মোহ দেশকে এমন পাইয়া বসিয়াছে যে, পাশ্চাত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট ইংরাজই "Friend, philosopher and guide"—ইংরাজের মুখনিঃসৃত সকল উক্তিই gospel truth—বেদবাক্য (!)—অভ্রান্ত সত্য!

কিন্তু ১৮২৪ খৃঃ অব্দে প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার সাত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—এই অল্পকালের মধ্যেই জাতীয় রীতিনীতি, শিক্ষা ও সমাজে কিরূপ ভাববিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল তাহা খৃঃ ১৮২৮ অব্দের ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনের রিপোর্টে সুস্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে—"...an impatience of the restrictions of Hinduism and a disregard of its ceremonies are openly avowed by many young-men of respectable birth and talents, and entertained by many more who outwardly conform to the practices of their countrymen."

নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের জাতীয় ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার

পরিত্যাগ করিয়া বিপথগামী ও সমাজদ্রোহী হওয়ার মূলে ছিল হিন্দু কলেজ। হিন্দু কলেজের শিক্ষকদিগের মধ্যে দার্শনিক-কবি হেন্‌রী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ও সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মেজর ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন ছাত্রদিগের আদর্শস্বরূপ হইয়াছিলেন। ডিরোজিও যখন হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা করিবার জন্য নিযুক্ত হন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৮ বৎসর—তাঁহার শিক্ষায় ধর্ম্ম ও সংযমের কোনও সংস্রব ছিল না, তিনি নাস্তিক ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। সে সময়ে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন গৌরবের বিষয় ছিল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, শশীচন্দ্র দত্ত, কিশোরীচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতি বহু মনীষী হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন। হিন্দুকলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ইঁহারা পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানে প্রভূত পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত যে পাশ্চাত্য সভ্যতা এ দেশে প্রবেশ করিবে তাহা বিচিত্র নহে। মনীষী রাজনারায়ণ বসু তাঁহার "সেকাল আর একাল" গ্রন্থে তদানীন্তন ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতিগতি ও রুচি নীতির যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে সমাজ বিপ্লবের সমুজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন—"তখনকার সময় গুণে ডিরোজিওর যুবক শিষ্যদিগের এমনি সংস্কার হইয়াছিল যে, মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সুসংস্কৃত ও জ্ঞানালোকসম্পন্ন মনের কার্য্য। তাঁহারা মনে করিতেন, এক এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয় লাভ করা। তিনি অকপটে লিখিয়াছেন—"আমি......প্রভৃতির সহিত কলেজের গোলদীঘিতে মদ খাইতাম, এবং এখন যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে সেখানে কতকগুলি শিক কাবাবের দোকান ছিল, তথা হইতে গোলদীঘির রেল টপকাইয়া, ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না, উক্ত কাবাব কিনিয়া আনিয়া আমরা আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা মাংস ও জলস্পর্শশূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্ঠাপ্রদর্শক কার্য্য মনে করিতাম।" এই সময় ইংরাজের ন্যায় বেশ ভূষা, ইংরাজের ন্যায় কেশবিন্যাস—এক কথায় ইংরাজের যতগুলি বহিরঙ্গ অনুকরণ অনায়াসসাধ্য সবই নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ভারতীয় সমাজকে পাশ্চাত্য সমাজে পরিণত করিব—এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া তাঁহারা সংস্কারের নামে সমাজের মূলোচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। জনৈক লেখক লিখিয়াছেন—"এক হিন্দু কলেজে রক্ষা ছিল্ না, তাহার উপর সংস্কৃত কলেজটী ইংরেজী কলেজ হইলে, বোধ হয়, ঘরে ঘরে নরক দৃশ্য দেখিতে হইত।" কিন্তু ১৮২৭ খৃঃ অব্দে সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী বিভাগ স্থাপিত হয়। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে "জেনারল কমিটী অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন"এর আদেশক্রমে ইহা তুলিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু ১৮৪২ খৃঃ অব্দে উহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে ও উৎসাহে সংস্কৃত কলেজে রীতিমত ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হয়। প্রাগুক্ত লেখক লিখিয়াছেন—"ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে সংস্কৃত শিক্ষাস্রোত অনেকটা তেজোহীন হয়। সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাকালে আপত্তি তুলিয়া যিনি ইহাকে ইংরেজি স্কুলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় তাঁহার প্রেতাত্মার অর্দ্ধাধিক তৃপ্তি হইয়াছিল, অধুনা প্রায় পূর্ণ।"

কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও বিলাতের হেলিবেরী কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও যে বৃটিশ কর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তব্য সম্পাদনের উপযোগী জ্ঞান বা দিগ্‌দর্শন হইতেছিল না তাহা ক্রমশঃ কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়। তখন তাঁহারা দেশীয় লোকদিগের সাহায্যে রাষ্ট্রপরিচালনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে বিলাতের পার্লামেণ্ট ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যে নূতন সনন্দ দান করেন, তাহাতে "ভারতবাসীই হউক বা ইংলণ্ডেশ্বরের অন্য যে কোন প্রজাই হউক সকলেই জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে উচ্চপদলাভে অধিকারী হইবে" বলিয়া সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। সরকারী উচ্চ পদলাভের যোগ্যতা অর্জ্জন যে সুশিক্ষার উপর নির্ভর করে, তাহা

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক উপলব্ধি করেন। ১৮২৩ খৃঃ অব্দ হইতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষা ব্যবস্থা লইয়া যে মতদ্বৈধ ও তুমুল বিতর্ক চলিতেছিল, তাহা ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার সচিব লর্ড মেকলে তাঁহার ইতিহাস প্রসিদ্ধ "মিনিট" রচনা করিয়া অবসান করেন। তাঁহারই প্রস্তাব অনুযায়ী স্থির হয়, অতঃপর সরকারের শিক্ষা কল্পে দান ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের জন্যই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। দেখিতে দেখিতে দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। মাদ্রাজে মন্‌রো ও বোম্বাইএ এলফিন্‌ষ্টোন ইংরাজী ভাষার সাহায্যে উচ্চ শিক্ষা-বিস্তারে ব্রতী হইলেন। আদালতে ও অন্যান্য রাজকার্য্যে ইংরাজী ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হইল। ভারত-সরকারের এই নব শিক্ষা পদ্ধতির ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসারপথ প্রশস্ত ও উন্মুক্ত হইল। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালে সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগে ইংরাজী শিক্ষিতদিগের দাবী অগ্রগণ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ইংরাজী বিদ্যা অর্থকরী বিদ্যা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সংস্কৃত কলেজে ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকে।

ইংরাজী ভাষা শিক্ষার স্রোত এরূপ খরতর হইল যে দেখিতে দেখিতে একদল নিমচাঁদের আবির্ভাব ঘটিল, তাঁহাদের প্রত্যেকের মুখের কথা ছিল—"I read English, write English, talk English, speechify in English, think in English, dream in English!" ইহা কেবল মুখের কথা নহে, তাঁহারা কার্য্যতঃ সত্য সত্যই তাহা করিতেন। ১৮৪১খৃঃ অব্দে মাইকেল মধুসূদন ইংলণ্ডের জন্য ইংরাজী ভাষায় রোদন করিয়াছিলেন—

"And oh! I sigh for Albion's strand
As if she were my native land!"

মনীষী রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন—"আমরা যখন কলেজে পড়িতাম তখন বাঙ্গালা পড়ার প্রতি কাহারো মনোযোগ ছিল না। আমাদের যিনি পণ্ডিত ছিলেন তাঁহার সঙ্গে আমরা কেবল গল্প করে সময় কাটিয়ে দিতাম। সুতরাং যখন আমরা কলেজ থেকে বেরুলাম তখন আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় কিছু বুৎপত্তি জন্মে নাই! সে সময়কার ছাত্রদিগের পক্ষে বাঙ্গালা ভাষা অতি ভীষণ পদার্থ ছিল।" অভিনন্দন-পত্র'কে 'রঘুনন্দন পত্র' বলা, 'বৃত্রসংহার'কে 'বেত্রসিংহ' বলা, 'মা দুর্গে দুর্গতিনাশিনী' না বলিয়া 'মা দুর্গে দুর্গেশ-নন্দিনী' বলা—শব্দবিভ্রাটের এমন আরও বহু দৃষ্টান্তের সহিত পাঠক নিশ্চয়ই পরিচিত আছেন। এরূপ শব্দবিভ্রাট যাঁহাদিগের হইত, তাঁহারা সকলেই কিন্তু শক্তিশালী ইংরাজী ভাষাবিদ্। ইংরাজী কবিতা লিখিয়া প্রথম কাশীপ্রসাদ ঘোষ, তৎপরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তরু দত্ত প্রভৃতি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন; ইংরাজী ভাষায় সংবাদ-পত্র ও সাময়িক পত্রিকা-সমূহে নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখিয়া তথা গ্রন্থপ্রণয়ন ও বক্তৃতা প্রদান করিয়া তদানীন্তন বঙ্গীয় সমাজের বহু পাশ্চাত্য শিক্ষিত মনীষী সম্মান ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, লালবিহারী দে, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, নরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগের নাম এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। ইংরাজী সাহিত্যে অধ্যাপনা করিয়া স্বনামধন্য প্যারীচরণ সরকার "Arnold of the East" উপাধি ভূষিত হন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যা পড়িবার জন্য তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ক্যানিং উৎসুক হইয়া থাকিতেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে তৎকালীন ছোট লাট সার রিচার্ড টেম্পল বলিয়াছিলেন—"The most effectively learned Hindu of his day both as regard English and Oriental Classics." কেশবচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দের বাগ্মিতায় পশ্চিম মহাদেশ অবধি বিস্ময়বিমূঢ় হইয়াছিল।

রাজনারায়ণ বসুর সহাধ্যায়ী ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার "সামাজিক প্রবন্ধে" লিখিয়াছেন—"বর্ষ কতিপয় গত হইল, কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব একটি সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সভাতে ইংরাজী ভাষায় বুৎপন্ন এবং ইংরাজি ভাষায় অনভিজ্ঞ দুই প্রকার লোকই উপস্থিত ছিলেন। একজন সভাসদ প্রস্তাব করিলেন—"সভার

কার্য্যবিবরণ বাঙ্গালা ভাষাতে লিখিত হউক।" অমনি একজন 'কৃতবিদ্য' গাত্রোত্থান করিয়া ঘৃণাসূচক হাস্য-সহকারে ঐ কথার প্রতিবাদপূর্ব্বক ইংরাজিতে বলিলেন,—"বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার প্রবৃত্ত করিলে, দেশটা দুই সহস্র বর্ষ পাছু হইয়া যাইবে

পাঠক স্মরণ রাখিবেন—১৮৩৫ খৃঃ অব্দে লর্ড মেকলের "মিনিট" সংস্কৃত শিক্ষার উপর দণ্ডোত্তোলন করিলে, সংস্কৃত শাস্ত্র-সাহিত্যের প্রতি যাঁহারা নাসিকাকুঞ্চন করিয়াছিলেন, তাঁহারা মাতৃভাষার নাম শুনিলে ওষ্ঠনির্ভোগ করেন। অবশ্য হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণের মধ্যে ক'একজন ক্যামেরণ, বীটন প্রমুখ কতিপয় বিচক্ষণ ইংরাজের পরামর্শে ভবিষ্যতে মাতৃভাষার অনুশীলন করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন—যেমন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি।

ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইবার অভিলাষ আধুনিক যুগেও কিছু অল্প নহে, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার সেই আদিযুগে ইহা যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহা ইংরাজ মনীষীদিগের সদুপদেশ দ্বারা কথঞ্চিৎ ব্যাহত না হইলে আজ মাতৃভাষার দৈন্য কিরূপ লজ্জাজনক হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বৈদেশিক ভাষার মোহ এক সময়ে ইউরোপেও দেখা গিয়াছিল। মনস্বী বেকন্এর "Novum Organum", দার্শনিকপ্রবর স্পিনোজার "Ethics", বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ নিউটনএর "Principia", এমন কি বার্গসঁর দর্শনগ্রন্থও লাটিন ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। মার্টিন লুথারের প্রচণ্ড আঘাতে রোমান চার্চ্চ ও লাটিন ভাষা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িলে অধিকাংশ ইউরোপে ফরাসী ভাষা লাটিনের স্থান অধিকার করে। এই জন্যই দেখা গেল ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট নব জার্ম্মাণরাষ্ট্রের প্রবর্ত্তন করিলেও ফরাসী ভাষা রহিয়া গেল—লিব্‌নিজএর দর্শন শাস্ত্র পর্য্যন্ত ফরাসী ভাষায় লিপিবদ্ধ হইলে শুনা গেল জার্ম্মাণ ভাষায় দর্শনগ্রন্থ লিখিবার উপযোগী শব্দসম্ভার অপ্রতুল। কেণ্ট ও হেগেল মাতৃভাষায় দর্শনশাস্ত্র লিখিয়া এই ভ্রম অপনোদন করেন। এলিজাবেথের যুগে ইংলণ্ডের শ্রুতকীর্ত্তি লেখকদিগকে লাটিন ছাড়িয়া মাতৃভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়।

১৮৫০ খৃঃ অব্দে ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিসভায় রাজনারায়ণ বসু বলেন—"আমাদিগের এই বঙ্গভূমিতে এক্ষণকার ইংরাজীতে কৃতবিদ্য যুবকদিগের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী ভাষাতে প্রসিদ্ধ কাব্যকাররূপে গণ্য হইবার অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের ভ্রান্তির আর সীমা নাই। তাঁহারা যাহা কখন হয় নাই, যাহা হইবার নহে, তাহা সাধন করিতে যত্নবান হইয়াছেন।...ঐ সকল যুবকেরা যদ্যপি এই কথা বলেন যে বাঙ্গালা ভাষা অতি অসম্পন্ন হীন ভাষা, তাহাতে রচনা করা দুঃসাধ্য, কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে সিসিরোর সময়ের লাটিন ভাষার ন্যায় কিম্বা লেসিঙ্গের সময়ের জর্ম্মন্ ভাষার ন্যায় কি আমাদিগের বাঙ্গালা ভাষা অসম্পন্ন? আপনাদিগের নিজ নিজ দেশীয় ভাষা উন্নত করিয়া ঐ দুই মহাত্মা কি পর্য্যন্ত না যশস্বী হইয়াছেন, যদ্যপি আমাদিগের আত্মভাষার উন্নতি সাধনে আমরা যত্নবান হই, তবে ঐরূপ যশস্বী আমরাও হইতে পারি।"

বস্তুতঃ দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান এককালে গভর্ণমেণ্টেরও যে লক্ষ্য না ছিল তাহা নহে। সার চার্লস্ ট্রেভেলিয়ান তাঁহার "On the Education of the people of India" গ্রন্থে শিক্ষাব্যবস্থার সেই আদিকালে বলিয়াছেন—"It was admitted on all sides that···the instruction of the mass of the people through the medium of their own language was the ultimate object to be kept in view." ১৮৩৫খৃঃ অব্দে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান ও ১৮৩৭ অব্দে নিম্ন আদালত সমূহে পারসীর পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহারের বব্যস্থা তথা মিশনরীদিগের বাঙ্গালা ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার মাতৃভাষার প্রচার, প্রসার ও অভ্যুদয়ের সহায়ক হইয়াছিল। ১৮৩৯খৃঃ অব্দে গবর্ণর-জেনারেল লর্ড অক্‌লেণ্ডর এক "মিনিট"এ প্রকাশ পায়—"পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা ইংরাজীর সাহায্যে দেওয়া হইবে, কিন্তু তাহা বলিয়া প্রাচ্য বিদ্যালয়গুলি উঠিয়া যাইবে না। ইংরাজীর সঙ্গে এ দেশীয় ভাষা শিক্ষাও চলিবে; যে যাহা ইচ্ছা করে, সে তাহাই শিখিবে।"

১৮৪৪ খৃঃ অব্দে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালে বাঙ্গালা ভাষার প্রসার-প্রবর্তনকল্পে বঙ্গের বহু স্থলে পাশ্চাত্যবিদ্যালয়ের আদর্শে বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। "কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন" ১৮৫২ খৃঃ অব্দে শিক্ষাবিভাগের ভার "কৌন্সিল অব এডুকেশন"এর উপর অর্পণ করিলে, কৌন্সিল উচ্চশ্রেণী ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহী হন। "এডুকেশন কৌন্সিল"এর সভাপতি চার্লস হে ক্যামেরণ ছাত্রদিগকে বলিয়াছিলেন—"Placed as you are between the learning of Europe and the mass of your countrymen, you may make yourselves their benefactors to an incalculable extent, by interpreting to them, in your vernacular tongue, what you have learnt in English." সার হার্ব্বার্ট ম্যাডক বলিয়াছিলেন—"I should impress on the students of all our Scholastic Institutions the vast importance to themselves and their countrymen of their acquirig a thorough knowledge of the native languages......" "স্কুলবুক সোসাইটী" ও "ভার্ণাকুলার-লিটারেচার সোসাইটী" বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও রবিনসন সাহেব এই দুই সভার সহিত বিশেষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। উইলিয়ম ইয়েট্স্ তাঁহার "Introduction to the Bengali Language" (2 Vols.) গ্রন্থে ১৮০০ খৃঃ হইতে ১৮৪০ খৃঃ অবধি বঙ্গভাষার পুষ্টি ও ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক আলোচনা করিয়াছেন। রেভারেণ্ড জেম্স্ লং ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত তদীয় "Descriptive Catalogue of Bengali Works" পুস্তিকায় তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ৬০ বৎসরে মুদ্রিত ১৪ শত বাঙ্গালা পুস্তক-পুস্তিকার এক তালিকা দিয়াছেন।

"এডুকেশন কৌন্সিল" মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রচারে তৎপর হইলেও দেশীয় শিক্ষা অর্থকরী না হওয়ায় ছাত্রগণ বাধ্য হইয়াই মাতৃভাষা অপেক্ষা রাজভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভে সমধিক উৎসাহী হইয়া উঠে—যাহারা ইংরাজীতে কৃতবিদ্য হইত তাঁহারা সরকারী পদমর্য্যাদা অর্জ্জনে সমর্থও হইত। কিন্তু তখনও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং গ্রাজুয়েটের জোয়ারও আসে নাই।

১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে সর্ব্বশেষ সনন্দ পান তাহার নির্দ্দেশক্রমে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা উচ্চ রাজকার্য্যে (Civil Service) ভারতীয় কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে বিলাত হইতে "বোর্ড অব কণ্ট্রোল"এর সভাপতি সার চার্লস উড ভারতের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারল লর্ড ডালহৌসীর নিকট তাঁহার প্রসিদ্ধ "এডুকেশন ডেসপ্যাচ" প্রেরণ করিলে ভারত গবর্ণমেণ্ট তদনুযায়ী শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তন ও বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের উদ্যোগ করেন। (এই "ডেসপ্যাচ" রচনায় আলেকজাণ্ডার ডাফ্ এর হাত ছিল।) উচ্চশ্রেণীর লোককে শিক্ষাদান করিলে, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাঁহাদিগের সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমশ শিক্ষিত হইয়া উঠিবে—পূর্ব্বে এইরূপ এক মতবাদ (Filtration Theory) প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হওয়ায় উক্ত "ডেসপ্যাচে" জনসাধারণের উচ্চনিম্ন সকল স্তরে শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে সরকারী দায়িত্বের কথা সবিশেষ আলোচিত হয়। এই "ডেসপ্যাচ" হস্তগত হওয়ার পর গভর্ণমেণ্ট দেশের সর্ব্বত্র বাঙ্গালা ও ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপনে বদ্ধ পরিকর হইলেন—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহায়তায় স্থানে স্থানে বহু বালিকা-বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারকল্পে ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে "কৌন্সিল অব এডুকেশন"এর স্থানে বর্ত্তমান "পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন" স্থাপিত হয়। (বর্ত্তমান ডিরেক্টরের পদসৃষ্টিও এই সময় হয় এবং এই সময় হইতেই সরকারী সাহায্য বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহেও দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।) ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে গবর্ণর জেনারল লর্ড ক্যানিং এর শাসনকালে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি ইংরাজী শিক্ষার প্রসার ও প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। "থিওসফিক্যাল সোসাইটী"র প্রতিষ্ঠাতা কর্ণেল এইচ্ এস্ অলকট এর ভাষায় Bad Aryans (B. A.) ও Mad Aryans (M. A.) এর ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব ঘটিতে

লাগিল—যে কয়টী উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা গেল তাহা এই উক্তি সপ্রমাণই করিল (exceptions prove the rule)।

১৮৭৯ খৃঃ অব্দে লর্ড লিটন "স্যাটুটারী সিভিল সার্ভিস" প্রবর্ত্তন করিয়া একশ্রেণীর উচ্চবেতনভোগী ভারতীয় রাজকর্ম্মচারী সৃষ্টি করিলে দেশীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ অধিকতর বৃদ্ধি পায়। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে দেশীয় বিদ্যালয় সমূহে সাহায্য দান, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিবিধান এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা প্রচার প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যে শিক্ষা কমিশন বসে, তাহার সভাপতি ডক্টর সার উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে বলেন—"এই শিক্ষায় যে ধর্ম্মহীন, শৃঙ্খলাহীন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইতেছে তাহার পরিণাম কি? সরকার কয়জনকে তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত পদ দিতে পারিবেন?" সরকারী চাকরীর ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ জানিয়াও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তৎপ্রতি আশক্তির অসদ্ভাব ঘটে নাই, কেননা সেদিনও যুক্ত প্রদেশের বেকার সমস্যা সমাধান কল্পে গঠিত সপ্রু কমিটী তাঁহাদিগের রিপোর্টে বলিয়াছেন—"The vast majority of the graduates of our Universities, and their parents shave the feeling, aim at securing some appointment or other in Government Service. It is only when they fail to secure Government appointments that they think either of private service or some other profession."

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেও যেমন, পরেও তেমন দেশীয় ভাষার প্রতি ইংরাজী শিক্ষিতদিগের অনাদর ও অবহেলা পর্ব্বত প্রমাণ হইয়া উঠিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ১৫ বৎসর পরে ১৮৭২ খৃঃ অব্দে বঙ্কিমচন্দ্র তৎপ্রতিষ্ঠিত "বঙ্গদর্শন" পত্রের 'সূচনা'য় লিখিয়াছেন—"ইংরাজপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষার লেখক মাত্রেই হয়ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশলশূন্য, নয়ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয় অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়া মাত্র; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি?.....লেখাপড়ার কথা দূরে থাক, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেক্চার, এড্রেস, প্রোসিডিংস সমুদয় ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথন ইংরাজিতেই হয়, কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে।......ইংরাজি একে রাজভাষা, অর্থোপার্জ্জনের ভাষা, তাহা আবার বহু বিদ্যার আধার, এক্ষণে আমাদের জ্ঞানোপার্জ্জনের একমাত্র সোপান; এবং বাঙ্গালীরা তাহার আশৈশব অনুশীলন করিয়া দ্বিতীয় মাতৃভাষার স্থলভুক্ত করিয়াছেন। বিশেষ ইংরাজিতে না বলিলে ইংরাজ বুঝে না; ইংরাজে না বুঝিলে ইংরাজের নিকট মান মর্য্যাদা হয় না; ইংরাজের কাছে মান মর্য্যাদা না থাকিলে কোথাও থাকে না, অথবা থাকা না থাকা সমান। ইংরাজ যাহা না শুনিল, সে অরণ্যে রোদন, ইংরাজ যাহা না দেখিল, তাহা ভস্মে ঘৃত।...আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্ম স্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না।...নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহনীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।"

কিন্তু যাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে ইহা উক্ত হইয়াছিল তাঁহারা ইহাতে কর্ণপাত করেন নাই, কেননা ১৮৯১ খৃঃ অব্দে—

অর্থাৎ বঙ্কিমের "বঙ্গদর্শন"এর প্রায় বিশ বৎসর পরে—"সাধনা" পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যখনই ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তখনি বাঙ্গালা ভাষা অবলম্বন করিতে তাঁহাদের একটা কাতরতা জন্মে। কিন্তু হায়, অভিমানিনী ভাষা, সে কোথায়! সে কি এত দীর্ঘকাল অবহেলার পর মুহূর্ত্তের আহ্বানে অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য, তাহার সমস্ত গৌরব লইয়া একজন শিক্ষাভিমানী গর্ব্বোদ্ধত পুরুষের নিকট আত্মসমর্পন করিবে? হে সুশিক্ষিত, হে আর্য্য—তুমি কি আমাদের এই সুকুমারী সুকোমলা তরুণী ভাষার মর্য্যাদা জান! ইহার কটাক্ষে যে উজ্জ্বল হাস্য, যে অশ্রুম্লান করুণা, যে প্রখর তেজ-স্ফুলিঙ্গ, যে স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি স্ফুরিত হয়, তাহার মর্ম্ম কি কখনও বুঝিয়াছ, হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছ? তুমি মনে কর, আমি যখন মিল, স্পেন্সার পড়িয়াছি, সব কটা পাশ করিয়াছি, আমি যখন এমন একজন স্বাধীন চিন্তাশীল মেধাবী যুবা পুরুষ, যখন হতভাগ্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাগণ আপন কুমারী কন্যা এবং যথাসর্ব্বস্ব লইয়া আমার দ্বারে আসিয়া সাধ্যসাধনা করিতেছে, তখন ঐ অশিক্ষিত সামান্য লোকদিগের ঘরের তুচ্ছ ভাষাটার উচিত ছিল, আমার ইঙ্গিতমাত্রে আমার শরণাপন্ন হইয়া কৃতকৃতার্থ হওয়া। আমি যে ইংরাজী পড়িয়া বাঙ্গালা লিখি ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালার সৌভাগ্য কি হইতে পারে?"

১৮৪০খৃঃ অব্দেই উইলিয়ম ইয়েট্স্ বলিয়াছেন—"প্রকৃত বাঙ্গালা অতি সম্ভ্রান্ত ভাষা। এমন কোন ভাব নাই যাহা সত্য সত্যই তেজের সহিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করা না যায়।" কিন্তু মাইকেলের ন্যায় প্রতিভাশালী কবিও তাহা তখন শুনেন নাই। চার্লস্ হে ক্যামেরণ, সার হার্ব্বাট ম্যাডক, জন ইলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন, বীম্স্ প্রভৃতির কথায়ও লোকে বড় কাণ দেন নাই। ইংরাজের কথাই যখন সহজে কর্ণে প্রবেশ করিল না তখন ঈশ্বর গুপ্ত, অক্ষয় দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কথাই বা সহজে কাণে ঢুকিবে কেন? এ সব তো শতাব্দী অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের কথা—ইহার অনেক পরেও তো ইংরাজী কবিতা রচনা করিয়া (প্রথমে বাঙ্গালায় লিখিয়া পরে ইংরাজীতে অনুবাদ নহে) "Nightingale of the East" ও "Nobel Prize Winner in Literature" হইবার অভিলাষ দেখা গিয়াছে। এত দীর্ঘকাল পরেও কি দেশ পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষার মোহমুক্ত হইয়া উঠিয়াছে? ইংরাজী ভাষা পরদেশীয় ভাষা, সকলের পক্ষে ইহা আয়ত্ত করাও সহজসাধ্য নহে, কিন্তু দেশের সকল ব্যক্তি যাহাতে এই ভাষায় কার্য্যোপযোগী শিক্ষালাভ করিতে পারে তজ্জন্য সম্প্রতি "Basic English" প্রবর্ত্তনের রব উঠিয়াছে। এমন কি, ইংরাজীকে "রাষ্ট্রভাষা"রূপে গ্রহণ করার প্রস্তাবও শুনা গিয়াছে।

যে পাশ্চাত্যশিক্ষার জন্য দেশ এত আগ্রহান্বিত সে সম্বন্ধে ইংরাজদিগের অভিমত কি? ১৯১৩ খৃঃ অব্দে ভারতীয় শিল্পভক্ত সার জর্জ্জ বার্ডউড বলিয়াছেন—"European system of education, although excellent for instruction, is deficient as a means of mental discipline, and altogether defective in its appliances of the promotion of culture; and seek moreover to impose it on their Indian proteges and friends, not as super-added accomplishment, but in substitution of their own traditional (in the case of Hindus immemorial) and idiosyncratic literature, arts and religions, in other words to the destruction of the souls of the Hindus and Muslims of India." ডক্টর অ্যানি বেশান্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ১৯২৪-২৫ খৃঃ অব্দের "কমলা লেকচার"এ বলিয়াছিলেন—"Nothing so denationalizes a people, as the imposition upon them of foreign tongue dominating their life and thoughts." ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত রাজনারায়ণ বসুর "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে উদ্ধৃত মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত রিচার্ড সাহেবের বক্তৃতার একটী উক্তি—"Gentlemen! let me say there is but little hope of a nation until it has some sense of nationality, and nationality without a natio-

nal language, which is the free spontaneous out-come of the national mind, is a delusion. Probably the best index to the growth of a people is the growth and development of its language. Moreover there is an interchange of cause and effect; help a people to develop their language in accordance with its own laws and you help them to acquire freedom of thought, and so gradually the other habits which are necessary to the formation of national character. I appeal then to your patriotism, I appeal to you on behalf of your mother tongue; it is well worthy your regard."

এক জাতির মাতৃভাষা অপর জাতির মজ্জাগত করানর অপচেষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ বিলাতী তলোয়ারের খাপে দেশী খাঁড়া ভরিবার কসরৎ বলিয়াছেন, ইহার যুক্তি অসীম। তিনি আরও বলিয়াছেন--ভিন্ন জাতির ভাষা আয়ত্ত করিতে শিক্ষার্থীদিগকে বীর হনুমানের গন্ধমাদন বহন করিবার মত বিপুল শ্রম করিতে হয়; অথচ প্রকাণ্ড গন্ধমাদন বহন করিবার বিরাট শ্রম স্বীকার করিয়াও ঐ কার্য্যের মূল উদ্দেশ্য বিশল্যকরণীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে না। এই উপমার ভাবার্থ—"ভাষা আয়ত্ত না হওয়ায় গোটা ইংরেজী কেতাব গলাধঃকরণ করিতে হয়।" সাত হাজার মাইল দূরবর্ত্তী যে জাতির শিক্ষা-সভ্যতা, সংস্কার-সমাজ দর্শন বিকাশের সহিত ভারতের সনাতন তন্ত্রমন্ত্রের কোনও যোগাযোগ নাই, তাহার ভাষা শিক্ষা করার পণ্ডশ্রম আর কতদিন এই ভাবে চলিবে ?

আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছি ভাষার সহিত জাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা ওতপ্রোত থাকে। এখন প্রশ্ন—বিজাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা কি আমাদিগের পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্তিমার্গের পথপ্রদর্শক হইতেছে, না জাতীয় আত্মহত্যার পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছে ? *

অবশ্য ইংরাজ বা তাহার ভাষার উপর আমাদের কোনও দ্বেষ নাই। ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা উদাসীন বা বোধহীন নহি। যে কথা বঙ্কিম অর্দ্ধ শতাব্দীরও পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন তাহা আজও বলা চলে—"আমাদিগের এমন অনেকগুলি কথা আছে, যাহা রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইবে। সে সকল কথা ইংরাজিতেই বক্তব্য। এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে; সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সকল কথা ইংরাজিতে না বলিলে, সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন ? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, এক পরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই ! এই মতৈক্য, এক পরামর্শিত্ব, একোদ্যম, কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয়, কেন না, এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী, ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে। অতএব যতদূর ইংরাজি চলা আবশ্যক, ততদূর চলুক।"

কিন্তু ইহা চিরকাল চলিতে পারে না—ইংরাজ যে চিরকাল আমাদের রাজা থাকিবেন তাহাও যেরূপ সম্ভব নহে, আমাদিগের চিরকাল ইংরাজীভাষার দাসত্ব করিতে হইবে ইহাও তদ্রূপ সম্ভব নহে। এই রাষ্ট্র জাগরণের যুগে বিশ্বালয়সমূহকে গ্রহণ করিতেই হইবে। "Some day, perhaps, the man in power will arise, who is not hidebound by the University traditions of his youth, who will perceive that an Indian University deserving of the name must devote itself to the development of Indian thought and learning, and who will care enough for true higher education to establish 'a real University in India'."—ভিনসেন্ট স্মিথের এ স্বপ্ন সিদ্ধ হইতে এখনও কত বিলম্ব ? মনস্বী কার্লাইলের কথা এই সূত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে—"A nation lives by its own culture and civilization. If that culture, that civilization be destroyed the nation also dies out."

* জাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা সংরক্ষণের গুরুভার বিশ-

জাতীয়তার পথে জয়যাত্রার শুভমুহূর্ত্তে ভারতীয় ভাবধারার সহিত সুপরিচিত হইতে না পারিলে জাতীয় সত্তা চিরস্থায়ী হইবে না। কামালপাশা নব্য তুরস্কের রাষ্ট্রকর্ণধার হইবার পূর্ব্বে তুরস্কে আরবী ভাষাই প্রচলিত ছিল, কিন্তু জাতীয় ভাষা ব্যতিরেকে যে জাতীয় অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই তিনি বিশুদ্ধ তুর্কী ভাষার পুনঃ প্রচলন করিয়াছেন। জার্ম্মাণ রাষ্ট্রধুরন্ধর অ্যাডল্‌ফ্‌ হিটলার ও আইরিশ রাষ্ট্রপতি ডি ভ্যালেরা স্ব স্ব জাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে কিরূপ সচেষ্ট তাহা আর কাহারও অবিদিত নহে। এই আদেশ অনুকরণীয়। দেশ স্বাধীন হইবার পূর্ব্বেই স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। ভারতের রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজন অপরিহার্য্য। এই রাষ্ট্রভাষা জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত। সম্প্রতি ভাষা হিসাবে প্রদেশ গঠনের কথা উঠিয়াছে—কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার পথে অন্তরায় অনেক। বর্ত্তমানে ভারতে বহু ভাষা ও উপভাষা প্রচলিত—ইহাদের মধ্যে ক'একটী সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত উৎপন্ন, তাহা ইহার সহিত সংস্কৃত ভাষায় যতটা সম্পর্ক ততটা আর কোনও ভাষার নহে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সংস্কৃতই ভারতের সর্ব্বত্র অধীত কথিত ও লিখিত হইত। ভারতীয় আর্য্য সংস্কৃতি ও সাধনা ভারতীয় দর্শন বিজ্ঞান বুদ্ধি প্রতিভার সংস্কৃতই অনন্ত আধার ছিল। এই সুপ্রাচীন ভাষার প্রভাব ভারতের সর্ব্বত্র অদ্যাবধি বিদ্যমান। সংস্কৃত বর্ত্তমানে আমাদের মাতৃভাষা না হউক, ইহা আমাদের মাতৃভাষার জননী বটে। সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন ও অধ্যাপনা আজ প্রতীচ্য মহাদেশেও হইতেছে—সেই সঙ্গে বঙ্গভাষারও সমাদর হইতেছে। ভারতে প্রচলিত সমস্ত ভাষার সহিত তুলনায় বঙ্গভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ব্যক্তির কথিত ভাষা—এই ভাষায় যে সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে তাহার বয়স সহস্র বৎসর মাত্র হইলেও, সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন আর কোনও ভাষায় গ্রথিত সাহিত্য এ পর্য্যন্ত ইহার সহিত তুলনীয় উৎকর্ষ অর্জ্জন করিতে পারে নাই। বঙ্গভাষা প্রাদেশিক ভাষা হইলেও ইহা "রাষ্ট্রভাষা"র পদ-মর্য্যাদালাভের সম্পূর্ণ যোগ্য। ইহা যে কেবল আমরা বাঙ্গালী বলিয়া বঙ্গভাষার প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগের আতিশয্য বা অন্যান্য ভাষার প্রতি অহেতুক বিতৃষ্ণা বশতঃ বলিতেছি তাহা নহে—নানা গুরুতর কারণেই ইহা "রাষ্ট্র-ভাষা" হইবার যোগ্য। অধুনা যে হিন্দী বা উর্দ্দুকে "রাষ্ট্র-ভাষা" করিবার বিপুল আয়োজন চলিতেছে তাহা কোন ক্রমেই সমর্থনীয় নহে। "রাষ্ট্রভাষা" পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন—ঐ দুই ভাষা আদৌ তাহা নহে। হিন্দী বা উর্দ্দু অপেক্ষা বঙ্গভাষা ভারতে সমধিক ব্যবহৃত। ভারতীয় ভাবধারা বঙ্গভাষার যতটা ধাতুগত—হিন্দীর ততটা নহে, উর্দ্দুর তো আদৌ নহে—এই হিসাবে ইহারা "রাষ্ট্রভাষা" হইতেই পারে না। তদ্ভিন্ন ভাষার ওজস্বিতা ও তেজস্বিতা ঐশ্বর্য্যসমৃদ্ধি, সর্ব্ববিধ ভাব প্রকাশোপযোগী শব্দসম্পদ ও শ্রুতিমাধুর্য্য প্রভৃতির দিক দিয়া বিচার করিলেও ভারতের সমস্ত প্রচলিত ভাষার মধ্যে একমাত্র বঙ্গভাষাই "রাষ্ট্র-ভাষা"র পদবী লাভের যুক্তি সঙ্গত অধিকারী। কিন্তু চিত্তের সঙ্কীর্ণতা অথবা সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি বশতঃ হিন্দী ও উর্দ্দুভাষা বহু বিজ্ঞ ব্যক্তিও ইহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন। "রাষ্ট্রভাষা" সম্বন্ধে ইহার অধিক আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক মনে করিয়া আমরা ক্ষান্ত হইলাম! রাজভাষার দাস্য করিতে যাঁহারা এখনও ইতস্ততঃ করেন না, তাঁহাদিগকে কেবল ডানিয়েল ওয়েবষ্টারএর ভাষায় একটি কথা বলিয়া যাই—"Energy of mind, genius, power, wheresoever it exists may speak out in any tongue, and the world will hear it."

শ্রীকমলাকান্ত বসু

অপলাষিকা

শ্রীষষ্ঠীধন সেনগুপ্ত

ওগো যৌবনা ! ভাসো কেন আঁখি নীরে,
মিলনের এই শুভ উৎসব সাঁঝে ;
কি ব্যথা বেদনা রয়েছে তোমারে ঘিরে
যৌবনময়ী তুমি কেন দীন সাজে ?
এ মিলন ক্ষণে আস নাই কেন বসি,
কেন চলে গেছো বেদনায় নিঃশ্বসি,
নয়নের জলে ঝরিছে রক্তকণা
অনুপস্থিতা কেন এই শুভ কাজে ?
তুমি যে কিশোরী, বন্ধ্যা অলক্ষণা
তাই বুঝি নাই এ শুভ উৎসব মাঝে ?

কার তরে স্নেহ বর্ত্তিকা জ্বাল রাখি
স্নেহ বুভুক্ষু ব্যথা হিন্দোল্ বুকে ?
চঞ্চল শিশু হাতে ধুলো বালি মাখি
আদর চিহ্ন আঁকেনি তোমার মুখে।
গহন-নিশীথে তৃষিত নয়ন কোণে,
অনাগত কত শিশু সুখ জ্বাল্ বোনে,
কত শিশু আসি ভরায় তোমায় নীড়
অধীর চরণে আসে তব অভিমুখে ;
ভেঙ্গে যায় যবে স্বপন শিশুর ভীড়
ভরে তব মন গভীর নিরাশ দুখে।

অশ্রু নয়না ! যৌবন তনু ভরি
স্নেহ মধু বৃথা জমাও মর্ম্মতলে ;
আসিল না শিশু স্বপন মূরতি ধরি'
মর্ম্মের মধু প্রকাশি' অশ্রু জলে।
কেমনে আঁকিবে তব মরমের ছবি,
তোমার ব্যথায় আমি যে ব্যথিত কবি,
অনুপম দেহ নামে বিস্মৃতি ছায়া,
হাসি সঞ্চয় কিছু বাঁধিলে কি অঞ্চলে ?
হের শিশুদের উচ্ছল মায়া
বাতায়ন হতে উৎসব দেখা ছলে।

ছায়াপট

বাণীনাথ

পথিক :

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—চারু রায়
চিত্র-শিল্পী—অজয় কর
শব্দ-যন্ত্রী—গৌর দাস
সুর-শিল্পী—হিমাংশু দত্ত (সুরসাগর)
কাহিনী—মণি ঘোষ

চরিত্রলিপি :

রেবা—লীলা হালদার
নন্দা—রমলা দেবী
জীবন—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
অবনী—ভোলা মুখার্জ্জি (এঃ)
জামাইবাবু—সত্য মুখার্জ্জি

কিছুদিন আগে ইন্দ্র মুভিটোনের নূতন অবদান 'পথিক' উত্তরা চিত্র-গৃহে মুক্তিলাভ ক'রেছে। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন যশস্বী শিল্পী-পরিচালক চারু রায়। আধুনিক সমাজের ছেলেমেয়েদের কেন্দ্র ক'রে পথিক চিত্রের চিত্রনাট্য রচিত হ'য়েছে। গ্রামের তরুণ জমিদার জীবন সহরের একঘেয়ে জীবন এবং বিশেষ করে নব্য মেয়েদের উপর বীতশ্রদ্ধা বশতঃ নিজ পল্লীগ্রামে বাস করে। পিতৃহীনা গাঁয়ের মেয়ে নন্দাকে সে ভালবাসে কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে তার মানসপটে উদয় হ'লো রেবা—সহরের একটি আধুনিক মেয়ে। রেবা তার বন্ধু অবনীর সহিত বেড়াতে আসে এই পল্লীর পথে। তাদের মোটরের কল বিগড়ে যায় এবং আশ্চর্য্য ভাবে রেবার সঙ্গে জীবনের পরিচয় ঘটে। জীবন ও নন্দার সহজ মেলামেশি—গাঁয়ের মাতব্বররা খুব সুনজরে দেখল না। চক্রান্ত করে একদিন রাত্রে এঁরা নন্দার গৃহে আগুন লাগিয়ে দিল। তার ফলে নন্দার মা নন্দাকে নিয়ে গ্রাম ত্যাগ ক'রে চলে গেল; কিন্তু জীবন নন্দাকে ভুল বুঝল। নন্দার স্মৃতি মন হ'তে মুছে ফেলে সেখানে জীবন রেবাকে নূতন করে প্রতিষ্ঠিত করলে। আর রেবার মনও ধীরে ধীরে এই মিষ্টভাষী জীবনের প্রতি ক্রমশ আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ল। কিন্তু ঘটনার চক্রে পড়ে রেবার মনে পরিবর্ত্তন ঘটল যেদিন সে অবনীর লিখিত চিঠিখানি পেল। জীবনের প্রেম-নিবেদনকে উপেক্ষা ক'রে সে অবনীকে স্বামীরূপে গ্রহণ করলে। আর জীবন অকস্মাৎ এক রেল ষ্টেশনে হারান প্রিয়তমা নন্দাকে খুঁজে পেল। ছবিখানির এইখানেই শেষ।

অতি মামুলি ধরণের কথা কাহিনী—কোন এক অখ্যাত লেখকের কাহিনীকে চারু রায় ছবির ভাষায় রূপালী পর্দায় রূপ দিয়েছেন। ইতিপূর্ব্বে বিচিত্রার মারফতে আমরা বহু বার অভিজ্ঞ চিত্র পরিচালকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে, চিত্রনোপযোগী নামজাদা লেখকদের বই অবলম্বনে যেন চিত্র নির্ম্মিত হয়। তাতে পরিচালকদের চিত্রনাট্য সম্বন্ধে ততখানি মাথা ঘামাতে হয় না এবং সেই সঙ্গে এই দুর্দিনে ষ্টুডিয়োর কর্ণধারগণও লাভবান হ'তে পারেন। পথিক চিত্র সেই দিক দিয়ে আমাদের হতাশ করেছে।

সমজদার দর্শকদের অন্তরে প্রবেশ করতে হ'লে চিত্রনাট্যকারের যে শিল্প প্রতিভা থাকা দরকার পথিক চিত্রে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। একঘেয়ে কাহিনীকে চিত্রনোপযোগী ক'রতে পরিচালক চারু রায়ের কতখানি হাত ছিল জানি না, কিন্তু গল্পের দিক দিয়ে যত দোষ ত্রুটি আছে সব আলো ও অন্ধকারে পর্দায় রূপ নিয়েছে। পরিচালকের দোষ ও অজ্ঞতা মার্জ্জনা করা যায় কিন্তু মূল কাহিনী বাজে হ'লে ভাল সেট ও সাজসরঞ্জাম দিয়ে কাউকে ভুলিয়ে রাখা যায় না।

পথিক ছবির প্রস্তাবনা অত্যন্ত দীর্ঘ। জীবন ও রেবা—এই দু'টি সুচিত্রিতের গৃহের মধ্যেই ছবির যা কিছু—তাতে

চোখকে পীড়া দেয় ও ছবি জীবন্ত হোয়ে উঠে না। জীবন, নন্দা, রেবা ও অবনীকে ইচ্ছামত পরিচালক নাড়াচাড়া করেছেন এবং এই নাড়াচাড়ার দরুণ চরিত্রগুলির পরিণতি গল্পের সঙ্গে খাপ খায়নি। ছবির প্রারম্ভে রেবা ও অবনী যখন জীবনের গৃহে, তখন হঠাৎ উন্মুক্ত মাঠে জীবন ও নন্দার প্রেম অভিনয় সত্যিই বিস্ময়কর।

সাপুড়ে চিত্রের একটি দৃশ্যে ঝুমড়ো (পাহাড়ী) মৌটুসী (মেনকা) ও চন্দন (কানন)

তারপর ছবির ঘটনা সব চেয়ে কম, তাই চিত্রের গতি বাধা পেয়েছে প্রতি পদে।

পথিক ছবির suspenseএর অভাব এবং পাত্রপাত্রীদের কথা-বার্ত্তা উপভোগ্য নয়। বহু জায়গায় গানের সঙ্গে চিত্রের কোনো সংযোগ নেই। শেষ গানখানি একটি ছোট মেয়ের মুখ দিয়ে গাওয়ান হয়েছে কিন্তু ক্যামেরার চোখে ধুলি দিতে পারেনি যে, গানটি মেয়েটির নয়। Playback গান না মিলিয়ে এমনভাবে শোনানয় পরিচালকের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হয়নি। ছবির সেট ও সাজসরঞ্জাম চমৎকার। এই বিভাগে শিল্পী চারু রায় অশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

নন্দার ভূমিকায় রমলার অভিনয় খুব চিত্তাকর্ষক হ'য়েছে। এঁর ভবিষ্যত উজ্জ্বল সন্দেহ নেই। শীলা হালদারের রেবা মন্দ নয়। আরো উন্নত অভিনয় আমরা আশা করেছিলাম। ছবির নায়ক ধীরাজ মোটের ওপর ভাল অভিনয় করেছেন—কিন্তু অবনীর ভূমিকায় নবাগত ভোলা মুখার্জ্জির অভিনয়কে প্রশংসা করতে পারলাম না। জামাইবাবু বেশে সত্য মুখার্জ্জি হাসির খোরাক জুগিয়েছেন। পথিকে প্রায় ৯খানা গান আছে। রবীন্দ্রনাথের গানগুলি মন্দ হয়নি। আলোকশিল্পী ও শব্দযন্ত্রীর কাজ মন্দ নয়। সম্পাদনা চলনসই।

ষ্টুডিয়ো সংবাদ

নিউথিয়েটার্স

মুক্তিস্নান—ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে নীতিন বসুর নূতন হিন্দি ছবি দিল্লী রিগ্যাল সিনেমায় মুক্তিলাভ করেছে। লর্ড লিনলিথগোর পৌরহিত্যে ছবিখানির উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হয়। ভারতীয় চলচ্চিত্রে এ একটি স্মরনীয় ঘটনা। ছবিখানিতে যক্ষ্মা রোগ সম্বন্ধে নানা তথ্য প্রচারিত হয়েছে। সাইগল, লীলা দেশাই, জগদীশ, পৃথীরাজ প্রভৃতি নামজাদা হিন্দি আর্টিষ্ট এই চিত্রে আছেন।

কপালকুণ্ডলা—পরিচালক ফনী মজুমদার অসুস্থ থাকায় সুটিং কিছুদিন বন্ধ ছিল। নবকুমার চরিত্রে নাজাম ও কপালকুণ্ডলা বেশে মিস্ লীলা দেশাই বেশ সুন্দর অভিনয় কচ্ছেন। কপালকুণ্ডলার বহির্দৃশের সুটিং ফনী মজুমদার থাজুরি গ্রামে সম্পন্ন করবেন।

সাপুড়ে—দেবকী বসু সাপুড়েদের নিয়ে ব্যস্ত আছেন। সিনেমায় সাপের খেলা মন্দ নয় যদি পয়সা আসে।

আদিম কালের কথা নয়, আজও হয়ত তারা আছে—সেই আত্মভোলা সাপুড়েদের কথা সেলিউলয়েডে আশ্রয় নিয়েছে। মৌটুসী ও চন্দন—দুটি সুন্দর চরিত্রে অবতীর্ণা হয়েছেন মেনকা ও কানন। ষষ্টিবাবা হয়েছেন কৃষ্ণচন্দ্র দে। রতীন ব্যানার্জ্জি একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা দেবেন। সাপুড়ের ছবি প্রায় তৃতীয়াংশ হয়ে গেছে। সুন্দর সেট, সেকেলে গহনা, কাপড় এবং মনিবর্দ্ধনও খেমচাঁদের নৃত্য সাপুড়ে ছবির বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়।

নিউ থিয়েটার্সের আগামী সামাজিক চিত্র 'বড়দিদি'র একটি দৃশ্য

বড়দিদি—ছবিখানি এখন সম্পাদক সুবোধ মিত্রের ঘরে বন্দী। কবে মুক্তিলাভ ক'রবে এখনও রূপবাণী কর্ত্তৃপক্ষরা জানান নি।

রজত-জয়ন্তী—প্রমথেশ বড়ুয়ার নূতন বাংলা চিত্র 'রজত-জয়ন্তী'র সুটিং আরম্ভ হ'বে আগাগোড়া কমেডি। একখানা ভাল কমেডি ছবি আজ পর্য্যন্ত কোন ভারতীয় চিত্র প্রতিষ্ঠান দর্শকদের উপহার দেননি। সুতরাং কমেডি ছবি শুনে আমাদের উৎসাহ বেড়ে যাওয়া সম্ভবপর। রজত চরিত্রে প্রমথেশ বড়ুয়া স্বয়ং নামবেন আর জয়ন্তী হ'চ্ছেন মেনকা। চিত্রে রজতের ভাই বিশু হিসেবে দেখা দেবেন পাহাড়ী সান্যাল। দুটি মানিকজোড় শৈলেন চৌধুরী ও ইন্দু মুখার্জ্জি হ'বেন—একজন কৃপণ জমিদার বগলাচরণ (শৈলেন চৌধুরী) এবং আরেকজন জোচ্চর নাম নটরাজ (ইন্দু মুখার্জ্জি)। সিপ্রা অর্থাৎ মলিনা হ'চ্ছেন এই ধুরন্ধর নটরাজের মেয়ে। ভানু ব্যানার্জ্জি হ'বেন একজন বোগাস চিত্র পরিচালক।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া পিকচার্স—

যখের ধন—হেমেন রায়ের রোমাঞ্চকর কাহিনী 'যখের ধন' অবলম্বনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া পিকচার্সের নূতন বাংলা চিত্র প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মনে হয় মার্চ্চ মাসের শেষাশেষী উত্তরায় ছবিখানি মুক্তিলাভ করবে। পরিচালক হরি ভঞ্জের শিল্প প্রতিভার পরিচয় এই ছবিতে আমরা দেখতে পাব। সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর ক'রে ছবিখানি ইষ্ট ইণ্ডিয়া পিকচার্স দর্শকদের উপহার দেবার চেষ্টা ক'রছেন যাতে ফিল্ম মহলে চাঞ্চল্য আসতে পারে। নামজাদা সব আর্টিষ্টদের এই ছবিতে দেখতে

পাওয়া যাবে। দস্যু করালীর ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী, লেখা—লীলা হালদার, শম্ভু—রবি রায়, বিমল—জহর গাঙ্গুলী, কুমার—সুশীল রায়, আঙ্গুর—শিশুবালা প্রভৃতি আর্টিষ্টরা ছবিতে আত্মপ্রকাশ করবেন। একটা চলন্ত ট্রেণ লাইনচ্যুত হ'য়ে ধ্বংশ হ'য়ে গেল দস্যুদের চক্রান্তের ফলে এই দৃশ্যটি সুন্দরভাবে আলোক-শিল্পী যতীন দাস তুলেছেন। তা'ছাড়া

কলম্বিয়ার 'আই এ্যাম দি ল' চিত্রে এডওয়ার্ড জি রবিনসন্

সাজ সরঞ্জাম, নৃত্য-গীত প্রভৃতি যা কিছু আকর্ষণ 'যখের ধনে' তা দেখতে পাওয়া যাবে।

এদের পরবর্ত্তী বাংলা চিত্র হ'চ্ছে দেবযানী দেবযানী কাহিনীর রচয়িতা কৃষ্ণচন্দ্র দে। কর্ম্মবীর পি, কে, ব্যানার্জ্জির অধীনে ছবিখানি উঠবে।

ফিল্ম করপোরেসন অফ ইণ্ডিয়া—

রিক্তা—সুশীল মজুমদার এই চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম বাংলা ছবি 'রিক্তা'র পরিচালনা করছেন। তুলসী লাহিড়ী রিক্তার কাহিনী লিখেছেন। ছবিখানি হ'চ্ছে নায়িকা-প্রধান গল্প। রিক্তা একেবারে নূতন ধরণের গল্প। অহীন্দ্র চৌধুরী একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় নাবছেন। তা ছাড়া ছায়া দেবী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, মোহন ঘোষাল, সন্তোষ সিংহ, তুলসী লাহিড়ী, রমলা, দেববালা প্রভৃতি নামজাদা নট-নটীরা এই চিত্রে অভিনয় ক'রছেন। সম্প্রতি সুশীল মজুমদার, ছায়া দেবী প্রভৃতি আরোও অনেকে কাশী, গয়া ও গিরিডীতে ছবির কাজে গেছেন। ছবির বহির্দৃশ্য যে খুব ভাল হ'বে সন্দেহ নেই। ক্যামেরাম্যান হ'য়েছেন মিষ্টার সেন গুপ্ত, সুর সংযোজনা ক'রছেন বিখ্যাত সুরশিল্পী ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়।

দেবদত্ত ফিল্মস্—

রুক্মিনী-হরণ—বহুদিন পরে দেবদত্ত ফিল্মস্ চিত্র নির্ম্মাণ কাজে আবার ব্রতী হ'য়েছেন। গোরা এই প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ ও শেষ চিত্র হ'য়েছিল। নূতন টেকনিশিয়ানদের নিয়ে পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় কাজে নেবেছেন। অভিজ্ঞ লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র 'রুক্মিনী-হরণ' ছবির পাত্রপাত্রীদের কথা জোগাবেন। চিত্র-নাট্যটি যে ভালই হ'বে এ আশা করা অন্যায় হ'বে না। 'রুক্মিনী-হরণ' চিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরী, মোহন ঘোষাল, জহর গাঙ্গুলি,

কলম্বিয়ার 'দি গ্ল্যাডিয়েটর' চিত্রে জো ই ব্রাউন

...বালা, পান্না প্রভৃতি আত্মপ্রকাশ করবেন। মিস্ প্রতিমা দাসগুপ্তা রুক্মিনী-হরণ চিত্রে চিত্রার ভূমিকায় নাবছেন। গোরা চিত্রের ললিতার চরিত্রে মিস্ দাসগুপ্তার অপূর্ব্ব অভিনয়-নৈপুণ্য সকলের স্মরণ আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি লণ্ডনের একটি বিখ্যাত ষ্টুডিয়োতে ফিল্ম টেক্‌নিক ও অভিনয় বিষয়ে শিক্ষানবীশ ছিলেন।

রাধা ফিল্ম কোম্পানী—

নর-নারায়ণ—পরিচালক জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জির পরিচালনায় ছবিখানির প্রায় অর্দ্ধেক তোলা হয়েছে। বহু নট-নটীর মিলন ঘটেছে এই ছবিতে। সব দিক দিয়ে যাতে একটি সর্ব্বাঙ্গীন চিত্র নির্ম্মিত হয় সে বিষয়ে পরিচালকের চেষ্টা ও যত্নের ক্রটি নেই। পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচিত হ'য়েছে নিম্নলিখিতরূপ। সত্যভামা—শীলা হালদার, জাম্বুবতী—মিস্ রেণু, জয়ন্তী—রাণীবালা, সত্যজীৎ—অহীন্দ্র চৌধুরী, অক্রুর—জহর গাঙ্গুলী, ও জাম্বুবান—তুলসী চক্রবর্ত্তী।

বাণীনাথ

উপেক্ষা

শ্রীমোহিনীমোহন পাল

অনেক দিন পরে তার সঙ্গে আমার দেখা।

ক'দিন ধরে বুকের ডান দিকটায় একটা ব্যথা পাচ্ছিলুম। ভেতরটা কে যেন নাড়া দিচ্ছে, চিড় খাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে—দেহ-যন্ত্রের কোন্ অংশটা বিকল হবার ইঙ্গিত দিচ্ছে। তাই বাস্‌এ ক'রে চ'লেছিলুম মেডিক্যাল কলেজ।

পিছনে অনেকক্ষণ হ'তে খুক্ খুকে কাশির শব্দ আসছিল। জোরে নয়, অতি ধীরে। বুক থেকে বেরুচ্ছিল যেন অতি ভয়ে ভয়ে—অতি সন্তর্পনে। কৌতূহল হলো। পিছন ফিরে তাকাতেই যে-মেয়েটির সঙ্গে চোখ মিললো, সে মৃদু হেসে উঠলো। পরিচিত হাসি। তার হাসি ফিরিয়ে দিয়ে বললুন, "কেমন আছেন?"

সে বললে, "ভালোই আছি।"

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার পাশে এতক্ষণ নীরবে বসেছিলেন। এবার বলে উঠলেন, "কে? হীরেনবাবু না?"

আমি হেসে জবাব দিলুম, "যাক্, তা'হলে চিনতে পেরেছেন। যাবেন কোথা?"

"যাচ্ছি একবার মেডিক্যাল কলেজ।"

আবার চুপচাপ। বাসএর অন্য যাত্রীরা আমাদের দিকে তাকায়। কন্‌ডাক্‌টর হেঁকে বলে,—"কলেজ স্কোয়ার।"

বাস থামে। ধীরে ধীরে নামি। এইটুকু আসতেই ঝাঁকানিতে বুকের ভেতর খিচ্ খিচ্ করতে থাকে!

চেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের বারান্দার এক ধারে তাকে একলা দেখলুম। এক বছর পরে আমাদের পরস্পরের এই সাক্ষাৎ! ওর মুখের কিছুই বদল হয়নি। সেই ছেলেমানুষি ভাব, সেই চঞ্চলতা, অকারণে হেসে-ওঠা, ওর খুক্ খুকে কাশির মধ্যে জীবনী শক্তির পরিচয় দিচ্ছে। ওর সারা অঙ্গে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে শাড়ী পরবার ধরণ, আল্‌গা খোঁপাকে ঘাড়ের ওপর সাজান, ঠোঁটের কোণে ছুরীর তীক্ষ্ণ ফলার মতো ওর সেই বাঁকা হাসি—ওকে বাইরে থেকে বেশ সচল দেখায়। ওর নাম চপলা।

ওর কাছে আসতে ও' আমার দিকে ফিরে বললে, "আপনি এখানে?"

আমি হেসে বললুম, "কেন, এখানে কি আসতে নেই?"

"যারা আসে তারা অভাগা, হয়ত আমারই মতো—জেলযাত্রী। বারে বারে ফিরে ফিরে আবার এখানে আসে।" ওর মুখে আনন্দের জ্যোতি নিভে যায়। তার মাঝে ওর হাসি খুবই ম্লান দেখায়।

আমি বললুম, "আমিও তাদেরই একজন, এসেছি বুকের ব্যথা নিয়ে। তাই দেখাতে আসা।"

"সে-কি! আমাদের স্যানাটোরিয়ামে আপনি ত' ছিলেন সকলের চেয়ে স্বাস্থ্যবান—আপনার ও' সব কিছু নয়।"

"না হলেই ভাল। স্যানাটোরিয়াম থেকে এসে একবছর ত' ছিলুম ভাল। তারপর কিছুদিন থেকে বুকের ভেতর কি যেন গুমরে উঠছে। ভাবলুম দেখিয়ে আসি—সন্দেহ ঘুচে যাক্।"

দাঁড়িয়ে থেকে কথা এগোয় না। হস্‌পিটালের সকলেই ব্যস্ত—ডাক্তার থেকে চাপরাশী পর্য্যন্ত। রোগীদের ক্লান্ত দৃষ্টি ও শুষ্ক মুখের মধ্যে যে দু' একটি সতেজ মুখ দেখি—চপলা সেই শ্রেণীর। রোগকে হেসে উড়িয়ে দেয়ার দুঃসাহসিকতা ওর অপরিসীম—এটা ওর স্পর্দ্ধা। হয়ত এজন্যই জীবনকে লঘু করবার বা নিজেকে সস্তা ক'রে তোলবার প্রয়াস দেখতে পাই। অদ্ভুত ওর কথা বলবার ও বলাবার ক্ষমতা। ওর উচ্ছল হাসির তরঙ্গের মাঝে সাবলীল দেহভঙ্গী বড় বেশি ব্যঞ্জক, বড় বেশি স্পষ্ট।

কথার স্রোতকে ঘুরিয়ে নিয়ে ও' বললে, "আপনি ত' বেশ লোক ! ওখান থেকে ফেরবার সময় কি বলেছিলেন ?"

"কি ?"

"বাঃ, এরই মধ্যে ভুলে গেলেন। যাক্‌, কবে আসছেন আমাদের বাড়ী ?"

"কি ক'রে বলি। সময় যে বড়ো অল্প ?"

"সময় অল্প নয়—আপনার ইচ্ছে নেই এই কথা বললেই ত' ফুরিয়ে যায়। আর আপনাকে কোন কথা বলি না।" শেষের কথায় ওর কণ্ঠে অভিমানের সুর ফুটে ওঠে।

"আচ্ছা যাবো একদিন। আপনার বাবা কোথায় গেলেন ?"

"ভেতরে ডাক্তারের সঙ্গে কথা কইতে গেছেন ঐ যে আসছেন এদিকে।"

আমি বললুম, "আমার কাজ এখনও বাকি। আমি চল্লুম।" এই ব'লে ভিতরের ঘরে দ্রুত পা চালিয়ে দিই।

মানুষের জীবনের আকাঙ্ক্ষা যেখানে অসীম, কর্ম্মের দ্রুততা যেখানে বন্ধনহীন, সৃষ্টির অপরিসীম আগ্রহে মন যেখানে শত ঔৎসুক্যে ভরা, সেখানেই অকর্ম্মণ্য দেহ তার প্রতিশোধ লয়, নিদারুণ নিষ্ঠুরতায় তাকে টুকরো টুকরো করে,—ব্যর্থতার বেদনায় চিত্তের সকল সম্ভাবনাকে যেন পরিহাস করতে থাকে। অন্তর চায় স্বচ্ছ সলিলা নদীর মতো অনাবিল আনন্দধারা, প্রাণ চায় সে আনন্দকে আপন সত্তার মধ্যে উপলব্ধি করবার, নব নব সৌন্দর্য্যের রসাস্বাদন করতে—কিন্তু বাইরেকার দেহই থেকে থেকে তাকে ব্যর্থ ক'রে দেয়, তাকে বিকচোন্মুখ হবার সুযোগ দেয় না। এটিই জীবনের মস্তো বড়ো ট্র্যাজেডি।

চপলার সঙ্গে যেটুকু সময় আমার মেশবার সুযোগ হয়েছিল, সে-সময়টা আমাদের দু'জনেরই পক্ষে সুখের ছিল না, হয়ত তা'তে কিছু সান্ত্বনা ছিল। পীড়িত দেহীর মনে সকল সময় বাইরেকার জিনিষের রসাস্বাদন করবার মতো অনুভূতি থাকে না, মনের চেয়ে রুগ্ন দেহের প্রতি দৃষ্টি থাকে বেশি। তাই আমাদের দু'জনের কথাবার্ত্তার মধ্যে পরস্পরের দৈহিক কুশলাদি প্রশ্নই হতো কিম্বা অনেক-এমন ছোট খাটো প্রশ্ন যার মধ্যে ছেলেমানুষির ভাবই থাকতো বেশি। এই স্বল্প পরিচয়ের মাঝে, ঐ ক'দিনের ক্ষুদ্র কথাবার্ত্তায় এইটুকুই জানতে পেরেছিলুম যে ওর চিত্ত আমার প্রতি সজাগ—কেন তা' জানি না। হয়ত উদ্‌ভ্রান্ত মনের ক্ষণিক এক চাঞ্চল্য, যা প্রকাশ পেতো ওর কথায়, ওর অকুণ্ঠ ব্যবহারে কিম্বা ওর সাবলীল হাসির অজস্র খুসির ধারাতে।

সেদিন ওদের বাড়ি গিয়েছিলুম। সহরতলির প্রান্তে ওদের বাড়ি—সামনে সরু গলি। এখানে নগরীর জন-কোলাহল নেই, তবে গৃহবাসীদের কলরব আছে।

দুপুরে ওদের বাড়ির দরজায় এলুম। একটি দশ এগারো বছরের ছেলে দরজা খুলে আমার চোখের ওপর সপ্রতিভ দৃষ্টি ফেলে সুধোলে, "কাকে খুঁজছেন আপনি ?"

সরল, সতেজ কণ্ঠস্বর। ওর টানা চোখের ঘন পক্ষের নীচে সুনিবিড় তারা মনে করিয়ে দিল চপলাকে। ভাবলুম, এ ভুল হ'বার নয়। আমার কি প্রয়োজন বলতে ও চঞ্চল হয়ে বললে, 'আপনি একটু দাঁড়ান।" এই ব'লে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। ওপরের জানালা একটু শব্দ ক'রে খুলে গেল। ওপরে তাকাতেই চপলার হাসিমুখ দেখলুম। ছেলেটি তখন নিচে এসে বলছে,—"আসুন, দিদি আপনাকে ডাকছে।"

ওপরের ছোট একটি ঘর। পূর্ব্বদিকে একজনের মতো একখানি খাট। পাশে ছোট একটা টেবিল, তাকে কতক-গুলো বই সাজান। চপলা ইজি চেয়ারে বসেছিল।

আমি ওর কাছে আসতে ও' বললে, "বসুন এখানে।" এই ব'লে ওর কাছের চৌকিটা আমায় দেখিয়ে দিল।

আমি সুধোলুম, "কেমন আছেন ?"

ওর সামনেই বসেছিলুম। আমার দিকে চেয়ে ও বললে, "ভাল আর কই ? কাল থেকে বুকের ব্যথাটা বেড়েছে।"

আমি বললুম, "সেদিন হসপিটাল গিয়েছিলেন—কি হ'লো তার ?"

"হ'বে আর কি ? বললে, আবার স্যানাটোরিয়ামে যাও। যাও বললেই ত হয় না—যাবার সামর্থ্য চাই।"

"কিন্তু কি ক'রে আপনার বাড়লো? যখন ফিরেছিলেন তখন ত' ভালোই ছিলেন। অন্য কিছু অনিয়ম না করলে বাড়বে কেন?"

চপলা সোজা হয়ে উঠে বসলো। ও' বলে উঠলো, "স্যানাটোরিয়ামে যা' করতুম, এখানেও তাই করি। এতেও যদি বাড়ে ত' বাড়ুক না, এর ত' একটা সীমা আছে। কিন্তু সেদিন আপনিও ত' হসপিটালে গিয়েছিলেন আমারই মতো?"

ওর শেষের কথাগুলির মধ্যে তীব্র শ্লেষের ইঙ্গিত। ওর কথার মধ্যে ধৈর্য্যের বাঁধন যত আল্‌গা, অন্যকে আঘাত করবার স্পৃহা ততোধিক প্রবল।

আমি হেসে বললুম, "আমি সেখানে যে সন্দেহ নিয়ে গিয়েছিলুম, তার অবসান হয়েছে। ডাক্তার পরীক্ষা করে' বলেছেন—"ও' কিছু নয়।"

ও' চুপ ক'রে রইলো অনেকক্ষণ। শীতের সূর্য্য পশ্চিমে হেলছে, ছায়া হচ্ছে দীর্ঘতর, বহুদূরে নীলাকাশে দু'টো চিল উড়ছে। অপরাহ্নের সূচনায় রাত্রির শৈত্যকে মনে পড়ছে।

দু'জনে এত কাছাকাছি বসে'। কিন্তু ও' যেন আমাকে কোন সুদূরে ঠেলে দিল, অন্ধকারের মাঝে—সংশয়ের দোলায়। এ রকম চুপ ক'রে বসে থাকা চলে না, আবার ছিন্ন কথার জালকে জোড়াও যায় না। মনে হয় বসে থাকাটাই অশোভন। উঠে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়ালুম।

চপলা এতক্ষণের পর বললে, "বসুন না হীরেন বাবু। আমাকে ভুল বুঝছেন কেন?"

ও' চেয়ার থেকে উঠে জানলার কাছে এলো—একেবারে আমার পাশে। ওর শাড়ীর অঞ্চল হাওয়ায় দুলে আমার গায়ে লাগলো। ওর কেশের মৃদু সৌগন্ধ্যের স্পর্শ, ওর দ্রুত শ্বাসের শব্দ পেলুম। একটু সরে গিয়ে বললুম, "আপনি আবার উঠলেন কেন? আমি বসছি।"

"না বসলে আমিও দাঁড়িয়ে থাকবো।"

"আঃ কি ছেলেমানুষি করছো? কেউ দেখলে কি ভাববে আমাদের?" আমার মুখ থেকে 'তুমি' বেরিয়ে পড়্‌লো।

'ও' আমার চোখে সুতীক্ষ্ণ হাসির ঝলক ফেলে বললে, "আমি ভয় করি না কারোকেই।"

খাদ্যপ্রাণ

মানুষের দেহে প্রতিক্ষণে যে ক্ষয় চলছে, তার পূরণের জন্য চাই যথোপযুক্ত আহার। তাই বলে কতকগুলো ফেন গালা ভাত, মশলাবহুল ডাল তরকারী কিম্বা ঝালবহুল শাক চরচড়ি খেলেই হয় না, ঘি, দুধ, মাখন প্রভৃতি স্নেহ জাতীয় পদার্থের প্রয়োজন রয়েছে, যাতে কি ভিটামিন "এ"র বৈশিষ্ট্য থাকে।

ওষুধ খাদ্যকে replace করতে পারে না কখনই। ওষুধের প্রয়োজন জীবনে কোথাও আসে, কিন্তু সেটা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত বা ক্ষণিক। মানুষের দেহকে পুষ্ট করে আহারই শেষ পর্য্যন্ত, ওষুধ একটি সহায়ক মাত্র হিসাবে আসতে পারে কোন কোন অবস্থায়।

বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মতে দেহ পুষ্টির জন্য ভিটামিন "এ"র বিশেষ প্রয়োজন। যে কয় প্রকার ভিটামিন আছে তার মধ্যে ভিটামিন "এ"ই শ্রেষ্ঠ এবং এ বস্তু মাছ, মাংস, ডাল প্রভৃতির মধ্যে পাওয়া যায় না, ঘি, দুধ প্রভৃতির মধ্যেই থাকে।

আজকের ভারতের গামা, হরবংশ সিং প্রভৃতি বলিষ্ঠ সংগ্রামপটু পুরুষ সিংহের কাছেই শুধু নয়, দুধ ঘিয়ের শ্রেষ্ঠতা সেকালে দেবাসুর সংগ্রামেও প্রমাণিত হয়েছিল। ক্ষীর সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত উঠেছিল, তা ত এই ঘৃতেরই রূপ কথা।

খাদ্যে ঘিয়ের ব্যবহার নানা প্রকার, কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য ঘিয়ের প্রকৃষ্ট ব্যবহার পাতে ঘি খাওয়ার। এই ঘি অতিরিক্ত গরম করে, খাদ্য প্রাণ নষ্ট করা হয় না, এবং যে ভাত ঘি দিয়ে খাওয়া হয়, তার জন্য মশলাও কম খাওয়া হয়।

ঘিয়ের যা গুণ, তা খাঁটী ঘিতেই সম্ভব বলা বাহুল্য। 'শ্রী' মার্কা ঘি যে বিশুদ্ধ তার পরিচয় এই অর্দ্ধ শতাব্দী দেশবাসী পেয়ে থাকবে- শ্রীঘৃতের টিনে ভারত গবর্ণমেণ্টের শুদ্ধতার চিহ্ন "এগ্‌মার্ক" Agmark শীল ও দেখতে পাবেন।

কী ওর দুঃসাহসিকতা! ওর পীড়িত দেহ মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করছে। ওর দেহের সঙ্গে মন হয়েছে অস্থির—বন্ধনের গ্রন্থিমোচনের স্পৃহা ওকে পাগল ক'রে তুলেছে।

আস্তে আস্তে চৌকি টেনে বসলুম।

ও' ইজিচেয়ারে বসে হেসে বললে, "কেমন হার হ'লো ত'? আর তুমি আমার চেয়ে কতোই বা বড়ো—বছর দুই বৈ-ত না?" ওর চোখ দুটি জল জল ক'রে উঠলো।

মনে মনে হাসলুম। বললুম, "পরাজয় স্বীকার করছি—এবার উঠতে হবে।"

"ওমা সে কি! না-না, আর একটু থাকো—একটু চা খেয়ে যেয়ো।"

"আমি ত' চা খাই না।"

ও' একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, "কবে আবার আসবে বল।"

আমি বললুম, "তার কি ঠিক আছে?"

ও' আমার দিকে ঝুঁকে এলো—একেবারে দেহের সান্নিধ্যে। চৌকির পাশে আমার ঝুলে পড়া হাতটা ওর নিজের দু' হাতে চেপে ধরলে। বাধা না দিয়ে ওর চোখের দিকে তাকালুম। ওর সারা মুখখানিতে বেদনার পরিস্ফুট ছাপ, ওর বড়ো বড়ো চোখের ক্ষুধিত দৃষ্টি—পিঞ্জরাবদ্ধ হিংস্র পশুর ন্যায় অতি তীব্র, অতি সুস্পষ্ট। ওর হাতখানি ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিলুম।

অনুরোধের সুরে ও' আমাকে বললে, "কেন আমাকে আহত করো বারবার? আবার কবে আসছো বল?"

আমি শান্তস্বরে বললুম, "হয়ত আমাদের এই শেষ দেখা।"

ও' বললে কান্নার সুর মিশিয়ে, "কেন? কি ক'রেছি আমি তোমার কাছে? কোনদিন তোমার কাছে কোন অনুরোধ করি নি। আজ করছি—অন্ততঃ আর একটি দিন এসো।"

চৌকি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, "আমাদের পরস্পরের আর সাক্ষাৎ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তোমার পীড়িত দেহকে আমি অবহেলা ক'রছি না—বরং আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাকে আর অনুরোধ করো না।"

এই ব'লে ঘর ছেড়ে নিচে নেমে এলুম।

শ্রীমোহিনীমোহন পাল

কালির দাগ

নছ্‌রু

পূজোর ছুটি।

দেশে যা'বার জন্যে জিনিষপত্তর বাঁধা-ছাঁদার ধুম লেগে গেছে। চাকরেরাই প্রায় সব করছে। কিছুদিন আগে গিন্নী বাপের বাড়ী গেছেন। সম্প্রতি লিখেছেন—আমার জন্যে নাকি তাঁর বক্ষ তৃষিত! এত তাড়াহুড়ার সে-ই হয়ত কারণ!

কয়েকজন বন্ধু এসেছেন দেখা করতে, রসালাপ চলছে। মাঝে মাঝে চাকরদের উদ্দেশ করে হাঁকছি, কিরে, ট্রেণ ফেল করাবি নাকি শেষটায়? আবার ক্ষণে ক্ষণে গুণ গুণিয়ে আপন মনেই গেয়ে উঠছি—বহুদিন পরে হইব আবার ইত্যাদি!...

মালী কি একটা জিনিষ সরিয়ে রাখছিল। বললুম, কিরে ওটা? সে তুলে ধরলো ছোটো একখানি 'জলচৌকি'! বিদ্যুতের আলোকে তার বুকে দেখলুম ছিট্‌কে-পড়া কালির মোটা একটা দাগ! সহসা যেন চোখের সব আলো নিবে গেল—ডেকে এল অশ্রুজলের অবাধ্য বান!...

এই চৌকিটাতে দোয়াত, কলম, কাগজ রেখে, অন্য এমনি একটা চৌকিতে বসে সে 'লেখা-লেখা' খেলতো—আমার চার বছরের শিশু! কত বছর আগে পড়েছিল এই কালি,—কালের গতি উপেক্ষা করে আজো লেগে আছে তার দাগ!.কিন্তু কৈ—কৈ আমার সে খোকা? শুধু সেই কি ধরা থেকে মুছে গেল নিশ্চিহ্ন হ'য়ে?...

স্মৃতি

শ্রীনিশীথচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ঘনাইল ঘন সাঁঝের আঁধার
দিবসের আলো ঢাকি'
অবসাদ আসি' নিশিথিনী বুকে,
জুড়াইল জ্বালা রাখি'।
পথিক চলিল আপনার মনে,
দিক-হারা কোন্ অজানা সে কোনে ;
ধুধু করে সব, যেন বালুচর—
আমি শুধু একা রই,
ভগ্ন-হিয়ায় একখানি ছবি—
তা'রি সনে কথা কই।

পুরাতন এযে বহু দিবসের
তবুও নূতন আজ,
অনাবিল সেই নয়নে-কাকুতি—
কত মাখা তায় লাজ ;—
একটী দিবস আঁখি ছাড়া হ'লে,
ভেসে যেত বুক নয়নের জলে,
সুধাইত মোরে, রহিব "কেমনে
তুমি না থাকিলে পাশে—
বিরহ-কালিমা ম্লান হ'য়ে যেত
মিলনের মধু-ভাষে।

এমনি করিয়া ফাল্গুন যেত
কত ফাল্গুনে মিশি'
কত অভিমান ছড়াইত বুকে
চাঁদিমায় সারা-নিশি।
সে স্বপন জাগে আজো আঁখি-নীরে
সে নিশি ফিরিয়া ইসারায় ধীরে,
ডেকে আজো যায়,—অতি সকরুণ,—
"হেন দিনে প্রিয়া কই— ?
অন্তরে সে যে এখনো সজাগ
ওরে, এখন ত একা নই॥

———

পুস্তক-পরিচয়
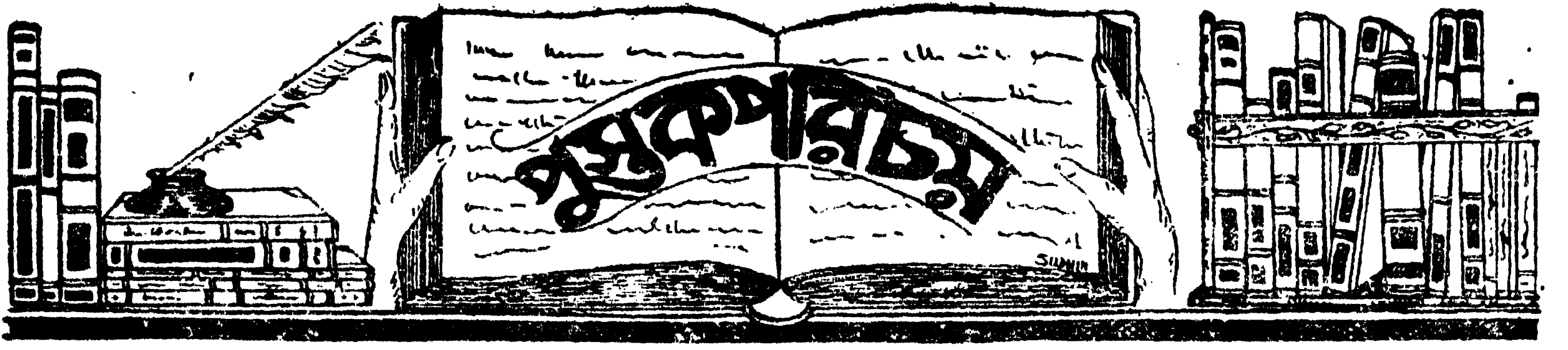
ছোটদের টয়লার্স অফ দি সি—শ্রীগৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত বি-এ প্রণীত। মণ্ডল ব্রাদার্স এণ্ড কোং লিঃ, ৫৪।৮ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্যের কোন উল্লেখ নাই।

প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক ভিক্টর হুগোর বিখ্যাত উপন্যাস 'টয়লার্স অফ দি সি' একখানি সুবৃহৎ উপন্যাস। আলোচ্য পুস্তকখানি সেই পুস্তকের ভাব অবলম্বনে লিখিত। মূল পুস্তকখানি অবশ্য সাধারণ পাঠকপাঠিকার জন্য লিখিত, কিন্তু বর্ত্তমান আলোচ্য পুস্তকখানি বালকবালিকাগণের উদ্দেশ্যেই লিখিত। সেইজন্যই পুস্তকখানিতে মূল পুস্তকের অনেক অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে মূলের সৌন্দর্য্য যথেষ্ট বর্ত্তমান। গ্রন্থকারের লেখার ভঙ্গী ভাল—অনেক সময় অনুবাদ পুস্তকে যে আড়ষ্টতা দেখা যায় ইহাতে তাহা নাই। পুস্তকখানি বালকবালিকাগণের তথা তাহাদের অভিভাবক অভিভাবিকাগণের নিকট আদরনীয় হইবে, এ আশা আমরা করিতে পারি।

মৈথিলী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম-এ প্রণীত। প্রকাশক যোগেন্দ্র পাবলিশিং হাউস, ১০৮ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, সালিখা, হাওড়া। মূল্য ।• আনা।

পুস্তকখানি একখানি নাটিকা—পুরুষ ভূমিকাবিহীন। সুতরাং বালিকাগণের অভিনয়ের উপযোগী করিয়াই লিখিত। জ্ঞানেন্দ্রবাবু সুলেখক; ইতিপূর্ব্বে তিনি "কালিদাস" প্রভৃতি রচনা করিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। পুস্তকখানির রচনা সরস মাধুর্য্য সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। হাস্যরসেরও যথেষ্ট অবতারণা আছে। এই পুস্তকের কৈকেয়ী চরিত্র একটী সুন্দর সৃষ্টি। আমরা পুস্তকখানি পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।

প্যাগোডার দেশে দিন পনেরো—শ্রীজিতেন্দ্র নাথ রায়, বি-কম প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীরেবতীরঞ্জন রায়, আগলা, ঢাকা। মূল্য ॥• আনা।

পুস্তকটীতে ব্রহ্মদেশের কয়েকটী স্থানের বিবরণ আছে। ইহা একটী ভ্রমণকাহিনী—পূর্ব্বে বিচিত্রায় সচিত্র ছাপা হইয়াছিল, তবে বর্ত্তমান পুস্তকে কোন চিত্র নাই। পুস্তকের ভাষা চলতি ভাষা—আখ্যানভাগ মোটের উপর মন্দ নয়। কিন্তু মাত্র ৫১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত পুস্তকের পক্ষে আট আনা মূল্য ধার্য্য করা অবশ্যই বেশী হইয়াছে।

শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী

রাণুর দ্বিতীয় ভাগ ঃ—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ২৫।২ মোহনবাগান রো হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোট গল্প অনেক দিন হইতে মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় পড়িয়া আসিতেছি কিন্তু সেগুলিকে এক স্থানে পুস্তকাকারে গ্রথিত করিয়া পড়িবার এবং তদ্বিষয়ে মত প্রকাশ করিবার সুযোগ ইতিপূর্ব্বে পাই নাই। সে সুযোগ পাইয়া খুসী হইয়াছি বলিয়াই এ কথাটার উল্লেখ করিলাম।

বিভূতি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ছোট গল্প আপানর সাধারণ সকলেরই প্রিয় ইহা পাঠক পাঠিকা মহলে লক্ষ্য করিয়াছি, কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলাম লেখায় কোনরূপ sting এর অভাবই ইহার প্রধান কারণ। বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের লেখা যেন কাহারও মুখ চাহিয়া লেখা নহে—লেখক সৃষ্টির আনন্দে লিখিয়া চলিয়াছেন; ইহার পিছনে বন্ধু বান্ধবের উত্তেজনা নাই, সম্পাদকের তাগিদ নাই, এমন কি সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার

ুরাকাঙ্ক্ষাও নাই। লেখক নৈর্ব্যক্তিক, নিস্পৃহ, ভোলানাথ। তাঁর ছোট গল্পের অন্যান্য গুণ ও categorically বর্ণনা করিতে পারি। (১) বিষয় বস্তুর মৌলিকত্ব। বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের লেখার উপর কাহারও প্রভাব পড়ে নাই। এমন কি রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রেরও নয়। বেশ বোঝা যায় তাঁর সমস্ত প্লট নিজের অভিজ্ঞতা এবং সমবেদনাতুর মন হইতে আহৃত। (২) শিশু-মনের এত বড় সহানুভূতিপ্রবণ পাঠক আমাদের বাংলা সাহিত্যে যার দ্বিতীয় নাই। সত্য কথা বলিতে কি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনেকগুলি ভাল গল্পই শিশু-মনের interpretation এর উপর প্রতিষ্ঠিত। শিশুর যে সব কথা এবং কার্য ইতিপূর্ব্বে নিরর্থক বলিয়া মনে হইয়াছে মুখোপাধ্যায় মহাশয় তার উপর নূতন অর্থ আরোপ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। (৩) তাঁর গল্পের প্রাঞ্জল হাস্যধারা পাঠক পাঠিকাকে আনন্দে মাতোয়ারা করিয়া তোলে। সাহিত্যে এমন নির্দোষ হাস্যরসের সৃষ্টি অথচ বুদ্ধির তির্যক খেলা, অল্পই দেখিয়াছি। এই বিষয়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরশুরাম এবং কেদার বন্দ্যোর সমশ্রেণীর, যদিও স্বশ্রেণীর নহে—কেন প্রত্যেকের টেক্‌নিক্ বিভিন্ন। এক "নবোঢ়ার পত্র" গল্প ছাড়া বক্ষ্যমান পুস্তকে বিভূতিভূষণ সর্ব্বত্রই wit এবং humour এর উচ্চ পরিচয় দিয়াছেন। 'বরযাত্রী" গল্পটি ত এ বিষয়ে অদ্বিতীয়। এই সকল গুণ ব্যতীত সংলাপের স্বাভাবিকত্ব, প্লটের অনিবার্যত্ব (inevitability) প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর গল্পের সমস্ত লক্ষণই বিভূতিভূষণের গল্পের মধ্যে পাওয়া যায়।

এই পর্যন্ত বলিয়া বিদায় লইলে বিভূতিভূষণের একটি গল্পের প্রতি অবিচার করা হইত। সে গল্পটির নাম 'ননীচোরা।' প্রথম শ্রেণীর গল্প হইলেই তাকে পাশ্চাত্যের ছোট গল্পের সঙ্গে তুলনা করা আমাদের স্বভাব। কিন্তু এই কথা জোর করিয়া বলা যায় যে পাশ্চাত্য দেশে এই গল্পটি সৃষ্ট হইতে পারিত না। সে দেশের ঐতিহ্যে এই বস্তু নাই। ভগবানে ভক্তের যে একান্ত বিশ্বাস, তার সহিত লেখক আশ্চর্য রূপে বাস্তবকে মিলাইয়াছেন। যখন আমরা পড়ি, "মায়ের নত দৃষ্টির নীচে শিশুর হাসি, ছায়া শ্যাম বৃক্ষতলে খেলায় মত্ত শিশুর দল, কোথাও দরিদ্র পল্লীতে জীর্ণ গৃহ, অবসরহীন জননী, উঠানে ছিন্নবাসপরা শিশু-ভগ্নীর কোলে রুগ্ন শিশু, অশ্রুভরা নিষ্প্রভ তাহার চোখ, কোথাও শিশুর দুর্জয় অভিমান, চাপা ঠোঁট, শান্ত গম্ভীর ভাব, মা খাবার খেলনা রাজ্যের যত জিনিষ একত্র করিয়াও মন পায় না। ০ ০০ কখন তিনি নাই, একেবারেই বিলুপ্ত, শুধু শিশুতে শিশুতে সমস্ত বিশ্ব একাকার হইয়া যায়।" তখন মন অবাক বিস্ময়ে বলিয়া ওঠে, এ ত শুধু সাহিত্য নয়, আর্ট নয়, এ যে অনুভূতি, উপলব্ধি। বাস্তবিক এই গল্পটির জন্য লেখককে সাধুবাদ প্রদান করিবার ভাষা আমার নাই।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ ও দানীবাবু—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত প্রণীত। রসচক্র সাহিত্য সংসদ হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। ইহার কারণ ছায়াচিত্রের অভ্যুন্নতি কিংবা বিশিষ্ট নাট্য প্রতিভার অভাব তাহা বলা শক্ত। বোধ হয় দুইই। রাহুগ্রস্ত নাট্য-কলা আবার মঞ্চের উপর পূর্ব্বের ন্যায় আবির্ভূত হইয়া সাধারণকে আকৃষ্ট করিতে পারিবে কিনা জানি না। কিন্তু এই সময় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত রঙ্গমঞ্চের গৌরবোজ্জ্বল যুগের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। সেই যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের মধ্যে গিরিশ পুত্র দানীবাবু (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ) ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অনেকের মতে অভিনয় চাতুর্য্যে তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পিতাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরিশ লেক্‌চারার ছিলেন। কাজেই তাঁহাকে এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। তিনি বিলাতের রঙ্গমঞ্চ ও প্রসিদ্ধ অভিনেতৃবর্গের সহিতও যে বিলক্ষণ পরিচিত তাহারও প্রমাণ আলোচ্য গ্রন্থে অনেক স্থলে পাওয়া যায়। কারণ তিনি বহু স্থলে তুলনামূলক আলোচনা করিয়া গ্রন্থখানি সকলের চিত্তাকর্ষক করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নাট্যামোদী ব্যক্তি মাত্রেই

পুস্তকখানি পড়িয়া আনন্দিত হইবেন, এ কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অনিন্দ্য।

রসচক্র—বারোয়ারি উপন্যাস। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় সম্পাদিত। রসচক্র সাহিত্য সংসদ হইতে শ্রীযুক্ত রাধেশ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

বহুকাল পূর্ব্বে প্রবাস-জ্যোতিঃ নামে একখানি অখ্যাত এবং অধুনালুপ্ত মাসিক পত্রে শরৎচন্দ্রের সঙ্কল্পিত একখানি উপন্যাসের কেবল প্রথম পরিচ্ছেদটি মাত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু তারপরে কি কারণে জানি না তিনি তাঁর সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করেন নাই। ঐ একটি মাত্র পরিচ্ছেদ লিখিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন। আড়াই বৎসর পূর্ব্বে, শরৎ চন্দ্রের জীবদ্দশাতেই, বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত কয়েকজন কথা সাহিত্যিক মিলিয়া তাঁহার আরব্ধ ভিত্তি ভূমির উপর যে সুন্দর ইমারতটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা তাঁহার অযোগ্য হয় নাই। দক্ষিণ কলিকাতায় রসচক্র নামে একটি বিশিষ্ট সাহিত্য-সংসদ আছে। শরৎচন্দ্র ছিলেন ইহার অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক। যাঁহাদের রচনার দ্বারা এই বারোয়ারি উপন্যাসখানি সমৃদ্ধ হইয়াছে তাঁহাদের অধিকাংশই উক্ত সংসদের সদস্য। সেইজন্য এই উপন্যাসের নাম দেওয়া হইয়াছে 'রসচক্র'। আমরা উপন্যাসখানি পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। ভাষায়, পরিকল্পনায়, চরিত্র সৃষ্টিতে এবং ঘটনা সংস্থানের স্বাভাবিকত্বে সমগ্র গ্রন্থখানি বিশেষ মনোজ্ঞ হইয়াছে। ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ইহার উপসংহার প্রণয়নে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

ব্যবধান

শ্রীগোপাল ভৌমিক

বহুবার করি' বহুরূপে তোমা বলি—
বলনা তোমায় কেমন করিয়া ছলি ?
কেমনে গ্রহণ করিব তোমার দান—
বহুরূপে ভাবি' পাই না তো সমাধান।

তুমি ত প্রেয়সী চাঁদের তুষারে নেয়ে
চলিয়াছ সুখে জীবনের তরী বেয়ে।
স্বপ্ন-কুহক র'য়েছে তোমারে ঘিরে,'
চ'লেছ সাম্‌নে দেখ না পিছন ফিরে'।

আমি হেথা সখি, মরু ঝড় সাথে যুঝি
বালুকা-সাগরে পাইনাকো পথ খুঁজি।
সংশয়-ভীতি আমারে ঘিরিয়া থাকে—
মুক্তি কখনো পাইনাকো কোন ফাঁকে।

প্রেমের স্বপন রুক্ষ জীবনে মম—
ঊষর মরুতে সাগর-স্বপ্ন সম।
এখানে পৃথিবী সদাই অন্ধকার
ব্যর্থ হৃদয়ে বাণী জাগে হতাশার।

আমার জীবনে সকল স্বপ্ন শেষ
পাথর-শীতল বাস্তব পরিবেশ।
আলোক-বিলাসী জীবনে তোমার রাণি,
ক্রুর অভিশাপ বৃথাই আনিবে টানি'।

দূরে আছো তুমি দূরেই থাকিয়া যাও—
নিবেদিতা, তব অর্ঘ্য ফিরায়ে নাও।
সুদূর-দেশের স্বপ্ন-কুহেলি-প্রিয়—
তুমি দূরে থাকো, দূর থাক্ লোভনীয়।

—————

সোনালী ক

১৯

পরদিন প্রত্যূষে যখন বাসনার নিদ্রা ভাঙল তখন তার মনের মধ্যে একটা অপরূপ পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে। যা কিছু অভিমান অপমান দুঃখ ক্রোধ সমস্ত ক্ষুদ্রায়তন হ'য়ে মনের একটা গোপন কোণে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু মনের যে দিকটার বাইরের সঙ্গে কারবার তা হ'য়ে গেছে একেবারে হাল্কা। যে তার ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ সমস্যার সহিত পরিচিত, সেও তাকে দেখলে হয়ত মনে করবে, এখন আর তার জীবন কোনো দ্বন্দ্বের দ্বারা পীড়িত, কোনো বিরোধের দ্বারা খণ্ডিত নয়। অমরেশ, নরেন্দ্র, পারুল—প্রত্যেকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য থেকে রিক্ত হ'য়ে নেমে এসেছে সহজ সাধারণতার স্তরে। এমন কি, এখন যেন অমরেশকে অধ্যাপনের জন্য পুনরায় ডেকে পাঠালেও চলে, এবং বিবাহের পাত্ররূপে নরেন্দ্রের যোগ্যতার কথা বিবেচনা ক'রে দেখবার পক্ষেও এখন আর যেন তেমন কিছু বাধা নেই।

স্নান সমাপন ক'রে বাথরুম থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে বাসনা ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে চুলটা ঠিক ক'রে নিচ্ছিল, এমন সময়ে পরিচারিকা মালতী এসে বললে, "খাবার টেবিলে আপনার চা দিয়েছি দিদিমণি।"

বাসনা জিজ্ঞাসা করলে, "মা কোথায়?"

"ঠাকুর ঘরে।"

"এখনো পূজো করছেন?"

"হ্যাঁ।"

মুখ নীচু ক'রে সিঁথি কাটতে কাটতে বাসনা বললে, "খাবার এখন তুলে নিয়ে যা। আমার দেরী আছে।" তারপর কেশ-প্রসাধন সমাপ্ত ক'রে দুইটা বারান্দা পার হ'য়ে অপর্ণার ঠাকুর ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হ'ল।

পূজা সমাপনান্তে অপর্ণা তখন ঘরের অর্গল মুক্ত ক'রে দিয়ে পূজার দ্রব্যাদি গুছিয়ে রাখছিলেন,—একটু ঠেলতেই দ্বারটা খুলে গেল। বাসনাকে দেখে তার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে অপর্ণা বললেন, "কিরে বাসু, কি বলছিস্?"

"এখনো পূজো শেষ হয়নি মা, তোমার?" ব'লে বাসনা ঘরের ভিতর মুখ বাড়িয়ে সকৌতূহলে চতুর্দ্দিক দেখতে লাগল।

স্মিতমুখে অপর্ণা বললেন, "কেন, তোমার তাতে কি ক্ষতি হ'ল শুনি?"

বাসনা বললে, "না, কিছু ক্ষতি হয় নি।" তারপর সম্মুখ দিকে অগ্রসর হওয়ার ঈষৎ উপক্রম ক'রে মৃদু স্মিতমুখে বললে, "তোমার ঠাকুর ঘরে একটুখানি ঢুকব মা?"

প্রস্তাব শুনে অপর্ণা মনে মনে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হ'লেন; যে লোক ভুলেও কোনো দিন এ অঞ্চলে পদার্পণ করে না সে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করতে চায়! কন্যার মুখের অভিব্যক্তি থেকে তার অন্তরের গোপন তথ্য নির্ণয় করবার চেষ্টা ক'রে তিনি বললেন, "সে কি কথা রে! হঠাৎ ঠাকুর ঘরে ঢোকবার খেয়াল হল কেন?"

"খেয়াল নয় মা,—সাধ।"

"হঠাৎ সাধই বা হ'ল কেন শুনি?"

"সে কথা তোমার ঠাকুরই বলতে পারেন।"

অপর্ণা বললেন, "আমার ঠাকুর ত বোকা আর বোবা, তা হ'লে তিনি বুঝবেনই বা কি ক'রে, আর বলবেনই বা কি ক'রে?"

এ কথার বাসনা কোনও উত্তর দিলে না, শুধু নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

"স্নান করেছিস?"

"করেছি।"

অনাবশ্যক প্রশ্ন। বাসনা যে স্নান ক'রে ধৌত বস্ত্র পরিধান করেছিল সেটা সহজেই প্রতীয়মান হচ্ছিল তার কেশ এবং বেশ থেকে।

অপর্ণা বললেন, "স্নান করলে কি হবে, টোষ্ট আর ডিম দিয়ে দেহটি বেশ ক'রে পবিত্র ক'রে এসেছ ত' ?"

জননীর দুশ্চিন্তা দেখে বাসনা হেসে ফেললে; বললে, "তা আসিনি মা,—স্নান করবার পর এখনো কিছুই মুখে দিই নি,—টোষ্টও নয়, ডিমও নয়।"

অপর্ণা বললেন, "তবে ভেতরে এসে বোস্।" ব'লে বাসনার জন্য নিজের দক্ষিণ পার্শ্বে একটা কুশাসন পেতে দিলেন।

"তুমি কেন পাতলে মা, আমি নিজে পেতে নিতাম।" ব'লে ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে বাসনা কুশাসনের উপর উপবেশন করলে; তারপর দেবদেবীর মূর্তি ও চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "এত কি পূজো তুমি কর, বল ত' মা ?"

অপর্ণা সহাস্যমুখে বললেন, "তুই এত কি বই পড়িস তা আমাকে বলত শুনি ?"

বাসনা বললে, "আমার যে অনেক বই! অন্তত পঁচিশ-ছাব্বিশ খানা হবে।"

অপর্ণা বললেন, "আর আমার যে অনেক ঠাকুর, তত্রিশ কোটি, তা জানিসনে বুঝি ?"

মৃদু হেসে বাসনা বললে, "তা জানি; কিন্তু এই তত্রিশ কোটির সকলের সঙ্গেই ত তোমার কারবার নয় না।" তারপর সহসা সে কথা পরিত্যাগ ক'রে বললে, "আচ্ছা মা, তুমি এখনো নিত্য শিবপূজো কর ?"

অর্পনা বললেন, "করি।"

বিস্ময়ের মৃদুচ্ছ্বসিত স্বরে বাসনা বললে, "কর ? কিন্তু কেন আর কর ? শিবঠাকুর ত' তোমার পূজোয় তুষ্ট হ'য়ে তোমাকে মনের মত বর দিয়েছেন।"

কন্যার নিকট হ'তে এই ধরণের পরিহাস রহস্যে অর্পণা অভ্যস্থ; সস্নেহে কন্যার পৃষ্ঠদেশে হস্তার্পণ ক'রে বললেন, "পাগলী মেয়ে কোথাকার !" তারপর তার মাথাটা ধীরে ধীরে একটু নেড়ে দিয়ে বললেন, "কিন্তু এখনো যে আর একটা বর বাকি আছে বাসু। তুই ত' পূজো-পাঠ কর-বিনে। সেইজন্যে আমিই তোর হ'য়ে শিবপূজো করি। 'মায়ে ঝিয়ে বর্ত্ত করে, যার যার বর সেই সেই মাগে'— তুই ত' তা আর হ'তে দিলি নে!"

বাসনা বললে, "আচ্ছা মা, এখন থেকে আমিও পূজো পাঠ করব,—কিন্তু তাই ব'লে শিবপূজো নয়। তুমি আমাকে অন্য পুজো শিখিয়ে দিয়ো।"

"কেন, শিবপূজো করবিনে ? শিবঠাকুর কী এমন অপরাধ করলেন তোর কাছে ?"

বাসনার ওষ্ঠাধরে ক্ষীণ হাস্যের রেখা দেখা গেল; বললে, "মা, অপরাধ তিনি কিছু করেন নি।" তারপর প্রসঙ্গটা পরিবর্তিত করবার অভিপ্রায়ে বললে, "তুমি ত' মা, গল্প কর, ছেলেবেলায় কত রকমের বারব্রত ক'রেছ। এখনো বছরে বছরে সাবিত্রী ব্রত করছ। আমাকে দিয়েও তুমি সেই রকম ব্রত-ট্রত করাও না কেন ?"

বাসনার ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করবার আগ্রহ দেখে অপর্ণা যথেষ্ট বিস্মিত হয়েছিলেন; তার উপর, ব্রত পালনের জন্য তার এই নির্বিকল্প প্রস্তাব শুনে তাঁর বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না; বললেন, "ব্রত করাবো তোকে কোন্ সাহসে ? তোরা যে নাস্তিক, ঠাকুর-দেবতা মানিস্ নে।" বাসনার ধর্মমতের উপর স্বামী শৈলনাথ এবং গুরু অমরেশের ধর্মমতের প্রভাব স্মরণ ক'রে এই বহুবাচনিক 'তোরা'র প্রয়োগ।

বাসনা বললে, "আমি নাস্তিক ব'লেই যদি তোমার মনের বিশ্বাস, তা হ'লে তুমি আমার বিষয়ে এমন নিশ্চিন্ত হ'য়ে থেকো না মা। জোর ক'রে ফিরিয়ে নাও আমাকে অন্যায়ের পথ থেকে।"

গভীর বিস্ময়ে এবং গভীরতর আনন্দে অপর্ণার মন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল; কন্যার মাথার উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত ক'রে স্নিগ্ধ স্বরে তিনি বললেন, "সত্যি বাসু ?— সত্যি তুই ব্রত-ট্রত করবি ?"

শান্তমুখে নিরাবেগ কণ্ঠে বাসনা বললে, "সত্যি।"

অপর্ণা মনে মনে সিদ্ধান্ত করলেন, বাসনার এই সহসা-জাগ্রত ধর্মপ্রবৃত্তি অমরেশের শক্তি-কেন্দ্র হ'তে খানিকটা

দূরে স'রে আসার পরিচয় ভিন্ন অপর কিছুই নয়,—তা সে বিকর্ষণ যে-কোনো প্রকারেই ঘ'টে থাকুক না কেন। যদিও ব্রতারম্ভের প্রশস্ত দিন ছিল চৈত্র-সংক্রান্তির দিবস, তথাপি সুসময়কে কদাচ অবহেলা করা উচিত নয় এই বিবেচনায় তিনি বললেন, "তুই এক দিনের মধ্যে একটা ভাল দিন দেখে আমি তোকে 'ফল-সাগরে'র ব্রত নেওয়াব বাসু;—আজ তুই শুধু সেই ব্রত নেবার সঙ্কল্প ক'রে এই ঠাকুরঘরে একটা প্রণাম ক'রে যা।"

আসন ত্যাগ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বাসনা বললে, "কাকে প্রণাম করব মা? তোমাকে?"

চকিতকণ্ঠে অপর্ণা বললেন, "কি বলিস তুই বাসু! ঠাকুরঘরে আমাকে প্রণাম করবি কি! দেবতাকে প্রণাম কর।"

"তা হোক্ মা, আগে তোমাকেই প্রণাম করি।" ব'লে অপর্ণাকে আর প্রতিবাদ করবার অবসর না দিয়ে নত হ'য়ে বাসনা তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলে।

বিরক্তি সহকারে অপর্ণা বল্লেন, "ছি ছি, কি করলি বল দেখি! পায়ে হাত দিয়ে হাতটা অপরিষ্কার করলি! নে, হাতটা ধুয়ে ফেলে ঠাকুর প্রণাম কর্।" ব'লে বাসনার হাতে ঘটি থেকে জল দিতে উদ্যত হ'লেন।

মৃদু হেসে বাসনা বললে, "মা, তোমার মহিমা থেকে এমন করে নেমে এসো না।"

সতর্জনে অপর্ণা বললেন, "বেশি ফাজলামি করিস্ নে। নে, হাত ধুয়ে ঠাকুর প্রণাম কর্।" ব'লে বাসনার দুই হস্তে জল ঢেলে দিলেন।

ভূমিতে উপবেশন ক'রে নতমস্তকে বাসনা প্রণাম করতে যাচ্ছিল, অপর্ণা বললেন, "ও-রকম ক'রে নয় বাসু, গলায় আঁচল দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে হয়।"

গলবস্ত্র হ'য়ে বাসনা মাতার উপদেশ মত প্রণাম করলে। কোন্ দেবতাকে সে প্রণাম করলে, কি কথা ব'লে তার গোপন হৃদয়ের দুঃখ-বেদনা নিবেদন করলে, তা সে-ই বলতে পারে। প্রণাম সমাপন করে যখন সে উঠে দাঁড়াল উচ্ছল অশ্রুতে তখন তার দুই চক্ষু চকচক্ করছে।

চকিতে অপর্ণা বাসনার মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলেন; চক্ষের অবস্থা দেখে কন্যার দুঃখদীর্ণ হৃদয়ের গোপন ব্যথার কথা অগোচর রইল না; গভীর সমবেদনায় তাঁরও দুই চক্ষু ছলছলিয়ে এল।

আধ ঘণ্টা পরে বাসনা শৈলনাথের অন্দরমহলের বসবার ঘরে প্রবেশ করলে। রবিবার, অফিসের তাড়া নেই, দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ শেষ ক'রে শৈলনাথ তখন ঈশোপনিষদের একটা শ্লোকের অর্থ-বিচারে নিযুক্ত ছিলেন,—বাসনা কক্ষে প্রবেশ ক'রে শৈলনাথের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে তাঁর পদধূলি গ্রহণ ক'রে দাঁড়াল।

পাশের একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে শৈলনাথ বললেন, "বোসো।" বাসনা উপবেশন করলে তার মাথায় হাত রেখে গভীর স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার বল ত বাসু?"—এ প্রণাম যে কেবলমাত্র প্রণামই নয়, পরন্তু বিশেষ একটা কোনো ঘটনার অভিব্যক্তি সে কথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

পিতার মুখের উপর সজল চক্ষু স্থাপিত ক'রে বাসনা বললে, "তোমার আশীর্বাদ নিতে এলাম বাবা!"

শৈলনাথ বললেন, "কিন্তু নতুন ক'রে কেন? সে ত' সর্বদাই তোমার ওপর বর্ষিত হচ্ছে।"

বাসনা বল্লে, "আর আমি কলেজে পড়ব না বাবা, সে পড়া অনেক হয়েছে। এবার তুমি আমাকে বাচস্পতি মশায়ের ছাত্রী ক'রে দাও, তাঁর কাছে আমি কাব্য আর দর্শন পড়ব। তা ছাড়া—" সহসা বাসনা নীরব হ'য়ে কি চিন্তা করতে লাগল।

কন্যার স্কন্ধে হস্তার্পণ ক'রে শৈলনাথ বল্লেন, "তা ছাড়া কি বল?"

"তা ছাড়া এবার থেকে আমি মার সঙ্গে বারব্রত পুজো-পাঠ একটু একটু করব।"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে শৈলনাথ বললেন, "এ তুমি বেশ বিবেচনা ক'রে তারপর স্থির করেছ ত'?"

"হ্যাঁ।"

"এতে তুমি মনের মধ্যে শান্তি পাবে মনে কর?"

"করি।"

"আচ্ছা, তা হ'লে আমি আশীর্বাদ করি তোমার জীবন-

ধারার এই নতুন পরিবর্ত্তন তোমার পক্ষে শুভ হোক, কল্যাণপ্রদ হোক।" ব'লে শৈলনাথ বাসনার মস্তকে পুনরায় হস্তার্পণ করলেন।

ঠিক এই সময়ে কক্ষে প্রবেশ করলেন অপর্ণা। স্বামীর কাছে এসে প্রসন্নমুখে বললেন, "শুনেছ সব কথা?"

শৈলনাথ বললেন, "শুনেছি। কিন্তু আজ থেকে বাসুর গোত্র গেল বদলে।"

অপর্ণা বল্‌লেন, "গোত্র বদ্‌লালো কি রকম?"

শৈলনাথ বললেন, "বদলালো না? এতদিন তার ছিল 'জয়গোবিন্দ' গোত্র, আর আজ থেকে হ'ল 'নারদ' গোত্র।"

সবিস্ময়ে বাসনা বললে, "সেকি বাবা! 'জয়গোবিন্দ' গোত্র 'নারদ' গোত্র—এসব আবার কি?"

শৈলনাথ বললেন, "তা বুঝি জান না? তোমার মার হ'চ্ছে 'নারদ' গোত্র; আর, তোমার আর আমার ছিল 'জয় গোবিন্দ' গোত্র।"

"তার মানে?"

"তার মানে একটা ছোট গল্প শুনলে বুঝতে পারবে। মধুসূদনকে দর্পহারী বলে তা জান ত'। কারো মনে দর্পের উদয় হ'লে তিনি তা ভঙ্গ করেন। একবার নারদের মনে এই দর্প হয়েছিল যে, তাঁর চেয়ে মধুসূদনের বড় ভক্ত আর কোথাও কেউ নেই। এ কথা উপলব্ধি ক'রে মধুসূদন মনে করলেন নারদের এ দর্প ভাঙ্গতে হ'বে। একদিন নারদ বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুমন্দিরের পাশ দিয়ে হরিকীর্তন করতে করতে চলেছেন, হঠাৎ দেখলেন বিষ্ণুমন্দিরের পাশে দাঁড়িয়ে খড়ম পায়ে ছাতা মাথায় ভগবান রাজমিস্ত্রী খাটাচ্ছেন, একটি প্রাসাদ তৈরী হ'চ্ছে। প্রখর সূর্য্যকিরণে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর। দেখে নারদের উৎকট বিস্ময় হলো। কে সে ভাগ্যবান যার বাড়ী স্বয়ং ভগবান নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নির্ম্মিত করছেন! কৌতূহলের বশবর্তী হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু, এ কার বাড়ী হচ্ছে আপনার বাড়ীর পাশে?' ভগবান বললেন, 'ও আমার একজন ভক্তের।' 'কোথায় সে থাকে?' ভগবান বললেন, 'ধরাতলে।' ঠিকানাটী সংগ্রহ ক'রে নারদ একেবারে পৃথিবীতে এসে হাজির। দেখতে হ'বে কে সে এমন ভক্ত, কী তার এমন পূজা-পদ্ধতি। যথাস্থানে উপস্থিত হ'য়ে নারদ দেখলেন, সেই ভক্ত সামান্য একজন চাষা। সমস্ত দিন তার কাছে কাছে থেকে লক্ষ্য করলেন পূজা-অর্চ্চনা সে কিছুই করে না, নিদ্রাভঙ্গে সকালে উঠে হাঁক দেয় 'জয়গোবিন্দ', তারপর কিছুক্ষণ পরে 'জয়-গোবিন্দ' ব'লে লাঙ্গলটা কাঁধে তুলে নিয়ে ক্ষেতে উপস্থিত হয়। 'জয়গোবিন্দ' ব'লে লাঙ্গলটা কাঁধ থেকে মাটিতে ফেলে। ভূমি কর্ষণ করতে করতে মাঝে মাঝে দু-চারবার 'জয়গোবিন্দ' বলে, তারপর সন্ধ্যা হ'লে 'জয়গোবিন্দ' ব'লে লাঙ্গলটি কাঁধে তুলে নিয়ে বাড়ীতে ফিরে আসে। রাত্রে চোখ বোঝবার আগে আরো দু-চারবার বলে 'জয়গোবিন্দ'। মাত্র এই, এ ছাড়া আর কিছু নয়। না আছে বীণা, না আছে কোশাকুশী, না আছে নামাবলী, না আছে তিলকাঞ্চন। বিষ্ণুলোকে ফিরে এসে নারদ বললেন, 'প্রভু, দেখে এলাম আপনার ভক্তকে। দেখে জানলাম, আপনার মধ্যে সুবিচার নেই।' ভগবান বললেন, 'কেন বল ত'?' নারদ বললেন, 'আপনার ভক্তের না আছে পুজো-পাঠ, না আছে হরিকীর্তন, দিনের মধ্যে শুধু বার কুড়ি-পঁচিশ 'জয়গোবিন্দ'। তার বাড়ী হ'চ্ছে আপনার বাড়ীর পাশে; আর, বীণা বাজিয়ে বাজিয়ে, আর কীর্তন ক'রে ক'রে আমাদের হাড় কালি হ'লো, আমাদের বাড়ী এক মাইল দূরে অন্য পাড়ায়।' অল্প হেসে ভগবান বললেন, 'ক্ষমা করো নারদ। বেশী বয়স হয়েছে, বিচারশক্তিটা একটু কমে গেছে। তুমি আমার একটা কাজ করতে পার নারদ?' নারদ বললেন, 'হুকুম করলেই করি।' একটা বাটীতে কাণায় কাণায় জল ভরে দিয়ে ভগবান নারদকে বললেন, 'এইটে ধর।' নারদ তাড়াতাড়ি বীণাটা বগলের মধ্যে চেপে ধ'রে দু' হাত পেতে জল ভরা বাটীটা গ্রহণ করলেন। ভগবান বললেন, 'এই বাটীটা নিয়ে ত্রিভুবন ঘুরে তুমি আমার কাছে ফিরে এ'স। কিন্তু দেখো একবিন্দু জল যেন বাটী থেকে না পড়ে। পারবে ত'?' নারদের মেজাজটা একটু গরম হয়েই ছিল, গম্ভীর মুখে বললেন, 'আশা করি পারব।' বগলে বীণা চেপে অতি সন্তর্পণে বাটীটা ধ'রে নারদ এগিয়ে চললেন। চক্ষু সর্বদা বাটীর উপর নিবদ্ধ যাতে এক ফোঁটা জল উছলে না পড়ে। এই রকম ভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'য়ে ত্রিভুবন

পরিক্রম ক'রে অবশেষে বিষ্ণুলোকে ভগবানের কাছে ফিরে এলেন। বাটীটি ভগবানের কাছে রেখে গর্বিত মুখে বললেন, 'নিন প্রভু, এক ফোঁটা জলও পড়েনি।' ভগবান বললেন, 'খুব ভাল কথা, কিন্তু নারদ একটি সত্যি কথা বলবে? এই দশদিনে তুমি কবার আমার কথা চিন্তা করেছিলে?' নারদ মনে মনে ভেবে দেখলেন একবারো নয়। সর্বক্ষণ জল আর বাটীর চিন্তায় তাঁর এই দশদিন কেটেছে। সর্বজ্ঞ ভগবানের কাছে মিথ্যে কথা ব'লে কোনো লাভ নেই, সুতরাং মহা অপ্রস্তুত হ'য়ে নারদ নিঃশব্দে ভগবানের দিকে চেয়ে রইলেন ভগবান বললেন, 'নারদ, এক বাটী জল নিয়েই তুমি আমাকে ভুলে গেলে। আর কত দুঃখ-কষ্ট আপদ-বিপদের মধ্যে ঐ চাষার জীবন কাটছে, অথচ সর্বদা তার মুখে 'জয়গোবিন্দ'। এখন বল দেখি, তার বাড়ীটা আমার বাড়ীর পাশে করাচ্ছি ব'লে বিশেষ কিছু অবিচার হয়েছে কি?' নারদ কোনো কথা না ব'লে বীণাটি নিয়ে প্রস্থান করলেন। এখন বুঝলে বাসু কেন তোমার মা'র 'নারদ' গোত্র? আর আমাদের 'জয়গোবিন্দ' গোত্র।"

গল্প শুনে বাসনা অপরিমিতভাবে হাসতে লাগল; আর অপর্ণা সক্রোধে বললেন, "বেশ বাবু, বেশ। তোমার বাড়ী না-হয় বিষ্ণুমন্দিরের পাশেই হবে, আর আমাদের হবে এক মাইল দূরে। মাঝে মাঝে নেমন্তন্ন করব, অনুগ্রহ ক'রে খেতে এসো

শৈলনাথ বললেন, "তা' আ[illegible] কিন্তু মনে রেখো 'জয়-গোবিন্দ' গোত্রের মুর্গির [illegible]কাট্‌লেটেও বাধা নেই। তোমার বিষ্ণুলোকে যদি সে পদার্থ না থাকে তা হ'লে দশটা মুর্গি আর পাঁচটা মোরগ পৃথিবী থেকে যাবার সময় নিয়ে যেয়ো।"

অপর্ণা বললেন, "যথা আজ্ঞা, তাই নিয়ে যাব, কিন্তু কলসী চারেক গঙ্গাজলও সঙ্গে নিয়ে যেতে হ'বে।"

তিনজনেই সমস্বরে হে'সে উঠলেন। (ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

— — — —

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং কলিকাতা, ২৭নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, সাহিত্য-ভবন প্রেস হইতে শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিচিত্রা

দ্বাদশ বর্ষ, ২য় খণ্ড	চৈত্র, ১৩৪৫	৩য় সংখ্যা

গৃধ্নু

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

সরোবরে পদ্ম ছিল ফুটি,
কমলের লোভে আমি নামিলাম জলে,
সাঁতারুর জলে কিবা ভয়?
বুকজলে চলিয়া ছিছুটি,
সহসা চরণ দুটি গাঢ় পঙ্কতলে
গেল ডুবি, মুক্ত নাহি হয়।

প্রস্ফুটিত কমলের পানে
বাহু মেলি গতিহারা হলেম নিমিষে
আকণ্ঠ সলিলে ডুবে যাই।
কবর গহ্বর মোরে টানে,
অলঙ্ঘ্য পরিখা মোরে ঘেরিল চৌদিকে
পঙ্কমগ্ন প্রেমে মুক্তি নাই।

———

বিশ্ব-রহস্য

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন

বিশ্ব সসীম কি অসীম, এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা এখনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। জ্যোতি-বৈজ্ঞানিকগণের ঝোঁক বিশ্বকে সসীম বলিয়া ধরার দিকে। তাঁহারা বলেন বিশ্ব যদি অসীম হইত, তবে নক্ষত্রের সংখ্যাও অসীম হইত। নক্ষত্রগণের সংখ্যা অসীম হইলে, আকাশে নক্ষত্রগণের মধ্যে যে সকল ফাঁক আছে, তাহা ভরিয়া যাইত —কোনো স্থানে তিল মাত্র ফাঁক থাকিত না—আকাশ-মণ্ডল সর্বত্র দেদীপ্যমান থাকিত।

কতকগুলি পদার্থ-বিজ্ঞানবিদ্ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করিয়া তর্কচ্ছলে বিশ্বকে অসীম বলিয়া ধরিয়া লইতে চাহেন। বিশ্বকে অসীম ধরিলে উহা ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে, একথা টেঁকে না। বিশ্বকে সসীম ধরিলে উহার লয় অবশ্যম্ভাবী। যাহার লয় আছে, এককালে তাহার উৎপত্তিও নিশ্চয় হইয়াছিল। অতএব অতীতে উহা কোনো অনৈসর্গিক বা অলৌকিক শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল ধরিয়া লইতে হইবে।

বিশ্বকে অসীম ধরিলে উহা অনাদি ও অনন্ত। উহার উৎপত্তির জন্য কোনো শক্তির প্রয়োজন নাই—উহা চির-কাল আছে, এবং চিরকাল থাকিবে—উহার যতদূর পরি-ণতি হওয়া সম্ভব, তাহা বহু যুগ পূর্বেই হইয়া গিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু বিশ্ব এখনো সক্রিয় বলিয়া দেখা যাইতেছে। উহাতে এখনো শক্তির বিকাশ হইতেছে, এবং পদার্থসমূহের অহরহঃ একরূপ হইতে রূপান্তর ঘটিতেছে। অতএব বিশ্বকে সসীম বলিয়া ধরিয়া লওয়াই যৌক্তিক। তবে, উহার পরিমাণ এত অধিক যে উহা অসীম বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

দেশ, কাল ও দ্রব্য এই তিনটী পদার্থ সসীম বিশ্বের অন্তর্গত। কিন্তু দেশ কাল ও দ্রব্যকে এখন আর পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ বলিয়া ধরা হয় না। উহারা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। একের পরিবর্তনে অপর দুইটির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী—উহারা পরস্পর আপেক্ষিক। এই মতবাদকে Relativity বা আপেক্ষিকতাবাদ বলে, এবং আইনষ্টাইন (Einstein) এই মতবাদের প্রবর্তক।

বিশ্বকে সসীম বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু সসীম হইলেও উহার প্রান্ত নাই। একটি ফুটবলের পৃষ্ঠদেশের যেমন প্রান্ত নাই, পৃথিবীর পৃষ্ঠ দেশেরও তেমনি প্রান্ত নাই। পৃথিবীর উপর দিয়া তুমি যত ইচ্ছা তত ঘুরিয়া বেড়াও, অন্ত পাইবে না। পৃথিবীর মেরু-প্রদেশ হইতে বিষুব-রেখার দিকে spiral গতিতে, অর্থাৎ স্ক্রুপের পাকের গতিতে, যদি কেহ চলিতে আরম্ভ করে, তাহার যাত্রার কখনো শেষ হইবে না।

বিশ্বের বাহির হইতে যদি কেহ বিশ্বকে দেখে, তবে উহা একটি বর্ধনশীল বিরাট জলবুদ্বুদের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। উহার গোলাকার বহিঃসীমার উপর দিয়া মানুষের ঘুরিয়া বেড়ান যদি সম্ভব হইত, তবে উহার অন্ত পাওয়া যাইত না। আপেক্ষিকতাবাদানুসারে বিশ্বের সসীম গোলকের দৈশিক প্রসারণ বা স্ফীতি হইতে পারে।

বিশ্বের অভ্যন্তরস্থ কোনো স্থান হইতে যদি সকল দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে বিশাল শূন্য মধ্যে অসংখ্য উজ্জ্বল বিন্দু ভাসিতেছে, এবং ঐ বিন্দুগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আকাশে সঞ্চরণ করিতেছে। এক একটি ঐরূপ বিরাট নক্ষত্র-সঙ্ঘকে এক একটি দ্বীপ-বিশ্ব বলে। মোটা-মুটি হিসাবে ২০,০০,০০০ দ্বীপ-বিশ্ব শূন্য দেশে দ্রুত বেগে দৌড়িতেছে। অতি দুরন্ত ধাবমান এক একটি দ্বীপ-বিশ্ব-পৃথিবী হইতে এক একটি নীহারিকাস্তুপ বলিয়া মনে হয়। আকাশের সব দিকেই এইরূপ নিহারিকাস্তূপ সমভাবে বিদ্যমান।

আমাদের সূর্যও অন্যান্য নক্ষত্রদের মত একটি নক্ষত্র। অসংখ্য দ্বীপ-বিশ্ব-সমূহের মধ্যে একটি দ্বীপ-বিশ্বের ইহা একটী নক্ষত্র। যে সকল নক্ষত্র আমরা খালি চোখে দেখিতে পাই, তাহারা আমাদের এই স্থানীয় দ্বীপ-বিশ্বের অঙ্গ।

এক একটী দ্বীপ-বিশ্বের আকৃতি বিরাট্ চ্যাপ্‌টান Rugby footballএর ন্যায় (চিত্র দেখ)।
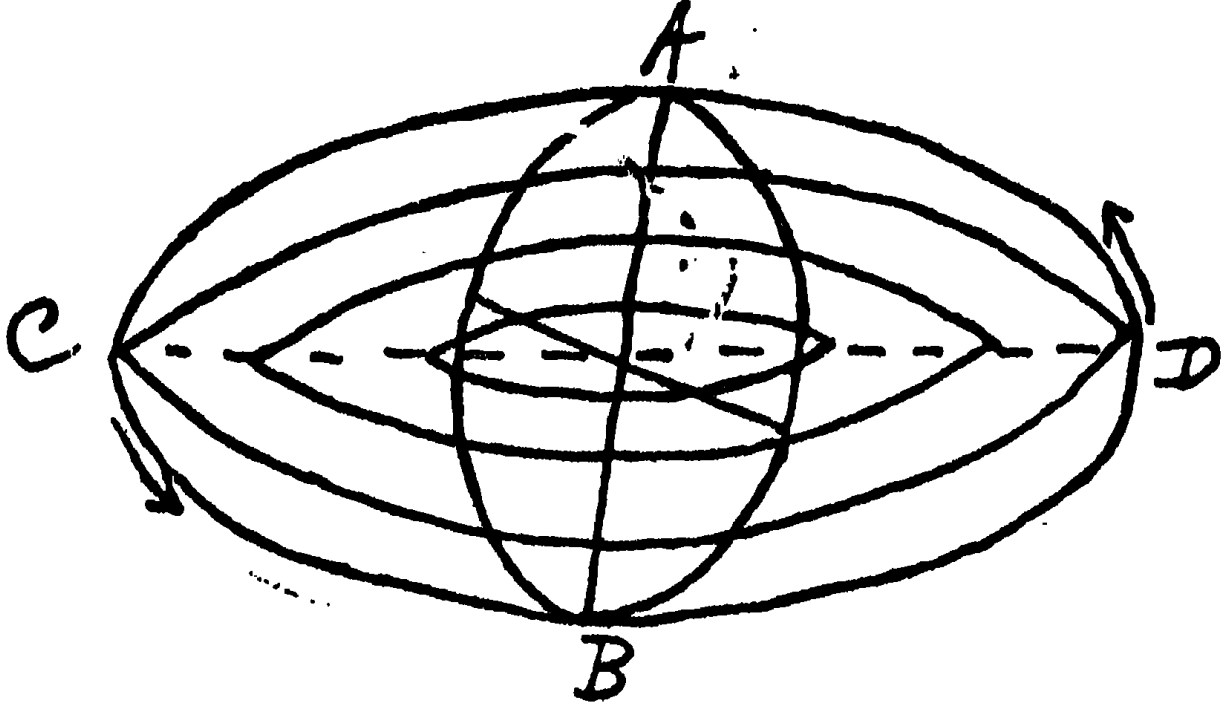
ইংরাজীতে এই আকারকে ellipsoid বলে। প্রত্যেক ellipsoidএর দুইটী অক্ষরেখা থাকে—একটী লম্বাদিকে, যেমন CD, এবং অপরটী প্রস্থেরদিকে, যেমন AB। প্রত্যেক দ্বীপ-বিশ্ব ছোট অক্ষরেখাটীকে মধ্যে রাখিয়া উহার চতুর্দিকে ঘুরিতেছে।

আমাদের স্থানীয় দ্বীপ-বিশ্বটীকে গ্যাল্যাক্সী (gallaxy) বলে। এবং অন্যান্য দ্বীপ-বিশ্বের ন্যায় গ্যাল্যাক্সীও উহার ছোট অক্ষরেখাটীকে বেষ্টন করিতেছে। আমাদের সূর্য নিজ দ্বীপ-বিশ্বের কেন্দ্র হইতে অনেক দূরে অবস্থিত।

গণনা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে, অক্ষরেখাকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে আমাদের দ্বীপ-বিশ্বের ৩,০০,০০০ বৎসর লাগে।

দ্বীপ-বিশ্বগুলি পরস্পর হইতে এত দূরে অবস্থিত যে তাহাদের অভ্যন্তরের কার্যাবলীর রহস্য অন্যান্য দ্বীপ-বিশ্ব জানিতে পারে না, আমরাও আমাদের দ্বীপ-বিশ্বস্থ পৃথিবী হইতে প্রত্যক্ষভাবে অধিক জানিতে পারি না। তবে, অনুমান হয় যে আমাদের দ্বীপের সহিত অন্যান্য দ্বীপের সাদৃশ্য আছে। পৃথিবী হইতে অন্যান্য দ্বীপ-বিশ্বগুলি এত দূরে যে প্রত্যেকটী যেন একটী নীহারিকা-পুঞ্জ বলিয়া বোধ হয়।

উহাদের ঔজ্জ্বল্য হইতে উহাদের দূরত্বের পরিমাণ অনুমিত হয়। অ্যাণ্ড্রোমিডা নামক নক্ষত্রমণ্ডলে যে বৃহৎ নীহারিকাপুঞ্জ আছে, তাহার ঔজ্জ্বল্য সর্বাপেক্ষা অধিক, কিন্তু পৃথিবী হইতে উহা এত দূরে যে খালি চক্ষে দেখিলে উহা একটী চতুর্থ শ্রেণীর নক্ষত্র বলিয়া বোধ হয়। অ্যাণ্ড্রোমিডার ঐ তথাকথিত নীহারিকাপুঞ্জ সত্যসত্যই নীহারিকা নহে, কিন্তু উহা কোটী কোটী নক্ষত্রসমন্বিত একটী বিশ্ব। কোটী কোটী নক্ষত্রের আলোক পুঞ্জীভূত হইয়া দূরত্ব বশতঃ একটী ক্ষুদ্র আকারের নক্ষত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এই নক্ষত্রটীর দূরত্ব ১০,০০,০০০ আলোক-বৎসর পরিমিত, অর্থাৎ উহা পৃথিবী হইতে ছয় মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মাইল দূরে। যে আলোক দ্বারা অ্যাণ্ড্রোমিডা-নীহারিকাপুঞ্জ পৃথিবী হইতে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা এক মিলিয়ন বৎসর পূর্বে উহা হইতে বহির্গত হইয়াছে, অর্থাৎ মনুষ্যজাতির উৎপত্তির বহু পূর্বে।

আমাদের গ্যাল্যাক্সীর বাহিরে অসংখ্য দ্বীপ-বিশ্ব দৃষ্টিগোচর হয়, এবং ঔজ্জ্বল্যে সবগুলি অ্যাণ্ড্রোমিডা অপেক্ষা ক্ষীণতর। আকারে ও ঔজ্জ্বল্যে ঐ সকল বিশ্বকে সমান ধরিলেও, উহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষীণপ্রভ বিশ্বটীও, সমানুপাতের নিয়মানুসারে, অ্যাণ্ড্রোমিডা অপেক্ষা ১৪০ গুণ দূরে, অর্থাৎ ১৪০ মিলিয়ন আলোক-বৎসর দূরে। উহা হইতে পৃথিবীতে যে আলোক পৌছে, তাহা প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইলের গতিতে সেখান হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া সম্ভবত ১৪০ মিলিয়ন বৎসরে পৃথিবীতে পৌছিয়াছে। ঐ আলোক যখন যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল তখন পৃথিবীতে সবেমাত্র জীবসৃষ্টি হইয়াছে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর যত বয়স হইয়াছে, ১৪০ মিলিয়ন বৎসর তাহার নিতান্ত সামান্য ভগ্নাংশ নয়, অর্থাৎ তাহার ৪০ ভাগের এক ভাগ।

নক্ষত্রগুলির আকার ও পরিমাণে, বিরাট বিশ্বের পরিমাণের তুলনায়, অধিক পার্থক্য বা অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না। সর্বাপেক্ষা ছোট নক্ষত্রাপেক্ষা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নক্ষত্রের পরিমাণ ৪০০ গুণের অধিক নয়। আমাদের সূর্য সর্বক্ষুদ্র নক্ষত্রাপেক্ষা ১০০ গুণের অধিক বড় নয়। তবে, আলোকের ঔজ্জ্বল্য ধরিতে গেলে নক্ষত্রদের মধ্যে অনেক বিভিন্নতা পাওয়া যায়।

আমাদের দ্বীপ-বিশ্বে বহুসংখ্যক নীহারিকা-রাশি বিদ্যমান। এই নীহারিকাকারের পুঞ্জগুলি আমাদের দ্বীপের বাহিরের নীহারিকাপুঞ্জ হইতে ভিন্ন প্রকৃতির। আমাদের দ্বীপের নীহারিকা-রাশিগুলি বায়ব্য—অতি পাতলা উজ্জ্বল গ্যাস-সম্ভূত। হয়তো ইহারা ছড়ান নক্ষত্র, অথবা কতকগুলি ভবিষ্যৎ নক্ষত্রের জনক।

এতদ্ব্যতীত কতকগুলি অন্ধকারময় নীহারিকাপুঞ্জও আছে। তাহারা সম্ভবতঃ পাতলা ধূলিরাশি। আলোক তাহাদের ভিতর দিয়া একদিক হইতে অপর দিকে যাইতে পারে না।

আমাদের দ্বীপ-বিশ্বের কতকগুলি নক্ষত্র-গোষ্ঠীর বিন্যাস-প্রণালীতে বেশ সমতা দৃষ্ট হয়। এক একটী নক্ষত্র-পরিবার এক একটি তালের ন্যায় গোল আকার ধারণ করিয়া আমাদের দ্বীপমধ্যে সীমান্ত প্রদেশ হইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে অবস্থিত। স্তরগুলি বাহিরের দিকে পাতলা, এবং যেমন যেমন কেন্দ্রের নিকটস্থ হইয়াছে, তেমনি তেমনি ঘন হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের অবস্থান হইতে দ্বীপটীর ellipsoid আকার স্পষ্ট ধরা পড়ে। সংখ্যায় এই স্তরগুলি ৭০টী।

পুঞ্জীভূত নক্ষত্রদের পরে কতকগুলি ছড়ান নিঃসঙ্গ নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে, ইহারাও দুই, তিন বা ততোধিক নক্ষত্রের সমষ্টি। তন্মধ্যে শতকরা ৫০টী যুগ্ম।

ব্যোমমার্গে বিচরণশীল বস্তুসমূহের পরবর্তী ক্রম গ্রহসমূহ। যথেষ্ট শক্তিশালী দুরবীক্ষণ না থাকাতে সূর্যমণ্ডল ব্যতীত অন্য কোনো নক্ষত্রের সহিত সংযুক্ত গ্রহমণ্ডল এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এই কারণে গ্রহবিষয়ক তথ্য আমাদের সম্যক উপলব্ধ হয় নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সূর্য্যের যে ৯।১০টী গ্রহ আছে, তাহাদের মধ্যেই সীমিত। সার জেম্‌স জীন্‌স গ্রহসমূহকে নিম্ন প্রদর্শিত আকারে সজ্জিত করিয়াছেন—

উপরে গ্রহগণের যে ক্রম দেওয়া হইল সেই ক্রমানুসারে সূর্য হইতে উঁহাদের দূরত্ব মোটামুটি ৪, ৭, ১০, ১৬, ২৮, ৫২, ১০০, ১৯৬, ৩৮৮ এই অনুপাতে। ০, ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪, ১২৮ এই শ্রেণীকে তিন দিয়া গুণ করিয়া প্রত্যেকের সহিত ৪ যোগ করিলে অনুপাতের সন্ধান পাওয়া যায়।

সূর্য

মার্কারী
ভীনাস
পৃথিবী
মার্স
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহসমষ্টি
জুপিটার
স্যাটার্ন
ইউরেনাস
নেপচুন
প্লুটো
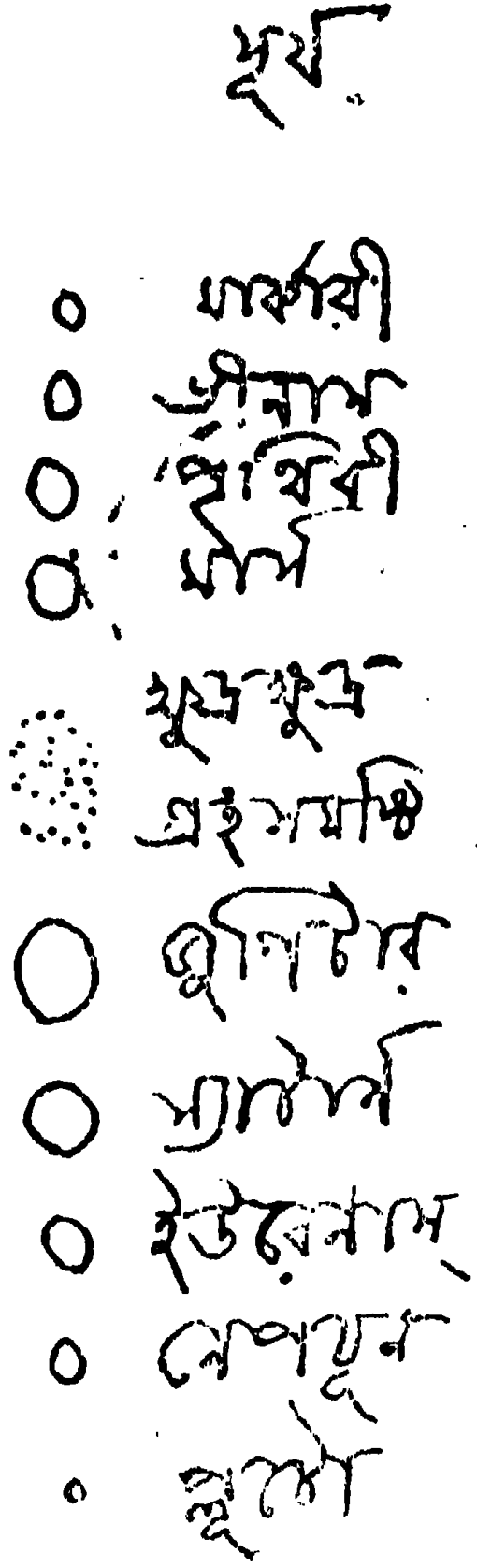
উপরের সংস্থানে দেখা যাইতেছে যে, বড় গ্রহগুলি মধ্যস্থলে এবং সর্ব্বাপেক্ষা ছোটগুলি দুই প্রান্তে। প্লুটো নামক গ্রহটী অল্প কাল হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। সকল গ্রহই এক দিকে (অর্থাৎ পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে) সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই সমতা দেখিয়া অনুমান হয় যে, সব গ্রহের উৎপত্তি এক নিয়মে হইয়াছে—হয় তাহারা এক সময়ে, অথবা অনুরূপ শক্তিসমূহের ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমার "সৃষ্টি-রহস্য" নামক পুস্তকে গ্রহগণের জন্ম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের পূর্ব্বেকার মত বিবৃত করিয়াছি তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

কোটী কোটী বৎসর পূর্বে সূর্য সমস্ত সৌরজগৎ ব্যাপিয়া বাষ্পাকারে বিদ্যমান ছিল। এই বাষ্পরাশি মধ্যে গতি ছিল। তাপের বিকিরণ বশতঃ ইহার সংকোচনের ফলে, ইহা যেমন ঘনীভূত হইতেছিল, তেমনি আলোড়িত হইতে-

ছিল। ক্রমশঃ ইহার ভারকেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া ইহাতে এক অভিনব গতির সৃষ্টি হইল। এই গতি পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে। বাষ্পরাশির আয়তনের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ইহার আবর্তনের বেগ বর্ধিত হইতে লাগিল। যতই বেগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই ইহার কেন্দ্রাপসরণ (centrifugal) বলও বাড়িতে লাগিল। কেন্দ্রাপসরণ বেগের ফলে এই তুরন্ধ পিণ্ডের নিরক্ষ দেশ স্ফীত হইল, এবং মেরু প্রদেশ চাপিয়া গেল। কেন্দ্রাপসরণ-বল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং পিণ্ডটী ঘনীভূত হইয়া ক্রমশঃ স্বল্পায়তন হইতেছিল। এই কারণে স্ফীত নিরক্ষ দেশ তরল পিণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া গেল। বিচ্ছিন্ন অংশটী অবিচ্ছিন্ন অবস্থার বেগেই ঘুরিতে লাগিল। অভ্যন্তরের তরল পিণ্ডটী স্বল্পায়তন হওয়াতে উহার বেগ অনেক বাড়িয়া গেল। তখন বাহিরের চক্রটী মধ্যবর্তী পিণ্ডকে বেষ্টন করিয়া অপেক্ষাকৃত কম বেগে উহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। কিন্তু ঘুরিতে ঘুরিতে উহার পরিধির এক স্থান কোনো কারণে দুর্বল হইয়া যাওয়াতে উহা সেই স্থানে ছিন্ন হইয়া গেল। ছিন্ন হইবামাত্র চক্রের যাবতীয় বস্তু এক স্থানে গুটাইয়া গিয়া একটী গোল পিণ্ডে পরিণত হইল, এবং যে বেগে চক্রটী ঘুরিতেছিল, প্রায় সেই বেগেই অভ্যন্তরস্থ পিণ্ডকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকিল। ইতিমধ্যে আর একটী বেগ উহাতে উৎপন্ন হইল, এবং এই বেগের প্রভাবে উহা নিজের মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে আবর্তিত হইতে লাগিল। এই প্রকারে তরল সূর্য্য-পিণ্ড হইতে পর পর নয়টি গ্রহের উৎপত্তি হইল।

এখন অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক সার জেম্‌স্ জীন্সের মত গ্রহণ করিয়াছেন। সে মত এই—এক হাজার মিলিয়ন বৎসর পূর্বে আমাদের সূর্য এবং সূর্য হইতে অনেক বড় অপর একটী নক্ষত্র পরস্পরের নিকটবর্তী হইয়াছিল। মধ্যাকর্ষণের বেগ বশতঃ উভয়ের তরল পিণ্ডে পর্বতপ্রমাণ উচ্চ জোয়ার উপস্থিত হইল, কিন্তু সূর্য ছোট বলিয়া উহার তরল পদার্থের স্ফীতি অধিক হইল। তাহারা ক্রমশঃ অধিক নিকটবর্তী হইতে থাকিলে, সূর্যের জোয়ার উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল। যখন উভয়ের মধ্যের ব্যবধান সর্বাপেক্ষা অল্প হইল, তখন সূর্যের ঐ তরল বস্তুরাশি নক্ষত্রটীর দিকে আকৃষ্ট হইয়া সূর্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইতিমধ্যে নক্ষত্রটী ক্রমশঃ সরিয়া গিয়াছে, এবং উহার আকর্ষণ কমিয়া গিয়াছে। বিচ্ছিন্ন তরল বস্তুরাশির অংশগুলি ক্রমশঃ গ্রহে পরিণত হইয়াছে।

মার্কারী, ভীনাস্, পৃথিবী, ও মার্সকে আভ্যন্তরীণ গ্রহ বলা হয়, এবং **জুপিটার, স্যাটার্ণ, ইউরেনাস্, নেপচুন ও প্লুটোকে** বহিঃস্থ গ্রহ বলা হয়।

ব্যোমমার্গে ভ্রমণশীল পিণ্ডসমূহ মধ্যে আরো কতকগুলি বস্তু আছে—যেমন উপগ্রহসমূহ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ-পরিবার, ধূমকেতু ও উল্কাপিণ্ড।

গ্রহগণের পরেই উপগ্রহগণের গুরুত্ব। **নেপচুন, ইউরেনাস্, সাটার্ণ ও জুপিটারের** ছোট ছোট উপগ্রহ আছে। আভ্যন্তরীণ গ্রহদিগের মধ্যে কেবল পৃথিবীরই **চন্দ্র** নামক উপগ্রহ আছে। উপগ্রহদের মধ্যে চন্দ্রের মর্যাদা প্রায় গ্রহদের সমান। পৃথিবীর সহিত চন্দ্রের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু অন্যান্য গ্রহের সহিত তাহাদের উপগ্রহের সাদৃশ্য নাই। পর্যবেক্ষণ দ্বারা অনুমিত হয় যে ঘূর্ণায়মান পৃথিবী এককালে দুই খণ্ডে বিভক্ত হওয়াতে চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, কিন্তু অন্যান্য গ্রহগণের উপগ্রহগুলি গ্রহগণের সহিত একই সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

সূর্য হইতে মার্স অপেক্ষা কিছু অধিক দূরে এবং **জুপিটার** হইতে কিছু কম দূরে এক গ্রহস্থানীয় বস্তু আছে, যাহা আকাশে ভাসমান কতকগুলি ছোট ছোট পিণ্ডের গুচ্ছ। এক একটী পিণ্ডের ব্যাস ৪০০ মাইলের কম নয়। ইহারা সকলে সমাজবদ্ধভাবে গ্রহগণের ন্যায় সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহাদিগকে যদি একীভূত করা সম্ভব হইত, তবে ইহারা "বোড" নামক বৈজ্ঞানিকের সূত্রানুসারে মার্স ও জুপিটারের মধ্যবর্তী গ্রহের স্থান অধিকার করিত। জীন্সের মতে এই পিণ্ডগুলি একটী অবিভক্ত গ্রহই ছিল, কিন্তু জুপিটারের অতি সন্নিহিত হওয়ায়, উহার আকর্ষণ বশতঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

ধূমকেতুরা কয়েক মাইল ব্যাস বিশিষ্ট এবং তদপেক্ষা আরো ছোট প্রস্তরখণ্ডের সমষ্টি, যাহারা এক যোগে একটী

অতি দীর্ঘ অক্ষরেখাবিশিষ্ট বৃত্তাভাস পথে সূর্যকে এক পাশের কেন্দ্রে (focus এ) রাখিয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

উল্কা আর কিছুই নহে, কতকগুলি ছোট বড় একক প্রস্তরখণ্ড, যাহারা অতি বেগে সূর্যমণ্ডলস্থ আকাশে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ পৃথিবীর বায়ু মণ্ডলে প্রবেশ করাতে বায়ুর সংঘর্ষে জ্বলিয়া উঠে।

অতএব বিশ্ব নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ দ্বারা নির্মিত। (এক মিলিয়ন মিলিয়নে এক বিলিয়ন হয়।)

(বৈজ্ঞানিক জগতে দূরত্ব-জ্ঞাপক একটী প্রথা কিছু কাল হইতে অবলম্বিত হইতেছে। আলোক এক সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল অতিক্রম করে। আলোকের গতির এই পরিমাণানুসারে দূরত্ব বর্ণিত হয়। কোনো স্থান হইতে কোনো স্থানের দূরত্ব এক আলোক-বৎসর বলিলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ স্থান হইতে ঐ স্থান পর্যন্ত আলোকের পৌছিতে এক বৎসর লাগিবে। অর্থাৎ উহাদের ব্যবধান মোটামুটি ১৮৬,০০০ × ৩৬৫ × ২৪ × ৬০ × ৬০ মাইল।)

পদার্থ	ব্যাস	দ্রব্য-মান
(১) বিশ্ব	১,৪০০,০০০,০০০ আলোক বৎসর	দশ বিলিয়ন বিলিয়ন সূর্য
(২) দ্বীপ-বিশ্বসমূহ	৩০,০০০ — ৩০০,০০০ আলোক বৎসর	২,০০—২০০,০০০ মিলিয়ন সূর্য
(৩) নক্ষত্রপুঞ্জ-সমূহ	২—১০০ আলোক বৎসর	১০০,০০০ সূর্য
(৪) গ্যাস-নীহারিকা-সমূহ	এক বিলিয়ন মাইল	১০,০০০ সূর্য
(৫) নক্ষত্রগণ	৪,০০০—৪০০,০০০ মাইল	½—১০০ সূর্য
(৬) গ্রহগণ	৪,০০০—৪০,০০০ মাইল	পৃথিবী = ৬,০০০ মিলিয়ন বিলিয়ন টন
(৭) উপগ্রহগণ	২০—৪,০০০ মাইল	চন্দ্র = ৭৫ মিলিয়ন বিলিয়ন টন
(৮) ক্ষুদ্র গ্রহসমূহ, ধূমকেতু ইঃ	৪৮০ মাইল অপেক্ষা কম	এক মিলিয়ন বিলিয়ন অপেক্ষা কম
(৯) ভূপৃষ্ঠস্থ আলগা বস্তুসমূহ যেমন প্রস্তর, বৃক্ষ, স্তন্যপায়ী জীবগণ	যৎসামান্য	১,০০০ টন অপেক্ষা কম
(১০) উল্কা, পোকা, মনুষ্য ইঃ, ছোট ছোট বৃক্ষ ইঃ	ধর্তব্যের মধ্যে নয়	২০০ পাউণ্ড হইতে এক আউন্সেও কম
(১১) ধুলিকণা, জীবাণু ইঃ, সংক্রামক পদার্থ ইঃ	ঐ	এক আউন্সের দশ সহস্র ভাগের এক ভাগ
(১২) পরিস্রুতির যোগ্য বা অযোগ্য বস্তুসমূহ	ঐ	অতি সামান্য
(১৩) ছুট্‌কান অণুসমূহ	ঐ	ঐ
(১৪) ছড়ান ইলেকট্রন ও প্রোটন	ঐ	ঐ

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল

বিজয়িনী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

৪র্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

[পরিচ্ছন্ন পর্ণকুটীর। সম্মুখে এক খণ্ড ভূমি একটী টগর গাছ, বিধবাবেশধারিণী স্বাতী ফুল তুলিতে তুলিতে গান গাহিতেছিল।—]

(গান)

যদি এ নয়ন জলে বহে যায় পারাবার
নীরবেই যাবে বহি জানিবে না কেহ আর।
এ হৃদয়কলি ফুটে নীরবে পড়িবে টুটে
কঠিন পাষাণ বুকে পড়িবে না রেখা তার।
নীরব দহনে দহি, নীরবেই যাব সহি
নীরবে মিলায়ে যাবে এ নীরব হাহাকার।

[বেড়ার ওপাশে রাজপথ। সাহেবী পরিচ্ছদে বিভূতি ও তাহার একজন পাইক পথ দিয়া যাইতেছে। বিপরীত দিক হইতে প্রজা মণিরুদ্দী সেখ কাস্তে হাতে মাঠে যাইতেছিল।—"সালাম করতা" বলিয়া পথ ছাড়িয়া দিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল।]

বিভূতি। মণিরুদ্দী, আমি ঢোল পিটিয়ে তোমাদের জানিয়েছি যে আমায় ও 'করতা', 'বাবু' না বলে 'সাহেব' বলবে।

মণিরুদ্দী। আজ্ঞে ও সব মনে আছে না মোটেই, বরাবর কইছি করতা। তাই মুখি আসে।

বিভূতি। পিঠে যা কতক চাবুক পড়লেই মনে থাকবে বোধ হয়।

মণি। এঁজ্ঞে তা থাকতি পারে—সালাম। (প্রস্থানোদ্যত)

(বিভূতি স্বাতীর দিকে দৃষ্টি পড়িতে বেড়ার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।)

স্বাতী। (চাহিয়া দেখিয়া)—হাঁ হাঁ করেন কি। অনুগ্রহ করে বেড়াটা ছোঁবেন না, ওতে আমায় কাপড় শুকোতে দিতে হয়।

বিভূতি। বেড়াটা কে বেঁধেছিল?—ভট্টাচার্জি না তুমি?

স্বাতী। ঐ মণিরুদ্দী।

বিভূতি। তাতে জাত যায় নি?

স্বাতী। না। সে তার পৈতৃক ধর্ম্ম পালন করছে, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে নি।

বিভূতি। (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) আমি তোমার কাছে ধর্ম্ম কথা শুনতে আসিনি। শীঘ্রই তোমার নামে আমার একটা চুরীর নালিশ করতে হবে। সেইটাই তোমায় জানিয়ে যেতে এসেছি।

স্বাতী। চুরির নালিশ? চুরির মাল আমার ঘরে আছে? না সেটা রাখতে এসেছ?

বিভূতি। অতটা সাধুগিরি ফলিও না। তুমি আমার বাড়ী থেকে শালগ্রাম চুরি করে আন নি?

স্বাতী। শালগ্রামে তোমার অধিকার কোন বিচারক দেবেন না—তুমি বিধর্ম্মী।

বিভূতি। শালগ্রামে না দিতে পারেন, কিন্তু শালগ্রামের সোনার পৈতেয় যে আমার অধিকার আছে, এটা অস্বীকার কোনো বিচারক করবেন না।

স্বাতী। (ক্ষণকাল বিহ্বলভাবে থাকিয়া) তুমি পৈতা ফেলেছ বলে শালগ্রামকেও পৈতে ছাড়া করতে চাইছ। আমি তা হতে দেবো না। এই আংটিটা (হাত হইতে খুলিয়া) বহুদিন পূর্ব্বে তুমিই আমাকে দিয়েছিলে। তোমার বাড়ী ছেড়ে আসবার সময় খগেনদার দেওয়া একখানা কাপড় মাত্র পরে আমি বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি। বাকী ছিল এই আংটীটি। পৈতায় বদলে এইটা

আমি তোমায় ফিরিয়ে দিচ্ছি। (আংটি দিতে গেল, বিভূতি হাত পাতিয়া দিল ; বিভূতিকে ঈষৎ বিচলিত দেখাইল, কিন্তু সহজেই সে আত্মসংবরণ করিয়া লইল।)

বিভূতি। (স্বগতঃ) এতটা কি—; নাঃ—কিসের মায়া? কিসের দয়া? আমার জীবনের যত দুর্ভোগ সব তোমারই জন্য। তুমি আমার জীবনের শনিগ্রহ। (প্রকাশ্যে) চুরির চার্জটা তাহলে তোমার উপর থেকে তুলেই নেওয়া গেল। (প্রস্থান)

(স্বাতী বেড়া ধরিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল)

স্বাতী। উঃ ভুলতে পারা এত কঠিন। ঘৃণা করতে গেলে ঘৃণা যে আসে না। প্রত্যাঘাত করতে গেলে সে আঘাত ফিরে যে নিজেরই বুকে বাজে। কি অভিশপ্ত এই নারী জীবন! বাজে! হাঁ বাজুক। তা বলে দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। নারীচিত্তের এই দৌর্ব্বল্যে পুরুষ সমাজের পতন ঘটে। আমি যাঁর কাছে শিক্ষা পেয়েছি তিনি আমাকে এই শিখিয়েছেন। উনি পুরুষদের মধ্যে খৃষ্টানী প্রচার করছেন, আমি মেয়েদের মধ্যে হিন্দুয়ানী প্রচার করছি। আমাদের মধ্যে এই রকমই চলুক। এক-দিন ভেবেছিলাম ওঁর সহধর্ম্মিনী হব। বাঃ বিধির বিধান ভাল।

(গান)

সাঙ্গ হয়েছে রণ
ক্লান্ত চিত্ত, অবলুণ্ঠিত, মাগিছে বিস্মরণ।
ভুল করেছিনু, ভুল করেছিনু, সে ভুল ভেঙ্গেছে মোর
স্বপ্ন দেখেছি, স্বপ্ন দেখেছি, ভেঙ্গেছে সে ঘুম ঘোর।
শতধাদীর্ণ বুক, লজ্জাবনত মুখ, খুঁজিছে সঙ্গোপন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[গ্রামের প্রান্তভাগ। মাঠের পাশ দিয়া গ্রাম ঘুরিয়া গিয়াছে। মাঠে চাষীরা অনেকে কাজ করিতেছে। কেহ কেহ লাঙ্গল কাঁধে করিয়া গরু তাড়াইয়া মাঠে নামিবার চেষ্টা করিতেছে। গরু তাড়াইবার "হেট্ হেট," "আরে মোলো" ইত্যাদি নানাবিধ শব্দ শোনা যাইতেছে। একখানা মুদির দোকান আছে। পাশে পোষ্টাফিস। দুই চারিজন গ্রাম্য ব্যক্তি বসিয়া গল্প করিতেছে। মাঠ হইতে চাষীদের গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছে—

ও তুই জহরী হয়ে জহর চিন্‌লি না
ভর দেখে মিলি পেতল ত্যাজ্জি করে চালি সোণা।

[তিন চারজন চাষী মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে লাঙ্গল কাঁধে পরস্পর কথা বলিতে বলিতে যাইতেছে।]

১ম ব্যক্তি। ও সাধু ভাই। ছাওয়ালেরে ল্যাখ্‌তে দে'ছ?

সাধুচরণ। আর ল্যাখা। পণ্ডিতমশয় কয় কি'না ছাওয়ালেরে কেরেস্তান কর। তবে পাঠশালে নেব।

১ম ব্যক্তি। আরে পণ্ডিতমশায় কস্ কারে? ও তো আমাগোর সেই নিধে। কেরেস্তান হয়ে কয় কি আমার নাম চ্যাল্লি। আমারে সব ক'বি ম্যাষ্টর।

মণিরদ্দি। (পিছন হইতে আসিয়া) আরে নিধে সে ত ম্যাষ্টর। আমাগোর জমিদার সে আবার কয় তেনারে ক'তি হবে ছায়েব। আরে ছিরকাল ক'লাম 'করতা মশায়" আর "গিন্নি মা"। তাঁগোর ছাওয়ালেরে কত কোলে করিছি, কাঁখে করিছি। আর আজ কিনা সে কয় আমি ছায়েব।

২য় ব্যক্তি। কস্ কি রে?

মণিরদ্দি। হাঁ গো চাচা হাঁ। ঠিকই কইছি। আবার কয় কিনা ছায়েব না কইলি বেতুয়ে পিঠের খাল খিচে লেবে।

অপর সকলে। আরে কসকি! এমন কথা ত জন্মে কখন শুনি নি। মা ঠাকরোণ থাতি না থাতি এ কি হচ্ছে কি?

জনৈক ব্যক্তি। আরে ও হ'ল এহনকার কালা-পাহাড়।

অপর সকলে। (সশঙ্কে) আরে চুপ চুপ। শুন্‌তি পাবে।

(তরকারীর ঝাঁকা মাথায় একজন ব্যাপারীর প্রবেশ)

এক ব্যক্তি। ও করতা। একবার নামাও ত। দেখি কি আছে।

(ব্যাপারী ঝাঁকা নামাইল। বাবুরাও কেহ কেহ দেখিতে উঠিয়া আসিলেন।)

একজন ভদ্রব্যক্তি। (একটা লাউ তুলিয়া লইয়া) কত দেবো রে?

ব্যাপারী। এজ্ঞে। দু পয়সা।

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি। বলিস্ কি রে? দু পয়সা? বাজারে নিয়ে গেলে তোলা লাগবে না? কেমন দেশ এটা! একটা আধলা দিচ্ছি; দিয়ে যা।

ব্যাপারী। (রাগিয়া উঠিয়া) আর তোলা দেবো না বাবু। এবার কেরেস্তান হব। মোর পিসুত ভাই হয়েছে। তার কিছুই লাগে না। এবার ঠিক করেছি আমিও হব।

সকলে। বলিস কি রে।

ব্যাপারী। হক কথাই বল্‌ছি বাবু। জমিদারবাবুর জুলুম দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। তোমরা সব শুধু চেয়েই দেখ আর যত দু পয়সার জিনিসের নেগে আধলা দিতে চাও,—আর আমরা সব না খায়ে শুকুয়ে মরি। হলামই না হয় কেরেস্তান। বাজারে তোলা নাগবে না; ছাওয়ালেরা মিনি খরচায় নেকতি পড়্‌তি পারবে। বাকী খাজনা মাপ হবে। সুবিধে কত বল দেখি?

জনৈক মুসলমান চাষী। কও ভাই। আর এট্টা সুবিধে আছে,—সেটার কথা ত কইলি না?

সকলে। কি কি? কি সুবিধে?

মুসলমান চাষী। খরচা বাঁচাবা। তুমি কেরেস্তান হলি তোমার ঘরে হিঁদুও খাবে না—মোছলমানও খাবে না। কিন্তু তোমার রইবে সব দোয়ার খোলা। হিঁদুর ঘরেও খাবা মোছলমানের ঘরেও খাবা। মজা কত।

(সকলে হাসিয়া উঠিল। কথা কহিতে কহিতে সকলে মাঠে নামিয়া পড়িল।)

কেষ্টখুড়ো। সব শুনলে ত বাবাজী। দেশে আর বাস করা ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠেছে। অথচ বাপঠাকুদ্দার ভিটে ছেড়ে যাবই বা কোথায়।

নিতাই। খুড়ো। যে চুলোতেই হক, কোথাও যেতেই হবে। পাঠশালা ইস্কুল সব বন্ধ করে দিলে ছেলেপিলে-গুলাকে ত আর গোমুখ্যু করে রাখা যাবে না।

(একখানা চিঠি পড়িতে পড়িতে নরেশ পোষ্টাফিস হইতে নামিয়া আসিল এবং কেষ্ট খুড়োর নিকট চিঠি পড়িতে পড়িতে গিয়া দাঁড়াইল।)

নরেশ। এই দেখ খুড়ো আমার সেই পিসতুত সম্বন্ধীর চিঠি। লিখেছে পাওনা থোওনা না থাকলেও মেয়েটী যখন ভাল তখন তাদের আপত্তি নাই। তোমাকে খুড়ো বিশে[ষ] চেষ্টা করে এই কাজটী করে দিতে হবে।

কেষ্ট খুড়ো। আরে আমি ত করে দিতেই চাই[।] গ্রামের মধ্যে এত বড় একটা আইবুড়ো মেয়ে এ রকম ক[রে] বসে থাকবে; তাতে কি গাঁয়ের কল্যাণ আছে? [না] সমাজের কল্যাণ হবে? কিন্তু মেয়েটা যে কিছুতে রাজী হচ্ছে না।

নরেশ। তাই বলে তোমরাও তাই শুনবে? এত ব[ড়] একটা অনাচার সমাজের বুকের উপর ঘটতে দেবে?

নিতাই। একে অনাচার কেমন করে বলছ নরেশদা[?] একটা অনাথা কচি-মেয়ে নিরাশ্রয় হয়ে তপস্বিনীর ম[ত] জীবন কাটাচ্ছে। এর ভেতর অনাচার তুমি পেলে কো[থা] থেকে?

নরেশ। একটা বিশ বছরের ধাড়ী মেয়ে যদি থুবে[ড়ী] হয়ে সমাজের বুকে বসে আর পাঁচটা মেয়েকে কুদৃষ্টা[ন্ত] দেখায় তবে তার চেয়ে বেশী অনাচার আর কিসে হয় শুনি[?]

নিতাই। পুরাণে আছে উমাও এমনই করে কুমা[রী] অবস্থায় দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন।

কেষ্ট খুড়ো। দ্যাখ নিতাই, ছেলে মুখে জ্যেঁপো ক[থা] সহ্য হয় না। ঠাকুর দেবতার আর মানুষের কথা কি এ[ক] হল? না নরেশ, তুমি ঠিকই বলেছ; যেমন করেই হয় মেয়েটাকে পার করতে হবে। দরকার হয় দুদশ টা[কা] চাঁদাও না হয় তোলা যাবে। আচ্ছা ও কি জমিদার বা[ড়ী] থেকে আঁচলে বেঁধে খোঁপায় গুজে কিছুই আনে নি? বেলা সবাই মিলে একবার না হয় মেয়েটার কাছে যাও[য়া] যাবে এমন। খগেনকেও সঙ্গে নিতে হবে।

(খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকের পরিচ্ছদ পরিহিত জনৈক ব্যক্তির প্রবেশ)

আগন্তুক। মিঃ ইমানুয়েল রায়চৌধুরীর বাড়ী কোথায়?

কেষ্টখুড়ো। ও নামের কেউ ত এখানে থাকেন না।

আগন্তুক। হাঁ থাকেন বই কি। মিঃ রায়চৌধু[রী] এখানকার জমিদার।

নিতাই। ঐ সোজা ডানদিকে গিয়ে বাঁ দিকে ঘু[রে] কিছুদূর গিয়ে আবার সোজা ডান হাতি রাস্তা ধরে যাবেন সামনেই তাঁর বাড়ী পাবেন। ফটকওলা প্রকাণ্ড বাড়ী।

কেষ্ট খুড়ো। (জনান্তিকে) একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব তার মিতে। ইনি আবার কি মতলবে এলেন কে জানে! নিতাই, তুই আবার বাড়ীর সন্ধান দিতে গেলি কেন?

নিতাই। আমি না দিলেই কি আর জানতে পারে না? (আগন্তুকের প্রতি) আপনি কোথা থেকে আসছেন?

আগন্তুক। কলিকাতার ব্যাপটিষ্ট মিশনের অধ্যক্ষরা মিঃ চৌধুরীর সত্য ধর্ম্মানুরাগে অত্যন্ত প্রীত হয়েছেন এবং তাঁদের পক্ষ থেকে সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন।

কেষ্টখুড়ো। (পিছনে ফিরিয়া মুখ ভেঙ্গাইয়া) রাজা করেছেন। সশরীরে স্বর্গে যাবেন।

তৃতীয় দৃশ্য।

(আমেরিকার বোষ্টন নগরস্থ আশ্রম। কয়েকজন মার্কিণ শিষ্য-শিষ্যাপরিবৃত অবস্থায় আনন্দস্বামী উপবিষ্ট। সম্মুখে একখানি পুস্তক খোলা রহিয়াছে। স্বামীজী তাহাদের নিকট হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছিলেন।)

আনন্দস্বামী। I hope you thus see the great catholicity of Hinduism.

জনৈক শিষ্য। But, Master! I yet fail to realise how can one stick to the tenets of one particular religion and still may retain respect for others.

আনন্দস্বামী। According to Hindu belief every religion leads its votaries to the same vast ocean of truth. Therein lies the wide catholicity of Hinduism. It has been very aptly said in our sacred books,—

"একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ য পশ্যতে স পশ্যতি

Abstract Theology and its rituals are the same in the eye of a Hindu.

(রেবার প্রবেশ। ঘরের একপাশ দিয়া আনন্দস্বামীর নিকটে গিয়া)

রেবা। It is now time for you to rest.

(ঘড়ি দেখাইল। আনন্দস্বামী শিষ্যদিগের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন। শিষ্যগণ কেহ মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া, কেহ বা ললাটে যুগ্মকর স্থাপন করিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল।]

একটি শিষ্যা (রেবার নিকটে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া) My Divine Sister! How lucky, how very lucky you are!

রেবা। We are all so, my dear sister; not I alone!

(সকলে চলিয়া গেলে রেবা আনন্দস্বামীর পায়ের কাছে আসিয়া বসিল। তাঁহার পায়ের উপর হাত রাখিল)

রেবা। বাবা, আজকাল আমি তোমাকে বড্ড কম পাচ্ছি!

আনন্দস্বামী। (হাসিয়া) কেন, তুমি ত এখন ভগিনী ত্রিগুণাতীতা। তোমার এখন বাবা মাদের কি দরকার?

রেবা। (আনন্দস্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া) আপনার কাছেও আমি ত্রিগুণাতীতা?

আনন্দস্বামী। (সস্নেহে মাথায় হাত রাখিলেন) রেবা, সন্ন্যাসীর বাসা এক জায়গায় অনেকদিন বাঁধা হয়ে গেল। এবার নীড় ভাঙবার সময় হয়েছে। চল, বেরিয়ে পড়ি।

রেবা। (উঠিয়া বসিয়া উৎসাহের সহিত) কোথায়? ভারতবর্ষে?

আনন্দস্বামী। হাঁ ভারতবর্ষেই। তবে পথে জাপান এবং চীন হয়ে যেতে হবে।

রেবা। (সাগ্রহে) সে বেশ হবে। একদিন আমাদের দেশ থেকে শত শত প্রচারক চীন জাপানে গিয়ে সেখানকার লোকদের মনুষ্যত্ব প্রদান করে এসেছিলেন। আজ আমরা কূপমণ্ডুক হয়ে পড়েছি।

আনন্দস্বামী। কিন্তু চীনের কাছে আমাদের ঋণও বড় কম নয় মা। আজকে যে আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষকে খুঁজে পাচ্ছি তা ঐ চীন পরিব্রাজকদের জন্যই।

রেবা। কিন্তু বাবা, আর একটা যে বিপদ হবে?

আনন্দস্বামী। কি বিপদ মা?

রেবা। সেখানকার লোকদের সঙ্গে আমরা কি ভাষায় কথা কইব?

আনন্দস্বামী। কেন, ইংরাজীতে? সেখানকার শিক্ষিত লোকেরা অনেকেই ইংরাজী জানেন। তুমি ত এখন ইংরাজীতে বেশ ভাল বক্তৃতা দিতে পার। আমি যখন ক্লান্ত হব তখন তুমি আমার হয়ে বলবে।

রেবা। সভায় উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌তে আমার যে বড় ভয় করে!

আনন্দস্বামী। ভয় কি মা? ভয়ের ত কিছু নেই। জানইত

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"

চতুর্থ দৃশ্য।

(ঘরের দাওয়ায় বসিয়া স্বাতী টেকোর পৈতা কাটিতে কাটিতে গাহিতেছিল।)

(গান)

প্রিয়তম হে, হৃদি মন্দিরে রয়ো জাগি,
আমি সকলই ত্যজিব তোমারই তরে, তব প্রেম লাগি।
প্রেম-ফুল তুলে ভরিব ডালা, প্রেমফুল চুনি' গাঁথিব মালা,
ফিরিব সবার দুয়ারে দুয়ারে তব প্রেম সুধা মাগি।
সুখ দুঃখ অভিমান, চরণে করিব দান,
সংসার সুখ তুচ্ছ গণিব তব অনুরাগে রাগি।

হে শ্রীধর তোমার চরণে যেন চিরদিন মতি থাকে। (সুতা খুলিতে খুলিতে) আর হাটে এক কুড়ি পৈতা বিক্রি হয়েছে। এবার ত দেখছি এক কুড়ি পুরা করতে পারলাম না। দুর ছাই আর ভালও লাগে না। (টেকো ফেলিয়া দিল) না লাগলেই বা হবে কি। (পুনরায় তুলিয়া লইয়া) সব জ্বালা গেলেও পেটের জ্বালা ত ঠিক আছে।

কেষ্টখুড়ো। (বাহির হইতে গলা খাঁকারি দিয়া) স্বাতি! ভিতরে আছ?

স্বাতী। কে আপনি?

কেষ্টখুড়ো। (বাহির হইতে) আমি তোমার কেষ্ট খুড়ো। (বেড়া ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। পিছনে পিছনে নিতাই, নরেশ এবং আরও জন কয়েকের প্রবেশ।)

স্বাতী। (কতকটা বিরক্ত এবং বিব্রত হইয়া বস্ত্রাদি সম্বরণ করিতে করিতে) আমার কাছে আপনাদের কি দরকার?

কেষ্ট খুড়ো। (দাওয়ায় উঠিয়া) তোমার এখানে বসবার আসন টাসন নেই? দু একখানা বার কর না।

স্বাতী। পূজার আসন ত আমি অন্য সময় বার করি না।

কেষ্ট খুড়ো। সতরঞ্চি কি মাদুর? তাই না হয় একটা বিছিয়ে দাও। কাপড় চোপড় না হলে যে সব ময়লা হয়ে যাবে।

স্বাতী। আমার শোবার মাদুরে আমি অন্য কাউকে ত বসতে দিই না।

কেষ্ট খুড়ো। এ মুস্কিলে ফেল্লে দেখছি। (কোনমতে উবু হইয়া বসিয়া) তোমাকে আমরা একটা কথা জানাতে এসেছি, স্বাতি! তুমি যে গ্রামের মধ্যে বসে এই সব অনাচার করছ এটা কি ভাল হচ্ছে?

স্বাতী। অনাচার?

কেষ্ট খুড়ো। অনাচার নয়? এই যে তুমি এত বড় মেয়ে আইবুড়ো হয়ে বসে রইলে, এর চেয়ে বড় অনাচার কখন হিন্দুর ঘরে হয়েছে? বলনা কেন? তুমি নিজেই কি দেখেছ?

(স্বাতী নিরব রহিল

কেষ্ট খুড়ো। আমরা সেকেলে বুড়োরা যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ গ্রামের মধ্যে এ সব মেলেচ্ছ কাণ্ড, এ সব ফিরিঙ্গি বিবিয়ানী ঢং হতে দিতে পারি না। এর একটা বিহিত আমাদের করতেই হবে।

স্বাতী। কিন্তু গ্রামের মধ্যে যে সাহেবীয়ানার ঢং চলছে কই তার ত আপনারা কোন প্রতিবাদ করছেন না।

জনৈক ব্যক্তি। আরে তিনি হলেন গ্রামের জমিদার। তাঁর কথার উপর কথা কইবার সাধ্য আমাদের কারো আছে না, ক?

নিতাই। আপনারা তাহলে শক্তের ভক্ত, নরমের যম। তাই বলুন।

কেষ্ট খুড়ো। দেখ নিতাই। পাগলের মত বকিস্‌নি। মেয়ে আর পুরুষ হল এক? পুরুষ যদি জাহান্নামে যায় তাহলে মেয়েদেরও কি সঙ্গে যেতে হবে?

নিতাই। অগত্যা। "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।"

নরেশ। তুমি থাম, নিতাই। শাস্ত্র নিয়ে অপব্যাখ্যা কোর না। শোন স্বাতি! তোমাকে এ রকম অসহায় অবস্থায় চিরদিন ফেলে রাখা আমাদের কর্ত্তব্য নয়। সে দিক থেকেও আমাদের একটা দায়ীত্ব আছে। জমিদার গিন্নি তোমায় নিজের মেয়ের মত করে মানুষ করেছিলেন। তুমি যে এ রকম দুঃখ দুর্দ্দশায় পড়ে রয়েছ এতে আমরাও প্রত্যবায়ের ভাগী হচ্ছি।

স্বাতী। আপনারা আমায় কি করতে বলছেন?

নরেশ। আমরা স্থির করেছি তোমার বিয়ে দেবো। একটি ভাল পাত্র আমরা ঠিক করেছি। আর খরচ পত্র; তা আমরা নিজেরাই এক রকম করে চালিয়ে নেবো। বলি, জমিদার গিন্নীর সবই ত তোমার হাতেই ছিল। দু এক-খানা সোণাদানা কিছু সঙ্গে এনেছ ত?

স্বাতী। (স্থির কণ্ঠে) আমি কিছুই সঙ্গে আনিনি। কিন্তু আপনারা ত খুব হিন্দুয়ানী ছড়াচ্ছিলেন। আপনারা কি আজকাল বিধবা বিয়ে সমর্থন করছেন নাকি?

সকলে। (সবিস্ময়ে সমস্বরে) বিধবা-বিয়ে?

স্বাতী। আমাকে দেখে আপনাদের কি মনে হয়?

কেষ্টখুড়ো। আমিও ঠিক এই কথাটাই বলব মনে করছিলাম। তখন যে তুমি অনাচারের কথা শুনে অবাক হয়েছিলে; তা বলি হাঁ গা বাছা, কুমারীর পক্ষে বিধবার আচার পালন কি অনাচার নয়?

স্বাতী। আমি সত্যই যে বিধবা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে। সত্যি বিধবা! তবে যে জমিদারের সঙ্গে তোমার বিয়ে স্থির হয়ে গেছল, তা কি করে হচ্ছিল?

স্বাতী। সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। খগেনদা সব জানেন। আপনারা ইচ্ছা করলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

(টেকো প্রভৃতি লইয়া উঠিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।)

কেষ্টখুড়ো। (বিমূঢ়ভাবে) অ্যাঁ! সত্যিই বিধবা?—কিন্তু—

নরেশ। না। তা হতে পারে না। স্বধর্ম্মনিষ্ঠা জমিদার গিন্নী একটী বিধবার সঙ্গে তাঁর একমাত্র ছেলের বিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন একথা যদি কেউ তামা তুলসী হাতে করে বলে তাহলেও আমি বিশ্বাস করি না।

অপর একজন। কিন্তু তা না হলে মেয়েটা বিধবা সেজেই বা আছে কেন? এরই বা মানে কি?

কেষ্টখুড়ো। শুনেছি মাছ খায় না, একবেলা মাত্র খায়। এরই বা মানে কি? অ্যাঁ! নাঃ ব্যাপারটা ভাল করে জানা দরকার। (উঠিয়া দাঁড়াইল) খগেনের কাছে যেতে হ'ল। চল হে সব, চল। দুর্গে দুর্গতিনাশিনী!

নরেশ। তাই চলুন। আমি কিন্তু অমনি ছাড়ছি না। ভাল করে জান্‌তে চাই। খৃষ্টান হবার জন্য যে নিজের ছেলেকে ত্যাগ করল সে যাচ্ছিল বিধবার সঙ্গে বিয়ে দিতে? কলিকালে কি সবাই ডুবে ডুবে জল খায়। অ্যাঁ!

(সকলের প্রস্থান। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রমথ প্রবেশ করিল।)

প্রমথ। (দ্বারে করাঘাত করিয়া) স্বাতি! দোর বন্ধ করে কি করছ? দোর খোল। (স্বগতঃ) কেষ্টখুড়োর দল যা রাস্তা ফাটিয়ে চল্‌ছিলেন, না জানি মেয়েটাকে কি সব বলে গেছেন।

স্বাতী। (দ্বার খুলিয়া) কে, প্রমথদা যে। শুনেছিলাম তুমি দেশত্যাগী হয়েছ। হঠাৎ যে আবার ফিরে এলে?

প্রমথ। মানুষ যা করে তা হঠাৎই করে, স্বাতি! ভেবে চিন্তে যুক্তি পরামর্শ করে যা করতে যাওয়া যায় সেটা করাই যায় না। যাক্ সে কথা। তুমি ভাল আছ?

স্বাতী। প্রশ্নটা আমারই করা উচিৎ ছিল, প্রমথদা। কারণ দেখছি তুমি ভাল নেই।

প্রমথ। ভাল থাকার দিন আমাদের দুজনকারই ফুরিয়ে গেছে, স্বাতি! দেশত্যাগী হয়েছি বটে, কিন্তু দেশকে

ভুলতে পারছি কই? দেশত্যাগী আমি যে স্বেচ্ছায় হইনি তাও তোমার অজানা নয়। দেশে আমায় টিঁকতে দিলে কই? নেহাৎ অতিষ্ঠ হয়েই আমি বেরিয়ে গেছি।

স্বাতী। তার জন্ম দুঃখ করবার কি আছে, প্রমথদা? পুরুষ মানুষ আর কবে চিরদিন ভিটে কামড়ে পড়ে থাকতে পায়?

প্রমথ। তা পায় না বটে। আর আমারও ভিটের উপর মায়া করবার কিছু নেই। তার এক পাশে উঠেছে গির্জ্জা; আর অন্য পাশে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার হচ্ছে পাঠশালার নাম দিয়ে!

স্বাতী। (ম্লান হাস্যের সহিত) নব প্রেমের বন্যার বেগ কিছু বেশীই হয়ে থাকে সে কথা ভুলে গেলে চলবে কেন, প্রমথদা?

প্রমথ। কিছুই ভুলিনি, স্বাতি! ঐটুকু মাত্র না করে ও যদি আমার "শির লে আও" বলে হুকুম জারি করত তাতেও আমি বেশী আশ্চর্য্য হতাম না। সে সব কথা থাক্। এবার আমি তোমায় এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছি।

স্বাতী। হঠাৎ তোমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি কে দিলে প্রমথদা?

প্রমথ। আরো দু চার জনের নাম করা যেতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে যিনি নেতৃস্থানীয় তিনি আমার বিবেক।

স্বাতী। বিবেক অনেক সময় অবিবেকীর মত পরামর্শ দেয়, ওর কথা শুনো না। (হাসিল)

প্রমথ। (হাসিয়া) যেমন তোমায় দিচ্ছে!

স্বাতী। প্রমথদা, তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে। আমার এখানে কিন্তু মাটিতে বসা ছাড়া উপায় নাই।

প্রমথ। তাই বসা যাক্। (উভয়ে বসিল।)

(বাহিরে একদল ছেলে গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।)

(গান)

ওরে পাতকি, ভব পারে যাবার উপায় করলি কি?
ও তোর ব্রহ্মা মহেন্দ্র কৃষ্ণ ভবেন্দ্র
তারা আপন পাপেই হাবুডুবু
তোমার উপায় করবে কি?

প্রমথ (চমকিয়া উঠিয়া) এ কি স্বাতি? সত্যি মানুষ এত নিচে নামতে পারে?

স্বাতী। কেন পারবে না প্রমথদা? নামবার পথ খুব ঢালু হয়। খুব সহজেই গড়িয়ে পড়া যায়। ব্যাপারটা কি জান? স্কুলে প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশন। হিন্দু এস ডি ও কে প্রাইজ দিতে আনা হবে। তাঁর অভ্যর্থনার এই সব আয়োজন হচ্ছে।

প্রমথ। বাঃ; খুব সুখে আছ স্বাতি! আমি যা হক উদ্ধার হয়ে গেছি।

স্বাতী। যাকগে। আজ রাত্রে আমার এখানে নারায়ণের প্রসাদ পাবে?

প্রমথ। কিন্তু পেট ভরবে ত? আমার কিছু পেটের জ্বালা ধরেছে।

স্বাতী। তোমার মুখ দেখেই তা বুঝতে পারছি। সেইজন্যই হঠাৎ অতিথি সেবার আগ্রহ হ'ল। তা হলে এক কাজ করা যাক। অতিথি সেবা উপলক্ষ্য করে আজ আমার নারায়ণের মচ্ছব হোক। তুমি আমার চাট্টি ঘি ময়দা এনে দাও। আর ঐ সঙ্গে খগেনদাকেও বলে এস। বেচারী আমার জন্য করে ঢের। এই উপলক্ষ্যে এক দিন ব্রাহ্মণ ভোজন করাই। (হাসিল।)

প্রমথ। তা' না হয় যাচ্ছি। অমনি তোমার জন্য এক জোড়া পেড়ে সাড়ি কিনে আনিনা, এ সব কি ছেলে-মানুষী তুমি করছ, বল দেখি?

স্বাতী। ছেলেমানুষী ত কিছু নয়, প্রমথদা, বরং বুড়ো মানুষীই বলতে পার। তুমি ত' জানই মা তাঁর শেষ মুহূর্ত্তে আমাকে তাঁর বিধবা পুত্রবধূ বলে স্বীকার করে গেছেন?

প্রমথ। কিন্তু সেই সঙ্গেই তোমাকে পুনরায় বিবাহ করবার অনুমতিও তিনি দিয়ে গেছেন, সে কথাটাই বা ভুলছ কেন?

স্বাতী। (হাসিয়া) কিন্তু তার সঙ্গে যে "ইচ্ছা হলে" কথাটা ছিল সে কথাটা কি খগেনদা তোমায় বলে নি? আচ্ছা, মজার লোক ত? না তুমি বোধ হয় ওটা ইচ্ছা করেই ভুলে যাচ্ছ? ইচ্ছা আর হল কই?

প্রমথ। ইচ্ছা না হওয়ার কি কোন বিশেষ কারণ আছে স্বাতি?

স্বাতী। সব কাজের ত কারণ থাকে না, প্রমথদা, অনেক কাজ অকারণেও করতে হয়। হাঁ, তুমি কিছু আলু পটলও বরং ঐ সঙ্গে নিয়ে এস।

প্রমথ। তা আন্‌ছি। (উঠিল) কিন্তু,—তুমি কি এখানে ঐ সব ব্যাপারের মধ্যে টি঳কে থাকতে পারবে?

স্বাতী। টি঳কে থাকতে পারব না? কি যে তুমি বল প্রমথদা। এ যে আমার শ্বশুর-বাড়ীর দেশ। এই শ্রীধর নিজে আমায় রক্ষা করছেন। কার সাধ্য এখান থেকে আমায় উচ্ছেদ করে। আমার ভবিষ্যৎ আমি গড়ে নিয়েছি; তুমি আমার জন্য একটুও ভেব না আর, প্রমথদা। (পরিবর্ত্তিত কণ্ঠে) তুমি একটু শীঘ্র করে ফিরো কিন্তু—; আমি ততক্ষণ অন্য কাজ সব সেরে নিইগে।

(ভিতরে চলিয়া গেল।)

প্রমথ। (কিছুক্ষণ মুহ্যমানভাবে থাকিবার পর) স্বাতীকে আমি চিনি। তার সঙ্কল্প অপরিবর্ত্তনীয়। অত্যাচারী বিধর্ম্মীটাকে সে এখনও ভুলতে পারে নি, এবং তা চায়-ও না! অভাগা বিভুতি! কি রত্নই তুমি হেলায় হারালে!

(প্রস্থান।)

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

প্রশ্নোত্তর

শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় এম-এস-সি, পি-এচ-ডি

সেদিন চাঁদিনী রাতে
প্রিয়া মোর ছিল সাথে,
ঘুমভরা ধরণীর
নীরব সে জোছনাতে।

লীলায়িত তনুটিরে
লীলাভরে ঘিরে ঘিরে
রূপালি আলোর স্রোত
ঝরেছিল আঙ্গিনাতে।

প্রিয়ারে শুধানু আমি,—
"আমার শুনিতে সাধ,
তুমি কি আমার প্রিয়া,
অথবা আকাশে চাঁদ!"

হাতদুটি হাতে নিয়া
হাসিয়া কহিল প্রিয়া
"তুমি যে আকাশ মোর
চাঁদ হয়ে আছি তাতে।"

রাজপুত্র বিভূতিচন্দ্র

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম্‌-এ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতিরূপে পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যখন 'বাঙ্গালার গৌরব'-কথা বিবৃত করিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালী জাতি উৎকর্ণ হইয়া বৌদ্ধ মহাপণ্ডিত বিভূতিচন্দ্রের কথাও শ্রবণ করিয়াছিল। একে বাঙ্গালার অতীত গৌরবের কাহিনী, তদুপরি শাস্ত্রী মহাশয়ের অপূর্ব্ব প্রকাশভঙ্গী, কাজেই সে কাহিনী এই 'আত্ম-বিস্মৃত' জাতির মন বিমুগ্ধ ও পুলক-চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কি? বেণ্ডাল সাহেব প্রণীত কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির ক্যাটালগে উল্লিখিত শান্তিদেবের 'শিক্ষাসমুচ্চয়ে'র একখানি পুঁথির পুষ্পিকায় "দেবধর্ম্মোয়ং প্রবরমহাযানযায়িনো জগদ্দল-পণ্ডিত-বিভূতিচন্দ্রস্য"—লেখা দেখিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ই সর্ব্ব-প্রথম বিভূতিচন্দ্রকে বাঙ্গালী অনুমান করিয়াছিলেন, কারণ মহাযান-পন্থী বিভূতিচন্দ্র জগদ্দল নামে যে বৌদ্ধ-বিহারে থাকিতেন, তাহা বাঙ্গালা-দেশে অবস্থিত ছিল। বিভূতিচন্দ্র সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন, "এই (জগদ্দল) বিহারে অনেক বড় বড় ভিক্ষু থাকিতেন, তাঁহাদের মধ্যে বিভূতিচন্দ্র প্রধান। বিভূতিচন্দ্র অনেকগুলি সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থের টীকা টিপ্পনী লিখিয়াছিলেন। যখন তিব্বতদেশে এই সকল বৌদ্ধগ্রন্থ তর্জ্জমা হইতেছে, তখন তিনি অনেক পুস্তকের তর্জ্জমায় সাহায্য করিয়াছেন, এবং নিজেও দুই চারিখানি পুস্তক তর্জ্জমা করিয়াছেন।" (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২১, পৃঃ ২৬৫)।

কিন্তু বিভূতিচন্দ্রের আসল বা আদি পরিচয়টা কি? সে সম্বন্ধে কোনও কথা শাস্ত্রী মহাশয় উদ্ধার করিতে পারেন নাই। কিন্তু বিভূতিচন্দ্র যেমন-তেমন বংশের ছেলে নয়, তিনি ছিলেন রাজপুত্র। শ্রীধরের 'বজ্র চর্চিকা-কর্ম-সাধন' নামে পুস্তকখানির যে তিব্বতীয় অনুবাদ করিয়াছিলেন বিভূতিচন্দ্র ও তিব্বত দেশীয় প্রজ্ঞারত্ন, তাহাতে স্পষ্ট ভাষায় বিভূতিচন্দ্রকে 'রাজপুত্র' বলা হইয়াছে। এই রাজাটি কে, তাঁহার নাম কি, কোন্ বংশ, তাহা জানি না, তিনি কোন স্থানে রাজত্ব করিতেন তাহাও অজ্ঞাত,—কেবল জানি তাঁহার আত্মজ বিভূতিচন্দ্রের চিত্ত একদা ভোগ-লালসার প্রতি, বিষয়-বৈভবের প্রতি, সংসারের প্রতি নিদারুণ বীতস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তিনি অজ্ঞাত কোনও আলোকের সন্ধানে, দীর্ঘ দিন পূর্ব্বের আর এক রাজপুত্রের পবিত্র নাম স্মরণ করিতে করিতে, কাষায় বস্ত্র ধারণ করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদের সকল বিলাস-সম্ভোগ, দাস-দাসী, সৈন্য-সামন্ত, সিংহাসন, সবই পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, জীবন-পথের সঙ্গী যাঁহারা তাঁহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না, বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিয়া তিনি গিয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন।

গ্রন্থকার, টীকাকার, অনুবাদক ও সংশোধক হিসাবে 'তোঙ্গুরে' যে বহু সংখ্যক পুস্তকের সহিত বিভূতিচন্দ্রের নাম জড়িত আছে, তাহাতে তাঁহার নামের সহিত কতগুলি বিশেষণ দেখা যায়, যথা 'পণ্ডিত', 'মহাপণ্ডিত', 'উপাধ্যায়', 'আচার্য্য', 'ভারতবাসী', 'জগদ্দলবাসী' ইত্যাদি। 'লুহি-পাদাভিসময় বৃত্তি', 'ষড়ঙ্গযোগটীকা', 'জ্ঞানচক্ষু সাধন' প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তকে আবার 'পূর্ব্ব ভারতে জগদ্দল-বিহারস্থ' বলিয়া কথাটা পাওয়া যায়। কিন্তু এই বিহারটি বাঙ্গালার ঠিক কোন জায়গায় অবস্থিত ছিল? ইহার উত্তর আছে সন্ধ্যাকর-নন্দীর 'রামচরিত' নামক কাব্যে,—বিহারটি ছিল রামাবতী নগরীতে। রামাবতী পাল-সম্রাট রামপালের সৃষ্টি, এই নূতন নগরীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া মহা-রাজাধিরাজ রামপালদেব কিরূপে ইহাকে সুশোভিত করিয়াছিলেন তাহার এক বিশদ বিবরণও 'রামচরিতে'

আছে। একদা পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নামে স্থানকে রামাবতী মনে করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় ভুল করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাকে এই ভুল সংশোধন করিতে হইয়াছিল। 'রামচরিত' অনুসারে, রামাবতী ছিল উত্তর বঙ্গে (বরেন্দ্রীতে) গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গমস্থলের নিকট এবং তাহারই এক প্রান্তে রামপালদেবের যত্নে গড়িয়া উঠিয়াছিল জগদ্দল মহাবিহার। দানশীল নামে জগদ্দলের আর একজন প্রসিদ্ধ ভিক্ষু, চন্দ্রগোমীর 'মনোহর কল্পনাম লোকনাথ স্তোত্রে'র যে তর্জ্জমা করিয়াছিলেন তাহাতেও জগদ্দল যে পূর্ব্ব ভারতের বরেন্দ্রীতে অবস্থিত ছিল, সেকথা পরিষ্কার ভাষায় লেখা আছে। সোমপুরী বিহার ব্যতীত বাঙ্গালা দেশে জগদ্দল বিহারের মত এত বড় বিহার আর বোধ হয় কস্মিন্‌কালে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রামাবতীর অবস্থান সম্বন্ধে ভুল সংশোধন করিয়াও, জগদ্দল বিহারের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শাস্ত্রীমহাশয় আর এক ভুল করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুমান, "রামপালই যে ঐ বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এমন বোধ হয়না।" এই ভ্রমাত্মক অনুমানের কারণ নির্দ্দেশ করা অতীব সহজ। জগদ্দলবাসী দানশীলের বহুপূর্ব্বে আর একজন দানশীল ছিলেন মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালের সমসাময়িক, এবং এই দুই যুগের দুই বিভিন্ন দানশীলকে অভিন্ন মনে করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় ভাবিয়াছিলেন, 'দানশীল' যখন রামপালের পূর্ব্ববর্ত্তী, জগদ্দল বিহারও তাহা হইলে রামপালের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত !!

আশ্চর্য্য, 'তেঙ্গুরের ক্যাটালগে' উল্লিখিত বিভূতিচন্দ্রের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট এতগুলি পুস্তকের মধ্যে যেখানে যেখানে বিহারের উল্লেখ আছে, সেখানে প্রায় সর্ব্বত্রই এক জগদ্দল বিহারের কথাই পাই। ততোধিক আশ্চর্য্য, ইহা সত্ত্বেও প্রায় দুই বৎসর হইল 'বিহার ও উড়িষ্যার রিসার্চ সোসাইটির জার্ণালে' (মার্চ, ১৯৩৭, পৃঃ ১১) একটি প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বিভূতিচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহাশয় বলিয়াছেন, বিভূতিচন্দ্র ছিলেন (মগধের) বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অল্পবয়স্ক পণ্ডিত। পণ্ডিত রাহুল এই তথ্যটি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করেন নাই, কিন্তু এই উক্তির নিগূঢ়ার্থ হইতেছে যে, বিভূতিচন্দ্র ছিলেন 'বিহার প্রদেশের গৌরব'!! তাহা হইলে, শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বাঙ্গালার গৌরব' হইতে বিভূতিচন্দ্রের নামটি কাটিয়া দিতে হয়!! পণ্ডিতপ্রবর রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহাশয় অতীশ দীপঙ্করকেও ছাড়িয়া কথা বলেন নাই, তিনি তাঁহাকে 'ভাগলপুরে' লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টার উত্তর যে দিন দিয়াছিলাম, তাহার পর বহুদিন গত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাবধি পণ্ডিত রাহুলের কোনও প্রত্যুত্তর নজরে পড়ে নাই। অবশ্য এমন হওয়া বিচিত্র নয় যে, দুই একখানি অথবা দুই চারিখানি গ্রন্থে বিভূতিচন্দ্রের নামের সহিত বিক্রমশিলা বিহারের যোগাযোগ দেখা যায়, অর্থাৎ বিভূতিচন্দ্র বিক্রমশিলা-বিহারেও কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার উপর নির্ভর করিয়া এত বড় কথা বলা চলে না যে, "বিভূতিচন্দ্র বিক্রমশিলা বিহারের পণ্ডিত"। তাঁহার এই পরিচয় মিথ্যা। বিভূতিচন্দ্র জাতিতে বাঙ্গালী হয়ত নাও হইতে পারেন, কিন্তু তিনি বরেন্দ্রীর জগদ্দলের গৌরব ছিলেন, একথা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন?

পণ্ডিত রাহুল আরও বলেন, "বিক্রমশিলা যখন মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, তখন বিভূতিচন্দ্র তাঁহার গুরু,—বিক্রমশিলার শেষ প্রধানাচার্য্য,—শাক্যশ্রীভদ্রের সহিত দেশত্যাগে অনুগমন করিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের জগত্তালে গেলেন, তারপর সম্ভবতঃ উহার ধ্বংসের পর তাঁহারা গেলেন নেপালে, এবং তথা হইতে (তিব্বতের) শক্য বিহারের প্রধানাচার্য্য তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এইরূপে ১২০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা তিব্বতে গেলেন। বিভূতিচন্দ্র ব্যতীত দানশীল প্রভৃতি আরও কয়েকজন পণ্ডিত শাক্যশ্রীভদ্রের সঙ্গে গিয়াছিলেন।" সেই 'পূর্ব্ববঙ্গের জগত্তাল'!! ভাবি, জগদ্দলের অবস্থান সম্বন্ধেই যিনি সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তিনি এত সব নূতন নূতন তথ্য জানিলেন কি প্রকারে? জানিলেন ত, মূল গ্রন্থগুলির নাম প্রকাশে এত আপত্তি কিসের? শাক্যশ্রীভদ্র বিভূতিচন্দ্রের গুরু ছিলেন, এই তথ্য কোথায় আছে? 'প্যাগ-সাম্‌-জোন্‌-জঙ্‌' অনুসারে উদ্দণ্ডপুর বা

ওদন্তপুরী বিহারের শাক্যশ্রীভদ্র কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন, এবং 'তুরুষ্কগণ' কর্ত্তৃক উহার ধ্বংসের পর তিনি পলাইয়া 'ওডিবিষের' (উড়িষ্যার) জগদ্দলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। জানিনা, এই গ্রন্থের সাক্ষ্যের উপর পণ্ডিত রাহুল নির্ভর করিয়াছেন কিনা, করিয়া থাকিলে 'ওডিবিষে'র স্থানে 'পূর্ব্ববঙ্গ' কথাটি তিনি নিজে বসাইয়া দিয়াছেন। ইহা সঙ্গত হইলেও, এবং 'পূর্ব্ববঙ্গ'কে 'উত্তরবঙ্গে' শুদ্ধ করিয়া লইলেও, 'শাক্যশ্রীভদ্র ও তস্য শিষ্য বিভূতিচন্দ্রকে' বিক্রমশিলা হইতে দিন কয়েকের জন্য জগদ্দলে আনিতে হইলে, অনেক কিছুই করিতে হয়। বিক্রমশিলা (অথবা উদ্দণ্ডপুর) বিহার মুসলমানগণ ধ্বংস করিয়াছিল ১১৯৮ বা ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে শাক্যশ্রীভদ্র, বিভূতিচন্দ্র প্রভৃতি তিব্বতে গিয়া থাকিলে, পণ্ডিত রাহুলের মতানুসারে স্বীকার করিতে হয়, ঐ বিহার ধ্বংসের পর ২।৩ বৎসরের মধ্যেই জগদ্দলও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ বিভূতিচন্দ্র জগদ্দলে ছিলেন অত্যল্পকাল। কিন্তু অতগুলি বিভিন্ন গ্রন্থে যে বিভূতিচন্দ্রকে 'জগদ্দলবাসী', 'জগদ্দল-পণ্ডিত' প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার উপায় কি হইবে? আর এক কথা, মনোরথ-নন্দীর 'প্রমাণ-বার্ত্তিক ভাষ্যে'র যে একখানি পুঁথি বিভূতিচন্দ্র স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন, তাহার শেষে কয়েকটি শ্লোক নিবদ্ধ আছে, তন্মধ্যে একটি শ্লোক হইতে জানা যায়, বিভূতিচন্দ্রের (অজ্ঞাতনামা) গুরু কাশ্মীর দেশীয় ছিলেন। পণ্ডিত রাহুলের যুক্তিটা হয়ত এই,—বিভূতিচন্দ্রের গুরু কাশ্মীরী, এবং শাক্যশ্রীভদ্রও কাশ্মীরী, অতএব শাক্যশ্রীভদ্রই বিভূতিচন্দ্রের গুরু। এই যুক্তি মানিয়া লইলেও, বিভূতিচন্দ্রকে বিক্রমশিলায় পাঠাইতে হইবে কেন? বরঞ্চ শাক্যশ্রীভদ্রকেই বরেন্দ্রীর জগদ্দলে আনিলে ক্ষতিটা কি?

বিভূতিচন্দ্র একদা তিব্বতে গিয়া কিছুদিন ছিলেন, এবং তিব্বত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আবার কিছুকাল নেপালে বাস করিয়াছিলেন ও সেই সময় কস্মিংশ্চিৎ ব্যক্তিকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, একথা বিহার ও উড়িষ্যার রিসার্চ সোসাইটির লাইব্রেরীতে রক্ষিত একখানি তালপত্রে লিখিত আছে,—"ভোটং গত্বা ততঃ স্থিত্বা শ্রুত্বা সর্বম···নং। পশ্চান্নেপালগতঃ স্থিত্বা পত্রীয়ং প্রহিতা ময়া ইত্যাদি।

বিভূতিচন্দ্র যে কিছুকাল নেপালে অবস্থান করিয়াছিলেন একথা সত্য, কারণ 'আর্য্য-অমোঘ-পাশ-সাধন' নামক একখানি পুস্তকের অনুবাদ তিনি ও তিব্বতীয় প্রজ্ঞাবর্ম্ম করিয়াছিলেন নেপালের সমন্থ-বিহারে বসিয়া। অতএ তাঁহার তিব্বত গমনের কথাও যথার্থ হওয়াই সম্ভবপর তিব্বতীয় বিহারে বিভূতিচন্দ্রের স্বহস্ত-লিখিত পুঁ আবিষ্কারও তাঁহার তিব্বত গমনের কথা সমর্থন করে কিন্তু সে দেশে তিনি একা গিয়াছিলেন, অথবা শাক্যশ্রী ভদ্রের অনুগমন করিয়াছিলেন, এ রহস্যের উদ্ঘাটন কে করিবে? যে সকল প্রামাণিক গ্রন্থে শাক্যশ্রীভদ্রের সহি বিভূতিচন্দ্রের গুরু শিষ্য সম্বন্ধ ও বিক্রমশিলা-বাসী বিভূতি চন্দ্রের অল্পদিন মাত্র জগদ্দলে আসিয়া অবস্থানের কথা লে আছে, পণ্ডিত রাহুল আয়াস স্বীকার করিয়া তাহাদের না ও পত্রাঙ্ক উল্লেখ করিয়া দিলেই সকল হাঙ্গামা চুকিয়া যাইত।

বিভূতিচন্দ্রের তিব্বতগমন প্রসঙ্গে অতীশ দীপঙ্করের সে দেশে গমনের কথা স্বভাবতঃই মনে জাগে। বিভূতিচন্দ্র তিব্বতে গিয়া পুনরায় ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু বাঙ্গালার পণ্ডিত সমাজের শিরোমণি অতীশ সেই যে গেলেন, আর ফিরেন নাই। বিভূতিচন্দ্রকে কেন ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল তাহা জানি না, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে অতীশের ন্যায় সম্মান তিনি বা অপর কেহ তথায় পান নাই। অতীশের সে দেশে খাতির ছিল কত! লোকে তাঁহাকে ভক্তি করিত কত! কথিত আছে,—যখন অতী লাসার সমীপবর্ত্তী হইতেছিলেন, এক বালিকা তাহার মস্তকে যে অলঙ্কার ছিল তাহা খুলিয়া ভক্তিভরে অতীশকে সমর্প করিয়াছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এই বালিকাটি নাম জানি না, কিন্তু একটি বালিকা, তাহারও গোপন অন্তরে অতীশের প্রতি কতখানি ভক্তিই না পুঞ্জীভূত ছিল হয়ত বালিকার সাংসারিক সম্পদ বলিতে ঐ অলঙ্কা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, এবং তাহাই সে অপরকে দিয়া দিয়াছে এই কথা শুনিয়া বালিকার মাতাপিতা তাহাকে

যথোনাস্তি ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। গরীবের মেয়ের আবার অত কেনরে বাপু? অভিমানিনী আর সহ্য করিতে না পারিয়া মনের দুঃখে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া মাতাপিতার উপর চূড়ান্ত প্রতিশোধ লইল। তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন অতীশ নিজে, এবং তারপর তিনি ব্যক্ত করিলেন যে, স্বর্গলোকে বালিকার পুনর্জন্ম হইয়াছে।

রাজপুত্র বিভূতিচন্দ্রের সময় সম্বন্ধে এইটুকুই জানিতে পারি যে, তিনি পণ্ডিত অভয়াকরগুপ্তের হয় সমসাময়িক না হয় পরবর্ত্তী ছিলেন, কারণ অভয়াকরের দুই বা ততোধিক গ্রন্থের অনুবাদ তিনি করিয়াছিলেন, অথবা করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। মোটামুটি বলিতে পারা যায়, বিভূতিচন্দ্র দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

গুণী

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

দূরে নয়, আরো কাছে স'রে এসো প্রিয়ে,
লীলায়িত বিসর্পিল লতার বন্ধনে
আমারে জড়ায়ে ধরো, বাহু-নিষ্পেষণে
সঞ্চিত যা কিছু আছে শূন্য ক'রে নিয়ে
তোমার প্রথম প্রেম মোরে সমর্পিয়ে
পূর্ণ করো হৃদয়ের অর্ঘ্য-উপচার,
আজ স্বর্ণ, কাল তাহা ধূলি-মৃত্তিকার,
এতদিন যাহা তুমি এসেছো ঢাকিয়ে।

তাহলে কি হবে রেখে সেই কোহিনুর
সতর্ক দৃষ্টির পথে?—কি তাহার দাম!
আমি হায় এ-জীবনে না যদি পেলাম;
সপ্তস্বরা স্বর্ণতন্ত্রী স্পর্শ-লোভাতুর,—
কিবা মূল্য? নাহি যদি নির্ঝরায় সুর
গুণীর হাতের মাঝে মূর্চ্ছায় উদ্দাম।

যে ঘরে হ'ল না খেলা

শ্রীমতী ইলা হালদার

আরো মাসখানেক কেটে গেছে। টোনি ইনসব্রুক থেকে বাড়ী ফিরে চলে গেল তার পরদিনই। যাবার বেলায় তার মৌন চাহনি কৃষ্ণাকে ব্যথা দিলে। জীবনের চলার পথে কত মায়া কত ভাবে মনকে পিছু ডাকে তাতে কান পাতার শক্তি কোথায় মানুষের। পৃথিবীর গতিপথে কত চন্দ্র কত গ্রহ মায়াময় আকর্ষণ বাড়ায় তবু তাকে তার নিয়ন্ত্রিত পরিমণ্ডলে দয়াহীন হয়ে চলে যেতে হয়,—যে আকর্ষণ তার মাটিকে জলকে তার অনুপরমাণুকে অভিষিক্ত করে রেখেছে তার নিয়ত আহ্বানের উত্তরে।

কৃষ্ণার অবসর তখনও বাকি ছিল। সে অষ্ট্রিয়া ছেড়ে সুইটসারল্যাণ্ডএর ভিতর দিয়ে ইটালীতে এল। অ্যালপসের বুকের ভিতর কুরে কুরে দশ মাইল দীর্ঘ সুড়ঙ্গ, তার মধ্যে দিয়ে ট্রেণ পনর কুড়ি মিনিটে চলে আসে। ইটালী জয় করতে যেয়ে নাপোলিও এই পাহাড় পেরতে কি দুর্দ্দশায় পড়েছিলেন। এখনকার বিজ্ঞানের দিনে ট্রেণের কাচবন্ধ কক্ষে নরম গদিতে বসে অন্ধকার কেটে কেটে যেতে শুধু একট থ্রিল লাগে—আর কিছু নয়। বাইরে পাথরের মত পুঞ্জিত অন্ধকার, পাহাড় চুঁয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে দিনরাত, পাথরের ভিজে দেওয়ালগুলো অন্ধকারে চকচকিয়ে উঠছে।

মিলানোর ক্যাথিড্রালের প্রাঙ্গণে জ্যোৎস্না রাতে কৃষ্ণা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে কাটিয়েছে। এ কি মানুষের তৈরী পাথরের প্রাসাদ—না পরীরা মোম নিয়ে এই মায়াপুরীকে গড়েছে বসে বসে। জ্যোৎস্নায় যখন পাথরের কঠিন contourগুলো মোলায়েম হয়ে যায়, মনে হয় এ এক স্বপ্ন—কোন সাধক শিল্পীর অনিমিখ চোখে কবে জন্ম নিয়েছিল। যে স্বপ্নকে লিওনার্ডো ডা ভিন্‌চি মোনালিসার অধরে রেখেছেন রহস্যরূপে—যে মায়া দিয়ে এঁকেছিলেন Last Supper চিত্রের ক্রাইষ্টএর দুটি হাত মিলানে সান্তা মেরিয়া কনভেণ্টএ দেওয়ালের গায়ে অবলুপ্ত ফ্রেসকোর মধ্যে এখনও সে দুটি হাতে নিরাশ [illegible] মোহন ভঙ্গী। মিলানো যুগশিল্পী লিওনার্ডোর জন্মভূমি। তাঁর মর্ম্মর প্রতিমূর্ত্তির পানে চেয়ে কৃষ্ণা ভাবত—এই লোক?—কি চেহারা, পাকান দড়ির মত কি দাড়ির অতি দুর্দ্ধর্ষ মূর্ত্তি, যেন ডাকাতের সর্দার—এরই এত রসের সন্ধান, রূপের এমন অন্তর্দৃষ্টি! তিনি শুধু নন, মস্ত সায়ানটিষ্টও। মানুষের হাত যে তার জীব কত মঙ্গলমধুর করতে পারে তার কল্যাণসুন্দর সৃষ্টি করে রেখে গেলেন মোনালিসার দক্ষিণ হাতখানিতে চিত্রজগতে যা পরিপূর্ণরূপে নিখুঁত, অনিন্দিত।

তারপর ফ্লোরেন্স—ফিরেনসি, দান্তের দেশ। জানালার তলা দিয়ে বয়ে যেত আর্নো নদী। সকা জানালা খুলেই দ্যাখা যায় নদীর জলে আলো ঝলে,—সান্তা ত্রিনিতা সেতু, যে সেতুর ধারে দান্তে বিয়াত্রিচের প্রথম দ্যাখার প্রবাদ—তার রেখাটি বেঁকে রয়েছে নদীর ওপরে। ওপারে পিয়াৎসা মীকেল-আঞ্জেলো, সেখানে তার বিপুল ব্রোঞ্জ-এর নগ্নদেহ ডেভিড্ মূর্ত্তি কত দূর হতে দ্যাখা যায়। কাম্পানীল, পিয়াৎসা ভেচিও, ক্যাথিড্রাল, ক্যাথিড্রাল-দ্বারের ব্রোঞ্জএর ওপর অনামা শিল্পীর আশ্চর্য্য কারিগরী যা দেখে মীকেল এঞ্জেলো তার নাম দিয়েছিলেন 'স্বর্গদ্বার'। পিত্তি গ্যালারি, উফিৎসি গ্যালারি—কলাজগতের অভাবনীয় সৃষ্টি ভরা এগুলি—রাফেল, তীৎসিয়ান, বত্তিচেলী, ফিলিপো লিপি, মীকেল এঞ্জেলো—দেখে দেখে দৃষ্টি যেন দিশাহারা হয়ে যায়। রাফেলের অদ্ভুত সুন্দর ম্যাডোনা—ম্যাডোনা ত এঁকেছে অনেকে অনেকভাবে কিন্তু তাকে এমন আশ্চর্য্য আনন্দিত রূপ কে দিয়েছে কবে। রাফেলের

মডেল ছিলেন তাঁর প্রেয়সী—ম্যাডোনার মূর্তি নিয়ে রূপ তাঁর রইল জগদ্বিদিত হয়ে। রাফেল কি কালিদাস পড়েছিলেন? 'যে ছিল নারীরূপে হৃদয় মন্দিরে—আজি যে রূপ তার ছাইল ভব'।

ফিরেন্‌সি থেকে বাইরে যাবার নানাদিকে নানা পথ ধূলিধূসরিত এই পথগুলি, দুপাশে টিবি টিবি পাহাড়, ঝোপ ঝোপ গাছ, ঘেঁসাঘেঁসি ঘর-বাড়ী—দেখে কৃষ্ণার মনে হত এ দৃশ্য সে দেখেছে—প্রাচীন রাজপুত চিত্রে, চোদ্দ শতাব্দী থেকে ইটালীয়ান মাষ্টারদের আঁকা ছবির সিম্বলিক সৌন্দর্য্যের মাঝে।

তারপর ভেনিস—ভেনিৎসিয়া। ঘন নীল আদ্রিয়াতিকে একটি ছিন্নমালার ছড়ান মুক্তোগুলির মত। নীল সমুদ্রের ওপর নীল সন্ধ্যা ধীরে নেমে আসে, নীল জলে গণ্ডোলা চলে—ভেসে আসে গণ্ডোলিয়ারের গান। সান্তো মার্কোর বিস্তীর্ণ বাঁধান প্রাঙ্গনে হাজার পায়রার কুজন ক্লান্ত হয়ে আসে, ক্যাথিড্রালের গম্বুজের শ্বেত পাথরে শেষ সূর্য্যের আলো পড়ে সাদা মুক্তোর মত ঝকমক করতে থাকে। ডোজির শুভ্র প্রাসাদের অন্তরের অন্ধকার অতীতের বর্বর বিলাস আর অবর্ণনীয় অত্যাচারে হাস্যে নিশ্বাসে মিলে এক হয়ে যায়। সরু সরু কেনাল দিয়ে গণ্ডোলা বয়ে যায়, নীল কালির মত নীল জল, দু পাশের সারি দেওয়া বাড়ীর মাথার ওপর সরু এক ফালি আকাশ। দুধারে পুরাণো বাড়ীগুলি—বাড়ীর সামনে জলে কাঠের ফলকে পোঁতা বনিয়াদী বংশের ক্রেষ্ট—গাইড বলে যাচ্ছে এটা অমুক ডিউকের—অমুক কাউণ্টের। মুসোলিনীর হুকুম এসব বাড়ী ভেঙ্গে নতুন ছাঁচে কেউ করতে পারবে না। অতীতের আসল রূপের ছায়াটি তাই এখনও এখানে দ্যাখা যায়। বড় বড় প্রাসাদের চুণ বালি খসে পড়েছে—লোহার কাঁটা বসান প্রকাণ্ড প্রবেশ দ্বারগুলি মর্চেতে মলিন হয়ে গেছে; সুন্দর সোপানের পাথরগুলো আল্‌গা হয়ে ফাট ধরেছে, পঙ্কিল পিছল জীর্ণ দেওয়ালে জলের ঢেউ লাগছে অবিরাম এসে। এসব প্রাসাদের আলোহীন ঘরে এককালে কত সুন্দরীর রূপশিখা আলো দিয়েছে—কত নির্ভয় পুরুষের বীরত্ব আগুন জ্বালিয়েছে। আনন্দে সঙ্গীত বেদনায় কান্নায় সচঞ্চল কত ইতিহাস নিয়ে এই বাড়ীগুলি মুখর ঢেউয়ের পারে নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রান্দ কানালের ওপর দিয়ে যেতে—সবুজ লতায় ঢাকা সাদা একটা বাড়ী। এই নাকি ডেস্‌ডিমোনার ছিল। দূরে দ্যাখা যায় রিয়াল্টো সেতুর শ্বেত সুন্দর রেখা। ডোজির প্রাসাদে এখনও ঐশ্বর্য্যের জমক। সেকালে ডোজিরা সাগর জলে যেয়ে আংটি ফেলে আসতেন, সাগরিকার সঙ্গে পরিণয়ের পর তাঁরা পরিচিত হতেন সাগর-বল্লভ নামে। Bridge of Sighs-এর ওপর এসে কৃষ্ণা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এর পাথরে পাথরে যে অনন্ত দীর্ঘশ্বাস অনুক্ষণ অনুরণিত হচ্ছে তাকে কাছে না এলে বোঝা যায় না, কান পেতে না রাখলে শুনা যায় না। প্রাসাদের বিপুল বিলাসের অনেক নীচে অন্ধকার কারাগার—রাজনৈতিক বন্দীরা যেখানে থাকত, পাথর কেটে গর্ত করা, সোজা হয়ে দাঁড়ান যায় না সেখানে, ট্র্যাপ ডোর খুলে দিলেই জল এসে তাদের ইঁদুরের মত ডুবিয়ে মারত। খুব সরু কেনালের গলির মধ্যে দিয়ে যেতে দ্যাখা যায় বাড়ীগুলোর পিছন দিকের শ্যাওলা ভরা ফাটল ধরা দেওয়ালে আধ ভাঙ্গা ট্র্যাপডোরের চৌকো গর্ত। ভেতরের আধ অন্ধকারে আবর্জনার ওপর বড় বড় ইঁদুর বেড়াচ্ছে। কৃষ্ণার সে রাতে খালি ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছিল—মনে হয় থক্‌থকে পঙ্কিল আঁশটে গন্ধ জল সাপের মত নিঃশব্দে উঠে আসছে গলার কাছে।...

কৃষ্ণা একদিন কিছু দূরে এক ক্যাথিড্রাল দেখতে গেল—বাসিলিকা দি সান্তা গ্লোরিয়োসা—মীকেল এঞ্জেলো তীৎসিয়ান এঁদের সমাধি সেখানে। তীৎসিয়ানের L'Assunta ক্রাইষ্টের স্বর্গারোহণের বিপুল ফ্রেস্‌কো রয়েছে সেখানে। এর চেয়ে তীৎসিয়ানের অনেক বিপুলতর ছবি ডোজির প্রাসাদে রয়েছে, যার চেয়ে আয়তনে বড় ছবি জগতে নেই। কিন্তু তাদের সঙ্গে এর তুলনাই হয় না। কলা ত কোয়ানটিটির জিনিষ নয়—কোয়ালিটি তার প্রাণ। একথা মানুষ কেবলই ভুলে মরে তাই শ্রেষ্ঠ কবি কলাবিদ্ তাদেরও বস্তা বস্তা সস্তা সৃষ্টি করতে হয় বাজার দর বজায় রাখতে। ছবিতে ভারজিন-এর মুখের দিকে চেয়ে কৃষ্ণার যেন আর পলক পড়ে না। ও মুখ কি রং মশলা দিয়ে তৈরী না দুঃখের দাহনে মানুষের কলঙ্ককে পুড়িয়ে তাই শুচিভস্মে সুন্দর করা

হয়েছে ওকে। উর্দ্ধনয়নার হাওয়ায় ওড়া কেশ উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত দুটি হাতের একটি অসহায় আগ্রহের আকুল ভঙ্গী—সমস্তটি যেন এক অনাবৃত আত্মার আরাধনার অনির্বাণ অগ্নিশিখা।

ক্যাথিড্রাল প্রবেশের সময় এক গোলযোগ বাধল। কৃষ্ণার মোজাহীন পায়ে স্যাণ্ডেল ও তার অনাবরণ বাহু দেখে পুরোহিত কিছুতে তাকে মন্দিরে যেতে দেবে না। কৃষ্ণার সঙ্গী এক আমেরিকান মেয়ে,—তার আরো দুর্দশা তার মাথায় টুপি নেই, খোলা মাথায় তাকে ঢুকতে দেবে না ভেতরে। আমেরিকান মেয়ে রুমাল বের করে মাথায় বাঁধল, কৃষ্ণা আঁচল টেনে হাত ঢাকল কিন্তু মোজার কি হয়। ভাগ্যে ইটালীতে এখনও ঘুষের প্রচলন আছে, কিছু অতিরিক্ত দক্ষিণা দিয়ে সে যাত্রা গোল কেটে গেল। ইটালী জার্ম্মানী প্রভৃতির ক্যাথিড্রালে এই প্রথা—মেয়েদের পা হাত এবং মাথা আবৃত করে তবে প্রবেশ করতে হয়। অথচ ছেলেদের বেলা উলটো নিয়ম—তাদের টুপি খুলে খালি মাথায় যেতে হয়। এর মানে কি ছেলেদের চেহারার প্রতি সুগভীর অবজ্ঞা—না মেয়েদের চাপল্যে দৃঢ় বিশ্বাস?

ফিরেনসি ভেনিৎসিয়া এসব দেশের লোকেরা স্বভাব শিল্পী—চামড়া পাথর কাঁচ রেশম সব কাজেই তাদের কারুকলার পরিচয়। কৃষ্ণাকে এক দোকান থেকে নিয়ে গেল তাদের কাঁচের কারখানা দেখাতে। আগুনের ধারে খালি গায়ে বসে শিল্পীরা কাজ করছে আগুনে ঝলসে তাদের সুঠাম দেহ দ্যাখাচ্ছে যেন মীকেল এঞ্জেলোর ব্রঞ্জএর সৃষ্টি। নিরাকার কাঁচের তালটাকে ক্ষিপ্র কৌশলে যাদুকরের মত কত রঙের রঙীন কত আকারে অদ্ভুত করে তুলছে দেখে অবাক লাগে। কয়েকটা কাঁচের ফুল তখুনি তারা তৈরী করে গরম গরম উপহার দিল কৃষ্ণাকে। আর একদিন এক লেসের দোকানের কর্ত্রী কৃষ্ণাকে নিয়ে গেলেন লেস তৈরী দ্যাখাতে, কি করে এখানকার বিখ্যাত লেসের উৎপত্তি হল প্রথমে, তার কিম্বদন্তী শোনালেন। অত্যন্ত সুন্দরী মহিলা, অনেক ভাষায় সুদক্ষা, গল্পটা বাজে হলেও শোনাল ভালই তাঁর মুখে।

যাবার বেলায় সমুদ্র সেতুর ওপর দিয়ে ট্রেণ চলেছে—কৃষ্ণা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেয়ে রইল। ভেনিসের প্রাসাদের শ্বেত সৌধশির, সান্তো মার্কোর সাদা গম্বুজ ক্রমে মিলিয়ে গেল। ভেনিৎসিয়া—শিল্পীর দেশ, সাগর-বল্লভের দেশ—মূরেদের রক্তে ধোয়া দেশ—নিবিড় নীল স্বপ্নের মত নীল সাগরে তলিয়ে গেল।……

কতগুলো নীচু ঝোপের ছোট পাতার ছায়ায় কৃষ্ণা বসে বই নিয়ে পড়ছে। বাহির হতে অনাদি নগরী রোমের অনন্ত কল্লোল Forum এর ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে ধাক্কা লেগে লেগে অস্ফুট হয়ে আসছে। সামনে কলোসিয়ামের বিরাট কালো দেওয়ালগুলো দুর্দম দম্ভের বিপুল কঙ্কালের মত রৌদ্রঝলসিত আকাশকে চিরে উঠে গেছে। রোদের ঝাঁঝ আটকাবার জন্য কৃষ্ণা মাথার গুণ্ঠনকে অনেকটা নামিয়ে দিয়ে পড়ছে বসে এক মনে। পড়ার মাঝে সে এমন তন্ময় হয়ে গেছল একজন লোক কাছে এসে দীর্ঘ ছায়া ফেলে দাঁড়িয়েছে পাশে তবু খেয়াল হয় নি।

"কৃষ্ণাই তাহলে, কোন ভুল নেই?"

ভয়ানক চমকে যেয়ে কৃষ্ণার কোল থেকে বইখানা সশব্দে পাথরের ওপর পড়ে গেল। দুহাত পকেটে ভরে লোকটি কৃষ্ণাকে নীরবে নিরীক্ষণ করছিল। চোখের ওপর হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে কৃষ্ণা চেয়ে দেখলে।—"জয়, তুমি?"

"একেবারে সাক্ষাৎ সশরীরে।"

কৃষ্ণা বিস্ময়ে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলে না। তারপর বল্লে "তুমি ছাড়া পেয়েছ?"

জয় তার পাশে বসে পড়ে বল্লে "কি করে, আমি বসে বসে যে পরিমাণে অন্নধ্বংস করতে লাগলাম—ওরা দেখলে আমায় ছেড়ে দিলে এর চেয়ে বেশী কত আর লোকসান করব।"

কৃষ্ণার বিস্ময় কিছুতে যেন যেতে চাইছিল না, বল্লে "কিন্তু শেষকালে এখানে তোমায় দেখব তা কি ভেবেছি কোন দিন। এতদিন ধরে কোথায় না খোঁজ নিয়েছি—"

"বল কী এ—তুমি করেছ আমার খোঁজ?—এ কি সত্য হে আমার চিরশত্রু?"

"তুমি তেমনি আছ এখনও।"

"কেন তুমি ভেবেছিলে কি? এতদিনে আমার শিং গজিয়েছে কিম্বা ল্যাজ? তা আমার খোঁজ পড়েছিল কেন? তোমাদের ফাণ্ডে টাকার টানাটানি?"

"সেটা কি খুব নতুন কথা?"

"না কিন্তু তাহলে আশাটা গোড়াতেই ভেঙ্গে দি—টাকার বালাই বিদায় হয়েছে, এখন কায়মনোবাক্যে তোমাদের লক্ষ্মীছাড়ার দলে।"

"কেন গেল কোথায় তোমাদের জমিদারী, তোমাদের ব্যাঙ্ক এর টাকা?—তুমি ছিলে আমাদের কল্পতরু।

"হায় হায় কল্পতরু এখন শুকনো কাঠ।" জমিদারীর কথা আর নাই বল্লাম। আমি জেলে বসে দেশ উদ্ধার করছি—ম্যানেজার ব্যাটা চুরি করে করে আমায় উদ্ধার করে দিলে। গভর্ণমেণ্টএর খাজনা আদায় হল না—জমিদারী সব নিলামে উঠে গেল—আপদ চুকে গেল। পুরোপুরি proletariat হয়ে গেলাম একদিনে, কেমন মজা দেখছ?"

কৃষ্ণা চুপ করে আছে দেখে বল্লে "এঃ তুমি যে একেবারে দমে গেলে দেখছি। আমার আভিজাত্যের কাল্পনিক শুচিগ্রস্ততার জন্যে তোমাদের কাছে আমার কম নিগ্রহ হয় নি। এখন তার গোড়াই গেছে উপড়ে—খুসী হচ্ছ না কেন? বিশ্বাস না হয় সাক্ষী এই পোষাক—এ হল আমার একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

কি ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণা বল্লে "আর যা অন্য টাকা ছিল তাও সমস্ত কি করে খরচ হয়ে গেল।"

"আঃ কৃষ্ণা তুমি ইয়োরোপে এসে একেবারে অসভ্য হয়ে গেছ। এতদিন বাদে দ্যাখা—কুশল জিজ্ঞেস করতে হয় শেখ নি—বলতে হয় শরীরটা বড় কাহিল হয়েছে—খাওয়াটা পেট ভরে হয়েছে ত—আরো যদি কিছু মনে পড়ে—তা নয় সোজাসুজি টাকার হিসেব।—হায় বস্তুতান্ত্রিক নারীজাতি।"

কৃষ্ণা দুহাতের ওপর চিবুক রেখে স্থিরচোখে জয়ের দিকে চেয়েছিল। ওর দৃষ্টির সমস্ত শক্তি তীক্ষ্ণ তৃষ্ণার মত জয়ের সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে ছিল। সে ধীরে বল্লে "আমি এদিকে পালিয়ে আসতে পারলাম কি করে জান তুমি?"

"বারে। তোমার সঙ্গে কি আর আমার দ্যাখা হয়েছিল—আমার জানবার কথা?"

কৃষ্ণা অন্যমনস্ক হয়ে বল্লে "না দ্যাখা হয়নি। তোমার দ্যাখা পাবার জন্যে আমারও কম নিগ্রহ ভোগ করতে হয় নি। শেষ পর্য্যন্ত তোমার বাড়ীর ঠিকানায় চিঠি দিয়েছি—তবু খোঁজ পাইনি।"

জয় চম্‌কে উঠে বল্লে "করেছ কি কৃষ্ণা! সেখানে পুলিসের সজাগ নজর সব সময়—এমন নির্বোধের মত কাজ করে? কবে লিখেছিলে?"

"বেলিনে থাকতে—সে কিছুদিন হয়ে গেল। সে কথা এখন থাক। এখানে আমি দেশে দেশে বেড়িয়ে বেড়াই—মোটের উপর সব রকমে আরামেই থাকি। লোকে ভাবে কি জান? আমার বাপ মস্ত বড় লোক—তিনি আমায় টাকা দেন।"

জয় কোন জবাব দিলে না। কৃষ্ণা বল্লে "কিন্তু তুমি জান সামান্য কেরাণী তিনি। আমার সংসার পুত্র কন্যার প্রবল বন্যা তাঁকে যথেষ্ট নাকানি চোবানি খাওয়াচ্ছে তার ওপর আমার ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাতে হলেই ত হয়েছিল তাঁর। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই পরের দয়ায় দিন কেটেছে আমার। কলেজে ঢুকে কিছু স্কলারসিপ্ কিছু ভিক্ষে এমনি করে ত শিক্ষা আমার শেষ হয়েছে। সেই বাপ দেবেন আমায় টাকা বিলেতে এসে পড়তে। আমার মত মূর্তিমতী অভিশাপ যে মেয়ে,—যার নাম করলে বাড়ীতে বিপদ আসে—" কৃষ্ণার কণ্ঠ তিক্ত হয়ে থেমে গেল।

জয় খুব আস্তে আস্তে বল্লে "সেদিন ত কেটে গেছে, কৃষ্ণা—অতীতকে কেন আর টেনে আন। তাতে অতীত বাঁচে না—বর্তমান বাসি হয়ে যায় শুধু।"

'ভেবোনা। আমি এখানে আমার গত জীবনের জাবর কাটতে বসি নি। বলছি সেই বাপের কাছে টাকা পাওয়ার ideaটা কতটা হাস্যকর। আমাদের দলবল যখন ছড়িয়ে গেছে চারিধারে, খালি পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে এসেছে, একদিন রাত্রে গোপনে একজন লোক অনেক কষ্টে এসেছিল আমার কাছে। আমায় টাকা দিয়ে গেল—তিরিশ হাজার টাকা, আর জাহাজের টিকিট।"

জয় কৃষ্ণার বইয়ের পাতাগুলো সোজা করছিল, নির্লিপ্তভাবে বল্লে "তাই নাকি।"

"হ্যাঁ। আমার তখন অন্য কোন উপায় ছিল না। টাকার জোরে সব পথ সব সময় সুগম হয়ে যায়—আমি ফেরাতে পারলাম না। সে কিন্তু কিছুতেই বল্লে না কে দিয়েছে এ টাকা।"

"ও।"

"জয় কে দিয়েছিল সে টাকা?"

"আরে, তা আমায় কেন জেরা করা—এ ত আচ্ছা জুলুম। তুমিও তেমনি আছ দেখছি—আস্ত একটি bully."

খুব আস্তে কৃষ্ণা বল্লে "আমি তখনই জেনেছি। তুমি ছাড়া এমন কেউ নেই যে এমন বিপদ অগ্রাহ্য করে ইচ্ছে করে সাহায্যে এগোবে।"

জয় সকৌতুকে বল্লে "আহা এমন ভক্তিটি তোমার অটল হয়ে থাক না কৃষ্ণা।—তোমায় ত বিশ্বাস নেই, রাগের চোটে একদিন আমায় ছুরি ছুঁড়ে মেরেছিলে মনে আছে?"

"আছে।" কৃষ্ণা কি কোন দিন ভুলবে সে দিন-গুলোকে।—তার সঙ্গীদের বারম্বার বিষাক্ত ইঙ্গিত—জয় ভীরু, জয় কাপুরুষ।— "ওরা আমায় কেবলই রাগিয়ে দিচ্ছিল।—তোমার অহিংসাবাদের ওপর ওদের অবিশ্বাস—তুমি দুর্বল এই ওদের ইঙ্গিত—" সেদিনের কটু স্মৃতির তিক্ত স্বাদ আজও ওর মনকে তেতো করে তুললো।

'ও তাই আমি আসামাত্র তুমি আমায় চোখা চোখা কথা শুনিয়ে দিলে। তবু দেখলে এটা নেহাতই নিরামিষ ভেড়া—একে দিয়ে মাংসাশী বাঘ তৈরী হয় না কোনমতে। পালিশ করছিলে একখানা ছুরি, অক্ষম ক্ষোভে দিলে সেখানা ধাঁ করে ছুঁড়ে আমার দিকে।"

"কি করব—তোমার শান্ত ধৈর্য্যের মাঝে একটা স্বচ্ছ superiority আমায় ভয়ানক রাগিয়ে দিত—কিছুতে তাকে সরাতে পারি নি—আঘাতটা তাকেই।"

"তা হবে কিন্তু লাগল যে ছাই আমাকেই।"

"তুমি হাত দিয়ে আট্‌কে নিয়েছিলে—হাতটা বোধ হয় কেটে গেছল—তুমি কোন কথা বলনি। গুরু বলেছিলেন, [illegible]কথা—আমাদের মধ্যে থাকবে নির্ভয় ধৈর্য্য, হিস্‌টিরিয়া নয়।"

দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। নীল আকাশে কালো তিলের মত কয়েকটা চিল চক্রাকারে উড়ছে। কয়েক জন টুরিষ্ট তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল।

হঠাৎ কৃষ্ণা মাথা তুলে বল্লে "তোমায় আমি পদে পদে লাঞ্ছনা করেছি, যন্ত্রণা দিয়েছি, তোমার চরিত্র যত আমার সম্ভ্রম জাগাত তত তোমায় হেয় করতে চেয়েছি—তোমার দেহ মনের শক্তি যত আমায় বিস্মিত করত তত আমার রাগ হত—তুমি যত আমায় মুগ্ধ করেছ—তত তোমায় ঘৃণা করেছি, তোমার মনের নিয়ত আহ্বান হতে আমার মনকে মুক্ত করার জন্যে তোমায় নিষ্ঠুর হয়ে নির্য্যাতন করেছি। কী নিরর্থক এ সব,—মনের শক্তির কি নিরর্থক অপচয়।"

স্নিগ্ধস্বরে জয় বল্‌লে "তা বলা চলে না কৃষ্ণা। বয়স যত বাড়ে মানুষের শক্তি বুদ্ধি তত বাড়ে। তা বলে তার শিশু জীবনটা কি খানিকটা নিরর্থক অপচয়? মনকেও তেমনি বাড়বার সময় দিতে হবে।—কত পথে কত মতের মধ্যে দিয়ে যেয়ে তবে ত সে পরিণতিতে পৌছবে।"

"তা বলে আমার মনকে পরিণতিতে পৌছবার জন্যে তোমার যে নিগ্রহ ভোগ করতে হবে এমন কি কথা ছিল? তোমার অর্থ সামর্থ্য, চরিত্র, তোমার বংশমর্য্যাদা—এ গুলো সবই তোমার বিরুদ্ধে যেত—তোমার অত্যন্ত অপরাধের মত মনে হত এ গুলোকে। কেন তুমি একেবারে এক হয়ে যেতে না আমাদের সঙ্গে। আমরা ভেবেছি তুমি টাকা দিয়ে আমাদের কিনতে চাইছ, সামর্থ্য দেখিয়ে আমাদের ভোলাতে চাইছ। তোমার মনের শান্ত দৃঢ়তাকে ভাঙতে না পেরে আমরা তাকে সব সময় ভেবেছি তোমার অসহ্য দম্ভ বলে। আমাদের হিংস্র সাধনায় তোমার যোগ নেই অথচ অসহযোগে তুমি জেলে গেলে। কেউ ভেবেছিল দুর্বল—spy নয় ত—এ সন্দেহও জেগেছিল কারোর মনে। তুমিও নির্লিপ্ত থাকতে, আমাদের সন্দেহে হয়ত হেসেছিলে মনে—কিন্তু তা ছাড়া কিছু করনি। তোমার মত করে কখন আমার মতকে গড়তে চাও নি।"

"চাইলেও পারতাম না। কেউ অন্য কাউকে নিজের ইচ্ছে মত গড়তে পারে না কৃষ্ণা—ওটা মানুষের একটা অত্যন্ত শূন্য দম্ভ।"

মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রে বাতাস আতপ্ত হয়ে উঠেছে। পাথরগুলো তেতে আগুন হয়ে উঠেছে ক্রমে।

জয় বললে "ওঠ কৃষ্ণা, বেলা অনেক হল। কোথায় তুমি থাক? দেখেছ এখনও সেটা পর্য্যন্ত জানি নি।"

ভাঙ্গা পাথর পেরিয়ে দুজনে Forumএর বাইরে এল। মধ্যাহ্ন রৌদ্রে ভিওরিয়ো এমানুয়েল-এর বিশাল সৌধের সাদা পাথর সূর্য্যের মত ঝকঝক করছে। এখনও ইটালীতে ঘোড়ার ফিটন চলে ওরা বেরতেই এক দল গাড়োয়ান এসে ছেঁকে ধরলে। জয় তাদের ঠেলে সরিয়ে কৃষ্ণাকে গাড়ীতে উঠতে সাহায্য করলে, বললে "আভান্তি চলো", খুব ধাক্কা দিয়ে গাড়ী চলল। কৃষ্ণার হোটেল সেখান হতে অনেকটা দূরে, ভিয়া লুডোভিসির প্রান্তে, খানিকটা নিরিবিলিতে। রাস্তাগুলো সেখানে পরিষ্কার, বাড়ীগুলো দেখতে ভাল।

হোটেলে পৌঁছে প্রবেশ পথে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে জয় বল্লে "আমি যাই তাহলে।"

কৃষ্ণা অবাক হয়ে বল্লে "সে কি, খেয়ে যাবে না? এত তাড়া যদি শুধু শুধু এলে কেন তবে এই রোদে?"

কৃষ্ণার হাতটা হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে জয় হাসলে। খর রৌদ্রভরা দ্বিপ্রহরে গাছের পাতলা ছায়ায় জয়ের হাসিটা হঠাৎ করুণ মনে হল। কৃষ্ণার চোখের মধ্যে চেয়ে সে বল্লে "কেন এলাম?—ভাল লাগল বলে।" হাতটা ছেড়ে দিয়ে সে চলতে আরম্ভ করল।

কৃষ্ণার বুকের রক্তটা ছলকে উঠে কথা বন্ধ করে দিলে কয়েক মুহূর্ত্ত। তাড়াতাড়ি সে ডেকে বল্লে "জয়, শোন শোন। কোথায় তুমি থাক বলে যাও, খাওয়ার পর আমি যাব।" জয় ফিরে দাঁড়ালে। বল্লে "ওরে বাসরে, আমার বাড়ীওলা গরীব বলে morality মানে না ভাবো না কি। এতদিন আমায় ভেবেছে কলির ভীষ্ম—হঠাৎ এক মেয়েকে নিয়ে আজকে আমি হাজির হই যদি সুনাম আমার ডুববে একেবারে টাইবারের জলে।"

"তাহলে তুমি এখানে এস?"

"কী মুস্কিল, তাহলে তোমার মানসম্ভ্রম যায় যে দেখছ না। এতদিন এরা তোমায় একজন রূপকথার রাজকন্যা-টন্যা ভেবেছিল—এখন হোটেলের ওই লিভারি-ওলা চাকরগুলো দেখে যদি তুমি এক trampকে ধরে নিয়ে হাজির হলে--ওরা ভাবে এঃ, এ দেখছি তাদের রাণী।"

কৃষ্ণা ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লে "ও সব বাজে ঠাট্টা রেখে দাও শিগ্গির এসো বলছি।"

জয় হেসে ফেল্লে "এই যে রুদ্ররূপ দেখা দিয়েছে আচ্ছা শোন, আমি সন্ধ্যের সময় আসব, এখন সত্যি আমার কতগুলো কাজ আছে।"

অপ্রসন্নভাবে কৃষ্ণা বল্লে "কোথায় আছ শুনি।"

জয় ঠিকানা বল্লে।

"ও সে ত অনেক দূরে এখান থেকে—এত বেলা হয়ে গেছে—এই রোদে অতটা যাবে।"

"হায় দেবী চৌধুরাণী তোমার এ কি অধঃপতন—রোদকে শেষকালে গরম লাগল? এরপর বরফকে কোনদিন তাহলে বলবে ঠাণ্ডা।" হেসে বল্লে "দূর কোথা, আমি দু'পা যেয়ে ট্রাম ধরে এখুনি পৌঁছে যাব। তুমি মিছে দেরী কোরো না—ভেতরে যাও।"

তবু কৃষ্ণা দাঁড়িয়ে রইল। জয়ের ঋজু দীর্ঘ দেহ যখন মোড়ের আড়ালে মিলিয়ে গেল কৃষ্ণা অত্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে হোটেলে ঢুকল।

ভেতরে নরম ঘন পর্দা নামান ব্লাইণ্ড্ ঢাকা ঘরের স্নিগ্ধ শীতলতায় সে একটা আরামের নিঃশ্বাস নিলে। খাবার সময় কি খেলে না খেলে খেয়াল করলে না। একটা চাপা চাঞ্চল্য চিত্তকে তার অস্থির করে রাখল। ওয়েটার কাছে এসে একটু কেশে বল্লে ' সিনোরীণাকে কি কিছু অন্য আরো ফল এনে দেব?"

কৃষ্ণা সচকিত হয়ে তাকালে—অন্য সকলে আহার শেষ করে উঠে গেছে, সে শুধু একলা বসে। তাড়াতাড়ি চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ল, বল্লে "না না, গ্রাৎসি—খাওয়া আমার হয়ে গেছে।"

ঘরে আসবে বলে লিফটে উঠল। তৃতীয় তলে যেখানে তার ঘর, লিফট্ এসে থেমে গেল। কৃষ্ণা নামে না দেখে লিফট্ বয় তার দিকে ফিরে বল্লে 'তৃতীয় তলা সিনোরীণা।"

"ও।"—লজ্জিত হয়ে কৃষ্ণা লিফট থেকে বেরিয়ে এল। ঘরে যেয়ে খাতাপত্র খুলে একটু পড়ার চেষ্টা করলে—কিছুতে মনোযোগ দিতে পারলে না—পড়ার খেই হারিয়ে ফেলে খানিক বিরক্ত হয়ে সে বই ফেলে উঠে জানালাটা বন্ধ

করে দিলে, ঘর অন্ধকার করে দিয়ে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সময় যাচ্ছে শামুকের মত আস্তে আস্তে। ক্লান্ত হয়ে কৃষ্ণা বালিসের তলা হতে রিষ্ট ওয়াচটা টেনে বের করে দেখলে—মোটে দশমিনিট কেটেছে। রেগে যেয়ে সে পাশ ফিরে শুয়ে জোর করে চোখ টিপে বন্ধ করে রইল। অনেক দিনের অনেক কথা ব্যথিত বিফলতা মনের টান করে বাঁধা তারগুলোকে আজ আঘাতে আহত করে তুলেছে। স্মৃতিকে মন্থিত করে অনেক গরল অনেক অমৃতে অন্তর উঠেছে অস্থির হয়ে। কান পেতে এখনও যেন শুনতে পায় সে দিনের বর্ষার ঝরঝরানি; পল্লীগ্রাম পথঘাট চারিদিকে কর্দমাক্ত, পানাভরা ডোবাগুলো কাণায় কাণায় জলে ভরা। কৃষ্ণাকে সেদিন যেতে হবে কার সঙ্গে দ্যাখা করতে চার পাঁচ মাইল দূরে হেঁটে। বাঁশ বনের ভেতর দিয়ে ক্ষীণ পঙ্কিল পথ চলেছে—কচু পাতায় ঢাকা ব্যাংডাকা, আশস্যাওড়া বিছুটি বুনোবেতের নিবিড় জঙ্গল—কেঁচোয় কেন্নোয় কিলকিল করছে। টাঙ্গানিকার ঘন অরণ্যও বর্ষায় বাংলার পল্লীর জঙ্গলের কাছে হার মানে। জয় যাচ্ছে কৃষ্ণার সঙ্গে। নালার ওপর দুখানা দীর্ঘ বাঁশ পাতা সেতু একপাশে হেলে রয়েছে—পা দিলেই মচমচিয়ে ওঠে। সেটা পার হতেই ভীষণ বৃষ্টি নামল। জয় ওয়াটারপ্রুফ্‌টা খুলে জোর করে কৃষ্ণার গায়ে জড়িয়ে দিল। কাজ সেরে দুজনে ফিরছে যখন তখনও জোরে হাওয়া দিচ্ছে। জয়ের ভিজে সপসপে বেশে হাওয়ায় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। নালার কাছে পৌছে দেখে সরু বাঁশ দুখানা ভেঙ্গে বর্ষার স্রোতে ভেসে চলে গেছে। কৃষ্ণা ভুরু কুঁচকে বল্লে "জ্বালাতন, আরো তিন মাইল ঘুরে যেতে হবে এখন।"

জয় জলের দিকে তাকিয়ে বল্লে "খুব বেশী গভীর নয়, হেঁটে পার হওয়া যাবে মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঃ—আমি ওই কাদায় নামছি। সাঁতার জানি না কিছু না—পা পিছলে পড়ে নাকানি চোবানি খাই আর কি—",

তার কথা শেষ হবার আগেই জয় টপ্‌ করে তাকে দুহাতের ওপর তুলে নিয়ে জলে নেমে গেল।

ওপারে যেয়ে নামিয়ে দিতেই কৃষ্ণা বোমার মত ফেটে পড়ে বল্লে "এটা হল কি?"

জয় নির্লিপ্তভাবে বল্লে "তোমায় ভেজান থেকে বাঁচান হল।"

"তোমার অত knight errantry না করলেও আমার চলে যায় বুঝেচ?—কে অত সদ্দারি করতে বলেছিল তোমায়?"

"বাঃ সদ্দারি করতে কাউকে বলতে হয় না কি? কেউ না বলতে গায়ে পড়ে যা করা হয় তারই নাম সদ্দারি—বুঝেচ।

কৃষ্ণা রাগে রুদ্ধবাক হয়ে হনহন করে এগিয়ে চলে গেল।

তারপর কী দিন এল ক্রমে।…সমস্ত ভারতবর্ষ ভরে যে জাল জড়িয়েছিল তাকে এবার সাবধানে টেনে তোলা। নিদ্রাহীন রাত নিষ্পলক আকাশের জলজলে তারাগুলোর মত উত্তেজনায় জল জল করে কাটতে থাকে। দিনগুলো অপেক্ষা শুব্ধ—কালবৈশাখীর আগমন মুহূর্ত্তে ঠিক আগে বঙ্গোপসাগরের ভীষণ কালো জলের অতল স্তব্ধতার মত।…নিজের গলার স্বরে চমকে ওঠা—নিজের ছায়া দেখে লাফিয়ে উঠে রিভলবার বের করা—সকলের মনের স্নায়ুগুলো যেন ধৈর্য্যের শেষ সীমায় পৌছে রয়েছে সব সময়।……

কৃষ্ণপক্ষের হলুদ রংয়ের ভাঙ্গা চাঁদ অশত্থগাছের আঁকাবাঁকা ডালের মাথায় দ্যাখা দিয়েছে। গাছের গুঁড়ি ঘেঁসে কৃষ্ণা আর জয় বসেছিল। চাপা রুদ্ধস্বরে কৃষ্ণা বলছে—"তুমি ভাব কি? সকলের চেয়ে তুমিই বেশী বোঝ? হতে পারে তুমি অনেকের চেয়ে বেশী পড়েছ—অনেক দেশ দেখেছ, তা বলেই ধরে নিতে হবে নাকি তুমি জগতের যত ইতিহাস রাজনীতিতে অভ্রান্ত পণ্ডিত? অত দম্ভ ভাল নয়।"

"কৃষ্ণা, তুমি কোনদিন কি আমার দিকে সহজভাবে চেয়ে দেখবে না? দাম্ভিক অকর্ম্ম বিলাসী আমি, এ ছাড়া আর কোনো পরিচয় কোনদিন নেবে না?"

ঘাসের ওপর থেকে কৃষ্ণা তার রিভলবারটা তুলে নিয়ে

হাতের ওপর দকে আমাদের যেতে হবে জান ত। পার তুমি এটা নিয়ে যাকে দেখিয়ে দেব তাকে গুলি করতে ?"

অন্ধকারে জয়ের চোখ দীপ্ত হয়ে উঠল। অনুচ্চ গম্ভীর স্বরে সে বল্লে "না পারি না। মানুষকে হত্যা করা মানুষের ধর্ম নয়—ওতে আমি বিশ্বাস করি না।"

কৃষ্ণা বিদ্রূপের বিষাক্ত হাসি হেসে উঠল। কাঁচের ওপর বালি ঘষার মত রূঢ় করকরে শোনাল কথাগুলো— "তা আগেই জানি। বুদ্ধদেব, বল সোজা কথায় সাহসে তোমার কুলোবে না।"

বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত জয় চম্‌কে দাঁড়িয়ে উঠল।—"কৃষ্ণা তুমিও এ কথা বল !"—ভাঙ্গা চাঁদের মরা আলোয় ওর মুখ মৃতের মত বিকৃত দ্যাখাল। কৃষ্ণার দিকে আর না তাকিয়ে সে চলে গেল।

ওকে এমন কখন দ্যাখেনি কৃষ্ণা—হঠাৎ তার বুকের ভেতরটা তীব্রভাবে ব্যথা করে উঠল।...

কী কালো সে রাত্তিরটা। চোখ চেপে বন্ধ করে রাখলেও এমন অন্ধকার হয় না—জগতের যত বাতি সব নিবিয়ে দিলেও এর চেয়ে বেশী অন্ধকার করা যায় না। পাতালের রুদ্ধ মসীস্রোতকে কে খুঁচিয়ে খুলে দিয়েছে, ফুটন্ত কালির সমুদ্রের মত ক্রুদ্ধ পদ্মার ভয়াল রূপ, পাগল হাওয়ার ভয়ঙ্কর হুঙ্কার, নিবিড় তিমির ভরা মেঘে নিশ্ছিদ্র আকাশ ফড়িংয়ের মত ছোট্ট একটা নৌকোয় কজন যাত্রী। ঢেউয়ের ওপর আছাড় খেতে খেতে নৌকাটা চলেছে, কারোর মুখে কথা নেই। হঠাৎ এক সঙ্গে দম্‌কা হাওয়া আর ঢেউয়ের ভীষণ ধাক্কা লেগে নৌকোটা উলটাতে উলটাতে সামলে গেল--যে হাল ধরে বসে ছিল সে প্রায় পড়ে গেছল আর একটু হলে। ওদের দলপতি ব্যস্ত হয়ে চীৎকার করে বল্লে "ভয়ানক ভরেছে নৌকো—একজন না নেমে গেলে সকলকে মরতে হবে।" ঝড়ের আওয়াজে তার চীৎকার চাপা পড়ে কথাটা মৃদু গুঞ্জনের মত মনে হল।

এখানে নামা!......কেউ কোন কথা বলতে পারলে না। মৃত্যুকে তারা গ্রাহ্য করে না। দেশকে বাঁচাতে, উদ্দেশ্যকে সফল করতে যেয়ে সকলের সামনে যে মৃত্যু তার দাম আছে, তাতে গৌরব আছে, আনন্দ আছে, সহানুভূতি আছে। কিন্তু তা বলে এখানে ? লোক চোখের আড়ালে অজ্ঞাতে নিতান্ত বৃথায়—রাক্ষসের মত ওই নিশ্চিত মৃত্যুময় জলে জেনে শুনে ডুবে মরা !

দলপতি ফের ডাক দিলে "সময় নেই। দেখি কার নাম ওঠে—"

জয় উঠে দাঁড়াল—"নাম ওঠাবার দরকার নেই, আমি যাচ্ছি।"

দলপতি তার হাত ধরে ফেল্লে "না দাঁড়াও। তাহলে অবিচার করা হবে—নাম ডেকে দেখি।"

জয় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বল্লে "অবিচার কি। সময় নেই, আমি সাঁতার জানি, শক্তি আছে গায়ে, কূলে পৌছলেও পৌছতে পারি—"

বিকট বাজের আওয়াজে কালো দিগন্ত ফেটে যেয়ে আগুন ঝলকে গেল। বিদ্যুতের আলোয় বিস্ফারিত চোখে কৃষ্ণা দেখলে জয় নৌকোর কিনারায় দাঁড়িয়েছে—অন্ধকারে ঢেকে গেল আবার চারিধার।......

সে রাতের বিভীষিকার স্মরণে আজকেও অস্থির হয়ে কৃষ্ণা শয্যাপ্রান্তের আবরণটাকে মোচড়াতে লাগল দুহাত দিয়ে।......

তারপর আর সে জয়কে দেখেনি। শুনেছিল জয়ের সংজ্ঞাহীন দেহ নদীতীরের বালি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। শুনেছিল মৃত্যুর সঙ্গে জীবন নিয়ে তার যুদ্ধ বেধেছে। তার পরে শুনেছিল সে রাত্রের গতিবিধি সম্বন্ধে সে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি বলে তাকে বন্দী করা হয়েছে। কোথাকার কোন দূরতম কারাগারে ডেটিনিউরূপে তার দিন কাটছে। এর পরে কৃষ্ণাকে দেশ ছেড়ে চলে আসতে হল, আর কোন সংবাদ সে শোনেনি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীইলা দেবী

জেনারেল রেম

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, পি-আর-এস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বোর্ড অফ কন্‌ট্রোলের সদস্যরূপে লর্ড মর্ণিংটন প্রথম ভারতবর্ষের রাজনীতির সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হন। চারি বৎসরকাল এই পদে থাকিয়া তিনি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন উত্তরকালে তাহা বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল। প্রধান মন্ত্রী পিটের সহিত ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্যের ফলে তিনি পূর্ণভাবে তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদাদি লাভ করিয়াছিলেন। গুরুর মত তিনিও ফরাসী নামে "হাড়ে চটা" ছিলেন। আমেরিকার উপনিবেশসমূহ হস্তচ্যুত হওয়াতে ইংলণ্ডের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা পূরণ করিবার নিমিত্ত গুরুশিষ্য মিলিয়া এই সময় ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই ওয়েলেসলী গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। যাহাতে কার্য্যারম্ভ করিতে মুহূর্ত্তমাত্র ব্যত্যয় না হয় সেজন্য ওয়েলেসলী দীর্ঘ সমুদ্রপথ জাহাজে পাড়ি দিবার সময় ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কাপ্তেন কার্কপ্যাট্রিকের সহিত উত্তমাশা অন্তরীপে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি তখন স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে তথায় অবকাশ যাপন করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে ওয়েলেসলী দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশদভাবে পরিচিত হন। ডিরেক্টর সভাকে তিনি এই সময় যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার অনুসৃতব্য কার্য্যক্রম এবং তাহার কারণাদি সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ফরাসী প্রভাব চিরদিনের মত সমূলে উৎপাটিত করিয়া ইংরাজাধিপত্য দৃঢ়সম্বদ্ধ করা এবং কায়ার পরিবর্ত্তে ছায়া লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে সম্মত হইলে দেশীয় রাজন্যবর্গকে ইংরাজ রাজছত্র-ছায়াতলে রাজ্যসুখ উপভোগ করিতে দেওয়া,—ইহাই ছিল ওয়েলেসলীর রাজনীতির মূল সূত্র। অধুনা উক্ত হইয়া থাকে যে ওয়েলেসলী শান্তির বারতা লইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু অবস্থাচক্রে তিনি অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সে কথা কিন্তু আদৌ সত্য নহে।*

আধুনিক ভারতেতিহাসে রুসাতঙ্ক আমাদের সুপরিচিত তখনকার দিনে ফরাসীভীতি তেমনই প্রবল ছিল ফরাসীদের ভয় করিবার কারণও যথেষ্ট ছিল। ফরাসীদের সহিত ইংরাজদের আবহমানকাল হইতে শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল। তদ্ভিন্ন এই সময় ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের সহিত প্রায় সমগ্র ইউরোপের সমর চলিতেছিল। ইংরাজরা জলের মত অর্থ ব্যয় করিয়া ফরাসীদের বিরুদ্ধে একের পর এক মিত্রমণ্ডল গঠন করিলেও অমিততেজা বিপ্লবী সেনাদলের হস্তে তাহারা প্রত্যেকবারই বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছিল। সাগরাম্বুপরিবেষ্টিতা বৃটানিয়ার জলপথে প্রাধান্য জন্য কোন ক্ষতি সাধন করা সম্ভব ছিল না। সেজন্য মহাবীর নেপোলিয়ন প্রাচ্যভূমে ইংরাজ

* "On the voyage outwards he formed the design of annihilating French influence in the Deccan."—Ency. Brit. (11th Ed.), Vol. XXVIII P. 506

"From the first he laid down as his guiding principle that the British must be the one paramount power in the peninsula."—Ibid Vol. XIV p. 410

"That Wellesley came to India with a conscious plan of conquest is well-known. The presence and influence of French Republicans from Seringapatam to Delhi was felt to be totally incompatible with the expressed intentions."

Keene—Hindustan under Free Lances p. 72-3,

শক্তি চূর্ণ করিবার এক বিরাট আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার গন্তব্যস্থল তখনও অজ্ঞাত ছিল। ত্রাসে উৎকণ্ঠায় বৃটীশ মন্ত্রীমণ্ডলীর দিন কাটিতেছিল। তাঁহাদের গৃহের পার্শ্বেই অত্যাচারজর্জ্জিত আইরিশ জাতি ফরাসী বিপ্লবের সাম্য স্বাধীনতা মৈত্রী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। উলফ টোন, নেপার ট্যাণ্ডি, এমেট প্রমুখ আইরিশ নেতৃবর্গ স্বতন্ত্র স্বাধীন আইরিশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। ওয়েলেসলী যখন ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন প্রায় সেই সময়েই (এপ্রিল ১৭৯৮) আয়র্লণ্ডে উলফ টোনের "ইউনাইটেড আইরিশমেন" দল বিদ্রোহ ঘটাইয়াছিল। ইংরাজ নৌবহরের জন্য জ্যাকোবিন গভর্ণমেণ্টের পক্ষে উহাদের বিশেষ কোন সাহায্য করা সম্ভব হয় নাই। কর্তৃপক্ষকে বিদ্রোহ প্রশমনকার্য্যে বিশেষ কিছু আয়াস পাইতে হয় নাই। উত্তরকালে ভারতেতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ লর্ড লেক তখন আয়র্লণ্ডে প্রধান সেনাপতি ছিলেন। বিদ্রোহদমন করিতে তিনি যে প্রকার অহেতুক কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাতে কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে উক্ত পদ হইতে অপসারিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষেও, ফরাসীশক্তি তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্য্যুদস্ত হইয়া গেলেও, ইংরাজদিগের পক্ষে আর নূতন উদ্বেগের কারণ দেখা দিয়াছিল। দিল্লী হইতে মহিশুর পর্য্যন্ত দেশের সর্ব্বত্র বিভিন্ন দরবারে ফরাসী ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অবস্থান করিতেছিল। কে বলিতে পারে যে সময় সমাগত হইলে তাহারা জাতীয় শত্রু ইংরাজদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইবে না? সাভোয়ার্ড দি বইনের সম্বন্ধে কতকটা নিশ্চিন্ত থাকিলেও তাঁহার উত্তরাধিকারী ফরাসী পেরঁর নিকট হইতে তাঁহাদের আশা করিবার কিছু ছিল না। মিশর অভিযানের কিছু পূর্ব্বে তিনি নেপোলিয়নের নিকট Descartes নামক এক ব্যক্তিকে দৌত্যকর্ম্মে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মাহেন্দ্রক্ষণে পেরঁ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিগ্রহণে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না বলিয়াই ইংরাজরা মনে করিতেন।

হিন্দুস্থানে পেরঁর মত দাক্ষিণাত্যে রেমঁর অবস্থানও ইংরাজদের ভয়ের কারণ ছিল। ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্র, মহিশুর দরবার এবং সিন্ধিয়ার ফরাসী সেনানায়কবর্গ, ইহাঁদের সকলকে তিনি তাঁহাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত করিবার প্রচেষ্টা করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ছিল। বোনাপার্টের ভারতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পেরঁর চল্লিশ হাজারের সহিত রেমঁর পনের হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য মিলিলে ইংরাজদের কি আর রক্ষা ছিল?

মহিশুর শার্দ্দুল টিপু সুলতান যে পূর্ব্ব পরাজয়ের কালিমা মুছিয়া ফেলিবার জন্য সাধ্যমত আয়োজন করিতেছেন সে কথা ইংরাজদের অজানা ছিল না। পশ্চিমে পারস্য হইতে পূর্ব্বে নেপাল এবং উত্তরে কাশ্মীর হইতে দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত সকল স্থানে ইংরাজদের সহিত যাহাদের শত্রুতা থাকিতে পারে অথবা উহাদের পতনে যাহারা লাভবান হইতে পারে সম্ভব অসম্ভব এমন সকল দরবারে তিনি দূত বা পত্র পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ভর করিতেন ফরাসীদের সহিত মিত্রতার উপর। 'অরির অরি' জ্ঞানে উহাদের তিনি নিজ স্বাভাবিক মিত্র বিবেচনা করিতেন। ফরাসী সরকারের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য তিনি ফ্রান্সে দৌত্য পাঠাইয়াছিলেন।* ফরাসী দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব বাধিলে ছয় হাজার মাইল দূরে বসিয়াও টিপু বিপ্লবের সাম্য স্বাধীনতা ও মৈত্রীর বাণীতে অনুপ্রাণীত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ইংরাজদের বিরুদ্ধে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের নিকট হইতে সাহায্যলাভ বিষয়ে অবহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যমধ্যে মহাসমারোহে "স্বাধীনতার বৃক্ষ" (Tree of Liberty) রোপিত এবং "স্বাধীনতার টুপী" (Cap of Liberty) পরিগৃহীত হইয়াছিল। মহিশুর দরবারে ভাগ্যান্বেষণনিরত ৫৯ জন ফরাসীসৈনিক শ্রীরঙ্গপত্তনে একটি জ্যাকোবিন ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সিটিজেন ফ্রান্সিস রিপো নামক ফরাসী নৌবিভাগের জনৈক ভূতপূর্ব্ব লেফটেণাণ্ট উহাদের দলপতি ছিল। ঐ ব্যক্তি একটি ফরাসী "প্রাইভেটিয়ার"

* তাহার কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ জন্য Bertrand de Molleville এবং কর্ণেল দ্যঁতিলের Memoires এবং কর্ণেল উইলকসের "History of Mysore" দ্রষ্টব্য।

জাহাজের অধ্যক্ষ ছিল। ঝঞ্ঝাবাতে তাহার পোতটী বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইলে রিপো আবশ্যকীয় জীর্ণসংস্কার জন্য মঙ্গলোর বন্দরে আশ্রয় লইয়াছিল। তথায় সুলতানের বহরাধ্যক্ষ গোলাম আলি খাঁর সহিত তাহার পরিচয় ঘটে। তাহার নিকট রিপো মরিশসদ্বীপের একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিল। বলিয়াছিল ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজদিগকে বহিষ্করণ ব্যাপারে সুলতানের অভিপ্রায় জানিবার এবং তদনুসারে আবশ্যকমত ব্যবস্থা করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে এদেশে পাঠাইয়াছেন। গুলাম আলি তাহাকে দরবারে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। সুলতানের সহিত উহার অনেক বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। তাহার মত অর্দ্ধশিক্ষিত, অমার্জ্জিত ব্যক্তির স্বরূপ যে সুলতানের চোখে ধরা পড়ে নাই তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। যাহা হউক টিপু উহার সাহায্যে কিছু সুবিধা করিয়া লইতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন।

মহিশুর দরবারে ভাগ্যান্বেষী ফরাসী সৈনিকগণের ক্লাব প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছি। ১২ই মে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে উহাদের একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহার কৌতূহলপ্রদ বিবরণ সমসাময়িক কাগজ পত্র হইতে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।* প্রথমে রাজতন্ত্রের প্রতি ঘৃণা এবং প্রজাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যসূচক প্রস্তাবসমূহ পরিগৃহীত হইবার পর মহোৎসাহে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইয়াছিল। তদনন্তর সকলে শোভাযাত্রা সহকারে নগর পরিভ্রমণ করিয়াছিল। উহারা রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইলে সুলতান স্বয়ং প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া উহাদের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রজাতন্ত্রের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য বহুসংখ্যক তোপধ্বনি করা হইয়াছিল। সুলতান উহার প্রতি স্বীয় অনুরাগ এবং তাহাদের প্রতি প্রীতি জানাইয়াছিলেন। উহারাও প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে তাহাদের অবিচল বশ্যতা জ্ঞাপন করিয়াছিল। অনন্তর প্রগাঢ় নিস্তব্ধতার মধ্যে "স্বাধীনতার শিরস্ত্রাণ পরিশোভিত স্বাধীনতার বৃক্ষ" রোপিত হইয়াছিল। রিপো তাহার পর একটি উৎকট বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাহার একাংশমাত্র মূল ফরাসী হইতে অনুবাদিত হইয়া এখানে দেওয়া হইল:—"আমি বর্ব্বরতা এবং অমানুষিক অত্যাচারের চূড়ান্ত প্রত্যক্ষ করিতেছি।—জগদীশ্বর। ত্রাসে আমার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছে। কি ভয়ানক! ইংরাজদিগের নিষ্ঠুরতার যূপকাষ্ঠে প্রদত্ত বলিদিগকেও আমি দেখিতে পাইতেছি। তাহাদের পাশবিকতার বলি এবং তৎসহ নিহতা স্ত্রীলোকগুলিকেও আমি দেখিতেছি। হায়! হায়!! কি বিষম বিভীষিকা!!! আতঙ্কে আমার রোমাঞ্চ হইতেছে। এ আবার কি দেখি? মাতৃস্তন্যপায়ী শিশুদিগের শোণিত অভাগিনী জননীর রুধিরের সহিত মিশিয়া একই স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। হতভাগিনী জননীবৃন্দের সহিত দুর্ভাগ্য শিশুদিগকেও আমি একই মৃত্যুর কবলে অন্তিম শ্বাস গ্রহণ করিতে দেখিতেছি। উঃ!—ঘোর আতঙ্ক এবং জঘন্য নীচতা! তোমরা আমার হৃদয়ে কি বিজাতীয় জুগুপ্সা না জাগাইয়া তুলিতেছ! অভাগা আত্মাগণ! বিশ্বাস কর আমরা তোমাদের এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। নির্দ্দয় বিশ্বাসঘাতক ইংরাজ! কাঁপ—ত্রাসে—কাঁপ। মনে রাখিও ভগবান বলিয়া এমন একজন আছেন যিনি অপরাধীর দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। তিনিই আমাদের মনে এ প্রতীতি জাগ্রত করিতেছেন যে আমাদের পিতৃপিতামহ এবং তাঁহাদের দলের উপর তোমরা যে নারকীয় অত্যাচার করিয়াছ তোমাদের রক্তে আমরা তাহা মুছিতে পারিব। নিরপরাধ, দুঃখভারগ্রস্ত আত্মাসকল! শান্ত হও। আমরা তোমাদের হইয়া প্রতিশোধ লইব। হাঁ,—আমি শপথ করিতেছি,—নিশ্চয়ই লইব।" রিপো ব্যতীত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণও সভায় বক্তৃতা করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ,—দম্পার, দি বে, কঁতোয়া, ভ্রেণিয়ের দাশিরে, প্রোভোয়া, জুয়ঁ, এব্রাহাম, কেস্তিয়ঁ, জুল্যাঁ, শারিয়ে, থুভেনির লেস্কোল, লাদালে, বম্পার, মিলে, এণ্টনি জোসেফ, মার্ক, ফ্রান্সিস দি এস্কারভিল এবং লেগ্রাঁ।

জ্যাকোবিনদিগের উৎসাহে টিপুও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। রিপোকে অত বেশী প্রত্যয় করিতে মন্ত্রিবর্গের মধ্যে কেহ কেহ নিষেধ করিলেও তিনি সে কথায় কর্ণপাৎ

* Asiatic Annual Register, 1799, pp. 251

করিলেন না। রিপোর সাহায্যে তিনি মরিশসের "ফরাসী সর্দ্দারগণের" নিকট দূত প্রেরণে সচেষ্ট হইলেন। স্থির হইল ১৭০০০৲ টাকা মূল্যদানে টিপু তাঁহার জাহাজখানি কিনিয়া লইবেন এবং বণিকের ছদ্মবেশে পণ্য দ্রব্য সহ তাঁহার দূতগণ রিপোর কথার যাথার্থ্য নিরূপণ জন্য মরিশস গমন করিবেন। পের্ণো (Pernaud) নামক জনৈক ফরাসী উক্ত জাহাজের কাপ্তেন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রিপো দরবারে (রাজদূতগণের নিরাপত্তার প্রতিভূস্বরূপ) রক্ষিত হইলেন। প্রতিশ্রুত ফরাসী সাহায্যকারী সেনাবল এবং নৌবহর লইয়া দুইজন দূত স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনে এবং অপর কয়েকজন ফরাসী প্রজাতন্ত্রের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সুলতানের প্রার্থনা জানাইবার জন্য ফ্রান্স গমনে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। টিপু পত্রমধ্যে অন্যান্য নানা কথার পর লিখিয়াছিলেন যে নির্লজ্জ দস্যুবৃত্তিপরায়ণ, তস্করপ্রকৃতি ইংরাজগণ, যাহাদের নিজেদের কোনরূপ যোগ্যতা নাই,—মোগল এবং মারাঠাদের সহযোগিতায় তাঁহাকে হীন সন্ধি স্থাপনে বাধ্য করিয়াছে এবং তাঁহার ভগবদ্দত্ত রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ এবং নগদ তিন ক্রোর ত্রিশ লক্ষ টাকা কাড়িয়া লইয়াছে। সেজন্য হিন্দুস্থান হইতে দুর্ব্বৃত্তদিগকে বিতাড়িত করিতে তিনি ফরাসীদিগের নিকট হইতে সাহায্য কামনা করেন এবং আশা রাখেন যে উক্ত মহদুদ্দেশ্য সাধনে প্রয়োজনীয় সাহায্য দানে তাঁহারা পরাঙ্মুখ হইবেন না।"

যাত্রার পূর্ব্ব রাত্রে পের্ণো সুলতান প্রদত্ত জাহাজের মূল্যসহ গোপনে মঙ্গলোর বন্দর ত্যাগ করিয়া জাহাজ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। ইহাতে মহিশুরী দূতগণের যাত্রারম্ভ করিতে কয়েক মাস বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। পাঁচজন দূতের মধ্যে তিনজন তখন জাহাজে ছিলেন। উহাঁদের অথবা পের্ণোর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ পোতটীর সলিলসমাধি হইয়াছিল। হুসেন আলি এবং সেখ ইব্রাহিম নামক অপর দুইজন রাজদূত সে রাত্রে স্থলে থাকার জন্য প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। পের্ণোর পলায়ন সংবাদে টিপু রিপোকে তাঁহার পরিবর্ত্তে যাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। দি বে নামক জনৈক ফরাসী দোভাষীরূপে রাজদূতগণের সহগামী হইয়াছিল। ঐ ব্যক্তি এককালে ঘড়ি নির্ম্মাতা ছিল। অক্টোবর মাসে (১৭৯৭ খৃঃ) সুলতানের জাহাজ মঙ্গলুর হইতে যাত্রা করিল। বন্দর হইতে বাহির হইয়াই রিপো তাহার ইউরোপীয় নাবিকগণসহ হুসেন আলি এবং সেখ ইব্রাহিমকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়াছিল এবং তাঁহাদের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষকে সুলতান কর্ত্তৃক লিখিত পত্রগুলি কাড়িয়া লইয়াছিল! উহাতে তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা লিখিত নাই দেখিয়া অতঃপর সে ঐ গুলি উহাদের ফিরাইয়া দিয়াছিল। সমস্ত পথ রিপো রাজদূতদ্বয়ের সহিত নিতান্ত বর্ব্বরোচিত ব্যবহার করিয়াছিল। ১৯শে জানুয়ারী ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে রিপোর জাহাজ মরিশস দ্বীপের পোর্ট লুইয়ে আসিয়া পৌছিয়াছিল। দ্বীপের শাসনকর্ত্তা জেনারেল মালার্ত্তিক মহামান্য অতিথিবর্গকে পরম সমাদরে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তাঁহাদের সম্মানার্থ ১৫০ সংখ্যক তোপধ্বনি করা হইল। গভর্ণমেণ্ট হাউস মধ্যে তাঁহাদের বাস ভবন নির্দ্দিষ্ট হইল।

টিপু মালার্ত্তিককে ১০০০০ ফরাসী এবং ৩০০০০ কাফ্রি সৈন্য পাঠাইতে বলিয়াছিলেন এবং লিখিয়াছিলেন যে উহাদের সহিত নিজ দুর্দ্ধর্ষ ষষ্ঠি সহস্র সৈনিক সম্মিলিত হইলে ইংরাজ, মারাঠা, মোগল সকলকে নির্জ্জিত করা অনায়াসসাধ্য হইবে। ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতিও এই সময় তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখিয়া দিয়াছিলেন। সুলতান যে রিপো কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছেন তাহা মালার্ত্তিক বুঝিলেন। কিন্তু রাজদূতগণের নিকট সে কথা স্বীকার করা চলে না। তিনি উহাঁদের বলিলেন যে তাঁহাদের প্রভু যে প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা তিনি যথাস্থানে জ্ঞাপন করিবেন। তাঁহার পক্ষে সরাসরিভাবে টিপুকে কোন প্রকার সাহায্য করা সম্ভব ছিল না। সেজন্য তিনি ঘোষণা করিলেন যে দ্বীপের অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে যাহারা সুলতানের কর্ম্মগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে যাইতে চাহে তাহাদের প্রার্থিত অনুমতি দেওয়া হইবে। ফলে প্রায় ১০০ জন স্বেচ্ছাসৈনিক সংগৃহীত হইয়াছিল। মহিশুরী দূতগণ উহাদের লইয়া "লা প্রেণেউস" নামক ফরাসী রণপোতযোগে মরিশস পরিত্যাগ করিয়া ২৬শে এপ্রিল তারিখে মঙ্গালোর বন্দরে আসিয়া উপনীত হইলেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া উহারা

প্রভুর নিকট অভিযান সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন তাহা পরম কৌতূহলপ্রদ। জাহাজে রিপোর দুর্ব্যবহার, নিজেদের সমুদ্রপীড়া, তাঁহাদের আগমনে মরিশসের রাজপুরুষ এবং অধিবাসীগণের বিস্ময়, তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা ইত্যাদি অনেক কথা লিখিলেও—মরিশস হইতে যে কোন প্রকার প্রকৃত সাহায্য প্রাপ্তি সম্ভব নহে এবং রিপো যে সে বিষয়ে তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে সুলতানকে সে কথা জানাইতে দূতদ্বয়ের সাহস হয় নাই। *

নবাগত ফরাসীদিগের সকলেই সমরব্যবসায়ী ছিল না। উহাদের সকলকার নামও জানা যায় না। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই দলে আসিয়াছিল বলিয়া জানা যায়:—

কাপ্তেন পীয়ের পল দুবুক—নৌসৈন্যগণের অধ্যক্ষ—	
কাপ্তেন শাপুই— স্থল „ „ —	
দেশমুলঁ্যা—ইউরোপীয়দিগের কম্যাণ্ডাণ্ট—	
গোলন্দাজগণের অফিসর—	•
নৌসৈনিকগণের „ —	৬
জাহাজী মিস্ত্রি—	৪
অফিসর, কাপ্তেন, সার্জ্জেণ্ট—	২৬
ইউরোপীয় সাধারণ সৈনিক—	৩৬
ইউরেসীয় „ „ —	২৬
মোট—	১০৩

বিভিন্ন উপায়ে পরিজ্ঞাত কয়েকজনের নামও এখানে দেওয়া যাইতে পারে,—লেফটেনাণ্ট:—শার্লমেন মার্ক দে লা রাবিনিয়ের, সাঁজিনাতে, রাবিনে, সাঁজেনে; এনসাইন জ্যাক ব্যর্থে; জ্যাক দুদেমঁা, জ্যাক রবার্টস, পীয়ের ফিলেংজ, পীয়ের পেরিট, মাইকেল লেলে, ফ্রাঁসোয়া রবার্ট, জ্যাক মূলেৎ, পেতি, মেরুলে এবং বেসিয়ের।

টিপু উহাদের নিম্নলিখিত হারে বেতন প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছিলেন—

			টাকা
(১)	জাহাজের কাপ্তেন—	মাসিক	২০০০৲
(২)	বন্দরের „ —	„	২০০০৲
(৩)	ব্রিগেডের অধ্যক্ষ—	„	২০০০৲
(৪)	লিজনের „ —	„	১৮০০৲
(৫)	ব্যাটালিয়নের „ —	„	১৫০০৲
(৬)	পদাতিকদলের কাপ্তেন—	„	৫০০৲
(৭)	অশ্বারোহীদলের „ —	„	৫০০৲
(৮)	জাহাজের লেফটেনাণ্ট—	„	৫০০৲
(৯)	„ এনসাইন—	„	৩০০৲
(১০)	পদাতিকদলের লেফটেনাণ্ট—		৩০০৲
(১১)	অশ্বারোহীদলের „ —	„	৩০০৲

টিপুর দরবারে ফরাসী ভাগ্যান্বেষীগণের মধ্যে শাপুই এবং দুবুক শুধু কতকটা ভদ্রলোক ছিলেন। উঁহারা সহকর্ম্মীগণের নাটকোচিত প্রহসনের ব্যাপারে কোন অংশ লয় নাই। দরবারে তাঁহাদিগকে সুলতান সকাশে পরিচিত করিয়া দিবার সময় আসিলে তাঁহাদের প্রকৃত পদমর্য্যাদা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল এবং কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের নিকট হইতে সে কথা জানিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা যুগ্মভাবে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে স্থল এবং জল নিজেদের যথানির্দ্দিষ্ট পথে কার্য্য করিবার জন্যই যে শুধু জেনারেল মালার্ত্তিক এবং এডমিরাল সেরসি তাহাদের পাঠাইয়াছেন তাহা নহে; পরন্তু ফরাসী প্রজাতন্ত্র এবং মরিশসদ্বীপস্থ তাঁহাদের প্রতিনিধিবর্গের নামে সুলতানের সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়া সন্ধি সংস্থাপনের জন্য পূর্ণ ক্ষমতা এবং অধিকার লইয়া রাজদূতরূপে তাঁহারা আসিয়াছেন, এবং তাঁহাদের কৃত সন্ধি ফ্রান্সের জাতীয় মহাসভার নিকট উপস্থাপিত হইয়া তাঁহাদের দ্বারা মঞ্জুর হইবে। কিন্তু মালার্ত্তিক বা সেরসি কর্ত্তৃক টিপুকে লিখিত ডেসপ্যাচে, মরিশসের সরকারী কাগজপত্রে অথবা "লা প্রেণেউস"এর

* টিপুর মৃত্যুর পর তাঁহার দফতর ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছিল। ফরাসীদিগের সহিত তাঁহার যে সকল পত্র ব্যবহার হইয়াছিল তন্মধ্যে কতকগুলি উঁহারা সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। "Asiatic Annual Register" (1799) গ্রন্থের ১৫৪-২৪৪ পৃঃ এবং পরিশিষ্টের ২১৪-৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। বক্ষ্যমান রিপোর্টটীও তন্মধ্যে আছে।

পোতাধ্যক্ষ কাপ্তেন লাম্বিন্তের পত্রমধ্যে এ ধরণের রাজনৈতিক দৌত্যের কোন প্রসঙ্গ দেখা যায় না।

অতঃপর টিপু স্থির করিয়াছিলেন যে স্থানীয় তথ্যাদি প্রদান এবং সাহায্যকারী অভিযান প্রেরণে আনুসঙ্গিক ব্যবস্থাকার্য্যে সুবিধার জন্য ফরাসীদেশে তাঁহার একজন দূত থাকিলে ভাল হয়। সেজন্য তিনি দুবুককে মনোনীত করিয়াছিলেন। স্থির হইল সুলতানের দুইজন মুসলমান মন্ত্রীও তাঁহার সঙ্গে যাইবেন। নিরপেক্ষ ওলন্দাজ বন্দর ট্রাঙ্কুইবার হইতে যাত্রা করাই দুবুকের সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। তথায় আসিয়া পৌছিয়াও নানা কারণে তাঁহার যাত্রারম্ভ করিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। ট্রাঙ্কুইবার হইতে তিনি সুলতানকে প্রায়ই আশ্বাস দিতেন যে তাঁহার সাহায্য জন্য ফরাসীরা লোহিত সাগরে পোতারোহণ করিয়াছে এবং তাহারা যে কোনদিন আসিয়া দেখা দিতে পারে। শাপুই এবং দরবারস্থ অন্যান্য ফরাসীরাও টিপুকে অনুরূপ ভরসা দিত। এখানে বলা প্রয়োজন যে বোণাপার্টির মিশরে অবতরণের সংবাদ ইতোমধ্যে এ দেশে আসিয়া পৌছিয়াছিল। তাঁহার লিখিত পত্রও সুলতানের হস্তগত হইয়াছিল। আবুকির উপসাগরে নেলসনের হস্তে ফরাসী রণপোতমালা বিধ্বস্ত হওয়ার সংবাদ (১৮।১৭৯৮) ইংরাজ কর্তৃপক্ষ প্রাপ্তিমাত্র টিপুকে জানাইতে তৎপর হইয়াছিলেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে দুবুক এবং তাহার সঙ্গীগণ ট্রাঙ্কুইবার হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ফরাসীদেশে পৌছিবার পূর্ব্বেই টিপু সুলতানের পতন হইয়াছিল। তাঁহাদের জাহাজও ইংরাজহস্তে ধৃত হওয়াতে তাঁহারা বন্দীভাবে ইংলণ্ডে আনীত হইয়াছিলেন। ইংরাজরা সকল কথাই জানিতে পারিয়াছিলেন। টিপুর ফরাসীদের মধ্যে তাঁহাদের গুপ্তচরের অভাব ছিল না। উহারা নিয়মিতভাবে সকল কথা তাঁহাদের জানাইত। ওয়েলেসলি স্বয়ং ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষকে সে কথা তাঁহার ডেস্প্যাচে লিখিয়াছিলেন। টিপুর দূতদ্বয় যখন মরিশসে আগমন করে তখন জন আর্কার্ট নামক জনৈক ইংরাজ সৈনিক বন্দীভাবে তথায় অবস্থান করিতেছিল। ঐ ব্যক্তি কোন উপায়ে কলিকাতায় কর্তৃপক্ষকে সকল সংবাদ, মায় মালার্তিকের ঘোষণাপত্রের প্রতিলিপি, পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।* তাহা ১৮।৬।১৭৯৮ তারিখে গভর্ণর-জেনারেলের হস্তগত হইয়াছিল এবং তৎক্ষণাৎ তিনি টিপুর সহিত যুদ্ধার্থ সৈন্য-সমাবেশ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।†

---

* J. J. Cotton :—List of Inscriptions on Tombs and Monuments in Madras, No. 173.

† "On the 2nd day after the receipt of intelligence he issued final orders for assembling without delay English armies on the coast of Coromondol and Malabar with a view of making an attack upon the Sultan."

Col. Wilks ; History of Mysore Vol. II. 689.

There is conclusive evidence that this was Wellesley's resolve before he landed ; at all events, that he expressed his intention so soon after his arrival that it is impossible to suppose that his words were not the results of a deliberately formed resolve."—Ibid, p.

"Its (Tipu's power) further diminution was indispensable to British power."—Ibid, p. 673.

"There is nothing to show that Tipu was ever afforded an oppurtunity of explaining his conduct, and there is a long minute of Wellesley, dated the 12th August 1799, giving conclusive reasons why there was no necessity to ask for explanations of that which could not be explained ; and that the English were justified in making preparations for war without disclosing their knowledge. The whole minute is a most masterly production, though we are not prepared to say that it is open to objection."—Ibid, ch. LV.

"Against an enemy of this description, no effectual security can be obtained, otherwise than by such a reduction of his power as shall establish a permanent restraint upon his future means of offence."……Wellesley's Despatches, pp. 11—57.

"It would be neither prudent nor politic to wait an actual hostality on his part."…Ibid, p. 1—2.

এখনকার দিনে অনেকে বলিয়া থাকেন ওয়েলেসলী টিপুকে ফরাসীদের সহিত ষড়যন্ত্র হইতে নিরস্ত হইয়া ইংরাজদিগের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু টিপু তাঁহার "সাবসিডিয়ারী এলায়েন্স" নীতি প্রত্যাখ্যান করিয়া ফরাসীদের সহিত তাঁহাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে থাকায় তাঁহারা বাধ্য হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। সে কথা কিন্তু প্রকৃত নহে। ওয়েলেসলি চিরদিনের মত টিপুর শক্তি চূর্ণ করিবার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সঙ্কল্প লইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন; এবং তাঁহাকে যে অপ্রস্তুত অবস্থাতে আক্রমণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে নিজামকে আয়ত্ত মধ্যে আনা প্রয়োজন ছিল। সেজন্য তাঁহার প্রতি ওয়েলেসলির দৃষ্টি প্রথম নিপতিত হইয়াছিল। তাঁহার ফরাসী-বাহিনী ভাঙ্গিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে একদল ইংরাজ সৈন্য দিয়া আসন্ন সমরে তাঁহাকে নিজেদের পক্ষে রাখা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে আশ্রিত মধ্যে পরিণত করা, অনন্তর তাঁহার এবং মারাঠাদের সহযোগিতায় টিপুর শক্তি খর্ব্ব করা এবং অতঃপর অন্যান্য রাজ্যগুলি সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করা ইহাই ছিল ওয়েলেসলীর রাজনীতির মূলসূত্র। প্রত্যেক দরবারে ফরাসী সৈনিকগণের স্থলে বৃটিশ "সাবসিডিয়ারী ফৌজ" রক্ষা এবং যাহাতে ভবিষ্যতে দেশীয় রাজগণ ফরাসীদের সহিত কোনরূপ যোগাযোগ রাখিতে না পারে সেজন্য সাগরতট হইতে যথাসম্ভব দূরে তাহাদের সীমাবদ্ধ করা,—এই দুই উপায়ে উক্ত কার্য্য সাধিত করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কলিকাতা যাইবার পথে মান্দ্রাজের মাটিতে পদার্পণ করিয়াই (২৬.৪ ১৭৯৮) ওয়েলেসলী স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

দেশীয় রাজন্যবৃন্দের মধ্যে নিজামই ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল। টিপু এবং মারাঠাদের ভয়ে তিনি সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতেন এবং সেইজন্যই তিনি রেমঁর নেতৃত্বে পাশ্চাত্য সমরপদ্ধতিতে শিক্ষিত বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। উহারা ইংরাজদের কোন অনিষ্টাচরণ কখনও করে নাই। ফরাসী অফিসরগণ নিজামের ইংরাজ অফিসরদিগের সহিত বরাবর সখ্যতাসূত্রে কাটাইয়াছিল। কিন্তু ওয়েলেসলীর রাষ্ট্রনীতিতে এ সকলের স্থান ছিল না।* তাঁহার সৌভাগ্যক্রমেই যেন ভগবান ইতিমধ্যে রেমঁকে ধরাধাম হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন।

নিজাম আলি টিপু এবং ইংরাজ উভয় পক্ষকেই সমান অবিশ্বাস করিতেন। সুতরাং প্রথমটায় তিনি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হন নাই। তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল ইংরাজরা প্রতিশ্রুত সাহায্য না করিলে মারাঠাদের হস্তে তাঁহার পতন অনিবার্য্য। আর যদি তিনি উহাদের কথায় সম্মত না হইয়া টিপুর সহিত যোগ দেন তাহা হইলেও ইংরাজ এবং মারাঠাদের সম্মিলিত বলের নিকট তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইবে। এমন সময় ওয়েলেসলী তাঁহাকে ভরসা দিলেন যে শুধু মারাঠাদের নহে, তাঁহার সকল শত্রুর বিরুদ্ধে কোম্পানী তাঁহাকে সাহায্য করিবে এবং তাঁহার নিকট রক্ষিত 'ফৌজ" দুই হইতে ছয় ব্যাটালিয়নে বর্দ্ধিত করা হইবে।

১লা সেপ্টেম্বর তারিখে নিজাম আলি ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের চরণে স্বাধীনতা ডালি দিলেন। ইহাতে তিনি তাঁহার ফরাসী কোর ভাঙ্গিয়া দিতে, উহার অফিসরগণকে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিতে এবং তাঁহার রাজ্যমধ্যে রক্ষিত "বৃটিশ অফিসরগণ পরিচালিত হায়দ্রাবাদ কণ্টিঞ্জেণ্টের" জন্য উহাদের পূর্ব্ব প্রদত্ত ৫৭৭১৩৲ টাকার পরিবর্ত্তে ২০১৪২৫৲ টাকা প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। শেষোক্ত ধারাটির সুস্পষ্ট অর্থ ফরাসী অফিসরগণকে অপসৃত করিয়া তাহাদের স্থলে ইংরাজ অফিসর নিয়োগ ভিন্ন আর কিছু নহে।

ফরাসীদের বাধাপ্রদানের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করিয়া কার্য্যারম্ভ করা আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছিল। হায়দ্রাবাদে পূর্ব্ব হইতে কর্ণেল হাইণ্ডম্যানের নেতৃত্বে দুই ব্যাটালিয়ন ইংরাজ সৈন্য ছিল। ১০ই অক্টোবর তারিখে গুণ্টুর হইতে কর্ণেল রবার্টসন আরও চারি ব্যাটালিয়ন সৈন্য লইয়া আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। রেমঁর

* There was no place for sentiment in such a policy as Mornington's."—Hindustan under Free Lances", P. 73.

দেহান্তের পর তাঁহার কোরে যথেষ্ট গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। বেতন বাকি পড়ায় সিপাহীগণ বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। রেমঁর স্থলাধিকার লইয়া অফিসরগণের মধ্যেও বিষম মনোমালিন্য ও মাৎসর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিজাম আলিকে সেনাদল ভাঙ্গিয়া দিতে ইতস্ততঃ করিতে দেখা যায়। "বিপদের সময় যাহাদের নিকট হইতে তিনি প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছিলেন তাহাদের বিদায় দিতে তিনি যে অনিচ্ছার সহিত বাধ্য হইবেন তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং নিজামের পথে সম্মানজনকও বটে। ইংরাজদিগের দিক হইতে বিচার করিলে হায়দ্রাবাদের ফরাসী কোর ধ্বংস করা সেরারকম রাজনৈতিক চালবাজি হইয়াছিল। কিন্তু যে বন্ধনসূত্র এ যাবৎ সিপাহী এবং অফিসরদের পরস্পরের সহিত এবং উভয়কে রাষ্ট্রের সহিত এক নিবিড় বন্ধনে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইল একথা মনে ভাবিলে দুর্ভাগাদের জন্য সহানুভূতির উদ্রেক হয়। একার্য্য যে প্রয়োজন ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রয়োজন বলিতে হয়। সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই যে বিদায়ের মুহূর্ত্ত সমাগত হইলে বহুবিধ গুপ্ত চক্রান্ত এবং সর্ত্তপালন,—যে সর্ত্ত দরবার এবং ফরাসীসেনিকগণ উভয়ের পক্ষেই নিতান্ত কষ্টকর এবং অপমানজনক হইয়াছিল—এড়াইবার চেষ্টা চলিতে দেখা গিয়াছিল।"*

কার্কপ্যাট্রিক এবং ম্যালকম বিনা রক্তপাতে কার্য্যসিদ্ধি করিতে ইচ্ছুক হইলেও বুঝিয়াছিলেন যে আবশ্যক হইলে সর্ব্ববিধ বিপদপাতের সম্ভাবনা মাথায় লইয়া তাহা করা আবশ্যক। তাঁহাদের আশঙ্কা ছিল যে দরবারের অনুসৃত কুটিলনীতিতে হয়ত বা শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা বল প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইবেন। তাঁহাদের সৈন্যগণ ফরাসী কোরের প্রতি ভীতিপ্রদর্শন করিতে এবং আদেশমাত্র উহাদের আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে আদিষ্ট হইয়াছিল। কর্ণেল হাইণ্ডম্যান ফরাসী শিবিরের পশ্চাদ্দেশে এবং রবার্টস সম্মুখদেশে স্থান পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন (২০।১০।১৭৯৮)

গভীর রাত্রে দুইজন ফরাসী অফিসর পিরঁর পক্ষ হইতে আসিয়া কার্কপ্যাট্রিককে জানাইয়াছিল যে তাহারা সকলে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছে এবং "এ কথা ভাল করিয়াই জানে যে রাজনৈতিক কারণে তাহাদের দাক্ষিণাত্য হইতে অপসারিত করা বাঞ্ছনীয় বোধ হইলেও ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের প্রত্যেকে তাহাদের প্রতি যতটুকু ন্যায়বিচার ও অনুকম্পা প্রদর্শন করা চলে তাহা লাভে তাহারা অধিকারী বিবেচিত হইবে।" কার্কপ্যাট্রিক এ কথার যথোচিত প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে ফরাসী ক্যাণ্টনমেণ্টে সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দিবার সরকারী ঘোষণাপত্র পঠিত হইয়াছিল। দরবারের যে সকল কর্ম্মচারীর প্রতি উক্ত কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছিল তাঁহারা কোন গণ্ডগোল দেখিতে পান নাই এবং ফিরিয়া গিয়া তন্মর্ম্মে রিপোর্ট দিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের স্বল্প পরে কার্কপ্যাট্রিক পিরঁর লিখিত একখানি চিঠি পাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি তাঁহাকে ক্যাণ্টনমেণ্টস্থ সরকারী এবং ব্যক্তিগত যাবতীয় সম্পত্তি রক্ষার্থ ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে কাহাকেও পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ঐ চিঠি পাইয়া তিনি তাঁহার সহকারী ম্যালকমকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই অধিকাংশ সিপাহী বক্রী বেতন পরিশোধ দাবী করিয়া প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। ম্যালকম যখন আসিয়া পৌঁছিলেন বিদ্রোহ তখন চরমে উঠিয়াছে। পিরঁ এবং অনেক অফিসর বিদ্রোহীদের হস্তে ধৃত হইয়াছিলেন। বৃথাই ম্যালকম উহাদের নিকট যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৃথাই তিনি উত্তেজিত সৈনিকদিগকে শান্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মহা-কোলাহলের সহিত উহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার কোন বিপদপাত অসম্ভব হইত না যদি না সময়োচিত সাহায্য তাঁহার রক্ষার্থ আগুয়ান হইত। বিদ্রোহীগণের মধ্যে ম্যালকমের পুরাতন রেজিমেণ্টের কয়েকজন সৈনিক ছিল।

* Kaye :—Life of "Sir John Malcolm," vol. II. p. 72

উহারা কোম্পানীর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রেম্‌র দলে যোগ দিয়াছিল। উহারা এক্ষণে নিজেদের ভূতপূর্ব্ব অফিসরকে চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে আগুয়ান হইল। ম্যালকমকে উঁচুতে তুলিয়া ধরিয়া মাথায় করিয়া ধরাধরি করিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া উহারা ক্রুদ্ধ জনতার হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। বিদ্রোহ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ফরাসী অফিসরগণের পক্ষে যত ভয়েরই হোক না কেন, ইংরাজদের ইহাতে আনন্দিত হইবার কথা। তাঁহাদের কার্য্য ইহাতে অপেক্ষাকৃত সুগম হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার বাধ্যতা ও বশ্যতাজ্ঞানপরিশূন্য বিশৃঙ্খল সৈনিকদিগকে নিরস্ত্রীকরণে যত্নবান হইয়াছিলেন। স্থির হইল পরদিবস প্রাতঃকালে রবার্টস ফ্রেঞ্চ লাইনের ঠিক সম্মুখভাগে স্থান পরিগ্রহণ করিয়া উহাদের আত্মসমর্পণে আহ্বান করিবেন এবং অর্দ্ধঘণ্টা বিলম্ব করিয়া আদেশ প্রতিপালিত হইতেছে না দেখিলে তাহাদের আক্রমণ করিবেন। তাঁহার সৈনিকগণের বন্দুকের শব্দ শ্রবণগোচর হইবামাত্র হাইণ্ডম্যান পশ্চাদ্দেশ হইতে উহাদের আক্রমণ করিবেন। যাহাতে কোন ব্যক্তি পার্শ্বদেশ দিয়া পলায়ন করিতে না পারে সেজন্য প্রান্তদ্বয় ম্যালকম ও অপর একজন অফিসর অশ্বারোহী সৈন্যদলসহ রক্ষা করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। পরদিন সকালে ম্যালকম যখন তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফরাসী শিবিরের দক্ষিণপার্শ্বভাগে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন তখনও রবার্টস দেখা দেন নাই। কতকগুলি সিপাহী তখন গোপনে শিবির হইতে পলায়ন করিতেছিল। ম্যালকমকে আসিতে দেখিয়া উহারা প্রমাদ গণিল। তিনি উহাদের আশ্বাস দিলেন যে ইংরাজ সরকারের আদেশ পালন করিলে কাহারও কোন ভয়ের কারণ নাই। সে কথা সহকর্ম্মীদের বুঝাইয়া বলিবার জন্য তিনি উহাদের শিবির মধ্যে যাইতে বলিয়াছিলেন এবং নিজেও তাহাদের অনুসরণ করিয়া অদূরে আসিয়া দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে শিবির মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছিল। বিদ্রোহীগণ মহাভয়ে অফিসরদের মুক্তি দিয়াছিল। সকলে ভীত, সন্ত্রস্ত, চকিত। ম্যালকম উহাদের বলিলেন যে নিরুপদ্রবে অস্ত্রপরিত্যাগ করিলে কাহারও ভয়ের কোন কারণ নাই। কোম্পানী নিজ নিজ ধনসম্পত্তিসহ সকলকে যথা ইচ্ছা যাইতে দিবেন। সিপাহীরা ইহাতে আশ্বস্ত হইয়াছিল। তাহারা ম্যালকমকে সুধু অনুরোধ করিয়াছিল যেন তাহাদের পরিত্যক্ত ক্যাণ্টনমেণ্টের অধিকার কোম্পানীর ফৌজ সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের হস্তে গ্রহণ করে,—লুণ্ঠনলোলুপ, দুর্দ্দান্ত নিজামী সওয়ারগণের হস্তে প্রদত্ত না হয়। রবার্টসকে সকল কথা জানাইয়া ম্যালকম ফরাসী লাইনের অদূরবর্ত্তী উচ্চ এক ভূখণ্ডের উপর সসৈন্যে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনতিবিলম্বে উত্তেজিত সিপাহীগণের কবল হইতে সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত ফরাসী অফিসরগণ তাঁহার নিকট আসিয়াছিল। বিষম বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ায় সকলে মুক্তির আনন্দে বিভোর;—অবস্থার ফেরে উহারা তখন প্রকৃত শত্রু ইংরাজদের মুক্তিদাতারূপে দেখিতেছিল।

অবশিষ্ট কথা সংক্ষেপে বলা ভাল। ক্যাণ্টনমেণ্ট হইতে অদূরে একটী সমুচ্চ পতাকা প্রোথিত হইয়াছিল। সিপাহীরা তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রাদি শিবির মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ পরিবারবর্গ ধনসম্পত্তিসহ তথায় আসিয়া সমবেত হইয়াছিল। বিন্দুমাত্র রক্তপাত হইল না,—একটীও অস্ত্রশস্ত্র ক্ষেপ হইল না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ১১।১২ হাজার সৈনিক নিরস্ত্রীকৃত ও দলচ্যুত হইল। সূর্য্যাস্তের মধ্যেই তাহাদের ক্যাণ্টনমেণ্ট আনুসঙ্গিক সকল কিছুসহ ইংরাজসেনার করায়ত্ব হইল। রেম্‌র ফরাসীবাহিনী ইতিহাসের কাহিনী মধ্যে পর্য্যবেসিত হইল।

বন্দী ফরাসীদের কলিকাতায় আনিবার জন্ত ওয়েলেসলী পূর্ব্ব হইতে মসলিপত্তন বন্দরে "Bombay" নামক একটি সমরপোত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তথা হইতে পরে বিভিন্ন দলে উহারা ইউরোপে প্রেরিত হইয়াছিল। সিপাহীগণ অচিরে হায়দ্রাবাদের বৃটীশ সাবসিডিয়ারী ফোর্সে গৃহীত হইয়া ইংরাজের সৈনিকে পরিণত হইয়াছিল। পর বৎসর উহাদের মধ্যে অনেকে বৃটীশ অফিসরগণের পরিচালনাধীনে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল।

পিরঁ কিন্তু আর ফ্রান্সে ফিরিয়া যান নাই। কলিকাতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি চন্দননগরে গিয়া বসবাস

করিয়াছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে উক্ত স্থান তখন ইংরাজদিগের দখলে ছিল। নেপোলিয়ানিক যুগের অবসানে ফরাসীরা আবার উহা ফিরিয়া পাইয়াছিল। এইখানে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর তারিখে তাঁহার দেহান্ত হইয়াছিল।*

এইরূপে হায়দ্রাবাদে রেমঁর কার্য্য অবসান হইয়াছিল। ধূপ মিলাইয়া গেলেও সৌরভ থাকে। রেমঁর স্মৃতি আজিও নিজামরাজ্যে প্রকীর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। ভারতবর্ষে অপর কোন ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষী সৈনিক তাঁহার মত প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে সমর্থ হয় নাই। রেমঁ সাহসী, উদার প্রকৃতি, মহানুভব, মানবচিত্তানুরঞ্জক এবং সাবধানী ছিলেন। তাঁহার মধ্যে অসীম কর্ম্মক্ষমতার সহিত সুচিন্তিত বিচক্ষণতা দেখা যাইত। তাঁহার পক্ষে তখন পর্য্যন্ত যে সকল পথ উন্মুক্ত ছিল তদ্দ্বারা ডুপ্লে, লালী ও সাফ্রাঁর পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করা ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের কাম্য। ফ্রান্সের ঐ সকল সুসন্তানের সহিত তাঁহার নাম একাক্ষরে লিখিত থাকিবার যোগ্য। যথেষ্ট স্বল্পতর সম্বলে তিনি যে চমৎকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার জন্মভূমির শত্রুগণের প্রাণে গভীর উৎকণ্ঠা ও ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে নিতান্ত অসময়ে তাঁহার দেহান্ত নিতান্ত পরিতাপের বিষয় ছিল। অচিরবিলম্বে ফরাসীদের স্বার্থের প্রতিকূল যে অশুভ অবস্থা সমুপস্থিত হইয়াছিল রেমঁ জীবিত থাকিলে হয়ত তাহা অতিক্রম করিতে পারিতেন। ইহাও সম্ভব যে অকালমৃত্যুর জন্যই তদীয় স্মৃতি ব্যর্থতার অপযশ হইতে মুক্ত রহিয়াছে। মার্কুইস ওয়েলেসলীর সহিত কুটনীতির চালে হয়ত তিনি পারিতেন না। ভারতবর্ষে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী খ্যাতনামা ইউরোপীয়গণের মধ্যে কেহ, পরবর্ত্তী যুগের প্রখ্যাত ইউরোপীয়গণের কেহ, তাঁহার মত দেশীয়গণের শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভালবাসা ও বিস্ময় আকর্ষণে সমর্থ হন নাই। যে সকল ব্যক্তি তাঁহাকে ভালবাসিত তাহাদের প্রপৌত্রগণ আজিও তাঁহার স্মৃতিকে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদান করিতেছে।*

হায়দ্রাবাদ সহর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে "মাইসেরাম তেকড়ি" বা ম্যসিয় রেমঁর পাহাড় নামে অভিহিত একটি গণ্ডশৈল আছে। উহার উপরে একটী চত্বরের প্রান্তভাগে গ্রাণাইট পাথরের একটি উচ্চ স্তম্ভ দেখা যায়। উহার গাত্রে সুধু "G.R" এই দুইটি অক্ষর উৎকীর্ণ আছে। চত্বরটির দক্ষিণদিকে গ্রীকপদ্ধতিতে নির্ম্মিত ছোট একটি ঘর আছে। উহাদের অভ্যন্তরে রেমঁর সমাধি সজ্জিত করিবার উপকরণ দীপ এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি সুরক্ষিত থাকে। প্রত্যেক বৎসর তাঁহার মৃত্যুদিনে (২৫শে মার্চ্চ) সমাধিটী আলোকমালায় সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয়। তথায় মেলা বসে। নগর হইতে বহু জনসমাগম হয়। নিজামের সৈন্যগণ মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনসূচক কামান বন্দুক ছুড়ে। বলা বাহুল্য তন্মধ্যে রেমঁর পঞ্চদশ সহস্রের বংশধরগণের অভাব নাই। তাহারা মুসা রহিমের মহত্ত্ব এবং দয়াদাক্ষিণ্য সম্বন্ধে বহুবিধ কাহিনীর অবতারণা করিয়া সারাদিন পাহাড়ে কাটাইয়া সন্ধ্যার পর নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। নিজামী ফৌজ "মাইসেরাম" (ম্যসিয় রেমঁ) নামক একটি রেজিমেণ্ট এখনও তাহার প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতি বহন করিতেছে।

অতঃপর পরিশিষ্টে টিপু এবং তাহার ভাগ্যান্বেষী ইউরোপীয় সৈনিকগণ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে। ওয়েলেসলী টিপুর নিকটও অনুরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু সুলতান তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া ফরাসীদের সহিত ইংরাজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে থাকায় তিনি বাধ্য হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন সাধারণতঃ ইতিহাসে এই কথা লিখিত হইলেও তাহা সত্য নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ওয়েলেসলী ভারতবর্ষের মাটিতে পদার্পণ করিয়াই টিপুর সহিত যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে যে চরমপত্র দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি এমনভাবে সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন যে তাহার মধ্যে সুলতানের পক্ষে প্রত্যুত্তর দান সম্ভব ছিল না। তাহা

* C. R. Wilson—"List of Inscriptions on Tombs and Monuments in Bengal", No. 485.

* "Final French Struggles in India," p. 244-45.

ভিন্ন টিপুর নিকট হইতে উত্তর প্রাপ্তির পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবামাত্র ইংরাজরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। টিপু তখন তাঁহাদের সহিত বলপরীক্ষার্থ আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। গভর্ণর-জেনারেল যে মুখে শান্তির বারতা প্রচার করা সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা তিনি কেমন করিয়া বুঝিবেন ? এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থাতেই টিপু ইংরাজ এবং তাঁহাদের মিত্রগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন (ফেব্রুয়ারী ১৭৯৯)। ইংরাজদের সমগ্র শক্তি চিরদিনের মত তাঁহাকে পর্য্যুদস্ত করিতে নিয়োজিত হইয়াছিল। ভেলোর হইতে জেনারেল হ্যারিস ১০০০ সৈন্যসহ মহিশুর রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। নিজাম তাহার সাহায্য জন্য ১০০০০ সৈন্য পাঠাইলেন। উহাদের মধ্যে অনেকে রেমঁর ভূতপূর্ব্ব সৈন্য ছিল। পশ্চিমপ্রান্ত হইতে অপর একদল শত্রুসেনা মহিশুর আক্রমণ করিয়াছিল। টিপুর ইউরোপীয় সৈনিকগণের সংখ্যা এই সময় নিম্নলিখিতরূপ ছিল বলিয়া প্রকাশ :—*

ইউরোপীয় এবং ইউরেশীয় পদাতিকসৈন্য—	১৮০
,, সওয়ার ১ পল্টন—	৫০
তোপাসী—	১৫০
পাশ্চাত্যপদ্ধতিতে শিক্ষিত, উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট সিপাহী—	২৫০০
	৬৩০
লালীর দলে ছিল :—	
ইউরোপীয় গোলন্দাজ—	
২ রিসালা তোপাসী ; তন্মধ্যে একটিতে এক কোম্পানী ইউরোপীয় সংযুক্ত ছিল—	১০০
	৭৬০

* Asiatic Annual Register, 1799, p. 241 (Chronicles)

সমর মধ্যে উহাদের কোন কৃতিত্ব দেখা যায় না। অফিসরগণের মধ্যে শাপুই, রোশাম্বো এবং কাউণ্ট ড্যুপ্রে এই কয়জনের সামান্য কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৬ই মার্চ্চ বাঙ্গালোরের অদূরে সদাশিব নামক স্থানে মহিশুরীসেনা ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিল। তখন টিপু স্বয়ং নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া শত্রুসেনাকে বাধাদানে আগুয়ান হইয়াছিলেন। কিন্তু ২৭শে মার্চ্চ পুনরায় মালবল্লীতে ইংরাজরা বিজয়লাভ করিল। কথিত আছে সেনানীবর্গ যুদ্ধার্থ যে স্থান নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন, কয়েকটী তোপ বিপক্ষের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা থাকাতে সুলতান তাহা গ্রহণ না করিয়া স্বীয় ইচ্ছামত স্থানে সেনা সমাবেশ করিয়াছিলেন। এই পরাজয়ের পর টিপু অনেকটা হতাশ এবং নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সন্ধির প্রস্তাবে ওয়েলেসলী কর্ণপাত করিলেন না। টিপুকে উৎখাত না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সুলতানের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দের মধ্যে অনেকে শত্রুর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া টিপু আরও হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু জেনারেল হ্যারিস শ্রীরঙ্গপত্তনের অদূরে আসিয়া দেখা দিয়াছেন এ সংবাদে মহিশুর শার্দ্দুলের লুপ্ত প্রায় তেজ এবং উদ্যম ফিরিয়া আসিয়াছিল। সন্ধির চিন্তা মন হইতে বিসর্জ্জন দিয়া তিনি রাজধানী রক্ষায় যত্নবান হইয়াছিল। ক্রমে ইংরাজসেনা নিকটে আসিয়া দুর্গ অবরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই সময় অবরুদ্ধ দুর্গের একটি সর্ব্বপ্রধান স্থানের ভার শাপুইকে প্রদত্ত হইয়াছিল। দীর্ঘকালব্যাপী তুমুল যুদ্ধের পর ৪ঠা মে সন্ধ্যার পর দুর্গ তাহাদের অধিকৃত হইল। মহাবীর টিপু প্রাণপণে অসিহস্তে যুদ্ধ করিতে করিতে দুর্গদ্বারে বীরের সদ্গতি লাভ করিলেন। এইরূপে মহিশুরের ক্ষণস্থায়ী মুসলমান রাজত্বের অবসান হইয়াছিল।

শ্রীরঙ্গপত্তনের পতনের পর টিপুর সেনাদলভুক্ত ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষীগণ সকলে ইংরাজকরে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। তাহারা দুর্গের এক নিভৃত অংশে

অত্মগোপন করিয়াছিল এবং দুর্গ অধিকারের পরবর্ত্তী তাণ্ডবলীলার প্রথম বেগ প্রশমিত হইবার পর আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল। বিজয়লাভের পর ইংরাজ সেনাপতি যখন শত্রুপক্ষীয় সকলকে অভয়দানসূচক ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছিলেন তখন তাহার বলে উহারাও রক্ষা পাইয়াছিল। ইংরাজলেখকগণ বলেন যে পোষাক পরিচ্ছদে এবং আকৃতিতে উহারা অত্যন্ত হীন ছিল। কিন্তু তাহাদের অধ্যক্ষ (কারণ তাহাদের মধ্যে একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন যাঁহার একটি অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের কমিসন প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই)—কে তাঁহার আকৃতি হইতে একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা বলিয়া মনে হইত। এক কথায় বলিতে ঐ দলটি একটি বিচিত্র ধরণের খিচুড়ি দল ছিল।* ইংরাজরা বন্দীগণকে কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিলেন। তথা হইতে ক্রমে ক্রমে তাহারা ইউরোপে প্রেরিত হইয়াছিল। এইরূপে মহিশুর দেশে ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষীগণের লীলা খেলার অবসান হইল।

টিপুর রাজ্যের কতকাংশ পূর্ব্বতন হিন্দু রাজবংশজাত একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে দিয়া অবশিষ্টাংশ ইংরাজ, নিজাম এবং মারাঠাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লওয়া হইল। ইতিহাসে ইহা ওয়েলেসলীর মহানুভবতার অন্যতম নিদর্শন বলিয়া উল্লিখিত হইতে দেখি। কিন্তু ইহার মধ্যে উদারতা বা মহত্বের অনুমাত্র ছিল না। মিত্রগণ ভাবিয়াছিলেন যে কর্ণওয়ালিসের সময় যেমন ঘটিয়াছিল এবারও তেমনই তাঁহারা টিপুর শক্তি খর্ব্বীকৃত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে লব্ধ রাজ্যার্দ্ধ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইবেন। টিপু যে নিহত হইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাম্রাজ্য যে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে এ সম্ভাবনা স্বপ্নেও কেহ ভাবিতে পারেন নাই। ফলে টিপুর দেহান্তের পর নূতন এক সমস্যা দেখা দিয়াছিল। মিত্রগণের সহিত তাহা সমভাগে বিভাগ করিয়া লইয়া তাঁহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দিতে ওয়েলেসলীর আদৌ ইচ্ছা ছিল না। পক্ষান্তরে ইংরাজদের অধিকাংশ গ্রহণে তাঁহাদের আপত্তি হইবার কথা। ফলতঃ মহিশুর রাজ্য গ্রাস করা সম্ভব ছিল না বলিয়াই ওয়েলেসলীকে মিতাচারী হইতে হইয়াছিল। একথা অপর কেহ বলেন নাই; বলিয়াছেন একজন সমসাময়িক ইংরাজ লেখক, যিনি উচ্চ রাজকর্ম্মচারীরূপে দীর্ঘকাল মহিশুর রাজ্যে যুদ্ধাভিযান এবং শাসনকার্য্যে নিরত ছিলেন।*

ইতিহাসে টিপুকে আমরা ঘোর অত্যাচারী, নিষ্ঠুর, নররাক্ষসরূপে চিত্রিত হইতে দেখি; তাঁহার মধ্যে মনুষ্যোচিত কোন গুণগ্রাম ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার অধিকাংশই রচা কথা বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে;—আধুনিক ইতিহাসকার তাই সত্যই বলিয়াছেন,—'Tipu was not the black devil that he is represented to be." অবশ্য টিপুর চরিত্রে যে নিষ্ঠুরতা দেখা যায় না তাহা নহে। কিন্তু তাহা যুগধর্ম্ম। তখনকার দিনে কোন রাজাই বা উহা হইতে মুক্ত ছিলেন? প্রাচ্যদেশের প্রধান প্রধান নৃপতিবৃন্দের সহিত তুলনায় টিপুর স্থান অতি উচ্চ। শাসন কার্য্যের সকল বিভাগের উপর তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। আমোদ বা আলস্য কোন কিছুর বশে তিনি রাজকার্য্য অবহেলা করিতেন না। সামান্যতম কার্য্যটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সাধিত করিবার ভার তিনি স্বহস্তে রাখিয়াছিলেন এবং সেজন্য বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য পরিদর্শনার্থ তিনি সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন ও তদনুসারে নিয়মিতভাবে কার্য্য করিতেন। অবশ্য এ প্রথার গুরুতর দোষ আছে। সামান্য কার্য্যে কালক্ষেপ না করিয়া তাহা নানা প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিয়োগ করা যাইতে পারিত। তদ্ভিন্ন সকল ভার স্বহস্তে রাখার ফলে কর্ম্মচারী বৃন্দের উপযুক্ত অভিজ্ঞতালাভ হইত না। কৃষককুলকে ভূম্যধিকারীগণের লুব্ধ গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য টিপু যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। দরিদ্র চাষী এবং শ্রমিক প্রজার সুখসন্তোষের উপরই যে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে তাহা তিনি বুঝিতেন। তখনকার দিনে ইউরোপীয় রাষ্ট্র-

* Asiatic Annual Register, 1799, p. 241 (Chronicles)

* Col. Wilks :—History of Mysore, Vol. II. p. 770.

নেতৃবৃন্দের মধ্যে কয়জন এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন? টিপুর যুগ না হয় ছাড়িয়া দিলাম, আধুনিক কালেও কি সকলে এ কথা বুঝেন অথবা বুঝিলেও সে মত চলিবার চেষ্টা করেন? টিপুর রাজত্বের প্রথমাংশে, অর্থাৎ কর্ণওয়ালিসের নিকট পরাজিত হওয়া অর্দ্ধেক রাজ্য এবং তিন ক্রোর টাকা অর্থদণ্ড দিবার পূর্ব্বে, তাঁহার কৃষকগণের অবস্থা খুবই ভাল ছিল, ক্ষেত্র সমূহ প্রচুর শস্যবহন করিত, গুরুকরভারমুক্ত প্রকৃতিপুঞ্জের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অবধি ছিল না। পক্ষান্তরে ইংরাজ এবং তাঁহাদের মিত্রগণের অধীনে কর্ণাটক এবং অযোধ্যা দেশ উৎসাদিত হইয়া মরুভূমে পরিণত হইতেছিল এবং তথাকার অধিবাসীগণের মত দুঃখী জগতে অতি অল্পই ছিল। * (সমাপ্ত)

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* "His country was accordingly, at least during the first and better part of his reign, the best cultivated, and his population the most flourishing in India, while under the English and their dependants, the population of the Carnatic and Oude, hastening to the state of deserts, was the most wretched upon the face of the earth."

Mill:—History of British India, Vol. VI 150.

বন্দেমাতরম্

শ্রীশান্তি পাল

আজি হতে একদিন শতবর্ষ আগে
জলদ-মেদুর ঘন অন্ধকার দিনে,
শুভক্ষণে এসেছিলে গৌড়-বঙ্গভূমে
আশার অরুণ ভাতি বিচ্ছুরিয়া নভে।

সেদিনের শস্য-শ্যাম শান্ত পল্লীচ্ছায়ে,
সুমঙ্গল শঙ্খ ঘণ্টা বাজে চারিভিতে;
উর্দ্ধনেত্রে চাহে সবে, লক্ষ তারা মাঝে
দেখা দিলে জ্যোতির্ম্ময় পৌর্ণমাসী চাঁদ।

তারপর যৌবনের কোন্ শুভক্ষণে
তুলেছিলে যে আলোক প্রবাহের ঢেউ,—
বাঙ্‌লার ভাগ্যাকাশ আজিকার দিনে
সে আলোকে উদ্ভাসিত চির-সমুজ্জ্বল।

আমাদের তপস্যার কবে হবে শেষ
সেইদিন বলেছিলে আপনার মুখে,
ভস্ম করি মিথ্যা গ্লানি দীপ্ত হুতাশনে
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড সম অগ্নি-পুরোহিত।

নিষ্কাম দেশাত্ম বোধ শুনাইলে সবে
দরিদ্রের দেবতারে শতরূপে আঁকি;
সপ্তকোটি সন্তানের ভুজধৃত অসি
এক সাথে ঝলকিল অরণ্যের বুকে।

যুগে যুগে বর্ত্তমান র'য়ে গেছ তুমি
সুজলা সুফলা শ্যামা বঙ্গভূমি মাঝে,
ওই শোন মহামন্ত্র উচ্চারণ করে
দেশমাতৃকার সাথে তব নাম স্মরি।

মৃত্তিকার দেবী তব পাইয়াছে প্রাণ
গৌরব-কিরিট শিরে—রাজেশ্বরী বেশ,
প্রেমময়ী মাতা কভু লোলজিহ্বা শ্যামা
সন্তান শোণিত সিক্ত—বন্দেমাতরম্।

হারান প্রেমের পথে

শ্রীসুধীর চট্টোপাধ্যায়

বর্ষার বিষণ্ণতা আকাশকে করুণ করে রেখেছে সারাটি দিন : বর্ষণহীন শ্রাবণের সন্ধ্যা !
নীচে উপযাচক বিদ্যুৎ আলোর উৎসব, উপরে আকাশের জ্যোতি
ম্লান হয়নি এখনো, মিশে গেছে তোমার চোখের নীলে !
বসে আছ ত্রিতলের জানালায় ; নীচে বয়ে চলেছে নির্ব্বিকার মহাকালের রথ
বিংশ শতাব্দীর বিরাট কলকাতায়—
রেডিও-বিদ্যুৎ-সিনেমা-সমন্বিত বিংশ শতাব্দী
বসে আছ ত্রিতলের জানালায় আমার অপেক্ষায় কি না জানিনে ;
কিন্তু আজ তোমায় দেখে মনে পড়ে
আর এক দিনের কথা ;—সেদিনও এমন শ্রাবণের বর্ষণহীন সন্ধ্যা
সেদিন বিদ্যুৎ-আলোর অনধিকার প্রবেশ লজ্জা দেয়নি অন্ধকারের রূপকে
বিপনীকীর্ণ যন্ত্রযানসর্ব্বস্ব নগরীর গুঞ্জন সেদিন ব্যথা দেয়নি প্রকৃতির মৌনতাকে।
সেদিন, সত্যিই তুমি বসেছিলে আমার প্রতীক্ষায়, আজ যা' আমি ভাবতে পারিনে
আজ আমার একমাত্র স্বপ্ন টাকার স্বপ্ন ; একমাত্র চিন্তা, অন্নের।
প্রেমের উত্তাপহীন বুক থেকে উঠ্ছে বুভুক্ষার বাষ্পতাপ।
আজকের আমি সহরের সহস্র বেকারের একজন—
ফুটপাথের ধুলোর আড়ালে রচি আকাশকুসুম !
সেদিনের আমি নবীন বাঙ্লার প্রতীক—আমাদের উদ্দীপনার সাড়া জেগেছিল
সেকালের হিন্দু সমাজের সংস্কারভিত্তিতে !
সেদিন ছিল আমার চোখে সোনার স্বপ্ন, আজ বিংশশতাব্দীর চক্রাকার-রৌপ্যস্বপ্ন
সেদিন পৌঁছতে পারেনি সেখানে !
ওগো, আজ তুমি দিতে পারবে আমায়, সেই একশ' বছরের পুরণ প্রেম ? সেই শতাব্দীবিস্মৃত মন
তবে জান্‌ব তুমি ভালবেসেছ আমায়, প্রতীক্ষা করছ আমার
আজকের বিংশশতাব্দীর বর্ষণহীন শ্রাবনসন্ধ্যায়।

পরশুরামের পথে

শ্রীমতী সুজাতা সিংহ রায়

এবার বড়দিনের ছুটিতে ঠিক হলো পরশুরাম যাওয়া হবে। সঙ্গী হলেন ডিব্রুগড় থেকে মিঃ মুখার্জ্জী ও তাঁর স্ত্রী। পরশুরাম একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত। কথিত আছে পরশুরাম মাতৃ-হত্যা করে যে পাপ করেছিলেন এই কুণ্ডে এসেই সেই পাপক্ষয় হয়েছিল। মাতৃহত্যা করে কুঠারখানা না-কি তাঁর হাতেই লেগে রইল। এবং তদ্দারা অনবরতঃ ভূমি-খননের জন্যই ব্রহ্মপুত্র নদের সৃষ্টি। এখানে এসেই হাত থেকে কুঠারখানা পড়ে গেল—এবং তাঁরও পাপক্ষয় হলো। শোনা যায় সকল তীর্থ দর্শনের শেষে পরশুরাম এলে সেসকল তীর্থের পুণ্যের পূর্ণতা লাভ হয়।

পরশুরামের কুণ্ডুর উপর লেখিকা ও তাঁহার সঙ্গিনী। এঁদের স্বামীরা যথাক্রমে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের তিনসুকিয়া ও ডিব্রুগড় শাখার এজেন্ট।

পরশুরাম তিনসুকিয়া থেকে ৮০ মাইল দূরে। ওখানে যেতে হলে 'সদিয়া' বলে একটা জায়গার ভিতর দিয়ে যেতে হয়। বর্ষায় পরশুরাম যাবার কোন উপায়ই নেই। শীতে পার্ব্বত্য নদীগুলো যখন শুকিয়ে যায় তখন P. W. D. কোন রকম করে যাত্রীদের জন্য শুকনো নদীগুলোর উপর একটা রাস্তা বেঁধে দেয়। সদিয়া ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের সেনা নিবাস। তিনসুকিয়া থেকে ৩০ মাইল দূরে। ২৫শে ডিসেম্বর বেলা সাড়ে দশটায় আমরা মোটরে সদিয়া রওনা হলাম। পরশুরাম যেতে হলে সদিয়ার রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীর কাছ থেকে ছাড়পত্র নিতে হয়। আগেই সেজন্য ওখানকার প্রধান কেরাণী রজনীবাবুকে লেখা হয়েছিল। বেলা প্রায় সাড়ে বারটায় সদিয়ায় রজনীবাবুর বাড়ীতে পৌঁছলাম। মাঝখানে 'সাইখোয়া' ঘাটে একটা খেয়া পাড়ি দিতে হলো ব্রহ্মপুত্রের উপর দিয়ে মোটর সমেত। শীতের ব্রহ্মপুত্র। মাঝখানে সরু সুতার মত ছোট্ট নদী বয়ে গেছে আর চারিদিকে শুধু বালির সমুদ্র। এই বালির উপর দিয়ে যখন আমাদের মোটর চলছিল তখন কিছুতেই ভাবতে পারছিলাম না বর্ষায় এখানেই তরঙ্গের উন্মত্ত লীলা চলতে থাকে।

রজনীবাবুর ওখানে গিয়ে ঠিক হলো যে সদিয়া থেকে আন্দাজ ৩৫ মাইল দূরে 'তেজু' ডাকবাংলায় গিয়ে আমাদের সে রাতটা কাটাতে হ'বে। এবং পরশুরামের দিকে অভি-যান পরদিন ভোরে। রজনীবাবু আগেই তেজুতে টেলিফোন-যোগে আমাদের ডাকবাংলায় থাকার ব্যবস্থা করে রেখে-ছিলেন। সদিয়া এসে আমরা আরেকজন যাত্রা-সঙ্গী পেলাম। ওঁদের সঙ্গে ছিলেন "Times of Assam" পত্রের পরিচালিকা সপ্ততিবর্ষ বয়স্কা একজন ভদ্রমহিলা। তাঁরাও রাতটা 'তেজু' ডাকবাংলায় কাটাবেন ঠিক করলেন। বেলা প্রায় তিনটার সময় আমরা রজনীবাবুর ওখানে চা, লুচি, আলুরদম ইত্যাদি ভূরিভোজন করে, ছাড়-পত্র ইত্যাদি নিয়ে তেজুর পথে যাত্রা করলাম। রাস্তার দু'পাশে ঘন গভীর

বন। আমাদের মোটর চলল নির্জ্জন পুরীর ভিতর দিয়ে। কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্নও পাওয়া যায় না। বৃটিশ সীমান্তের বাইরে, আইন কানুনের বাইরে এখানে ওখানে বিরাট উঁচু সব গাছপালা দেখে মনে হচ্ছিল সত্যিই ওরাও স্বাধীন, সব বাঁধা, সব নিয়মের বাইরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের মোটর এদের মধ্য দিয়ে চলেছে তো চলেছেই। মোটর চালকটি আর কখনো এ পথে আসেনি। লোকালয়বর্জ্জিত নির্জ্জন বন্যরাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সত্যিই মনে হচ্ছিল আমরা যেন নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেছি। পথেরও শেষ নেই আমাদের চলারও বিরাম নেই। কয়েক মাইল যাবার পর পথের মাঝে মাঝে পাতার ছাউনি দেওয়া দু-একটা কুটীর দেখা যাচ্ছিল। সেগুলির কাছেই গাছের ছাল পরে আবর মিশমী সব পাহাড়ী জাতিরা শুকনো পাতায় আগুন জ্বালিয়ে শীতের প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষা করছিল। মনে হচ্ছিল যেন আমরা আবার সেই আদিম যুগে ফিরে গিয়েছি। সেখানকার অধিবাসীরা সকলেই ওদের সরল চাহনি দিয়ে অবাক হয়ে আমাদের মোটর দেখছিল। নাদুস্-নুদুস সুন্দর সব স্বাধীন পাহাড়ী জাতি। বাঘ, বন্যহাতী, সাপে ভরা জঙ্গলে ওরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে আমাদের মত ভয়ে আঁৎকে ওঠে না।

ওদের চাহনিকে পিছনে ফেলে সন্ধ্যার সময় 'তেজু'র ডাকবাংলায় পৌছান গেল। মাঝে আবার একটা পার্ব্বত্য নদী 'কুণ্ডিল' পাড়ি দিতে হয়েছিল। ডাকবাংলায় উঠে দেখলাম মাত্র দুইটা পরিবারের থাকবার মত ব্যবস্থা। বাড়ীটাতে দুটি ঘর দুটি বাথরুম ইত্যাদি। এরই একটি আমাদের জন্য এবং অন্যটি আমাদের সঙ্গী যাত্রীদলের জন্য ঠিক করে রাখা হয়েছে। প্রত্যেক ঘরেই একজনের শোবার মত ছোট্ট একটা খাট। তারই মধ্যে চারজনের নিদ্রার আয়োজন করা যে কত বড় সমস্যা সহজেই অনুমেয়। বন্ধুবর মিঃ মুখার্জ্জী সকল অবস্থাতেই বেশ জমিয়ে তুলতে পারেন। তিনি ডাকবাংলার রক্ষকের সঙ্গে সখ্যস্থাপন করে আর একটা খাটের ব্যবস্থা করে নিলেন। শোবার ব্যবস্থা যদি বা হোলো, উঠল খাওয়ার সমস্যা। অবশ্য আমাদের সঙ্গে চাকর ছিল, এবং সেদিনকার রাত্রের মত খাবার এবং চায়ের বন্দোবস্তও সঙ্গেই ছিল এক রাত্রির জন্য 'তেজুতে' সংসার পাতা হলো। দুটো খাটে বিছানা ইত্যাদি করে—খাটের উপর পা তুলে চায়ের সঙ্গে সঙ্গে চারজনের আড্ডাটা জমে উঠল ভালোই। ততক্ষণে অন্য যাত্রীদল এসে পাশের ঘরে সব ঠিকঠাক করে নিচ্ছিলেন। ওদের সঙ্গে ষ্টোভ্ ছিল, রাত্তিরে ওরা খিচুড়ী রান্না করে নেবেন শুনলাম। মিঃ মুখার্জ্জীর তখন দৃষ্টি পড়লো খিচুড়ীর দিকে। রাত্তিরে চপ মাংস মাছ সন্দেশ ইত্যাদিতে ভূরিভোজন করেও তাঁদের জানাচ্ছিলেন যে আমাদের সঙ্গে ষ্টোভ বা খাবার কোনরকম ব্যবস্থা না থাকায় ফলাহারেই তৃপ্ত থাকতে বাধ্য হয়েছেন, উপবাস বল্লেই চলে। শেষ পর্য্যন্ত ঐ দলের ভদ্রলোকটিকে খিচুড়ী আর মিষ্টান্ন থেকে ভাগ দিতে হলো। আমাদের বলা বাহুল্য মিঃ মুখার্জ্জী কিংবা

মধ্য পথের একটি দৃশ্য।

আমাদের কারোরই সেসব খাবার কোন প্রয়োজনই হয় নি। এরকম সব কাণ্ড আরো খানিকক্ষণ চালিয়ে রাত সাড়ে নটায় আমরা সব লেপের নীচে গেলাম। কিন্তু কারোই ভাল ঘুম হলো না। মাঝরাতে আবার সবাই একসঙ্গে জেগে উঠলাম এবং খানিকক্ষণ আবার মুখুয্যে মশায়ের কৌতুক চলল। ভোর সাড়ে পাঁচটার সময়

আমি ও মিসেস্ মুখার্জ্জী বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। দেখলাম ডাকবাংলার কাছেই গাছের নীচে সব তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসীরা ধুনী জালিয়ে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে আছেন। আমি ও মিসেস মুখার্জ্জী খানিকক্ষণ ওদিকটা ঘুরে এলাম। তারপর সকলের হাত পা মুখ ধোওয়া হলে চা কেক্ বিস্কুট ইত্যাদি দিয়ে প্রাতরাশ শেষ করে বিছানাপত্র বেঁধে পরশুরাম যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। সেদিনের দুপুরের খাবারের কোন ব্যবস্থাই আমাদের সঙ্গে ছিল না। চাকরও আমাদের সঙ্গে চলে যাবে কাজেই মিঃ মুখার্জ্জী আবার রক্ষকের সঙ্গে ভাব জমালেন। আধসের চাল, তিন পোয়া ডাল ঘি ইত্যাদি কিনে এনে সব এক সঙ্গে রান্না করে রাখতে বলে গেলেন। বেলা ৮টায় কিছু কেক্ বিস্কুট সঙ্গে নিয়ে আমরা মোটরে চড়লাম। 'তেজু' থেকে ১০ মাইল দূরে মিশমীঘাট পর্য্যন্ত মোটরে যেতে হবে। তারপর খেয়াপাড়ি দিয়ে হেঁটে পাঁচ মাইল পরশুরাম। এবার আমাদের মোটর চলল উঁচু নীচু আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে। সরু ছোট্ট রাস্তা এঁকে বেঁকে চলেছে। এক একটা বাঁক দেখে মনে হয় পথের শেষ ওখানেই, আর পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না। রাস্তাটাও বিপজ্জনক। দু-এক বছর আগে বন্য হাতী বেরিয়ে একটা যাত্রীসহ মোটর গাড়ী ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিল। কত নুড়ির নদী, কত বালির নদী পেরিয়ে আমাদের মোটর ছুটে চলল। এসব নদীর দুর্দ্দশা দেখে আমার দুঃখ হলো, ছয় মাস আগে ওরা পাহাড় পর্ব্বত ভেঙ্গে কী উদ্দাম নৃত্যই না করেছে আর আজ আমরা এদেরই বুকের উপর দিয়ে নির্ব্বিবাদে মোটর হাঁকিয়ে চলেছি। বেলা ন'টায় আমাদের মোটর এসে 'মিশমীঘাটে' থামল। অন্য যাত্রীদল আমাদের আগেই এসে পৌঁছেছিলেন। ওঁদের দলের বৃদ্ধা হাঁটতে পারবেন না তাই তাঁর পরশুরামে যাবার আলাদা ব্যবস্থা হয়েছে। ওখানে যারা হেঁটে যেতে পারে না তাদের পার্ব্বত্য জাতিরা বাঁশ দিয়ে এক রকম পাল্কী তৈরী করে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যায়। আমরা মিশমীঘাটে পৌঁছে দেখি, একদল আবার সে পাল্কী তৈরী করতে ব্যস্ত। চটপট বাঁশ এনে কেটে, গাছের ছাল দিয়ে বেঁধে চমৎকার পাল্কী তৈরী করে নিলে। সভ্যজগতের লোহা-লক্কড়েরও দরকার পড়ল না, বা হাতুড়িরও প্রয়োজন হলো না। প্রকৃতির দান বাঁশ আর গাছের ছাল দিয়েই ওদের প্রয়োজন মিটে গেল।

আমরা সব খেয়াপাড়ির জন্য নৌকায় উঠলাম। এসব নৌকা ভারী চমৎকার। পাহাড়ী জাতিরাই তৈরী করে, ওরাই চালায়। আস্ত একটা গাছ কেটে আনে তারপর গাছের গভীরতাটুকু শুধু কেটে নেয়। এমনি দুটো নৌকো এক সঙ্গে জোড়া বেঁধে চালায়। ওদের বজরাও তেমনি। ছোট ছোট বাঁশের মাথায় বেঁধে দেয়। এই দিয়েই ওরা ব্রহ্মপুত্রের গভীর স্রোতকে নিজেদের আয়ত্তে রাখে। ওদের মধ্যে একদল গল্প করে চলেছে—মাথামুণ্ডু কিছুই আমরা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ওদের সঙ্গে কথা বলাও বিপদ। ওরা না জানে হিন্দি, না জানে ওদের নিজের ভাষা ছাড়া অন্য কিছু। নদীটার নাম 'মিশমী নদী'। ভারী সুন্দর দেখতে। দুধারের উঁচু উঁচু বিরাট পাহাড়গুলো নিজেদের স্নেহচ্ছায়ায় নদীটাকে ঘিরে রেখেছে। পাহাড়ের চূড়ায় সব মেঘের কুণ্ডলী জমে জমে আছে। একটার পর একটা সারি বেঁধে যেন পাহাড়ের চূড়াগুলি দাঁড় করানো, আর তাদেরই পদতল স্পর্শ করে চলেছে বিরাট ব্রহ্মপুত্রের ক্ষীণকায়া এক শাখা, তারও তেজ কিছু কম নয়। এতটুকু এক নদী, কী করে সে এত গভীর গর্জ্জনের সৃষ্টি করে ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়। নদীটার জল ঝকঝকে কাঁচের মত পরিষ্কার, রং নীল। পার্ব্বত্য জাতিরা তাই এর নাম দিয়েছে 'নীলা'। সভ্যজগতের বাইরে, প্রকৃতির মোহজাল ওদেরও অন্তরে ভাবের ঝঙ্কার তোলে। ওদেরও অন্তরকে এমনি করে দোলা দিয়েছে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। এই নদীরই বুকের উপর দিয়ে এক ঘণ্টায় আমরা ওপারে গিয়ে উঠলাম।

এইখানে সুরু আমাদের সুদীর্ঘ পাঁচ মাইল পদব্রজে অভিযান। আমি এ জিনিষটাকে বড় ভয় করি। মাইল খানেক হাঁটলেই আমার পা দুটো আমাকে আর বহন করতে চায় না। তাই সুদীর্ঘ অন্তহীন পায়ে চলার পথের দিকে চেয়ে মনটা আমার অনেকখানিই দমে গেল। আমার অন্য সঙ্গীরা হাঁটতে পেলেই খুসী হ'ন—কাজেই আমার বিপদের জন্য তাঁদের কোনরকম সহানুভূতিই দেখা গেল না।

কাজেই অনন্যোপায় হয়ে আমিও পথ চলা সুরু করলাম। নির্জ্জন রাস্তা দিয়ে চলেছি আমরা চারজন। পিছনে খানিকটা দূরে আমাদের ভৃত্য ও মোটর চালক জিনিসপত্র নিয়ে আসছে। রাস্তার দুপাশে বনফল, বনফুলের গাছ। প্রকাণ্ড সব কাঠবিড়ালি এগাছ ওগাছ লাফালাফি করে নির্ব্বিবাদে সে সব খেয়ে চলেছে—আমাদের দেখে ভ্রূক্ষেপও নেই। পথের পাশে এত সব চিত্তাকর্ষক দৃশ্য থাকা সত্ত্বেও আমার মন কিন্তু পড়ে রইল আমার পদযুগলের বিভ্রাটের উপর। দরদী মন কি-না, যেখানে ব্যথা, সেখানেই সে ছোটে। মাথার উপরে সূয্যিমামার স্নেহ পরশ আর পায়ের নীচে কোথাও বা বালির সমুদ্র কোথাও বা পাথরের স্তূপ। শরীরটাকে টানতে টানতে প্রায় অর্দ্ধেক

আশ্চর্য্যের কথা,—পায়ের ব্যথাটাও অনেকটা ভুলে গেলাম খানিকক্ষণের জন্য!

রাস্তায় এসে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আশ্চর্য্যের কথা,—পায়ের ব্যাথাটাও অনেকটা ভুলে গেলাম খানিকক্ষণের জন্য। অনেকখানি ফাঁকা জায়গা—আমাদের বাঁ পাশে। সে জায়গাটুকু সব প্রস্তরের স্তূপ হয়ে আছে। আর তারই পাশ দিয়ে চলেছে ব্রহ্মপুত্র বিরাট গর্জ্জন করতে করতে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে। নদীর বুকে, পাহাড়ের চূড়ায়, শীতের সোনালী রোদের চিকিমিকি কী যেন এক মায়া-জালের সৃষ্টি করেছে। মন আপনা থেকে সৌন্দর্য্যে অভিভূত হয়ে পড়ে সেখানে। লোকচক্ষুর অন্তরালে সঙ্গোপনে প্রকৃতি যেন তার সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন সেখানে। সে যে কী এক দৃশ্য যে দেখে নি তাকে বুঝানো অসম্ভব। সঙ্গীরা সবাই মুগ্ধ হয়ে গেছলেন। আমার খালি মনে হচ্ছিল সঙ্গীরা যদি এর

যদি একেই পরশুরাম বলে স্বীকার করে তৃপ্ত হ'ন!

সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে একেই পরশুরাম বলে স্বীকার করে তৃপ্ত হ'ন, এবং আর অগ্রসর হ'তে বিরত হ'ন, তবে আমার পদযুগলও রেহাই পায়, আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। কিন্তু নির্দ্দয় সঙ্গীরা কয়েকটা ফটো তুলে নিয়েই মনে করলেন,—জায়গাটার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা হ'য়েছে, এইবার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে কোনো দোষ হয় না। কাজেই আবার পথ চলা সুরু হোলো। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মিলল পথের শেষ—আমরা পরশুরাম পৌঁছলাম। তীর্থের মাহাত্ম্য যাই থাক—জায়গাটা সত্যই ভারী সুন্দর। দু'পাশের অনেকগুলো পাহাড় এক সঙ্গে হয়ে জায়গাটাতে একটা কুণ্ডের মত সৃষ্টি করেছে। পাহাড়ের গায়ের সব ছায়া নদীর বুকের উপর তরঙ্গের সঙ্গে দুলছিল—বড় বড় 'মহাসেলে' মাছ সব নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে অবিরাম সন্তরণ-লীলায় খেলা করছিল। নদী-স্রোত উচ্ছৃঙ্খল, তারই খানিকটা জায়গা একটু নিরাপদ মনে করে স্নানের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে।

কথিত আছে এর জল মাথায় দিলে সর্ব্ব পাপের ক্ষয় হয়। এরই উপরে আছে ব্রহ্মকুণ্ড। ব্রহ্মপুত্র মানস সরোবর থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে এখানেই সর্ব্ব প্রথম সমতল ভূমিতে অবতীর্ণ হল। আমরা খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে

মনে করলেন জায়গাটার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা হ'য়েছে।

পরশুরামের জল মাথায় ছুঁইয়ে ব্রহ্মকুণ্ডে মাথা ধুয়ে এলাম। পরশুরামের জল বরফগলা জলের মত ঠাণ্ডা। তাই আমাদের আর স্নান করা হলো না। ওখানে যারা স্নান করে তাদের ভিজা কাপড়গুলো পাহাড়ী জাতিরা নিয়ে যায়। আমাদের জানা ছিল না। মিঃ মুখার্জ্জী আর তাঁর স্ত্রী ছুটো পুরাণো কাপড় নিয়ে গেছলেন তাই দিয়েই বস্ত্রদানের পুণ্য সারা গেল। তারপর আমাদের সঙ্গের খাবার ধ্বংস করে ঘণ্টাখানেকের ভিতর ঘরের দিকে যাত্রা করলাম। এবার ফিরতি পথে হাঁটতে আর তেমন কষ্ট হলো না। হয়তো বা মনটা অনেকখানিই পূর্ণ হয়ে উঠেছিল তাই যখন শেষ পর্য্যন্ত আবার 'নীলা' গাড়ি দিয়ে মোটরে চড়লাম তখন আর এতখানি চলার কষ্ট কিছুই অনুভব করতে পারিনি। আবার এসে পৌঁছলাম 'তেজু'তে। মনটা সকলেরই হয়তো পূর্ণ। তায় আবার যাত্রা শেষের একটা অবসন্নতা আছে। কাজেই প্রায় মুখ বুজেই যখন সবাই খেতে বসলাম সামনে এলো বড় বড় দুই বাটী ডাল যা দশ এগারো জন মানুষের পক্ষেও যথেষ্ট। আর একটা থালায় মাত্র একজনের মত ভাত। বেলা দুইটায় দশ মাইল হাঁটার পর ছয়জনের জন্য এই আহারের ব্যবস্থা দেখে মনটা অসম্ভব রকম দমে গেল। মিঃ মুখার্জ্জী তখন বললেন তাঁরই ভুলের এ প্রায়শ্চিত্ত। তিনি ডাক-বাংলার রক্ষককে বার বার বলে গেছেন ডাল চাল ইত্যাদি একসঙ্গে রান্না করে রাখতে কিন্তু 'খিচুড়ি' কথাটা আর উচ্চারণ করেননি। শেষ পর্য্যন্ত এক এক মুঠা ভাত আর কয়েক চুমুক ডাল খেয়েই আহার পর্ব্ব সমাপন করা

পরশুরামের ঘাট।

গেল। খেয়ে উঠেই বেলা ৩টার সময় আমাদের একরাত্রির আশ্রয়দাতা 'তেজু' ডাকবাংলাকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে আমরা মোটরে চড়লাম। ঘরমুখো বাঙ্গালীর প্রাণ তখন ঘরের জন্য ব্যাকুল। কাজেই পূর্ণবেগে মোটর চালিয়ে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় খেয়াপাড়ির জন্য খেয়াঘাটে এসে মোটর আমাদের থামল। সূর্য্যিমামা তখন পশ্চিম দিকটা খানিকটা লাল করে যাই যাই করছিলেন; যেমনি

আমরা নদীর ঘাটে পৌঁছলাম অমনি তিনি টুপ করে নদীর বুকে লুকিয়ে গেলেন।

আধঘণ্টা অপেক্ষা করে খেয়াপার হয়ে আমরা আবার চললাম। শীতের রাত। কুয়াসায় চারদিক ঢাকা। এক এক জায়গায় কুয়াসা জমাট বেঁধে এমন কুহেলিকার সৃষ্টি করছিল যে বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে আমাদের মোটর থামাতে হয়েছিল। রাত সাতটায় এসে তিনসুকিয়ায় পৌঁছলাম। মুখার্জ্জীরা আর নামলেন না। সোজা চলে গেলেন ডিব্রুগড়ে।

পরশুরামের স্মৃতি অনেকখানিই মনের মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। আজকাল কিন্তু একেবারে মুছে যাবার ভয় নেই। কারণ যখনই কোনো কারণে খানিকটা হাঁটবার প্রয়োজন হয়, তখনই মনের মধ্যে ভেসে ওঠে শ্রীচরণ-যুগলের সেই ব্যথার স্মৃতি,—সেই দশমাইল হাঁটা,—সেই পুণ্যতীর্থ পরশুরাম।

শ্রীমতী সুজাতা সিংহ রায়

কণা

শ্রীসুবোধ পুরকায়স্থ

সৌন্দর্য্যের কুঞ্জবনে আকুল কুসুম সঙ্গোপনে
কোথা ফুটিয়াছে।
হৃদয়-ভ্রমর ফেরে দিশেহারা, উদ্‌ভ্রান্ত গুঞ্জনে
তারি কাছে কাছে॥

আমি? আমি পরিচয়হীন।
শুধু জানি, যদি ও মুখ না হেরি
বাজে না আমার বীণ॥

প্রেমেরে চিনিবে সমগ্ররূপে,
আগপথ নাহি আর।
ভাঙ যদি তবে দিবালোকসম
দীপ্তি রবে না তার॥

বাণীতে লাগিলে সুর জাগে গান সুমধুর
পরশে জীবনতল;
ধ্বনি ও শব্দে মিলে হয় কোলাহল॥

অমর স্মৃতি

শ্রীমতী কমলা দাস

জানলার পাশে বসে মনীষা ভাবছে। মেঘাচ্ছন্ন দিন, চারিদিক ঘন অন্ধকারাবৃত, কোথাও এতটুকু আলোর রেশ দেখা যায় না, সামনের সরু মেঠো পথটুকু পর্য্যন্ত খানিকটা গিয়ে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে ঝম, ঝম। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে, যেন পথহারা পথিকের পথ নির্দ্দেশের জন্য। ঝোড়ো কাকের পাখার ঝাপটার আওয়াজ কখনো কখনো এসে মনের ভেতরটা চঞ্চল করে দিচ্ছে। দিনটী আষাঢ়স্য প্রথম দিবস কিনা তা ঠিক জানা নেই তবে আষাঢ় মাসেরই যে একটী দিন তা প্রকৃতির রূপ দেখলেই বোঝা যায়।

মনীষা ভাবছে তার অতীত দিনের স্মৃতি। যদিও সেটা শুধু স্মৃতিই তবুও সেটাকে অতীত বলা যায় না। কারণ অতীতে তা বিলীন হয়নি, রয়েছে তা সজীব, প্রাণবন্ত।

মনীষার মনে পড়ে সেই ভোর বেলাটীর কথা—দুজনে পাশাপাশি ছাতে বসে। পূবের আকাশে তখনো সলজ্জ রক্তিম আভার কোন রেখা পড়েনি। বিলীনপ্রায় নক্ষত্র চোখে পড়ে, প্রভাতের শিশির ভেজা বাতাস মাঝে মাঝে তার চুলে দোলা দিয়ে যাচ্ছিল। পাখীর মিঠে কাকলী দু' একটা শোনা যাচ্ছিল। দূরে যাচ্ছিল এক রাখাল ছেলে তার বাঁশিতে সুর দিয়ে। তাকে দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু তার সুরের রেশে পৃথিবী যেন উন্মনা হয়ে উঠেছিল; আর সব নিস্তব্ধ

সেই সময় প্রদীপ মনীষার একটী হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বলেছিল, "মণি সত্যিই তুমি কি অপূর্ব্ব, তোমার তুলনা হয় না। এই যে মধুর প্রভাত, তুমি না থাকলে তার কোন মাধুর্য্যই নেই, তোমাকে ভালবেসে আমি হয়েছি ধন্য। তোমাকে আমি কি করে বোঝাব যে তোমার মধ্যে আমি সব কিছু পেয়েছি, পার্থিব সৌন্দর্য্য, অপার্থিব আদর্শ, অতুলনীয় প্রেম।

আবার বৃষ্টিটা বুঝি চেপে এলো, তার কি বিশ্রামও নেই, বিরামও নেই? সে যেন চায় চারদিক ধুয়ে পৃথিবীর অন্তর্নিহিত রূপ ও রসের সন্ধান।

মনীষার মনে ভেসে আসে চিন্তাস্রোতের মুখে আর একটী শতদল, একটী গোধূলিক্ষণের কথা, অস্তমিত সূর্য্যের হোলির আবির পশ্চিম আকাশকে তখন রাঙ্গিয়ে দিয়েছে। লজ্জাবনতা অবগুণ্ঠিতা সন্ধ্যা মৃদুমন্দ গতিতে পৃথিবীর বাসর ঘরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে।

মনীষা ও প্রদীপ মাঠের আঁকা-বাঁকা পথটী ধরে চলছিল। দুজনেই নিস্তব্ধ, কারো মুখে কোন কথা নেই। কিন্তু তাদের মনের মধ্যে কত ভাব কত কথা যে ঠেলে উঠছিল তা বলা যায় না। প্রদীপ একবার রক্তিম আকাশের দিকে তাকাল আর একবার তাকাল মনীষার মুখের দিকে। মনীষা উপলব্ধি করল হাতের উপর একটু চাপ আর দেখল প্রদীপের চোখের চাহনি। তা যেন বলতে চায়, তোমার কাছে সব তুচ্ছ। যদিও প্রদীপ কিছু বলেনি, কিন্তু মনীষা তার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল আর পেয়েছিল তার অকৃত্রিম প্রেমের আভাষ।

আজ মনীষার মনে কত কথাই ঠেলে উঠছে, প্রভাতের তরুণ রবি যখন ধরার বুকে নেমে আসে, পাতায় পাতায় যখন রোদের ঝিকিমিকি খেলা আরম্ভ হয়, মসী-আচ্ছন্ন পৃথিবী যখন আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তখন কিছুই আর আবৃত থাকেনা; যত কিছু সুন্দর, যত কিছু মনোহর সবই যেমন স্বচ্ছ হয়ে দেখা দেয় ঠিক সেই রকমই পৃথিবীর যত কালিমা, মলিনতা, গ্লানিও প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সূর্য্যের আলোক দেয় বাহ্যিক রূপকে উন্মুক্ত করে কিন্তু মেঘ অন্তর আকাশের আবরণকে উন্মোচন করে। তাই আজকের মেঘাচ্ছন্ন দিন, মনীষার মনের রুদ্ধ দুয়ার হঠাৎ

একটু ফাঁক করে টেনে বের করে এনেছে তার মনের গহনে লুকান কথা।—আর বাঁধ-ভাঙ্গা স্রোতের মত তা দুকূল ছাপিয়ে উঠছে।

সেই দিনটী, সানাই বাজছে কোন কল্পলোকের চির-কল্পনাময় প্রণয়বাণী অবারিত করে। তার সুরের ছন্দে ছন্দে ধ্বনিত হচ্ছে চারদিক। এর সঙ্গীতে বাজে দুটী সুর। বিসর্জ্জনের করুণ রাগিণীর মাঝেই আবার আগমনীর মিঠে সুর বেজে ওঠে। একদিকে ও করে আশীর্ব্বাদ প্রেম দেউলের নবাগত পূজারী-পূজারিণীকে—যাত্রাপথ জয়যুক্ত হোক, মঙ্গলময় হোক, সার্থক হোক। আবার অন্যদিকে তেমনি বলে, ওগো অজানা পথের পথিক, তুমি ভুল কোর না। ভুল কোরনা যে এই উৎসবই সব নয়; আছে বন্ধন, তা মাধবীলতার নাও হতে পারে। সুর তার বেজেই চলে। কেউ শোনে তা - কেউ শোনে না।

মনীষার মনেও এই রকম দুটী ভাব দুলছিল। কখনো কোন অজানা আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে উঠছিল, আবার কখনো তৃপ্তি ও আনন্দের স্বপ্নে তার ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেশ ফুটে উঠছিল। উলু ও শঙ্খধ্বনির মাঝে যখন তাদের শুভদৃষ্টি হল তখন মনীষার মনে হল প্রদীপকে যেন তার ভাল লাগছে। তারপর সে এল প্রদীপের ঘরে। প্রদীপ বল্ল, "মণি, তুমি হলে এই গৃহের গৃহলক্ষ্মী, আমাকে একটু স্থান দেবে?" ধীরে ধীরে অজ্ঞাতে প্রদীপ মনীষাকে আপন করে নিল। আর মনীষা দেবতার দুয়ারে তার মিনতি জানায় যুগে যুগে যেন সে তাকেই তার স্বামিত্বে বরণ করে নিতে পারে।

দিনগুলি পদ্মের দলের মত কালস্রোতে ভেসে চল্ল।

কিন্তু আকাশ বেশীক্ষণ সুনীল থাকে না, ক্ষণকালের মধ্যেই কোথা থেকে এক টুকরা কাল মেঘ ভেসে আসে। তাই এল তাদের এই মধুর মিলনের মাঝখানে। দেবতাদের হল হিংসে। পৃথিবীতেই যদি স্বর্গের সৃষ্টি হয় তবে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে যে কোন প্রভেদ থাকে না। তাই একদিন হঠাৎ অতর্কিতে প্রদীপ চলে গেল পৃথিবীর ওপারে। কিন্তু দেবতারা ত বোঝেনি যে তারা শুধু প্রদীপের দেহটাকে উঠিয়ে নিতে পেরেছে, যার মূল্য অতি সামান্য। তাই বুঝি মনীষা এই ব্যবধানে তাকে আরও বেশী করে অনুভব করতে পারে।

যখন সবে ভোর হয় তখন মনীষার ঘুম ভেঙ্গে যায়, শুকতারা তখনও আকাশে জ্বল জ্বল করে, ঘরের প্রদীপ সারা রাত জাগার পরে সবে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। মনীষা এসে দাঁড়ায় বাতায়নের পাশে। কাছের তারাটীর দিকে তাকিয়ে ভাবে তারার প্রদীপের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে আছে তার প্রদীপ। মনীষা বোঝে ওকে দেখতেই তারার রূপে এসেছে।

আবার ম্লান সন্ধ্যায় মনীষা যখন তুলসী তলায় দীপ দেয় তখন হঠাৎ ও যেন শোনে সে এসে কাণে কাণে বলছে, সত্যি তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে।

ঘুমের মাঝে প্রদীপের ত নিত্য আগমন। মনীষা ভাবে তাকে যেন সে আরও বেশী করে পেয়েছে সব কিছুরই ভিতর দিয়ে।

মনীষা ভাবছিল তার প্রদীপ নেই কিন্তু তার একনিষ্ঠ প্রেম এখনও আছে অক্ষয় হয়ে। ভালবাসার পাত্র গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে, আছে তার ভালবাসা; মানুষ নেই আছে স্মৃতি, স্পর্শ নেই আছে স্পর্শের মাধুর্য্য, দেহ নেই আছে আত্মা। যা আসল যা সত্য তা রয়ে গেছে, ফাঁকি দিয়ে গেছে শুধু মিথ্যা।

হঠাৎ একটা বাজ পড়বার ভীষণ শব্দে তার চিন্তার খেই গেল হারিয়ে; ও উঠল কেঁপে কোন অজানা আশঙ্কায়। তারপরই আবার সব শুব্ধ। তখনও বৃষ্টি চলছে অবিরাম।

মনীষা নড়ে-চড়ে ঠিক হয়ে বসল, জানলার শার্সিটা ভাল করে টেনে দিল। আবার সে তার গভীর ভাবের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিল। তার মনে হল সেদিনের কথা—সেদিন প্রদীপ নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে তাকে বাঁচিয়েছিল, তিরস্কৃত হয়ে বলেছিল, "মণি, তুমি ত জান মানুষের প্রকৃতি হচ্ছে সব চাইতে প্রিয় জিনিষটীকে রক্ষা করা, আমি ত শুধু তাই করেছি; এতে অন্যায় ত কিছু নেই, মণি।" মনীষা ভাবে এই যে নিঃস্বার্থ ভালবাসা, স্বর্গীয় প্রেম এর কি কোন মূল্যই নেই? এই যে নূতন যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে নব নব ভাব দেখা দিয়েছে,—তারা ভাবে

যা অতীত তাকে যেতে দাও, যেটা লুপ্ত হয়ে গেছে তা যাক, হোক সেখানে নূতনের অভিষেক, যাক পুরাতন চিরবিদায় নিয়ে। বর্ত্তমানই তাদের কাছে সর্ব্বস্ব; অতীতের কোন স্থান নেই, মন এগিয়ে চলুক, তার চলার পথে যেন বাধা না পড়ে সে যেন অচল না হয়ে পড়ে; কিন্তু তারা ত বোঝে না যে মনের প্রসারের একটা সীমা আছে। মনীষার মনে হয় একথা যারা ভাবে তারা কখনও সত্যিকার ভালবাসা কি তা বোঝবার বা জানবার সুযোগ পায়নি। ওর চোখ দিয়ে দুফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল তাদের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে। সত্যি, যদিও প্রদীপ চলে গেছে তার মনের কোণে সে রয়ে গেছে অমর হয়ে।

তখনও বাইরে বৃষ্টি পড়ছে অবিরাম ঝম ঝম।

শ্রীমতী কমলা দাস

মরুযাত্রা

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

কল্পনা মরিয়া গেছে অবজ্ঞার মৃত্তিকায় পড়ে আছে জীর্ণ এ কঙ্কাল,—
স্বর্ণমায়া কুরঙ্গের পশ্চাতে হায়রে কবি বৃথাই ঘুরিলি এতকাল!
পলে পলে তিলে তিলে যৌবনের স্বপ্নরাশি জ্বলে গেল তুষাগ্নির মাঝে
অদূর ভবিষ্যালোকে স্পষ্ট যেন শুনা যায় ভয়াবহ রুদ্র-বীণ্ বাজে।

অতিক্রমি দীর্ঘপথ অভ্যস্থ চরণদু'টি চলে যেন কি এক নেশায়,
ছায়াহীন তরুহীন ঊষর-জীবন মরু ঢাকিয়াছে মৃত্যুর ছায়ায়।
এক বিন্দু স্নেহবারি কেহ যদি দেয় সেথা শূন্যে লীন হয় বাষ্পাকারে,
নাই স্নেহ, নাই মায়া, দয়া পরিহাস করে অট্টহেসে বীভৎস আকারে।

মরণ শর্ব্বরী বুকে গুরু গুরু শব্দ শুনি বড় শ্রান্ত, বড় ক্লান্ত মন,
জীবনের সাথী আজ নিষ্করুণ প্রেতমূর্ত্তি আসে-পাশে চলে অগনন!
দ্বন্দ্বজীবী মানুষের হেরি' শেষ-পরিণাম, কোটি আস্যে ফোটে ক্রুর হাসি
ঘাতক ও অপরাধী পাশাপাশি চলে আর ঊর্দ্ধ হ'তে ব্যঙ্গ করে ফাঁসী।

যে নারী যৌবন-স্বপ্নে কহেছিল একদিন, রহিবে সে প্রেমের-সঙ্গিনী,—
তাহারি কুঞ্চিত কেশ সহসা ধরেছে ফণা মৃত্যুরূপা কাল ভুজঙ্গিনী।
ভুল ভুল হায় কবি, শুখায়েছে কাব্য-নদী নাই সেথা একবিন্দু জল
মঞ্জরী ঝরিয়া গেছে, রসহীন জীর্ণ শাখে নাহি আর ফল-ফুলদল!

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

৩

গদ্য সাহিত্য

রাজা রামমোহনের সময় হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় পর্য্যন্ত যে সকল সাময়িক পত্র বাংলা গদ্য সাহিত্য উন্নতির অভিমুখে লইয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত তিনখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১। রাজা রামমোহন রায়ের "সংবাদ কৌমুদী"।

২। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "রহস্য সন্দর্ভ"।

৩। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"।

সুখের বিষয় উহাদের মধ্যে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' অদ্যাপি জীবিত আছে। এই পত্রিকা স্বনামখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও চিন্তাশীল সুলেখক অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধ-সম্ভারে অলঙ্কৃত হইত। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত পত্রিকায় মহাভারতের উপক্রমণিকা ভাগ বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়।

রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তী এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সকল সাহিত্য-রথী আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং বাংলা গদ্য সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্ব্বাগ্রগণ্য। তজ্জন্য একটু বিস্তারিত ভাবে বঙ্গভাষায় তাঁহার দান সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বিশুদ্ধ বাংলা গদ্যের তিনি প্রথম সৃষ্টিকুশল শিল্পী। তাঁহার ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও অনর্থক সমাসাড়ম্বরে শৃঙ্খলিত নহে। উহা সরল সুন্দর, সুসঙ্গত ও সুসংযত। তাঁহার রচনায় অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় একটি অপূর্ব্ব ছন্দ প্রবাহ প্রবাহিত, তজ্জন্য উহা পাঠে মন আনন্দ রসে অভিষিক্ত হয়। তাঁহার অন্যান্য পুস্তকের কথা দূরে থাকুক, বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কর	রস	পাতা নড়ে	নূতন ঘটি
খল	শঠ	জল পড়ে	পুরাণ বাটী
ঘট			সাদা কাপড়
জল			কাল পাথর
			ইত্যাদি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনূন্য ৩০।৩২ খানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই ছাত্রদিগের পাঠ্য পুস্তকরূপে লিখিত। বেতালপঞ্চবিংশতি, বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী, চরিতাবলী, শকুন্তলা, সীতার বনবাস প্রভৃতি অনেকেরই সুপরিচিত। তিনি জগৎবিখ্যাত মহাকবি Shakespeare-এর 'Comedy of Errors' অবলম্বনে ভ্রান্তিবিলাস এবং সামাজিক বিষয়ে বহু বিবাহ ও বিধবা বিবাহ সম্বন্ধেও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধিকাংশ পুস্তকগুলি ইংরাজী বা সংস্কৃত হইতে অনূদিত। কিন্তু অনুবাদে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অনুবাদ মাত্রেই উপেক্ষনীয় নহে। কেবল আক্ষরিক অনুবাদের বিশেষ কোন মূল্য নাই বটে, কিন্তু মূলের ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অনুবাদ করা কঠিন। মূলের সৌন্দর্য্য অব্যাহতভাবে রক্ষা করা এমন কি স্থলে স্থলে উহার উৎকর্ষ সাধন অসামান্য শক্তির পরিচায়ক। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্ব প্রচলিত ভাষার পারিপাট্য সাধন করিয়া ইহাকে শোভন ও সুন্দর করিয়াছেন। ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও অনর্থক সমাসাড়ম্বরে ইহা দুর্ব্বোধ্য ও গুরু ভারাক্রান্ত হয় নাই। সুবিন্যস্ত পদাবলী প্রয়োগে, সুনির্দ্দিষ্ট বিরাম চিহ্ন ব্যবহারে ও ভাষার লালিত্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা মনোরম ও শ্রুতিসুখকর। প্রসাদ গুণ রচনার একটি প্রধান গুণ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সকল রচনায় ইহা সুপরিস্ফুট

মৌলিক গ্রন্থ রচনা না করিয়াও সৃজন প্রতিভা ও সূক্ষ্ম রসানুভূতিতেও অনুবাদ কিরূপ হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বক্ষ্যমান রচনাগুলি হইতে প্রতিপন্ন হইবে।

"দাক্ষিণাত্য দেশে ধর্ম্মপুর নামে নগর আছে। তথায়, মহাবল নামে, মহাবলপরাক্রান্ত মহীপতি ছিলেন। একে প্রবল প্রতিপক্ষ রাজা, চতুরঙ্গিনী সেনা লইয়া, তদীয় রাজধানীর অবরোধ করিলে, রাজা মহাবল, স্বীয় সমস্ত সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে অবগাহন করিয়া, অশেষ প্রকার প্রতিকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু দৈবদুর্বিপাক বশতঃ ক্রমে ক্রমে স্বপক্ষীয় সমস্ত সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, নিতান্ত নিরূপায় হইয়া প্রাণরক্ষার্থে মহিষী ও তনয়া সমভিব্যাহারে অরণ্য প্রস্থান করিলেন।" বেতালপঞ্চবিংশতি

"নগরপাল জিজ্ঞাসা করিল, 'এই অঙ্গুরীয় কি করিয়া তোর হাতে আসিল বল্।' ধীবর কহিল, 'আজ সকালে শচীতীর্থে জাল ফেলিয়াছিলাম। একটা বড় রুই মাছ আমার জালে পড়ে। মাছটা কাটিয়া উহার পেটের ভিতরে এই আঙটি দেখিতে পাইলাম। তারপর এই দোকানে আসিয়া দেখাইতেছি, এমন সময়ে আপনি আমাকে ধরিলেন, আমি আর কিছুই জানি না। আমাকে মারিতে হয় মারুন, কাটিতে হয় কাটুন; আমি চুরি করি নাই।"

শকুন্তলা

"প্রথমে সেই শিশুকে দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণে যে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সেই স্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই অপরিচিত শিশুকে ক্রোড়ে করিবার নিমিত্ত আমার মন এমন উৎসুক হইতেছে। পরের পুত্র দেখিলে মনে এত স্নেহোদয় হয়, আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। আর যাহার এই পুত্র, সে ইহারে ক্রোড়ে লইয়া যখন ইহার মুখচুম্বন করে, হাস্য করিলে যখন ইহার মুখমধ্যে অর্দ্ধবিনির্গত কুন্দসম দন্তগুলি অবলোকন করে; যখন ইহার মৃদুমধুর আধ-আধ কথাগুলি শ্রবণ করে, তখন সেই পুণ্যবান ব্যক্তি কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়। আমি অতি হতভাগ্য, সংসারে আসিয়া এই পরম সুখে বঞ্চিত রহিলাম।" শকুন্তলা

"রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এবং অপ্রতিহ[ত] প্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্য নির্বিশেষে প্রজাপাল[ন] করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে স্বল্প সময়েই সম[স্ত] কোশল রাজ্য সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার সুখ সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হই[য়া] উঠিল। ফলতঃ তদীয় অধিকারকালে প্রজালোকের সর্ব্বাং[শে] যাদৃশ সৌভাগ্য সঞ্চার ঘটিয়াছিল, ভূমণ্ডলে কোনও কা[লে] কোন রাজার শাসন সময়ে সেরূপ লক্ষিত হয় নাই।"

সীতার বনবাস

'লক্ষ্মণ! নিষ্ঠুর বিধাতা আমার কপালে এত দুঃ[খ] ভোগ লিখিলেন কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। অথব[া] বিধাতার অপরাধ কি, সকলেই আপন আপন কর্ম্মের ফ[ল] ভোগ করে। আমি জন্মান্তরে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছিলা[ম] এ জন্মে সেইরূপ ফলভোগ করিতেছি। বোধ করি, পূ[র্ব্ব] জন্মে কোনও পতিপ্রাণা কামিনীকে পতি বিয়োজি[ত] করিয়াছিলাম, সেই মহাপাপেই আজ আমার এই দুরব[স্থা] ঘটিল; নতুবা আর্য্যপুত্রের হৃদয় স্নেহ, দয়া, ও মমতার পরি[পূ]র্ণ; আমিও যে একান্ত পতিপ্রাণা ও শুদ্ধচারিণী, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানেন; তথাপি যে এমন সময়ে আমায় গৃ[হ] হইতে বহিস্কৃত করিলেন, সে কেবল আমার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জি[ত] কর্ম্মের ফল ভোগ।"

"সীতা কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া স্নেহভরে সম্ভাষণ করি[য়া] লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! ধৈর্য্য অবলম্বন কর; আ[র] বিলাপ ও পরিতাপ করিও না। সকলেই অদৃষ্টাধীন আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে; তুমি অ[ার] সেজন্য কাতর হইও না; শোক সংবরণ কর। আম[ার] ভাবনা ছাড়িয়া দিয়া ত্বরায় তুমি আর্য্যপুত্রের নিকটে যাও তিনি আমায় বনবাস দিয়া কাতর ও অস্থির হইয়াছে[ন] সন্দেহ নাই; যাহাতে তাঁহার শোকের নিবারণ ও চিত্তে[র] স্থিরতা হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হইবে; তাঁহাকে বলি[বে] আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া ক্ষোভ করিবা[র] আবশ্যকতা নাই; তিনি সদ্বিবেচনার কার্য্যই করিয়াছে[ন] প্রাণপনে প্রজারঞ্জন করা রাজার ধর্ম্ম; আমায় পরিত্য[াগ] করিয়া তিনি রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াছেন।......তাঁহ[ার] চরণে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবে, যদিও আ[মি]

লোকাপবাদের ভয়ে অযোধ্যা হইতে নির্ব্বাসিত হইলাম, যেন তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে একেবারে অপসারিত না হই। আমি তপোবনে থাকিয়া এই উদ্দেশ্যে ঐকান্তিক চিত্তে তপস্যা করিব, যেন জন্মান্তরেও তিনি আমার পতি হন।”

সীতার বনবাস

“চন্দ্রপ্রভা শুনিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, ভগিনি! যত অভ্যাস কর না কেন, কখনই অবিরক্ত চিত্তে সংসার-ধর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিবে না। পুরুষের পদে পদে অত্যাচার; কত সহ্য করিবে বল। তুমি পুরুষের আচরণের বিষয় সবিশেষ জান না, এজন্য ওরূপ বলিতেছ, যখন ঠেকিবে, তখন শিখিবে; এখন মুখে ওরূপ বলিলে কি হইবেক। বিশেষতঃ পরের বেলায় আমরা উপদেশ দিতে বিলক্ষণ পটু; আপনার বেলায় বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে; তখন বিবেচনাও থাকে না, সহিষ্ণুতাও থাকে না।”

ভ্রান্তিবিলাস

অনুবাদ ভিন্ন ও রচনা-মাধুর্য্যের নিদর্শন।

আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্ন ভাব ছিল না। ফল কথা এই স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সৎগুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্ত্তি আমার হৃদয় মন্দিরে দেবীমূর্ত্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে, তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতি পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।”

বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত)

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১২৮৭ সালে বঙ্গদর্শনে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন।

“ইঁহাদের দলের অগ্রণী এমন কি পরিবর্ত্তন সময়ের প্রধাননেতা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,......ইনি একা একশত, ইনি বাঙ্গালীকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন।...ইনি সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শিখাইয়াছেন, ইঁহার কথামালা ও চরিতাবলীর ভাষা যদি বঙ্গীয় সর্ব্বপ্রধান লেখকও পড়েন, অনেক উপকার লাভ করেন।

অবশেষে বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে অভিমতের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব।

“তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বঙ্গভাষা।...... ...বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী। তৎপূর্ব্বে গদ্য-সাহিত্যের সূচনা— তিনি সর্ব্বপ্রথমে কলা নৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের আধার নহে, যেন তেন প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলে কর্ত্তব্য সমাধান হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে।

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্য্যকুশলতা দান করিয়াছেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাব প্রকাশের কঠিন বাধা সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এ সেনানীর রচনাকর্ত্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।

গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্ব্বরতা উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে ভদ্রসভার উপযোগী আর্য্য ভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে বাংলা গদ্যের যে অবস্থা ছিল, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষা গঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্প প্রতিভা ও সৃষ্টি ক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

ভাষা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও গতানুগতিক ও প্রাচীনপন্থী ছিলেন না এবং ভাষা সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রগতিশীল বলা যাইতে পারে।

গদ্য রচনার ছন্দ বিষয়ে তিনিই ছিলেন প্রথম দ্রষ্টা ও স্রষ্টা, গদ্য পাঠের ধ্বনি সামঞ্জস্যে যে পাঠক ও শ্রোতা আনন্দ পাইতে পারে এই সূক্ষ্ম অনুভূতি তাঁহার ছিল।”

(ক্রমশঃ)

জয়ন্তী

শ্রীপ্রসাদকুমার বসু

মাঘ মাসের সকালে লেপের উষ্ণ আলিঙ্গনের অনাবিল আনন্দ থেকে কল্যাণকে বঞ্চিত করলে মীরা। গায়ের উপর থেকে লেপটাকে সরিয়ে দিয়ে ডাকলে, এই ওঠো ওঠো—

চোখ না খুলেই কল্যাণ লেপটাকে আর একবার গায়ের উপর টেনে নিয়ে বললে, লক্ষ্মীটি, আর একটু ঘুমুতে দাও।

মীরা ওর ঠাণ্ডা হাত দু'খানা কল্যাণের ঘাড়ের কাছে চেপে ধরে। কল্যাণ অল্প একটু হেসে বললে, কি হচ্ছে মীরা!

মীরা জবাব দিলে, Get up at five. তা five ছেড়ে seven হয়েছে। এবার তোমাকে উঠতেই হবে। কোন কথা শুনছি না আজ।

অগত্যা কল্যাণকে উঠতেই হয়। মীরার দিকে তাকিয়েই বলে, তোমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছে মীরা, কি এমন গরম লাগলো তোমার যে এই বরফ জমানো শীতের মধ্যে ভোরে সাত তাড়াতাড়ি নেয়ে এলে?

ছোট্ট একটুখানি হেসে মীরা জবাব দিলে, ১০ই মাঘ আজ, আমার জীবনের স্মরণীয় দিন। তারপর অভিমানের সুরে বললে, পুরুষ তুমি, তোমার কাছে এই দিনের কোন মূল্য নাও থাকতে পারে। তোমাদের কাছে ইতিহাসের দিনগুলোই সব চেয়ে বড়। কিন্তু মেয়েদের ছোট্ট জীবনের ইতিহাস একটা বিশিষ্ট দিনকে কেন্দ্র করেই লেখা সুরু হয়। সুখের হোক, দুঃখের হোক, এই একটা দিন বাদ দিলে আমাদের জীবনের সব কিছুই উহ্য থেকে যায় যে!

কল্যাণ লজ্জা পায়, ১০ই মাঘ আজ। তিন বছর আগে এক রঙিন সন্ধ্যায় মীরাকে সাথীরূপে সে পেয়েছিল। সেদিন সকালে কেহ তার ঘুম ভাঙায় নি', নিজেই উঠেছিল সাতটা বাজার অনেক আগেই, সমস্ত রাত ঘুমুতে পারে নি। স্বপ্ন-জাল বুনে কাটিয়েছিল। পাখী ডাকার অনেক আগেই উঠে পড়ে। কাজ কিছুই নেই। তবুও মনে হচ্ছিল সমস্ত দিনটার মধ্যে হয়ত একটুও বিরাম পাবে না। সেদিন সে শুয়ে থাকতে পারে নি। আশার আনন্দ তাকে উন্মত্ত করেছিল। মীরাকে তখনও সে পায় নি!

তিন বছর আগে এমন ভাবে সকালটাকে ঘুমিয়ে কাটানোর কল্পনাও সে করতে পারত না। পাওয়ার গর্ব্ব চাওয়ার হর্ষকে ক্ষুব্ধ করতে পারে নি তখনও। সেদিন ছিল উৎকণ্ঠা, আজ এসেছে আত্মসচেতনতা। তিন বছর আগে সে উন্মুখ হয়েছিল মীরার প্রতীক্ষায়। সোনার কাঠি বুলিয়ে মীরার ঘুম ভেঙেছিল সেদিন। আজ সেই মীরার ডাকেও তার ঘুম ভাঙতে চায় নি!

কল্যাণের ইচ্ছা হয় মীরার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তার ভুলের জন্য শাস্তি চায়, মীরাকে বলে, আমায় মাফ কর—

মীরা খিল খিল করে হেসে ওঠে। বলে, ছেলে মানুষ কোথাকার! আচ্ছা, এবার তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে এসগে যাও, আমি আসছি এক্ষুনি।

মীরাকে আজ অপূর্ব্ব দেখাচ্ছিল। ঘন লাল পাড় গরদের সাড়ী তার স্বাভাবিক সুন্দর বর্ণকে সুন্দরতর করে তুলেছে। মুখের উপর দু' একটা চুর্ণ অলক এসে পড়েছে, কপালের ছোট্ট সিন্দুরের টিপ তার মুখখানাকে এক অপরূপ মাধুর্য্যমণ্ডিত করেছিল। অন্যদিন হলে কল্যাণ মুখে মুখে কবিতা রচনা করে ফেলত এবং মীরাকে অনেক উপদ্রব সহ্য করতে হত। আজ কিন্তু সে চুপ করেই রইলো, শুধু অন্তরের অন্তঃস্থলে মীরাকে নিবেদন করে দিলে তার প্রাণের অর্ঘ্য, মীরার এই বেশ এক নূতন অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করলে তার হৃদয়ে। মীরাকে যেন সে আজ নূতন করে জানলে।

কল্যাণ উঠল না, বিছানার উপরেই বসে রইলো, ভাবলে, এই মীরা! তিনটী বছরের মধ্যে একটুও পরিবর্ত্তন হয় নি! ঠিক তেমনিই রয়ে গেছে। তিন বছর আগে যেমন অকারণ সে হেসে উঠত ক্ষণে ক্ষণে, আজও হাসে ঠিক সেই রকম। ঠিক তেমনই তার গালের দু'ধারে টোল খেয়ে যায়, চোখের ঘন-কাল মণিদুটো নেচে ওঠে। বিবাহিত জীবনের নানা অসুবিধার মধ্যেও মীরা ঠিক আছে, অফুরন্ত তার আনন্দ-উৎস, প্রাণময়ী!

কল্যাণের মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে যায়—অতুলনীয়া!

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ঘরে ঢুকে মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের ছোপ লাগিয়ে মীরা প্রশ্ন করে—ইস্! কিন্তু কার এত প্রশংসা হচ্ছে শুনি?

কল্যাণের মনের মেঘ তখন অনেকটা কেটে গেছে। তাই ঠাট্টা করে বলে, যারই হোক না কেন, তোমার তাতে কি? বিশ্বের সবগুলো ভাল ভাল বিশেষণ যে কেবল তোমাকেই দিতে হবে এমন কি বাধ্যবাধকতা আছে?

মীরা উদাস ভাবে জবাব দিলে, প্রশ্ন করা অপরাধ হয়েছে। উঃ, পুরুষগুলো কি বিশ্রী। পরের বাড়ীর মেয়ে বৌ'কে নিয়ে কবিতা লেখে, ধরা পড়লে আবার কথা শোনানও চাই।

মীরার কথা বলার ধরণে কল্যাণ হেসে ওঠে, বলে, আর মেয়েগুলোও কি দুষ্টু, ছেলে ধরার ফাঁদি!

মীরা বলে, যা তা বল না বলছি, সইব না কিন্তু।

ওর চোখে মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

কল্যাণ জবাব দিলে, হাজার বার বলব, প্রমাণ চাও দেব যত দরকার, অস্বীকার করতে পারবে না, তারপর যেন নিজের মনেই স্বগত উক্তি করে, বেচারা আমি! পরিচয় নেই, হঠাৎ কিনা বলা হল আমারই নিজের লোককে আমাকে না হলে ওঁর চলবে না, ভারী ভাল লাগে আমাকে! আমাকে নিয়েই যত আলোচনা আর গল্প গুজব। আশ্চর্য্য মেয়ে যা হোক, একটু একটু করে দিব্যি চোরের মত এসে একেবারে ভিত্তি রচে বসে পড়লে! তবু ত বিয়ের আগে আলাপ পর্য্যন্ত হয় নি, তাইতেই এত।

টেবিলটার ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে মীরাও জবাব দিলে, বেশ করেছি, আমার খুসী। ইস্, উনি যেন আর কিছুই জানেন না। যার কাছে গিয়ে বলা হয়েছিল আবার মেয়েটী কিন্তু ভারী চমৎকার, তোমার ঐ রকম একটা বৌ হলে ভাল হত, না না? আমি যেন আর কিছু জানি না, আমি ত বিয়েই করতাম না—

কল্যাণ খুব খানিকটা হেসে নিয়ে বললে, তা আর জানি না, মাকে অত সেবাযত্নে হাত করতে যেন আমিই বলেছিলাম!

মীরা হেরে গিয়ে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলে, ক'দিন থেকে মাকে সন্নিসি হয়ে যাবার ভয় দেখানো হচ্ছিল মশায়ের?

কল্যাণ প্রথমটা হো হো করে হেসে ওঠে, তারপর ক্ষোভের সুরে বললে, সত্যি মীরা, সন্নিসি আমি নই কিন্তু তোমাকে ত প্রায় সন্ন্যাসিনীই করে রেখেছি। কী বা দিতে পেরেছি তোমাকে শুধু দৈন্যের গ্লানি ছাড়া, তাই ত ভাবি কেন তুমি আমায় বরণ করেছিলে!

কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে যাবে মীরা আশা করে নি; তা হ'লে এ প্রসঙ্গ সে অনেক আগেই চাপা দিয়ে ফেলত। তার চোখ দুটো জলে ভরে এল, বলতে চাইলে, ওগো, কে বলেছে আমি তোমার কাছে কিছুই পাইনি'। দৈন্যই যে আমার জয়তিলক। তাই ত তোমাকে আমি এমন ক'রে পেয়েছি। এর চেয়ে বেশী আমি কোনদিন চাই নি', চাই নি'!

মীরার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়লো,

কল্যাণের অলক্ষ্যেই মুছে ফেলে বলে, তাড়াতাড়ি মুখটা ধুয়ে নাও, তোমার চা এই আনলাম বলে।

কল্যাণের সামনে থাকতে ওর আর সাহস হচ্ছিল না, কারণ তার চোখের জল কল্যাণের দুঃখকে আরও প্রবল করে তুলবে।

কল্যাণও আর কোন কথা বললে না। টুথ ব্রাশটায় একটুখানি পেষ্ট লাগিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে দাঁত মাজতে লাগলো। হয়ত ভাবছিল মীরার কথা, তার মন্দভাগ্যের কথা, নয়ত আজকের দিনটাকে কেমন করে সফল করবে তারই কথা; কে জানে!

এমন ভাবে কতক্ষণ কেটেছে কল্যাণ তা জানত না,

খেয়াল হল মীরা যখন দু'পেয়ালা চা নিয়ে এসে ঠাট্টা করে বললে, ঘসার চোটে দাঁতগুলো প্রায় ক্ষয়ে গেল যে!

অপ্রতিভ কল্যাণ অল্প একটু হাসলে মাত্র, যা হোক একটা কিছু জবাব দিয়ে মীরাকে সে ঠকাতে পারবে না জানে।

মীরা সবই বুঝতে পারে, অন্ততঃ আজকের দিনে কল্যাণের দুঃখকে সে মুছে নিতে চায় তাই।

ওদের বিবাহের ত্রৈবার্ষিক জয়ন্তীতে যোগদান করার জন্য যাকে বিশেষ ভাবে বলা হয়েছিল, তিনি কল্যাণের মামাত বোন মাধবী, সম্পর্কটা খুব নিকট না হলেও ওরা দু'জনেই মাধবীর কাছে ঋণী, ওদের বিবাহটা দিয়েছে এক রকম ওই, কল্যাণ ওকে ঠাট্টা করে বলত, হাইফেন।

মাধবীর সঙ্গে মীরার পরিচয় খুব ছেলেবেলা থেকেই, ওরা দু'জনে একসঙ্গে ইস্কুলে পড়ত এবং দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও ছিল খুব, আজও সে মীরার আমন্ত্রণ ফেলতে পারে নি, স্বামীর কাছে পুরো একটা দিনের ছুটি নিয়ে বেলা দশটার মধ্যে এসে পৌঁছেছে।

মীরাকে ও বললে, খুব টাট্‌কা কিনা তাই সের দেড়েক চিংড়ি নিয়ে এলাম। লোক ত মোটে তিনটী, এর আর্দ্ধেক গুলোর হবে কাটলেট রাত্তিরে, বাকী আর্দ্ধেকের দই মাছ, দইখানা তোর জামাই বাবু কোত্থেকে যেন অর্ডার দিয়ে আনিয়েছেন। শোন-পাপড়িটা তেমন সুবিধা পাওয়া গেল না—

মীরা বাধা দিয়ে বললে, এটা কিন্তু তোমার ভারী অন্যায় মাধু। কি দরকার ছিল এসবের!

মাধবী জবাব দেয়, তা যদি বল তা হলে আমারই বা আসার কি দরকার ছিল?

এর কোন জবাব দেওয়া যায় না, মীরা চুপ করেই রইলো। একটু পরে মাধবী আবার বললে, ওঁকে এত করে বললাম এ বেলা একবার আসতে, তা ভাই যে কাজের হাঙ্গামা, বলেছেন পারেন ত রাত্তিরে একবার আসবেন। জানিস ত ওঁকে, এক ফোঁটাও সময় নেই হাতে। কেবল কাজ আর কাজ। পারি না আর বাপু এই কাজের মানুষকে নিয়ে!

মাধবীর জন্যে খানকয়েক নিম্‌কি মীরা তাড়াতাড়ি ভেজে আনলে, বললে, রান্না হতে একটু দেরী হবে ভাই, যা হোক একটু মুখে দাও এখন।

মাধবী বললে, বেশ, আমি বুঝি একলাই খাব শুধু? না, তুমি এস, কল্যাণদা'কেও ডাকছি।

খাওয়ার চেয়ে গল্পই বেশী হয়, মাধবী বলে, তুমি নাকি একটা জীবন্ত নিদ্রা কল্যাণ দা? মীরা বলেছে।

কল্যাণ জবাব দিলে, দেখ মাধু, প্রত্যেক মানুষের একটা না একটা বিশেষত্ব থাকে, আমি একটু ঘুমুতে পারি বলে তোমাদের হিংসা করা উচিত নয়।

মাধবী খুব বিজ্ঞের মত প্রশ্ন করলে, তোমার কিছু বলার আছে মীরা?

মীরা যথেষ্ট উদারতা দেখিয়ে বললে, আসামী কবুল জবাব করেছে, সুতরাং মামলা আমি তুলে নিচ্ছি।

নিমকি কখানার সদ্ব্যবহার অনেক আগেই হয়ে গেছে, কল্যাণ বললে, শুনলাম বাড়ীতে শোন-পাপড়ির শুভাগমন হয়েছে, তার কয়েকখানা আনলে মন্দ হত না কিন্তু।

মীরা জবাব দিলে, আচ্ছা তোমার কি কেবল খাওয়ার চিন্তা!

কল্যাণ বললে, আবার পরের বিশেষত্ব নিয়ে চর্চ্চা হচ্ছে, ভারী অন্যায় সব!

মাধবীর খুব ভাল লাগে ওদের এই ব্যবহার। তার দৌত্য ব্যর্থ হয় নি এতেই তার আনন্দ। কল্যাণ ত তাদের বাড়ী থেকেই একরকম মানুষ, মা-বাপ মরা ছেলেটীকে তার কেমন খুব ছোট থেকেই ভাল লাগে। কল্যাণদা'কে সুখী করতে পারলে তার গর্ব্ব হত, মীরাকে ত সেই দিয়েছে কল্যাণকে, ভগবানের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করে, এমনি শান্তিতেই যেন ওদের জীবন কাটে, সাংসারিক অবস্থা ওদের ভাল নয়, তবু মনের কোণে ওদের রাজার ঐশ্বর্য্য রয়েছে, সে ভাণ্ডার চিরদিনই যেন অফুরন্ত থাকে!

মাধবীর ইচ্ছা ছিল এমনি ভাবেই আজকের দিনটা কাটিয়ে দেয়, ওদের এই অনাড়ম্বর অথচ পরিপূর্ণ জীবনের

আনন্দ সেও পূর্ণভাবে উপভোগ করতে চয়ে, তার নিজের জীবন থেকে এ অনেকখানি স্বতন্ত্র। অভাব তার অবশ্য কিছুই নেই, স্বামীর ভালবাসাও সে পেয়েছে, তবু সে পাওয়া হয়ত মীরার সৌভাগ্যের তুলনায় অনেক কম। স্বামীর কাছ থেকে যে প্রেম সে পায় সেটা ঠিক এমন ভরপুর নয়। তা যেন অবসর সময়ের জন্য তোলা থাকে, এমন পরিপূর্ণভাবে স্বামীকে সে কখনও পায় নি। স্বামী তাকে স্নেহ করেন খুব, কিন্তু হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন শুধু কাজ করবার জন্যেই তিনি পৃথিবীতে এসেছেন, দু'দণ্ড চুপ করে বসারও উপায় নেই। প্রেম তাঁর যত বড় গভীরই হোক, মাধবীর মাঝে মাঝে মনে হয় সে রিক্তা, অবশ্য এ দুঃখ তাকে বেশীক্ষণ বইতে হয় না। কাজকর্ম্মের শেষে স্বামী এসে যখন তাকে আদর করেন তখন সে মনে মনে লজ্জা পায়, গর্ব্ব হয়, কত বড় কর্ম্ম-জীবন তার স্বামীর! কিন্তু তারপরই আবার যখন কয়েকটা দিন কেটে যায় স্বামী তার অস্তিত্বও যেন স্বীকার করতে চান না, তখন বেদনাটা মাধবীকে আবার কাতর করে তোলে। তার বুভুক্ষু যৌবন অতৃপ্তি ও অভিমানে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। হোক তার স্বামী যশস্বী, তবু—! এই ত কল্যাণদা' রয়েছে, কাজ তাকেও করতে হয়, কিন্তু মীরা ত কখনও নিজেকে নিঃসঙ্গ ভাবে না। হোক কল্যাণদা' গরীব, কিন্তু মীরাকে সে বঞ্চিত করে নি'। গরীবের স্ত্রী মীরা, নিতান্ত দরিদ্র তারা, কিন্তু মীরার মধ্যে উপবাসী অন্তর এমন করুণভাবে কেঁদে ওঠে না কখনও।

জোর করে চিন্তাটাকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে মাধবী, মনকে বলে, এ অত্যন্ত অন্যায়। স্বামীর উপর নিদারুণ অবিচার করছে সে, তা ছাড়া মীরার সৌভাগ্যে তার দুঃখ পাবার কি আছে!

কিছু ক্ষণ চুপ চাপ কাটার পর মীরা বললে, এবার কিন্তু আমাকে উঠতে হবে ভাই, বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে।

মাধবী ওকে বসিয়ে দিয়ে বলে, বস্ না মীরা, আজ নয় গল্প করেই কাটাব আমরা।

মীরা হাসতে হাসতে জবাব দিলে, প্রস্তাবটা খুব ভাল সন্দেহ নেই, কিন্তু শুধু হাওয়া খেয়ে থাকলেই ত মানুষের চলে না। উদর নামক যে দেবতাটী আমাদের মধ্যে অহরহঃ বর্ত্তমান তাঁকে থামাকা রাগিয়ে লাভ কি!

মাধবীর চট করে মনে পড়ে যায়, সমস্তই মীরাকে নিজ হাতে করতে হবে, ঠাকুর বা লোক রাখার সামর্থ্য তাদের নেই। ওদের জন্য তার দুঃখ হয়, তবু ঠাট্টা করে বলে, ঠিক কথা, এমন জাগ্রত দেবতাকে অসন্তুষ্ট হতে দেওয়া যায় না, পুজার আয়োজন করিগে চল।

মীরা বলে, অতিথির কাজ করায় নিষেধ আছে। তুমি বস, আমি অল্পক্ষণের মধ্যে সব সেরে নিচ্ছি।

মাধবী প্রতিবাদ করে, বলে, তোমার হয়ত অতিথি আমি মীরা, কিন্তু কল্যাণদা'র নই, সুতরাং—

কাজ এমন কিছুই নয়, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা তুমুল ব্যাপারের সৃষ্টি হয়।

সেটা এই।

দোতলায় একখানা বড় ঘর নিয়ে কল্যাণরা থাকে। ঘরের সামনের ছোট বারাণ্ডায় দরমার পার্টিসান দিয়ে রান্নার জায়গা, বাকী আধখানা বারাণ্ডা অভ্যাগতদের বসার জায়গাও বটে, আবার সেখানে কাপড় রোদে দেওয়া এবং অল্প বিস্তর ভাঁড়ার রাখাও চলে। গোলমালের সূত্রপাত হয় এই বারাণ্ডাখানা নিয়েই, নিজের জুতোটাকে মাধবী রেখেছিল বারাণ্ডার এক কোণে, হঠাৎ পায়ের ধাক্কা লেগে জুতোটা নীচের তলায় ভাড়াটেদের রান্নাঘরের সামনে গিয়ে পড়ে, বিধুর মা অমনি চীৎকার করে ওঠেন, ওমা, কি অনাচ্ছিষ্টি গো! নোংরা জুতো হেঁসেলের ওপর ছুঁড়ে ফেলছে গো! কোথা যাব গো!

মাধবী লজ্জিত হয়, তাড়াতাড়ি জুতোটাকে কুড়িয়ে নিয়ে বলে, মাপ করবেন, হঠাৎ পড়ে গেছে। জুতোটা হাতে করে মাধবী সিঁড়ি দিয়ে ওঠে।

বিধুর মার বাক্যের তুফান থামে না, মাধবীকে শুনিয়েই বলেন, যত সব খেরেষ্টানের কারবার হয়েছে! বলি জুতো পরে বিবি সেজে থাকতেই যদি হয় তবে এখানে কেন? আরও ত ঢের জায়গা আছে। গেরস্থ ভদ্দরলোকের বাড়ীতে এ সব নোংরামি—

মাধবী ফস্ করে জবাব দিতে যায়, মীরা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে, কার সঙ্গে ঝগড়া করছিস মাধু! গালা-গালি খাবি? এমনিতরই লোক ওরা।

মীরার কথাগুলো বিধুর মার কাণে যায়, বারুদের উপর জ্বালানো দেয়াশলাইয়ের কাঠি পড়ে। সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে বিধুর মা তারস্বরে চীৎকার করে আরম্ভ করেন, তবেরে পোড়ামুখীরা! এখানে এসেছ বাঁদরামি করতে? নানা অকথ্য ভাষার অবতারণা হয়, তার কোনটার বা মানে আছে, কোনটা বা সম্পূর্ণ অর্থহীন, শেষ পর্য্যন্ত মাধবী বা মীরার কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে বিধুর মা কান্না জুড়ে দেন এবং সেই ভাবেই বলেন, দাঁড়া! আসুক ওরা বাড়ী, তারপর তোদের একদিন কি আমার একদিন!

ঘরের মধ্যে থেকে কল্যাণ ঠাট্টা করে বললে, আজকের দিনে একটা প্রহসনের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু যবনিকা পতন এত শীগগির হবে আশা করি নি'। ইন্‌টারভ্যালও হতে পারে, নায়কের দল অর্থাৎ বিধুর মার "ওরা" এলে আবার পাট উঠতে পারে. এমন মধুর নাট্যরসের জন্য তোর জুতোটাকে কিন্তু ধন্যবাদ দিই মাধু!

কল্যাণের কথার জবাব না দিয়ে মাধবী মীরাকে বলে, কেন তোরা এখানে থাকিস এই সব কুলোকের মধ্যে? অন্য কোথাও যেতে পারিস না?

মীরার ঠোঁটের কোণে একটা ক্ষীণ হাসি ফুটে ওঠে, বলে, সব জায়গাতেই ত এই রকম ভাই!

মাধবীর মনে পড়ে যায়, ঠিক, একখানা বাড়ী সম্পূর্ণ নিয়ে থাকবার অবস্থা ওদের নয়, সুতরাং সইতেই হবে।

মাধবীর এ সব সহ্য না হবার যথেষ্ট কারণ আছে, বড় লোকের স্ত্রী সে, কিন্তু মীরার এসব ভাত মাছের সমান হয়ে গেছে। এতে তার মন খারাপ হয় না এবং কাজও আটকে থাকে না, এত বড় একটা ঘটনার পরও সে দিব্যি হাসি ঠাট্টার সঙ্গে নিজের কাজ করে যায়।

দুপুরে খেতে সেদিন ওদের দেরীই হয়, রোজই প্রায় এমনি। কারণ দিনে কল্যাণের কোন কাজ নেই, তার চাকরী সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত, পঁয়ত্রিশ টাকা রোজগার, এতেই সংসার চলে, অর্থাৎ চালাতে হয়। একদিন না গেলে মাইনে কাটা যায়, আজ রবিবার নইলে আজও হয়ত তাকে যেতে হত। ভাবতেও তার দুঃখ পায়।

খেতে বসে গল্প হয় অনেক, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের পাট তাদের প্রায়ই নেই, বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তা করার শক্তি তাদের নেই বলে। কাজেই কালে ভদ্রে যদি কেহ কখনও আসে তাকে নিয়ে ওরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। একটুক্ষণও চুপ করে থাকতে পারে না। মীরা এবং কল্যাণ দু'জনেই অতি মাত্রায় মুখর হয়ে ওঠে, একটা দিনের হাসি গল্পে তারা তাদের দৈনন্দিন দুঃখ ভুলে যেতে চায়।

হঠাৎ এক সময় মাধবী বলে, তোমাকে একটা সুসংবাদ দেব কল্যাণদা'। কি আমাকে দেবে বল?

কল্যাণ ঠাট্টা করে বলে, সংবাদটা যদি সু হয়—। কিন্তু কিছু দেবার কথা ভাবতে কল্যাণের দুঃখে হাসি পায়, দেবার ক্ষমতা তার আছে কিনা! তাই একটু থেমে বলে, আচ্ছা আগে ত শুনি সংবাদটা।

মাধবী ঘাড় নেড়ে বললে, না, সে হবে না। আগে প্রতিজ্ঞা কর।

কল্যাণ জবাব দিলে, বেশ, নীতেশবাবুকে বলব তোকে যেন আরও বেশী করে ভালবাসে সে।

মাধবী মুখখানা গম্ভীর করে বলে, কথার ছিরি দেখ একবার! যাও আমি বলব না কিছুতেই। কিন্তু পরক্ষণেই বলে, আসছে বছর কিন্তু আমাকে আরও বেশী করে খাওয়াতে হবে বলে রাখছি, পরের বছর তোমাদের উৎসবে যোগ দেবার জন্য আসবে এক ছোট অতিথি, মীরা আমায় বলেছে।

মীরার মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে, কল্যাণকে এ সংবাদটা দেব দেব করেও এতদিন সে লজ্জায় দিয়ে উঠতে পারে নি'। আজ মাধবীই প্রথম জানালে কল্যাণকে।

কল্যান প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারে না, যখন বোঝে ততক্ষণে মীরা তার সামনে থেকে উঠে যায়।

পাকা গৃহিণীর মত মাধবী বলে, এখন থেকেই কিন্তু মীরার একটু সাবধানে থাকা দরকার। প্রথমবার, তার মাথার উপর কেউ নেই। ওর দিকে একটু দৃষ্টি রেখ কল্যাণদা', অবশ্য তোমাকে কিছু বলে দিতে হবে না—

মাধবী বলে চলে, সব কথা কল্যাণের কানে যায় না, শুধু সে ভাবে, মীরা জননী হতে যাচ্ছে, তার মীরা!

খাওয়া দাওয়ার পরে মাধবী আর মীরা বারাণ্ডায় বসে গল্প করে, কল্যাণ ঘরের মধ্যে পাটির উপর শুয়ে ওদের হাসি ঠাট্টা কিছু কিছু শোনে। কিছুতেই সে ওদের সঙ্গে বসে গল্প করতে পারলে না।

কল্যাণ এই টুকুতেই অস্থির হয়ে ওঠে, মীরার উপর তার অভিমান হয়। কেন সে এতদিন কথাটা তাকে জানায় নি! এত বড় একটা দায়িত্ব, তার জীবনের প্রথম পরীক্ষা,—একটা ভাল ডাক্তারের উপদেশ নেওয়ার ত যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে, খুব দেরী হয়ে গেছে বোধ হয়। হঠাৎ এখন যদি একটা কোন অমঙ্গল ঘটে বসে,—ভাবতেও কল্যাণের দম বন্ধ হয়ে আসে। আশ্চর্য্য কিছুই নয়, কিই বা জানে মীরা আর কিই বা জানে সে! কল্যাণের ইচ্ছা করে মাধবীকে বলে এখানে কটা মাসের জন্য থাকতে। কিন্তু বুঝতে পারে তা সম্ভব নয়। তারও ত নিজের সংসার আছে।

কল্যাণের কানে যায় মাধবী মীরাকে বলছে, ছেলে যদি হয় কি নাম রাখবি ভাই!

কল্যাণ ভাবে, যত সব পাগলামি! ছেলে! আগে সে সামলে নিক তবে ত।

দরজার ফাঁকে মীরার মুখখানা দেখা যায়, হাসিতে উজ্জ্বল। এক ঝলক রোদ এসে তার স্বাভাবিক গৌর বর্ণকে রক্তিম করে তুলেছে। গলার কাছে সাড়ীর লাল পাড়টা জ্বল জ্বল করছে। হঠাৎ কল্যাণের মনে হয়, মীরা আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছে। আপন মনেই ভাবে, হবেই ত। এ সব জিনিষ উপেক্ষা করলে এমনি হয়। কি এমন হয়েছিল তাকে আগে জানাতে! নাঃ, আচ্ছা সব ছেলে মানুষের পাল্লায় সে পড়েছে!

মীরা তখন মাধবীকে বলছে, ওকে জানিয়েছিস যখন, তখন দেখনা আমার কি অবস্থা করে, যে ব্যস্ত মানুষ!

কল্যাণ মনে মনে বলে, ঠিক, কিন্তু একটু কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকত!

মাধবী মীরাকে জবাব দিলে, আহা, এমন অস্বাভাবিক কিছু হচ্ছে, যে তার জন্যে খুব ব্যস্ত হতে হবে? সবারই ত এমন হয়।

কল্যাণের ইচ্ছা করে চেঁচিয়ে বলে, সব জিনিষ বুঝবার ক্ষমতা যদি তোমাদের থাকত, তা হলে এমনটি আর হতে দিতে না। এখন যা কিছু হাঙ্গামা সবই ত আমাকে একলাই ভোগ করতে হবে।

কিন্তু একটু একটু করে প্রথম আবেগটা কেটে গেলে কল্যাণ ভাবতে পারে, মাধবীর কথাটা নিতান্ত বাজে নয়: সে যাকে একটা প্রকাণ্ড কিছু ভাবছে নারীর কাছে সেটা ত সত্যই স্বাভাবিক। তবু একজন ডাক্তারের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করা যে বিশেষ প্রয়োজন তা সে অস্বীকার করতে পারে না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সে মনে মনে বলে, কি দুর্ভাবনাই যে হয়েছিল! তবু এ সম্বন্ধে মনটা তার একেবারে পরিস্কার হয় না, খুঁৎখুঁতানি থেকেই যায়।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে কল্যাণের সমস্ত চিন্তার ধারা অন্য পথে যাত্রা করে। ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা একদিন বাদে করলেও চলতে পারে। কিন্তু এটা যে আজ না করলেই নয়, মীরার জীবনে আসেছ একটা প্রকাণ্ড আবর্ত্তন। তাদের বিবাহের ত্রৈবার্ষিক জয়ন্তীর মীরার সঙ্গে চতুঃবার্ষিক উৎসবের মীরার অনেকখানি প্রভেদ থাকবে। আজকের মীরাকে সে হয়ত আর সমস্ত জীবনের মধ্যে অন্বেষণ করে পাবে না। এতদিন মীরা ছিল কতকটা অসম্পূর্ণ, আজ সে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে। এতবড় একটা গৌরবের দিনের স্মৃতি চিরস্মরণীয় করতে হবে তাকে। মনে হয়, সমস্ত পৃথিবীটাকে উজাড় করে এনে দেয় মীরার কাছে।

অনেকক্ষণ স্বপ্নজাল রচনা করে কল্যাণ। ভাবনার তার সমাপ্তি হতে চায় না। মীরা তার রিক্ত জীবনের অমূল্য সম্পদ। তাই তাকে নিয়ে তার এত ব্যস্ততা।

বারাণ্ডায় মাধবী ও মীরার গল্প শেষ হয় না। ওদের হাসি কলরোল জরাজীর্ণ বাড়ীখানাকে মুখর করে তুলেছে।

বিকালের পড়ন্ত রোদ ঘরের মধ্যে এসে পড়ছে। কল্যাণের খেয়াল হয় গোধূলি লগ্নে তাদের বিবাহ হয়েছিল। অমনি

তাড়াতাড়ি গায়ে একটা জামা লাগাতে লাগাতে সে বেরিয়ে পড়ে। গোধূলির দেরী নেই বিশেষ। আজ ফুলের গহনা দিয়ে সে সাজাবে মীরাকে, উপহার দেবে সুন্দর একখানা সিল্কের সাড়ী। এ পর্য্যন্ত কিছুই তার দেওয়ার সামর্থ্য হয় নি'। আজ যে করেই হোক মীরাকে সে সুন্দর করে ভূষিত করবে।

সিঁড়ি দিয়ে হণ হণ করে কল্যাণ নেমে যায়। পিছন থেকে মীরা প্রশ্ন করে, কোন রাজ্য জয় করতে যাওয়া হচ্ছে শুনি ?

জবাব দেবার অবসর তখন কল্যাণের নেই। শুধু বলে, কাজ আছে।

মাধবী চেঁচিয়ে বলে, শীগগির ফির কিন্তু।

কথাটা কল্যাণের কাণে যায় না। মীরা হাসতে হাসতে বলে, লাউড স্পীকার হলে কথাটা শোনা যেত। তারপর আঙুল দিয়ে গলির মোড়ে কল্যাণকে দেখিয়ে বলে, কতদূর এর মধ্যে গেছে দেখছিস মাধু ! চলা নয়ত ওড়া।

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে পথ চলে কল্যাণ। কতদূর হেঁটে এসেছ হুঁস থাকে না। হঠাৎ একটা কাপড়ের দোকানের সামনে এসে সে থমকে দাঁড়ায়। কাপড়ের অভাব নেই। কল্যাণের একসঙ্গে অনেকগুলোই পছন্দ হয়ে যায়। যাক্, সাড়ী কেনা হয়ে গেলে ফুলের গহনা কিনতে তার খুব বেশী দেরী হবে না। সন্ধ্যার মধ্যেই সে বাড়ী ফিরতে পারে। মীরা ও মাধবী দুজনেই অবাক হয়ে যাবে নিশ্চয়ই।

হঠাৎ অন্যমনস্কভাবে পকেটে হাত দিতেই তার মুখটা ম্লান হয়ে যায়, সঙ্গে আছে মাত্র আট আনা পয়সা ! নিজের গলা নিজে টিপে ধরতে তার ইচ্ছা হয়। স্তব্ধ হয়ে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। গ্লাসকেশের মধ্যে রঙিন সাড়ী-গুলো যেন ক্রুদ্ধ সাপের মত ফণা উঁচিয়ে কামড়াতে আসে। একবার তার মনে হয় বাড়ী ফিরে মীরার কাছ থেকে কটা টাকা নিয়ে আসে, কিন্তু কোথায় পাবে মীরা ? মাসের শেষ, বড়জোর দু'টো টাকা সে একসঙ্গে বার করতে পারে।

পায়ের তলায় পৃথিবীটা যেন হঠাৎ সরে যেতে থাকে। পড়তে পড়তে সে একটা গ্যাসপোষ্ট ধরে কোন রকমে সামলে নেয়। টাকার যে এত প্রয়োজন আগে সে ভাবতে পারে নি'। আজ সে বুঝতে পারে কেন লোকে চুরি করে, চুরি ? প্রয়োজন হলে সে তাও করতে রাজী আছে, এখনি, এই মুহূর্ত্তে !

আবোল তাবোল অনেক চিন্তা তার মাথাটাকে তোল-পাড় করে দেয়। যেন দৈত্য-দানবের যুদ্ধ ! রাস্তার লোক হয়ত ভাবে পাগল। তা ভাবুক। পাগল হয়ে যেতে তার হয়ত আর খুব বেশী দেরী নেই ! গ্যাসপোষ্টটা ধরেই সে দাঁড়িয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ এমনিভাবেই কাটে। হঠাৎ কাঁধের উপর একটা মৃদু স্পর্শ পেয়ে সে চমকে ওঠে। অনেকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে ক্ষীণভাবে বলে, ও অজিত ! অজিত তার বহু পুরাতন বন্ধু। অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই।

অজিত বলে, চিনতে পারলি ? কিন্তু তুই—

কল্যাণ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে, কিছু নয়, এমনি ! হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল, তাই। নিজের দৈন্যকে অপরের সামনে প্রকাশ হতে দিতে সে কিছুতেই চায় না।

অজিত বলে, চল না, হাঁটতে হাঁটতে একটু গল্প করা যাবে। তারপর ?

কল্যাণের দৃষ্টিটা আবার গ্লাস-কেসের উপর গিয়ে পড়ে, ব্যথাতুর হৃদয় নিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত সে অজিতের সঙ্গে এগিয়ে যায় খানিকটা, তারপর হঠাৎ থেমে যায়। মাথায় তার একটা বুদ্ধি আসে। বলে, শরীরটা ভাল লাগছে না রে, একেবারে একটা ডাক্তার দেখিয়েই যাই। হঠাৎ মাথা-ঘোরা ভাল লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে না, কয়েকটা টাকা দিতে পারিস অজিত, ডাক্তারের ফি-টা এখনই দিয়ে যাব তা হলে ? বাড়ী গিয়েই তোকে টাকাটা পাঠিয়ে দেব।

কথা কটা বলে ফেলেই কল্যাণের নিজের প্রতি ঘৃণা হয়। ছিঃ ছিঃ, এত নীচ সে হতে পেরেছে ? বন্ধুর সঙ্গে প্রতারণা করতে তার একটুও বাধল না ? তাকে ত বলতে পারত কেন তার টাকা চাই, কিন্তু তা প্রায় অসম্ভব। নিজের দৈন্য সে কাউকেও জানাতে পারে না। না—

হঠাৎ উন্মাদের মত অজিত হেসে ওঠে, কল্যাণের বুকটা কাঁপতে থাকে। উঃ, কি হাসি ! যেন নরকপুরীর প্রেতগুলো হঠাৎ ছাড়া পেয়ে গেছে !

হাসি আসে, কিন্তু অজিতের মুখের উপর ব্যঙ্গের ছায়া থেকেই যায়। বলে, ভাল ব্যাঙ্কার ধরেছিস রে! কিন্তু বুদ্ধির প্রশংসা ত তোর চিরদিনই ছিল। হঠাৎ এমন বোকা হলি কেন? দেখছিস না, পায়ে জুতো নেই, ধুতিখানা নানারকম ভাবে ঘুরিয়ে পরেও ছেঁড়াগুলো লুকানো যায়নি, মুখে মাসাধিক কাল ক্ষুরের স্পর্শ নেই। আজ খাওয়াও হয়নি। কিন্তু সে কথা ত আর পরকে জানান যায় না। তাই আমিই ত তোকে বলতে যাচ্ছিলাম, যে ট্রামে আসতে আসতে হঠাৎ ব্যাগটা কে তুলে নিয়েছে। কয়েকটা জিনিষ না কিনে বাড়ী গেলে কিছুতেই চলবে না। কিছু টাকা দিতে পারিস কল্যাণ? নয়ত অন্ততঃ চার আনা পয়সা দে। ট্রামে করে বাড়ী গিয়ে আবার টাকা নিয়ে আসি। কিন্তু তুই চার মানালি কল্যাণ!

অজিত আবার আগের মত হেসে ওঠে ভীষণ। কল্যাণের অসহ্য ঠেকে। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে চার আনা পয়সা বার করে অজিতকে দেয়। ক্রুদ্ধ স্বরে বলে, এই নে যা' পালা বলছি। আমার সামনে থেকে এখুনি সরে পড়। না, আর একটী কথাও নয়।

অজিত কি ভাবে সেই জানে, কিন্তু দাঁড়াবার তার ইচ্ছা থাকলেও সামর্থ্য ছিল না। সমস্ত দিন না খেয়ে রয়েছে, চার আনা পয়সা তার কাছে তুচ্ছ নয়।

কল্যাণের মেজাজটা গরমই থেকে যায়। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বলে, রাস্কেল!

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকার মত যথেষ্ট সময় তার নেই। তার আফিসের বড়বাবু থাকেন ভবানীপুরে, অনেকটা দূর। কিন্তু যেতেই হবে তাকে, শেষ চেষ্টা! বড়বাবুর কাছে কয়েকটা টাকা ধার পাওয়া যাবে হয়ত, সে সুদই নেবে নয়, যত ইচ্ছা। বড় বাবুর পায়ে ধরতেও সে রাজী আছে!

তাড়াতাড়ি সে একটা চলন্ত ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে লাফিয়ে ওঠে। যাত্রীরা হৈ হৈ করে ওঠে, গেল গেল! কণ্ডাক্টার ভাঙ্গা বাংলায় তীব্র প্রতিবাদ করে, আদমি লোক আপনা দোষে মরেগা। আউর ধোতো দোষ হোবে হামার, কোম্পানির ছুটিশ হাছে, ইত্যাদি।

কল্যাণের তখন সে সব কথায় কান দেবার অবসর নেই, হয়ত কিছু শোনেই না। লোকের ঘাড়ে গিয়েই বসে, ধাক্কা এবং গালাগালি খেয়ে উঠে দাঁড়ায়। কণ্ডাক্টারকে পয়সা দিতে গিয়ে প্রায় বলেই ফেলে, বড় বাবুর বাড়ী। সামলে নিয়ে বলে, ভবানীপুর।

কল্যাণের মনে হয় ট্রাম যেন চলছেই না। উঃ কতদূর ভবানীপুর!

বড়বাবুর বাসায় পৌঁছে শোনে, তিনি বাড়ী নেই। ছুটির দিন তিনি কলকাতায় থাকেন না। কল্যাণের সমস্ত আশা একসঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। কি কঠোর পরিহাস! তার মনে হয় সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে তার মত নিরাশ্রয় অসহায় আর কেহ নেই। শুধু নিতান্ত নিঃসম্বল নয় সে, সবার পরিত্যক্ত।

ফেরার পথে তাড়াতাড়ি থাকে না। যখন হোক বাড়ী ফিরলেই চলবে। রাত্রি অবশ্য কম হয়নি'। কিন্তু তাতে তার কি আসে যায়!

• সোজা পথ ছেড়ে দিয়ে সে ঘুরেই চলে। যতটা সময় কাটান যায়। কিন্তু হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় সে একটু পরেই অসম্ভব দ্রুত চলতে আরম্ভ করে। মাধবীর স্বামী নীতেশবাবুর কাছে সে ত টাকা পেতে পারে! অন্য সময় হলে এমন কথা ভাবতে তার লজ্জায় মাথা কাটা যেত, কিন্তু আজ সে নিজের উপর খুব রাগ করে, এই সহজ কথাটা তার আগে মনে হয়নি বলে। যত রাতই হোক নীতেশবাবুর কাছে তাকে যেতেই হবে, লজ্জা করবার মত যথেষ্ট অবসর বা ঐশ্বর্য্য তার নেই।

মনটা তার উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। যাক্, একটা দারুণ সঙ্কট থেকে সে পরিত্রাণ পাবে!

হেঁটে নয়, এক রকম ছুটেই চলে।

গলির মোড়ে একটা মদের দোকানের সামনে গোলমাল করছে অনেক লোক। কল্যাণ মনে মনে তাদের ঘৃণা না করে পারে না। কেহ কাঁদছে, কেহ হাসছে। কল্যাণকে প্রায় ছুটতে দেখে অনেক রকম ইঙ্গিত করে তারা। এই নরকের মধ্যে থেকে পালাবার জন্যে কল্যাণ রীতিমত ছুটতে আরম্ভ করে দেয়। আর একটা সঙ্কীর্ণ অন্ধকার গলির মধ্যে পৌঁছেও সে থামে না।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় কল্যাণ একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে নর্দ্দমার মধ্যে, তারপর আর সে কিছু জানে না।

রিক্স-ওয়ালার দোষ নেই। বেচারা তার মাতাল আরোহীর জেদের জন্য পূর্ণ বেগে ছুটছিল। অন্ধকার গলির মধ্যে সে কল্যাণকে দেখতে পায়নি।

* * * *

পরের দিন বিকালে যখন তার চেতনা সঞ্চার হয় তখন সে দেখে একটা অচেনা স্থানে সর্ব্বাঙ্গে পটি জড়িয়ে সে শুয়ে আছে, সারা গায়ে অসম্ভব ব্যথা, মাথাটা উঁচু করারও ক্ষমতা নেই।

মীরা এবং মাধবীকে হাসপাতালের ডাক্তারেরা তার কাছে আসতে দেয়নি। পাছে চেতনা সঞ্চারের পর তাদের দেখে সে আবার মূর্চ্ছিত হয় এই ভয়ে। নীতেশবাবু একলাই বসে আছেন।

সে রাত্রিটা মীরার কেমন করে কেটেছিল কে জানে!

কল্যাণ কিন্তু তখনও বুঝতে পারে না তার কি হয়েছে।

শ্রীপ্রসাদকুমার বসু

সুরের প্রাণ

শ্রীমতী বাসন্তী সেন

গভীর রজনী আমরা দু'জনে
বসিয়াছি কাছাকাছি—
আলো ও ছায়ার লীলা হেরিবারে
নীরব হইয়া আছি।
অদূরে ধূসর অশোক শাখায়
পাতাগুলি ওঠে কাঁপি
এমন অতুল ক্ষণেতে নীরবে
সাধ জাগে নিশি যাপি।
দু'জনে নীরব শুনিতেছি মোরা
মোদের প্রাণের ধ্বনি,
ঝরাণো পাতার বিদায় ভাষণে
বাতাস উঠেছে রণি!

নীরবতা ভাঙ্গি তুমি বলিয়াছ
যে কথা পরাণে জাগে—
ভুলে যাব সেই সুরে আপনারে
বুঝিতে পারিনি আগে।
বাহিরে হেরিনু অক্ষয় জ্যোতিঃ
গৃহেতে নিবিড় প্রীতি,—
এই দুই সুরে গাহিয়া চলিব
আমার গোপন গীতি।
তুমি যদি প্রিয় রহ পাশে মোর
পাই যে খুঁজিয়া সুর,
তুমি মোর প্রাণে বাজায়েছো বীণা
রাগিণীতে ভরপুর।

বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্র

অধ্যাপিকা শ্রীমতী কল্যাণী ভট্টাচার্য এম্-এ

১

এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা আজকালকার দিনে বড় বিপজ্জনক। বঙ্কিমকে নিয়ে সম্প্রতি সমালোচকমহলে যে লাঠালাঠি চলেছে তাতে এ পথে পদক্ষেপ করতে সাহস হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সমস্ত আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন সেগুলি আধুনিক যুগে গ্রাহ্য কিনা এই নিয়ে মতভেদের সৃষ্টি হচ্ছে, হয় তাঁকে গুরু বলে বরণ করে নিতে হবে নয়ত দিতে হবে মহাকালের অতল গর্ভে বিসর্জন।

আবার শরৎচন্দ্র যা বলেছেন তা আমাদের আজকের জীবনের ভিত্তিমূলে আঘাত করছে, আজকের সমাজের সমস্যাগুলি তাঁর লেখনী থেকে মূর্ত হয়ে উঠেছে; কাজেই তিনি মেয়েদের বিষয়ে যা বলেছেন তাতে সকলকে বিচলিত হতে হয়, সমালোচকের মতামত আলোড়িত হয়ে উঠতে চায়। কেউবা তাঁর উপন্যাসে জীবনযাত্রার নূতন বেদ পেয়ে তাঁকে নমস্কার করছেন, কেউবা অশ্লীলতা ও কদর্যতার জন্য তাঁকে অপাংক্তেয় করে দিতে চান।

পাঠকমণ্ডলীর ভিন্ন রুচির প্রতি দৃষ্টি রেখে কমল নারীর আদর্শ কিনা, ভ্রমর সৎপত্নী কিনা, রোহিনীর পাপের জন্য কে কতটা দায়ী, প্রেমের আদর্শ আয়েসা না সাবিত্রী, এই সব ভয়াবহ বিষয়ের আলোচনা করব না: যতদূর সম্ভব মতভেদের সম্ভাবনা এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করব।

শরৎচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে প্রভেদ বিস্তর; সেই প্রভেদ নারীচরিত্রচিত্রণের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করেছে। আমি নারী চরিত্রগুলির পৃথক সমালোচনা না করে' যে প্রভেদের ফলে দু'জনে নারীকে দু'দিক থেকে দেখতে পেয়েছেন তার আলোচনা করব।

২

বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে উদ্ভূত হয়েছেন, এঁদের জীবনযাত্রার প্রণালীও ভিন্ন।

বঙ্কিম সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, সমাজের চূড়ামণি, "old order" এর অনুকূল স্রোতে তিনি তরণী বেয়ে গেছেন, তাঁর কাছে কে বিদ্রোহ আশা করবে? পেটের ক্ষুধায় যিনি কখনো জ্বলেন নি, স্নেহের ক্ষুধা যাঁর উদ্রিক্ত হবার আগেই মিটেছে, ছন্নছাড়াব জীবনযাত্রা যাঁর কাছে অপরিচিত তিনি যে মানব জীবনকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ দেখতে চাইবেন তাতে আর বিচিত্র কি?

শরৎচন্দ্রের জীবন আমাদের কাছে অন্ধকারে আবৃত। তবু এটুকু আমাদের বুঝতে বাকী থাকে না যে লক্ষ্মীর তিনি আদরের সন্তান নন, কাব্যলক্ষ্মী তাঁকে যে কোন বনের অন্ধকার ছায়ায় বর দিয়ে থাকুন না কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁকে বহু দিন পর্যন্ত অবজ্ঞাই করে এসেছেন। নিয়মের কঠিন পাশে যাঁর জীবনের ঘণ্টা মিনিট কেউ বেঁধে দেয় নি তিনি যে নিয়মের স্বপক্ষে বলবেন না তা আশ্চর্য নয়। মানবজীবনের নিম্নতম অবস্থা অবধি যিনি নেমে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছেন তাঁর লেখায় যে মানুষের সভ্যতা সমাজ-বহির্ভূত নগ্নমূর্ত্তি প্রকাশ পাবে তাও বিচিত্র নয়।

রাজনৈতিক বিপ্লব সমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা করে একটা জ্ঞান আমাদের হয়েছে যে উপস্থিত নিয়ম যার পক্ষে সুখকর সে সহজে বিদ্রোহ করে না, বিদ্রোহ করে যে উৎপীড়িত এবং অত্যাচারিত। আমাদের সমাজের যে অংশ ঐশ্বর্যে এবং রাজসম্মানে সৌভাগ্যশালী সেখানে

বঙ্কিমের জন্ম, আর শরতের উদয় সমাজের সেই স্তর হতে যারা উপরোক্ত দলের ভোগের খোরাক জোটাতে জোটাতে নিঃস্ব হতে চলেছে।

বঙ্কিম মহামানব, দেশপ্রাণ, দয়ার আধার, তিনি যত ঊর্ধ্বেই অবস্থিত হোন না কেন দেশমাতার দুঃখ, দেশের জনসাধারণের দৈন্য, দেশের নারীর লাঞ্ছনা তাঁকে দুঃখ দেবে নিশ্চয়ই। তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রের মধ্যেও দুর্বলতার ফাঁক আছে বলেই পাপিষ্ঠা রোহিনীর জন্য তিনি দুফোঁটা চোখের জল ফেলেছেন, জেবউন্নিসাকে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে প্রেমের স্বর্গলোকে স্থান দিয়েছেন, দস্যুদ্বারা অপহৃতা ইন্দিরাকে জাল জুয়াচুরি করেও শ্বশুরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়েছেন, যখন সন্তানদলের গুরুর প্রচণ্ড নির্দেশে বঙ্গনারী দেশসেবায় স্বামীর সহধর্মিনীপদ থেকে বিচ্যুত হচ্ছিল তখন শান্তির দৃপ্ত প্রতিবাদে তাঁর যুক্তি হতবাক হয়েছে; কিন্তু এ নিছক দয়াধর্ম, এর মধ্যে বিদ্রোহের জ্বালা নাই, সমাজ বিধানের উপর কটাক্ষ নাই।

অপরদিকে শরৎচন্দ্র—সমাজবিধ্বংসী, দুশ্চরিত্রতার সমর্থক বলে যাঁর খ্যাতি। নারীর ত্যাগ, সংযম, নিষ্ঠার প্রতি তাঁর টান কম নয়, সনাতন হিন্দু ধর্মের আচার বিচার তাঁর কাছে ছোট নয়, তবু তিনি বিদ্রোহী। পাপ প্রলোভনের নগ্নমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন বলেই তিনি পাপের চিত্র হুবহু আঁকতে পেরেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও দেখিয়েছেন যে পঙ্কজিনীর জন্ম পঙ্কে।

তাই রোহিনী যেমন পাপের পথে পা দিয়ে তার নারীত্বের সমুদয় অংশে জলাঞ্জলি দিয়েছে কিরণময়ী তেমন পারে নি। সে বাহিরে দুশ্চরিত্রা, কুলত্যাগিনী, কিন্তু অন্তরে যে দেবতা প্রতিষ্ঠিত তার মূর্তি মুহূর্তের তরেও ম্লান হয়নি, যেন হিরণ্যকশিপুর বৈরিভাবের সাধনা। তারপরে চন্দ্রমুখী, সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী এরা সতীত্বের জয়টীকা ললাটে নিয়ে আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়: মতিবিবিও একদিন তার হারানো স্বামীর ভালবাসা ফিরে চেয়েছিল কিন্তু ভালো বলতে যা বোঝায় তা সে কোনদিন হ'তে পারল না।

অন্ধ সমাজ বিধানের প্রতি শরৎচন্দ্রের এই যে বিদ্রোহ তার রেশ বঙ্কিমের রচনায় পাওয়া যায় না। প্রতাপ-শৈবলিনীর বাল্যপ্রেমের ব্যর্থতা দেখিয়ে বঙ্কিম মন্তব্য করেছেন বুঝিবা বাল্যপ্রেমে অভিসম্পাত আছে; শরৎও পার্ব্বতী-দেবদাসের বাল্যপ্রেমের চিত্র দেখিয়েছেন, কিন্তু অভিসম্পাত যে কোথা থেকে এবং কার দোষে এল তা আমাদের জানতে বাকী থাকে না।

বিদ্রোহের আর এক সোপান ঊর্ধ্বে অভয়া আর কমলকে পাই। শান্তি যেমন ক'রে স্বামী সত্যানন্দের বিধানকে মূক করে দিয়েছিল, ঠিক তেমনি করেই অভয়া শরৎচন্দ্রের পাপপুণ্য বিচারশক্তিকে মূক করেছে, বুঝতে পারেন নি বলেই তিনি বিচার না করে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। আর কমল,—সে তো কোন কালের কোন বিধানের কাছেই ধরা দিল না।

শরৎসাহিত্য বঞ্চিতের লাঞ্ছিত, উৎপীড়িতার দুঃখ জ্বালা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন বলেই এত উজ্জ্বলভাবে ফোটাতে পেরেছেন। অপর পক্ষে নারীর আর একটা দিক তিনি অস্পষ্ট রাখলেন। তিনি শিক্ষিতা মেয়েদের স্বপক্ষে বলবার বিশেষ কিছু পাননি: বস্তুত মেয়েদের বুদ্ধি-বৃত্তি যে অবাঞ্ছনীয় এই কথাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনে হয়। আমাদের চোখের সামনে যে বিজয়া, অচলা, সরোজিনী, মনোরমার দল তিনি তুলে ধরেছেন তারা ললিতা, মৃণাল, কমল এদের কাছে ম্লান হয়ে যায়।

এ বিষয়ে বঙ্কিম ও শরৎ এক মত, "He for God and She for God in him." এই ভাবের অনুসরণ করে বঙ্কিম প্রফুল্লকে শিক্ষা দেবার সময়ে একমাত্র ভক্তি ছাড়া অন্য কোন বিষয়ই "অল্প একটু"র বেশী শেখাতে সাহস পাননি: আবার শরৎচন্দ্রও বন্দনা জামাজুতো ছেড়ে রান্না ঘরে না ঢোকা পর্য্যন্ত সুধীর, অশোক ইত্যাদির কণ্টকে জর্জরিত হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারেন নি।

বঙ্কিমের সময়ে মেয়েদের শিক্ষা বা স্বাতন্ত্র্যের দাবী উচ্চারিত হয়নি, তিনি অযাচিত ভাবে যা দিয়েছেন তাই ঢের; কিন্তু শরৎ এ দাবী দেখেও বিনাবিচারে বাতিল করেছেন। কয়েক বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাধারণ মেয়ের হয়ে যে আর্জি তাঁর কাছে পেশ করেছিলেন আজও তা মঞ্জুর হল না।

শরৎচন্দ্রের প্রখর সত্যদৃষ্টি চিনি বলেই বলতে সাহস হচ্ছে যে সমাজের এই বিশেষ স্তরের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত নন বলেই নারী চরিত্রের এই দিকটা তাঁর হাতে ফুটে ওঠেনি। এদিকের পরিচয়টা যে অসম্পূর্ণ রইল তাতে দুর্ভাগ্য তাঁর চেয়ে নারীরই বেশী।

৩

বঙ্কিম ও শরৎ দুই যুগের মানুষ। বাঙলা দেশে যেমন তাঁরা দুই পৃথক যুগে জন্মেছেন তেমনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের দুটি আলাদা যুগ তাঁদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

বঙ্কিম যে যুগের লেখক তখন ইংরাজী সাহিত্যের ভিক্টোরিয়া যুগের প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে প্রবল। আত্ম-নিগ্রহ ও আত্মদমনই তখনকার আদর্শ, Spencer, Mill প্রমুখ তাত্ত্বিকদের শাসনে ছেলে মানুষ করার প্রকৃষ্ট উপায় হ'ল তার দেহকে সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত করে কঠিন করে তোলা, মন্ত্র ছিল, "Spare the rod and spoil the child." তখন মেয়েদের না খেয়ে খেয়ে ক্ষীণ, পাণ্ডুর আর স্বর্গীয়ভাব সম্পন্ন হ'তে হ'ত। তখন Comteর সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণ পরিণতির ধর্ম্ম দেশবিদেশে সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। তখনকার ইংরেজ সমাজ tabooতে ভরা ছিল আর মেয়েদের উপর ছিল pruderyর আধিপত্য।

অপর পক্ষে শরৎচন্দ্র যখন লিখেছেন তখন ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ এক বিপরীত অংশ আমাদের দেশে এসে পৌচেছে। তখন সন্তানকে প্রকৃতির কোলে অবাধ স্বাধীনতায় মানুষ করে তোলাই প্রকৃষ্ট নিয়ম বলে গ্রাহ্য হয়েছে; একে একে মেয়েদের লজ্জার অনেক আবরণই খসে পড়েছে; সংযমের চেয়ে আত্মপ্রকাশেরই আদর বেশী হয়েছে; দেহধর্ম্মই মানুষের সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম বলে গণ্য হয়েছে; পাপ আর আগের মত ভয়াবহ রূপ ধারণ ক'রছে না।

দুই যুগের যে দুটো ভিন্ন ধর্ম্মের উল্লেখ করলাম তার একটার প্রভাব বঙ্কিম ও অন্যটার প্রভাব শরৎচন্দ্রের উপর দেখতে পাই। এ দুইয়ের ভালমন্দ বিচারের ধৃষ্টতা করবনা, শুধু যা দেখেছি তারই উল্লেখ করছি।

বঙ্কিম নারীকে বড় করেছেন ত্যাগে, সংযমে, বাঞ্ছনীয় করেছেন দুর্ব্বলতায়; প্রফুল্লর মধ্যে নারীর শিক্ষার যে আদর্শ প্রকাশিত হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে কোম্‌ত্‌-দর্শনের অনু-মোদিত। লবঙ্গলতা তার বৃদ্ধস্বামীর সেবাতেই নারীত্বের চরম সাফল্য লাভ করেছে: সেটা যে অসম্ভব নয় তা শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন মৃণালের চরিত্রে; কিন্তু অন্যরকম হ'লেও যে মহা-পাপ হবে না তার আভাস দিয়েছেন পার্ব্বতীর চরিত্রে—বৃদ্ধ স্বামীর সেবার কোন ত্রুটি সে কোনদিন ঘটায়নি, কিন্তু যখন তার বুভুক্ষু হৃদয় বিশ্বের সকল পীড়িতের সেবায় নিজের স্নেহ-ক্ষুধা মিটাতে চায় তখনই আমরা বুঝি তার নারীত্বের পূর্ণ পরিণতি কোথায় ব্যাহত হয়েছে।

শরৎচন্দ্র বলেছেন মাতৃত্বেই নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ; এই পরিপূর্ণতায় যারা বঞ্চিত হল তারা হয় বিদ্রোহ করল, যেমন অভয়া; নয়তো বিশ্বের সকল সন্তানের মাতৃপদে অভিষিক্ত হয়ে অন্তরের তৃষ্ণা মিটাবার চেষ্টা করতে লাগল, যেমন রাজলক্ষ্মী, পার্ব্বতী, চন্দ্রমুখী। এ ক্ষেত্রে কমল চরিত্র দল ছাড়া হয়েছে, সেখানেই তার মস্ত গলদ।

এ ছাড়া নারীর মাতৃমূর্ত্তি, স্নেহময়ী ভগ্নীর মূর্ত্তি দেখিয়ে শরৎ নারীর সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করেছেন, সত্যই যেন তাঁর চোখে বাংলার প্রত্যেক ঘরে মা-বোন ধরা দিয়েছে। Comteর সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের সাধক হয়েও বঙ্কিমের নারীত্বের সংজ্ঞা সঙ্কীর্ণতর, উপন্যাসের পতিভক্তি এবং রোম্যান্সের রসদ জোগাবার জন্যই যেন নারীর প্রয়োজন, তার হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগের বিচিত্র ধারার কোন সন্ধানই তিনি রাখেন নি।

শরৎচন্দ্রের সাহসের একটা পরিচয় এই যে নারীর দৈহিক পাপকে তিনি অতি বড় করে দেখেন নি। মনের পাপই আসল পাপ; বাইরের একটা দুর্ঘটনার জন্য কাউকে তিনি আজীবন লাঞ্ছিতা করে রাখতে চাননি; নারী পতিতা হলেই যে পাপাচারিণী হবে এমন কোন কথা তিনি স্বীকার করেননি, শরৎচন্দ্রের জীবনের সত্যদিদৃক্ষার সঙ্গে এর কতটা সম্বন্ধ আছে জানি না, কিন্তু একথা জানি যে পশ্চিমের যে পরিবর্ত্তিত প্রভাবের উল্লেখ করেছি, এই সাহসের কথাটি তার অন্তর্গত।

আরো দুটো কথা শরৎচন্দ্র বলেছেন যার উদ্ভব বঙ্কিমের যুগে হয়নি। অভয়ার চরিত্র দিয়ে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, যে স্বামী অযোগ্য, যাকে ভালবাসা সম্ভব নয়, তার সহবাস করা গণিকার বৃত্তি; কথাটা ভালোমন্দ যাই হোক Bertrand Russel প্রমুখ মনীষীদের মতবাদের ছায়া এতে সুস্পষ্ট।

আবার কমলের মুখ দিয়ে যা প্রচার করেছেন, সে তত্ত্বও আমাদের দেশের নয়। কমলের শিরায় প্রবাহিত বিলাতী রক্তই কি তাঁর ঋণের স্বীকারোক্তি নয়?

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে সংযত মিতবাক্ ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব বাঙালীর উপর প্রবল ছিল; কিন্তু শরৎসাহিত্যের যুগে উচ্ছ্বাসপ্রবল কন্টিনেন্টাল উপন্যাসের প্রাবল্যই বেশী।

এই বিভিন্ন প্রভাবের ফলেই হোক্ বা যে কারণেই হোক্,—বঙ্কিমের নারীরা পাপপুণ্য যে কোন কাজেই লিপ্ত থাকুক না কেন তাদের আচার ব্যবহার সর্বত্র সংযত; শৈবলিনী মরাগাঙে জোয়ার দেখেও উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হয়নি, রোহিনীর মত লজ্জাহীনার মুখেও ভাবের আতিশয্য প্রকাশ পায়নি। অপর পক্ষে শরৎচন্দ্রের নায়িকারা প্রায় উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়ে সব কাজ করছে; তাদের রাগ, অনুরাগ, দুঃখ, আনন্দ সবকিছুরই বাহ্যিক প্রকাশ আবেগময়। জ্ঞানদা সবার সম্মুখে অতুলের পায়ে মাথা খুঁড়তে পারে, বিজয়া বিলাসকে সর্বসমক্ষে অপমান করবার মত আত্ম-বিস্মৃত হয়, মেজদিদি নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘাত প্রতিঘাতের অনুসারে তার স্নেহের পাত্রকে আদর বা অপমান করতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র যে আদর্শ অন্তরে ধারণ করেছিলেন তারই উপদেশ ও উদাহরণ তাঁর উপন্যাসের অনেকগুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। শিক্ষকের আসন গ্রহণ ক'রতে তাঁর কুণ্ঠা হয়নি, বরং তিনি এই ধারণাই পোষণ করতেন যে লোকের শিক্ষার্থে যে লেখনী নিয়োজিত হ'লনা সে লেখনীর শক্তি নিষ্ফল হয়ে গেল।

যে যুগের পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব বঙ্কিমের উপর বিস্তৃত হয়েছিল তা'র মধ্যে আর্টের এই শিক্ষার দিকটা প্রবল। তারপরে যুগ পরিবর্তনে সাহিত্যে শিক্ষকের স্থান উপহাসাস্পদ হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু তাই বলে শিক্ষা দেওয়া বন্ধ হল না: এখনও সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দান চলছে, কিন্তু লেখক এখন শিক্ষকের আসন গ্রহণ করেন না, তিনি করেন propaganda. বঙ্কিম শিক্ষকের আসন গ্রহণ করেছিলেন, শরৎচন্দ্র করেননি কিন্তু তাঁর লেখায় propagandaর অভাব নহে।

৪

সাহিত্যের স্তরভেদে বঙ্কিমকে classic আর শরৎকে romantic সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে। বঙ্কিমের বাধ্যতা, শরতের বিদ্রোহ; বঙ্কিমের সংযম, শরতের স্ফূর্তি, এই বিভেদের প্রতিই নির্দেশ করছে।

বঙ্কিম যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সে আদর্শ অলঙ্ঘ্য, লঙ্ঘনের মাত্রাভেদে শাস্তির তারতম্য ঘটে। আজীবন-বঞ্চিতা রোহিনীর পাপের ফল মৃত্যু, আর শৈবলিনীর পাপের শাস্তি নরকভোগ।

শরৎচন্দ্র পাপের ফল অস্বীকার করেন নি। সাবিত্রীকে তার বঞ্চিত বৈধব্যজীবনের একটি ভুলের জন্য আমরণ তপস্বিনী হয়ে থাকতে হ'ল; অচলা তার অনিচ্ছাকৃত স্বামী ত্যাগের যে দুঃখ পেল তা শৈবলিনীর নরকভোগের চেয়ে কম নয়। রাজলক্ষ্মীকে তার পিয়ারী জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করতে হল' কঠোর ব্রহ্মচর্যের মধ্য দিয়ে। তবু অপর দিকে অভয়া দাঁড়িয়ে আছে তার অসতীত্বের সতীত্বের অক্ষুণ্ণ মহিমা নিয়ে, আর আছে কমল যাকে পুষ্পবিহারিণী ভ্রমরী বলে অবজ্ঞা করা সহজ নয়।

পাপে, পুণ্যে, সতীত্বে, অসতীত্বে নারীর যে বিচিত্র রহস্যময় রূপ শরৎচন্দ্র ফুটিয়েছেন বঙ্কিম তা করেননি। হয়ত বঙ্কিমের যুগে "নারী জাগরণের" প্রথম অবস্থায় নারীর স্থান সম্বন্ধে এত সূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজন হয়নি।

নারীর ধর্ম পুরুষের ধর্মের মধ্যেই নিহিত আছে এই বিশ্বাস বঙ্কিমের রচনায় সর্বত্র প্রকাশ; কিন্তু শরৎচন্দ্রের নারী তার সত্তা হারায় নি। স্ত্রীর স্বামীত্যাগ যেমন নিষ্ফল, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, চন্দ্রমুখীর সংযত ভালোবাসা তেমনি

সার্থকতামণ্ডিত। ভ্রমর শুধু একবার নিজের আহত নারী মহিমার গর্ব প্রকাশ করেছিল বটে কিন্তু অপর দিকে সুশিক্ষিতা দেবী চৌধুরাণী স্বামীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার আগে কোন মহৎ কাজেই সুখ পায়নি। বঙ্কিমের নারীর আত্মলোপ বিসর্জনেই পর্যবসিত হয় আর শরতের নারীর আত্মলোপ আত্মলাভের সোপান।

বঙ্কিম ও শরতের দৃষ্টিভঙ্গির একটা প্রভেদ বিমলা ও অন্নদাদিদির চরিত্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এরা দুজনেই সতী হয়েও ভাগ্যদোষে কুলটা বলে জগতের সামনে পরিচিত হয়েছিল; বিমলার সতীত্ব শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হল, কিন্তু রহস্যময়ী অন্নদা সতীশ্রেষ্ঠা হয়েও পৃথিবীর বিচারশালায় কোন সুবিচারই পেল না।

৫

বঙ্কিম কোথাও বিচলিত বা বিক্ষিপ্ত হন নি; তিনি আদর্শ স্থাপন করে ধীরভাবে তার অনুসরণ করেছেন, আর শরৎচন্দ্র সমস্ত জীবনময় কেবল খুঁজেই বেড়ালেন। একজন যোগস্থ হয়ে বিশ্বনিয়মের মঙ্গলমার্গ বেছে নিয়েছেন, অন্যজন বাছতে পারেন নি বলেই কেবল প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেছেন।

শরৎচন্দ্র সতীত্বের যে আদর্শ নিয়ে সুরু করেছিলেন তার মধ্যে পরিচিত মামুলী ছন্দই দেখি—জ্ঞানদা, ললিতা, এরাই এর আদর্শ।

এরপর নারীর প্রেয়সীরূপ ছাড়িয়ে মা-বোনের রূপও তাঁর চোখে পড়ল, এখানে পাই বিন্দু, নারায়ণী মেজদিদিকে; পাই সুনন্দাকে উনিশ বছর বয়সে সতেরো বছরের ছেলের মা হবার মত শক্তি যার ছিল; আর পাই পার্বতী রাজলক্ষ্মীকে যাদের মাতৃস্নেহাঞ্চল সমস্ত বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

এ পর্যন্ত বিশেষ সমস্যার উদয় হয়নি, তার উদয় হল যখন দেখলাম সাবিত্রী, চন্দ্রমুখী, রাজলক্ষ্মীকে—যারা পতিতা হয়েও পুণ্যবতী; আবার দেখলাম অচলা আর বিরাজ বৌকে যারা কক্ষচ্যুত হয়েও ধর্মচ্যুত হয়নি।

সমস্যা গুরুতর হয় যখন অভয়া আসে যে অসতী হয়েও অসতী নয়, আর কমল আসে যার উদ্ধত প্রশ্ন সবাইকে নিরুত্তর করে দিতে পারে।

বঙ্কিমের সাহিত্যকে আমরা কোন পরমসুন্দর মর্মর মূর্তির সঙ্গে তুলনা করতে পারি—যেমন নিষ্কলুষ, তেমন আশ্চর্য।

আর শরৎসাহিত্য যেন হেলেন-অফ-ট্রয়, তার সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে সহস্র রণপোত অভিযানে বেরোতে পারে, তার রূপের আগুনে ইলিয়মের উচ্চচূড় প্রাসাদসমূহ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, আবার সেই কলঙ্কিনীর রূপের সামনে বিচারকের মাথাও হেঁট হয়ে যায়।

শ্রীমতী কল্যাণী ভট্টাচার্য

জাপানে 'নাৎসু'
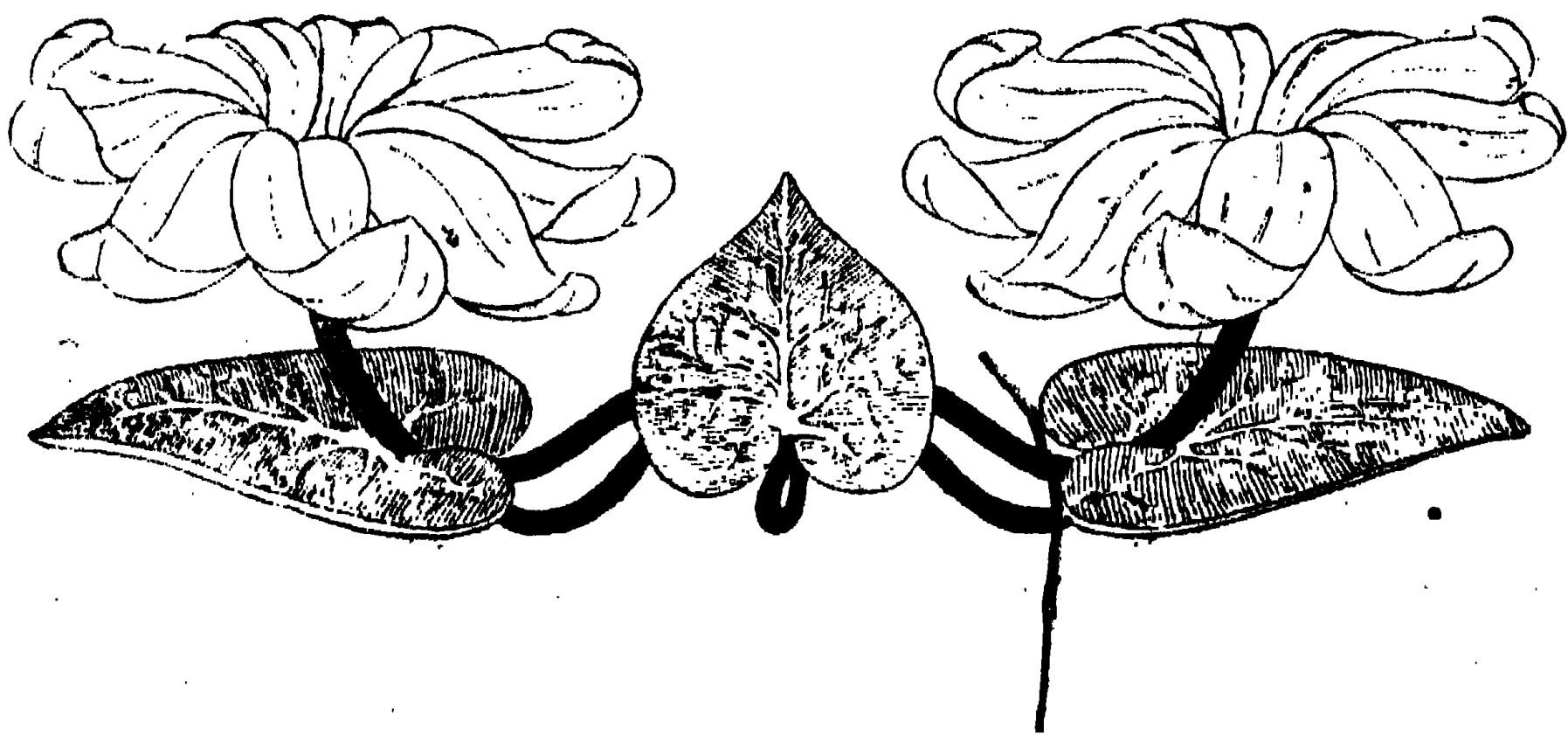
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

এশিয়ার পূর্ব্ব উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত জাপান দ্বীপপুঞ্জের গ্রীষ্মঋতুর সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমে সে দেশের ঋতুগুলির অবস্থা এবং তাদের স্থিতিস্থাপকতার কথাই মনে পড়ে। আমাদের দেশের ন্যায় এখানে ষড়-ঋতুর পূর্ণ বিকাশ হয় না। এজন্য ঋতুচতুষ্টয় নিয়ে জাপান বর্ষ-সংক্রমণ করে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে জাপানে ছয়টী ঋতু বিদ্যমান। তবে বর্ষা এবং হেমন্ত ঋতু অল্পদিন স্থায়ী হওয়ায় জাপানীরা এই দুই ঋতুকে গ্রীষ্ম এবং শরতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বর্ষা এবং হেমন্ত ঋতুর উল্লেখ কোন জাপানী গ্রন্থে দেখতে পাই না। গ্রীষ্মকালের শেষভাগে দুই তিন সপ্তাহকাল জাপানের সর্ব্বত্র বারিপাত হয়ে থাকে। এটাকে বর্ষাকাল বলা যায় কিন্তু জাপানীরা এ'কে গ্রীষ্ম-কালের মধ্যেই গণনা করেছেন। জাপানের দক্ষিণাংশ মৌসুমী অঞ্চলের অন্তর্গত। এজন্য সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। হেমন্ত ঋতুও অল্পদিনের জন্য স্থায়ী হওয়ায় ইহা শরৎঋতুর মধ্যে পরিগণিত হয়েছে। জাপানের কাছ দিয়ে উষ্ণ ফিরোসিও বা জাপানস্রোত বয়ে যাচ্ছে বলে এর জলবায়ু উষ্ণতর হয়েছে। কুরিল দ্বীপপুঞ্জের কাছে মেরু-প্রদেশীয় শীতল স্রোত প্রবাহিত হয়ে অধিকতর শীতল করে তুলেছে। জাপান উত্তর দক্ষিণে বহুদূর জুড়ে অবস্থিত বলে এর মধ্যে নানা প্রকার জলবায়ুর আবির্ভাব হয়ে থাকে।

গ্রীষ্মঋতুকে জাপানীরা 'নাৎসু' বলেন। বর্ষে বর্ষে 'নাৎসু' যখন এসে জাপানের দিক্‌চক্রবালকে অভিবাদন জানায়, তখন নানা দেশ থেকে এই গ্রীষ্মঋতু সম্ভোগ করবার জন্য ভ্রাম্যমানদিগের সমাগম হয়। নিসর্গদেবীর বিগতক্লান্তি জনিত যে নূতন সজীবতা এবং দীপ্তি উদার শ্যামল ক্ষেত্রে, সুকোমল পুষ্পদলে, বনে বনে, নদীর স্রোতো-ধারায়, পর্ব্বতে পর্ব্বতে আর নির্ঝরিণীর বক্ষে ফুটে ওঠে, তা দেখে ভ্রাম্যমানদিগের অন্তর আনন্দে উদ্বেলিত হয়। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মালয় ষ্টেট্‌স, জাভা, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হ'তে বহু নরনারী এখানে এসে থাকেন এই গ্রীষ্মঋতুর আনন্দ সমারোহে যোগদান করতে। পূর্ব্বে উত্তর এবং দক্ষিণ চীন হ'তে অনেকে আসতেন কিন্তু বর্ত্ত-মানে চীন জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে আর তাঁরা আসেন না। চেরি, ম্যাপল, ওক, চেষ্টনাট, বার্চ এবং এল্‌ম গাছের সবুজ পত্রপুঞ্জ অন্যান্য ক্ষণস্থায়ী গাছের পত্রপুঞ্জের অপেক্ষা সৌন্দর্য্যে মণোরম হয়ে ওঠে আর চিরসবুজ পাইনের গাঢ়তম রঙের খেলায় গ্রীষ্মদিনের প্রহরগুলি বিভোর হ'তে থাকে।

'নাৎসু'কে সকল রকমে উপভোগ্য করে' তুলবার জন্য জাপান ভ্রাম্যমানদিগের উদ্দেশ্যে বহু রকমের আমোদ-প্রমো-দের ডালি সাজিয়েছেন। বিস্তৃত সমুদ্র উপকূলে স্নান এবং চিত্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমুদ্র সৈকতে স্নিগ্ধ শীতল সমীরণ বয়ে যায় আর গ্রীষ্মের উত্তাপ উপশমিত হয়।

জাপান থেকে উত্তরের অক্ষরেখাবর্ত্তী স্থানে এখানকার মত বহুক্ষণ ধরে অবগাহন সম্ভব নয় কিন্তু এখানে জলের উত্তাপ বেশী হয় না বলেই স্নান করে আরাম পাওয়া যায়। যাঁরা এর চেয়েও কম উত্তাপের পক্ষপাতী, তাঁরা পার্ব্বত্য অঞ্চলে যেতে পারেন—সুন্দর সুন্দর হোটেলও সেসব অঞ্চলে রয়েছে। ওদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কানিকোতি, কারুইজাওয়া, লেক নজিরি, নিক্কো, হাকোন আর উনজেন। এসব স্থানে স্পা বা খনিজ জলের উৎস আছে। স্পাতে স্নান করে কত লোক যে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পেয়েছে, তা হিসাব করে ওঠা যায় না। এসব স্থানে ঔষধ মিশ্রিত উষ্ণ জলে স্নান করারও পদ্ধতি দেখা যায়। কাইউ সাহউর বেপ্‌পু প্রভৃতি স্থানে সমুদ্র এবং খনিজ জলের

অভাব নেই। উত্তর দিকস্থ হোক্কাইডো দ্বীপে ভ্রমণ অত্যন্ত মনোরম এবং আনন্দদায়ক।

অধুনা পর্ব্বতারোহণ আর শিবির স্থাপন করে এখানে গ্রীষ্ম যাপন করার প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত হয়েছে। গ্রীষ্মঋতুতে জাপানের আল্পস পর্ব্বত মাউন্ট ফুজি, এবং হোক্কাইডোর উত্তর অঞ্চলবর্ত্তী পর্ব্বত থেকে আরম্ভ করে কাইউ সাইউর মাউন্ট আসো পর্য্যন্ত যতগুলি পর্ব্বত আছে সবগুলি পর্ব্বতারোহীদিগের বেশ প্রিয় হয়ে' উঠেছে।

আওয়া জেলায় 'বন' ড্যান্স

তোকিও উপসাগর এবং দ্বীপপুঞ্জ শোভিত সাগরে ছোট ছোট পোত নিয়ে আমোদ প্রমোদ চলতে থাকে। জাপানে গ্রীষ্মের প্রমোদানুষ্ঠান যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একথা অস্বীকার করা যায় না। জুলাই মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে 'বন' (আলোকের ভোজ) উৎসব হয়। জাপানীরা একে ও-বন বলেন। প্রথম দিন মৃত ব্যক্তিগণের আত্মারা তাঁদের গৃহে ফিরে আসেন। তিন দিন গৃহে থেকে তাঁরা ভোজ পর্ব্ব সমাধা করেন। তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য গৃহ-দ্বারে সাঙ্কেতিক অগ্নিশিখা জ্বলে আর লণ্ঠনগুলি তাঁদের সমাধি ক্ষেত্রে ঝুলানো হয়। উৎসব সমাপন হয়ে গেলে লণ্ঠন বোঝাই করা বোটগুলি জলে নিমজ্জিত হয়ে থাকে। তারপর আরম্ভ হয় বিরাট লোক-নৃত্য। এ নৃত্যের নাম হচ্ছে 'বন ও ডোরি'। তরুণেরা স্থানীয় তীর্থ মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে রাত্রি পর্য্যন্ত 'বন ও ডোরি' নৃত্য করতে থাকেন। গ্রাম্য নৃত্যের অপূর্ব্ব কলা কৌশল দেখানো হয় কিসো, সাডো, আওয়া এবং সিরাইসিজিমাতে।

৭ই জুলাই রাত্রে টানাবাটা হাইম (অর্থাৎ গগনের বয়নরাজ্ঞী) স্বর্গ নদী (অর্থাৎ আকাশের ছায়াপথ) পার হ'তে থাকেন কালো পাখীর ডানায় বসে' আর ধরণীতে এসে আত্মগোপন করেন তাঁর প্রিয়তম রাখালের বাহু আশ্লেষের মধ্যে। নানা শিবিরের যত তরুণ প্রেমিক পত্র-বহুল বেনু কুঞ্জের শাখায় শাখায় ঝুলিয়ে রাখে রঙীন কবিতাগুলি এবং স্বর্গের প্রেমিকদের জন্য কুঞ্জকাননে নির্ম্মাণ করে রাখে অসংখ্য বেদী। ৭ই জুলাই তারিখের রাত্রি হচ্ছে অভিসার রজনী, এই রজনী আসে প্রেমের উদ্দীপনা এবং মঙ্গলোৎসব নিয়ে।

সমগ্রদেশ জুড়ে চলতে থাকে বহু আড়ম্বরপূর্ণ শিণ্ডো পার্ব্বণ। নিক্কো হইতে টোসাইওগু তীর্থে, তোকিওস্থ শিণ্ডোতীর্থ সান্নোডে এবং কাইওতোর ইয়াসাকা তীর্থে যে সব পর্ব্বানুষ্ঠান ২রা জুলাই থেকে ২৪শে জুলাই পর্য্যন্ত থাকে, সেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। গ্রীষ্মকালে আরও পর্ব্বানুষ্ঠান হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে তোকিওর কাওয়াবিরাকির কথা বলা যেতে পারে। জাপানের রাজধানী তোকিওর নাম যখন এডো ছিল, তখন থেকে এর সমাদর সুরু হয়েছে। এ উৎসবের নাম হচ্ছে নদীর উদ্বোধন। পর্ব্বরজনীতে সুমিদা নদীর ওপর আতসবাজীর অবিশ্রান্ত জলসা চলে। উত্তর তোকিওর ভিতর দিয়ে সুমিদা নদী চলে গেছে। অতীতযুগে এই সুমিদার ওপর দিয়ে সন্ধ্যাবেলায় ছোট ছোট তরণীতে উঠে জাপানীরা বেড়াতেন। এখন কাহাকেও আর দেখা যায় না। এখন সে পদ্ধতিও লুপ্ত হয়ে গেছে।

১লা জুলাই তারিখে 'নাৎসু'কে অভিনন্দিত করবার জন্য মাউন্ট ফুজিতে যাওয়া হয় এবং সেখানে প্রমোদানুষ্ঠান হয়; উচ্চতর পর্ব্বতশিখরে কতিপয় সুন্দর হোটেল নির্ম্মিত হয়েছে। জাপানীরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং কুসুমের ভক্ত। জুনমাসে যখন নানাজাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় তখন জাপানীরা আমোদে আত্মহারা হয়ে ওঠেন। নানা রংএর 'কিমোনো' পরিধান করে জাপসুন্দরীগণ চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করেন। এঁদের দেখে মনে হয়, এঁরাও যেন প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। জুনমাসে যে সব ফুল ফোটে তাদের মধ্যে বিচিত্র আইরিস ফুল নয়নানন্দকর। আগষ্টেও আইরিস তার ফুলফোটাবার গান গেয়ে থাকে আর হাসু (বা পদ্ম) এসে তার সাথে গাইতে থাকে। এর হাল্কা পাটলবর্ণের দলগুলি [illegible] আত প্রত্যুষে হাসু যখন ফুটতে থাকে তখন সে [illegible] বিশেষ সুন্দর ধ্বনি করে, সেই ধ্বনি সৌনপারিপার্শ্বি [illegible] মধ্যে স্পষ্ট শোনা যায়।

তোকিওর উইনো পার্কের সিনোবাজু পুষ্করিণীতে অজস্র হাসু ফুল ফোটে, এতদ্ব্যতীত ইয়োকোহামার সানকি-এন বাগানে, কামাকুরার হাতিমান তীর্থ সীমানায় আর কোবের কাছে আকাসি ক্যাসেলের পরিখায় হাসুর গান শুনতে পাওয়া যায়। জুনমাসের শেষের দিকে হোতারু-গারি বা খদ্যোতধরা আরম্ভ হয়। শিশুসুলভচিত্ত নিয়ে প্রাপ্ত বয়স্কেরাও এই আমোদ প্রমোদে যোগদান করেন। জোনাকি পোকা ধরবার জন্য খাঁচা হাতে অনেক জাপানীকে আঁধার রাতে ময়দানে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। গ্রীষ্ম রজনীতে বিভিন্ন বিপনির পুষ্পপ্রদর্শনী-ভ্রাম্যমানদিগের চিত্ত আকৃষ্ট করে। এসব পুষ্প বিক্রয় করেন জাপসুন্দরীরা। তাঁদের চটুল চাহনি, সৌজন্য এবং ভদ্রালাপের ভিতর এমনই একটা আকর্ষণী শক্তি আছে যাতে করে পরিদর্শকগণ ফুল না ক্রয় করে চলে আস্‌তে পারেন না।

নাগারা নদীর ধারে গিহু সহরের লোকেরা করমোরাণ্ট পাখী নিয়ে মৎস্য ধরতে [illegible]। রাত্রি এলে দলে দলে জাপানীরা লণ্ঠনসজ্জিত বোটের উপর উঠে নদীর মাঝে এগিয়ে যায় এবং করমোরাণ্টের গলায় দড়ি বেঁধে তা সঙ্কেত পূর্ব্বক তাকে জলে ছেড়ে দেয়। [illegible] খী মাছ ধরে নিয়ে আসে জেলের কাছে। প্রতি রাত্রে মৎস্য ধরার উৎসব উপলক্ষে নদীর ধারে আতসবাজী হয়। এ উৎসবে বহু লোক যোগদান করে থাকে। বলাবাহুল্য, জাপানের নদীগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি অনতিদীর্ঘ এবং খরস্রোতা।

সুমিদা নদীর উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষ্যে আতসবাজীর খেলা

জাপানের গ্রীষ্ম রজনী মানুষকে প্রলুব্ধ করে, তাই রজনীতে যখন চাঁদ ওঠে, তখন নৈশ সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার জন্য সকলের মধ্যে ব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া যায়। টানাবাটামাতুরি (অর্থাৎ নক্ষত্রোৎসব) এবং

প্রত্যেক 'শিণ্ডো' পার্ব্বণ রজনীতেই হয়। ছাদের ছাইচ-তলায় মৃদু মন্দ সমীরণ গুঞ্জন করে আর ছাদে বসে সুন্দরীরা চাঁদ দেখতে দেখতে আপনহারা হয়ে যায়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে জাপানীরা খুব ভালবাসে বলেই তাদের প্রত্যেকের মধ্যে কবি মনের প্রেরণা রয়েছে।

গ্রীষ্ম সন্ধ্যায় জাপানী কক্ষে বসে যে আনন্দানুভব করা যায় তারই একটু আভাস দিচ্ছি। বাথরুম থেকে গাত্রাদি প্রক্ষালন করে এসে যখন 'জুকাতা'র মধ্যে বসা যায়, তখন স্বর্গ সমীরণ এসে শরীরকে শীতল করতে থাকে। মাথার ওপর কাগজের লণ্ঠনগুলি দুলে দুলে ওঠে আর চন্দ্রে

কামাজুরাতে সুন্দরী স্নানার্থীনীগণ

লেবুর রঙের টাটামি (ঘাসের বোনা মাদুর) পায়ের তলায় বিছানো থাকে। ফুলের গন্ধ ভেসে আসে। তারি মাঝে তৈলস্ফটিক রঙের চা অথবা সোনালী রঙের সাকী পান করতে করতে বাতায়নের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় চাঁদ উঠছে আর অন্ধকারাচ্ছন্ন বনানীর মাঝে মর্ম্মরধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তখন মনে হয় চিত্ত যেন কোথায় ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে চায়—ফিরবে কিনা কে জানে!

জাপানীরা স্নিগ্ধ বায়ু সেবনের জন্য রাস্তা দিয়ে সান্ধ্য ভ্রমণে বহির্গত হয়ে থাকেন—এই ভ্রমণকে এঁরা গিনবুরা বলেন। সন্ধ্যার পরে অসংখ্য কাফেতে জাপানী নরনারী-দিগকে শীতল পানীয় পান করতে দেখা যায়। প্রাচীন জাপানের বৈশিষ্ট্য এখনও কাইয়োতো সহরে বিদ্যমান। এর বুকের উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে স্বচ্ছ প্রবাহিনী কামো-গাওয়া বয়ে যাচ্ছে আর এর তটে বসে গ্রীষ্মের নৈশ সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার জন্য সহরের চারিদিক থেকে এসে নরনারী ভিড় করে। গ্রীষ্ম ঋতুর উপযোগী 'কিমোনো' পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক খুব আরাম পাওয়া যায়। 'কিমোনো' যেমন হাল্কা, তেমনই স্নিগ্ধপ্রদ। পাখা প্রত্যেকেরই হাতে থাকে এবং ক্রমাগত চালানো হয়। প্রায় বঙ্গদেশের মত এখানে গরম পড়ে থাকে। গ্রীষ্মকালে মশার উপদ্রব হয়। মশার দৌরাত্ম্য থেকে আত্মরক্ষার জন্য বৃহদাকার মশারি সমস্ত ঘর জুড়ে খাটানো থাকে। ঘর থেকে মশা বাহির করবার উদ্দেশ্যে এক প্রকার কাঠ জ্বালানো হয়। এ কাষ্ঠের নাম হচ্ছে 'জোটিউ কিকু নো কি'। 'নমি' নামক একপ্রকার ছোট ছোট পোকার উপদ্রব হয়ে থাকে। এরা দিনের বেলায় 'তাতামি'র মধ্যে লুকিয়ে থাকে এবং রাত্রে বেরিয়ে ঘুমের ব্যাঘাত জন্মায়। এই পোকার দৌরাত্ম্য অসহনীয়। 'নমিতরি নোকো' নামক এক প্রকার গুড়া আছে। বিছানার চারিদিকে এই গুড়া ছড়িয়ে দিলে নমিরা এর গন্ধে মুগ্ধ হয়ে যেমন ভক্ষণ করে অমনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

গ্রীষ্মকালে জাপানীরা খুব বনভোজন করে থাকেন, অবশ্য এই বনভোজন এঁদের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। বেস্তো (অর্থাৎ আহার্য্য বস্তু) বাক্সে পুরে এঁরা 'ফুরোসিকি' (অর্থাৎ রুমাল) দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে বনভোজন করতে চলে যান। আমাদের দেশের মত এঁরা বনভোজন করেন না, অর্থাৎ বনে জঙ্গলে গিয়ে রন্ধনাদি করেন না। চলচ্চিত্র মন্দির এবং নাট্যশালায় জাপানীরা গিয়ে থাকেন। এসব স্থানে রাত্রিদিন আমোদ প্রমোদ চলছে—যিনি যখন অবসর পাচ্ছেন, তিনিই তখন সেখানে যাচ্ছেন।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ সিমাবারা প্রায়ো দ্বীপের কেন্দ্রে উপত্যকার উপর উচ্চে অবস্থিত রয়েছে উন্‌জেন। গরমের দিনে এর পাহাড়ে বাস করা খুব আরামপ্রদ। সাংহাই থেকে নাগাসাকি পর্য্যন্ত ষ্টীমারে যেতে হয়। ষ্টীমারে ২৭ ঘণ্টা থাকতে হয়, তারপর প্রায় তিন ঘণ্টা ব্যাপী মোটরে চলবার পর ইসাহায়া এবং ওবামা হয়ে' উন্‌জেনে আসা যায়। উন্‌জেনে উষ্ণ জলের প্রস্রবণ এবং খনিজ জলের উৎস আছে। গল্‌ফ, টেনিস খেলা, তরণী বিহার, সমুদ্র স্নান, হিকিং, পর্ব্বতারোহণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। উন্‌জেন কাঙ্কো, কাইউসাইউ, জুমি, টাকাগি প্রভৃতি হোটেল আছে।

বালুস্নান এবং সমুদ্রস্নানেরও ব্যবস্থা আছে। কোবে থেকে এখানে ষ্টীমারে যেতে ১৭ ঘণ্টা লাগে। বেপ্পুতে বড় বড় হোটেলের অভাব নেই। মিয়াজিমা পবিত্র দ্বীপ। এর বেষ্টন রেখা রয়েছে ১৯ মাইল জুড়ে। পাইন বনে ভরা ছোট ছোট পাহাড়ে হরিণ চরে বেড়ায়, হরিণগুলি দেখতে বড় সুন্দর। এখানে পুণ্যতীর্থ রয়েছে। মিসেন (১,৮৯০ ফিট) পর্ব্বতশৃঙ্গ হ'তে সমগ্র দ্বীপের যে সৌন্দর্য্য দেখা যায় তা বর্ণনাতীত, উপভোগ্য মাত্র। এই পর্ব্বতে উঠতে দুই ঘণ্টা লাগে। মোটরলঞ্চে সারা দ্বীপটী প্রদক্ষিণ করতেও দুই ঘণ্টার বেশী লাগে না। কোবে থেকে মিয়াজিমাতে আসতে প্রথমতঃ ছয় ঘণ্টা রেলে তারপর ১২ মিনিট ফেরি-

টোকিও গিন্‌জা সহরের রাত্রের দৃশ্য
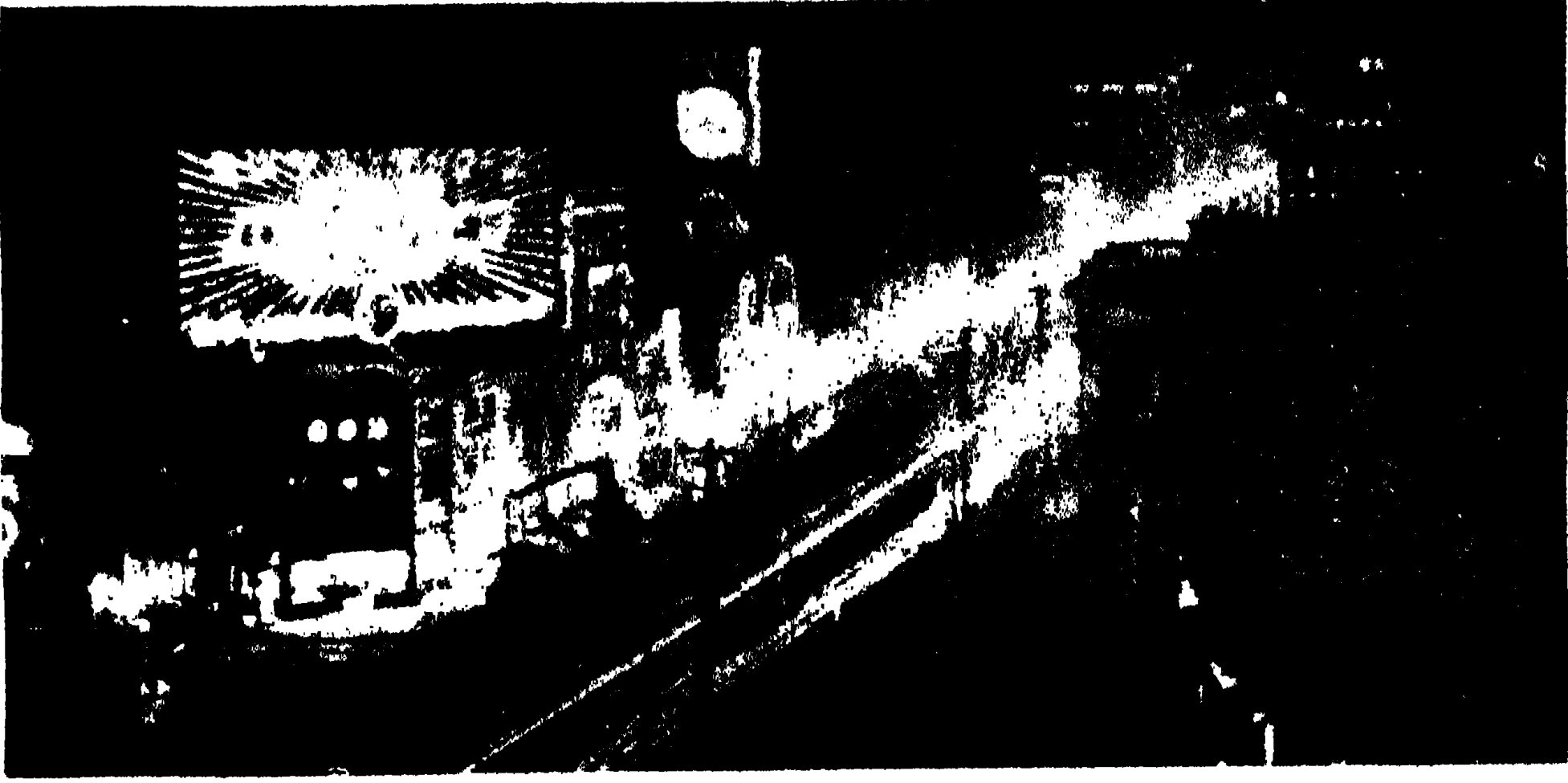
সাংহাই, হংকং প্রভৃতি স্থান থেকে অনেকে সমুদ্রকূলবর্ত্তী কারাতু সহরে গিয়ে থাকেন। কাইউসাইউ দ্বীপের উত্তর উপকূলে এই সহর বিদ্যমান। নাগাসাকি থেকে কারাতু পর্য্যন্ত রেলে পাঁচঘণ্টা যেতে লাগে। কুবোতা ষ্টেশনে কেবল গাড়ী বদল করতে হয়। কারাতুর শুভ্র বালুকা সৈকত প্রায় চার মাইল ব্যাপী জুড়ে আছে। গ্রন্থিযুক্ত সারি সারি পাইন বৃক্ষ এখানকার অমূল্য সম্পদ। এখানে কারাতু সি-সাইড, কাইহিনিন ও কারাতু হোটেল উল্লেখযোগ্য। জাপানের বৃহত্তম খনিজ জলের প্রস্রবণ মণ্ডিত সহর হচ্ছে বেপ্পু। এর পশ্চাতে রয়েছে মাউণ্ট টুরুমি সারা বছর ধরে স্নানার্থীগণ এখানে এসে ভিড় করেন। মুক্ত বাতাসে বোটে থাকতে হয়। জাপানের সর্ব্বাপেক্ষা ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ বন্দর কোবের পশ্চাতে অপূর্ব্ব পার্ব্বত্য আশ্রয়স্থলরূপে মাউণ্ট রোক্কো সমাদৃত। অনেক গ্রীষ্মোপযোগী ভিলা আছে। এ সব ভিলার বেশীর ভাগ মালিক হচ্ছেন কোবে এবং ওসাকার জাপানীগণ, কতিপয় ভিলা আবার বিদেশীরাও নির্ম্মাণ করেছেন। গ্রীষ্মকালে সাঁতার দেবার জন্য এবং শীতকালে স্কেটিংএর জন্য বহু পুষ্করিণী আছে। এখানে আসতে মোটর যোগে কোবে থেকে ৪৫ মিনিট এবং ওসাকাতে দেড় ঘণ্টা লাগে। গিহু, ইনুইয়ামা, এবং হ্রদপ্রধান হুক্কি প্রদেশ গ্রীষ্মাবাসের পক্ষে মনোরম। তোকিওর পশ্চিমে প্রায় ষাট মাইল দূরে রয়েছে হাকোন

জেলা। এখানে বারোটী স্পা আছে। এতদঞ্চল ঐতিহাসিক কীর্ত্তি কাহিনীর জন্য বিখ্যাত। এখানকার মধ্যে লেক হাকোন বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তোকিও থেকে ওডাওয়ারা পর্য্যন্ত প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে ইলেকট্রিক ট্রেণে আসার পর ইলেকট্রিক বা মোটরকারে মাইয়ান সোতায় আসতে হয়। প্রায় ৩৫ মিনিট লাগে। তোকিওর দক্ষিণ পশ্চিমে ৩২ মাইল দূরে কামাকুরা অবস্থিত। ঐতিহাসিক ঘটনাপুঞ্জে এ স্থান জড়িত রয়েছে।

বৃহৎ মূর্ত্তি এখানে আছে। এ মূর্ত্তিকে জাপানীরা দাইবুতু বলেন। এখানেই রয়েছে হাতিমান তীর্থ। কুরিহামাতে কমোডোর পেরির মনুমেণ্ট আছে। জাপানে প্রথম ইংরাজ উইল এডামসের মনুমেণ্ট জোকোসুকার সন্নিকটে বিদ্যমান। তোকিও থেকে কামাকুরায় ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণে আসতে পঞ্চাশ মিনিট লাগে। নিক্কো এবং কারুই-জাওয়াতে 'নাৎসু' উৎসবের আধিক্য দেখা যায়। কারুই-জাওয়াতে আসামার বিরাট আগ্নেয় গিরি রয়েছে। এখানে অনেকেই বন ভোজন করতে আসেন। বহু গ্রীষ্ম-কুটীর চারিদিকে নির্ম্মিত হয়েছে। কারুইজাওয়ার ভিতর যে কুসাটুস্পা আছে সেখানে যেতে হ'লে কারুইজাওয়ায় গিয়ে ট্রামে চাপ্‌তে হয়, তারপর স্পাতে পৌছানো যায় তিন ঘণ্টা ট্রামে থাকার পর। মাইওকো এবং কুরোহাইন পর্ব্বতের পাদদেশে লেক নোজিরি (২,১০০ ফিট) অবস্থিত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে নোজিরি লেক এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই হ্রদ চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। লেকের চতুঃপার্শ্বে এই এসোসিয়েশন জমি ক্রয় করে ৯০টী কুটীর নির্ম্মাণ করেছেন বিদেশীদের গ্রীষ্মাবাসের জন্য। তোকিওর উইনো থেকে কাসিওয়াবারা পর্য্যন্ত ট্রেণে আসতে ছয় ঘণ্টা লাগে, তারপর ষ্টেশন থেকে মোটর-বাসে এই লেকে আসতে পনর মিনিট সময় অতিবাহিত করতে হয়। কামিকোতি উপত্যকায় প্রাকৃতিক উষ্ণ প্রস্রবণ, সুন্দর সুন্দর হ্রদ এবং চিত্তাকর্ষক পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য অত্যন্ত উপভোগ্য। ইয়াকিডেক আগ্নেয়গিরি এখানে জীবন্ত অবস্থায় রয়েছে। মাতুসিমা, তাকায়ামা, টোয়াডা প্রভৃতি স্থানগুলি অতীব মনোরম এবং ভ্রাম্যমানগণ এসে এসব স্থানে খুব আনন্দ লাভ করেন। হোক্কাইডোতে ওনুমা হ্রদ, নোবোরিবেতু স্পা, জাইওজানকেল উষ্ণ প্রস্রবণ, আরআকান হ্রদ আছে। এরা পর্য্যটকদিগকে তৃপ্তি দিয়ে থাকে।

কোরিয়ার টাইওসেনের কথা বল্‌তে গেলে মাউণ্ট কঙ্গোকে প্রথমেই মনে হয়। এর ১২,০০০ ফিট উচ্চ সৌন্দর্য্য-পূর্ণ শৃঙ্গাবলী চিত্তাকর্ষক। পর্ব্বত শৃঙ্গগুলি গ্রেনাইটের তৈয়ারী, এখানে বহু গহণ অরণ্য আছে। এর বুকের ওপর দিয়ে জলপ্রপাত চলেছে, তারি সুরে দিগন্ত মুখরিত। এই পর্ব্বতমালাকে এখানকার আদিম অধিবাসীরা প্রগাঢ় ভক্তি জানায়। এ স্থানটী বৌদ্ধ ধর্ম্মের কেন্দ্র, ১৮০টী বৌদ্ধমঠ আছে। এখনও প্রায় বত্রিশটী বৌদ্ধ মঠ শক্তিসম্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। তাইওয়ানজি হোটেলের পাচটী বাংলো আছে, এগুলির ছাদ কাঠ দিয়ে তৈয়ারী হয়েছে—খুব সুন্দর হোটেল। ১৫০ ইয়েন দিলে একটী লোক একমাস এ হোটেলে থাকতে পারে। অনশ্রী-হোটেলও সুন্দর। এ হোটেলটী কঙ্গোর বাহিরে অবস্থিত। উভয় হোটেলেই এক প্রকার খরচ দিয়ে থাকতে হয়।

ফরমোজা দ্বীপের টাইওয়ানে অবস্থিত মাউণ্ট আরিসান। কাগি থেকে ট্রেণে যেতে ৪০ মিনিট লাগে। এর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা হচ্ছে ৩,৬০০ ফিট। পর্ব্বত শৃঙ্গগুলির বেশীর ভাগই গহন অরণ্যাবৃত। পর্ব্বতে প্রধান প্রধান বৃক্ষদিগের নাম হচ্ছে চাইনিজ জুনিপার, ক্রাইপটোমেরিয়া, জাপানীজ ক্রাইপ্রেস, ক্যাম্পরট্রেস এবং চেষ্টনাট। পর্ব্বত শৃঙ্গমালার হৃৎপিণ্ড বলা হয়েছে নুনোমাটায়রাকে—এর উচ্চতা হচ্ছে ৭,৫০০ ফিট। গ্রীষ্মকালে সর্ব্বোচ্চ উত্তাপ ৭০ ডিগ্রী (ফারেনহিট)। এখানে দুইটী সরাই আছে—আরিসান হোতেরু আর কাইওকাই হোতেরু। দুই বেলা আহারের জন্য সরাইখানার কর্ত্তৃপক্ষরা প্রত্যহ চারি ইয়েন নিয়ে থাকেন।

গ্রীষ্ম ঋতু আমাদের কাছে বিরক্তিজনক এবং আমরা এ ঋতুকে কিরূপ সুন্দর ভাবে উপভোগ করতে হয় তাও জানি না। কিন্তু জাপানীরা শুধু এই ঋতুকে সম্বর্দ্ধিতই করেন না, যতদূর সম্ভব আমোদ প্রমোদ এবং পর্ব্বানুষ্ঠান নিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে উপভোগ করেন এবং যাতে বিদেশীরা

এসেও এদেশে অর্থ ছড়িয়ে গ্রীষ্ম ঋতুকে সম্ভোগ করেন, তার জন্য যতরকম আমোদ প্রমোদের উপকরণ থাকৃতে পারে সবগুলি সাজিয়ে রাখতে কার্পণ্য করেন নি। এঁরা চা'ন জীবনের গান নব নব সুরে গাইতে আর আমরা চাই তাড়াতাড়ি গানের পালা শেষ করে দিতে। প্রকৃতির সহিত মানব জীবনের নিবিড় যোগসূত্র না থাকলে জীবনের গান নূতন করে গাওয়া যায় না, জাপানীরা যোগসূত্র রেখেছেন বলেই আজ তাঁদের জীবন আমাদের মত বিষিয়ে ওঠে না। তাঁদের নব নব জাগরণ সঙ্গীত শুনে সমগ্র বিশ্ব মৌন বিস্ময়ে 'নিপ্পনে'র পানে চেয়ে রয়েছে।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ডানপিটে

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন এম্-এ, বি-এল

১

মহেশ চক্রবর্ত্তীর ছেলে রঘুনাথের বয়স অল্প—বিশ-বাইশের বেশী নয়। কিন্তু গ্রামে তাহার প্রতিপত্তি অসামান্য। কারণ এমন লোক খুব কমই আছে যাহারা তাহার নিকট কোন না কোন প্রকার উপকার না পাইয়াছে।

কয়েকজন সমবয়সীকে লইয়া ক্রমশঃ রঘুনাথের বেশ একটি দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। লোকে তামাসা করিয়া তাহার নাম দিয়াছিল—'রঘু ডাকাতের দল।' এই 'ডাকাতের দলের' কীর্ত্তি-কলাপের কথা প্রায় প্রত্যহই কিছু না কিছু শোনা যাইত। কাহারও ঘরে আগুন লাগিলে, কোথা হইতে যে এই দল আসিয়া জোটে এবং নিকটবর্ত্তী পুকুর ডোবা খালি করিয়া পাড়াটাকে জলে ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া যায়, কেহ বুঝিতেও পারে না। রোগীর সেবা করিতে, ডাক্তার ডাকিতে, মৃতের সৎকার করিতে, ক্রিয়া-কর্ম্মের বাড়ীতে মেরাপ বাঁধা হইতে আরম্ভ করিয়া পরিবেশন পর্য্যন্ত সমস্ত কাজের জন্যই রঘুর দলের ডাক পড়িত। ডাক পড়িত বলা ঠিক হইল না,—তাহারা নিজেরাই আসিয়া জুটিত।

রক্ষু পালের ছোট ছেলেটা যখন জলে ডুবিল, তাহার মা চীৎকার করিয়া উঠিতেই কোথা হইতে দুইজন ছুটিয়া আসিল। তাহারা যেন কাছেই কোথাও ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল। ছেলে জলে পড়িয়া গিয়াছে শুনিয়া যদু কামারে ছেলে হারু পুকুরে নামিল এবং তাহার সঙ্গী আবদুল ছুটিয়া গেল সর্দ্দারকে খবর দিতে। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে জনসতেরো ষণ্ডামর্ক ছোকরা আসিয়া জুটিল এবং সারা পুকুর তোলপাড় করিয়া ছেলেটাকে তুলিল। রঘুনাথ ছেলের পা দুইটা ধরিয়া ঘুরাইতে লাগিল। আর দুইজন ছুটিয়া গিয়া নিতাই মান্নার গোলা হইতে বিনা বাক্য ব্যয়ে একটা নুনের বস্তা তুলিয়া আনিয়া পুকুর পাড়ে ঢালিয়া ফেলিল। ছেলেটাকে নুনের গাদা হইতে বাহির করিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া, একটু চাঙ্গা করিয়া রঘুনাথ যখন তাহাকে তাহার মায়ের কোলে তুলিয়া দিল, তখন সেখানে দু'শো লোকের ভীড় জমিয়া গিয়াছে; কিন্তু "রঘু ডাকাতের দলের" কাহারও পাত্তা নাই,—কে কখন কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে। কেবল রঘুনাথ চোখ পাকাইয়া হাঁকিতেছে—"ছেলে নিয়ে আর কখনও পুকুর-ঘাটে আস্‌বি ;"

২

পরের কাজে রঘুনাথের যেমন প্রচণ্ড উৎসাহ, নিজের কাজে তাহার তেমনই দারুণ অবহেলা। লোকে তাহার জন্য মহেশ চক্রবর্ত্তীরই দোষ দেয়,—তিনি ছেলেকে মানুষ

করিয়া যাইতে পারেন নাই। চক্রবর্ত্তী ম'শায় নিজে খুব কর্ম্মঠ ছিলেন। কয়েক বিঘা জমি এবং কয়েক ঘর যজমান ইহারই আয়ে বেশ গুছাইয়া সংসার চালাইয়া গিয়াছেন। পত্নী বিয়োগের পর বালক রঘুনাথের পরিচর্য্যার ভার তাঁহাকেই লইতে হইয়াছিল। পূজা-পাঠ সারিয়া তিনি নিজেই রন্ধন করিয়া খাইতেন এবং ছেলেকে খাওয়াইতেন। শোকে-তাপে এবং অত্যধিক পরিশ্রমে যখন তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া আসিল, তখন তিনি যজমান ও ভূসম্পত্তির সমুদায় ভার তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র কৈলাশের হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন,—রঘুনাথের গায় একটুও আঁচ লাগিতে দিলেন না।

কৈলাশের সংসারে পিতাপুত্রের আহার ও পরিচর্য্যার ব্যবস্থা ভালই হইল। মহেশ চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুর পরেও প্রায় দেড় বৎসর কাল এইরূপে কাটিল। কিন্তু ক্রমে কৈলাশের স্ত্রী আন্নাকালীর ভাবান্তর দেখা গেল। তিনি রঘুনাথকে একটা অনাবশ্যক গলগ্রহ মনে করিতে লাগিলেন। কৈলাশ নিরীহ নির্ব্বিরোধী মানুষ; রঘুনাথকে আন্তরিক ভালও বাসিত। সে বলিল—"কাজ নেই ভাই, তোমার যা'-কিছু বুঝে-প'ড়ে নাও, নিজের ব্যবস্থা নিজেই যা' হ'ক কর। এ অশান্তি আর ভাল লাগে না। হা-ঘরের মেয়ে ঘরে আন্‌লে এই রকমই হয়,—কি আর হ'বে বল, অদৃষ্ট।"

রঘুনাথ নিজের জমিজমা সব বুঝিয়া লইল। কিন্তু যজমান-ঘরগুলি কৈলাশের হাতেই রাখিল। বলিল—"ও তুমি যেমন করচো দাদা, তেমনি কর। আমি ও-সব কাজ শিখিওনি পারবোও না। বরং আমাকে যা' হ'ক কিছু দিও, তা' হলেই আমার চ'লে যা'বে।"

তিন চার দিন রঘুনাথ নিজের ঘরে স্বহস্তে রাঁধিয়া খাইল। তা'র পরেই বিরক্তি ধরিয়া গেল। কুড়ের মত বসিয়া বসিয়া রান্না করা তাহার পক্ষে কষ্টকর। তা' ছাড়া সময় নষ্ট, হাত-পা পোড়া। তা'র পর যাহা রান্না হয় তাহা অখাদ্য।

সেদিন সকালে উঠিয়া সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিতে আরম্ভ করিল। বেলা যখন দ্বিপ্রহর, তখন সে পার্ষদগণ পরিবেষ্টিত হইয়া হামিদের দলিজায় বসিয়া আছে। রঘুনাথ বলিল—"উঃ বড় ক্ষিদে পেয়েছে রে!" সকলে বলিল—"বেলাও ত ঢের হয়েছে,—যাও না, বাড়ী গিয়ে নাওয়া-খাওয়া কর গে'।" সে বলিল—"বাড়ী গিয়ে কি করব, আজ রান্না-বান্না করিনি; আর এত বেলায় গিয়ে পারিও না।" হামিদ বলিল—"বেশ, তুমি চান করে এস, আমি তোমার খাবার ব্যবস্থা করছি।" স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল, কোথা হইতে তাহারা রাশিকৃত ফল মূল আনিয়া জড়ো করিয়াছে। রঘুনাথ তাহা সকলকে বিতরণ করিয়া এবং নিজে খাইয়া শেষ করিল।

৩

পরদিন রঘুনাথ গিয়া জুটিল গয়লা-পাড়ায়। হীরু গয়লার ছেলে অমূল্য রঘুনাথের উপাসক সম্প্রদায় ভুক্ত। সে এখনও ছেলেমানুষ বলিয়া রঘুনাথ তাহাকে কোন কাজ করিতে দেয় না। অমূল্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া শাগরেদি করে, মনে মনে আশা রঘু-দা'র যা'-হ'ক একটা সামান্য তুচ্ছ আদেশ পালন করিয়াও তাহার জীবন সার্থক করিবে

রঘুনাথ বলিল—"অমূল্য, আজ তোদের বাড়ী খাব বুঝলি?"

অমূল্যর প্রাণটা নাচিয়া উঠিল। বলিল—"ঠিক বলচ রঘু-দা', ঠিক বলচ? তাহ'লে পিসিমাকে ব'লে আসি?" এত বড় সংবাদটা বাড়ীতে ছুটিয়া গিয়া জানাইবার জন্য সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

রঘুনাথ বলিল—"দাঁড়া না রে, আমিও ত যা'ব।"

অমূল্যদের বাড়ীতে ঢুকিয়া রঘুনাথ হাঁকিল—"কই গো পিসী, আজ তোমাদের বাড়ী অতিথি হ'লাম,—এইখানেই খা'ব।"

পিসী বলিল—"বেশ ত বাবা, সে ত সৌভাগ্যের কথা।" দাওয়ায় একখানা পিঁড়ি প্যাতিয়া দিয়া পিসী বলিল—'তা' হ'লে সামান্য কিছু উদযুগ ক'রে রেখে দিচ্ছি, চানটা ক'রে এসে তুমি চড়িয়ে দাও। না হয় ত বল, আমরাই চড়িয়ে দেবো, তুমি নামিয়ে নিও 'খন।"

রঘুনাথ প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল—"না, সে হ'বে না। রা বান্না মেয়ে মানুষের কাজ, ও আমার পোষায় না।"

পিসী বলিল—"তা' সত্যিই ত, রান্না করা কি আর বেটাছেলের পোষায়। তা একটি ডাগর মেয়ে দেখে বিয়ে কর না, বাবা,—বিয়ের বয়স ত বয়ে যাচ্ছে। এমন বাউণ্ডুলে হয়ে কতদিন কাটাবে।"

"ওসব কথা বল ত আমি এই চললাম"—বলিয়াই রঘুনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল।

পিসী হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা, সে ত পরের কথা,—তা'র জন্যে পালাবার দরকার কি! বস।...তা'হ'লে তোমার খাবার কি ব্যবস্থা করি বল। একটু দুধ মেরে ঘন ক'রে দিই,—আর ঘরে কলা ত আছেই, চিঁড়ে কি খই যা' বল—"

রঘুনাথ লাফাইয়া উঠিল। বলিল—"ওরে বাস রে! সে পারব না। কাল সারাদিন পেটে ভাত পড়েনি,—ফল খেয়ে কাটিয়েছি। আজ আবার ফলার করতে পারব না। ও-সব মুনি-ঋষিদের খোরাক আমার ধাতে সয় না।"

পিসী হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"তবে কি ব্যবস্থা হয় নিজেই বল বাবা।"

রঘুনাথ বলিল—"কেন তোমাদের ত রান্না হচ্ছে; খুড়ীকে বল ঐ হাঁড়িতেই আমার জন্যে দুটি চা'ল নিতে।"

মহাবিস্ময়ে পিসী গালে হাত দিয়া বলিল—"ওমা, শোন কথা! তা'ও আবার হয় নাকি?"

অমূল্য খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—"রঘু-দা', তুমি না বামুন,—তুমি আমাদের ভাত খাবে!"

মুখ বিকৃত করিয়া রঘুনাথ বলিল—"যা যা! মিছে বকিসনি। কৈবর্ত্তর বামুন আবার বামুন! তবু যদি দু'টো মন্তর জানতাম। থাক্‌বার মধ্যে আছে এই পৈতেগাছাটা। তাও যদি বলিস ত ছিঁড়ে ফে'লে না হয় গয়লা হয়ে যাই।"

পৈতা ধরিয়া টান মারে দেখিয়া পিসী হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল,—"এ কোথাকার পাগল ছেলে গো! মহেশ-ঠাকুরের এমন গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলে হ'ল কি ক'রে!"

শেষ পর্য্যন্ত রঘুনাথ কোনও কথা শুনিল না,—গয়লাদের ভাতই খাইল। তাহারা ত ভয়েই মরে। কিন্তু রঘুনাথ আশ্বাস দিয়া বলিল—"থাম না পিসী, কারুর বাড়ী বাদ যা'বে না, দেখে নিও। সবাইকার জাত মেরে তবে ছাড়ব।"

সত্য সত্যই রঘুনাথ যাহার-তাহার বাড়ী ভাত খাইয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। গ্রামে একটা হৈ-চৈ পড়িল। কিন্তু তাহাকে বাধা দিবার মত সাহস কাহারও ছিল না। কৈলাশ চক্রবর্ত্তী একবার তাহাকে ডাকিয়া অনেক করিয়া বুঝাইল। রঘুনাথ বলিল—"তুমি দাদা, পূজারী বামুন, তোমার বটে জাত-কুল বাঁচিয়ে চলা দরকার। আমার কি! কি আর হ'বে,—না হয় ম'রে গেলে স্বজাতে কাঁধ দেবে না—এই ত? তা আমার নিজের দল আছে, তা'র জন্য ভাবনা কি!"

কৈলাশ আজকাল রঘুনাথের একটা বিবাহ দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টায় ছিল; সে বলিল—"ছিছি, ও কথা বল্‌ছ কেন ভাই? এইবার তোমার বিয়ে-থা' করা দরকার হয়েছে ত; তাই বল্‌ছি, ও রকম ক'রে বেড়া'লে কোন ভাল ঘরের মেয়ে—"

"হ্যাঁ, বিয়ে আমি প্রায় করছি কিনা!"—বলিয়াই রঘুনাথ উঠিয়া চলিয়া গেল

রঘুনাথের বেশ নিরুদ্বেগে দিন কাটিতে লাগিল। আহারের চিন্তা মোটেই করিতে হয় না। হাবু আসিয়া বলে—"রঘু মামা, দিদ্‌মা বলেছে আজ তোমাকে আমাদের বাড়ী খেতে হবে।" খেঁদী হাত ধরিয়া টানাটানি করে; বলে—"রঘু-কাকা, আমাদের বাড়ী কতদিন যাওনি বল দেখি। মা আজ তোমাকে ধ'রে নিয়ে যেতে বলেছে,—চল।" ঘরে ঘরে এমন অন্নপূর্ণা বিরাজমান থাকিতে তাহার আর ভাবনা কি?

সুতরাং তাহার কাজের মধ্যে কেবল পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া, নিজের স্বার্থ নাই এমন কোন কাজের সন্ধান করিয়া বেড়ানো। যাহাতে স্বার্থের গন্ধ আছে রঘুনাথ তাহা সযত্নে বর্জ্জন করিয়া চলে।

৪

একদিন সকালে উঠিয়াই রঘুনাথ শুনিল তাঁতিদের একটা বউকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। ভোরের দিকে সে একবার ঘরের বাহিরে গিয়াছিল, আর ফেরে নাই। সংবাদটা খুব গোপনেই আসিয়াছিল; গোপনেই তদন্ত আরম্ভ হইল।

রঘুনাথ তাহার পাঁচজন বিশ্বস্ত সহচরকে ডাকিয়া পাঠাইল এবং তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এক একজনকে এক এক কাজের ভার দিল। সেদিন সে আর বাড়ীর বাহির হইল না, সারাদিন ধরিয়া নানা তথ্য সংগ্রহ করিতে লাগিল,—কে কে আজ গ্রামে নাই, তাহারা কে কোথায় গিয়াছে,—কখন গিয়াছে, কবে ফিরিবে ইত্যাদি। তা'ছাড়া যাহাদের উপর সন্দেহ হয় তাহাদের গতিবিধি সম্বন্ধেও রিপোর্ট আসিল।

বৈকালে হামিদের নিকট অনেকটা পাকা খবর পাওয়া গেল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস রহমান, ফটকে ও আবদুল গণি এই ব্যাপারের প্রধান আসামী। আবদুল গণির বাড়ী এই গ্রামের শেষ প্রান্তে, সেইখানেই মেয়েটাকে আটক রাখা হইয়াছে এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আবদুল গণির চাচা আজ দু'দিন বাড়ী নাই, কাল আসিবার কথা আছে। সে বড় কড়া লোক, তাহার বাড়ীতে এ রকম ব্যাপার ঘটিয়াছে জানিলে রক্ষা রাখিবে না। তাই খুব সম্ভব আজ রাত্রেই মেয়েটাকে সরাইয়া ফেলিবে।

মেয়েটাকে উদ্ধারের ভার সেই পাঁচজনের উপরই পড়িল হামিদ, হউক্, বিষ্ণু, বঙ্কা, ছিদাম। আজ তাহাদের সারা দিন পরিশ্রম হইয়াছে; তাই একটু বিশ্রাম করিয়া লইয়া, রাত্রি নয়টা হইতে আবদুল গণির বাড়ী গোপনে ঘেরাও করিয়া থাকিবে। তারপর অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা।

"বেশী মারধর ক'রে কাজ নেই, বুঝেছ হামিদ ভাই; কেবল একটা ক'রে ঠ্যাং জখম ক'রে দেওয়া, যা'তে দু'-চার দিন খুঁড়িয়ে চল্‌তে হয়।" এই বলিয়া রঘুনাথ তাহাদের বিদায় দিল।

রাত্রি প্রায় একটার সময় তাহারা তাঁতি-বউকে অতি গোপনে তাহার বাড়ীতে পৌছাইয়া দিয়া রঘুনাথকে আসিয়া জানাইল।

হামিদ বলিল—"তা'রা চারজন ছিল। তা'র মধ্যে রহমান আর ময়রাদের ফট্‌কে জখম হয়েছে, আর দুজন পালিয়েছে। একজন মনে হ'ল আবদুল গণি, আর একজনকে চেনা গেল না,—বোধ হয় ভিন্ন গাঁয়ের লোক।"

পরদিন রঘুনাথের মন্ত্রণা-সভা বসিল। এ গাঁয়ে যে পাপ এতদিন ছিল না, তাহা যখন দেখা দিয়াছে, তখন তাহার প্রতিকারের উপায় করিতে হইবে। রাত্রে রীতিমত পাহারার ব্যবস্থা হইল। এগারটা হইতে ভোর পাঁচটা পর্য্যন্ত এক একটি ছোট দল পালা করিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিবে। দুইজন সর্দ্দার, রঘুনাথ ও হামিদ, মধ্যে মধ্যে রোঁদে বাহির হইয়া দেখিবে ঠিকমত কাজ হইতেছে কি না।

তারপর শরীর চর্চ্চার ব্যবস্থা হইল। ব্যায়ামের আখড়া করিবার জন্য যদু মোড়লের কাছে এক টুকরা জমীর জন্য আবেদন করা হইল। মোড়ল গ্রামের মাতব্বরদের সহিত পরামর্শ করিল। সকলেরই মত যে ছোকরারা যদি মন্দ পথে না গিয়া এই সব লইয়া থাকে সে ভালই, তাহাতে গ্রামের উপকার ছাড়া কোন ক্ষতি নাই।

অনুমতি পাইবামাত্র রঘুর দল বাঁশ কাটিয়া চারিদিকে বেড়া দিল। চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ব্যায়ামের সাজ সরঞ্জাম কেনা হইল। তাহার জন্য একটা চালা ঘরও উঠিল। জমীটার একাংশ কুস্তির জন্য খোঁড়া হইল, বাকীটা লাঠি খেলা, মুগুর ভাঁজা, ডন, বৈঠক, ইত্যাদির জন্য পিটিয়া সমতল করা হইল। গ্রামের যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল।

৫

একবার রোঁদে বাহির হইয়া রঘুনাথ দেখিল, গয়লা-পাড়ায় একটা কাঁঠাল গাছের তলায় জন তিন-চার লোক বসিয়া নিম্নস্বরে কথা কহিতেছে। দূর হইতে অন্ধকারে তাহাদের চেনা গেল না; তবে তাহার দলের লোক নয় তাহা বেশ বোঝা গেল। অতি সন্তর্পণে পিছন হইতে যাইয়া রঘুনাথ একেবারে তাহাদের সম্মুখে গিয়া চাপা গলায় হাঁকিল—"কে রে সব, এত রাত্রে, এখানে?"

তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইতেই টর্চের আলো মুখের উপর পড়িল। রঘুনাথ দেখিয়া চিনিল—রহমান, ফট্‌কে, ভোলা। ভোলা ছুটিয়া পলাইল, আর দুইজন দাঁড়াইয়া রহিল

রঘুনাথ বলিল—"কি, নব হাওয়া খেতে বেরুনো হয়েছে নাকি? আজা পা জোড়া লেগেছে বুঝি? কিন্তু মনে থাকে যেন, সেবার একটা ঠেঙের উপর দিয়ে গেছে, এবার মাথা ফাটবে।"

তাহারা কি বলিতে যাইতেছিল, রঘুনাথের হাতের লাঠি দেখিয়া আর সাহস হইল না। রঘুনাথ বলিল—"চ' তোদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যাই। ছোকরারা পাহারায় বেরিয়েছে, দেখলে হয় ত আবার ঠ্যাং ভেঙ্গে দেবে।"

পরদিন রহমান থানায় গিয়া এজাহার দিল রঘু চক্রবর্ত্তী বড় দুর্দ্দান্ত হইয়া পড়িয়াছে, দল বাঁধিয়া গ্রামের লোকের উপর অত্যাচার করিয়া বেড়ায়, রহমানকে বিনা কারণে গালাগালি দিয়াছে, মারিয়াছে।

ছোট দারোগা আশ্বাস দিয়া বলিলেন, দু'এক দিনের মধ্যে তিনি কাছেই এক জায়গায় চুরির তদন্তে যাইবেন, সেই সময়ে যেন রহমান তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে, তিনি গিয়া সব ঠাণ্ডা করিয়া দিয়া আসিবেন।

দারোগা আসিলেন। রঘুনাথকে ডাকাইয়া আনিয়া খুব খানিক হাঁক-ডাক করিলেন। রঘুনাথ বলিল—"দারোগা বাবু, রহমানকে আমি গালাগাল দিইনি, মারিওনি, তবে গোটা কতক কড়া কড়া কথা বলেছি বটে, একদিন হয়ত ওর মাথা ফাটাব বলেছি। কিন্তু রাত দুটোর সময় ও গয়লা পাড়ায় যায় কেন তা' বলুক।"

দারোগা রাগিয়া উঠিলেন; বলিলেন—"কেন যায় স কৈফিয়ৎ কি তোমার কাছে দিতে হ'বে? কেন, ও কি তোমার বাবার রেয়ৎ?"

রঘুনাথ রুখিয়া উঠিয়া বলিল—"খবরদার মুখ সামলে কথা কইবেন। আপনি পুলিসের দারোগা, যা' খুসী করবার ক্ষমতা রাখেন জানি। তা' ব'লে ভদ্রলোক হয়ে মুখ খারাপ করবেন কেন? ব্যাপার কি জানেন? নন্দ গয়লার মেয়ে আজ দু' বছর হ'ল বিধবা হয়েছে। এতদিন স শ্বশুর বাড়ীতে ছিল, এখন তা'রা গলগ্রহটাকে দূর ক'রে দিয়েছে, তাই মাসখানেক হ'ল এখানে এসে রয়েছে। এখন বুঝুন, রহমান আর তার সঙ্গীরা—তাদের নাম এখন মার করে কাজ নেই—ঐ নন্দর বাড়ীর আনাচে-কানাচে রাত-দুপুরে ঘুরে বেড়ায় কেন।"

রহমানকে খুব ধমক দিতে সে বলিল—"না হুজুর, ওসব মিছে কথা। গাঁয়ে আমার অনেক দুষমন আছে, তারা—"

দারোগা রঘুনাথের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"তাই যদি হয়, তা'র জন্যে ত আমরা রয়েছি। তোমাদের এ অনধিকার চর্চ্চা করবার কোন দরকার নেই।"

রঘুনাথ হাসিয়া উত্তর করিল—"আজ্ঞে, আপনারা ত আছেন জানি। কিন্তু হঠাৎ দরকারের সময় আপনাদের পাচ্ছি কোথায় বলুন। চোর পালালে তখন—"

দারোগা বলিলেন—"সে ভারও ত আমাদের। কেন, চৌকিদাররা রাত্তিরে বেরোয় না? কি হে দফাদার? ......আর তেমন দরকার যদি বোঝা যায়, আর দুটো চৌকীদার বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। তা' ব'লে তোমরা এসবে হাত দিও না,—বিপদে পড়বে। এবার সাবধান ক'রে দিয়ে যাচ্ছি,—আর যদি এ রকম দল বেঁধে রাত্তিরে ঘোরাঘুরি কর, কি একটা হাঙ্গাম বাধাও, তা'র ফল ভুগতে হ'বে।"

সভা ভঙ্গ করিয়া দারোগা উঠিলেন। গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। যাইতে যাইতে রঘুনাথ ও তাহার দলের বিস্তারিত বিবরণ দারোগার কর্ণগোচর করা হইল। কেহ কেহ তাহাদের সুখ্যাতি করিল। আবার যাহারা তাহাদের ভয় করিত তাহারা দুই-চারিটা বিরুদ্ধ কথাও শুনাইল।

রঘুর দলের আখড়া দেখিয়া দারোগা বহু মোড়লকে বলিলেন—"এটা ভাল করনি, মোড়লের পো। ছেলে-গুলো এই রকম করে' যদি এক-একটা গুণ্ডা হয়ে ওঠে, ত দেশের পক্ষে সেটা মস্ত অমঙ্গল। ক্রমে ডাকাতের দল হয়ে দাঁড়া'তেই বা কতক্ষণ! এ পাপ দূর কর, বুঝেছ? নইলে তুমিও বিপদে পড়তে পার।"

তার পর মুরুব্বির দলকে উদ্দেশ্য করিয়া দারোগা উপ-দেশ দিয়া গেলেন—"তোমাদের ছেলেদের নিয়েই ত এই দল, —এদের জন্যে তোমাদেরই ত ভুগতে হ'বে। এই রকম ছোকরাদের উপর কড়া নজর রাখ্‌বার জন্যে উপর-ওয়ালা-দের হুকুম আছে। দরকার হ'লে দলকে দল চালান দেবার ক্ষমতা আমাদের আছে। তখন কেউ জেলে যা'বে, কেউ অন্তরীণ হবে, কেউ বা মুচলেকা দিয়ে তবে নিস্তার। শুধু তা'ই নয়,—ছেলেদের শাসনে না রাখ্‌তে পারলে অভি-

ভাবকদের পর্য্যন্ত নিয়ে টানাটানি হ'তে পারে। তাই বল্‌ছি, নিজের নিজের ছেলেদের সামলাও। ওদের এক-একটা কাজ-কর্ম্মে লাগিয়ে দাও, কিছু না হয় বিয়ে দিয়ে দাও,—সব ঠাণ্ডা হয়ে যা'বে, দল আপনিই ভেঙ্গে যা'বে।"

কয়েক দিন পরে দেখা গেল রঘুনাথের আখড়ার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। চালাঘরখানি অন্তর্হিত হইয়াছে এবং সমস্ত জায়গাটা কোপাইয়া রাতারাতি বেগুণ-চারা বসানো হইয়া গিয়াছে।

দুইজন সঙ্গী লইয়া রঘুনাথ থানায় নালিশ করিতে গেল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। দারোগা তাহাদিগকে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবার পরামর্শ দিয়া ফিরাইয়া দিলেন।

রঘুনাথ তাহাতেও দমিল না। বলিল—"কুছ পরোয়া নেই! আমার বাড়ীতে আখড়া হ'বে। ভিতরে অনেকখানি উঠান আছে, আর মেয়েছেলের বালাই ত নেই,—বেশ হ'বে।"

নবীন উদ্যমে নূতন আখড়ার প্রতিষ্ঠা হইল। আবার পূর্ব্বের মত ব্যায়াম-চর্চ্চা চলিতে লাগিল। রাত্রে পাহারার কাজও চলিল; তবে খুব সাবধানে,—যাহাতে চোরও না জানিতে পারে গৃহস্থও না জানিতে পারে।

ছোকরাদের ঠাণ্ডা করিবার যে মুষ্টিযোগ দারোগা শিখাইয়া গিয়াছিলেন, কয়েক স্থলে তাহারও প্রয়োগ হইল। কিন্তু দুই-একজন ছাড়া কেহই ঠাণ্ডা হইল না। তাহারা রঘুনাথের কথায় মরে-বাঁচে,—বাপ-খুড়াকে কেয়ারই করে না। কাজেই বাপ-খুড়ার দলকে অন্য উপায় চিন্তা করিতে হইল।

৬

কৈলাশের জাঠতুত ভাই শিবনাথ জামালপুরে রেল-কারখানায় কাজ করেন। সেখানে তাঁহার রোজগারও বেশ, প্রভাব প্রতিপত্তিও মন্দ নয়। পূজার সময় দেড় মাসের ছুটি লইয়া শিবনাথ কয় বৎসর পরে এবার দেশে আসিয়াছেন।

গ্রামের মাতব্বরগণ পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, রঘুটাকে যদি শিবনাথের সঙ্গে জামালপুর চালান করা যায়, তাহারও একটা হিল্লে হয়, দেশেও শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুন্ন থাকে। তাহারা সকলে মিলিয়া শিবনাথকে ধরিয়া বসিল।

শিবনাথ যদি বা সম্মত হইলেন, রঘুনাথ কিছুতেই রাজী হয় না। এমন স্বাধীন সচ্ছন্দ জীবন ছাড়িয়া একা বিদেশে গিয়া থাকিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা নাই। কৈলাশ কয়েকদিন ধরিয়া অনেক বুঝাইল। রঘুনাথ একমাত্র কৈলাশকেই একটু মানিত; কারণ কৈলাশ যে তাহাকে আন্তরিক ভালবাসে তাহা সে জানিত। কৈলাশের কথায় ক্রমশঃ তাহার মনটা একটু নরম হইল। তারপর জামালপুরের বিরাট কারখানা ও পাহাড়, মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ড এবং মীরকাসেমের পুরাতন কেল্লা ও তাহার পাশে গঙ্গা—বর্ষাকালে যাহার এপার ওপার দেখা যায় না—এই সমস্ত বর্ণনা শুনিয়া তাহার একটু কৌতূহলও হইল। সে যাইতে রাজী হইল। কিন্তু কথা রহিল যে দিন কতক থাকিয়া যদি ভাল না লাগে ত ফিরিয়া আসিবে।

জামালপুরে আসিয়া রঘুনাথের মাসখানেক বেশ কাটিল। শিবনাথ তাহার জন্য একটা কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে যা' হ'ক একটা জুটিয়া যাইবে এরূপ ভরসা আছে।

ইতিমধ্যে একদিন মুঙ্গের হইতে আসিল বিজয় কর্ম্মকার। সেও শিবনাথের স্বগ্রামবাসী এবং তাঁহারই সঙ্গে আসিয়া কয়েক বৎসর হইল মুঙ্গেরে সেকরার দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। জামালপুরে তাহার বিস্তর খরিদ্দার, মুঙ্গেরেও কিছু কিছু কাজ পায়। সুতরাং তাহার কারবার এখন বেশ চলিতেছে।

বিজয়ের সঙ্গে মুঙ্গেরে বেড়াইতে আসিয়া জায়গাটা রঘুনাথের খুব পছন্দ হইয়া গেল। বিজয়ের দোকান চক্‌-বাজারে। সেখানে বাঙ্গালীর বাস কম; অধিকাংশ দোকানদার বিহারী হিন্দু ও মুসলমান। দিন কয়েক থাকিতে থাকিতে তাহাদের মধ্য হইতেও রঘুনাথের দু'-চারজন বন্ধু জুটিয়া গেল।

ওদিকে শিবনাথ তাহার একটা কাজ যোগাড় করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কিন্তু রঘুনাথের বেশ

নিরুদ্বেগে দিন কাটিতেছে। সে কখন জামালপুরে থাকে কখন মুঙ্গেরে।

রবিবারে ছুটির দিনে বিজয় প্রায়ই জামালপুর যায়, সেদিনও গিয়াছিল। ফিরিতে রাত্রি বেশী হইয়া গেল, রঘুনাথ তখন ঘুমাইয়াছে। সকালে যখন বিজয় উঠিল তাহার অনেক পূর্ব্বেই রঘুনাথ বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। দুপুরে বাসায় ফিরিয়া সে বিজয়ের নিকট শুনিল যে শিবনাথ তাহাকে ডাকিয়াছেন, আজই যাইতে হইবে।

স্নানাহারের পর একটু বিশ্রাম করিয়া লইয়া রঘুনাথ যখন জামালপুর যাইবার জন্য বাহির হইল, তখন বিজয়ের খাওয়া হইয়া গিয়াছে, সে রাস্তার ধারে রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছে। বিজয়ের আট বছরের মেয়ে পার্ব্বতী সামনের মুদীর দোকানের দাওয়ায় বসিয়া সমবয়সী হিন্দুস্থানী মেয়েদের সঙ্গে খেলা করিতেছে।

চক্-বাজার ও বড়বাজারের রাস্তার মোড়ে—যেখান হইতে জামালপুরের বাস্ ছাড়ে—সেই দিকে অগ্রসর হইতে হইতে হঠাৎ যেন রঘুনাথের মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল। টাল সামলাইয়া লইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে গিয়া পারিল না। তখন সে চাহিয়া দেখিল রাস্তার লোকেরা আতঙ্কে চীৎকার করিয়া টলিতে টলিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। বুঝিতে বাকী রহিল না যে বিষম ভূমিকম্প হইতেছে। ততক্ষণে সে মোড়ের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। দেখিল সম্মুখে কেল্লার ঘড়িওয়ালা ফটক মুহূর্ত্তের মধ্যে ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল।

রঘুনাথের আর যাওয়া হইল না, সেইখান হইতেই ফিরিল। খদ্দরের চাদরটা মাথায় পাগড়ির মত করিয়া জড়াইয়া সে বিজয়ের বাসার দিকে ছুটিল। পৃথিবী তখনও কাঁপিতেছে। রাস্তার দু'ধারের সমস্ত বাড়ী—অধিকাংশই খোলার ঘর—ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কিছুদূর গিয়া আর রাস্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না,—সমস্ত চক্-বাজারটা ইট, কাঠ, খোলা ও মাটির স্তূপে পরিণত হইয়াছে।

আর একটু যাইতেই রঘুনাথ পার্ব্বতীকে দেখিতে পাইল। সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে,—ঘর কোথায় খুঁজিয়া পাইতেছে না। রঘুনাথকে দেখিতে পাইয়া সে প্রাণপণে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। রঘুনাথ তাহাকে একটু অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে বসাইয়া বলিল,—"এইখানে চুপ ক'রে ব'সে থাক্, কোথাও যাস্‌নি, আমি এখনি আস্‌ছি।"

একটু দূরে একটা ভগ্ন-স্তূপের উপর হইতে ডাক আসিল,—"রঘু ঠাকুর, ও রঘু ঠাকুর, শীগগির এস,—সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। পার্ব্বতী কোথায় জানি না, বৌটা বোধকরি চাপা পড়েছে।" রঘুনাথ ছুটিয়া গেল। বলিল—"পার্ব্বতী ঠিক আছে,—তা'কে বসিয়ে রেখে এসেছি। এখন চল, বৌকে খুঁজে বা'র করতে হ'বে।"

দু'হাতে খাপড়া সরাইতে সরাইতে দুজনে অগ্রসর হইল। এক জায়গায় দেখা গেল চারিদিকে বাসন ছড়ানো রহিয়াছে, এবং তাহারই মাঝখানে বিজয়ের স্ত্রী উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। চালের পচা বাখারিগুলাকে পটাপট ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া রঘুনাথ নিমেষের মধ্যে খানিকটা ফাঁকা করিয়া ফেলিল এবং ভিতরে ঢুকিয়া বৌটিকে কোলে করিয়া বাহির হইয়া আসিল। তখন তাহার জ্ঞান নাই; তবে বেশী আঘাত পায় নাই,—কেবল বাসনের উপর পড়িয়া কপালের খানিকটা কাটিয়া গিয়াছে।

অতি কষ্টে একটু জল খুঁজিয়া বাহির করিয়া চোখে মুখে দিতে স্ত্রীলোকটির জ্ঞান হইল। সে উঠিয়া বসিল। তারপর দুইজনে ধরাধরি করিয়া তাহাকে খোলা মাঠের দিকে লইয়া চলিল।

এমন সময় একজন মুসলমান ছুটিয়া আসিয়া রঘুনাথের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"বাবু সাহেব, মেরা বিবিকা ভি পাত্তা নহি মিল্‌তা, আপ চলিয়ে জরা, মেহেরবানি করকে।"

লোকটিকে রঘুনাথ চিনিত,—কাছেই তাহার দরজীর দোকান ছিল। রঘুনাথ পার্ব্বতীকে ডাকিয়া দিয়া তাহাদের মাঠের দিকে যাইতে বলিয়া সে মুসলমানটির সঙ্গে চলিল।

অল্পক্ষণের মধ্যে দরজীর স্ত্রীকে উদ্ধার করিয়া দু'জনে

মিলিয়া তাহাকেও মাঠে আনিয়া হাজির করিল। কোথা হইতে দু'-তিন খানা খাটিয়া এবং কয়েক খণ্ড বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দুজনে মিলিয়া একটুখানি স্থান ঘেরিয়া ফেলিয়া মেয়েদের তাহার ভিতর বসাইল।

তারপর রঘনাথ বলিল—"খলিফা সাহেব, আব্ ত সব কা জান বাঁচ গিয়া,—চলিয়ে আউর কিসিকো—"

"জী হাঁ, জরুর!"—বলিয়া খলিফাও প্রস্তুত হইল।

আজ রঘুনাথের একটানা জীবন-স্রোতে সহসা বান ডাকিয়াছে,—কর্ম্মের আহ্বানে তার সারা দেহ-প্রাণে এক দুর্দ্দমনীয় উৎসাহের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নেতৃত্ব করিবার জন্যই যেন তাহার জন্ম। তাই আজ এই একটি মাত্র সহযোগী পাইয়া তাহার সেই মজ্জাগত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। তাহার এই প্রচণ্ড কর্ম্ম-প্রচেষ্টা খলিফার হৃদয়েও সংক্রামিত হইল,—তাহার উদ্দাম মুসলমান রক্ত নাচিয়া উঠিল! দু'জনে মিলিয়া সেই বিপদ-সঙ্কুল ভীষণ শ্মশান ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল।

কোথায় কাহাকে খুঁজিয়া পাইবে! যাহাদের প্রাণ বাঁচিয়াছে, তাহারা শুধু প্রাণটুকু লইয়াই পলাইয়াছে। যাহারা এই বিরাট ভগ্ন স্তুপের নীচে সমাহিত তাহাদের কোন চিহ্নই নাই! তথাপি চারিদিকে চাহিতে চাহিতে, কোথাও যদি কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় কান পাতিয়া শুনিতে শুনিতে তাহারা অগ্রসর হইল।

কিছুদুর গিয়া দেখা গেল, একটা দোতলা মাটকোঠা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কেবল এক দিককার দেওয়াল তখনও দাঁড়াইয়া আছে। সেই দেওয়ালের সংলগ্ন একখানা শাল কাঠের কড়ির উপর একটা খোঁটা ধরিয়া এক বুড়ী বসিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে,—"আরে বাপ্পা রে, মর গইলি রে! আরে মাইয়া রে, মর গইলি রে!"

প্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলা-ক্ষেত্রেও বুড়ীর রকম দেখিয়া রঘুনাথ হাসিয়া ফেলিল। তারপর খলিফাকে বলিল—"আপ আগে বাঢ়িয়ে,—হাম বুঢ়িয়াকো উপর লেতা হায়।"

খলিফা অগ্রসর হইল। রঘুনাথ দেওয়ালের পিছন দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দেওয়ালটা এতক্ষণ কোন-রূপে আলগোছে দাঁড়াইয়াছিল, মানুষের ভার সহিতে না পারিয়া পড়িয়া গেল,—ঠিক একখানা প্রকাণ্ড তক্তার মত। বুড়ী আশ্রয়চ্যুত হইয়া নিম্নে একটা খোলার চালের উপর পড়িয়া গেল এবং গড়াইতে গড়াইতে একটা মাটির ঢিপিতে লাগিয়া আটকাইয়া গেল।

বুড়ীর গায়ে আঘাত বিশেষ লাগে নাই। কিন্তু সে আতঙ্কে চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল,—বোধ হয় মনে করিল সে মরিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে চোখ চাহিয়া সে বুঝিল যে মরে নাই। তখন সে উঠিয়া ঢিপিটার উপর বসিল। নিকট দিয়া দুইজন লোক অতি উৎকণ্ঠিত ভাবে ছুটিয়া যাইতেছিল। বুড়ী তাহাদের লক্ষ্য করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"এ ভাইয়া, বাঁচ গইলি; এ বাবুয়া বাঁচ গইলি!" তাহারা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু রঘুনাথ! রঘুনাথ কোথায় গেল? খলিফা অনেক দুর অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু রঘুনাথ গিয়া জুটিল না দেখিয়া সে আবার ফিরিয়া আসিল। বুড়ীকে নিরাপদ দেখিয়া সে নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এ বুঢ়িয়া, উ বংগালী বাবু কাঁহা গিয়া?"

বুড়ী নির্ব্বিকার চিত্তে উত্তর করিল—"কা জানি, হাম ত বাঁচ গইলি।"

মৃত্যুর হাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বুড়ীর প্রাণে আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু সে বুঝিল না, তাহার তুচ্ছ অকিঞ্চিৎ-কর প্রাণটাকে বাঁচাইবার জন্য কত বড় একটা মূল্যবান জীবনের অবসান হইয়াছে।

খলিফা আর সেখানে দাঁড়াইল না। "বাবু সাহেব, বাবু সাহেব" করিয়া প্রাণপণ চীৎকার করিয়া সে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং পাগলের মত এটা-ওটা সরাইয়া রঘুনাথকে অনেকক্ষণ ধরিয়া খুঁজিল। তারপর ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল এবং বালকের ন্যায় ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল—"এ মেরে দোস্ত! এ মেরে মালিক!"

৮

রঘুনাথ আর ফিরিল না।

বিজয় সেই দারুণ শীতে স্ত্রী কন্যা লইয়া তিন দিন মাঠেই কাটাইল। তারপর দোকান হইতে যাহা কিছু

পারিল উদ্ধার করিয়া সে জামালপুর গেল। সেখানে বাবুদের নিকট প্রাপ্য টাকা যাহা পাইল তাহা লইয়া দেশে ফিরিল।

রঘুনাথের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ দেশের লোক বিজয়ের কাছে শুনিল। কিন্তু মৃত্যু যে কিরূপে ঘটিয়াছে বিজয় তাহা বলিতে পারিল না। তথাপি সকলে বুঝিল রঘুনাথের আত্ম-বিসর্জ্জন বৃথা যায় নাই,—নিশ্চয় কিছু করিয়া তবে সে মরিয়াছে।

এই দুঃসংবাদে গ্রামের স্ত্রীলোক মাত্রেরই চক্ষে জল পড়িল। ছোকরারা প্রথমটা শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। তারপর হামিদকে রঘুনাথের স্থলাভিষিক্ত করিয়া "রঘুনাথ সেবা সমিতির" প্রতিষ্ঠা করিল।

কেবল বিজ্ঞের দল একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল—"ডানপিটের মরণ, ঐ রকমই হয়।"

সত্যরঞ্জন সেন

বিদ্যুতের কথা

শ্রীনীলরতন কর

বস্তুর অবস্থা, অবস্থান ও সজ্জার বৈচিত্র্য বৈদ্যুতিক শক্তির আচরণে কি প্রকার পরিবর্তন ঘটায় গত শত বৎসর যাবৎ বিজ্ঞানীগণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তার সন্ধান নিচ্ছেন। একারণে বিদ্যুতের স্বরূপ বিষয়ে কারও প্রকৃত জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও এর সাহায্যে ব্যবহারিক কাজ চালানো আটকে থাকেনি।

বৈজ্ঞানিক গবেষকগণের মন্তব্য থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ইলেক্‌ট্রন্ বিদ্যুতের প্রকার বিশেষ। জড়জগতের অণু পরমাণু যে সকল চরম কণিকার সমাবেশে রচিত ইলেকট্রন সেই কণিকাদের অন্যতম। ইলেকট্রন্‌সমূহ প্রায় ওজনহীন এবং পরমাণু হতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করতে পারে। বিদ্যুত বহনশীল তারে হাত দিলে আমরা যে ধাক্কা বোধ করি সাধারণ দ্রব্যাদি স্পর্শে তা অনুভব করি না। কেন্দ্রিনস্থিতধনাত্মক সঞ্চারের সহিত ইলেক্‌ট্রনের ঋণাত্মক সঞ্চার মিলিত থাকায় বস্তুসমূহ বাহিরে নিরসক্তের মতো আচরণ করে। কিন্তু যেখানে ইলেক্‌ট্রনরা এক পরমাণু থেকে অপর পরমাণুতে ধারাবাহিকভাবে প্রবাহিত হয় সেখানে অতি সহজে বিদ্যুতের অস্তিত্ব ধরা পড়ে এবং সেখান হতে আমাদের কাজ চালানোর উপযোগী বিদ্যুত পাওয়া যায়। রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রভাবে বৈদ্যুতিক সেল্ হতে এবং চুম্বকের গতি প্রভাবে ডাইনামো যন্ত্র হতে ইলেকট্রন সমূহ প্রবাহিত হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বৈদ্যুতিক ঘটনার সব কিছু এই ইলেকট্রণের চলাচলের উপর নির্ভর করে।

বিদ্যুতের ব্যবহার আজকাল যেভাবে প্রসার লাভ করছে তাতে প্রত্যেকেই এ বিষয়ে কিছু না কিছু সংবাদ রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। বৈদ্যুতিক আলো পাখা প্রভৃতির কথা ত নিতান্ত সাধারণ, টেলিফোন, বেতারযন্ত্র, ডাইনামো প্রভৃতির বহুল প্রচলন ফলে বিদ্যুত সম্পর্কে বহু তথ্য মুখে মুখে প্রচারিত হচ্ছে। কাজেই, এই সকল যন্ত্র ব্যবহারকারীদের অনেকে volt, ampere, resistance, inductance, thermionic valve, triode ইত্যাদির বিষয় অল্পবিস্তর জ্ঞাত আছেন।

এখানে আমরা এমন একটী সামগ্রীর দৃষ্টান্ত ধ'রে আলোচনার সূত্রপাত করব যার সঙ্গে আধুনিকযুগের প্রায় সকলেই পরিচিত। জিনিষটির নাম বৈদ্যুত রাসায়নিক ব্যাটারী বা অ্যাকুমুলেটর। অনেকস্থানে এটি বেতারযন্ত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর ভিতর জটীল কোনও কলকব্জা নেই। ব্যাটারীটি মোটের উপর একটি সেলুলয়েড্ অথবা কাচের পাত্র, তার ভিতর ফিকা সালফিউরিক অ্যাসিডে

ডোবানো থানকয়েক সিসার পাত থাকে। ব্যাটারী বহুসংখ্যক সেল্ (Cell)এর সমষ্টি, প্রত্যেক সেলএ দুইটি বিদ্যুত পরিচালন-প্রান্ত আছে; প্রান্ত দুইটীর একটীতে লাল চিহ্ন এবং অপরটিতে কালো চিহ্ন আঁকা থাকে। যাতে একাধিক সেলকে নির্ভুলভাবে সজ্জিত করা যায় সেই উদ্দেশ্যে এই চিহ্ন দুইটি দেওয়া হয়।

যদি একটি তামার তারের সাহায্যে দুইটি একই প্রকার অবস্থায় স্থিত বৈদ্যুতিক সেলের লাল চিহ্নিত প্রান্তদ্বয় একত্র সংযোগ করা যায় এবং কালো চিহ্নিত প্রান্তদ্বয় আর একটি তার দ্বারা সংযোগ করা যায় তবে সেল দুটির ভিতরে কিংবা বাহিরে বিশেষ কোনও পরিবর্তন ঘটে না। পক্ষান্তরে যদি একের কালো প্রান্তের সহিত অপরের লাল প্রান্ত জুড়ে দেওয়া যায় তাহলে শেষের প্রান্ত দুটি সংযোগের সময়
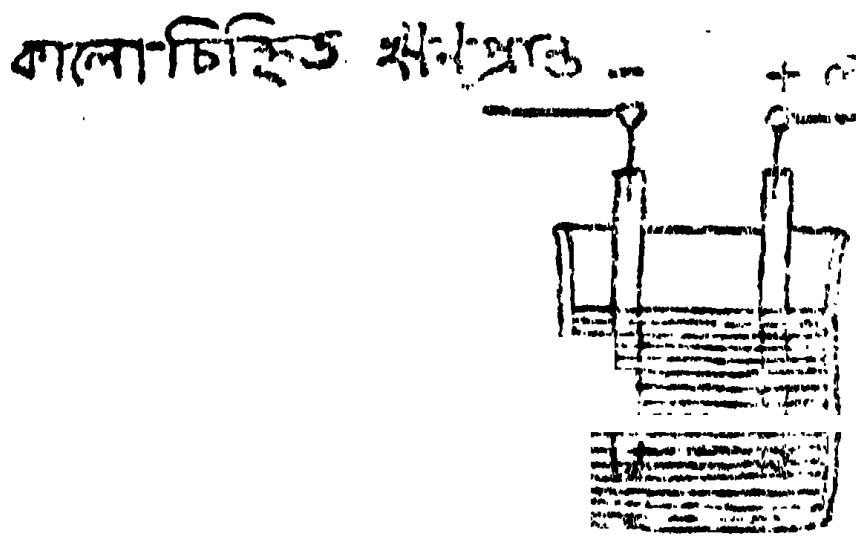
বৈদ্যুত-রাসায়নিক সেল্।

বিদ্যুত স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়। এইভাবে সংযোগ করতে গেলে হাত পোড়ানোর বিশেষ সম্ভাবনা, তা ছাড়া এর পরিণাম স্বরূপ হয় সংযোগকারী তারটি পোড়ে, নয়ত সেল দুইটি নষ্ট হয়।

সেল অথবা ব্যাটারীর লাল চিহ্নিত প্রান্ত থেকে কালো চিহ্নিত প্রান্তে তার যোগ করা থাকলে যে ব্যাপার ঘটে তাকে সাধারণ ভাষায় বলা হয়—ধনপাত থেকে তার বেয়ে ঋণপাত অভিমুখে ধনবিদ্যুত প্রবাহিত হচ্ছে। প্রকৃত ঘটনা বলতে গেলে এই কথাকেই ঘুরিয়ে বলা যায় ঋণপ্রান্ত থেকে ধনপ্রান্তের দিকে ঋণ বিদ্যুত বা ইলেকট্রন প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু লালের সহিত লাল এবং কালোর সহিত কালো প্রান্ত যুক্ত হলে তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুত প্রবাহের কোনও প্রবণতা থাকে না।

রাসায়নিক প্রক্রিয়া হেতু সেলটির ভিতর ঋণপাতে ইলেকট্রনের আধিক্য হয় আর ধনপাতে ইলেকট্রনের অভাব হয়। ইলেকট্রনরা ঋণপাত থেকে ধনপাতে যাবার কোনও সুবিধা না পেলে ঋণপাতের উপরেই জমতে থাকে। ক্রমে সেখানে ইলেকট্রনের ভিড় জ'মে ওঠে। শেষ পর্যন্ত তাদের ভিড় এমন চরম সীমায় পৌছে যে রাসায়নিক দ্রব্য সেখানে আর ইলেকট্রন ঠেলতে পারে না।

বৈদ্যুত রাসায়নিক সেল বহু প্রকারের হয়ে থাকে। প্রকার বিশেষে তাদের রাসায়নিক সাজসজ্জাও বিভিন্ন। কোনটিতে হয়ত সালফিউরিক অ্যাসিডের পরিবর্ত্তে কষ্টিক্ পটাশ ব্যবহৃত হয় আর সিসার পাতের বদলে ব্যবহার হয় লোহা অথবা নিকেলের পাত। আবার কোনওটিতে হয়ত অ্যামোনিয়াম্ ক্লোরাইড্ বা নিশাদল, দস্তার পাত, কার্বন্ দণ্ড প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। সাধারণ টর্চ বা বিদ্যুত মশালে যে সেল থাকে তাতে শেষোক্ত প্রকার ব্যবস্থা আছে।

রাসায়নিক প্রক্রিয়া ফলে প্রত্যেক প্রকার সেল থেকেই ইলেকট্রনের প্রবাহ পাওয়া যায়। সেলটি যতক্ষণ ভাল অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ তার প্রান্তদ্বয়ে একটা সুনির্দ্দিষ্ট ইলেকট্রণের চাপ বিরাজ করে। খুব নিখুঁত ভাবে তৈরী হলেও যে কোনও সেল তার ইলেকট্রন চাপের সুনির্দ্দিষ্ট চরম সীমাকে কখনও অতিক্রম করতে পারে না। সাধারণত এই ইলেকট্রনের চাপ ভোলটেজ নামে অভিহিত। ইলেকট্রন কতখানি চাপ দিচ্ছে তারই হিসাব দিতে গিয়ে সেলের ভোলটেজ দুই, অথবা বিদ্যুত সরবরাহকারী প্রধান তারের ভোলটেজ দুই শত কুড়ি ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। কোনও অ্যাকুমুলেটরের প্রান্ত দুটি একটি তার দিয়ে জুড়ে দিলে তারটি গরম হ'য়ে ওঠে; খুব বেশী গরম হ'লে তার দিয়ে আলো বেরোয়। তারটি যদি বারবার সংলগ্ন ও বিচ্ছিন্ন করা যায় তবে প্রত্যেক বার খোলা ও লাগানোর সময় স্পৃষ্ট স্থানটিতে বিদ্যুত স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়। ঋণপাতে সঞ্চিত ইলেকট্রনরা তার বেয়ে ইলেকট্রনের অভাবগ্রস্ত ধনপাতে প্রবাহিত হওয়ার জন্যই এই ঘটনাটি লক্ষিত হয়। যতক্ষণ রাসায়নিক দ্রব্যটি

নিঃশেষ না হয় এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঠিক একভাবে চলার পথে কোনও বাধা না পায় ততক্ষণ সেলের দুইটি পাতের মধ্যে ইলেকট্রনের পরিমাণের পার্থক্য প্রায় একরূপ থাকে ।

পরিপূর্ণ বিদ্যুত সঞ্চারযুক্ত সেলের দুই প্রান্তে তার সংযোগ করলে ইলেকট্রনের প্রবল ভিড় হালকা করার জন্য প্রথম মুহূর্তে চাপটা পরবর্তী কালের চেয়ে কিছু বেশী হয়, তারপর বহুক্ষণ প্রায় সমান চাপে বিদ্যুত প্রবাহিত হ'তে থাকে। ইলেকট্রনের এই প্রবাহের নাম বিদ্যুত প্রবাহ (Current)। প্রত্যেক ইলেকট্রনের প্রবাহের সমষ্টি নিয়েই বিদ্যুত প্রবাহ, যেমন নদীর প্রত্যেক জল বিন্দুর প্রবাহ সমষ্টিতেই নদীর স্রোত।

নল দিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে কতটা জল বেরিয়ে যায় তা দিয়ে আমরা যেমন কলের জলের স্রোত নিরূপণ করি, সেইরূপ প্রতি সেকেণ্ডে তার বেয়ে কি পরিমাণ ইলেকট্রন ছুটে যায় তা দিয়ে বিদ্যুত প্রবাহ নির্দেশ করা হয়। সাধারণত জলপ্রবাহের বেলা যেমন কতগুলি জলবিন্দু ছুটে যাচ্ছে তার হিসাব না দিয়ে বলা হয় কত গ্যালন জল যাচ্ছে, সেইরূপ বিদ্যুত প্রবাহের বেলা বলা হয় কত অ্যাম্পিয়া বিদ্যুত যাচ্ছে এক অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুত অর্থে প্রতি সেকেণ্ডে ৬,০০ ০,০০০,০০০,০০০,০০০ সংখ্যক ইলেকট্রনের প্রবাহ।

জলপ্রবাহের সঙ্গে বিদ্যুত প্রবাহের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। যেমন কোনও উচ্চ স্থান থেকে অথবা কোনও পাম্প হতে জলপ্রবাহ সরু নল দিয়ে যাবার সময় মোটা নল অপেক্ষা বেশী বাধা পায় এবং নলের দৈর্ঘ্য যত বাড়ে বাধাও তত অধিক হয়, সেইরূপ কোনও ব্যাটারী অথবা ডাইনামো যন্ত্র থেকে বিদ্যুত প্রবাহ সরু তার বেয়ে যেতে মোটা তারের চেয়ে বেশী বাধা পায় এবং তারের দৈর্ঘ্য যত বাড়ে বিদ্যুত প্রবাহের পথে বাধা তত বৃদ্ধি পায়। বিদ্যুত প্রবাহ পথে এই বাধার নাম বৈদ্যুতিক রোধ (electrical resistanco)। কাচ, পিচ, সেলুলয়েড প্রভৃতি বস্তুর বিদ্যুত রোধন সামর্থ্য এত অধিক যে বৈদ্যুতিক ব্যাটারীর প্রান্তদ্বয় এই দ্রব্যের গায়ে আটকে রাখলে বস্তুটির ভিতর দিয়ে বিদ্যুত প্রবাহিত হতে পারে না। এই সকল দ্রব্য 'প্রতিরোধক বস্তু' বা 'ইনসুলেটর' নামে পরিচিত। শুষ্ককাঠ, রবার, পোর্সেলিন্, ইবনাইট্ ব্যাকেলাইট প্রভৃতি এই 'প্রতিরোধক' বস্তুর অন্তর্গত!

বিভিন্ন বস্তুর বিদ্যুত পরিচালকতত্বগুণে পার্থক্য আছে। অধিকাংশ ধাতুই বিদ্যুতের সুপরিচালক, তবে তার মধ্যে ধাতু অনুসারে পরিচালকত্বের মাত্রাভেদ হয়। একই আকারের একটি রূপার তার এবং একটি তামার তারকে পৃথক ভাবে যে কোনও বিদ্যুতের উৎসে সংযোগ ক'রে পরীক্ষা করলে বোঝা যায় তামা অপেক্ষা রূপার ভিতর দিয়ে অধিকতর বিদ্যুত পরিচালিত হয়। পরিচালকের ভিতর দিয়ে বিদ্যুত প্রবাহিত হবার সময় ইলেকট্রনরা এক পরমাণু হতে পরমাণুন্তরে গমন করে। যেমন সারিবদ্ধ লোক নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত থেকেও কোন জিনিষকে হস্তান্তরিত করে সারির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে নিয়ে যেতে পারে, সেইরূপ তারের উপাদানস্বরূপ পরমাণুরা নিজ নিজ চাঞ্চল্যের পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ইলেকট্রন চালায়। অবশ্য এই প্রবাহের মূলে একটা বৈদ্যুতিক চাপ বা ভোলটেজ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

শ্রীনীলরতন কর
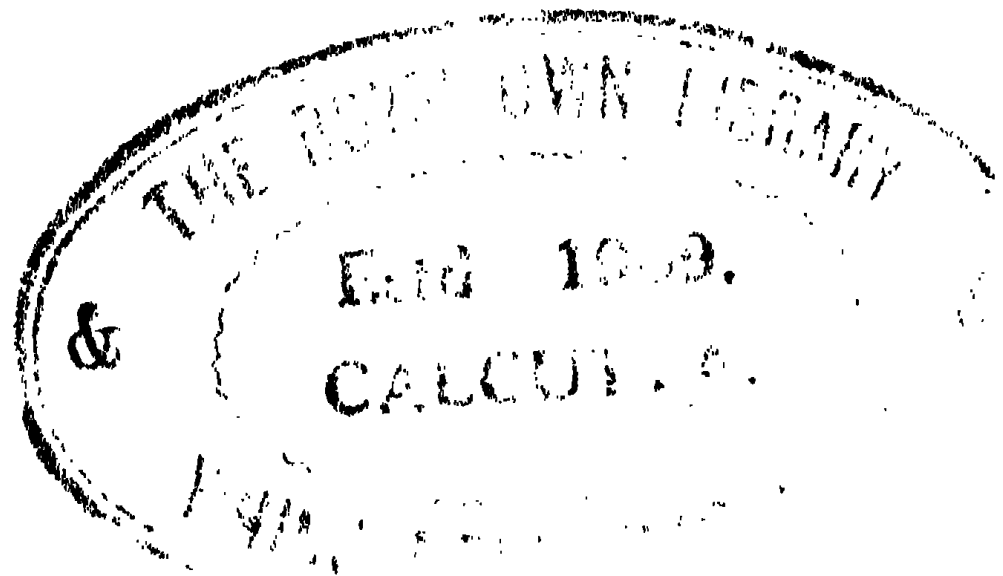
মহাজন পদাবলী ও বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

বর্ত্তমান বর্ষের গত মাঘ মাসের বিচিত্রায় শ্রীরাধারমণ গোস্বামী বেদান্তভূষণ মহাশয় "মহাজন পদাবলী ও বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত" নাম দিয়া একটী অতি সুন্দর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা মূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধটী শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় ও শ্রীঅপর্ণা দেবী সম্পাদিত "কীর্ত্তন পদাবলী" নামক গ্রন্থের আলোচনা মূলে লিখিত। এই গ্রন্থের সমালোচনা করিতে গিয়া তিনি যে ভাবে মহাজন পদাবলী ও বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহাতে এই উভয় বিষয়েই তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্য ও রস জ্ঞানের আলোকে বহু বিষয় শিক্ষার সুযোগ পাইয়াছি। পদবী দেখিয়া তাঁহাকে "আচার্য্য সন্তান" বা "প্রভু সন্তান" বলিয়াই মনে হইল। সুতরাং বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের বিশুদ্ধতা রক্ষায় তাঁহার দৃঢ়তা দেখিয়া আমি অত্যন্ত আশান্বিত ও আনন্দিত হইয়াছি। পদাবলী ও বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত তাঁহাদেরই ঘরের জিনিস। এই সমস্ত বিষয়ে কথা বলিবার তাঁহাদেরই অধিকার। ভরসা করি তিনি চিরদিনই এইরূপ সজাগ ও সতর্ক থাকিবেন, শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে দীর্ঘজীবি করুন।

গোস্বামী মহাশয়ের এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কথা কহিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তিনি প্রবন্ধের মধ্যে আমার নাম লইয়া যেন একটু শ্লেষ করিয়াছেন। তজ্জন্যই যৎসামান্য নিবেদন করিতে হইল। কীর্ত্তন পদাবলীর মধ্যে সম্পাদক ও সম্পাদিকা আমার নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার সঙ্গেই করিয়াছেন। তজ্জন্য আমাকে অপরাধী করা অমানী-মানব সম্প্রদায়ের একজন গোস্বামী সন্তানের যোগ্য কার্য্য হইয়াছে কিনা তিনি অবসর মত একটু ভাবিয়া দেখিলে কৃতার্থ হইব। যাঁহারা বৈষ্ণব কাব্য সম্পদ সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, বরং তাঁহাদের সঙ্গে একধারে আমার নাম করিলে আমি ধন্য হইতাম। কারণ আমি পদাবলী লইয়া সাহিত্যের দিক দিয়া যৎসামান্য আলোচনা করিয়াছি। আমার মনে হয় সংস্কৃত এবং বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত না জানিয়াও সাহিত্য হিসাবে পদাবলীর আলোচনা অপরাধ গণ্য হইতে পারে না। তারপর তিনি আমার সম্পাদিত একখানি গ্রন্থের ছাপার ভুলের সঙ্গে কীর্ত্তন পদাবলীর ছাপার ভুলের মিল দেখিয়া "অনুকরণ ও প্রেরণা" নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। প্রেরণার কথা বলিতে হইলে বলিব গত প্রবন্ধে তিনি যে ভাবে প্রেরণা দিয়াছেন, তাহাতে কীর্ত্তন পদাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণে তিনিও নিবেদনে নিশ্চয়ই সংবর্দ্ধনা লাভ করিতেন। শ্রীরাগ ছাপার ভুলে "শ্রীবাস" হইয়াছে। তিনি এই সামান্য ভুল লইয়াও রসিকতা করিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয় 'শিক্ষিত মহিলা' লিখিয়াছেন। ব্যাকরণ না জানার জন্য সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না। কিন্তু তাঁহার 'হৈয়ত্বাবীন' (বিচিত্রা ৭ পৃষ্ঠা ২৪ পংক্তি) কি বস্তু? "বীণ" একরূপ বাদ্যযন্ত্র শুনিয়াছি, হৈয়ত্বাবীন কি দূরবীন্ জাতীয়? কৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে "ধল", তিনি তাঁহাকে 'ধব' করিলেন কেন? কোন সুসমাচারের সঙ্গে যদি গোস্বামী মহাশয়ের এই প্রবন্ধের কোন শব্দের ঐক্য দেখি, আমি কি বলিব তাহা অনুকরণ ও প্রেরণা?

গোস্বামী মহাশয় কীর্ত্তন পদাবলীর মধ্যে বহু ত্রুটী বিচ্যুতি দেখিয়াছেন এবং কতকগুলি দেখাইয়াছেন। কয়েকটী বিষয়ে আমার মনে খটকা লাগিয়াছে। দুই একটী নিবেদন করিতেছি।

গোস্বামী মহাশয় রসজ্ঞ, বৈয়াকরণ, এবং আলঙ্কারিক ও দার্শনিক। তাই লিখিয়াছেন "এই খণ্ড হইতেই পুস্তকখানির মৌলিকত্বের মূল অনুমান করা কঠিন নহে।" অর্থাৎ কীর্ত্তন পদাবলীর রূপ-খণ্ড ইত্যাদি ও রাসলীলা ইত্যাদি রকমারি নাম দেখিয়া তিনি অনুমান করিয়াছেন

"খণ্ড" শব্দ শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন হইতে গৃহীত এবং এই পদ্ধতি অসঙ্গত। আমি নিবেদন পাই—পদকল্পতরুর মধ্যে দাস-লীলা, নৌকাবিলাস, হোলী লীলা, উত্তর গোষ্ঠ, গোষ্ঠ বিহার, গোষ্ঠাষ্টমী যাত্রা, রূপোল্লাস প্রভৃতি এই যে বিভিন্ন ধরণের নাম, ইহাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়াছে?

গোস্বামী মহাশয় যদি কীর্ত্তন পদাবলীর নিবেদন পড়িয়া দেখিতেন তাহা হইলে তাঁহার বিশেষ ক্রোধের কারণ ঘটিত না। "বহির্ভূত কোন পরিস্থিতিতে রসজ্ঞ ব্যক্তি প্রশ্রয় দিতে পারেন না।" এই "পরিস্থিতি" কি বস্তু এবং তাহাতে রসজ্ঞের প্রশ্রয় কি মত জানিনা। লোকে অকারণ "প্রত্য-বায় ভাগী"ই বা কেন হইবে বুঝিলাম না। সম্পাদক ও সম্পাদিকা লিখিয়াছেন—তবে এই প্রসঙ্গে আমাদের আর একটী কথা বলিবার আছে, প্রথম হইতে তৃতীয় খণ্ড পর্য্যন্ত আমরা কবিগণের ক্রম-পর্য্যায় অনুসারে তাঁহাদের রচিত পদগুলি সাজাইয়া দিয়াছি এবং চতুর্থ খণ্ড হইতে শেষ খণ্ড পর্য্যন্ত পদগুলি পালা অনুসারে সাজানো হইয়াছে।" (নিবেদন।৵০)। এইবার বোধ হয় গোস্বামী মহাশয় বুঝিতে পারিবেন, রূপখণ্ড প্রভৃতি গাহিবার জন্য পালা হিসাবে সাজানো হয় নাই। কবিগণের রসানুভূতি পর পর কোন্ ধারায় বিকশিত হইয়াছে ঐ খণ্ডগুলিতে তাহাই ধরিবার চেষ্টা হইয়াছে। এইজন্যই পর পর কতকগুলি গৌরচন্দ্র সাজাইয়া দিয়া সম্পাদক দুইজন কোন অপকর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। চন্দনচর্চ্চিত নীল কলেবর পদটীতে রাসরসাস্বাদী শ্রীভগবানের একটী বিশেষ রূপই প্রকটিত হইয়াছে, এরূপ মনে করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। শ্রীকৃষ্ণ প্রকরণ, শ্রীরাধা প্রকরণ নাম দেখিয়া কি বুঝা যায় না কাহার রূপ, বা কাহার পূর্ব্বরাগ। গোস্বামী মহাশয়ের ভাবুকতা ও অভিভাবকত্ব আমি অস্বীকার করি না, তবে পদের প্রাচীনত্ব লইয়া সাহি-ত্যিকগণ মাথা ঘামাইবেন", আর তিনি "মহাজন পদের ভাবধারার অনুকূল অথবা পরিপন্থী" বিচার করিয়া ডিক্রী ডিস্‌মিস্ করিবেন, এরূপ ভাগাভাগি আমরা মানিতে দ্বিধা-বোধ করিতেছি। কবিরু বয়স অনুসারে পদের প্রাচীনত্ব ধরিয়া আমি যদি পদাবলী সাজাইয়া দিই, তাহার মধ্যে ভাবধারার বিচারের কি আছে? ভিন্ন ভিন্ন কবির বিভিন্ন পদ খণ্ড খণ্ড ভাবে সাজানো ত অপরাধ নহে। আমরা সাহিত্যের দিক দিয়া তাহার সার্থকতা অস্বীকার করিব কিরূপে? পালাগুলি সাজানো আছে গাহিবার জন্য। তার মধ্যে ভাবধারা খুঁজিয়া দেখিতে পারেন। "কোন গৌরচন্দ্র গাহিয়া—চন্দনচর্চ্চিত পদটী গাহিতে হইবে।" এই প্রশ্ন যে নিতান্তই অতি পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, বোধ হয় গোস্বামী মহাশয় এখন স্বীকার করিবেন।

প্রভু সন্তান যদি জিজ্ঞাসা করেন, "যুগল মিলন ব্যাপারটী কি"? যাত্রায় যুগল মিলনের কথা শুনিয়াছি বটে। তাহা হইলে আমরা গোলালোকে তাহার কি উত্তর দিব? তবে আমরা বহুদিন হইতে বহু পালার যুগল মিলনের ঝুমুর বা পদ গাহিয়া গান গাহিতে দেখিয়া আসিতেছি।

গোস্বামী মহাশয় মানের মধ্যে খণ্ডিতা ও কলহান্তরিতায় পদ দেওয়ায় চটিয়া গিয়াছেন। তিনি উজ্জ্বল নীলমণির "মান" পর্য্যায়ের প্রথম শ্লোকটী তুলিয়া দিয়া বলিতেছেন— "পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত যে দম্পতী তাহারা একত্র বাস করিয়া (অথবা পৃথক বাস করিয়া) পরস্পরকে অভীষ্টানুরূপ আলিঙ্গন দর্শনাদি করিতে পারিতেছে না; যাহা বাধা জন্মাইতেছে তাহার নাম "মান"। মানের এই ব্যাখ্যা দিয়া গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন "ইহাতে নায়িকার অন্য সংসর্গ দূষিত নায়কের প্রতি রোষ বা শ্লেষোক্তি বুঝায় না"। নিবেদন পাই—দম্পতী পরস্পর অনুরক্ত, অথচ মুখ দেখা দেখি বন্ধ ইহাই যদি মনে হয়, তবে তাহার কোন কারণ থাকা কি সম্ভব মনে হয় না? কীর্ত্তনপদাবলীর সম্পাদক দুইজন সংস্কৃত জানেন কিনা জানিনা, কিন্তু আমি যে সংস্কৃত জানিনা তাহা সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়া উজ্জ্বল নীলমনির বহরমপুর সংস্করণের বাঙ্গালা লেখা কিছু তুলিয়া দিতেছি। (৮৭০ পৃঃ—৮৮০ পৃঃ) × × "সহেতু নির্হেতু ভেদে ইহা দুই প্রকার হয়"। × × "মানের প্রতি কারণ ঈর্ষা। × × কৃতাপরাধ নায়কের নায়িকার প্রতি ভয় হয়। নায়ক কৃত অপরাধে নায়িকার ঈর্ষা উৎপন্ন হয়। এই দুই কারণে নায়ক নায়িকার মান নামে একটী রস হয়।" ৮৭১ পৃষ্ঠায়

প্রিয়কৃত বিপক্ষ-বৈশিষ্ট্যকে মানের হেতু বলিয়াছেন। ৮৭৪ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন "শ্রুত, অনুমিত ও দৃষ্টভেদে বিপক্ষ-বশিষ্ট্য তিনপ্রকার হয়"। ৮৭৬ পৃষ্ঠায় অনুমিতির ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—"ভোগাঙ্ক, গোত্রস্খলন, এবং স্বপ্ন ভেদে অনুমিতি তিনপ্রকার হয়"। অতঃপর বিপক্ষ গাত্রে ও প্রিয় গাত্রে ভোগাঙ্ককে দর্শনের শ্লোক রহিয়াছে। সুতরাং "মানের মধ্যে খণ্ডিতা দিয়া অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধি বহির্ভূত কার্য্য করা হইয়াছে", গোস্বামী প্রভুর এই আপ্তবাক্য আমরা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। "অলঙ্কার কৌস্তুভ" গ্রন্থেও ১৪৩ পৃষ্ঠায় (বহরমপুর সংস্করণ) "প্রিয়তম অন্যকান্তার প্রতি আসক্ত হইলে স্ত্রীগণের ঈর্ষান্বিত হইয়া থাকে"। এইরূপ লেখা রহিয়াছে।

সাহিত্য দর্পনের মধ্যে এই শ্লোকটী আছে—

পত্যুরণ্য প্রিয়া সঙ্গে দৃষ্টেঽথানুমিতে শ্রুতে।
ঈর্ষ্যা মানো ভবেৎ স্ত্রীণাং তত্রত্বনুমিতিস্ত্রিধা।
উৎস্বপ্নায়িত ভোগাঙ্ক গোত্রস্খলন সম্ভবা॥

খণ্ডিতা নায়িকা ঝগড়া করিয়া নায়ককে তাড়াইয়া দিয়া (কলহের পরে) অনুতপ্তা হয়, এই অবস্থার নাম যদি কলহান্তরিতা হয়, তবে তাহাও মানের মধ্যে থাকিবে এবং তাহা খণ্ডিতার "পরিশিষ্ট বা প্রকার ভেদ" রূপে নিশ্চয়ই গণ্য হইবে। গোস্বামী প্রভু যে প্রকৃতই বিদ্বান তাহা তাঁহার লেখার বিনীত ভঙ্গিতে, এবং তিনি যে প্রকৃতই বৈষ্ণব তাহা তাঁহার লেখার শালীনতায় স্বতঃ প্রকাশিত হইয়াছে। "ব্যাখ্যা না দিয়া কেবল শ্লোকে আওড়াইলে × × বিদ্যার দৌড় ধরা পড়ে" ইত্যাদি। মান খণ্ডের আরম্ভে যে শ্লোকটী কীর্ত্তন পদাবলীতে তোলা আছে, তাহার মানে না বলিয়াই যে সম্পাদক দুইজন কীর্ত্তন পদাবলীতে শ্লোকটী তুলিয়াছেন, গোস্বামী প্রভুর এরূপ অনুমানের হেতু কি? স্নেহ হইতেই ভয় হয়, প্রণয় হইতেই ঈর্ষ্যা হয়। স্নেহের উৎকৃষ্টাবস্থাই প্রণয়। প্রণয়ই মানের কারণ। মানের হেতু ভেদ "ভোগাঙ্ক"। ইহাই খণ্ডিতা। সুতরাং শ্লোকটী তোলার অপরাধটা কি হইল? প্রণয় হেতু অদাক্ষিণ্যই ঈর্ষ্যা।

গোস্বামী প্রভুর ক্রোধ এত অধিক হইয়াছে যে তিনি প্রায় প্রলাপে পৌছিয়াছেন। অপরাধ—কীর্ত্তন পদাবলীতে আশ্লিষ্য বা শ্লোকটী মহাপ্রভুর "আস্বাদিত" বলা হইয়াছে। গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন—"এই শ্লোকটী অন্যান্য শ্লোকের সঙ্গে মহাপ্রভুর আস্বাদিত পদ বলিয়া এক পর্য্যায় ফেলা উচিৎ হইয়াছে কি? ঐ শ্লোকটী মহাপ্রভুর স্বরচিত।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া স্বীয় দার্শনিক বুদ্ধি ও যুক্তির প্রভা ও প্রতিভায় অনুমান করিয়া বলিতেছেন—"সম্পাদকেরা কি তাহা অস্বীকার করিতে চাহেন? কিছুই বিচিত্র নয়?" অর্থাৎ একটা মহামারি কাণ্ড ঘটিয়াছে। সেইজন্য তিনি একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। যেন সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। শেষে ভয় দেখাইয়াছেন "বৈষ্ণবেরা কিছুতেই মার্জ্জনা করিবেন না"। নিবেদন পাই—এইরূপ অভিশাপ দেওয়া নিতান্তই বাড়াবাড়ি হইয়াছে। যদিই বা কোন বৈষ্ণব নিজ স্বাভাবিক উদারতা গুণে মার্জ্জনা করিতেন, এখন তাঁহার এই আদেশের পর আর কেহই সে সাহস করিবেন না। এই ভাবে হঠাৎ ধোপা নাপিত বন্ধ করিতে আদেশ দেওয়াতে একটু কঠোরতাই প্রকাশ পাইয়াছে। নিবেদন পাই—"আস্বাদিত" বলিলে এতই কি অপরাধ হয়? আস্বাদিত বলিলেই কি রচয়িতাকে অস্বীকার করা হয়? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতেছি—"অয়ি দীন" শ্লোক সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

"ঘসিতে ঘসিতে যৈছে মলয়জ সরে।
গন্ধ বাড়ে তৈছে এই শ্লোকের বিচার॥
রত্ন গণ মধ্যে যৈছে কৌস্তুভমণি।
রসকাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি॥
এই শ্লোক করিয়াছেন রাধাঠাকুরাণী।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র বাণী॥
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠে জন॥

মধ্যলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ

"আশ্লিষ্য" শ্লোক ভগবানের, অয়িদীন শ্লোক ভগবতীর। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী নির্ভয়ে গৌরচন্দ্রের দ্বারা ইহা আস্বাদন করিয়াছেন, এবং তাহাতে রচয়িত্রীর কোন মানহানী হয় নাই।

গৌরচন্দ্রের নিজ রচিত শ্লোককেও কবিরাজ গোস্বামী গৌরচন্দ্রের দ্বারা আস্বাদন করাইতেছেন, এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই অপরাধ বৈষ্ণব সমাজ মার্জ্জনা করিয়াছেন।

"পূর্ব্বে অষ্ট শ্লোক পড়ি লোকে শিক্ষা দিল।
সেই অষ্ট শ্লোকার্থ আপনি আস্বাদিল ॥"

অন্তলীলা ২০ পরিচ্ছেদ

এই অষ্ট শ্লোক যদি কেহ মহাপ্রভুর আস্বাদিত শ্লোক বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহাতে কি বুঝায় ইহা মহাপ্রভুর রচিত নহে? এবং আস্বাদিত বলিলেই অপরাধ হইবে ও বৈষ্ণব সমাজ তাহা কিছুতেই মার্জ্জনা করিবেন না?

কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণ নিজেকে "যশোদার পুত্র" বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় গোস্বামী প্রভু শ্রীভগবানকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া নিজের রুচি ও বৈষ্ণবতার পরিচয় দিয়াছেন। নিবেদন পাই—শ্রীকৃষ্ণকে যশোদানন্দন কি কেহ বলে না? 'যশোদা-বৎসলো হরি" বলিয়া কি কোন স্তোত্রে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ নাই? শচীনন্দন, শচীদুলাল বলিয়া কি কেহ মহাপ্রভুর উল্লেখ করে না? "দেবকীনন্দন" "রৌহিনেয়" এ সব শব্দ কি বর্ণসঙ্করত্বের পরিচায়ক?

"প্রচলিত কোন কোন পদে মথুরায় গমনের কথা আছে, কিন্তু ঐ সকল পদ গোস্বামীগণের অভিপ্রায় সম্মত নহে।" গোস্বামী মহাশয় নিশ্চয়ই পদকল্পতরু দেখিয়াছেন। পদকল্পতরুর মধ্যে ১৩৩৮ সং নিতি যাও মধুপুরী (অনন্ত) ১৩৫৫ সং মথুরার বিকে যাই (জগন্নাথ দাস) ১৩৬৯ সং দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল মথুরায় বেচিবার, চলিলা মথুরার বিকে রঙ্গিয়া বড়াই সাথে। (বাসুদেব ঘোষ) ১৩৭১ সং মথুরার বিকে যাইতে পথে মহাদানী (বংশীবদন) ১৩৭৮ সং যাইছ মথুরার বিকে (জ্ঞানদাস) ১৩৮৫ সং এই পথ দিয়া মোরা যাই মথুরাতে (বংশীবদন) ১৩৯৫ সং নিতি নিতি যাও রাই মথুরা নগরে (জ্ঞানদাস) ১৪০৩ মথুরা অনেক পথ (বংশীবদন) পদগুলি দেখিবেন। জ্ঞানদাস ঝাহ্নবা দেবীর শিষ্য, খেচুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার পদ বৈষ্ণবমণ্ডলীর অনুমোদিত নহে একথা বলা চলে না। বাসু ঘোষ মহাপ্রভুর সম-সাময়িক, এবং রসজ্ঞ ভক্ত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে "ভার কাণ্ড" অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার দধি দুগ্ধের ভার লইয়া মথুরায় যাইতেছিলেন, পথে ভার ভাঙ্গিয়া দধি আদি নষ্ট করেন ও খাইয়া ফেলেন এইরূপ উল্লেখ আছে। গোস্বামী মহাশয় বড় জোর বলিতে পারেন দানলীলা সম্বন্ধে দুইটী মত আছে। ব্রজ গোপীরা মথুরায় দূত পাঠাইয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে ব্রজে আসিয়াছিলেন, ইহা কোন পুরাণে পাওয়া যায়? অথচ পদকর্ত্তারা অনায়াসেই এই এই বিষয়ে পদ লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী রাসের "এবং শশাঙ্কাংশু" শ্লোকের কাব্য শব্দের ব্যাখ্যায় বৃহত্তোষনী টীকায় চণ্ডীদাসের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। গোপালচরিত গ্রন্থখানি মহাপ্রভুর রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তাহার মধ্যে ভার খণ্ডের শ্লোক আছে। পদকল্পতরুর মধ্যে "হেমবট পাইয়া পাঁতরে" এই পদটী পাওয়া গিয়াছে। পদটী বড়ু চণ্ডীদাসের। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন নামধেয় অধুনা প্রকাশিত গ্রন্থখানির পুঁথি কত প্রাচীন, পদগুলি আসল না নকল ইত্যাদি বিষয়ে স্বর্গগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ ও স্বর্গগত পদাবলী বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় প্রভৃতি মহামহারথীগণ বহু আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং এ প্রবন্ধে আর পিষ্ট পেষণ করিব না, দেখিতেছি গোস্বামী মহাশয় এদিকে বড় কাণ দেন না। সাহিত্য হিসাবে বিচার তিনি পছন্দ করেন না। আমরা কিন্তু সাহিত্য হিসাবেই পদাবলীর আলোচনা করি। তার মধ্যে যদি আমরা বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ কিছু লিখিয়া থাকি গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে উপদেশ দিবেন, আদেশ করিবেন। তবে প্রত্যবায়-ভাগী করিবেন না। এবং অভিশাপ দিবেন না। এ সব আলোচনায় আজকাল আর তেমন পয়সা পাওয়া যায় না। আমরা একটু নাম যশের জন্যই এই পথে প্রবেশের চেষ্টা করি। তাহাও যদি না জোটে, গোস্বামী মহাশয় উৎসাহ না দেন, উল্টা বৈষ্ণব সম্প্রদায় মার্জ্জনা করিবেন না বলিয়া ভয় দেখান,—আলোচনা ছাড়িয়া দিব, দরকার নাই!!

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বৃন্ত-চ্যুত

শ্রীপ্রতুলকুমার মুখোপাধ্যায়

ছোট ফুটফুটে মেয়ে। আপন মনে খেলা করে—ঘুরে বেড়ায়, সকলেই মনে মনে তাকে ভালবাসে। সমবয়সীরা তার দৃষ্টির সামনে ঘোরে, তার সঙ্গে কথা বলবার ও মিলে মিশে খেলা করবার সকলেরই ইচ্ছা, কিন্তু পিতামাতার তিরস্কারের ভয়ে সাহসে কুলায় না। দূরে দূরে ঘোরে; উৎসুক নেত্রে দেখে। বয়ঃজ্যেষ্ঠরাও তাকে দেখে আনন্দ পায়—তার সুন্দর আকৃতি এবং নম্র স্বভাব সকলকে মুগ্ধ করে। কিন্তু বেশী ঘনিষ্ঠতা করতে কেউ চায় না—অজ্ঞাত কুলশীলার মেয়ে সে তার পিতাকে সকলেই চিনতো, কিন্তু তার মা'কে কেউ চেনে না। কোথায় কবে তাদের বিয়ে হ'য়েছিল তা কেউ জানে না। এমন কি বিবাহ সম্বন্ধেও অনেকে সন্দিগ্ধ। সন্দেহ সমাধানের জন্য হরিগোপালবাবুও জীবিত নেই। সুতরাং সমস্তই অন্ধকারের মধ্যে থেকে গেছে। মেয়েটিও সমবয়স্কদের দিকে চেয়ে থাকে বা সামনের এক এক দিন কোন ছেলে হাত নেড়ে ইসারায় তাকে ডাকে—কিন্তু কাছে যেতে না যেতেই ছুটে পালিয়ে যায়। কিছুই বোঝে না—অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাদের ব্যবহারে।

বাঘা—পাড়ার দেশী কুকুর। সেই কেবল তার একমাত্র বন্ধু। কাছে কাছে থাকে, লাফিয়ে তার সঙ্গে খেলা করে। বিস্কুটের অংশ পায়—ল্যাজ নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করে। মুহূর্ত্তে তাহা উদরস্থ ক'রে—কৃতজ্ঞতা জানায়। কোন কোন দিন সব বিস্কুটগুলিই বাঘাকে দিয়ে হাসিমুখে খাওয়া দেখে। ফুরিয়ে গেলে, বিধুকে ডেকে আবার এনে দিতে বলে। বিধু কাছে এসে হেসে জিজ্ঞাসা করে,—"অনেকগুলো যে দিয়েছিলাম, কি করলে সে সব দিদিমণি?"

সেও হেসে বলে,—"বাঘা সব খেয়ে ফেলেছে।"

বিধু অনেকদিনের পুরণো চাকর। সে বোঝে—কোথায় তার দুঃখ কি তার অভাব। তার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। জলন্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিকে দুরন্ত ছেলেদের পানে চায়—হয়তো মনে মনে তাদের এবং তাদের নিষ্ঠুর পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত দিতে থাকে।

—"যাওনা বিধুদা বিস্কুট আনতে!" বিধুকে একটু ধাক্কা দিয়ে মেয়েটি বলে। স্নেহাসক্ত করুণ চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বিধু চ'লে যায়। বাঘার সঙ্গে মেয়েটি খেলা ক'রতে থাকে। আশ্বাস দিয়ে বলে, "বিধুদা আনতে গেছে, আনলে আবার দেবে—কেমন?"

—"আয় বাঘা মুড়ী খেয়ে যা!" দূর থেকে ছেলেরা ডাকে। বাঘা নতুন মনিবের হাতের দিকে দেখে—কিছু আছে কিনা। আবার একবার দুরন্ত আহ্বানকারীদের দিকে দেখে। দূর থেকে ক্রমান্বয়ে ডাক পড়ে—"বাঘা—বাঘা—তু-উ-উ—" বাঘা আর স্থির থাকতে পারে না। একবার মেয়েটির দিকে তাকিয়েই—ছুটে যায়। তখনই এদিক থেকে ডাক পড়ে—"এই বাঘা এদিকে আয়—নইলে আর কুখখোনো কিছু দেবো না।" ভূমে পতিত মুড়ি ক'টি তাড়াতাড়ি শেষ ক'রেই বাঘা ফিরে আসে।—"কেন গেছলি ওখানে? অ্যাঁ!" কান ম'লে দিয়ে শাসন করে। দূরের ছেলেরা মেয়েটিকে শুনিয়ে শুনিয়ে পরস্পর বলাবলি করে—"ওঁর যেন কুকুর—তাই মারছেন।" আবার কেউ বলে—"কেন মারবে? কি জন্যে মারবে?" এইভাবে প্রচ্ছন্ন রেশা-রেশির ভেতর দিয়ে সারা সকাল কাটে।

একঘেয়ে জীবনের দুর্ব্বিষহ জ্বালা সহ্য ক'রতে না পেরে মেয়েটি ক্রমেই দুর্ব্বল হ'য়ে যায়। গুপ্ত-আকিঞ্চনের নিরাশায় ধীরে ধীরে শয্যা নেয়। বিচক্ষণ ডাক্তার 'হরিবাবু' এসে দেখে যান। রোগের বিবরণ আদ্যোপান্ত শোনেন।

বাহ্যিক নিরাময়ের পরই তার ছেলে বিশ্বনাথকে তার সাথী করে দেন। মেয়েটি পায় তার—বিশুদাকে।

মেয়েটির একক জীবনকে বিদ্রূপ ক'রে পূর্ব্বে যেখানে ছেলেরা হাসতো, খেলতো—সেই আম গাছের তলাটিতে দু'জনে ইটের ঘর তৈরী ক'রে খেলা করে। কাদা-মাটির খাবার প্রস্তুত ক'রে ভরা পেটে মনের আনন্দে মিথ্যা খাওয়া খায়। কখন কখন বিশ্বনাথ মাষ্টার হয়—মেয়েটি হয় ছাত্রী। বিশুদা পড়া নেয়। না পারলে—মাষ্টারী চালে মারে। মেয়েটি হাসিমুখে মার খায়। মাষ্টারীকে ব্যঙ্গ ক'রতে দেখে বিশ্বনাথ রেগে যায়। বলে,—"তুই যে হাসছিস্?"

—"বারে! মিছে ক'রে কাঁদবো কি ক'রে—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—" খিল খিল ক'রে আরও জোরে হেসে ওঠে। বিশ্বনাথ গম্ভীর ভাবে বলে,—"অমন করলে কাল থেকে আর আসবো না—তা ব'লে দিচ্ছি।"

মেয়েটির মুখ শুকিয়ে যায়—চোখ ছল ছল করে।

বিশ্বনাথ হেসে ওঠে,—"দূর মুখ্যু! মিছে কথাও বুঝতে পারিস্ না?"

মেয়েটি অবাক হ'য়ে বিশ্বনাথের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে—"তুমি কি মিছে কথা ব'লছিলে?"

—'তবে?" হাসতে হাসতে বিশ্বনাথ বলে। মেয়েটি আরও বিস্মিত হয়—মিথ্যাকে এমন ভাবে সত্যের আবরণে ঢেকে বিশ্বনাথকে বলতে দেখে। কখন কখন হেসে বলে, —"তুমি খুব ভাল, নয় বিশুদা? সত্য, কালী, শঙ্কর ওরা কেউ ভাল নয়। আমার সঙ্গে কথা কয় না, কেবল ভেংচি কাটে। তুমি থাকলে ওরা তো কিছু করে না—তোমায় ভয় করে বুঝি?"

—"নিশ্চয় করে!" নিজের সুভোল চেহারার দিকে প্রশংসা-পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার দেখে আবার বিশ্বনাথ বলে,— "ওদের মত আমি রোগা-পটকা নাকি! এক এক চড়ে ওদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতে পারি।" কথার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনাথের সারা মুখ অহমিকায় পূর্ণ হ'য়ে যায়। মেয়েটি অপলক দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে থাকে। হঠাৎ এক সময় তার অলক্ষিত কারুর উদ্দেশে একটি আঙুল তুলে হাসতে হাসতে বলে,—"কেমন মজা—খুব জব্দ।" সঙ্গে সঙ্গে মাথাটিও একদিকে নাড়তে থাকে।

কোন কোন দিন বিশ্বনাথ তাদের গাছ থেকে লুকিয়ে কাঁচা কুল পেড়ে আনে। আমগাছের আড়ালে ব'সে ভাগ ভাগি ক'রে খায়। কোন দিন পুকুরের শানবাঁধান ঘাটে গিয়ে দুজনে বসে—মাছেদের খেলা দেখে।

গ্রীষ্মের আমেজ লেগে পুকুরের জল ক'মে যায়। বিশ্বনাথ অল্পসল্প সাঁতার জানে। এক এক দিন সে তার কৃতিত্ব দেখায়। মেয়েটি বিস্ময়-পুলকে চেয়ে থাকে। মনে মনে চিন্তা ক'রে দেখে—সাঁতার কাটতে, গাছের আগ-ডালে উঠে ডাঁসা পেয়ারা পাড়তে, তার চাইতে অনেক জোরে দৌড়তে আরও কত কি করতে তার বিশুদা জানে। মুখ তার আনন্দ-দীপ্ত হয়ে' ওঠে। পুকুরে অল্পজল, ডুবে যাবার ভয় নেই বলে, আশ্বাস দিয়ে বিশ্বনাথ কোন কোন দিন তাকে জলে ডেকে নিয়ে যায়। অল্প জলে নেমেই মেয়েটি বলে,—"না ভাই, আর যাবো না—ডুবে যাবো।"

—"ভীতু মেয়ে কোথাকার!" হাত ছেড়ে দিয়ে বিশ্বনাথ দূর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্রমে ক্রমে সাঁতারে বিশ্বনাথ উন্নতি ক'রে সব জিনিষের মত সাঁতারেও মেয়েটিকে শিষ্যা ক'রে নেয়। মেয়েটি অল্প জলে হাত-পা ছুঁড়ে জল ঘোলা ক'রে তোলে। ক্লান্ত হ'লে উঠে পড়ে।

বর্ষা নামে। ঘোলাটে জলে পুকুর কাণায় কাণায় ভ'রে ওঠে। বিশ্বনাথ ছুটে গিয়ে জলে লাফিয়ে পড়ে। ব্যাকুল দৃষ্টিতে মেয়েটি চেয়ে থাকে—যেখান থেকে বিশুদা অদৃশ্য হ'য়েছে। উৎকণ্ঠায় ছোট বুকটি বারে বারে দুলে দুলে ওঠে। মুহূর্ত্ত পরেই খানিক দূরে বিশ্বনাথ ভেসে ওঠে। আনন্দে হাততালি দিয়ে মেয়েটি ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়তে থাকে। হাসতে হাসতে বিশ্বনাথ আরও দূরে চ'লে যায়—নাগালের বাইরে।

বিশ্বনাথের দুঃসাহসিকতার কথা হরিবাবু জানতে পেরে বাড়ীতে আটক ক'রে রাখেন—কোথাও বেরুতে দেন না। দুশ্ছেদ্য মায়ার ফাঁসে দু'টিতে বাঁধা প'ড়েছে—একে অন্যের অদর্শনে অস্থির হ'য়ে ওঠে। বিশ্বনাথ কাঁদে। প্রতিজ্ঞা করে—আর কখন জলে নামবে না। কিন্তু মুক্তি পায় না। হরিবাবুর আদেশে সর্ব্বদা তাঁর চোখের সামনে থাকতে হয়। ক্ষুদ্র হৃদয়ের গভীর চিন্তায় মুহ্যমান হ'য়ে

পড়ে। ব্যাকুলতার ভেতর দিয়ে একটির পর একটি প্রহর অতিবাহিত হয়, মেয়েটির ওপর বালকোচিত রাগে সারা মন ভ'রে যায়। অভিমানের উত্তেজনায় প্রতিজ্ঞা করে—আর কখন সে যাবেও না—কথাও কইবে না। কিন্তু প্রভাতের আলোক-স্পর্শে পূর্ব্বদিনের প্রতিজ্ঞা কোথায় ভেসে যায় মোটেই জানতে পারে না—মনেও থাকে না। মনে করে—আজ নিশ্চয় সে যেতে পাবে—কিন্তু পারে না। বেদনার গুরুভারে মন তার গুমরে ওঠে। চোখে জল আসে।

মেয়েটি আমতলায় চুপ ক'রে ব'সে থাকে। মাঝে মাঝে উদ্‌গ্রীব ভাবে দূরের পানে চেয়ে দেখে—বিশুদা আসছে কি না। কাউকে দেখতে পেলে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে—ঐ বিশুদা আসছে! কাছে এলে ভ্রম বুঝতে পারে, সে বিশুদা নয়। অজ্ঞাত কারণে চোখের পাতা ভিজে যায়। বুকভরা আশা নিয়ে শয্যা ত্যাগ করে, আবার নিরাশার বোঝা বুকে ক'রে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে—কখন হাসে, আবার কখন কেঁদে ওঠে। কখন চেঁচিয়ে ওঠে, কখন ঠোঁট দু'টিই শুধু কাঁপতে থাকে, কোন শব্দ বার হয় না। ঘুম ভেঙ্গে যায়। চেয়ে দেখে—বাঁশ-ঝাড়ের আড়াল থেকে সূর্য্য উঁকি দিচ্ছে; তারই আভাস গাছের পাতায় পাতায় পড়েছে। পাখীরা আকাশকে সচেতন করে তুলেছে প্রভাতের বন্দনা গীতিতে। সর্ব্বত্র একটা চাঞ্চল্যের সাড়া—নবীনতার গান সবারই মুখে ফুটেছে। উঠে পড়ে—ছুটে যায় খেলার জায়গায় বিশুদা এসেছে কি না দেখতে। সে এলে—ঘাসের ওপর যে শিশির-বিন্দুগুলি আলোর ঝলমলিতে মুক্তার মত দেখায়, সেগুলি শিশিতে ভরতে হবে। সে চেষ্টা ক'রেছে পারেনি। তার বিশ্বাস—বিশুদা নিশ্চয় পারবে। কিন্তু গিয়ে দেখে আসেনি। সূর্য্যের প্রখরতার সঙ্গে সঙ্গে শিশির-বিন্দুগুলি কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে যায় বুঝতে পারে না। ক্ষুণ্ণ-মনে ব'সে থাকে। উদাস বাতাস তাকে স্পর্শ ক'রে যায়। মুখের হাসি মিলিয়ে যায়, মনে স্ফূর্ত্তি থাকে না; পূর্ব্বের মত আপন মনে বাঘাকে নিয়ে খেলায় একাগ্রতা আসে না।

পূর্ণিমার কাছাকাছি কোন তিথি। সন্ধ্যা হতেই গোল হ'য়ে চাঁদ উঠেছে। গাছের পাতায় জ্যোৎস্নার মাতামাতি। ঝিরঝিরে হাওয়ায় এক পাতার কিরণ আর এক পাতায় পিছলে পড়ছে। মাঠের ওপর কে যেন একখানা সোনা-রূপায় মেশান পাত বিছিয়ে দিয়েছে। মেয়েটি গাছতলায় ব'সে আছে। বিশ্বাস—আজ নিশ্চয় বিশুদা আসবে। জ্যোছনা মাখামাখি ক'রে দু'জনে খেলা করবে। ব'সে ব'সে এই চিন্তাতেই বিভোর হ'য়ে যায়—কিছুই খেয়াল থাকে না। বিধু এসে ডাকে—"দিদিমণি ঘরে চল—রাত হ'য়ে গেছে।"

—"বিশুদা যে এখুনি আসবে!" অসীম আগ্রহে হাসি-ভরা মুখে মেয়েটি বলে। একটি দীর্ঘনিশ্বাস বিধুর বুক ঠেলে বার হয়ে যায়। ম্লান চোখে পায়ে হাঁটা পথ ধরে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে স্তব্ধভাবে চেয়ে থাকে—কোন কথা বলতে পারে না, কণ্ঠরোধ হয়ে আসে।

—"বিশুদা আর আসেনা কেন, বিধুদা?" ব্যথিত-কণ্ঠে মেয়েটি বলে।

—"কাল তাকে ডেকে আনবো।" মেয়েটির হাত ধরে বাড়ীর দিকে বিধু পা বাড়ায়।

—"তুমি তো রোজই বল—কিন্তু কৈ ডেকে আন?" অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে মেয়েটি বলে। কান্নার আবেগে কণ্ঠস্বর কেঁপে যায়।

—"গিয়েছিলাম, দেখা হয়নি। কালকে যেমন ক'রে পারি ডেকে আনবো। আসতে না চাইলে মারতে মারতে ধ'রে আনবো।" হাসিমুখে এই কথা ব'লে বিধু বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করে।

—"বারে! মারলে বুঝি লাগেনা! তুমি আমার নাম করে ডেকে এনো।"

—"আচ্ছা।" হাসতে হাসতে মেয়েটির হাত ছেড়ে দেয়।

গভীর রাতে মেয়েটির ঘুম ভেঙ্গে যায়। চেয়ে দেখে—তার বিশুদা জানালায় দাঁড়িয়ে—"পুষ্প! পুষ্প!" ব'লে অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকছে। মায়ের বাহুপাশ থেকে সন্তর্পণে মুক্ত হ'য়ে পা টিপে টিপে বাইরে এসে—ছুটে গিয়ে বিশুদার হাত চেপে ধ'রে অভিমানে ঠোঁট দু'টি ফুলিয়ে বলে—"তুমি আর আসনা কেন?"

বিশু বলে—"বাবা আসতে দেয়নি যে। কিন্তু তুইও তো একদিনও যাস্‌নি?"

—"আমি যে তোমাদের বাড়ী চিনি না।"

—"বিধুকে ব'ল্লেই পার্ত্তিস্—সে নিয়ে যেত।"

পুষ্পর মনে হয়—সত্যই তো, সে ত একদিনও এ মনে ক'রতে পারেনি। তারই তো অন্যায়। ওর বাবাই না হয় আসতে দেয়নি—ওকে তো কেউ বারণ করতো না।"

গল্প করতে করতে মাঠে গিয়ে বসে। ছুটোছুটি ক'রে খেলা করে—বাঘাও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়য়। খেলা করতে করতে এক সময় বিশু পুষ্পর হাত ধ'রে ব'ল্লে,—"চ' পুকুরে নাইগে।"

—"এই এতো রাত্তিরে?" বিস্মিত-কণ্ঠে পুষ্প ব'ল্লে।

—"তাতে কি? কেউ এখন নেই, বেশ মজা হবে—অনেকক্ষণ জলে থাকতে পার্ব্বো।"

—"বেশ মজা হবে, নয়, বিশুদা? চল—চল।"

দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে পুকুরের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। এক—দুই—তিন ব'লে দু'জনেই এক সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিলে। হঠাৎ পুষ্পর চমক ভাঙ্গল অথৈ জলে হাবুডুবু খেতে খেতে চেঁচিয়ে উঠল,—"বিশুদা! বিশুদা! ডুবে যাচ্ছি ধর—ধর—" মুখে জল ঢুকে কণ্ঠ রোধ ক'রে দিলে। অবশিষ্ট কথাগুলি গলার ভেতরই রয়ে গেল। বাইরে কেবল খানিকটা ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরিয়ে এল। যে ক'টি কথা বেরুল, তার প্রতিটি শব্দ নিয়তির গভীর রাত্রে অট্টহাসির মত ধ্বনিত হল। ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে অল্প-ক্ষণ মৃত্যুর সঙ্গে ল'ড়ে শেষে ধীরে ধীরে অতল জলে তলিয়ে গেল। নিশীথিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে বাঘা অবিশ্রান্ত ভাবে ডাকতে লাগল—"ঘেউ—ঘেউ—ঘেউ—ঘেউ—"

প্রাতে সকলের চোখে পড়ে—পুষ্পর মৃতদেহ জলে ভাসছে। বিশ্বনাথ অনেক কাকুতি-মিনতির পর সেইদিন সকালে মুক্তি পেয়েছে। সেও সকলের মত ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে বিধুর পাশে দাঁড়িয়ে পুষ্পর মৃতদেহের দিকে চেয়ে আছে। বুঝেছে—পুষ্প আর নেই। কিন্তু ক্ষুদ্র-হৃদয়ের অগভীর চিন্তায় ঠিক উপলব্ধি করতে পারছে না—তার ভালবাসার বৃন্ত থেকে পুষ্পকে কে চ্যুত ক'রে নিয়েছে। অশ্রুতে তার দৃষ্টি-শক্তি ঝাপসা হ'য়ে যায়। চোখ মুছে ফের চেয়ে দেখে—পুষ্পকে সকলে ধরাধরি ক'রে সিঁড়িতে শুইয়ে দিচ্ছে।

শ্রীপ্রতুলকুমার মুখোপাধ্যায়

সমাজের উপর সিনেমার প্রভাব

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ দাস সাহিত্যবিনোদ

সিনেমার প্রভাব আমাদের সমাজের উপর এত বেশী যে সেই সম্বন্ধে একটু ভেবে দেখার সময় এখন এসেছে। সিনেমা আজ পর্য্যন্ত যতটা উন্নতি ক'রেছে অন্য কোন সৎপ্রতিষ্ঠান হয়ত এই অল্প সময়ে এতটা উন্নতি করতে পারত না। কারণ সিনেমা যত লোকের সহানুভূতি পায় অন্য কোন প্রতিষ্ঠান তা পায় না। সুতরাং এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানকে আমাদের পক্ষে কল্যাণকর ক'রে তুলতে পারলে সমাজের তথা জাতির অনেক উন্নতি হতে পারে।

বাংলা দেশের মুমূর্ষ হিন্দু সমাজকে পুনঃসঞ্জীবিত করার কাজে আমরা সিনেমার সাহায্য গ্রহণ করতে পারি। অন্যান্য সভ্যদেশে ছবির মধ্যে কিছু কিছু শিক্ষা বা সমাজ-সংস্কারের আভাষ থাকে কিন্তু আমাদের দেশে তা আদৌ নেই। রাশিয়া এত অল্পদিনের মধ্যে যে উন্নতি করেছে তার জন্য সিনেমার কৃতিত্ব কম নয়। রাশিয়ান ছবির মত ছবি আমাদের দেশে না থাকলেও যা আছে তার শিক্ষাটুকুও আমরা গ্রহণ করিনা, তার পরিবর্ত্তে আমরা অভিনেতা, অভিনেত্রীদের হাব ভাবের অন্ধ অনুকরণে ব্যস্ত থাকি।

আমাদের দেশে যে ধরণের সিনেমা বর্ত্তমানে অত্যধিক পরিমাণে প্রচলিত তার প্রভাব আমাদের সমাজের উপকারের চেয়ে অপকার বেশী ক'রে থাকে। প্রথমেই ধরা যাক এর নেশা। সিনেমার মোহে আমরা আমাদের আর্থিক অবস্থার কথা যাই ভুলে, কর্ত্তব্যের প্রতি জন্মে বিতৃষ্ণা। পিতা মাতা, অভিভাবকদের মতামতের অপেক্ষা না রেখে লুকিয়ে চুরিয়ে সিনেমায় যেতে শিখি। পয়সার অভাব পড়লে সোনার রিষ্টওয়াচ বা আংটী বাঁধা দিয়েও আমাদের নেশার ঝোঁক মেটাতে পশ্চাৎপদ হই না। অনেকের এমন অভ্যাস হয়ে যায় যে রোজই তাদের একবার সিনেমায় যাওয়া চাই—এ শুধু অর্থের অপব্যয় ভিন্ন আর কিছুই নয়। দেশের এই দুর্দ্দিনে যে কত পয়সা নষ্ট করে আমাদের যুবকেরা তা দেখতে পাওয়া যায় সহরের যে কোন সিনেমা-গৃহে বাংলার ছাত্র সমাজের একদিনের জনতা দেখলে।

আমাদের দেশের সিনেমা জনসাধারণের চরিত্র গঠনে মোটেই সাহায্য করেনা। চরিত্র গঠনে সিনেমাকে প্রয়োগ করতে পারলে দেশের উন্নতি অনিবার্য্য, কারণ উপদেশ অপেক্ষা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত চরিত্র গঠনে অনেক বেশী কার্য্যকরী। একটু তলিয়ে দেখলে বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে সিনেমা আমাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতিসাধন না করে বরং তাকে অবনতির পথে টেনে নিয়ে চলেছে।

আজকাল অনেকেই অভিনেত্রীদের আচার ব্যবহার হাবভাব নকল করতে ব্যস্ত। তাদের কাছে কাননের আনন, উমার হাসি ও প্রভার গলা খুব মিষ্টি বোধ হয়। দিনরাত এদের কথাই তারা চিন্তা করে কিন্তু একবারও তারা ভেবে দেখে না যে এরা যত ভালই অভিনয় করুক না কেন তারা অভিনেত্রী ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাদের নিয়ে আলোচনা করবার কোন যথার্থ কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

বর্ত্তমানে অনেকেই সিনেমায় অভিনেতা অভিনেত্রীরূপে প্রবেশ করবার ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করে। এর ফলেই আজকাল অনেক ভদ্রঘরের যুবক যুবতীকে পর্দ্দার গায়ে দেখতে পাওয়া যায়। তারা বুঝতে পারে না যে তারা আপাতমধুর মোহে মুগ্ধ হয়ে ভবিষ্যতের জন্য নরক তৈরী করে রাখছে। মোহে পড়ে যারা সিনেমায় প্রবেশ করে বাইরে থেকে তাদের দেখলে মনে হয় যে তারা খুব সুখে আছে কিন্তু অনুসন্ধান করে দেখলে দেখা যাবে যে তাদের মধ্যে শতকরা একজনও প্রকৃত সুখী নয়।

ছাত্রদের সিনেমা দেখা মোটেই উচিত নয়। একদিন সিনেমা দেখলে তার ছবি মনের পর্দ্দায় অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রতিফলিত হয়ে থাকে এবং তারা ছবির সব কিছু অনুকরণ করতে চেষ্টা করে কারণ তারা অনুকরণপ্রিয়। যে অন্ধকারের সাহায্যে তারা ছবি দেখতে পায় ক্রমশ সেই অন্ধকারই তাদের পাঠ্য পুস্তকের অক্ষরগুলি ঝাপসা করে তোলে। যে সিনেমা ছাত্রদের এত ক্ষতি করে যে অন্য কোন জিনিষ তেমনটি কর্ত্তে পারে না আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ছাত্ররাই সেই সিনেমা বাঁচিয়ে রেখেছে। তাদের সিনেমা উৎসাহে যেদিন ভাটা পড়ে আসবে সিনেমার আর্ক-লাইটও সেদিন থেকে ঝাপসা হ'তে সুরু করবে।

সিনেমা আমাদের সমাজের উপর কতখানি কুপ্রভাব বিস্তার করেছে সেটা একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা করছি। ৺রবীন্দ্র মৈত্র তাঁর "ত্রিলোচন কবিরাজ" নামক বইয়ে লিখেছেন,—কোন এক যুবকের ফিল্মে অভিনয় করবার ইচ্ছা প্রবল হয়। সে তার প্রিয় নটের আর্ট, মেক-আপ ও অঙ্গভঙ্গী অনুকরণ করে। একদিন তার ইচ্ছা হ'ল তার এই আর্টের প্রভাব পরীক্ষা করতে, তাই সে তার বৌদির কাছে হাসতে হাসতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা বৌদি, আমি যদি এই রকম হি-হি করে হাসি তা হলে তোমার মনের মধ্যে কেমন করে?—বলে সে হি-হি করে হাসতে লাগল। বৌদি উত্তরে জানালেন যে তিনি কিছুই অনুভব করেন না। যুবক হতাশ হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল, কিছু না? বুকের ভিতর কুড়কুড়ও করে না॥

৺রবীন্দ্র বাবু যাকে একদিন ব্যঙ্গ কৌতুক বলে গেছেন সেই ব্যঙ্গ কৌতুক আজ সত্যে পরিণত হতে চলেছে। আজকাল অনেক ঘরেই এরকম যুবক দেখতে পাওয়া যায়। সিনেমা যে সমাজের উপর কতটা কুপ্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে, তদ্বিষয়ে এর চেয়ে প্রকৃষ্টতর উদাহরণ আর আমার জানা নেই!

যে সিনেমা আমাদের পক্ষে এতখানি ক্ষতিকর আমরা যদি তার সংস্কার সাধন করতে পারি তবে এর দ্বারাই অশেষ কল্যাণ সাধিত হ'তে পারে। এখন দেখা যাক কি উপায়ে আমরা সিনেমাকে দেশ ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর করে তুলতে পারি।

আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প; সুতরাং প্রথমতঃ একে আমরা শিক্ষা-প্রচার কল্পে ব্যবহার করতে পারি। আমাদের দেশের ষ্টুডিয়োর মালিকরা দেশের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য না রেখে মাত্র অর্থোপার্জ্জনের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। কাজেই তাঁদের নিকট হ'তে প্রকৃত শিক্ষা বিষয়ক কোন ছবি আশা করা বাতুলতা মাত্র। আজ পর্য্যন্ত যদি একখানাও শিক্ষা বিষয়ক ছবি বাঙ্গলা দেশের প্রযোজকরা নির্ম্মাণ করে' আমাদের উপহার দিতেন তা হ'লেও বা কিছুটা আশার কথা ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরা এখনও পূর্ব্বের মতই নির্ব্বিকার। প্রত্যেক ষ্টুডিয়ো যদি বৎসরে অতি অল্প ব্যয়ে মাত্র একখানি করে' শিক্ষা বিষয়ক ছবি প্রস্তুত করে' তবে তা-ই যথেষ্ট, এই ধরণের ছবির সাহায্যে দেশ যে কতখানি উন্নতি লাভ করতে পারে তার প্রমাণ রাশিয়া। অল্পদিন পূর্ব্বেও যারা পৃথিবীর নিকট অবজ্ঞাত ছিল আজ তারা জগতের অন্যতম সভ্য, শিক্ষিত ও শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়েছে। রাশিয়ার উন্নতির ইতিহাসের পিছনে সিনেমার যে সহায়তার কাহিনী আত্মগোপন করে' আছে, তা সামান্য নয়। আমাদের দেশে যে শিল্প কেবলমাত্র লঘু আনন্দ পরিবেশনের কাজে নিযুক্ত সেই শিল্পের সাহায্যেই সোভিয়েট রাশিয়া নিজেদের দেশের বিভিন্ন বিভাগে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রচারে সিনেমার সাহায্য নিলে অল্প সময়ে, সামান্য অর্থব্যয়ে বিশেষ ফল লাভ করতে পারা যায়। বঙ্গদেশে, তথা ভারতে, 'নিউ থিয়েটার্স' অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র প্রতিষ্ঠান এবং চিত্র-ব্যবসাক্ষেত্রে আমাদের গৌরব স্বরূপ। বাঙ্গালী এই প্রতিষ্ঠানের নিকট হ'তে অনেক কিছুই আশা করে, সুতরাং নিউ থিয়েটার্সের কর্ত্তব্য শিক্ষা-বিষয়ক চিত্র নির্ম্মাণ করে দেশের অন্যান্য ষ্টুডিয়োগুলিকে উৎসাহ দান করা। এই বিষয়ে আমরা উক্ত ষ্টুডিয়োর মালিকদের অনুরোধ করি তাঁরা যেন এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখেন।

আমাদের দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রীদেরও এইদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। এইরূপ একটি জনহিতকর শিক্ষা প্রচারের পন্থাকে অবহেলা করে' অব্যবহৃত

অবস্থায় পড়ে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। যদি দেশের শিক্ষা-মন্ত্রীরা এই ফিল্ম শিল্পকে শিক্ষা প্রচারে ব্যবহার করেন তাহ'লে তাঁরা দেখতে পাবেন যে কত সহজে দেশে শিক্ষা বিস্তার করা যায়। ছোট ছোট শিশুদের মনে ক্রীড়াচ্ছলে—কৌতুকচ্ছলে যে শিক্ষার বীজ উপ্ত হয় তা অতি সহজেই অঙ্কুরিত হয়।

স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে শিক্ষাদানের কাজে ফিল্মের সাহায্য কিছুদিন হ'তে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তা তেমন ব্যাপকভাবে নয়। সহরে মাঝে মাঝে এইরূপ দু-একখানি চিত্র প্রদর্শিত হয় মাত্র। এইরূপ ছবির সংখ্যা আরও অধিক হওয়া উচিত এবং স্বাস্থ্যবিভাগের লক্ষ্য রাখা উচিত যেন প্রতি সহরে এবং পল্লীতে এই ধরণের ছবি প্রদর্শিত হয়।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশের প্রতি পল্লী ও সহরে যক্ষ্মা যেরূপ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করছে তা দেখে এখন মনে হয় যদি সময় থাকৃতে এর প্রতিবিধান করতে না পারা যায় তবে ভবিষ্যতে দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হবে। অথচ এই করাল ব্যাধির কবল হ'তে আমরা অতি সহজেই মুক্ত হ'তে পারি।—অজ্ঞতাই এই রোগের মূল। সুতরাং এই রোগের উৎপত্তি, বিস্তার, ভবিষ্যৎ ফল, চিকিৎসা প্রভৃতি সম্বলিত চিত্র প্রস্তুত করিয়া দেশের লোকের কাছে দেখালে এই রোগের প্রসার অনেকটা কম্‌তে পারে।

অধুনা আমাদের সমাজ-বন্ধন ক্রমশ শিথিল হ'য়ে পড়ছে। জাতিগত উন্নতি করতে হ'লে সমাজের মূল ভিত্তি দৃঢ় হওয়া উচিত। যে সমস্ত ছায়াছবি সাধরণতঃ আমরা দেখে থাকি তাতে সমাজ সংস্কারের কোন আশা নাই বরং বিপরীত কিছুর আশঙ্কা আছে। সমাজ ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য এইরূপ ছবি হওয়া প্রয়োজন যে, যার সাহায্যে দেশবাসী উন্নত ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবন যাপন করতে পারে।

উপরি-উক্ত প্রস্তাব সমূহ হতে কেহ যেন ধারণা না করেন যে, আমরা কেবল মাত্র শিক্ষা সংক্রান্ত ছবি নির্ম্মাণের পক্ষপাতী। সর্ব্বপ্রকার ছায়া ছবির সহিত যদি এইগুলি মিশ্রিত হ'য়ে প্রদর্শিত হয় তবে ছায়া ছবি আনন্দ দানের সহিত জাতির পরম উপকার সাধন করতে পারে।

সিনেমা যদি ভবিষ্যতে সুসংস্কৃত না হয় এবং আমাদের কোন স্থায়ী উপকার করতে না পারে তাহলে এই সমাজ ও জাতি বিধ্বংসী গড্ডালিকা প্রবাহ অচিরে বন্ধ হ'য়ে যাওয়া উচিত। কারণ আমরা সে রকম সিনেমা চাই না যা আমাদের অর্থে পরিপুষ্ট হয়ে আমাদেরই অপকার ভিন্ন উপকার করতে পারবে না—এ যে শুধু দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা ভিন্ন আর কিছুই নয়!

ব্রজেন্দ্রনাথ দাস
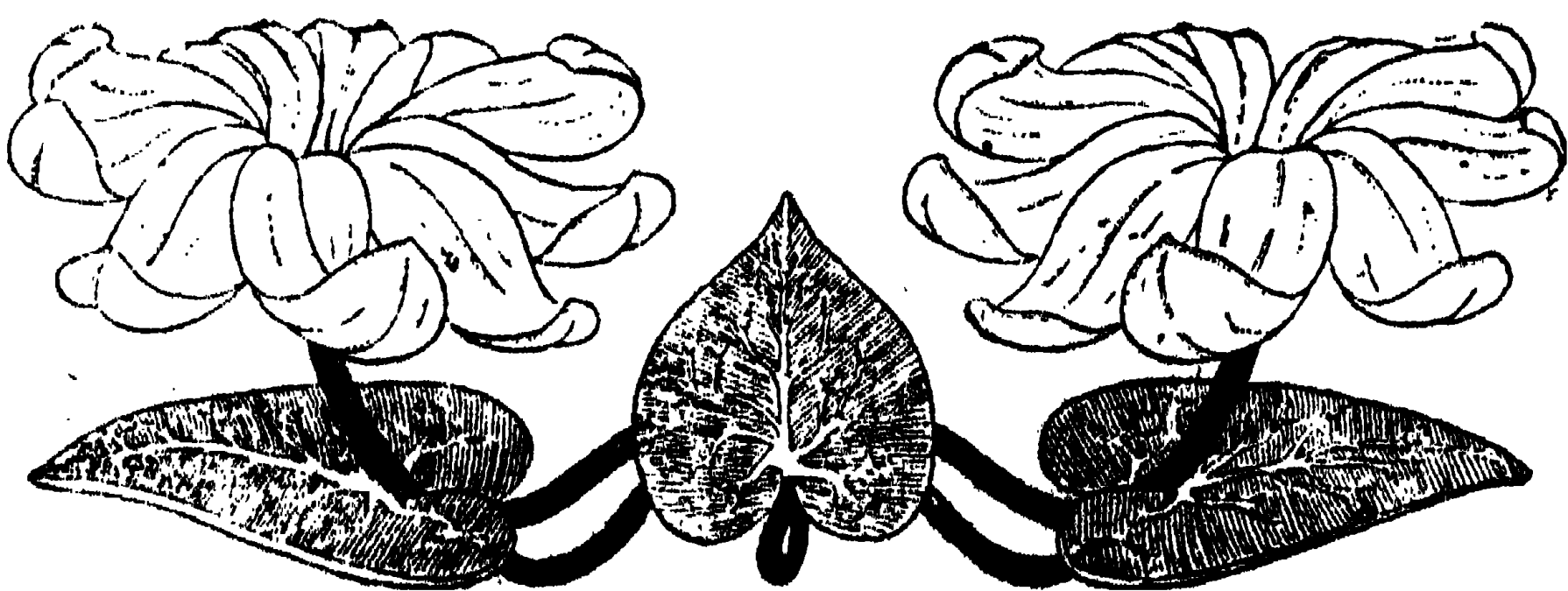
নন্দার মাসী

শ্রীযাদবেন্দ্র মিত্র

নন্দার মাসী।
তাই গ্রামের ছেলে বুড়ো নির্ব্বিশেষে
পরিচিতা ছিল
নন্দার মাসী বলেই।

বরঞ্চ,
ওই নামটার প্রতি ছিল একটা
মস্ত বড় আকর্ষণ ;
যেন একমাত্র ওরই সেটা।
পাড়ার ছেলেগুলো যখন দুষ্টুমি করে
ডাকত অন্য কিছু।
তাড়া খেত, বকুনী খেত আরও বেশী,
হয়ত বা কখনও
নন্দার জন্যে মাসী ;
কাঁদত বিনিয়ে বিনিয়ে।
নামটাই যেন ছিল মৃত নন্দার প্রতি,
একমাত্র নিদর্শন শোক প্রকাশের।
ছেলেটার দিকে চাইলে
পিলেটাই পড়ত প্রথম নজরে।

হয়ত বা,
মাসীর খাওয়ানোর অসীম উৎসাহেই
বেড়েছিল ওটা স্বাভাবিক গতিতে।
কিম্বা গ্রামের ছেলেদের ট্রেড্‌মার্ক
যদি হয় ওটা,

তবে যমরাজার নেহাৎ
খামখেয়ালই হবে বল্‌তেই।
কিন্তু মাসী বলে এটা নাকি
ওরই পোড়া কপাল দোষেই

সেবার নন্দার জ্বরে মাসী
রক্ষাকালীর কাছে ধর্ণা দিয়ে
মানস করেছিল দুটো পাঁঠা
আর, দেড় ভরি সোনার হার
বোনপোর আরগ্যো কামনায়॥
জোড়া পাঁঠা আর হারের বিলম্ব ঘটেনি
মোটেই,
মায়ের কাছে উদ্দেশ্য হতে।
কিন্তু মাসীর সন্দেহ হয়
হারটাতে কিছু পেতল ছিলো মেশানো।
তাই জাগ্রত মা কালী, শাস্তি দিতে
চরম পরিণতি ঘটালো ওলাউঠায়॥

গেল কেড়ে নিয়ে
মাসীর কোল ফাঁকা করে।
এইটেই ছিল মাসীর মস্তবড় দুঃখ
বাধত অহরহ।
স্বর্ণকারের ফাঁকী, আর আপন নির্ব্বুদ্ধিতা,
মিলে জোট পাকিয়ে,
রচনা করল মস্ত বড় ফাঁকি।

আর ফাঁকিটাই রয়ে গেল
নন্দার-মাসী নাম ডাকে ॥

পিয়ারা গাছে,
যখন পাকা মাতলা গন্ধ ছোটে,
মাসী গাছের ছায়ায়
চাটাই পেতে শোয়।
কাছে থাকে একটা বাঁশের কঞ্চি।
মাঝে মাঝে ভাঙা চশমার ফাঁকে
ছেঁড়া রামায়ণ সুর করে পড়ে।
ছেলেগুলো আনাচে কানাচে ঘুরে,
মাসী ঐ দিকে চেয়ে থাকে।
বইখানা মুড়ে, হাই দিয়ে
তুড়ি দিয়ে বলে—
নারায়ণ, নারায়ণ,
নচ্ছার ছেলেদের জ্বালায়
ওর পড়া হয় না মোটে'।
এই অভিযোগ চিরদিন চলে ॥
ছেলেদের ডেকে পিয়ারা দেয়
ছুটো চারটে।
আর নিশ্বাস ছাড়ে কয়েকটা।
হয়ত বলে, 'হায় ওরে নন্দা ॥'
ছেলেদের উৎসাহ বেড়ে যায়।
ক্রমে আব্দার ধরে
মাসী একটা গল্প বলোনা—
সেই যে ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর গল্পটা।
মাসী বলে যায় একটার পর একটা।
তারপর শেষ হ'লে বলে "তোরা বোস
নুন লঙ্কা দিয়ে
কাঁচা আমের আচার নিয়ে আসে।
ছেলেদের ছুহাত ভরে দেয়।
আর মুখের দিকে তাকায়।
ওরা আঙ্গুল চাটে আর বলে,
"মাসী কি চমৎকার।"
মাসী হেসে বলে,
"ধঞ্চে পাতা দিই নি তো
তাতেই এতো।
তোরা গরু না ছাগল,
সবই লাগে তোদের কাছে ভালো।"
বিকেল বেলা সব মেয়েরা,
মাসীর কাছে আসে ফিতে কাঁটা নিয়ে
আর বলে "দাও না মাসী
বিনুনীটা ঠিক এমনি
ঐ যে ক্ষেন্তির মত করে"
মাসী বলে "যা তোদের জ্বালায় আর পারি
না তো।"

সন্ধ্যে বেলা
পিদিমটা জলে মিট্‌মিট্‌ করে
ও পা ছড়িয়ে বসে
ন্যাকড়া ছিঁড়ে শলতে পাকায়।
পাড়ার সব বর্ষীয়সীরা আসে
একে একে
নাতি কোলে।
গ্রামের পলিটিক্স আলোচনা চলে।
মধু বোসের নাতবৌ,
না কি ভারি নির্লজ্জ
পরপুরুষের দিয়ে চায় ঘোমটার ফাঁকে
মাসী গালে হাত দেয়
কানের কাছে মুখ নিয়ে
ফিস্ ফিস্ করে বলে,
"ওমা একি লজ্জা!

রাম, রাম, এযে ঘোর কলি।"
মতি গয়লার নাকি
বড্ড দেমাক
বিনে পয়সায় দুধ দিতে গররাজী
এমনি কত কি।
সেদিন ভোরে
হাতে একটা বেতের ডালা,
মাসী গেছে
ওর পুকুর পাড়ে বেড়া দেওয়া
পুঁই ডাঁটার সবুজ ক্ষেতে।
মাথা ঘুরে যায়
হাত থেকে ডালা খসে পড়ে।
গরুতে একদম মুড়িয়ে খেয়ে গেছে।
তাই মাসী রণচণ্ডীবেশে
পাড়াখানি ঘুরে এলো।
শাণিত বাক্যবাণের
অভাব ছিল না মোটে,
বরঞ্চ প্রাচুর্য্যই ছিল বেশী।
এমনি করে ঘটলো
বাগিচার ট্র্যাজেডি।
সকাল বিকেল মাসী পাড়ায় পাড়ায়
টহল দিতো
যেন একখণ্ড জ্বলন্ত উল্কা।

সবাইয়ের ছিল ভয়ের কারণ।
যদিও তিনি সরকারের
ছাপানো গেজেট্ নন,
তবুও গ্রামের ত বটে
সুতরাং সেই হিসেবে মূল্য ছিল
কিছু বেশী॥
বিবাহ উৎসবে মাসীর ডাক পড়ত ;
উনি যেন বিশেষ একটা অঙ্গ
এমনি ভাবে মাসী ছিল
সমাজের প্রাণ।
কোনও সহুরে কবি
কল্পনার রঙীন আমেজে,
আঁকেন যদি গ্রামের ছবি
থাক্‌বে তাতে গোধূলি, রাখালের বাঁশী
বড় জোর,—
গ্রাম্য বধূর সলজ্জ হাসি।
আর মাসী
হয়ত হবে
অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য।
হায়, মাসীর ঘটবে চরম দুর্দ্দশা
অতি করুণ এক ট্রেজেডি।
তাতেই ঘট্‌বে কবিতার কমিডি॥

শ্রীযাদবেন্দ্র মিত্র

ছায়াপট

বাণীনাথ

ভাবী ঃ

পরিচালক—ফ্রাঙ্ক অষ্টেন

কাহিনী—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোক-শিল্পী—যোসেফ উইরবিং

শব্দ-যন্ত্রী—এস, বচা

পাত্র-পাত্রী ঃ

রেণু—রেণুকা দেবী

কিশোর—জয়রাজ

বিমলা—মায়া দেবী

অনুপম—রামসুকলা

বেলা—মীরা

বোম্বে টকিজের হিন্দি ছবি 'ভাবী' বোম্বাই, উত্তরভারত প্রভৃতি স্থান ঘুরে এসে কিছুদিন আগে কলিকাতা প্যারাডাইস চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ ক'রেছে। বাংলার পরিচিত লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিষের ধোঁয়া' উপন্যাস অবলম্বনে ছবিখানি লিখিত হ'য়েছে। সুতরাং বাংলার আবহাওয়া, বাঙ্গালী চরিত্রের বিশেষত্ব—ভাবী চিত্রে বেশী করে ফুটে উঠেছে। ভাবী চিত্রের কাহিনী চিত্রনোপযোগী এবং প্রবীণ বিদেশী পরিচালক বেশ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা ক'রে সহজ স্বচ্ছ ভাষায় ছবিখানিকে পর্দ্দায় রূপ দিয়েছেন। সাধারণতঃ বোম্বে টকিজের প্রধান ছবিগুলিতে দেবিকারাণী ও অশোককুমার নাবেন, কিন্তু এই ছবিখানি রেণুকা দেবী, জয়রাজ প্রভৃতি নট-নটীর অভিনয় গুণে প্রথম শ্রেণীর চিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়েছে।

ভাবী চিত্রের কাহিনী হচ্ছে এইরূপ : কিশোর ও তিরথ দুই বন্ধু। মৃত্যুর সময় তিরথ অভাগী স্ত্রী বিমলাকে বন্ধু কিশোরের হাতে সঁপে দিয়ে শান্তির নিশ্বাস ফেলে। সেই থেকে বিমলার প্রতি কিশোরের যত্নের শেষ ছিল না—বিমলার দুঃখের লাঘব হ'লো, কিন্তু ক্রমশ অশান্তির ছায়া স্পষ্ট হয়ে এলো। কিশোরের পিতা পশুপতিবাবু ছেলেকে ভুল বুঝলেন। কিশোরকে তিরস্কার, ভৎসনা ও তারপর ত্যাজ্যপুত্র করলেন; কিন্তু বিমলার দুর্দ্দশা ও তিরথের শেষ কথা স্মরণ করে' সব অপমান সহ্য করে' বিমলার পাশে এ'সে দাঁড়াল। কিশোরের পাশের বাড়ীতে থাকেন বিনয়বাবু ও তাঁর সুন্দরী মেয়ে রেণু। কিশোরের সঙ্গে নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে বিনয়বাবুর পরিবারের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। পরিচিত হওয়ার পর থেকে কিশোর ও রেণু অলক্ষ্যে দু'জনে

রেণুকা দেবী

দুজনকে ভালবাসে; কিন্তু রেণুর বন্ধু অনুপমের স্বার্থে ঘা লাগে। অনুপমের চক্রান্তে দু'জনেই দুজনকে ভুল বোঝে—অনুপমের উদ্দেশ্য প্রায় সফল হবার মুখে দেবতাদের চক্রান্তে ফল অন্য রকম দাঁড়াল। বিনয়বাবু অসুস্থ—রাস্তায় হিন্দু-মুসলমানদের ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলেছে—কেউ নেই যে

একটু ওষুধ নিয়ে আসে। সেই বিপদের মুখে কিশোর নিজের জীবন বিপন্ন করে আহত অবস্থায় ওষুধ নিয়ে এসে বিনয়বাবুর প্রাণ বাঁচায়। তারপরেই রেণু ও কিশোরের মিলনের মধ্যে ছবিখানি শেষ হয়।

ছবির গোড়ার দিকে তিরথ ও কিশোরের সম্বন্ধ আরেকটু ফুটিয়ে তোলা উচিৎ ছিল। ছেলের প্রতি একেবারে প্রথম শ্রেণীর 'তারকা' পদে অধিষ্ঠিত হ'লেন। রেণুকা দেবী কয়েকটি সুন্দর গান গেয়েছেন। কিশোরের অন্তর-বিপ্লব, দুঃখ-আশা, সংগ্রাম সহজ ভাষায় বেশ দক্ষতার সঙ্গে জয়রাজ ফুটিয়ে তুলেছেন। জয়রাজের কিশোর—এই চিত্রের একটি প্রধান আকর্ষণ। ছবির সত্যিকার 'ভাবী' পরিচালকের স্নেহদৃষ্টি হ'তে বঞ্চিত হয়েছেন। রেণু

ভাবী চিত্রে রেণু ও কিশোরের ভূমিকায় যথাক্রমে রেণুকা দেবী ও জয়রাজ

পশুপতি বাবুর হঠাৎ অমন আচরণ খুব স্বাভাবিক নয়। কিশোর ও রেণুর মধ্যে প্রেমের আবহাওয়া সৃষ্টির জন্যে পরিচালক বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কৃতকার্য্য হননি। ছবির টেম্পো ধীর গতিতে চলেছে—অনাবশ্যক দৃশ্যগুলি সম্পাদকের চোখকে ফাঁকি দিয়েছে। ভাবী চিত্রে ছোট খাট দোষত্রুটি আছে অস্বীকার করি না, কিন্তু সমস্ত ছবিখানিতে যে মাধুর্য্য ও সুষ্ঠু চিত্রকলার নিদর্শন দেখা যায় তা সত্যিই প্রশংসনীয়। ভাবী ছবির সব চেয়ে বড় সম্পদ এর কাহিনী এবং জয়রাজ ও রেণুকা দেবীর সুন্দর অভিনয়। সুন্দরী শিক্ষিতা রেণুকা দেবী ভাবীর 'রেণু'কে নূতন রূপ দিয়ে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন। ইনি 'জীবন-প্রভাতে' একটি ছোট ভূমিকায় নেবেছিলেন কিন্তু এই ছবির নায়িকা হিসাবে চরিত্রকে প্রধান স্থান দিতে কিশোরের ছায়া হিসেবে বিমলাকে যতখানি পেয়েছি তাতে মন তৃপ্ত হয়নি। তবে ভাবীর দুঃখ, অন্তরের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও ভালবাসাকে তিল তিল হত্যা করে' সুন্দর অভিনয় দ্বারা মায়া দেবী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রেণুর পিতা দেশাই বেশ দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করে' ছবির যা কিছু হাসির খোরাক জুগিয়েছেন। মীরা দেবী ছবির দ্বিতীয় নায়িকা বেলা চরিত্রে মন্দ অভিনয় করেন নি। অনুপম ভূমিকায় রামসুকলা চলনসই। অন্যান্য চরিত্রগুলি মন্দ নয়। ফটোগ্রাফী ও শব্দ-যন্ত্রের কাজ ভাল। সম্পাদনা মন্দ নয়। সুর-সংযোজনা প্রশংসনীয়।

তুষমণ ঃ

প্রযোজক—মিঃ বি, এন, সরকার

পরিচালক ও আলোক-শিল্পী—নীতীন বোস

কাহিনী—শৈলজা মুখো, বিনয় চ্যাটার্জ্জি ও পণ্ডিত সুদর্শন

শব্দ-যন্ত্রী—মুকুল বোস

সুর-সংযোজনা—পঙ্কজ মল্লিক

সম্পাদনা—সুবোধ মিত্র

চরিত্র-লিপি ঃ

মোহন—সাইগল

গীতা—লীলা দেশাই

ডাঃ কেদার—নাজাম

গীতার পিতা—নেমো

বাসন্তী দেবী—দেববালা

রেডিয়ো ডিরেক্টর—জগদীশ

স্যানাটরিয়াম পরিচালক—পৃথ্বিরাজ

ভাবী চিত্রে বেলার ভূমিকায় মীরা দেবী

নিউ থিয়েটারসের নূতন হিন্দি ছবি তুষমণের উদ্বোধন উৎসব সর্ব্বপ্রথম দিল্লী রিগ্যাল চিত্রগৃহে লর্ড লিনলিথগো সম্পন্ন করেন। ছবিখানি কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা নিউ সিনেমা চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে। এই ছবিতে নিউ থিয়েটার্সের সব নামজাদা হিন্দি আর্টিষ্টদের নামান হয়েছে। ছবির নাম তুষমণ রাখা হলেও সত্যিকার দেশের তুষমণ 'যক্ষা রোগ' ছবির প্রধান বিষয়বস্তু নয়। তুষমণ একটি বিচিত্র প্রেম কাহিনী—ছবির যা কিছু বাণী তা পরিচালক সহজ ভাবে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে দর্শকদের শুনিয়েছেন। সুতরাং ছবির আনন্দ বিতরণ অংশে পরিচালক যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

মোহন, রেডিয়ো গায়ক আর বন্ধু কেদার, ডাক্তার। মোহনের আর্থিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল নয়।—রায় বাহাদুরের একমাত্র সুন্দরী শিক্ষিতা কন্যা গীতা দেবীকে মোহন ভাল-বাসে এবং আশা রাখে হয়ত একদিন গীতাকে নিজের জীবন-সঙ্গিনীরূপে পাবে। মোহনের বিরহ আশা ও স্বপ্নকে

ভেঙ্গে চুরমার করে দিল প্রথম গীতার মা আর দ্বিতীয় নিজের অসুখ। গীতার মা চায় গীতার স্বামী হবে গীতারই উপযুক্ত পাত্র। ডাক্তার কেদার হ'লো গীতার মার মতে সেই উপযুক্ত পাত্র। ডাক্তার কেদার জানত না মোহন গীতাকে ভালবাসে। একদিন বন্ধুকে নিজের সব চেয়ে প্রিয় গীতাকে সঁপে দিয়ে মোহন ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাল। মোহনের অসুখ বেড়ে গেছে—স্যানাটরিয়ামে আশ্রয় নিতে

প্রথম হ'তে শেষ পর্য্যন্ত ছবিখানির গতি বেশ অবাধে চলেছে। নানা বিচিত্র ঘটনার মধ্যে দিয়ে পরিচালক ছবিখানির সুন্দর সমাপ্তি করে' শিল্প প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। সঙ্গীত, অভিনয়, শিল্পকলার দিক দিয়ে ভুবমণ সকল সুধীবৃন্দের অভিনন্দন দাবী করতে পারে।

ছবির দ্বিতীয় ভাগে পরিচালকের অন্যান্য ছবি 'ভাগ্য চক্র' 'দিদি'র আভাষ কিছু কিছু পাওয়া যায়।

মায়া দেবী ও জয়রাজ

বাধ্য হয়েছে। অন্যদিকে গীতা ও ডাঃ কেদারের বিবাহের প্রায় সব ঠিক—সেই মুহূর্ত্তে ঘটনার আবর্ত্তনে সব ওলট পালট হ'য়ে গেল। গীতা গাড়ী করে পালিয়ে যাচ্ছিল মোহনের সঙ্গে দেখা করবে ব'লে। পথে গাড়ী গেল ভেঙ্গে —আহত গীতা সেই স্যানাটরিয়ামে আশ্রয় নিলে এবং ফিরে পেল তার চিরবন্ধু মোহনকে।

ষ্টেজের উপর গীতা দেবীর নৃত্য এবং মোটর দুর্ঘটনা খুব উপভোগ্য হয়নি। গীতার অমন করে' পালিয়ে যাবারই বা কি দরকার ছিল? হঠাৎ কোন সুখবর পেয়ে গীতা দেবী

লীলা দেশাইএর সিঁড়ির উপর অথবা ট্যাপ ড্যান্স দর্শকদের চোখকে পীড়া দিয়েছে। 'দিদি' চিত্রের পর লীলা দেশাই ভুবমন ছবিতে প্রধান নায়িকার ভূমিকার

অবতীর্ণা হয়েছেন। ছবির প্রথম ভাগে লীলা দেশাইএর অপূর্ব্ব অভিনয় সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু ছবির বিষাদময় দৃশ্যগুলি তেমন ভাবে লীলা দেশাই ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। গীতা চরিত্র যেন লীলা দেশাইএর জন্যেই বিশেষ করে' রচিত হয়েছিল। এই সর্ব্বপ্রথম ইনি একটি গান গেয়েছেন। গানটি মন্দ নয়—তবে নাচের দিক দিয়ে অশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সাইগল ও লীলা দেশাই দুষমন ছবিতে সুন্দর সাবলীল অভিনয়ের দ্বারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মোহনের বিরাট আশা, ভালবাসা ও দুঃখ সাইগলের সুষ্ঠু অভিনয়ে দেখতে পাই। রেডিয়োর সামনে সাইগলের মধুর গানগুলি দুষমণ ছবির সব চেয়ে বড় সম্পদ। ডাক্তার কেদার চরিত্রে নাজামের অভিনয় বেশ প্রশংসনীয়। নাজামের ন্যায় এমন সুদর্শন অভিনেতা ভারতীয় চিত্র জগতে খুব কমই আছে। যেভোরুগী গীতার পিতা কন্যার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা আর মার অন্যায় জিদ নেমো ও দেববালার অভিনয়ে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রেডিয়োর ষ্টেসন ডিরেক্টর হিসেবে জগদীশের সুন্দর অভিনয় উল্লেখযোগ্য। আর স্যানোটরিয়াম ডাক্তার বেশে পৃথ্বিরাজের নূতন মেক-আপ ও অভিনয় ভঙ্গি বেশ ভাল। মনোরমা ছবির গঙ্গা চরিত্রে বেশ অভিনবত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। অনান্য চরিত্রগুলি মন্দ নয়।

দুষমণ ছবির সব চেয়ে আকর্ষণ এর ফটোগ্রাফি। এই বিভাগে নীতীন বোস অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছেন। শব্দ-যন্ত্রী মুকুল বোস বেশ প্রশংসনীয় কাজ করেছেন।

দুষমন চিত্রের একটি দৃশ্য

শ্রীমতী লীলা দেশাই ও সাইগল

সম্পাদনা উল্লেখযোগ্য। ছবির সঙ্গীত বিভাগে সুর-শিল্পী পঙ্কজ মল্লিক নিজের বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখেছেন।

ষ্টুডিয়ো সংবাদ ঃ

নিউ থিয়েটার্স ঃ

বড়দিদি—নিউ থিয়েটার্সের নূতন ছবি বড়দিদি ৭ই এপ্রিল যুগপৎ নিউ সিনেমা ও রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করবে। ছবির অনবদ্য কাহিনীর সহিত বাংলা দর্শকরা সকলেই বিশেষ পরিচিত, সুতরাং সে বিষয়ে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। অমর মল্লিকের প্রথম পরিচালনায় ছবিখানিতে অভিনয় করিয়াছেন মলিনা, চন্দ্রাবতী, মেনকা, শৈলেন চৌধুরী, পাহাড়ী সান্যাল, ইন্দু মুখার্জি প্রভৃতি।

সাপুড়ে—দেবকী বসুর পরিচালনায় ছবিখানির সুটিং সমাপ্তি হয়েছে। সুন্দর অভিনয়, নাচ, গান, হাসি কৌতুক

দর্শকদের যত রকম ভাবে আনন্দ দিতে পারা যায়, তারই আয়োজন করেছেন দেবকী বসু। ছবিখানি বিয়োগান্ত। ওস্তাদ (মনোরঞ্জন) ছবির শেষ দৃশ্যে চন্দনের প্রেমিক ঝুমড়োর জীবন বাঁচাতে গিয়ে নিজেই মৃত্যুকে বরণ করে' নেয়। ওস্তাদ হচ্ছে এই ছবির প্রধান নায়েক।

রজত-জয়ন্তী—প্রমথেশ বড়ুয়ার নূতন বালা ছবির কাজ বেশ দ্রুত গতিতে চলেছে। রজতের গৃহে টেকনিশিয়ানরা কাজে ব্যস্ত। রজত মানে প্রমথেশ বড়ুয়ার ব্যবসা হ'চ্ছে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি করা। এই খেয়ালী ডাক্তার ও মাসতুতো ভাই বিশুর (পাহাড়ী) কাছে রোগাস চিত্র পরিচালক (ভানু বান্যার্জ্জি) এক সুন্দর প্রস্তাব এনেছেন যে মাত্র দশ হাজার টাকা খরচ করলেই একটি শ্রেষ্ঠ ছবি তৈরি করে' ডাক্তারকে একদিনেই বড়লোক করে দেবেন। ডাক্তার অর্থাৎ বড়ুয়ার টাকা নেই—কিন্তু ধনী কৃপন মামার (শৈলেন চৌধুরী) বেশ কিছু আছে। দেখা যাক শেষ পর্য্যন্ত কি হয়।

কপাল-কুণ্ডলা—ফণী মজুমদারের পরিচালনায় ছবির কাজ বেশ ভাল ভাবেই চলেছে। নবকুমারের গৃহে কপাল-

দুষমন চিত্রের একটি দৃশ্যে লীলা দেশাই, সাইগল ও জগদীশ

কুণ্ডলা এসেছেন তাই চারিদিকে উৎসব ও আনন্দ, কিন্তু ভবিষ্যৎ এর ক্রোড়ে অন্ধকারের ছায়া দেখে কপাল-কুণ্ডলা বিমর্ষ। ননদ অর্থাৎ মিস্ পান্না হাসি কৌতুকে কপাল-কুণ্ডলার বিমর্ষ মনকে প্রফুল্ল রাখতে চেষ্টা করে'। ছবির এই অংশগুলি এখন তোলা হচ্ছে। কপাল-কুণ্ডলা (লীলা দেশাই) ও নবকুমার (নাজাম) বেশ সুন্দর অভিনয় কচ্ছেন।

জয়-পরাজয়—হেমচন্দ্রের বাঙলা সংস্করণের প্রথম ছবি 'জয়-পরাজয়', সুতরাং বাঙ্গালী দর্শকদের কাছে এ একটি সুসংবাদ সন্দেহ নাই। ছবির নায়ক হবেন বোধ হয় পঙ্কজ মল্লিক আর নায়িকা কানন। সঙ্গীত পরিচালকদের ছবির প্রধান নায়ক হিসেবে আমরা দেখতে চাই না। বার বার পর্দায় দেখা দিলে সুর-শিল্পীদের বৈশিষ্ট্য থাকে না। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন চৌধুরী, ইন্দু মুখার্জ্জি, বোকেন চট্টো প্রভৃতিদের এই ছবিতে দেখতে পাব। সুর-সংযোজনা করবেন রাইচাঁদ বড়াল

ফিল্ম করপোরেশন ঃ—

তুম হারি জিৎ—রঞ্জিৎ সেনের পরিচালনায় ইংাদের এই নূতন হিন্দি ছবিখানি বোম্বাইতে ৭ই এপ্রিল মুক্তিলাভ করবে। ছবিখানি চিত্রমোদীদের আনন্দ দেবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ছায়া দেবী এই ছবির প্রধান নায়িকা আর নায়ক হচ্ছেন সুদর্শন মুজামিল। ছবিখানির সুর-সংযোজনা করেছেন ভীষ্মদেব চ্যাটার্জ্জী।

রিক্তা—সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় এদের প্রথম বাংলা ছবির কাজ দ্রুত চলেছে। বাংলার নামজাদা চলচ্চিত্র অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী এ্যাটর্নী বিকাশের ভূমিকায়

নেমেছেন। বিকাশের স্ত্রী হচ্ছে ছায়া দেবী। এই দুই জনের জীবনকে কেন্দ্র করে' মূল চিত্রনাট্য অনেকটা গড়ে উঠেছে। তবে অনান্য চরিত্রগুলি ছবিতে কম স্থান জুড়ে নেই। বিকাশের গৃহে এখন স্যুটিং চলেছে। বিকাশের বন্ধু হিসেবে দেখা দেবেন অশোক (রতীন)। পরিচালক সুশীল মজুমদার বিকাশের পুত্র হিসেবে দেখা দেবেন। আর ছবিতে তাঁরি সুন্দরী স্ত্রী হচ্ছেন রমলা। রমলার একটি গান নেওয়া হয়েছে। রিক্তা ছবিতে তুলসী লাহিড়ী, দেববালা, সন্তোষ সিংহ, রবি রায়, মোহন ঘোষাল প্রভৃতি আর্টিষ্টরা আছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া পিকচার্স:

যখের ধন—হরি ভঞ্জের পরিচালনায় তোলা 'যখের ধন' ছবিখানি উত্তরা চিত্রগৃহে ১লা এপ্রিল মুক্তিলাভ

ফিল্ম করপোরেশনের 'রিক্তায়' সরমা ও বিকাশের ভূমিকায় যথাক্রমে, দেববালা ও অহীন্দ্র চৌধুরী। পরিচালক—সুশীল মজুমদার।

ভারতলক্ষ্মীর 'পরশমণি' চিত্রের একটি মনোরম দৃশ্যে জ্যোৎস্না ও তুলসী লাহিড়ী

করেছে। যখের ধন ছবিতে কুমার (সুশীল রায়), বন্ধু বিমল (জহর গাঙ্গুলি) ও রেখা (শীলা হালদার) বিপুল উৎসাহে গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে সব বিপদকে তুচ্ছ করে' কেমন করে' সেই গুপ্তধন আবিষ্কার করেছিল অতি সুন্দর করে' তা ছবিতে দেখান হয়েছে। দস্যু করালীর ভূমিকায় নেমেছেন অহীন্দ্র চৌধুরী। এই ছবির পর এই চিত্র-প্রতিষ্ঠান হ'তে ফনী বর্ম্মা নূতন বাংলা ছবি "কচ ও দেববানী" তুলবেন।

রাধা ফিল্ম কোম্পানি :

নর-নারায়ণ—পরিচালক জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জীর পরিচালনায় ছবিখানির অর্দ্ধেক সমাপ্তি হয়েছে। "সামন্তক মনি" এই ছবিতে সব চেয়ে প্রধান স্থান পেয়েছে। এই মনিটির প্রতি লোভ ছিল সকলের। সত্যজিৎ ও প্রহসনের মৃত্যু হলো এই মনিটির জন্যে। মনিটিকে লাভ করলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু রাজা জরাসন্ধের চক্রান্তের ফলে অন্য রকম দাঁড়ায়। একটার পর একটা এই অংশগুলি তোলা হচ্ছে।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স :

পরশমণি—ছবিখানির সব কাজ শেষ হয়ে এলো। পরশমণির শেষ দৃশ্যে মোহিত ও সীতার অভিনয় প্রাণ-স্পর্শী হয়েছে। মদ্যপায়ী, মোহিত অর্থাৎ দুর্গাদাস শিক্ষিতা স্ত্রী সীতার সেবা যত্নে নিজের ভুল বোঝে। এই মোহিতের চরিত্রের দোষ গুণ চিত্রে সুন্দর করে' ফোটান হয়েছে। পরশমণি ছবিতে নাচ, গান, অভিনয় সুন্দর করে' পরিচালক প্রফুল্ল রায় পরিবেশন করেছেন। ছবিখানি কোথায় মুক্তি-লাভ করবে জানা যায় নি।

দেবদত্ত ফিল্মস ঃ

রুক্মিণী-হরণ—নূতন আলোক-শিল্পী গীতা ঘোষ যোগদান করায় আবার বহু দৃশ্য নূতন করে তোলা হচ্ছে। এই ছবির প্রধান আকর্ষণ হ'বে চিত্রার ভূমিকায় মিস প্রতিমা দাসগুপ্তার অপূর্ব্ব অভিনয়। মিস প্রতিমা দাস গুপ্তার জন্যে বিশেষ করে এই চরিত্রটি রচিত হয়েছে। চিত্রা ও পুণ্ডরিক্ষের প্রথম মিলন দৃশ্য তোলা হচ্ছে। পুণ্ডরিক্ষ বেশে দেখা দেবেন পূর্ণ চৌধুরী হিন্দিতে আর বাংলায় বেচু সিংহ। রুক্মিনী হয়েছেন মিস্ পান্না। ছবিখানি পরিচালনা করছেন অভিজ্ঞ পরিচালক জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জি।

বাণীনাথ

ঢালে দংশনে গরল

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, কবিরত্ন, বি-এ

অন্তরে প্রবেশ ক'রে বিশ্বাস করিয়া চুরি,
অসতর্ক অন্ধকারে যে জন চালায় ছুরি,
সে জন সুজন কত বুঝিতে কি থাকে বাকি ?
ঠকাতে পারে কি আর তাহার ছলনা, ফাঁকি ?

বন্ধুত্বের আবরণ খুলিয়া খসিয়া যায় ;
চোখে পড়ে কসায়ের জঘন্য কদর্য্যতায়।
শিহরিয়া উঠে প্রাণ ; মানবে দানবে আর
ভেদাভেদ কোথা ? আমাদের শান্তির সংসার
এই সব চক্রী, ঈর্ষী,—নররূপী সয়তান—
গড়ে অশান্তি আগার ; সদা ত্রাসে কাঁপে প্রাণ
নানা অকল্যাণ, থাকে যেই প্রতিষ্ঠানে ;
পাপ বিষ দেয় ঢেলে শুভকর অনুষ্ঠানে।

ক্ষমায় স্বভাব তার হয় কভু নিরমল ?
বিষধর সম সুধু ঢালে দংশনে গরল।

হাসি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌-এ, বি-এল্‌

পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুর সহিত মানবমনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। এমন কি কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে মানব মন না থাকিলে এগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিত কি না সন্দেহ। মানব বিষয়ী, এগুলি বিষয়। বিষয়গুলি প্রতিনিয়ত মানবের ইন্দ্রিয়ের দ্বারে এরূপভাবে আঘাত করিতেছে যে মানবের মন তাহা দ্বারা আলোড়িত না হইয়া থাকিতে পারে না। ইহারই ফলে মানবের মনে বিভিন্ন অনুভূতির উৎপত্তি।

বহির্জগতের তরঙ্গগুলি যদি চিরকাল একইরূপ হইত তাহা হইলে মানবের মন তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িত এবং তাহার ফলে কোনও অনুভূতিই থাকিত না। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। তরঙ্গগুলি মনকে কখনও হেলাইতেছে, কখনও দোলাইতেছে, কখনও বা বিষম আবর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ভাঙ্গিয়া টুটিয়া ফেলিতেছে। তাই মানব হাসে, তাই কাঁদে, তাই ভয় পায়।

মানবমনের একটি বিশেষত্ব এই যে সে সংসারের বিষয়-গুলির বাস্তবিক সংঘটন এবং আশানুরূপ সংঘটন এ দুইএর মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারে এবং সেইজন্যই সে হাসে অথবা কাঁদে। কোনও গুরুতর বিষয়ে আমাদের আশা ব্যর্থ হইয়া গেলে আমরা কাঁদি এবং কোনও সামান্য বিষয়ে আমাদের ইচ্ছানুরূপ ঘটনা না ঘটিলে আমরা হাসি। সংসারে নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল বিষয়ের মধ্যেও মানব একটা সাধারণ মানদণ্ড (standard) বাঁধিয়া লইয়াছে। কোনও একটি নূতন ঘটনা উপস্থিত হইলে সে অজ্ঞাতসারে তাহাকে এই মানদণ্ডের সহিত তুলনা করে এবং উহা হইতে কোনও-রূপ পার্থক্য দেখিলে অবস্থা বিশেষে হাসে অথবা কাঁদে। জীবনে বিয়োগ ও মিলন সর্ব্বপ্রধান জিনিস। আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু অথবা অনুরূপ ঘটনা মানবের মনকে একবার আক্রমণ করিলে অতি দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখে এবং যখন সে বন্ধন অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠে তখন মানব কাঁদিয়া সান্ত্বনা পায়। আবার যখন আমরা একটি মূর্খ ব্যক্তির কার্য্য কলাপ দেখিতে পাই তখন আমাদের মানসিক ভাব তাহার প্রতি সমঞ্জস হইবার পূর্ব্বে যে অবসরটুকু থাকে সেই অবসরে আমরা হাসিয়া আনন্দ উপভোগ করি।

আমরা যে সাধারণ মানদণ্ডের কথা বলিলাম তাহা হইতে কোনও বিষয় অন্যরূপ হইলে তাহা মনকে একটি বিশিষ্ট ভাবে আন্দোলিত করে। যদি কোনও ঘটনা এত গভীর হয় যে উহা ঐ পরিমাপ অতিক্রম করিয়া যায় তাহা হইলে উহা বিষাদজনক (tragic) হইয়া উঠে এবং যে ঘটনা ইহার অনেক নিম্নে থাকে তাহা হাস্যোদ্দীপক (comic)। এইজন্য দেখা যায় অসামঞ্জস্যই হাস্যের প্রধান কারণ এবং অন্যান্য কারণ ইহার আনুসঙ্গিক। কোনও একটি বিষয়ে আমাদের মন কোনও একটি বিশেষ ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকে কিন্তু পরে যাহা ঘটে তাহা ঠিক অন্যরূপ। একজনের জ্বর হইয়াছিল তিনি অন্য এক ব্যক্তিকে ঔষধের কথা জিজ্ঞাসা করায় শেষোক্ত ব্যক্তি বলিলেন "বৃহৎ অট্টালিকা চূর্ণ।" এক শিক্ষক তাঁহার ছাত্রকে বলিতেছেন "আলেক-জাণ্ডার তোমার মত বয়সে তোমার অপেক্ষা হাজার গুণ জ্ঞানী ছিলেন।" ছাত্র উত্তর করিল "আজ্ঞে হাঁ, তবে অ্যারিস্টটলের মত একজন ব্যক্তি তাঁহার শিক্ষক ছিলেন।" এই দুইটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় শেষোক্ত ব্যক্তিটি অথবা ছাত্রটি যে উত্তর দিতেছেন তাহা শুনিবার জন্য আমাদের মন প্রস্তুত ছিল না। এইরূপে দেখা যায় একজন বুদ্ধিমান লোক যদি মূর্খের মত কার্য্য করে, একজন লোক বীরপুরুষের মত বক্তৃতা করিয়া যদি কাপুরুষের মত কার্য্য করে তাহা হইলে আমরা হাসি। কৃপণের বদান্যতা, লম্পটের সচ্চরিত্রতা,

তোষামোদপ্রিয় ব্যক্তির তোষামোদে ঘৃণা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা হাস্যোদ্দীপক। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একজন মূর্খকে একটি কঠিন বিষয়ের প্রসঙ্গে যখন বলেন "একথা কি আপনার আর বুঝিতে বাকি আছে?" তখন তিনি নিজের মনে হাসিতে থাকেন। একটি অভিমানোদ্ধত বৃথাড়ম্বর-প্রিয় বহুমূল্য পরিচ্ছদধারী যুবক চলন্ত ট্রাম গাড়ীতে উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন তাহা দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। রাস্তার কাদা তাঁহার দেহে ও পরিচ্ছদে লাগিয়া যাওয়ায় তিনি যতই কর্দ্দমাক্ত স্থানগুলি নানারকমে গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন রাস্তার লোকজন ততই হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিল। রঙ্গমঞ্চে একজন অভিনেতা হঠাৎ বক্তৃতা ভুলিয়া গেলেন তখন অপর একজন অভিনেতা তাঁহার বক্তৃতাটি শ্রোতার গোচরেই তাঁহাকে মনে করাইয়া দিলেন; অথবা একজন অভিনেতা বিভিন্ন সময়ের বক্তৃতা উলটপালট করিয়া অথবা একসঙ্গে মিশাইয়া বলিতে লাগিলেন তখন অপর একজন ব্যক্তি রঙ্গমঞ্চেই অজ্ঞাতসারে বলিয়া ফেলিল "আঃ, তুমি ওটা এখন বল্লে কেন? ভীমের বক্তৃতার শেষ কথা 'চল তবে ত্বরা করি' বলা শেষ হ'লে তবে তোমার 'অতিথি আজি এ পুরে' বলা উচিত ছিল।" এ সমস্ত ঘটনাগুলিই হাস্যোদ্দীপক। এ স্থলে সেক্ষপীয়রের মিড্ সামার নাইটস্ ড্রীম নামক নাটকের মধ্যে যে নাটকাভিনয়টি আছে তাহা পাঠকের মনে পড়িতে পারে। একজনের নাসিকায় সর্পদংশন করায় সে মারা যায়। তাহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াও একজন বলিয়া উঠিলেন "চক্ষু মানুষের পরম ধন, ভাগ্যে চক্ষু দুইটি বাঁচিয়া গিয়াছে।"

অসামঞ্জস্য কেবল যে ঘটনাতেই হয় তাহা নহে, কখনও কখনও কেবলমাত্র কথা দ্বারাও দেখান যায়। 'রক্ষিশূন্য কক্ষ' না বলিয়া 'কক্ষশূন্য রক্ষি' বলিলে হাসিপায়। এইরূপ 'নাব ডাক্তেল' 'বক্ষের জলে চক্ষু ভাসিয়া যাওয়া' ইত্যাদি। এরূপ হাস্যোদ্দীপক উদাহরণ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে এগুলির একটি চমকপ্রদ ক্রিয়া আছে। Witএর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সিড্নী স্মিথ বলিতেছেন যে ইহাতে ঘটনাগুলি কিঞ্চিৎ অসাধারণভাবে বর্ণিত হয় এবং তাহা মনে বিস্ময় আনয়ন করে। একটি লোক মারা গিয়াছে না বলিয়া 'শিঙে ফুঁকেছে' অথবা 'পটোল তুলেছে' বলিলে হাসি পায়।

অসামঞ্জস্য হাস্যের কারণ বলিয়া অজ্ঞতাও হাস্যের একটি বিষয়, যেহেতু ইহা পূর্ব্বকথিত সাধারণ মানদণ্ডের অনেক নিম্নে। একজন পল্লীগ্রামের লোক কলিকাতায় আসিয়া যখন মোমবাতিকে কলাগাছের থোড় অথবা রাস্তার জলের কলকে শিবঠাকুর বলে তখন হাস্য সংবরণ করা যায় না। একই কার্য্যের বিভিন্নরূপ কারণ থাকে। যাহার বহুদর্শিতা নাই সে অজ্ঞতাবশতঃ সেই কার্য্য দেখিয়া সকল স্থানেই নিজের অনুরূপ কারণটি আরোপ করে, ইহা হাস্যের বিষয় একটা গল্প আছে একজনের গামছা হারাইয়া যাওয়ায় সে দাড়ি রাখিয়া অর্থাৎ নাপিতের খরচ বাঁচাইয়া গামছার দাম তুলিতেছিল। সে একটি বৃহৎ দাড়িবিশিষ্ট লোককে দেখিয়া বলিয়া উঠিল "ভায়ার শাল না কি?"

সংসারের ব্যাপারগুলির বাস্তবিক সংঘটন এবং আশানুরূপ সংঘটন এ দুইএর মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই প্রভেদ থাকে। মানব নানারূপ সুখময় ঘটনা কল্পনা করে কিন্তু পরক্ষণেই তাহা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা দেখিয়া হাসি পায়। এস্থলে ঈশপের গল্পে গোয়ালিনীকুমারীর বিবাহপ্রস্তাবে অনিচ্ছা-সূচক মস্তক কম্পন ও দুগ্ধভাণ্ড পতনের কথা আমাদের স্মরণ হয়। সংসারের বিষয়গুলিকে মানব তাহার অধীনে আনিতে চায় কিন্তু অবশেষে বিষয়গুলি মানবের প্রভু হইয়া উঠে। মানব বুঝিতে পারে যে তাহার ক্ষমতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তথাপি সে অসম্ভব বস্তুর কল্পনা অথবা প্রয়াস হইতে বিরত হয় না। অবশ্য ক্ষমতার মধ্যে প্রয়াস দোষাবহ নয় কিন্তু তাহাও অতি দ্রুত কল্পিত হইলে হাস্যোদ্দীপক হইয়া উঠে। অসম্ভব ব্যাপারের প্রয়াসের উদাহরণ আমরা ইতিহাস হইতেও অনেক পাই যথা এম-পিডক্লস্, ক্লিওম্‌প্রোটাস্, প্রভৃতি।

মানব যে বিষয়ে দুর্ব্বল সে বিষয়টিকে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া বিদ্রূপ করা হয় তাহাও হাস্যের কারণ। তোষা-মোদে যখন দেবতাগণও মুগ্ধ হন তখন মানুষ কোন ছার, কিন্তু কতকগুলি লোকের মধ্যে তোষামোদ-প্রিয়তা এতই প্রবল যে তাঁহাদের মধ্যে যে জিনিসটির অভাব, কোনও

লোক তাঁহাদের সেই জিনিসটি আছে বলিয়া বলিলে অত্যন্ত খুসী হন এবং এমন কি অন্য লোক না বলিলেও তাঁহাদের মনে মনে একটা ধারণা থাকে যে বাস্তবিকই তাঁহাদের সেই জিনিসটি আছে। একজনের বক্তৃতা অন্য কাহারও ভাল না লাগিলেও তাঁহার নিজের ধারণা তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। একজনের শরীরের বর্ণ মসীময় হইলেও চাটুকার প্রণয়ীর মুখে তাঁহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের প্রশংসা শুনিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। একজন বৃদ্ধ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার সময়ে তাঁহার বেশ ধারণা থাকে যে তিনি তখনও একটি পুরাদস্তুর যুবক আছেন।

মানবের বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয়তা হাস্যের একটি চিরন্তন উপাদান এবং এ ব্যাপারটি বিদ্রূপ করিতে মহাত্মা বিষ্ণুশর্ম্মা ও মহাত্মা ঈশপ কখনও ক্লান্তিবোধ করেন নাই।

তাঁহারা মানবজাতির দোষ ও ভ্রমগুলি ইতর প্রাণীর লেজ পুচ্ছ প্রভৃতিতে সংক্রমিত করিয়াছেন। বানরের স্বভাব চপলতা, কচ্ছপের মন্দগতি, শৃগালের বুদ্ধি প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে তাহাদিগকে কথা বলাইয়া গল্প রচনা করা হইয়াছে। ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ, ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক অথবা আকাশে উড্ডয়নেচ্ছু কচ্ছপের গল্প পড়িতে পড়িতে আমরা যেরূপ উপদেশ পাই তেমনই হাসিতে থাকি। এ গল্পগুলিতে নৈতিকদর্শনকে যদিও প্রাকৃতিক ইতিহাসে পরিণত করা হইয়াছে তথাপি ইহাদের মধ্যে হাস্যরস মিশ্রিত না থাকিলে ইংরাজ সমালোচক হেজলিট্ এরূপ কথা বলিতেন না যে "আমি ইউক্লিডের জ্যামিতি অপেক্ষা ঈশপের গল্পের রচয়িতা হইতে চাই।"

কেবলমাত্র কথা ব্যতীত অনেক সময়ে আকার ইঙ্গিত দ্বারাও হাস্য আনয়ন করা হয়। নাট্যাভিনয়ে বিদূষকগণ কখনও হস্ত সঞ্চালন কখনও ভ্রূকুঞ্চন, কখনও বিকট চীৎকার প্রভৃতির দ্বারা হাস্য আনয়ন করে। এরূপ হাস্য প্যান্টোমাইম প্রভৃতির মধ্যে প্রভূত পরিমাণে দেখা যায়। এরূপ হাস্যের টান অনেক সময়ে আদি রসের দিকে থাকে এবং অভিনয়ে যত কৃতকার্য্য পাঠকালে তত নয়। কিন্তু ইহা অপেক্ষা অন্য ধরণের আর একপ্রকার হাস্য আছে তাহা কেবল উন্নত ও শিক্ষিত মন বিশিষ্ট লোক ভিন্ন অন্য কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না। সংসারে অনেক গুরু বস্তু আছে এবং অনেক লঘু বস্তুও আছে; মন যখন কোনও একটা গভীর বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছে তখন তাহাকে পরক্ষণেই কতকগুলি অতি সামান্য সামান্য বিষয়ের আলোচনা করিতে হয় এবং মানব তাহাতে স্বভাবতঃই হাসে। চার্লস্ ল্যাম্ব এবং ইংরাজীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গদ্য-লেখক স্যার টমাস ব্রাউনের হাস্য এইরূপ ঘটনা হইতে সমুদ্ভূত। এই পৃথিবী তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবী কিন্তু তাঁহাদের মন আর একটা কল্পনাময় পৃথিবীতে সর্ব্বদা বিচরণ করিত; তাঁহারা এই দুইটি পৃথিবীর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অক্ষম। এরূপ মনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি—হাস্য। কিন্তু ইঁহাদের মনে হাস্যের সহিত বিষাদের তরঙ্গও প্রতি-নিয়ত কখনও উঠিতেছে, কখনও একটি তরঙ্গ অপর একটিতে বিলীন হইয়া তাহা হইতে পুনরায় উত্থিত হইতেছে এবং কখনও বা একটি তরঙ্গ সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইবার পূর্ব্বেই অন্য একটি আসিয়া তাহাতে আঘাত করিতেছে। কখনও সাধারণভাবে হাস্যোদ্দীপন, কখনও প্রকারান্তরে, কখনও সামান্য কথা দ্বারা, কখনও আকার ইঙ্গিতে, কখনও বা হাসাইতে হাসাইতে পাঠককে একটি ঊর্দ্ধতন রাজ্যে লইয়া গিয়া বিষাদের গভীর সমুদ্রে নিমজ্জন। কিন্তু যখন তাঁহারা বাস্তবিক মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছেন তখন দেখা যায় যে সেই হাস্যের বাহ্য আবরণের পশ্চাতে বিষাদের কালিমারেখা ক্রমশঃ প্রকট হইয়া অন্তর্হিত হইতেছে এবং কখনও বা বাহ্য আবরণটি একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা সেই কালিমারেখা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। তাঁহাদের হাস্যে ক্রন্দন আছে কিন্তু ক্রন্দনে হাস্য নাই। তাঁহাদের হাস্য কি বলিয়া বর্ণনা করা যায় জানি না। বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর যেমন আধ গৌরী আধ শঙ্কর, আধজ্যোতি আধ ছায়া, সেইরূপ ইহাদের হাস্য অর্দ্ধেক কবিতা, অর্দ্ধেক কল্পনা, অর্দ্ধেক বিষাদ অর্দ্ধেক সহৃদয়তা, অর্দ্ধেক চিন্তা অর্দ্ধেক অনুভূতি। জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে ইঁহাদের মধ্যে হাস্য অপেক্ষা ক্রন্দন অধিক কেন? তবে কি সংসারে সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিক? পূজ্যপাদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় 'সুখ না দুঃখ' প্রবন্ধটি লিখিয়া কোনও একটি দিকে

অধিক টান দিয়াছেন আশঙ্কা করিয়া পাঠকের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়াছেন কেন? সেক্ষপীয়রের 'কিং লীয়র' নাটকের বিদুষককে 'বিদুষক' বলিব না 'বিষাদক' বলিব?

সাধারণ জীবনের বিকৃতি দেখিলে স্থল বিশেষে হাসি পায়। দুই তোত্‌লার কলহ শুনিয়া অথবা তোত্‌লা ক্রুদ্ধ হইয়া কথা বলিতে না পারিলে শিশুগণ হাসে। জীবন বিকৃত দেখিলে হাসি পায় বলিয়া কতক লোক সাধারণ জীবন হইতে কিঞ্চিৎ অসাধারণ ঘটনা ঘটাইয়া হাস্য আনয়ন করিয়াছেন। মোলিয়রের পুস্তকগুলিতে অফুরন্ত হাস্য আছে কিন্তু ঘটনাগুলি কিছু অসাধারণ, বাস্তব জীবনে সেরূপ ঘটনা ঘটে কিনা সন্দেহ। সেরূপ হাস্যোদ্দীপক ঘটনা ঘটাইবার জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলিকে বিশেষ ভাবে সৃষ্টি করিতে হয় তাহা সব সময়ে হয়ত বাস্তব জীবনে সত্য নহে।

অতিরঞ্জন ব্যাপারটিও জীবন বিকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিশিষ্ট। অতিরঞ্জনপ্রিয়তা মানবমাত্রেই দেখা যায় কিন্তু পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মধ্যে অধিক। একটি ঘটনায় যে ব্যাপারটুকু সংযোগ করিয়া দিলে হাস্য আনয়ন অথবা বৃদ্ধি করা যায় তাহা যোগ করিয়া দিতে অনেকে কসুর করেন না। একটি লোক ঘরে শুইয়াছিল, একটা পায়রার পালক উড়িয়া আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িল। সেই ঘটনাটা মুখান্তরিত হইয়া স্ত্রীলোকগণের মুখে অবশেষে এইরূপ দাঁড়াইল যে লোকটা গতরাত্রে একটা পায়রা বমি করিয়াছে।

ক্ষুদ্র বস্তুকে মহৎ অথবা মহৎ বস্তুকে ক্ষুদ্র করিয়া বর্ণনা করিলে হাসি পায়। এস্থলে 'বিষ বৃক্ষে' হুকার বর্ণনা স্মরণ হয়। এইরূপে 'প্যারডি' অর্থাৎ ব্যঙ্গানুকরণ হাস্যের একটি কারণ। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'জন্মভূমি' গানটির অনুকরণে চশমা প্রভৃতি বিষয় লইয়া প্যারডি রচিত হইয়াছে এবং মাইকেলের লেখার অনুকরণে "টেবুলিলা সূত্রধর কাপড়িলা তাঁতি" এবং "ছুচুন্দারী বধ কাব্য" রচিত হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায় অসদৃশ বস্তুর উপমাতেও হাসি পায়। "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিত:" নীতিটি সমস্ত ব্যাপারে প্রয়োগ করা চলে না।

অসামঞ্জস্য হাস্যের কারণ বলিয়া ভণ্ডামিও হাস্যের একটি কারণ। একজন হাতে মালা জপিতেছে কিন্তু অন্তরে কাহার সর্ব্বনাশ করিবে তাহাই ভাবিতেছে। অনেক স্থলে দেখা যায় এরূপ লোকের চাতুরী ধরা পড়িয়া গেলে তাহারা তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া পুনরায় একটি নূতন চাতুরী কল্পনা করে তাহাও হাস্যোদ্দীপক। মোলিয়রের 'মক ডক্টর' এইরূপ চরিত্রের লোক। এরূপ ভণ্ডামির দৃষ্টান্ত আমরা বেন জনসনের নাটকগুলিতে অনেক পরিমাণে পাই। এরূপ লোকের কার্য্যকলাপ দেখিলে হাসি পায়—যদিও তাহার সহিত ঘৃণা মিশ্রিত থাকে—এবং যাহাদের মূর্খতাকে লইয়া ইহারা ক্রীড়া করে তাহাদের কার্য্য দেখিলেও হাসি পায়—যদিও তাহার সহিত সহানুভূতি মিশ্রিত থাকে।

মাতৃভাষা ব্যতীত অন্যভাষা একেবারে জানে না অথবা অল্পই জানে এরূপ বিভিন্ন ভাষাবাদীর পরস্পরের কথোপকথন বড়ই হাস্যোদ্দীপক। একজন বাঙ্গালী একজন হিন্দুস্থানীর সহিত হিন্দী কথা বলিতে গিয়া সমস্তই বাঙ্গলা বলিতেছেন কেবল ক্রিয়া পদের স্থলে 'হ্যায়' কথাটি যোগ করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে একটা 'লেকিন' অথবা 'মগর' যোগ করিয়া এবং বাঙ্গলা কথাকে অশুদ্ধ ভাবে হিন্দীতে পরিবর্ত্তিত করিয়া মনে করিতেছেন তিনি খুব হিন্দী বলিতেছেন। একজন বাঙ্গালী বক্তৃতা দিতেছেন "পিয়ারে হিন্দুস্থানী ভাই লোক, স্বাধীনতা বাত কি বাত নেহি হ্যায়। আজ দেশকা উন্নতিকা দিন, বিলাসমে ব্যসনমে আউর কি কাটেগা?" একজন বিকৃত বাঙ্গলাভাষী কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া দেশের লোকের সহিত দেখা হইলে বলেন যে তিনি দেশের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন কিন্তু ঐ কথাগুলি বলিবার সময়ও দেখা যায় তাঁহার কথায় দেশের কথার টান পূর্ণ মাত্রায় থাকে। একজন পাদ্রী বাঙ্গলা কবিতায় যীশুর গুণকীর্ত্তন করিতেছেন—"গোয়াল গরে কে। শোয়েচেন জাব পাটরেটে।" ওনি যীশু মুকটি ডাটা। উনি জগটের ট্রাটা॥" ইত্যাদি।

দ্ব্যর্থবোধক কথার ক্রীড়ার দ্বারা যে হাস্য আনয়ন করা হয় তাহাকে ইংরাজীতে pun বলে। বক্তা এক অর্থে কথাটি প্রয়োগ করিতেছেন এবং শ্রোতা ইচ্ছাপূর্ব্বক অথবা অনিচ্ছাপূর্ব্বক অন্য অর্থে তাহা গ্রহণ করিতেছেন। পাঠকের

এস্থলে গোপালভাঁড়ের 'কৃষ্ণপ্রাপ্তির' কথা স্মরণ হইতে পারে। বুভুক্ষু ব্যক্তির নিকট কেহ সন্দেশ আনিয়াছে বলিলে তিনি যত আনন্দিত হন, সে সন্দেশটা মোদকের না হইয়া সংবাদপত্রের সন্দেশ হইলে ততোধিক দুঃখিত হন। প্রশ্ন—"আপনার ঠাকুরের নাম কি?" উত্তর—"আজ্ঞে শালগ্রাম।" প্রশ্ন—"আপনাদের কি মেল?" উত্তর—"বোম্বাই মেল।" বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তে' এবং সেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার' নাটকের প্রথম অঙ্কে ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

একজন একটা প্রশ্ন করিতেছে অথবা কথা বলিতেছে অন্য ব্যক্তি তাহা ভুল শুনিয়া অথবা একেবারে না শুনিয়া প্রশ্নটি অথবা কথাটি অনুমান করিয়া লইয়া যে উত্তর দেয় তাহাতে হাসি পায়। একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন "পুঁটুলিতে কি?" উত্তর হইল "রাধানগর যাচ্ছি।" এক ব্যক্তির পুত্র অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিল, অনেক চিকিৎসা করিয়াও কোনও ফল হইতেছে না দেখিয়া পিতা একদিন নিতান্ত বিমর্ষভাবে বসিয়া আছেন এমন সময়ে একজন মোসাহেব আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খোকাকে এখন কে দেখছে?" পিতা বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন "দেখবে আর কে—যম।" মোসাহেব কথাটা না শুনিয়াই বলিয়া উঠিল "হাঁ, উনি খুব ভাল ডাক্তার শুনেছি, উনি যে রোগীকে দেখেন তাকেই ভাল ক'রে দেন।"

মানবমাত্রেরই একটা বিবেচনাশক্তি আছে এবং বিভিন্ন মানবের চিন্তাধারা বিভিন্নরূপ। অবশ্য কদাচিৎ একজনের অভিমত অন্যজনের সহিত মিলিয়া যায় কিন্তু এমন কতকগুলি লোক আছেন যাঁহাদের নিজেদের কোনও মতামত নাই অথবা থাকিলেও স্বার্থের খাতিরে অথবা নৈতিক সাহসের অভাববশতঃ তাহা প্রকাশ করেন না। তাঁহারা সমস্ত বিষয়ে অন্যলোকের চিত্ত সমর্থন করিতে থাকেন। এরূপ লোকের কথা শুনিয়া ও আচরণ দেখিয়া হাসি পায়। এজন্য রাজগণের মোসাহেবগুলি চিরবিদ্রূপস্থল। সূর্য্য পশ্চিমদিকে উদিত হয় ইহা যদি রাজার অভিমত হয় তাহা হইলে তাহাদেরও তাহাই।

জোভের পদকের মত সংসারে প্রত্যেক জিনিসের দুইটি দিক আছে তাহার একটি দিক আনন্দময় ও অপর দিকটি বিষাদময়। যষ্টির দুই প্রান্ত যেমন কখনও পৃথক করিতে পারা যায় না এ দুইটিও তদ্রূপ। নির্ম্মলহাস্য (humour) এই দুইটি দিক সমান দৃষ্টিতে দেখে। এই দৃষ্টি কেন্দ্রচ্যুত হইলে একদিকে যেরূপ অতি তুচ্ছ ও কৃত্রিম হাস্যে পরিণত হয় অপর দিকে তদ্রূপ নিরবচ্ছিন্ন বিষাদে পরিণত হয়। মানব তাহার নিজের নিকট অতি মহৎ কিন্তু পৃথিবীর সহিত তুলনায় সে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নগণ্য শক্তিহীন জীব এবং মানব জীবনের ইহা অতি সাধারণ বৈরতা। নির্ম্মল হাস্য এই উভয়দিকের সমান সহানুভূতি রাখিয়া কোনওটিকে প্রধান হইতে দেয় না। সেক্সপীয়রের হাস্য ঠিক এই ধরণের। প্রথমে দেখা যায় ম্যালভোলিও তাঁহার তুলাদণ্ডের বিদ্রূপের প্রান্তে ঝুলিতেছে এবং পরক্ষণেই দেখা যায় যে সে তাঁহার হৃদয়ের অপরিসীম সহানুভূতির পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

হাস্যে এইরূপ সহানুভূতি না থাকিয়া যদি নৃশংসতা মিশ্রিত থাকে তাহা হইলে তাহা কঠোর বিদ্রূপের আকার ধারণ করে। কখনও কখনও এরূপ বিদ্রূপের বিষযুক্ত শর ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়, উহা অতি জঘন্য। জুভিনাল এইরূপ বিদ্রূপের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ এবং তিনি ড্রাইডেন ও পোপের মহাজন। ড্রাইডেনের বিদ্রূপে উদারতা মিশ্রিত আছে বলিয়া যদিও তিনি এ দোষে সর্ব্বতোভাবে দুষ্ট নহেন, এ্যাডিসনের উপর পোপের যে বিদ্রূপ তাহা সাহিত্য হিসাবে যত মধুর নৈতিক হিসাবে ততোধিক ঘৃণ্য। ব্যক্তি বিশেষের বিদ্রূপে এত হিংসা ও এত সঙ্কীর্ণতা ছিল বলিয়া পোপের বিদ্রূপ এত হেয় কিন্তু বায়রণের "ভিসন অফ্ জজমেণ্ট" এরূপ উদারভাবে লিখিত যে তাহা পড়িয়া তাঁহার উপর আমাদের ঘৃণার ভাব আসে না। এই বিদ্রূপ ক্রমশঃ ব্যক্তিবিশেষকে অতিক্রম করিয়া সমাজ এবং সমাজকে অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর উপর সংক্রামিত হয়। সৃষ্টি রহস্য অদ্যাবধি কেহ ভেদ করিতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতে পারিবেও না তথাপি মানবের স্বভাব এই যে সে উহা ভেদ করিতে চেষ্টা করিবে। এরূপ প্রয়াসে অকৃতকার্য্য হইয়া কাহারও মনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি অবিমিশ্র হাস্য যথা সিডনি স্মিথ;

কাহারও হাসিকান্নার সংমিশ্রণ এবং অপরিমেয় সহানুভূতি যথা সেক্সপীয়র; কাহারওবা নৃশংস বিদ্রূপ যথা সুইফ্‌ট্‌। সংসারে সুখ ও দুঃখ বোধ হয় সমপরিমাণেই আছে, তথাপি মানব দুঃখকে সংসার হইতে বিতাড়িত করিতে চায় এবং না পারিলে তাহার অবস্থা বিভিন্নরূপ ধারণ করে। কাহারও হাস্যের লীলাময় তরঙ্গ, কাহারও অতলস্পর্শ জলধির গম্ভীরতা, কাহারও বা হাসিকান্নার সংমিশ্রণ অথবা ক্রমান্বয়ে আবির্ভাব ও তিরোভাব। কিন্তু অধিকাংশস্থলে দেখা যায় হাসি অপেক্ষা কান্না, সহানুভূতি অপেক্ষা বৈরতা এবং সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সন্দেহের ভাগ অধিক। এরূপ বিষাদ (melancholy) ও সন্দেহ প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্লেটোর মধ্যে আছে, ইহা মণ্টেনের মধ্যে আছে; ইহা সেক্সপীয়র, মিলটন, বেকন প্রভৃতির মধ্যে আছে এবং কাহার মধ্যেই বা নাই? মণ্টেনের সম্বন্ধে একটি রচনাতে ইমারসন বলিতেছেন—Who shall forbid a wise scepticism seeing that there is no practical question on which anything more than an approrximate solution can be had?

কখনও কখনও হাস্যের একটি উদ্দেশ্য থাকে, কখনও বা থাকে না। সেক্সপীয়র, অ্যারিষ্টোফেন্‌স্‌, মোলিয়র, সুইফট্‌ প্রভৃতি ভাবুকের হাস্যের একটা মহত্ব এই যে উহা উদ্দেশ্যপূর্ণ (means to an end)। কিন্তু ইহার বিপরীত একরূপ হাস্য আছে তাহা নিরুদ্দেশ্য। ইহা উত্থিত হয়, কিন্তু ইহার কোনও গতি নাই, ইহা একটি ঘূর্ণীতে আত্মহারা হয়। এরূপ কতকগুলি লোক আছেন যাঁহাদের চক্ষে সংসারের প্রত্যেক জিনিস হাস্যময় অথবা হাস্যের সম্ভাবনাপূর্ণ। এরূপ নিরুদ্দেশ্য হাস্যের মূল্য কিছুই নাই তথাপি দেখা যায় কোনও কোনও গ্রন্থকার—যথা সিডনি স্মিথ—এরূপ ভাবে উহা প্রদান করিয়াছেন যে তাহা সাহিত্যে চিরন্তন স্থান অধিকার করিয়াছে।

হাস্যের যে সমস্ত নিদান নির্দিষ্ট হইল তাহা-ব্যতীত অন্য অনেকরূপ কারণ আছে এবং সেগুলি এই কারণগুলির সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। অধিকাংশ স্থলে ঘটনার পারিপার্শিক অবস্থা ও আকার ইঙ্গিত প্রভৃতির দ্বারা হাস্যোৎপাদনের সহায়তা হয়। আরও দেখা যায় একই ঘটনা কেবল বর্ণনার তারতম্য অনুসারে হর্ষ অথবা বিষাদ আনয়ন করে। কতকগুলি লেখকের হাস্য বিশ্লেষণ করা কঠিন ব্যাপার। চসারের হাস্য কিছু বায়ব ধরণের এবং আমাদের স্পর্শকে প্রতারিত করে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

বাংগালা গানের আদর্শ

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

আজকাল সচরাচর যে সব বাংগালা গান গাওয়া হয় তা'দের সম্পর্কে অনেক কিছু ভেবে দেখার আছে। বাংগালা গান বলতে যদি শুদ্ধমাত্র সেই জিনিষ বোঝায় যেখানে মাল-টানা গাড়ির সহিত ভারবাহী পশুর জুড়ে'-দেওয়ার ম'ত কথার সহিত সুরকে ঘাড় ধ'রে মিলিয়ে দিলেই কার্য্যসিদ্ধি সেখানে, অবশ্য, আমাদের কিছু বলার থাকে না। গোরুর গাড়ির ক্যাঁচোর-কোঁচোর ধ্বনি আকাশ প্রকম্পিত করে বটে, কিন্তু সেটা সুশ্রাব্য নয়। তেমনি কথার সহিত সুরের যেন-তেন প্রকারেণ রফা-ক'রে-নেওয়াটাকেও গান বলতে মার্জিত রুচিতে বাধে। সেইজন্যেই, বাংগালা গানের রূপ কী এবং কেমন হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। তাতে ভবিষ্যৎ বাংগালা গানের সুষ্ঠু বিকাশের পথে সহায়তা হ'তে পারে।

বর্ত্তমানে অনেকেই বাংগালা গানের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে দলে তাঁ'রা আরো ভারী হ'বেন এমন আশা অবশ্যই করা যেতে পারে। কিন্তু, নির্বিচারে, যুক্তি বিরহিত ভাবেই যদি তা'র চর্চা হয়, তা' হ'লে সে-থেকে স্থায়ী কোনো ফললাভ হবে বলে মনে হয় না। যে-কোনো শিল্প চর্চায় একটা আদর্শকে চোখের সম্মুখে মেলে ধরতে হয়; সেই আদর্শ শিল্পীর ভাবকে উদ্দীপ্ত করে, তা'র চলার পথকে করে নিয়ন্ত্রিত। গতানুগতিক পদ্ধতিকে অন্ধের ম'ত অনুসরণ ও অনুকরণ করলে শিল্পীর স্বধর্ম ব্যাহত হয়। তবে অনুকরণকে যদি নিজস্বীকরণের পর্য্যায়ে উন্নীত করা যায় তা হ'লে সেটা শুভ ফলপ্রসূ হওয়া সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ সে জন্যেই বলেছেন, 'অনুকরণই চুরি, স্বীকরণ চুরি নয়।' কিন্তু স্বীকরণের ক্ষমতা তরুণ কোনো শিল্পীর ভেতর লক্ষ্য করেছি ব'লে তো মনে পড়ছে না। প্রত্যেক শিল্পেরই একটা আদর্শ থাকা উচিত; যা কিছু শুনবো, অথবা গ্রহণ করবো তা'কে প্রথমে আদর্শের সহিত মিলিয়ে নিতে হ'বে। আদর্শের পরিপন্থী যদি কিছু থাকে তা'কে বর্জন ক'রে ভালো জিনিষগুলোকে নিজের প্রকৃতির অঙ্গীভূত করতে হবে। তবেই জন্মায় স্বীকরণের ক্ষমতা। আর, তা'র থেকেই ভবিষ্যৎ যাত্রাপথের পাথেয় সংগ্রহ করতে হয়। হয়ত আদর্শের আগুনে অনেক কিছুই পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে, কিন্তু যেটা রইলো সেইটেই শিল্পীর চরম সম্পদ। যে-কোনো শিল্প সম্বন্ধেই একথাগুলো খাটে। যে-সব সঙ্গীত-শিল্পী বলেন, বাংগালা গান গাইবো তা'র আবার আদর্শ অনাদর্শ কি, আদর্শ নিয়ে মাথা ঘামালে কি আর গান গাওয়া চলে?—তাঁদেরকে বলি, যথাবিহিত মর্য্যাদার সঙ্গেই বলি, যে, আদর্শ নিয়ে মাথা ঘামানো যেমন তাঁদের পক্ষে বাহুল্য, গান নিয়ে মাথা ঘামানোটাও তেমনি বাহুল্য। এ-কথা কাকে বোঝাই যে আদর্শবিরহিত শিল্পচর্চা আত্ম-হত্যার স্বগোত্র? কেউ হয়ত এ-কথায় কানই দেবেন না কিন্তু তা হ'লেও এটা ঠিক যে একদিন না একদিন তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারবেন।

আজকাল 'কাব্য সঙ্গীত' নাম দিয়ে যে-সব গান গাওয়া হচ্ছে তাদে'র ভেতর বাংগালা গানের উপাদান নেই এমন বলি না, কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি এই যে কাব্য সম্পদের দিক থেকে যে-সব গান ঋদ্ধ, সুর-সঙ্গতির কথা না ভেবেই তা'দের গায়ে কাব্যসঙ্গীতের লেবেল এঁটে দেওয়া হয়। কাব্য সঙ্গীতে সুর বিবেচ্য নয় এই কি লোকের ধারণা? তা' না হ'লে এমন কেন দেখি যে যে-সব গান ভাবের দিক থেকে অনবদ্য, অসঙ্গত ও বিরুদ্ধ, সুর-তান-লয়ের সমন্বয়ে তাদের রূপকে বিকৃত করা হচ্ছে? রাগ-সঙ্গীতের ধরণ ধারণ থেকে কাব্যসঙ্গীতের জাত কোন দিক দিয়ে আলাদা সেই ধারণা সকলের মনে উপচিত

ক'রে দেওয়া আবশ্যক; তা না হ'লে কাব্য সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচার সত্ত্বেও রূপের ব্যত্যয়ের দরুণ তা'র মর্য্যাদায় হানি হবে। কাব্যসঙ্গীত দেশে বহুধা প্রচারিত হোক এইটে কামনা করি, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-আশাও না ক'রে পারিনে যে তা'র রূপ অক্ষুণ্ণ, অবিকৃত থাকুক।

প্রকৃত পক্ষে, কাব্য-সঙ্গীত আমাদের নিজেদের-দেওয়া নাম। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে দেশী সঙ্গীত বলে এক বিশেষ শ্রেণীর গানের উল্লেখ আছে। 'সঙ্গীত দর্পণ' দেশী-সঙ্গীত নামে অভিহিত করেছেন সেই সমস্ত গানকে নিজ নিজ দেশের রীতি ও প্রকৃতি অনুসারে লোকানুরঞ্জক ভাবে যাদের গাওয়া হয়। "তত্তদ্দেশস্থয়া রীত্যা যস্যা লোকানুরঞ্জনম্। দেশে দেশে তু সঙ্গীতং তদ্দেশীত্যভিধীয়তে।" সেই দিক থেকে দেখতে গেলে বাউল, কীর্তন, ভজন, ভাটিয়ালি, গজল, লাউনী, বিহারী, বাংগালা গান সমস্তই দেশী সঙ্গীতের পর্য্যায়ভুক্ত। এবং আমরা সেই ভাবেই দেশী সঙ্গীতের অর্থ করে এসেছি এতাবৎকাল। যেমন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে বলা হয় মার্গ সঙ্গীত, আমরা বর্তমানে তা'কে বলি রাগসঙ্গীত, তেমনি সংস্কৃত দেশী সঙ্গীতের ও সমার্থক বাংগালা শব্দস্থিরীকরণের প্রয়োজন। আর, তাতেই পেলেম আমরা 'কাব্য সঙ্গীত'কে। কিন্তু দেশী সঙ্গীত বল্‌তে যেমন উপরোক্ত সমস্ত শ্রেণীগুলোকেই বুঝায়, কাব্য সঙ্গীত বল্‌তেই বা তা নয় কেন? কেন ভজন, গজল, ভাটিয়ালি, কীর্তনকে কাব্য সঙ্গীত থেকে আলাদা ক'রে দেখা হ'বে?

আমার যতোটুকু জানা তাতে এই বুঝি যে কাব্যসঙ্গীত উপরোক্ত সমস্ত শ্রেণীর গানগুলোকে পাংক্তেয় করতে বাধ্য। তাতে অবশ্য যাকে আমরা 'আধুনিক বাংগালা গান' বলি তার নিজস্ব কোন সংজ্ঞা থাকে না, কিন্তু তাকে সোজাসুজি 'বাংগালা গান' বল্‌লে এবং ভবিষ্যতে এই নামই প্রচলিত করলে এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হবে বুঝ্‌তে পারিনে! কাব্যসঙ্গীতকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হোক আর 'আধুনিক বাংগালা গান'কে 'বাংগালা গান' আখ্যা দেওয়া হোক এটা এমনই কি অসঙ্গত প্রস্তাব? আবার অনেকের ধারণা রাগভঙ্গিম বাংগালা গানের সঙ্গে আধুনিক বাংগালা গানের অহি-নকুল সম্পর্ক বিদ্যমান, যেন সে কিছু আধুনিক বাংগালা গান থেকে আলাদা! প্রকৃত প্রস্তাবে, রাগপ্রধান বাংগালা গানই হোক আর 'আধুনিক বাংগালা গানই' হোক দুটোকে এক পর্য্যায়ে ফেলা উচিত। কেন উচিত এ-কথা যদি জিজ্ঞাসিত হয় তা হ'লে বাংগালা গানের আদর্শ কী হওয়া উচিত সেই প্রশ্ন নিঃসন্দেহ এসে পড়ে। 'আধুনিক বাংগালা গানে'র ধর্ম রাগ-প্রধান বাংগালা গানের ধর্ম থেকে কিছুমাত্র বিপরীত, বিপ্রতীপ নয় সেইটে বোঝাবার জন্যেই আজ এ আলোচনার অবতারণা করতে হয়েছে।

এমনো যদি হয় যে কাব্য-সঙ্গীত বল্‌তে বোঝায় সেই জাতের গান যাতে কাব্য ও সুর পরস্পরের হাত-ধরাধরি ক'রে জড়িয়ে-মিশিয়ে আছে তা হ'লেও আমাদের দ্বিধা ঘুচ্‌তে চায় না। এই যদি কাব্য-সঙ্গীতের আদর্শ হয় তা হ'লে সেটা যে খুব সুষ্ঠু ও সঙ্গত আদর্শ এ-কথা আমিও মানি কিন্তু রাগ-প্রধান বাংগালা গানকে সে জাত থেকে আলাদা করা হয় কী হিসেবে? রাগ-প্রধান বাংগালা গান কি সেই পর্য্যায়ের বাংগালা গান কাব্যের ভাগ যাতে শূন্য, রাগভঙ্গিম সুরের যাতে ষোলো আনা রাজত্ব? এই যদি 'রাগপ্রধান বাংগালা গানের' প্রকৃত সংজ্ঞা হ'য়ে থাকে তা হ'লে তাকে বাংগালা গান না বলাই সঙ্গত। কারণ আমরা এমন বাংগালা গান চাই না যাতে কাব্যসম্পদ সম্পূর্ণ অস্বীকৃত। হাজার সুর সম্পদে ঋদ্ধ হ'য়েও বাণীর মূল্য যা'র কাণাকড়িও নয় তেমন গানকে বাংগালা গানের জাতে তুলে আনার কোনো অর্থ হয় না। দেখেশুনে মনে হয় তা'কেই বলা হয় রাগপ্রধান বাংগালা গান যাতে কাব্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে 'রাগ' প্রাধান্য লাভ করেছে আর কাব্য সঙ্গীত বল্‌তে বোঝায় সেই পংক্তির গান যাতে কাব্যকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে সুর পড়েছে চাপা। অন্ততঃ সাধারণ শিল্পীদের গান শুনে এইরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমার বিচারে উভয়ের কোনোটিকেই বাংগালা গান পদবাচ্য বলা উচিত নয়। আধুনিক বাংগালা গানই ব'লো আর রাগপ্রধান বাংগালা গানই ব'লো, বাংগালা গান হবে এমন কিছু যেখানে সুর-ও বড় কথা

নয়, কাব্য-ও বড়ো কথা নয়; দুইয়ের সুসমঞ্জস সঙ্গতি ও অঙ্গাঙ্গী সমন্বয় যা'র চরম ও পরম কথা। যেখানে সুরের পাখায় ভর ক'রে উড়ে কথা, কথার উপলে প্রতিহত হ'য়ে সুরে জাগে নূপুর-নিক্কণ। বাংগালা গানে কথাও থাক্‌বে, সুরও থাকবে অথচ 'কথাই' তার শেষ কথা নয়, সুরই তা'র শেষ কথা নয়,—কথা ও সুরের অতীত কোনো বিশেষ রূপই তা'র অধিগম্য হওয়া উচিত। সেই রূপের ধ্যান যাঁরা করছেন আজ্‌কের দিনে তাঁদের উপহাস করবার লোকের অভাব ঘটবে না কিন্তু সেই ধ্যানরূপ যদি সত্যই কোনোদিন গীতি-জগতে প্রত্যক্ষ হয় সেই দিনে আজ্‌কের নিন্দা মুখ লুকোবার পথ খুঁজে পাবে না।

হিন্দুস্থানী ঠুংরী গান খুবই উপভোগ্য জিনিষ, অথচ আজকের দিনে যেভাবে ঠুংরী গাওয়া হয় সে-পদ্ধতি শ্রদ্ধেয় নয়। যে-কোনো সুরের সহিত যে-কোনো সুরের সংমিশ্রণে বর্তমান ঠুংরীর যে চেহারা দাঁড়াচ্ছে সেটা শুধু সুরের জগা-খিচুড়ি ব'লেই নিন্দনীয় নয়, তাতে ক'রে ঠুংরীর প্রকৃত রস-রূপও পদে পদে খর্ব হচ্ছে; তাইতেই আপত্তি। এলোপাথাড়ি ভাবে কতকগুলো সুরকে পরে পরে বিন্যস্ত করলেই তা ঠুংরী হয় না; ঠুংরীর আছে একটা আলাদা 'চাল', সেটা নির্ভর করে তার গাওয়ার পদ্ধতির উপর। যে-সব রাগিনী প্রকৃতিতে বিরুদ্ধ যেমন তোড়ী ও মাঠা ঠাটের রাগিনী, যেমন আশাবরী ও পরজ ঠাটের রাগিনী তাদের একত্রে জোর ক'রে ঠেসে ধরার নাম মিশ্রণ নয়, তাতে ঠুংরী গানের হুমড়ি খেয়ে পড়ার সম্ভাবনাই থাকে অধিক। অথচ আজকের তরুণ গায়কেরা এইভাবে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ভাবেন ঠুংরী গাইছেন, জয়জয়ন্তীর পর মোহিনী, অথবা পিলুর পর শঙ্করার সুর লাগিয়ে ভাবেন আহা কী সুন্দরই না জানি হচ্ছে গানটি! কিন্তু এঁদের জেনে রাখা প্রয়োজন, তেলে জলে যেমন মিশ খায় না এই সব রাগিনীও একত্র মিশ খেতে চায় না। সুতরাং নিরঙ্কুশ মিশ্রণের বাহাদুরীর মোহে অন্ধ না হয়ে কী ভাবে প্রকৃত ঠুংরী গাওয়া যেতে পারে তার চেষ্টা করলে এঁরা অধিক বিজ্ঞতার পরিচয় দেবেন।

বাংগালা গানের প্রসঙ্গে ঠুংরীর আলোচনা করলাম শুধু এই দেখাতে যে আধুনিক বাংগালা গানের সুর যোজনা অনেকটা উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসারেই সম্পন্ন হয়। বাংগালা গানের একটা নিজস্ব প্রকৃতি আছে, সেটা ভুলে গিয়ে সুরকার (Composer) এমনভাবে সুর সংযোগ করেন যাতে সুরের মিশ্রণটাই বড়ো হ'য়ে দেখা দেয়, গানটি নয়। আস্থায়ীর কলিতে সুর আরম্ভ হ'লো ভীমপলশ্রীতে, অন্তরায় দেখা গেলো সেটা বাগেশ্রীতে দাঁড়িয়ে গেছে। কোনোরকমে শেষের দিকটায় জোড়াতাড়া দিয়ে ফের তাকে ভীমপলশ্রীতে আনা হ'লো। কিন্তু মুস্কিল হয় সঞ্চারীর বেলায়—সকলেই জানেন সঞ্চারীতে খাদের দিকে সুর করতে হয় এবং সুরকারের সেইখানেই সুরের 'এফেক্ট' দেখানোর সব চাইতে বড়ো সুযোগ। সুতরাং বর্তমান সুরকার 'এফেক্ট' দেখানোর অতি ব্যগ্রতায় সেই সব সুরের আমদানী করেন যাদের খাদের দিকে 'কাজ' বেশি, যেমন দরবারী কানাড়া, পুরিয়া, মিঞা কি মল্লার। কিন্তু একবারটি ভাবেন না মূল সুরের সহিত অর্থাৎ আস্থায়ীর সুরের সহিত তার ঐক্য আছে কিনা। কিন্তু তখনই 'ক্লাইম্যাক্স' যখন আভোগকে অন্তরা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সুরে গীত হ'তে দেখি। কারণ আভোগকে অন্তরার সুরে গাওয়াই পদ্ধতি। ধ্রুপদাঙ্গ গান থেকে এই পদ্ধতি এসেছে। শুধু প্রচলিত পদ্ধতি ব'লেই তাকে মান্‌তে বলছি নে—আভোগকে অন্তরার সুরে গাওয়ার একটা শ্রুতিগত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে সর্বত্র এই নীতির অনুসরণ করেছেন, দুই এক স্থানে ব্যত্যয় ঘটেছে মাত্র।

আধুনিক সুরকার যে ভাবে বাংগালা গানে সুর সংযোগ করেন সেটা ঠুংরীর নিরঙ্কুশ মিশ্রণেরই স্বগোত্র একথা আমি আগেই বলেছি। বলা বাহুল্য এই নীতি মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়। তাতে বাংগালা গানের স্বধর্ম ব্যাহত হয় ব'লে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদাঙ্গ গানের চার 'তুক' অনুযায়ী যে ভাবে তাঁর বাংগালা গানগুলোতে সুর যোজনা করেছেন সেইটেই প্রকৃষ্ট নীতি। তাতে মূল সুরটি বজায় থাকে, এবং গানের শিরপা ভুলে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করার প্রবৃত্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ যে-গানে ভীমপলশ্রীকে প্রধান সুর বলে ধরেছেন সে গানে ভীমপলশ্রীরই প্রাধান্য, যে গানে বসন্তকে মূল সুর করেছেন

সে-গানে বসন্ত শুধু ঋতুরাজই নয় সুর-রাজও—এই ভাবে প্রত্যেক গানের আলাদা আলাদা সুর দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু আজকালকার গানে কোনটা মূল সুর তার হদিস পাওয়ার উপায় নেই, সুতরাং 'মিশ্র' ব'লে লেবেল এঁটে দিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি। রবীন্দ্রনাথেও আমরা সুরের মিশ্রণ দেখি—কিন্তু তা'র প্রয়োগ যথাযথ জায়গায়। তাতে সুরের একটা নূতন রূপ ফুটে উঠেছে, সুর কোথাও খর্বতা লাভ করেনি। অতুলপ্রসাদ তাঁর 'তব চরণতলে সদা রাখিও দীনবন্ধু' নামক জৌনপুরীয় গানটিতে এক জায়গায় শুদ্ধ নিখাদের প্রয়োগ করেছেন। সকলেই জানেন জৌনপুরীতে শুদ্ধ নিখাদের ব্যবহার নেই, অথচ শুধু মাত্র এই শুদ্ধ নিখাদের দরুণ গানখানার কতো না মাধুর্য্য! এইভাবে যথাযোগ্য স্থানে যথাবিহিত রীত্যনুসারে মিশ্র সুরের 'খোঁচ' লাগাতে হয়, তাতে গানের সৌন্দর্য চতুর্গুণিত হয়; কিন্তু ব্যাপকভাবে সুরমিশ্রণ নৈব নৈব চ। আমার মনে হয় এইদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের পর কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। একমাত্র হিমাংশুকুমার, বড়োই ক্ষোভের বিষয় সুরকার হিসেবে তাঁর যে সম্মান প্রাপ্য সে-সম্মান তিনি দেশের লোকের কাছে পান নি। আমার বিচারে সুরকার (Composer) সুরশিল্পী (performer বা Executant অপেক্ষা অনেক বেশি সম্মানের অধিকারী কিন্তু আমাদের দেশে সুরকারের সম্মান নেই, এই দুঃখ। বারান্তরে এই নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

তা হ'লে দেখ্‌তে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের সুরযোজনার আদর্শ মান্য। কিন্তু বাংগালাগানের চলার বেগ সেইখানে এসেই থেমে যাক্ এটা বাঞ্ছনীয় নয়। যে কোনো শিল্প 'Perfection'এর স্তরে উঠলে তা'র সক্রিয়তা নষ্ট হ'য়ে যায়। অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়েই নব অর্জনের প্রতিভা তার পথ ক'রে নিতে পারে। শিল্পিত মনের যখন আর কিছু চাওয়ার থাকে না তখন শিল্পের কৈবল্যের দশা। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথে প্রতিভাকে চালিত ক'রে শিল্পী নব অবদানে নূতন সৃষ্টি-সম্ভারে বাংগালা গানকে ঋদ্ধ করুক এইটেই কামনা করি।

কী ক'রে সেটা করা যায়? এইবারে সে কথা বলি। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে যে-সব সুর করেছিলেন এরা এতো বেশি ধ্রুপদাঙ্গ যে এদের ঐতিহাসিক মূল্য থাকতে পারে কিন্তু আজকের দিনে তা'র সাঙ্গীতিক মূল্য নগণ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'গীতালি', 'প্রবাহিনী', 'গীতাঞ্জলি'র যুগে যে সব-গান রচনা করেছেন সেগুলো প্রকৃতই বাংগালা গান। তাতে সুর ও বাণীর পরস্পরের এমন মিতালি যে সেই রাখীবন্ধনের ক্ষেত্রে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যকে নিঃশেষে ডুবিয়ে দিয়েও সুর ও বাণী গানের একটা বিশেষ রূপকে প্রকাশ করেছে। সেই রূপ অনির্বচনীয়—চকিতে তার আভাস মেলে কিন্তু পরক্ষণেই পুকুরের জলের ঝিলিমিলির ম'ত কোথায় মিলিয়ে যায় ঠাহর করা যায় না; হঠাৎ যেন সেই রূপকে বোঝার কিনারায় আসি, কিন্তু হায়, কাউকে সে কথা বোঝানো চলে না—সে রূপ যেন আঙুলের ফাঁক দিয়ে জল গলিয়ে যাবার ম'ত পালিয়ে পালিয়েই বেড়ায়, তাকে বোঝাতে গিয়েছো কি সে আর তোমার মধ্যে নেই। যে-গানে বুকে জাগে কেমন-—ক'রে—উঠা মৃদু শিহরণ, যে-গানে ক্ষণে ক্ষণে অচেনা অজানা জগতের আভাস দিয়ে যায় তা কাব্য প্রধানও নয়, সুরপ্রধানও নয়, এক কথায় তা এমন কিছু দুইয়ের অতীত কোনো তৃতীয় সত্বার যাতে সগৌরব অধিষ্ঠান।

অতুলপ্রসাদ হিন্দুস্থানী ঠুংরী 'চাল' বাংগালা গানে প্রবর্তিত করেছিলেন। কিন্তু কোথাও ব্যাপক মিশ্রণের আশ্রয় গ্রহণ করেন নি—বাংগালা গানে সুর সংযোজনার কালে হিন্দুস্থানী ঠুংরীর রস-রূপটাই তাঁ'র ধ্যান-গোচর ছিল। রবীন্দ্রনাথও তাঁর পরবর্ত্তী অধ্যায়ের গান-গুলোতে হিন্দুস্থানী সুরের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন—যদিও তা'কে স্থূলভাবে ধরা-ছোঁয়া যায় না। অধুনা দিলীপ-কুমার, কাজী নজরুল এবং হিমাংশুকুমার দত্ত এই নীতি মেনে নিয়েছেন। বাংগালা দেশে আধুনিক সুরকার বলতে এঁদের তিন জনকেই বোঝায়। এঁদের আবার হিমাংশু কুমারের অবদান নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। তিনি সুর সংযোজনায় ব্যাপকভাবে হিন্দুস্থানী, সুরের আশ্রয় নিয়েছেন কিন্তু কোথাও তাতে বাংগালা গানের নিজস্ব প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হয় নি। এঁদের প্রত্যেকেই রবীন্দ্রনাথ ও

অতুলপ্রসাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেছেন এবং বাংগালা গানকে বিভিন্ন বহু ভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গানে রাগ-সঙ্গীতের সুর যতোটুকু স্থান জুড়ে আছে ইচ্ছা করলে বাংগালা গানকে তার চাইতে আরো অধিক সুরের ভর সওয়ানো যেতে পারে। রাগসঙ্গীতের খেয়ালের ধরণ যে বেশ সুষ্ঠুভাবে বাংগালা গানে প্রবর্তিত করা যেতে পারে, এবং বাংগালী গানের স্বধর্ম ক্ষুণ্ণ না ক'রেও যে কণ্ঠের তার ব্যবহার হ'তে পারে হিমাংশুকুমারের সুরগুলিই তাঁর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এ কথা আমি বিশেষ ভাবে বোঝাতে চাই যে বাংগালা গানে বাণীর লালিত্যকে অস্বীকার করলে চলবে না। কথার তৃষ্ণা আমাদের সহজাত তৃষ্ণা, তা'কে মর্যাদা দিতেই হ'বে। কিন্তু হিন্দুস্থানী রাগ ভঙ্গিম সুর বাংগালা গানে আরো অধিক ব্যাপক ভাবে চালানো যেতে পারে—তাতে বাংগালা গানের কথার সৌন্দর্য মারা যাবে না এই আমার বিশ্বাস। অধুনা প্রচারিত রাগ ভঙ্গিম বাংগালা গানে কাব্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়ে থাকে। আমি যে-রাগপ্রধান গানের কথা বল্‌ছি তাতে বাণীর লালিত্য মাধুর্য ভাব সকলই থাক্‌বে অথচ হিন্দুস্থানীর খেয়ালের সংস্পর্শে তা'র জাত মারা যাবে না। হিমাংশুকুমারের গানগুলো যাঁরা শুনেছেন তাঁরা আমার এ-কথার সাক্ষ্য দিতে পারবেন। এ সব ব্যাপারে হাতে কলমে দেখানো ছাড়া লিখে কিছু বোঝাবার উপায় নেই। সেই সব গানই হচ্ছে প্রকৃত রাগভঙ্গিম গান। যদিও বিভিন্ন সুরের নিরঙ্কুশ মিশ্রণ সঙ্গত নয়, কিন্তু একটা গোটা সুরকে রাগভঙ্গিম ভাবে বাংগালায় গাওয়া যেতে পারে। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল এইদিকে অনেকখানি এগিয়েছিলেন, বর্তমানে হিমাংশুকুমার সেই সূত্র তুলে ধরেছেন। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'ঠুং খেয়াল' দিলীপকুমারে এসে পরিণতি লাভ করেছে। বাংগালা গান তাতেও অনেক পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়েছে। বাংগালা গানে এইভাবে আরো বেশি রাগ সঙ্গীতের ভার চাপানো যেতে পারে, তাতে বাংগালা গান হুমড়ি খে'য়ে পড়বে না। কাব্যের দিক থেকে বর্তমান বাংগালা গান নিঃসন্দেহ উন্নতি লাভ করেছে, সুরায়নেও সে তেমনি কিম্বা তদোধিক ঋদ্ধ হোক এই কামনা নিয়ে আজকের ম'ত বিদায় নিচ্ছি।

নারায়ণ চৌধুরী

"সাবধানের মার নাই"

খাঁটি দুধ, খাঁটি মাখন, খাঁটি ঘি, খাঁটি মধু, খাঁটি তেল, খাঁটি আটা ও ময়দা পাওয়ার জন্য আপনারও অনেক সময় চিন্তা আসে। কিন্তু অনন্ত ঐশ্বর্য্যময়ী প্রকৃতি তার অসীম স্নেহের প্রাচুর্য্যে এ সকলই ত সম্ভব করেছেন। তাই আক্ষেপ হয়, মানুষের এই ভোগের ও প্রয়োজনের উপাদানকে দূষিত করে, যারা মানুষকে প্রতারিত করে, তার বিধান আজও সম্যক হয়নি।

পয়সা দিয়ে ভাল জিনিষ পাওয়া যাবে না, এ কম দুঃখের কথা নয়। কিন্তু পয়সা কম দিয়েও ভাল জিনিষ চায়, এবং পায় না বলে মানুষের আক্ষেপ বড় কম নয়। যত লোক চায় খাঁটি জিনিষ, তার মধ্যে অনেক বেশী লোক চায় সস্তা জিনিষ।

খোলা টিন হতে ঘি নেওয়ার একটি মোহ আছে। খোলা টিন হতে জিনিষ নিলে, দাম সব জিনিষেই একটু কম হয়। কিন্তু সব সময় হয়ত ঠিক জিনিষ পাওয়া যাবে না—অনেক বিক্রেতাদের অনুরূপ,—বোঝান সত্ত্বেও দস্তুরীলুব্ধ চাকর-বাকর মারফত এইরূপ ঘি আনানর বিপদ আরও বেশী। খোলা টিনের ঘিয়ে ঝুল, ময়লা ও নানাভাবে দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা। ছোট ছোট টিনের প্যাকিংএর তাই বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং এই প্যাকিংএর অতিরিক্ত দামটা তাই consumerকে দিতে শিখ্‌তে হবে নচেৎ নিরাপত্তা নেই, বলাই বাহুল্য।

বন্ধ টিন নেওয়ার সময়ও কিন্তু চোখ বুজে নিলে চলবে না। সকল বন্ধ জিনিষেরই শীলটা চিন্‌তে হবে, এবং দেখে নিতে অভ্যাস থাকা দরকার। নচেৎ শীল বন্ধ জিনিষেরও বিশেষ মানে থাকে না। অল্প আয়াসে বেশী উপায় করা—প্রতারণা ও জাল করার লোকের অভাব আজও হয়নি।

জানেন ত গভর্ণমেণ্টের নোট ও টাকাও জাল হয় এবং না দেখে নিলে ঠক্‌তে হয়—প্রতীকার নেই।

দেশে বিশুদ্ধ খাদ্যের সমস্যা যায় না। "শ্রী" ঘৃত দেশের সামনে একটিমাত্র অর্ঘ নিয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশবাসীর কাছে, যতক্ষণ এর উপর আস্থা আছে, ততক্ষণই এর অস্তিত্ব সার্থক—তার চাইতে একমুহূর্ত্তও বেশী নয়।

মানব

শ্রীপ্রসাদ বসু

দেহ ও মনের প্রয়াগ-তীর্থে
আমি বাঁধিয়াছি বাসা,
সেথা করি বাস ধরার তীর্থ-বাসী,
একদিকে মোর বহিয়া চ'লেছে
মরণ কীর্ত্তি নাশা
আর দিকে ছোটে অমরতা উচ্ছ্বাস'।
আমি মাঝখানে পূর্ণ হৃদয়ে,
মাখি নদীজল দু'হাতে উভয়ে,
সমভাবে লাগে আমার অঙ্গে
দু'নদীর দুই বারি,
আমি দু'জনের, দু'জনে আমার
সমভাবে অধিকারী।

এপারে মনের মন্দির মাঝে
ওঠে অমরার বাণী,
শুনি ওঙ্কার ত্রিলোক-ভুলানো সুর,
ত্রিদিব লোকের তীর্থ হ'তেও সেরা
নেমে আসে সুর-রাণী,
মন্দার বাসে করে হৃদি ভরপুর।
দেবতারা সেথা করে যাওয়া-আসা,
ঢেলে যায় প্রীতি প্রেম ভালোবাসা,
ঊষার আলোক, গোধূলির রং
রামধনুকের মেলা
ভীড় করে সেথা মহা-আনন্দে,
পুণ্যের হেলা ফেলা।

দেহের যন্ত্রে মন্ত্রে মন্ত্রে
বাজে শোণিতের গান
অস্থি-মজ্জা মহা-উল্লাসে নাচে,
তনুর তনিমা গভীর প্রণয়ে
দিয়ে যায় মোরে দান,
প্রতিদান তা'র সলাজে সরমে যাচে
তনু-লতিকায় ফোটে ফুল ফল,
শিরা-উপশিরা বিভোর বিভল,
ওঠে কম্পন শত শিহরণ
দেহের দু'কুল ঘিরে,
প্রতিমা পূজার আরতি শঙ্খ
বেজে ওঠে ধীরে ধীরে।

মাঝখানে আমি, দুইপাশে মোর
স্বর্গ নরক জাগে,
দিবস, এপাশে, ওপাশে আঁধার ঘোর,
আমার অঙ্গে ভালো মন্দের
কোন দাগ নাহি লাগে,
নির্ম্মল আমি আপন ভাবে বিভোর।
কলঙ্ক ভরা আমি শশধর,
কণ্ঠে গরল আমি শঙ্কর,
কীটে ভরা হৃদি আমি সুমনস,
আমি মণি কৌস্তুভ,
ভালো মন্দের উপরে দাঁড়ায়ে
অমর আমি মানব।

নানাকথা
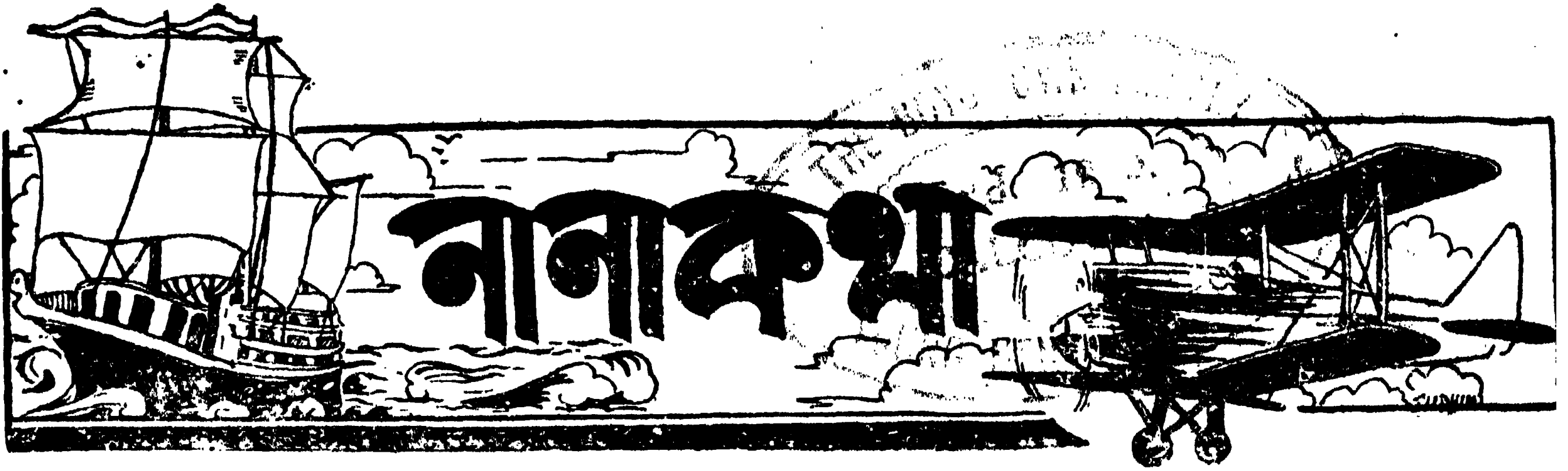
ত্রিপুরী কংগ্রেস—

এবারকার ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশনে আর কোনো লাভ হোক বা না হোক আমাদের অবরুদ্ধ দৃষ্টি যে কতকটা উন্মুক্ত হয়েছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই। যা অদৃশ্য ছিল তা ঝাপসা হয়েছে এবং যা ছিল ঝাপসা তা হয়েছে সুস্পষ্ট। গৃহপালিত বিড়ালও যে বনে গেলে বনবিড়াল হয়, এ জ্ঞান আমরা নূতন করে লাভ করেছি। কংগ্রেসে হাই কম্যাণ্ডের নিষ্করুণ প্রভুত্ব মদমত্ততা দেখে বারম্বার মনে হয়েছিল, হায়রে! এরা আবার British Imperialismএর নিন্দা করে! এরা আবার ব্রিটিশ দমননীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে! বারম্বার মুখ দিয়ে একটা কথা নির্গত হবার উপক্রম করেছিল, Physician, heal thyself! একটা কথা শোনা আছে, মন্দ হবার অন্যতম প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে, মন্দকে ভাল করতে যাওয়া। এরা সেই কথাটাকে প্রমাণ না করে ছাড়বে না দেখছি! আচ্ছা বাপু, মন্দই না-হয় হ'য়ো কিন্তু তাই বলে এত দ্রুত গতিতে?

* * *

যে ব্যাপারটা ত্রিপুরীতে ঘ'টে গেল তাকে অভিমন্যু বধের পালা বলা চলে। অভিমন্যু অবশ্য সুভাষচন্দ্র, এবং সপ্তরথী কে কে, তা আঙুলে গণনা করলেই ঠিক মিলে যাবে। তাছাড়া, সপ্ত কংগ্রেসী সরকার ত আছেই। এই অভিমন্যু বধের আগেকার অবস্থার কথাটা ভারি কৌতুকপ্রদ অর্থাৎ যখন পুনর্নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র জয়ী হলেন ঠিক তার অব্যবহিত পরের কথা। যখন দ্রোণ কর্ণাদি বলতে লাগলেন, বেরিয়ে এলাম আমরা দু হাত ধৌত করে বর্ত্তমান ওয়ার্কিং কমিটি থেকে। এখন অব্যাহতভাবে সুভাষচন্দ্র গঠিত করুন তাঁর নিজের ওয়ার্কিং কমিটি নিজের কার্য্য কল্পনার অনুযায়ী। কিন্তু দুদিনেই এই মহানুভবতা সূর্য্যকর-জালে শিশির বিন্দুর মতো দেখতে দেখতে উবে গেল করুণকণ্ঠে মহাত্মাজী আক্ষেপ করলেন, "সুভাষচন্দ্রের জয়ের অর্থ আমার পরাজয়।" এবং সঙ্গে সঙ্গে বুক দিয়ে উপুড় হ'য়ে পড়লেন দ্রোণকর্ণাদি সদলবলে সুভাষচন্দ্রের জয়টা পরাজয়ে অর্থাৎ মহাত্মাজীর পরাজয়টা জয়ে পরিণত করবার জন্যে।

* * *

সমরানল যখন প্রজ্জ্বলিত মহাত্মাজী তখন কিন্তু সুভাষচন্দ্রের প্রতি সুবিচার করতে বিস্মৃত হননি। তিনি বলেছিলেন, "তা তোমরা অত শঙ্কিত হচ্ছ কেন? সুভাষ বাবু ত শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের শত্রু নন।" এই প্রশস্তি শ্রবণ করে রোগ শয্যাতেও সুভাষচন্দ্রের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল কি না জানিনে, কিন্তু এই রকম একটি ব্যাপারে আমাদের পাড়ার যদুনাথ বিশ্বাসের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল, পুলিশ অনুসন্ধান কালে পাড়ার একজন মাতব্বর ব্যক্তি যখন দারোগা বাবুকে বলেছিলেন, "না না, যদুনাথ বিশ্বাস যখন গুণ্ডা নয় তখন তার বিরুদ্ধে এতটা সংশয়াপন্ন হওয়া যায় না।" ইংরাজিতে 'Damning by faint praise' বলে যে একটি কথা প্রচলিত আছে, অন্ততঃ শেষোক্তটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

* * *

সম্প্রতি আর একটি ব্যাপার ভারি কৌতুকজনক হ'য়ে উঠেছে। কিছুকাল থেকে কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের দল আর্তনাদ করতে আরম্ভ করেছিলেন যে, "ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ব্যাপারটাকে অচল করে সুভাষচন্দ্র রোগ-শয্যায়

শুয়ে রয়েছেন, সুতরাং কংগ্রেসও অচল হয়ে উঠেছে।" সুভাষচন্দ্রের গুরুতর অপরাধ, কেন তাঁর দেহ-তাপ নর্ম্যালে নেমে আসছে না। এই অভিযোগের উত্তরে সুভাষচন্দ্র এক বিবৃতি প্রকাশ করেছেন যে, পন্থ প্রস্তাবে যখন ইহাই স্থির হয়েছে যে মহাত্মাজীর পরামর্শানুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হবে, তখন মহাত্মাজী যদি দয়া করে তাঁর রোগ-শয্যা পার্শ্বে আগমন করেন, তা' হ'লে ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হবার পক্ষে আর বিলম্বের কারণ থাকে না।

শায়িত ছবি

এই বিবৃতি প্রকাশের পর অপর পক্ষ নীরব হয়েছেন। শুনেছি, মহাত্মাজী এবং সুভাষচন্দ্রের মধ্যে সুদীর্ঘ তার এবং চিঠিপত্র চলছে। আশা করি অচিরে দেশ এর ফলাফল অবগত হবে। ত্রিপুরী মন্থনকালে যে বিষ উত্থিত হয়েছে, আমরা আশা করি, তা কণ্ঠে ধারণ ক'রে মহাত্মাজী কংগ্রেসকে এবং দেশকে নিরাময় করবেন।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি কর—

প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে ১৩৪০-এর বিচিত্রায় আমরা চিন্তামণির চিত্র সম্বন্ধে রোমাঁ রোলাঁর একটি পত্র প্রকাশিত করেছিলাম। তখন তিনি রিপন কলেজের ছাত্র ছিলেন। এরই সমসাময়িককালে খ্যাতনামা শিল্পী নিকোলাস্ রোরিক্ চিন্তামণির চিত্র দেখে লিখেছিলেন—"I rejoice to see that the ancient traditions are beautifully upheld in your talented paintings. ......Without much prophecy I can tell you that a splendid future awaits you if you will as powerfully and as devotedly continue your strivings. I see that you love the traditions of ancient India and indeed what refined heart would abstain from cherishing the glorious hymns of your mother country ? I can see that you do not only love art but also that you have developed a fine skill and nothing vulgar enters your colour symphonies,......I hope you will never forget that man does not learn only during his childhood but throughout his whole life, always renewing himself aud finding therein new inspiration."

চিন্তামণির অঙ্কিত একটি চিত্র দেখে সে সময়ে রোমাঁ রোলাঁ লিখেছিলেন—"I appreciate the quiet and

sober colouring in The Eternal Commune in perfect harmony with the grand serenity of the tumult of the waves."

১৯৩৫-এর সেপ্টেম্বর থেকে চিন্তামণি গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগে শিক্ষকের পদে কাজ করছিলেন। গত বৎসর আগষ্ট মাসে তিনি ইয়োরোপে গিয়েছেন। এক্ষণে তিনি পারীতে আছেন এবং সেখানে ভাস্কর্য শিল্প, প্রাচীর চিত্র (Fresco painting) ও তৈলচিত্র বিষয়ে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন। তাঁর শিল্প কার্য্যের নিদর্শন সমূহ তথাকার অধ্যাপক ও শিল্পরসিকদের গভীর সহানুভূতি

শ্রীচিন্তামণি কর

আকর্ষণ করেছে। এ বৎসর ১১ই ফেব্রুয়ারী পারীর International Club-এ তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পের একটি প্রদর্শনী খোলা হয়েছে; প্রাচ্য মূর্তি শিল্পে সুপণ্ডিত অধ্যাপক A. Foucher এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।
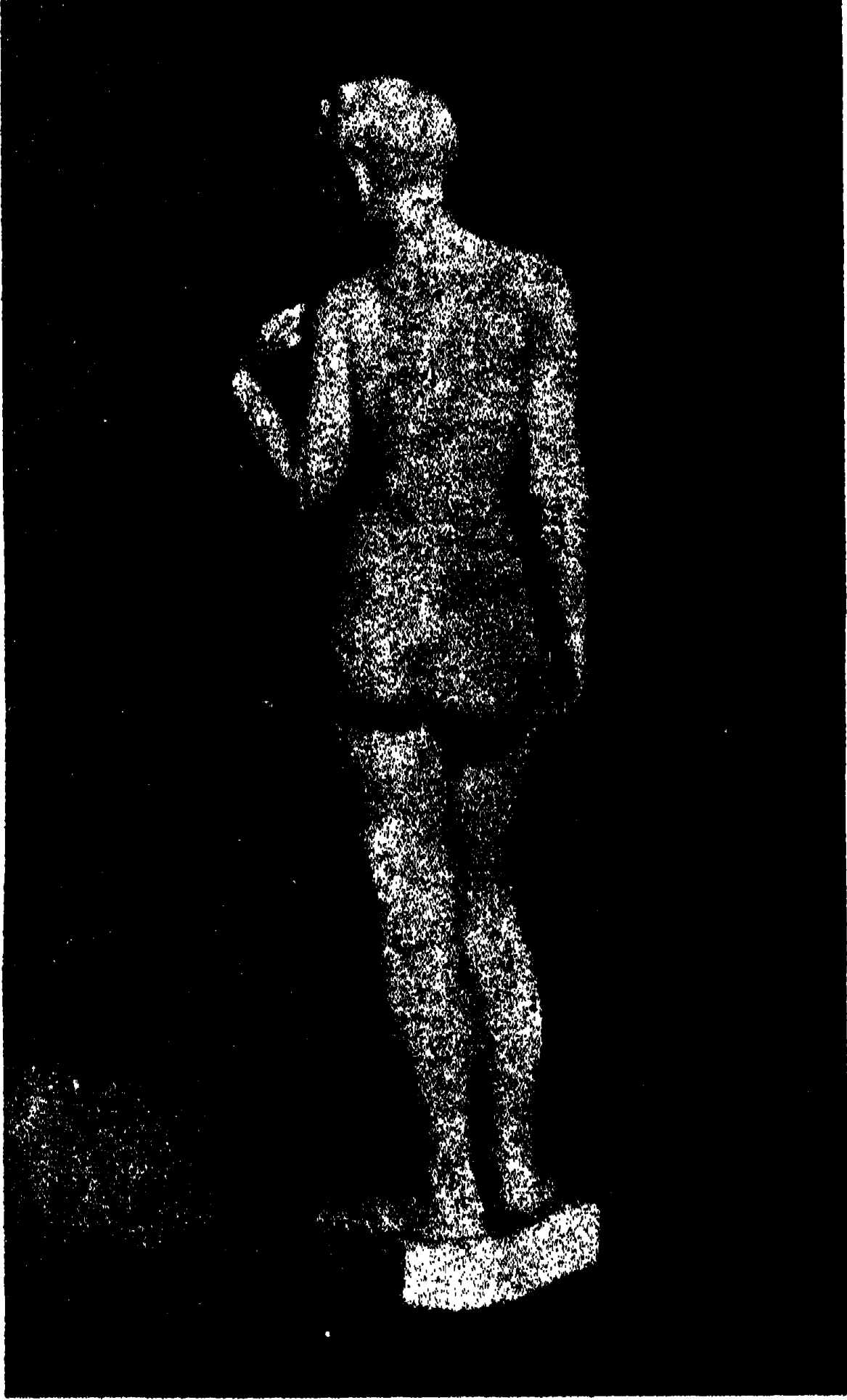
দাঁড়ান ছবি

প্রদর্শনীতে বহু জনসমাগম হয় এবং তথাকার পত্রিকা সমূহের প্রতিনিধিগণ চিন্তামণির শিল্পকার্য বিষয়ে আলোচনার জন্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীযুক্ত চিন্তামণি, কলেজের নির্দিষ্ট সময়ের অবকাশে ওখানকার ইউনিভারসিটির Institut de Art et du Archiologyর লাইব্রেরী এবং মিউজিয়মে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিল্প বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও গবেষণার নিমিত্ত কাজ করছেন; অধ্যাপক Foucherএর সহায়তায় তিনি এই বিভাগে কাজ করার অনুমতি পেয়েছেন।

বিভিন্ন প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত এবং মাসিক ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত চিন্তামণির অঙ্কিত চিত্রাদি হতে শিল্প রসজ্ঞগণ তাঁর রূপদক্ষতা ও শিল্পী মনের যে পরিচয় পেয়েছেন তার উপর অধিক বলা অনাবশ্যক। শ্রীযুক্ত রোম্যাঁ রোলাঁ, নিকোলাস রোরিক, পার্সি ব্রাউন, লিলি হ্যাভেল (ই, বি, হ্যাভেলের স্ত্রী), ও, সি, গাঙ্গুলি প্রমুখ বহু দেশী ও বিদেশী শিল্প সমালোচকগণ চিন্তামণির শিল্প কার্যের প্রশংসা করেছেন এবং তিনি একাধিকবার কলিকাতার একাডেমী অব ফাইন আর্টস থেকে প্রাচ্য রীতিতে অঙ্কিত জলরঙা ছবি ও পেন্সিলে প্রতিকৃতি অঙ্কনে দক্ষতার জন্য প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর পূর্বে

প্যালে শাহ্‌-ওর-সামনে দক্ষিণ দিকে দণ্ডায়মান শ্রীযুক্ত চিন্তামণি কর

চৌরঙ্গীর Y. M. C. A হলে তাঁর নিজস্ব শিল্প কার্যের যে প্রদর্শনী হয়েছিল তাতে বহু ইয়োরোপীয় ও মার্কিন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত তাঁর আলাপের সুযোগ ঘটেছিল। বৈদেশিকগণের নিকটও তাঁর চিত্র খুব সমাদর পেয়েছে এবং তাঁদের নিকট বিক্রীত চিত্রের অর্থে চিন্তামণি তাঁর ইয়োরোপ

গমনের ও সেখানে থাকার সমস্ত ব্যয় ভার চালাতে সমর্থ হয়েছেন। চিন্তামণির বয়স এক্ষণে চব্বিশ বৎসর মাত্র, এর মধ্যেই তিনি যেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আমরা তাঁর প্রয়াসের সাফল্য কামনা করি। এই সঙ্গে তাঁর কয়েকটি ভাস্কর্যের নমুনা ও ফোটো প্রকাশিত করলাম।

লুক্সমবুর্গ গার্ডেন অবসারভেটারীর দক্ষিণ দিকে দণ্ডায়মান শ্রীচিন্তামণি

চিন্তামণির শিল্প সৃষ্টির সহিত বিচিত্রার পাঠকগণ পরিচিত আছেন। তাঁর অঙ্কিত বহু চিত্রের প্রতিলিপি বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি প্রচ্ছদে যে চিত্রটি মুদ্রিত হচ্ছে তাও তাঁর দ্বারা অঙ্কিত।

খ্যাতনামা প্রবাসী বাঙ্গালী—শ্রীযুক্তবাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় গত ১৫ই জানুয়ারী মজঃফরপুরে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ৮১। ইনি সম্প্রতি উত্তর বিহারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উচ্চ বিদ্যালয় তাঁর অন্যতম পিতৃব্য জমিদার জগদীশকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত এক যোগে প্রতিষ্ঠা করেন। গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ, ভূমিহার ব্রাহ্মণ কলেজ, চ্যাপমান বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি বহু বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকল্পেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। তিনি বিহার কাউন্সিল ও লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লী এবং জিলা বোর্ডের বহুদিন যাবৎ সভ্য ছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি হিন্দু সভা, আর্য সভা, উকিল সভা প্রভৃতি নানা সভা সমিতির বহুকাল যাবৎ সভাপতি ছিলেন।
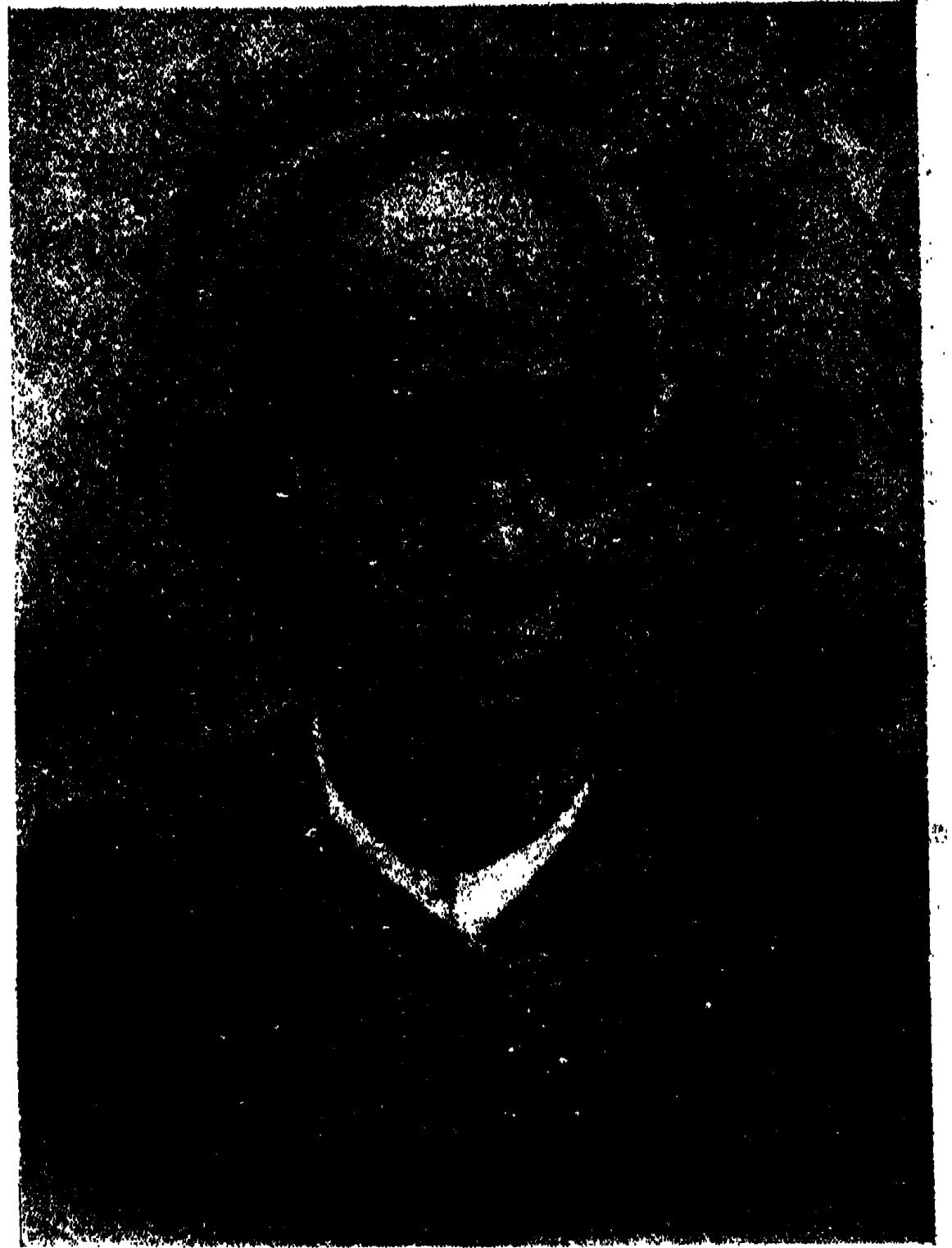
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১৯০৬ সালে মজঃফরপুরে প্লেগের এবং ১৯৩৪ সা[লে] ভূমিকম্পের সময় বহু বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করেন।

যোগেন্দ্রবাবুর মৃত্যুতে বিহারে বাঙালী সম্প্রদায় [যে] বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বীণাপাণি সঙ্গীত বিদ্যালয়—চুঁচুড়া

গত ১৯শে মার্চ্চ রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীযু[ক্ত] কার্ত্তিকচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত 'বীণাপাণি সঙ্গীত বিদ্যালয়ে'র দ্বিতীয় বার্ষিক সঙ্গীত অধিবেশন চুঁচুড়া কামারপাড়াস্থিত

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের বাটীতে অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। উক্ত সম্মেলনে প্রায় পাঁচশত শ্রোতা এবং স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়ের পক্ষ হতে সম্পাদক মহাশয় আমন্ত্রিত সঙ্গীতজ্ঞগণকে সম্বর্দ্ধনা করেন এবং উক্ত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলেন। কুমারী শোভনা ঘোষাল এবং শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ-রায়ের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর শ্রীমান শিবশঙ্কর নন্দী, কুমারী সবিতা সেন এবং কুমারী শান্তিলতা ভট্টাচার্যের বাল্য-সঙ্গীত অতিশয় উপভোগ্য হয়েছিল। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ-চক্রবর্ত্তীর খ্যাল এবং শ্রীমান বনমালী ঘোষের তবলা সঙ্গত এবং শ্রীযুক্ত কাত্তিকচন্দ্র রায়ের সুললিত ধ্রুপদ এবং শ্রীতারা-পদ ভট্টাচার্যের মৃদঙ্গ সঙ্গীত শুনে সকলে মোহিত হন। শ্রীযুক্ত নন্দলাল দত্ত প্রদত্ত "রামপ্রসন্ন মেমোরিয়ল কাপ" বাল্য-সঙ্গীতের কৃতিত্বের জন্য কুমারী শান্তিলতা ভট্টাচার্যকে প্রদান করা হয়। অতঃপর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "শঙ্করা" ও "বিহঙ্গড়া" রাগের খ্যাল গান করে সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করেন। শ্রীযুক্ত বিনোদলাল গাঙ্গুলী তাঁর সহিত সঙ্গত করেন। সঙ্গীতাচার্য শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'মালকোশ', 'বাহার' ও একটী ভজন গেয়ে শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করেন। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মল্লিক তাঁর সহিত সঙ্গত করেন। সভাপতিকে ধন্যবাদান্তে রাত্রি ১১টায় সভা ভঙ্গ হয়। শ্রীযুক্ত কাত্তিকচন্দ্র রায় এবং তাঁর শিষ্যবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই অধিবেশন বিশেষ সাফল্য লাভ করে এবং তাঁদের আদর আপ্যায়িতে সকলেই বিশেষ পরিতৃপ্ত হন।

গৃহস্থের দৃষ্টিতে গীতা

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সরস্বতী, বি-এ

যে প্রস্থানত্রয়কে অবলম্বন করিয়া বেদপন্থী সমাজ পরিচালিত হইতেছে, গীতা সেইগুলির অন্যতম। সকল উপনিষদের "সার স্বরূপে" উহা সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছে এবং যাঁহার যেমন প্রকৃতি তিনি সেইরূপ ভাবেই উহাতে অর্থ আরোপ করিয়াছেন। উহাতে কেহ রূপকের খেলা দেখিয়াছেন এবং কেহ বা যৌগিক রহস্যের গূঢ় সন্ধান পাইয়াছেন; আবার কেহ বা উহাতে ঐহিকতা-বিরোধী ভাবের বিন্যাস দেখিয়াছেন। কেহ কেহ উহাতে কর্ম্মের নিন্দা ও জ্ঞানের প্রশংসা করা হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। ঐরূপে নানা ব্যক্তি নানা দিক হইতে গীতার্থ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমি একটা বিশিষ্ট দিক্ লইয়াছি।

আমি গৃহস্থ। গৃহস্থের দৃষ্টি ও মন লইয়া আমি গীতা পাঠ করিয়াছি। আমি ভুলিতে পারি নাই যে, যে-সমাজের জন্য গীতা উদ্গীত হইয়াছিল সে-সমাজে গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়াই কীর্ত্তিত হইত। 'ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর' (ঈশোপনিষৎ ১)—ইহাই তাৎকালীন সমাজের মূলমন্ত্র ছিল। ভোগের জন্যই ত্যাগের আবশ্যকতা, ত্যাগবুদ্ধি না থাকিলে ভোগে তৃপ্তি জন্মে না। এরূপ ভাবে ভোগ করিবার বুদ্ধি সজাগ ছিল বলিয়াই তাৎকালীন বেদপন্থী আর্য্যেরা ভোগের জন্য শতবর্ষ পরমায়ু পাইতেন। (দশ ২; কৌষীতকি ২।৭) কেবল আধ্যাত্মিকভাবে নয়, জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহারা সমদৃষ্টি লাভ করিতে চাহিতেন আর সেইভাবেই আপন সমাজের রূপ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সমাজের যে বর্ণভেদ তাহা লোকের প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্মভেদগত মাত্র। তাহা উচ্চাবচ ভেদ নহে।

সমদৃষ্টিকে খুব বড় করিয়া দেখিতেন বলিয়া তাঁহারা ধনের ও বংশের জন্য কাহাকেও অযথা সম্মান দিতেন না। প্রকৃত গুণবাণ ব্যক্তিকেই তাঁহারা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। সমাজস্থ প্রত্যেকেই সমান, তা সে বৃত্তিগত ভাবে ব্রাহ্মণই হউক আর শূদ্রই হউক, ইহাই ছিল তাঁহাদের সমাজের মূল ভিত্তি। (১) মৌলিক গুণভেদে—প্রকৃতিভেদে—মানুষের কর্ম্মভেদ

---

(১) এই জন্য দেখিতে পাই, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিকটও তত্ত্ববিদ্যা গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। (কৌষীতকি উপনিষদের ১ম ও ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। মহাভারতের বনপর্ব্বে সর্পরূপী নহুষের সহিত যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন স্মরণ করুন। "যাঁহাতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, নৃশংসতার অভাব, তপ ও করুণা এই সকল সদ্গুণ লক্ষিত হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ।...যে শূদ্রে এই সব লক্ষণ বিদ্যমান্ আছে সে প্রকৃত শূদ্র নহে আর যে ব্রাহ্মণে তাহা নাই সে ব্রাহ্মণও প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহে। ফলতঃ বংশ কখন জাতি নির্ণায়ক হইতে পারে না।...তত্ত্বদর্শিগণ চরিত্রকেই প্রধান যজ্ঞস্বরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁহার চরিত্র সুসংস্কৃত, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ।" "মূর্খ ব্রাহ্মণ ও কাঠের হাতী একই পর্য্যায়ভুক্ত, দুইই নামসর্ব্বস্ব। মূর্খ ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করা আর ভস্মে ঘি ঢালা একই কথা; আচরণ দেখিয়াই যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ আর কে প্রকৃত শূদ্র তাহা বিবেচনা করিতে হইবে।" মনুর এইরূপ সব উক্তি স্মরণ করুন। অগস্ত্য বশিষ্ঠ নারদ জাবাল ও বিদুর প্রভৃতির কাহিনীও স্মরণ আবশ্যক। জ্ঞানালোচনার পক্ষে বাধা তৎকালে কোন স্তরেই ছিল না। জ্ঞানচর্চ্চা সকলকেই করিতে হইত। জ্ঞানচর্চ্চায় যে বিরত হইত সেই সমাজে পতিত বলিয়া গণ্য হইত। আর্য্যদের ধারণা ছিল—সকল কর্ম্মের শেষ পরিণামই হইতেছে জ্ঞান লাভ তথা ভগবৎলাভ। সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আর্য্যেরা যাজ্ঞিক মনে করিতেন। কাহারও জন্য জপযজ্ঞের, কাহারও জন্য উদ্যোগযজ্ঞের, কাহারও জন্য হবির্যজ্ঞের

অনিবার্য্য হইলেও কর্ম্মের সঙ্গে উচ্চতা-নীচতার কোন নিত্য সম্বন্ধ ছিল না। নিষ্ঠার সহিত যিনিই কর্ত্তব্য পালন করিতেন তিনিই সমাজে শ্রদ্ধেয় ছিলেন। ধনীরা ও জ্ঞানীরা ছিলেন ধনের ও জ্ঞানের ন্যাসরক্ষক মাত্র। ধন ও জ্ঞান সাধারণের উপকারে ব্যয়িত ও নিয়োজিত হইলেই উহাদের সার্থকতা, অন্যথা উহাদের কোন মূল্য নাই। ইহাই ছিল তাঁহাদের বোধ। নিজের স্বার্থ ও পরের স্বার্থ মিশাইয়া অর্থাৎ যজ্ঞ-বুদ্ধিতে পরস্পরকে সাহায্য করিয়া জীবন যাপন করাই ছিল তাঁহাদের সত্যকার ধর্ম্মসাধনা। (২)

এ জগৎটাকে তাঁহারা মিথ্যা বলিয়া, স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতেন না। তাঁহারা প্রকৃতিকে যেমন মায়া বলিতেন, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষকে (অর্থাৎ ভগবান্‌কে)-ও তেমনি মায়ী বলিতেন। (শ্বেত ৪।৯, ১০)। গুণময়ী প্রকৃতি নানারূপে ও নানাভাবে প্রকাশিত হইতেছে (সাংখ্য-কারিকার ভাষায় রঙ্গ করিতেছে) বলিয়াই উহার নাম মায়া। মায়া নানা-ত্ব জ্ঞাপক শব্দ। নানাত্ব হইতেই মোহের ও ব্যষ্টিবোধের সৃষ্টি-সম্ভাবনা ঘটে বলিয়াই মায়া শব্দে মোহকারিণী ও মোহ-উৎপাদিকা অর্থ ক্রমশঃ আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু মোহকারিণী ও মোহ উৎপাদিকা হইলেও মায়া মিথ্যা বা স্বপ্ন নয়।

তাঁহারা প্রকৃতিকে মিথ্যা বা স্বপ্ন মাত্র মনে করিতেন না যে, তাহা তাঁহাদের নিম্নোক্ত উক্তিগুলি হইতে স্পষ্ট হইবে। "পুর্ব্বে এক আত্মা ব্যতীত আর কিছু ছিল না। তিনি ভাবিলেন—'আমি 'লোকসকল সৃষ্টি করিব কি ?' এবং তৎপরেই তিনি এই লোকসকল সৃষ্টি করিলেন।" (ঐত ১।১।২)। "ব্রহ্ম যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন তাহাতেই অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। সুতরাং এই যাহা কিছু সে-সমস্তই সত্য (অর্থাৎ অবিনাশী) এবং সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম।" (তৈত্তি ২।১)। "জগতে যাহা কিছু সে সবই ভগবৎ-সত্ত্বায় পূর্ণ।" (ঈশ ১)। "মায়ী পুরুষের অবয়বসমূহ দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে।" (শ্বেত ৪।১০)। "যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবে সে সমস্তই সেই পুরুষই।" (শ্বেত ৩।১৫)। "আমার বিভূতির (বা প্রকাশের) অন্ত নাই···আমি সর্বভূতের অন্তরে আত্মারূপে অবস্থিত ; আমিই ভূতসমূহের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ।" (গীতা ১০।১৯,২০)। "হে পার্থ ! আমার শত শত—সহস্র সহস্র নানারকমের ও নানাবর্ণের দিব্যমূর্ত্তি সকল দেখ। আদিত্যদিগকে, বসুদিগকে, অশ্বিনীকুমারদিগকে ও মরুৎ সকলকে এবং তৎসঙ্গে পূর্বে যাহা কেহ দেখে নাই এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত বস্তুও দেখ। আমার এই দেহে চরাচর সমেত সমস্ত জগৎ একত্র অবস্থিত রহিয়াছে তুমি তাহা দেখে এবং আরও যাহা দেখিতে ইচ্ছা কর তাহাও দেখ।" (গীতা ১১।৫-৭)। "আমি আমার একটিমাত্র অংশ দিয়া এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি।" (গীতা ১০।৪২)। "জীবলোকে জীবভূত যাহা কিছু সেসব আমারই অংশ ; সবই সনাতন।" (গীতা ১৫।৭) "আমাকে ছাড়া চরাচরে কোন ভূতেরই অস্তিত্ব নাই। আমি সকল ভূতের বীজ স্বরূপ। আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নাই।" (গীতা ১০। ৩৯,৪০)। "আমিই প্রকৃতিতে সৃষ্টির বীজ নিক্ষেপ করি, তাহা হইতেই সকল ভূতের সৃষ্টি। সুতরাং আমি সারা ভূতের বীজপ্রদ পিতা এবং প্রকৃতি উঁহাদের মাতা।" (গীতা ১৪।৩-৪)। "প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগেই সৃষ্টি।" (সাংখ্যকারিকা ২১)। "জগৎ মূর্ত্তিরূপে দেবী নিত্যা (অর্থাৎ সনাতনী)। তিনিই সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন।" (চণ্ডী ১।৪৪) অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের এক ও অদ্বিতীয় মূলসত্ত্বা। পুরুষের সৃষ্টি-ইচ্ছাই প্রকৃতিরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে যে ভেদ তাহা

আর কাহারও জন্য বা অভিচার যজ্ঞের বিধি ছিল। (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব)। যাজ্ঞিক যখন সবাই, সমাজস্থিতির জন্য সকলেরই যখন সমান আবশ্যকতা তখন সকলেই যে সমপদস্থ ছিলেন এবং নৈষ্ঠিক যাজ্ঞিক মাত্রই যে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তদ্‌বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

(২) বেদপন্থী আর্য্যদের নিত্য পরিশোধ্য পণ্যঋণের কথা স্মরণ করুন। "যে কেবল নিজের জন্য পাক করে সে পাপভাগী হয়।" (গীতা ৩।১৩)। "পরস্পরকে সাহায্য করিয়া পরম শ্রেয় লাভ কর।' (গীতা ৩।১১)। "যে পরকৃত উপকার ভোগ করিয়া তাহা শোধ না দেয় সে চোর নয় তো কি ?" (গীতা ৩।১২)।

প্রকাশগত ভেদ। মূলতঃ উভয়ে অভেদ। অভেদের মধ্যে এই যে ভেদ ইহাই মিথ্যা ভেদ। গীতায় স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে, "ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ই আমি।" (১৩।২) প্রকৃতি আদি পুরুষের পুরাণী প্রসৃতি বা বিস্তার মাত্র। (১৫।৪)।

প্রকৃতি মিথ্যা তো নয়ই, নশ্বরও নহে। যাহার আদি নাই তাহার অন্তও নাই। ভগবানের সৃষ্টি ভাবই যখন প্রকৃতি তখন আবার তাহার আদি বা অন্ত থাকিবে কেমন করিয়া? এইজন্যই গীতায় প্রকৃতিকে পুরুষের মত অনাদি (তথা অনন্ত) বলা হইয়াছে (১৩।২০) এবং আরও বলা হইয়াছে যে, উহার প্রকৃত স্বরূপও বুঝিতে পারা যায় না। (১৫।৩)। ফলতঃ উহার নাম ও রূপ অর্থাৎ ব্যক্ত ভাব নিত্য পরিবর্ত্তিত হইতে থাকায় নশ্বর হইলেও উহা কিন্তু আসলে অবিনশ্বরই। সাংখ্যের মতেও প্রকৃতি অনাদি ও নিত্য; পদার্থ মাত্র বিনাশী। ইহা অবোধের কথা। (৪৫) (সাংখ্যসূত্র ৪৫, ৬৭)।

আর্য্যেরা বলিতেন—ব্রহ্মার বয়স শত বৎসর অতীত হইলে প্রকৃতিতে মহাপ্রলয় হইবে এবং প্রকৃতি পুরুষের মধ্যে লীন হইয়া যাইবে। সাংখ্যকার প্রকৃতির পৃথক সত্ত্বা স্বীকার করায় তাহার মতে প্রকৃতির ব্যক্ত ভাব প্রলয়কালে তাহার অব্যক্ত ভাবে লীন হইয়া যাইবে। কিন্তু মহাপ্রলয়েই যে সৃষ্টির একেবারে শেষ নয় এবং আবার সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী, এ সম্বন্ধে তাহাদের মতবিরোধ ছিল না। সুতরাং মহাপ্রলয়কে প্রকৃতির ক্ষণিক বিশ্রামমাত্র বলিয়াই আর্য্যেরা বিবেচনা করিতেন। বিশ্রাম যখন মৃত্যু নয় তখন প্রকৃতিকে নশ্বর কিরূপে বলা চলে? ব্যক্ত—অব্যক্ত উভয় অবস্থার মধ্য দিয়াই প্রকৃতি নিত্য প্রবাহস্বরূপে বিরাজমতী

মহাপ্রলয়কে সৃষ্টির এক পর্য্যায়ের অবসান ধরিলেও ব্যবহারিক ভাবে—জীবের দিক হইতে—প্রকৃতিকে নশ্বর বলা চলে কি না? এই মহাপ্রলয় কতদূরে তাহা জানিতে পারিলেই ইহার বিচার সম্ভব। মহাভারত ও পুরাণসমূহে একটা হিসাব দেওয়া আছে। ঐ হিসাব হইতে জানা যায়—ব্রহ্মার বয়স শতবৎসর অতীত হইলে তবে প্রকৃতিতে মহাপ্রলয় হইবে। ব্রহ্মার একদিন আমাদের ৪৩২ কোটি ৩৬ হাজার বৎসর। ৩৬০ দিনে বৎসর ধরিয়া গণনা করিলে ব্রহ্মার শতবৎসর অর্থে আমাদের ৪৩২ কোটি ৩৬ হাজার ৩৬০ × ১০০ বৎসর। (৩) এ কত বৎসর! ব্রহ্মার বয়স নাকি এখনও ৫০ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। অর্থাৎ এই মহাপ্রলয় মানুষের হিসাবের বাহিরে কোন এক সুদূর ভবিষ্যকালে হইবে।

কথা উঠিতে পারে, এই মহাপ্রলয় ব্যতীত খণ্ড প্রলয়ও তো আছে। ব্রহ্মার প্রতিদিনের দিবাভাগে সৃষ্টি ও রাত্রি-কালে সৃষ্টির (অস্থায়ী ও আংশিক ভাবে) বিলয় হয়। এই সৃষ্টি ও লয় বা প্রকৃতির ব্যক্তাব্যক্ত ভাব প্রতিনিয়তই চলিয়াছে। ইহার বিরাম নাই। (গীতা ৮।১৭-১৯, ৯।৭-৮, ১৫।৩) এরূপ একটা খণ্ড প্রলয়ও কিন্তু আমাদের ৪৩২ কোটি ৩৬ হাজার বৎসর পরে পরে ঘটে। সুতরাং আমাদের পক্ষে প্রাকৃতিক ব্যবহারিক ভাবেও নশ্বরতা সম্বন্ধে ধ্যান করিয়া বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই।

বস্তুত, প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা নিত্যভাব বেদপন্থী আর্য্যদের মনে ছিল। আর তাহা ছিল বলিয়াই তাঁহারা পার্থিব অভ্যুদয়ের জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করিতেন। এই ব্যাকুলতা হইতেই তাঁহাদের যত কিছু বৈদিক যজ্ঞের উদ্ভব হইয়াছিল। এই প্রকৃতিকে ভোগ করিবার জন্য তাঁহারা ভগবানের নিকট কি না চাহিতেন? অন্ন, ধন, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, রূপ, যশ, সুসন্তান এবং গুণবতী ভার্য্যা—কিছুই তাঁহারা প্রার্থনায় বাদ দিতেন না। শত্রু পরাজয়ের জন্যও তাঁহারা ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেন। ঋগবেদে আছে—হে ইন্দ্র! আমাদিগকে অক্ষয় কীর্ত্তি ও ধন দাও (১।৯।৭)। কৌষীতকি উপনিষদে আছে—হে ইন্দ্র। আমার পুত্রকে শ্রেষ্ঠ ধনসমূহ দাও। ইহার বংশসূত্র কাটিও না (অর্থাৎ ইহাকে নির্ব্বংশ করিও না)। হে পুত্র! শতবর্ষ জীবিত থাক।' (২।৭)। উহাতে আরও আছে—ব্রহ্মকে শ্রীরূপে, যশরূপে ও তেজরূপে ধ্যান করিবে।' (২।৪)।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে প্রার্থনা আছে—'হে রুদ্র!

(৩) শ্রীযুক্ত তিলকের গীতা রহস্যের অষ্টম প্রকরণে এ অঙ্ক সবিস্তারে করিয়া দেখান আছে।

আমাদের পুত্র, পৌত্র, আয়ু, গো ও অশ্ব বিনাশ করিওনা। ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের বলবান্ ভৃত্যদিগকে বধ করিও না। আমরা হোমযোগ্য দ্রব্য লইয়া সর্ব্বদাই তোমাকে আহ্বান করিতেছি। (৪।২২)। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে গল্প আছে—ব্রহ্মবিৎ ইন্দ্র স্বর্গচ্যুত হইবার পর বৃহস্পতির ও পরে শুক্রাচার্য্যের পরামর্শ মত তাঁহার পরাভবকারী দৈত্য-রাজ প্রহ্লাদের নিকট শিষ্যরূপে অবস্থান করিয়া তাঁহার নিকট পার্থিব অভ্যুদয় রহস্য জানিয়া আবার শ্রী ও ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই গল্পের পরিপোষক একটি উক্তি কৌষীতকি উপনিষদে (৩।৪) পাওয়া যায়। সেখানে উল্লেখ আছে যে, ইন্দ্র প্রহ্লাদপক্ষীয়দিগকে অনায়াসে নিহত করিয়াছিলেন। সুতরাং এ গল্প নিছক কাহিনী না হওয়াই সম্ভবপর।

আর্য্যদের ঐহিকতাবুদ্ধি যে কত প্রবল ছিল তাহা কৌষীতকি উপনিষদের এই প্রার্থনাটি হইতে জানিতে পারা যায়—"যে আমাদিগকে দ্বেষ করে, আমাদের প্রাণ সন্তান ও পশু (বা সম্পত্তি) (৪) দ্বারা তাহাকে আনন্দিত করিও না। বরং যাহাকে আমরা দ্বেষ করি, তাহারই প্রাণ সন্তান ও পশু (বা সম্পত্তি) (৪) দ্বারা আমাদিগকে আনন্দিত কর।" (২।৫)। ভগবানের ভগবত্তার কল্পনার মধ্যেও ঐহিকতার আভাস আছে বলিয়া মনে হয়। কারণ ষড়ৈশ্বর্য্যের বর্ণনার প্রথমেই দেখি—সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য, সম্পূর্ণ বীর্য্য সম্পূর্ণ শ্রী ও সম্পূর্ণ যশ; তারপর দেখি—সম্পূর্ণ জ্ঞান ও সম্পূর্ণ বৈরাগ্য বা অনাসক্তি। দেবদেবীর কল্পনাকালেও আর্য্যেরা ঐহিকতা বিস্মৃত হন নাই, সেইজন্য তাঁহাদের হাতে তাঁহারা অস্ত্র দিয়াছিলেন। গীতাতেও পুরুষের বর্ণনায় আছে—"দিব্য-অনেক-উদ্যত-আয়ুধ" (১১।১০)। বস্তুত পক্ষে, অনার্য্যদের সহিত সংগ্রাম করিয়া যাঁহাদিগকে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইয়াছিল তাঁহারা ঐহিকতাকে বা পার্থিব অভ্যুদয়কে হীন-চক্ষে দেখিতেন ইহা কখনই সম্ভবপর নয়।

ধন ও অন্নের সংগ্রহচেষ্টাকে তাঁহারা হেয় মনে করা দূরে থাক এগুলিকে তাঁহারা ব্রহ্মবৎ জ্ঞান করিতেন। অন্ন হইতে বীর্য্য এবং বীর্য্য হইতে সৃষ্টি। (৫) সুতরাং অন্নকে তাঁহারা যে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। অন্নের সঙ্গে ধনের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। তাই ধনও ব্রহ্মস্বরূপ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ হইতে কতকগুলি উক্তি উদ্ধার করিতেছি।—"আমি দীপ্তিময় ধনস্বরূপ।" (১।১০)। "যাঁহারা অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন তাঁহারা সমুদায় অন্ন লাভ করেন।" (২।২)। "তিনি জানিলেন যে, অন্ন ব্রহ্ম।" (৩।২)। "অন্নের নিন্দা করিও না। অন্ন ব্রতস্বরূপ…অন্নকে পরিত্যাগ করিও না। অন্ন ব্রতস্বরূপ।…বহু অন্ন অর্জ্জন করিও। অন্ন ব্রতস্বরূপ।…বাসের জন্য আগত কাহাকেও ফিরাইও না। তাহাকে আশ্রয়দান ব্রতস্বরূপ। সেই জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে বহু অন্ন সংগ্রহ করিও এবং অভ্যাগতকে বলিও—'আমরা অন্ন প্রস্তুত করিয়াছি।…এই অন্ন অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যিনি ইহা জানেন, তিনি ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করেন, তিনি অন্নবান্ ও অন্নদাতা এবং পুত্রাদিতে, পশুতে (অর্থাৎ সম্পত্তিতে), ব্রহ্মতেজে ও কীর্ত্তিতে মহত্ত প্রাপ্ত হন।" (৩।৭-১০)।

ঐহিকতার এইরূপ পক্ষপাতী হইয়াও তাহারা কিন্তু ঐহিকতা-সর্ব্বস্ব হওয়া পছন্দ করিতেন না, কেবল ঐহিকতাতেই তৃপ্তি পাইতেন না (কঠ ১।২৭); বরং মনে করিতেন যে, ভোগ লালসায় উন্মত্ত হইলে চলিবে না, লালসাকে সংযত করিয়াই জীবন পথে চলিতে হইবে; প্রবৃত্তির সঙ্গে নিবৃত্তির আত্যন্তিক যোগ সংস্থাপনেই আমাদের সত্যকারের প্রতিষ্ঠা, তাহাতেই আমাদের ভোগের প্রকৃত সার্থকতা। ফলে তাঁহাদের আচরণে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই সুসমঞ্জস ভাবে ফুটিয়া উঠিত। এবং তাঁহারা ভাবিতেন, বিরাট ভগবান যেমন নিজেকে এই বিশ্বের মধ্যে ছড়াইয়াছেন, আমাদিগকেও সাধ্যমত সেইরূপ ভাবে বিশ্বহিতায় ছড়াইয়া পড়িতে হইবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডির মোহ কাটাইয়া দশের ও বিশ্বের হিতের মধ্যে নিজের হিত খুঁজিতে হইবে। তবেই আমাদের মনুষ্যত্ব।

(৪) তৎকালে পশুই সম্পত্তির প্রতীক ছিল।

(৫) অন্নাৎ রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ। (তৈত্তি ২।১) অন্নাৎ ভূতানি জায়ন্তে। জাতানি অন্নেন বর্দ্ধন্তে। (তৈত্তি ২।২)। অন্নাৎ ভবন্তি ভূতানি। (গীতা ৩।১৪)।

প্রকৃতির ও নিবৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া জীবন-যাত্রার সূত্র বাহির করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারিয়াছিলেন—কেবল অধ্যাত্ম বিদ্যার সাধনায় মুক্তি মিলে না, পার্থিব বিদ্যারও সাধনা চাই; বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কে জানিলে (ঈশ ১১), জগৎ ও ভগবান উভয়কে জানিলে (ঈশ ১৪) তবে অমৃতের অধিকারী হইতে পারা যায়; অর্থাৎ যে কেবল পার্থিব সুখ-সৌভাগ্য লইয়া থাকিতে চায় তাহার তো অধোগতি হয়ই আর যে কেবল আধ্যাত্মিক সাধনা লইয়া থাকিতে চায় তাহার আবার আরও বেশী অধোগতি হয়। (ঈশ ৯, ১২)

এই প্রসঙ্গে তৈত্তিরীয় উপনিষৎ হইতে একটি অনুবাক্ উদ্ধার করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। "বেদ পাঠ শেষ হইলে আচার্য্য শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন—সত্য বলিও, ধর্ম্মপথে চলিও, বেদ আলোচনা করিতে ভুলিও না; ধন আহরণ করিয়া আচার্য্যকে দক্ষিণা দিও; সন্তান সূত্র কাটিও না (অর্থাৎ বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা করিও); সত্য ও ধর্ম্ম ও কুশল হইতে বিচলিত হইও না; জগতে মহত্ব লাভ করিতে বিরক্ত হইও না; জ্ঞান আহরণে ও প্রদানে তথা দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিও; মাতা পিতা আচার্য্য ও অতিথিকে দেববৎ জ্ঞান করিও; কেবল অনিন্দনীয় কার্য্যই করিও; যাহা সৎকার্য্য তাহাই করিও; অসৎকার্য্য করিও না; আমাদের যে সকল কার্য্য ভাল কেবল তাহাই অনুকরণ করিও। শ্রেষ্ঠতর ব্রাহ্মণদিগকে শ্রদ্ধা দেখাইও। যাহা দিবে তাহা শ্রদ্ধার সহিত দিবে, বিচার করিয়া দিও, বিনয়ের সহিত দিও, ধর্ম্মবুদ্ধিতে দিও, মিত্র বুদ্ধিতে দিও। কর্ম্ম বা আচরণ সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইলে বিচারসমর্থ, সরলমতি, ধর্ম্মব্রত ব্রাহ্মণদের আদর্শ মানিয়া চলিও।" (১।১১)। প্রসিদ্ধি আছে যে, বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণে কেবল এই সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে পরহিত সাধনই ধর্ম্ম আর পরপীড়নই পাপ। নিত্য-জীবনযাত্রার একটা সন্ধান আমরা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনের কথোপকথন মধ্যে পাই। তাহা এইরূপ—"কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা এবং উপযুক্ত পাত্রে দান ও সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করাই সচ্চরিত্রতার লক্ষণ। যে পুরুষকার দ্বারা কাহারও হিতসাধন হয় না এবং যাহা দ্বারা জনসমাজে লজ্জাপ্রাপ্ত হইতে হয় সেরূপ পুরুষকার কদাচ প্রকাশ করিবে না। যে কার্য্যদ্বারা জনসমাজে শ্লাঘনীয় হওয়া যায় ঐরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।" মনুর উপদেশ ছিল—নিত্য পঞ্চঋণ শোধ করিয়া জীবন যাপন করিবে অর্থাৎ বেদপাঠ করিয়া জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া ঋষিঋণ, বংশরক্ষা করিয়া পিতৃঋণ, উপাসনা করিয়া দেবঋণ, অতিথি ও ছাত্রদিগকে অন্ন দিয়া নৃঋণ এবং ইতর প্রাণীদিগকে অন্নভাগ ও উদ্ভিদগুলিকে জল দিয়া ভূতঋণ শোধ করিবে, অন্যকথায় নিত্য সমাজহিতে ও সর্বভূতহিতে এবং তৎসঙ্গে আত্মহিতে নিজেকে নিষ্ঠার সহিত ব্যাপৃত রাখিবে।

বেদপন্থী সমাজের মূল ভিত্তি ছিল এইরূপই। গার্হস্থ্য আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহাদের সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদের যাহা কিছু ব্যবস্থা সে সমস্ত প্রধানতঃ গৃহস্থদিগকে লক্ষ্য করিয়াই। গার্হস্থ্য আশ্রমের জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যগুলি শেষ হইলে পর তবে সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশের অধিকার জন্মিত, তাও সরাসরি নয়। কিছুকাল মধ্যবর্ত্তী বানপ্রস্থ-আশ্রমে অবস্থান করিয়া সন্ন্যাস-অবস্থার যোগ্যতা সঞ্চয় করিয়া লইতে হইত। মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে বিদুর-ধৃতরাষ্ট্র সংবাদে দেখি—'পুত্রদিগের পিতা হইয়া, তাহাদিগকে অঋণী রাখিয়া, তাহাদের বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া, কুমারী কন্যাদিগকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করিয়া সকলে অরণ্যে যাইয়া মুনিব্রত গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবে।' মনুর মতে শরীর জরাগ্রস্ত হইলে ও শরীরে বলি দেখা দিলে এবং পৌত্র জন্মিলে গৃহস্থ বনাগমন করিবে।' বিষ্ণু সংহিতার মতে, মাংস লোল হইলে ও কেশ শুক্ল হইলে অথবা পৌত্রের জন্ম হইলে গৃহস্থ পত্নীকে পুত্রদিগের নিকট রাখিয়া বন গমন করিবেন। পত্নী ইচ্ছা করিলে পতির অনুগমন করিতে পারিবেন। বনে যাইয়াও গৃহস্থ অগ্নির পরিচর্য্যা করিবেন, বেদাধ্যয়ন করিবেন, ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবেন, চর্ম্ম ও চীরবস্ত্র পরিধান করিবেন এবং যথালব্ধ অন্ন ভোজন করিবেন। তপস্যা দ্বারা তিনি শরীর ও মন দৃঢ় ও কষ্ট-সহিষ্ণু করিয়া তুলিবেন। এইরূপে সকল আসক্তি হইতে

নিবৃত্তি জন্মিলে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া তিনি প্রব্রজ্যাশ্রমী হইবেন।' (৯৪-৯৬ অধ্যায়।) কিন্তু এই বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল না যে, তাহাও কৌষীতকী উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে জানা যায়। পরলোকযাত্রী জরাগ্রস্ত পিতা পুত্রকে আহ্বান করিয়া তাহাকে গার্হস্থ আশ্রমোচিত সকল কর্ত্তব্যের ভার ছাড়িয়া দিতেন। তৎপর তিনি ইচ্ছা করিলে পুত্রের অধীনে বাস করিতেন অথবা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেন। (২।১০)।

বেদপন্থী সমাজে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতে একেবারে বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করা চলিত না। শুক, সনৎকুমার প্রভৃতি কয়েকজনের কথা ব্যতিক্রমস্থল বলিয়াই তাঁহারা গণ্য করিতেন। ফলে সকলকেই গার্হস্থ্য আশ্রমী হইতে হইত। মুনি ঋষিরা পর্য্যন্ত সকলেই গৃহস্থ ছিলেন।

গীতা যাহার জন্ত উদ্‌গীত হইয়াছিল তিনিও বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন গৃহস্থ। তাঁহাকে কর্ত্তব্য কার্য্যে নিয়োজিত রাখিবার জন্তই গীতার আবশ্যকতা ঘটিয়াছিল। ভগবান্ তখন গৃহস্থরূপেই লীলাপর। যাঁহাকে আদর্শ করিয়া অনাসক্তভাবে জীবনপথে চলিবার জন্ত তিনি অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন (৩।২০) সেই জনকও ছিলেন গৃহস্থ। নিজের কর্ম্মময় গৃহস্থ জীবনের প্রতিও তিনি অর্জ্জুনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। (৩।২২-২৪)। নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য নিষ্ঠার সহিত যজ্ঞ বুদ্ধিতে সম্পাদন করিয়াই মানুষ ভগবানের অর্চ্চনা করে (১৮।৪৫।৪৮), একথা তিনি গৃহস্থকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, কারণ কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাস শ্রমীদিগকে একথা বলার কোন সার্থকতা নাই। জ্ঞানী ও ভক্তের লক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহারা সর্ব্বভূতহিতে রত। (৫।২৫; ১২।৪)। গৃহস্থ ভিন্ন আর কাহার পক্ষে কার্য্যতঃ নিত্য সর্ব্বভূতহিতে রত হওয়া সহজ ও সম্ভবপর? সর্ব্বজনহিতে রত থাকাই তো গৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম—নিত্যকার যজ্ঞ।

ভগবান চাহিয়াছেন—আমরা যেন 'সর্ব্বভাবেন' তাঁহাকে অর্চ্চনা করি। (১৮।৬১)। 'সর্ব্বভাবেন' শব্দের অর্থ কায়, মন ও বাক্য দিয়া। (৫।১১)। কায় অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়। সুতরাং তাঁহার সেবা কর্ম্মেন্দ্রিয় দিয়াও যখন করিতে হইবে তখন তিনি যে বংশরক্ষাকেও ভগবৎ-অর্চ্চনার অংশরূপে গণ্য করিয়াছেন তদ্‌বিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকিতে পারে না। যে সমাজের লোকেরা দেবতাদিগকে প্রার্থনা জানাইতেন যে,—'আমার বংশসূত্র কাটিও না অর্থাৎ আমাকে নির্ব্বংশ করিও না'. (কৌষী ২।৫, ৭), যে সমাজে. সৃষ্টিশক্তির প্রতীকস্বরূপ শিবলিঙ্গ পূজার প্রথা পরে চলিয়া গিয়াছে, সেই সমাজে ভগবান যে নিজেকে সৃষ্টিসাধক বীজস্বরূপ (১০।৩৯) ও ধর্ম্ম-অবিরোধী কামস্বরূপ (৭।১১) বলিয়া বর্ণনা করিবেন (৬) এবং যজ্ঞের সংজ্ঞা দিবেন—লোকসৃষ্টির ও লোকপুষ্টির সহায়ক ত্যাগাত্মক কর্ম্ম মাত্র (৮।৩) এবং যৌনধর্ম্মরক্ষাকে ধর্ম্মসাধনার অঙ্গীভূত বলিয়া নির্দ্দেশ দিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছু নাই। তিনি গার্হস্থ্য জীবনকে অনাবশ্যক ও নিরর্থক মনে করিতেন না বলিয়াই এইরূপ ভাবে নিজের সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। সৃষ্টিকে তিনি নিজের সংসাররূপে এবং ভৃত্যগণকে নিজের সন্তানরূপে কল্পনা করিয়া প্রকৃতিকে নিজের স্ত্রীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। (১৪।৩, ৪)।

যে সমাজে স্ত্রীকে সঙ্গিনী করিয়া—সহধর্ম্মিণী করিয়া ধর্ম্মসাধনার ব্যবস্থা ছিল, স্ত্রীর সাহচর্য্য বিনা যজ্ঞসম্পাদন অসম্ভব ছিল, সে সমাজে গার্হস্থ্য জীবনের নিন্দাসূচক কোন কথা যে তিনি বলিবেন ইহা কখনই সম্ভবপর নয়। নিজে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিয়া গার্হস্থ্য জীবনকে ধর্ম্মসাধনার ও মোক্ষপ্রাপ্তির পক্ষে বিঘ্নসাধক সুতরাং নিকৃষ্ট বলিলে শুনাইতও বিশ্রী। নিজে ধর্ম্ম আচরণ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়াই যাঁহার স্বভাব (৩।২১, ৫) তিনি নিজে গৃহস্থভাবে সারাজীবন যাপন করিয়া এমন কথা কি কখন বলিতে পারেন?

---

(৬) প্রশ্নোপনিষদে আছে—"যাহারা দিবসে রতিক্রিয়া করে তাহারা স্বীয় প্রাণ ক্ষয় করে আর যাহারা রাত্রিতে রতিক্রিয়া করে তাহারা ব্রহ্মচর্য্যই রক্ষা করে।...যাহারা যথাকালে সন্তান উৎপাদন করে এই ব্রহ্মলোক তাহাদেরই।" (১।১৩,১৫)—যেহেতু পুত্রোৎপাদন দ্বারাই লোক সমূহের ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখা সম্ভব হয়।" (ঐত ২য় অধ্যায়)।

যদি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অপধর্ম্ম হয়, নিকৃষ্ট ধর্ম্ম হয়, তবে সমাজও থাকে না। সৃষ্টির উদ্দেশ্যও বুঝা যায় না। গৃহস্থের জীবন যদি নিকৃষ্ট জীবন হয় তবে তাঁহার স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টির আবশ্যকতা কি ছিল? 'এমিবা' শ্রেণীর মত জীব লইয়াই তো তাঁহার সৃষ্টিলীলা বেশ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারিত! না, না গৃহস্থজীবনটা নিকৃষ্ট নয় এবং ধর্ম্মসাধনার ও মোক্ষপথের পক্ষে বিঘ্নসাধকও নয়। বরং গার্হস্থ্য আশ্রমই ধর্ম্মসাধনার শ্রেষ্ঠতম আশ্রম, তবে খুব কঠিন দায়িত্বপূর্ণ আশ্রম। এই আশ্রমে থাকিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে, যথাসম্ভব আমিত্বের প্রসার করিতে হইবে—সন্তানদের মধ্যে, আত্মীয়দের মধ্যে, প্রতিবেশীদের মধ্যে, দেশবাসীদের মধ্যে, জগদ্‌বাসীদের মধ্যে, সারাভূতের মধ্যে সেই আমিত্ববোধ ক্রমশ প্রসারিত করিয়া, তাহাদের সকলের জন্যই আমি আছি, এই বোধে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিতে হইবে; অর্থাৎ সকলের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ দেখিয়া কর্ত্তব্যনিরত থাকিতে হইবে। ইহাই গৃহস্থের ধর্ম্মসাধনা। এরূপ ধর্ম্মসাধনারই অপর নাম লোকসংগ্রহ। সকলের হিতে রত থাকিয়া সকলকে সৎপথে পরিচালিত করাকেই লোক-সংগ্রহ বলে। একাজ এমন নিপুণভাবে ও অনুগ্রভাবে করিতে হইবে যাহাতে নিজের আমিত্ব বা অহমিকা ফুটিয়া না উঠে এবং লোকের বুদ্ধিভ্রম না ঘটে। (৩।১৮,২৫,২৬)

গৃহস্থদের মধ্যে আবার ক্ষত্রিয় স্বভাব যাঁহার প্রবল এমন এক ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্ গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহার গূঢ় রহস্য, বোধ হয়, এই সত্য প্রতিষ্ঠা করা যে গৃহস্থ মাত্রই এক অর্থে ক্ষত্রিয় নিত্য সমাজ সেবা ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সমাজকে (তথা অংশত সৃষ্টিকে) ক্ষতের হাত হইতে, সর্ব্ববিধ অভাবের হাত হইতে, মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করা গৃহস্থেরই ধর্ম্ম, যেহেতু গৃহস্থই তো সকল আশ্রমীর আশ্রয়স্থল

গীতায় মুক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। একটা উদার ভাবের উপর একত্ব প্রতিষ্ঠিত। ভগবান্ একথা বারবার বলিয়াছেন যে, তুমি-আমি দৃশ্যতঃ সামান্য জীব হইলেও মূলতঃ সামান্য নই। মূলে ব্রহ্ম যিনি, তিনিই জীবরূপে—'তুমি-আমি'রূপে লীলাপর। সুতরাং জীবে জীবে যে ভেদ তাহা লৌকিক ভেদ,—মৌলিক ভেদ নহে। এই তত্ত্ব জীবনে অর্থাৎ কালে ও ভাবে উপলব্ধি করিতে পারাই মুক্তি। মুক্তি কোন অপূর্ব্ব বস্তু নয়; তাহা স্বভাবের পূর্ণ পরিণতি মাত্র, জীববুদ্ধিকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে লীন করিয়া দিয়া সমদৃষ্টিতে ও সমবুদ্ধিতে জীবনযাপন করিতে থাকা মাত্র। এজন্য গ্রাম ত্যাগ করিয়া বনে যাওয়ার আবশ্যকতা কাহারও হয় না। দান বিশেষের সহিত মোক্ষের কোন সম্বন্ধ নাই। হৃদয় হইতে অজ্ঞানতার গ্রন্থি নিত্য চেষ্টার ফলে খুলিয়া ফেলিতে পারিলেই যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন স্থানে অবস্থান করিয়াই মোক্ষ পাইতে পারে, তা সে স্ত্রীই হউক, বৈশ্যই হউক, শূদ্রই হউক, আর ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণই হউক। (১০।৩২, ৫।২৫, ২৯; ৬।২৯-৩২; ১১।৫৫; ১২।৪; ২।৭১-৭২)।

লোক ব্যবহারাত্মক কোন নীতিকথাকে অবলম্বন করিয়া তিনি গীতারহস্য ব্যাখ্যা করেন নাই। কেবল লোক ব্যবহারগত নীতিবুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া কোন সমাজ, এমন কি কোন ব্যষ্টিও চিরকাল আত্মরক্ষা করিতে পারে না। নীতির উপরও বড় কথা হইতেছে—আত্মবোধের কথা। ভগবান্ সেই কথাই আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। নীতি চাই, সদাচরণ চাই, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগবুদ্ধি চাই এবং নিজের স্বার্থবুদ্ধিকে ও ভোগেচ্ছাকে সংযত করা চাই—এগুলি মনুষ্যত্ব সাধনার ভিত্তি। এগুলি নহিলে চলিবে না। কিন্তু আরও চাই এই বোধ যে, তুমি-আমি মূলতঃ অভেদ, তুমিও যে আমিও সে। আমাদের এ জীবনযাত্রা, দৃশ্যতঃ বা আপাতসুখকর বা কষ্টকর যাহাই হউক না কেন, ব্রহ্মলীলা মাত্র তোমাতে-আমাতে যে-বিরোধ তাহা সত্যকারের বিরোধ নয়, পরস্পরকে বুঝিবার ভুলেই, আত্মবোধের অভাবেই, এই বিরোধ। এ বিরোধ দূর করিতে হইবে—হয়ত কঠোর ভাবেই দূর করিতে হইবে। কিন্তু তাহা কোন ভাবের বশে নয়, কেবল কর্ত্তব্যের প্রেরণার বশে, শান্তভাবে ও মন হইতে শত্রুবুদ্ধি মুছিয়া ফেলিয়া। (৭) তুমি তো

(৭) নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব। ভূত-সমূহের প্রতি বৈরীবুদ্ধি যাহার নাই সে-ই আমাকে পায়। (গীতা ১১।৫৫)।

আমার শত্রু নও, সুতরাং তোমার প্রতি আমার শত্রুবুদ্ধি থাকিবে কেন? তোমাকে হিংসা করিলে আমার নিজেকেও যে হিংসা করা হইবে (১৩।২৮)—তাহা কি আমি করিতে পারি? সমস্ত ভূতের মধ্যে আমার নিজকে এবং আমার নিজের মধ্যে সমস্ত ভূতকে অনুভব করিতে থাকাই যে আমার ধর্ম্ম (৬।২৯), ইহা আমি কেমন করিয়া ভুলিব?

লোলুপতা পরিহারের জন্য ভগবান্ অনেক কথা বলিয়াছেন। লোলুপতা আমাদের সাজে না। যে আত্মজ্ঞানী, সে লোলুপ হইবে কেন? মূলতঃ ব্রহ্ম যে, তাহার অপ্রাপ্য কি আছে? নিজের মধ্যে এই ব্রহ্মবোধটা জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই তো ব্যষ্টিগতভাবে সকল প্রাপ্তির শেষ। (৬।২২)। তখন যাহা কিছু কৃত্য বা প্রাপ্তব্য তাহা লোকহিতার্থ। (৩।২০-২৫)। সুতরাং সেইজন্যই তো সর্ব্বতোভাবে আমাদের চেষ্টা করা আবশ্যক। সেই চেষ্টার নামই তো সাধনা বা তপস্যা। লোলুপতা জয় করিতে পারিলেই আমরা ভগবানের সংসার-রহস্য প্রকৃতভাবে ভেদ করিতে পারিব এবং প্রকৃত জ্ঞানীর মর্য্যাদা ও সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইব—আমাদের জীবলীলার অবসান ঘটিবে এবং গতাগতি হইতে আমরা চিরতরে মুক্ত হইব। (১৫।৩-৫)

যখন মানুষে-মানুষে সত্যকারের কোন ভেদ নাই, তখন কেবল নিজের সুখের কথা ভাবিয়া কায করা চলে না, তখন নিজের সুখের কথা ভাবিতে গেলে তোমারও সুখের কথা ভাবা আবশ্যক হয়। সুতরাং আমার সকল কার্য্য তোমার আমার সকলেরই সুখের জন্য হইবে। এইভাবে কায করিবার বুদ্ধিকেই যজ্ঞবুদ্ধি বলে। (৩।১০-১১) যজ্ঞবুদ্ধিতে কায করিয়া আমরা আসক্তির হাত এড়াইব এবং ক্রমে কর্তৃত্বের অভিমান হইতে এবং এমন কি সকল দ্বন্দ্ববোধ হইতেও নিজেকে মুক্ত করিতে পারিব।

কর্ম্মের ভিতর দিয়াই আমাদের সাধনা আরম্ভ হইবে। যতক্ষণ জীবভাব ও জীববুদ্ধি থাকিবে ততক্ষণ কর্ম্মসাধনা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াই জ্ঞান ও ভক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে এবং নিজ জীবনে এই তিনের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। তবেই সাধনায় সিদ্ধি ঘটিবে। সিদ্ধির পর কর্ম্ম করা না করা সম্বন্ধে স্বাধীনতা আসিলেও গীতার মতে কর্ম্ম ত্যাগের অবকাশ কোন দিনই নাই। ভগবান বলিতেছেন, সৃষ্টিরও যেমন শেষ নাই কর্ম্মেরও তেমনি শেষ নাই—সৃষ্টি ও কর্ম্ম একার্থক শব্দ। (৮।৯)। সুতরাং সিদ্ধি বা মুক্তির পরেও কর্ম্ম, তবে তখন সে-কর্ম্ম একেবারে ভাগবত কর্ম্ম—স্বতঃস্ফূর্ত্ত যজ্ঞকর্ম্ম। (৩।১৭-২০)। সে-অবস্থা যতক্ষণ না আসিতেছে ততক্ষণ ভগবানের উপর একান্ত-নির্ভর হইয়া যতটা সম্ভব নিষ্কাম হইয়া তাবৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকাই আমাদের সত্যকার ধর্ম্মসাধনা। (২।৪৮; ৩৮, ৯)। তাঁহার আশ্বাস বাণী সর্ব্বদাই যেন আমাদের মনে থাকে—যতটা নিষ্কাম হইতে পারিব ততটাই আমাদিগকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিবে, নিষ্কাম সাধনার একটুও ব্যর্থ হইবে না, এ সাধনা যতই অল্প হউক তাহা কল্যাণদায়ক হইবেই হইবে। (২।৪০; ৬।৪০)। এরূপ সাধনার ফলে আমরা শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবই পাইব। (৩।৩০-৩১)। সুতরাং ত্রুটিযুক্ত হইতে থাকিলেও কর্ত্তব্য পরিহার করা উচিত নহে—যতটা সম্ভব নিষ্কাম ভাবে তাহা করিয়া যাইতে হইবে। (১০।৪৮)।

এই প্রসঙ্গে ভগবানের একথাটাও আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক,—"আমাকে যে যেরূপ ভাবে ভজনা করে আমিও তাহাকে সেইরূপ ভাবেই ভজনা করি, অর্থাৎ আমাকে যে যেমন ভাবে পাইতে চায় আমি তাহার নিকট সেইরূপ ভাবেই ধরা দিই, তাহাকে সেইরূপ ভাবেই অনুগৃহীত করি" (৪।১১)। অন্য কথায়, মানুষের সত্যকারের চেষ্টা কখনই বিফল হয় না, ভগবান তাহার সে চেষ্টায় দৃঢ়তা আনিয়া দেন (৭।২২) এবং কিরূপে সে-চেষ্টা সিদ্ধ হইবে তৎসম্বন্ধে তাহাকে বুদ্ধিও যোগাইয়া দেন (১০।১০), কারণ উদ্যমীর উদ্যম, তেজস্বীর তেজ ও চেষ্টাবানের সাফল্য তিনিই, তিনিই সিদ্ধি (১০।৩৬)। অন্য কথায়, আন্তরিক ভাবে ও যথার্থ পুরুষকারের সহিত যদি আমরা কোন কার্য্যে ব্রতী হই তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আমরা সিদ্ধিলাভ করিবই—আমাদের সেরূপ চেষ্টা কখনই ব্যর্থ হইবে না। ফলে তিনি আমাদিগকে ইহাও বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, আমরা যদি আন্তরিকভাবে

পুরুষকার অবলম্বন করিয়া দৃঢ়তার সহিত কার্য্যে ব্রতী না হই তাহা হইলে আমাদের কার্য্যসিদ্ধি সুদূরপরাহত। (৮) সুতরাং নিষ্ঠার সহিত কর্ম্ম করিয়াই আমাদিগকে সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে (১৮।৪৫)। জীবস্বভাববশত আমাদের কর্ম্মত্যাগের উপায় নাই যখন (১৮।৬৩), তখন ভগবানে মন স্থির রাখিয়া নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য সাধিয়া গেলেই আমরা সকল পাপ হইতে উদ্ধার পাইব (৪।৩৬, ৩৭) এবং কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া (৪।৪১) অন্তিমে ভগবানের পরম পদে চির-আশ্রয় পাইবই। (৮।৭)

তাঁহার এই কথাটাও ভুলিলে চলিবে না যে, মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই নিজের শত্রু। সুতরাং নিজেকে কখনও অবসাদগ্রস্ত করিও না; আত্মচেষ্টায় নিজের কল্যাণ সাধিয়ো। (৬।৫, ৬)

কর্ম্মের ভিতর দিয়াই যিনি ধর্ম্মসাধনার উপদেশ দিয়াছেন তিনিই আবার কর্ম্মকে নিন্দা করিবেন, ইহা অসম্ভব কথা। তিনি যে-কর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন তাহা কাম্য কর্ম্মের! কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া অর্থাৎ নিজের ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার কথা মনে না আনিয়া এবং লোকহিতকে সামনে রাখিয়া (৯) নিষ্কাম ভাবে কার্য্য করিলে (১৮।৫,৬) তবেই মুক্তি মিলিবে, ইহাই তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। ফলতঃ তিনি সন্ন্যাস বলিতে কর্ম্মত্যাগ বুঝেন নাই, ফলাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগ মাত্র বুঝিয়াছেন (১৮।২) এবং সন্ন্যাসী বলিতে নিষ্কামকর্ম্মীই বুঝিয়াছেন (৬।১)।

গীতায় যোগ শব্দ বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইলেও ভগবান্ যোগী বলিতে সর্ব্বত্র কর্ম্মযোগীই বুঝিয়াছেন। কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব নির্দ্দেশ করিয়া তিনি তথাকথিত কর্ম্মত্যাগীদিগকে কর্ম্মীই সাব্যস্ত করিয়াছেন। যখন আহার বিহার পর্য্যন্ত কর্ম্ম, তখন কর্ম্মী নয় কে? কর্ম্ম যখন সকলকেই করিতে হইবে তখন কর্ম্মকে সোজাসুজিভাবে স্বীকার করিয়া নিষ্কামভাবে তাহা সম্পাদন করাই সত্যনিষ্ঠা। অন্যথা উহা মিথ্যাচার হইয়া দাঁড়ায়।

ভগবান যেভাবে কর্ম্মের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন সে ভাবে বিচার করিলে সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যকে পর্য্যন্ত কর্ম্মী বা কর্ম্মযোগী ভিন্ন আর কিছু অভিধা দেওয়া চলে না। তাঁহার সারা জীবনটাই তো লোকহিতকর কর্ম্মের ভিতর দিয়াই কাটিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাধনার ফলে তিনি এ জন্মে একেবারে সিদ্ধ হইয়াই জন্মিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে চতুরাশ্রমের ভিতর দিয়া যাইতে হয় নাই, যাওয়া আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে যাহা খাটিয়াছে তাহা কি সকলের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য?

গীতা ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক যোগশাস্ত্র বলিয়া পরিচিত। গীতার্থ সহজ বুদ্ধিতে বুঝিতে চেষ্টা করিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, যোগশাস্ত্র অর্থে গীতা কর্ম্মযোগশাস্ত্র। উহা ব্রহ্মবিদ্যাও বটে, কারণ কর্ম্মের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায় ও জীব ব্রাহ্মীস্থিতিলাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে তাহারই বিষয় উহাতে আলোচিত হইয়াছে।

সর্ব্ব উপনিষদের সার বলিয়া উহার যে খ্যাতি তাহা কিন্তু ঠিক নহে। উপনিষদসমূহের সার ভাগ উহাতে সঙ্কলিত হইলেও উহার একটা নিজস্ব ভাব ও ভঙ্গী আছে। উহা নিজে একদিকে যেমন উপনিষদ অন্যদিকে তেমনি সাধনসঙ্কেতমূলক স্মৃতিও বটে। উহা শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ই। গীতার সাধনরহস্য এই—কেবল জ্ঞানসাধনায়, কেবল কর্ম্মসাধনায় অথবা কেবল ভক্তিসাধনায় মানুষ মুক্তির অধিকারী হয় না। মানুষকে মুক্তির জন্য জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধ সাধনার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে এবং সেই সাধনার সহজ সঙ্কেত হইতেছে নিষ্কাম হইয়া

---

(৮) চেষ্টা পর মানুষ শ্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দেবতারা তাহার চেষ্টা সিদ্ধির জন্য সাহায্য করেন না। (ঋগবেদ ৪।৩৩,১১)

(৯) দৃষ্টান্ততঃ, সুরাপানে সমাজস্থ ব্যক্তিদের অহিত হইলেও সুরার ব্যবসায়ে অর্থ আছে জানিয়া যাহারা সুরা ব্যবসায়ী হয় তাহারা সমাজের অহিত সাধক ভিন্ন আর কিছু নয়। এরূপ ভাবে অর্থ উপায়ে সাধারণ ধনবিজ্ঞানের সায় থাকিলেও উহা চরিত্রনীতি ও সমাজনীতির দিক্ হইতে নিন্দনীয় হওয়ায় ভারতীয় সমাজে সুরাব্যবসায়ীদের স্থান অতি নীচে।

কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া নিজেকে নিমিত্তমাত্র ভাবিয়া জ্ঞান ও ভক্তিসহকারে নিষ্ঠার সহিত তাবৎ কার্য্য বিশ্ব-হিতার্থ সম্পাদন করিতে হইবে। গীতার সাধক পূর্ণ-মনুষ্যত্বের সাধক। পূর্ণভাবে মানুষ হওয়া আর মুক্ত হওয়া গীতার মতে একই কথা। মনুষ্যত্বের এই সাধনসঙ্কেতই গীতার বিশেষত্ব।

ভগবান্ বলিতেছেন—গীতার্থ সে-ই যথার্থভাবে বুঝিতে পারিবে, যে শ্রদ্ধান্বিত, যে অসূয়াশূন্য, সুহৃদবুদ্ধি যাহার আছে, লোকহিতেচ্ছা যাহার প্রকট, জ্ঞান দ্বারা যে পরিচালিত হইতে প্রস্তুত, নিরলসভাবে কর্ত্তব্যসাধনকেই ধর্ম্ম সাধনা বলিয়া যে মনে করে, ভগবানকে যে নিজের জীবনে অর্থাৎ ভাবে ও কাযে উপলব্ধি করিতে চায়। (১৮।৭১)

ভগবান আমাদের মধ্যে এই সকল গুণ জাগরিত করিয়া দিন, আমরা যেন তাঁহারই ভাবে ভাবিত হইয়া তাঁহারই কার্য্য বুঝিয়া আমাদের কৃত্য তাবৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারি অর্থাৎ গীতার ভাষায় 'সৎকর্ম্মকৃৎ' হইতে পারি (১১।৫৫), যেন অর্জ্জুনের মত বলিতে পারি—'মোহ নষ্ট হইয়াছে, স্মৃতি ফিরিয়া পাইয়াছি, সন্দেহ দূর হইয়াছে; এখন বুঝিয়াছি তোমাতেই আমাদের সত্যকার স্থিতি; সুতরাং তোমারই নির্দ্দেশমত কর্ত্তব্য করিয়া যাইব, তুমি হৃদ্দেশে অবস্থান করিয়া আমাকে পরিচালনা কর (১০।৭৩) *

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

* লেখকের অপ্রকাশিত 'গীতাসার' গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপে এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত তিলকের গীতারহস্য পাঠের সুযোগ পাইয়াছি। উহাতে আমার মতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমর্থন আছে। ঋগবেদউক্ত বাক্য দুইটি আমি তাঁহারই গ্রন্থ হইতে এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিয়াছি।

ভারতীয় সাধন প্রগতি ও পৌরাণিক শিক্ষা

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী পুরাণরত্ন

জ্ঞানের ক্রমবিকাশের দ্বারা অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা দূর করিয়া আত্মাকে স্বীয় দিব্য সত্বায় উদ্বুদ্ধ করাই সাধনার মূল কথা। নিম্ন হইতে উচ্চ, উচ্চ হইতে উচ্চতর—উচ্চতম অবস্থালাভের জন্য যে সাধনা প্রচেষ্টা তাহারই বিশিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত গতিকেই সাধন প্রগতি বলা যায়। কি অধ্যাত্ম জগতে কি ব্যবহারিক জগতে প্রগতিশীল মানব ক্রমশঃই উচ্চতর জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা জগতকে উন্নতির পথে চালিত করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও উন্নত হইতেছেন। সেইজন্য দেখা যায় জগতে যে জাতির ভাবধারা যে পথে চালিত তাহারা সেই পথেই ক্রমশঃ উচ্চতর জ্ঞানানুশীলন দ্বারা উন্নত হইয়াছেন এবং হইতেছেন। সুতরাং কি আধ্যাত্মিক কি জাগতিক সকল প্রকার জ্ঞানানুশীলনের জন্য মানবকে বহুমুখে তার সাধন অভিযান চালাইতে হইয়াছে। এবং তাহার সকল অভিযানের মূল অনধিকৃতকে অধিকার করা, অজ্ঞাতকে জানা; এবং মানবের সকল কার্য্যের মূলে যে অধিকতর সুখ, যে অধিকতর আনন্দলাভের ইচ্ছা সেই ইচ্ছাই তাহাকে সকল প্রকার অভিযানের প্রেরণা প্রদান করিয়াছে এবং করিতেছে।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনায় জানা যায় এই অভিযানের প্রথমযুগে মানব যখন জীবন সমস্যার সমাধানের উপায় নির্দ্ধারণে অনুসন্ধিৎসু হন তখন তাঁহারা অগ্নিকেই জীবন সমস্যার সমাধানের প্রধান সহায় স্বরূপ প্রত্যক্ষ দেবতারূপে উপলব্ধি করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র অথর্ব্বা ঋষি অরণি কাষ্ঠদ্বয় সংঘর্ষনে যখন অগ্নি প্রজ্জলনের জ্ঞানলাভ করিলেন তখন মানবের জীবনরক্ষার জন্য ইহার অশেষ প্রয়োজনীয়তার বিষয় জ্ঞাত হইয়া ইহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং 'অগ্নির্বৈদেবতা' বলিয়া প্রচার করিয়া সেই অগ্নিকেই জীবের পরমহিতৈষী প্রত্যক্ষ দেবতা-জ্ঞানে স্তব-স্তুতি করিতে থাকেন এবং জগতের উৎকৃষ্ট নিজেদের প্রিয় দ্রব্য সকল উৎসর্গরূপ যজ্ঞদ্বারা অগ্নির সন্তোষ বিধানে মন্ত্রাদির অনুভূতিলাভ করেন "অগ্নি মীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব মৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতবম। (ঋক ১।১।১ম) (আমি আমার সম্মুখবর্ত্তী যজ্ঞকুণ্ডস্থিত এই দীপ্তিমান অগ্নির স্তব করি। তিনি আমার এই অনুষ্ঠিয়মান যজ্ঞের ঋত্বিক ও হোতা এবং প্রভূত রত্নের আধারস্বরূপ)।

অগ্নির প্রজ্জ্বালন ও তাহার ব্যবহারের জ্ঞানলাভ করিয়া জীবন সমস্যার কথঞ্চিত সমস্যার সমাধান হইলে মানব জ্ঞানের পরবর্ত্তী বিকাশে জলের ব্যবহারের জ্ঞানলাভ করিয়া তাহার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা উপলব্ধি করেন। জলের সাহায্যে কৃষিকার্য্যাদির দ্বারা অধিকতর শান্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের উপায় পাইয়া মানব জলকেই পরমারাধ্য দেবতা জ্ঞানে স্তবমন্ত্রে তাহার তুষ্টিবিধানে যত্নবান হন। 'আপো হিষ্টা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জেদধাতন। মহেরণায় চক্ষসে।' (ঋক ৯।১।১০ম)। "হে জল সকল! তোমরা সকলে সুখের আকরস্বরূপ আমাদিগের খাদ্যের উপায় করিয়া দাও এবং যাহাতে আমরা সেই রমণীয় দর্শনকে দেখিতে পাই তাহার বিধান করিও।"

অগ্নি ও জলের জ্ঞানে উন্নীত হইয়া মানব পরে বায়ুকেই শ্বাস প্রশ্বাসরূপে জীবদেহ রক্ষা কার্য্যে প্রধান সহায়রূপে উপলব্ধি করিয়া বায়ুর শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া বায়ু বা মরুৎকে দেবতাজ্ঞানে নানা প্রকারে তাহার স্তবস্তুতি করিতে থাকেন। "বায়বা যাহি দর্শমেতে সোমা অরং কৃতাঃ। তেষাং পাহি শ্রধীহবং"। (ঋক ২।১ম)। (হে দর্শনীয় বায়ু! আইস সোমরস সমূহ উত্তম পানীয়রূপে প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি তাহা পান কর এবং আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর।)

অতঃপর মানব জ্ঞান রাজ্যে অগ্রসর হইয়া জড়জগতের সর্ব্ব বস্তুর রূপান্তর কর্ত্তা ও সর্ব্বজীবের জীবন স্বরূপ সূর্য্যকে প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া উপলব্ধি করেন। এবং তাঁহাকে 'সবিতা' বা সর্ব্বভূতের প্রসব, পালন ও সংহার কর্ত্তা জানিয়া তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত থাকেন এবং ক্রমে জ্ঞানের পরিপক্কতায় তাঁহার 'ভর্গত্ব' উপলব্ধি করেন। সূর্য্যের তেজ স্বরূপ সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী "ভর্গ"কে ধ্যানের দ্বারা আরাধনার মন্ত্রানুভূতি লাভ করেন। 'তৎসবিতুর্ব্বরেণং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ'। আমরা সেই প্রসিদ্ধ দীপ্তিশালী জগত প্রসবকারী দেব সূর্য্যের জগত প্রকাশক বরণীয় সেই ভর্গ (১) অর্থাৎ তেজকে ধ্যান করি যে ভর্গ আমাদিগের বুদ্ধি বৃত্তি সমুদায় ধর্ম্মার্থ, কাম, মোক্ষে বিনিযুক্ত অর্থাৎ প্রেরণ করেন।—"ধ্যায়েম তৎপরম্‌সত্যম সর্ব্বব্যাপী সনাতনম। যো ভর্গঃ সর্ব্বসাক্ষী শো মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়ানি নঃ। ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষেষু প্রেরয়েদ্বিনিযোজয়েৎ"। (মহানির্ব্বাণতন্ত্রম ৯।২, ১৯।২০)। প্রথম জ্ঞানের স্ফুরণে মানব এই প্রাকৃতিক অগ্নি জল বায়ু সূর্য্য প্রভৃতির বাহ্যগুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের বিষয় অনুসন্ধিৎসু হইলে এই সব প্রাকৃতিক বস্তুর বাহ্যিক শক্তির পিছনে দৈবশক্তির অধিষ্ঠানের জ্ঞান লাভ করিয়া প্রত্যেক প্রাকৃতিক বস্তুর বাহ্যিক শক্তির পিছনে এক একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন এবং তাহাদের সন্তোষ বিধান দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ কামনায় স্তবস্তুতি এবং যজ্ঞের প্রবর্ত্তন করেন প্রাকৃতিক বস্তু সমূহের যে বাহ্যিক গুণ ও ধর্ম্মের জ্ঞান ভারতীয় পরিভাষায় তাহাকে বস্তু সম্বন্ধে আধিভৌতিক জ্ঞান বলা হইয়াছে।

আধিভৌতিক জ্ঞানের ঊর্দ্ধে আধি দৈবিক জ্ঞান। প্রত্যেক বিভিন্ন বস্তুর যে বিভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অধিষ্ঠান জ্ঞান তাহাকে আধিদৈবিক জ্ঞান বলা হইয়াছে। এই আধিদৈবিক জ্ঞান লইয়াই বেদের কর্ম্মকাণ্ড।

বিভিন্ন ঋষির অনুভূত বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুর বিভিন্ন দেবতার তুষ্টির জন্য যজ্ঞবিধি এবং স্তবমন্ত্রে শত সহস্র শাখায় বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্ম বিভক্ত হইয়া বেদশাস্ত্রের বিরাট কর্ম্মকাণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে।

প্রাচীনতম বেদে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুর অধিষ্ঠাত্রী ৩৩ জন দেবতার অনুভূতি লাভ করেন—১১ জন দ্যুলোকের, ১১ জন অন্তরীক্ষের ও ১১ জন ভূলোকের অর্থাৎ এই পৃথিবীর। অগ্নিমুখে আহুতির দ্বারা এই সব দেবতাদের সন্তোষবিধানের জন্য মন্ত্রের সাধনাই প্রথম যুগের ভারতীয় সাধনের সার্থকতা বলা যায়।

বহু শতবর্ষব্যাপী যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে মানবজ্ঞান তদ্বিষয়ে চরম উৎকর্ষ লাভ করিবার পর যখন ভারতীয় সাধন প্রগতি উচ্চতর জ্ঞানের পথে ধাবিত হইল তখন ভারত বিভিন্ন শক্তির মৌলিক কারণ এক মহাশক্তির জ্ঞানের আভায পাইলেন। তাহাদের মধ্যে সৃষ্টির প্রহেলিকা সম্বন্ধে জ্ঞানের আন্দোলন সুরু হইল। তখন তাহারা প্রশ্ন করিলেন—'কো অদ্ধা বেদ কঃ ইহ প্রবোচৎ। কুত অজাতা। কুত ইয়ং বিসৃষ্টি'। কে জানে কোথা হইতে এই বিচিত্র সৃষ্টি, কে বা বলিতে পারে কোথা হইতে এ সকল জন্মিয়াছে! তখন তাহাদের মধ্যে যে জ্ঞানের স্ফুরণ হইল তত্ত্বজ্ঞ ঋষিরা সেই তত্ত্বসকল সূত্রাকারে সঙ্কলিত করিয়া ব্রহ্মসূত্র বা জ্ঞান কাণ্ডরূপ বেদের দ্বিতীয় ভাগের প্রচার করেন। বেদের প্রথম স্তরে যেখানে যজ্ঞমন্ত্র এবং বহু দেবতার স্তবস্তুতির ঋক; দ্বিতীয় স্তরে যেখানে বহু দেবতার বিভিন্ন শক্তির উদ্ভব এক মহাশক্তির জ্ঞানের জন্য চিন্তা। বিশ্বের সমুদায় জ্ঞান ও কর্ম্ম, অন্তর ও বহির্জগতের সর্ব্বময় অধিশ্বর এক বিরাটের জ্ঞানে তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মসূত্রে এই পরম বাণী প্রচার করিলেন,

---

(১) ভর্গ শব্দটী ভৃজ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ভৃজ ধাতু অর্থে পাক ও সংহার এবং প্রকাশ ও দীপ্তি। সূর্য্য হইতে সমস্ত বস্তুর পাক অর্থাৎ রূপান্তরে পরিণত হয়। তিনি স্বয়ং প্রভাকররূপে সর্ব্বদা দীপ্তিশীল ও সমুদায় প্রকাশ করিতেছেন, এবং তিনি প্রলয়কালে কালাগ্নিরূপে সপ্তরশ্মি দ্বারা জগত সংহার করেন—সেইজন্য তাঁহার নাম 'ভর্গ'।

"ভৃজিঃপাকে ভবেদ্ধাতুর্যস্মাৎ পাচয়তেহ্যসৌ। ভ্রাজতে দীপ্যতে যস্মাজ্জগচ্চান্তে হরত্যপি। কালাগ্নিরূপমাস্থায় সপ্তার্চ্চিঃ সপ্তরশ্মিভিঃ। ভ্রাজতে তৎস্বরূপেণ তস্মাদ্ভর্গঃ স উচ্যতে।"

'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগত্।
তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।'
(ঈশোপনিষদ—১ম)

জগতে চেতন অচেতন যা কিছু পদার্থ সমস্তই পরমেশ্বর দ্বারা পরিপূর্ণ, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, সেই হেতু ত্যাগ বুদ্ধি দ্বারা অনাসক্ত হইয়া ভোগ কর, কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা রাখিও না। (১) এই চরম ও পরম সত্যের উপলব্ধি করিয়া ভারতের ঋষিকুল যে বাণী প্রচার করিয়াছেন তাহা জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। এই যে বিভিন্ন শক্তির পিছনে এক মহাশক্তির অনুভূতি, বিভিন্ন দেবতার স্থলে এক মহেশ্বরের জ্ঞান, ইহাকেই ভারত আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলিয়াছেন। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানই জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ স্তর এবং ইহাই বিশ্ব রহস্যের চরম সত্য নির্ণয়ের একমাত্র উপায় বলিয়া ভারতীয় সাধকগণ এই জ্ঞানানুশীলনের জন্য বহু বিভিন্ন পথে সাধন অভিযান চালাইতে থাকিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে যাহাকে জানিলে সব জানা যায়, যাহাকে পাইলে সব পাওয়া যায় এইরূপ একটি বস্তুর জন্য অভিযানই মানুষের সকল সাধনার শেষ। সর্ব্বশাস্ত্র-সার গীতার বাণীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানবের সম্মুখে যে সত্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন তাহাতেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে—'

'অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতং জগত।'
'অহং সর্ব্বস্য প্রভবং মত্ত সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।'

'হে জ্ঞানপিপাসু মানব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আর কত জানিবে, জানিবার বিষয়ের কি অন্ত আছে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জ্ঞান আহরণের চেষ্টায় বৃথা শক্তিক্ষয় করিওনা। আমিই সকল জ্ঞানের উৎস, সকল বস্তুর মূল, আমা হইতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে আমার একাংশই এই জগত বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। (পাদশ্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতংদিবি)। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে আমাকে জানিবার চেষ্টা কর তাহা হইলেই তোমার সব চাওয়া, সব পাওয়ার, নিবৃত্তি হইবে। (যথা চৈকেন বিজ্ঞানেন সর্ব্ব বিজ্ঞানং ভবতি।)

বহুদিনের সাধনায় ভারত যে বাণী লাভ করিল তাহাকেই নানাভাবে রূপদান করিতে ভারতের পুরাণ শাস্ত্রের প্রচার হয়। দার্শনিক সৃষ্টিতত্ত্বের সোদাহরণ ব্যাখ্যাদানও পৌরাণিক শিক্ষার একটা দিক হইলেও উপনিষদ এবং গীতার এই চরম বাণীর ব্যবহারিক প্রয়োগ কৌশল এবং তাহাকে ব্যবহারিক জীবনে সাধনপ্রণালী শিক্ষাদানই পৌরাণিক শিক্ষার মূল। গীতা যাহাকে সর্ব্ব-ভূতের অন্তরাত্মা বলিয়া বাণী দিয়াছেন (১) সেই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মাকে যে মানব কর্ম্মজীবনে তার নিত্য সঙ্গীরূপে লাভ করিতে পারে সেই তত্ত্বপ্রচারই পৌরাণিক শিক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান। ইহা আমরা ভারতের সাধনায় পুরাণের দানের কথা আলোচনায় দেখিয়াছি। (২)

ভারতীয় সাধন প্রগতি বৈচিত্র্যময় উত্থান পতনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া গীতায় একটা সামঞ্জস্যের বাণী, একটা মিলনসূত্র লাভ করিয়া একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছিল ইহা আমরা ভারতের সাধনায় গীতার দানের কথায় দেখিয়াছি। (৩) ব্যবহারিক জগতে সেই গীতার বাণীকে রূপদান করাই পৌরাণিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। ঈশ্বরকে

---

(১) বাহিরের দিকে ব্যবহারিক বিচারের জ্ঞান-বিকাশের ক্রম এইরূপ হইলেও জ্ঞানরাজ্যে ভারত অতি আদিম যুগেই এই একত্বের অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বেদ প্রমাণে জানা যায়।

'ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু
রথো দিব্যঃ সসুপর্ণোগরুত্মান্।
একং সদবিপ্রা বহুধাবদ
ন্ত্যাগ্নিং যমং মাতরিশ্বানরাহু॥
ঋক্—১ম—৬৪ সূ।

(১) 'ঈশ্বরো সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেস্তিষ্ঠত্যর্জ্জুন'

(২) ভারতের সাধনায় পুরাণের দান। বিচিত্রা—মাঘ ১৩৪৩।

(৩) ভারতের সাধনায় গীতার দান—বিচিত্রা—ফাল্গুন ১৩৪২।

কেন্দ্র করিয়াই গীতার বাণী প্রচারিত। সেই ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রচার এবং মানবকে তদভিমুখী করিবার জন্য যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রয়োজন তাহাই নানাভাবে দৃষ্টান্ত দ্বারা বিভিন্ন পৌরাণিক উপাখ্যানের মধ্য দিয়া জগতে প্রচারিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে গীতার বাণীতে দেখিয়াছি সেই সর্ব্বেশ্বর পুরুষোত্তমের জ্ঞান লাভ করিলে মানব সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হন। পরে দেখি তাঁহার জ্ঞানলাভের জন্য মানবকে বিশেষ গুণ বা বৃত্তি বা সম্পদ লাভের জন্য সাধন করিতে হয়। গীতা তাহাকে দেবীসম্পদ বলিয়াছেন,—অভয়, চিত্ত সংশুদ্ধি, দান, ইন্দ্রিয় সংযম, যজ্ঞ, তপ, স্বাধ্যায়,ঋজুতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা বর্জ্জন, ভূতসমূহে দয়া, নির্লোভিতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচাঞ্চল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অন্তর্ব্বহিঃ শুদ্ধি, প্রাণী হিংসা বর্জ্জন, অনভিমানিতা—এই ষড়বিংশতি প্রকার দৈবী সম্পদের অধিকারীই সেই পুরুষোত্তমের জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন (১) এবং দম্ভ, দর্প, অহঙ্কার, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞতা এইগুলি আসুরী সম্পদ্। (২) গীতা অভয়াদি দৈবী সম্পদ মোক্ষের উপায় এবং আসুরী সম্পদ বন্ধনের কারণ বলিয়াছেন। 'দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।' বহুতর চরিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা বহুবিধ উপাখ্যানের সৃষ্টি করিয়া পুরাণ এই দৈবী ও আসুরী সম্পদের ব্যাখ্যা করিয়া লোকশিক্ষার উপাদান যোগাইয়াছে, একটি সর্ব্বজনবিদিত দৃষ্টান্ত দ্বারা পৌরাণিক শিক্ষার পদ্ধতি বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক,—মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথা সকলেই জানেন,—শুম্ভ নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয় প্রপীড়িত দেবগণের হিতার্থে ত্রিভুবন উজ্জলকারিণী অনুপম সৌন্দর্য্য গরিমার মণ্ডিতা দেবী শ্রীশ্রীচণ্ডী যখন হিমালয়ের শিখরদেশে আবির্ভূতা হইলেন তখন শুম্ভনিশুম্ভের অনুচর চণ্ডমুণ্ড দেবীর অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া আপন প্রভুকে জানাইলেন (১) মহারাজ অতীব রমনীয় কোন' এক রমণী হিমাচল সমুদ্ভাসিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। তাদৃশ অত্যুত্তমরূপ কেহ কোথাও দেখে নাই। হে অসুররাজ! আপনি একবার পরিজ্ঞাত হউন যে দেবযোগ্যা রমণীরত্ন কে এবং আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন। ইনি আপনারই যোগ্যা; কারণ জগতের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ বস্তু আপনি আহরণ করিয়াছেন কাজেই জগতের এই শ্রেষ্ঠ স্ত্রীরত্নই বা আপনি গ্রহণ করিবেন না কেন। অনুচরের বাক্যে অসুরদ্বয় জগন্মাতা চণ্ডীকে আপন ভোগের জন্য ধরিয়া আনিতে সুগ্রীবনাম দূতকে প্রেরণ করিলেন। দূতকে বলিয়া দেওয়া হইল প্রথমে অসুররাজের ঐশ্বর্য্যের উল্লেখ করিয়া দেবীকে প্রলুব্ধ করিবে (দম্ভ)। তাহাতে স্বীকৃত না হইলে বলপ্রকাশ করিয়া বাধিয়া আনিবে। "তামানয় বলাদ দুষ্টাং কেশাকর্ষণ বিহ্বলাম্।" আমি অসুররাজ আমার ত বলের অভাব নাই। (দর্প ও অহঙ্কার)। পরে উপাখ্যানভাগে দেখা যায় দেবী যখন অসুররাজের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া আসিতে চাহিলেন না এবং তাহার বলের কথা শুনিয়াও ভয় পাইলেন না বরং বলিলেন যে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া যে আমাকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে আমি মাত্র তাহারই ঘরণী হইব। 'যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যাপোহতি যো মে প্রতি বলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি।' শ্রীশ্রীচণ্ডী ৫।৬১ এই আমার প্রতিজ্ঞা। দূতমুখে দেবীর এইরূপ উত্তর শুনিয়া মহাপ্রতাপশালী শুম্ভ নিশুম্ভ মহাক্রোধান্বিত হইয়া (ক্রোধ) দেবীকে শাস্তি দিবার জন্য বহুতর সৈন্য প্রেরণ করিলেন (নিষ্ঠুরতা) (ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য যুদ্ধে লোকক্ষয় করা রাজার পক্ষে নিষ্ঠুরতার পরিচয়) পরে দেবীর সহিত যুদ্ধে

---

(১) অভয়ং সত্ত্ব সংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতঃ। দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥ অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্। দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মর্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥ তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহোনাতিমানিতা। ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ গীতা ১৬।১।২।৩

(২) দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেবচ। অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ১৬।৪

(১) তাভ্যাং শুম্ভায় চাখ্যাতা অতীব সুমনোহরা। কাপ্যাস্তে স্ত্রী মহারাজ ভাসয়ন্তী হিমাচলম্॥ নৈব তাদৃক্ ক্বচিদ্রূপং দৃষ্টং কেন চিদুত্তমম। জ্ঞায়তাং কাপ্যসৌ দেবী গৃহ্যতাঞ্চা সুরেশ্বর॥. চণ্ডী ৫।৪৩।৪৪

সৈন্যগণ পরাস্ত ও নিহত হইলে শুম্ভ নিশুম্ভ তাহাদের সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া দেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন এবং আসুরী বৃত্তির ঘোর অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া পরাজিত ও নিহত হইলেন। অজ্ঞতার পরিচয়, কারণ গীতায় যিনি পুরুষোত্তম ভগবান পুরাণে তিনিই আদ্যাশক্তি ভগবতী শ্রীশ্রীচণ্ডী, আসুরিক বলে তাঁহাকে আয়ত্ত করা যায় না অর্থাৎ আসুরী সম্পদ দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা সম্ভব নহে। অসুররাজ আসুরী সম্পদ দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করিতে গিয়া মহা অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়া নিহত হইলেন। পরে দেখা যায় অভয়াদি দৈবী সম্পদের অধিকারী দেবতাগণ ভগবতীর প্রসন্নতা ও কৃপা লাভ করিয়া সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া সিদ্ধকাম হন।

পুরাণ 'অভয়াদি' দৈবী সম্পদের অধিকারীকে দেবতাখ্যা ও অহঙ্কারাদি আসুরী সম্পদের অধিকারীকে অসুর নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাই দেবাসুর কথার তাৎপর্য্য এবং ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য আসুরী মনোবৃত্তির দমন ও দৈবী-বৃত্তির উদ্বোধনের জন্য সাধনাই পৌরাণিক উপাখ্যানের দেবাসুরের যুদ্ধকথায় পরিব্যক্ত হইয়াছে। দৈবী ও আসুরী মনোভাবের উপমায় পুরাণ দেখাইয়াছেন আসুরী সম্পদশালী অসুরগণ দম্ভ, দর্প, অহঙ্কার, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন থাকিয়া ঐন্দ্রিয়ক ভোগসুখকেই চরম জ্ঞান করিয়া তাহার আহরণে জগতকে পীড়নই করিতে থাকেন এবং তাহার ফলে অধোগতি প্রাপ্ত হন এবং দৈবী সম্পদের অধিকারী দেবতাগণ ভগবৎ কৃপায় স্বীয় কল্যাণ সাধন দ্বারা জগতেরও কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিয়া জগতের হিতকামী হইয়া জগৎপূজ্য হন। তাই পৌরাণিক উপাখ্যানে ভগবতী চণ্ডীর নিকট দেবতাদের শেষ প্রার্থনা—

'প্রণতানাং প্রসীদত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তি হারিণি।

ত্রৈলোক্য বাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব' ॥ ১১।৩৪

হে দেবি! তুমি বিশ্বের আর্ত্তিহারিণী অতএব শরণাগতের প্রতি প্রসন্না হও, তুমি ত্রৈলোক্যবাসী সকলেরই স্তুত্য তুমি সকলের প্রতি বরদায়িনী হও।

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় দেখিয়াছি জ্ঞান ও কর্ম্ম জগতের সমুদায় কার্য্যই ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বাধীনে নিয়ন্ত্রিত এবং তাহাকে জানা ও তাহার সান্নিধ্য লাভই মানবের সাধন প্রগতির চরম পরিণতি। এই তত্ত্ব শিক্ষাদানই পৌরাণিক শিক্ষার মূল। পরে ভারতীয় সাধন প্রগতির ক্রম আলোচনা করিলে দেখা যায় সেই শিক্ষাকেই সজীব ও সতেজ রাখিতে ভারতীয় সাধকমণ্ডলী যুগে যুগে স্থান, কাল ও পাত্র উপযোগী শিক্ষা-দানে লোকশিক্ষার উপাদান জোগাইয়া ভারতের সনাতন কৃষ্টি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

ভারতীয় মহাযুদ্ধের পর কুরুক্ষেত্রের শ্মশানভূমিতে দাঁড়াইয়া মোহান্ধ মানবকে ভগবান যে বাণী শুনাইয়াছেন ভারতীয় সাধকমণ্ডলী পৌরাণিক আখ্যান উপাখ্যানের মধ্য দিয়া জগতকে সেই মহান শিক্ষাকে রূপ দিয়াছেন কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধারণা শক্তির পরিবর্ত্তন হয় সুতরাং সময়োচিত ধারণা শক্তির উপযোগী ধর্ম্মশাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা না পাইলে ধর্ম্মকথা মানবের পক্ষে সহজসাধ্য হইতে পারে না। তাই দেখা যায় যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষগণ আভির্ভূত হইয়া তত্তৎ কালের মানবের ধারণাশক্তির উপযোগী করিয়া ধর্ম্মকথা ব্যক্ত করিয়া থাকেন। তাই ভারতে বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রভৃতির আবির্ভাব।

কালের নির্ম্মম আবর্ত্তে মানবের বুদ্ধিবৃত্তির পরিবর্ত্তনে ধর্ম্মতত্ত্ব যখন সংস্কারমাত্রে প্রবর্ত্তিত হয়, সত্য যখন নিষ্ক্রীয় ও নির্জ্জীব সত্যকে সাধন করিয়া তাহাতে জীবন দান করেন তখন মানব সাধারণ সেই সত্যকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ভারতীয় মহাসমরের সহস্রাধিক বৎসর পরে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবে আমরা তত্ত্বেরই প্রমাণ পাই—

'সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।

সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে' ॥ গীতা। ৬।৩১।

যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে আপনার সহিত অভিন্ন মনে করিয়া সাধনা করেন সেই যোগী যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন আমাতেই (ভগবানে) অবস্থিতি করেন। গীতোক্ত সর্ব্বভূতে সাম্য ও প্রীতির এই মহাবাণী পুরাণকার ঋষি নানাভাবে প্রচার করিলেও কালের প্রভাবে তাহা প্রাণহীন জ্ঞানে পর্য্যবসিত

হইলে ভগবান বুদ্ধদেব স্বীয় জীবনে সাধনা দ্বারা সেই নির্জ্জীব সত্যে জীবন সঞ্চার করিয়া সাধারণের গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলেন। ["অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয়ের বুদ্ধের জীবনী ও বাণী নামক গ্রন্থের ভূমিকায় এই কথা খুব স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন ; পরমেশ্বর সর্ব্বলোক চরাচরের পিতা, এই কথা কে না জানে! কিন্তু মহাপুরুষ খৃষ্ট আসিয়া পুত্রত্বকে সাধন করিলেন, আর অমনি জগদ্‌বাসী কত লোক ভগবানকে পিতা বলিয়া বাঁচিয়া গেল। ভগবান ত্রিলোকের পতি সকলেই জানেন, মহাপ্রভু চৈতন্য সেই প্রেম সম্বন্ধ সাধন করিয়া গেলেন, বৈষ্ণবগণ সেই রস হাতের কাছে পাইয়া বাঁচিয়া গেলেন। মহাপুরুষরা নির্জ্জীব সত্যগুলিকে ধরিয়া সাধনা দ্বারা জীবিত করিয়া দেন তখন সত্য আমাদের জিজ্ঞাস্যমাত্র থাকে না, তাহা অন্তরের খাদ্য এবং প্রাণের আশ্রয় হইয়া উঠে।"] কালপ্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদর্শস্বরূপ ত্যাগ, সংযম ও জ্ঞানের সাধনাপথ অনধিকারীর নিকট বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া একটা ব্যভিচারে দাঁড়াইলে সেই ব্যভিচার সমর্থনের জন্য একটি বৌদ্ধতান্ত্রিক মতের উদ্ভব দেখা যায় ফলে কাপালিক ও তথাকথিত শৈব, শাক্ত গাণপত্য বৈষ্ণব মতবাদের অসংখ্য শাখায় দেশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলে শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য সেই সব মতের সারতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলে মানব নির্জ্জীব ধর্ম্মমতে জীবনীশক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। শঙ্করের সময় বৌদ্ধাদির জ্ঞানচর্চ্চায় বৈদিক ধর্ম্মমত নষ্ট হইতে বসিয়াছিল শঙ্কর বৈদিক মত প্রকাশ দ্বারা তাহার রক্ষা করেন। যুগ পরিবর্ত্তনে শঙ্করেরও ধর্ম্মমতের জীবনীশক্তির হ্রাস হইলে যে প্রেম সম্বন্ধ প্রাচীন ভারতের পুরাণকার ঋষি শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে বহুভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন কালের আবিলতায় তাহা মানবের জ্ঞানের বিষয় থাকিলেও তাহার জীবনীশক্তি লোপ পাইয়াছিল। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য সেই প্রেম সম্বন্ধ সাধন করিয়া তাহাতে জীবন দান করিলে তাহার সাধনে মানব ভগবদ্ প্রেমের আস্বাদ পাইয়া কৃতকৃতার্থ হন।

ভারতীয় সাধনার যে সনাতন বাণী যুগে যুগে মহামানবের আবির্ভাবে মানবের গ্রহণোপযোগী নূতনরূপে নূতনভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আসিতেছে তাহার আলোচনায় দেখা যায় ভারতের সাধনার বাণীতে কখনও জগতকে উপেক্ষা করা হয় নাই তবে ধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্মের দ্বারা জগতকে ভোগ করাই ভারতের সাধনার আদর্শ। ধর্ম্মহীন বিষয় ভোগ ভারত কোনদিন অনুমোদন করেন নাই। ধর্ম্মই মানবের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। বর্ত্তমান ভারতের ঋষি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্ম্ম কথায় সাধনার যে রূপ দিয়াছেন তাহাই ভারতের সাধনার চিরন্তন রূপ—"বিষয় সুখ, বাহিরের সৌন্দর্য্য প্রভৃতি যে একেবারে বর্জ্জনীয় তাহা নহে তবে বিষয় সুখের জন্য যে ধর্ম্ম তাহা নিকৃষ্ট ধর্ম্ম, ঈশ্বরের জন্য যে ধর্ম্ম তাহাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, একদিকে সংসার একদিকে ঈশ্বর মধ্যে ধর্ম্ম, এদিকের মঙ্গলের জন্যও ধর্ম্ম আবশ্যক, ঈশ্বরের দিকে যাইবার জন্য ধর্ম্ম সহায়
ভারতের প্রাণের কথা, ইহাই ভারতীয় পৌরাণিক শিক্ষার মূল,—

যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং কলিকাতা, ২৭নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, সাহিত্য-ভবন প্রেস হইতে শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
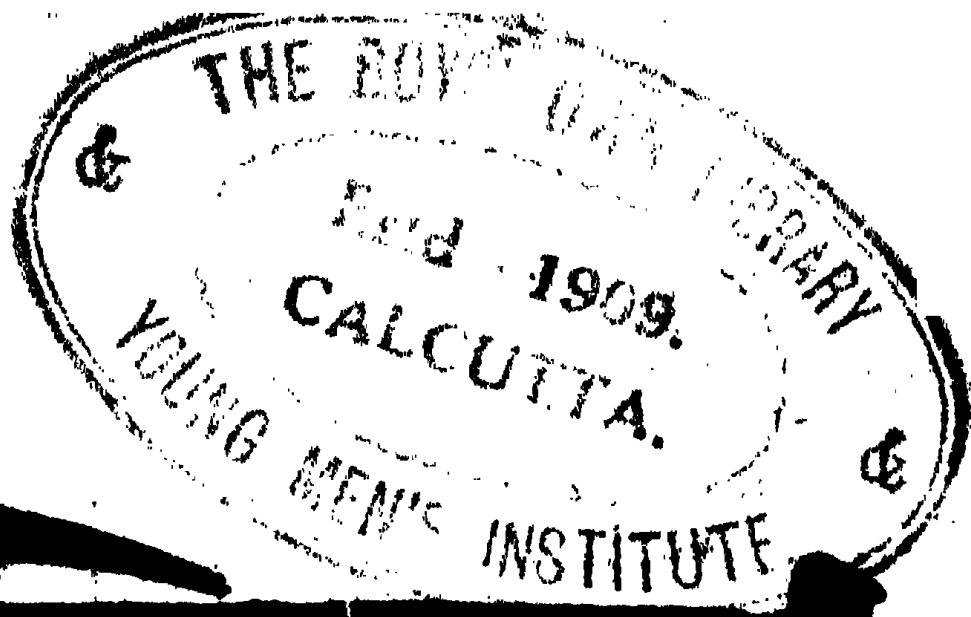
বিচিত্রা

দ্বাদশ বর্ষ, ২য় খণ্ড | বৈশাখ, ১৩৪৬ | ৪র্থ সংখ্যা

বাঙলা সাহিত্যের অন্ত্য-মধ্যযুগ

ডক্টর শ্রীমনোমোহন ঘোষ এম, এ; পি-এইচ, ডি; কাব্যতীর্থ

ষোড়শ শতাব্দী আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। এই সময়ে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী তুর্ক সুলতানগণের শাসনে বাঙলাদেশে মোটামুটি শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করিতেছিল। পুরুষানুক্রমে এদেশে বসবাস করিয়া ঐ সুলতানগণের ধর্ম্মগত গোঁড়ামী ও অসহিষ্ণুতা ততদিনে বিশেষ ভাবে কমিয়া গিয়াছে এবং তাঁহারা বাঙলার নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি অনেকটা অনুকুল হইয়াছেন, তাই বাঙলা সাহিত্যের এক সমৃদ্ধিমান নবযুগের আবির্ভাব সম্ভবপর হইল। এই যুগ অতি শুভ মুহূর্ত্তেই আরম্ভ হইয়াছিল, কারণ নবযুগারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার ইতিহাসে এমন দুইটি ব্যাপার ঘটিল যাহার ফলে প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের এই যুগটি হইল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ। ইহার প্রথমটি হইতেছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব (১৪৮৫ খৃঃ) এবং এক অভিনব প্রেমের ধর্ম্মের প্রচার। আধ্যাত্মিক সাধনা তথা সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি এক নূতন আদর্শের আবিষ্কার এবং নূতন পন্থার প্রবর্ত্তন করেন; তাহার ফলে সমগ্র বাঙালী জাতির হৃদয় এক নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে। এই ভাবধারার প্রেরণাতেই ঘটিয়াছিল বাঙলার সাহিত্যে এবং সমাজে এক অভাবনীয় যুগান্তর।

নবযুগের পরিপোষক দ্বিতীয় ঘটনাটি হইতেছে বঙ্গে মোগল অধিকারের প্রসার (১৫৭৫ খৃঃ)। মোগল বাদ-শাহগণের শাসনাধীন হওয়ায় বাঙলার জনসাধারণ ষোড়শ শতকের চরম পাদ হইতে প্রায় ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা-কৃত অধিকতর সমৃদ্ধি ও সুখ-শান্তির অধিকারী হইয়াছিল। এই হেতু ষোড়শ শতকের আরম্ভকাল হইতে অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল বাঙলা সাহিত্যের এক বিশেষ বৈচিত্র্যময় বিকাশ। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ হইতে সাহিত্যের যে ধারা বহিয়া আসিয়াছিল তৎসঙ্গে নূতন ধারাও এ যুগে সৃষ্ট হইল। এ যুগের রচিত সাহিত্যকে নিম্নলিখিত ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় যথা:—

১। বৈষ্ণব পদাবলী,

২। চরিতাখ্যান,

৩। সংস্কৃত পুরাণেতিহাসের অনুবাদ:—
রামায়ণ, ভাগবত ও মহাভারত,

৪। মঙ্গলকাব্য:—মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্ম্ম মঙ্গল,

৫। হিন্দি ভাষা হইতে অনুবাদ,

৬। লোক সাহিত্য।

এই শ্রেণী বিভাগের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা পূর্ব্ব-বর্ত্তী যুগের সাহিত্যের আপেক্ষিক দারিদ্র্য সুস্পষ্ট বুঝিতে

পারি। কারণ তখন শুধু একখানি পদাবলীর গ্রন্থ, দুইখানি পুরাণেতিহাসের অনুবাদ, একখানি মঙ্গল কাব্যের রচনা হইয়াছিল। এই চারিখানি গ্রন্থ তিনটি শ্রেণীর মাত্র প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। আর এই আলোচ্য যুগে প্রায় দুই শত লেখক ছয়টি বিভিন্ন শ্রেণীতে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে এক সৃষ্টিপ্রাচুর্য্যের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব যখন দেশে ছড়াইয়া ছিল সেই সময়ের রচনা বলিয়া এই যুগের সাহিত্যকে সাধারণতঃ চৈতন্যদেবের নামাঙ্কিত করা হয়। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী ও চরিতাখ্যানমূলক রচনানিচয়কে বাদ দিলে ষোড়শ হইতে সপ্তদশ শতক পর্য্যন্ত দুই শত বৎসরকে 'চৈতন্যযুগ' বলা খুব নির্ভুল মনে হয় না। কারণ রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবতাদির অনুবাদ চৈতন্যদেবের পূর্ব্বযুগে সুরু হইয়াছিল আর মঙ্গল কাব্যের আরম্ভ সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। এই উভয় শ্রেণীর কাব্যরচনায় পূর্ব্বযুগের প্রেরণাই কাজ করিতেছিল। হিন্দী সাহিত্য হইতে অনুবাদকে কেবল আংশিকভাবেই চৈতন্যদেবের প্রভাবের ফল বলা যায়। পূর্ব্ববঙ্গে রচিত পল্লী গীতিকার উপর চৈতন্যদেবের প্রভাব কল্পনা করা দুঃসাধ্য। কিন্তু এই সকল কারণ সত্ত্বেও বাঙলা সাহিত্যের খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীকে যে চৈতন্যযুগ বলা হয় তাহা শুধু প্রাচীন বাঙলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মনেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য নহে; এই যুগের সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় ও মূল্যবান সাহিত্য বৈষ্ণব পদাবলী এবং চরিতকাব্য চৈতন্যদেবের প্রভাবে রচিত হইয়া ছিল বলিয়া এই যুগকে খুব সঙ্গতভাবেই তাঁহার নামাঙ্কিত করা হইয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উল্লিখিত পদাবলী ও চরিত কাব্যেরই আলোচনা করা হইবে।

চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে আবির্ভূত চণ্ডীদাসও রাধাকৃষ্ণের লীলাত্মক পদাবলী রচনা করিয়া ছিলেন, কিন্তু খুব সম্ভব তৎকালে উচ্চবর্ণাদির মধ্যে শাক্ত মত প্রবল থাকায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমমূলক গীতিনিচয় দেশময় তেমন সমাদর লাভ করে নাই। ঐ গীতিগুচ্ছের অন্তর্নিহিত 'পরকীয়া বাদ'ও হয়ত তাহাদের বহুল প্রচারের বাধা জন্মাইয়াছিল! কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত নবীন বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে বাংলার মনোজগতে এক বিপ্লব উপস্থিত হইল। যে ব্রাহ্মণাদি প্রধান বর্ণের লোকেরা বিশুদ্ধ গার্হস্থ আদর্শের প্রতিকূল বলিয়া রাধাকৃষ্ণ লীলার পরকীয়াবাদকে এতদিন পরিহার করিতে ছিলেন তাঁহারা ইহাকে বৈষ্ণবতত্ত্বের আবরণে সুদৃশ্য করিয়া ধর্ম্মসাধনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করিলেন। তাহাতেই ঘটল বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের এক অভূতপূর্ব বিকাশ ও প্রচার। এই পদাবলীর রচয়িতা হিসাবে প্রায় দুইশত কবির নাম পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে তাঁহাদের দ্বারা প্রায় উনিশ হাজার পদ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এ যাবৎ ছয় সাত হাজারের বেশী পদ পাওয়া যায় নাই। এই প্রাপ্ত পদগুলিই বর্ত্তমান আলোচনার ভিত্তি। কিন্তু বিপুল পরিমাণই এই পদাবলী সাহিত্যের একমাত্র গর্ব্বের বিষয় নহে। এই 'পদাবলী সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট গীতি কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত।' উহার কোন কোনটিতে আছে প্রাচীন কবিতার (classical poetry) ভাব সংযম এবং সুপরিস্ফুট শব্দচিত্র এবং কোন কোনটিতে আছে নবীন কবিতায় (romantic poetry) ভাবোচ্ছ্বাস এবং শব্দচিত্রে রেখাপাতের বৈচিত্র্য ও শিল্পময় অস্পষ্টতা। তাহার ফলে পদাবলী সাহিত্য পড়িতে বসিলে কখনো মনে হয় সংস্কৃত কাব্য পড়িতেছি আবার কখনো মনে হয় পড়িতেছি কোন আধুনিক কবির রচনা। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে এতাদৃশ উৎকর্ষ বর্ত্তমান থাকিলেও সকল পদকর্ত্তার রচনায় কাব্যগুণ সমান ভাবে দেখা যায় না।* খুব অল্প সংখ্যক শক্তিশালী কবি ব্যতীত কেহই প্রাচীন বা আধুনিক কবিতার লক্ষণাক্রান্ত উত্তম রচনা রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এই প্রতিভাবান্ কবিগণের মধ্যে গোবিন্দ দাসের নাম সকলের আগে মনে হয়। তাঁহার রচনায় বিদ্যাপতি ও জয়দেবের প্রভাব সুস্পষ্ট হইলেও তাঁহার কয়েকটি পদ বিশ্ব সাহিত্যের স্থায়ী ভাণ্ডারে সাদরে রক্ষিত হইবার

---

* বৈষ্ণব পদাবলীর উৎকর্ষ বিষয়ক আলোচনায় উক্ত পদাবলী সাহিত্যের অদ্বিতীয় বিশেষজ্ঞ ৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মতই মুখ্যত অনুসৃত হইয়াছে। তাঁহার 'অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী'র ভূমিকা ৩৷০-৩৷৵০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

যোগ্য। সখিমুখে কৃষ্ণের নিকট বাসকসজ্জিতা রাধিকার ব্যাকুলতা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন :—

মাধব, মনমথ ফিরত অহেরা।
একলী নিকুঞ্জে ধনী ফুলশরে জর জর
পন্থ নেহারত তেরা॥
উজর শশধর দীপ পজারল
অলিকুল ঘাঘর রোল।
হনইতে হরিণী নয়নী দরশায়ই
ওহি ওহি পিকু বোল॥
তুহুঁ অতি মন্থর গমন দুরন্তর
মধু যামিনী অতি ছোটী।
সো ঘর বাহির করত নিরন্তর
নিমিখ মানয়ে যুগ কোটি॥

শেষের দুইটি চরণে রাধিকার ব্যাকুলতার যে ছবি ফুটিয়াছে তাহা কাব্য সাহিত্যে খুবই দুর্লভ। অথবা বর্ষাকালে রাধিকার অভিসার বর্ণনা করিতে গিয়া গোবিন্দ দাস যখন লিখিয়াছেন

মন্দিরবাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তহি অতি দুরতর বাদল দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার॥
হরি রহ মানস সুরধুনী পার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত॥
দশদিশ যামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার॥
ইথে যদি সুন্দরী তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দ দাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥

উল্লিখিত পদটিতে গোবিন্দদাস বর্ষা রজনীর ঘনঘটার যে উপভোগ্য চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। কিন্তু গোবিন্দদাসের উৎকর্ষ কেবল সরস বর্ণনায় নহে, ভাবসমৃদ্ধিতেও বটে। যেমন কৃষ্ণের মথুরা যাত্রার পরে রাধিকার উক্তিতে তাঁহার বিরহের যে চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাহার মত ভাবগম্ভীর রচনা পদাবলী সাহিত্যে খুব বেশি নাই।

শুনলহুঁ মাথুর চলব মুরারি।
চলতহিঁ পেখলু নয়ন পসারি॥
পালটি নেহারিতে হাম রহ হেরি।
শূনহি মন্দিরে আয়লু ফেরি॥
দেখ সখি নীলজ জীবন মোই।
পিরীতি জানায়ত অব ঘন রোই॥
সো কুসুমিত বন কুঞ্জকুটীর।
সো যমুনাজল মলয়সমীর॥
সো হিমকর হেরি লাগয়ে চঙ্ক।
কানু বিনে জীবন কেবল কলঙ্ক॥
এতদিনে বুঝল বচনক অন্ত।
চপল প্রেম থির জীবন দুরন্ত॥

এই পদে রাধিকার প্রেমের যে গভীরতা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাকে ভাব মাধুর্য্যে অপূর্ব্ব বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। গোবিন্দ দাসের আর একটি পদেও এই শ্রেণীর ভাব সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান। ঐ পদটিতে প্রিয়তমের ধ্যানে তন্ময় রাধিকা বলিতেছেন :—

যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হোই তথি-মাহ॥
এ সখি বিরহ মরণ নিরদ্বন্দ্ব।
ঐছে মিলই যব শ্যামর চন্দ॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গজ্যোতি হোই তথি-মাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহে হোই মৃদু বাত॥
যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধরশ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥

কৃষ্ণের প্রতি নিজের ব্যবহার স্মরণ করিয়া বিরহিণী

রাধিকার অনুতাপমূলক উক্তিতে গোবিন্দ দাস যে লিখিয়াছেন :—

যো মঝু চরণ পরশরস লালসে
লাখ মিনতি মুঝে কেল।
তাকর দরশন বিনে তনু জরজর
দরশ পরশ সম ভেল॥

ইহার ভাবসম্পদও খুব সুলভ নহে। গোবিন্দ দাসের রসভাবসমৃদ্ধ পদাবলীর পরেই মনে হয় জ্ঞানদাসের রচনা। তাঁহার বিরহিণী রাধা বলিতেছেন :—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে॥

এই পদাংশটিতে অনুরাগের যে গভীরতা ও তীব্রতা প্রকাশ হইয়াছে তাহা বাঙলা কাব্যসাহিত্যের বর্ত্তমান যুগেও সুলভ নয়। কালিন্দীকূলে কৃষ্ণকে দেখিয়া অনুরাগিণী রাধার অবস্থা বর্ণনা করিয়া জ্ঞানদাস যে পদ লিখিয়াছেন তাহা অতি সহজ সরলভাবে উচ্চাঙ্গের রস সৃষ্টি করিয়াছে। রাধিকা বলিতেছেন :—

আলো মুঞি জানিলে যাইতাম না কালিন্দীর কূলে।
চিত হরিয়া নিল কালিয়া নাগর ছলে॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনবনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া ফুকরে পরাণ॥
চন্দন চাঁদের মাঝে মৃগমদ ধাঁধা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলী রৈল বাঁধা॥

স্বপ্নে রাধিকার কৃষ্ণসন্দর্শনের যে চিত্র জ্ঞানদাস আঁকিয়াছেন তাহাও রস এবং ভাবে অনবদ্য। রাধা বলিতেছেন—

মনের কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কার নই॥

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে,
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুর বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝি ঝি ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিনু হেন কালে॥

এই পদে জ্ঞানদাস বর্ষণমুখর শ্রাবণ-রজনীতে সুখসুপ্তা রাধিকার স্বপ্নদর্শনের যে সরস চিত্র আঁকিয়াছেন তাহার তুলনা খুব বিরল।

জ্ঞানদাসকৃত নিম্নোদ্ধৃত ভাবসম্মিলনের পদটিও বাঙলা গীতিকাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন। রাধিকা বলিতেছেন :—

বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ও দুটি চরণ
সদা লইয়া রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি।
নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুমি সে কালিয়া চাঁদা।
জ্ঞানদাসে কয় তোমার পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বাঁধা।

প্রেমবৈচিত্ত্য বর্ণনায় জ্ঞানদাস কৃষ্ণের যে গভীর অনুরাগের ছবি আঁকিয়াছেন তাহা সহজেই চিত্তকে সরস করিয়া তোলে। রাধিকা বলিতেছেন :—

সই কিবা সে পিরীতি তার।
আলস করিয়া নারি পাসরিতে
কি দিয়া সুধিব ধার॥
আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া,
পীত বাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম॥

আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখন যে দিকে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া
তখন সেদিকে ধায়॥

গোবিন্দদাস জ্ঞানদাসের পর যে পদাবলীকারের নাম করিতে হয় তিনি হইতেছেন বিখ্যাত চণ্ডীদাস। এই চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রণেতা (বড়ু) চণ্ডীদাস হইতে পৃথক ব্যক্তি। দীর্ঘকাল যাবৎ বাঙলার জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল যে ইনিই প্রাক্-চৈতন্য যুগের চণ্ডীদাস; কিন্তু ইঁহার রচনায় আধুনিক ভাষা এবং চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণব তত্ত্বের প্রভাব দেখিয়া ইহাকে চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের কবি মনে করা দুঃসাধ্য।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম?
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমন যোগিনী পারা॥

এবং

ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥
কোন বিধি সিরজিল সোতের শেওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বঁধু বলি॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥

ইত্যাদি সুপরিচিত উত্তম পদ ও পদাংশগুলি এই দ্বিতীয় চণ্ডীদাসের রচনা। পদাবলী সাহিত্যের যা কিছু গৌরব ও খ্যাতি তাহা এই কয়জন উচ্চ শ্রেণীর পদকর্ত্তার রচনার জন্যই সম্ভবপর হইয়াছে। অবশিষ্ট পদাবলীরচয়িতাগণ ভাষা, রীতি এবং ছন্দোমাধুর্য্যে অনেক উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়া থাকিলেও তাঁহাদের রচনা সকল শ্রেণীর রসজ্ঞের মনোরঞ্জন করিবার মত নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী কবি জয়দেব, (বড়ু) চণ্ডীদাস এবং মৈথিল কবি বিদ্যাপতির দ্বারা অতিমাত্র প্রভাবিত হওয়ার ফলেই প্রধানতঃ তাঁহাদের মৌলিকতার অভাব এবং তজ্জনিত ন্যূনতা ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বাঙলার গীতি কাব্যের ভাণ্ডারে তাঁহাদের দান নগণ্য নহে। উত্তরকালে একজন বাঙ্গালী কবির গীতিকাব্য যে বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে শ্রেষ্ঠ সম্মানের অর্ঘ্য লাভ করিয়াছে এই পদাবলী সাহিত্যের সৃষ্টি প্রাচুর্য্যের মধ্যেই তাহার প্রথম অঙ্কুর অন্বেষণ করিতে হইবে। বাঙলা ভাষাতে যে বহু বিচিত্র রসস্ফূর্ত্তির সাধনরূপে ব্যবহৃত হইবার শক্তি বিদ্যমান আছে সর্ব্বপ্রথমে তাহার সন্ধান দেন বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতাগণ।

পদাবলীর পরেই চরিতকাব্য মধ্য যুগের বাঙলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অপূর্ব্ব দান। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব-পর্য্যন্ত যা কিছু বাঙলা সাহিত্য পাওয়া যায় তাহা হয় গীতিকাব্য, নয় মঙ্গলকাব্য, নয় সংস্কৃত পুরাণাদির মর্ম্মানুবাদ। বাঙলা সাহিত্যের এই বৈচিত্র্যহীনতা নিরাকরণ সর্ব্বপ্রথমে সম্ভবপর হইল 'চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে। অশেষ-লোক-পূজিত চৈতন্য দেবকে আশ্রয় করিয়াই বাঙলার সর্ব্বপ্রথম চরিত-কাব্য রচিত হইল। এই গ্রন্থের নাম 'শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত।' বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ইহার রচয়িতা। ইনি আনুমানিক ১৫১০খৃঃ বা ১৫ ১৫খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থে তিনটি খণ্ডে বাষট্টি পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস ও নীলাচল গমন পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। কেহ কেহ পরবর্ত্তী কালে পৃথকভাবে প্রাপ্ত তিনটি অধ্যায়কেও এই গ্রন্থের অঙ্গীভূত বিবেচনা করিতে চাহেন কিন্তু তাঁহাদের মত ঐতিহাসিক সমালোচকের দৃষ্টিতে নির্ভুল বিবেচিত হয় নাই।

চৈতন্যভাগবত ভক্ত কবির রচনা। চৈতন্যদেবের অবতারত্বে বিশ্বাসবান কবি তাঁহার নরলীলাকে দেবলীলায়

আকার দান করিতেই এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। কবির এই বিশ্বাস অতিশয় আন্তরিক ছিল বলিয়া তাঁহার রচনার মধ্যে একটা বিশেষ প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণ বর্ত্তমান। কাব্যাংশেও উহা একান্ত হীন নহে। চৈতন্য দেবের পঠদ্দশা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বেশ সুন্দর হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে বাঙলা দেশে বিদ্যাচর্চ্চার মধ্যে একটা প্রচণ্ড সজীবতা ছিল। চতুষ্পাঠীর বিদ্যার্থিগণ সুযোগ পাইলেই প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত বা বিদ্যার্থীকে অধীত শাস্ত্রের কূট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া নাকাল করিবার চেষ্টা করিতেন। নিমাই পণ্ডিতও পঠদ্দশায় এই শ্রেণীর বাদার্থী ছিলেন। বড় বড় বৈষ্ণব পণ্ডিতকেও তিনি প্রশ্নবাণে বিব্রত করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। বৃন্দাবন দাস লিখিতেছেন :—

কৃষ্ণ কথা শুনিতেই সবে ভালবাসে।
ফাঁকি বিনু প্রভু কৃষ্ণ কথা না জিজ্ঞাসে॥

* * *

মুকুন্দ যায়েন গঙ্গা স্নান করিবারে।
প্রভু দেখি আড়ে চলেছিলা কত দূরে॥
প্রভু দেখি জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের স্থানে।
এ বেটা আমারে দেখি পলাইল কেনে॥

* * *

এ বেটা পড়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র।
পাঁজি বৃত্তি টীকা আমি বাখানি সে মাত্র॥
আমায় সম্ভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন।
অতএব আমা দেখি করে পলায়ন॥

বয়োজ্যেষ্ঠ মুরারি গুপ্ত (যিনি উত্তরকালে চৈতন্য দেবের ভক্ত হইয়াছিলেন) নিমাই পণ্ডিতের সহিত এক টোলে পড়িতেন। কিন্তু অন্য বিদ্যার্থীরা মানিয়া লইলেও নিমাই কিছুতেই তাঁহার বয়স বা বিদ্যার জ্যেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেন না। তাহার ফলে মুরারির সহিত তাঁহার তর্ক বিবাদ লাগিয়াই থাকিত। মুরারি একদিন তর্কে হারিয়া গেলে—

প্রভু বলে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়।
লতাপাতা নিয়া গিয়া নাড়ী কর দড়॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি।
কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥
মনে মনে চিন্ত তুমি কে বুঝিবে ইহা।
ঘরে যাহ তুমি রোগী দৃঢ় কর গিয়া॥

স্থানে স্থানে এইরূপ সরস চিত্রের অবতারণা দ্বারা চৈতন্য ভাগবত কাব্য শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে, অন্যথায় ইহাকে কেবল ঐতিহাসিক রচনা হিসাবেই গণ্য করা চলিত। চৈতন্য দেবের জীবন চরিতের উপাদান হিসাবে ইহা বিশেষ মূল্যবান।

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতের পরে লোচন* দাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের' নাম করিতে হয়। লোচন দাস আনুমানিক ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোনও সময়ে দেহত্যাগ করেন। তাহার গ্রন্থ চারিখণ্ডে বিভক্ত। এই চারি খণ্ডের মধ্যে চৈতন্য দেবের বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর প্রতাপরুদ্র রাজার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই চৈতন্য মঙ্গল কাব্যাংশে চৈতন্য ভাগবত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। চৈতন্য দেবের নীলাচলে গমনের প্রাক্কালে তাঁহার জন্য ভক্তগণের ব্যাকুলতার যে চিত্র লোচন দাস আঁকিয়াছেন তাহা বেশ সরস ও হৃদয়স্পর্শী।

শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ।
প্রভুরে কহিতে কিছু করে অনুবন্ধ॥
স্বতন্ত্র ঠাকুর তুমি মো সব অধীন।
দীন দুরাচার পাপী তাহে ভক্তিহীন॥
কি বলিতে পারি প্রভু করিলা সন্ন্যাস।
এখন ছাড়িয়া যাহ নিজ সব দাস।
একেশ্বর কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন চাহিবে কাহাতে॥

* * *

উপমা দিবার নাহি ত্রৈলোক্য ভিতর।
তোমার নিষ্ঠুর বাণী জগত কাতর॥
এমত করিতে প্রভু না জুয়ায় তোরে।
আপনে রুইয়া বৃক্ষ কাট কেনে মূলে।
যে যায় তাহারে লহ সংহতি করিয়া।
নহে বা মরিব সঙ্গে আগুনে পুড়িয়া॥

হের দেখ তোর মাতা শচী অনাথিনী।
সহিতে না পারি উহার বিনানিঞা বাণী ॥
বিষ্ণু প্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে।
শূন্য হৈল নবদ্বীপ নগর বাজারে ॥
শূন্য যেন লাগে সর্ব্ব বৈষ্ণবের ঘর।
সভারে সভার বাড়ি যোজন অন্তর ॥

চৈতন্য জীবনীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক এবং সুলিখিত গ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।' এই গ্রন্থেই মহাপ্রভুর জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসরের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। ইহা কেবল যে মহাপ্রভুর উত্তম জীবন চরিত মাত্র তাহা নহে। তাঁহার প্রবর্ত্তিত নবীন বৈষ্ণব ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্বের আধার হিসাবেও এই গ্রন্থ অদ্বিতীয়। বাঙলা ভাষায় পয়ার ছন্দের ভিতর দিয়া যে কত উচ্চাঙ্গের দার্শনিক তথ্য প্রকাশিত হইতে পারে এই গ্রন্থ সাবধানে ও নিপুণ ভাবে আলোচনা করিলে তাহা বুঝা যাইবে।

চৈতন্য চরিতামৃতের রচনা কাল লইয়া বহু মতভেদ আছে। খুব সম্ভব এই রচনা কাল নির্ভুলভাবে কদাপি নির্ণীত হইবে না। • তবে প্রাপ্ত মালমশলা হইতে এই মনে হয় যে উহা সম্ভবত খৃষ্টীয় ১৫৭৫ বা ১৫৮০ সালের কাছাকাছি সময়ে রচিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসাবেও চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ অমূল্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর মত বৃদ্ধ ভক্ত এবং পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ভক্তের রচনা বলিয়া ইহার প্রামাণ্য খুব অবিসংবাদিত। কিন্তু এমন উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াও তিনি ছিলেন বিনয়ের অবতার। পূর্ব্ববর্ত্তী চৈতন্য-চরিতাখ্যায়ককে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া গ্রন্থ পরিসমাপ্তিতে তিনি লিখিতেছেন :—

বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥
চৈতন্য লীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ ॥
মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুই বিষয় লালস।
বৈষ্ণবাজ্ঞা বলি করি এতেক সাহস ॥

এবং কাব্যের ফলশ্রুতিতে তিনি যে বিনয় দেখাইয়াছেন তাহা অতি অপূর্ব্ব। তাঁহার খাঁটি বৈষ্ণবতত্ত্ব এস্থলে যেরূপে খুব সহজে প্রকাশিত হইয়াছে এমন আর কোথায় ও নহে। কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন :—

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যাঁ সবার চরণ কৃপা শুভের কারণ ॥
চৈতন্য চরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা মুঞি করি পানে ॥

কিন্তু চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের অসাধারণ উপাদেয়তা এবং কবিরাজ গোস্বামীর পাণ্ডিত্য ও নির্ম্মল চরিত্রের কথা স্মরণ করিলে ঐ গ্রন্থের পাঠক মাত্রেই তাঁহার এই দীন উক্তিতে কুণ্ঠা বোধ করিবেন।

আদি, মধ্য এবং অন্ত্যলীলায় মোট বাষট্টি পরিচ্ছেদে চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকার চৈতন্যদেবের জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিকরূপে বেশ সহজ ভাবে তৎপ্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিবিধ তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বহু দুরূহ তত্ত্বের সমাবেশ-সত্ত্বেও চৈতন্যচরিতামৃতের রচনা প্রাঞ্জল এবং সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন।

জয়ানন্দ কৃত 'চৈতন্যমঙ্গল' চৈতন্য চরিতের অপর একখানি গ্রন্থ। এই চরিত কথা কাব্যাংশে বা তত্ত্ব ব্যাখ্যায় পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থত্রয়ের সঙ্গে তুলনায় হীন বিবেচিত হইবে। উহার খুব সামান্য অংশেই সাহিত্যিক উৎকর্ষ বর্ত্তমান।

'গোবিন্দ দাসের কড়চা' নামক একখানি গ্রন্থও চৈতন্য জীবনীর একাংশ অবলম্বনে রচিত। কিন্তু এই গ্রন্থের প্রামাণ্যে অনেকেই বিশেষভাবে সন্দিহান। তাই উহাকে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক গোবিন্দদাসের রচনা মনে করা অসম্ভব। বিশেষজ্ঞের মতে উহা অষ্টাদশ শতকের পূর্ব্বের রচনা নহে।

আলোচিত চরিত্রগ্রন্থ কয়েকখানি ব্যতীতও এই যুগে অদ্বৈত গোস্বামীর জীবনচরিত অবলম্বনে ঈশান নগরের 'অদ্বৈত প্রকাশ' এবং নব হরিদাসের 'অদ্বৈতবিলাস' রচিত হইয়াছিল কিন্তু এই গ্রন্থদ্বয়ে সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য খুব সুলভ নহে। অবশ্য ইতিহাস হিসাবে এই গ্রন্থদ্বয় মূল্যবান্।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

বিজয়িনী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[ইন্দো-চীন দেশে এঙ্কোর-ভাটের মন্দিরের সম্মুখভাগ। চারি পার্শ্বের সরলোন্নত নারিকেল এবং গুবাক বৃক্ষরাজির মধ্যে বিচিত্র ও বিশাল মন্দির। অদূরে একটি বৌদ্ধ বিহার। দুই তিনজন বৌদ্ধ ভিক্ষুবেশী লোক দাঁড়াইয়া কি কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। আনন্দস্বামী, রেবা এবং এখানকার ফরাসী সংরক্ষক প্রবেশ করিলেন। ভিক্ষুগণ কতকটা উত্তেজিত ভাবে বোধহয় ইহাঁদের সম্বন্ধেই কিছু বলাবলি করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিল।]

রেবা। বাবা! বাবা! দেখুন এখানের সমস্তই যেন আমার ভারতবর্ষের প্রতীক! অন্যান্য দেশে ইউরোপীয় সভ্যতা যেমন প্রাচ্য সভ্যতার ঘাড়ে চেপে বসেছে এখানে তা পারে নি।

আনন্দস্বামী। কিন্তু মা এর আর একটা দিকও দেখবার আছে। সময় মত নূতনের সঙ্গে একটা আপোষ করে না নিতে পারলে তার ফল সুবিধাজনক হয় না। জাপান নূতনের সঙ্গে মিশে গিয়ে এ যুগের শক্তিমদমত্তায় আজ জগতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। চীন তা পারে নি। তার ফলে—

(ভিক্ষুদের মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া আসিয়া আনন্দস্বামীকে অভিবাদন জানাইয়া সাগ্রহে বলিলেন।)

ভিক্ষু। স্বাগত! স্বাগত! তথাগতের দেশের সম্মানিত অতিথি!

ফরাসী ভদ্রলোক। এই দেখুন, এই সেই জগতে অতুলনীয় পুরাতন কম্বোজের সুবিখ্যাত মন্দির আপনাদের সম্মুখে।

রেবা। বাবা! কি অপূর্ব্ব এ মন্দির! সত্য সত্যই যেন এর তুলনা নেই। কিন্তু এ সব যেন চোখে দেখা যায় না। একদিন হিন্দু জাতি এই সব মহৈশ্বর্য্যের ভাণ্ডার অর্দ্ধ জগতে স্থাপন করেছিল। শুধু ধর্ম্মের জগতেরই নয়, তাঁদের কর্ম্মজগতের দানও কি অসামান্য। আর আজ? আজ, সুধু জগতের দরবারেই নয়, নিজের ঘরেও সে ভিখারীর অধম। সে—সে, উঃ, এ কি পরিবর্ত্তন? এমন কেন হয়?

স্বামীজী। মা জগতে যে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য মহাকাল আমাদের এমনই করে মধ্যে মধ্যে সজাগ করেন। কেন মা, তুমি এমন শোকাচ্ছন্ন হচ্ছো? "ক্লৈব্যং মাস্ম গম—" গীতার সেই মহাবাণী স্মরণ করো। অতীত আমাদের হারাণ স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে। তাই ত অতীত চিহ্নের প্রয়োজন। হিন্দুজাতির এই সব অতুলনীয় কীর্ত্তিকলাপ দেখে গৌরবান্বিত হও। মনে বল এনে, জোর করে ভাবো, যা ছিল তা আমরা আবার ফেরাবো। ভারত একদিন ধর্ম্মচক্রের সহায়তায় কর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করতে দিগ্বিদিকে বেরিয়ে পড়েছিল। তার বিজয় যাত্রাকে ধর্ম্মবলই সর্ব্বত্র সাফল্যমণ্ডিত করেছিল। আজ তার মস্তক সেই ধর্ম্মমুকুট বিহীন হয়েছে। আজ ধর্ম্মরূপী নারায়ণকে সে ভুলে গেছে।- তাই বিজয়লক্ষ্মী তাকে ত্যাগ করেছেন। তোমরা মা এ যুগে সম্মিলিত চিত্ত মন নিয়ে প্রাণপণে ক্ষীরোদশায়ী যোগনিদ্রামগ্ন নারায়ণের আরাধনা করে তাঁকে জাগ্রত করতে চেষ্টা করলে সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীকেও লাভ করতে পারবে। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। পূর্ব্বপুরুষদের অতীত গৌরবকাহিনী দৃঢ় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে এই পথের অভিমুখী হতে বলছে।

রেবা। (আনন্দস্বামীর পদধূলি লইয়া অশ্রুপূর্ণকণ্ঠে)

তাই বলুন যেন কিছু করে যেতে পারি, না হলে এ মানুষ জন্মের কোন সার্থকতা হবে না।

(আনন্দস্বামী সস্নেহে তাহার মাথায় হাত রাখিলেন।)

ভিক্ষু। যদি আপনার আপত্তি না থাকে আপনাকে একবার আমাদের বিহারে আস্‌তে হবে।

স্বামীজী। নিশ্চয়, নিশ্চয়। তথাগতের দর্শন সৌভাগ্য হইতে আমি কি নিজেকে বঞ্চিত করে যেতে পারি? আমার মার সেই সঙ্গে মনে পড়ে যাবে ধন জন রাজ্য ঐশ্বর্য্য কত তুচ্ছ, কত ভঙ্গুর তা জানতে পেরেই ঐ মহামানব তাঁর তরুণবয়সে একদিন সব ফেলে অবিনশ্বর শান্তির সন্ধান দিতে বাহির হয়েছিলেন।

রেবা। (সলজ্জে) না বাবা। যাই বলুন, যশোধর্ম্মপুরের রাজপ্রাসাদে দেখার পর থেকে আমার মনটা এত ভেঙ্গে পড়েছিল কিছুতেই যেন আর মনকে স্থির করতে পারছিলাম না। আচ্ছা ঐ তোরণদ্বারের বিচিত্র চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা আজ চারিদিকে চেয়ে ওর ভীষণ পরিণাম দেখে কি রকম কষ্ট অনুভব করছেন ; বলুন ত ?

স্বামীজী। (সহাস্যে) তোমার চেয়ে বেশী নয়! মা! ভারতবর্ষের অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তিকায় অনেক চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ এর চেয়ে বেশী করে দুঃখ করতে পারতেন। তবে এখানকার চতুর্ম্মুখ আজ মড়া আগলে বসে থাকার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁদের আর সে দুর্ভোগটা করতে হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে সৎকারকার্য্য সমাধা হয়ে গেছে। এই যা তফাৎ।

রেবা। তা সত্যি বাবা। দুঃখ করবার কিছু নেই। (ফরাসী তত্ত্বাবধায়কের প্রতি) আচ্ছা, এখানের ইতিহাস আমি কিছুই জানি না। এখানকার হিন্দু সাম্রাজ্য কোন সময় স্থাপিত হয়েছিল ? আমায় দয়া করে একটু বলবেন ?

ফরাসী তত্ত্বাবধায়ক। চীনদেশের ইতিহাস থেকে জানতে পারা গিয়াছে যে খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভেই কৌণ্ডিন্য নামে একজন কম্বোজে হিন্দুরাজ্যের ভিত্তি স্থাপনা করেন। তখন অবশ্য কম্বোজ নামের প্রচলন হয়নি। তার নাম ছিল তখন "ফুনান"। চীনা ভাষায় তার অর্থ উচ্চ স্থান।

রেবা। হ্যাঁ বাবা, সেই কৌণ্ডিন্য নিশ্চয়ই বাঙ্গালী ছিলেন, তাম্রলিপ্তি থেকে সমুদ্রপথে এসেছিলেন ?

আনন্দস্বামী। (স্বগতঃ) ত্রিগুণা এখনও সেই বাঙ্গালী স্বপ্ন ভোলেনি নাকি ? (প্রকাশ্যে) তা কি নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না ? হতেও হয়ত পারে।

ফরাসী তত্ত্বাবধায়ক। প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের কয়েক শতাব্দী পরে আর একদল হিন্দু ঔপনিবেশিক কম্বোজ রাজ্যের সৃষ্টি করেন। কম্বোজ প্রথমে "ফু-নানে"র আধিপত্য স্বীকার করত। পরে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে কম্বোজের রাজা চিত্রসেন মহেন্দ্রবর্ম্মণ "ফু-নান" জয় করে দুই রাজ্য সম্মিলিত করেন।

রেবা। তিনি বোধ হয় ভারতবর্ষের লোক ছিলেন ?

ফরাসী তত্ত্বাবধায়ক। তা বলা যায় না। তবে হিন্দু যে ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁর সময়ের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে সেইটিই কম্বোজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন লেখ।

রেবা। সেটি বোধ হয় আমরা দেখব ?

ফরাসী তত্ত্বাবধায়ক। এই সময় থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত হিন্দুরাজারা অব্যাহতভাবে কম্বোজ শাসন করেন। এই সপ্ত শতাব্দীর কম্বোজের ইতিহাস তাহার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল যুগ। তারপর থাই নামক এক বর্ব্বর জাতির আক্রমণে কম্বোজের হিন্দুরাজত্বের অবসান হয়।

রেবা। আমরা ভিতরে দেখতে যাব ত ?

ফরাসী তত্ত্বাবধায়ক। হাঁ নিশ্চয়ই।

(সকলে অগ্রসর হইলেন।)

২য় দৃশ্য

[বড়বদুরের মন্দিরের সম্মুখ। আনন্দস্বামী, রেবা এবং কতিপয় শিষ্যবর্গ।]

আনন্দস্বামী। এই দেখ মা। তোমার ভারতের আর এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তির নিদর্শন। এই দ্বীপময় ভারতে পর্য্যটন করে তুমি কি এক অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা লাভ করলে, এখন বুঝতে পারছ ? তুমি আমায় বলেছিলে অষ্ট্রেলিয়ায় না গিয়ে আপনি কতকগুলা ছোট ছোট দ্বীপে যেতে চাইছেন কেন ? কেন আসতে চেয়েছিলাম আজ বোধহয় তোমার আর সে সংশয় নেই ?

রেবা। (বিমুগ্ধচিত্তে অপূর্ব্ব শিল্প চাতুর্য্যের নিদর্শন মন্দিরগাত্রের প্রতি চাহিয়া দেখিয়া)

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥"

অর্জ্জুনের এই কথার তাৎপর্য্য আজ আমি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি, বাবা। ইউরোপ আমেরিকার ঐশ্বর্য্যসম্ভারে আমার মনকে মোহাবিষ্ট করেছিল। কিন্তু অতীতকে কি আবার ফিরিয়ে আনা যায়?

আনন্দস্বামী। অহরহ ঘূর্ণায়মান চক্রের চিরস্থির থাকা সম্ভব কি? অতীত গৌরবের স্মৃতি মনে জাগরূক রেখে সাধনা কর। ফললাভ অনিবার্য্য। যেদিন তুমি নয়, আমি নয় কোটি কোটি ভারতবাসী সমকণ্ঠে বলতে পারবে—

"অবনত ভারত চাহে তোমারে
এস সুদর্শনধারি মুরারে!

সেদিন সেই কোটি কণ্ঠের আহ্বান কখনই উপেক্ষিত হবে না।

রেবা এবং তৎসঙ্গীগণ। জয় নবীন ভারতের জয়। জয় আনন্দস্বামী মহারাজের জয়।

৩য় দৃশ্য

[বলিদ্বীপের একটি নৃত্যসভার দৃশ্য। সপারিষদ রাজা সভার মধ্যে আসীন। তিনটী সুপরিচ্ছদধারিনী বালিকা নৃত্য করিতেছিল। ব্যস্তে সাংবাদিক আসিয়া রাজাকে কিছু জ্ঞাপন করিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল। ওলন্দাজ রাজপ্রতিনিধির সহিত আনন্দস্বামী, রেবা প্রভৃতি প্রবেশ করিলেন। পরস্পরের অভিবাদন এবং প্রত্যভিবাদন]

রাজা। আসুন আসুন। ভগবান তথাগতের স্বদেশবাসি এবং স্বদেশবাসিনিগণ! আমাদের স্বদেশীয় প্রথায় আপনাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য আমার গৃহকন্যাদের দ্বারায় এই উৎসব সভার আয়োজন করেছি। আপনারা আসন গ্রহণ করে কিছুক্ষণ দর্শন করলে চরিতার্থ হ'ব।

(সকলের উপবেশন। নৃত্যগীতাদি চলিতে লাগিল।)

চতুর্থ দৃশ্য

[বিভূতির লাইব্রেরী ঘর। কতকগুলি পুস্তকের আলমারী। দেওয়ালে বিভূতির স্বহস্ত অঙ্কিত কতকগুলি ওয়াটারকলার এবং অয়েল পেণ্টিং করা চিত্র বিরাজিত। চিত্রনিম্নে নাম লেখা—"উষা," "তপস্যা", "শরৎ", "বসন্ত", "বনশ্রী", "শিশির", ইত্যাদি। প্রত্যেকটি চিত্র বিভিন্ন ভঙ্গীতে রেবাকে আদর্শ করিয়া অঙ্কিত। বিভূতি চেয়ারে বসিয়া বই পড়িতেছিল। সামনের দিকে চাহিতেই "উষা" চিত্রটীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল। উঠিয়া গিয়া দেখিতে দেখিতে]

বিভূতি। কাপড়ের রংটা একটু যেন fade হয়ে আসছে।

(রুমাল দিয়া ঝাড়িতে ঝাড়িতে)

তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা?

(বলিতে বলিতে আর একখানি ছবির দিকে চাহিল; নিকটে গিয়া দাঁড়াইল এবং পূর্ব্ববৎ ঝাড়িতে ঝাড়িতে)

একদিন এই পথে চলেছিলে আমাদের পাশে
বক্ষ তব দুলিত নিঃশ্বাসে।
অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব, কত গানে কত নাচে রচিয়াছে
আপনার ছন্দ নব নব
বিশ্ব তালে রেখে তাল
সে যে আজ হায় কত কাল।
এ জীবনে আমার ভুবনে
কত সত্য ছিলে
মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপার তুলিকা ধরি রসের মূরতি।
সে প্রভাতে তুমিই তো ছিলে
এ বিশ্বের বাণী মূর্ত্তিমতী।

(পাশ ফিরিতেই বিভূতির চোখে পড়িল—তপস্যানিরতা উমার অনুকরণে আঁকা রেবার পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। পাদপাঠের উপর ছবিটি এমন ভাবে রাখা ছিল যে হঠাৎ দেখিলেই মনে হয় যেন রেবা সত্যই তপস্যায় বসিয়া আছে। সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিভূতি সহসা নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল।—ছবির দুই পাশে হাত ছড়াইয়া মুখের দিকে তাকাইয়া)

বিভূতি। রেবা! তপস্যা কি তোমার শেষ হবে না? আর কতদিন, বল কতদিন এ ব্যর্থ প্রতীক্ষা করব? ফিরে কি তুমি আসবে না? (ছবির ষ্ট্যাণ্ডের উপর মাথা রাখিল) আমার তপস্যা কি তোমার টলাতে পারল না? কিন্তু একি

প্রলাপ বক্‌ছি? আজ কোথা তুমি? কোন স্বর্গে? অথবা—উঃ, ভাবতে পারি না! মনে করতেও সমস্ত গায়ে আগুন জ্বলে উঠে! কোন নরকের দ্বারে হয়ত—(অবসন্নভাবে মাথা নত করিল। দুই চোখে জল ঝরিয়া পড়িল।)

(দ্বারের পরদা একটু তুলিয়া পিটার বিস্মিত হইয়া সরিয়া গেল এবং বাহির হইতে বলিল।)—মিঃ চৌধুরী! ভিতরে আসতে পারি কি?

(বিভূতি চমকাইয়া উঠিল। দ্রুতপদে বসিবার চেয়ারের কাছে গেল। রুমাল দিয়া চোখের জল মুছিয়া চেয়ারে বসিয়া বইখানা হাতে লইল।) —আসুন।

পিটার। (হস্তস্থিত সংবাদপত্র দেখাইয়া)—এই দেখুন। আজ আবার বম্বে টাইমস কি লিখেছে।

বিভূতি। (স্বগতঃ) এ জীবনে, আমার ভুবনে

কত সত্য ছিলে।

(প্রকাশ্যে)—কই দেখি, দাও।

(পিটার কাগজখানা তাহার হাতে দিতে গেল। বিভূতি কাগজ লইবার জন্য একবার হাত বাড়াইয়া পরক্ষণে হাত সরাইয়া লইল।)—আচ্ছা। তুমিই পড়।

(স্বগতঃ) এক সাথে পথে যেতে যেতে

রজনীর আড়ালেতে

তুমি গেলে থামি।—(কবি সত্যই অন্তর্যামী।)

অজানার সুরে

চলিয়াছি দূর হতে দূরে।

মেতেছি পথের প্রেমে

তুমি পথ হতে নেমে

যেখানে দাঁড়ালে

সেখানেই আছ থেমে।

পিটার। (কাগজ হইতে পড়িল) "The learned editor of the "Paritrata" has again proved before us the fact, if any such proof was at all needed, that a renegade who abandons the faith of his fore-fathers, has nothing but foul invectives to hurl with much vehemance against the religion and society to which he formerly belonged. His so-called reply to our former article is nothing but a vile acrimonious attack against Hinduism and has very little to do with argument or reason. He seems to think that......

বিভূতি। (বাধা দিয়া)—এ আমার মোটেই personal attack নয়। আমি সুপবিত্র খৃষ্টধর্ম্মের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করেছি এবং তা' করবার অধিকার আমাদের নিশ্চয়ই আছে। ওটা কি বই?

পিটার। আর্য্যমহিলা। এটায় ত্রিগুণাতীতার একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে। গীতার ব্যাখ্যা। আপনাকে দেখাবার জন্য এনেছিলাম।

বিভূতি। আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা! এইজন্যই স্ত্রীলোকদের কোন উচ্চাধিকার দেওয়া হত না। ঠিকই হত। দেখি, কি লিখেছেন। (আর্য্যমহিলা পাঠ এবং কিছু পরে উত্তেজিত কণ্ঠে)—"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ মামেকং শরণং ব্রজ।" How selfish! যেমন হিন্দু সোসাইটি তেমনই তার যোগ্য উপদেষ্টা! অহং-এ পরিপূর্ণ ওদের এই শ্রীকৃষ্ণটি। এই দাম্ভিকটাই এদের পরম পূজ্য দেবতা! ভগবানের পূর্ণ অবতার! (পুনরায় পাঠ)

পিটার।—(ঈষৎ চিন্তিত ভাবে) কিন্তু আমাদের লর্ড এই রকম একটা কথা তাঁর প্রিয় পুত্রের মুখে প্রচার করেছিলেন না—"If you foresaketh others and taketh me I...

বিভূতি। (বাধা দিয়া) কি বাজে বকছ! আগে ব্যাখ্যাটা শোনো—"মামেকং শরণং ব্রজ"—মাং একং শব্দ এখানে আত্মার স্বরূপে (অর্থাৎ সমষ্টিরূপে পরমাত্মার) প্রযুজ্য।

পিটার। (কাষ্ঠ হাস্যের সহিত) How funny!

বিভূতি। হয়েছে কি এখনও; শোনো। জন্ম মৃত্যু নিবৃত্তিই জীবের চরম লক্ষ্য। আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে তাহা অসম্ভব। সুতরাং পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত না হইলে এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারা যায় না।

(পত্রিকাখানি ফেলিয়া দিয়া লিখিবার টেবিলের নিকট গিয়া বসিল।)

সঙ্গে সঙ্গেই এর তীব্র প্রতিবাদ করা দরকার।

পিটার। তাহলে এবারও special issue বার করতে হবে নাকি ?

বিভূতি। (পিটারের দিকে না চাহিয়াই) নিশ্চয়ই।

(উত্তেজিত ভাবে লিখিতে লাগিল।)

৫ম দৃশ্য

[হাওড়া ষ্টেসনের বহির্ভাগ। ফুল দিয়া সাজান একখানা দামী মোটর গাড়ী। দুই চারিজন বিশিষ্ট ব্যক্তি গাড়ীর নিকটে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন। চতুর্দ্দিকে বিপুল জনতা। স্বেচ্ছাসেবকগণ জনতাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। একজন পাড়াগেঁয়ে গোছের ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়েছিলেন। জনৈক স্বেচ্ছাসেবক তাহাকে সরাইয়া দিল।]

ভদ্রলোক। আরে মশয় ঠ্যালা দ্যাহেন কেনে ?

স্বেচ্ছাসেবক। ওদিকে যাও। আরে ওদিকে যাও।

ভদ্রলোক। তা না হয় গেলাম। কিন্তু এখানে কি হবে কইতি পারেন ? কি হবে কি ? টৌকি না কলের গান ? ভিড় ত বড় কম হয় নাই দেখি।

তাহার সঙ্গী। (পিছন হইতে) আরে ও পিসে ! টৌকি আবার কারে কয় ?

ভদ্রলোক। ও আমার কপাল ! টৌকি কারে কয় তুমি এখনো জানো নি ? আরে ছবিগুলাক বেবাক হাত পা নাড়ে, কথা কয়, গান গায়। মেয়ে ছেলেগুলো নাচে। আসলে কিন্তু সবগুলা ছবি ছাড়া আর কিছু নয়। বুঝলি কিনা।

জনৈক ব্যক্তি। আমলো যা। পাড়াগেঁয়ে ভূত কোথাকার। রেল ষ্টেসনে এসেছে টকি দেখতে।

ভদ্রলোক। ইসে তুমি গাইল দাও কেনে ? টৌকি ছাড়া এমন তরো ভিড় হতে নারে নাকি ?

জনৈক তরুণ। Right you are. ঠিক বলেছ দাদা ! আজকাল কলতাতায় যদি কিছু থাকে তবে ঐ টকি। আগেকার দিনে লোকে বলত—

রাতে মশা দিনে মাছি
এই নিয়ে কলকাতায় আছি।

এখন বলতে হলে বলা উচিত—

দিনে রেডিও রাতে টকি
এই নিয়ে কলকাতায় থাকি।

একজন প্রবীণ ব্যক্তি (অপর একজনকে) যাই বল, আমি কিন্তু কিছুতেই এটা সমর্থন করতে পারি না। দীনবন্ধু মিত্রের ভাষায় বলতে হয়—"পুরুষ জ্যাঠা বরং সহা যায় মেয়ে জ্যাঠা একেবারে অসহ্য।"

দ্বিতীয় প্রবীণ। জ্যাঠামি এতে কি দেখলে ?

প্রথম প্রবীণ। আবার কি দেখব ? বিবেকানন্দের সময় থেকে অনেক পুরুষ মানুষই আমেরিকা জয় করে এলেন। তাই দেখাদেখি মেয়েরাও যদি হিন্দুধর্ম্ম প্রচার কর্ত্তে আমেরিকা ছোটেন, তবে ত মালক্ষ্মীকে বিদায় দিয়ে অলক্ষ্মীকে নিয়ে ঘরবন্না পাততে হয়।

একটি ফাজিল ছোকরা (উভয় ব্যক্তির মধ্যে মুখ বাড়াইয়া)।—তার ত বড় বাকিই আছে।

(বলিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইয়া নিতান্ত ভাল মানুষের মত অন্য-দিকে চাহিয়া রহিল।)

দ্বিতীয় প্রবীণ। অতি প্রাচীনকাল হতেই এ অধিকার মেয়েদের দেওয়া হয়েছিল। তুমি অশোক কন্যা সংঘমিত্রা, চারুমতীর কথা……

প্রথম প্রবীণ। আরে রেখে দাও সে সব কথা। আদিম যুগে মানুষ যে কাপড় পরত না। তুমি আবার তাই ফিরিয়ে আনতে চাও নাকি ?

ফাজিল ছোকরা। Hear Hear !

প্রথম প্রবীণ। জ্যাঠা ছেলে। দেবো, এই লাঠির বাড়ী (লাঠি তুলিল)

(ছেলেটা "ওরে বাবারে" বলিয়া পলাইল। প্রবীণ ভদ্রলোকটি লাঠি তুলিয়া পিছনে পিছনে চলিলেন।)

(বাঙ্গালা এবং ইংরাজী দুইখানি দৈনিক সংবাদপত্রের রিপোর্টার-দ্বয়ের প্রবেশ)

প্রথম ব্যক্তি। শালা জোটেছ ? ওটা কিন্তু আমার জাগা।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। Bravo, বেশ বাবা। আমি এসে দু ঘন্টা দাঁড়িয়ে পাথর বনে গেলাম। আর এইমাত্র এসেই কিনা—"ওটা আমার জাগা।"

(ভিতর হইতে উচ্চকণ্ঠে জনতার শব্দ শোনা গেল—"আনন্দ-স্বামী কি জয়", "মাতা ত্রিগুণাতীতা কি জয়", "হিন্দু ধর্ম্ম কি জয়"। স্বেচ্ছাসেবকগণ জনতাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কয়েকজন ইউরোপীয় এবং দেশীয় শিষ্য শিষ্যা সমভিব্যাহারে আনন্দস্বামী এবং রেবার প্রবেশ। জনতার মধ্য হইতে যে যে পারিল স্বামীজীর পদধূলি লইল। জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে আসিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। একজন স্বেচ্ছাসেবক তাঁহাকে সরাইয়া দিতে গেলে অপর এক ব্যক্তি তাহাকে নিষেধ করিল— 'আরে করিস কি। মহামহোপাধ্যায় রঘুবর পণ্ডিত মহাশয় যে।")

পণ্ডিত মহাশয় (সামনে আসিয়া)।—আজ আমার কি সৌভাগ্য। যাজ্ঞবল্ক্য এবং গার্গী যেন প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া আজ আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে সতত প্রার্থনা করিতেছি যেন সনাতন ধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী আপনার হস্তেই সমগ্র জগতের উপর সগৌরবে উড্ডীন হয়। আজ আমার জীবন সার্থক।

(স্বামীজী "শিব শিব" বলিয়া নমস্কার করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রতি নমস্কার করিয়া ফিরিয়া গেলেন : একদল বালিকা অভ্যর্থনা-সঙ্গীত গাহিয়া মাল্যচন্দন দিল।)

(গান)

এস এস আজি পুরুষসিংহ দুঃখলাঞ্ছিত এ দীন বঙ্গে
এস মা জননী বাণী বীণাপাণি জ্ঞানমঞ্জুষা লইয়া সঙ্গে ॥

পরপদাহত অসূয়াবিদ্ধ
পরানুকরণে পরমসিদ্ধ
এ হীন জাতিরে জাগ্রত করো, "উঠ, জাগো" বলি জীমূতমন্দ্রে।
সেই মহাবানী ধ্বনিয়া ফিরুক গগনে পবনে তারকা চন্দ্রে ॥

(স্বামীজী গাড়ীতে উঠিতে যাইবেন, রিপোর্টারগণ তাঁহাকে প্রায় ঘেরিয়া ফেলিল। কয়েকটী তরুণ তরুণী অটোগ্রাফের খাতা হস্তে নিকটে আসিয়া)

প্রথম। একটু হাতের লেখা।

দ্বিতীয়। একটা বাণী।

একজন রিপোর্টার। এদেশের ধর্ম্মানুরাগ এবং আমেরিকার ধর্ম্মানুরাগ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই একটী কথায়...

(স্বামীজী সহাস্যবদনে যতগুলি খাতায় পারিলেন লিখিলেন। রিপোর্টারদের কোন কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। গাড়ীতে উঠিবার পর রিপোর্টারগণ জানালা এবং দরজার নিকট জমা হইল। জনৈক বিপুল বপু মাড়োয়ারী একজন রিপোর্টারের জামা ধরিয়া টানিতে টানিতে)

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক।—লিখ্ লিজিয়ে বাবু সাহেব, হামারা নাম ছগনলাল ঝুনঝুনওয়ালা। টিশন সে হাজির থা ! লিখ লিজিয়ে

রিপোর্টার। ধুত্তোর গুষ্টির পিণ্ডি...

(বলিয়া পুনরায় গাড়ীর জানালার নিকট যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে গাড়ীতে ষ্টার্ট দেওয়া হইয়াছিল। গাড়ী চলিয়া গেল। জনতা জয়ধ্বনি করিতে করিতে গাড়ীর অনুসরণ করিল।)

৬ষ্ঠ দৃশ্য

(কলিকাতার ময়দানের একাংশ। চতুর্দ্দিকে লোকারণ্য। মধ্যদেশে উচ্চ বক্তৃতামঞ্চ। সভাপতি, বক্তৃগণের আসন নির্দ্দিষ্ট মঞ্চের উপরে তখনও আর কেহ আসেন নাই। শুধু বিভূতি এবং পিটার এক পাশে উপবিষ্ট। নিম্নে শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে ঠিক সম্মুখভাগেই প্রমথ দণ্ডায়মান।)

বিভূতি (জনান্তিকে)। কি হে পিটার। সেই হিদেন স্ত্রীলোকটা আর তার সেই গুরু মহারাজ বেগতিক দেখে শেষ পর্য্যন্ত সরে পড়ল নাকি ?

পিটার (বক্ষস্থলে ক্রশ চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া ভাবযুক্ত মুদিত নেত্রে)—প্রভু বলেছেন "তাঁর নামের আলোকে অজ্ঞান তমসা দূরে পলায়ন করবে।"

শ্রোতৃবৃন্দের মধ্য হইতে প্রথম ব্যক্তি। লোকটা কোথাকার জমিদার হে ?

প্রমথ। পালংহাটার।

১ম ব্যক্তি। ওঃ তাই নাকি ? তবে ত তোমার স্বদেশী।

প্রমথ। (উত্তেজিত কণ্ঠে) স্বদেশী ? আমার স্বদেশী না—না ! যে বিভূ আমার বাল্যবন্ধু, সহপাঠি, আমার সহোদর ভাইয়ের চেয়েও বেশী ছিল, সে আজ এগার বছর

আগে শেষ হয়ে গেছে! হাঁ,—শেষ হয়ে গেছে! সে নেই! সে নেই!! সে নেই!!!

২য় ব্যক্তি। কি সব বলছ হে? বক্তৃতা শুনতে এসে তোমারও কি ভাব লেগে গেল নাকি হে?

১ম ব্যক্তি। প্রমথ, এই কি সেই বিভূতি চৌধুরী নয়? সে মরবে কেন? সে ত বেঁচে রয়েছে।

প্রমথ। না সে বেঁচে নেই। সে মরেছে। তার নিজের মা নিজেই তার মৃত্যু ঘোষণা করে গেছেন।

৩য় ব্যক্তি। যাই বলুন মশাই। এ যুগে ত খৃষ্টান অনেকেই হয়েছে, কিন্তু এমন সমাজদ্রোহী আর একটিও ত কই কেহ হয়নি। এই ত কৃষ্ণমোহন বাঁড়ুয্যে, মাইকেল মধুসূদন, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সব বড় বড় ঘরের ছেলেরাও খৃষ্টান হয়েছিলেন ত। তা দেশের ভাল বই ত কিছু মন্দ করেন নি তাঁরা। এটা একটি দ্বিতীয় কালাপাহাড়।

(অন্যদিকে মহিলাদিগের বসিবার স্থানে হাইহিল জুতা, কাঁধ কাটা ব্লাউস পরা কয়েকটি আধুনিকা তরুণী বসিয়াছিলেন।)

১মা। কাল গেসলি ভাই, হাওড়া ষ্টেসনে কুমারী ত্রিগুণাতীতাকে দেখতে?

২য়া। আমি ত আর পাগল হইনি যে কাল অমন "টকি অফ টকিজ" ছেড়ে দেখতে যাব তোদের ত্রিগুণাতীতাকে।

১মা। আমি কিন্তু ভাই গেসলাম!

২য়া। জালাসনি আর। তোর ভক্তি আছে তাই তুই গেসলি। আমার নেই।

৩য়া। কে, শীলাদি?

২য়া। এই যে তুইও এসেছিস দেখছি। কিন্তু আমাদের এই ভক্তিলতাকে ছাড়াতে পারবি? ও কাল হাওড়া ষ্টেসনে গেসল।

৩য়া। যাই বল শীলাদি। মান্ধাতার আমলের ঐ পুরাণো philosophy যে যুগটা নিজেই fossil হয়ে গেছে —তার philosoply পড়ে সস্তায় নাম কেনবার এ একটা মন্দ ফন্দি বার করেনি এই ত্রিগুণাতীতাদের দল।

২য়া। তা ছাড়া আর কি? তুইও ওর সঙ্গে ভিড়ে যা না। সস্তায় নাম কিনে ফেলতে পারবি।

৩য়া। আমার বয়ে গেছে। নাম যদি কিনতে হয় সিনেমা অ্যাক্ট্রেস হলে ঢের বেশী নাম করতে পারব। আমার খুব ইচ্ছা আছে। বাবার হাতে আর হচ্ছে না। বিয়ের পর আমি নিশ্চয়ই সিনেমায় নামব।

(সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণের সহিত ত্রিগুণাতীতার প্রবেশ। জনতা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সভার উদ্যোক্তৃবৃন্দের মধ্যে অনেকে, সভাপতি সেক্রেটারী প্রভৃতি সসম্মানে তাঁহাকে মঞ্চে লইয়া গেলেন। ঐক্যতানবাদ্য আরম্ভ হইল। আরতিপ্রদীপ এবং পুষ্পমালা হস্তে দুইটি বালিকার দুইদিক হইতে প্রবেশ। নৃত্য এবং গীত সহযোগে অভ্যর্থনা সঙ্গীত এবং মাল্যপ্রদান অন্তে প্রস্থান।)

(গান)

কি দিয়ে তাঁহার করিব আরতি
জননী ভারতী যতনে যাঁয়।
নিজ কণ্ঠের অমল কমল
মালিকাটি খুলে দিল গলায়।
প্রোজ্জ্বল ভালে ঝলিছে মায়ের হাতের টিপ।
উজ্জ্বলি দিশি জ্বলিছে যশের মনি প্রদীপ।
মুগ্ধ আমরা তব কণ্ঠের বিশ্ব জাগানমূর্চ্ছনায়॥

সভাপতি। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) সমবেত ভদ্রমহোদয়া এবং ভদ্রমহোদয়গণ! অত্যন্ত দুঃখের সহিতই আমি আপনাদের জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে আমাদের পরম পূজনীয় আচার্য্য আনন্দস্বামী হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তবু এই দুঃসংবাদের সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাদের আর একটি আনন্দের সংবাদও জানাচ্ছি যে আমাদের আমন্ত্রণ এবং রেভারেণ্ড চৌধুরীর সঙ্গে তর্কযুদ্ধের নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্য তিনি তাঁর প্রধানতমা শিষ্যা ব্রহ্মবাদিনী কুমারী ত্রিগুণাতীতা মহোদয়াকে প্রতিনিধিরূপে পাঠিয়েছেন। আমি আপনাদের সকলকার পক্ষ হতে এবং আমার নিজের পক্ষ হতে তাঁকে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করছি এবং আশা করছি তিনি অতঃপর তাঁহার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে বলে আমাদের সকলকে কৃতার্থ এবং ধন্য করবেন।

(জনতার সমর্থনসূচক আনন্দধ্বনি)

ত্রিগুণাতীতা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) মাননীয় সভাপতি মহাশয়। প্রিয় ভগিনীগণ এবং আমার সম্মানভাজন ভ্রাতৃ-

মণ্ডলী! আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণে আমরা আপনাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হতে পেরেছি।

বিভূতি। (চমকিয়া উঠিল। স্বগতঃ) একি! একি শুনলুম। (রেবার মুখের দিকে চাহিল।)

ত্রিগুণাতীতা। আমাদের এখানে উপস্থিত হবার আরও একটি বিশেষ কারণ আছে। রেভারেণ্ড চৌধুরী নামে একজন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক তাঁর ধর্ম্মের পক্ষ থেকে আমাদের তর্কে আমন্ত্রণ করেছিলেন। আশা করি তিনি এখন এখানে উপস্থিত আছেন।

(বিভূতির দিকে দৃষ্টিপাৎ করিবামাত্র ঈষৎ বিস্ময়ের চিহ্ন রেবার চক্ষে নিমেষের জন্য ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার স্বাভাবিক শান্ত ভাব আবার ফিরিয়া আসিল।)

শ্রোতৃবৃন্দের মধ্য হইতে ১ম ব্যক্তি। আমরা আপনার কথাই শুনতে চাই আগে।

২য় ব্যক্তি। মহিরাবণবধটা আগে হয়ে গেলেই ভাল হত।

৩য় ব্যক্তি। মা যখন নিজে এসেছেন তখন মহিরাবণ ছেড়ে মহিষাসুর পর্য্যন্ত বধ হয়ে যাবে। আগে মায়ের নিজের কথা দুটো শুনতে দিন।

মঞ্চ হইতে এক ব্যক্তি। আপনারা সব চুপ করুন।

ত্রিগুনাতীতা। হে অমৃতের পুত্র কন্যাগণ! আপনারা আমার কথা শুনতে চাইছেন। কিন্তু আপনারা জানেন কি যে আমার কথা আপনাদেরই অন্তরস্থ মহাপুরুষের কথার প্রতিধ্বনি ভিন্ন অপর কিছুই নয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বহু ভূখণ্ড পর্য্যটনের ফলে এই মহা সত্যেরই সন্ধান আমরা পেয়েছি যে একই সূত্রে গ্রথিত মণিসমূহের ন্যায় এক অখণ্ড চৈতন্যকে আশ্রয় করে বিকশিত অসংখ্য ব্যক্তি তাদের ব্যক্তিত্বের মোহে ভুলে আছে মাত্র যে তারা সকলেই এক। তাদের কথা, চিন্তা, অনুভূতি, আশা, আকাঙ্ক্ষা সবই মূলতঃ অভিন্ন।

পিটার। (নিম্নকণ্ঠে যাহাতে শুধু বিভূতি শুনিতে পায়) তাই বটে। সেইজন্যই ত তোমাদের দেশের লোকেরা তোমাদের সঙ্গে ক্রিতদাসীর মত ব্যবহার করে।

বিভূতি। চুপ। (একদৃষ্টে রেবাকে দেখিতে দেখিতে স্বগতঃ) ভুল করছি? না না ভুল নয়। এ সে-ই! প্রমথ কি বলেছিল? সন্ন্যাসীতে নিয়ে গেছে?

ত্রিগুণাতীত। কিন্তু একত্ব অনুভূতির পক্ষে অন্তরায় হল আমাদের অন্তর্নিহিত অনাদি অবিদ্যা। এই অনাদিরূপী অহং আমাদের বাধা দেয়।

বিভূতি। শিশির? না উষা? না না ত-প-স্যা। হাঁ; সেই তপস্যা আজকার মন্ত্র বলে আমার সামনে মূর্ত্তিমতী হয়ে দেখা দিল? স্বপ্ন? (চোখ রগড়াইয়া) না না স্বপ্ন নয়। সত্য—সত্য। এ রেবা। এ আমার সেই রেবা! আমার রেবা! কিন্তু কার সাধনায়? আমার না,—না,—না।

জনতা হইতে এক ব্যক্তি। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) মা! আমাদের একটু সহজ করে বলতে হবে যে। আমরা যে কিছুই জানি না।

অপর এক ব্যক্তি। (তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া দিল) কি বিপদ! গোলমাল করতে চাও ত' হাটে গেলেই পারতে।

বিভূতি। (স্বগতঃ) তপস্যা, মূর্ত্তিমতী তপস্যা! একে আমি কোথায় টেনে আনতে চেয়েছিলাম! উঃ! আজ কোথায় রেবা আর আমি আজ কোথায়? কোথায়? স্বর্গে আর মর্ত্ত্যে? না-না। স্বর্গে আর নরকে!

ত্রিগুণাতীতা। যেটা আপনাদের কাছে কঠিন বোধ হবে আপনারা দয়া করে আমাকে বলবেন। আমি সহজ করে বলবার চেষ্টা করব। আমি নিজেও ত খুব বেশী জানি না। তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করব। সংসারে প্রত্যেক পদে লাভ ক্ষতির যে খতিয়ান আমরা রচনা করে চলি, তার কতটা ক্ষতি আর কতটা লাভ তা আমাদের কে বলে দেবে? যাকে আজ আমরা ক্ষতির খাতায় ফেলে একেবারে মুহ্যমান হয়ে হয়ত আত্মহত্যা করতেই উদ্যত হই দুদিন পরে আমাদের অজ্ঞানবিমূঢ় জ্ঞান নিয়েই বুঝতে পারি সে ক্ষতি আদৌ ক্ষতি নয়। ক্ষতির রূপ ধরে এসেছিল পরম লাভ আমাদের কাছে। আমরা তাকে চিনতে পারি নি, তাই

"স্বাগত" বলে অভ্যর্থনা করে নিইনি। এইটাই হচ্ছে অবিদ্যাবিমূঢ় অহং বুদ্ধির চরম খেলা।

বিভূতি। (স্বগতঃ) যে আমাদের সামনে—ক্ষতির-রূপ-ধরে-এসেছিল, আমরা তাকে চিনতে পারিনি। না পারিনি চিনতে। আত্মহত্যা?—হাঁ, আত্মহত্যাই করেছি। সুধু আত্মহত্যা নয়, আরও অনেক হত্যা করেছি তার সঙ্গে। অসংখ্য! অসংখ্য! কি করেছি? কি করেছি আমি? (দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া) মা! মা! মা!—মাতৃহত্যা করেছি!! স্বাতি! তুমিও বাদ যাওনি। অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে একরকম অনাহারে বিনাচিকিৎসায় মরে গেছ! তোমাকেও আমি খুন করেছি! দেবি! যদি এলে, তবে এত দিন পরে কেন এলে? কেন এলে?—আগে এলে না কেন?

ত্রিগুণাতীতা। কিন্তু হতাশ হওয়া উচিত নয় মানুষের। মানুষ মানে জন্মমৃত্যুর অধীন এই পাঞ্চভৌতিক দেহ নয়। দেহমধ্যে প্রত্যগাত্মারূপী যে চিদাত্মা রয়েছেন—অমৃতত্বের অধিকার যাঁর শাশ্বত......

বিভূতি। (স্বগতঃ) শাশ্বত? অমৃতত্বের অধিকার শাশ্বত! তবে কি এ অধিকার আমি আজও হারাই নি? (সহজভাবে উঠিয়া বসিল) শাশ্বত! শাশ্বত! অমৃতত্বের অধিকার শাশ্বত!

ত্রিগুণাতীতা। সচ্চিদানন্দের অংশভাগী পরম চৈতন্য স্বরূপকেই আমরা বলি মানুষ। হীনতার আবরণ তা সে যত নিবীড়ই হোক না কেন তাকে মেঘাবরিত সূর্য্যের মত কখনই চিরকাল ঢেকে রাখতে পারে না। একদিন সে আবরণ খসে যায়। আর মানুষের যা সত্যস্বরূপ মেঘ-বিনির্মুক্ত ভাস্করের মতই তা ভাস্বরমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। সেইজন্য মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ তাঁদের অগ্নিমন্ত্রে আমাদের আহ্বান করে বলেছেন,—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।"

(শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে একপাশে বসিয়া প্রমথ এতক্ষণ একদৃষ্টিতে ত্রিগুণাতীতাকে দেখিতেছিল। এইবার বলিল)

প্রমথ। এ নিশ্চয়ই সেই রেবা। কোন সন্দেহ নাই। থাকতে পারে না। আঃ ভগবান, তোমায় কোটি কোটি প্রণাম! আমার এতদিনকার সুগভীর আত্মগ্লানি আজ পরম আত্মপ্রসাদে পরিণত হল।

(ত্রিগুণাতীতা আসন গ্রহণ করিলেন। তখন সভাপতি উঠিয়া কার্য্যতালিকা হইতে পড়িলেন "রেভারেণ্ড চৌধুরীর বক্তব্য।" জনতা পুনরায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।)

কয়েক ব্যক্তি আমরা ওর কথা শুনতে চাই না।

অপর একজন। ও renegadeটা আবার বলবে কি?

কেহ কেহ। হাঁ, আমরা শুনতে চাই ওর কি বলবার আছে।

স্বেচ্ছাসেবকগণ। চুপ চুপ। বড় গোলমাল হচ্ছে।

পিটার। যাও বন্ধু। মনে রেখ সদাপ্রভুর বিজয় পতাকা আজ তোমার হাতে।

বিভূতি। (সুপ্তোত্থিতবৎ) অ্যাঁ? হাঁ,—যাই।

(উঠিয়া দাঁড়াইল। পা টলিতে লাগিল। আবার বসিয়া পড়িল। পুনরায় উঠিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। রেবা স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া ছিল। বিভূতি একবার জনতার প্রতি চাহিয়া দেখিল। পরে সেদিন "তপস্যা" চিত্রের তলে যেমনভাবে বসিয়াছিল তেমনই নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িয়া বিহ্বলস্বরে বলিল।)

আমি,—আমি পরাজিত।

ত্রিগুণাতীতা। (শান্ত স্মিতমুখে দক্ষিণ করতল উত্তোলিত করিয়া) জয়োস্তু

(যবনিকা পতন।)

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

এয়ারোপ্লেন বা বিমান-যান

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম্‌-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন

আজকাল **এয়ারোপ্লেনের** কথা সকলেই শুনেছেন—কেউ উহা উড়ে যেতে দেখেছেন, কেউ বা উহা নিকট হ'তে দেখেছেন, আবার কেউ বা উহাতে চড়েছেন। এখন **বিমানযোগে** দূরদেশে চিঠিপত্র যাতায়াত ক'রছে। কয়েক বৎসর পূর্বে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বিমানে আরোহণ ক'রে পারস্য-দেশ ভ্রমণ করে এলেন। আজ থেকে দু'তিন বৎসরের মধ্যে শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহরু, তাঁহার কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা ও ভগ্নী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, এবং রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ইউরোপ ভ্রমণ করে বিমানে চড়ে দেশে ফিরেছেন। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে সংপ্রতিকার **অ্যাবিসিনিয়ার** যুদ্ধে এবং আজকাল **স্পেনে** ও **চীনে** যে যুদ্ধ চলছে, তাতে শত্রুপক্ষের নগর ও নরনারীগণের উপর বিমান হতে বোমা নিক্ষেপ করে নৃশংশতার পরাকাষ্ঠা দেখান হয়েছিল ও হ'চ্ছে।

বিমান মনুষ্যজাতির একদিকে যেমন পরম হিতকারী বন্ধু অপর দিকে তেমনি বিষম মারাত্মক শত্রু। মিত্রই হ'ক্‌ আর শত্রুই হ'ক্‌, এই যানটীর সহিত এখন সভ্য জাতিগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

পুরাকালেও ভারতবর্ষে বিমান ব্যবহৃত হ'ত শোনা যায়। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণশাস্ত্র পাঠে জানা যায় যে **নারদ** ঋষি ঢেঁকি আকারের একপ্রকার ক্ষুদ্র বায়ু যানে আরোহণ ক'রে ত্রিভুবনের সর্বত্র অপ্রতিহতভাবে অতি সত্বর ইচ্ছামত গমনাগমন করতে পারতেন। বিমানে সীতা দেবীকে তুলে **রাবণ** পঞ্চবটী বন থেকে সমুদ্রপারস্থ লঙ্কায় নিয়ে গিয়েছিল। লঙ্কার সমরে জয়লাভের পর সীতা দেবীকে বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করে শ্রীরামচন্দ্র সীতাসহ তাঁর বানর ও রাক্ষস বন্ধুগণকে নিয়ে বিমান যোগে লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় গিয়েছিলেন। তাঁর বিমানখানা নিশ্চয়ই একখানা বড় জাহাজের সমান ছিল, নতুবা তাতে এত লোক ধ'রল কি করে? মহাভারতেও দেখা যায় যে উষাহরণ ব্যাপারে বিমানের উপযোগ করা হয়েছিল, এবং শ্রীকৃষ্ণ অনেক সময় বিমানের সাহায্য নিতেন।

আধুনিক যুগের পূর্বে বিমান ব্যবহৃত হত কিনা, সে সম্বন্ধে ঠিক কিছু বলা যায় না। কাব্যে ও পুরাণে বিমানের উল্লেখ কবি-কল্পনাও হ'তে পারে, কারণ ভারত-যুদ্ধের পর এই বৈজ্ঞানিক যুগ পর্যন্ত বিমান ব্যবহারের কোনো বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই, এবং প্রত্ন-নিদর্শন-স্বরূপ পৃথিবী-পৃষ্ঠে বা ভূগর্ভে পূর্বকালের বিমানের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না।

গ্রীক পুরাণে মানুষের আকাশে ওড়ার এক অদ্ভুত বিবরণ পাওয়া যায়। ভূমধ্য সাগরস্থ **ক্রীট** দ্বীপ এক কালে খুব সমৃদ্ধ ও প্রতাপান্বিত হয়ে উঠেছিল—**গ্রীস** দেশের **অ্যাথেন্স** অপেক্ষাও। একটী গ্রীক পৌরাণিক উপাখ্যান পড়ে জানা যায় যে **ডেডালাস্‌** নামক এক অ্যাথেন্সবাসী শিল্পী হত্যাপরাধে **অ্যাথেন্স** হতে নির্বাসিত হয়ে **ক্রীটে** আশ্রয় নিয়েছিল এবং **ক্রীটের** রাজা **মাইনসের** আজ্ঞায় সেখানে একটি **গোলকধাঁধা** নির্মাণ করেছিল। তার ভেতরে নানা দিকে অসংখ্য পথ ছিল, এবং পথগুলি এত জটিল যে, যে একবার সেই গোলকধাঁধায় প্রবেশ করত, সে কখনো তা থেকে বেরুতে পা'রত না। রাজা **মাইনসের** একটী পুত্র ছিল, যার আকৃতি ও প্রকৃতি রাক্ষসের ন্যায়। তার নাম ছিল **মিনোটার** এবং সে জীবজন্তু কাঁচা খেয়ে ফেলত। রাজা **মাইনস** তাকে ঐ গোলকধাঁধার ভেতর রেখে দিয়েছিলেন, এবং তার আহারের জন্য গোলকধাঁধায় মানুষ বা কোনো পশু ছেড়ে দেওয়া হ'ত। সেই মানুষটা বা পশুটা গোলক-ধাঁধার ভেতর থেকে বেরুবার পথ খুঁজতে খুঁজতে

মিনোটারটার সামনে গিয়ে পড়ত এবং **মিনোটার** তাকে তৎক্ষণাৎ ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত।

এক সময় কোনো অপরাধের জন্য **ডেডালস্** রাজা **মাইনসের** অপ্রীতিভাজন হ'য়েছিল, এবং তিনি **ডেডালস্** ও তার পুত্র **আইকেরিয়াস্‌কে** গোলকধাঁধায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। **ডেডালস** ভাবী শিল্পী ছিল। সে মোম দিয়ে পাখীর পাখার মত দুজোড়া পাখা তয়ের করে রেখেছিল। গোলকধাঁধায় পড়বা মাত্র সে ও **আই-কেরিয়াস্** সেই মোম-নির্মিত পাখা পীঠে বেঁধে গোলকধাঁধা থেকে উড়ে পালিয়েছিল। **ডেডালস্** নিরাপদে **সিসিলী** দ্বীপে পৌছেছিল, কিন্তু **আইকেরিয়াস** অনেক উঁচুতে উঠে পড়াতে, সূর্য্যের তাপে তার পাখার মোম গলে গিয়েছিল, এবং সে সমুদ্রে পড়ে প্রাণ হারিয়েছিল। এই গল্পটী কবি-কল্পনা ব'লে মনে হয়।

বাষ্পীয় শকটের আবিষ্কার ও সফলতা দেখে জাহাজেও ষ্টীম-এঞ্জিনের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল এবং জাহাজ স্রোতের ও বায়ুর অধীনতা থেকে মুক্ত হয়েছিল। তারপর মানুষ আকাশ পথে গমনাগমনের আকাংক্ষা পোষণ ক'রে আসছিল, কিন্তু বহুকাল কোনো উপায়ই বার করতে পারে নি।

বেলুনে গ্যাস পোরা হইতেছে

শূন্যে উঠবার জন্য প্রথমে একটা প্রকাণ্ড ফাঁপা গোলক (বল) উদভাবিত হয়েছিল। সেটা গলান রবারের লেপ-দেওয়া-ক্যাম্বিস নির্মিত এবং তাতে বায়ু অপেক্ষা হালকা গ্যাস পুরে দিয়ে টান করে দেওয়া হত।

সে আজ ১০ বৎসরের কথা, আমরা হাওড়ার ময়দানে

বেলুনে-চড়া দেখতে গিয়েছিলাম। মাঠ চারি দিকে বেড়া দিয়ে ঘেরা। তাতে মানুষ ঢুকতে পারে না। সকলে বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে ময়দানের ভেতর কি হচ্ছে দেখছিল। আমি দূর থেকে দেখলাম যে ময়দানের মধ্যস্থলে একটা তিনতলা সমান প্রকাণ্ড লালরঙের গোলাকার বস্তু দাঁড়িয়ে ঈষৎ দুলছে। তার তলায় তার সঙ্গে দড়া দিয়ে বাঁধা একখানা গোল নৌকোর মত পদার্থ ঝুলছে। সেই নৌকোর সঙ্গে বাঁধা দুগাছা মোটা দড়া মাটীতে পড়েছে এবং কয়েকজন লোক দড়া দুগাছা নীচের দিকে টেনে ধরে আছে। একজন ইংরাজ দড়াধ'রে সড়সড় করে উঠে নৌকোয় বসল, এবং কিছুক্ষণ পরে নীচে যারা দড়া ধ'রে ছিল, তারা দড়া ছেড়ে দিলে। তৎক্ষণাৎ সেই গোলাকার বিরাট লাল বস্তুটা তার তলায় নৌকা নিয়ে দেখতে দেখতে সাঁ ক'রে আকাশে উঠে গেল, এবং ক্রমশঃ উচ্চ হ'তে উচ্চতর স্থানে উঠতে লাগল।
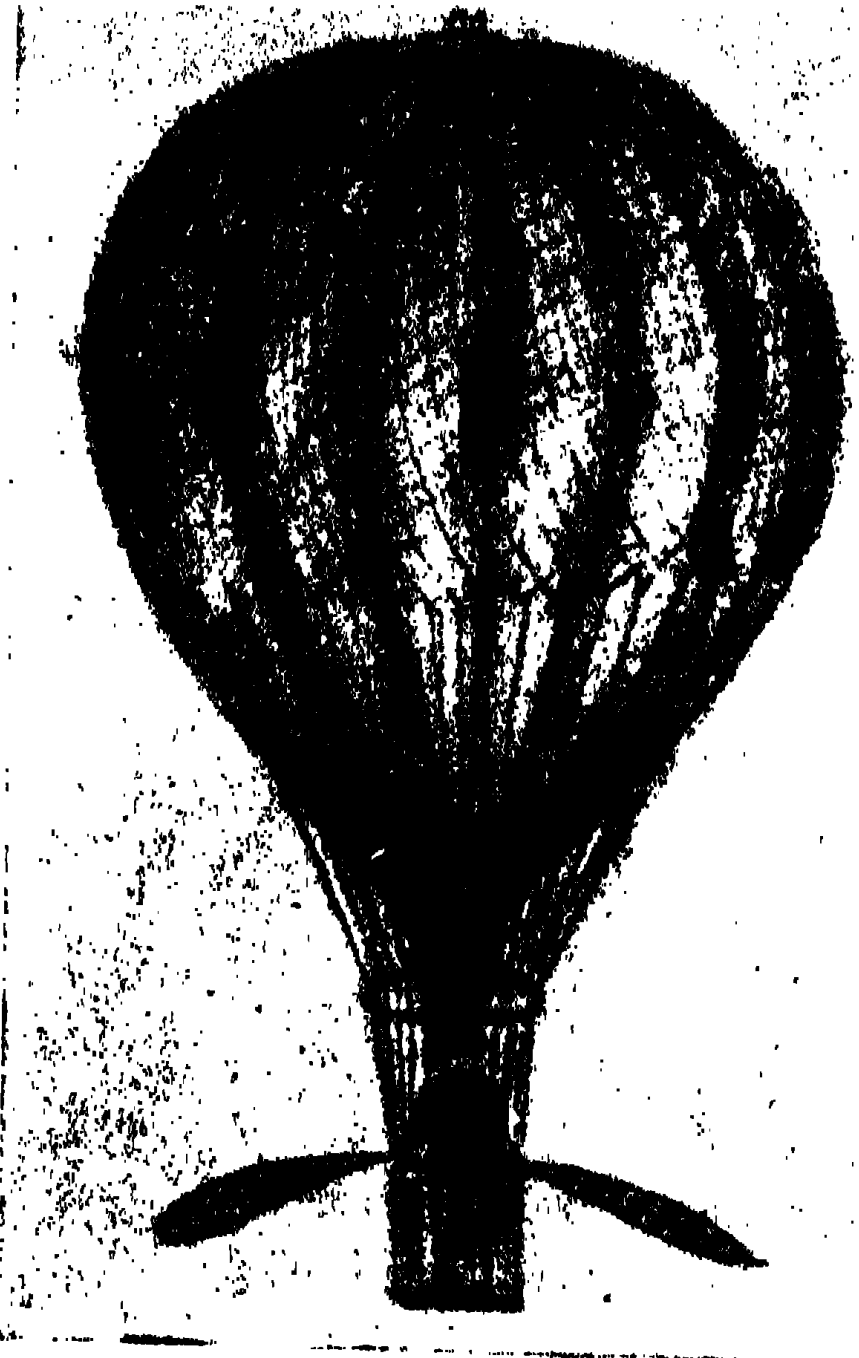
ঐ গোলাকার বস্তুটীকে **বেলুন** বলে। **বেলুন** শব্দের অর্থ বড় বল। উহা ওপরে ওঠে কেন? উহা বায়ু অপেক্ষা অনেক হল্‌কা ব'লে। উহা কাপড়ের নির্মিত একটা প্রকাণ্ড গোল থলি ভিন্ন আর কিছু নয়। কাপড়ের সুতার মধ্যে যে ফাঁকগুলি আছে, তা রবারের পাৎলা প্রলেপ দ্বারা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। থলিটীর মধ্যে **হাইড্রোজেন গ্যাস** পুরে দেওয়া হয়েছে। **হাইড্রোজেন-গ্যাসের** ওজন বায়ুর ওজনের সাতভাগের এক ভাগ। এত হাল্‌কা ব'লে উহা-দ্বারা-পূর্ণ বলটী অনায়াসে সোঁ করে ওপরে উঠে যায়।

বেলুনের সাহায্যে আকাশে উঠবার চেষ্টা ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়। বহু বৎসরের অকৃতকার্য্যতার পর উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে **বেলুনে** আরোহণ ব্যাপারটী সম্পূর্ণরূপে সাফল্য লাভ করে।

বেলুন-যোগে আকাশে ওঠা, সম্ভব হ'ল বটে, কিন্তু **বেলুন** বায়ুর কৃপা-পাত্র হ'য়ে থাকল। বাতাসে তাকে যেদিকে ঠেলে নিয়ে যেত, সে দিক্ ভিন্ন তার অন্য দিকে যাবার শক্তি ছিল না। তাকে যে দিকে ইচ্ছা, সেদিকে চালাবার উপায় দেখা গেল না। কিন্তু **বেলুন** যাত্রা এয়ারোপ্লেন-যাত্রা অপেক্ষা অধিক আরামপ্রদ—**বেলুন** বাতাসের সঙ্গে সমানবেগে চলে বলে আরোহীরা সামান্য পরিমাণেও বাতাসের ঝাপটা অনুভব করে না—কোনো ঝাঁকুনী পায় না। **বেলুন** চলছে কি স্থির আছে, তাও তারা বুঝতে পারে না—কেবল নিম্নস্থ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে টের পায় যে **বেলুনটা** স্থির নয়, গতিশীল—নীচের বস্তু সমূহ যেন বিপরীত দিকে চ'লে যা'চ্ছে।

বহু ঊর্দ্ধে যখন **বেলুনটা** উঠে যায় তখন আরোহীরা পর পর অধিক শীত অনুভব করতে থাকে, কারণ উচ্চ স্তরের বায়ু ক্রমশঃ অধিক ঠাণ্ডা হয়। এই কারণেই দার্জীলিং বা শিমলায় অধিক শীত। আর এক কথা এই যে ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী বায়ুর স্তর অপেক্ষা ওপরের স্তরগুলি ক্রমশঃ অধিক পাতলা হতে থাকে, কারণ যত ওপরে ওঠা যায়, বায়ুর **চাপ** তত কম হ'য়ে যায়। খুব উঁচুতে উঠলে, বায়ু পাতলা ব'লে, যতটা **অক্সিজেন** জীবনধারণের জন্য মানুষের প্রয়োজন, ততটা **অক্সিজেন** সেখানে পাওয়া যায় না। শ্বাস প্রশ্বাস-ক্রিয়া কষ্টকর বোধ হয়, এবং কানে তালা লেগে যায়।

কিন্তু **বেলুন** যাতে অত উঁচুতে উঠে যেতে না পারে,

তার প্রতিবিধানের যথেষ্ট উপায় **বেলুনে** আছে। একটু একটু করে গ্যাস ছেড়ে দিলেই বেলুন একটু একটু করে নীচে নেমে যায়। ভালভ্ খুলে দিয়ে **গ্যাস্** ছাড়বার ব্যবস্থা **বেলুনের** স্থান বিশেষে করা আছে।

এই বারে, **বেলুনকে** বাতাসের বিপরীত দিকে বা যে কোনো দিকে চালাবার চেষ্টা হ'তে লাগল। **পেট্রোলের** দ্বারা **মোটরকারের এঞ্জিন** চলে দেখে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে **গিফোর্ড** নামক এক **ইঞ্জিনিয়ার বেলুনে পেট্রোল-এঞ্জিন** ব্যবহার ক'রে বায়ুর বিরুদ্ধে চল্‌তে সফলতা প্রাপ্ত হলেন। তারপর বেলুন চালাবার জন্য তড়িৎ শক্তি ব্যবহার করাও সম্ভব হ'ল। কিন্তু তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন ক'রবার জন্যও **এঞ্জিনের** দরকার। এক একখানা **এঞ্জিন** নিতান্ত কম ভারি নয়। দেখা গেল যে **এঞ্জিন** ইত্যাদির ভারের তুলনায়, তাদের দ্বারা যে পরিচালিকা-শক্তি উৎপন্ন হয়, তা অতি সামান্য।

তার পরে ৪০।৫০ বৎসর ধ'রে পরিচালনীয় **বেলুনের** উন্নতিকল্পে বহু চেষ্টা হয়েছে। শেষে বিংশ শতকের প্রথম দশকে **কাউন্ট জেপেলিন** নামক **জার্মানী** দেশীয় এক ব্যক্তি তাঁর নিজ নাম দিয়ে একখানি কার্য্যক্ষম পরিচালনীয় বিরাট **বেলুন** নির্মাণ ক'র্‌তে সমর্থ হলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি **জেপেলিন** L 1 নাম দিয়ে যে **জেপেলিন**খানি নির্মাণ করেছিলেন, তা উত্তর সমুদ্রে পড়ে ডুবে যায়। তার পরে অনেক **জেপেলিন** বহু দূর দেশ-যাত্রা ক'র্‌তে সমর্থ হয়েছিল, এবং তাদের মধ্যে অনেকগুলি আগুনে পুড়ে বা ঝড়ে প'ড়ে বিনষ্ট হয়েছিল।

জেপেলিন L 1 এর আকার একটা বিরাট ঢাকের ন্যায়—লম্বায় ৫২৫ ফুট—একখানা **ড্রেড্‌নট্** জাহাজের সমান। সেটা ১৮টা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত এবং সব প্রকোষ্ঠগুলি **হাইড্রোজেন গ্যাসে** পূর্ণ ছিল। ঐ **গ্যাসই** জাহাজখানাকে বাতাসের ওপর ভাসিয়ে রাখত। ঐ প্রকোষ্ঠগুলি কোনো **অদাহ্য গ্যাসের** আবরণের দ্বারা ঢাকা। জাহাজখানার নিম্নে দুখানা **কার**, অর্থাৎ কামরা-বিশিষ্ট গাড়ি, দুইখানা নৌকো, গমনাগমনের লম্বা পথ, সামনের ডানদিকে ও বাম দিকে এক একটী চালক যন্ত্র, ১৭০ ঘোটক-শক্তি-পরিমিত বল সম্পন্ন তিনখানা **এঞ্জিন**, পেছনের উভয় পার্শ্বে এক একটী চালক-যন্ত্র, এবং কয়েকটী খাড়া এবং শোয়ান ছোট **প্লেন** বা তল সংযুক্ত ছিল। **গ্যাস পূর্ণ** প্রকোষ্ঠগুলির উপর একটা **অ্যালিউমিনিয়ম**

জেপেলিনের গঠন

নির্মিত মঞ্চ, এবং মঞ্চের ওপর একটা ছোট কামান ছিল। জাহাজে বেতার যন্ত্রও ছিল, এবং প্রবল বাতাস না থাকলে সে ঘণ্টায় ৪৫ মাইল যেতে পারত। ৬ খানা খাড়া **তলের** সাহায্যে জাহাজখানাকে দক্ষিণে বা বামে ফেরান হ'ত এবং ৮ খানা শোয়ান **তলের** সাহায্যে তাকে ওপরে ওঠান বা নীচে নামান যেত। **জার্মানেরা** এইরূপ আকাশ-যানের খুব পক্ষপাতী। **হাইড্রোজেন** দাহ্য ব'লে এখন জেপেলিনে **হীলিয়ম্** গ্যাস ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু ইংরাজেরা এরূপ জবড়জং বিমান মোটেই পছন্দ করে না। তারা বলে, এর আকার বেমানান এবং এর ভার অত্যধিক। এর নির্মাণে অসম্ভব রকম খরচ পড়ে, এবং এর ওপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করা যায় না। যুদ্ধের সময় **দ্বিতল ও জলতল** বিমানই অধিক কার্যক্ষম, কারণ ঐ জাতীয় যানগুলিকে মাটী হ'তে ওপরে তুলতে এবং ওপর থেকে নীচে নামাতে **জেপেলিন** অপেক্ষা অনেক কম জায়গা লাগে, এবং বিপদের সম্ভাবনাও কম থাকে।

পরিচালনযোগ্য বেলুন তিন শ্রেণীর—**অনমনীয়, নমনীয় ও অর্ধনমনীয়।** **অ্যালিউমিনিয়মের** পাত দিয়ে মোড়া থাকে বলে **জেপেলিন** অনমনীয় শ্রেণীর। এতে **গ্যাস** কমে গেলেও এ গুটিয়ে যায় না। নমনীয় যানে ঠেশে **গ্যাস পুরলে**, তার বস্ত্রাবরণ ফুলে থাকে, কিন্তু **গ্যাস কমে** গেলে কুঁকড়ে যায়। অর্ধনমনীয় যানের তলার দিকটা কঠিন আবরণ যুক্ত বলে, তার সঙ্গে এঞ্জিন ও চালন-যন্ত্র সংযুক্ত করা চলে। এই শ্রেণীর ব্যোমযান ফরাসী দেশে অধিক ব্যবহৃত হয়। নমনীয় ও অর্ধনমনীয় যানের গুণ এই যে যখন তাদের ওড়ানর দরকার হয় না তখন তাদের একস্থান থেকে অন্য স্থানে সহজে নিয়ে যাওয়া যায়, কারণ অল্পাধিক গুটিয়ে তাদের ছোট করা যায়। তাদের দোষ এই যে তাদের মধ্যে টান কমে **গ্যাস্** পোরা না থাকলে তাদের বিপদ্ হয়। **গ্যাস্** কমে গেলে তারা তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে। শত্রুদলের মধ্যে পড়লে তাদের যে দুর্দশা হয়, তা আর বলবার কথা নয়।

এয়ারোপ্লেনের বৈশিষ্ট কি? তার গঠন কিরূপ? তা কত প্রকারের। তা ভার-বিশিষ্ট হয়েও কোন শক্তি-বলে আকাশে ভাসমান ও গতিশীল থাকে? ইত্যাদি বিষয়ের ধারণা অনেকের নাই, কিন্তু জানবার ঔৎসুক্য আছে। তাদের এই কৌতূহল পরিতৃপ্ত করবার উদ্দেশ্যে আমি **এয়ারোপ্লেন** সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য নিয়ে লিপিবদ্ধ করলাম।

যে সকল **এয়ারোপ্লেন** সাধারণতঃ ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়, তাদের কতকগুলি একটী এবং কতকগুলি দুটী ডানার মত আধারের ওপর ভর ক'রে বাতাসে

Low Wing Monoplane
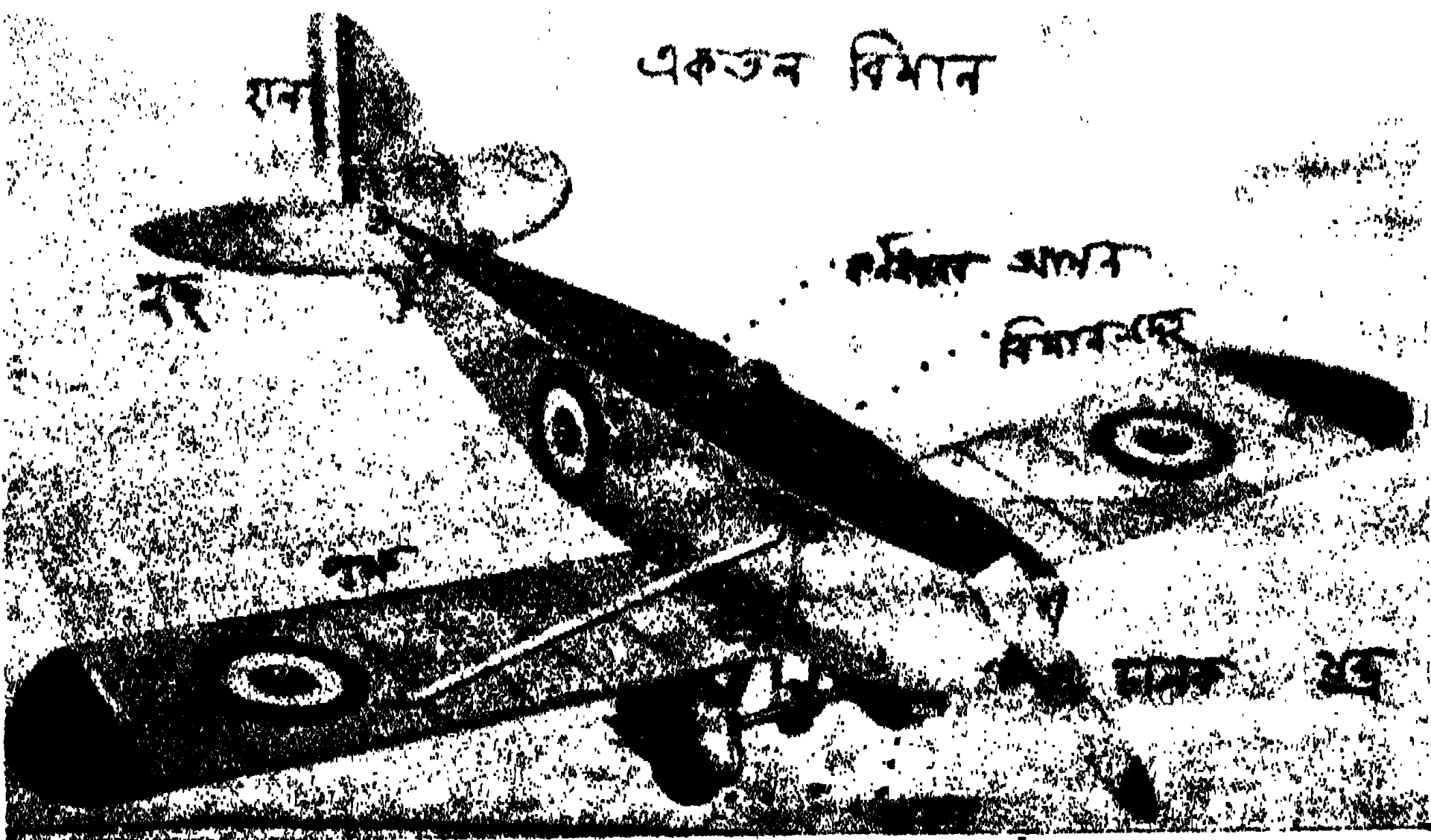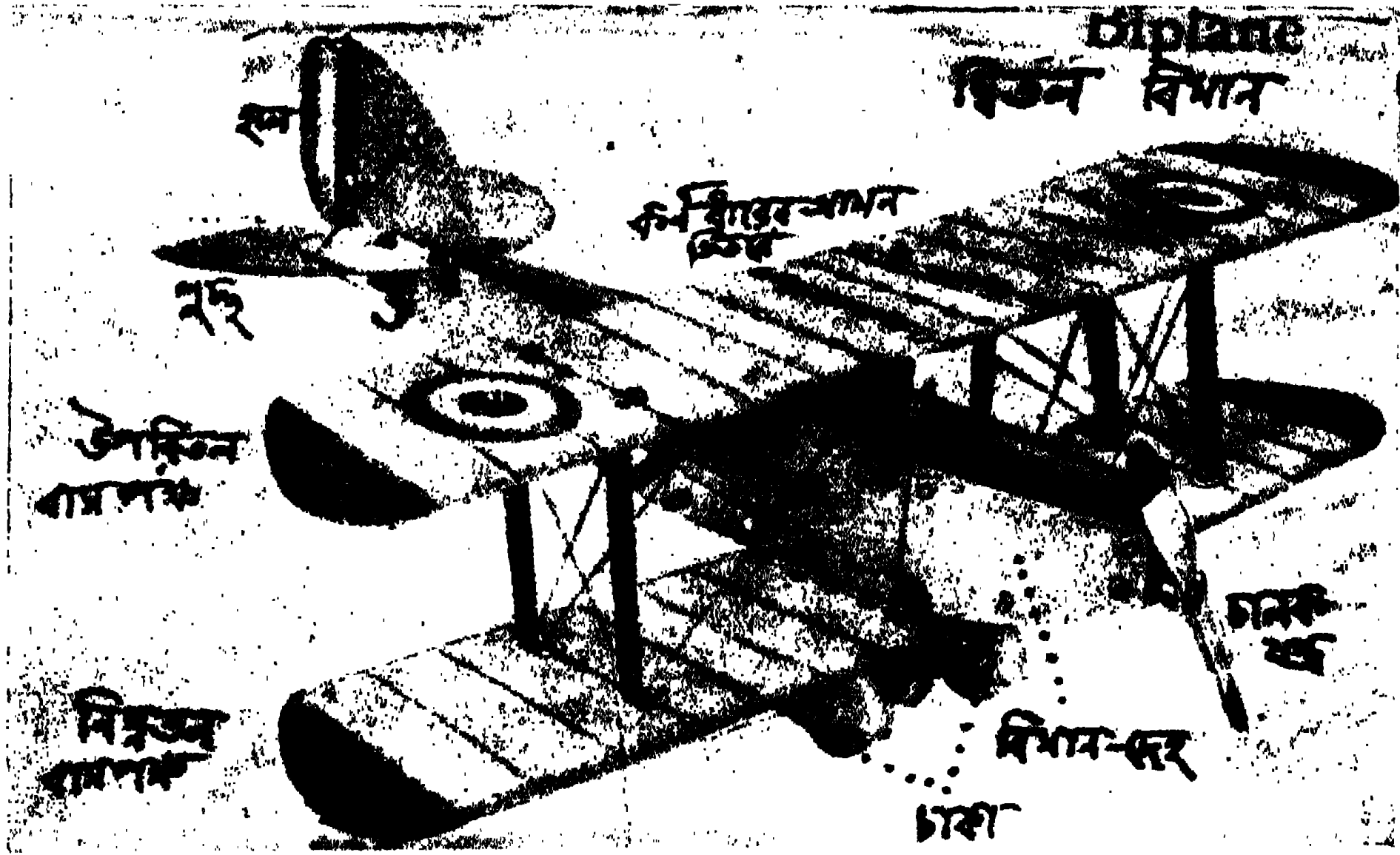
উড়্‌তে থাকে। এই আধারগুলিকে **প্লেন বা তল** বলে। ইংরাজীতে বায়ুকে **এয়ার** বলে। **এয়ার** অর্থাৎ বায়ুতে যে **প্লেন** বা **তল**-বিশিষ্ট যান উড়ে যায় তার নাম **এয়ারো-প্লেন**। প্রত্যেক তলের দুটী অংশ—একটী ডান দিকের, অপরটী বাঁ দিকের। আসল যানখানি ঐ দুই অংশের মাঝখানে এড়োএড়ি ভাবে থাকে। উড়্‌বার সময় প্লেন বা তলের অংশ দুটী পাখীর পাখার মত যানখানিকে বায়ুতে ভাসিয়ে রাখে।

কতকগুলি **এয়ারোপ্লেনের** আধার একটী **প্লেন** বা **তল**, এবং কতকগুলির দুটী **তল** প্রথমোক্ত যানগুলিকে **মনোপ্লেন** বা **একতল**, এবং শেষোক্ত যান-গুলিকে **বাইপ্লেন** বা **দ্বিতল** বলে। **একতলের তলটী** যানের নিম্নে, মধ্যদেশে বা ওপরে যানের সঙ্গে সংলগ্ন করা যেতে পারে। নানা প্রকারে **এয়ারোপ্লেনের** আবিষ্কর্তারা নিজ নিজ রুচি অনুসারে যানের বিভিন্ন অংশ সমূহকে ভিন্ন ভিন্ন আকারে ও প্রকারে সংযোজিত করেছেন, এবং নিজ নিজ নামানুসারে তাদের নাম দিয়েছেন, যেমন **ব্লেরিও মনোপ্লেন, গ্রেহাম-হোয়াইট বাইপ্লেন** ইত্যাদি। নিম্নে যে দুটী চিত্র দেওয়া হ'ল, তা হতে **মনোপ্লেন বা একতল**, এবং **বাইপ্লেন** বা **দ্বিতলের** বোঝা যাবে।

এই বিমান দু'খানিতে মধ্যের নৌকাকার অংশটীই আসল অংশ। ইংরাজীতে **ফিউজেলেজ** বলে। এইটেই **বিমান-দেহ**, এবং **তলটী** বা **তল** দুখানি এই **বিমান-দেহের** সহিত সংযুক্ত থাকে। **তল** ও **বিমান-দেহ** পরস্পরের অবলম্বন, অর্থাৎ পরস্পরকে ধারণ ক'রে আছে। **বিমান-দেহের** পশ্চাৎ-সীমায়, অর্থাৎ পুচ্ছে দু দিকে দুটী ছোট শোয়ান **তল** থাকে—খাড়া হ'য়ে তাদের মাঝখানে থাকে **হাল**। পুচ্ছের শোয়ান তল দুটীর এক এক অংশ

২
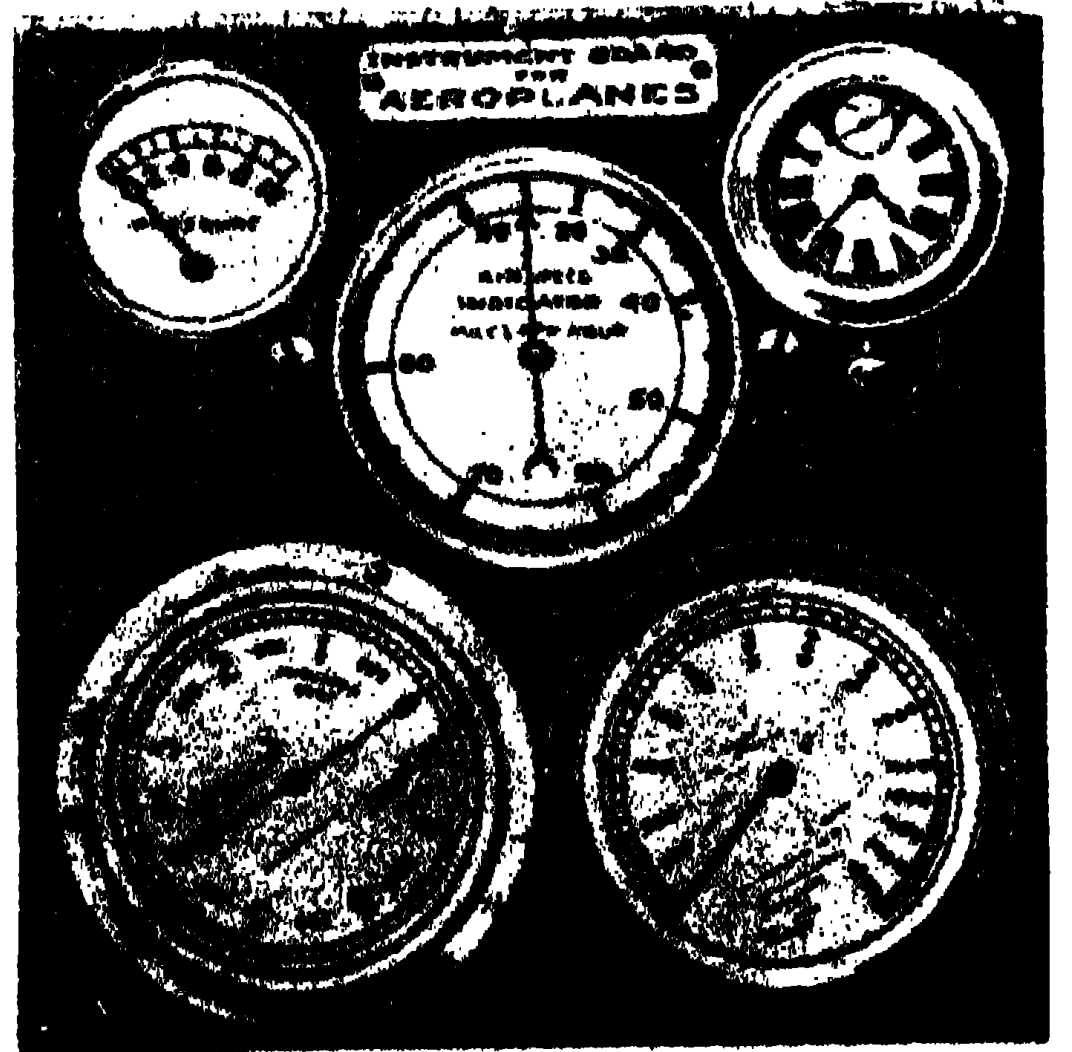
(১) চাপ-নির্ণায়ক যন্ত্র। (২) বায়ুর বেগ-নির্ণায়ক-যন্ত্র। (৩) ঘড়ি। (৪) উচ্চতা-নির্ণায়ক যন্ত্র। (৫) বিমানের বেগ-নির্ণায়ক যন্ত্র।

ওঠান নামান যায়। কর্ণধারের আসনের সম্মুখে টাঙান থাকে কতকগুলি প্রয়োজনীয় ছোট ছোট যন্ত্র। পূর্ব্ব পৃষ্ঠার চিত্র দেখ।

যথা (১) বায়ুর চাপ-নির্ণায়ক যন্ত্র, যার দ্বারা জানা যায় বায়ু ঘণ্টায় কত মাইল চলছে; (২) বায়ুর বেগ-নির্ণায়ক যন্ত্র; (৩) একটা গোল ক্লক ঘড়ি; (৪) উচ্চতা-নির্ণায়ক যন্ত্র, যা দিয়ে জানা যায় বিমানখানি কত উচ্চে উঠেছে; (৫) বিমানের বেগ-নির্ণায়ক যন্ত্র, যা দেখে টের পাওয়া যায় চালক যন্ত্র এক মিনিটে কতবার ঘুরছে। এ ছাড়া কর্ণধারের সম্মুখে শোয়ান ভাবে থাকে একটা **কম্পাস**-যন্ত্র।

কম্পাসের দ্বারা দিক্-নির্ণয় হয়। কিন্তু বিমানখানি যদি বায়ুর ঠেলে অনুসরণীয় পথ থেকে পূর্বে বা পশ্চিমে স'রে যায়, **কম্পাস** দ্বারা তা বুঝবার উপায় নাই। **ইংলিশ-চ্যানেল** পার হওয়ার সময় **ডোভার** থেকে **ক্যালে** যেতে গেলে খাড়া দক্ষিণ পূর্ব দিকে যেতে হয়। যদি পাশ থেকে জোরে বাতাস না বয়, তবে **এয়ারোপ্লেনখানি কম্পাসের** সাহায্যে দিক্ নিরূপণ ক'রে ঠিক পথে যেতে পা'রে। কিন্তু যদি কুয়াসা থাকে, তা হলে বিমানখানিকে মেঘের সীমার ওপরে ওঠাতে হয়। কুয়াসার পর্দা মধ্যে থাকাতে কর্ণধার পৃথিবীস্থ কোনো নিদর্শন না দেখতে পেয়ে দিশাহারা হ'য়ে পড়ে। তখন যদি সেখানে প্রবল বাতাস ওঠে, তা হ'লে বিমান পথভ্রষ্ট হ'য়ে যায়। **কম্পাস** তখন তাকে দিক্-নির্ণয়-কার্যে সাহায্য ক'রতে অক্ষম। এরূপ কারণে অনেক সময় অনেক **এয়ারোপ্লেন** বিনষ্ট হ'য়েছে।

চালক-যন্ত্রটী কোনো **এয়ারোপ্লেনে** কর্ণধারের সম্মুখ দিকে এবং কোনো এয়ারোপ্লেনে তার পশ্চাৎ দিকে থাকে। **কনটিনেণ্ট্যাল এয়ার**-মেলে পাঁচটা চালক যন্ত্র সম্মুখে থাকে।

বেগে বায়ু প্রবাহিত হওয়ার সময়েও আজকাল বিমান চালান হয়। কখনো কখনো প্রবল বাতাস বিমানকে পেছু দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। আবার, সময় সময় বাতাসের ঝাপটা এসে বিমানের যেখানে সেখানে আঘাত ক'রে তাকে তোলপাড় ক'রতে থাকে। তখন কর্ণধারের মাথা ঠাণ্ডা রাখা প্রয়োজন, এবং তার সমস্ত কৌশল খাটান আবশ্যক হয়।

আকাশে কোথাও কোথাও খানিকটে স্থান নিয়ে এক প্রকারের বায়ুশূন্য প্রদেশ থাকে। সেই বায়ুশূন্য স্থান-গুলিকে **বায়ু-পকেট** বলে। **বায়ু-পকেটে** বায়ুর অস্তিত্ব নেই। সমুদ্রে যেমন চোরা চরে বা পাহাড়ে ঠেকে জাহাজ নষ্ট হয়, আকাশে তেমনি অজ্ঞাত **বায়ু-পকেটে** পড়ে অনেক বিমান মারা যায়। সচল বায়ু না থাকায় বিমান সেখানে ভাসতে পারে না। ভাসতে না পেরে সে নীচে প'ড়তে থাকে। তখন তাকে সামলান ভার হয়।

বায়ু-পকেট ছাড়া আকাশে নানা প্রকারের **বায়ু-স্রোতও** আছে, এবং তাদের কতকগুলি ওপরে উঠছে এবং কতকগুলি নীচে নামছে। সেগুলি থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য কর্ণধারের বিশেষ কৌশল আবশ্যক। হটাৎ উর্দ্ধাভিমুখী বা নিম্নাভিমুখী স্রোতে পড়ে বিমানখানি ডান দিকে বা বাঁ দিকে কাত হয়ে যায়, এবং তার ফলে উহা তির্যক ভাবে উঠতে বা নামতে আরম্ভ ক'রলে, দারুণ আলোড়ন উপস্থিত হয়।

মাটীতে নামবার সময় বিমান স্ক্রুর পাকের মত পাক দিয়ে ঘুরে ঘুরে আস্তে আস্তে নামতে থাকে। কিন্তু সময় সময় কোনো কোনো বিমানকে সোজা নীচের দিকে নামতে দেখা যায়। তখন **এঞ্জিন** কাজ করে না, কিন্তু **চালক-যন্ত্র** ঘুরতে থাকে। ঐ ঘোরার বেগ ক্রমশঃ ক'মে আসে। এরূপ নামার সময়ও কর্ণধারকে বিশেষ কৌশল অবলম্বন ক'রতে হয়, যাতে করে বিমানখানি সটান ভাবে মাটীতে প'ড়ে ধাক্কা না খায়। সম্মুখের গতি নিতান্ত ক'মে গেলে বিমানের **তলগুলি** বিমানকে বায়ুতে ভাসিয়ে রাখতে পারে না। সম্মুখ দিকের গতিই বিমানকে বায়ুতে ভাস-মান রাখে। ভাসতে না পারলে বিমান সটান মাটীতে প'ড়ে গিয়ে ধাক্কা খায়।

৩

যেমন **বাইসিক্লকে** দাঁড় করিয়ে সাম্নের দিকে ক্ষিপ্র গতি না দিলে সেটা খাড়া থাক্তে পারে না, তেমনি

বিমানকে সামনের দিকে গতি না দিলে উহা বায়ুতে ভেসে থাকতে পারে না। **বাইসিক্লের** গতি বন্ধ হ'লে সেটা এক দিকে কাত্ হ'য়ে মাটীতে পড়ে যায়। তেমনি **এঞ্জিনের** সাহায্যে বা পৃথিবীর **মাধ্যাকর্ষণের** সাহায্যে যদি বিমানকে গতিশীল না রাখা হয় তবে উহা মাটীতে প'ড়ে যায়। একটা ঢালু জমীর ওপর একটা ভারি বর্ত্তুলাকার দ্রব্য মাধ্যাকর্ষণের সাহায্যে নীচের দিকে গড়িয়ে যায়; তেমনি একখানা বিমান যদি ঢালুভাবে চালিত হয়, তবে সে মাধ্যাকর্ষণের বলে গতিবিশিষ্ট থাকবে।

প্লেন বা তলগুলি বিমানকে বায়ুতে ভাসিয়ে রাখে বিমানের আসল অংশটী, অর্থাৎ নৌকাকার **ভারী দেহটী**, **তলগুলির** সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণকে অগ্রাহ্য করে, এবং শূন্যে বিমান-দেহের আধারের কাজ করে।

Diagrams showing how a Kite Flies
1. When wind is blowing in a horizontal direction. 2. When wind is
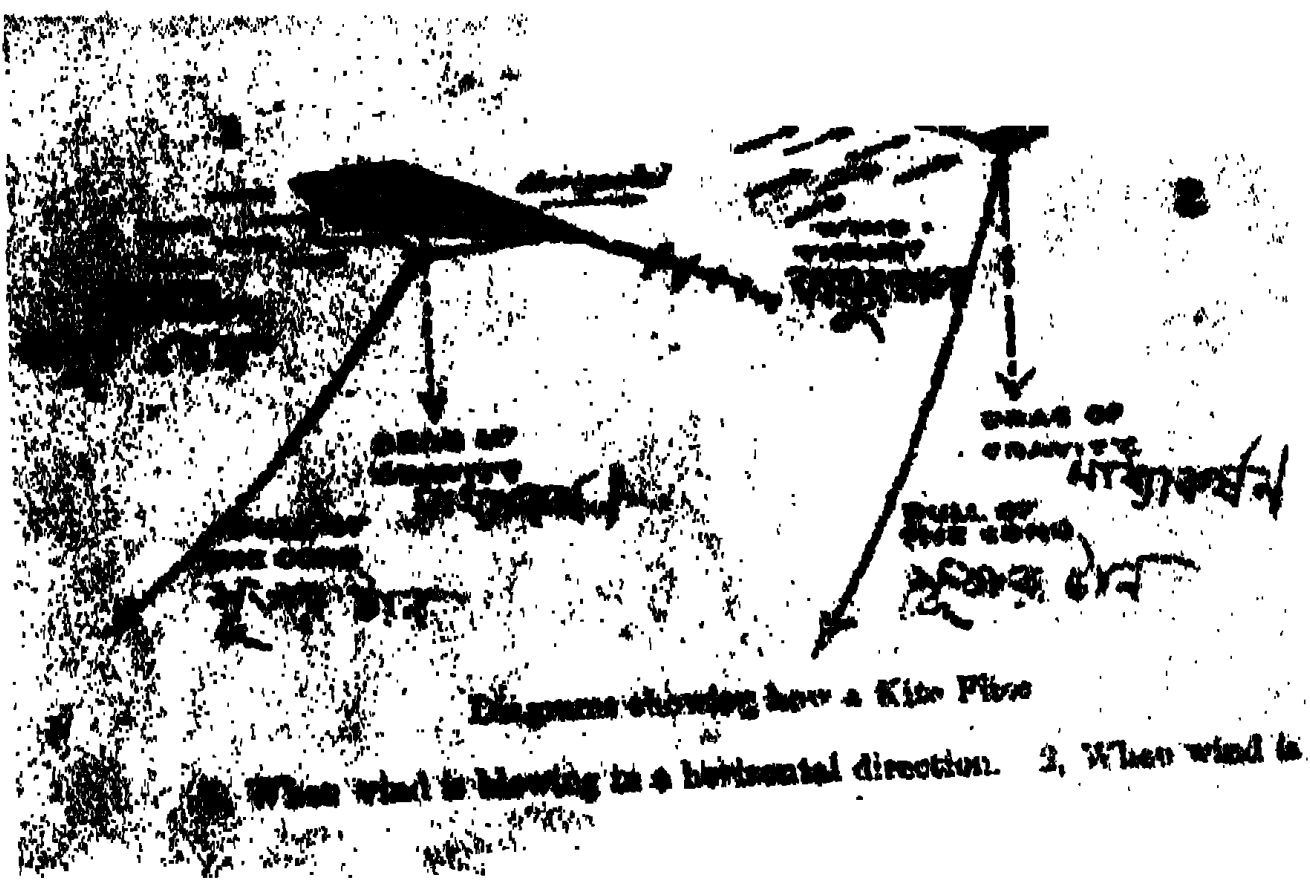
যে দ্রব্যের ওজন আছে, তা নীচের দিকে **চাপ** দেয়। বায়ুর ওজন আছে, অতএব নীচের দিকে বায়ুর একটা চাপ আছে। এই নীচের দিকের চাপ ছাড়া, **বায়ুর ঠেল ওপর দিকে ও পাশের দিকেও আছে।** ওপর দিকের ঠেলকে **উর্দ্ধচাপ** এবং আশে পাশের যে চাপ, তাকে **পার্শ্বচাপ** বলে। যে শক্তি বলে বায়ু বা জল তার মধ্যের কোনো বস্তুকে ওপর দিকে ঠেলে তোলে, তাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় **উৎপ্লাবনী** শক্তি বলে। বায়ু-সমুদ্রে যে সকল বস্তু ডুবে আছে, তারাও একটা উর্দ্ধ চাপ পায়। বস্তুটী হাল্কা না হ'লে ঐ চাপের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। বিমানের **তলগুলি** হাল্কা ব'লে বায়ুর **উৎপ্লাবনী** শক্তি দ্বারা ওরা বায়ুতে ভেসে থাকতে পারে।

তলগুলি পেছন দিকে ঈষৎ গোল হয়ে বেঁকে গিয়েছে। এই রূপে-বেঁকান-হাল্কা-ফ্রেমের মধ্যে টান ক'রে ক্যাম্বিস ছড়িয়ে এক একটী **তল** নির্ম্মিত হয়। **তল** বেঁকা হ'লে বিমান অপেক্ষাকৃত আস্তে চলে বটে, কিন্তু অধিক বোঝাই নিতে পারে। সাবধান থাকা উচিত যেন **তলের** ক্যাম্বিসের কোনো অংশ **ফেঁপে** না ওঠে- ফেঁপে উঠলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে।

দ্বিতল বিমানের ওপরের **তলটী** কতকগুলি খুঁটীর সাহায্যে নীচের **তলের** সহিত সংযুক্ত থাকে। নৌকাকার **বিমান-দেহটী** নীচের তলের মধ্য ভাগে বসান। **একতল** বিমানে যে তলটী থাকে, তাকে কখনো **বিমান-দেহের** সহিত সংযুক্ত করা হয়। দু'দিকের অংশ দুটী যেন পাখীর দুটি পাখার ন্যায়। প্রত্যেক অংশের প্রান্তভাগের, এক পাশে কবজা-দ্বারা সংলগ্ন একখানি ক'রে **ছোটতল** থাকে, যা দোকানের আগোড়ের মত কখনো ঝুলে থাকে, এবং কখনো বা ওপরদিকে তুলে **বড়তলের** সঙ্গে সমসূত্র করা যেতে পারে। এই **ছোট তলগুলিকে** ইংরাজীতে **এলিরণ** বলে। বিমান কোনো দিকে কাৎ হলে, তাকে সোজা ক'রবার নিমিত্ত, সেদিকের **এলিরণ** নামিয়ে দিয়ে অপর প্রান্তের **এলিরণ** তুলে দেওয়া হয়। **কর্ণধারের** ডাইনে একটী **লীভার** থাকে। তারের দ্বারা তার সঙ্গে **এলিরণ** দুটী সংযুক্ত থাকে। **লিভারটী** আবশ্যক মত চালিয়ে **এলিরণ** দুটী ওঠান নামান হয়।

আধারভূত **প্লেন দুটীতে** এবং সম্মুখ-ভাগে পুচ্ছে হালের দুধারে যে **তল** দুটী আছে তাতে এলিরণের মত এক এক খানি ছোট প্লেন কব্জা দিয়ে সংযুক্ত থাকে। এই ছোট তলগুলি তারের দ্বারা কর্ণধারের পাশের একটী **লীভারের** সহিত সংযুক্ত থাকে। এই **তলগুলিকে** ইংরাজীতে **এলিভেটার** বলে। যখন ওপরে উঠবার দরকার হয়, তখন কর্ণধার তার পাশের **লীভারটীতে** টান দেয়। সংযুক্ত ছোট **তলগুলি** এই টানে ওপর দিকে উঠে পড়ে, এবং তাদের গায়ে বাতাস লাগাতে বিমানখানি ওপর দিকে মুখ করে ওপরে উঠতে থাকে।

বিমানকে নীচে নামবার দরকার হ'লে কর্ণধার **লীভার-টীকে** সামনে ঠেলে দেয়। তার ফলে **এলিভেটার** নেমে যায়।

হাল থাকে বিমান-দেহের সব পেছনে, অর্থাৎ তার পুচ্ছে। কর্ণধারের পায়ের কাছে একটা লোহার দণ্ড থাকে, এবং দণ্ডটি তার দিয়ে হালের সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। এই দণ্ডটিকে পা দিয়ে বাঁ ধারে চাপলে, বিমান বাঁধারে ঘুরবে, এবং ডান ধারে চাপলে ডান ধারে ঘুরবে।

এ ছাড়া বিমান দেহের সামনের দিকে একখানা **এঞ্জিন** থাকে, বড় বিমানে একাধিক **এঞ্জিন** থাকে। **এঞ্জিনটী** বা এঞ্জিনগুলি **চালক-যন্ত্রকে** বা চালক যন্ত্রগুলিকে গতি-বিশিষ্ট রাখে, এবং এই গতি-বেগে ভাসমান থেকে বিমান অগ্রসর হয়।

৪

পাঠকগণের অনেকেই বাল্যকালে ঘুড়ি উড়িয়েছেন। যাঁরা নিজে ঘুড়ি ওড়ান নি, তাঁরা নিশ্চয়ই অপর কাউকে ঘুড়ি ওড়াতে দেখেছেন, এবং ঘুড়ি কেমন ক'রে ওড়ে সে বিষয়ে তাঁদের অনেকটা জ্ঞান আছে। একথা কাউকে ব'লে দিতে হবে না যে ঘুড়িখানা যতটা স্থান অধিকার ক'রে থাকে, সেই স্থানের বায়ু অপেক্ষা ঘুড়িখানা অনেক ভারি। তা না হলে ঘুড়িখানা আপনিই উড়ে যেত। ঘুড়ির এক কোণ থেকে সামনের কোণ পর্যন্ত একটা সোজা সরু কাঠী কাগজের সঙ্গে জোড়া থাকে, এবং বাঁকী দুই কোণের একটী থেকে আর একটী পর্যন্ত একটা অর্ধ গোলাকার কাঠী লাগান থাকে। যেখানে অর্ধ গোলাকার কাঠীটা সোজা কাঠীটার ওপর দিয়ে পার হয়, সেই সঙ্গমস্থল থেকে সোজা কাঠীর যে অংশটি অর্ধবৃত্তের বাইরে থাকে সেটা ছোট অংশ, এবং যে অংশটা বৃত্তের ভিতর দিকে থাকে সেটা বড় অংশ। ছোট অংশের দিকটা ঘুড়ির মাথার দিক, এবং অপর দিকটা ঘুড়ির লেজের দিক। সোজা কাঠীটার প্রায় দেড় গুণ লম্বা এক গাছি সূতার এক প্রান্ত সঙ্গমস্থলে বাঁধা হয়, এবং অপর প্রান্তটি সঙ্গমস্থল ও লেজের মাঝামাঝি সোজা কাঠীটিতে বাঁধা হয়। এইরূপ ভাবে বাঁধা সূতাটীকে ঘুড়ির কল বলে। কলের মাঝখানে লাটাইয়ের সূতার প্রান্ত বাঁধা হয়। কল টেনে ঘুড়িখানা ঝুলিয়ে দেখা হয় ওর দুধারের ওজন সমান আছে কিনা, অর্থাৎ একদিকে কাত হচ্ছে কিনা। যদি এক ধার হাল্কা হয়, ওজন সমান রাখবার জন্য হাল্কা দিকে গোল কাঠীটিতে কাপড়ের একটি ছোট গুঁজি বা কান্নে লাগাতে হয়। সোজা কাঠীর নীচের প্রান্ত কাপড়ের একটা ছোট লেজও যোগ ক'রতে হয়।

যখন ঘুড়িখানা ছাড়া হয়, তখন যে দিক থেকে বাতাস আসছে, তার বিপরীত দিকে তাকে এমনি বেঁকিয়ে ধ'রতে হয় যাতে বাতাস তার গায়ে লাগে। প্রথমে তুমি এক হাতে লাটাই নিয়ে, অপর হাত দিয়ে ঘুড়িখানাকে ওপর দিকে ছুড়ে দিয়ে সূতো ছাড়তে ছাড়তে বাতাসের বিপরীত দিকে কিছু দূর দৌড়ুবে। সে সময় বাতাস না থাকলেও তোমার নিজেরও ঘুড়িখানার বেগে বাতাস উৎপন্ন হবে।

নিস্তব্ধ দিনেও একখানা মোটরকার রাস্তা দিয়ে বেগে দৌড়ে যাবার সময় বেশ বাতাস উৎপন্ন হয় দেখেছ,—তার প্রমাণ এই যে সেই সময় ধূলো ওড়ে।

তুমি সূতো ছা'ড়তে ছা'ড়তে সামনের দিকে যেমন যেমন দৌড়ুচ্ছ, ঘুড়িখানাও তেমনি তেমনি ক্রমে ক্রমে তোমার পেছন দিকে বাতাসের ওপর উঠছে। এইটের কারণ বুঝতে পারলেই তুমি বুঝতে পা'রবে এয়ারোপ্লেন বাতাসের ওপর কি কারণে ওঠে।

ঘুড়ির ওপর তিনটে বলের কার্য হয় (১) বাতাসের বেগ, (২) সূতোর টান, এবং (৩) মাধ্যাকর্ষণ।

(১) বাঁকান ঘুড়ির সম্মুখের পৃষ্ঠে বাতাস লেগে তাকে কোণাকুণি ভাবে ওপর দিকে ঠেলে তুলছে।

(২) সূতোর আকর্ষণ তাকে বিপরীত দিকে টানছে।

(৩) মাধ্যাকর্ষণ তাকে মাটির দিকে নামাবার চেষ্টা ক'রছে।

আচ্ছা, ঐ একখানা এয়ারোপ্লেন উড়বার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। একজন মিস্ত্রী বিমানের সম্মুখে গিয়ে চালক যন্ত্রটি জোরে ঘুরিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জিনখানা চীৎকার ক'রে সক্রিয় হয়ে উঠল, এবং চালকযন্ত্র প্রতি মিনিটে ১০০০ বার ঘুরতে লাগল। এই দ্রুত ঘোরার ফলে সেখানে জোরে বাতাস বইতে লাগল।

সেই বাতাসের ঠেল তার **এলিভেটিং প্লেনের** ওপর লাগতে লাগল। বাতাসের এই ঠেলে বিমানখানা তার রবারের টায়ার যুক্ত চাকার সাহায্যে মাটির ওপর সামনের দিকে কিছুদূর চলে মাটি ছেড়ে ওপরে উঠতে লাগল।

এখন বিমানখানা তার পাখার মত ছড়ান দু' ভাগে বিভক্ত বড় **তলটীর** বা **তল দুটীর** সাহায্যে বায়ুতে ভাসতে ভাস্‌তে চিলের মত পাক দিতে দিয়ে ওপরে উঠে গন্তব্য স্থানের দিকে উড়ে চলে যেতে লাগল। ঘুড়ির সঙ্গে বিমানের প্রভেদ এই যে, সুতোর টানের বদলে তাতে **এঞ্জিনের** টান পড়ে অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঘুড়ির সুতো টেনে রেখেছিল, তার বদলে **এঞ্জিন**খানা (হয়তো শত অশ্বের বল-সমন্বিত) তাকে সামনের দিকে টানছে।

প্লেনগুলির পেছনের ধার অপেক্ষা পাখীর ডানা দুটির অনুকরণে, সামনের ধার কিছু উঁচু ক'রে রাখা হয়। ঢাল যত কম থাকে, বেগ তত অধিক হয়। তবে ওপরে উঠার সুবিধার জন্য ঢাল অধিক রাখা আবশ্যক।

প্লেনগুলি প্রায়ই পাখীর ডানার মত, ঈষৎ গোল ক'রে বেঁকান থাকে—পীঠটা ওপর দিকে। ওপরে উঠবার সময় ঢাল অধিক থাকাতে **প্লেনের** দুপীঠেই বাতাস লাগে এবং ওপরে উঠবার বেগ বৃদ্ধি পায়।

প্লেন কথাটি এমন অনেক সময় বিমানের অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন **সী-প্লেন** বা **ওয়াটার-প্লেন**। **সী-প্লেন** বা ওয়াটার-প্লেনের নীচে দুখানা চাকার বদলে দুখানা ছোট নৌকো থাকে।

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল

প্রশ্ন

শ্রীমমতা ঘোষ

কোন্‌খানে তুই লুকিয়ে ছিলি—আকাশ মাঝে বুঝি?
তারা হ'য়ে রোজ নিশীথে গেছিস আমায় খুঁজি'!
গগন গায়ে দেখেছি যায় নিত্য সন্ধ্যা হ'লে—
সেই কি খ'সে পড়লি এসে মর্ত্ত্যে মায়ের কোলে?
আমার দূরের তারা—
মিষ্টি হেসে মাকে যে তুই কর্‌লি আত্মহারা।

কোথায় ছিলি জানার লাগি' থাক্‌ছি কুতূহলে,
শুক্তি বুকে মুক্তা হ'য়ে ছিলি সাগর জলে?
ঢেউয়ের তালে তালে যখন উঠ্‌ত সিন্ধু মেতে
দোলা লেগে তুই কি তখন আস্‌লি বাহিরেতে?
মায়ের কোলের 'পরে
তাই কি রে তোর হাস্‌তে গেলে মুক্তো কেবল ঝরে।

লুকিয়ে ছিলি কোন্‌খানে রে দে না আমায় ক'য়ে,
কানন আলো ক'রে ছিলি বুঝি গোলাপ হ'য়ে?
সৌরভে তোর মুগ্ধ মনে আস্‌ত সবাই পাশে,
ফির্‌ত বাতাস তোর কাছেতে গন্ধ মাখার আশে।
সে তুই শিশু রূপে
দিলি ধরা,—মায়ের হিয়া ভর্‌লি চুপে চুপে।

এই যে কোলে থাক্‌তে শুয়ে চাইছে অনুখন,
মিঠে হেসে কেমন ক'রে ভোলায় মায়ের মন।
ওর সুখেতে আনন্দ ফুল ফোটে মনের বনে,
কাঁদ্‌লে পরে গোপনে চোখ মুছি আঁচল কোণে।
দিচ্ছি আমি ক'য়ে,—
মায়ের বুকের মাঝ্‌খানে ও রয়েছে প্রাণ হ'য়ে।
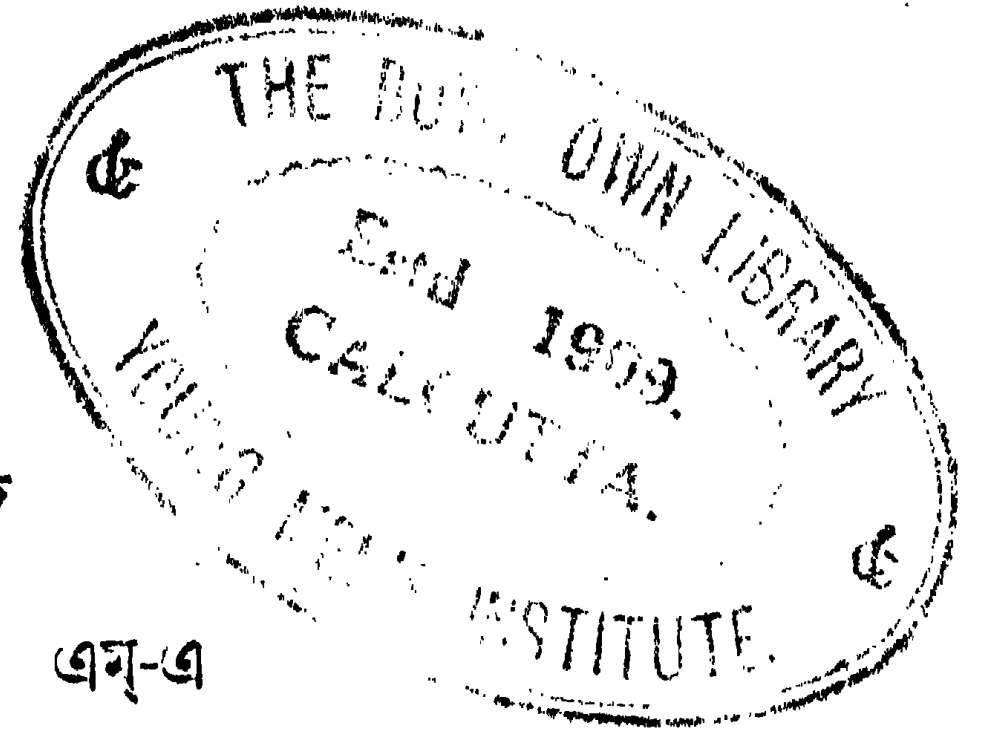
পাশ্চাত্য জড়বাদ

শ্রীনৃত্যগোপাল রুদ্র বেদান্তরত্ন, এম্‌-এ

বর্ত্তমান যুগের প্রতীচ্য দেশীয় বৈজ্ঞানিকগণের বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহারা বহু বর্ষ হইতেই বিশ্বের জড়শক্তির তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। কেপলার (১৫৭১-১৬৩০ খৃঃ অঃ), নিউটন (১৬৪২-১৭২৭ খৃঃ অঃ), লাপলেস (১৭৪৯-১৮২৭ খৃঃ অঃ) প্রভৃতি জগৎপূজ্য বৈজ্ঞানিকগণ যে চিন্তাধারার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণও সেই সব বিষয়ে সম্যক অনুশীলন করিতেছেন, চিন্তারাজ্যে নানাবিধ নূতন নূতন আবিষ্কার করিতেছেন এবং তাঁহাদের বিবিধবিষয়ক গবেষণায় জগৎকে চমৎকৃত ও বিমোহিত করিতেছেন। এডিংটন, জীন্‌স প্রভৃতি বর্ত্তমান কালের বিশিষ্ট চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিকগন এই বিশ্বের সৃষ্টি সম্বন্ধে যে মতবাদ পোষণ করেন, আমরা এস্থলে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই ক্ষুদ্র সন্দর্ভে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে যদিও আমরা নিয়তই জড়শক্তির বিবিধ বিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং যদিও এই জগতের বৈচিত্র্য জড়শক্তি হইতেই সমুদ্ভূত, তথাপি এই জড়শক্তির অস্তিত্ব চৈতন্যময় ব্রহ্মের অস্তিত্বের বাধা জন্মাইতে পারে না। আমরা বলিতে চাই যে জড়বিজ্ঞান ব্রহ্মবিজ্ঞানের প্রতিপক্ষ নহে; বরং জড়বিজ্ঞানের আলোচনায় ব্রহ্মবিদ্যারই পরিপুষ্টি লাভ হইয়া থাকে অথবা হওয়া সমুচিত।

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকারে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে এ বিষয়ে বহুকাল হইতেই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করিতেছেন, কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লাপলেসের নেবুলা বা নীহারিকাবাদ (Nebular theory) অনেকেই গ্রহণ করিয়াছেন। এই মতবাদ অনুসারে সূর্য্য ও নক্ষত্রগণ নেবুলা বা গ্যাসজাতীয় একপ্রকার পদার্থ হইতে সমুদ্ভূত। নীহারিকা বা নেবুলা হইতেছে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূলতত্ত্ব। এই নীহারিকা কি প্রকার? বিশাল আকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রের সমাহার অর্থাৎ নক্ষত্রপুঞ্জ পরিদৃষ্ট হয়। দূরবীক্ষণের দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় এই নক্ষত্রপুঞ্জ ব্যতীত আকাশে আর এক প্রকার সূক্ষ্ম বস্তুর সমাবেশ রহিয়াছে, সেই বস্তু সমষ্টিই হইতেছে নীহারিকা বা নেবুলা। নীহারিকা মতবাদে কথিত হয় যে গ্রহ নক্ষত্র সমুদয়ই এই নীহারিকা হইতে সঞ্জাত, এবং নীহারিকার অবশেষ ভাগ হইতে সূর্য্য উদ্ভূত।

যাহা হউক বর্ত্তমানে ঐ নীহারিকাবাদের স্থলে স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক স্যর জেমস হপউড জীন্‌স্ কর্ত্তৃক আবর্ত্তনবাদ বা Tidal theory প্রোক্ত হইয়াছে। এই মতবাদ অনুসারে কথিত হয়, প্রায় দুইশত কোটি বর্ষ পূর্ব্বে সূর্য্যের তরল আকার ছিল। সেই সময়ে এই সব গ্রহ নক্ষত্র কিছুই ছিল না। ঘটনাক্রমে একটি অতি বৃহৎ নক্ষত্র সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। তাহাতে সূর্য্যের মধ্যে এক ভীষণ আবর্ত্তনের সৃষ্টি হয়। যেমন পার্থিব সমুদ্রের জলে জোয়ারের উৎপত্তি হয় ইহাও সেই প্রকারের আবর্ত্তন। এই আবর্ত্তনের ফলে সূর্য্য হইতে তরল বিন্দু সকল ক্ষরিত হইয়া পৃথক্ পৃথক গ্রহ নক্ষত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই সকল গ্রহ নক্ষত্র সূর্য্যের ও সেই বিরাট নক্ষত্রের আকর্ষণ বশতঃ নানা আকারের কক্ষের অর্থাৎ ভ্রমণ পথের সৃষ্টি করিয়াছে। যাহা হউক এই বিশাল নক্ষত্র ধীরে ধীরে দূরে অতি দূরে অপসারিত হইয়া গিয়াছে। এই হইল পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদের আবর্ত্তনবাদ। জীন্‌স্ তৎপ্রণীত The Universe Around us, The mysterious Universe প্রভৃতি গ্রন্থে এই মতবাদ বিবৃত করিয়াছেন। ১৯৩৭ সালে ভারতে যে বিজ্ঞান সভা হইয়া গিয়াছে সেই সভায় এই মহাত্মা জীন্‌স্ সভাপতিত্ব করিয়াছেন।

জীন্‌সের মতে সূর্য্যের অংশ সমূহ যখন ক্ষরিত হইয়াছিল তখন বহুকাল ব্যাপিয়া সেগুলি অতি উষ্ণ ছিল। ধীরে ধীরে কতকগুলি অংশ শীতলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। পৃথিবীও তাহাদের মধ্যে একটি। এই পৃথিবী শীতলতা প্রাপ্ত হইয়া জীবের বাসের উপযোগী হইলে পরে ধীরে ধীরে ইহাতে প্রাণী সমূহের উদ্ভব হইয়াছে। এই স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে, যে সমুদয় গ্রহ পৃথিবীর মত মৃদু উত্তাপযুক্ত কেবল সেই সমুদয় স্থলেই প্রাণীর অধিবাস সম্ভবপর। যে সকল গ্রহে বা নক্ষত্রে ঐ প্রকারের আবহাওয়া নাই সেখানে প্রাণী সমূহ বাস করিতে পারে না। এই ব্রহ্মাণ্ডের অতি উত্তপ্ত ও অতি শীতল স্থান সমূহে প্রাণীর বাস আদৌ সম্ভব নহে। এই বিশাল বিশ্বের কোটি কোটি ভাগের এক ভাগও জীবের বাসের উপযোগী নহে। ইহাই জীনসের অভিমত। জীন্‌স্‌ বলেন যে তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে জীবের বাসের জন্য এই বিশ্ব পরিকল্পিত নহে, পরন্তু বিশ্বের অতি ক্ষুদ্র অংশে জীব সমূহ রহিয়াছে মাত্র; এবং বিশ্বের বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হওয়ার বহু পরেই সেই ক্ষুদ্র অংশে জীবের বাস সম্ভবপর হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাক্‌ প্রাণী সমূহের ভবিষ্যৎ কি ঘটিবে? দেখা যায় উত্তাপ ও আলোক যেখানে যেখানে জীবের উপযোগী আছে কেবল সেই সমুদয় স্থানেই জীবের বাস সম্ভবপর। কিন্তু চিরকাল ব্যাপিয়াই কি উত্তাপ ও আলোক এবম্বিধ ভাবে জীবের বাসের উপযোগী রহিবে? জীন্‌স্‌ বলেন ইহা সম্ভবপর নহে। কারণ সূর্য্য হইতে নিয়তই উত্তাপক্ষরণ হইতেছে। কালে সূর্য্য শীতল হইয়া গিয়া পৃথিবীর অতি শীতল অবস্থা ঘটাইবে, যেখানে জীবের বাস সম্যক অসম্ভব হইয়া পড়িবে। আর পৃথিবী যদি ধীরে ধীরে সূর্য্যের নিকটতর হইত তাহা হইলে হয় ত পৃথিবী স্বকীয় তাপ রক্ষা করিতে পারিত বটে, কিন্তু তাহা না হইয়া বরং পৃথিবী ধীরে ধীরে সূর্য্য হইতে দূরবর্ত্তী রহিয়া যাইতেছে। Dynamical Laws এর দ্বারা ইহাই আমরা অবগত হইয়া থাকি। প্রতি শত বর্ষে পৃথিবী সূর্য্য হইতে প্রায় একগজ দূরে অপসারিত হইয়া যাইতেছে। সুতরাং জীবের পরিণতি যে কি ঘটিবে ইহা সহজেই অনুমেয়। ত' ছাড়া বহুকাল পরে গ্রহ নক্ষত্রের কক্ষচ্যুতির সম্ভাবনাও রহিয়াছে।

জ্যোতিষের এই মতবাদ ব্যতীত পদার্থশাস্ত্রও এই একই অনুমান করিয়া থাকে। পদার্থ বিদ্যায় উক্ত হইয়াছে, সমুদয় বিশ্বের উপরিভাগে উত্তাপের সমীকরণ (uniform distribution of heat) ঘটিয়া থাকে। ইহাতেও অনুমান হয় কালে পৃথিবীতে উত্তাপের অভাবে জীবের জীবননাশ সুনিশ্চিত। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির যুগযুগান্ত পরে ঘটনাচক্রে বিশ্বে জীবের অস্তিত্ব ঘটিয়াছে, এবং আবার ঘটনাচক্রে জীবের বিনাশও সংঘটিত হইবে। ইহাই কি আমাদের শাস্ত্র বর্ণিত মহাপ্রলয়?

এই যে প্রাণীসমূহের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের প্রতি জড় বিজ্ঞান অঙ্গুলি সঙ্কেত করিতেছে ইহাতে জনসাধারণের মতে কি ভাব আসিতে পারে? কেহ হয়ত ভাবিবেন, তাহা হইলে জগৎস্রষ্টার আর প্রয়োজন কি রহিল? বাস্তবিক পক্ষে বহু শিক্ষিত ও শিক্ষিতম্মন্য ব্যক্তি জড়বাদে অনুপ্রাণিত হইয়া মনে মনে নাস্তিক্যবাদই পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এডিংটন, জীন্‌স্‌ প্রভৃতি জড়বাদী পণ্ডিতগণ জগৎকর্ত্তা সম্বন্ধে সেরূপ ভাবেন না। জীন্‌স্‌ বলেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বৈচিত্র্য দেখিয়া মনে হয় একটি পরতত্ত্ব রহিয়াছেন যিনি অসীম জ্ঞানের আকর, এবং সেই হেতুই এই প্রকারের ওতপ্রোতভাবে সম্বন্ধ যুক্ত বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব সম্ভবপর হইয়াছে। এই চিন্তাশীল পণ্ডিত জীন্‌স্‌ প্রকৃত পক্ষে মনে করেন যে সেই বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের মধ্যেই যেন এই মূর্ত্তজ্ঞানস্বরূপ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে। বাস্তবিক হিন্দুদর্শনেরও অনেকটা এই প্রকারই তাৎপর্য্য।

"যদেতদ্‌ দৃশ্যতে মূর্ত্ত মেতজ্‌ জ্ঞানাত্মনস্তব।
ভ্রান্তি জ্ঞানেন পশ্যন্তি জগদ্রূপ মযোগিনঃ॥
জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ।
অর্থ স্বরূপং পশ্যন্তো ভ্রাম্যন্তে মোহসংপ্লবে॥
যে তু জ্ঞানবিদঃ শুদ্ধ চেতস স্তেঽখিলং জগৎ।
জ্ঞানাত্মকং প্রপশ্যন্তি ত্বদ্রূপং পরমেশ্বর॥" বিষ্ণুপুরাণ।

তুমি জ্ঞানাত্মা; এই যে মূর্ত্তরূপ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা তোমার

জ্ঞানময় রূপ ; কিন্তু অজ্ঞেরা জগৎকে ভূতময় দেখিতেছে। অবুদ্ধিগণ জ্ঞানস্বরূপ এই অখিল জগৎকে অর্থরূপে (স্থূলরূপে) অবলোকন করত মোহসংপ্লবে (সংসার সাগরে) ভ্রমণ করিতেছে। হে পরমেশ্বর! যাঁহারা জ্ঞানবিৎ শুদ্ধচেতা তাঁহারা অখিল জগৎকে তোমার জ্ঞানাত্মক রূপ বলিয়া দেখেন।'

যাহাকে আমরা জড় বা প্রকৃতি বলিয়া থাকি তাহাও ব্রহ্মেরই শক্তি বিশেষ—প্রকৃতি শক্তি। "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনস্তু মহেশ্বরম্"। (শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ)—যিনি জগৎকর্ত্তা মহেশ্বর তিনিই মায়ী এবং তাঁহার মায়া শক্তিই হইতেছে প্রকৃতি।

শ্রীনৃত্যগোপাল রুদ্র

মৃত্যুদূত

শ্রীমতী সুপ্রভা দত্ত এম্-এ

কবির কথা ঃ)

ঝড়ের বাতাস দুয়ারে দিয়েছে হানা
জানি আমি আরো সাথে কেহ তার
অপেখিয়া আছে বাহিরে,
খুলিলে দুয়ার উতল হাওয়ায় নিমেষে নিভিবে দীপ
আর মোর তারে দেখা নাহি হবে কোনদিন।

তবু খুলে দিনু দ্বার।
এস এস ঘরে অতিথি আমার, নিশীথ দ্বিপ্রহরে
ঘুমের মাঝারে স্বপনের রূপে এসেছ যে কতবার।
কখনো এসেছ দিনের স্বপ্নে মধুর আলস ভরে
চম্পক ফুল-গন্ধ-মোহিত চৈত্রের বেলাশেষে।
অথবা বাহিরে কেঁদেছে যখন ব্যাকুল শ্রাবণ রাতি

সহসা নয়নে নিদ্ টুটিয়াছে, দু'হাতে বক্ষ চাপি'
চরণের ধ্বনি শুনেছি বাহিরে, শুনেছি মর্ম্ম মাঝে
চেতনায় আর বেদনায় মম জাগিয়াছে হাহাকার।
সেই তুমি আজি আসিয়াছ যদি ঝঞ্ঝার কলরবে
নিভাইয়া দীপ, দেহে আর মনে কঠিন আঘাত হানি
তবু খুলে দিনু দ্বার।

ফুল ঝ'রে যায় অশ্রুর মত, বহে
অশান্ত মত্ত বাদল বায়
বিজলী চমকে বাহিরে চাওয়া না যায়।
ঘন ঘন মেঘ গরজায় আর বজ্র খসিয়া পড়ে ;
দুই চোখে জ্বলে ভয় বিস্ময়, শুকায় নয়ন ধার
পথ নাহি আর, পথ নাহি আর,
মৃত্যুর রূপে এসেছ অতিথি, আপনি খুলেছে দ্বার।

বিদ্যুৎ দীপ ধরি'
দিকবধূ যত দেখিল তোমারে নয়ন ভরি'
দুয়ার খুলিতে দেউটী নিভেছে আঁধার ঘিরেছে ঘোর,
তবু ও মিনতি মোর,
বারেক আমারে ভীষণমধুর, দেখে নিতে
দাও ওরূপ বঁধুর
তারপরে চির রাত্রি তমসাময়ী।

(নারীর কথা :)
খুলে নাহি দিব দ্বার
নিদয় অতিথি, মিনতি শোন আমার।

তোমারে দিয়েছি মরমের যত সুকুমার সুখগুলি ;
একটি করিয়া যবে
কল্পনা মম পুষ্পের সম ফুটেছে সগৌরবে,
কোথা হ'তে কার বজ্র কঠিন পরুষ আঘাত আসি
ফুলবনে মম নির্ম্মম করে অনল দিয়েছে জ্বালি।
কতবার তব আহ্বানে আমি কম্পিত কলেবর
আশা আর ভয়ে হৃদয় বাঁধিয়া দুয়ার দিয়েছি খুলি,
হরিয়াছ তুমি আমার প্রিয়রে
আমারি আঁখির আগে,
ভূমিতে পড়েছি লুটি
জাগিয়া দেখেছি হৃদয় শয়নে নিভিয়া গিয়েছে বাতি।

আজি ঝঞ্চার রাতে
ফুল ঝ'রে যায় অশ্রুর মত,
বহে অশান্ত মত্ত বাদল বায়
বিজলী চমকে বাহিরে চাওয়া না যায়।
আজিকে আবার ভৈরব তব আহ্বান এল নাকি ?
নিদয়, তোমারে সাধ্য কি আমি
বলে যে ঠেকায়ে রাখি !
দয়া করো তাই, ক্ষমা করো অপরাধ
যত ভুল পরমাদ।
মোর মান নাই, লজ্জাও নাই, শরণ মাগিনু তাই,
ভীরু হৃদয়ের সজল আশায় জড়ায়ে রেখেছি যারে
করুণা মানিয়া হেলা ক'রে তুমি
ফেলে রেখে যাও তারে।
ফিরে যাও হে অতিথি, মিনতি শোন আমার
আজি ঝঞ্চার রাতে।

শ্রীসুপ্রভা দেবী

•যে ঘরে হ'ল না খেলা

শ্রীমতী ইলা হালদার

ঘড়িতে তিনটে বেজে গেল। কৃষ্ণা শয্যা ছেড়ে উঠে স্নানকক্ষে ঢুকল। কন্টিনেন্টাল স্নানকক্ষগুলো একটা বিলাসের মত। শ্বেতপাথরের মত নির্মল সাদা মেঝে, প্রকাণ্ড সাদা কাচের স্নানপাত্রে লাগান ঝকঝকে রূপোর মত দুটো ট্যাপ উষ্ণশীতল জলের। পালিশ করা দেওয়ালে নানা রকমের আলো আয়না খুঁটিনাটি অনেক আয়োজনে যত কিছু বিলাসের ব্যবস্থা। বিকেলের দিকে এখন বেশ গরম লাগে, কৃষ্ণা রোজ স্নান করে এ সময়টা।

আরো কিছু পরে চারটের পর কৃষ্ণা হোটেল থেকে বেরল। —জয় কখন আসবে কে জানে তার চেয়ে ওকে একটু অবাক করা যাবে হঠাৎ হাজির হয়ে ওর ওখানে। রাস্তার দুধারের দোকানের ব্লাইণ্ড তুলে দিচ্ছে। বুলভার্দএ ওয়েটাররা মস্ত মস্ত ছাতা খুলে তার তলায় চেয়ার টেবল্ সাজাচ্ছে বিকেলের পানাহারের আয়োজনে। ভিত্তোরিও ভেনিতো দিয়ে ট্রাম ভিয়া কুইরিনেলএর বড় রাস্তায় পড়ল, সেখান থেকে একটা খুব সরু রাস্তায় ঢুকে কিছুদূর যেয়ে ট্রাম শেষ হয়ে গেল। কৃষ্ণা নেমে অন্ধকার অপরিসর এক গলির ভেতর ঢুকল। এদিকে আগে কখন সে আসেনি। দুপাশে পুরোণো অপরিষ্কার বাড়ী রংওঠা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ময়লা কাপড়পরা মোটা ষণ্ডা গোছের লোকেরা, কেউ তামাক চিবুচ্ছে কেউ মাটির পাইপ মুখে দিয়ে বসেছে। নোংরা পোষাক ছেঁড়া জুতো, দাড়ি কামায়নি কতদিন। খালি পায়ে ছেলেমেয়ে খেলা করছে—ভীষণ ময়লা ছেঁড়া কাপড় তাদের। রাস্তায় লেবুর খোসা পুরোণো কাগজ যত জঞ্জাল ছড়ান—থুথুতে ভর্তি, পা ফেলতে ঘৃণা লাগে। দু একজনকে কৃষ্ণা বাড়ীটা কোথায় জিজ্ঞেস করলে। তারা এরকম ধরণের মেয়েকে কখন এদিকে আসতে দ্যাখেনি,—তাদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি অসভ্য ব্যবহার। কৃষ্ণা বিরক্ত হয়ে উঠলে—দূর ছাই কেন যে সে জয়ের কথা না শুনে এখানে আসতে গেল।

যাহোক অবশেষে বাড়ী খুঁজে বের করে ভেতরে ঢুকলে। ভেতরটা বেশ অন্ধকার, টিমটিমে একটা বাতি জলছে। দাগ লাগা পুরোণো কাঠের কাউন্টারের পাশে বসে একটি লোক, রংটা ম্যাড়মেড়ে হলদে, বিশাল ভুঁড়ি; মাথায় চকচকে টাক- ময়লা পোষাকের ওপর একটা apron—এককালে কালো ছিল সেটা, দাগ লেগে লেগে চিতাবাঘের চামড়ার মত চিত্রিত হয়েছে এখন। কৃষ্ণাকে দেখেই সে বলে উঠল—"আমরা মেয়েদের এখানে নিই না, বাইরে ত লেখাই আছে। জায়গা হবে না এখানে।"

এ রকম অভ্যর্থনার জন্যে কৃষ্ণা প্রস্তুত ছিল না। ভ্রুকুটি করে বল্লে—"কে থাকতে চায় এখানে—আমি থাকতে আসিনি। জয় মুখার্জি আছেন এ বাড়ীতে। তাঁর সঙ্গে দ্যাখা করতে চাই—শিগ্‌গির খবর দিন দয়া করে।"

লোকটি কৃষ্ণার দিকে ছোট চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ—কিছুমাত্র শীঘ্রতার লক্ষণ না দেখিয়ে ধীরে সুস্থে কানের ওপর থেকে একটা বেঁটে পেনসিল বার করে বল্লে, "আপনার নাম?"

কৃষ্ণা বল্লে।

"কোথা থেকে আসছেন?"

"হোটেল্ সাভইয়া।"

লোকটি লেখা থামিয়ে চোখ তুলে ফের তাকালে, তার পর বল্লে, "অ। তা আগে বলেন নি। বসুন বসুন। ওরে ও মার্কাস শীগগির শুনে যা—"

হোটেলটা ভদ্রশ্রেণীর, সেখান থেকে যে এসেছে সে

খুব সম্ভব টাকা ধার চাইবে না—বাড়ী ভাড়া না দিয়ে পালাবার দলেও এ নয় তাহলে—বাড়ীওলা ব্যস্ত হয়ে চীৎকার করলে, "ও মার্কাস শুনতে পাচ্ছিস না—"

অনুপস্থিত মার্কাসের কোন সাড়া শব্দ এল না।

"আঃ ছোড়াটা আবার গেল কোথায়—আচ্ছা বসুন—আপনি বসুন—আমিই যেয়ে খবর দিচ্ছি।" লোকটি ভূঁড়ি দোলাতে দোলাতে হাঁপিয়ে থপ থপ করে সিঁড়ি উঠতে লাগল। সরু খাড়া সিঁড়ি—ইটগুলো বেরিয়ে আছে, কৃষ্ণা তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। বাড়ীওলা আপ্যায়ন করে বসতে বল্লেও বসবার কোন আসন ছিল না। নীচু ছাতটা ঝুলে ভরা, দেওয়ালে কতকাল চুণকাম হয় নি, মেঝেতে ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করার প্রথা বোধ হয় এ বাড়ীর নেই। রসুনের গন্ধ, কাঁচা ম্যাকারণি আর পচা মাছের গন্ধে গলা বন্ধ হয়ে আসে। বিকেলবেলা অন্ধকারে বাতির মিটমিটে আলোয় দাঁড়িয়ে কৃষ্ণা ভাবতে লাগল জয়ের জমিদারীতে সাত মহলা বিশাল বাড়ী বিস্তীর্ণ উদ্যান, স্বচ্ছ দীঘির ধারে পদ্মফুলের গন্ধঘন অপরাহ্ন।...বালীগঞ্জের বৃহৎ বাড়ীতে বিকেলে এমন সময় নরম সবুজ লনে টেনিস খেলা আরম্ভ হত—তীক্ষ্ণ রুচি তীব্র সৌখীন ছেলেমেয়ের অতি উচ্চ হাসি গল্পে কলকাতার কোলাহলও হার মেনে যেত।...

জন তিনেক লোক গোলমাল করে কথা বলতে বলতে ভেতরে ঢুকল। প্রথমে অন্ধকারে তারা কৃষ্ণাকে দেখতে পায় নি—একজন হঠাৎ তাকে দেখে চুপ করে গেল। অন্য দুজন লোকটার দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণাকেও দেখলে। আস্তে আস্তে এগিয়ে তারা কৃষ্ণাকে ভাল করে নিরীক্ষণ করে দেখে তাদের ভাষায় কি বলাবলি করতে লাগল। কৃষ্ণা কাউণ্টারের কাছে সরে দাঁড়ালে, তারাও সরে এসে ওর হাতের সোনার কঙ্কনটা দেখিয়ে কি বল্লে। কৃষ্ণা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জানালে সে তাদের ভাষা বোঝে না। তারা ভাঙ্গা ছাতাপড়া দাঁত বের করে হেসে কি বল্লে, একজন কঙ্কণটা ঘুরিয়ে দেখে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল। কৃষ্ণা এক ঝটকায় ওদের হাত সরিয়ে দিয়ে সক্রোধে ভ্রুকুটি করে বল্লে, "সাহস ত কম নয়।"—

ওরা প্রথমে আশ্চর্য্য হয়ে গেল, তারপর ভয়ানক রেগে নোংরা থাবায় খপ করে ওর হাতটা টিপে ধরে এক টান মারল। পিছন থেকে জয় নেমে এসে লোকটার কাণের ওপর শুধু এক ঘুসি লাগিয়ে দিল। লোকটা কাউণ্টারের অপর প্রান্তে গড়িয়ে গেল। আর একজন তেড়ে হুমকি দিয়ে উঠতেই তার গালে জয় ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিলে। বাড়ীওলা জয়ের সঙ্গে নেমে এসেছিল—সে যতটা সম্ভব দূরে দাঁড়িয়ে লোকগুলোকে চেঁচামিচি করে গালাগালি দিতে লাগল। সবটাতে মিলে বেশ খানিকটা গোলযোগ। যাহোক এই শ্রেণীর ইটালিয়ানদের শক্ত জায়গা দেখলে নরম হয়ে যাবার অভ্যাসটি আছে—তারা বিড়বিড় করে বকতে বকতে বোধ হয় জয়কে শাসিয়ে একে একে সরে পড়ল।

কৃষ্ণার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে জয় বল্লে "তোমায় এখানে আসতে মানা করেছিলাম না—এখানে ভদ্র মহিলারা আসে!"

অনর্থক একটা গোলমালের সৃষ্টি হল তাকে নিয়ে—কৃষ্ণার কাণ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল—ঝাঁঝের সঙ্গে বল্লে, "এখানে ভদ্রলোকে থাকে। তুমি কি সমস্ত রোমে এর চেয়ে সভ্য জায়গা পেলে না থাকতে?"

"সভ্য আছে কিন্তু সস্তা ত নেই।" জয় হেসে বল্লে, "আর বাড়ীওলা বেচারার কথাও ত ভাবতে হবে—পাছে আমি বাড়ীর গন্ধে কস্তুরী মৃগের মত পাগল হয়ে পালাই বলে ফের পাঁচ লীরা ভাড়া কমিয়ে দিয়েছে। এটা কি কম কথা হল?"

দুজনে গলির বাইরে বেরিয়ে ট্রামে উঠল। কৃষ্ণা বল্লে "ভিয়া পিঞ্চিয়ানায় চল—আমার হোটেল থেকে কাছে হবে।"

পথে যেতে যেতে কৃষ্ণা বল্লে, "তোমার কি কাজ ছিল বলেছিলে—হল না সেগুলো?"

"হয়েছে কতক। বিজ্ঞাপনের অনুবাদ করে দেওয়া—ভারি মজার কাজ। কৃষ্ণা তুমি মোটা হতে চাও?—কিম্বা রোগা? গায়ের রং কোনটা চাও—গোলাপি কি বাদামি কি হলদে? চোখ বড় করতে চাও, নাক উঁচু করতে চাও, উর্ব্বশীর অনন্ত যৌবনের গোপন তথ্যটি চাও? যা খুঁজবে তাই পাবে আমার বিজ্ঞাপনের মধ্যে।"

"এই করে তোমার দিন চলে?"

"দিব্যি। কি যে তোমরা বলতে না? জমিদারীর আয় প্রজার রক্ত শুষে—বিলাসের বাহুল্য ব্যয়ের ব্যভিচার —আরো কত সব মনে নেই। এখন কি রকম ডিগনিটি অফ লেবার দ্যাখাচ্ছি দ্যাখো একবার।"

কৃষ্ণা কোন জবাব দিলে না। ট্রাম থেমে গেছে, দুজনে ভিয়া পিঞ্চিয়ানা দিয়ে হেঁটে চললো। বেশ ভিড় হয়েছে, সুন্দরীরা বন্ধুর সঙ্গে সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছেন। পুতুলের মত সাজান সুন্দর ছেলেমেয়ের দল—তাদের সঙ্গে শুভ্রবেশা সেবিকা। বুড়োবুড়ী হাত ধরে চলেছে—সৌখীন যুবা কেউ সখ করে ঘোড়ায় চলেছে। নগরের অপর প্রান্ত হতে এ যেন অন্য আর একটা দেশে এল তারা। খানিক দূর যেয়ে একটা বেঞ্চে বসল দুজনে। পথের পাশে শিশু অলিভ্‌এর সবুজ বেড়া, করবীর কুঞ্জে থোকা থোকা গোলাপি ফুল ফুটেছে—তার একটা অতি ক্ষীণ সুগন্ধ বাতাসে। পশ্চিমের আকাশ লালে লাল করে সূর্য্য অস্ত গেল, জয় সেই দিকে তাকিয়ে ছিল কৃষ্ণা তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। আগের মত ওর ঢেউ খেলান ঘন চুল মসৃণ ললাট সুউন্নত নাক সুদৃঢ় চিবুকের পাশটা। ললাটের ওপর চিবুকের পাশে কয়েকটা সরু রেখা দেখা দিয়েছে, গালের হাড়টা একটু বেশী স্পষ্ট হয়েছে, বড় বড় পক্ষ্মঘেরা চোখ—অনেকটা বসে গেছে। ঘাড়ের কাছে কোটের সুতো বেরিয়ে গেছে, কনুইয়ের কাছটায় জীর্ণ হয়ে গেছে—শার্টের কাফটা ছিঁড়েচে।

জয় কি বলতে যাচ্ছিল, মুখ ফিরিয়ে কৃষ্ণার দিকে চেয়ে থেমে গেল। "কি দেখছ কৃষ্ণা?"

"আচ্ছা জয় তুমি বিয়ে করবে না কোনকালে? সে কথাটা কখন ভেবে দেখেছ?"

জয় হেসে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসল। "হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? ওইটির কথা ভাবতে ত বড় ভুল হয়ে গেছে—তাইত। এখন এতদিন বাদে আমার মত চালচুলোহীন vagabondটিকে কোন মেয়ে শিবপূজোর পুরস্কার বলে গ্রহণ করবে বল।"

"মেয়ের অভাব নেই—মাটির হাঁড়ি কলসীর চেয়েও মেয়ে সস্তা—অন্তত বাংলা দেশে। তুমি বিয়ে করবে কিনা তাই বল।"

"ওকি কৃষ্ণা তুমি আজকাল ঘটকবৃত্তি ধরেছ নাকি! অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার সন্ধান দিয়ে বেড়াও?"

"রাজকন্যার সন্ধান রাখি না। তবে আমায় হলে চলবে তোমার?"

জয় এবার সত্যি অবাক হয়ে কোন জবাব দিতে পারলে না

"শুনতে পেলে?"

অনেক রকমের অনুভূতির অকস্মাৎ ধাক্কা খেয়ে ভয়ানক কেঁপে উঠল জয়ের মনটা। কিন্তু অনেক দিনের সুদৃঢ় সাধনায় সে সংযত করেছে তাকে। তখুনি সামলে সহজ হয়ে বল্লে "শুনতে ত পেলাম কিন্তু শ্রবণকে বিশ্বাস করি কি করে। অবলা অবোলা বঙ্গবালা ভীরু দুর্বলা সে কিনা এমন লজ্জাহীনা! হায় হায় গেল সমাজটা রসাতলে একেবারে।"

"কোন কালেই ত আমি লজ্জাবতী লতাটি নই। যে আওতায় ওসব বাড়ে সে সব আবদার জোটেনি আমার কোন কালে।"

"না তুমি লজ্জাবতী লতা নও কোনকালে।" কৃষ্ণার অতল কালো চোখের ভেতর চেয়ে খুব আস্তে জয় বল্লে "তুমি মরুভূমির কাঁটাভরা ক্যাকটাস্‌এর ফুল—খেয়ালী বিধির হঠাৎ খুসীতে সৃষ্টি—অদ্ভুত সুন্দর......"

করবীর ক্ষীণ মধুর গন্ধে বাতাস বিধুর হয়ে উঠল—পশ্চিমের রাগরক্ত আকাশ, ঝরা পদ্মের পাপড়ির মত কালো হয়ে এল।

কতক্ষণ পরে কৃষ্ণা বল্লে "আমার কথার জবাব দিলে না—"

জয় জেগে উঠে হাসলে তার করুণ হাসি বল্লে "কোন মেয়েকে বিয়ে করার সামর্থ্য আমার নেই। যাকে দারিদ্র্য থেকে বাঁচাতে পারব না তাকে জেনে শুনে দুঃখের মাঝে আসতে বলব কোন মুখে।"

কিছুক্ষণ ভেবে কৃষ্ণা বল্লে, "তোমার এ অবস্থায় জন্যে কাকে তুমি দোষ দাও? কে এনেছে এখানে তোমায়?"

"বাঃ আনবে আবার কে ?—কোন অবস্থায় আমার জন্যে আবার একজন গাইড চাই না কি।"

সংসারের খুঁতধরা লোকেদের ও একটা প্রিয় দুর্ব্বলতা সব দুঃখের জন্যে অন্যকে দায়ী করা। জয় বল্লে "এই ত ছাখো না জার্ম্মানী অষ্ট্রিয়ার দোর্দ্দণ্ড Hohenzolern, Hapsburg বংশ তাদের কেউ আজকে ড্রাইভার কেউ দোকানদার—কাকে দোষ দেবে তারা ? আমারও ভ্যানিটিটা নিজেকে তাদের দলে ভেবে মনে মনে বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করে নেয় মাঝে মাঝে।"

"ও সব কথা ছেড়ে দাও। সত্যি করে বল আমায় দায়ী কর না কি কখন কোন দিন ? আমিই তোমায় এপথে এনেছিলাম, বলতে গেলে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বস্বান্ত করে ছাড়ালাম আমিই ত ?"

কৃষ্ণার মুখের দিকে জয় তাকালে। "ও। সেই অনুতাপে আমায় বিয়ে করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছ ? দয়া ? দেখ কৃষ্ণা নাটক নভেলে ওগুলো চলে বেশ শোনায় ভাল।—নায়িকা নায়কের দারিদ্র্য দেখে অনুতাপানলে দগ্ধ হয়ে তাকে বরণ করলেন—কি বুকফাটান স্বার্থত্যাগ কি জ্বলন্ত পাতিব্রত্য—শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়। কিন্তু এটা ত নাটক নয়—কিছু ভুল করেছ কৃষ্ণা—সত্যিকারের জীবনে পুরুষেরাও একেবারে বোধশক্তি বিবর্জিত নয়—দয়ার দান তারা নেবেই বা কেন। তাদেরও আত্মসম্মান আছে—অন্তত থাকা উচিত।" সে উঠে পড়ল।

কৃষ্ণাও বিদ্যুতের মত ছিটকে উঠে দাঁড়াল। "আর মেয়েদের বুঝি কোন সম্মান সম্ভ্রম থাকতে নেই ?" এতদিন ধরে যাকে খুঁজে বেড়িয়ে যা বলবে বলে ভেবে রেখেছিল ক্রোধে দিশাহারা হয়ে ঠিক তার বিপরীত বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে,—সব তার গোলমাল হয়ে গেল।—"মেয়েরা কি পথের কুকুর—তোমার ফেলে দেওয়া অন্ন চেটে চেটে খেয়ে মোটা হবে ?—না তাদের ভাব জঙ্গলের জোঁক—রক্তশোষা তাদের ব্যবসা ? নিজে যখন দয়ার ওপর এত চটা অন্যকে দয়া ছাখাতে এসেছিলে কোন স্পর্দ্ধায় ? আমি অত্যন্ত গরীব—গরীবের আবার আত্মসম্মান কি—তাই ভিক্ষে দিয়ে অপমান করতে সাহস হয়েছিল, না ? সমস্ত ভিক্ষে দিয়ে কলির হরিশ্চন্দ্র সাজা হয়েছে ? তোমার দয়াকে আমিও ঘৃণা করি—তোমার দয়াকে গ্রহণ করেছি সে জন্যে এখন নিজেকে ঘৃণা করছি। তোমার ভিক্ষে যা বাকি আছে আমি এই মুহূর্ত্তে দিচ্ছি ফিরিয়ে—যা খরচ হয়েছে—তা যতদিন না পরিশোধ করতে পারব কলঙ্কিত হয়ে থাকবে আমার জীবন। তোমার দয়ায় বেঁচে থাকার চেয়ে ফাঁসিতে ঝুলে মরা ভাল—" কৃষ্ণা দ্রুত চলতে আরম্ভ করলে।

জয় ওর গতিরোধ করে দৃঢ়মুষ্টিতে হাত চেপে ধরল। গম্ভীর স্বরে বল্লে, "যেও না, বস। আজকে একটা প্রশ্নর জবাব চাই, বলে দিয়ে যাও। তোমার আমার ভাল লাগে কি লাগে না এসব প্রশ্নে এসব মধুর অপচয়ে তোমার অবসর নষ্ট করিনি কোনদিন। তোমার কাছ থেকে অনেক অপমান পেয়েছি, অনুযোগ করেছি কখন বলে মনে হয় না। আজকে আমার কথাটার জবাব দিয়ে যাও। এতদিন কখন এ প্রশ্ন করিনি—ভয় ছিল ভাববে কোন পাওনার দাবী করব পরে। আজকে আমার দাবী করবার মত কোন জোর নেই—আজকে বলে যাও। তোমার সঙ্গে আমার আচরণে ব্যবহারে কথায় বার্ত্তায় কর্ম্মে সাধনায় যে পরিচয় সে কি শুধুই দয়া বলে মনে হয় তোমার ? তার চেয়ে বেশী তার চেয়ে নিকটতর মধুরতর আর কিছু নয় ?"

কৃষ্ণা জয়ের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত নিরুত্তরে চেয়ে রইল। তারপর অনুচ্চস্বরে বল্লে "আর আমি তোমায় শুধু দয়া ছাখাতে এলাম এতদিনে এই তুমি বুঝলে আমায় ?

ভোরের সূর্য্যের আলোয় আলোয় ঘর উঠেছে ভরে। জয় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শেভ করছে কৃষ্ণা তখনও কুড়েমি করে শুয়ে শুয়ে কি একটা বই পড়ছে। দাসী প্রাতরাশ নিয়ে এসে দরজায় করাঘাত করলে। কৃষ্ণা বইয়ের আড়াল থেকে বল্লে, "দরজাটা খুলে দাও না যেয়ে।"

"আমি শেভ্ করছি যে—"

"হলেই বা। মেডগুলো ত এমনিতেই তোমার প্রেমে পড়ে আছে—আর বেশী সাজগোজের দরকার কি।"

"হায় হায় কৃষ্ণা তুমি কি আমার প্রেমে পড়বার জন্তে হোটেলের মেড্ ছাড়া আর একটু ভদ্রগোছের কাউকে পেলে না।"

দরজা খুলে দিতে দাসী এসে প্রাতরাশের থালা বিছানার ধারে টেব্‌ল্‌এ রাখল, সুমিষ্ট হেসে সুপ্রভাত জানিয়ে চলে গেল। কৃষ্ণা আড়চোখে তার পানে তাকিয়ে বল্লে, "কিন্তু সত্যি এদেশের দাসীকেও দেখতে যেন রাণীর মত।"

তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে জয় বল্লে, "কেন পুরুষেরাই বা মন্দ কিসে। ওয়েটারদের চেহারায় মনে হয় ওরা খাবারটা পরিবেষণ করেই রাজ্যশাসনে বসে যাবে।"

"আমার চকোলেটটা ঢেলে দাও না।"

জয় ধূমায়িত চকোলেট পেয়ালায় ঢেলে তাতে ক্রিম মেশাতে মেশাতে বল্লে, "আচ্ছা কি পড়া হচ্ছে—এত কুড়েমি আজ—"

কৃষ্ণা পড়ে শোনালে—"সখি কা পুছসি কৈছন কেলি, কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইনু না বুঝিনু কৈছন কেলি—"

জয় বিছানার পাশে পেয়ালাটা সরিয়ে এনে রাখলে। কৃষ্ণা হাত বাড়িয়ে তার মুখটা নিজের মুখের ওপর টেনে আনলে, আলস্যবিজড়িত স্বরে বল্লে, "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল—যুগ যুগ হিয় হিয়াপর রাখিনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল—"

জয়ের তীব্র দীর্ঘ চুম্বনে ওর কথার সবটা শেষ হল না।

সাতদিন হল কৃষ্ণাদের বিয়ে রেজিসটার্ড হয়েছে। জয় তার বাড়ী ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণার কাছে এসেছে। কৃষ্ণা জয়কে নিয়ে যেখানে যত দোকান ঘুরে ঘুরে ওর কাপড় চোপড় কিনেছে বেছে বেছে। জয় আপত্তি করে বলেছে, "কি বিপদ, কনের জন্তেই ত trousseaw কেনার নিয়ম—তা নয় আমায় নবকার্ত্তিকের মত বর সাজতে হবে নাকি এই বয়েসে?"

কৃষ্ণা ধমকে উঠেছে "থাম তুমি। যা চেহারা করে বেড়াচ্ছিলে যেন একটি ঝোড়ো কাক। আর কথায় কাজ নেই।"

অনেক দোকানের অনেক রকম কাপড়ের স্তূপ থেকে কাপড় বেছে বেছে নেওয়া। নানারকমের শার্ট থেকে দেখে ঠিক করা, টাইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে মোজা রুমাল বেছে বার করা, এর মাঝে ভারি একটা মজার তৃপ্তি আছে।—তা ছাড়া জয়ের জন্যে জিনিষ কেনা।......

হোটেল থেকে ওরা যখন বেরল, বেলা বেড়ে উঠেছে—রাস্তায় ভিড় জমেছে ক্রমে। কৃষ্ণা বল্লে, "চল Forumএ বেড়িয়ে আসব একবার।"

"আচ্ছা রোজই কি ওই পাথরের ঢিবিগুলো একবার তোমার দ্যাখা চাই?"

"হ্যাঁ। সত্যি কিন্তু ওসব দেখে দেখে পুরোণো হয় না—ওগুলো আমায় fascinate করে।"

"কোনটা তোমায় fascinate করে না বলতে পার। মিউসিয়ামের হিজিবিজি ছবি—হাত পা ভাঙ্গা মূর্ত্তি ঘাসের ফুল কাচের মালা রাজ্যের ruins—সবই ত শুনি তোমায় fascinate করে।"

কৃষ্ণা হাসলে, কিছু বল্লে না। জ্বলন্ত সোনার মত নিকষিত আনন্দ ঝলসিত এই দিনগুলো—গাঢ় রক্তিম মদিরার মত ঘন মদিরোজ্জ্বল রাত। সকাল থেকে চোখ মেলে সে যা দ্যাখে,—ঘরের তুচ্ছতম জিনিষগুলো থেকে বাইরে বাড়ীর সারি সাজান দোকান ভিড়ভরা বাজার লোকচলা পথ সবই অত্যন্ত মধুর মনে লাগে—খুশীতে ঝলমলিয়ে ওঠে চিত্ত। মনে হয় আকাশে এত নীলরংও ছিল? আলোর এত সোনা, সংসারে এত সৌন্দর্য্য, জয়ের মত এমন সুন্দর মুখ ছিল জগতে! নগরের নানা কোলাহল মোটরের আওয়াজ পথযাত্রীর কথাবার্ত্তা পথবর্ত্তী গাছে পাখীর ডাক এত মিষ্টি লাগে? জয়ের উচ্ছল হাসির মত এত মিষ্টি হাসতে পারে মানুষে।......এতদিন অনুভূতি তার ঘুমিয়েছিল দুঃস্বপ্নে, জয় নিয়ে এল সোনার কাঠি—জাগাল তাকে এক নতুন জগতে। ওর এতদিনের সুপ্ত অন্তর আজকে সহসা জেগে তৃপ্তিহীন তৃষায় যত কিছু আনন্দকে নিঃশেষ করে নিতে চায় নিশ্বাসের মত মুহূর্ত্তে। এতদিনের শূন্যতাকে ভরে দিতে চায় অন্তহীন সুখে।

ফোরামএ ঢুকে তারা খানিকটা এদিকে সেদিকে

বেড়ালে। পালাটাইন, ক্যাপিটোলাইন আর কুইরিনাল এই তিন পাহাড়ের পায়ের কাছে সমতল জায়গাটা ফোরাম। বহুদিন আগে ল্যাটিনরা Alban পাহাড়ের সাদা শীতের দেশ ছেড়ে টাইবারের ধারের রৌদ্রঝলসিত রাজ্যে এল তখন থেকে তারা এই পাহাড়ের পায়ের মাটি অনেক রক্তে অনেকবার ভিজিয়েছে। শেষকালে নাকি রোমান ও সাবাইন দুদলে সন্ধি করে এখানে স্থাপন করলে ফোরাম—বাজার। সেই ফোরামকে ঘিরে ধীরে গড়তে লাগল রোমের গৌরব, ইম্পিরিয়াল যুগে, রীগাল যুগে রিপাব্লিকের যুগে রোমের দুরবিস্তৃত সভ্যতার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হত এইখানে এই ফোরামের ভেতরে। ফোরামের চারিধার ঘিরে যত দেবদেবীর মন্দির—ষ্টেটএর গুরু কার্য্য সম্পাদনার স্থান। এখানে ছিল Curia—সেনেট গৃহ, Comitium—এখন যাকে বলা চলে assembly, Regia.—Pontiff দের কলেজ, Saturn—সতুর্ণোর বেদী, ভলকানের বেদী, Janus-এর মন্দির, ভেস্তার মন্দির, ভেস্তাল ভারজিনের থাকবার বাড়ী। দিনে দিনে যুগে যুগে রোম যত উন্নত হয়েছে এই ফোরামএ তার সমৃদ্ধির ছাপ রেখে দিয়ে গেছে।—বহু কীর্ত্তির ধ্বংসভরা এ এক স্তব্ধ পাষাণ সমুদ্র archaeologist ঐতিহাসিক মিলে অনেক কষ্টে এর অন্তহীন ইতিহাসের পরিমাপ সংগ্রহ করে বেড়ায়।

ঘুরে ঘুরে জয় ও কৃষ্ণা তাদের প্রথম দ্যাখার জায়গাটায় এল। জয় দেখিয়ে বল্লে, "এখানে ছিল ভেস্তার মন্দির। মন্দির ঠিক বলা যায় না, ওতে ত কোন মূর্ত্তি ছিল না, শুধু হোমবেদী—ওর নাম aedes অর্থাৎ নিকেতন। ভেস্তা হল প্রতিঘরের হোমাগ্নির পবিত্র প্রতীক। সমস্ত সাধারণকে নিয়ে ষ্টেট্এর যে মস্ত বড় সংসার—এ হল তারই হোম বেদী।"

অগ্নিপূজার এই cult রোম সৃষ্টির অনেক আগে রোমক সভ্যতার অনেক আগে মানুষের সৃষ্টির ইতিহাসের প্রথম পাতায় ফিরে যায়। যখন মানুষ সবেমাত্র অগ্নিজয়ী হয়েছে—অনেক সাধনায় সাবধানে আগুনকে জ্বালাতে হয় বহু বৃষ্টি বাতাস দুর্যোগের হাত থেকে তাকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। ইতিহাসপূর্ব যুগ থেকে মানুষ আগুনকে রক্ষা করেছে—মিসরে, পারস্যে, ভারতবর্ষে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণরা অগ্নিকে অনির্বাণ রেখেছে, প্রাচীন ল্যাটিনবংশে mater-familias তাদের গোল গঠনের তৈরি কুটিরে আগুনের উপাসনা করেছে। তাদের দেখে সেই গোল ছাঁচের অগ্নি নিকেতন রোমএ প্রথম পত্তন করলেন রীগাল যুগে Numa। খুব দামী পাথর দিয়ে মনোরম কারুকার্য্যময় করে তৈরী করা হল একে, সেপ্তিমো সেভেরোর রাণী জুলিয়া ও অন্য অনেকে একে অনেকবার সাজিয়ে সুন্দর করেছিলেন। এখন কঙ্কালের মত কয়েকখানা পলকাটা পাথর পড়ে আছে ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে চারিদিকে।

"এর পাশে ওইখানে সেদিন হঠাৎ তোমায় দেখলাম।—কৃষ্ণা জান ত ও জায়গাটা কি—ওইখানে ভেস্তাল ভারজিনরা থাকতেন—তাঁদের বাড়ী ছিল ওখানটায়। এত জায়গা থাকতে ওখানেই তোমার দ্যাখা পেলাম কেন বলতে পার?" সকৌতুকে বল্লে, "আড়াই হাজার বছর আগে—তখনও তুমি ওখানে থাকতে নাকি? ওই রকম সাদা কাপড় পরে—ছজন অগ্নি রক্ষিকার একজন?"

কৃষ্ণা বল্লে, 'তা হলে তোমারও ত কাছাকাছি কোথাও থাকতে হয়েছিল।"

"আমিও ছিলাম—জান না বুঝি। তাহলে শোনো গল্প—" কপট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বল্লে "ওই যে দ্যাখা যায় কলোসিয়ামের কালো দেওয়াল ওর তলার স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার কুঠরীতে আমি ছিলাম। একদিন কলোসিয়ামের থাক দেওয়া পাথরের গ্যালারিতে নীচে থেকে ওপর অবধি লোকে ভরে যেত। কোলাহলে কান কালা করে দিত। সব থেকে সামনের শ্রেণীর সিংহাসনে রোমের সীজার বসতেন, তাঁর ঠিক পাশে শুভ্রবসনা ভেস্তাল ভারজিন ছ'জন। মাটির তলার ছোট কুঠরীর দরজাগুলো খুলে খুলে দিল—কত যোদ্ধা এল, কেউ বর্শা কেউ অসি কেউ ভল্ল নিয়ে, বন্দীরা এল, ক্রিশ্চান যারা ধরা পড়েছে তাদের এনে ফেলে দিল। ক্ষিদেতে ক্ষিপ্ত বাঘ সিংহের খাঁচাটা খুলে দিল—জন্তুগুলো সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে উঠে এসে ওদের ওপর পাগলের মত লাফিয়ে পড়ল। তারপর কী ভীষণ রক্তপাত, মানুষে পশুতে মানুষে মানুষে কী বীভৎস বর্বর নিষ্ঠুরতা—"

জয় অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে গেল। "প্রাচীন ভারতে যে সময় বুদ্ধের বাণী শুনেছে লোকে, অশোক অহিংসা ব্রত গ্রহণ করে সেবাধর্ম শেখাচ্ছেন সকলকে—দয়া করো সেবা করো—শুধু মাত্র মানুষকে নয়, পশু পাখী কীট পতঙ্গ—যারা তোমার চেয়ে অনেক নীচে, যাদের বলবার ভাষা নেই, চাইবার শক্তি নেই, তাদেরও দুঃখে দরদী হও। তখন সেই যুগে, এই রোমের রক্তপিপাসু সভ্যতা রাক্ষসীর মত মানুষের মনকে বর্বরতায় বিকৃত করে তুলেছে—সাম্রাজ্যের নামে, শাসনের নামে কৌতুকের নামে, নৃশংস বীভৎসতা নিত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আর সেই সভ্যতার গর্বে মুসোলিনি আজকে কথায় কথায় বেলুনের মত ফুলে উঠছেন।"

কৃষ্ণা বল্লে "কি হল তারপর ?"

"ও, হ্যাঁ। তারপর একজন মুখোস পরা গ্ল্যাডিয়েটার আর একজনকে হারিয়ে তার ওপর চেপে বসেছে, ছুরিটি তুলে ধরেছে, বসিয়ে দিলেই হয়, শুধু ভারজিনদের অনুমতির অপেক্ষা। তাঁদের কথাই ষ্টেটএর সব থেকে বড় বিধান কিনা। হেরে যাওয়া লোকটা কত খোসামোদ করছে—ঠাকরুণরা, দাও বাপু ছেড়ে দাও—রোজ স পাঁচ আনার সিন্নি দেব তোমাদের—কিন্তু সিন্নির ঘুষে কি ভারজিনদের মন ভেজে, চোখ কটমটিয়ে আঙ্গুল নীচু করে দ্যাখালেন—মানে মারো। সেখানের সমবেত জনতা ভারজিনদের সংযমকঠোর মনের নির্মমতায় সভয় শ্রদ্ধায় ভরে উঠল—কলোসীয়ামের নীচে থেকে ওপর পর্য্যন্ত শব্দের ঢেউ উঠল—মেরে ফেলো মেরে ফেলো। আমার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল—আমার কথাটি ফুরোলো।"

কৃষ্ণা কোন কথা বল্লে না। সে ব্যথিত হয়েছে বুঝে জয় তাড়াতাড়ি বল্লে "এই পাথরের প্রকাণ্ড গামলাটা দ্যাখো কৃষ্ণা,—এতে কি হত বল দেখি ? এইতে পুণ্যজল থাকত—যেমন আমাদের মন্দিরে গেলে ছড়িয়ে দ্যায় না। আর এই জাঁতাটি দেখেছ, একে কি আর জাঁতা বলে বোঝা যায় কিন্তু এই দিয়ে ভারজিনরা গম পিষতেন। আগে mater familiasদের কর্ত্তব্য ছিল সংসারের সকলের জন্যে খাবার তৈরী করা—ভারজিনরাও তাই রুটি করতেন—তাকে বলত mola salsa। জুন মাসে একবার করে এই রুটি বিতরণ হত, সাধারণের প্রতিনিধিরূপে ষ্টেটএর সব থেকে বড় বিচারক যাঁরা তাঁরা রুটি পেতেন। আগে এটা দোতলা ছিল—এখন দেখেছ কি ভাবে ভেঙ্গে গেছে। চল ওদিকে, সতুর্ণোর মন্দিরের কাছে যাবে ?"

সতুর্ণো ল্যাটিনদের প্রাচীন কৃষি দেবতা; পালাটাইন পাহাড়ের পায়ের কাছে প্রথমে শুধু সতুর্ণোর পূজা-বেদী ছিল। তার ওপরে আড়াই হাজার বছরেরও কিছু আগে Consul Titus Lartius মন্দির তৈরী করে দেন। মন্দিরের বাৎসরিক প্রীতিভোজন Saturnalia রোমের সুবিখ্যাত উৎসব ছিল। মন্দিরের শুধু সাত আটটি ঋজু দীর্ঘ স্তম্ভ এখন সেদিনের শ্রীসুন্দর অপূর্ব কারুকলার চিহ্নরূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জয় বল্লে, "সাধারণের যত ধন সম্পত্তি এইখানে জমা থাকত। এ মন্দির যখন জুলিয়াস সিসারএর শাসনে আসে তখন এতে পনের হাজার সোনার তিরিশ হাজার রূপোর ইট ছিল, আর তিরিশ মিলিয়ান Sestertii. এর আরেকটা নাম ছিল Aerarium। যখন ক্রীশ্চান আমলে পূজো বন্ধ হয়ে গেল তখনও এখানে কাজ চলত office হিসেবে।

কাছেই সেখানে আর এক মন্দিরের তিনটি পলকাটা থাম দাঁড়িয়ে রয়েছে, কৃষ্ণা সেদিকে দেখিয়ে বল্লে, "ওইটা কি বলতে পার—তুমি ত আমার বিনা মাইনের গাইড।"

"ওটা ষ্টেট্ থেকে করিয়েছিল—Vespasian আর Titusএর মন্দির"- হেসে বল্লে, "তা মজুরি যদি দাও না বলব ভেব না।

"ইস মজুরিই যদি দেব—তোমায় নেব কেন।"

"কি বল্লে—আমার কাজের কোন মজুরিই হয় না—উঃ কি অবজ্ঞা—এ ত আর সহ্য হয় না।"

কৃষ্ণা সুন্দর ভুরুটা তুলে সকৌতুকে বল্লে, "আহা courting for compliments—আমাকে দিয়ে বলাতে হবে—ওগো সুন্দর তোমার কাজের কী মজুরি দেব—সে অমূল্য—"

জয় হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে গেল, কৃষ্ণা তার হাতে বেশ জোরে একটা চিম্‌টি কেটে লঘু ক্ষিপ্র পদে পাথরের ওপর দিয়ে চলতে লাগল।

"আরে কর কি—আস্তে চল। আচ্ছা শোনো, আর একটা গল্প বলব—তুমি যুতুর্ণা ঝরণা দেখেছ?—সেখানে চল শুনবে।"

"না আজ যাব না, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। এ খিলানগুলো কি ছিল বলতে পার?"

"কেউ ত বলেন এগুলো দরকারি কিছুই নয়। Boni বলে একজন বলেন এ ছিল Rostra—তখনকার বক্তৃতা-মঞ্চ। দু হাজার বছর আগের Lollius Pulikanusএর টাকায় যে Rostra ছাপ আছে তিনি বলেন সেই নাকি এই। তা যদি হয় তাহলে এইখানে দাঁড়িয়ে সিসারের হত্যার পর এণ্টোনি তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা দিয়েছিলেন।"

"বল কি!—এইখানে—" কৃষ্ণা পাথরগুলোকে সসম্ভ্রমে ছুঁয়ে দেখলে। এই ভগ্ন পাষাণ শুনেছিল সেদিনে তরুণ বীরের বন্ধুবিয়োগব্যথিত উদ্বেল কণ্ঠের জ্বালাময়ী ভাষা। চারিধারে রোমক নাগরিক দল—শুভ্র টোগা—ভূলুণ্ঠিত উত্তরীয় কারোর, উত্তেজনায় অধীর আবেগে অস্থির কখন।

"আরো পরে সিসেরোর কাটা মাথা ও হাত পা Rostraর ওপর ফেলে রেখে দিয়েছিল লোককে দ্যাখাবার জন্যে। তা বলে এই ভাঙ্গা ঢিবিই যে সে জায়গা তা নাও হতে পারে।"

"নাও হতে পারে? কেন শুনি? তুমি একটা sceptic—নাকের, ওপর যা দেখবে তাও বিশ্বাস করবে না। এ্যান্‌টনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন এটা ত ঠিক—ফোরামের ভেতরে দিয়েছিলেন তাও ঠিক—তবে এই যে সে জায়গা নয় তা ধরে নেবই বা কেন?"

"ব্যস একদম অকাট্য যুক্তি। ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান সেও রোমে জন্মেছে আর জুলিয়াস সিসারও রোমে জন্মেছেন—তবে এই গাড়োয়ানই যে তিনি তা ধরে নিতে দোষ কি।"

"আচ্ছা খুব হয়েছে। যে জোর করে চোখ বন্ধ করে রাখবে তাকে কেউ কিছু দ্যাখাতে পারে না।"

"জোর করে চোখ বন্ধ করে থাকা হল?—চোখকে ড্যাবডেবে করে খুলে রাখলেও এখানে কল্পনাকে রীতিমত কষ্ট দিতে হয়।"

এমন কল্পনাহীন লোককে দ্যাখাবার চেষ্টা বৃথা। কৃষ্ণা রাগ করে কথা না বলে চলতে লাগল।

"রাগ হল?—আচ্ছা দ্যাখো এবার দ্যাখাচ্ছি সত্যি important এক জায়গা।"

রোদ বেড়ে উঠেছে। ওরা ভাঙ্গাচোরা পাথরের অলিগলি দিয়ে এল যেখানে, এক বেদীর পাথর সব আলগা হয়ে খুলে রয়েছে—দু এক খানায় এখনও একটু কারুকার্য্য লেগে আছে। জায়গাটাকে বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে ওপরে করোগেট দিয়ে ঢাকা

জয় বল্লে, "পম্পি থিয়েটারে জুলিয়াস সিসারকে মেরে ফেলবার পর তাঁর দাসেরা যে শিবিকায় তিনি গেছলেন সেখানে সকালে ফের তাইতে করে তাঁর দেহকে নিয়ে এল এখানে। কোথায় দেহকে দাহ করা হবে এই নিয়ে তুমুল তর্কের পর তাঁর ভক্তরা ঠিক এইখানেই তাঁকে দাহ করে স্মৃতি-বেদী তৈরী করে দেয়—"

কৃষ্ণা ব্যস্ত হয়ে বল্লে, "এই সেই বেদী?"

"না না, তারপর কতবার কত শাসক নেতার ইচ্ছা অনুযায়ী কখন এখানে বেদী ভেঙ্গেছে কখন গড়েছে। তারপর দু হাজার বছর আগে সিসারের তিন ভক্তে মিলে এইখানে তাঁর নামে এক মন্দির উৎসর্গ করে। যে জায়গায় তাঁর চিতা জ্বলেছিল ঠিক তার ওপর তৈরী করলে মন্দিরের এই পূজাবেদী।"

"মন্দির ছিল এখানে?"

"হ্যাঁ, দ্যাখনা তার চিহ্নও এখন খুঁজে বার করা মুস্কিল।" এত মতদ্বৈধের পর যে মন্দির গড়ে উঠল—আবার তা নিশ্চিহ্ন হয়ে ভেঙ্গে চলে গেল। জয় বল্লে "সাক্রা ভিয়ায় সিসারের যে বাড়ী তাকে এখনও archaeologist খুঁজে বার করতে পারেন নি। পম্পি থিয়েটারে যে ঘরে তাঁকে মেরেছিল তাও বোঝা যায় নি, যে মূর্তির পায়ের তলায় তিনি আহত হয়ে পড়ে গেছলেন তাও হারিয়ে গেছে। রোম'এর এককালের সর্বশক্তিমান শাসকের এই একমাত্র শেষ চিহ্ন।"

ক্ষিপ্র উন্মত্ত জনতার তাণ্ডব কোলাহল। তার মাঝ দিয়ে চিতার আগুন জ্বলে উঠল—আগুনের লকলকে

শিখাগুলো তৃষিত জিভ দিয়ে নিষ্কলুষ আকাশকে চেটে শেষ করতে চায় যেন। দেশের একজন পরম প্রেমিককে লোকে নৃশংসভাবে হত্যা করল সেদিনে,—দেশেরই নাম দিয়ে।......হত্যা, তার উদ্দেশ্য যতই উচ্চ হোক তা দিয়ে নির্মল সাফল্য কই এল।......কৃষ্ণা অবনত মস্তকে স্তব্ধ হয়ে রইল।

ওর মনের কোনখানে দ্বন্দ্ব বুঝতে বিলম্ব হল না জয়ের। সে তাকে বাহু দিয়ে বেষ্টন করে স্নিগ্ধস্বরে বল্লে, "চল ফিরে যাই কৃষ্ণা।"

সে রাতটা পুর্ণিমার। ইটালীর নীল নিবিড় আকাশে জ্যোৎস্নার শুভ্রোচ্ছ্বাস ভারতবর্ষের আকাশকে মনে পড়ায়। রোমা—জ্যোৎস্না বিগলিতা চিরনগরী, তার এক অপূর্ব্ব রূপ রাতে। ধ্যাননীল মহাকালের কোলে স্তব্ধ বীণা যেন, পুরাণো নূতনে জড়ান তার তার। অতীতকাল আর উত্তর কালের অনন্ত সঙ্গীতের সংহত এক শান্ত সঙ্গতি এর মাঝে।

রাত্রিভোজনের পর কৃষ্ণা বল্লে, "কী রাতটা হয়েছে। চল বেড়িয়ে আসি পালেটাইন পাহাড়ের দিকে।" জয় বল্লে "চল। তুমি একটু এগোও, সামনের দোকানে আমার একটু কাজ আছে, খোলা আছে কিনা আমি একবার দেখে যাচ্ছি।"

"দেরী কোরো না।"

"দেরী! এ কি মেয়েদের কাণ্ড ভেবেছ নাকি—কাপড় দেখতে আরম্ভ হল ত দ্যাখাই চলেছে দ্যাখাই চলেছে, পাহাড় পর্ব্বত হয়ে উঠল তবু আর পছন্দ হয় না।"

"আচ্ছা আচ্ছা পুরুষসিংহ না হয় চোখবুজেই যেয়ে চটপট কাজ সেরে এস।"

ওরা দুজনেই রাস্তায় বেরিয়ে এল।

জয় কিন্তু কথার উলটো করে অনেক দেরী করতে লাগল। বুলভার্দ এ খোলা হাওয়ার কাফেতে লোকে লোকে ভরে উঠেছে। উগ্রমৃদু নানা রংয়ের নানা রকমের ইতালীয় সুরার ধারা বইছে, হাসি গল্পে রীতিমত কোলাহল উঠেছে—লোকের ভিড়ে চলা দায়। কৃষ্ণা পরেছে খয়েরি রংয়ে সোনার পাড় দেওয়া শাড়ী আর পুরাণো ছাঁচের সোনার কর্ণাভরণ। ওর শাড়ী পরার একটা নিজস্ব ধরণ, সর্ব্বদা ওর ভঙ্গীটিকে বিশেষ করে বিকাশ করে, ওর স্বল্প-অলঙ্কার সহজরূপ সকলের চোখে পড়ে। সকলেই তার দিকে দেখছে তাকিয়ে কিছু বিস্ময়, কিছু প্রশংসায়। ভিড়ের ভেতর একা একা অর্থহীন ভাবে ঘোরা, যতদুর বিরক্তিকর হতে হয়—সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। জয়ের ওপর কৃষ্ণার ভারি রাগ হতে লাগল—আসুক ত সে যা বকুনিটা দেবে।

সময় কাটাবার জন্যে কৃষ্ণা একটা দোকানের কাঁচের জানালার আড়ালের পাথরের মূর্ত্তিগুলো দেখতে লাগল দাঁড়িয়ে। একটি লোক অনেকক্ষণ থেকে কৃষ্ণার কাছে কাছে ঘুরছিল, এবার তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে "Buona Bella!" কী সুন্দর। কৃষ্ণা ভাবলে মূর্ত্তিগুলোর কথা বলছে, বল্লে "হ্যাঁ, বেশ করেছে এগুলো।"

"আমি মূর্ত্তির কথা বলিনি—সিনোরিণার কথা বলেছি।"—লোকটি তৎক্ষণাৎ ইটালিয়ান এ গড় গড় করে এমন বক্তৃতা আরম্ভ করলে—একটা রীলের সুতো ধরে টেনে যাচ্ছে যেন, ফুরতে আর চায় না।

আচ্ছা সত্যি জয়ের কি আক্কেল। অন্যমনস্কভাবে কৃষ্ণা বল্লে সে অত ইটালিয়ান বোঝে না।

লোকটি থেমে গেল—"পার্লে ভু ফ্রাঁসে সিন্যোরিনা?" সঙ্গে সঙ্গে আবার আর এক চোট বক্তৃতাবৃষ্টি। লোকটির ঝাঁকড়া কালো চুল—সোনালি সাদা রং—হলদে ক এ্যাম্বারের মত চোখ, খাড়া নাক। তার অনির্বারিত বক্তৃতার মর্ম এই যে সে আর্টিষ্ট—কৃষ্ণার মত এমন ললিতশ্রী আর কখন সে দেখেনি—সিনোরিনা যদি দয়া করে এখন তার সঙ্গে একবার তার ষ্টুডিওতে পদার্পণ করেন এই ওরিয়েনতাল রূপকে রেখায় বেঁধে সে ধন্য হয়। জয়ের সঙ্গে আর যদি কখন কৃষ্ণা কোথাও বেরয়—আচ্ছা লোক যাহোক, কতক্ষণ আর দাঁড়ান যায় এক জায়গায়। আর্টিষ্ট-এর কথা কিছুই কৃষ্ণার মনে যায় নি—সে জনতার মাঝে চঞ্চল চোখে খুঁজে দেখে চলতে লাগল। এত সহজে কৃষ্ণা রাজি হয়েছে দেখে আর্টিষ্ট অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে দ্বিগুণ বেগে বাক্যস্রোত জুড়ে দিল।

"উঃ কৃষ্ণা তোমায় খুঁজে খুজে একেবারে হায়রাণ হয়ে গেছি।"

"আমায় খুঁজে!"— কৃষ্ণা আগুন হয়ে উঠল। "আর কোনদিন কোথাও যদি যাই কখন তোমার সঙ্গে—আক্কেল বলে একটা জিনিষ নেই—এ রকম লোকের সঙ্গে মানুষে বেরয়"—

আর্টিষ্ট বেচারা জয়ের হঠাৎ আবির্ভাবে থতমত খেয়ে একেবারে চুপ হয়ে গেছল! কৃষ্ণার রাগ দেখে সে আরো ঘাবড়ে উঠল—কারণ রাগের ভাষাটা যে দেশেরই হোক ভাবটা বিশ্বজনীন। কতগুলো অসংলগ্ন কথা বলে সে তাড়াতাড়ি বিদায় চাইলে, কোনমতে পালাতে পারলে বাঁচে এখন।

তার পালিয়ে যাওয়ার ভঙ্গীতে হেসে ফেলে জয় বল্লে "ও বেচারাকে বেজায় ভয় পাইয়ে দিলে তুমি—ওটি জুটল কোথা থেকে?"

কৃষ্ণার রাগ যায়নি তখনও, ঝেঁঝে বল্লে—"কে জানে কোথাকার আর্টিষ্ট vagabond যত তোমার ভরসায় থাকলেই ওই সব যত লোকের পাল্লায় পড়তে হয়। খুব শিক্ষা হয়েছে আমার।"

"ও কি জানে বল—আর্টিষ্ট লোক, আগুনের আলোই দেখেছে—উত্তাপটির ত পরিচয় পায়নি—তাহলে সাহস করত না ঘেঁষতে।" কুণ্ঠিত ভাবে জয় বল্লে, "সত্যি বড্ড দেরী হয়ে গেল—এখুনি দিচ্ছি বলে কোথায় যে ডুব দিল দোকান-দার—ইটালিয়ানগুলোর কথার যদি কোন ঠিক থাকে। চল এবার ফাঁকায় যাই।"

জ্যোৎস্নার মায়ায় অদ্ভুত দ্যাখাচ্ছে পালাটাইন পাহাড়ের প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপ। ও যেন এক হাড়ের পাহাড় কত যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হয়ে আছে, কবে আসবে রূপকথার রাজপুত্র ছড়িয়ে দেবে মায়াজাল—জেগে উঠবে রোমস্রষ্টা অদ্ভুতপায়ী রমিউলাস। তারপর হতে কত রাজা কত নেতা কত বীর Fulvius Flacus, Lutatius Catulus, Æemilius Scaurus, Licinius Crassus, Milo, Sulla, Catilina, Clodius, Cicero, Hortensius, Antonius, Augustus, Tiberius, Caligula, Nero—পালেটাইনের ভাঙ্গা হাড়ের পাহাড়ে জীবন্ত হয়ে জেগে উঠবে, নির্ভীক সাহসী কেউ, নিষ্ঠুর ক্রূরমনা রাজনৈতিক—চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক কেউ বা।

পথের পাশে গাছের তলে চূর্ণ জ্যোৎস্নাভরা ছায়ায় বসলে দুজনে। আধ জ্যোৎস্নায় জয়ের মুখের দিকে চেয়ে কৃষ্ণা তার সব বকুনি ভুলে গেল—অবান্তর একটা প্রশ্ন করলে হঠাৎ "আচ্ছা আমার এখানের এই যে সব আলাপী পরিচিত—এদের সম্বন্ধে তুমি ত কখন কোন প্রশ্ন কর না? কোন কৌতূহল কখন জাগে না?"

"না।"

"কেন? এ বিশ্বাস না ঔদাসীন্য?"

"ঔদাসীন্য? তাই মনে হয়?" নিঃশব্দ হাস্যে জয়ের মুখ ভরে উঠল। "শোন, রামায়নে পড়েছিলাম সীতা আগুনে প্রবেশ করেছিলেন, একটি চুলও পুড়ল না তাঁর। শুধু কাব্যপুরাণে নয়, সংসারেও এমন এক জাতের মেয়ে ছেলে আছে জান। যারা আগুনের ওপর দিয়ে নিত্য হেঁটে যেতে পারে আগুনের ঝাঁঝ তাদের গায়ে লাগে না। মেয়েদের মধ্যে তুমি তাদের একজন।"

কৃষ্ণা কিছুক্ষণ কোন কথা বল্লে না, তারপর স্মিতমুখে বল্লে "আর সেই দলের ছেলের মধ্যে বুঝি তুমি একজন?"

"ওঃ সে ত understood."

কৃষ্ণা হেসে গড়িয়ে পড়লে—"না তোমার বিনয়ের অভাব আছে এ অপবাদ শত্রুতেও দেবে না।"

"বা এ বিনয়ের অভাব হল। কাব্যের জাঁকাল ভাষায় এর নাম আত্মপ্রত্যয়। তুমি এসব জানবে কোথা থেকে—কাব্য কি পড়েছ কোন কালে—গীতার ভাষ্য আর পলিটি-কল ইকনমির ভেতরে এসব থাকে না। নাঃ তোমার সম্বন্ধে আমি ক্রমেই হতাশ হয়ে উঠেছি। যে মেয়ে রান্না করা মসলাবাটা ছেড়ে শাস্ত্র আর শাস্ত্রচর্চ্চায় দিন কাটিয়েছে মনস্তত্বের সূক্ষ্মরহস্য সে বুঝবে কি।"

"ওগো বাংলার অখ্যাত ফ্রয়েড, মনস্তত্ব রেখে এবার গৃহতত্বে মন দাও ত একটু।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ আর কদিন রোমে থাকবে। ওদিকে আমার

পরীক্ষার সময় হয়ে আসছে—পরীক্ষার পর আর ত লণ্ডনে থাকার দরকার হবে না—তখন কোথায় থাকার কথা ভেবেছ ?"

জয় সাগ্রহে উঠে বসে বল্লে "শোন কৃষ্ণা আমিও বলব ভাবছিলাম—আমার কতগুলো plan আছে তা জান ?"

"কি রকম শুনি ?"

"তোমার পরীক্ষা শেষ হলে কোথায় যেয়ে থাকব আমরা ?—সুইটসারল্যাণ্ড তোমার ভাল লাগে ?"

সুইটসারল্যাণ্ড।···তুষার-শিখ পাহাড়ে পা ডুবে যাওয়া ঘন ঘাসের বনে রঙীন ফুলের বৃষ্টি। স্বচ্ছ শুভ্র সকালগুলি—তুষার দেশের তুহিন দেবতার মঙ্গল মন্ত্র তারা—প্রোজ্জ্বল নির্মল। পাহাড়ের স্তব্ধ গাম্ভীর্য্যের মাঝে হঠাৎ একটা আওয়াজ জেগে ওঠে—পাহাড়ী ছেলে পাহাড়ের ভাষায় তার দূরের বান্ধবীকে ডাক দিচ্ছে। সে ডাক পৃথিবীর প্রথম বাণীর মত অদ্ভুত নিঃসঙ্গ—একা একা ঘুরে ফিরছে পাহাড়ে বনে। পাইন বনে সন্ধ্যা নামে; গলান চুণির মত ঘন লাল কখন, পদ্মের পাপড়ির মত নরম গোলাপি কখন। গরুর গলার ঘণ্টা বাজে—অতি মধুর ধ্বনিতে তার, মন করুণ হয়ে যায়।···শীতের দিনে বাহিরে অবিরাম বরফের নিঃশব্দ বর্ষণ ঘরের ভেতর আগুন জ্বলে—আগুনের আভা পড়ে জয়ের মুখে।..

জয় বল্লে 'আর ওখানে যদি বেশী শীত মনে হয়, দক্ষিণ ফ্রান্সে গেলে কেমন হয় ? ছোট কোন গ্রামে—খুব ছোট একটা বাড়ীতে—কতই আর খরচ পড়বে।"

অনেক দিন ধরে সমুদ্রের জল আর জল দেখে দেখে আর দোলায় দোলায় চোখ আর মন দুই যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে—ফ্রান্সের বনভূমির দিগন্তভরা শ্যাম স্নিগ্ধ রূপ দেখে কৃষ্ণার সবগুলি অনুভূতি অনির্বচনীয় শান্তিতে শীতল হয়ে গেল। উঁচু নীচু মাটির ঢেউ খেলান ঘন সবুজ ঘাস—গাঢ় লাল পপিতে ভরা—আরক্ত ওষ্ঠের রাগ রক্ত চুম্বনের মত জ্বলছে সর্বত্র। নেপোলিঁওর দেশ—কোরো (Corot), মিলে (Millet), রুসোর স্বপ্নসহজ আর্ট এর দেশ, সুবেশা সুন্দরীতে, সুগন্ধে সুরাতে সহজ আনন্দে ফ্রান্স এক নিত্য-ঝঙ্কৃত কৌতুক হাস্যের মত। নির্দি [illegible] ভ্যালির উদাস সুগন্ধে সন্ধ্যা গজমন্থর গমনে আসে। বার্চবনের সবুজ অন্ধকারে জয়ের সঙ্গে বাড়ী ফেরা, বার্চগাছের কালো গুঁড়ির কাছে কাছে সাদা ডেসি জোনাকির মত জ্বলে—ঘাসে ঘাসে ভরা ঘন লাল পপি। বাড়ীর দেওয়াল বেয়ে অ্যাসটোরিয়ার লতা উঠেছে বেগুনিফুলের স্তবক দুলিয়ে।

জয় বল্লে, "অবশ্য ইটালিতেও থাকা যেতে পারে। ফিরেণসি কিম্বা নাপোলির কাছে কোন বাড়ী নিয়ে।"

পুরাণো পাথরের বাড়ীর রহস্যভরা অন্ধকারে মোমের হলদে আলো মিলে জ্বলবে এ্যাম্বারের মত উজ্জ্বল হয়ে। ধূসর সবুজ অলিভ আর সাইপ্রাসের সারি ঘেরা পথ, গাছগুলিকে জড়িয়ে যেখানে সেখানে, প্রাচীরে, গৃহের গায়ে আঙ্গুরের লতা আপনি হয়ে বেড়েছে। স্তব্ধ মধ্য রাত্রি দীপনেভান ঘরে জানালা দিয়ে ত্যাখা যায় স্বচ্ছ কালো আকাশে দীপ্ত সপ্তর্ষি—কালপুরুষ জ্বলছে উজ্জ্বল হয়ে। প্রাচীন রোমের প্রাচীন ভারতের কত অগণিত রাতে তারা অমনি অনিমেষে তাকিয়েছিল—কত নিদ্রিত নরনারীর স্বপ্নের ওরা নীরব সাক্ষী ছিল। সে সব স্বপ্ন শূন্যে মিলিয়ে গেছে—মিথ্যা হয়ে গেছে মানুষের অনেক পরিচেষ্টা।···তারার আলোয় অস্পষ্ট দেখা যাবে জয়ের মুখ— তার উদাত্ত অনুচ্চারিত ভাষা—অনুভব করবে তার দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ।......মানুষের অনেক স্বপ্ন মিথ্যা হয়ে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু জয় ত শূন্য স্বপ্ন নয়, দুঃসহ দুঃখের দাম দিয়ে পাওয়া পরম সত্য সে। সত্য কখন মিথ্যার মত মিলিয়ে যেতে পারে না।......নিবিড় পুলকে কৃষ্ণার অন্তর অকারণে বিধুর হয়ে ওঠে—কাকে সে কৃতজ্ঞতা জানাবে এ আনন্দে। দুঃখের দিনে মানুষে যেখানে নির্ভর চায়, আনন্দের দিনে সেখানেই সানন্দ প্রণাম পৌঁছে দেয়। কৃষ্ণা দুঃখের দিনে যা অগ্রাহ্য করেছে—সুখের মাঝে চাইলেই কি সাড়া মিলবে সেখানে।

"কি—কথা বলছ না কেন কৃষ্ণা।"

কৃষ্ণা বল্লে "তুমি কোথায় থাকতে চাও বল আগে শুনি।"

"কী মুস্কিল—যেখানে থাকবে তুমি তাও জান না ?"

কৃষ্ণা হেসে ওর মুখের দিকে চাইলে। "তোমার তাহলে কোনই পছন্দ নেই, আমার পছন্দ হলেই হবে?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা আমার কোথায় যেয়ে থাকতে সব থেকে ভাল লাগবে বলছি শোন। শ্যাওলাভরা সরু নদী, সাল্‌তি চলে তাতে, সন্ধ্যেবেলায় গ্রামবধূরা কলসী করে জল নিয়ে যায়। তার পারে সোনালি খড়ে ছাওয়া বাড়ী। ধূ ধূ মাঠ চলেছে কখন সবুজে বোনা—কখন পাকা ধানে ধানে সোনা, মাঠের মাঝে ঝুরি নামান বটের তলে রাখাল ছেলে বাঁশী বাজাবে দুপুরে। আমের মুকুলের গন্ধভরা বাতাসে বাঁশের পাতা কাঁপবে—বকুল ফুল ঝরে ঝরে পড়বে। পলাশ সিমুল ফুলে ফাগুন আসবে আগুন জ্বালিয়ে। রজনীগন্ধার গন্ধস্নিগ্ধ সন্ধ্যায় চাঁদ উঠবে আমলকি গাছের আড়াল দিয়ে—আর শাঁখের আওয়াজ শোনা যাবে অনেক দূরের গ্রাম হতে।"...

জয় নিরুত্তরে বসে রইল।

"জানি তুমি বলবে ও ত কল্পনার তৈরী—বাস্তব ওর বিপরীত। তা জানি। ওর ভেতরে কী নির্জীব আলস্য—কত যে মিথ্যা কত যে নীচতা চণ্ডীমণ্ডপে জমাচ্ছে নিত্য তা আমিও জানি। মেয়েরা ঘোমটার ঘেরাটোপে বাঁধা পুঁটলি, নিজেরা অক্ষম অসহায়, কিন্তু ওদের অধীনে যারা তাদের ওপর নির্য্যাতনে ওরা কম যায় না। কিন্তু কি করবে। মন ওদের বদ্ধ জলের পানাপুকুর, সেখানে যত বিষের সৃষ্টি ত হবেই। এ সব শতাব্দীগত আবর্জনা—একে একটু করে হোমিওপাথি ডোসে সমাজসংস্কার আর মহিলা সমিতি করে সারান হবে—কী উপহাস।" থেমে যেয়ে খুব আস্তে কৃষ্ণা বল্লে "ওদের ছাড়াও আরো যারা লক্ষ লক্ষ গরীব চাষী মজুর—শিক্ষা নেই স্বাস্থ্য নেই—অর্থ নেই—দুষ্ট বুদ্ধি যথেষ্ট আছে—কি করবে—কে ভাল শিক্ষা দিচ্ছে ওদের! পেটে ভাত নেই, রোগে ওষুধ নেই, শীতে কাপড় নেই—অন্য দেশের পশু গরুরও ওদের চেয়ে আরামের জীবন।"

"তা বলে তোমার জীবনযাত্রার ideaকে ওরা চাইবে না কখন।"

"তা নাই চাক্—কিন্তু আমি ওদেরই চাই—ওই সব গরীব রুগ্ন মূর্খদের। আমার দেশ যা আছে তাও কত সুন্দর। তাকে গত গরিমার মরা মুখোস পরাব না আর। তার কলঙ্ককে কল্পনা দিয়ে ঢাকতে যাব না, তার যেখানে যত ত্রুটি যত গ্লানি যত দৈন্য সে সবকে মধুর মিথ্যায় মুছে দিয়ে মনকে ভোলাব না। আমার দেশের আসল রূপকেই আমি স্বীকার করতে চাই—আমি সেখানেই জায়গা চাই—সেখানেই আমি থাকতে চাই। কিন্তু সেখানে আমার প্রবেশ নেই..."

হাঁটুর ওপর মাথা রেখে কৃষ্ণা নীরব হয়ে রইল। আকাশে অতন্দ্র চাঁদ প্রহর জাগতে লাগল আর জয়ের স্নিগ্ধ দৃষ্টি সান্ত্বনার মত তাকে ছুঁয়ে রইল।

* * * *

সকালে রাস্তায় বেরিয়ে জয় বল্লে "আজ কোন ঢিবি-টিতে যেতে হুকুম হয়।"

"আজ কলোসিয়ামে চল না—যাবে?"

"অগত্যা। পড়েছি তোমার হাতে, কলোসিয়াম যেতে হবে সাথে।"

"বাস্‌রে কবিও আছ দেখছি—একেবারে versatile."

"হবে না—সব সময় মনে রাখতে হবে ত যে এই দূর দেশে আমি হলাম ভারতবর্ষের প্রতীক।"

কৃষ্ণা হাসিতে লুটোপুটি খেতে লাগল—"ওঃ কী গুরু দায়িত্ব সত্যি—"

জয় জবাব দিতে যাচ্ছিল পেছন থেকে একজন কে তাদের ডাকাডাকি করতে করতে ছুটে এল। কৃষ্ণা তার হ্যাণ্ড ব্যাগ ফেলে চলে এসেছিল, হোটেলের লোক সেটা নিয়ে এসে তাকে দিল।

জয় অপ্রসন্ন ভাবে বল্লে "আঃ এ ব্যাটা আবার পেছু ডাকলে কেন।"

কৃষ্ণা সকৌতুকে বল্লে "এ কি, তুমি এ সব কবে থেকে মানতে আরম্ভ করেছ?"

জয় তার হাসিতে যোগ দিলে না। সে ভাবছিল মন কেন এমন সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে সব সময়? কাউকে অত্যন্ত বেশী ভাল বাসতে পারা, দেবতার এ এক অদ্ভুত দাক্ষিণ্য জীবনে। সীমাহীন সুখের সঙ্গে অন্তহীন দুঃখে দোল খাওয়া

নিত্য। কত যে আশঙ্কা—কত যে আনন্দ—শরতের স্বচ্ছ আকাশের অনিশ্চয়তার মত বেদনা নিয়ত। অন্যমনস্ক ভাবে জয় বল্লে "ভালবাসা ভারি ভীরু করে কিন্তু মানুষকে।"

"কই আমার ত কিছু হয় না?"

"ও আমি বুঝেচি—তুমি তেমন তাহলে মোটেই ভাল-বাস না—এবার ধরেছি—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ধরেছেন—ভারতের প্রতীক।"

"নাঃ তোমার পতিভক্তি একেবারে নেই। এমন হলে কি চলে—তুমি দেখছি সোজা নরকে যাবে।"

কৃষ্ণা ওর মুখের দিকে মুখ তুলে তাকালে। বল্লে "দুঃখ করব না তাতে। স্বর্গবাস ত করে গেলাম তারপর যদি নরকই ভাগ্যে থাকে যাওয়া যাবে না হয়।"

"আঃ কি যা তা বল কৃষ্ণা। এই দেখ একটা ট্রাম আসছে—কই কি রকম তাড়াতাড়ি হাঁটতে পার—ধরে উঠতে পার ওটাতে?"

"না আমি তাড়াতাড়ি হাঁটব না। তুমি হাঁট যেন বাঘে তেড়ে আসছে—এত তাড়াটা কিসের শুনি সব সময়? কিছুতেই আমি জোরে চলব না।"

"আচ্ছা বাপু বেশ—এবার থেকে তোমায় খুশী করতে হাঁটব যেন হাঁটু ভেঙ্গেছে। তা হলে ত হবে?"

কৃষ্ণা সহাস্যে বল্লে "থাক্ অমন মার্টার নাই হলে।"

কলোসিয়ামে একবার ঘুরে জয় বল্ল "চল যাই।"

"[illegible] যাই যাই কর কেন বল ত?"

"ভাল লাগে না, ভাল লাগে না—তোমায় হাজারবার বলেছি এখানে ভাল লাগে না আমার।"

এখানের অন্ধকার চোরকুঠরী গুলোতে কতলোকে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরেছে—কত রক্তে ভিজেছে এর ভিত। ওর ভীষণ উঁচু কালো দেওয়ালগুলো এখনও বোধ হয় মানুষকে চেপে মারতে চায়—এর মেঝেয় তৃষিত পাথরগুলো আজও যেন উদগ্রীব হয়ে নররক্ত পান করতে চায়। অসহিষ্ণু হয়ে জয় বল্লে "চল চল এখান থেকে—" //

সেখানে আরো দুতিন জন সাদা পোষাক পরা লোক কখন এসেছিল। ওরা চলে যাচ্ছে দেখে তারা কাছে এল। একজন কৃষ্ণার দিকে এগিয়ে এসে টুপি খুলে ভদ্রভাবে পরিষ্কার ইংরিজিতে বল্লে "আপনার নাম কি সিনোরীনা কৃষ্ণা ব্যানার্জি?"

কৃষ্ণা জবাব দিতে যেয়ে হঠাৎ থেমে গেল। ভয়ানক একটা সন্দেহে ভীষণ চম্‌কে উঠল ওর মন। জয় হাসিমুখে বল্লে "ইনি আমার স্ত্রী—এখন এঁর নাম সীনোরা মুখার্জি। আপনি এঁকে আগে থেকে চিনতেন?"

সে বল্লে "না।" তারপর পকেট থেকে একটা চামড়ার চ্যাপ্টা নোটকেস বার করে তার থেকে একখানা চিঠি বার করে কৃষ্ণার সামনে ধরে বল্লে, "এ চিঠি আপনার লেখা?"

বের্লিন থেকে জয়কে লেখা কৃষ্ণার চিঠি। জয়ের দিকে একবার চেয়ে কোন মতে কৃষ্ণা বল্লে "হ্যাঁ।"

মাপ করবেন সীনোরা, আপনাকে আমাদের সঙ্গে এখুনি চলে আসতে হবে। আমরা ইটালীয় পুলিস ডিপার্টমেন্ট থেকে আসছি,—আপনার নামে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ওয়ারেণ্ট রয়েছে। অনেক দিন ধরেই আপনার অনুসন্ধান করা হচ্ছে।"

জয়ের জগতে নিদ্রিত এক আগ্নেয়গিরি সহসা জাগ্রত অগ্নুৎপাতে এক মুহূর্ত্তে সহস্রশিখা বিস্তার করে পুড়িয়ে দিলে সমস্তটা—ভীষণ ভূমিকম্পে ভেঙ্গে গেল তার ভিত। বাহিরে বিমূঢ়ের মত সে দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটি বল্লে "আমরা কতদিন ধরে খোঁজ করছি। আজ সকালেও আপনাদের হোটেলে গেছলাম, সেখান থেকেই আপনাদের সঙ্গে এসেছি। মাপ করবেন সীনোরা আমার সঙ্গে আসুন তাহলে।"

জয় চমকে জেগে উঠে কৃষ্ণাকে আড়াল করে এগিয়ে এল। রূঢ় ভাবে বল্লে "না। তা কখন হতেই পারে না।"

লোকটি বল্লে "আমি নিরুপায়, আমায় কর্ত্তব্য ত করতে হবে—কি করব বলুন।" সে কৃষ্ণার দিকে সমর্থনের জন্যে চাইলে।

বরফে মাজা আকাশে স্বচ্ছ সকালের প্রকাশ। পাইন বনে হাওয়ার মর্ম্মবাণী।......পপি ছড়ান ঘাসে ঘন সবুজ দিগন্তের বিস্তার, astoniar বেগুনি ফুলের গুচ্ছ দোলান

বাড়ী। কৃষ্ণা অন্য মনে বললে "হ্যাঁ আপনি কি করবেন—।" আঙুরের লতা জড়ান অলিন্দের কুঞ্জ। দিনের আলোর এ্যাম্বারের মত রং, স্বচ্ছ কাল রাতে তারা ভরা আকাশ।... "যাচ্ছি আমি" কৃষ্ণা বল্লে।

জয় জোরে তার বাহু ধরে আটকালে—"কৃষ্ণা কোথায় যাবে—তুমি বল কী—"

জয়ের দিকে চেয়ে কৃষ্ণা হঠাৎ মাথা নত করলে।—উদ্গত অশ্রুকে গোপন করতে।

পুলিসের লোক কুণ্ঠিতভাবে বল্লে "আমি অত্যন্ত দুঃখিত সীনোরা—কিন্তু আপনাকে ত এখুনি যেতে হবে।"

কৃষ্ণা ধীরে জয়ের হাত ছাড়িয়ে নিলে। তার মুখের দিকে মুখ তুলে তাকালে। গলাকে প্রাণপনে সংযত করে বল্লে "এমন অবুঝ হয় বুঝি,—বারে তুমি না ভারতবর্ষের প্রতীক—তোমার কি পাগল হওয়া চলে—।" তার দুই গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল "দুঃখ কোরো না।—ক্ষোভ আমার খুব বেশী নেই......প্রতিদিনের দ্বেষ-দৈন্য ভরা সংসারের হিংস্র দুঃখে আমার আকণ্ঠ ডুবে ছিল। তুমি এলে, আমায় নিয়ে গেলে এক মৃত্যুহীন আনন্দের মহৎ প্রশান্তির মাঝে। বাহিরের যত শাস্তি এখন আমায় কষ্ট দেবে কি করে?...স্বর্গের কোন দেবতা কোন দিন কোন মানুষকে এর চেয়ে সত্যিকারের অমৃত কখন দিতে পারেনি—যা দিয়েছ তুমি আমায়—" হঠাৎ কৃষ্ণা অস্থির হয়ে জয়ের কাছে এগিয়ে আসতে গেল—পুলিসের লোকের দিকে চেয়ে তখুনি সে থেমে গেল। নিজেকে সংবরণ করে কোনদিকে না তাকিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল, পুলিস কর্মচারীরা তাকে ঘিরে নিয়ে অপেক্ষমান মোটারে যেয়ে উঠল। ঈষৎ ধূলো উড়িয়ে একটা নিশ্বাসের মত গাড়ী চলে গেল।

স্তব্ধ হয়ে জয় সেখানে দাঁড়িয়ে রইল একভাবে। শুধু ভাঙ্গা পাথরের তীক্ষ্ণধার কিনারার ওপর ওর দৃঢ়মুষ্টির নির্মম পেষণে হাতটা কখন কেটে যেয়ে তপ্ত রক্ত ধূলায় গড়িয়ে পড়তে লাগল ফোঁটার পর ফোঁটা।......

সমাপ্ত

শ্রীমতী ইলা দেবী

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

গদ্য সাহিত্য

৪

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরে গদ্য-সাহিত্যে অক্ষয়কুমার দত্তের নাম এতাবৎকাল চলিয়া আসিতেছে। ঐরূপ স্থান নির্দ্দেশ ঠিক হইয়াছে কি না তাহার বিচারের জন্য অক্ষয় কুমার দত্তের বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিব। তৎপূর্ব্বে অক্ষয়কুমার দত্তের সাহিত্যানুরাগ ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া বোধ করি।

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় প্রথম বাংলা গদ্য লিখিবার জন্য অক্ষয়কুমারও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট ঋণী। ফলতঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উৎসাহে ও আদর্শে অনেকে বাংলা লিখিতে আরম্ভ করেন এবং ভবিষ্যতে তন্মধ্যে অনেকে যশস্বী লেখক বলিয়া সমাদৃত হন। অক্ষয় কুমারের প্রথম বাংলা লিখিবার বিবরণ জানিতে অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। ইহার প্রবর্ত্তক গুপ্ত কবি ঈশ্বরচন্দ্র। তিনি অক্ষয়কুমারকে ইংরাজী সংবাদপত্র হইতে বাংলায় অনুবাদ করিতে বলেন। কিন্তু প্রথমতঃ অক্ষয়কুমার নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেন। গুপ্ত কবি পুনরায় অনুরোধ করিলে, তিনি অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। লেখা দেখিয়া ঈশ্বর গুপ্ত বলেন যে বহুকাল ধরিয়া যিনি এ কর্ম্মে অভ্যস্ত, তাঁহার পক্ষেও এইরূপ অনুবাদ কোনক্রমেই অগৌরবের নহে। ভবিষ্যৎকালে গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনেক সুলেখক গড়িয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনি রমেশচন্দ্রকে যেরূপে প্রথম বাংলা লিখিতে উৎসাহিত করেন, তাহার অনুরূপ ঘটনা এই প্রসঙ্গে অনেকের মনে উদয় হইবে।

অক্ষয়কুমার দত্তের প্রথম রচনা "অনঙ্গমোহন", এখন দুষ্প্রাপ্য। ১২৪৮ সালে তাঁহার ভূগোল প্রকাশিত হয়। ১২৬০ সালে "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' ১ম ভাগ, ১২৬৪ সালে উহার দ্বিতীয় ভাগ এবং "চারু পাঠ" তিন ভাগ। ১২৬৬ সালে "ধর্ম্মনীতি", ১২৬৮ সালে পদার্থ বিদ্যা। ১২৯২ সালে "উপাসক সম্প্রদায়" ১ম ভাগ ও ১৮০৪ সালে উহার ২য় ভাগ অক্ষয় কুমার দত্ত প্রকাশ করেন। শেষোক্ত গ্রন্থ দুইখানি পুরাতত্বের নানা জটিল তথ্যের মীমাংসা ও নানা কূটতর্কের আলোচনায় পূর্ণ। ভুবন-বিখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপক ম্যাকস্‌মুলার সাহেব ঐ পুস্তকের সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার দত্তের মৃত্যুর পর "প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

শৈশবে চাণক্যশ্লোকে "বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে" পড়িয়াই অক্ষয়চন্দ্রের বিদ্বান হইবার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়। স্থির নিশ্চয় মনে অভীষ্ট লাভের জন্য তিনি একাগ্রভাবে দেশীয় ও বিদেশীয় নানা ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী অধ্যয়নে নিয়ত নিমগ্ন রহিতেন। এজন্য তাঁহার বিশ্রামের অবসর মিলিত না। তিনি নিরলসভাবে তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার বাড়াইতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। বঙ্গভাষা সমৃদ্ধশালী করিব এবং স্বদেশীয় লোকদের জ্ঞানবৃদ্ধি করিব ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। সেই ব্রত সাধনে তিনি যে অমানুষিক কঠোর পরিশ্রম করিতেন, তাহার বর্ণনা করিয়া তাঁহার দৌহিত্র সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "লিখিতে লিখিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইত; চাকরেরা বাতি জ্বালিয়া খাবার রাখিয়া দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিত। হুঁস নাই। প্রভাতে পত্রিকা সম্পর্কীয় কর্ম্মচারীরা নিয়মিত সময়ে কার্য্যালয়ে আসিয়া দেখিত, খাবার পড়িয়া আছে, অক্ষয়-কুমার বঙ্গভাষার জন্য 'অক্ষয় যশের মালা' রচনা করিতে

ব্যস্ত।" এইরূপ দ্বাদশ বর্ষের পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তিনি দুশ্চিকিৎস রোগে আক্রান্ত হন ও তাহার ফলেই অবশেষে তাঁহার মৃত্যু হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের পরে গদ্য সাহিত্যে যাঁহারা সুলেখক বলিয়া গণ্য হন, তাঁহারা অল্প বিস্তর ঐ দুই মহাপুরুষের নিকট ঋণী। তন্মধ্যে 'গ্যারিবল্ডি' ও 'মেটসনি' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণেতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, "বান্ধব" সম্পাদক 'প্রভাত চিন্তা' 'নিশীথ চিন্তা' প্রভৃতির লেখক কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস ও বহু গ্রন্থ লেখক রজনী কান্ত গুপ্ত প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। অতঃপর অক্ষয়কুমার দত্তের রচনার নিদর্শন স্বরূপ তৎরচিত বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে কয়েকটি রচনার অংশবিশেষ সন্নিবিষ্ট করা হইল।

বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

"জীব-হিংসা যে নিষিদ্ধ কর্ম্ম, ইহা কোন না কোন সময়ে প্রায় সকলেরই মনে উদয় হয়। যাঁহারা আমিষ ভোজনে বিধি দিয়া থাকেন, তাঁহারাও কহেন, বৃথা জীব হিংসা কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ মনুষ্যের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে জগদীশ্বর আমাদিগের যেরূপ স্বভাব করিয়াছেন, এবং বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার যেরূপ সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন তাহাতে আমাদের আহারার্থে জীবহিংসা করা তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না। তিনি আমাদিগকে উপচিকীর্ষাবৃত্তি প্রদান করিয়া সঙ্কেতে ইহা জ্ঞাপন করিয়াছেন, যে যে কর্ম্মদ্বারা জীবের যন্ত্রণা হয় তাহা কোনক্রমেই বিধেয় নহে।......আর যিনি জীবনদাতা তিনিই সংহর্ত্তা। জীবগণ তাঁহার নিয়মানুসারে জন্মগ্রহণ করে, এবং তাঁহারই নিয়মানুসারে নষ্ট হয়।......এ কারণ প্রাণি হিংসা আমাদের ন্যায়পরতাবৃত্তিরও বিরুদ্ধ। জীবহিংসা (সুতরাং আমিষ ভোজন) যেমন আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অভিমত নহে, সেইরূপ তাহা আমাদের অহিত ব্যতীত কদাপি হিতকারী নয়, কারণ মৎস্য মাংস আহার করিলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা প্রভৃতি নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটনা হয়, যে কার্য্য ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধ এবং যাহার অনুষ্ঠান করিলে অশুভ ঘটনা হয়, তাহা কি প্রকারে পরমেশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া স্বীকার করা যায়? যাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নয়, তাহা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।"

"চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ।"

মেঘ ও

"জল উত্তপ্ত হইলে যে ধূমাকার পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাকে বাষ্প কহে। শীত ঋতুর প্রাতঃকালে নদী সরোবর হইতে যে ধূমাকার বস্তু উঠিতে দেখা যায় তাহাও ঐ বাষ্প বৈ আর কিছুই নয়। ঐ সকল বাষ্প ঘন হইলেই মেঘ হয়। মেঘ সচরাচর দুই ক্রোশের অধিক উঠিতে পারে না।......মেঘের উৎপত্তি, বায়ুর শৈত্য ও উষ্ণত্বের উপর বিস্তর নির্ভর করে। জল যত উত্তপ্ত হয়, তাহা হইতে ততই বাষ্প উঠিতে থাকে। এ নিমিত্ত প্রখর গ্রীষ্মের সময়ে অধিক বাষ্প উৎপন্ন হইয়া অধিকদূর উত্থিত হয়। সেই সমস্ত বাষ্প উপরিস্থিত বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া থাকে; অত্যন্ত লঘু বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না।

সমুদয় মেঘই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণাসমূহ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। তাহাতে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া অশেষ প্রকার মনোহর বর্ণ উৎপাদন করে। সূর্য্য কিরণে নীল, পীত, লোহিত, হরিৎ, পাটল প্রভৃতি নানা বর্ণ আছে। বহুকোনবিশিষ্ট কাচে ও অন্য অন্য কোন বস্তুতে সূর্য্য কিরণ পাতিত করিয়া ঐ সকল বর্ণ পৃথক করিয়া দেখান যায়। বেলোয়ারি ঝাড়ের কলমে রৌদ্রের আভা পতিত হইয়া যে নানাবিধ বর্ণ উৎপাদন করে, তাহা অপর সাধারণ সকলেই বিদিত আছে।"

স্বপ্নদর্শন—বিদ্যাবিষয়ক

ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখি, কতকগুলি পরম পবিত্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যা সরোবরতটে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদিগের অসামান্য রূপ লাবণ্য, প্রফুল্ল পবিত্র মুখশ্রী এবং সারল্য বাৎসল্য স্বভাব অবলোকন করিয়া অপরিমেয় প্রীতি লাভ করিলাম। আশ্চর্য্য এই যে তাঁহাদিগের শরীরে কোন অলঙ্কার নাই, অথচ অনলঙ্কারই

তাঁহাদের অলঙ্কার হইয়াছে। বোধ হইল যেন আনন্দপ্রতিমা-গুলি ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলাম, ইহারা দেবকন্যা হইবেন, সংশয় নাই। তখন বিদ্যাদেবী সাতিশয় অনুকম্পা পুরঃসর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ;. ইঁহারা দেবকন্যা বটেন এবং এই ধর্ম্মাচল ইঁহাদের বাসভূমি। ইঁহাদের কাহারও নাম দয়া, কাহারও নাম ভক্তি, কাহারও নাম ক্ষমা, কাহারও নাম অহিংসা, কাহারও নাম মৈত্রী ইত্যাদি।

স্বপ্নদর্শন—ন্যায়বিষয়ক।

তদনন্তর ধর্ম্ম অনুমতি করিলেন, "প্রথমতঃ বিষয়াধি-কারের বিষয় সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যে ধনে যাহার স্বত্ব আছে, তিনি তাহা এই দণ্ডেই প্রাপ্ত হইবেন। অতএব যাহার যত লেখাপত্র আছে, সমস্ত উপস্থিত কর।" ইহা শুনিয়া যাবতীয় লোক স্ব স্ব স্বত্বাধিকার সপ্রমান করিবার নিমিত্ত বিবিধ প্রকার লেখাপত্র আহরণ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! তাহাদের উপর ন্যায়দণ্ডের জ্যোতিঃ পতিত হইবামাত্র তাহাদের যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশিত হইল।......কোন কোন পাতার দুই চারি পঙক্তি ও কোন কোন পত্রের কেবল কতিপয় প্রক্ষিপ্ত অক্ষর নষ্ট হইয়া তাহার অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গেল। কিন্তু শত শত মুদ্রার ষ্ট্যাম্প পত্র সকল দাবানল দ্বারা মহারণ্যের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া পর্ব্বতাকার হইল।......ইতিমধ্যে আর এক অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলাম। প্রধান প্রধান বিচারালয়ের সহস্র সহস্র অনুজ্ঞাপত্র দগ্ধ হইল। ইনসালবেণ্ট কোর্টের প্রায় সমস্ত নিষ্কৃতিপত্র ভস্মীভূত হইয়া গেল ও যে সকল সম্ভ্রমশালী ভাগ্যবান ব্যক্তি তাহার আশ্রয় করিয়া নির্ম্মুক্ত পুরুষের ন্যায় বিহার ও ব্যবহার করিতেছিলেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বন্দী হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।......

উহাতে লোকসমাজের কি বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়া উঠিল। সহস্র সহস্র ব্যক্তি অপূর্ব্ব বেশভূষা ধারণ পূর্ব্বক পরম রমণীয় রথারোহণ করিয়া মহাবেগে গমন করিতেছেন, তৎক্ষণাৎ অবতরণ পুরঃসর গাত্র হইতে সমস্ত বস্ত্রাভরণ উন্মোচন করিয়া এবং সামান্য বসন পরিধান পূর্ব্বক পদব্রজে চলিলেন। কোন স্থানে দেখিলাম, লক্ষপতি বা কোটিপতি ধনাঢ্য ব্যক্তি পরম শোভাকর অট্টালিকায় বহুমূল্য অত্যুত্তম আসনে উপবিষ্ট হইয়া বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত আমোদ প্রমোদে কালহরণ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে একজন সামান্য গৃহস্থ অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আসনচ্যুত করিয়া দিল, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নির্গত হইয়া অতি পুরাতন বৃক্ষমূলবিদ্ধ ভগ্ন গৃহে বাস করিলেন।

ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড

"এখন আমাদের মানস বিহঙ্গ সৌরজগতের পরিজ্ঞাত ভাগের প্রান্ত পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান হইয়াছে। আর তাহাকে ক্ষান্ত রাখা যায় না। তাহার অপরিশ্রান্ত পক্ষ সকল আর নিরস্ত হইবার নয়। আসল বিশ্বের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে এমন অচিন্ত্য অননুভবনীয় সৌরজগতকেও যৎ-সামান্য ক্ষুদ্র বস্তু বলিয়া বোধ হয়। অন্যান্য নক্ষত্রমণ্ডল তৃণক্ষেত্রস্থিত তৃণ ও বালুকাক্ষেত্রস্থিত বালুকার ন্যায় অপরিসীম আকাশ ক্ষেত্রে ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে।...... ইতিপূর্ব্বে আমরা যেরূপ এক সৌরজগতের বিষয় পর্য্যা-লোচনা করিয়া বিস্ময় সাগরে মগ্ন হইতেছিলাম, বিশ্বাধিপের বিশ্বরাজ্য সেরূপ কত সৌরজগতে পরিপূর্ণ, তাহা একবার অন্তঃকরণে ধারণা করিতে চেষ্টা কর। তাহাদের সংখ্যাই বা কত, রচনাই বা কিরূপ, কত কত বিচিত্র ব্যাপারই বা তৎসমুদায়ে সম্পন্ন হইতেছে, তাহা কাহারও নিরূপণ করিবার সামর্থ্য নাই বটে, কিন্তু সেই সমস্ত সৌরজগৎ যে এক সীমাশূন্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী এক এক প্রদেশ স্বরূপ এবং এক রাজাধিরাজ মহারাজের শুভকর রাজশাসনদ্বারা রক্ষিত ও পালিত, তাহার সন্দেহ নাই।"

সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের সুখের তারতম্য

"জ্ঞানের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! বিদ্যার কি মনোহর মূর্ত্তি! বিদ্যাহীন মনুষ্য মনুষ্যই নয়। বিদ্যাহীন মনের গৌরব নাই। মানবজাতি পশুজাতি অপেক্ষা যত উৎকৃষ্ট,

জ্ঞান-জনিত বিশুদ্ধ সুখ ইন্দ্রিয়-জনিত সামান্ত-সুখ অপেক্ষা তত উৎকৃষ্ট। পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী শুক্ল যামিনীর সহিত অমাবস্যার তামসী নিশার যেরূপ প্রভেদ, সুশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যালোকসম্পন্ন সুচারু চিত্ত-প্রাসাদের সহিত অশিক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞান-তিমিরাবৃত হৃদয়-কুটীরের সেইরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়।"

এই সকল রচনার ভাব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার অনুরূপ—স্নিগ্ধ গম্ভীর ও মনোহর। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্যের ন্যায় অক্ষয়কুমারের গদ্যেও ভাষাশিল্পীর অলক্ষ্য ছন্দের গতি লক্ষিত হয়। প্রকৃতি, প্রাণী, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা এক্ষণে যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী হইয়াছে কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র ইহার প্রথম সূত্রপাত করেন। আর একদিকেও তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি অনুসারে সম্বোধন পদ প্রয়োগে পক্ষপাতী ছিলেন না। তজ্জন্য "মুনে!" ও "দেবি!" এই সম্বোধন পদ দুইটির পরিবর্ত্তে "মুনি" ও "দেবী"। এইরূপ ভাবে পরিবর্ত্তন করেন।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুসারে তাঁহার ভাষা সর্ব্বদা সঙ্গতি রাখিয়া চলে। বৈজ্ঞানিক বিষয় সরল ও সহজ ভাবে প্রকাশ অক্ষয়কুমার দত্তের ন্যায় শক্তি-শালী লেখকের পক্ষেই সম্ভব।

এই সকল রচনা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরেই অক্ষয়কুমার দত্তের স্থান নির্দ্দেশ কোনরূপ অসঙ্গত হয় নাই। অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় প্রধানতঃ অনুবাদ কার্য্যে অসামান্য দক্ষতা প্রকাশ করেন। কিন্তু উহাতে তাঁহাদের উভয়ের কল্পনা শক্তি ও মৌলিক গবেষণা যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে অক্ষয়চন্দ্র দত্তের আলোচনায় যে অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলেরই অনুধাবনযোগ্য।

'যাহারা এইরূপ নির্দ্দেশ করেন, তাহারা বোধ হয়, ইংরাজী গ্রন্থের সহিত অক্ষয়কুমারের গ্রন্থ মিলাইয়া দেখেন নাই। মীর্জ্জার স্বপ্ন দর্শনে যাহা নাই, চারু পাঠের স্বপ্ন দর্শনে তাহা আছে। আডিসনের কল্পনা অপেক্ষা অক্ষয় কুমারের কল্পনায় অধিকতর বিকাশ হইয়াছে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়
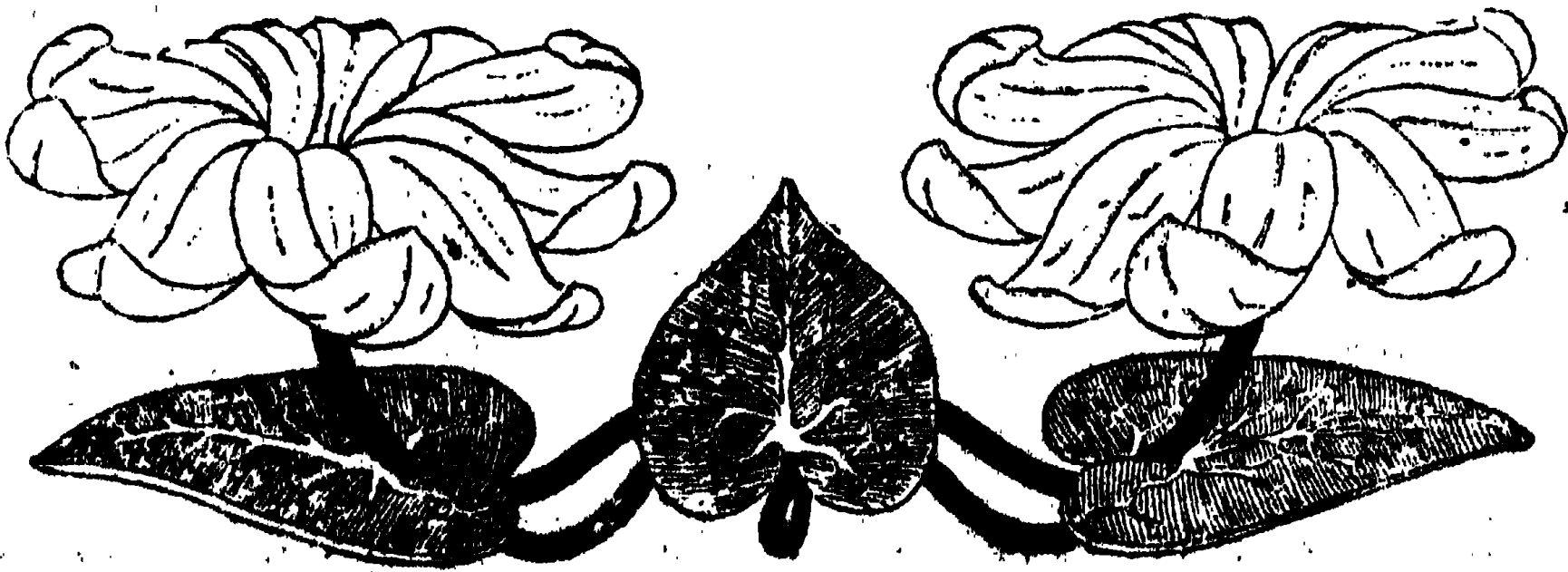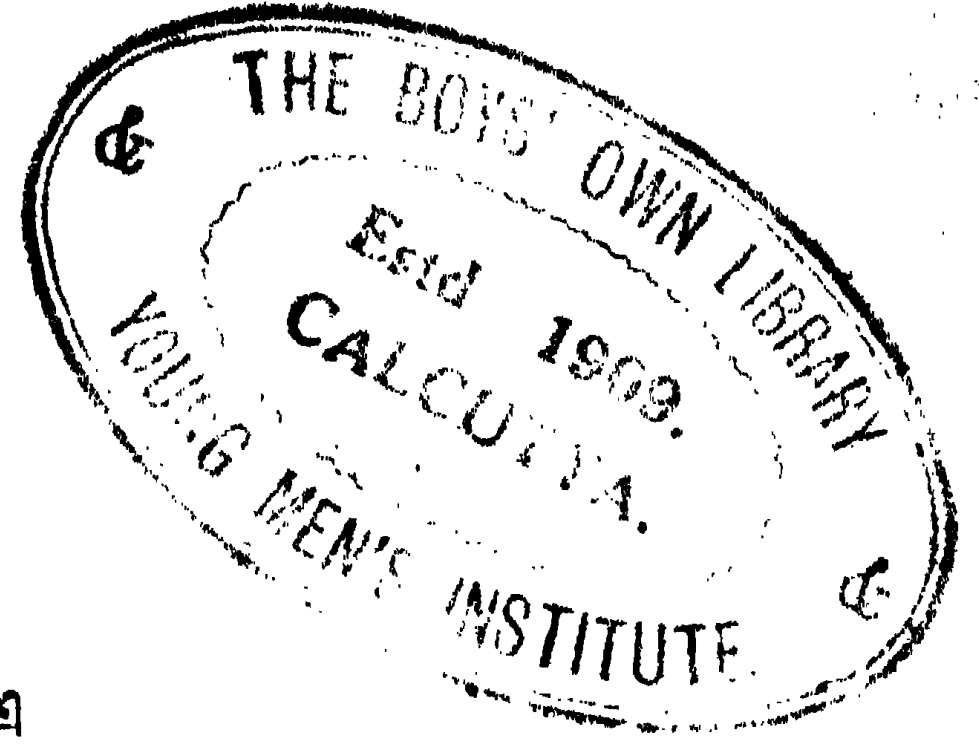
জলধর-স্মৃতি*

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্-এ

রবিবাসর আহূত হইয়াছে, কিন্তু যিনি রবিবাসরের সর্ব্বাধ্যক্ষ ছিলেন, যিনি উহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন তিনি আজি কোথায়? গত অধিবেশনে যাঁহার জন্মোৎসব উপলক্ষে আমরা সমবেত হইয়া দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়াছিলাম, কে জানিত তাহার পরবর্ত্তী অধিবেশনে তাঁহার স্মৃতিমাত্র সম্বল করিয়া আমরা সম্মিলিত হইব? কিন্তু যদি পরলোকপ্রস্থিত আত্মা নানাবেশে তাহার প্রিয়জনের সান্নিধ্যে আসে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তাঁহার অশরীরী আত্মা আজ তাঁহার শেষ জীবনের একান্ত প্রিয় এই রবিবাসরের অধিবেশনে উপস্থিত আছে।

রবিবাসরের সদস্যগণের নিকট রায় জলধর সেন বাহাদুর কেবল একজন প্রথিতযশা লেখক বা বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি সম্পাদক ছিলেন না, তিনি একটি সাহিত্য-সভার সভাপতি মাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন এই ভ্রাতৃপরিবারের কর্ত্তা, এই সাহিত্যগোষ্ঠীর গোষ্ঠীপতি, তিনি ছিলেন আমাদের 'দাদা'। যেমন পরিবারস্থ কাহাকেও তাহার স্বর্গগত পিতা বা ভ্রাতার গুণাবলী বর্ণনা করিতে বলিলে সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না প্রতি মুহূর্ত্তের কত অর্দ্ধবিস্মৃত প্রেম ও করুণার নিদর্শন লাভ করিয়া তাহার জীবন ধন্য হইয়াছে তাহার কোনটি সে বলিবে এবং হয়ত কিছুই গুছাইয়া বলিতে পারে না, সেইরূপ আমাদের পক্ষেও তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে আমরা কিছুই বলিতে পারি না, কেবল এইটুকুই মনে হয় কতরূপে তাঁহার অজস্র স্নেহলাভ করিয়া আমাদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছে। ভাষায় আমাদিগের হৃদয়ের সে অনির্ব্বচনীয় ভাব অভিব্যক্ত করিতে পারি না। তথাপি দাদার নিকট আমি ব্যক্তিগত ভাবে যে অপরিসীম ঋণে আবদ্ধ তাহা প্রকাশ্যে স্বীকার করিবার এ সুযোগ আমি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেছি না।

মধুর কৈশোরে দাদার নামের সহিত আমার প্রথম পরিচয়—তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া। আমার ১৪।১৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে উৎকৃষ্ট মাসিকপত্রের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল, উৎকৃষ্ট লেখকের সংখ্যা ততোহধিক অল্প। ভারতী, নব্যভারত, সাহিত্য, প্রদীপ, প্রভৃতি কয়েকখানি মাত্র মাসিকপত্র তখন বাঙ্গালী পাঠকের পাঠতৃষ্ণা নিবারণ করিত এবং কোন পত্রই এখনকার প্রধান মাসিকপত্রগুলির ন্যায় বৃহদায়তন ছিল না। সুলেখকের সংখ্যা অল্প ছিল বলিয়া তাঁহাদিগের নাম আমার নিকট অতি পরিচিত হইয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য ইঁহাদের মধ্যে দাদার নামও আমার নিকট অতি পরিচিত হইয়া গিয়াছিল।

এই পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হইল যখন ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'প্রবাসচিত্র' ও 'হিমালয়' নামক নবপ্রকাশিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিষয়ক পুস্তকদ্বয় আমাদের গার্হস্থ্য পুস্তকাগারে আসিল। তখন আমার বয়স ১৫ বৎসর মাত্র—প্রগাঢ় দার্শনিক প্রবন্ধ বুঝিবার ক্ষমতা জন্মে নাই, এবং আমাদের প্রিয়দর্শন দর্শনপ্রিয় সভাপতি মহাশয়ের নিকট স্বীকার করিতেও কুণ্ঠা নাই যে সে ক্ষমতা এখনও জন্মে নাই, গল্প উপন্যাস কালেভদ্রে মাসিক পত্রে দেখা যাইত, ভ্রমণ বৃত্তান্ত দুর্ল্লভ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ ঐ বয়সে এইরূপ গ্রন্থপাঠেরই সমধিক ইচ্ছা হয়। সুতরাং সুমিষ্ট, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহিনী ভাষায় রচিত এই গ্রন্থদ্বয় আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। এরূপ পাণ্ডিত্য-বর্জ্জিত আড়ম্বরলেশশূন্য মধুর ভাষা আর কাহারও প্রবন্ধে পাওয়া

* 'রবিবাসর' কর্ত্তৃক আহূত স্মৃতি-সভায় শ্রীযুক্ত রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুরের সভাপতিত্বে পঠিত।

দুর্ল্ভ ছিল। সেই অবধি দাদার রচনা পাইলেই আমি পড়িতাম।

আমাদের বিদ্যালয়ে পঠদ্দশাতেই রামানন্দ বাবু 'প্রদীপ' বাহির করিলেন। উহাতে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সুন্দর হাফটোন চিত্র নিয়মিত ভাবে প্রথম প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন যে অল্পসংখ্যক চিত্র প্রকাশিত হইত, আমাদের তরুণ মনে তাহা দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া যাইত। কখনও যাঁহাদিগকে দেখি নাই এবং তখন দেখিবার আশাও করিতাম না, তাঁহাদিগের চিত্র দেখিয়াই তাঁহাদের দর্শন ও সান্নিধ্যসুখ উপলব্ধি করিতাম। প্রদীপের ৪র্থ বর্ষে ১৩০৮ খৃষ্টাব্দে দাদার পরিব্রাজক বেশে গৃহীত একটি আলোকচিত্র প্রকাশিত হইল। কম্বল গাত্রে, দীর্ঘ যষ্টিহস্তে সংসারবিরাগী পরিব্রাজকের সেই মূর্ত্তি,—যাহা ১৬ বৎসর বয়সে দেখিয়াছিলাম—তাহাই দীর্ঘকাল মানসনয়নে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম এবং যখনই দাদার কোন রচনা পাঠ করিতাম তখনই সেই আত্মভোলা ভোলানাথসদৃশ মূর্ত্তিখানি যেন নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হইত। তখন স্বপ্নেও মনে করি নাই একদিন তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া—তাঁহার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া—ধন্য হইব।

সাহিত্যের যে উচ্চ আদর্শ কৈশোরে সাহিত্যগুরুগণ আমাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহাতে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের দ্বার আমাদের ন্যায় মূর্খ ব্যক্তির পক্ষে একপ্রকার রুদ্ধ বলিয়াই মনে হইত। বিশেষতঃ কিশোরকালাবধি সাহিত্যসম্পাদক সুরেশ সমাজপতির সমালোচনায় প্রসিদ্ধতম লেখকগণেরও নিগ্রহ দেখিয়া আমি মাতৃভাষার সেবায় যে কখনও উন্মুখ হইব ইহা স্বপ্নেও মনে করি নাই। কিন্তু 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।' ঘটনাচক্রে আমাকেও অনধিকার চর্চ্চা করিতে হইল এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সুরেশ সমাজপতি এবং তাঁহার অভিন্ন-আদর্শ শিষ্য হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই দুইজন সাহিত্যের কঠোর সমালোচকের সম্পাদিত পত্রেই আমার সাহিত্যিক ধৃষ্টতার প্রথম পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। ইঁহাদের উৎসাহে আমার প্রথম পুস্তিকা 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' প্রকাশিত হইলে আমার বাল্যবন্ধু 'যমুনা' সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল মহাশয় একদিন আমাকে দাদার নিকটে লইয়া গেলেন। ফণীন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'সই-মা'র তিনি তখন ভূমিকা লিখিয়াছেন বা লিখিতেছেন। তিনি তখন রামতনু বসুর লেনে মানসী প্রেসে অবস্থান করিতে ছিলেন। প্রথম সাক্ষাৎ, কিন্তু ব্যবহার পাইলাম যেন আমি তাঁহার বহুদিনের পরিচিত আত্মীয়। দাদা নবপ্রকাশিত 'ভারতবর্ষে' আমাকে উৎসাহ দিয়া গ্রন্থখানির প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রশংসাবাণীতেও আমার মনের সঙ্কোচ ও ভয় বিদূরিত হইল না।

তাহার কারণ এই যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ব্বে আমি মনে সাহিত্য-মন্দিরে তাঁহাকে লেখক ও সমালোচক হিসাবে যে উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছিলাম, সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশের পর দেখিলাম সকলে তাহা দিতে সম্মত নহেন। অনেকে বলিলেন দাদার সমালোচনা ত, উনি সকল বইয়েরই সুখ্যাতি করেন—গুরুদাসের দোকানকে সব বই-ই বিক্রয় করিতে হইবে সুতরাং "ভারতবর্ষে" দাদাকেও সকল বইএরই সুখ্যাতি করিতে হইবে। মনে খটকা লাগিল। যিনি আজীবন সাহিত্যসেবাতে আত্মনিয়োগ করিলেন সত্য সত্যই কি তাঁহার রসাস্বাদন শক্তি বা সমালোচন শক্তি নাই কিম্বা তিনি পরমুখাপেক্ষী হইয়া সমালোচনা করেন? তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত হইবার পর ইহার রহস্য ভেদ করিতে পারিলাম। পরে সে সম্বন্ধে বলিব।

অজাতশত্রু কেহই নহেন। এরূপও শুনিলাম যে তাঁহার নিজের রচনায় উচ্চশ্রেণীর প্রতিভার ছাপ নাই, তাঁহার লেখায় আর্ট নাই,—আরো কত কি?

কিন্তু এ সকল শুনিয়াও তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। যিনি যাহাই বলুন না কেন, তাঁহার লেখা যে বড় মিষ্ট লাগে,—বড় মিষ্ট লাগে। গল্পের প্লটে হয়ত বৈচিত্র্য নাই, মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ বিশ্লেষণ নাই, কিন্তু এমন সুমিষ্ট ভাষা, এমন প্রাণময়ী ভাষা, এমন করুণ সহৃদয়তাপূর্ণ বাণী পড়িতে কাহার না ভাল লাগে? Art of concealing artই তাঁহার প্রধান আর্ট। তাঁহার রচনা পড়িলে মনে হয় এই আমাদের সুজলা সুফলা মলয়জ-

শীতলা মাতৃভূমির নিজস্ব মধুর, কোমল, স্বচ্ছ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষা কোথাও বিলাতী বোটকা গন্ধ নাই, পাণ্ডিত্যলেশ বর্জ্জিত আড়ম্বরশূন্য, সহজবোধ্য ভাষা।

গ্রাম্যবার্ত্তা, বসুমতী, হিতবাদী, সুলভসমাচার প্রভৃতি সম্পাদনে দাদার সম্পাদকরূপে কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

"ভারতবর্ষ" প্রকাশের পূর্ব্বেই যখন উহার প্রতিষ্ঠাতা দ্বিজেন্দ্রলাল ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিলেন তখন উহার প্রকাশকগণ দাদাকে উহার সম্পাদনভার প্রদান করিলেন। কি আশ্চর্য্য তাঁহাদের দুরদর্শিতা! বিগত ২৬ বৎসরের 'ভারতবর্ষে'র ইতিহাস দাদার সম্পাদনার কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে। প্রকাশের অত্যল্পসময়ের মধ্যেই এরূপ জনাদর লাভ বোধ হয় আর কোন মাসিকপত্রের অদৃষ্টে ঘটে নাই। যদি বাঙ্গালা সাহিত্যে তিনি যে শতাধিক গ্রন্থ লিখিয়া গৌরবের আরোপ করিয়াছেন তাহার কথা আমরা বিস্মৃত হই, তথাপি কেবল ভারতবর্ষ বহুবৎসর সুসম্পাদিত করিয়া তিনি সাময়িক সাহিত্যের যে উন্নতিবিধান করিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও কেহ কেহ তাঁহার সম্পাদন-কার্য্যের ত্রুটী ধরিয়াছেন। এমন কি একবার স্বয়ং শরৎচন্দ্র আমাকে বলিয়াছিলেন, এমন অনেক জিনিষ দাদা 'ভারবর্ষে' ছাপেন যাহা তিনি (শরৎচন্দ্র) সম্পাদক হইলে কখনও ছাপিতেন না। নবীন লেখকদিগকে তিনি অনেক সময়ে অযথা প্রশ্রয় দিয়া থাকেন।

কিন্তু এ সকল অসামঞ্জস্য এক মুহূর্ত্তে বিলীন হইয়া গেল যখন আমি দাদার ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইলাম,—যখন জানিলাম তিনি প্রকৃত নবদ্বীপবাসী, যে নবদ্বীপে একদিন সেই মহা প্রেমের বন্যা ডাকিয়াছিল, যে প্রেমে একদিন 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়'——যখন দেখিলাম দাদা বঙ্গবাসীর মন্দিরে মূর্ত্তিমতী নিষ্ঠা। যেমন একদিন গৌরাঙ্গদেব ভগবৎ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া দীনাতিদীনের নিকটেও প্রেমভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছিলেন এবং যাহাকেই দেখিতেন তাহাকেই নিজের অপেক্ষা অধিকতর প্রেমিক মনে করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতেন ও তাহার নিকট প্রেম যাচ্ঞা করিতেন, বাণীর মন্দিরে দাদাকেও আমি সেইরূপ আত্মাভিমানশূন্য একনিষ্ঠ ভক্তরূপে দেখিয়াছি এবং যিনি যেটুকু সামর্থ্য লইয়াই হউক না কেন বাণী পূজার জন্য ভক্তিভরে অর্ঘ্য আনিয়াছেন তাঁহাকেই সাদরে কোল দিয়াছেন, বলিয়াছেন এস ভাই এস, মায়ের পূজার মন্দির সকলের জন্যই উন্মুক্ত।' 'ভক্তিতে মিলয়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর'—এ মহাবাক্য যে বাণীসেবাতেও সত্য ইহা সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, কারণ জ্ঞানের সাধনাই বাণী অর্চ্চনার প্রধান ও প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু ভক্তি ও নিষ্ঠাও যে বাণী সাধনার প্রকৃষ্ট উপায় তাহা দাদার জীবনে প্রথম আমরা উপলব্ধি করিলাম। এবং সারদাপ্রেমের এই গভীর উন্মাদনাই তাঁহাকে প্রত্যেক লেখকেরই সহিত সমানুভূতি-সম্পন্ন এবং তাঁহার রচনায় রসাস্বাদনে সামর্থ্য দিয়াছে, হংসের ন্যায় নীর হইতে ক্ষীর পৃথক্ করিবার শক্তি দিয়াছে। যেমন সরলান্তঃকরণ সাধুপুরুষগণ সকলকেই সরল ও সাধু বলিয়া মনে করেন, নিষ্ঠাবান সাহিত্যসেবক জলধর-দা সকল লেখককেই বাণীর একনিষ্ঠ সাধক বলিয়া মনে করিতেন। এই জন্যই যে লেখক, যতই নবীন ও অপরিপক্ক হউক না কেন তাঁহার নিকট গিয়াছে তাঁহাকে তিনি সাহিত্যের মন্দিরে সানন্দে প্রবেশপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত করাইয়া দিয়াছেন। যাঁহারা উচ্চশ্রেণীর প্রতিভার অধিকারী বা লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক তাঁহাদের অনেকে অনেক সময়ে নিম্নশ্রেণীর বা নবীন লেখকদিগকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, আমল দিতে চাহেন না। বাণীভক্ত জলধর-দা' কেহ বাণীসেবায় উন্মুখ দেখিলে আনন্দে তাহাকে মায়ের বেদীর সম্মুখে আনিয়া পূজার অধিকার দিতেন। স্বদেশবাসীর পক্ষ হইতে শরৎচন্দ্র জলধর-দা'কে এই বিশেষ কার্য্যের জন্য তাঁহার প্রতি এইভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"বাণীর মন্দির-দ্বারে তুমি সকলকে দিয়াছ অবারিত পথ, কনিষ্ঠগণকে দিয়াছ আশা, দুর্ব্বলকে দিয়াছ শক্তি, অখ্যাতকে দিয়াছ খ্যাতি, আত্মপ্রত্যয়হীন, শঙ্কাকুল কত আগন্তুক জনই না সাহিত্যপূজার বেদীমূলে তোমার ভরসা ও বিশ্বাসের মন্ত্রে স্বকীয় সার্থকতা খুঁজিয়া পাইয়াছে।"

জলধরদা'র সাহিত্য-নিষ্ঠা কত গভীর ছিল তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে যেখানে যতদূরেই হউক না কেন, যত দুরধিগম্য স্থানে হউক না কেন, কোন সাহিত্যসভার নিমন্ত্রিত হইলে তিনি শারীরিক দুর্বলতা ও পারিবারিক অসুবিধার কথা বিস্মৃত হইয়া সর্ব্বাগ্রে সেখানে ছুটিতেন। ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যত পরিচিত ছিলেন এবং যত সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জ্জন করিয়াছেন, আর কেহ তত পরিচিত বা তাদৃশ শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাঁহার বাগ্মীতা অসাধারণ ছিল এবং যাহা তিনি বলিতেন অন্তর হইতে আবেগের সহিত বলিতেন। গত বৎসর আমার অনুরোধে খিদিরপুরে হেমচন্দ্র পাঠাগারে হেমচন্দ্র শতবার্ষিকী স্মৃতিসভায় সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে তিনি স্বীকৃত হন। তাঁহার শারীরিক অবস্থা সে সময়ে অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, তথাপি তিনি সাহিত্যব্রতী হইয়া এরূপ সভায় যোগদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা করিবার সময় তিনি অত্যধিক আবেগে এত অভিভূত হইয়াছিলেন যে সন্তোষকুমার বসু প্রভৃতি সভার অন্যান্য উদ্যোক্তারা পাছে তিনি রক্তের চাপাধিক্য বশতঃ অজ্ঞান হইয়া পড়েন এরূপ আশঙ্কা করিয়া পুনঃপুনঃ তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সমস্ত বক্তব্য শেষ করিয়া তবে আসন পরিগ্রহ করেন। সেদিন-কার দৃশ্য আমি কখনও ভুলিব না।

তাঁহার শেষ জীবনে রবিবাসরই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল এবং রবিবাসরেই স্বর্গারোহণের কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রকাশ্য সভায় তাঁহার শেষ আগমন। রবিবাসরের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আপনারা সকলেই অবগত আছেন। আমি যখন 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র অন্যতম লেখক ছিলাম, তখন প্রায়ই সন্ধ্যার সময় 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' কার্য্যালয়ে জলধর দা আসিতেন। প্রভাতকুমার, সুবোধ দত্ত, সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র মিত্র, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা প্রভৃতি সাহিত্যানুরাগী মহাশয়গণও তথায় প্রায় আসিতেন এবং সেখানে নানাপ্রকার সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা হইত। এই সময়ে দাদা প্রস্তাব করেন যে এরূপ অবান্তর আলোচনা না করিয়া 'রবিবাসর' নামক একটি সভা স্থাপন করিলে হয়, সেখানে প্রতি অধিবেশনে সাহিত্যবিষয়ক কোন প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইতে পারে। তবে উহার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে প্রবন্ধ পাঠ নহে, লেখকগণের মধ্যে প্রীতির ভাব বর্দ্ধিত করা তাঁহাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করা। প্রথমে স্থির হইয়াছিল সভ্যসংখ্যা ২০ জনের অধিক করা হইবে না কিন্তু শীঘ্রই উহা এরূপ আকর্ষণের প্রতিষ্ঠান হইয়াছিল যে সদস্য সংখ্যা ৫০ জন পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা হয়। এখনও অনেকে উহাতে যোগদান করিতে উৎসুক কিন্তু নানা কারণে সদস্য সংখ্যা বর্দ্ধিত করা সম্ভব নহে। বলা বাহুল্য এই আকর্ষণের প্রধান কেন্দ্র ছিলেন জলধর দাদা। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষসভা লইয়া বিষম গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং রবি-বাসরেরও একবার সেইরূপ দুর্দ্দিন আসিয়াছিল। সেই সময়ে আমি প্রস্তাব করি যে অধ্যক্ষসভার পরিবর্ত্তে দাদাকে সমস্ত ক্ষমতা দিয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ করা হউক এবং তিনি যাহা করিবেন তাহাই সকলে মানিয়া লইবেন। দাদার প্রতি সকলেরই এরূপ গভীর শ্রদ্ধা ছিল যে ইহাতে সকলেই একমত হইয়াছিলেন এবং রবিবাসরের কার্য্যধারায় আর কখনও কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। দাদা যেমন রবিবাসরের প্রাণ ছিলেন, রবিবাসরও যেন দাদার প্রাণস্বরূপ হইয়াছিল। শারীরিক অসুস্থতার জন্য গত বৎসরের কথা বাদ দিলে একথা সকলেই স্মরণ করিতে পারেন যে তিনি কখনও রবিবাসরে অনুপস্থিত ত হইতেন না, বরঞ্চ সকলের অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। কতবার সুদূর মফঃস্বলে প্রাতে কোন সাহিত্যসভায় সভাপতিত্ব করিয়া অপরাহ্ণে ছুটিয়া আসিয়াছেন রবিবাসরের অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য। তাঁহার এই অচলা নিষ্ঠা আমাদিগের শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছে। কত সময় অসহ্য গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে কৃষ্ণপুরে, প্রচণ্ড শীতের সন্ধ্যায় লেক অঞ্চলে, বা বিপুল বর্ষার রাত্রে জলমগ্ন কলিকাতায় অপরিসর গলিতে তিনি রবিবাসরের অধিবেশনে যোগদান করিয়াছেন দেখিয়া আমরা মনে মনে লজ্জা অনুভব করিয়াছি যে ঐরূপ অসুবিধা বা অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমরা আসিতে অনুৎসুক ছিলাম এবং সামান্য

শারীরিক অসুবিধার জন্য সুধীসংসর্গ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিবার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলাম। রবিবাসরের ন্যায় প্রতিষ্ঠান,—যাহার উদ্দেশ্য ও গৌরব কেবল পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠে নহে—পরন্তু সাহিত্যসেবকগণের মধ্যে প্রীতি ও সহানুভূতির ভাব সঞ্চার করিয়া দেওয়া,—তাহার সফলতা নির্ভর করে সদস্যগণের নিয়মিত উপস্থিতির উপর। এই উপস্থিতির জন্য শরৎচন্দ্র একবার একটি কঠোর নিয়ম প্রচলিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু জলধর দা রবিবাসরে নিয়ম কানুন প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই সদস্যগণকে নিয়মিত ভাবে এবং যথাসময়ে অধিবেশনে যোগদান করিতে অনুপ্রেরিত করিবে।

জলধর-দা' অক্লান্তভাবে অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল ব্যাপিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালা সাহিত্যিকের সেবা করিয়া তাঁহার জীবন সার্থক করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অসংখ্য রচনাবলী অর্দ্ধশতাব্দীকাল পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিয়াছে এবং বহুকাল মনোরঞ্জন করিয়া তাঁহার স্মৃতি অপরিম্লান রাখিবে। বহু বিদ্বজ্জনসভায় তিনি সম্মানিত, সম্বর্দ্ধিত ও সম্পূজিত হইয়াছেন। কিন্তু 'লেখক জলধরের' স্মৃতি সাহিত্যের ইতিহাসে রক্ষিত হইলেও, লেখক অপেক্ষা বড় 'মানুষ জলধরের' স্মৃতি কি আমরা ক্রমশঃ বিলীন হইতে দিব? মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার সেই অবিচলিত নিষ্ঠা, সাহিত্যিক গণের প্রতি তাঁহার সেই গভীর ভ্রাতৃভাব, সাহিত্যক্ষেত্রে সেই সর্ব্বত্র সমদর্শিতার ভাব, কি আমরা আমাদিগের ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের মধ্যে অনুপ্রেরিত করিয়া যাইতে পারি না? পারি, যদি আমরা তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় এই রবিবাসরটীকে তাঁহারই আদর্শে পরিচালিত করিয়া সঞ্জীবিত রাখিতে পারি। আজ তাই আমাদের শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া দাদার পরলোক গত আত্মার নিকট এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি যেন আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা সফল হয়,

"তোমারি চরণ করিয়া স্মরণ চলিব তোমারি পথে।"

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

অভিশপ্ত বৈশাখ

শ্রীসুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

তোমরা দেখেছো যারা অভিশপ্ত বৈশাখের
বর্ণহীন নিঃসঙ্গ আকাশ
জেনেছো কী কোনোদিন নিঃসঙ্গ চাঁদের
উধাও কালের বুকে পাথুরে নিঃশ্বাস?

হাজার সূর্য্যেরা শোনে দগ্ধনীল বিদ্রোহের
অগ্নিময় উদ্ধত ভাষণ...
অলক্ষ্য শূণ্যের মাঝে নক্ষত্র গ্রহের
লক্ষ লক্ষ বক্ষ আজ হ'য়েছে উন্মন!

তোমরা ভুলেছো জানি উচ্ছ্বসিত রজনীর
মর্ম্মরিত অরণ্য-বিলাপ
নেবুলার বক্ষে তাই সাগর-উর্ম্মির
স্বপ্ন হোলো শতাব্দীর তীব্র অভিশাপ॥

তোমাদের অভিযোগে বাস্তবিত সন্ধ্যাটির
বক্ষে জাগে বন্ধ্যা মরুভূমি,
অদৃশ্য ফল্গুর কাছে আপন মুক্তির
পন্থা খোঁজে জ্যোছনার পাণ্ডুলিপি চুমি॥

আমার লাগে না ভালো নির্ব্বাসিত সূর্য্যটির
রক্তমুখী রসশূণ্যতারে,
কক্ষহারা তারকার অভিশাপে বীর
ক্ষয়িষ্ণু বিস্ময়ে জানি হারায় আত্মারে॥

পদ্মা: প্রমত্তা নদী

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীসুবোধ বসু
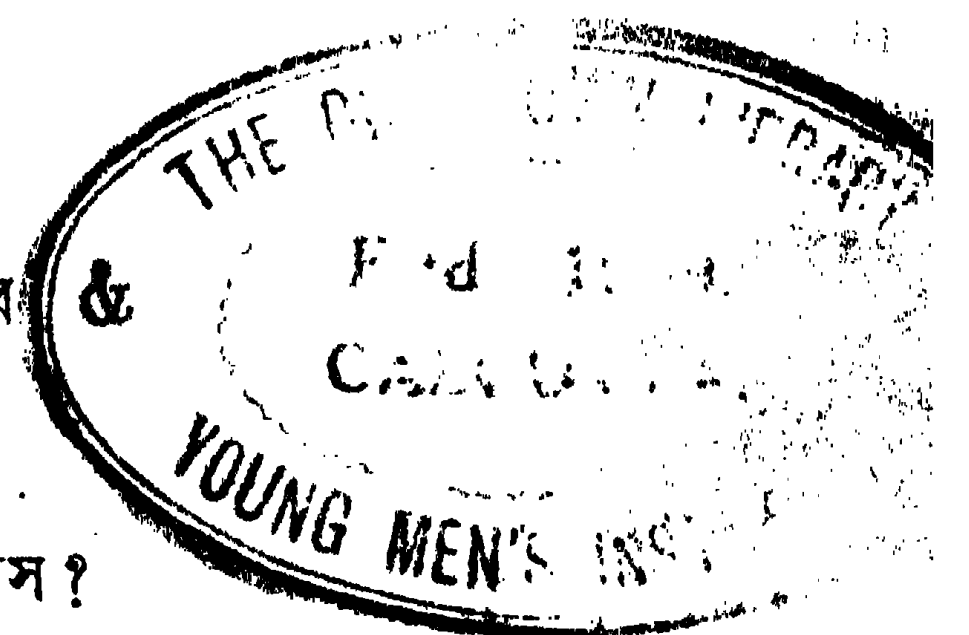
এগারো

ইহার ঠিক তিন দিন পরে খবরের কাগজের এক কোণায় এই সংবাদটুকু বাহির হইল :—

বিক্রমপুরের স্বনামধন্য জমিদার স্বর্গীয় দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরির পুত্র রজতপ্রসন্ন চৌধুরি গতকল্য চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক পিকেটিং এবং সাধারণ জনতাকে বে-আইনী কাজে প্ররোচিত করিবার অভিযোগে নয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। বাংলার জমিদারদের মধ্যে সম্ভবত ইনিই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্য ভাবে আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দিলেন।

জেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা মাত্রই অজস্র পরিচিত এবং বন্ধু আসিয়া রজতের চতুর্দ্দিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। জীবনের এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার প্রথম মুহূর্ত্তে এতগুলি চেনা মুখ দেখিয়া রজত সত্যই আশ্বস্ত বোধ করিল। মনে হইল যেন আত্মীয়দের মধ্যেই আসিয়াছে।

বন্ধুদের কেহ কহিল—'রজত, এসেছিস্, ভাল করেছিস্। তোকে ছাড়া আড্ডা আমাদের জমছিল না।' কেহ কহিল—হাওয়া বদলাতে এলি রজত? জায়গাটার স্বাস্থ্য সত্যি ভাল। আর একজন বলিল—'আর ঘ্যাঁট্ খেয়ে মুখও বদ্‌লাতে পারবি—ঘ্যাঁট্, দি ঘ্যাঁট্! ঘ্যাঁটের নামে আমি একটা কবিতা লিখব!'

এমন সময় পিছন হইতে লোহার মত শক্ত এক জোড়া হাত রজতের কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকাইয়া দিল। চমকিয়া ফিরিয়া সে দেখিল—সমর! উল্লাসে রজতের অন্তর ভরিয়া উঠিল।

সমর তার প্রথামত রসহীন তীব্র কণ্ঠে বক্তৃতার ভঙ্গিতে সুরু করিল—কেমন, বলতাম কিনা তোমাদের যে তোমাদের এই কংগ্রেস একটা আস্ত বুর্জ্জোয়া প্রতিষ্ঠান?—ক্যাপিট্যালিষ্টদের একটা নির্লজ্জ আখড়া!—নইলে, এই রকম হোপলেশ ধনিক কংগ্রেসের জন্য জেলে আসতে পারে?' বলিয়া গম্ভীর ভাবে রজতকে টানিয়া একান্তে লইয়া গেল। কহিল—বাঁচলুম, রজত। পেট্রোনাইজ না করতে পেরে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলাম—আশাতে এখন বুক ভরে উঠল।

রজত কহিল—কিন্তু এখানে কি পেট্রোনাইজ করবি?

'কেন,' সমর অম্লান বদনে কহিল, 'তোর এলাউন্সের খানিকটা।'

'তবে আমি খাব কি?'

'তার আমি কি জানি! কিন্তু আমার পেট ভরা চাই তো, না, চাই না? অদ্ভুত লোক যা হোক!—ভাতার টাকা কি রকম ছোট লোকের মত কমিয়ে দিয়েচে, দেখেচিস্ তো? হাড় কিপটে! আগে, জানিস তো, ভাতার হারের কোনও কড়াকড়িই ছিল না। শুনতে পাই, আমার খাওয়ার বহর দেখেই নাকি প্রেন্টিস সাহেব ভড়কে গেছেন!'

রজত হাসিয়া কহিল—তা চেহারাখানার বাড়তি দেখেই টের পেয়েচি। সারাদিন নিষ্কর্ম্মার মতন বসে কি করিস্, বল তো? দিন কাটাস কি করে? এখনও তেমনি বকর বকর করিস?

সমর সগর্ব্বে কহিল—করি না আবার! নিশ্চয় করি; বকে বকে জেল-কর্তৃপক্ষের মাথা খারাপ করবার উপক্রম করেচি—ও রকম অহিংস্র অস্ত্র আর দুটি নেই। তবে 'সুপার' ভয় দেখিয়েচে, এত বেশি বক্‌লে 'সেলে' ঢুকিয়ে দেবে।—তা দিক না,—'সেলের' দেওয়ালগুলিকেই আমি অতিষ্ঠ করে' তুলব।—যাকে বলে শব্দ-ব্রহ্ম!

দুইতিন দিনের মধ্যেই রজত জেলের জীবনের সঙ্গে নিজেকে অনেকটাই মানাইয়া লইল। বাহিরের মুক্ত আকাশ মুক্ত আলোর জন্য মন কখনও আকুল হইয়া উঠে সত্য,—বিস্তৃত শস্য-প্রান্তরের উদার বিস্তারের জন্য একটা সুতীব্র বুভুক্ষা কখনও তাকে চঞ্চল করিয়া তোলে বটে, তবু এতগুলি শিক্ষিত সুস্থ মনের সাহচর্য্য সত্যই লোভনীয়। কত উঁচু বিষয়ে তারা তর্ক করে—রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, দর্শন,—কত মধুর কণ্ঠে কবিতা পাঠ হয়, কত মনীষীর জীবন সম্বন্ধে আলোচনা চলে, কত কৌতুক-পরিহাসে বন্দী-জীবনের দুঃখ তারা হাল্কা করিয়া লইতে চেষ্টা করে।

কিন্তু সব চাইতে বেশি রজতকে যাহা এই বন্দী-দশার মধ্যে বহন করিয়া লইতেছে তাহা এই :—সুমিত্রার কাছে আর সে পরাজয়ের লজ্জা বোধ করিবে না; তুচ্ছ মন দেওয়া নেওয়ার উপরে উঠিবার ক্ষমতা যে রজতের আছে, তাহা সুমিত্রাকে সে ইহার চাইতে স্পষ্ট করিয়া আর জানাইতে পারিত না। পুনর্ব্বার যদি কখনও তার সঙ্গে রজতের দেখা হয়, তবে রজত সগৌরবে মাথাটা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে,—বাক্য-হীন ভাষায় বলিতে পারিবে,—আমার প্রেম চপলতা মাত্র ছিল না; ত্যাগ করিবার ক্ষমতা আমারও আছে।

এমন সময় একদিন ওয়ার্ডার আসিয়া খবর দিল—একজন মহিলা তার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। দুদিন পূর্ব্বে সত্যানন্দ আসিয়াছিলেন; সত্যানন্দ তার কত বড় শুভাকাঙ্ক্ষী তাহা জানিত বলিয়া রজত ইহাও জানিত যে খবর শুনিলেই তিনি ছুটিয়া আসিবেন। কিন্তু হঠাৎ একজন মহিলা দেখা করিতে চায় শুনিয়া বিস্ময়ের তার আর অন্ত রহিল না।

কিন্তু বিস্ময় তার মাত্রা হারাইয়া ফেলিল, যখন ভিসিটর্স-রুমে যাইয়া রজত দেখিল, একটা চেয়ারের হাতলে ভর করিয়া উদ্বিগ্ন চোখে দরজার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে—সুমিত্রা। রজত প্রথমটায় নিজের দৃষ্টিকেই বিশ্বাস করিতে পারিল না—এমনই সে চমকাইয়া উঠিল।

সুমিত্রা অত্যন্ত পাণ্ডুর মধুর একটু হাসি হাসিল—অদ্ভুত একটা অশ্রু-জলে-মেশান হাসি। কহিল—রজতবাবু, একটু চোখ বুজুন তো?

রজত বিস্মিত হইয়া কহিল—চোখ?

'হ্যাঁ, চোখ দুটো একটু বন্ধ করুন, আপনাকে একটু বিস্মিত করবো।—না, না, তামাসা করচি না, সত্যই। মিনতি করি—

'এ কী করলেন!' স্তম্ভিত রজত চোখের পাতা মেলিয়া বিস্ময়োক্তি করিল। প্রণতা সুমিত্রা তখন একটি স্পন্দিত ভীরু লতার মত উঠিয়া সমুখে দাঁড়াইয়াছে। মুখোমুখি,—চোখের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে চোখ, একটা অ-কথিত বেদনায় সুমিত্রার ঠোঁট বারম্বার কাঁপিয়া উঠিতেছে।

নিজেকে কিছুটা সংযত করিয়া সে কহিল—'একটা কথা জানতে চেয়েছিলে: সেই কথাটা জানিয়ে গেলুম।' বলিয়া তাড়াতাড়ি ওদিকে ফিরিয়া নিজেকে স্থির করিতে চেষ্টা করিল।

রজত শুধু অস্ফুট কণ্ঠে কহিল—সুমিত্রা!

সুমিত্রা কহিল—যে দিন তোমার প্রথম ছুটি হবে, সেই

দিন সর্ব্বপ্রথম আমার বাড়ি যাওয়া চাই; আমি আজ থেকেই দিন গুণতে থাকবো। আশা করচি, আমারও তখন ছুটি হয়ে যাবে।

রজত চমকাইয়া কহিল—তুমিও জেলে আসবে না কি?

সুমিত্রা কহিল,—বাঃ রে, আসব না!

'না, না, সুমিত্রা। জেলে এসে তোমার কাজ নেই।'

সুমিত্রার সুগভীর মমতায় একটুক্ষণ রজতের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তারপর ছোট একটু দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া কহিল,—ছিঃ, তোমাকে জেলে পাঠিয়ে আমি বাড়িতে থাকবো কোন্ লজ্জায়! আমাদের দুজনার একই সাধনা—এদিকে বৈষম্য করা চলবে না।—আজ আমি বিদায় হলাম,—কিন্তু সে-দিনের অপেক্ষায় বসে থাকবো।' বলিয়া অত্যন্ত ধীরে ধীরে হাঁটিয়া সে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

সাত দিন পরে এক আগন্তুকের মুখে খবর পাওয়া গেল—সুমিত্রার ছয় মাস জেল হইয়াছে।

রজতের সকল বন্ধন বেদনা দূর হইয়া গেল। যাহা মানুষকে সঞ্জীবিত করে, জীবনকে লোভনীয় করে, সেই স্বপ্ন, সেই আশা, নদীর স্রোতের মত জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অমিত দাক্ষিণ্যের সঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। অন্তরের সেই অনন্ত উল্লাসে কারাগারের সেই লৌহদণ্ডগুলি অদৃশ্য হইয়া গেল। খোলা মাঠে এবং রাখালের বাঁশি, পাল-তোলা নৌকার স্বচ্ছন্দ জল-যাত্রা, চন্দ্রালোকিত তালগাছের ছায়াছবি এবং শস্যক্ষেতের সুগন্ধ বাতাস অবলীলাক্রমে কারাপ্রাচীর ডিঙাইয়া রজতের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল!

বারো

অবিচ্ছিন্ন এক [illegible] স্বপ্নের মধ্যে রজতের দিন কাটিতে ছিল।

খালের জলে ডিঙি ভাসাইয়া ছায়াগাছের তলায় তলায় [illegible] লইয়া সে বেড়াইল; জানালার ধারে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া বৈশাখী ঝড়ের রুদ্র দাপটে বনভূমির করুণ নিগ্রহের দিকে চাহিয়া রহিল; সোনার শরতে পূজার শানাইয়ের শব্দ শুনিয়া একসঙ্গে দুজনেই পুলকিত হইয়া উঠিল!

মনে মনে কত নতুন বাড়ি যে রজত তৈরি করিল, তার ইয়ত্তা নাই। কত বিচিত্র তার স্থাপত্য রীতি, কত বিভিন্ন তাদের পরিবেশ। সুমিত্রাকে পাশে লইয়া গেল সে সমুদ্রতটে—বালুর উপর দিয়া সহাস্যে ছুটাছুটি করিল। শৈলনগরীর পাইনসঙ্কুল অসমতল সর্পিল পথ দিয়া সুদূর কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে চাহিতে চাহিতে বেড়াইয়া ফিরিল!

কি করিলে সুমিত্রা সব চাইতে বেশি আনন্দিত হইবে, রজত ভাবিয়াই পায় না। একটা অভূতপূর্ব্ব গর্ব্বে, একটা অসম্ভব গৌরবে রজত স্পন্দিত হইয়া উঠিতে লাগিল। রজত পরাজিত হয় নাই,—সে জয় করিয়াছে। এত বড় জয়লাভ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ব্বর সম্রাটের পক্ষেও কোনও কালে সম্ভবপর হয় নাই!

কিন্তু মনের এই অপূর্ব্ব উল্লাসের কথা সে কারও কাছে প্রকাশ করিল না—এমন কি সমরের কাছেও নয়। এ আনন্দ যেন অতি পবিত্র, অতি স্পর্শভীরু—অন্য কাহারও দৃষ্টি এর সহ্য হইবে না। ইহা থাকুক তাহার গোপন অন্তরে,—মনের মধ্যকার এক সুগোপন পুলকে সে একাএকাই ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে—এ পুলকের ভাগ দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

নটা মাস যে কোথা দিয়া কাটিয়া গেল রজত যেন টেরও পাইল না। তাই যেদিন তার কারাবাসের মেয়াদ ফুরাইল, সেদিন সে সত্য সত্যই চমকাইয়া উঠিল—মুক্তির আদেশটা যথাসময়ের অনেক পূর্ব্বে হইয়াছে বলিয়া মনে হইল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে রজত ছাড়া পাইল। জেলের ফটকের বাহিরে আসিয়া দেখে বৃদ্ধ সত্যানন্দ উৎসুখ চোখে দাঁড়াইয়া আছেন। পিতৃবন্ধুর জন্য এক সুনিবিড় শ্রদ্ধায় রজতের মন পূর্ণ হইয়া গেল; তাড়াতাড়ি যাইয়া রজত তার পায়ের ধূলা লইল।

সত্যানন্দ কহিলেন,—পদ্মার ঋণ তোমার এইবার শোধ হলো। চল,—গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

রজত ধীরে ধীরে তাহার সঙ্গে অগ্রসর হইয়া চলিল। কিন্তু বারম্বার সুমিত্রার মুখটাই বায়স্কোপের ক্লোজ-আপের মতন বড় হইয়া দুই চোখের সমুখে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল; কিন্তু সে তো এখানে আসিবে না!

গাড়িতে বসিয়া মন্দালিকা; রজতকে দেখা মাত্র ওর চোখ দুইটা অশ্রুজলে একেবারে পূর্ণ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া সে যে অশ্রু গোপনের চেষ্টা করিতেছে তাহা রজতের বুঝিতে বাকি রহিল না। মোটরের খোলা দরজাটা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে সে পরিহাস তরল কণ্ঠে কহিল—এই যে ঠাকরুণ, জেলের দরজা পর্য্যন্ত আসা হয়েচে—ঠেলে আর একটু ঢুকিয়ে দিয়ে যাব নাকি?

মন্দালিকা ম্লান হাসিয়া কহিল—কিন্তু গায়ে কি তোমার ততটা জোর এখনও আছে রজত-দা? কী রোগা যে হয়ে গেচ, একবার আয়নায় দেখবে চল।

'হ্যাঁ, রোগা, তোকে বলেচে। ঘ্যাঁট কি রকম ভাইটা-মিনে ভরা তা জানিস্।—কিন্তু তোমার সঙ্গে এখন আমি বাড়ি যেতে পারব না, তা জেনে রাখ। আমার জরুরি কাজ আছে—পথে আমাকে নামিয়ে দিতে হবে—'

মন্দা কহিল—ঈস্!

সত্যানন্দও বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—না, রজত, তা এখন নয়। কাজ কাল হবে, এখন বাড়ি চল।

'আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে,' রজত ক্লিষ্টস্বরে কহিল, 'তাকি আপনি চান কাকাবাবু? যত রাতই হোক কাকীমার কাছে গিয়ে পৌছব, কিন্তু এখন নয়—একটু ক্ষণের জন্য আমায় ছেড়ে দিতে হবে।'

সত্যানন্দ কহিলেন—না, রজত, তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর, এ আমি কখনও চাই না। বল, কোথায় তোমাকে পৌছে দিতে হবে? কিন্তু খুব যেন দেরি করো না।

মন্দালিকা অসন্তুষ্ট স্বরে কহিল—এই ময়লা কাপড়-জামা তাও বদ্‌লাবেন না?

রজত দুষ্টুমির স্বরে কহিল—আমি কি ভদ্রলোক নাকি যে জামা কাপড়ের জন্য এতটা সতর্ক হতে হবে? জেলের আসামী কবে আবার এতটা ভদ্রলোক হলো, ভদ্রমহিলা? কিন্তু বুঝলি মন্দ, খুব কিন্তু একটা ভোজ চাই আজ। কাজ সেরে গিয়ে যদি দেখি, রান্না প্রস্তুত নয়, তবে তোমার পিঠ সম্বন্ধে হুঁসিয়ার থেকো।

পদ্মপুকুরের কাছাকাছি তার এই অকৃত্রিম একান্ত সুহৃদদের ক্ষুণ্ণ করিয়া রজত মোটর হইতে নামিয়া পড়িল। সুমিত্রা যে বসিয়া আছে, তাহার প্রত্যাশায়। জানালা দিয়া তার দুই উন্মুখ চোখ যে বারম্বার পথের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে! আর কি বিলম্ব করা যায়!

যে মিলনের স্বপ্নে সুদীর্ঘ নয় মাস কারাজীবন রজতের কাছে একটা রঙিন আনন্দের মতো কাটিয়া গিয়াছে, যে-মিলন তার কামনায় প্রেমে, হৃদয়ের সমস্ত অকথিত বাণী এবং অগীত সঙ্গীতে স্পন্দিত হইতেছে, তাহা সার্থক হইতে আর দেরি নাই—মনের এ চাঞ্চল্য আর দমন করা যায় না। রাস্তাটা ক্রমেই যেন অধিকতর বিলম্বিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

সুমিত্রা, কোন্ পূর্ব্বজন্ম হইতে তুমি আমাকে অনুসরণ করিয়া ধরণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? জন্মজন্মান্তরের কোন্ অদ্ভুত আকর্ষণে তোমার কাছে আমি ছুটিয়া আসিলাম? কোন সহৃদয় দেবতা আমাদের জন্য এত আনন্দ-আবেগের ব্যবস্থা করিলেন?

গ্যাসালোকিত ফুটপাথ, মর্ম্মরিত পথতরু শাখা, আলো-বিচ্ছুরিত বাড়িগুলি রজতের নিকট স্বপ্ন মনে হইতে লাগিল। সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া কে যেন বাঁশি বাজাইতেছে।

ঐ ল্যান্সডাউন বাজার, গাড়ির ষ্ট্যাণ্ড, তারপর বাঁ দিকে রাস্তা, তারপর—সর্ব্বনাশ, আর একটু হইলেই যে মোটর-চাপা পড়িত!

সুমিত্রা! সুমিত্রা! তোমার দু'চোখ হইতে তুমি আমার প্রথম কি অভ্যর্থনা বর্ষিত করিবে, তাহা আমি কল্পনা করিয়া চলিয়াছি! বারান্দার রেলিঙের উপর কেমন করিয়া ঝুঁকিয়া থাকিবে তাহা আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। স্মিতহাস্যে তোমার মুখমণ্ডল সহসা কেমন যে রাঙিয়া উঠিবে, তাহা পূর্ব্বাহ্নেই আমি কল্পনা করিয়া লইলাম।

রজত দ্রুত হাঁটিয়া চলিল। বড় ক্লান্ত বোধ হইতেছে, এইবার আশ্রয় পাইবে।

দূর হইতেই বহুপ্রার্থিত বাড়িটা দৃষ্টিগোচর হইল। দেখিল, অন্ধকার। নিকটবর্ত্তী হইল, দেখিল—অন্ধকার, আলোর সামান্যতম আভাস পর্য্যন্ত নাই। কাছে আসিল, দেখিল,—অন্ধকার।

উত্তেজনায় রজত হাঁপাইতে লাগিল। এ কি ব্যাপার! এর অর্থ কি! বাড়ি ভুল করে নাই তো? না, না,—ঠিক এই বাড়ি—ভুল করা তার পক্ষে অসম্ভব—

স্খলিতপদে রজত দৌড়াইয়া গেল। সদর দরজাটায় দুর্ব্বল কম্পিত হস্তে আঘাত করিতে লাগিল,—কোনও সাড়া আসিল না।

'সন্তোষ বাবু—সন্তোষ বাবু—সন্তু-দা,—সুমিত্রা,—সুমিত্রা—

প্রতিধ্বনি ছাড়া একটুমাত্র জবাব আসিল না। চেতনার যতটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা সংহত করিয়া রজত পুনর্ব্বার প্রাণপণ বলে দরজায় আঘাত করিতে লাগিল। অবশেষে অস্থির হাতে একবার একটা আঘাত পাইয়া চাহিয়া দেখিল, দুয়ারে তালা বন্ধ।

কাল-বৈশাখীর ঝড়ে বনবনান্তরের বক্ষ ভেদ করিয়া যেমন করুণ দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসে, তেমনি অতি সকরুণ একটা দীর্ঘশ্বাস রজতের বুকের মধ্য হইতে যেন পাঁজরাগুলি ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসিল।

মাতালের মত টলিতে টলিতে সে অদূরবর্ত্তী মুদির দোকানের দিকে আগাইয়া গেল। পৃথিবীটা একেবারে অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে!

'আচ্ছা, ঐ বাড়িতে যারা ছিলেন, তারা কোথায় গিয়েছে, বলতে পার?'

মুদি তখন নিকেলের চশমাটা নাকের অগ্রভাগে বসাইয়া হিসাব দেখিতেছিল। প্রশ্ন শুনিয়া চোখ উঠাইয়া কহিল—কি চাই, বল্লেন?

"ঐ কোণার বাড়িতে যারা ছিলেন, তারা কোথায় গেছেন, বলতে পার?" রজত পুনর্ব্বার কহিল।

'তারা উঠে গেছেন।'

'কোথায়? কবে?'

'তা প্রায় মাস দেড়েক হবে বৈ কি।—সেই যে মেয়েটি মারা গেল, তারপরই উঠে গেচেন—'

'মারা গেল!' রজত চেঁচাইয়া কহিয়া উঠিল। 'কে মারা গেল? কে?'

'ঐ যে মোশায়, সুন্দর দেখতে মেয়েটি ছিল—যিনি স্বদেশী করতেন।—বড় দুঃখের কথা,—তবে বুঝলেন না, মোশায়,—সবই ভগবানের হাত। জেল থেকে বেরিয়ে এল; দিব্যি চলাফেরা করচে। তারপর দেখি, দরজায় কেবলই মোটর আর গাড়ি। শুনলুম, নিমুনিয়া হয়েচে। তিকিচ্ছের তোড়জোড় খুবই চল্‌লো, তা হলেই আর হবে কি—একদিন সব ফর্শা হয়ে গেল। যাকে কর্ত্তা নিজে টানেন—ও কি, ও রকম করচেন কেন,—অ্যাঁ—কি,—হলো কি—

সহসা রজত উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিল—অসম্ভব এক তাড়িত শক্তি যেন সহসা তাহাকে অধিকার করিয়াছে। ছুটিতে ছুটিতে সে ম্যাডক্ স্কোয়ারে যাইয়া প্রবেশ করিল, এবং বিলীয়মান দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে সমুখের শূন্য বেঞ্চটা আবিস্কার করিয়া তাহার উপরে হুড়মুড় করিয়া পড়িল। পরক্ষণে তাহার আর কোনও সংজ্ঞা রহিল না।

তেরো

মঞ্জরী রায়ের বিবাহ হইয়াছিল এক ঘোরতর সাহেবের সঙ্গে; রঙটা কালো হওয়া ছাড়া তার সাহেবিয়ানার বড় রকম আর কোনও ত্রুটি খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। ভাবে ভঙ্গিতে, দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ খুঁটিনাটিতে মিষ্টার সুবিমল পাল চৌধুরি তার তিন বছরের বিলাত প্রবাসটাকে এমন তীব্র মুষ্টিতে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন যে বিলাতের খানিকটা তার সঙ্গে এদেশে আসিয়া পড়িয়াছিল। মঞ্জরী অবশ্য অত্যন্ত গর্ব্বসহকারেই ব্যাপারটাকে গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই সে দেখিতে পাইল যে তীব্র ইচ্ছা সত্ত্বেও উগ্র বিলাতিয়ানাতে সে কিছুতেই রপ্ত হইতে পারিতেছে না।

সুবিমল পাল চৌধুরি স্বদেশ হইতে সিভিলিয়ান হইবার সৎ সংকল্প লইয়া বিলাত যায় ; কিন্তু সংকল্প সাধু হইলেও তাহা সংকল্পই রহিয়া গেল ; অবশেষে অগতির গতি বিলাতের ওকালতি পাশ করিয়া সে দেশে ফিরিয়া আসিল এবং জীবনের এই ব্যর্থ আশার প্রতিশোধ তুলিল দুর্ভাগা ভারতবর্ষের উপর। কিন্তু এ চটক যে-সব ক্ষেত্রে কার্য্যকরী হয়, এবারেও সেখানে কাজে লাগিল ; মঞ্জরী পিতৃগৃহ হইতে পাল চৌধুরির ফ্ল্যাটে স্থানান্তরিত হইল।

বিবাহিত জীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল হনিমুন ও উইক্-এণ্ডে শৈলবিহার দিয়া ; সাহেবি হোটেলে ডিনার ও বিলাতি সঙ্গীতের রিসাইটেলে হাততালি দেওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া উঠিয়াছিল ; গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে মোটর ছুটাইয়া নিরুদ্দেশ-যাত্রা সততই চলিত। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, দেখা গেল,—উইক্-এণ্ডে বেড়াইতে গেলে নিরর্থক পয়সা খরচ হয় ; বিলাতি হোটেলের ডিনার অযথা মহার্ঘ্য ; বিলাতি সঙ্গীত অনাবশ্যক কোলাহলমুখর, এবং গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোডের মসৃণ অশেষ পথে গাড়ি যতই ছুটিয়া চলে, পেট্রোলের ট্যাঙ্ক ততই খালি হইয়া ওঠে। সুতরাং জীবনযাত্রার সংস্কার প্রয়োজন হইয়া পড়িল।

কিন্তু স্বভাব অত সুশীল ছেলে নয়। ইচ্ছা করিলেই মানুষ তার হাত হইতে রেহাই পায় না,—এবং স্বভাবের এই দৌরাত্ম্য মিঃ পাল চৌধুরিকে এখনও প্রত্যহ সন্ধ্যায় সাহেবি রেস্তঁরার কক্ষে কখনও একা কখনও বা সস্ত্রীক ঘুরাইয়া ফিরায়। তবে আজকাল সে ডিনার খাইতে যায় না,—অর্কেষ্ট্রাধ্বনিত 'বুফে'তে পুরুগদি সংযুক্ত চেয়ারে গর্ব্বসহকারে বসিয়া আইস-ক্রিমের অর্ডার দেয়।

আজও তিনি সস্ত্রীক আইস-ক্রিমের সন্ধানে আসিয়াছিলেন। কিন্তু আইস-ক্রিমেই তার তর্ক নিবদ্ধ ছিল না,—দুই বাটি ক্রিমের সমুখে বসিয়া পাল চৌধুরি স্ত্রীর নিকট নানাপ্রকার রসাল কক্‌টেল প্রস্তুতির বিস্ময়কর প্রণালীগুলি গর্ব্বসহকারে ব্যাখ্যা করিতে সুরু করিয়াছিলেন। মঞ্জরী এতে কোনও আনন্দ পায় না,—কিন্তু তবু তাকে আগ্রহ প্রকাশ করিতে হয়, সাহেবের সহধর্ম্মিণী হওয়ার ইহা দুরূহ সৌভাগ্য !

পাল চৌধুরী কহিতে লাগিলেন,—ওয়াইন বললেই এ-দেশের লোক লাফিয়ে উঠবে—যেন মদ সত্যই কিছু অস্পৃশ্য পদার্থ !—কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে ভয় মদের নয়, মদের কোয়ালিটির।—যে-কোনও সিভিলাইজ্‌ড্ দেশেই দেখতে পাবে, ওয়াইন্ একটা অপরিহার্য্য পানীয়—pep, vim, delight ! ধরো না, শ্যাম্পেন ;—শ্যাম্পেন পান যদি গর্হিত হয়, তবে চুম্বন আরও গর্হিত, তবে লভ্ একটা ঘৃণিত—ওঃ, ডিয়ার ! কাণ্ড দেখেছো ঐ বাঙালি ছোক্‌রাটার ?—গ্লাসের পর গ্লাস, বোতলের পর বোতল, কেমন অবলীলাক্রমে গলা দিয়ে পার করে দিচ্ছে ; মস্ত-রসিক বটে !

তখন কৌতূহলী হইয়া মঞ্জরী ঘাড় বাঁকাইয়া চেয়ারের পশ্চাত দিকে তাকাইল, এবং তাকাইয়াই পরমুহূর্ত্তে একেবারে চমকাইয়া উঠিল। দেখিল, তাহাদের টেবিলের অদূরে একটা টেবিলের সমুখে বসিয়া রজত মদের পূর্ণ গ্লাস মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। টেবিলের উপর দুতিনটা বোতল ; একটা সম্পূর্ণ নিঃশেষিত, অপর একটাও আংশিকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। রজত কোনও দিকে চাহিতেছে না ; তার সমুখে কোনও খাদ্য নাই—এমন কি মদের চাট্ হিসাবে বাদাম-ভাজা প্রভৃতি যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাও সে একদিকে ঠেলিয়া রাখিয়াছে ; শুধু স্খলিত হস্তে বোতল হইতে কেবলই মদ্য ঢালিয়া সে গলায় ঢালিয়া দিতেছে,—এমন কি প্রত্যেকবার সোডা মিশাইবার কথাও তার মনে হইতেছে না।

আলুথালু রজতের দীর্ঘ চুল ; রক্তলেশহীন মুখে যেন শতাব্দীর অবসাদ আসিয়া ভিড় করিয়াছে ; আমিলিত চোখ দুটিতে বুঝি দৃষ্টি শক্তি অবশিষ্ট নাই। হতভম্ব বিস্ময়ে এবং সুগভীর করুণায় মঞ্জরী কতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার দিকে নিষ্পলক চোখে চাহিয়াই রহিল—তার মনে হইতে লাগিল, রজত যেন সদ্য এক কবর হইতে উঠিয়া আসিয়াছে ; সে যেন মানুষ নয়,—স্বাস্থ্যদীপ্ত, প্রাণচঞ্চল, শক্তিমান রজতপ্রসন্ন যেন মরিয়া ভূত হইয়া সহসা

এই দীপালোকিত উৎসব মুখরিত ভোজনাগারে জীবিত মানুষদের চম্‌কাইয়া দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে।

পালচৌধুরি কহিলেন,—ও-রকম ভাবে তাকিও না; ওরকম করে মাতালদের দিকে তাকাতে নেই—বলা যায় না তো, ওদের কোন্ খেয়াল গজিয়ে ওঠে—আই মিন্,—ওদের avoid করে' চলাই নিরাপদ; কেননা, ওদের wits ওদের কন্ট্রোলে থাকে না—ও কি—কোথায় যাচ্ছ?—

মঞ্জরী চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কহিল—তুমি একটু বস।—আমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলে আসচি—

সবিস্ময়ে পাল চৌধুরি কহিলেন—তুমি? ওর সঙ্গে? বলো কি?—

মঞ্জরী কহিল,—উনি রজতবাবু: একসঙ্গে আমরা পড়তাম। মদ খাবার ছেলে তো উনি নন্—কিন্তু এ কী ব্যাপার! আমি তো কিছুই বুঝতে পারচি না। বলিয়া মঞ্জরী দ্রুত হাঁটিয়া রজতের কাছে উপস্থিত হইল।

রজত একবার চোখ মেলিয়া চাহিল। তারপর বোতল হইতে গ্লাসটা পূর্ণ করিতে করিতে নির্লিপ্ত নিম্নস্বরে কহিল,—বসুন্।

মঞ্জরী সমুখের চেয়ারটায় বসিয়া পড়িল কহিল এসব কি কাণ্ড, রজতবাবু?

রজত গ্লাসটা মুখের সমুখে উঠাইয়া একটু ইতস্তত করিয়া নামাইয়া রাখিল। মৃদুস্বরে কহিল—যা ভুলতে চান, তা যদি বারে বারে মনে পড়ে, মনে পড়ে' তা যদি আপনাকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চায়,—তবে আপনি কি করেন?—আপনি ভুলতে চান, কেমন? কি করে' ভুলবেন? বলুন, কি করে' আপনি ভুলবেন?—

'না, না, রজতবাবু,' মঞ্জরী মিনতি-করুণ কণ্ঠে কহিল—'ছি, ছি!'

'তবে ছি ছি করুন্ বিধাতাকে, ধিক্কার দিন ভাগ্যকে; নিষ্ঠুর নিয়তিকে অভিশাপ দিন।' স্খলিত রজতের কণ্ঠ, নেশায় বিকৃত, অবসাদে ক্ষীণ।

'মিনতি করি, রজতবাবু, কি হয়েচে বলুন; নিজের যে আপনি সর্ব্বনাশ করচেন।'

'না, ভুল; নিজে করিনি,' রজত স্খলিত কণ্ঠে কহিতে লাগিল, 'সত্যি, মাইরি, এ সর্ব্বনাশ আমার নিজের করা নয়।—যার আঙুলটাও খুঁজে পাওয়া যায় না, শত আক্রোশেও যার চুলের ডগাটুকুও ধরতে পারব না, এ সেই স্বেচ্ছাচারীর কাজ! কে সে, জানেন?—আপনাদের ঈশ্বর! তার সঙ্গে কি আর কুস্তি করা চলে—হি হি—চলে না। কিন্তু নিজেকে ইচ্ছেমত খুব সায়েস্তা করা চলে—খুব—'

'রজতবাবু?'

'বলুন।'

'আপনার মস্ত বড় কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটেচে, আমি বুঝতে পারচি—নইলে এ আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না। কিন্তু পুরাতন সহপাঠিনীর এই অনুরোধটুকু রাখুন,—নিজেকে এমন করে' নষ্ট করবেন না!—আপনি যে মস্ত বড়; কত বড় উজ্জ্বল ভবিষ্যত আপনার সমুখে রয়েচে; দুঃখের আঘাতে এমন করে' নিজেকে অবলুণ্ঠিত করা কি আপনার শোভা পায়? ছি, রজতবাবু—

রজত সহসা ঈষৎ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। কহিল—ভবিষ্যৎ? তার অন্য নাম মৃত্যু, অন্ধকার—বিলুপ্তি;—হ্যাঁ, বিলুপ্তি! কী হবে ভবিষ্যতের পিছে ছুটে? তার চেয়ে এই তো বেশ'—একটা বোতল খানিকক্ষণ শূন্যে উঠাইয়া ধরিয়া রাখিয়া রজত সশব্দে পুনর্ব্বার টেবিলে সংস্থাপিত করিল। কহিল—এও বিলুপ্তি আনে—গভীর অবলুপ্তি! কোথায় যেন হারিয়ে যাই! চমৎকার! না:, আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে পারব না—বড় নির্ম্মম আপনার অনুরোধ—বড় কঠিন—

'মঞ্জরী!'

মঞ্জরী পিছনে ফিরিয়া দেখিল স্বামীকে। পাল চৌধুরির চোখে মুখে আশঙ্কা এবং উদ্বেগ উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। মঞ্জরীর পাশে আসিয়া সে ব্যস্ততার স্বরে কহিল—মঞ্জরী, বাড়ি চল।—

'রজতবাবু—

'বাড়ি যান্; সর্ব্বনাশ আমি নিজে করিনি, বাড়ি যান্—'

'মঞ্জরী ?' পাল চৌধুরি ডাকিল।

'এ কিছুতেই উচিত হচ্চে না, রজতবাবু—'

'বিধাতার কি উচিত হয়েচে, এমনি করে' তার জীবন অকালে নিঃশেষ করে' দেওয়া ? কিছুতেই নয়, কিছুতে-ই নয়। তবু তো হলো।—উচিত বলে কিছু নেই,—না, নেই। যদি উচিত বলে কিছু থাকবেই—মিস্ রায়,—তবে কি এমন অবিচার, এমন কঠিন নির্দ্দয় অবিচার ঈশ্বরের রাজত্বে না, না, ঈশ্বর বলে কেউ নেই—বয়, বয়, ইধর—

'বাড়ি যান, নমস্কার!'

'রজতবাবু!'

টলিতে টলিতে রজত যখন হোটেলের বাহিরে আসিল, তখন রাত প্রায় দশটা। তাহার অবস্থা তখন আর দাঁড়াইবার মত নয়; সে-অবস্থা দেখিয়া পথিকেরা পর্য্যন্ত একটু দূর দূর সরিয়া চলিল। এবং অনতিবিলম্বেই একটা লোক আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল—গাড়ি, হুজুর ?

রজত চেষ্টা করিয়া চোখের পাতা মেলিয়া লুঙ্গি-পরা সেই লোকটার দিকে সক্তজ্ঞভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করিল। কহিল,—গাড়ি ? কই গাড়ি ?

একটা ফিটন গাড়িতে অর্দ্ধসংজ্ঞাহীন রজতকে তুলিয়া লইয়া কোচমান গাড়ি হাঁকাইয়া দিল,—একবার গন্তব্যস্থান জিজ্ঞাসামাত্র করিল না। রজতও সে সম্বন্ধে কিছুই বলিল না; মাথাটা এক কোণায় এলাইয়া দিয়া সে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিয়া অনেক রাস্তা ঘুরিয়া অবশেষে গাড়ি দোতলা একটা বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়োয়ান কোচবাক্স হইতে নামিয়া সমুখের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল, এবং কিছুক্ষণ পরে যখন পুনর্ব্বার নিচে নামিয়া আসিল, তখন তার পিছনে পিছনে নামিয়া আসিল একটি সুর্ম্মা-আঁকা-চোখ, ঘাঘরা-পরা, ওড়না-ওড়ান মেয়ে।

কোচমান চাপাস্বরে কহিল—বাইজি, মালুম হোতা কি এ বহুত খানদানি বাবু; হুঁসিয়ার সে চল্ না।

বাইজি কানের দুল নাড়িয়া, কাঁধের ভঙ্গি করিয়া কহিল—'চলে গা।' বলিয়া গাড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

'আইয়ে বাবুজি।'

গাড়ি থামিলে রজত ঈষৎ জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল; বাইজির আহ্বানে চোখ মেলিয়া চাহিল।

বাইজি মুখে হাসি আনিয়া, আপ্যায়নের ভঙ্গি করিয়া পুনরায় মৃদু মিষ্ট স্বরে কহিল—ভিতর চলিয়ে, বাবুজি।

রজতের বিশেষ কোনও ভাবোদয়ই হইল না; তেমনি দৃষ্টিহীন চোখ মেলিয়া সে চাহিয়া রহিল। তখন কোচমান আগাইয়া আসিয়া সেলাম করিয়া কহিল—হীরা বাইজি, হুজুর। ইস্ সে খুপসুরৎ বাই এ মহল্লেমে নহি—আইয়ে হুজুর।' বলিয়া রজতের হাত ধরিয়া নামাইল।

রজত স্খলিত-কণ্ঠে কহিল—বাইজি ? গান ? নাচ ? বাঃ! বাঃ! বাঃ!

বাইজির উদ্যত স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া রজত টলিতে টলিতে উপরের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

'তোমার নাম কি, শুনি ?'

'হীরা বাইজি।—পান চুরুট ফরমাইয়ে, বাবুজি।'

পকেটে হাত ঢুকাইয়া রজত আন্দাজে একটা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিল।

'তুমি গান গাও ?'

'হাঁ।'

'নাচ ?'

'হাঁ।'

'তবে নাচ, তবে জোর্‌সে লাগাও। বাঃ বেশ, বাঃ—বাইজি, চমৎকার তোমার নাম—হীরামন—হি হি—হীরামন; ঘুরে' ঘুরে' ঘুঙুর বাজিয়ে

নাচ ;—সমস্ত ঘুরে' ঘুরে' নাচচে,—তুমিও নাচ, হীরামন—

'সঙ্গতি লোগ্‌ সব বোলাই ?'

'বোলাও : সব ডাকো। দেখচো না, পৃথিবীটা ঘুরচে, আমরাই কি শুধু বসে থাকবো ? নাঃ,—কিছুতেই না—'

বাইজি এই অদ্ভুত মাতালের বাক্যজালের কোনও মাথামুণ্ডু করিতে না পারিয়া সঙ্গৎ করিবার লোক ডাকিতে বাহির হইয়া গেল ; পানের জন্য একটা দশ টাকার নোট পাইয়া রজতের উপর তার সম্ভ্রম বাড়িয়া গিয়াছিল।

এই মধ্যরাত্রে অত্যল্প কালের মধ্যে তবলচি, মৃদঙ্গী, সারেঙ্গীবাদক জোগাড় হইয়া গেল, এবং নেশায় আমুদ্রিত আঁখি রজতের সমুখে সেই মধ্য-যৌবনা নটী আড়ষ্ট বাহু বিক্ষিপ্ত এবং অসহজ কটি আন্দোলিত করিয়া নূপুরগুঞ্জরিত নৃত্যরস পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিল। বহু পরিবেশিত কটাক্ষ এবং বহু প্রযুক্ত নির্লজ্জ লাস্য গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে সে তার এই নতুন অতিথিটির উপর প্রয়োগ করিতে লাগিল। নাচিতে নাচিতেই আড়-চোখে দেখিতে চেষ্টা করিল,—নেশাতুর বাবুজির উপর এগুলি কেমন কার্য্যকরী হইতেছে। এবং নৃত্য ও সঙ্গীতের মধ্য-পথে অত্যন্ত অমানান জায়গায় রজত যখন সহসা হাততালি দিয়া কহিয়া উঠিল—বাঃ, বাঃ, চমৎকার—অপূর্ব্ব !' তখন বিজয় সম্বন্ধে বাইজির আর কোনও সন্দেহ রহিল না। রজত টাকা বিলাইল, মদ্য আসিল, সঙ্গীত জমিয়া উঠিল, নৃত্য ও মদির কটাক্ষ ঘরের মধ্যে ছুটাছুটি করিতে লাগিল,—এবং একটা তৃপ্তিকর নিদ্রার পর রজত যখন জাগিয়া উঠিল, তখন দেখিতে পাইল, সঙ্গতিরা সব বিদায় লইতেছে, এবং হীরা বাইজি তার বিস্তৃত রেশমি ঘাঘরার আবর্ত্ত দীর্ঘ করিয়া ছড়াইয়া দিয়া রজতের কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছে।

'বাবুজি ?'

'তোমার ভুরুটা গলে' আসচে।' রজত কহিল।

বাইজি রুমাল দিয়া তাড়াতাড়ি ভুরুর গলনোন্মুখ কাজল এবং মুছিয়া ফেলিল। কহিল—ও কুছ নেই, বাবুজি। বাতাইয়ে তো, নাচ ক্যায়সা হয়া—আপকো খুশ হুয়া তো ?'

'ছি, গালেতে এতও রঙ মাখতে হয়—ঘামের সঙ্গে উঠে আসচে ! ঈস্‌,—একবার আয়না দিয়ে দেখে আস তো।'

'রাত কো হিয়াই ঠারে গা তো ?' বাইজি জিজ্ঞাসা করিল।

কিছু উত্তেজনার প্রাবল্যে, কিছু বা নিদ্রায়, রজতের অসম্ভব নেশা ইতিমধ্যে পাত্‌লা হইয়া আসিয়াছিল। বাইজির কৃত্রিম ভুরু এবং কৃত্রিম মুখবর্ণের কুশ্রীতার উপর দৃষ্টি পড়া ইহার জন্যই রজতের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল ! বাইজির শেষ প্রশ্নটাতে সহসা যেন একটা তীব্র মার খাইয়া সে চম্‌কাইয়া জাগিয়া উঠিল। চকিতে সে খাড়া হইয়া বসিল। অত্যন্ত বিকৃত কণ্ঠে ধমকের সুরে সে কহিল—ক্যায়া ?

বাইজি সামান্য বিস্মিত হইয়া নিজ প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিল।

এক মুহূর্ত্তে রজত সোজা হইয়া দাঁড়াইল। চকিতে সমস্ত অবস্থা তার হৃদয়ঙ্গম হইল। মূর্চ্ছা হইতে জাগিয়া উঠিয়া মানুষ যেমন করিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখে, তেমনি করিয়া সে চারদিকে তাকাইয়া দেখিল ; দেখিতে দেখিতে তাহার সমস্ত শরীর স্পন্দিত হইতে লাগিল—তার পা দুটা এমন অসম্ভব রকম কাঁপিতে লাগিল যে মনে হইল এখনই সে পড়িয়া যাইবে।

বিকৃতকণ্ঠে চিৎকার করিয়া কহিল—এ আমি কোথায় ? এ কোন্‌ জায়গা এসেচি—না, না, হতেই পারে না ;—এই, তোমার নাম কি ? তুমি কে ? ওঃ,—কত টাকা তোমার চাই ?' বলিয়া পকেটে হাত গুঁজিয়া এক তাড়া নোট উঠাইয়া হীরা বাইজির উদ্দেশ্য ছুঁড়িয়া দিয়া রজত উন্মাদের মত সিঁড়ি দিয়া নিচে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

হীরা বাইজি উৎফুল্ল হইয়া টাকা গুণিতে গুণিতে মন্তব্য করিল—এ ক্যায়্‌সা পাগলারে ! মালুম হোতা কি, কোন রাজরাজড়া হোয়ে গা,—লেকিন্‌ ঔরৎ কো সাথ্‌ গোস্‌সা করকে—

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীসুবোধ বসু

তান্ত্রিক

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বড় জঙ্গলটা পার হইয়াই সামনে 'শিবমণি'র শ্মশান সুরু হইয়াছে।

এই জালিম গড়ের জঙ্গল এবং শ্মশান এ অঞ্চলে সুপ্রসিদ্ধ; কবে কোন্ জালিম নামীয় রাজা বা জমিদারের জঙ্গল হইতে এই নাম-করণ হইয়াছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে তাহা নিঃশেষে মুছিয়া গেছে। এমন কি, একটা কিংবদন্তী অবধি আজকাল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বহু বৃদ্ধ কতকগুলি গাছ প্রায় দু' মাইল ব্যাপিয়া জড়াজড়ি করিয়া দাঁড়াইয়া, মধ্যে মধ্যে বাবলা আর নাগকেশরের ঝোপ, কোথাও কোথাও বা রাশি রাশি বুনো-ভাঙের গন্ধে বাতাস মন্থর হইয়া উঠিয়াছে।

জঙ্গলটা আসিয়া যেখানে শেষ হইয়াছে, ঠিক তাহারি নীচে দিয়া নাগর নদীর কাকচক্ষু জল বহিয়া চলিয়াছে। বালুকা বিস্তৃত তটের উপর ভাঙা হাঁড়ি, পোড়া বাঁশ এবং কয়লার রাশি ছড়ানো, ইহাই 'শিবমণি'র শ্মশান।

উত্তর বাংলার অধিকাংশ নদীই পার্ব্বত্য এবং শীতের সূচনা হইতে সুরু করিয়া চৈত্র পর্য্যন্ত এমনি হৃতশ্রী হইয়া পড়িয়া থাকে যে তখন অনায়াসেই ইহাদের হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। মাঝে মাঝে জলের মধ্য হইতে অভ্র মিশ্রিত বালির স্তর লইয়া ছোট ছোট চর জাগিয়া ওঠে, সূর্য্যের আলোয় অভ্র-কণিকা চিক্ চিক্ করিয়া রোদের গুঁড়ার মতো দীপ্তি পায়। কিন্তু সে সময়েও নদীর কোনো কোনো অঞ্চলে গভীর জল থাকে, পাহাড়ে-নদী নিজের স্বভাব-ধর্ম্মানুযায়ী অবিরাম বালুকা বহন করিয়া চলিলেও এই খাতগুলি ভরাট করিতে পারে না। নদীর এই সমস্ত গভীর অঞ্চলগুলি এ দেশে 'মণি' বলিয়া পরিচিত।

'শিবমণি'র শ্মশানের মতো দীর্ঘ এবং বিখ্যাত শ্মশান দশ বারো মাইলের মধ্যে নাই। কলিকাতার নিমতলা বা কাশীমিত্রের ধারণা লইয়া ইহার সম্বন্ধে অনুমান করা চলে না। মাইলের পর মাইল জুড়িয়া বালির উপরে এই শ্মশানের সীমানা বিস্তৃত; সামনে খরস্রোতা নদী, পশ্চাতে জালিম-গড়ের জঙ্গল, দু' তিন মাইলের মধ্যে আর জনমানবের বসতি নাই।

লোক মুখে একদিন খবর রটিল, এ হেন 'শিবমণি'র শ্মশানে নাকি একজন তান্ত্রিকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। নরমুণ্ডের আসন করিয়া তিনি ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া থাকেন, গলায় তাঁহার হাড়ের মালা, পরনে রক্তবস্ত্র। সিদ্ধ-পুরুষ তিনি, মারণ, উচাটন এবং স্তম্ভন-বিদ্যায় অদ্বিতীয়।

সংবাদটা চারিদিকে সাড়া তুলিল।

বক্কেশ্বর দাওয়ায় বসিয়া পরিতৃপ্ত সহকারে ছোট কল্কেটাতে একটা টান মারিবার উপক্রম করিতেছিল; এমনি সময় পাঁচুর মা আসিয়া উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ রে, যা শুনছি, তা কি সত্যিই?"

আরম্ভেই বিঘ্ন, বক্কেশ্বর খুসি হইল না। চোক পাকাইয়া কহিল, "কি শুনছ?"

গাঁজার গন্ধ এবং বক্কেশ্বরের মুখের ভাব দেখিয়া পাঁচুর মা দু' পা পিছাইয়া গেল; কিন্তু তথ্যটা ভাল করিয়া না জানিলেই চলিতেছে না, সুতরাং আবার প্রশ্ন করিল, "কে নাকি সন্নিসি এসেছে শিবমণিতে, সে নাকি নরবলি দেয়?"

গাঁজার আগুনটা নিবিয়া আসিতেছে, বক্কেশ্বর আরো চটিয়া উঠিল। কহিল, "সন্নিসি নয়, সন্নিসি নয়, কাপালিক। নরবলি দিয়ে ওঁরা কালী পুজো করে, পেলে তোমাকেও বলি লাগিয়ে দেবে।"

—"অ্যাঁ!"

বক্কেশ্বর তেম্‌নি ভেংচি কাটিয়া বলিল, "অ্যাঁ নয়, অ্যাঁ নয়, হ্যাঁ। এই ধরোনা, কালীর পায়ে একটা জবাফুল দিয়ে

বললে, 'পেঁচোর মা কাত'—অমনি এক ঘণ্টার মধ্যে কলেরা হ'য়ে তুমিও সাবাড়! আর তোমার আহ্লাদে ছেলেকে রাজ্যির ঘি-দুধ গিলিয়ে যে রকম পুরুষ্টু পাঁঠা করে' তুলছ, তা'তে তান্ত্রিকের নজরে পড়লে আর রক্ষে নেই। যাও, যাও, পেঁচোকে সামলাও গে।"

অন্য সময় হইলে ছেলেকে এই ভাবে 'খোঁড়া'টা পাঁচুর মা সহজে বরদাস্ত করিত না, গ্রামে তাহার রসনার প্রসিদ্ধি আছে; বক্কেশ্বরের ঊর্ধ্বতন চতুর্দ্দশ-পুরুষের পারত্রিক গতি নির্দ্দেশ করিয়া তবে সে এখান হইতে নড়িত; কিন্তু আপাতত তান্ত্রিকের ভয়ে তাহার বাকরোধ হইয়া গিয়াছিল, অতএব সংক্ষেপে, 'কি সর্ব্বনেশে কথা গো' বলিয়া সে বৎসহারা গাভীর মতো পাঁচুর অনুসন্ধানে ছুটিল।

বক্কেশ্বর ভীষণ দৃষ্টিতে পাঁচুর মার গতি পথের দিকে চাহিয়া প্রায় গর্জিয়া কহিল: "বন্ধকী কারবার ক'রে মাগী টাকার কুমীর হ'য়ে উঠেছে। পরিবারের গয়নাগুলো গাঁজার পয়সার সুদে সব তো ওর পেটে দিয়েছি। তান্ত্রিকের কাছ থেকে এবারে একটা মারণ-উচাটন যা' হোক কিছু শিখে এসে মাগীকে দেব একদম ঠাণ্ডা বানিয়ে,—হাঁ!"

সজোরে স্বগতোক্তিটা শেষ করিয়া বক্কেশ্বর কষিয়া কলকেতে একটা দম মারিল।

গ্রামের তালুকদার গঙ্গাধর হালদার সামনের পথ বাহিয়া চলিয়াছিল। বক্কেশ্বরের কথাটা কাণে যাইতে সে এক মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল।

সরিকিয়ানার গতানুগতিক বিবাদ।

ইতিহাস যেমন অনাবশ্যক তেমনি অবান্তর এবং পরিণতিটাও চিরন্তন। আইন-আদালতের জুয়ার আড্ডায় ভিড়িয়া ইহারা নিজেদের সঞ্চিত পুঁজি সেই কবে উড়াইয়া দিয়াছে, দুই তরফেরই ঋণের অঙ্ক দেখিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

মীমাংসা বলিতে গেলে কিছুই হয় নাই। পাঁচ ছয়টা মোকর্দ্দমা এখনো হাইকোর্টের নথি-পত্রের নীচে চাপা পড়িয়া, খণ্ড-পর্ব্ব যে কতগুলি হইয়া গেছে, তাহা লিখিতে গেলে সংক্ষেপে মহা-ভারত। পাল্লাটা কখনো এদের, আবার কখনো বা ওদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেও মোটের উপর বিজয় লক্ষ্মীর নিরপেক্ষতায় দোষারোপ করা চলে না।

এই মহাযুদ্ধ আজকাল একটু মন্দা পড়িয়াছে, সেটা গঙ্গাধরের প্রতি নিতান্ত দৈবানুগ্রহ বশতই বলিতে হইবে। কাশ ফুলের বিকশিত শুভ্র সমারোহ লইয়া এবং মেঘমুক্ত নীল দিগন্তে হংস বলাকা ভাসাইয়া কবির আনন্দ কল্লোলিত শারদোৎসব সেবার বাংলার ঘরে ঘরে আসিল বটে, কিন্তু সে আনন্দটা পল্লীর এ অঞ্চলে বেশি প্রসার লাভ করিতে পারিল না। তখন সবে বর্ষার জল নামিয়া গিয়াছে এবং পাট পচিতে সুরু হইয়াছে। গ্রামে কলেরা আরম্ভ হইল।

সে রূপ চোখে না দেখিলে তো আর লিখিয়া বুঝাইবার নয়! মৃত্যুটা যে এত ব্যাপক এত সহজ এবং বিন্দুমাত্র পূর্ব্বাভাষ না দিয়াই অনায়াসে আসিয়া হাত বাড়াইতে পারে, তাহা কল্পনা করা যায় না। একটু আগেই জাল লইয়া যে খালে মাছ ধরিতেছিল; হাতীর মতো সুস্থ সবল জোয়ান লোকটা দু'ঘণ্টা পরেই তাহার খোঁজ লইতে গিয়া জানা গেল, ইতিমধ্যেই বার কয়েক ভেদ-বমি হইয়া সে শিব-নেত্র হইয়াছে। তাহার ভিজা জাল তখনো শুকায় নাই, এবং দুঘণ্টা আগে খাইবার জন্য যে মাছ সে ধরিতেছিল, সে মাছ তখনো জ্যান্ত অবস্থায় খালুইয়ের মধ্যে ছট্‌ফট করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে মৃত্যুর শাণিত কুঠার মানুষের অরণ্যকে নির্ম্মম ভাবে নির্ম্মূল করিতে লাগিল। বাড়ির পরে বাড়ি ফাঁকা হইয়া চলিল এবং গঙ্গাধরের দোর্দ্দণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বী মুকুন্দ হালদার একদিন চোখ রগড়াইয়া চাহিয়া দেখিল যে, স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতির যে সাংসারিক বোঝায় সে বিব্রত হইতেছিল, মহাকাল সে বোঝাটা একান্ত অবলীলা ক্রমে তাহার মাথার উপর হইতে নামাইয়া লইয়াছেন। ফাঁকা বাড়িটা চোখের সামনে খাঁ খাঁ করিতেছে এবং একমাত্র দূর সম্পর্কের পিসিমা তারা ঠাকরুণ চণ্ডী মণ্ডপের রোয়াকে পা ছড়াইয়া বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতেছেন।

মুকুন্দের জ্ঞান চক্ষু খুলিয়া গেল কি-না কে বলিবে, হয়তো নশ্বর জীবন এবং মায়া প্রপঞ্চময় এই পৃথিবীর মূল্য সে মুহূর্তেই বুঝিয়া লইল। অতএব সেই যে রাত্রে সে বাড়ি ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইল, কাহাকেও কোনো একটা
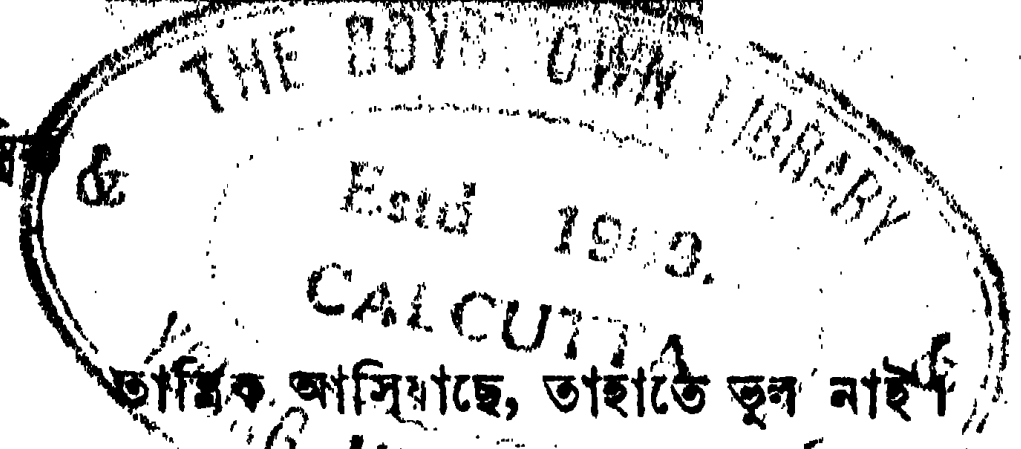
কথা বলিয়া গেলনা পর্য্যন্ত। বেশির ভাগ লোকেই অনুমান করিল, মনের দুঃখে মুকুন্দ নাগর-নদীর জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, কেহ কেহ বা বলিল, সন্ন্যাসী হইয়াছে। গঙ্গাধর অন্য সময় হইলে চোখ টিপিয়া হয়তো বা কোনো কল্পিতা বাগ্দী মেয়ের ইঙ্গিত করিত, কিন্তু আপাতত সেটা প্রমাণসহ হইবেনা বুঝিয়াই সে রসনা কণ্ডুয়নটা সহ্য করিয়া লইতে বাধ্য হইল।

রসদের অভাবে অবশেষে কলেরা কমিয়া আসিল। কালক্রমে ধীরে ধীরে ক্ষতটা উপশমিত হইতে লাগিল এবং তারা ঠাকরুণ যথ হইয়া মুকুন্দ হালদারের সম্পত্তি আগলাইতে সুরু করিলেন।

এই অবকাশে দু'একবার থাবা মারিবার চেষ্টা করিয়াই গঙ্গাধর বুঝিয়া লইল, ব্যাপারটা সহজ নয়। উগ্রচণ্ডা মূর্তি ধরিয়া সমান উৎসাহে কোমর বাঁধিয়া তারা ঠাকরুণ লড়াইয়ে অবতীর্ণা হইলেন। গঙ্গাধর সেবার হাইকোর্টে হারিয়া আসিয়া ধপাৎ করিয়া একটা মোটা তাকিয়ায় হাত পা ছাড়িয়া দিল, তারপর নির্দয় ভাবে ফরশীর নলটা চিবাইয়া কহিল, "বাপরে, মেয়ে মানুষ বটে একখানা!"

তল্পীদার রামকানাই কলকেটার দিকে লোলুপ দৃষ্টি ক্ষেপন করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে মেয়ে মানুষ কি বলছেন হালদার মশাই, স্বয়ং রক্ষে কালী, রক্ষে কালী।"

রক্ষা কালীর সঙ্গে তারা ঠাকরুণের যে খানিকটা বর্ণ সামঞ্জস্য আছে, এটা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না। গঙ্গাধর মাথা নাড়িল বটে, কিন্তু কালীর সঙ্গে লড়াই করিবার একটা প্রচণ্ড আসুরিক শক্তি ততক্ষণে ওর দেহে মনে সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। একটা হ্যাঁচকা টানে ফরশীর নলটা ও রামকানাইয়ের দিকে ছুড়িয়া দিল, কহিল, 'হুঁঃ দেখে' নিচ্ছি, দাঁড়াও।"

ছো মারিয়া রামকানাই নলটা তুলিয়া লইল, তারপর শশব্যস্তে সেটাকে মুখে পুরিয়া দিয়া মুদিত নেত্রে স্বর্গীয় পরিতৃপ্তি আস্বাদন করিতে করিতে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, তা' দেখবেন, দেখবেন বই কি!"

কিন্তু দেখাটা এ পর্য্যন্ত আর হইয়াই উঠিল না। তান্ত্রিক আসিয়াছে, তাহাতে ভুল নাই।

গ্রামে সাড়া পড়িল, সন্ধ্যের পর কেউ আর এ পথ মাড়াইতে চায় না। কে না জানে: একশো আটটা নরবলি কালীর পায়ে ধরিয়া না দিলে তাহাদের সাধনা সিদ্ধ হয় না, তাহাদের বামাচারের কাহিনী যে সর্বজনবিদিত এবং শিশুর কপালের মালা গাঁথিয়া তো তাহারা গলায় পরে।

তান্ত্রিকের চেহারাখানা বেশ চাহিয়া দেখিবার মতো, বিভীষিকা আনিতে পারে নিঃসন্দেহ। দাড়ী গোঁফ এবং জটার জটিলতা দেখিয়া মা দুর্গার চরণাশ্রিত পশুরাজের কথাই মনে পড়িয়া যায়। শ্মশ্রু-গুম্ফের সেই বিরাট অরণ্যের দু' চার গাছা করিয়া সবে পাকিতে সুরু হইয়াছে। গলায় ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের মালা, পরিধানে ময়লা একখানা গেরুয়া। একটা কমণ্ডলু একটা ত্রিশূল এবং ছোট্ট একটি ঝুলিই তাহার সম্পত্তি। শিবমণির শ্মশানে নরমুণ্ডের আসন গাড়িয়া সে বসিয়া থাকে, আবার কখনো বা ব্যোম্ ব্যোম্ শব্দে তারস্বরে চীৎকার করে। অস্বাভাবিক গম্ভীর এবং উচ্চণ্ড তাহার গলা।

নরবলি সে দেয় কি না, এখন পর্যন্ত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

কিন্তু সব জিনিষই তো আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা। মানুষের চোখের আড়ালে কত কীই যে ঘটিয়া যায়, কে তাহার সন্ধান রাখে? আর তা ছাড়া, নরবলি তো দিতে হয় সেই অমাবস্যার মিশমিশে কালো রাত্তিরে, কোলের মানুষ অবধি যখন দেখা যায়না, তেমনি সময়ে। সুতরাং সেই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে ভূত প্রেতের রাজ্যে কখন যে কি ঘটিয়া যায় সকলে তা বুঝিবে কেমন করিয়া?

খবরটা অবশ্য বক্কেশ্বরই শেষ পর্যন্ত আনিল।

—"বলি কী হয়েছে শুনেছো পাঁচুর মা?"

ঘুঁটে নির্মাণ কাজে নিযুক্তা পাঁচুর মা হাতের গোবরের তালটার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াই রুদ্ধ শ্বাসে প্রশ্ন করিল, "কি হয়েছে?"

বক্কেশ্বরের চোখ দুইটা টকটকে লাল, সওয়া পাঁচ আনার গাঁজা পোড়াইয়া তাহার কল্পনা শক্তি রীতিমত সতেজ এবং

উর্ব্বরা হইয়া উঠিয়াছে। "বামুনের ছেলে, গলায় পৈতে ধব্ ধব্ করছে, কাঁচা সোনার মতো রঙ। মুণ্ডু নেই, দেখে এলাম নাগর-নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে।"

—"ও মাগো!" গোবরের তালটা পাঁচুর মা'র কাপড়ের উপরে খসিয়া পড়িল এবং ফলে এই-ই দাঁড়াইল যে পাঁচুর ইস্কুল-পাঠশালা তো বন্ধ হইলই, ঘরের মধ্যে তালাবন্দী হইয়া তাহার দিন কাটিতে লাগিল।

তান্ত্রিক-সম্বন্ধে অদ্ভুত বিভীষিকাটা নিত্য-নতুন কাহিনীতে পল্লবিত এবং রঙীন হইয়া শেষ পর্য্যন্ত এমনি রূপ গ্রহণ করিল যে সন্ধ্যা হইলেই ঘরে ঘরে কপাট পড়িতে আরম্ভ হইল।

তখন অন্ধকার বেশ ঘন হইয়া আসিতেছে।

নাগর-নদীর স্বচ্ছ নীল জল যেখানে বালুতট ঘেঁসিয়া বহিয়া গেছে, সেখানে বালির উপরে আসন-পিঁড়ি করিয়া তান্ত্রিক বসিয়াছিল। সামনে একটা কাঠের গুঁড়ি ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছে। ওপারে বাবলা-কাঁটার বন অন্ধকারের মধ্যে যেন সারি সারি ভুতুড়ে মূর্তি লইয়া দাঁড়াইয়া, পিছনে 'শিবমণি'র জঙ্গল একেবারে কালির মতো জমাট বাঁধিয়া আছে। এ পাশে রাশীকৃত বন-তুলসীর মঞ্জরী হইতে একটা কেমন গন্ধ নদীর বাতাসে বাতাসে ছড়াইয়া যাইতেছিল এবং কোথা হতে যেন ভাসিয়া আসিতেছিল শঙ্খ চিলের রূঢ় তীক্ষ্ণ চীৎকার।

ঠিক এমনি সময়ে কোথা হইতে গঙ্গাধর আসিয়া হাজির।

একহাতে মোটা একটা বাঁশের লাঠি, আরেক হাতে কালিতে এবং ধোঁয়ায় ঝাপসা একটা বহু পুরাতন লণ্ঠন। সেই প্রেত-চ্ছায়ার মতো নিষ্প্রভ একটা অদ্ভুত আলোতে গঙ্গাধরকে যেন অমানুষিক বলিয়া মনে হইতেছিল।

তান্ত্রিক চমকিয়া বলিল, "কে?"

গঙ্গাধর লাঠি এবং লণ্ঠন রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে একটা প্রণাম করিল, আশঙ্কায় ওর বুকটা ধ্বক্ ধ্বক্ করিতেছে। ঝোঁকের মাথায় এখানে এইভাবে চলিয়া আসাটা যে আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ হয় নাই, তাহা ও মর্মে মর্মেই অনুভব করিতেছিল যেন। যদিও আজ অমাবস্যার রাত্রি নয়, তবুও বিপদের সম্ভাবনা যেখানে আছেই, সেখানে তো আর কালাকাল বিচার করা চলে না!

কিন্তু যাহা নিতান্তই হইয়া গেছে, তাহা লইয়া এখন আর চিন্তা করিয়া লাভ নাই। সুতরাং গঙ্গাধর করজোড়ে উঠিয়া বসিল, কহিল, "আপনি সিদ্ধ-পুরুষ বাবা, দয়া ক'রে এই চরণাশ্রিত দাসের একটা গতি আপনাকে করতেই হবে।"

তান্ত্রিক স্থির দৃষ্টিতে গঙ্গাধরের মুখের দিকে চাহিল, প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি উপকার তুমি আমার কাছে চাইতে এসেছ?"

গঙ্গাধর চমকিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্তের জন্য মনে হইল, এই কণ্ঠস্বর ওর পরিচিত, একান্তই সুপরিচিত। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া গঙ্গাধর তান্ত্রিকের মুখখানাকে বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু জটা-শ্মশ্রু বিভূতির আবরণ ভেদ করিয়া তাহাকে চিনিয়া লওয়া সহজ নয়। তা' ছাড়া বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চোখেও তো ছানি নামিয়াছে, আজকাল ওকে মাঝে মাঝে পদ্মমধু ব্যবহার করিতে হয়, অতএব কিছুই বুঝিতে পারা গেল না।

গঙ্গাধর নিজের মনটাকে সংযত করিয়া লইয়া তেমনিই একটানা ভাবে স্তুতিপাঠ করিয়া চলিল: "সবাই বলছে, আপনি মারণ উচাটন স্তম্ভন সব করতে পারেন বাবা, এই দুনিয়ায় আপনার অসাধ্য কোনো কাজ নেই। আপনি অনুগ্রহ করলে সব হতে পারে।"

অন্ধকারের মধ্যে তান্ত্রিক ভ্রূকুটি করিল, "কি করতে হবে?"

গঙ্গাধর প্রগলভ হইয়া উঠিল: "বেশি নয় বাবা, আমার একটা শত্তুর নিপাত করতে হ'বে। তার জ্বালায় কিচ্ছু হওয়ার জো নেই, সব কাজেই সে বাগড়া দিয়ে বেড়াচ্ছে।"

তান্ত্রিকের চোখ দুইটি হঠাৎ দু' টুকরো জ্বলন্ত কয়লার মতো ঝক ঝক করিয়া উঠিল, এক মুহূর্তের জন্য মনে হইল, সামনের ধুনীর আগুন অপেক্ষাও তাহার চোখের দীপ্তি যেন তীব্রতর!

কিন্তু গঙ্গাধর সেটা লক্ষ্য করিতে পারিল না।

তান্ত্রিক প্রশ্ন করিল : "কি রকম শত্তুর ?"

সোৎসাহে গঙ্গাধর বলিয়া চলিল, "একটা বিধবা বুড়ী, তিন কুলে তার কেউ নেই। কিন্তু সে বাঘের মতো আমার শত্তুর মুকুন্দ হালদারের সমস্ত সম্পত্তি একলা আগলাচ্ছে, কিছুতেই তাকে কায়দা করতে পারছিনে। তুমি যা হোক একটা মন্তর ঝেড়ে যদি ওটাকে ভব-সংসার থেকে রওনা করিয়ে দিতে পারো বাবা, তা'হলেই একেবারে নিশ্চিন্দি।"

তান্ত্রিক হঠাৎ হাসিয়া উঠিল : অর্থহীন, অসংযত হাসি। সে হাসির শব্দ তরঙ্গে তরঙ্গে নদীর বুকে শিহরণ জাগাইয়া ওপারের বাবলা বন কাঁপাইয়া দূর-দিগন্তে প্রবাহিত হইয়া গেল।

একেবারে চমকিয়া উঠিল গঙ্গাধর।

হাসি থামিলে তান্ত্রিক কহিল, "জোয়ান পুরুষ মানুষ হয়ে একটা বিধবা স্ত্রীলোককে মারবার জন্যে তুমি মারণ-উচাটন প্রয়োগ করতে এসেছ ?"

গঙ্গাধরের গলাটা শঙ্কায় শুকাইয়া উঠিয়াছে, ঠোঁট দুইটা একবার চাটিয়া কহিল, "কি করব বাবা, রাত্তিরে লেঠেল অবধি পাঠিয়ে সুবিধে করতে পারিনি, সে মেয়ে-মানুষ কি সোজা ? অনেক পুরুষকে সে চরিয়ে খেতে পারে।"

তান্ত্রিক আবার তেমনি অট্টহাসি করিয়া উঠিল, বীভৎস হাসিটা গঙ্গাধর যেন সহ্য করিতে পারিতেছেনা : "সত্যি বলছি বাবা, এর একটি বর্ণও মিথ্যে নয়। যদি ওকে শেষ করতে পারো, তা'হলে তোমাকে নগদ একশো টাকা গুণে দেব কালী পুজো করতে, গঙ্গাধর হালদার এক কথার মানুষ।"

তান্ত্রিক কহিল, "টাকার লোভ আমাকে দেখাতে হবে না, এমনিতেই তোমার এ অনুরোধটুকু আমি রক্ষে করব। খালি একটা কাজ তোমাকে করতে হবে।"

গঙ্গাধর উৎকর্ণ হইয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে কহিল, "কি কাজ ?"

—"একলক্ষ আটবার বগলামুখী স্তোত্র জপ করতে হবে।"

—"একলক্ষ আটবার!" গঙ্গাধরের চোখের তারা প্রায় কপালে উঠিবার উপক্রম।

—"হাঁ কিন্তু খুব বেশি নয়। যাকে নিপাত করতে চাও, তা'র নামটা—"

—"নামটা, নামটা," ভ্রূ কুঁচকাইয়া ভাবিয়া কহিল, "তারামণি দেব্যা!"

—"আচ্ছা এতেই হ'বে। প্রত্যেকদিন সকাল সন্ধ্যেয় চান ক'রে শুচি হ'য়ে ব'সে জপ করবে, 'ওঁ শ্রী তারামণি দেব্যায় মারয় মারয় ছেদয় ছেদয় খাদয় খাদয় হ্রীং হ্রীং ফট্—"

গঙ্গাধর থামাইয়া দিল : "একটু আস্তে আস্তে বলো বাবা, অত মনে রাখতে পারছিনে'। কি বলছিলে, 'ওঁ শ্রী তারামণি দেব্যায়ৈ মারয় মারয়'-তার পরে ?"

"—ছেদয় ছেদয়—"

—"ছেদয় ছেদয়—"

—"খাদয় খাদয়—"

—"খাদয় খাদয়—"

—"হ্রীং হ্রীঃ ফট্।"

"হাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে;" গঙ্গাধর মন্ত্রটাকে আর একবার আওড়াইয়া লইয়া কহিল "এই 'ছেদয় খাদয়' দু'টোতেই একটু গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে, তা' ও ঠিক হয়ে যাবে। এই মন্ত্র জপ করতে পারলেই কার্য সিদ্ধি তো ?"

—"নিশ্চয়," তান্ত্রিক হাসিল, "সাতদিনের মধ্যে এই মন্ত্র জপ শেষ করলেই দেখবে একেবারে হাতে হাতে ফল।" গঙ্গাধর আবার সাষ্টাঙ্গে তান্ত্রিকের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া প্রণাম করিল!

তারপর সাতদিন ধরিয়া চলিল গঙ্গাধরের দুঃসহ সাধনা।

বামুনের ঘরে জন্মিয়াও পুরো পৈতার একটা বৎসর গঙ্গাধর গায়ত্রী জপ করিয়াছিল কি না সন্দেহ, কিন্তু অধুনা তাহার নিষ্ঠা দেখিয়া বাড়ির লোকের তাক লাগিয়া গেল। ঠাকুর ঘরে খিল আঁটিয়া গঙ্গাধর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া মন্ত্র আওড়ায় : "খাদয় খাদয় হ্রীং হ্রীং ফট্।"

তাহার নিদ্রা প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম।

সাতদিনের দিন গঙ্গাধরের জপ শেষ হইল। উৎকর্ণ হইয়া গঙ্গাধর মুকুন্দ হালদারের বাড়ীর দিকে কাণ পাতিয়া রহিল, এখনি হয়তো খবর আসিবে যে দু' বার মুখে রক্ত তুলিয়া তারা ঠাকরুণ গঙ্গাধরের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দিয়াছেন। তারপর বে-ওয়ারিশ সম্পত্তির অন্যান্য যে সব অংশীদার মাসিয়া জুটিবে, তাহাদের তিন তুড়ি মারিয়া ফিরাইয়া দিতে কতক্ষণ।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইবার নয়। সপ্তম, অষ্টম, নবম এবং দশম দিন নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল, ও তরফ হইতে একটা সন্তোষজনক দুঃসংবাদ দূরে থাক, কোনো একটা টিকটিকির মৃত্যুর খবর অবধি পাওয়া গেল না। ক্ষুব্ধ বিস্মিত গঙ্গাধর সেদিন রাত্রে আবার তান্ত্রিকের আস্তানায় গিয়া উপস্থিত হইল।

তান্ত্রিক প্রশ্ন করিল, "কি হল ?"

বিরক্ত গঙ্গাধর বুড়ো আঙুল নাচাইয়া কহিল, "হবে আবার কি, কচুপোড়া! তোমার ও মন্তরে কিছু হ'ল না বাবা ঠাকুর, বদলে অন্য মন্তর দাও।"

তান্ত্রিক গম্ভীর হইয়া বলিল, "এ বগলা-মুখী স্তোত্র, অব্যর্থ। তোমার নিজেরই কোথাও কোনো ত্রুটি হ'য়েছে, নিশ্চয় তুমি শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবে জপ করতে পারোনি!"

—"তাই তো!" মাথা চুলকাইয়া গঙ্গাধর কহিল, "তা হ'লে ?"

—"তা' হ'লে মারণটা এ যাত্রা আর নিতান্তই হ'লনা দেখছি। তবে আর একটা উপায় আছে। তুমি যদি চাও, তা হ'লে তোমাকে সব কয়টা মোকর্দমাতেই জিতিয়ে দিতে পারি।"

—"চাইনে আবার!" গঙ্গাধর প্রায় লাফাইয়া উঠিল: "মারণে আর কাজ নেই বাবা, তুমি তাই-ই ক'রে দাও, তা'তেই ঢের হবে। যত টাকা লাগে—"

বাধা দিয়া তান্ত্রিক কহিল, "এক পয়সাও লাগবে না। শুধু আজ রাত্রে তোমার মোকর্দমার যতগুলো নথি আছে, সে সব জরুরি কাগজ-পত্র আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমি মন্ত্রপূত ক'রে দিলেই—"

—"সমস্ত জরুরি নথি!" গঙ্গাধর ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "সে যে বড় মুস্কিলের—"

—"তা' হ'লে তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ! বেশ, তোমার যা ইচ্ছে, তাই করতে পারো!"

—"আহা হা, তা' নয়, তা' নয় বাবা ঠাকুর, তোমাকে অবিশ্বাস করতে যাব, আমি কি এত বড়ই মহাপাতকী!"

গঙ্গাধর শশব্যস্তে জিভ কাটিল: "ও গুলো বাইরে বে'র করা বড্ড অসুবিধে, আর চারদিকেই তো শত্তুর--'

—"সেই জন্যেই তো বলছিলুম—"

—"আরে না, না, বাবা ঠাকুর, তুমি কিছু মনে কোরো না, আমি আজ রাত্তিরেই ওগুলো তোমার কাছে নিয়ে আসব। তবে কি না—"

দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে গঙ্গাধর বাড়ির দিকে পা বাড়াইল এবং ঘণ্টা দুই তিন বাদেই কাগজের একটা প্রকাণ্ড স্তূপ লইয়া শ্মশানে আসিয়া হাজির হইল। কহিল, "কত সাবধানে যে নিয়ে এসেছি বাবা, তা' আমিই জানি।"

তান্ত্রিক হাসিল, অন্ধকারের মধ্যে তাহার ক্রূর অস্ফুট হাসিটা গঙ্গাধর দেখিতে পাইল না। তান্ত্রিক কহিল, "আমার সামনে তুমি এই কাগজগুলো রেখে পূর্বাস্য হ'লে চোখ বুজে ব'সো, আর আমি যে মন্তর বলি, তাই আউড়ে' যাও। তা' হ'লেই—"

—"আচ্ছা।" গঙ্গাধর চোখ বুজিয়া বসিল।

—"বলো, ওঁ কালী কালী—"

—"ওঁ কালী কালী—"

—"জয়ং দেহি দ্বিষো জহি—"

—"জয়ং দেহি দ্বিষো জহি—"

হঠাৎ শব্দ হইল 'ঝুপ!' গঙ্গাধর চাহিয়া দেখিল, 'শিবমণি'র অথই জলে সমস্ত নথিগুলি ভাসিয়া যাইতেছে।

—"কি সর্বনাশ করলে—" বলিয়া পাগলের মতো চীৎকার করিয়া গঙ্গাধর অন্ধকারে তীক্ষ্ণ স্রোতের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া গেল। সাঁতার সে জানিত না।...

পরের দিন গ্রামে আবার সাড়া জাগিল। তান্ত্রিক আর কেউ নয়, সে মুকুন্দ হালদার। এই সাত বৎসর পরে সে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

জলধর দাদা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

রবিবাসরের এমন কোন সভা অতি অল্পই হইয়াছে, যে সভায় আমাদের জলধর দাদা না উপস্থিত থাকিতেন! যে সভায় দাদা উপস্থিত থাকিতেন না মনে হইত সে সভার অধিবেশন যেন যজ্ঞেশ্বর বিহীন যজ্ঞেরই মত।

এই সেদিনের কথা, আমার বাড়ীতে রবিবাসরের অধিবেশন হইবে, সময় বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল চারিটা, দাদা আমাদের তিনটার সময় আসিলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, এত আগেই যে এলেন? দাদা খানিকটা চুরুটের ধোঁয়া উড়াইয়া হাসিমুখে বলিলেন—বুড়ো মানুষ যদি দেরী করে ফেলি, তাই আগেই এসে নিশ্চিন্ত হলাম। দাদার কয়জন ছিলেন নিত্য সহচর—বাহন, আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীমান গৌরীচরণ, বন্ধুবর নরেন্দ্র দেব এবং ব্রজমোহন দাশ, ফণী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি—ইহাদের সুধু নাম করিলাম, দাদার দুর্ল্লভ স্নেহের অধিকারী ছিলাম আমরা সকলেই, কেননা দাদার বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিবার মত আমাদের মধ্যে কেহই ছিলেন না এখন পর্য্যন্তও নাই।

একটা বিরাট বটগাছ যেমন অনেকখানি স্থান ছায়া-শীতল করিয়া রাখে তেমনি আমাদের এই বৃদ্ধ বটবৃক্ষটি তাহার স্নেহভরা শতবাহু বিস্তার করিয়া আমাদিগকে তাঁহার শীতল স্নেহছায়ায় মুগ্ধ ও আনন্দপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

আমাদের কোনও সভায় যদি কোনও সভ্য বা প্রধান কোনও সাহিত্যিক বা খ্যাতনামা ব্যক্তির মৃত্যুজনিত শোক প্রকাশ করিতে হইত, তাহা হইলে দাদা বাঁ হাতে তাঁর চুরুটখানি ধরিয়া গদ্‌গদ্ ভাবে করুণ কণ্ঠে বলিতেন—যাহারা আমার কত পিছে আসিয়াছিল—তাহারাই কি না আগে চলিয়া গেল, আমাকে কি না মৃত্যুও ভুলিয়া গিয়াছে!

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুদিনের কথা স্মরণ হইতেছে। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আমরা সকলে শবযাত্রা শেষে সেদিনকার নির্দ্দিষ্ট রবিবাসরের অধিবেশনে সুহৃদ্বর খগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বাড়ী উপস্থিত হইয়াছি। শরৎচন্দ্রের চিতা তখনও নিবে নাই, তখনও আদিগঙ্গার জলে চিতার অগ্নি-শিখা প্রতিবিম্বিত হইতেছে; শোকক্ষুব্ধ জনতা অশ্রুভরা নয়নে চাহিয়া আছে, সেই সকলের বড় প্রিয় শরৎচন্দ্রের চিতার দিকে। আমরা চলিয়া আসিলাম। জলধর দাদা শোকে অভিভূত—দাদা আদেশ করিলেন যোগীন্, তুমি শরতের কথা বল! রবিবাসরের সভার প্রিয় সভ্য শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে প্রথম শোক-প্রস্তাব রবিবাসরের সভা হইতেই হইয়াছিল। দাদা চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন—তাঁহার চক্ষে বহিতেছিল অশ্রুধারা!

আজ দাদার প্রিয় নরেনের বাড়ী রবিবাসরের সভা বসিয়াছে, দাদা কোথায়? দাদার সেই আসনটি যে আজ শূন্য! চুরুটের ধোয়া ত আজ উড়িয়া উড়িয়া প্রতি কথাটি ধূম্রায়মান করিতেছে না। সকলের দিকে চাহিয়া ঘাড়খানি বাঁকাইয়া কে আসিল না আসিল তাহার সন্ধান ত কেহ করে না। ফণীবাবু আসিয়াছেন কিন্তু দাদাত সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া নামেন নাই। আজ এই অধিবেশন—এই রবিবাসরের সদস্যগণ সকলের মুখেই একটা বিষাদের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবিবাসরের অধিবেশন হইতেছে—অথচ আমাদের সর্ব্বাধ্যক্ষ নাই! জলধর দাদা নাই, সর্ব্বজয়ী কালের কাছে তাহাও সম্ভব হইল! আজ নরেনের উচ্চকণ্ঠে সভার কার্য্যাবলী বুঝাইবার প্রয়োজন নাই!—আজ বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যিকদেরই সুধু নহেন বাঙ্গালার সর্ব্বসম্প্রদায়ের জলধর দাদা রবীন্দ্রনাথ হইতে বাঙ্গালা দেশের সকলের জলধর দাদা, সে জলধর দাদা আর নাই!

আমার সহিত দাদার পরিচয় সে অনেক দিনের অন্ততঃ পক্ষে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম নহে। প্রথম যে কবে কোন্ সূত্রে তাঁহার সহিত পরিচয় হইয়াছিল, তাহা বিশেষ করিয়া স্মরণ নাই। সম্ভবতঃ সাহিত্য পরিষদে কিংবা হিতবাদী আফিসে। সে দিন হইতে তাঁহার মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল।

ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি আমার অনুরোধে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ী অতিথি হইয়াছিলেন। বিজয়বাবু জলধর দাদার প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং সম্মেলনের একজন উৎসাহী উদ্যোগী ছিলেন। আমিও বিজয় বাবুরই অতিথি ছিলাম। আমি প্রদর্শনীর জন্য পুরাতত্ত্ব-সম্পর্কিত দ্রব্য ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে যাইয়া পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম। অনেক প্রীতি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারি নাই। দাদাও আমার পাশে বসিয়া চুরুট টানিতেন—বাহিরের আনন্দ-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেলেন না। আমি বলিলাম দাদা আপনি যান? লোকে কি মনে করবে?

দাদা বলিতেন—না না তোকে ছেড়ে আমি যাব না।

যেবার ঢাকায় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইল। সে সময়ে দাদা আমাকে পত্রদিলেন—আমি তোমার ওখানে উঠব। আমি লিখিলাম গরীবের ঘরে আপনি আসিবেন সে কি কথা! দাদা কিন্তু কোন কথাই শুনিলেন না, উত্তরে লিখিলেন—আমার বড় লোকের বাড়ী পোষাবে না। তোর ওখানেই উঠ্‌ব।

সকল বড় বড় সাহিত্যিকেরা ঢাকা পৌছিলেন, আমিও ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম—দাদাকে নেওয়ার জন্য অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন—দাদা তাঁহাদিগকে বলিলেন—'আমি যোগেনের ওখানেই যাব।' তাহাই হইল, সকলে মোটর গাড়ীতে চলিয়া গেলেন—আমি একখানি ছ্যাকরা গাড়ীতে করিয়া দাদাকে বাড়ী লইয়া আসিলাম। আমার মা, বাঙ্গালা সাহিত্যের এই সাধকটিকে সাদরে আহ্বান করিলেন,—দাদা তাঁহাকে মা মা বলিয়া এমনভাবে অল্প ২,৩ দিনের মধ্যেই আপনার করিয়া লইলেন।—তাঁহার সেই স্নেহপূর্ণ ব্যবহার আজও ভুলিতে পারি নাই। আমার মা ও দাদার মধ্যে বয়সের খুব ব্যবধান ছিল না—আমার মায়ের মৃত্যুর সংবাদে তিনি ব্যথিত হইয়া লিখিয়াছিলেন আবার মাকে হারাইলাম। জলধর দাদার সেই সরল ও বিনীত ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া মা কতদিন বলিয়াছিলেন এমন মানুষ হয় না।

এ দুইটি ঘটনার কথা বলিলাম, সুধু তাঁহার স্নেহের গভীরতা প্রকাশের জন্যই।

জলধর দাদার নাম সাহিত্য জগতে ভ্রমণ বৃত্তান্তের জন্যই বিখ্যাত। এবং তাঁহার এই খ্যাতি চিরদিনই বাঁচিয়া থাকিবে, এ বিষয়ে আমার এই উক্তি একেবারেই অত্যুক্তি নহে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জলধর দাদার ভ্রমণ বৃত্তান্ত কিরূপ জনপ্রিয় ছিল, তাহা ১৩১০ সালের মাঘ মাসের 'সাহিত্যে' প্রকাশিত 'সাহিত্য সেবকের ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

১৩১০ সাল। ২৯শে জ্যৈষ্ঠ। 'ভারতী' ও 'সাহিত্যের' ভ্রমণকারী বাবু জলধর সেন কলিকাতায় আসিয়াছেন। 'সাহিত্য' সম্পাদক মহাশয় তাঁহাকে আপ্যায়িত করিবার নিমিত্ত আজ রাত্রে একটা প্রীতি ভোজের জোগাড় করিয়াছিলেন। জলধরের উপলক্ষ্যে লক্ষ আমাদের ন্যায় সামান্য লোকের উপরেও পড়িয়াছিল। আহারের ব্যাপারটা বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল। আবার মাংস ভোজনে বিরতি দেখিয়া, সু-চন্দ্র, আহারে তৃপ্তি হইল না বলিয়া দুঃখ করিলেন? আর আম্বাই করিয়া কয়েকটা বোম্বাই বেশী মাত্রায় খাওয়াইয়া দিলেন। এখন কথা এই, জলধর বাবু "ভারতীতে" তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত ছাপাইতে দিবেন, কিনা? প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া বড় দুরূহ। "সাহিত্য" সম্পাদক "ভারতীর" প্রিয় প্রকাশচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়াই সব মাটী করিয়া দিলেন বোধ হয়। প্রকাশ জলধরকে যেরূপ পাকড়াও করিয়া ধরিয়া বচনের ধারা ছুটাইয়াছিলেন, তাহাতে বিশ্বাস হয় না যে, জলধর ভারতীকে সহজে ভুলিতে পারিবেন। তা না পারুন, "সাহিত্যের" খাতির এড়ানও সহজ হইবেনা। সম্পাদক মহাশয় যে দুই চারি বুলি দিয়াছেন, তাহাই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে প্রচুর।. আর

বেশী কিছুর দরকার নাই। সেন মহাশয়ের ভ্রমণ কাহিনী অনেক স্থানে উপন্যাসের ন্যায় হইলেও পড়িয়া আমোদ পাওয়া যায়।

স্বর্গত নিত্যকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের এই ক্ষুদ্র মন্তব্যটুকু হইতেই বুঝিতে পারা যায় সেকালে জলধর দাদার ভ্রমণ কাহিনী জনসাধারণের মনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পঞ্চাশ বৎসর আগের মাসিকপত্রের পৃষ্ঠা খুঁজিলে এমন কাগজ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায় যাহার পৃষ্ঠায় জলধর দাদার লেখা না প্রকাশিত হইয়াছে। ছোটদের কাগজ "সখা ও সাথীতে" তাঁহার দিল্লী ভ্রমণের কথা আজও মনে পড়িতেছে। 'দাসী" পত্রিকায় তিনি ধুবড়ি সম্বন্ধে একটী ছোট সুন্দর ভ্রমণ কাহিনী লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সেই ক্ষুদ্র ভ্রমণ কাহিনীটির মধ্যে অতি অল্প কয়েকটী কথায় ষ্টেশন মাষ্টারের যে চিত্রটী ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা আজও আমি ভুলিতে পারি নাই।

এক সময়ে তাঁহার লিখিত "প্রবাস চিত্র"খানি আমার একরূপ নিত্যসঙ্গী ছিল। তাহার প্রত্যেকটী ভ্রমণ বিবরণ ভাষার সৌন্দর্য্যে এবং বর্ণনার মাধুর্য্যে আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। সৌভাগ্য ক্রমে তিনি এ গ্রন্থে যে সকল স্থানের বিবরণ লিখিয়াছেন আমিও তাহা দেখিয়াছি। দেখিয়া মনে হইয়াছে যেন জলধর দাদা প্রত্যেকটী স্থান অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন।

জলধর দাদা কোনও দিন আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। যে "হিমালয়" গ্রন্থ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে সেই হিমালয়ের বিষয়েও লিখিত ডায়েরীখানা তিনি প্রকাশের জন্য উৎসুক ছিলেন না। এ সম্বন্ধে হিমালয়ের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"জলধর বাবুর ন্যায় স্বভাবভীরু লোক সহজে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহেন না। বর্ত্তমান ভূমিকা-লেখকের সহিত এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ বিষয়ে কিছু সম্বন্ধ আছে। আমি তাঁহার ডাইরীখানা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া যদি হিমালয় কাহিনী যথা নিয়মে "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশ না করিতাম, তাহা হইলে তিনি [illegible] হইয়া [illegible]ভাষায় এ রত্ন প্রকাশ করিতেন কিনা এ সম্বন্ধে আমার এবং যাঁহারা জলধর বাবুকে জানেন, তাঁহাদের অনেকেরই সন্দেহ আছে। আজ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে এই কাহিনী প্রকাশিত হওয়ায় আমার যত আনন্দ তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ আর কাহারও হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা জানিনা; এবং সেইজন্যই আজ অতীত বর্ষের এই কাহিনী স্মরণ করিয়া সে কথার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক বোধ করিলাম না।" এই ভূমিকাটুকু ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হিমালয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

বাঙ্গালা সাহিত্যে ভ্রমণ কাহিনীর ইতিহাসে জলধর দাদার রচনাকৌশল, তাঁহার সরলতা ও আন্তরিকতা আমাদের চিত্তকে বিমুগ্ধ করে।

যৌবনে পত্নী-বিয়োগবিধুর চিত্তে প্রেমিক জলধর শিব প্রমথেশের মতই বেদনা-বিজড়িত প্রাণে হিমালয়ের হিমবক্ষে প্রাণ জুড়াইতে গিয়াছিলেন। তাহারই ফলে হিমালয়ের বিরাট মূর্ত্তি হিমালয়ের ক্ষুদ্র আকারে গঙ্গার বেগবতীধারাকে সংক্ষুব্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার সবখানি সৌন্দর্য্য বাঁধা পড়িয়া আছে কয়েকখানি পত্র বেষ্টনীর মধ্যে।

জলধর দাদা ছিলেন করুণ রসের প্রস্রবণ। তাঁহার রচনার মধ্যে দুঃখ ও বেদনার চিত্রই স্বতঃপ্রকাশিত। করুণ চিত্র প্রকাশে তিনি সুদক্ষ শিল্পী ছিলেন। মৃত্যুর বেদনা গভীর ভাবে আঘাত করিয়াছিল বলিয়াই তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী ও তাঁহার গল্প ও উপন্যাস অমন সুমধুর।

জলধর দাদার রচনা এত প্রাণস্পর্শী এবং সুমধুর হইবার দুইটি কারণ বিদ্যমান। প্রথমতঃ যৌবনে প্রিয়জনের মৃত্যুর আঘাত বেদনা, দ্বিতীয়তঃ কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের প্রভাব।

'গ্রাম্যবার্ত্তা' সম্পাদক হরিনাথ—কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ নামে পরিচিত। নদীয়া কুমারখালি জলধর দাদার বাসপল্লীর অধিবাসী ছিলেন এই হরিনাথ। হরিনাথ ছিলেন পরম ধার্ম্মিক, সাধক ও পরম জ্ঞানী। সেকালে গ্রামে গ্রামে বিশেষ করিয়া নদীয়া জেলায়—"হরিনাথ" বলিলে তাঁহাকে কেহই চিনিত না, সকলেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে প্রশ্নকারীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত; কিন্তু 'এডিটার

মহাশয়' বলিলে সকলেই তাঁহাকে [illegible] ফিকিরচাঁদ বলিলেও অনেকে চিনিত। এই কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ' দেশের জন্য বিবিধ কল্যাণকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন; স্বভাবকবি হরিনাথের অপূর্ব্ব বাউল সঙ্গীত সেকালে ঘরে ঘরে গীত হইত। আমরা কতদিন গভীর রাত্রিতে নদীর বুকে ধীবরদের কণ্ঠে গীত হইতে শুনিয়াছি—

'বাঁশের দোলাতে উঠে, কে হে বটে,
শ্মশান ঘাটে যাচ্ছ চলে।'

কিংবা "মন আমার টোপাপানা, ডুবতে চায় না,
সেই ভাবনা রাত্রি দিনে!"

ঢাকা সহর এক[illegible] হরিনাথের বাউল সঙ্গীতে মুখরিত হইয়াছিল। এই কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ছিলেন, "দুঃখী, তাপী, অনাথ, অসহায়, রোগী, শোক কাতর ব্যক্তি সকলের স্নেহের উৎস। সকলকেই তিনি আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। আমাদের জলধর দাদা এই সাধক মহাপুরুষের শিষ্য ছিলেন—তাই এমন নিরহঙ্কার, এমন বিনয়ী ও এমন স্নেহপরায়ণ ছিলেন—তাই ত তিনি আমাদের সকলের দাদা হইতে পারিয়াছিলেন।

জলধর দাদা স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি যেমন বাসপল্লীর প্রতি অনুরাগী ছিলেন, তেমনি দেশমাতৃকার প্রতি তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল অপরিমেয়। অতি সুমিষ্ট সুরে স্বদেশ গীতি গাহিতেন—আমরা সৌভাগ্যক্রমে একবার তাঁহার মুখে 'কতকাল পরে বল ভারত রে' এই প্রাচীন সঙ্গীতটি শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

তাঁহার লিখিত কলুঙ্গার যুদ্ধ—গুর্খাদের বীরত্ব কাহিনী প্রথমে 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে প্রবাস চিত্রে উহা মুদ্রিত হইয়াছে। কলুঙ্গার যুদ্ধ সম্পর্কে জলধর দাদার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কেহ কোনও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন কিনা জানি না তাঁহার রচিত এই কলুঙ্গার যুদ্ধ কি ইতিহাসের দিক্ দিয়া, কি বীরত্ব বর্ণনায়, কি ভাষার দিক দিয়া সর্ব্বতোভাবে একটি শ্রেষ্ঠ রচনা বলিতে হইবে। স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার 'অব্যক্ত' গ্রন্থে কলুঙ্গার যুদ্ধের কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে জলধর দাদার লিখিত প্রবন্ধের বিষয় উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই।

পল্লীগ্রামের সুখ দুঃখ, পথ, ঘাট, লোকজন, হাটবাজার, ব্যবসায় বাণিজ্য ও দারিদ্র্যের কথা ছোট ছোট গল্পে ও উপন্যাসে অতি সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সাহিত্যসেবীদের মধ্যে অহঙ্কার ও আত্মাভিমান একটু বেশী পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। দাদার আমাদের সে বালাই ছিল না। কতবার তাঁহার মুখে শুনিয়াছি অতি সুন্দর উত্তর। দুইটি ঘটনা মনে পড়িতেছে—স্বর্গত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইয়াছে, দাদাকে লইয়া গিয়াছি। বহু সম্ভ্রান্ত সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি সেখানে আসিয়াছেন,—একজন বলিলেন—দাদা, আপনার ঐ উপন্যাসটা ভাল হয় নাই? দাদা নির্বিকার চিত্তে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া হাসিয়া বলিলেন—আপনি যেমন—লেখাপড়া কিই বা জানি কিই বা লিখবো! আর একজন আর একদিন বলিলেন আপনার বইখানা অতি ভাল হয়েছে! দাদা, তেমনি নির্বিকার ভাবে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন ভাল বাসেন আমাকে তাই ভাল বললেন! এমনি ছিল প্রত্যেকটি বিষয়ে তাঁহার নির্বিকার ভাব।

সাহিত্য-সেবাই ছিল তাঁহার প্রাণ। সারাজীবন সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া জীবনপাত করিয়া গেলেন। বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মেলনে তাঁহাকে যুবকের মত খাটিতে দেখিয়াছি, সকলকে হাসি মুখে অভ্যর্থনা করিতে শুনিয়াছি।

বিগত বর্ষে শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্রনাথ আমাদের রবিবাসরের সদস্যগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। একখানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আমরা সকলে চলিলাম। দাদার আনন্দ দেখে কে? যেন তিনি বংশবিজয়ী বীর! চুরুটের পর চুরুট নিঃশেষ করিতেছেন এবং কি ভাবে কেমন করিয়া তাঁহার এই সৈন্যদলকে লইয়া যাইয়া শান্তি নিকেতনের শান্তি ভঙ্গ করিবেন, কোন্ সে বিজয় রবে রবীন্দ্রনাথের গৌরব ঘোষণা করিবেন তাহারই মহলা চলিতেছিল গাড়ীর মধ্যে। ষ্টেশানে গাড়ী থামিলে যাত্রীর দল ও ষ্টেশনের কর্ম্মচারীরা বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছিল—এই যাত্রার দল কোথায় গাহনা করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রীতি ও স্নেহে রবিবাসরের সভার
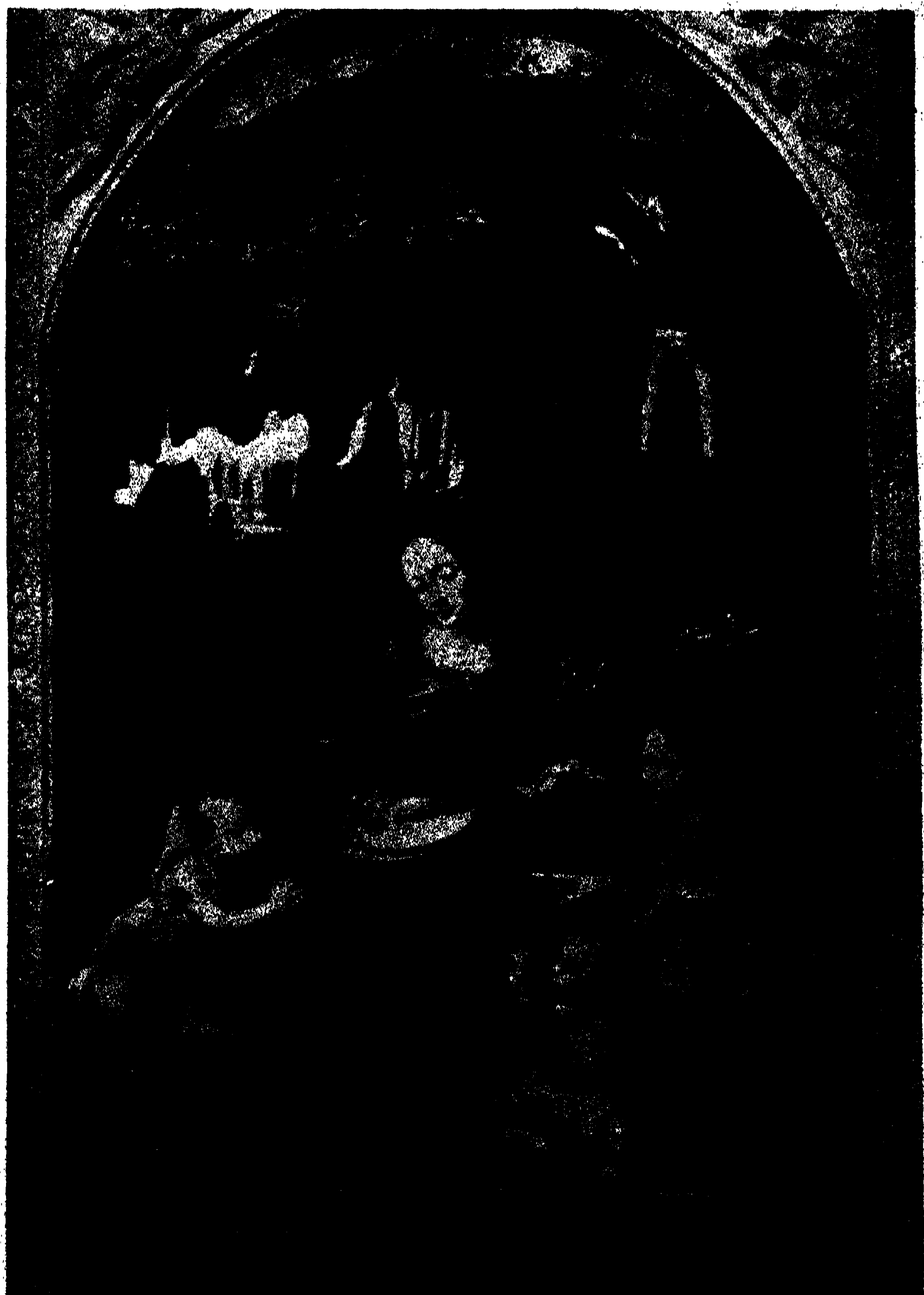
স্বর্গীয় সুষমা

বৈশাখ ১৩৪৬]

[শিল্পী—লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ।
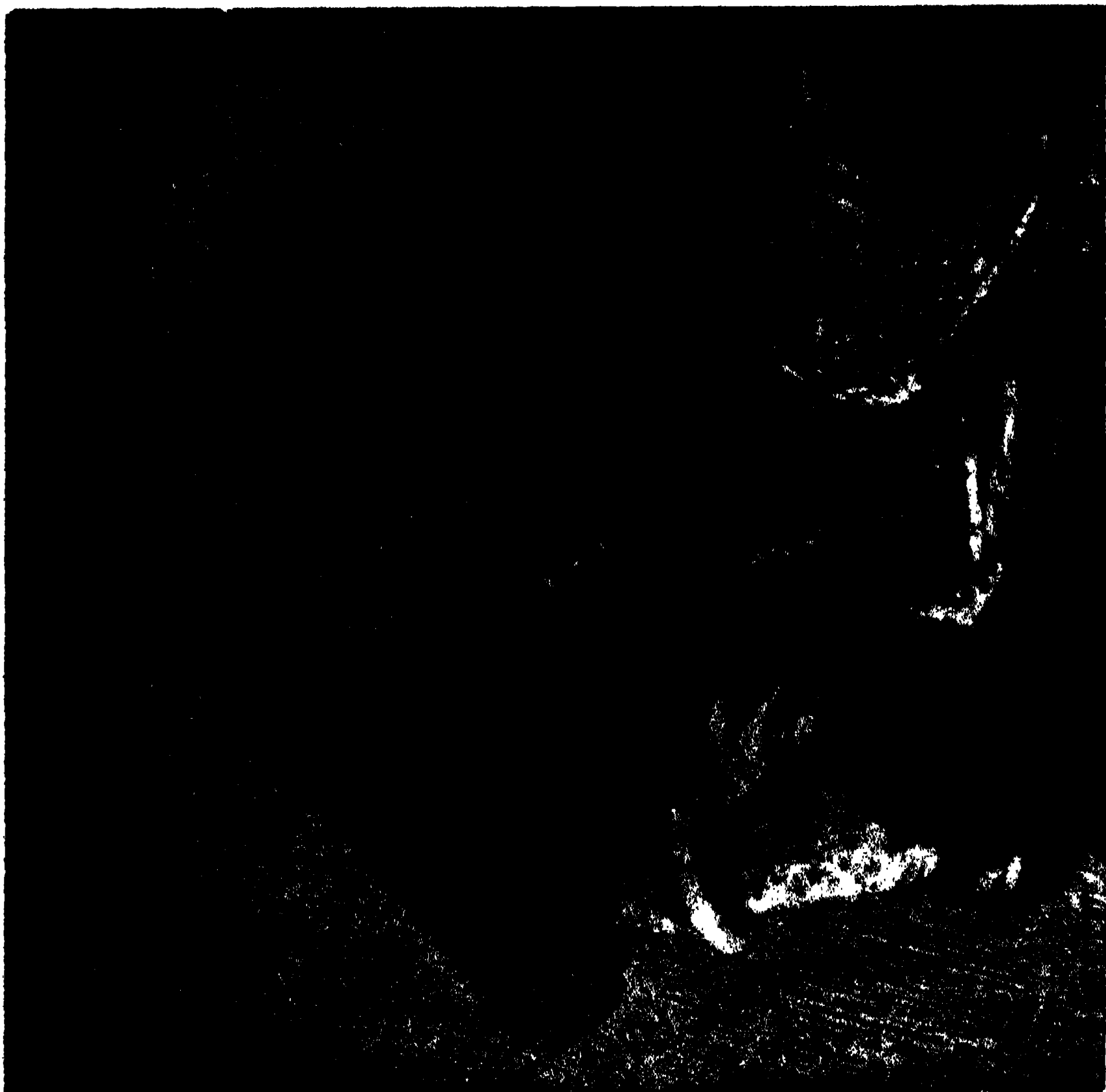
স্বদেশী ছাতা

অধিবেশন সার্থক ও সুন্দর হইল। দাদা একে একে তাঁহার সৈন্যগণকে রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। দাদার আনন্দ দেখে কে? সুন্দর ছোট একটি শ্রদ্ধা ও ভক্তির বাণী রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন! সেদিন বুঝিবা কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি চুরুট টানিতেও ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

দাদাকে শেষবারের মত দেখিলাম বাগানবাড়ীর আশী বৎসরের জয়ন্তী উৎসবে। সে ত উৎসব নয়, নিশান্তে মলিন দীপের মত শেষ প্রভা মাত্র! এ যেন আনন্দ-বিদায়, দাদা নিষ্প্রভ, ম্লান, মৃত্যু পাণ্ডুর মুখ তাঁর, যাহার জন্য এই উৎসব, বাঁশীর গুঞ্জন ও কবিতার ঝঙ্কার, তিনি কি কিছু লক্ষ্য করিতে পারিতেছিলেন? দৃষ্টি ছিল তখন কোথায়? কোন্ দেশের দিকে নিবদ্ধ? বুঝি বা মৃত প্রিয়ার অশরীরি জ্যোতির্ম্ময়ী আত্মা তাঁহার প্রিয়তমকে আহ্বান করিতেছিল, এস, ওগো! এস, এস—পরপারের ডাক আসিয়াছিল।

আমি সেই জয়ন্তী উৎসবে যাঁহারা তাঁহাকে শতজীবি হইবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছিলেন, তখন শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রনাথকে বলিলাম—আর দাদাকে দেখিতে পাইবে না! এই বোধ হয় শেষ! কাহার কণ্ঠে ফুলের মালা? শকেয়ারি ফুলের কি শোভা! তেমনি সেদিন আমাদের জলধর দাদাকে দেখিয়াছিলাম।

তিনি হঠাৎ চলিয়া গেলেন। শেষ দেখা তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না- শ্মশানে যাইতে পারিলাম না এই দুঃখ! তবে শান্তি এই দাদা দীর্ঘ আশী বৎসর কাল বাঁচিয়া কীর্ত্তি ও যশে বিমণ্ডিত হইয়া পুত্র-পৌত্র কন্যা ও দৌহিত্র পরিবৃত হইয়া এবং বন্ধুজনের হৃদয়ে হৃদয়ে স্নেহের আসনখানি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া চলিয়া গেলেন—যাও দাদা লীলা শেষ!

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রেম

কমলরাণী মিত্র

তোমার আমার দু'জনার' স্থান
হবে না এ ভরা ধরণীতে;
চ'লো ভেসে' যাই—
চ'লো ভেসে' যাই তরণীতে!!
যদিও মেঘের ঘণিমা ঘনায়,
ফেণিল-সিন্ধু যদি উছলায়,
বুকের আঁচল খুলে' মেলে' দেবো
প্রিয়তম বুকে ভ'রে' নিতে'!
চ'লো ভেসে' যাই,
চ'লো ভেসে' যাই অজানিতে!!

আকুল-আবেশে চোখে চেয়ে' রবো
নিমেষ-বিহীন আঁখিতারা,
হয়তো বরষা হ'বে সারা।
অনুরাগময় নিবিড়-পরশে
জড়ায়ে ধরিব কম্প্র হরষে,
সব ভয়, সব সংশয় শেষ,
দোঁহাকার মাঝে দোঁহাহারা;
আকাশে তখন ঝরঝর ধারে
হয়তো ঝরিবে জলধারা!!

জনগণহীন বিপুল-বিজনে
দু'জনার কাছে দুইজনা—
করুক বিশ্ব বঞ্চনা।
উদ্দাম-গতি উত্তরী' বায়ে
উদ্দেশহীন ভাসিয়াছি নায়ে
বাহুতে বাহুর নিবিড়-বাঁধনে
বিভল পাগল উন্মনা;
দু'জনার কাছে কেহ নাই আর
শুধু তুমি আমি দুইজনা॥

মহাজন পদাবলী ও বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত

(সমালোচনার প্রত্যুত্তর)

শ্রীরাধারমণ গোস্বামী বেদান্তভূষণ

গত মাঘ মাসে আমি শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় এবং শ্রীমতী অপর্ণা দেবী সম্পাদিত কীর্তন পদাবলীর সমালোচনা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। চৈত্রমাসে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়কে এই আলোচনায় অগ্রসর হইতে দেখিয়া সুখী হইলাম।

সাহিত্যরত্ন মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের প্রথমেই আমাকে অত্যধিক বাড়াইয়াছেন। তাঁহার নামকরণ হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে তিনি কোনও বৈষ্ণব বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। সুতরাং বিনয় তাঁহার জন্মগত অধিকার। অবশ্য পরক্ষণেই তিনি যে সকল কটূক্তি করিয়াছেন, তাহা আমারই দুর্ভাগ্যের ফল। যাহা হউক, যখন এ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে, তখন একদিকে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিনয়ের অভিনয় এবং অপর দিকে তাঁহার কটুভাষণ এতদুভয় যথাসম্ভব পরিহার পূর্ব্বক আমার যাহা বক্তব্য তাহা সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

আমি আমার প্রবন্ধে একটি ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম - সখ্য লিখিতে সম্পাদকেরা 'নিবেদনে' সৌখ্য লিখিয়াছেন। হরেকৃষ্ণ বাবুর সম্পাদিত গীতগোবিন্দের ভূমিকায়ও সখ্য স্থলে সৌখ্য পাইতেছি। কোনও একটি ভুল পুনঃ পুনঃ ঘটিতে থাকিলে সন্দেহ হয় যে হয়ত এই ভুল মুদ্রাকর প্রমাদমাত্র নহে। সেইজন্য অনুমান করিয়াছিলাম যে উভয় ক্ষেত্রে একই ব্যক্তির হস্ত রহিয়াছে। হরেকৃষ্ণ বাবু যে ভাবে এই আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে আমার অনুমান অমূলক নহে। বরং সম্পাদকদ্বয়ের পক্ষ সমর্থনে তিনি যে অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে এই সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ়ীভূতই হইতেছে।

আমার প্রবন্ধে আমি কতকগুলি ভ্রমপ্রমাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম, তাহার কয়েকটি মাত্র লইয়া সাহিত্যরত্ন মহাশয় আলোচনা করিয়াছেন। যে গুলির আলোচনা করেন নাই, সেগুলি মানিয়া লইয়াছেন, ইহা মনে করিলে আশা করি অসঙ্গত হইবে না। অতএব তিনি যে গুলির উল্লেখ করিয়াছেন; আমি তাহারই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

প্রথমত তিনি আমার প্রবন্ধে কতকগুলি ছাপার ভুল লইয়া উপহাস বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার জন্য আমি দায়ী নহি। বিচিত্রার মাননীয় সম্পাদক যদি আমার নিকট প্রুফ পাঠাইতেন, তাহা হইলে 'হৈয়ঙ্গবীণং' 'হৈয়ন্থাবীণং' এ পরিণত হইতে পারিত না। এদিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবামাত্র আমি সংশোধন করিয়া দিয়াছি। সম্পাদক মহাশয় যে আমাকে এই ভ্রম-সংশোধনের সুযোগ দিয়াছিলেন, এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

মাসিকপত্র বা সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ, নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে পত্রিকা প্রকাশ করিতে হয় বলিয়া লেখকদিকের নিকট প্রুফ পাঠাইয়া উঠিতে পারেন না। উপস্থিত ক্ষেত্রেও সম্ভবতঃ তাহাই ঘটিয়াছে। হরেকৃষ্ণ বাবুর ৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রবন্ধেও অন্ততঃ ৪০টা ছাপার ভুল হইয়াছে। 'অমানী মানব', 'দানলীলা,' 'মলয়জসরে', 'ঝাহ্নবা দেবী', 'খেচুরীর মহোৎসব' ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। কিন্তু একখানি গ্রন্থে যদি শ্রীরাগ স্থলে শ্রীবাশ মুদ্রিত হয়, তাহা হইলে সে গ্রন্থ যে সুসম্পাদিত তাহা কোনও ক্রমে বলা চলে না। শ্রীরাগ স্থলে শ্রীবাশ ছাপিয়া পাঠকের উপর ভ্রম-সংশোধনের ভার দিলে—বিশেষতঃ অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিচিত পদে—সুবিবেচনার কাজ হয় কি?

সম্পাদক মহাজন-পদের রস বিভাগে গোড়ার দিকে 'খণ্ড' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন যেমন রূপ খণ্ড, অনুরাগ

খণ্ড, মানখণ্ড ইত্যাদি। আমি বলিয়াছি যে ইহা সম্পূর্ণ মৌলিক। সাহিত্যরত্ন মহাশয় উত্তরে বলিতেছেন 'আমি নিবেদন পাই—পদকল্পতরুর মধ্যে দানলীলা, নৌকা বিলাস, হোলি লীলা, উত্তর গোষ্ঠ, গোষ্ঠাষ্টমী যাত্রা, রূপোল্লাস প্রভৃতি এই যে বিভিন্ন ধরণের নাম, ইহাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়াছে?' আমার উত্তর এই যে তিনি যে উদাহরণগুলি দিয়াছেন, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যাইবে যে মহাজনদিগের পদবিভাগে কোথায়ও 'খণ্ড' শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। 'কৃষ্ণ কীর্ত্তন' একখানি কাব্য; উহা কীর্ত্তন বা পদাবলীর গ্রন্থ নহে। সুতরাং ঐ গ্রন্থ হইতে 'খণ্ড' শব্দ গ্রহণ এবং কতকগুলি কবিতা চয়ন করায় সম্পাদকের নূতনত্বের প্রতি মোহ সূচিত হইতেছে। কৃষ্ণ কীর্ত্তন পুস্তকখানি যে গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধে, তাহাই আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

আলোচ্য প্রবন্ধে সাহিত্যরত্ন মহাশয় আমার প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া একস্থানে বলিতেছেন 'বহির্ভূত পরিস্থিতিতে রসজ্ঞ ব্যক্তি প্রশ্রয় দিতে পারেন না।' কিন্তু আমি এরূপ কথা বলি নাই। আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা এই: 'চারি পাঁচ শত বৎসর যে ভাবধারা বৈষ্ণব সাহিত্য, সমাজ ও ধর্মমতকে পরিপুষ্ট করিয়াছে, তাহার বহির্ভূত কোনও পরিস্থিতিতে রসজ্ঞ ব্যক্তি কখনও প্রশ্রয় দিতে পারেন না।' আমার বক্তব্যের একাংশ উদ্ধৃত করিয়া লেখক আমার প্রতি সুবিচার করেন নাই। যে অংশ তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে কোনও অর্থই হয় না। অথচ তিনি একস্থানে আমাকে 'প্রলাপে'র জন্য দায়ী করিয়াছেন। তাঁহার সুবিচারের দৃষ্টান্ত অন্যত্রও আছে। আমি তাঁহাকে 'অপরাধী' করিয়াছি (৩৬২ পৃঃ) 'চটিয়া গিয়াছি (৩৬৩পৃঃ) ধোপা নাপিত বন্ধ করিতে আদেশ দিয়াছি' (৩৬৪ পৃঃ) 'ভগবানকে বর্ণসঙ্কর বলিয়াছি' (৩৬৫) ইত্যাদি। যাঁহারা আমার প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই, তাঁহারা হয়ত মনে করিবেন যে আমি সত্যই হয়ত ঐ সকল উক্তি করিয়াছি কিন্তু তাঁহাদের অবগতির জন্য আমি সবিনয়ে বলিতে চাই যে আমার প্রবন্ধে এই সকল উক্তি কোথায়ও নাই।

সম্পাদক রূপের পদের মধ্যে রাসের পদ দিয়াছেন। আমি ইহার নিন্দা করিয়াছি, সত্য। 'চন্দন চর্চ্চিত নীল কলেবর' পদটি বসন্ত রাসের পদ বটে। কেহই তাহা অস্বীকার করিবে না। কিন্তু সাহিত্যরত্ন মহাশয় বলিতেছেন এই পদটিতে রাসরসারম্ভী শ্রীভগবানের একটি বিশেষ রূপই প্রকটিত হইয়াছে......' সুতরাং তাঁহার অভিপ্রায় যে এই পদ রূপের মধ্যে যাইতে পারে। কিন্তু সাহিত্যরত্ন মহাশয় এখানে একটি ভ্রম সমর্থন করিতে গিয়া আর একটি ভ্রমে পতিত হইলেন। 'চন্দন চর্চ্চিত' পদটি রাসারম্ভী রূপের নহে, রাসের পরিণত অবস্থার পদ। 'শ্লিষ্যতি কামপি, চুম্বতি কামপি, কামপি রময়তি রামাং'—ইহা রূপের বর্ণনা? রূপে, রাসে, মানে গোষ্ঠে যদি কিছু প্রভেদ না থাকে, তবে 'কীর্ত্তন পদাবলীতে' রাসলীলা নামক স্বতন্ত্র 'খণ্ডের' কি প্রয়োজন ছিল?

সাহিত্যরত্ন মহাশয় বলিতেছেন—'কবিগণের রসানুভূতি পর পর কোন্ ধারায় বিকশিত হইয়াছে, ঐ খণ্ডগুলিতে তাহাই ধরিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই জন্যই পর পর কতকগুলি গৌরচন্দ্র সাজাইয়া দিয়া সম্পাদক দুইজন কোন অপকর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। (৩৬৩পৃঃ) বাস্তবিক যদি তাঁহাদের উদ্দেশ্য বৈষ্ণব কবিগণের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ মূলক গ্রন্থ সংকলন হয়, তবে তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিলেই সমস্ত গোল চুকিয়া যায়। যদি এই পুস্তক কীর্ত্তন পদাবলী নামধেয় কোনও সমালোচনার গ্রন্থ হয়, তাহা হইলে আমাদের কোনও বক্তব্য নাই। হেমচন্দ্র বা রঙ্গলালের কবিতায় তাঁহাদের রসানুভূতি কি ভাবে বিকশিত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিলে যেমন একখানি সুন্দর কাব্য-সমালোচনার পুস্তক হইতে পারে, তেমনি বৈষ্ণব কবিদের ভাববিকাশ কোন্ কোন্ ধারা অবলম্বন করিয়া সংঘটিত হইয়াছে, তাহা সম্পাদক অনুসন্ধান করুন, তাহাতে আমাদের কি আপত্তি থাকিতে পারে? 'কীর্ত্তন পদাবলী' এই নাম তাহা হইলে সঙ্গত হয় কি?

গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হইয়াছে:—'ভিন্ন ভিন্ন লীলার তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা দিয়াছি।' কিন্তু যদি কবিগণের চিত্ত-বিকাশের অনুক্রমই সম্পাদকের লক্ষ্য হয়, তবে

অনুচিত গৌরচন্দ্রিকার কি প্রয়োজন? 'তদনুচিত' কথাটির সার্থকতাই বা কি, তাহা সাহিত্যরত্ন মহাশয় বিচার করিয়া দেখিবেন? "কবির বয়স অনুসারে পদের প্রাচীনত্ব ধরিয়া আমি যদি পদাবলী সাজাইয়া দিই, তাহার মধ্যে ভাবধারার বিচারের কি আছে?" সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের সহিত এ সম্বন্ধে আমরাও একমত। কিন্তু কীর্ত্তন পদাবলীতে কাহার বয়স অনুসারে পদ সাজানো হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। সম্পাদক যদি পুণাক্ষরে এ কথা ভূমিকায় বা নিবেদনে প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে আমি এই পণ্ডশ্রমে কখনও প্রবৃত্ত হইতাম না, একথা আমি সাহিত্যরত্ন মহাশয়কে বিশ্বাস করিতে বলি। আমরা কীর্ত্তনের অনুরাগী, মহাজন পদাবলীর ভক্ত, আমরা তাহারই অনুসন্ধান করি। তিনি যদি সাহিত্যের দিক দিয়া পদ সাজাইতে চাহেন, তাহা হইলে এ কথা বলা চলে না যে 'পালাগুলি সাজানো আছে গাহিবার জন্য। তার মধ্যে ভাবধারা খুঁজিয়া দেখিতে পারেন।' এরূপ কথা ত কখনও শুনি নাই। ভাবধারার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া পালা সাজানো যায় না, পালা না সাজাইলে গান গাওয়া চলে না। সুতরাং আপনি 'ভাবধারা' অগ্রাহ্য করিয়া পালা সাজাইবেন এবং পাঠকের উপর তাহা খুঁজিয়া লইবার বরাৎ দিবেন, এ কিরূপ ব্যবস্থা?

কীর্ত্তন পদাবলীতে মানের মধ্যে খণ্ডিতা ও কলহান্তরিতা অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমি বলিয়াছি যে, ইহাতে রস-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। সাহিত্যরত্ন মহাশয় সাহিত্যদর্পণ ও উজ্জ্বলনীলমণি হইতে বচনপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন: "মানের মধ্যে খণ্ডিতা দিয়া অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধি বহির্ভূত কার্য্য করা হইয়াছে"; গোস্বামী প্রভুর এই আপ্ত বাক্য আমরা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।" এ সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে আমরা কখনও আপ্ত নহি। ভ্রমপ্রমাদাদি চতুষ্টয় দোষ রহিত ব্যক্তিকেই আপ্ত বলে। আপ্ত বাক্য বলিয়া আমার উক্তিকে বিদ্রূপ করা চলে। কিন্তু ইহা গ্রহণ করিবার জন্য কোনও অনুরোধ নাই। দেখা যাউক সাহিত্যরত্ন মহাশয় কি বলিতে চাহেন। সাহিত্যদর্পণে মান দুই প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে: প্রণয়মান, ঈর্ষামান। মানঃ কোপঃ স তু দ্বেধা প্রণয়ের্ষ্যা-সমুদ্ভবঃ। তিনি যে 'পত্যুরন্য প্রিয়া সঙ্গে' ইত্যাদি শ্লোকটি সাহিত্যদর্পণের তৃতীয় পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা ঈর্ষামানের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ঈর্ষাজনিত যে মান হয়, তাহাতে নায়িকা পতির অন্য-সংসর্গ দোষ সন্দেহ করিয়া কুপিতা হয় এবং তাহার জন্য নায়কের প্রতি নানা প্রকার বক্রোক্তি ও তিরস্কার করে। এই প্রকার অবস্থাপন্না নায়িকাকে খণ্ডিতা বলা হয়। সাহিত্যদর্পণ মতে:

পার্শ্বমেতি প্রিয়ো যস্যা অন্যসম্ভোগচিহ্নিতঃ।
সা খণ্ডিতেতি কথিতা ধীরৈরীর্ষ্যাকষায়িতা॥

অন্যসম্ভোগ চিহ্নিত (ভোগাঙ্ক) নায়ককে আসিতে দেখিয়া নায়িকা ঈর্ষা কষায়িতা হইলে তাহাকে খণ্ডিতা বলে।

উজ্জ্বলের মতে

উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্।
ভোগ-লক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতা॥

অর্থাৎ সময় লঙ্ঘন করিয়া অন্য নারীর ভোগ চিহ্ন অঙ্গে লইয়া যাহার নায়ক প্রাতঃকালে আগমন করেন, তাহাকে খণ্ডিতা বলে।

এইরূপ খণ্ডিতা নায়িকা যখন ক্রোধবশে নায়ককে তাড়াইয়া দেন, তখন নায়িকার মনে অনুতাপ আসিলে তাহার কলহান্তরিতা অবস্থা প্রাপ্তি ঘটিতে পারে। এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। কিন্তু সাহিত্যরত্ন মহাশয় সম্ভবতঃ মান অর্থে ঈর্ষা এবং মানিনী অর্থে খণ্ডিতা মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মানের একমাত্র কারণ অন্য নায়িকা-সঙ্গ নহে। অন্য কারণেও মান হইতে পারে এবং কলহ হইতে পারে। কীর্ত্তন পদাবলীতে 'স্নেহস্তুৎকৃষ্টতা বাপ্ত্যা' ইত্যাদি যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও দেখিতে পাইবেন যে স্নেহ বা প্রেম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া কৌটিল্য ধারণ করিলে তাহাকে মান বলে। উজ্জ্বল নীলমণির এই অংশ একবার ভাল করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে মান 'উদাত্ত' এবং 'ললিত' ভেদে দ্বিবিধ। রাসের অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখা দিলেন, তখন

কোনও গোপী (শ্রীরাধা) মান করিয়া ভ্রূকুটি করিয়া রহিলেন।

কাচিদ্ভ্রূকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভ বিহ্বলা।
ঘ্নতীবৈক্ষাৎ কটাক্ষেপৈর্নির্দ্দিষ্ট দশনচ্ছদা॥

—ভাগবত ১০ম স্কন্ধ

বস্তুতঃ উজ্জ্বলে এবং সাহিত্যদর্পণে নায়িকাভেদের মধ্যে খণ্ডিতা ও কলহান্তরিতা বর্ণিত হইয়াছে। মান প্রকরণের মধ্যে কোথায়ও নহে। সাহিত্যরত্ন মহাশয় যদি বচন আবৃত্তি না করিয়া দেখাইতে পারিতেন যে এরূপ রীতি কোনও অলঙ্কার শাস্ত্রে বা পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থের কোথায়ও অনুসৃত হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতাম। বস্তুতঃ সাহিত্যদর্পণে ও উজ্জ্বলে খণ্ডিতা ও কলহান্তরিতা নায়িকাভেদের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। মান বর্ণিত হইয়াছে সাহিত্যদর্পণে শৃঙ্গার রসের প্রকারভেদ রূপে। শৃঙ্গার রসের স্থায়ীভাব রতি। রতি দুই প্রকার: বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভের আবার চারি প্রকার ভেদ আছে: পূর্ব্বরাগ-মান-প্রবাস-করুণাত্মক। আলঙ্কারিকগণের বিধি না মানিলে উপায় কি?

কলহান্তরিতা নায়িকা কাহাকে বলে? কলহ কি কেবল অন্য নারীর উপভোগেই ঘটে? অন্য কারণে ঘটিতে পারে না? বস্তুতঃ আলঙ্কারিকেরা তাহাকেই কলহান্তরিতা বলিয়াছেন যে নায়িকা ভূলুণ্ঠিত, চাটুবাক্যে প্রসন্ন করিতে ব্যগ্র, পাদপতিত নায়ককে বিদায় করিয়া দিয়া পশ্চাৎ অনুতাপগ্রস্তা হইয়াছে। 'রোষাৎ'—ক্রোধবশে বিদায় করিয়া দিয়াছে! এখানে অন্য নায়িকার কথা কোথায়?

সাহিত্যরত্ন মহাশয় গীতগোবিন্দের একটি সংস্করণ কয়েক বৎসর হইল প্রকাশ করিয়াছেন। গীতগোবিন্দেও দেখিবেন খণ্ডিতা ও কলহান্তরিতা বিভিন্ন সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। এগুলি নায়িকারই অবস্থান্তর বিশেষ। ইহা মানের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে রসশাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য হয়। আমার প্রবন্ধে কৃষ্ণকীর্ত্তনের দানলীলা সম্বন্ধে এই মন্তব্য ছিল যে উহা গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ। আমরা আরও বলিয়াছিলাম যে 'প্রচলিত কোনও পদে মথুরায় গমনের কথা আছে, কিন্তু ঐ সকল পদ গোস্বামিগণের অভিপ্রায়সম্মত নহে।' হরেকৃষ্ণ বাবু এই প্রসঙ্গে অনেকগুলি পদ উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন যে "গোস্বামী মহাশয় বড় জোর বলিতে পারেন দানলীলা সম্বন্ধে দুইটি মত আছে!" আমি তাহাই ত বলিয়াছি এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলিয়াছি যে ঐ দুইটি মতের মধ্যে একটি গোস্বামীদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ। কৃষ্ণকীর্ত্তন যে গোস্বামিগণের সম্মত হইতে পারে না, তাহাই দেখাইবার জন্য আমি প্রসঙ্গতঃ দানলীলার উদাহরণ দিয়াছিলাম। পূর্ব্বতন গোস্বামীরা শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার পবিত্রতা সম্বন্ধে এতই সতর্ক ছিলেন যে তাঁহারা মথুরায় বেচাকেনা করিতে যাওয়া পর্য্যন্ত অপছন্দ করিতেন। সাহিত্যরত্ন মহাশয় জানেন কি না বলিতে পারি না, প্রাচীন কীর্ত্তন গায়কেরা দানঘাটীর দান ব্যতীত অন্য দানলীলা গান করিতেন না। এখনও যাঁহারা প্রাচীন রসশাস্ত্রের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহেন, সেই সকল গায়কের নিকট শুনিয়া দেখিবেন মথুরায় গমনাত্মক দানগান শুনিতে পাইবেন না। বস্তুতঃ সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ ব্যাপারে বৈষ্ণবেরা সম্মতি দিতে পারেন না। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীরাধিকা কাত্যায়নী ব্রত করিয়াছিলেন লেখা আছে, কিন্তু গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত এই যে নিত্যসিদ্ধারা কাত্যায়নী ব্রত করেন নাই। শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ঐ ব্রত উদ্‌যাপনের সময় নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন মাত্র।

এই সঙ্গে আর একটি বক্তব্য এই: কৃষ্ণকীর্ত্তনের কামাতুর নায়ক যখন ছলে বলে নায়িকাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত, তখন 'আমি যশোদার পো' এরূপ পরিচয় দেওয়া শুধু অস্বাভাবিক নহে, অসঙ্গতও বটে। অতএব যে গ্রন্থে এরূপ নীতিবিরুদ্ধ প্রসঙ্গ আছে, সে গ্রন্থ অপ্রামাণ্য এবং বর্জ্জনীয়। কিন্তু সাহিত্যরত্ন মহাশয় আমার কথা বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন: "কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণ নিজেকে 'যশোদার পুত্র' বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় গোস্বামী প্রভু শ্রীভগবানকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া নিজের রুচি ও বৈষ্ণবতার পরিচয় দিয়াছেন।" আমি যাহা বলি নাই পরন্তু যাহার বিরুদ্ধ বাক্য বলিয়াছি, তাহার জন্য আমাকে দায়ী করা সমালোচনার কোন ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি তাহা বুঝিতে পারি-

যায় না। যাঁহারা কৃষ্ণকীর্ত্তনকে মহাজনপ্রণীত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাই ভগবানকে বর্ণসঙ্করত্বের দায়ে পাতিত করিতেছেন; আমি নহি।

সাহিত্যরত্ন মহাশয় উহার পরেই লিখিয়াছেন—"নিবেদন যাই শ্রীকৃষ্ণকে যশোদানন্দন কি কেহ বলে না, যশোদা বৎসলো হরিঃ বলিয়া কি কোনও স্তোত্রে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ নাই?" থাকিবে না কেন? আমরা তাঁহাকে যশোদা-দুলাল বলি, শ্রীচৈতন্যকে শচীর দুলাল বলি। কিন্তু ইঁহারা নিজে কবে কোথায় মায়ের নামে নিজ পরিচয় দিয়াছেন? বিশেষতঃ আদিরসের প্রসঙ্গে ইহা নিতান্তই গর্হিত। সেইজন্য আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা পুনরায় প্রণিধান করিতে অনুরোধ করি। 'শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার নিকট আপনার পরিচয় দিতেছেন আমি যশোদার পুত্র, আমার নাম গোবিন্দ। প্রণয়প্রার্থী একজন যুবকের পক্ষে মাতার পরিচয় দেওয়া অত্যন্ত দীনতাসূচক সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কারণ কথিত আছে, মাতৃনামাধমাধমঃ। ছলে বলে কৌশলে নায়ক যেখানে নায়িকার উপভোগে উদ্যত, সে স্থানে মাতৃপরিচয়ে নিজের পরিচয় দান করিবার অবকাশ কোথায়? ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যাহাদের বাপের ঠিক নাই তাহারাই মায়ের নামে পরিচয় দিয়া থাকে মাতৃবৎ বর্ণসঙ্করাঃ।' ইহাতে ভগবানকে বর্ণসঙ্কর বলা হয় নাই, যাঁহারা তাহার মুখে এমন অশাস্ত্রীয় পরিচয় স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের কাব্য বর্জ্জনীয়, ইহাই আমার উক্তির তাৎপর্য্য। কৃষ্ণকীর্ত্তন যে প্রামাণিক গ্রন্থ ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সাহিত্যরত্ন মহাশয় শ্রীসনাতন গোস্বামী হইতে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন পর্য্যন্ত সকলেরই দোহাই দিয়াছেন। তিনি বেশ বিদ্রূপ সহকারে বলিয়াছেন। "...... প্রভৃতি মহামহা রথীগণ বহু আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং এ প্রবন্ধে পিষ্টপেষণ করিব না। দেখিতেছি গোস্বামী মহাশয় এ দিকে বড় কাণ দেন না।" কিন্তু সাহিত্যে সুপ্রবীণ সাহিত্যরত্ন মহাশয় কি জানেন না যে ডক্টর সুকুমার সেন তাঁহার ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনকে খুব প্রাচীন বলেন নাই? আমি যতদূর জানি তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে কৃষ্ণকীর্ত্তনের গ্রন্থকার বৈষ্ণব ছিলেন না; তাঁহার গ্রন্থ প্রাচীনতার সাক্ষ্য দেয় না এবং ইহার রুচি অত্যন্ত অমার্জ্জিত ও প্রাকৃত। ইহার পরেও যখন সাহিত্যরত্ন মহাশয় তাঁহার নাম করিলেন, তখন অনুমান হয় যে তিনিও এ দিকে বড় কান দেন না। শ্রীসনাতন গোস্বামীর কথা ছাড়িয়াই দিলাম—কারণ তাঁহার বৃহত্তোষণী নহে, বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী টীকায় কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের নাম গন্ধ খুঁজিয়া পাই নাই। সাহিত্যরত্ন মহাশয় এক স্থলে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ভারখণ্ডের অস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন, তাহাও খুঁজিয়া পাইতেছি না। সাহিত্যরত্ন মহাশয় কোথায় দেখিয়াছেন, তাহা বলিয়া দিলে আমাদের পক্ষে সুবিধা হইত।

আমার প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল যে 'আশ্লিষ্য পাদরতা'ং শ্লোকটি মহাপ্রভুর স্বরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার 'আস্বাদিত' বলিয়া কীর্ত্তন পদাবলীতে এই শ্লোকটির উল্লেখ করিয়া সম্পাদক অন্যায় করিয়াছেন। সাহিত্যরত্ন মহাশয় সম্পাদকীয় মত সমর্থন করিতে অগ্রসর হইয়া আমাকে আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন "গোস্বামীপ্রভুর ক্রোধ এত অধিক হইয়াছে যে তিনি প্রায় প্রলাপে পৌছিয়াছেন" "......অর্থাৎ একটা মহামারি কাণ্ড ঘটিয়াছে। সেইজন্য তিনি একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। যেন সর্ব্বনাশ হইয়া গেল।" ইত্যাদি। একটি প্রবাদ আছে যে যুক্তি যেখানে দুর্ব্বল, কটূক্তি সেখানে সবল। সে যাহাই হউক, বিচার্য্য বিষয় হইতেছে, 'আস্বাদিত' এবং 'রচিত' এক জিনিষ কি না। যদি কাহারও রচিত কাব্য তিনি নিজে আস্বাদন করেন, তাহা হইলে কি বলিব যে ঐ কাব্য তাঁহার আস্বাদিত? বঙ্কিমচন্দ্র যদি তাঁহার বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতটি কখনও আস্বাদন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার রচয়িতৃত্ব কি চলিয়া যাইবে? সাহিত্যরত্ন মহাশয় চরিতামৃতের একটি পয়ার উদ্ধৃত করিয়া বেশ দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন: "শ্রীমহাপ্রভু ওই শ্লোক আস্বাদন করিয়াছেন তাহা বৈষ্ণব সমাজ মার্জ্জনা করিয়াছেন।"

পূর্ব্বে অষ্ট শ্লোক করি লোকে শিক্ষা দিল।
সেই অষ্ট শ্লোকার্থ আপনি আস্বাদিল॥

'আস্বাদিত' কথাটি বড় বড় অক্ষরে ছাপা হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্যরত্ন মহাশয় একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে বুঝিতে পারিতেন যে প্রথমতঃ ইহাতে এই শ্লোকগুলি যে মহাপ্রভুর কৃত তাহা বলা হইয়াছে। আর বলা হইয়াছে যে মহাপ্রভু এই শ্লোকার্থ আস্বাদন করিয়াছিলেন। সুতরাং আমার উক্তির স্বপক্ষেই সাহিত্যরত্ন মহাশয় যুক্তি আহরণ করিয়া আমাকেই প্রলাপোক্তির জন্য দায়ী করিয়াছেন। ইহা সমীচীন হইয়াছে কি না, তাহা বিচার করিবার ভার সুধীগণের উপর দেওরা ব্যতীত আমার অন্য কি উপায় আছে ?

এই উপলক্ষে তিনি আর একটি উক্তি করিয়াছেন, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'আস্বাদিত' বলিলেই কি রচয়িতাকে অস্বীকার করা হয়?' উদাহরণ স্বরূপ তিনি চৈতন্যচরিতামৃত হইতে পয়ার উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন, 'অয়ি দীন দয়ার্দ্রনাথ' শ্লোকটি রাধারাণীর 'রচিত' এবং গৌরচন্দ্রের 'আস্বাদিত'! তিনি বলিতেছেন "'আশ্লিষ্য' শ্লোক ভগবানের, অয়ি দীন শ্লোক ভগবতীর। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী নির্ভয়ে গৌরচন্দ্রের দ্বারা ইহা আস্বাদন করিয়াছেন এবং তাহাতে রচয়িত্রীর কোন মানহানি হয় নাই।" এই উক্তির উপর ভাষ্য করা অনাবশ্যক। আমি শুধু বিনীত ভাবে বলিতে চাই যে এরূপ অদ্ভুত কথা কেহ কখনও শোনে নাই। রাধারাণীর রচিত শ্লোক পাওয়া গিয়াছে ইহা নূতন সংবাদ বটে! ভগবতী বলিতে রূঢ়িবৃত্তি দ্বারা দুর্গাকে বুঝায়, রাধারাণীকে বুঝায় তাহা জানিতাম না।

এইবার সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের আর দুই একটি উক্তি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিবেদন করিয়া শেষ করিব। (আমরা নিবেদন করিতেই অভ্যস্ত। সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের 'নিবেদন পাই' সাহিত্যে সম্ভবতঃ নূতন আমদানী। সুতরাং তাঁহার নিবেদন-প্রাপ্তির অনুকরণ করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত।) তিনি আমার প্রবন্ধে 'উচ্চ শি মহিলা' ব্যবহারে দোষ ধরিয়াছেন। একটু স্মরণ ক দিলেই সুপ্রবীণ সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের মনে পড়িবে যে ধারয় সমাসে পূর্ব্ব বিশেষণের পুংবদভাব হয়। যথা। হরিণী, পরমসুন্দরী, আরাধ্যদেবতা, অধীতবিদ্যা ইত্যাদি

সাহিত্যরত্ন মহাশয় কোন সুসমাচারের সহিত ব প্রবন্ধের ভাষার ঐক্য লক্ষ্য করিলেন (৩৬২ পৃঃ), ত বলিলে সংশোধনের উপায় কিরূপে হইবে? প্রমাণ ব কথা বলিলে তাহা সর্ব্বথা নিষ্ফল হয়।

পরিশেষে তিনি অভিমান করিয়া বলিতেছেন আলোচনায় আজকাল আর তেমন পয়সা পাওয়া যায় দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এ তাঁহার কত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছেন? আমরা ত বহুকাল শুনিয়া আসিতেছি যে, পদাবলীর আলোচনায় ব লাভবান হইয়াছেন। *

শ্রীরাধারমণ গো

শ্রদ্ধেয় বেদান্তভূষণ মহাশয়ের মূল প্রবন্ধে ক মুদ্রাকর প্রমাদ বর্তমান থাকায় তাঁহাকে অযথা নিন্দ প্রতিবাদ সহ্য করিতে হইয়াছে। সেজন্য আমরা অ দুঃখিত। দৈবক্রমে শ্রদ্ধেয় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের প্র প্রবন্ধও মুদ্রাকর প্রমাদ হইতে অব্যাহতি পায় নাই কারণ আশা করি বেদান্তভূষণ মহাশয় আমাদিগকে ব সহজে ক্ষমা করিতে পারিবেন।

প্রতিবাদ-প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর মূল লেখকের প্রতিবাদ করিবার অধিকার নিশ্চয়ই কিন্তু সেই প্রতিবাদের পুনঃ প্রতিবাদের রীতি সা প্রচলিত নাই। সুতরাং প্রতিবাদ হিসাবে বর্ত্তমান বাদানুবাদ এই প্রবন্ধেই শেষ। বিঃ সঃ

সুশান্ত সা'

তৃতীয় পর্ব্ব

শ্রী রুদরঞ্জন দাশগুপ্ত

২

অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও যখন সাবিত্রীর জ্ঞান হল না তখন জজ সাহেবের আদেশ সাবিত্রীকে সদর হাঁসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা হল। জজসাহেব নিজে জেলার বড় ডাক্তার সাহেবকে অনুরোধ করে চিঠি লিখে দিলেন যে সাবিত্রীর চিকিৎসা শুশ্রূষার যেন কোন ত্রুটী না হয়।

বিচার আবার সুরু হল। জজসাহেব তখন আমাকে এবং একে একে আলীমিঞা ও নফরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে সাক্ষী প্রমাণ শুনে আমাদের কিছু বলবার আছে কিনা। জজসাহেবের উত্তরে কি বলব না বলব, হরিশ আগেই আমাদের শিখিয়ে রেখেছিল। আমি বললাম "আমি নির্দ্দোষী; আর কিছু বলতে চাই না।" আলীমিঞা বললেন যে খুনের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগই নেই এবং খুনের জন্য তিনি একেবারেই দায়ী নন। বললেন যে তিনি পলতায় গিয়েছিলেন গন্টুকে সেখান থেকে যদি প্রয়োজন হয়ত একটু জোর দেখিয়ে নিয়ে আসবার জন্য, অন্য কোনও উদ্দেশ্যে নয়; এবং গন্টুকে নিয়ে আসবার সময় দাদার আক্রমণে গোলাপ মণ্ডলের সঙ্গে দাদার ধস্তাধ্বস্তিতে দাদা কি ভাবে খুন হয়েছেন গোলাপমণ্ডলই বলতে পারে—আলীমিঞা তা জানেন না, কেননা আলীমিঞা আগেই গন্টুকে নিয়ে নৌকায় এসে উঠেছিলেন; পিছন ফিরে, খুনের ব্যাপার তিনি দেখেনই নি কিছু। নফর শুধু "নির্দ্দোষী" ছাড়া আর কিছু বলে নি।

আমাদের কৈফয়ত শেষ হলে সরকারী উকিল, সরকার পক্ষের দিক দিয়ে মকোদ্দমাটি জুরীদের বোঝাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং প্রায় দুঘণ্টা কাল ধরে সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে নানান ভাবে আলোচনা করে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলেন যে এই মকোদ্দমাটীতে আমরা তিনজনেই যে দোষী সে বিষয় কোনও দিক দিয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। আমাদের পক্ষের কথা, আলীমিঞার কথা, বিদ্রূপ করে হেঁসে উড়িয়ে দিয়ে বললেন যে একটী শিশুকে স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় মার বুক থেকে ছিনিয়ে আনার জন্য রাত্রিকালে ৩।৪ জন গুণ্ডার সশস্ত্র অবস্থায় যাওয়ার যে কি প্রয়োজন, তাঁর ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তা তিনি ধারণাই করতে পারেন না। বললেন শুধু ছেলেকে আনাই যদি উদ্দেশ্য হত তাহলে দিনের বেলায় বাপ একজন চাকর নিয়ে গেলেই হত যথেষ্ট, কেননা বাপ ছেলেকে আনতে গেলে তার বিরুদ্ধে একমাত্র সন্তানের জননীর রোদন ছাড়া আর কারও কোনও প্রতিবাদ সম্ভবই হত না। আমি যে খুনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলাম, সে বিষয় জুরীদের জলের মত বুঝিয়ে দিলেন যে আমি এর মধ্যে না থাকলে আলীমিঞা বা ৩।৪ জন গুণ্ডার দাদাকে অযথা খুন করবার কোনও উদ্দেশ্যই থাকতে পারে না এবং সে ভরসাও তাদের হতনা কখনই এবং এই সম্পর্কে সাবিত্রীর সাক্ষ্য উল্লেখ করে বললেন যে সাবিত্রী সত্য কথাই বলেছে এবং সাবিত্রীর কথা যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে রাত্রিকালে অন্ধকারে ঘাটের পারে ৩।৪ জন গুণ্ডাকে চুপি চুপি টাকা দেওয়ার উদ্দেশ্য, নিজের সন্তানকে নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা—এত বড় অসম্ভব কথা কোনও পাগলকেও বিশ্বাস করতে বলা চলে না, তা সে টাকাটা সুশান্ত নিজে হাতে করেই দিক বা আলীমিঞাই হাতে করে দিন; এবং এদিক দিয়ে গোলাপ মণ্ডলকে অবিশ্বাস করার কোনও সঙ্গত কারণই নেই। তুষারের কথা তুলে বললেন যে তুষার সত্য সত্যই অভাগিনী; সম্ভ্রান্ত বংশের বড় ঘরের বধূ সে, অবস্থার বিপর্য্যয়ে তাকে স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে হয়েছে, খুনের

মকোদ্দমায়, প্রকাশ্য আদালতে। কিন্তু সে যে সত্য কথা বলেছে সে বিষয় তাকে দেখে কারো মনে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না কেননা এত বড় গল্প মিথ্যা করে বানিয়ে আগাগোড়া বলা—একি তার মত অশিক্ষিত বাঙ্গালী ঘরের কোনও মেয়ের পক্ষে সম্ভব, জুরীরাও ত বাঙ্গালী, তাঁরাও ত স্ত্রী কন্যা মাতা নিয়ে ঘর সংসার করেন, তাঁরাই বিবেচনা করে দেখুন। সত্য কথা বলেছে সে, সরকারী উকিল জোর গলায় বললেন, কেননা সত্য তার পক্ষে নিদারুণ, সত্য তার পক্ষে মর্ম্মান্তিক, সত্যকে চাপা দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব, তার পক্ষে সাধ্যাতীত। বক্তৃতার শেষের দিকে জুরীদের স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁদের কর্ত্তব্য, সমাজের দিক দিয়ে, মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে, ন্যায় ধর্ম্মের দিক দিয়ে। বুঝিয়ে দিলেন—বিচারাসনে বসেছেন তাঁরা—তাঁদের একমাত্র কর্ত্তব্য বিচারই করা, তা সে বিচার যতই কঠোর হোক, যতই কঠিন হোক।

সরকারী উকিলের বক্তব্য শেষ হলে আমাদের ব্যারিষ্টার উঠে দাঁড়ালেন।

প্রথমেই জুরীদের বললেন যে ন্যায় ধর্ম্মের দিক দিয়ে মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে তিনিও বিচারই চান—তবে সুবিচার, অবিচার নয়। বিচারের কতগুলি আইনসঙ্গত পদ্ধতি জুরীদের বুঝিয়ে দিয়ে বললেন যে বিচারের নামে কত নির্দ্দোষী লোক বারে বারে শাস্তি পেয়েছে এমন কি ফাঁসী পর্য্যন্ত হয়েছে, জগতের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্তের ত অভাব নেই। বিলাতে জুরীদের বিচারে খুনের অপরাধে একটি সুন্দরী তরুণী মেয়ের কেমন করে ফাঁসী হয়েছিল এবং পরে কি ভাবে প্রকাশ হল যে মেয়েটি ছিল সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী—এই গল্পটী সুন্দর ভাবে মনোরম ভাষায় জুরীদের বুঝিয়ে দিয়ে বললেন যে ফৌজদারী বিচারে আসামীদের দোষ সম্বন্ধে এতটুকুও সন্দেহ যদি জুরীদের প্রাণে উপস্থিত হয় তা হলে তাঁরা আসামীদের নির্দ্দোষী বলতে বাধ্য। এবং এই প্রসঙ্গে বারে বারে মনে রাখতে বললেন ফৌজদারী আইনের সেই সনাতন বাণীটি—প্রমাণ অভাবে দশটা দোষী লোক যদি মুক্তি পায় ত পাক্ কিন্তু ভুল বিচারে একটা নির্দ্দোষী লোকেরও যেন শাস্তি না হয়।

মকোদ্দমাটীর সাক্ষী প্রমাণের বিষয় নানান দিক দিয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল ধরে নানান ভাবে আলোচনা করে আমাদের ব্যারিষ্টার প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলেন যে এ মকোদ্দমাটীতে আমাদের কারো বিরুদ্ধেই দোষ প্রমাণিত হয়নি। গোলাপ মণ্ডলের কথা যে একেবারেই বিশ্বাস করা চলে না, নানান দিক দিয়ে, তার কথা নিয়ে আলোচনা করে, নানান যুক্তি তর্কের অবতারণা করে, জুরীদের দিলেন বুঝিয়ে। বললেন, একটা বড় কথা, একটা অতি সহজ কথা জুরীরা যেন ভুলে না যান যে খুনের উদ্দেশ্যে মানুষ মানুষকে এ ভাবে খুন করে না, খুনের উদ্দেশ্যে খুন হয় গোপনে, যথাসম্ভব সব দিকের সমস্ত প্রমাণ বাঁচিয়ে। বললেন, যদি দাদাকে খুন করাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল তাহলে এ ভাবে স্পষ্টাস্পষ্টি ছেলে আনতে গিয়ে দাদাকে কখনই খুন করা হত না, কেননা সেক্ষেত্রে এ খুনের জন্য যে আমরাই দায়ী হব এ কথা ত নেহাৎ মূর্খও বুঝতে পারে—আমি কিম্বা আলীমিঞা কি সেটুকুও বুঝতে পারিনি? কাজেই এ খুন সবদিক বিবেচনা করে ষড়যন্ত্রের ফলে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে হয়নি, এ খুন হয়েছে হঠাৎ একটা দৈব দুর্ঘটনার মত, বিনা কারণে কোনও একটা সাময়িক উত্তেজনার ফলে এবং তা যদি হয়, আমাদের ব্যারিষ্টার জুরীদের বেশ সহজ ভাবেই বুঝিয়ে দিলেন, তাহলে সরকার পক্ষের কথা, অর্থাৎ গোলাপ মণ্ডলের গল্পটী কখনই সত্য নয়, হতে পারেনা—একটা মিথ্যা বানান গল্প, সুশান্তকে বিপদে ফেলার জন্যই এ মকোদ্দমার উপযোগী করে তৈরী করা হয়েছে এবং এ দিক দিয়ে দেখতে গেলে আসামীদের পক্ষের কথাগুলিই যে সত্য সে বিষয় সন্দেহ করবার কোনও কারণ নাই।

এত বড় মিথ্যা গল্প আমার বিরুদ্ধে কে বানিয়েছে, কেন বানিয়েছে এই প্রসঙ্গে তুষারবালার সাক্ষ্য নিয়ে তীব্র সমালোচনা সুরু করলেন আমাদের ব্যারিষ্টার। তার জেরার প্রত্যেক কথাটী ধরে ধরে আলোচনা করে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলেন যে এ রকম অনর্গল মিথ্যাকথা খুনের মকোদ্দমায় এতটুকু ইতঃস্তত না করে যে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে অনায়াসে বলে যেতে পারে, তার তুলনা জগতের মেয়েদের সমাজেই অত্যন্ত বিরল—আমাদের বাঙ্গালী ঘরের মেয়েদের

কথা এক্ষেত্রে ওঠেই না। তুষারবালার মত মেয়ের সঙ্গে, আমাদের ব্যারিষ্টার বললেন, জুরীদের বাড়ীর মেয়েদের তুলনা করে সরকার পক্ষের উকিল জুরীদের বাড়ীর "মা লক্ষ্মীদের" অপমানই করেছেন, সম্মান দেখান নি। সংসারের পক্ষে সমাজের পক্ষে এরকম স্ত্রীলোক মূর্ত্তিমতী 'অভিশাপ' এবং এরকম 'অভিশাপ' ভগবান করুন জুরীদের বাড়ীতে যেন কখনও না আসে, সরকারী উকিলের কথার প্রতিবাদে, আমাদের ব্যারিষ্টার তাঁর মনের এই একান্ত শুভকামনাটীও জুরীদের দিলেন জানিয়ে। শুধু তাই নয়, এই প্রসঙ্গেই জুরীদের বুঝিয়ে দিলেন যে তুষারের মত স্ত্রীলোকের কাছ থেকে তার সন্তানকে ছিনিয়ে আনা—এই কার্য্যটী সরকারী উকিল যতটা সহজ মনে করেন ঠিক ততটা সহজ নয়; কেননা রোদনসম্বল বাঙালী ঘরের মেয়ের সঙ্গে তুষারের কোনও দিক দিয়েই ঠিক তুলনা করা চলে না। এবং সঙ্গে সঙ্গে জুরীদের এটাও বুঝিয়ে দিলেন যে তুষারের মতন মাতার কাছ থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে আনার মধ্যে একমাত্র সন্তানের শুভকামনা ছাড়া আমার আর কোনও উদ্দেশ্য বা স্বার্থ ছিলনা বা থাকতে পারেও না, যতই পাষণ্ড আমাকে সরকারী উকিল মনে করুন না কেন। তারপর সন্তানকে জোর করে কেড়ে আনা ও আমার সঙ্গে নিদারুণ মনোমালিন্যের দরুন, আমারই রূপবতী স্ত্রী ও আমারই চিরদিনের শত্রু মুকুন্দর একসঙ্গে যোগাযোগে, কি উদ্দেশ্যে, এই মিথ্যা খুনের ষড়যন্ত্রে গল্পটী তৈরী হল, কেমন করে তাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত করা হল একটা মিথ্যা কুৎসিত সন্দেহের কথা সৃষ্টি করে—জুরীদের জলের মত বিস্তারিত বুঝিয়ে দিলেন আমাদের ব্যারিষ্টার।

এই প্রসঙ্গেই সাবিত্রীর সাক্ষী নিয়ে আলোচনা করে বললেন যে সাবিত্রীর কথা জুরীরা বিশ্বাস করুন বা নাই করুন আমার পক্ষ থেকে এ মকোদ্দমায় তাতে বিশেষ কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সাবিত্রীর কথা যদি জুরীরা অবিশ্বাস করেন এবং আমাদের ব্যারিষ্টার নানা রকম যুক্তির অবতারণা করে দেখালেন যে সাবিত্রীর কথা অবিশ্বাস করাই সমীচিন তাহলে ত আমার বিরুদ্ধে এ মকোদ্দমায় কোনও পদার্থই থাকে না; অপর পক্ষে সাবিত্রীর কথা যদি জুরীরা বিশ্বাসও করেন তাহলেও খুনের ষড়যন্ত্রের সন্তোষজনক প্রমাণ কি ঐ একটী কথার মধ্যেই নিঃসন্দেহে পাওয়া যায়? টাকাটা দেওয়া হয়েছিল, আমাদের ব্যারিষ্টার বললেন, ঠিক সন্ধ্যার সময়, প্রকাশ্য জায়গায়, গোপনেও নয়, গভীর রাত্রেও নয় এবং টাকাটা যে কেন দেওয়া হয়েছিল, তার কোনও প্রমাণ সাবিত্রীর কথার মধ্যে একেবারেই নাই। টাকাটা যদি দেওয়া হয়ে থাকে ত দেওয়া হয়েছিল নিশ্চয়ই অন্য কোনও কারণে এবং যে কারণেই দেওয়া হোক খুনের উদ্দেশ্যে যে দেওয়া হয়নি এটা নিশ্চিত, কেননা যদি খুনের উদ্দেশ্যে টাকাটা দেওয়া হত তাহলে টাকাটা দেওয়া হত গোপনে চুপি চুপি, সাবিত্রীকে জানিয়ে কথাবার্ত্তা বলে প্রকাশ্যে টাকাটা দেওয়ার ত কোনই প্রয়োজন ছিল না, কারণ, আমাদের ব্যারিষ্টার জুরীদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন, সাবিত্রী যে খুনের ষড়যন্ত্রে ছিলনা, সেটা ত সর্ব্ববাদীসম্মত, এবং সেটা আদালতে তার কথা শুনে কারোরই অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নাই। অপর পক্ষে, আমাদের ব্যারিষ্টার জোর গলায় বললেন, সাবিত্রীর সঙ্গে সুশান্তর যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা সরকার পক্ষ বলেন সেটা যদি সত্য হত, তাহলে কি সাবিত্রীর, জগতে তার একমাত্র আশ্রয়, তার প্রাণের একমাত্র অবলম্বন সুশান্ত—তারই বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আদালতে, সমস্ত পরিণাম উপলব্ধি করে, ওরকম সাক্ষী দেওয়া—এ কি কোনও মেয়ের পক্ষে সম্ভব? সত্য কথা বলারও ত একটা সীমা আছে? বললেন, সাবিত্রী আদালতে এসে শুধু এইটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দিয়ে গেল যে তাকে নিয়ে সরকার পক্ষের গল্পটী বানানো, মিথ্যা—সাবিত্রীর কথার মধ্যে আর কিছুই প্রমাণ হল না।

আমাদের ব্যারিষ্টারের বক্তৃতা শেষ হতে হতে প্রায় ৫॥ টা বাজল এবং সেদিনকার মত বিচার বন্ধ করে জজসাহেব উঠে গেলেন চলে। তাঁর বক্তৃতার শেষের দিকটায় জুরীদের প্রতি একটা তীব্র প্রাণস্পর্শী আবেদন সত্যই আমাকে বিশেষ অভিভূত করেছিল—আমি আজও ভুলিনি। বলেছিলেন তিনি, "মানুষের মনের নিভৃত গহন তলের ব্যথা অনুভূতির খবর জগতে কেই বা রাখে? কতখানি মর্ম্মবেদনায় কতখানি নিরুপায় অবস্থায় মানুষ নিজেরই

সন্তানকে নিজেরই স্ত্রীর কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে আনতে বাধ্য হয়, সেই সন্তানেরই মঙ্গলের জন্য তাকে মাতৃহারা করে, আর সেই আকুল বেদনার সমস্ত শেল তুলে নেয় নিজেরই বুকে, সেটুকু বোঝবার মত সহানুভূতি, দরদ, তাই বা জগতে আছে ক'জনার? প্রত্যেক পদক্ষেপে প্রত্যেক কথায় মানুষ মানুষকে ভুল বোঝে ভুল বিচার করে, ভুলে যায় আমার পক্ষে যা স্বাভাবিক, যা সহজ অবস্থার বিপর্য্যয়ে আমারই পাশের মানুষটার পক্ষে সেইটেই হয়ে ওঠে অস্বাভাবিক, সেইটেই আর সহজ নয়। তাই ত বলি মানুষের বিচার—সে ত কখনই শেষ বিচার নয়। সে বিচার, সুবিচার না অবিচার, তারও একদিন বোঝাপড়া হবে—নিশ্চয়ই হবে—সেই আমাদের শেষ বিচারকের শ্রীচরণে।"

* * * *

পরেরদিন আবার বিচার সুরু হল ১১টায়, সেইদিনই বিচারের শেষ দিন। সাবিত্রী কেমন আছে কে জানে—সকাল থেকেই মনটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল, একটা নিরাসক্ত অবসন্ন মনোভাব। জেল থেকে আদালতে এসে হরিশ আসামাত্র তাকে সাবিত্রীর খবর জিজ্ঞাসা করেছিলাম—সে কিছুই জানে না।

জজসাহেব এলেন; তিনি সমস্ত সাক্ষী প্রমাণ বিশ্লেষণ করে, নিজের মতামত দিয়ে জুরীদের বিস্তারিত বুঝিয়ে দেবেন—এ মকোদ্দমায় সেইটুকুই এখন বাকী।—তার পরই জুরীরা দেবে "রায়"—দোষী কি নির্দ্দোষী।

তিনি এলেন, বসলেন নিজের আসনে গম্ভীরমুখে, হরিশ ও সরকারী উকিলকে ডেকে বললেন, "জেলার ডাক্তার সাহেব আমাকে খবর পাঠিয়েছেন সাবিত্রী আজ সকালে মারা গেছে—হাঁসপাতালেই। অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনায় মস্তিষ্কের শিরা ছিঁড়ে গিয়েই সে আদালতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। আর তার জ্ঞান হয়নি। এখন তার সৎকারের কি ব্যবস্থা হবে ডাক্তার সাহেব জানতে চেয়েছেন।"

হঠাৎ চীৎকার করে উঠলাম "হরিশ! ভাই! তুমি যাও। যথাবিহিত তার সৎকারের ব্যবস্থা কর। তার আর কেউ নেই জগতে।"

জজসাহেব তৎক্ষণাৎ হরিশকে অনুমতি দিলেন—হরিশ আদালত ছেড়ে গেল চলে। সাবিত্রী নাই—আর সে ইহজগতে নাই!

* * *

আচ্ছন্নের মত বসেছিলাম, আসামীর কাঠগড়ার মধ্যে—কতক্ষণ কে জানে? একটা কথা অনবরত বুকের মধ্যে বারে বারে আছাড় খেয়ে মরছিল—"হাত ধরনা শাস্তদা! না ধরলে কি পারি।" সামান্য পল্লীপথের একটা বাঁশের সাঁকো পেরুতে বহুকাল আগে সে একদিন আমার হাত ধরতে চেয়েছিল, আর আজ ইহকাল পরকালের সেতু কেমন করে সে হল পার!

হঠাৎ হুঁস হল। দেখলাম প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় কেটে গিয়ে জজসাহেবের কথা শেষ হয়েছে। জুরীরা উঠে দাঁড়িয়েছেন—রায় দেবার পূর্ব্বে পাশের একটা ঘরে গিয়ে নিজেদের মতামত একবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নেবার জন্য। চেয়ে দেখলাম—ধীরে ধীরে চোখের জলে কখন যে আমার জামার খানিকটা একেবারে ভিজে গেছে, নিজেই টের পাইনি।

প্রায় একঘণ্টা পরে জুরীরা এলেন ফিরে। এক বাক্যে রায় দিলেন। সমস্ত আদালতে চাপা চাঞ্চল্যের মধ্যে পরিষ্কার শোনা গেল—সকলেই দোষী।

জজসাহেব জুরীদের মত গ্রহণ করে—আমাদের শাস্তি দিলেন। নফর ও আলীমিঞার প্রতি হুকুম হল—ফাঁসী। হুকুমের সময় আলীমিঞা জোর করে একবার আমার ডান হাতখানা চেপে ধরেছিলেন—আজও ভুলিনি।

আমার প্রতি আদেশ হল—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। ফাঁসী না দিয়ে দ্বীপান্তরের হুকুম দেওয়ার কারণ জজসাহেব আমাকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন যে সাবিত্রীকে দেখে, তার কথা শুনে এবং বিশেষ করে জেরার সাবিত্রীকে অযথা অপমানের হাত থেকে বাঁচানর দরুন, যদিও অবস্থার বিপর্য্যয়ে আমি খুনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলাম তবুও ফাঁসী হওয়ার মতন সত্যিকারের পাষণ্ড আমি নই বলেই জজসাহেবের বিশ্বাস হয়েছে।

জজসাহেবকে অশেষ ধন্যবাদ!

* * *

আমার কথা শেষ হল। সুদূর দ্বীপান্তরে বসে, অক্লান্ত পরিশ্রমে লেখা এই যে আমার জীবনের কাহিনী—কেন লিখলাম? জগতে কেউ আমার এ কাহিনী কখনও পড়বে কিনা জানি না—কিন্তু গন্থু? সেও কি কোনও দিন পড়বে না?

ভগবান তার কল্যাণ করুন! ইতি—।

পরিশিষ্ট

সুশান্তর লেখা আত্মজীবনী আর পাওয়া যায় না। সুদূর দ্বীপান্তরে বসে জীবনের বিস্তারিত কাহিনী লিখে সে হরিশকে পাঠায়—সেও বহুদিন আগেকার কথা। তারপর হরিশ, তার বিচারের বছর ১৫ পরে তার মুক্তি লাভের সময় তার অনেক সন্ধান করেছিল কিন্তু তার কোনও সন্ধানই পাওয়া যায় নি।

* * * *

তবে, বিচারের প্রায় বিশ বছর পরে একদিন শরতের অপরাহ্নে মাধবপুরের 'রতনসা'র বাড়ীর বাইরের পুকুরের পুবের পাড়ের বাঁধাঘাটের নিকটেই একটী গাছতলায় একটী বৃদ্ধ ভগ্নদেহ লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল—দীর্ঘ শুভ্র দাড়ি গোঁপ ও চুলে মুখখানি প্রায় সমস্তই আবৃত, পরিধানে মলিন ছিন্ন বসন। লোকটী সেইখানে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়েছিল উত্তরের পাড়ের বাঁধাঘাটের দিকে। উত্তরের পাড়ের বাঁধা ঘাটের উপর লেবু গাছ তলায় বসেছিল 'রতনসা'র বংশের একমাত্র প্রতিনিধি, শ্রীগগনচন্দ্র সাহা চৌধুরী—ওরফে মাধবপুরের বঁড় তরফের গন্থুবাবু। সে এখন যুবক—সুন্দর সুশ্রী সবল তার দেহ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তার বসন ভূষণ।

লোকটি একদৃষ্টে চেয়েছিল, এমন সময় অন্দর হতে বেরিয়ে এলেন গন্থুবাবুর মাতা শ্রীমতী তুষারবালা—হাতে তার বড় একটা রূপার গেলাসে এক গেলাস সরবত। এলেন তিনি ঘাটের পারে, বসলেন একমাত্র সন্তানেরই পাশে, তুলে দিলেন সন্তানেরই হাতে সরবতের গেলাসটী।

লোকটি অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে তাকিয়েছিল গন্থুবাবু তা লক্ষ্য করেছিলেন কি না জানি না। সহসা তিনি চাইলেন লোকটীর প্রতি—চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। কি তাঁর মনে হল তিনিই জানেন, একটা চাকরকে ডেকে রুক্ষস্বরে বললেন "লোকটা বোধ হয় পাগল, একদৃষ্টে এদিকে ও রকম চেয়ে আছে কেন? ওকে তাড়িয়ে দাও এখান থেকে।"

গন্থুবাবুর কথাগুলি লোকটীর কাণে পৌচেছিল কি না জানিনা। লোকটী কিন্তু তৎক্ষণাৎ মাথা নীচু করে ধীর পদক্ষেপে সে স্থান ত্যাগ করে গেল চলে।

* * * *

লোকটীকে আবার একবার দেখা গিয়েছিল সেইদিনই সন্ধ্যার পরে। শুক্লা একাদশী, তাই উজ্জল চাঁদের আলোয় সমস্ত মাধবপুর গ্রামখানি, বেগবতী নদীর এপার ওপার সমস্তই এক মায়া মন্ত্রে মুখরিত হয়ে উঠেছিল সেদিন সন্ধ্যার পরে। লোকটীকে দেখা গিয়েছিল—চুপ করে বসে আছে নদীর কিনারায় "মন্টি বোঠানের" চিতার শিবমন্দিরের পাশে, একদৃষ্টে চেয়ে আছে নদীর ও পারের দিকে, সম্মুখেই তার বহুদিন আগেকার সেই নুয়ে পড়া বাঁশ ঝাড়।

* * *

আর একবার লোকটীকে দেখা গিয়েছিল সেই দিনই গভীর রাত্রে, সাবিত্রীদের বাড়ীর সম্মুখের গ্রাম্য পথের উপরে চুপ করে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়েছিল ধ্বসে ভেঙ্গে পড়া আগাছায় জঙ্গলাকীর্ণ সাবিত্রীদেরই বাড়ীর পানে। গভীর রাত্রি, নিস্তব্ধ পৃথিবী ঘুমন্ত, আকাশে নিদ্রাহারা শুক্লা একাদশীর চাঁদ—তখন মেঘে ঢাকা। মেঘলা চাঁদের আলোর একটা ম্লান ছায়ায় মাধবপুর গ্রামখানি, তার আশে পাশের ঝোপ ঝাড় মাঠ, দূরে জলাভূমির উপর দীর্ঘ বড় বড় তাল গাছ—সবই যেন ইহকাল পরকাল নিয়ে একটা ভয়াবহ অচেনা মায়ায় কেমন অবাস্তব হয়ে উঠেছিল সেই দিন গভীর রাত্রে। লোকটী চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, শুনতে কি পেয়েছিল সেই বহুদিন আগেকার হারিয়ে যাওয়া একটা অশরীরি বাণী—"শান্তদা! আসতে এত দেরী করলে কেন?"—

* * *

লোকটীকে আর কেউ কখনও দেখে নি।

এই কি 'সুশান্ত সা'?

সমাপ্ত
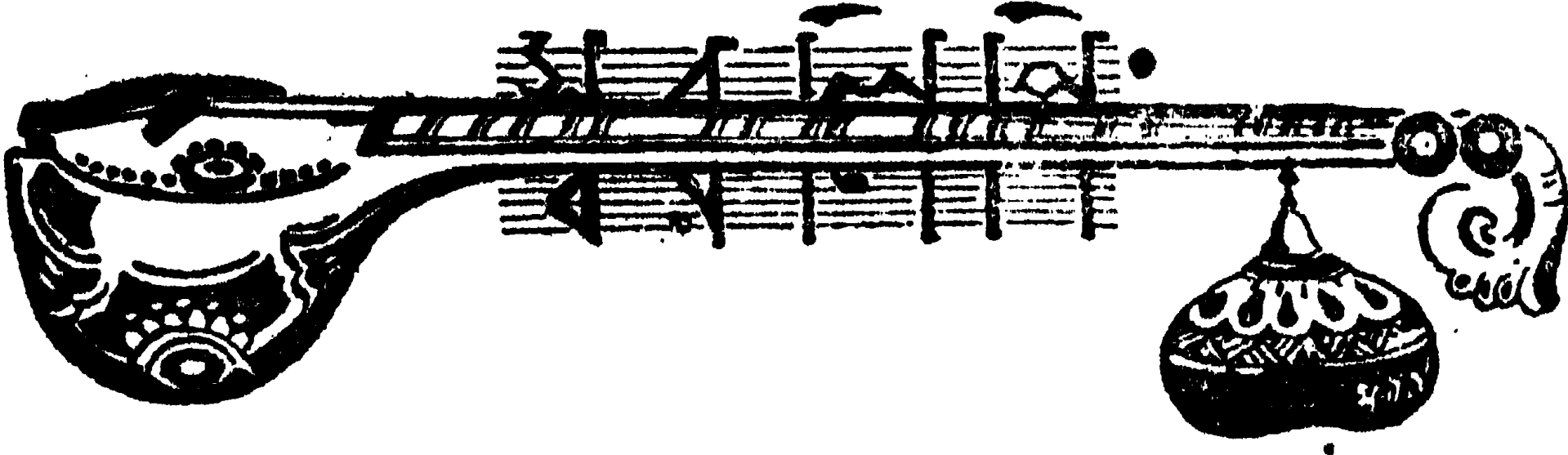
বাউল

ওরে পাগল, স্রোতের টানে বেড়াস কেন ভেসে ভেসে ?
যেখানে তোর আপন ঘাটি, সেইখানেতে দেখ না এসে।
সেখানে তোর আঁধার তলে
লক্ষ হাজার মাণিক জ্বলে,
সেখানে তোর আপন জনে বুক ভ'রে নে ভালোবেসে।

ভবের হাটে কেনাবেচায় যায় যদি তোর যাক না সবই
হাল ছেড়ে তুই থাক্ না ব'সে সেই চরণে শরণ লভি'।
ভয় কিরে তোর ঝড়তুফানে ?
একথা তুই জানিস প্রাণে—
দুখের রাতি কাটবে রে তোর আলোর কমল ফুটবে শেষে।

কথা—শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায়

০ ১ + ৩
II র্সা নর্র্সা র্সা | পা পর্সণা পা I মপা রা মা | ধা পা -া I
ও রে ০ | পা গ ল স্রো ০তে র | টা নে ০

০ ১ + ৩
মগা পমা গমা | জ্ঞা রা জ্ঞা I সরা মপা ধণা | মপা র্র্সা নর্সা I
বে ড়া ০স | কে ন ০ ভে সে ০ | ভে সে ০

র্সা নর্সা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্সর্রা র্সনা I র্সর্রা র্সধা র্সা | ণা ধা -া I
যে খা ০ | নে তো ০র আ প ন | ঘা টি ০

পা ধা ণা | মা পা ধা I গা মপা গমা | জ্ঞা রা -া I
সে ই খা | নে তে ০ দে ০খ্ না | এ সে ০

সরা মপা ধণা | র্সর্রা র্মর্জ্ঞা র্র্জ্ঞা I র্র্সা -া -া | -া র্সনা র্সা I
তো ০ ০ | লা ০ ০ মন্ ০ ০ | ০ ক থা

র্র্সা ণধা পমা | ণধা পমা জ্ঞরা I জ্ঞসা -া -া | -া -া -া II
শো ০ ০ | ০ ০ ০ ০ন্ ০ ০ | ০ ০ ০

{ র্সনা র্ঋর্সা নর্সা | ণধা র্সণা ধণা I ধপা ধা পধা | পমা পা ক্ষপা I
সে খা ০ | নে তো র আঁ ধা র | ত লে ০

মগা -া পমা | জ্ঞরা মজ্ঞা -া I রসা রা জ্ঞরা | সন্‌া সা -া I
ল ০ ক্ষ | হা জা র মা ণি ক | জ্ব লে ০

(সা মরা মা | পা না র্সা I না র্রর্সা র্রা | র্ণর্রা র্গা র্রর্সণা I
জ্ব ০ ০ | লে ০ ০ জ্ব ০ ০ | লে ০ ০

নর্সা পধা ণা | মজ্ঞা মরা জ্ঞা I সা -া -া | সা র্রা র্সা) } I
জ্ব ০ ০ | লে ০ ০ মন্‌ ০ ০ | ও ০ রে

সা রা -া | গা মা -া I পা ধা -া | না র্সা -া I
সে খা ০ | নে তো র আ প ন | জ নে ০

র্রা র্গা র্রর্গর্পর্মা | র্গা র্রর্সা না I র্সনা পনা পনা | র্রা নর্রর্সা র্সা I
বু ক ভ' | রে নে ০ ভা লো ০ | বে সে ০

(গেয়ে "ভোলা মন কথা শোন্‌" যেভাবে উপরে স্বরলিপি দেওয়া হয়েছে সেভাবে গেয়ে প্রথম লাইনের ধুয়া গেয়)

{ না নর্রা র্সনা | ধনা পধপা ধা I গা পা ধা | না পধা নর্সা I
ত বে ০ | র হা টে কে না ০ | বে চা য়

নর্সা র্রা র্রা | র্ঋা র্রা র্জ্ঞা I র্রর্ঋা র্রা না | র্সা ন্মা -া I
যা র য | দি তো র যা ক না | স বি ০

না র্গা র্রা | র্সা না র্সা I ধা র্রা র্সা | না ধপা -া I
ছা ল ছে | ড়ে তু ই থা ক্‌ না | ব' সে ০

গা মা পা | ধা ণা ধপা I পধা পগা পা | মা গা -া I
লে ই চ | র ণে ০ শ র ণ | ল ভি ০

(মা সা গা | গমা ণধা ননা I র্সা -া -া | -া র্সনা র্সা I
ভো ০ ০ | লা ০ ০ মন্ ০ ০ | ০ ক থা

গর্রা র্সণা ধপা | মজ্ঞা রসা রজ্ঞা I সা -া -া | -া -া -া) } I
শো ০ ০ | ০ ০ ০ ন্ ০ ০ | ০ ০ ০

সা -া মা | রা পা -া I গা ধা ধা | পা নধা না I
ভ য় কি | রে তো র ঝ ড় তু | ফা নে ০

পা পধা নর্সা | র্সা র্সা ধা I ধা ধনা র্সর্রা | র্গা র্রর্সা র্রর্সা I
এ ক ০ | থা তু ই জা নি ০স্ | প্রা ণে ০

র্সা র্সর্রা র্গর্মা | র্গা র্রর্গা র্রর্সা I র্রর্গা র্পর্মা র্রর্গা | র্রর্সা না -া I
দু খে র | রা তি ০ কা ০ট্ বে | রে তো র

পা না -া | পা না র্রা I র্সা ণা পা | মা গা -া I
আ লো র | ক ম ল ফু ট বে | শে ষে ০

(গেয়ে দুলাইন ওপরে 'ভোলা মন কথা শোন্' যেভাবে গাওয়া হয়েছে সেই ভাবে গেয়ে প্রথম লাইনের ধুয়া গেয় II তারপরে

নর্সা র্রর্গা র্মর্গা | র্রর্গা র্সর্গা র্রর্গা I র্সা -া -া | র্গর্রা র্সনা র্সা I
দে ০ ০ | শে ০ ০ ০ ০ ০ | দে ০ শে

নর্সা র্রজ্ঞা র্রর্সা | নর্সা নর্রা র্সণা I ধা -া -া | র্সণা ধপা ধা I
দে ০ ০ | শে ০ ০ ০ ০ ০ | দে ০ শে

গমা পধা ণধা | পধা মধা পমা I গা -া -া | গমা পদা পা I
দে ০ ০ | শে ০ ০ ০ ০ ০ | দে ০ শে

পর্সা ণদা পমা | ণদা পমা জ্ঞরা I সা -া -া | সা র্রা র্সা II
দে ০ ০ | শে ০ ০ ০ ০ ০ | দে ০ শে

প্রেতদের গান

শ্রীসুনীলরঞ্জন ঘোষ এম্-এ

আমরা থাকি পাতাল-তলে বৈতরণীর আরেক পারে
জীবন কাটাই নরক পুরীর দিবসবিহীন অন্ধকারে।
রক্ত নদীর ফেনিল জলে
আমরা ডুবি গাহন ছলে,
মদের নেশায় মাতাল হ'য়ে মাদল বাজাই মড়ার হাড়ে,—
বৈতরণীর আরেক পারে!

আর্দ্র ক্লেদের গন্ধ-ভরা নিকষ-কালো আকাশ-তলে
আমরা গাহি আর্ত্তনাদে অর্থবিহীন গানের ছলে।
অগ্নি-তরল লৌহ-পাতে
নৃত্য করি নিত্য রাতে,
অঙ্গ সাজাই ভস্ম-ভূষায় কঙ্কালেরি অলঙ্কারে,—
বৈতরণীর আরেক পারে!

আমরা ঘুরি কবর মাঝে শবের পচা মাংস লাগি';
মড়ার কালো রক্তে মোরা তৃষ্ণা মিটাই রাত্রি জাগি'।
তন্দ্রা-ভরা আবছা চোখে
অন্ধকারে হঠাৎ শোকে,
আমরা কাঁদি হাসির ঝোঁকে সদ্য চিতায়, শ্মশান ধারে,—
বৈতরণীর আরেক পারে!

মৃত্যু দূতের আজ্ঞা বহি' আমরা যমের অযুত সেনা
মিটিয়ে কবে এলেম জানি আর জীবনের সকল দেনা।
আজ্‌কে মোরা রুদ্র-রূপে
ভয়ঙ্করের আঁধার স্তূপে
আপনি খুলি আপন কপাল প্রদীপ জ্বালাই বুকের ধারে,—
বৈতরণীর আরেক পারে।

উর্দ্ধে মোদের পৃথ্বী জাগে জমাট মাটির সীমার শেষে,
ঐত তারি কলধ্বনি আলগা হাওয়ায় যায় যে ভেসে!
সেথায় মানুষ আলোর কোলে
বসন্তেরি স্বপ্নে দোলে;
আমরা হেথায় বিস্মরণের মন্ত্র জপি নরক-দ্বারে,—
বৈতরণীর আরেক পারে!

———

মরুর তৃষা

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত এম্-এ

খোলা জানলা দিয়ে ঘরের ভিতর প্রচুর রৌদ্র এসে পড়েছে। সুলতা জানলার পাশে বসে খোকার জামা সেলাই করছে একমনে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় তার কাণের পাশের পাতলা চুলগুলি বারংবার মুখের উপর পড়ছে।

অদূরে, ঠিক তার সামনে, বাগানের ভিতর পাথরে তৈরী এক নগ্ন নারীমূর্ত্তি। নারীর দেহে আত্মদানের অপরূপ ভঙ্গিমা—হাতদুটি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত, বক্ষোদেশ কঠিন, ক্ষীণ কামনালস তনু পিছন দিকে ঈষৎ হেলানো।

সেলাই করতে করতে সুলতার মনে অনেক কথা জাগে। নিজের জীবনের ব্যর্থতা অন্তরকে তার ব্যাকুল করে তোলে। মনে পড়ে কত দীর্ঘ রাত্রি কেটেছে তার জেগে—নিদ্রামগ্ন স্বামীর পানে চেয়ে হতাশ বেদনায় প্রাণ তার গুমরে উঠেছে—ঘুমন্ত খোকার মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দই তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে···ভুলিয়ে দিয়েছে তার দুঃখময় ক্লান্তি। ···খোকার কথা ভাবতেই ঠোঁটে তার ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে ওঠে।

তারপর হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ে বাগানের ঐ নগ্ন নারী-মূর্ত্তির উপর—মুখ তার নিমেষে পাণ্ডুর হয়ে আসে। প্রাণের পূর্ণতা সে রূপায়িত দেখে ঐ মর্ম্মর মূর্ত্তির মধ্যে···সুলতা অস্বস্তি বোধ করে। বাগানের চারিধারেই ঐ প্রাণপ্রাচুর্য্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত—পুষ্পিত বৃক্ষলতায়, পাখীর গানে, মধুপের গুঞ্জনে, সূর্য্যকিরণের অপরূপ বর্ণচ্ছটায় জীবনের ঐ উচ্ছল আনন্দ বিকসিত।······

সুলতা কেমন যেন অস্থির হয়ে ওঠে। মনে হয় খোকাকে কাছে পেলে নিজেকে সে সামলে নিতে পারবে—জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকে, "খোকা! খোকা!"

পাথরের ঐ মূর্ত্তির মধ্যে যে আবেগ সে প্রত্যক্ষ করেছে সেই আবেগই যেন তার অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছে! সুলতা নিজেকে সংযত করতে পারে না, প্রায় চীৎকার করেই ডাকে, "খোকা! খোকা!"

কিন্তু খোকার সাড়া নেই। খোকাকে যদি সে কাছে পায় এখন, তাহলে হয়ত এই অন্তরের বেগ দমন করতে পারে।

খোকা—তার আদরের খোকা! খোকার নরম গাল দুটিতে চুমো দিয়ে সে তাকে বুকে চেপে ধরবে। খোকার কথা ছাড়া আর কিছুই ভাববে না সে। কিন্তু খোকা কৈ! মন যে তার ক্রমেই অশান্ত হয়ে উঠছে—ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার দুর্দ্দমনীয় বেগ সে যে আর সামলাতে পারছে না!······ আবার সে ঐ কামনাতুর নারীর মূর্ত্তির দিকে তাকায়—দুজনের হৃদয়াবেগের সাদৃশ্য উপলব্ধি করে হঠাৎ তার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে।

খোকার জন্য সে এবার ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে ওঠে। অন্তরে তার যে আদিম নারী সুপ্ত হয়েছিল হঠাৎ সে যেন জেগে উঠেছে কোন্ যাদুদণ্ড স্পর্শে!

খানিক পরেই নিজেকে সে সাম্‌লে নেয়। তার চোখের পানে চেয়ে মনে হয়, মনে তার দৃঢ়তা এসেছে। সে ভাবতে চেষ্টা করে, এসব কিছু নয়—শুধু মনের দুর্ব্বলতা।

আবার সে সেলায়ের কাজে মন দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু তার হঠাৎ মনে হয় এ কাজ সে যেন করছে শুধু কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায়, এর অন্তরালে ভালবাসার টান নেই এতটুকু। ···সত্যি আজ যেন কী তাকে পেয়ে বসেছে—সে যেন মন্ত্রাবিষ্ট! নইলে এসব অদ্ভুত চিন্তা মনে জাগে কেন? ঐ পাষাণময়ী নগ্ন নারী তো এসব কিছুই চিন্তা করে না—গভীর আবেশে চক্ষু মুদ্রিত করে জীবনের আনন্দ পূর্ণভাবে সে উপভোগ করছে।······

মনে মনে সে ভাবে, হয়ত এ গৃহে নিজেও কোনদিন সুখী হয় নি, অপরকেও পারে নি সুখী করতে।

তারপর হঠাৎ এক সন্দেহের দংশনে সে যেন সচকিত হয়ে ওঠে।

"তাইত! খোকা আমায় ভালবাসে তো!"

এতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বামীর চিন্তা একবারও মনে জাগে নি তার। কিন্তু স্বামীর কথা যখন মনে পড়ে গেল তখন এক অপরিসীম লজ্জার প্রবাহ যেন তার সর্ব্বাঙ্গে বয়ে গেল। দেহের সমস্ত রক্ত নিমেষে সঞ্চালিত হল মুখে—চিন্তাগুলো কেমন যেন জট পাকিয়ে গেল।...সত্যি, স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? সে কি কখনও স্বামীকে ভালবেসেছে? যদি না বেসে থাকে, তবে অপরাপর স্ত্রীর মত স্বামীর কাছে সে আত্মদান করতে পেরেছে কি? স্বামী কি তাকে আন্তরিকতার সঙ্গে নিতে পেরেছেন? কৈশোরের শেষে যখন তার বিবাহ হয় তখন সে কি বিবাহিত জীবনের মর্ম্ম কিছু বুঝতে পেরেছিল? বিবাহের পর যখনই স্বামী তার সান্নিধ্য কামনা করেছেন তখনই সে কেমন ভয়ে শিউরে উঠেছে। সে যে তাঁর সঙ্গ প্রত্যাখ্যান করে নি সে শুধু মাতৃত্বের লোভে।

খোকাকে পাবার পর স্বামীকে আর সে সহ্য করতে পারত না। স্বামী বাড়ীতে ঢুকলেই সে কেমন অস্বস্তি বোধ করত—দূরে দূরে থাকতে পারলেই যেন সে নিশ্চিন্ত। কিন্তু ভাল না লাগলেও স্বামীর উপর দয়া হত তার। ঘুমের মধ্যে স্বামীর প্রতি করুণা মাঝে মাঝে এমন তীব্র হয়ে উঠত যে তার বুকের ভিতরটা যাতনায় টন্ টন্ করত —চম্‌কে জেগে উঠত সে—নিজেকে তখন সংযত করে রাখা তার পক্ষে কঠিন হত খুব—পাছে স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয় এজন্যে হাতদুটো জোরে মুষ্টিবদ্ধ করে নিজেকে সাম্‌লে নেবার চেষ্টা করত সে।

আর স্বামী? তিনি কি তাকে এখনও ভালবাসেন, না আর কাউকে ভালবাসতে সুরু করেছেন? এ চিন্তা কখনও তার মনে জাগেনি এর আগে—তার কাছ থেকে স্বামী এতই দূরে! খোকাকে তিনি ভালবাসেন এ সে লক্ষ্য করেছে আনন্দের সঙ্গে। ঘরসংসারের উপর তাঁর যত্ন ও নজর দেখে সে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছে মনে মনে। কিন্তু তাদের দুজনের সম্পর্ক বলতে এ ছাড়া আর কী আছে?

খোকাকে পেয়ে সব ভুলে গিয়েছিল—এমন কি নিজেকেও।...

সেলায়ের সূচ দ্রুত চলতে থাকে। কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে সে ঠেলে ফেলতে চায় নিজের ত্রুটি বিচ্যুতির দুঃসহ চিন্তা। তার গলার ভিতরটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে। খোকা কি তাকে এই আত্মগ্লানির হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে? যে দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা আজ তার সারা অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, পারবে কি সে ঐ আলোড়নের হাত থেকে তার দুর্ব্বল অসহায় মাকে রক্ষা করতে? সে কি তার ঐ ক্ষুদ্র বাহুর সাহায্যে মায়ের জীবনটা নতুন করে গড়ে তুলতে পারবে—তার সব কিছু ত্রুটি ও অক্ষমতার নিখুঁত সমাধান করে?

খোকার গলার আওয়াজ এখন তার কানে আসে। তার আওয়াজের সঙ্গে আর একটি শিশুর কণ্ঠও শোনা যায়। এ গলা তার খেলার সাথী রাণুর। রাণু তাদেরই প্রতি-বেশীর পাঁচ বছরের মেয়ে। সুলতা জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখে।

তাদের পানে চাইতেই সুলতা বুঝতে পারে একটু আগেই তারা ঝগড়া করেছে।

খোকা গম্ভীরভাবে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখনও বা গাছের পাতা ছিঁড়ে চারিধারে ছড়িয়ে ফেলছে, কখনও বা গাছের গায়ে পা দিয়ে অকারণ আঘাত করছে—কিন্তু তার মুখখানা অত্যন্ত বিষণ্ণ।

হঠাৎ সুলতার মনে হয় ঠিক এমনি বিষণ্ণ মুখে প্রতিদিন অপরাহ্নে খোকার বাবাও সংসারের ছোটখাটো কাজকর্ম্মে নিজেকে ব্যস্ত করে রাখেন। সুলতা লক্ষ্য করলে, খোকা আর রাণু দুজনেই যেন অনুতপ্ত—ঝগড়া করে কা'রো মনেই স্বাচ্ছন্দ্য নেই। ওরা অবশ্য পরস্পরকে এড়াবার চেষ্টা করছে—তবু যখন ওদের মধ্যে ব্যবধানটা বেশী হয়ে পড়ছে, তখন ওরা আবার ছল করে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হচ্ছে।

কখনো কখনো ওরা এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছে—যেন কিছুই হয়নি ওদের। খোকা এক সময় একটা গাছের আড়ালে গিয়ে শিস দিতে সুরু করে—রাণুকে সে

জানাতে চায় সে বেশ নিশ্চিন্তে আছে। কিন্তু সুলতা দেখলে, তার ডাগর চোখদুটি সাথীর পানেই নিবদ্ধ আর তাতে গভীর বেদনার ছাপ।

তারপর রাণু একটা খালি ঝুড়ি কোথা থেকে এনে দু'হাতে ঘাস ছিঁড়ে বোঝাই করতে থাকে। খোকা ছিল এখন শিউলি গাছটার ডালের উপর বসে—ঠিক তার নীচেই রাণুর ঘাসের ঝুড়ি। খোকা উপর থেকে কয়েকটি ফুল ছুঁড়ে দেয় ঝুড়ির মধ্যে এবং উদ্বিগ্ন মুখে লক্ষ্য করে রাণু কি করে। প্রথমটা রাণু যেন একটু থমকে যায়—কিন্তু তারপর বেশ প্রসন্নভাবেই ফুলগুলি তুলে নিয়ে তোড়া বাঁধতে সুরু করে।

শিশুদের এই খেলার সঙ্গে বাস্তব জীবনের সাদৃশ্য দেখে সুলতা চমকে ওঠে। অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়ে সে—নিদারুণ আত্মগ্লানিতে তার সারা মন ভরে যায়। সে এখন বুঝতে পারে মাতৃত্বের আনন্দে এমনি বিভোর ছিল সে যে স্বামীকে এতকাল নিষ্ঠুর ভাবে অবহেলা করে এসেছে। খোকাকে নিয়ে সে যে স্বপ্নপুরী রচনা করেছিল তার মধ্যে স্বামীর প্রবেশাধিকার ছিল না। খোকাকে সে ভালবেসেছিল এমনি আত্মহারা হয়ে যে আর কোন ডাক তার কানে পৌঁছয়নি। আজ সে দেখতে পায় খোকার মুখের পিছনে স্বামীর মুখ। তেমনি সারল্যপূর্ণ, তেমনি উদার, তেমনি বিষাদকাতর। সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে পড়ে যখনই স্বামী তার জন্যে সামান্য কিছু করবার সুযোগ পেয়েছেন তখনই তিনি অনুভব করেছেন কত না গর্ব্ব ও আনন্দ! সত্যি, আজ পর্য্যন্ত কত ফুলই না তিনি ছড়িয়ে গেছেন তার জীবনের পথে, কিন্তু সে শুধু তাদের দলিত করেছে—নির্ম্মম উপেক্ষায়।......শিশুরাই আজ খেলার ছলে তার অন্ধ মনের ভ্রান্তি ভেঙে দিয়েছে!

কিন্তু ঐ অবোধ শিশু দুটির কাছ থেকে জীবনের যে পরম শিক্ষা এই মাত্র সে পেয়েছে তার জন্যে সে ওদের মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাবে কাল।

আজকের দিনটি স্বামীর। আজ তাঁর কথাই শুধু সে ভাববে।

দুটি হাত বুকের উপর রেখে, স্থির ভাবে বসে সে অনাগত ভবিষ্যতের পানে চেয়ে থাকে।......

স্বামীর জন্যে সুলতা অপেক্ষা করে অন্তরের সমস্ত প্রীতি ও ব্যাকুলতা নিয়ে।

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত
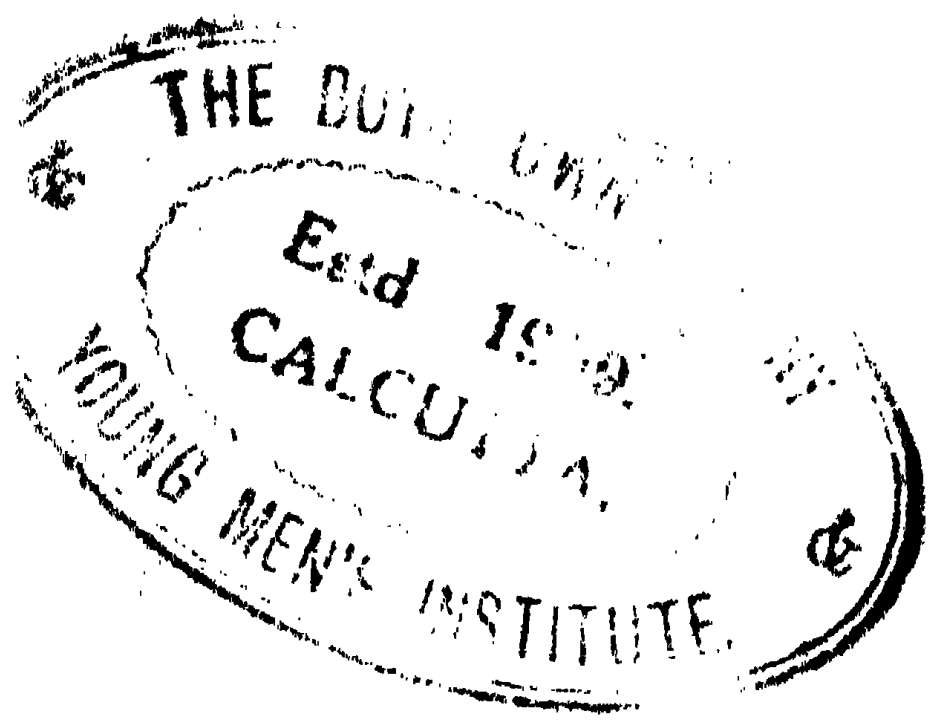
প্রবাদ-প্রসঙ্গ

প্রবাদ, প্রবচন প্রভৃতি বহুপ্রচলিত লোকোক্তিসমূহ ভাষায় অলঙ্কার স্বরূপ। এগুলি ভাষার প্রাচীনত্ব, ব্যাপকতা ও ভাবপ্রকাশশক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মানব জীবনের বিভিন্নমুখী অভিজ্ঞতার এই সকল সরস, সরল, সংক্ষিপ্ত সূত্রগুলি শত শত বৎসর ধরিয়া সঞ্চিত হইয়া ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছে।

আমাদের বাংলা ভাষার এই সম্পদ অতুলনীয়। আমরা কিছু বলিতে বা লিখিতে হইলে নিতান্ত অজ্ঞাতসারেই নানা প্রবাদবচনের প্রয়োগ করিয়া থাকি। কারণ ইহাতে বক্তব্য যেরূপ স্পষ্ট ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠে নিজেদের শত চেষ্টায় তেমন হয় না। এমন কি, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকারগণ, যাঁহাদের রচনা-কৌশল অসাধারণ, তাঁহারাও বাংলা ভাষার অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে এই সকল রত্নরাজি আহরণ করিয়া আপন আপন রচনার শোভাবৃদ্ধি করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলা প্রবাদ প্রবচনের কোন উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ-গ্রন্থ নাই। তাহার ফলে বাংলা ভাষার গুরুতর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ ব্যবহারের অভাবে এইরূপ অনেক 'বচন' লোপ পাইতে বসিয়াছে, হয় তো কিছু কিছু ইতিমধ্যে লুপ্ত হইয়াও গিয়াছে। এই সকল 'বচন' এতকাল মুখে মুখেই চলিয়া আসিয়াছে। বিশেষ করিয়া বাংলার পল্লীবৃদ্ধাগণ এই ধারা এখনও কিছু কিছু বজায় রাখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে, এবং তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক তথাকথিত 'মেয়েলী কথা' লোপ পাইতেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ, এমন অনেক 'বচন' আছে, কালের পরিবর্ত্তনে যাহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠা এখন কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং, যে কথার অর্থ কেহ বোঝে না তাহা ক্রমে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া কালক্রমে লোপ পাইবে এরূপ আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে।

বাংলা ভাষার এই অমূল্য সম্পদ রক্ষার উদ্দেশ্যে 'বিচিত্রায়' "প্রবাদ-প্রসঙ্গ" নাম দিয়া একটি পৃথক বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইতেছে। এই বিভাগে দুইটি অংশ থাকিবে। প্রথমটি 'অর্থবিচার'। ইহাতে বিশেষ বিশেষ প্রবাদের তাৎপর্য্য, উৎপত্তি, প্রয়োগবিধি প্রভৃতির আলোচনা হইবে। দ্বিতীয়টি—'সংগ্রহ'। ইহাতে এরূপ নূতন নূতন 'বচন' সংগৃহীত হইবে যাহার ব্যবহার সচরাচর দেখা যায় না, অথবা দেশের অংশবিশেষ সীমাবদ্ধ হইয়া আছে।

'অর্থবিচার অংশটিতে মাসে মাসে কয়েকটি প্রশ্ন সন্নিবেশিত হইবে। 'বিচিত্রার' পাঠকপাঠিকাগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঐ সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর বা আলোচনা পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

'সংগ্রহ' অংশটির জন্য পাঠকপাঠিকাগণের নিকট অনুরোধ যেন তাঁহারা অবসর মত কিছু কিছু 'বচন' সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া আমাদিগকে সাহায্য করেন।

'বিচিত্রার' অন্যতম লেখক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন অনেকদিন হইতে প্রবাদ প্রবচনের সংগ্রহ ও আলোচনায় নিযুক্ত আছেন। 'প্রবাদ প্রসঙ্গের' পরিচালনা ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করি 'বিচিত্রা'র মাতৃভাষানুরাগী পাঠকমণ্ডলীর সহযোগিতায় আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হইবে।

বিচিত্রা সম্পাদক

অর্থ বিচার

(প্রশ্নাবলি)

(১) অকাল কুষ্মাণ্ড। ইহার অর্থ 'অপদার্থ'। কিন্তু অকালে বা অসময়ে যে কুষ্মাণ্ড ফলে তাহাকে অপদার্থ মনে করিবার কারণ কি?

(২) অক্কা পাওয়া। সংস্কৃত 'অক্কা' শব্দের অর্থ 'মাতা', কিন্তু বাংলাতে ইহার অর্থ 'মৃত্যু' হইল কিরূপে?

(৩) অৰ্দ্ধেক সকল ঘর-গোষ্ঠী, তার অৰ্দ্ধেক মা ষষ্ঠী। এই মেয়েলী ছড়ার অর্থ কি?

(৪) অষ্টরম্ভা। 'কলা' বা 'কদলী' শব্দের অর্থ 'কিছু না।' কিন্তু 'রম্ভা' শব্দ এরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। অথচ 'অষ্টরম্ভা' বলিলে আবার সেই অর্থই হয় কিরূপে?

(৫) অসারে জলসার। অর্থ কি?

(৬) আক ছেঁচতে কুকশিমের কথা। ইহার অর্থ 'অপ্রাসঙ্গিক কথা বলা।' এই প্রকার অর্থের উৎপত্তি কিরূপে হইল?

(৭) আদা জল খেয়ে লাগা। ইহাতে অধ্যবসায় বুঝায়। কিন্তু এই বিশেষ গুণের সহিত আদা জলের সম্বন্ধ কি?

(৮) আদায় কাচকলায়। ইহাতে 'বিরোধ' বুঝায়। কিন্তু এই দুইটি পদার্থের মধ্যে কি কোন প্রকৃতিগত বিরোধ আছে?

(৯) আগড়াগেছে করা। ইহার অর্থ 'বিস্তর ফাঁকা বাজে কথা বলা।' এইরূপ অর্থের উৎপত্তি কি?

(১০) আলোচাল দেখলে ভেড়ার মুখ চুলকায়। আলোচাল কি ভেড়ার বিশেষ প্রিয়? তাহার কারণ কি, প্রমাণই বা কি?

(১১) আসকে খেয়েছ, ফোঁড় গণোনি? আসকে এক প্রকার পিঠার নাম। কিন্তু 'ফোঁড়' শব্দের অর্থ কি, এবং তাহার গণনা করারই বা তাৎপর্য্য কি?

সত্যরঞ্জন সেন

গল্প-লেখা

শ্রীঅমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ

১

অলকা জিজ্ঞেস করে: তারপর?

দুই চোখে তার ঔৎসুক্য ও হর্ষ ছাপিয়ে ওঠে; কর্ণমূল অবধি আবিরের রং-এ আঁকা রাঙা।

সিতাংশু হেসে উঠল: বারে! তা শুনে তোমার লাভ! মানে তারপর কি হ'ল আমি পড়ছি না, বুঝলে?

অলকা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলে: না, না, তোমাকে পড়তেই হবে, তারপর সেই মেয়েটির কি হোলো, গো? আহা বেচারা!

সিতাংশু পড়তে লাগল:—

তারপর একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে ওদের দেখা, পুরো এক বৎসর পরে নিভৃতে···নির্জ্জনে···। এক বৎসরে জুলিয়ার বিরাট পরিবর্ত্তন—সংক্ষেপে সে আর সে জুলিয়া নেই, লাবণ্যের প্রতিমা আজ বিষাদের—দৈন্যের—বিগ্রহ সেজেছে। জুলিয়া আজ হয়েছে কুরূপা।

······ফ্রেড বল্লে: সত্যি তুমি জুলিয়া? —কিন্তু এদশা তোমার কে কল্লে?

জুলিয়া ম্লান হেসে নীরব রইল। থাকবার মধ্যে তার আছে সেই চোখদুটি···তার দৃষ্টি এখনও কত উদার, কত স্বচ্ছ কত স্থির, কত অচঞ্চল।···সেই নিষ্কম্প চোখদুটি ধীরে ধীরে ফ্রেডের উপর ন্যস্ত হয়।

আগ্রহে ফ্রেডের দুচোখে জল ভরে আসতে চায়, বলে:

ওঃ! কতদিন তোমাকে দেখিনি বলোতো ?...কোথায় থাকো? কাজে বেরিয়েছিলে বুঝি?

জুলিয়া শুধু নির্নিমেষ অবাক-নয়নে ফ্রেডের দিকে চেয়ে থাকে, কি উত্তর দেবে ভুলে যায়। কাছে এসে ফ্রেড বলে: কই বল্লে না তো ?...কোথায় থাকো, কোথায়?

জুলিয়া ঠিক তেমনি ভাবেই তাকিয়ে থাকে···

···হঠাৎ ফ্রেড সবিস্ময়ে ডাকে—জুলিয়া!

জুলিয়া চমক ভেঙ্গে ওঠে; ও ফ্রেড তুমি!...একটু চুপ করে থাকার পর বলে: তুমি ফ্রিডারিক ক্রুক্স না?

হঠাৎ চমকে ফ্রেড বলে: কেন? তুমি কি আমায় চিনতে পারছ না? আমি?...আমি···? হ্যাঁ আমি ফ্রিডারিক ক্রুক্স্? কি আশ্চর্য্য!

জুলিয়া একটু থতমত খেয়ে বলে ক্ষমা ক'র। আচ্ছা মেরি কি কাল ভিয়েনা চলে গেছে?

ফ্রেড একটু ভীত পরে ততোধিক বিস্মিত হয়ে বলে: আরে আমি ?...ফ্রেড! কি আবোল-তাবোল বকছ? মেরি আবার কে?

জুলিয়া থেমে বলে: ও ফ্রেড! তা বেশ, তারপর খবর কি তোমার? ভাল তো?

ফ্রেড বলে: খবর আর কি—মোটামুটি; তারপর কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা! ইস্! কি তুমি রোগা হয়ে গেছ, কানের কাছে ওটা কিসের দাগ? কই আগেত দেখিনি।

জুলিয়া ম্লান হাসে: এমন আর কি রোগা হয়েছি, একটু জ্বর হয়েছিল বই ত আর নয়।

কিন্তু তুমি?—তুমি?—হ্যাঁ,···মানে তোমাকে কিন্তু বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে, you are looking beautiful, নতুন বিয়ে টিয়ে করেছ বুঝি? খুব সুন্দরী বোধ হয়?

জুলিয়া একটু হাসল, হেমন্তের ম্লান হাসি...ব্যাথাতুর, অলস, অনুগ্র!

ফ্রেড একটু ঠাট্টা করলে: নতুন বিয়ে করলে বুঝি beautiful দেখায়? তা বেশ, তারপর তুমি?...তুমিও তো বিয়ে-টিয়ে করেছ? কে ভদ্রলোক? পরিচয় করিয়ে দেবে তো?

জুলিয়া লজ্জার ভান করে: হ্যাঁ মাস-পাঁচ-কি ছয় হবে...

হঠাৎ ওর চোখদুটো ঝাপসা হয়ে আসে, কঠিন শাসনে উদ্গত অশ্রুকে দমন করে নেয়, বলে: তার নাম?

পরে একটু মুচকি হেসে—তোমারই নেমসেক্; তোমাদের বেশ ভাব হবে দুটিতে বুঝলে?

ফ্রেড বলি বলি ক'রে ফস করে বলে ফেলে, তোমাদের বুঝি লভ-ম্যারেজ হয়েছিল?—না এমনি নিগোসিয়েশন ম্যারেজ?

···মুহূর্ত্তের মধ্যে ফ্রেডের মুখখানি ব্যথায় ম্লান হয়ে পড়ল, পত্র-পুষ্প-পল্লবে অতীতের মৃত বৃক্ষটি আজ সঞ্জীবীত, মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে···মনে পড়ল একদিন···অতীতের বুকে ক্ষীণায়মান, পরিম্লান একটি ছবি, একটি দৃশ্য, অতীতের বুকে একটী চির-মর্ম্মরিত হতাশ্বাস···পুঞ্জীভূত বেদনার একটি রুদ্ধ-হাহাকার ধ্বনি!...এখনও মনে পড়ে সেই ছোট একটি কফির টেব্‌ল্, একটি নিস্তব্ধ, নিরালা কক্ষ।

শুধু জুলিয়া আর সে...জুলিয়ার চোখ-মুখে সেদিন প্রেমের কি অনর্গল, অকুণ্ঠিত, ব্যাকুলতা···আত্মদানের কি অপূর্ব্ব কুণ্ঠাহীন, সাবলীল ভাবদ্যোতনা···ভাবতেই ফ্রেডের চোখের পাতা অকস্মাৎ ভারী হয়ে আসে...

শ্লেষের নিষ্ঠুর, সুতীব্র হাসিটি জুলিয়ার ঠোঁট জুড়ে আছে: তা শুনে তোমার লাভ কি? তুমি কি বল্‌তে চাও যে তোমার স্ত্রী, মানে, যাকে তুমি বিয়ে করেছ তাকে তুমি ভাল না বেসেই বিয়ে করেছ?

ফ্রেড চু'প করে থাকে।···এর পর একটা বিশ্রী কুৎসিৎ নিস্তব্ধতা···যেন শরীরের প্রতি লোমকূপকে পাষাণ-শীতল করে দিতে চায়।

হঠাৎ ত্রস্তভাবে ফ্রেড বলে ওঠে: আচ্ছা, আসি, একটা জরুরী কাজে বেরিয়ে যেতে হবে আজ···কথাগুলো অবশ্য বেখাপ্পাই শোনায়।

জুলিয়া বাধা দেয়: যাবে?—না,···না, এত শীগ্‌গীর তোমাকে—(হো হো করে পাগলের মত হাসি)···একবছর পর দেখা, আরে বস, বস, গল্প-টল্প করা যাক।

ফ্রেডের বাঁ হাতের কব্জিটা শক্ত করে মুঠোর মধ্যে ধরে

জুলিয়া বসালে, ঠোঁট দুটিতে একটু হাসি ফুটিয়ে বলে: তোমার বিয়ের গল্প করা যাক। তোমাদের মধ্যে প্রপোজ কে প্রথম করে—তুমি না সে?

মিথ্যা অভিনয় করতে ফ্রেড যেন আর পার্চ্ছে না, সমস্ত মন যেন অবশ হয়ে আসে, তবুও একে বলতে হয়: হাঁ, প্রপোজ আমিই প্রথম করি। আচ্ছা, তোমাদের বেলায় প্রপোজ কে করে প্রথম?

জুলিয়া, যেন কিছু হয় নাই এমনি সপ্রতিভ ভাবে বল্লে: কেন, আমি। ফ্রেড মাথা হেঁট করে চুপ করে ভাবে…

জুলিয়া ওর পিঠে একখানা হাত রেখে অত্যন্ত তরল করে হাসলে—যেন বলতে হয় বলেই বল্‌ছে এইভাব, তাতে একটুও সত্য নেই, একটুও সীরীয়াসনেস্ নেই……নীল আকাশে একফালি সাদা মেঘের মতই শুভ্র, স্বচ্ছ ও লঘু। বলে: মনে পড়ে একবছর আগে! সেই কুয়াসামুখর সন্ধ্যায়?

……বলেই হো হো করে হাসতে আরম্ভ করে দেয়—হ্যাঁ…হ্যাঁ মনে পড়ছে, আমিই বুঝি তোমায় কল্লুম……হ্যাঁ আমিই সেই তোমার কোল ঘেঁসে, অত্যন্ত কাছে বসে তোমার বুকের ভেতরে এসে……

……সত্যি! কি ছেলেমানুষই ছিলাম তখন! হাসতে হাসতে ওর সর্ব্বাঙ্গ আরক্তিম হয়ে ওঠে।

একটু একটু করে ফ্রেড পাথর হয়ে উঠল, বিশ্বের গাম্ভীর্য্য যেন আজ ওর আশ্রয় নিয়েছে; বল্লে: তুমি কি বলতে চাও যে একবছরের মধ্যে তুমি বুড়ী—বর্ষীয়সী—হয়ে পড়েছ যে তখন ছেলেমানুষ ছিলে?

হাসির তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস এক মুহূর্ত্তে হয়ে গেল যেন প্রাচীন-পাষাণ, যেন সে আপনার সীমা পেয়ে হঠাৎ দপ করে নিভে গেল……তার উৎসারিত-উচ্ছলতা রেখে গেল শুধু মৌন-মূক-অন্তর্গূঢ়-বেদনা।

……তা নাত-কি? বলতে গিয়ে জুলিয়ার ঠোঁটের পাশ দুটি একটু কেঁপে উঠল আত্মবিস্মৃতভাবে।

……আবার সেই অদ্ভুত, মর্ম্মান্তিক নীরবতা…… ব্যর্থতাকে নির্দ্দেশ করে যেন অদৃষ্ট লিপির সুতীব্র ব্যঙ্গ!

ফ্রেড উচ্ছ্বসিত হয়ে ওর হাত দুটি ধরে বল্লে: আমায় শুধু ক্ষমা কর, জুলিয়া…শুধু ক্ষমা……আর কিছু না…… আমি মিথ্যা কথা বলেছি……আমি কাউকে বিয়ে করিনি ……তুমি শুধু আমায় ক্ষমা কর……আমি মিথ্যা অভিনয় করেছি…তুমি!…তুমি…! হ্যাঁ তোমাকেই যে শুধু ভালবাসি, জুলিয়া?

জুলিয়া (পরম-বিস্ময়ে)……আমি?…আমি কি?—কেন?

—কেন?…কেন? তুমি বিয়ে করেছো?

জুলিয়া অপ্রতিহত রুক্ষস্বর একটুও নরম করলে না, বল্লে: কেন ক'রবোনা? আসন্ন মহাপ্রলয়ের কালবৈশাখী ঝড় যেন চোখে সাড়া দিয়ে যাচ্ছে!

…বল্লে! কি বল্লে?…কি?……মিথ্যুক?…আমি? ……অ্যাঁ! আমি ভীষণ মিথ্যুক?……

…হঠাৎ একটু থেমে গেল। ক্রুদ্ধা ফণিনী ওর বিজয়ী, রুষ্ট, রুদ্ধ মাথা সোজা করে তুল্লে, স্বচ্ছ, নিরীহ চোখে ও ফোটালে অপ্রতিরুদ্ধ, জ্বালাময়ী দৃষ্টি……ভাবাকে দিলে ও সূচি-তীক্ষ্ণ শ্লেষ, মর্ম্মান্তিক তিক্ততা, তুষার-শীতল আগ্রহ…

বল্লে: আমি মিথ্যুক?…আর তুমি? মনে পড়ে? মনে পড়ে?

ফ্রেড নিরুত্তর, অপরাধীর মত মাথা তার নিচে ঝুলে পড়েছে……চোখ দিয়ে জল উপছে পড়েছে তার বুকে……

ফ্রেড একটি উত্তরও করে না, ওর মর্ম্মান্তিক কাতরতার দিকে চেয়ে চেয়ে জুলিয়ার চোখের পাতা ভিজে এলো… দুহাতে ফ্রেডের গলা জড়িয়ে ধরে বল্লে: তুমি কি করেছ আমার জানো?

ওর দুর্ব্বার শাসন অবাধ্য অশ্রুর কাছে পরাজয় মেনেছে…বাঁধ ভেঙ্গে আজ প্লাবন ধরেছে ওর গণ্ডে, আর ওর বক্ষঃস্থলে।

* * * *

* * * অলকা আর সহ্য করতে পারলে না, সিতাংশুর কোলে অসহায়, অবশ ভাবে ভেঙ্গে পড়ল…ওর মৃনাল-কোমল হাত দুটি দিয়ে সিতাংশুকে আপন করে, নিবিড় করে বাঁধলে, তারপর ডান হাতখানা সিতাংশুর মুখের উপর চেপে বল্লে: থাক, থাক, আর পড়তে হবে না …ছাই গল্প—পাঁশ গল্প!

শ্রীঅমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ধন্য অভাগারা…

শ্রীবিভুপ্রসাদ বসু

ম্লানচ্ছায়া হেমন্তের সন্ধ্যালোক বাহি',
কুহেলি তিমির স্রোতে ঘন অবগাহি,
ওই নেমে আসে মোর ক্লিন্ন আঁখি পরে
জাগ্রত স্বপন সম বিশ্বের প্রান্তরে
জগতের চিরন্তন অভাগার দল।
একদিন এল যারা পাথেয়-সম্বল
এ বিপুল বসুধার দূর প্রান্তদেশে;
তারপর কিছু দূর ভ্রমণের শেষে—
খোয়ায়ে ফেলিল যারা সে-সম্বলটুক্।
জীবনের যাত্রাপথে দেখিল কৌতুক
প্রলয় ভ্রূকুটি-ঘন বিপত্তির মাঝে,
যাধার মৈনাক চূড়া যেথায় বিরাজে
সেথায় হানিল তারা মহেন্দ্রের সম
জীবন্ত যৌবন বজ্র অমোঘ দুর্দ্দম।

হেমন্তের নিশীথিনী মৃত্যু-পাণ্ডু-হিম
আহত বেদনা সম অসাড় নিঃসীম।
তবু চাহি আছি সেই আবিল আঁধারে
ক্ষীণ দৃষ্টি মুদে যেন আসে বারে বারে
অসহায় অবসাদে; শ্লথ আঁখি তুলে
এখনো দেখিতে পাই ভগ্ন উপকূলে
অভাগারা বাহিতেছে ছিন্নপাল তরী,
তরঙ্গ আসিছে ছুটে পড়িছে আছড়ি'
সর্ব্বনাশা প্রাচুর্য্যেরে করিয়া উজাড়।
ভঙ্গুর ভেলায় বসি' মহা নির্ব্বিকার
তাহারা ধরেছে তান হাস্য কলরবে—
কল্লোল সঙ্গীত সাথে উদার-গৌরবে
অফুরান্ প্রাণ খুলে।

তাই ভাবি মনে,
যাদের খেয়াল-খাতা জটিল-লেখনে
ভরি' উঠে দিনে দিনে প্রলাপে মুখর
কোথায় তাদের বেদী, সে-কোন উষর
জগতের কাব্যলোকে ?……
ধন্য অভাগারা,—
সর্ব্বস্ব পেয়েছে তাই তারা সর্ব্বহারা !

ছায়াপট

বাণীনাথ
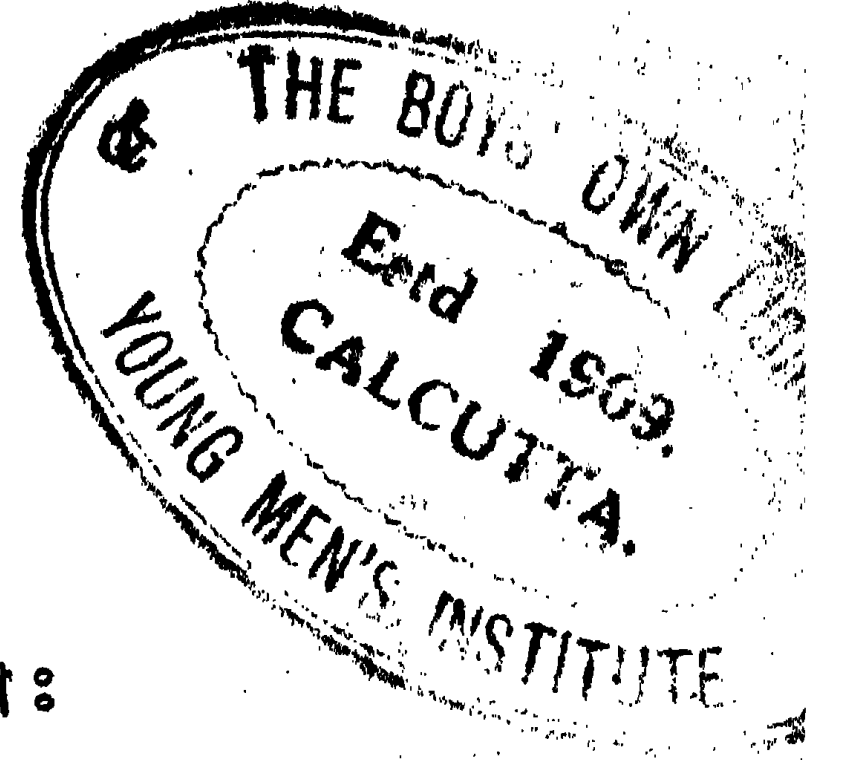
বড় দিদি ঃ

প্রযোজক—নিউথিয়েটাস' লিঃ
কাহিনী—ডাঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
পরিচালক—অমর মল্লিক
চিত্রশিল্পী—বিমল রায়
শব্দযন্ত্রী—বাণী দত্ত
সুরশিল্পী—পঙ্কজ দত্ত
চিত্র সম্পাদক—সুবোধ মিত্র
গোষ্ঠীচালক—জলু বড়াল

চরিত্র লিপি ঃ

মাধবী—মলিনা
সুরেন—পাহাড়ী সান্যাল
শান্তি—চন্দ্রাবতী
ব্রজবাবু—যোগেশ চৌধুরী
প্রমীলা—ছবি রায়
নিমু—নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায়।
মথুর বাবু—ইন্দু মুখোঃ
মনোরমা—মেনকা

নিউ থিয়েটার্সে'র নবতম অবদান "বড়দিদি" কিছুদিন আগে রূপবাণী ও নিউ সিনেমায় যুগপৎ মুক্তিলাভ করেছে। জনপ্রিয় আর্টিষ্ট অমর মল্লিক প্রথম পরিচালক হিসেবে "বড়দিদিকে" দর্শকদের উপহার দিয়েছেন এবং ছবিখানি সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হওয়ায় দর্শকদের পরিপূর্ণ আনন্দ দিতে পেরেছেন। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের "বড়দিদি" গল্পটি সকলের চির আদরের; এমন কেউ নেই যে এই অনবদ্য কাহিনী একবার অন্ততঃ পড়ে নাই। মনস্তত্বপূর্ণ এই বড়-দিদি কাহিনীকে রূপালি পর্দ্দায় রূপ দিতে গিয়ে পরিচালক অমর মল্লিক সম্পূর্ণ গল্পটিকে সহজ ছবির ভাষায় বুঝিয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। কোথাও খুব টেকনিকের মারপ্যাচ নেই।—বৈচিত্র্য, দৃশ্যপট, মুগ্ধকর সঙ্গীত বা সুন্দরী অভিনেত্রীদের নয়নমনোহর দেহগত রূপ—বড় দিদি চিত্রে প্রধান স্থান পায়নি। বড় দিদি ছবির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ—ইহার অপূর্ব্ব কাহিনী। ভাল গল্পের বেলায় ভয় জাগে—আনাড়ি পরিচালকদের নির্বুদ্ধিতার জোরে চিত্রনোপযোগী সুন্দর কাহিনীগুলি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তবে নামজাদা লেখকদের সুপ্রসিদ্ধ গল্প বা উপন্যাসকে চিত্ররূপ দেওয়াও সহজ নয়। পরিচালকের পক্ষে সুবিধা ও অসুবিধা দুই আছে। অসুবিধা—যে ছবির কাহিনী পরিচালকের নির্দ্দেশে ছবিতে ওলট পালট হ'য়ে দে'খলে দর্শকদের মন অপ্রসন্ন হয়। আর সুবিধা হচ্ছে এই যে গল্প অবতারণার জন্যে বাজে সেলিউলয়েড নষ্ট করতে হয় না এবং গল্পের ধারাবাহিকতায় ফাঁকি থাকলেও বিশেষ কোন দোষ হয় না। চেনা বামুনের পৈতার দরকার হয় না—ভাল কাহিনী হলেই দর্শকরা আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে। টেকনিক, ভাল ফটোগ্রাফী, উন্নত পরিচালনা বা শব্দযন্ত্রীর কাজ শুধু ফিল্ম ক্রিটিকদের কাছেই প্রশংসা পেয়ে থাকে।

বড় দিদি ছবির গল্পাংশ নূতন ক'রে বলবার প্রয়োজন হয় না। সুরেন্দ্র ও মাধবী—এই দুটি অপূর্ব্ব চরিত্রের মনোদ্বন্দ্ব, মান অভিমান, ত্যাগ, ভালবাসা সংযম নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে ছবিতে দেখান হয়েছে। আত্মভোলা সুরেন্দ্র গৃহ হ'তে পালিয়ে এসে ব্রজবাবুর মেয়ে প্রমীলার শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। সকলের অলক্ষ্যে বিধবা বড়দিদির স্নেহ এই আত্মভোলা উদার অন্যমনস্ক অসহায় সুরেন্দ্রের প্রতি যেন একটু বেশী পড়ে'ছিল। কাশী হইতে মাধবী গৃহে

ফিরে আসতে আবেগভরা সুরেন্দ্রের ছেলেমানুষি আচরণ এবং তারপর ঘরোয়া বিপ্লব, সুরেন্দ্রের গাড়ী চাপা পড়া নিখুঁত ভাবে ছবিতে ফুটে উঠেছে। ছবির শেষ দৃশ্যে জমিদার সুরেন্দ্র ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলেছে তার আরাধ্যা বড় দিদির সন্ধানে। বড় দিদির সন্ধান পেয়েছিল কিন্তু তার জন্যে তার জীবনের সব চেয়ে বড় মূল্য দিতে হয়েছিল তার অপূর্ব্ব ত্যাগ। সুরেন্দ্রের হৃদয় বিদারক দৃশ্যে ছবিখানি শেষ হয়

যার ফলে ছবিখানি বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছে। ছবির দোষ ত্রুটি আছে অস্বীকার করি না কিন্তু সেগুলি খুব উল্লেখযোগ্য নয়। পাহাড়ী, মলিনা, চন্দ্রাবতী, ছবি রায় ও নির্ম্মল ব্যানার্জ্জির অভিনয় পরিচালকের সাফল্যে বিশেষ সহায়তা করেছে। ছবির বহু স্থানে রঙ্গালয়ের প্রভাব লক্ষিত হয়। বড় দিদির কয়েকটি চরিত্র রঙ্গালয়কে অনুসরণ করে সেটের মধ্যে চলা ফেরা করেছেন। ছবির টেম্পো দ্রুত নয়—গানগুলি নিকৃষ্ট এবং বহু যায়গায়

শ্রীমতী মলিনা দেবী

শোনা যায় ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন দেবকী বসু। তবে রূপোলি পর্দায় তাঁর নাম পাওয়া যায় না। চিত্রনাট্যের কৃতিত্বের চেয়ে সবচেয়ে কৃতিত্ব হচ্ছে বড়দিদির অমর রচয়িতা শরৎচন্দ্রের। বড় দিদি খুব ঘটনাবহুল চিত্র নয়। ছোট্ট কাহিনীকে একটা সুস্পষ্ট রূপ পরিচালক দিয়েছেন

অনাবশ্যক বোধ হয়েছে। দীর্ঘ বাগান বাড়ীর দৃশ্যটি সম্পাদকের চোখকে ঠকিয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যালের মুগ্ধকর অভিনয় চমৎকার হয়েছে। আত্মভোলা, সরল, নির্ম্মল সুরেন্দ্রনাথ চরিত্রটি পাহাড়ীর অভিনয় গুণে জীবন্ত হয়েছে।

নিউ থিয়েটার্সের মীরা বাঈ হতে অধিকার, বহু চিত্রে পাহাড়ী অভিনয় করেছেন, কিন্তু বড় দিদির সুরেন্দ্র পাহাড়ীর অভিনয়-জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ দান। মাধবীর ভূমিকায় মলিনার অভিনয় খুব চিত্তাকর্ষক। মাধবীর চরিত্রের যা কিছু বিশেষত্ব মলিনার উৎকৃষ্ট অভিনয়ে দেখতে পাই। পল্লীগ্রামের ধূর্ত্ত ভীষণ ফন্দীবাজ বিধু চাটুয্যের এই ক্ষুদ্র চরিত্রে নামান উচিত হয়নি। মনোরমা চরিত্রের অবতারণা ও বিকাশ মূল ছবির মাধুর্য্যকে আঘাত দেয়। মনোরমার ভেড়ুয়া স্বামী হিসেবে ভানু বন্দোপাধ্যায়ের সাইকেলে চড়িয়া ব্রাহ্মমার্কা সঙ্গীত ভাল লাগলেও হাস্যজনক হয়েছে। এলোকেশী চরিত্রে রাণীর চেহারা, সঙ্গীত ও অভিনয় পরিচালককে কোনদিক দিয়ে সহায়তা করেনি।

বড়দিদি চিত্রে শান্তির ভূমিকায় চন্দ্রাবতী

ভূমিকায় সত্য মুখার্জি বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রমীলার চরিত্রে ছবি রায়ের সুন্দর অভিনয় ছবির বহু অংশকে সজীব করেছে। নিমুর ভূমিকায় নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায় চমৎকার অভিনয় করেছেন। যোগেশ চৌধুরীর ব্রজ বাবু মন্দ নয়। শান্তির চরিত্রে চন্দ্রাবতীকে মানায়নি তবে অভিনয় উল্লেখযোগ্য। মথুরবাবু বেশে ইন্দু মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় প্রাণহীন। মনোরমা বেশে মেনকা সকলকে হতাশ করেছেন। মেনকাকে মিষ্টার রায় (শৈলেন চৌধুরী), মিসেস রায় (রাজলক্ষ্মী), বিন্দু (নিভাননী), শিবচন্দ্র (কেষ্ট দাস), অহি (অহি সান্যাল) মন্দ নয়। গাড়োয়ান ও ভিখারী বেশে সুকুমার পাল ও বিনয় গোস্বামীর গান চলনসই।

ফটোগ্রাফী বেশ উল্লেখযোগ্য। সুরেন্দ্রনাথের ঘোড়া চড়ার সটগুলি বিমল রায় বেশ কৃতিত্বের সহিত তুলেছেন, তবে সুকির চেয়ে ফটোগ্রাফী নিকৃষ্ট হয়েছে। শব্দযন্ত্রী

বাণী দত্তের কাজ উত্তম। সম্পাদনা প্রশংসনীয়। বড় দিদির প্রচার পত্রিকা মুদ্রিত হবার পরও সুবোধ মিত্র কাঁচি চালিয়ে অনাবশ্যক দৃশ্যগুলি বাদ দিয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। সুর সংযোজনা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ছবির আরেকটি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে টেকনিসিয়ানদের সব বিভাগেই গণ্ডা কয়েক সহকারীদের নাম দেখা যায়।

বড়দিদি চিত্রে মলিনা, পাহাড়ী ও মেনকা

নিউ থিয়েটার্সের সাপুড়ে চিত্রের একটি দৃশ্যে কাননবালা

যখের ধন ঃ

প্রযোজক—ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম্ কোম্পানী।

কাহিনী—হেমেন্দ্রকুমার রায়।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—হরি ভঞ্জ।

আলোকচিত্র-শিল্পী—যতীন দাস।

শব্দযন্ত্রী—অবনী চ্যাটার্জ্জি ও গোবিন্দ ব্যানার্জ্জি।

সুরশিল্পী—শচীনদেব বর্ম্মণ ও ধীরেন দাস।

চরিত্রলিপি ঃ

করালী—অহীন্দ্র চৌধুরী।

কুমার—সুশীল রায়।

বিমল—জহর গাঙ্গুলি।

লেখা—শীলা হালদার।

কাডিং—ছায়া।

আঙ্গুর—শিশুবালা।

শম্ভু—রবি রায়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর রোমাঞ্চকর বাণী চিত্র "যখের ধন"—উত্তরা চিত্রগৃহে কিছুদিন পূর্ব্ব হ'তে দেখান হইতেছে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "যখের ধন" বইটি ছোট ছেলেদের জন্যই রচিত। পরিচালক হরি ভঞ্জ এই রোমাঞ্চকর কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে সম্পূর্ণ নূতনভাবে চিত্রনোপযোগী চিত্রনাট্য তৈরী ক'রে দর্শকদের উপহার দিয়েছেন। সর্ব্বপ্রথম এই ধরণের ছবি প্রস্তুত ক'রে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে এবং পরিচালক হরি ভঞ্জ শিল্প প্রতিভার পরিচয় দিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

"যখের ধন" চিত্রের চিত্রনাট্য দোষমুক্ত না হওয়ায় সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর ছবিতে পরিণত হয় নাই। দোষ ত্রুটি ইহার আছে কিন্তু তরুণ পরিচালকের শিল্প নির্দ্দেশ প্রশংসনীয়। লেখা চরিত্রটিকে ছবিতে প্রধান স্থান দিয়ে "যখের ধন" কাহিনীকে নূতন রূপ দিয়েছেন। শিল্পীগণের অভিনব অভিনয়, আসামের অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলী এবং রোমাঞ্চকর অবাহাওয়া—ছবিখানিকে জীবন্ত করে তুলেছে।

ছবির গল্পাংশ হচ্ছে এইরূপ—কুমার তার দাদামশাই মারা যাবার পর সিন্দুক হতে একটা মড়ার খুলি আর একটা পকেট বই পায়। পকেট বইএ লেখা ছিল—"যখের ধনের

ফিল্ম করপোরেশান কোম্পানীর 'রিক্তা' চিত্রে বিকাশের ভূমিকায়
অহীন্দ্র চৌধুরী

কলম্বি ।৽ কিড গ্লন' চিত্রের একটি দৃশ্য

কলম্বিয়ার ডিরেক্টার এইচ, কোন পরিচালক ফ্রাঙ্ক কাপরাকে শ্রেষ্ঠ পরিচালক গণ্য হওয়াতে একাডেমী অফ মোগন পিকচার্সের তরফ হইতে পুরস্কার দিতেছেন।

ঠিকানা খাসিয়া পাহাড় ভাঙ্গা দেউল।" এই মড়ার খুলিটার বিষয় পাড়ার করালীবাবু জানতেন এবং তাঁর ঐ গুপ্তধনের প্রতি লোভ ছিল। হঠাৎ একদিন রাত্রে কুমারের ঘর হ'তে মড়ার খুলিটা অন্তর্হিত হ'লো। তারপরই ঘটনার চক্রান্তে একদিন কুমারের বন্ধু বিমল, তার বোন লেখা ও চাকর রামহরি সেই গুপ্তধনের উদ্দেশে রওনা হ'লো খাসিয়া পাহাড় অভিমুখে। করালীর দল তার আগেই সেখানে পৌছেছিল।

এইখানে দুই দলে ভীষণ সংঘর্ষ হয় কিন্তু কুমারের দল বহু বিপদে পড়েও প্রাণে বেঁচে ছিল। নূতন উদ্যম নিয়ে অভীষ্ট সাধনে কুমার ও বিমলের দল ভাঙ্গা দেউলে পৌছল। দারুণ অন্ধকারে সুড়ঙ্গের ভিতর নানা বিভীষিকাকে অগ্রাহ্য করে এরা মরা যখের খুলির মধ্যে সিন্দুকের ডালা খুলে দেখে "যখের ধন" নেই। বাহিরে এসে দেখে করালীর হাতে অপহৃত ধন। কুমারের গুলিতে করালীর মৃত্যু হ'লো যখের ধনের উত্তরাধিকারী হ'লো দুই বন্ধু এবং লেখা ও কুমারের পরিণয়ে ছবিখানি শেষ হল।

ছবির নট-নটীরা সেটের মধ্যে চলাফেরা করেছেন অনেকখানি রঙ্গালয়ের নট-নটীদের মত এবং নিখুঁত অভিনয়ের পরিচয় দিতে না পারায় ছবির ভাল অংশগুলি তেমন হৃদয়গ্রাহী হয়নি। "যখের ধন" ছবিতে যতখানি রোমাঞ্চকর আবহাওয়া থাকা দরকার ছিল পরিচালকের নির্দ্দেশে ছবিতে তা প্রধান স্থান পায়নি। ছবির গোড়ার দিকে কুমার ও বিমলের করালীর আড্ডা-বাড়ীতে হানা দেওয়া এবং ভীষণ বিপদে পড়ে অতি সহজে উদ্ধার পাওয়া হাস্যাস্পদ হয়েছে। কুমার ও লেখার সুন্দর সম্বন্ধটুকু কোথাও তেমন সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠেনি।

সুশীল রায় ও শীলা হালদারের অভিনয় এর জন্যে অনেকখানি দায়ী। কার্ডিং চরিত্রটি বিকাশের মুখে নির্ব্বাণ লাভ করেছে। মনে হয় এই সুন্দর চরিত্রটি দর্শকদের অন্তরকে স্পর্শ করে ব'লেই পরিচালক তাড়াতাড়ি কার্ডিংকে বিদায় দিয়েছেন।

ছবির নায়ক দুর্ব্বল কুমারের পরিবর্ত্তে বিমলের আশ্চর্য্যকর সাহস, ভালবাসা, ধৈর্য্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিমল চরিত্রের যা কিছু বিশেষত্ব জহর গাঙ্গুলির অভিনব অভিনয়ে দেখতে পাই। লেখা চরিত্রে শীলা হালদারকে বেশ মানিয়েছিল কিন্তু আরো উন্নত অভিনয় আশা করেছিলাম। সুশীল রায় কুমারের ভূমিকায় মন্দ করেনি তবে খুব উল্লেখযোগ্য নয়। ভদ্রলোকবেশী করালীর সয়তানীর অংশগুলি অহীন্দ্র চৌধুরী বেশ ফুটিয়ে তুলেছেন, তবে মাঝে মাঝে বড় একঘেয়ে হওয়ায় ছবিকে নির্জ্জীব করেছে। কার্ডিং ভূমিকায় ছায়া সকলের অন্তরকে স্পর্শ করেছেন। রামহরি বেশে কুমার মিত্র হাসির খোরাক জুগিয়েছেন। শম্ভু বেশে রবি রায় উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য চরিত্রগুলি মন্দ নয়। আলোকচিত্রশিল্পী যতীন দাসের কাজ বেশ প্রশংসনীয়। ট্রেন ধ্বংস দৃশ্যটি এবং ছবির বহির্দৃশ্যগুলি অতি সুন্দর তুলেছেন। শব্দযন্ত্রীর কাজ ভাল। সুরশিল্পীদ্বয়ের কাজ উল্লেখযোগ্য। সর্ব্বশেষ পরিচালক হরি ভঞ্জ এই শ্রেণীর প্রথম রোমাঞ্চকর ছবি তুলে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

ভার্জ্জিনিয়া ব্রুস

বাণানাথ

পূর্ব্ব আফ্রিকার জঙ্গলে সাত হাজার মাইল

শ্রীহীরেন বসু

গণৎকার হাত দেখে যেদিন রায় দিলেন সমুদ্রযাত্রা আমার ভাগ্যে নেই, দুঃখে ক্ষোভে ও অভিমানে আমি নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়েছিলাম। জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা দেশ ভ্রমণ, তাও যখন কপালের লেখার দোষে খোয়াতে বসলাম তখন আর আক্ষেপের সীমা ছিল না। কিন্তু অন্তরের অন্তর্যামী বোধ করি সে আক্ষেপে স্বস্তিবচনই প্রয়োগ করেছিলেন—যা এসে আমার কাণে পৌছে নি।

গণনার ফলাফল কালাপানির অতল জলে ডুবে মরলো। ৩০শে জানুয়ারী কলকাতা থেকে বোম্বাই মেলে রওনা হয়ে ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ সাল আমি সমুদ্র বক্ষে ষ্টীমারে চড়ে বসলাম।

জাহাজের নাম 'টাক্লিয়া', ওজনে ১০,০০০ টন—পরিমাণে ছোটই বলতে হবে। বেলা ২-১০ মিনিটে ষ্টীমারে উঠলাম। ইহার পূর্ব্বে যাত্রীদের যে পরীক্ষার পর্ব্ব অতি-

মোমবাসা বন্দরে ভারতীয়দের বসতি

যা একান্ত বাস্তব—তার আহ্বানে একদিন চমক ভাঙলো—বুঝলাম গণৎকারের গণনায় বিভ্রাট ঘটেছে, নইলে এমন আমন্ত্রণ আমার জীবনে আসার সম্ভাবনা কোথায়? আমার পেশা চিত্র—চিত্রজগতে পরিচালনা। বোম্বাইয়ের এক বিশিষ্ট চিত্র-প্রযোজক এ আহ্বান আমায় দিলেন। তাঁদের ছবি হবে "আফ্রিকায় ভারতীয় বসতি"—সে ছবির পরিচালনার ভার আমারই উপর, তারই কল্যাণে আমার ভাগ্যবিধাতার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হলো। আর

ক্রম করতে হয় তা সত্যই বিরক্তিকর। সে বস্তুটী হচ্ছে কাষ্টম হাউসে নিজের জিনিষের উপর "কর" দেওয়া। ব্যবহারের অতিরিক্ত এতটুকুও জিনিষ ভারত সরকার বিনা অর্থে বিদেশে নিয়ে যেতে দেন না। ইহাই আইন, কাজেই বাক্স সুটকেশ খুলে তাঁদের কর্ম্মচারীর সমক্ষে প্রমাণ কর্ত্তে হলো এগুলি নিছক ব্যবহারীয় সামগ্রী, এতে আর ভেজাল নেই। এঁদের কাছ থেকে ছাড়ান পেয়ে তাড়না পেলাম ইমিগ্রেসন অফিসের কাছ থেকে। বিদেশ হতে দেশে ফিরে

আসার পনের কড়ি না দিলে বা তার যথাযথ ব্যবস্থা না করলে এঁরা ছাড়পত্র দেন না। এঁদের কাছ থেকে অব্যাহতি পাবার পর আবার নূতন একটি পরীক্ষার ক্ষেত্র অর্থাৎ, ডকের ডাক্তারের শারীরিক সুস্থতার ছাড়পত্র। কোলাহল এবং তীরের যাত্রীদের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত যখন হারিয়ে গেলো তখন ফিরে দেখলাম সারা সমুদ্রে ছেয়ে আছে অনন্ত দিগন্ত। তট-মেখলার শেষ দোলা সমুদ্রের নাগর দোলার সাথে মিলিয়ে গেলো।

জেসাস ফোর্ট—মোমবাসা
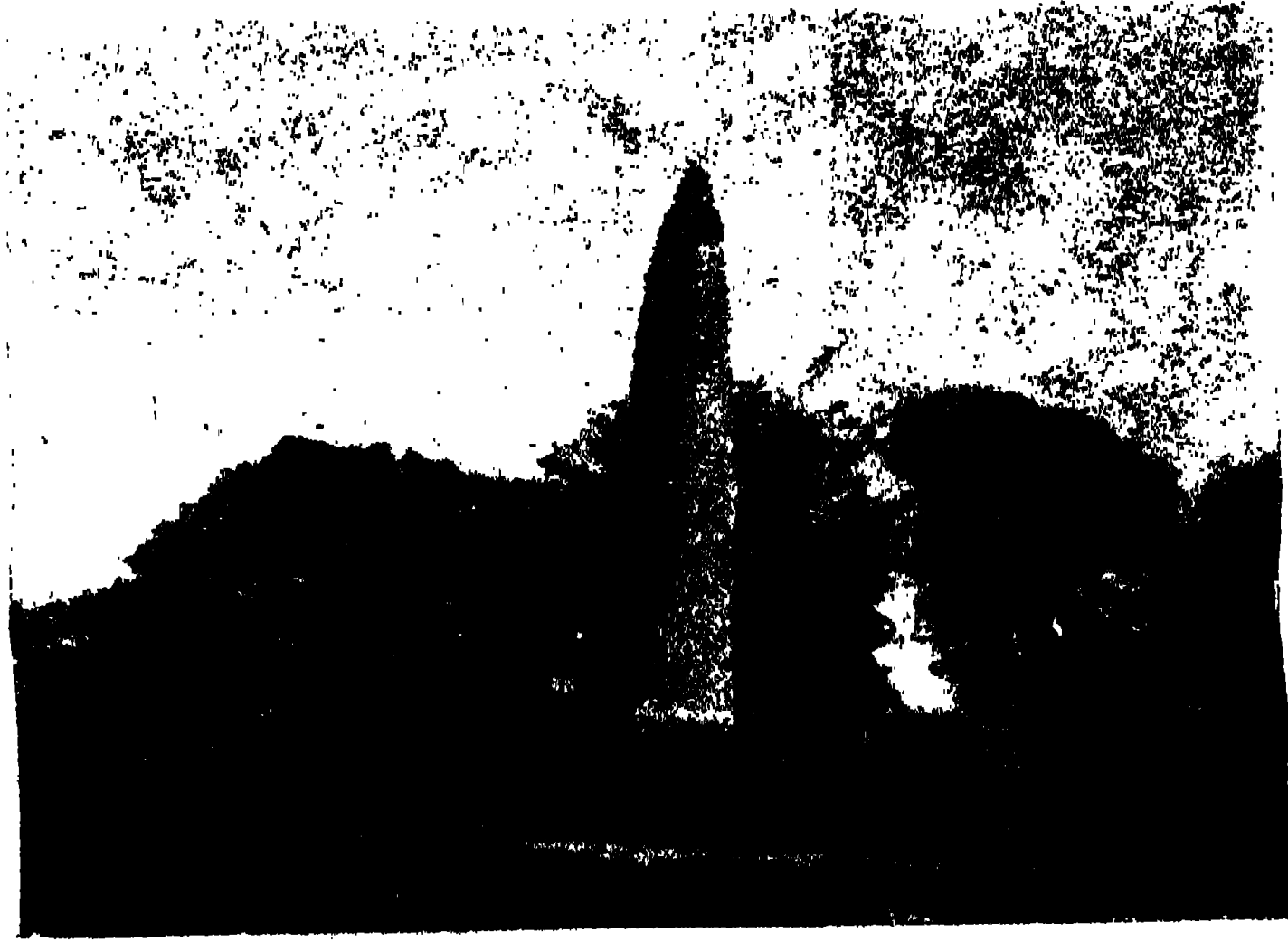
পর্ত্তুগীজ মনুমেণ্ট

এতগুলির ভিতর দিয়ে যখন যাত্রী উত্তীর্ণ হয়ে সাগর পারের অভিমুখে পাড়ী দেবার জন্য প্রস্তুত হয় তখন সে একান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত।

জাহাজ ছাড়ল—। ধীরে ধীরে মিত্র বন্ধু আত্মীয় অনাত্মীয়দের দৃষ্টির এলাকার বাইরে গিয়ে পড়লাম। জন-

এতক্ষণে ষ্টীমারটীকে ঘুরে দেখার অবকাশ হলো। নীচেই কেবিন, অবশ্য সেকেণ্ড ক্লাস। কামরাটী বেশ পরিপাটী করে সাজানো। তোয়ালে সাবান বালিশ বিছানা সব ষ্টীমার থেকে দেয় এর জন্যে আর ভিন্ন কর নেই। কেবিনগুলির সামনে "করিডোর" বা বারান্দা, তারই পাশে

স্নানের ঘর, পাইখানা ও ইউরিন্যাল্। স্নানের জন্য "পুল" অর্থাৎ চৌবাচ্চারও ব্যবস্থা আছে। উপরের ডেকের মধ্যবর্ত্তী দুখানি শ্রেণীবদ্ধ ঘর। একটী গ্রামোফোন, রেডিও পিয়ানো ইত্যাদির দ্বারা সুশোভিত "মিউজিক রুম" নামে অভিহিত, অপরটী "স্মোকিং রুম" অর্থাৎ ধূমপানের ঘর; যদিও মদ্য-পান করার ব্যবস্থাটাই তথায় বেশী। যাই হোক ব্যবস্থার প্রশংসা না করে থাকা যায় না। এ ছাড়া ডাইনিং রুম, পড়বার লাইব্রেরি ইত্যাদি সব জিনিষেরই কিছু কিছু ব্যবস্থা আছে, খেলা ধুলার ব্যবস্থাও প্রচুর।

আমি কিন্তু হিন্দু আহারেরই বন্দোবস্ত করলাম। কিছুক্ষণ রন্ধনশালায় দাঁড়িয়ে আহারের ব্যবস্থা করার পর উপরের ডেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে একটী ডেক চেয়ারের কোণে আশ্রয় নিলাম কিন্তু পচা পেঁয়াজ রসুন গোস্ত মাটনের গন্ধ তখনও আমার সারা মগজের মধ্যে রি রি কচ্ছিল। আরাম কেদারায় আরামের আশায় শোয়ার পরই অনুভব করলাম ব্যারাম—উপর্যুপরি দু তিন ঝলকে উঠে গেল। লোকে বললো 'সি-সিক্‌নেশ' আমি বুঝলাম 'মিল্ সিক্‌নেশ'; অর্থাৎ এর পর জাহাজে দশ দিন থাকা সত্বেও একটী দিনও

ভারতীয়দের পুরাতন ব্যবসাক্ষেত্র

নীচের দ্বিতলে লোয়ার ডেক্, সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে সর্ব্ব জাতি, সর্ব্ব ধর্ম্মের তো সমন্বয়ে যেন শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র রচনা করেছে, আর তারই মাঝে বাংলা, হিন্দী, উর্দ্দু, মারাঠী, গুজরাটী, পর্ত্তুগীজ, পাঞ্জাবী, ইংরাজী হতে সুরু করে ডাচের কচমচ পর্য্যন্ত যেন হরবোলার বাক্যবিন্যাস। বিরাট হাট, তারই পাশে রন্ধন শালা অর্থাৎ ভিয়ানবাড়ী। মুসলমানী হাঁড়ীকাবাব থেকে সুরু করে হিন্দুর সাত্ত্বিক আহার পর্য্যন্ত। খাওয়ার বিচার ও সংস্কার এখানে হার মেনেছে তবুও মন-ঠাহরাণো আশ্বাসে

মোমবাসার নতুন সহর

আহারে প্রবৃত্তি হলো না। খেতাম খালি ইংলিশ ডিনার অর্থাৎ, মাখম আর রুটী।

সেদিনের রাত কেটে গেল। পরদিন সকালে নব সূর্য্যোদয়ের সাথে এক নতুন অনুভূতিতে সারা মন প্রাণ আচ্ছন্ন হলো। পেলাম অসীম সমুদ্রের সীমা—অর্দ্ধগোলাকৃতি আকাশ যেন তার সীমা নির্দ্ধারণ করেছে। ষ্টীমারখানা মনে হয় যেন সাগরের কেন্দ্রে অবস্থিত, তাকে বেষ্টন করে জল বিস্তার একটী বিরাট থালার মত দেখাচ্ছে, আর তারই চারিধারের সীমান্ত সৃষ্টি করেছে দিক চক্রবাল। অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম। পৃথিবীর অর্দ্ধমণ্ডলের এমন বাস্তব রূপ এর পূর্ব্বে কখন দেখি নি।

ষ্টীমার বেলা ১০টার সময় পোরবন্দরে এসে দাঁড়ালো—আবার যাত্রীদের আসা যাওয়ার ভীড়। ষ্টীমার এবার ডকের মধ্যে প্রবেশ করেনি, নৌকা করে যাত্রিদের আনা হলো। বড় বড় নৌকায় রপ্তানির মাল এলো। বেলা বারটায় জাহাজ আবার ছাড়ল।

উইয়ের প্রাসাদ

জাহাজের যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো। চিত্র-জগতের কর্ম্মীদের পরিচয়ের সুযোগ ও সুবিধা যথেষ্ট। সকলেই চায় এই সঙ্ঘের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হতে। কাজেই সারা জাহাজ মায় কাপ্তেন পর্য্যন্ত আমাদের বন্ধু হয়ে উঠলেন। মহাত্মাজীর পুত্রবধু তাঁর শিশু পুত্র অরুণকুমার গান্ধী ও কন্যা সীতাকে নিয়ে আমাদের সহযাত্রী। এঁরা যাবেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। জাহাজে আমি আমার বাংলার চিরন্তনী পোষাক ধুতি-পাঞ্জাবী পরতাম। শ্রীমান অরুণ-কুমার আমার ঐ বেশ দেখে নামকরণ করলে—"সুভাষ বসু"। দেখতে দেখতে সারা জাহাজ আমার আজন্মার্জ্জিত নাম ছেড়ে আমাকে সেই নামেই অভিষিক্ত করলেন।

জাহাজ এবার পাড়ী জমালে নয় দিনের রাস্তা। এর মধ্যে তটরেখার চিহ্ন মাত্র নেই। জাহাজের যাত্রীরা মিলে entertainment committee ক'রে নানা খেলাধুলা, প্রতিযোগিতা, ও সঙ্গীতে এ কয়টা দিন এক নিঃশ্বাসে কাটিয়ে দিলে। মোমবাসায় পৌছবার দিনটী এই নতুন সংসার থেকে নিজেকে পৃথক করতে মনে কষ্ট অনুভব করলাম।

মোমবাসায় পৌঁছে আবার সেই কাষ্টাম ইত্যাদি—অর্থাৎ কষ্টম্। মোমবাসা বন্দর প্রাকৃতিক বন্দর—সৌন্দর্য্যে ও শোভায় মনোরম। বাংলা দেশের মতই সবুজ শ্যামল ক্ষেত—বন্দরের পাশে পাশে নারিকেলের বন। সহরে পৌছলাম। সুন্দর পরিচ্ছন্ন সহর। ভারতের সহরের সঙ্গে পার্থক্য যথেষ্ট। দেখলেই মনে হয় বিলাতি ছাঁচে ঢালা এখানকার সহরগুলি। ট্রাম ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার যানবাহনের চলাচল আছে। আমাদের মটর সহর ছেড়ে এক নিরালা বাগানবাড়ীর অঞ্চলে গিয়ে পৌছল। সুন্দর বাংলো। ভারতবর্ষে বসে যখন আফ্রিকার গল্প পড়তাম এবং শুনতাম তখন সে এক বিরাট ভয়াবহ জঙ্গল বলেই মনে হত, কিন্তু এই নিখুত সুন্দর বসতি দেখে সত্যই প্রাণে বিস্ময় জাগে।

এই বসতির ব্যবসায়ী বলতে নিছক ভারতীয়। পান সিগারেট থেকে সুরু করে সর্ব্বোচ্চ ব্যবসা ভারতীয়দের বশে। ইংরাজ ও ইয়োরোপীয়গণও ব্যবসাক্ষেত্রে আছেন

সোনার নদী—তারই পাশে ছবির উদ্বোধন উৎসব

তবে তাঁরা বিশিষ্ট ব্যবসার অধিকারী মাত্র। আফ্রিকা-বাসীদের মধ্যে অতি অল্পই সুশিক্ষিত দেখতে পাওয়া যায়। যাঁরা আছেন তাঁদের গুণতির মধ্যেই পাওয়া যায় এবং তাঁরা অধিকাংশ চাকরীজীবী। এতদ্ব্যতীত সব আফ্রিকাবাসীই ছোট কাজ করে। সোহিলী নামে একটী ভাষার এখানে

প্রচলন এবং এই ভাষা ব্রিটিশ ইষ্ট আফ্রিকায়, সারা কেনিয়া, ইউগাণ্ডা ও টাঙ্গানিকা প্রদেশে প্রচলিত। দেশীয়গণের ধর্ম্ম বিশেষ করে খৃষ্টীয় ও মুসলমানীই, তবে এখনও এদের মধ্যে Paganism পাওয়া যায়—যারা সূর্য্য, চন্দ্র, গাছপালা বা বিশেষ কোন প্রাকৃতিক শক্তির উপাসক।

আরবীরা যখন প্রথম এদেশে এসেছিলো তখন তারাই সারা প্রদেশকে নিজেদের রীতি ও পদ্ধতিতে গড়ে তুলছিলো। দাস ব্যবসায়ে এরা ছিল জগতের অগ্রনী। তাই কাফ্রী নরনারী বেচাই এদের বিশেষ ব্যবসা ছিলো।

মেঘের খেলা

মোমবাসায় নেমে সহরটীকে বেশ ভালো করে প্রদক্ষিণ করে নিলাম। এখানে ব্যবসার ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের ধারা ইংরাজী ভাবে ও রীতিতে চলে। টাকার বদলে এখানকার পয়সা পাউণ্ড শিলিং ও সেণ্ট। একশটী সেণ্টে একটী শিলিং, যার দাম আমাদের সাড়ে দশ আনা। শিলিংএর নোট চলে কাজেই পাউণ্ড বা ষ্টারলিং নামেই আছে কার্য্যতঃ।

মোমবাসা থেকে ১১ই তারিখ সকাল ৮॥ টার সময় আমরা টাঙ্গানিকার প্রধান সহর আরুষার দিকে যাত্রা আরম্ভ করলাম। জঙ্গলে জঙ্গলীগণের ও বন্যজন্তুর ছবি তোলবার আবশ্যকীয় জিনিষপত্র সবই সঙ্গে নিয়ে ছয়খানি লরিতে, অর্থাৎ তিনখানি বাস আর তিনখানি মালের লরিতে বার হয়ে পড়লাম।

মোমবাসা একটী দ্বীপ কাজেই পুল পার হয়ে গাড়ী আমাদের পাহাড়ের চড়াইতে উঠতে লাগলো। পথের দৃশ্য অতি সুন্দর। ছোট ছোট বাগানবাড়ী পেরিয়ে গ্রাম পেলাম। বাংলার প্রাকৃতিক অবস্থানের মধ্যে যদি গোলাকৃতি কুটীর স্থাপন করা যায় তাহলে ঐ গ্রামের রূপ কল্পনা করা যায়। মাটীর কলসের বদলে শুকনো লাউয়ের কলস কাঁকে নিয়ে মেয়েরা জল নিয়ে আসছিলো, আমি চেয়ে চেয়ে পল্লী সুন্দরীদের দেখতে লাগলাম। সর্ব্ব অঙ্গ চিত্রিত যেন কষ্টিপাথরে খোদিত মূর্ত্তি। শিরের শোভা কেশবিন্যাসের বদলে নেড়া মাথা। যার চুল আছে তার সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। কুঞ্চিত ছোট ছোট ছাঁটা ঘাসের মত চুল এদের কদর্য্যই করে, তাই অনেক ভেবে এজাতি তাদের চুলগুলির উপর ক্ষুর চালিয়েছে।

দেখতে দেখতে আমাদের মটর প্রায় দেড় হাজার ফিট সমুদ্র থেকে উচ্চে উঠে পড়লো। এ অঞ্চলটী পাহাড়ে সমাচ্ছন্ন। কিন্তু পাহাড়ের গাত্র ঘন জঙ্গলে ঢাকা, তার মধ্যে নারিকেলই বেশী। নিম্নস্থিত মোমবাসা নগরের দৃশ্য—

পথের সাথী

মোমবাসার পুল এবং ডকের দৃশ্য অতি সুন্দর। বন্দরের মধ্যে চার পাঁচটী প্রাকৃতিক খাল মোমবাসার চারি পাশ ঘুরে যেন তাকে নাগপাশে জড়িয়ে রেখেছে। তারই একটীতে মোমবাসার পুরাতন বন্দর। তারই তীরে Fort Jesus। ফোর্ট জিসাস পর্ত্তুগীজদের পুরাতন কীর্ত্তি নির্দ্দেশ

করছে। তারই অদূরে সহরের মধ্যে পর্ত্তুগীজদের প্রতিষ্ঠিত মনুমেণ্ট। সবই ক্রমে দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে যেতে লাগলো। উপরের কাফ্রি পল্লীর নরনারীরা আবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। মেয়েদের পরণে পাটের ঝুরীর মত দেশীয় ঘাসের ঘাগরা; বুকে কারো ফালি কাপড় বাঁধা, কারো তাও নেই। ইংরাজী হুলা হুলা নাচে যা পরিধানের রেওয়াজ আছে—এ অনেকটা তাই। দেখে মনে হয় এদের পোষাক ও নাচের অনুকরণে হুলা নাচের সৃষ্টি। পুরুষদের কটিদেশ চামড়া বাঁধা, হাতে তীর ধনু।

আমাদের মোসি-ক্যাম্প, অদূরে মাউণ্ট কিলিম্যানজারো

প্রায় ৫০ মাইল পরে আমরা এক প্রকাণ্ড প্রান্তরে এসে পৌছলাম। এটী দৈর্ঘ্যে ১০০ মাইল। প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে বাবলার বন ও রাশি রাশি ধূলো। এই প্রান্তরের নাম "টারু মরুভূমি"। এই পথের দুধারে ২০ হতে ৫০ ফিট পর্য্যন্ত উঁচু উইয়ের প্রাসাদ। এর ত্রিসীমানায় জলের নাম গন্ধও নেই। এইখানে আমাদের প্রথম পথরোধ করে এক বানরের দল। সংখ্যায় তারা হবে প্রায় ৫০টী, গায়ের রং সবুজ ও নীলের ডোরা—যাকে ইংরাজীতে গ্রিল্ বলে। এদের ছবি নেবার আশায় তাড়াতাড়ি ক্যামেরা ফিট করলাম, কিন্তু বোধকরি এরা আমাদের অভিপ্রায় বুঝে দৌড়ে পালালো। অদূরে বাবলার ডালে ও আশে পাশে বসে বোধ করি আমাদের বলতে লাগলো, "অত সহজে ছবি তোলবার মতো আমরা সুলভ নই হে, এখনো দেরি আছে!" আমরা তাদের আশা ছেড়ে দিয়ে ষ্টিয়ারিংএ মন দিলাম; গাড়ী তীর বেগে ছুটে চললো। এই রাস্তাগুলির বিশেষত্ব যে যতদূর দু চোখের দৃষ্টি যায়—ততদূর এরা বরাবর সিধে দৌড়ে চলেছে—দূরান্তে পাহাড়ের উপর দিয়েও এমনিতর সোজাই চড়ে পরপারে বিলীন হয়েছে।

প্রায় বেলা ১॥০টার সময় আমরা কেনিয়া ও টাঙ্গানিকার সন্ধি সীমান্তে পৌছলাম। জায়গাটীর নাম "ডয়", এরই প্রায় ১০ মাইল দূরে একটী পার্ব্বত্য নদী—তারই ধারে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য বিশ্রাম নিলাম। মটর তার পরপারে রেখে নদীতে হাতমুখ ধুতে এসে দেখি এক অবাক কাণ্ড। নদীর কোলের বালির সাথে সোনার কুচি। সারা নদীর বুকে সূর্য্যের আলোক পড়ে সে যেন এক সোনার হাট বসিয়েছে। ঘাটশিলার সুবর্ণরেখাতেও সোনার কুচি দেখেছি, কিন্তু এ রকম প্রচুর পরিমাণে সোনার ধূলো এর আগে কখনো দেখিনি। নদীটার দু পাশে বড় বড় Tiger-grass "বেঘো ঘাস" অর্থাৎ যে

মাউণ্ট কিলিম্যানজারোকে ঘিরে মেঘমালার স্বপ্নপুরী রচনা

ঘাসের ভেতর বাঘ থাকে। তারই মাঝে মধ্যাহ্নে হাজার হাজার ছাগল জল খায়। দেখে মনে হলো বাঘ ছাগলের দেখা হয় কি না হয় জানিনা কিন্তু ছাগলের সাথে এই বেঘো ঘাসের পরিচয়টা মন্দ নয়। সেই নদীতীরে শুধু

আমরা মধ্যাহ্নের আহারাদিই সমাপ্ত করলাম না বরং ছবির প্রথম আরম্ভ "মুহুরত" এই থানেই উত্থাপিত করলাম। নদীর পাড়ের উপরে উঠে দেখলাম দূরে ২০।২৫টী অষ্ট্রীচ্—উটপাখী। কিন্তু এরা নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হলো। ছবি তোলার আকাঙ্ক্ষা বাড়লো অথচ বস্তু নাগালের বাইরে যাওয়ায় মনক্ষুন্ন হয়ে দৃষ্টি ফেরাতে দেখলাম প্রকৃতির অপরূপ খেলা। সত্যিই আফ্রিকার মতো মেঘের এমন অদ্ভুত খেলা জগতের আর কোথায় বড় একটা দেখা যায় না। আকাশ নীল স্বচ্ছ—অথচ মেঘের আনাগোনার বিশ্রাম নেই। ২০০০ ফিটের উচ্চতায় মাঠের উপর থেকে আরম্ভ করে গাছের মাথায় ভরা মেঘ, অথচ সূর্য্যকিরণের অভাব নেই।

মাউন্ট কিলিম্যানজারোর তলায় ছবি তোলার আয়োজন

গাড়ী চলল। "ডয়" থেকে প্রায় ১০ মাইল দূরে "মোশি" সহর। এটী টাঙ্গানিকার একটী প্রধান সহর। এইবার আরম্ভ হলো হরিণের চকিত গতি। দলে ৭০।৮০টী করে—ক্ষিপ্র গতিতে আমাদের যাওয়ার পথ অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে। এই সময় পাশের জঙ্গলে পেলাম "জিরাফ"। এটী ছোট দল—সমষ্টিতে মাত্র দশ বারটি। কয়েকটীর ছবি নিলাম কিন্তু তৃপ্তি হলো না, তবু আমাদের নবীন পথের সাথী বলে এদের উপরই ছবির বউনী করলাম, আর জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে বন্য জন্তুর ছবি নেবার মহলাও হয়ে গেল। ষ্টিল ফোটোতে একটী জিরাফের ছবি নিলাম। পরে পথিমধ্যে এদের আরও দর্শন করলাম বটে কিন্তু সন্ধ্যার আঁধার ঘিরে আসছিলো বলে ছবির প্রচেষ্টা স্থগিত রাখলাম।

সেদিন রাত্রে প্রায় ৮টার সময় "মোসি" সহরে এসে পৌছলাম। রাত্রের ঘনান্ধকারে কয়েকটী আলোকময় দোকান ছাড়া সহরের কিছুই দৃষ্টিগোচর হলো না। আমাদের রাত্রের আস্তানা হলো এখানকার ইমিগ্রেসান অফিসারের বাড়ী। বিশেষ যত্ন ও আপ্যায়িত করে এঁরা আমাদের অতিথি করলেন। রাত্রের ভোজ সমাধান করে সারাদিনের ক্লান্তির শান্তি আনলাম। গৃহস্বামী আমাদের দুখানি করে কম্বল দিয়ে গেলেন। দেখে হাসি পেলো; বললাম এখন রীতিমত গরম বোধ হচ্ছে কাজেই নিজেদের বাছে যা আছে তাও গায়ে দেবার প্রয়োজন হবে না। তিনি স্মিত মুখে বললেন "থাক দরকার লাগে ব্যবহার কর্ব্বেন"। তখন কে জান্তো যে এর মধ্যে অতি বড় প্রচ্ছন্ন কৌতুক ভরা ছিলো। রাত্রে গা সির্ সির করায় নিজেদের বস্ত্র বাস খুলে গায়ে দিলাম। কিন্তু যত রাত বাড়ে—ততই শীতের বিকট বিদ্রূপ। সকালে যখন দেহকে শয্যা থেকে মুক্ত করলাম তখন পর পর তিনখানি কম্বলই গা থেকে ঝেড়ে ফেললাম।

সকলের প্রাতঃকৃত্যের অবকাশে আমি বাসার পিছনের খোলা মাঠে গিয়ে দাঁড়ালাম। দৃষ্টির সাথে বিনিময় হলো এক বিরাট পাহাড়ের সাথে। সারা অঙ্গ তার মেঘে আবৃত, মাথার চূড়ায় বরফের জটা। মনে হলো—এ কী গম্ভীর রূপে সন্ন্যাসী এলে অপরূপ রূপে! দার্জিলিংএ গিয়ে আমার এমনই বোধ হয়েছিলো। কিন্তু স্থির চিত্তে চিন্তা করার পর আশ্চর্য্যের আর সীমা থাকে না। বিষুব রেখার উপর অবস্থিত এই পাহাড়, অথচ তার শিখরে বরফ! সত্যই প্রকৃতির বিপরীত আচরণ! এক অপূর্ব্ব বিস্ময়ে দলের সকলের প্রত্যাশায় চেয়ে রইলাম। এই পর্ব্বতরাজির নাম মাউন্ট কিলিম্যানজারো—উচ্চতায় ইনি ১৯৮০০ ফিট্; আফ্রিকার সর্ব্বোচ্চ শিখর। এঁর সারা অঙ্গ ঘিরে পশু ও সরীসৃপের বাস। প্রথম স্তরে হিংস্রজন্তু, দ্বিতীয় স্তরে হাতীগণ্ডার, ও তৃতীয় স্তরে সাপের বাস।

নাগপাশে বদ্ধ এই তুষারশিখাশোভিত কিলিম্যানজারো সত্যই শিব হয়ে বসে আছেন। প্রভাতে সূর্য্যকিরণে কত কীরীট ঝলমল করে উঠছিলো। আমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম এই অপূর্ব্ব সুন্দর গিরিশেখরের ছবি তোলার প্রত্যাশায়।

মোসী সহরকে বেড়ে একটী নদী খরতর বেগে ছুটে চলেছে। জন্ম তার কিলিম্যানজারোর শিখর চূড়ায়, তাই বরফ গলা জল। তারই পাশে রাস্তা ঘুরে ঘুরে আরুষার দিকে ছুটে চলেছে। নদীকে বার বার অতিক্রম করেছে কয়েকটী পাকা সেতু। এগুলি নাকি জার্ম্মানদের আমলে তৈরি হয়েছিলো। এই টাঙ্গানিকা প্রদেশ পূর্ব্বে জার্ম্মাণদের অধিকারেই ছিলো। মহাযুদ্ধের পর থেকে এটি ইংরাজ শাসিত। অধুনা এই প্রদেশের চাহিদায় জার্ম্মাণী আবার ঝুঁকে পড়েছে। মোসী সহরের এলাকা খুব বেশী না হলেও দেখ্‌তে ভারী সুন্দর—গিরিমালার বুকের উপর ইউকালিপটাসের ঘন জঙ্গলে এর শোভাকে দ্বিগুণ করে তুলেছে। নদীর পারে দাঁড়িয়ে আমরা কিলিম্যানজারোর ছবি তুললাম। মেঘমালার অদ্ভুত গতি পাহাড়ের গায়ে স্বপ্নপুরী রচনা করছিলো।

ক্রমে বেলা বাড়তে লাগলো। পথ-চল্‌তে সুরু করলাম। পথের দুধারে হরিণের দল আর মাঝে মাঝে অষ্ট্রিচ। পথিমধ্যে উল্লেখযোগ্য আর কিছু দেখিনি। বেলা প্রায় ১১টার সময় টাঙ্গানিকার প্রধান সহর আরুষায় পৌছলাম।*

(ক্রমশঃ)

শ্রীহীরেন বসু

---

* শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বসু একজন সুবিখ্যাত সিনেমা ডিরেক্টর। বোম্বাইয়ের একটি বৃহৎ সিনেমা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ইষ্ট আফ্রিকার ভয়সঙ্কুল নিবিড় অরণ্য প্রদেশে প্রবেশ করিয়া ছবি তোলার সুযোগে ইনি যে অসাধারণ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহার সচিত্র বিবরণ এই ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে। বাঙলা দেশের মাসিকপত্রে এধরণের মৌলিক প্রবন্ধ খুব সুলভ নহে। সঙ্গীত জগতেও হীরেন্দ্র বাবু যথেষ্ট সুপরিচিত। ইঁহার রচিত এবং গীত বহু গান গ্রামোফোনে প্রকাশিত হইয়াছে। সর্বজন আদৃত 'শেফালী তোমার আঁচলখানি বিছাও শারদ প্রাতে' গানটি ইঁহারই রচিত এবং গীত। বিঃ সঃ

প্রভাতী সুরের বেণুটী যখন বাজে

শ্রীঅমিয় সেন

প্রভাতী সুরের বেণুটী যখন বাজে,
কুয়াসা আবরি দিক্‌-বঁধূ রহে লাজে,
উষার দুয়ারে আভাষে লালিমা চাহে,
আমার পরাণে কে যেন মধুরে গাহে!

আজিকে জানি না কাহার মধুৎসবে,
পত্রে বাজিছে নূপুর মধুর রবে!
পূর্ব্বাচলের রক্ত-রাঙানো মেঘে
তারি আবাহন পেনু যে প্রভাতে জেগে।

অস্ত-আকাশে পাণ্ডুর চাঁদ বুঝি,
নীলিমার মাঝে তাহারে পেয়েছে খুঁজি;
বিদায় বেলার অশ্রু তাহারি তরে,
ঘন-পল্লবে শিশির হইয়া ঝরে-।

নামিল কে যেন আলোর ঝর্ণা বাহি!
মত্ত বিহগ বুঝিবা তাহারে চাহি,
ঢালিছে বিশ্বে সুরের অমিয় ধারা,
আবেশে পরাণ শিহরে পাগল পারা।
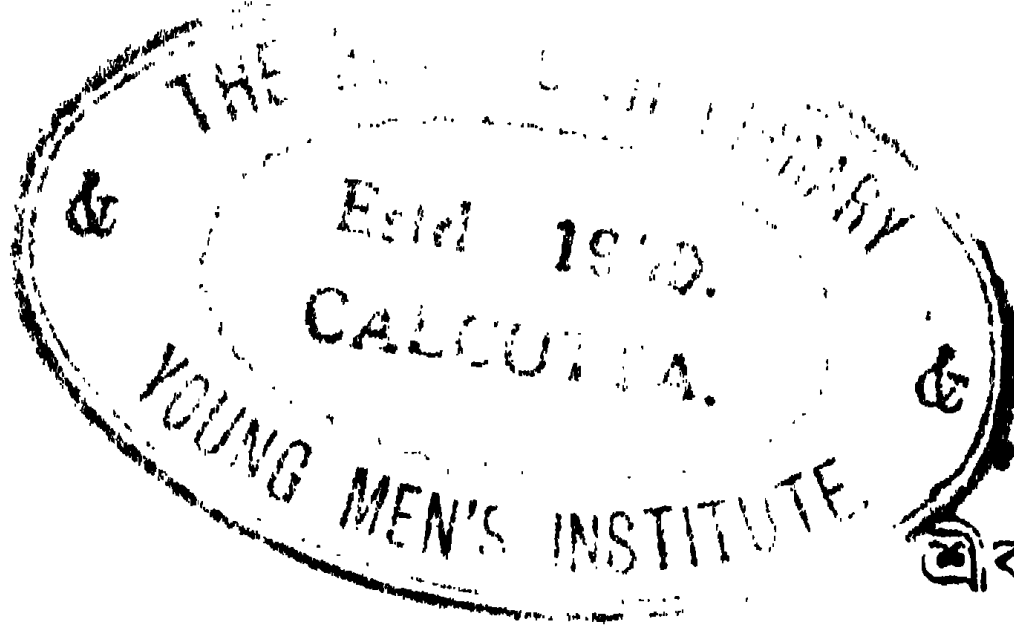
গীতা ও শাস্ত্র

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ফাল্গুনের বিচিত্রায় অনিলবাবুর হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজ নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিবার পর যদি বিচিত্রার পাঠকপাঠিকাগণ অগ্রহায়ণের বিচিত্রায় প্রকাশিত "কোন্ পথ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে আমি যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলাম, অধিকাংশ প্রশ্নের অনিলবাবু কোনও সদুত্তর দেন নাই।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনিলবাবু বলিয়াছেন, "গীতার শিক্ষায় স্তর ভেদ আছে। এক স্তরে শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হয়। কিন্তু ইহাই চরম মীমাংসা নহে। মানুষ এবং মানব সমাজও এমন অবস্থায় উপস্থিত হয় যখন প্রচলিত শাস্ত্রকে সম্যক ভাবে মানিয়া চলা তাহার সম্ভব হয় না, তখন সাত্ত্বিক বুদ্ধি অনুসরণ করিয়া বিচারের দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হয়।" প্রথমতঃ এ সকল কথা গীতায় কোথাও নাই। ইহা অনিলবাবুর কল্পনা মাত্র। দ্বিতীয়তঃ অনেক স্থলে দেখা যায় যে যে সকল শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা মানিয়া চলা সম্ভব অনিলবাবু সেগুলিও বর্জন করিতে বলেন। তিনি বলেন ঐ সকল শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অনিষ্টকর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে শাস্ত্র বলিয়াছেন * চণ্ডালের পক্ষে মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নহে। এ ব্যবস্থা মানিয়া চলা সম্পূর্ণ সম্ভব। কিন্তু অনিলবাবু বলেন যে এই ব্যবস্থা ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং পরিত্যাগ করা উচিত। অতএব অনিলবাবু যদিও মুখে বলিতেছেন যে শাস্ত্রের ব্যবস্থা পালন করা সম্ভব না হইলে সে ব্যবস্থা ত্যাগ করিতে দোষ নাই, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার অন্তরের বিশ্বাস এই যে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা মন্দ, অর্থাৎ তাঁহার মত গীতার মতের বিপরীত। কারণ গীতা বলিয়াছেন যে শাস্ত্র নির্দেশ অনুসারে কর্ত্তব্য নির্ণয় করা উচিত। (গীতা ১৬;২৪)। তৃতীয়তঃ, অনিলবাবু বলিয়াছেন যে "সাত্ত্বিক বুদ্ধি" অনুসরণ করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করা উচিত। এক্ষণে প্রশ্ন হইবে কোনও ব্যক্তির বুদ্ধি যথার্থই সাত্ত্বিক কিনা তাহা কিরূপে নির্ণয় করা যাইবে। এক ব্যক্তি মনে করিতে পারেন যে তাঁহার বুদ্ধি সাত্ত্বিক, কিন্তু হয়ত প্রকৃত পক্ষে তাঁহার বুদ্ধিতে অনেক পরিমাণে রজো গুণ এবং তমোগুণ বিদ্যমান। সুতরাং তিনি তাঁহার বুদ্ধির সাহায্যে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইবেন না। বাস্তবিক পক্ষে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা সকল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রসূত। নচেৎ শ্রীকৃষ্ণ সে ব্যবস্থা অনুসরণ করিতে বলিতেন না। শ্রীমদ্ভাগবত ১১৷৫৭৷৫৩ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে স্মৃতি শাস্ত্রের ব্যবস্থা সকল তাঁহারই আদেশ।

> ব্রহ্মবন্ধুর্ন হন্তব্যঃ আততায়ী বধার্হণঃ
> ময়ৈবোভয়মাম্নাতং পরিপাহ্যনুশাসনং॥

"বেদাঃ বিভিন্নাঃ"

অনিলবাবু বলেন "বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ" এই শ্লোকটির আমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহা ভুল, তাঁহার ব্যাখ্যাই ঠিক। তাঁহার ব্যাখ্যা এই যে মহাজনের আচরণ

---

* চাণ্ডালৈরন্ত্যজৈশ্চৈব তথান্য প্রতিলোমজৈঃ
ম্লেচ্ছৈশ্চ নীচ চাণ্ডালৈশ্চ কুনিন্দ্যাদিদূষিতৈঃ
এবমাদিভিঃ সংস্পৃষ্টে দেবাগারে বিশেষতঃ
স্পৃষ্টে প্রবেশনে বাধা পূজাকালে চ দর্শনে। ভৃগু সংহিতা
বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থা ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। পূর্বজন্মের কর্মের দোষে দেহ অপবিত্র হয় এবং তদনুসারে অধিকার নির্দ্দেশ করা হয়। অধিকার ভেদ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিতেন, মা কোন ছেলের জন্য মাছের পোলাও রাঁধিয়া দেন, আবার কোনও ছেলের পোলাও হজম হয় না তাহার জন্য মাছের ঝোল করিয়া দেন। মাতার ন্যায় হিতকারী শাস্ত্রও সেইরূপ বিভিন্ন বর্ণের জন্য বিভিন্ন কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দেখিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করা উচিত, শাস্ত্র দ্বারা কর্ত্তব্য নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু অনিলবাবুর এই ব্যাখ্যার সহিত গীতার উপদেশের সামঞ্জস্য নাই। কারণ গীতা বলিয়াছেন যে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ (গীতা ১৬।২৪)। "বেদাঃ বিভিন্নাঃ" ইহা যুধিষ্ঠিরের উক্তি, "শাস্ত্রং প্রমাণং" ইহা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। অনিলবাবু কি বলিতে চাহেন যে এখানে শ্রীকৃষ্ণের ভুল হইয়াছিল, যুধিষ্ঠিরের উক্তিই ঠিক? আমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছি ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি এবং যুধিষ্ঠিরের উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইয়াছে। আমি বলিয়াছি যে বেদাঃ বিভিন্নাঃ এই শ্লোকের অর্থ এই যে বেদে বিভিন্ন পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সকল পথই সত্য, কারণ বেদ অভ্রান্ত, কিন্তু বেদ নির্দিষ্ট বিভিন্ন পথের মধ্যে কোন্ পথ গ্রহণ করিব এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে, সেই সংশয়ের মীমাংসা যুধিষ্ঠির এই ভাবে করিয়াছেন যে শাস্ত্র অনুসরণকারী কোনও মহাপুরুষের নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হওয়া উচিত। সে মহাপুরুষ যে শাস্ত্র অনুসরণ করিবেন এবং শাস্ত্র নির্দিষ্ট পথই নির্দ্দেশ করিবেন ইহা যুধিষ্ঠির স্পষ্টভাবে বলেন নাই বটে। কিন্তু গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যখন বলিয়াছেন যে যাহা শাস্ত্রবিরোধী তাহা অকর্ত্তব্য তখন এ বিষয়ে সন্দেহের কিছুমাত্র অবসর নাই।

আমি বলিয়াছিলাম যে বেদে যেমন বিভিন্ন পথ আছে, মহাজনগণও সেইরূপ বিভিন্ন পথ গ্রহণ করিয়াছেন, কোন্ মহাজনের পথ গ্রহণ করিব? অনিলবাবু উত্তর দিয়াছেন, "যে মহাপুরুষ তাঁহার দিব্য-চরিত্র এবং আদর্শ ব্যক্তিত্বের দ্বারা আমার হৃদয় মন আকর্ষণ করিবেন আমি তাঁহারই অনুসরণ করিব।" শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষ অনেকেরই হৃদয় মন আকর্ষণ করিয়াছেন, এবং এই মহাপুরুষগণ সকলেই বলিয়াছেন যে শাস্ত্র ভগবানের আদেশ, শাস্ত্র লঙ্ঘন করা উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ কোনও ব্যক্তির দিব্য চরিত্র এবং আদর্শ ব্যক্তিত্ব আছে এইরূপ অনেকে মনে করিতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক সে ব্যক্তির চরিত্র তত ভাল না হইতে পারে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে ভণ্ড ব্যক্তি গুরু সাজিয়া অনেকের অনিষ্ট করিয়াছে। শাস্ত্র অনুসারী কোনও গুরুর আশ্রয় লইলে এরূপ অনিষ্টের সম্ভাবনা কম কারণ তিনি শাস্ত্র বিরোধী উপদেশ দিতে পারিবেন না।

গীতার ১৬।২৩ শ্লোকে "কামকারতঃ" এই শব্দ ব্যবহার হইয়াছে এজন্য অনিলবাবু বলিয়াছেন যে শাস্ত্রব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া যেরূপ কর্ম করিতে ভাল লাগে সেইরূপ কর্ম করিলে দোষ হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্র ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয় তাহা করিলে দোষ হয় না। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। না জানিয়াও আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়। অধিকন্তু পরবর্ত্তী ১৬।২৪ শ্লোকে "কাম-কারতঃ" শব্দের ব্যবহার নাই, এবং সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে যাহা শাস্ত্রবিহিত তাহাই কর্ত্তব্য, যাহা শাস্ত্র নিষিদ্ধ তাহা অকর্ত্তব্য। আমাদের (বা আমাদের গুরুদের) যদি মনে হয় যে শাস্ত্র বিধান ভুল বা অনিষ্টকর, তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে আমাদের বুদ্ধি যথেষ্ট নির্মল নহে বলিয়া আমরা শাস্ত্র বিধানের উপকারিতা বুঝিতে পারিতেছি না। গীতা ১৮।৩২ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে তমোগুণ প্রবল হইলে কর্ত্তব্যকে অকর্ত্তব্য মনে হয়।

অনিলবাবু বলিয়াছেন যে গীতা সপ্তদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে সাত্বিক বুদ্ধির সাহায্যে শাস্ত্রবিধান লঙ্ঘন করিলে দোষ হয় না। যদি অনিলবাবুর এই উক্তি যথার্থ হইত তাহা হইলে গীতা পরস্পরবিরোধী হইত,—কারণ ১৬।২৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে শাস্ত্রবিধান লঙ্ঘন করিলে দোষ হয়। প্রকৃত পক্ষে ১৭ অধ্যায়ে একথা কোথাও নাই যে সাত্বিক বুদ্ধির সাহায্যে শাস্ত্র বিধান লঙ্ঘন করিলে দোষ হয় না। অনিলবাবুর উচিত ছিল যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া। ১৭ অধ্যায়ের প্রারম্ভে শাস্ত্রবিধি ত্যাগের কথা আছে, কিন্তু ত্যাগ করিলে যে দোষ হয় না ইহা বলা হয় নাই। প্রত্যুত ১৭।১১ শ্লোকে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী যজ্ঞকে সাত্বিক যজ্ঞ বলা হইয়াছে এবং শাস্ত্রবিধি অনুসরণ না করিয়া যজ্ঞ করিলে সে যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলা হইয়াছে। সুতরাং ১৭ অধ্যায়েও একথা পাওয়া যাইতেছে যে শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করা উচিত, লঙ্ঘন করা উচিত নয়।

অনিলবাবু বলিয়াছিলেন শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা না থাকিলে তাহা লঙ্ঘন করা উচিত। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম গীতায় কোথায় ইহা আছে। ইহার উত্তরে অনিলবাবু গীতার এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন—ইহার অর্থ "হে অর্জ্জুন, সকল সময়ে যোগযুক্ত হইয়া থাকিবে।" যোগযুক্ত হওয়ার সহজ অর্থ ঈশ্বর চিন্তা করা। এই বাক্যে শাস্ত্রলঙ্ঘন করিবার সমর্থন অনিলবাবু কিরূপে পাইলেন ইহা অনিলবাবুই বলিতে পারেন।

মনুসংহিতা

অনিলবাবু বলেন যে কোনও পণ্ডিত মনুসংহিতা রচনা করিয়া তাহা মনুর নামে প্রচার করিয়াছেন, বাস্তবিক যে এ সকল ব্যবস্থা মনু প্রণয়ন করিয়াছেন ইহা সত্য নহে। আমি একবার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম যে মনুসংহিতার ব্যবস্থাগুলি মনু কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। অনিলবাবু তাঁহার উক্তি সমর্থন করিবার জন্য নানারূপ কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে মনু একজন নহে, চারিজন; বাস্তবিক মনু বলিয়া কোনও ব্যক্তি ছিল কিনা তাহা সন্দেহ; মনুসংহিতার ভাষা পরীক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে ইহা "খৃষ্টীয় শতাব্দীর" (?) বেশী পূর্বে রচিত হয় নাই; দৈনিক বসুমতীর কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তির রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে ধর্ম সম্বন্ধে কোনও সংশয় হইলে কোনও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে মনু মনোনয়ন করা হইত, তখন তিনি বিধান দিতেন। (এই লেখকটি কে?) তাঁহার এই অদ্ভুত উক্তির সমর্থনে তিনি কি প্রমাণ দিয়াছেন? এবং সর্বশেষে Monier Williams এর রায় উদ্ধৃত করিয়াছেন "It is an irregular compendium of rules and maxims by different authors."

মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্‌ বলিয়াছেন যে মনুসংহিতার বিধানগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির রচনা। বিলাতী পণ্ডিতের এই উক্তি অনিলবাবুর বিশ্বাস উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে। কিন্তু এই উক্তির সমর্থনে উপযুক্ত যুক্তির অভাবে আমরা ইহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ। মনুসংহিতার রচনাকাল সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদের শাস্ত্র গ্রন্থের রচনা কাল যতদূর সম্ভব অর্বাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার যথাসম্ভব চেষ্টা করেন, যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকিলেও তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রচার করেন, এবং সেই জন্য বেদপুরাণ প্রভৃতির রচনাকাল সম্বন্ধে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত তাঁহারাই বারম্বার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, (অতএব অনিল বাবু অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন) যে মনুসংহিতার ভাষা দেখিলে কোনও সন্দেহ থাকে না যে ঐ গ্রন্থ যিশুখৃষ্টের বেশী পূর্বে রচনা হয় নাই। কিন্তু এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদেরই মত যে যাস্কের নিরুক্ত খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, এই যাস্কে মনুসংহিতার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে,* সুতরাং মনুসংহিতার ভাষা যে অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এ অবস্থায় মনুসংহিতার ভাষা দেখিয়া উহা খৃষ্টের বেশী পূর্বে রচিত হয় নাই এ সিদ্ধান্ত টিকিতে পারে কিরূপে? পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি হেতু অনিলবাবু এই অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করেন নাই। এই প্রকার ভক্তি হেতুই হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থাগুলি যাহা সকল হিন্দু-ধর্মগ্রন্থ এবং সাধু পুরুষ ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া সম্মান করিয়াছেন,—সেগুলি অনিলবাবুর চক্ষে এত হেয় বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

আর এককথা। তর্কের খাতিরে যদিই বা স্বীকার করা যায় যে মনুসংহিতা বেদের পরে রচিত হইয়াছিল এবং মনু বৈদিক যুগের ব্যক্তি, তাহা হইলেই কি এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে মনুসংহিতার ব্যবস্থাগুলি মনু দেন নাই? বৈদিক যুগেই যে মনুর কতকগুলি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ বেদই বলিয়াছেন,—

যৎ কিঞ্চ মনুরবদৎ তৎ ভেষজং

অর্থাৎ মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা ঔষধের ন্যায় হিতকারী। মনুর ব্যবস্থাগুলি মনুর সময় হইতে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, পরবর্ত্তী যুগে যিনি মনুসংহিতা রচনা করিয়া-

* Dr Radhakumud Mukherjee প্রণীত Hindu Civilisation গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ছিলেন তিনি তৎকালের প্রচলিত ভাষাতেই উহা রচনা করিয়াছিলেন। এই সহজ কথা বুঝিতে অনিল বাবু বড় কষ্ট পাইতেছেন এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে অভিবাদন করিয়া এরূপ অদ্ভুত মত প্রচার করিয়াছেন যাহা গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হয় যে ব্যাস বাল্মীকি শঙ্কর রামানুজ সকলেই ভ্রান্ত। কারণ ব্যাসদেব মহাভারতে মনুসংহিতা হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন,

পুরাণাঃ মানবোধর্ম সাঙ্গোবেদশ্চিকিৎসিতং
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ

অর্থাৎ পুরাণসকল, মনুসংহিতা, বেদ-বেদাঙ্গ এবং আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র ইহারা ঈশ্বরের আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত এজন্য যুক্তির দ্বারা আক্রমণ করা উচিত নহে।

আমি পূর্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি যে বাল্মীকি মনু-সংহিতা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে মনু এই কথা বলিয়াছেন (মনুনা গীতৌ)।

ব্রহ্মসূত্র ২।১।১ এর ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য মনুসংহিতা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন,

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্য মধিগচ্ছতি॥

মনুসংহিতা ১২।৯১

অর্থাৎ "যিনি সর্বভূতে আত্মদর্শন করেন এবং আত্মাতে সর্বভূত দর্শন করেন তিনি স্বারাজ্যলাভ করেন।" (মনুর দৃষ্টি কিরূপ উদার তাহা এই বাক্য হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। আজকাল অনেকে বলেন যে মনুর অনেক ব্যবস্থা ঘৃণামূলক এবং অনৈক্যসূচক। এরূপ বলিবার কারণ এই যে মনু পূর্বজন্মের কর্ম অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্বজন্মের কর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে মনুর ব্যবস্থা অন্যায় মনে হইবে না।)

শঙ্কর মনুসংহিতা হইতে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে মনুর মাহাত্ম্য স্বয়ং বেদ প্রচার করিয়াছেন, মনু যখন "আত্মা এক" এই মত প্রচার করিয়াছেন তখন সাংখ্য দর্শনের 'আত্মা বহু' এই মত গ্রহণ করা যায় না। মনু নামক একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার মতসকল মনুসংহিতাতে নিবদ্ধ হইয়াছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিলে শঙ্করাচার্য্য এরূপ কথা বলিতে পারিতেন না। এ বিষয়ে শঙ্করের মতের সহিত রামানুজের মতের কোনও অনৈক্য নাই কারণ ব্রহ্মসূত্র ২।১।২ সূত্রের ভাষ্যে রামানুজ বলিয়াছেন যে মনু যোগপ্রভাবে ব্রহ্ম দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ব্যবস্থাসকল জগতের বিশেষ হিতকারী। ৩।৪।৩৭ সূত্রের ভাষ্যে রামানুজ মনুসংহিতার শ্লোক প্রামাণিক বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন যে জপ প্রভৃতি সাধনার দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করা যায়।

সুতরাং অনিলবাবু যে কল্পনা করিয়াছেন যে হয়ত তাঁহার ন্যায় শঙ্কর রামানুজও এরূপ বিশ্বাস করিতেন যে "সমাজের কল্যাণের জন্য দেশকালোপযোগী বিধি রচনা করিয়া" মনুর নাম দিয়া চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে,—এ কল্পনা অলীক। মনু নামক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপদেশ মনুসংহিতাতে নিবদ্ধ হইয়াছে, এবং সে ব্যক্তি বেদজ্ঞ ও পূর্ণ জ্ঞানী শঙ্কর ও রামানুজের যে ইহাই বিশ্বাস ছিল এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবসর নাই। ভরসা করি ইহার পর আর অনিলবাবু দৈনিক বসুমতীর কোনও অজ্ঞাতনামা লেখকের অর্বাচীন রচনা উদ্ধৃত করিয়া এরূপ অদ্ভুত মত প্রচার করিবেন না যে মনুসংহিতার মনু একজন কাল্পনিক ব্যক্তি মাত্র।

অনিলবাবু বলিয়াছেন যে হিন্দু শাস্ত্রে একাধিক মনুর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে কোন্ মনুর উপদেশ মনুসংহিতাতে নিবদ্ধ হইয়াছে? তাঁহার অবগতির জন্য বলা যাইতেছে যে স্বায়ংভুব মনুর উপদেশ ইহাতে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা সুবিদিত। মনুসংহিতা ১।৩৩ শ্লোকে ইহার উল্লেখ আছে।

বিধবা বিবাহ

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে অনিলবাবুর যুক্তি কিছু অদ্ভুত। তিনি স্বীকার করিতেছেন, "মনুসংহিতা বিধবা বিবাহ সমর্থন করে নাই"। তিনি ইহাও বলিয়াছেন "মনুসংহিতা যে বেদমূলক তাহা আমি স্বীকার করি।" তথাপি তাঁহার মতে বিধবা-বিবাহের দোষ নাই কারণ পরাশর ও নারদ স্মৃতিতে একটি শ্লোক পাওয়া যায় যাহা পড়িলে মনে হয় যে বিধবা-বিবাহ সমর্থন করা হইয়াছে। ইহা সর্বজনবিদিত যে

ধর্ম বিষয়ে হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বেদ,—বেদের সহিত যদি স্মৃতির বিরোধ হয় তাহা হইলে সে স্মৃতিবাক্য প্রামাণিক নহে। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে পরাশর ও নারদের ব্যবস্থা যদি বেদবিরোধী হয় (অনিলবাবু তাহাই বলেন) তাহা হইলেও সেই ব্যবস্থা অনুসরণ করিতে হইবে অনিলবাবুর এই মত সম্পূর্ণরূপে যুক্তিবিরুদ্ধ। বাস্তবিক পক্ষে পরাশর ও নারদ কখনও বেদবিরোধী ব্যবস্থা দিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদের যে শ্লোকটী আপাততঃ বিধবা-বিবাহের সমর্থক বলিয়া বোধ হয়, তাহার প্রকৃত অর্থ কি তাহা বিচার করা প্রয়োজন। বেদ এবং মনুসংহিতার সহিত পরাশর বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে এখানে পতি শব্দের অর্থ বাগ্‌দত্ত পতি গ্রহণ করিতে হইবে। যদি অনিলবাবু বেদ ও মনুর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অন্য কোনও রূপে পরাশর বাক্য ব্যাখ্যা করিতে পারেন তাহা হইলে আমরা তাহা বিচার করিতে প্রস্তুত। কিন্তু এই শ্লোকের বেদবিরোধী ব্যাখ্যা কখনও গ্রহণীয় হইতে পারে না।

বিধবা বিবাহের সমর্থনে অনিলবাবু এইরূপ যুক্তি দিয়াছেন। বিধবার বিবাহ হয় না বলিয়া কোনও ক্ষেত্রে বিধবার চরিত্র নষ্ট হয়, বিধবার বিবাহ দিলে তাহাদের চরিত্র নষ্ট হইত না, সুতরাং সমাজে অধিকতর পবিত্রতা বিরাজ করিত। তাঁহার এই যুক্তি ঠিক হয় নাই। পাতিব্রত্য ধর্মের প্রভাবে অন্য সমাজ অপেক্ষা হিন্দু সমাজে ভ্রষ্ট চরিত্র রমণীর সংখ্যা কম। বিধবা পুনরায় বিবাহ করিবে না ইহা পাতিব্রত্য ধর্মের অঙ্গ। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে পাতিব্রত্য ধর্ম নষ্ট হইবে, তাহাতে সাধারণ ভাবে সকল রমণীর উপর প্রভাব মন্দ হইবে, মোটের উপর ভ্রষ্ট চরিত্র রমণীর সংখ্যা বাড়িবে, কমিবে না। পাশ্চাত্য দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। রমণীর চরিত্রের পবিত্রতা পাশ্চাত্য দেশে অধিক, অথবা ভারতবর্ষে অধিক *? সতী, সীতা, সাবিত্রী, প্রভৃতি রমণীর জীবন হিন্দুরমণীর চরিত্র প্রভাবান্বিত করিয়া তাহাদের চরিত্র জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। বিধবা বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ এই সকল পুণ্যশ্লোক রমণীর চরিত্রের বিরোধী। এ জন্য এই সকল প্রথা প্রচলিত হইলে কয়েকটি ক্ষেত্রে রমণীর অবৈধ প্রণয় নিবারিত হইতে পারে, কিন্তু মোটের উপর হিন্দু রমণীর চরিত্র উন্নত হইবে না,—অবনত হইবে।

অন্য কোনও ব্যক্তি এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারেন কিন্তু অনিলবাবু পারেন না। কারণ অনিল বাবু গীতার ভক্ত। এবং গীতায় ভগবান স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন

তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ
১৬।২৪

"কোন্ কর্ম কর্ত্তব্য কোন্ কর্ম কর্ত্তব্য নহে, এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ।" শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান বেদ। মনুসংহিতাও একটি সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থ এবং তাহা যে গীতার পূর্বে রচিত হইয়াছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, কারণ মহাভারতে মনুসংহিতা হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে "মানব ধর্ম" অর্থাৎ মনুর ব্যবস্থা সত্য, তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রয়োগ করা উচিত নহে। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিয়াছেন যে কর্ত্তব্য বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ, এবং এই শাস্ত্র শব্দে যখন মনুসংহিতাকে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং মনুসংহিতা যখন বিধবা বিবাহের বিরোধী, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বিধবা বিবাহ শ্রীকৃষ্ণের মতের বিরুদ্ধ, গীতার মতের বিরুদ্ধ।

অনিলবাবু অবশ্য এরূপ স্তর ভেদ করিয়াছেন যে প্রথম স্তরে মানুষের উচিত শাস্ত্র মানিয়া চলা, পরে সে উন্নত স্তরে সাক্ষাৎ ভগবানের বাণী হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া শাস্ত্র লঙ্ঘন করিতে পারে। কিন্তু বালবিধবা ত প্রথম স্তরেই পড়িবে। সুতরাং তাহার উচিত শাস্ত্র মানিয়া পুনরায় বিবাহ না করা। খুব অল্প সংখ্যক বিধবা অন্তরের মধ্যে সাক্ষাৎ ভগবানের বাণী লাভ করিয়া শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে, বিশেষতঃ সে যদি এরূপ প্রকৃতির বিধবা হয় যে তাহার কামপ্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল এবং বিবাহ না দিলে সে অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইয়া গর্ভবতী হইতে পারে (অনিল বাবু যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন)। (ক্রমশঃ)

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

* যদি কাহারও এ বিষয়ে কিছু সন্দেহ থাকে তাহা হইলে Judge Lindsay প্রণীত Revolt of Modern Youth গ্রন্থ পাঠ করিবেন। তিনি বলিয়াছেন "Of the girls of High school age mere than 90/ indulge in hugging and kissing, 50/ in other sex liberties. ইংলণ্ডে war babyর কথা সকলে জানেন। Bishop of St. Albans বলিয়াছেন "three fourths of birth prevention appliances manufactured in England are sold to the unmarried.

ডোরা

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য

বন্দরের সুমুখেই একটা পায়ে-চলা রাঙা মাটীর পথ...

...এঁকে বেঁকে বেরিয়ে গিয়ে দূরের নীল রঙের পাহাড়ের গায়ে গিয়ে মিশেছে; তারপরে আবার একটা মোড় ঘুরে সোজা চলে গেছে গ্রামের দিকে; পথের ধারে গমক্ষেত... পাইন ফার গাছের সারি;...একটু এগিয়ে গিয়েই একটা পুরাণো গীর্জ্জা, ভাঙা চোরা অবস্থায় পথের ওপরেই দাঁড়িয়ে; একটা গম-ভাঙা কল উজিয়ে—গ্রীনহেড নদীর সাঁকো পার হ'য়ে—মিটফোর্ডের বিলের পাড় দিয়ে কৃষক 'জন'এর গোলা-বাড়ী, মাইকেলের মেষের খোঁয়াড় পেরিয়েই পথের ধারের সেই চেনা বাড়ীটা.. সেই চেনা মুখের একটু হাসি—চেনা চাউনি...উইলি. .থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে...

"এইতো পৌঁচে গেছি."

নিজের পোষাকের দিকে তাকিয়ে ও একটু হাসে—তারপরে রুবির নাম ধ'রে ডাকে;...শুধু বোবা বাড়ীটা রিম্‌ঝিম্ ক'রে ওঠে...ঝুর ঝুর ক'রে পাইন গাছ থেকে কতকগুলো ছেঁড়া পাতা ঝরে পড়ে...

পথের ওধারের ওক্ গাছটায় বিকেলের রোদ্দুর রাঙা হ'য়ে পড়ে...

এক ঝলক বাতাস দেয়; ধুলোবালি আর ঝরা পাতা-গুলো উড়তে থাকে সৃষ্টিছাড়ার মত; ও চোখ দুটো দু'হাতে চেপে রাখে।...ও ভাবে রুবির কথা...; রুবির মুখখানা স্পষ্ট মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আর একখানা এলোমেলো কটা চুল ঘেরা করুণতা মাখান মুখ ভাসা ভাসা মনে পড়ে...

ও আবার রুবিকে ডাকে...রুবি বাড়ী নেই নাকি?

...জানলা দিয়ে উঁকী মেরে দেখে—রুবির ছোট্ট বোনটা কি সেলাই করছে...ওদের ছোট্ট কুকুর 'টমটা' ওর পায়ের কাছে কুঁকড়ে প'ড়ে রয়েছে;...রুবির মা ভাঁড়ার ঘরে ব'সে কলরব তুলেছে...রুবি নেই...ফিলিপের বাড়ী গেছে বোধ হয়; ওর সমস্ত শরীরটা রাগে জ্বলে যায়; কাল রুবি গ্রামের সব চেয়ে সুন্দর মেয়ে ব'লে নির্ব্বাচিত হয়েছে...এতে সব চেয়ে আনন্দ উইলির...

রুবিকে উপহার দেবার জন্য আনা' ফুলের তোড়াটা ও পথে ছুঁড়ে ফেলে দেয়...আর ভাবতে পারেনা ফিলিপের কথা...; চোখ দুটো দিয়ে আগুন ফুটে বেরুতে থাকে...

রুবি ওর সাথী, সেই কোন ছেলেবেলা থেকে; ওর জন্য ও পিতার আদেশ অমান্য করেছে...আর আজ কিনা...ও নিজের বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দেয়...

* * * *

সেদিনও এমনি ভাবেই ভোর হয়;...কুয়াসায় সবদিক স্পষ্ট দেখা যায় না;...বন্দরের জাহাজগুলো থেকে অনবরত পাক দিয়ে ধোঁয়া উড়ে যায়...সামনেই সমুদ্র. .দিগ্বলয় রেখায় একটু আধটু ভাঙা ঢেউয়ের চিহ্ন...

একটু পরেই সূর্য্য ওঠে...সমুদ্রের জল অনেকটা রাঙা হ'য়ে ওঠে...তীরের বালিগুলো চক চক করে...

ঠিক এই সময়ে ওরা তিনটীতে সমুদ্রের ধারে খেলতে আসে...

উইলি বড়লোক নাবিকের ছেলে; রুবি বন্দরের সব চেয়ে সুন্দর মেয়ে, আর ডোরা, এক শীত রাত্রের বাপ-মা হারিয়ে যাওয়া অসহায় অতিথি...। ডোরা থাকে উইলির পিতার আশ্রয়ে...

ওরা সমুদ্রের ধারের বালির ওপর লুটিয়ে পড়ে...ছুটো-ছুটি, লুকোচুরী খেলে...

দূরের পাহাড়ের ধারের ঝাপসা গাছের সার ফিকে হ'য়ে আসতে থাকে...; উইলির বাড়ীর মাথার ওপরকার গম্বুজটার ওপর রোদ বাঁকা হ'য়ে পড়ে; ইউ-গাছের ওপর দাঁড়কাক উড়ে বেড়ায়...

উইলি রুবিকে দেখিয়ে বলে—"ডোরা, আমার ছোট্ট সংসারের ছোট্ট বউ..."

বাধা দিয়ে ডোরা বলে, "না উইলি, এবার আমি তোমার বউ হব..."

ওরা দুজনে এই নিয়ে কথা কাটাকাটি করে।...ততক্ষণ রুবি তার ছোট্ট সংসারটী গুছোতে ব্যস্ত হয়;...কতকগুলো সামুদ্রিক ঝিনুক—দু'এক টুকরো দড়ি আর বালির স্তূপ··· এই নিয়েই ওর ছোট্ট সংসার···শেষ পর্য্যন্ত উইলির কথাই বজায় থাকে···ওই জিতে যায়।

···ডোরার নীল চোখদুটী নিরাশার অশ্রুতে ভ'রে যায়; কান্নার আবেগে কাঁপতে কাঁপতে বলে—"আমি তোমায় ঘৃণা করি উইলি···"

বালির ওপর ও বসে পড়ে···কালো চোখের পাতা হ'তে কয়েক ফোঁটা জল গাল বেয়ে পড়তে থাকে···ওর দেখাদেখি সরলা রুবিরও চোখে জল আসে—

ডোরার চোখদুটী রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বলে —কেঁদনা ডোরা। আমরা দুজনেই উইলির বউ—কেমন?"

ডোরা মৃদু হেসে রুবির হাত দুটো টেনে নেয়;···উইলি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে···

···এই ভাবে শত রকম আদর আবদার মান অভি-মানের মধ্য দিয়ে খেলাধুলা ক'রে ওদের দিন কেটে যায়...

* * * ওদের মনপ্রাণে যৌবনের জোয়ার আসে

ডোরা আর রুবি দুজনেই ভালবাসে উইলিকে..; উইলি রুবির ওপর ডোরার চেয়ে বেশী প্রসন্ন। রুবিকে ও সত্যই ভালবাসে···

উইলির পিতার ইচ্ছা ডোরার সঙ্গে তার ছেলের বিয়ে হোক...কিন্তু উইলি তা' চায় না...।

ছেলেকে কাছে ডেকে এনে বলে "উইলি—আমার পুত্র তুমি; আমার ইচ্ছা যে তুমি ডোরাকে বিয়ে কর। বাপ-মা মরা মেয়ে তোমাকে ছাড়া আর কাকেও জানেনা···তাই..."

উইলি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে···ডোরার ভাসা ভাসা নীল চোখ···অশ্রু সজল করুণ মুখখানি আর তার লাজনম্র ভাব ওর মনে পড়ে···কিন্তু ও যে রুবিকে ভালবাসে...।

মৃদু কণ্ঠে ও উত্তর দেয়—"বাবা, আমি জীবন থাকতে ডোরাকে বিয়ে করতে পারবোনা; আমি তাকে আমার বোনের মত স্নেহ করি—ভালবাসি···"

উইলির পিতা ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে; তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলে—

"তোমাকে বিয়ে করতেই হবে। আমি তোমাকে ভাববার জন্য কিছু সময় দিচ্ছি; তাতেও যদি তুমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ কর, তবে এ বাড়ীতে তোমার প্রবেশ পথ রুদ্ধ হবে, জেনো···"

উইলি দীপ্তকণ্ঠে ব'লে ওঠে—"বাবা, আপনার আদেশ আমি মাথা পেতে নিচ্ছি—এ বিয়ে আমি করতে পারবোনা ···আমায় ক্ষমা করুন—"

তারপর ও ধীরে ধীরে ঘর থেকে চলে যায়; দেওয়ালে টাঙানো যীশুর মূর্ত্তিকে প্রণাম করে—তারপরে বেরিয়ে পড়ে পথে। মিট্‌ফোর্ডের গলি-খুঁজি দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলে রুবির বাড়ীর দিকে ..

রুবিকে গিয়ে বলে—"রুবি, আমি বাবার আদেশ অমান্য করে এসেছি···এখন-

"—কেন অমান্য করলে উইলি?"

"—তা কি তুমি জাননা রুবি? বাবার ইচ্ছা আমি ডোরাকে বিয়ে করি···কিন্তু···"

"—কিন্তু কেন উইলি? বিয়ে করলেই তো পারতে—"

"—তা কেমন করে হবে? আমি তোমাকে ভালবাসি রুবি; এখন কি আমি আশা করতে পারি যে তুমি···"

বলতে বলতে মাঝপথেই ও রুবির মুখের দিকে তাকায়; রুবির গালদুটো লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠেছে···দু'চোখে জল টল্‌টল করছে···

"—বলো তোমার কি মত?"—রুবির হাত দুটো চেপে ধরে উইলি বলে।

রুবির নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে আনন্দে···; আস্তে আস্তে ও বলে—"হ্যাঁ···কিন্তু তুমি যেন আমায় ছেড়ে কোথাও যেওনা উইলি..."

দুজনে চেয়ে থাকে দুজনের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে···

···খানিকদূরে বন্দরের জাহাজগুলো বাঁধা রয়েছে দেখা যায়; দূরের গমক্ষেতের পাশের পায়ে চলা পথটা যেন এই দুপুরের রোদে গা এলিয়ে পড়ে রয়েছে; আকাশে দু'একটা পাখি উড়ছে কালির দাগের মত;···বহুদূরের কালো মেঘের মত পাহাড়টা···

* * * *

সেইদিন বিকেলবেলা, ডোরা পাহাড়ের ওপর গিয়ে বসে; তার সুমুখ দিয়েই ঘন জঙ্গল এঁকে বেঁকে নীচে নেমে গিয়ে পথের ধারে গিয়েই শেষ হয়েচে; দূরে নীল সমুদ্র···একসারি ঝাউগাছ বিকেলের মিঠে বাতাসে 'সেঁা সেঁা' করছে!

মাথার ওপর নীল-গাঢ় নীল আকাশ;...তার এক-প্রান্তে খণ্ড খণ্ড 'জলহারা' মেঘ জ'মে;···বন্দরে একটা জাহাজ ছাড়বার উপক্রম করছে; হঠাৎ ওর চোখ প'ড়ে যায় নীচে—দেখে···সমুদ্রের ধারেই একটা পাথরের আড়ালে, একটা ঝোপের মধ্যে বসে উইলি আর রুবি। ···ওরা পরস্পর বাহুবদ্ধ; 'তন্ময় হ'য়ে গল্প করছে দু'জনে—'

সামনের ঝাউগাছটায় রোদ বাঁকা হ'য়ে পড়ে; দলে দলে যুবারা বাদাম বনে বাদাম তুলতে যায়···ডোরার ওদিকে হুঁস নেই···

ওর বড়ো বড়ো চোখদুটো দিয়ে আগুন বেরুতে থাকে; মুখখানা ফ্যাকাসে হ'য়ে যায়···ও তবু দেখে—

···ওদের মুখে চোখে ভেসে উঠছে ডোরার অভিশাপ—ভবিষ্যৎ···

···ওদের মুখদুটো পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসে আরো—আরো—কাছে—

ডোরার চোখ ঝাপসা হ'য়ে যায় অশ্রুতে; ও মুখ ফিরিয়ে নেয়...তারপর...

তারপর ধীরে ধীরে উঠে পড়ে...পিছনের বনের দিকে আর তাকাতেও ইচ্ছা হয় না; ওরা দুজনে তখনও তন্ময় হ'য়ে রয়েছে। ডোরার চোখদুটো অন্ধকার হ'য়ে যায়; জীবনব্যাপি এক অতৃপ্ত ক্ষুধা বুকের মধ্যে পাক দিয়ে ওঠে।...স্বামীর মরণের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সৌভাগ্যবতীর সিঁথির সিঁদুর মুছে যায়...তেমনি ওর আশার সুখস্বপ্নের পরিসমাপ্তি!...দু'চোখ ওর জলে ভ'রে আসে—

বাড়ী পৌছোতেই উইলির বাবা ডোরাকে ডেকে পাঠায়।

ধীরে ধীরে বলে—"আমি তোমাকে স্নেহ করি ডোরা; আমি আদেশ করছি—তুমি আর উইলির ছায়া মাড়িও না; সে আমার পুত্র নয়। আমি তোমাকে মেয়ের মত পালন করেছি—আশা করি, তুমি আমার আদেশ রক্ষা করবে···সে এবাড়ীর কেউ নয়..."

এতগুলো কথা বলেই সে ব্যথায় ঝিমিয়ে পড়ে; পুত্রের একি ব্যবহার!

ডোরা রাজী হয়; উইলির কথা মনে হতেই ওর মনে কষ্ট হয়; কিন্তু 'উইলি যে ওকে ভালবাসে না—সে রুবিকে বিয়ে ক'রে সুখী হবে'—এই কথাটা ভাবতেই ওর মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ ক'রে ওঠে আর ভাবতে পারে না; প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু ও যে উইলিকে ভালবাসে—f বাসবেও···

ও ভাবে এ হতেই পারে না—পিতা কি কখনও ছেলেকে ভুলে থাকতে পারে? ও চায় উইলি রুবিকেই বিয়ে ক'রে সুখী হোক—তবু ফিরে আসুক...

* * * *

উইলির আর রুবির বিয়ে হ'য়ে যায়···

আনন্দের মধ্য দিয়ে ওদের তিনটী বছর কেটে যায়—

রুবি একটী পুত্রের জননী; উইলি সারাদিন কাজে বেরিয়ে যায়—তবু কাজের মধ্য দিয়ে পিতাকে যতটুকু ভুলে থাকতে পারা যায়; রুবি তার নিঃসঙ্গ সময়টুকু ওর ছেলে-টীকে আদর করার আনন্দে ভরিয়ে তোলে; আপন মনে ঐ এক বছরের শিশুকে ইতিহাসের গল্প যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী শোনায়...ছেলেটী বোঝেনা কিছুই···শুধু মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে—

রুবি ওকে বুকে চেপে ধরে—চুমু খায়···

···সন্ধ্যের সময় পাখিরা এসে ঘরের কোকরে আশ্রয় নেয়;···তাদের কিচ্ কিচ্ শব্দ ক্রমশঃ মিইয়ে আসে...

উইলি বন্দর থেকে ফিরে আসে। নাবিকের পোষাক পরা অবস্থাতেই ঘুমন্ত ছেলেটীকে আদর করে;...সোহাগ ক'রে রুবির গালে একটা টোকা মারে···তারপর রুবির কাছে সমস্ত দিনের অভিজ্ঞতা উজাড় ক'রে বলতে বসে—

নিজের কলারে লাগানো গোলাপ ফুলটা খুলে নিয়ে রুবির থোকা থোকা চুলে যত্নে পরিয়ে দেয় উইলি; পকেট থেকে একরাশ ঝিনুক বের ক'রে মেজেতে ছড়িয়ে দেয়…

…বাড়ীর পাশের পথটা ততক্ষণে আঁধারে ঢেকে যায়; পথগামী লোকদের কথাবার্ত্তার আওয়াজ কমে আসে… গ্রামের বাজারের দু' একটা আলোর ঝলককে মৃদু মৃদু কাঁপতে দেখা যায়…উঠানের আইভিলতার ঝাড়টা শির শির ক'রে ওঠে…

ওরা দুজনে তখনও ব'সে ব'সে গল্প করছে…সেই রূপ-কথার রাজপুত্তুর রাজকুমারী ওরা দুজনে; কত মান অভিমান-হাসিকান্না; তেপান্তরের মাঠের প্রাণের কথার ইতিহাস…ছেঁড়া পাতার মত অমন কত শত আজগুবি স্মৃতি…ওরা দুটিতে মাত্র তাদের সন্ধান জানে…

…কথায় কথায় উইলি রুবিকে তার সমুদ্রযাত্রার কথা বলে…

রুবির মুখ অন্ধকার হয়ে যায়; দু'হাতে উইলিকে জড়িয়ে ধ'রে বলে—"তুমি আমাকে এমন করে ছেড়ে যেওনা উইলি;…সত্যি আমি বাঁচবো না…"

উইলি আদর ক'রে ওর কেশগুচ্ছে হাত বুলিয়ে দেয়—

যাবার সময় বলে—"রুবি, আমাকে যেতেই হবে। ঈশ্বরের অভিপ্রেত এই যাত্রা; রুবি কেঁদোনা, আমি আবার আসবো…"

ওর চোখেও জল এসে যায়; ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটাকে বুকে চেপে ধরে—তারপর রুবির মুখচুম্বন করেই বেরিয়ে পড়ে…।

…রুবি ভাবে এতক্ষণ উইলি চলে গেছে দূরে—বহুদূরে… যেখানে ওর কাতর আহ্বান পৌঁছোয় না;…দুজনের মধ্যে ব্যবধান ঐ নীল সমুদ্র…ঐ বিরাটের কাছে গিয়ে ত' কথা চলে না।…রুবির মনটা হাঁপিয়ে ওঠে; কোন কাজে মন বসে না…উইলির বিরহ ওকি সইতে পারে? ছুটে যায় সমুদ্রের ধারে…হয়তো সে ফিরে আসবে আজকেই…

বালির ওপর ও বসে পড়ে—তাকিয়ে থাকে নীল সমুদ্রের দিকে…; কিছুই দেখা যায় না—শুধু নীল, নীল ভাঙা ঢেউ…

সামুদ্রিক পাখি দলে দলে ডাঙার দিকে উড়ে আসে…

সমুদ্রের জল বাড়ে…ও ভাবে উইলির কথা! সেই কতদিন আগে সে চলে গেছে! তার কত সৃষ্টিছাড়া আদর আবদারের মধ্য দিয়ে চলমান স্মৃতিগুলো মনের কোণে খাপছাড়া ভাবে ভেসে ওঠে…; ও একদৃষ্টে চেয়ে থাকে দিগ্বলয় রেখার দিকে…; দূরে দিগন্তে জাহাজের উন্নত মাস্তুল দেখা যায়—তারপর গোটা জাহাজটা…

রুবির বুক দুলে ওঠে…আপনা আপনিই বালির ওপর উঠে দাঁড়ায়…; তাকিয়ে থাকে জাহাজের দিকে একদৃষ্টে—জাহাজের ডেকের ওপর কত নরনারী ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে… উইলি নেই…

সমুদ্রের জল বেড়ে বেড়ে ততক্ষণে তার পা ছুঁয়েছে…; ও শুধু চেয়ে থাকে—জাহাজ তীরের ধার দিয়ে চলে যায় দূরে…তারপরে মিলিয়ে যায় বহুদূরের 'শুভ্র চক্ররেখায়'। ও তখনও চেয়ে আছে অনন্ত নীল সমুদ্রের দিকে…ওখানে ওর প্রাণের প্রশ্নের উত্তর দেবার কেউ নেই…

জল আরও বাড়ে…

…রোদ পড়ে গেছে—সন্ধ্যা নামছে। দূরে শোনা যাচ্ছে মেষের গলার ঘণ্টাধ্বনি—মেষপালকদের সন্ধ্যাকালীন গান; আকাশে নীড়প্রত্যাগত স্কাইলার্কের দল…

দু'ফোঁটা চোখের জল পায়ের নীচে সমুদ্রের জলের ওপর পড়ে…

তারায় তারায় আকাশ ছেয়ে যায়। বুকভরা এক বেদনা নিয়ে ও বাড়ী ফেরে; ঘরে যে ছোট ছেলেটা অনেক-ক্ষণ একলা ঘুমচ্ছে…

বাড়ী ফিরে এসে—রোজকার মত সে ঘুমন্ত ছেলেটাকে বুকে চেপে ধরে;—চোখের জলে বুক ভেসে যায়…

…লোকের মুখে ও শোনে উইলির কথা।…উইলি নীল সমুদ্রের আবর্ত্ত হতে বাঁচিয়েছে এক নিরাশ্রয় নাবিকের প্রাণ, সারা বন্দর ভরে যায় তার নামে…

রুবির মনটা তবু একটু শান্ত হয়…।

* * * *

এক বছর পরে…

এক দুপুরে উইলি ফিরে আসে বন্দরে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে।

রুবি ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে উইলিকে...দু'চোখ দিয়ে ওর জল ঝর্‌তে থাকে ; ও ভেঙে পড়ে অশ্রুর উচ্ছ্বাসে—

উইলি দু'হাতে রুবির মুখখানা তুলে ধরে...

সেই পুরোণো পথ দিয়ে দুজনে বাড়ী ফেরে ; পথের ধারেই উইলির বাবার বাড়ী। ঐদিকে চাইতেই ওর চোখে জল আসে ; বাড়ীর ফটকের ধারেই সেই নিজের হাতে লাগানো ওকগাছটা আজও ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে ; বাড়ীর পিছনদিকের বাগানটার কেয়ারী করা পাতাবাহারের গাছের সারি বুনো হ'য়ে গেছে ; ঝরা পাতায় বাগানটা ছেয়ে রয়েছে—দেখবার কেউ নেই বোধ হয় ; ছাদের ওপরকার টবে লাগানো ফুলগাছগুলো শুকিয়ে গেছে—কেউ একফোঁটা জল দেয় নি...ওর দুর্ব্বল শরীর আবেগে কাঁপতে থাকে...

···হঠাৎ বাবাকে ফটক খুলে বাইরে বেরুতে দেখতে পায় ; এই ক'বছরের মধ্যে কতটা পরিবর্ত্তন। বাবা যেন এই ক'বছরে অনেক বেশী বুড়ো হ'য়ে গেছে—একটু কুঁজোও ...ওর কান্না আসে ; দুহাত মাথায় ঠেকিয়ে পিতার উদ্দেশে প্রণাম করে...

রুবিকে একটু ঠেলা দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে "পালিয়ে চল রুবি পালিয়ে চল..."—বাড়ী পৌছেই রুবি ছুটে গিয়ে শিশুটীকে নিয়ে এসে উইলির হাতে তুলে দেয়—উইলি বুকে চেপে ধরে তার বংশধরটীকে...

···উইলির শরীর ক্রমশঃ ভেঙে পড়তে থাকে ; স্ত্রীপুত্রের খাওয়া পরার কষ্টই ওকে সবচেয়ে বেশী ব্যথা দেয় ; ডোরা শুন্‌তে পায় ওদের দুঃখের কাহিনী ; প্রাণ ওর কেঁদে ওঠে —ও ছুটে যায় উইলির বাড়ীতে...

ঘরে ঢুকে দেখে অন্ধকার কোণে উইলি শুয়ে আছে ; ও ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে উইলির মাথার কাছে বসে পড়ে —মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়...

উইলি চোখ মেলে চায়—মৃদুকণ্ঠে বলে—"ডোরা, তুমি এসেছ ? আমি জানি তুমি আসবে"...

ডোরার চোখের পাতা ভিজে ওঠে—ও এক দৃষ্টে তাকায় উইলির ফ্যাকাসে মুখখানির দিকে···

উইলির মুখে ফুটে ওঠে এক অস্ফুট আলো। ও ধীরে ধীরে আবার ঘুমিয়ে পড়ে···

ওর একখানা শীর্ণ হাত তখনও ডোরার হাতে—উইলির মুখে তখনও পরিতৃপ্তির হাসি লেগে রয়েছে···

...ডোরা গোপনে সাহায্য করে ওদের— ; ও আজও উইলিকে ভালবাসে...

* * * *

উইলির শরীরের কোন উন্নতি দেখা যায় না...ক্রমশঃ আরও ভেঙে পড়ে···

উইলি শুয়ে শুয়ে ভাবে বাড়ীর কথা !···আজ ওর দুঃসময় এসেছে ; বাড়ীতে অতগুলো নিরাশ্রয় প্রাণী—সবাই তো ওর মুখ চেয়ে রয়েছে—ওর দৌলতের জোরেই ত মুখে উঠছে অন্ন।···কিন্তু ঈশ্বর ওর সমস্ত শক্তিটুকু এক নিমেষের মধ্যে কেড়ে নিয়ে, ওকে ভিখিরি করলেন···

ওর বড়ো বড়ো চোখ দিয়ে জল পড়ে···

রুবির কথাই যে বারে বারে মনে পড়ে ; হয়তো ছোট্ট ছেলেটা খাবারের জন্য কাঁদছে ; রুবি কি দিয়ে যে ওকে সান্ত্বনা দেবে তা ভেবেও পায়না ; আধো আধো ভাষায় ছেলেটা মাকে জিজ্ঞাসা করে—"মা—বাবার কি হয়েছে ?"

রুবি ওর কথার কোন উত্তর দেয়না—

বাড়ীর পাশ দিয়ে ফেরীওয়ালা বাদাম হেঁকে যায় ; ছেলেটা আবার কেঁদে ওঠে—বায়না ধরে—রুবি কি বলে ঐ ছেলেটাকে ভুলোবে ?

উইলির মাথাটা বন্ বন্ ক'রে ঘুরে ওঠে ; কাঁদতে কাঁদতে উপরের দিকে তাকিয়ে বলে—"ঈশ্বর আমার সমস্ত সুখটুকু নিঙড়ে নিয়ে, শুধু ওদের খাওয়া পরার শান্তিটুকু দাও···নইলে, ওরা যে বাঁচবে না···"

জানলার ধারেই পাইন গাছের ছোট্ট একটা ডালে একটি একরত্তি পাখি কিচকিচ ক'রে ডেকে চলে উইলির মনে পড়ে বুড়ো বাপের কথা—ডোরার অশ্রুসজল মুখখানি···সে বাপের আশ্রয়—সহানুভূতি হারিয়েছে ; সে পরিত্যক্ত। কিন্তু সেই রাস্তার ধারের ছোট্ট বাড়ীটি—সেখানের স্মৃতিগুলো কি ভোলবার ?

ও চেঁচিয়ে ওঠে—চেয়ে দেখে ঘরের মধ্যে মেজেতে ও শুয়ে রয়েছে...

ওর বুকের ভেতরটা কেমন ক'রে ওঠে।...

সমস্ত ঘরটা ক্রমশঃ আঁধারে ঢেকে যায়; ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে কেসে ওঠে···এক ঝলক তাজা রক্ত উঠে আসে···

আবার একটা কাসি—আবার এক ঝলক রক্ত···

···দূরে বন্দরে একটা জাহাজ ছাড়বার আগে শেষবারের মত ভোঁ দেয়...উইলি তাড়াতাড়ি উঠে বসে প্রাণপণে চিৎকার ক'রে ওঠে; জড়িত কণ্ঠে বলে "সমুদ্র যাত্রা—সমুদ্র যাত্রা!...দুঃখময় এ নয়, এ অমৃতময়; কোন অতল স্পর্শ অনাদি অনন্ত শক্তির অনুপ্রেরণা আমায় ডাক দেয় বারে বারে ওরে আয়—রুবি, আমি যাই···

তারপর ও মেজেতে লুটিয়ে পড়ে: সে নিদ্রা আর ভাঙেনি···

ডোরা রুবির কাছে যায়।

ঘরে ঢুকে দেখে রুবি কাঁদছে; ও ধীরে ধীরে রুবির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—"রুবি, আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি...

রুবি কাঁদতে কাঁদতে বলে—"আমার মত একজন অতি দুঃখিনীকে সাহায্য করতে ?"

রুবি আবার ঝিমিয়ে পড়ে; ডোরা ওর পাশে বসে পড়ে...

মৃদুকণ্ঠে ডোরা বলে—"তোমার ছেলে কোথায়, রুবি ?"

রুবি হাত দিয়ে পাশের ঘুমন্ত ছেলেটিকে দেখিয়ে দেয়...

ডোরা বলে—"আমায় একটি অধিকার দেবে ?"—রুবি অর্থহীন দৃষ্টিতে ওর মুখ পানে তাকায়।

ডোরা আবার বলে—"উইলি আজ নেই; শুধু তার আত্মার মঙ্গলের জন্য তার ছেলেটিকে তার পিতামহের কোলে ফিরিয়ে দেবার অধিকারটুকু আমায় দাও..."

রুবি রাজী হয়; ডোরার বুকে মাথা গুঁজে কেবলি কাঁদতে থাকে···

-উইলির ছেলেটিকে নিয়ে ডোরা তার পিতার কাছে

··বুড়ো নাবিক তার বাড়ীর সামনে বসে, সুমুখের পথটার দিকে চেয়ে থাকে; বিকেলের পড়ন্ত রোদে সমস্ত পথটা নিঝুম হ'য়ে পড়ে—পাইন কার গাছের বনে শন্ শন্ শব্দ হয়···

···উঠানের একদিকে একটা ওক গাছ; তার আগডালে রোদ বাঁকা হ'য়ে পড়েছে···সেই কতকাল আগে উইলি ঐ গাছটা বসিয়েছিল···আজ সেই গাছ বড় হয়েচে কিন্তু দেখবার জন্য সে আর নেই—সে তার বুড়ো বাপকে ছেড়ে চলে গেছে!

বুড়ো নাবিকের দু'চোখ ঝাপসা হ'য়ে আসে...

···পিছনের বারান্দায় ক্যানারী পাখি দুটো খাঁচায় বসে শব্দ করে—বাগানের ঝাউ গাছটার তলাকার বাঁশে খাটানো দোলনাটা শূন্য হ'য়ে পড়ে থাকে—ওকগাছটার ছোট ডালটা মৃদু মৃদু নড়ে···এ সব যে তারই···

দেওয়ালে-টাঙানো উইলির ছবির দিকে তাকিয়ে নাবিকের চোখ অন্ধকার হ'য়ে যায়—

···ওর চমক ভাঙে কার ডাকে; চেয়ে দেখে ডোরা—কোলে তার ছোট্ট একটী ছেলে—ঠিক উইলির মত দেখতে; তাড়াতাড়ি ও চোখের জল মুছে ফেলে···

"তুমি কাঁদছো কাকা ?"

বুড়ো নাবিক পাগলের মত বলে ওঠে—"সে আমায় ছেড়ে চলে গেছে! আমার কথা শুনলে না; চলে গেল।··· কিন্তু আমি কি নিয়ে বাঁচবো ডোরা ?"

হঠাৎ নাবিক চোখ মুছে বলে—"তোমার কোলে কার ছেলে মা ?"

—"উইলির"—

নাবিক কেঁদে ফেলে; এ উইলির ছেলে? সত্যি ঠিক তার মত···; সে পাগলের মত বলে ওঠে—"ডোরা, উইলি কোথায় ?"

ডোরা উপরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—"ঐখানে কাকা..."

নাবিক উঠে প'ড়ে ছেলেকে কোলে নেবার জন্য ডোরার দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞার কথা! উইলিকে সে ত্যাগ করেছে যে, এ তার ছেলে? নাবিক দাঁড়িয়ে পড়ে···

ডোরার দিকে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলে—"কোথায় পেলে একে ?"

"—উইলির স্ত্রীর কাছ থেকে এনেছি কাকা; তুমি একে ফিরিয়ে নাও..."

"—এ সব চক্রান্ত ···" বুড়ো নাবিক চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে বলে। আবার চোখ যে জলে ভ'রে আসে; মাতৃহারা উইলি। উঃ—সে আর পারে না। একদিকে দুর্নিবার পিতৃস্নেহ...অন্যদিকে প্রতিজ্ঞা।

ডোরা মাথা নীচু ক'রে বলে—"নেবে না কাকা ?"

ডোরার কোলের ছেলেটা যে, বুড়ো নাবিকের মুখের দিকেই চেয়ে আছে; এ যে ঠিক উইলির মত দেখতে···বুড়ো নাবিক আবার এগিয়ে যায়—আবার দাঁড়িয়ে পড়ে; প্রতিজ্ঞার কথা যে তার পিতৃস্নেহের চেয়েও সত্য—নির্ম্মম···

ছেলেটা আবার হেসে ওঠে...

—"তোমার ছেলে আজ বেঁচে নেই কাকা; তবু তাকে তুমি ক্ষমা কর···তার ছেলেকে···" বুড়ো নাবিক ডোরাকে ধমক দেয়।···কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে···

"—কেন তাকে ক্ষমা করবে না ?"—ডোরা জিজ্ঞাসা করে।

অকস্মাৎ বুড়ো নাবিক অশ্রুর ভারে ভেঙে পড়ে; কাঁদতে কাঁদতে বলে—"ডোরা, আমি নিজের হাতে আমার ছেলেকে হত্যা করেছি; তার মৃত্যুর জন্য আমিই দোষী; ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন।···দাও তার ছেলেকে···"

নাবিক তার বংশধরকে কোলে নেয়; ছেলেটা কাঁদতে থাকে—নাবিক তাকে বুকে চেপে ধরে।...দু' চোখ বেয়ে জল ঝরতে থাকে···। সে উপরের দিকে চেয়ে মাথায় দু' হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে···

ছেলেটা কান্না ভুলে পিতামহের ঘড়ির 'লকেটটা' চুষতে শুরু ক'রে দেয়।...ডোরার চোখে জল আসে···ও চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়···

বুড়ো নাবিক বলে—"দাঁড়াও ডোরা···"

ডোরা মাথা নীচু ক'রে দাঁড়ায়।

"—তুমি এ কাজ কেন করলে ? কেন একে নিয়ে এলে ? কেন তুমি আমার প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করলে ? চলে যাও আমার সুমুখ থেকে···"

কোনটি শ্রেষ্ঠ ?

সমুদ্র মন্থনে শ্রেষ্ঠ—"শ্রী"

প্রাকৃতিক শোভায় শ্রেষ্ঠ—শ্রীনগর

বৈষ্ণবদের কাছে শ্রেষ্ঠ—শ্রীধর

মানবদেহে শ্রেষ্ঠ—শ্রীরাম

মহাভারতে শ্রেষ্ঠ—শ্রীকৃষ্ণ

ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—শ্রীফল

ফুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—শ্রীপর্ণ

কাষ্ঠের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—শ্রীখণ্ড

অবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—শ্রীঘন

দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—শ্রীনাথ

সওদাগরের শ্রেষ্ঠ—শ্রীমন্ত

বঙ্কিম চরিত্রে শ্রেষ্ঠ—"শ্রী"

শরৎ উপন্যাসে শ্রেষ্ঠ—শ্রীকান্ত

নামের আগে শ্রেষ্ঠ—শ্রী

পড়ুয়াদের কাছে শ্রেষ্ঠ—শ্রীপঞ্চমী

নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ—শ্রীমতী

ইংরাজের দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—"শ্রীঘর"

গৌরাঙ্গ সহচরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—শ্রীবাস

বৌদ্ধযুগের শ্রেষ্ঠ—মঞ্জুশ্রী

ঘৃতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঘৃত—"শ্রী"

ডোরা বেরিয়ে পড়ে সুমুখের পথে ; তখনও তার কানে আস্‌ছে বুড়ো নাবিকের ছেলে ভোলাবার গান ;···ও জোরে পা চালিয়ে দেয়—

কিছু দূর গিয়ে ও বুড়ো নাবিকের উদ্দেশে প্রণাম করে—তারপর...

···রাস্তার দুধারে গমক্ষেত ; ..ইউবনে শন্ শন্ শব্দ .. মাথার ওপর উড়ে চলে নাম-না জানা পাখির দল ; দূরে দিগন্তে গাছপালার সারি...তারপরেই নীলাভ পর্ব্বত-মালা···

সূর্য্য ডুবে গেছে কোনকালে ..

···পায়ের নীচে অসীম অনন্ত পথ···সেই পথ দিয়ে ও তখনও চলেছে···

শীতরাত্রে হিম পড়ছে···রাস্তার ধারের আলোগুলো মিট মিট ক'রে জলছে ; পথচারী মাতালদের জড়িত কথা ভেসে আস্‌ছে···ডোরা তখনও চলেছে···

পথের ধারেই একটা ঝোপের মধ্যে উইলির সমাধি ; ডোরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে...প্রস্তর সমাধিটীকে মাথা নুইয়ে প্রণাম করে···তারপর আবার এগিয়ে যায়···

পথের ধারের বাড়ীগুলো বোবা হ'য়ে গেছে ; দু'একটা বাড়ীর বন্ধ জানলা দিয়ে দু' এক ফালি আলো বাঁকা হ'য়ে রাস্তার ওপর পড়েছে······

আর একটু এগিয়ে গিয়েই রুবির বাড়ী ; ডোরা দ্বারে মৃদু ধাক্কা দেয়···

কোন সাড়া আসেনা ;···বাড়ীর ভিতর থেকে ভেসে আসে পিয়ানোর সুর ; অস্পষ্ট কথাবার্ত্তা—দু'একটী গানের কলি · ; ডোরা সোজা চলে যায় গ্রামের ষ্টেশনের দিকে......

···সমস্ত ষ্টেশনটা নিস্তব্ধ···দূর হ'তে ভেসে আসে গ্রাম্য কুকুরের ডাক ; ও একবার গ্রামের দিকে চেয়ে প্রণাম করে······

প্ল্যাটফর্ম্ম পেরিয়ে রেল লাইন ধরে সোজা পূব দিকে এগোতে থাকে...

···মাথার ওপর তারাভরা আকাশ···সামনে অখণ্ড অন্ধকার—পিছনে অন্ধকারঢাকা ষ্টেশন। পায়ের নীচে ট্রেণ লাইন দুটো রূপার পাতের মত চক্‌চক্ করছে···

পায়ের নীচে অনন্ত পথ...; কত অচেনা পথিক চলে গেছে বারে বারে—তাদের ঐ আনাগোনার ইতিহাস আজও সংক্ষিপ্ত ক'রে আঁকা রয়েছে ঐ ধূলোর ওপরে...

সেই পথ দিয়ে ও চলতে থাকে সামনের দিকে···

···সামনের অন্ধকার যে হাতছানি দিয়ে যাত্রা-সঙ্কেত দেয় বারে বারে—

···দূরে আগুনের গোলার মত কি যেন চকিতে ফুটে ওঠে অস্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর ;···

তারপর জলতে জলতে এগিয়ে আসে কাছে...আরও কাছে···

তার উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়—

ডোরা মাথা নুইয়ে যীশুর উদ্দেশে প্রণাম করে ; ঐ গোলকটা আরও কাছে. এগিয়ে আসে···তারপর···

তারপর সব শেষ ক'রে তার বিরাট অজগরের মত দেহ নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়······*

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য

* টেনিসন অনুসরণে

বাংলার শিশুসাহিত্য কোন পথে ?

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ এম্-এ

বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য এখনও শৈশবাবস্থায়। ইহার জন্য দুঃখ করিবার কিছুই নাই, কারণ কোন জাতিরই সাহিত্য শিশুসাহিত্য লইয়া আরম্ভ হয় নাই। তবে সাহিত্য বুঝিতে এস্থলে লিখিত সাহিত্য বুঝিতে হইবে। পুরাণকথা, উপকথা, রূপকথা, ছেলেভুলান ছড়া বা ঘুমপাড়ানি গানের কথাও বাদ দিতেছি যেহেতু এইগুলির ইতিহাস প্রায় সর্ব্বজাতির পক্ষে সমান প্রাচীন। এমন কি নিরক্ষর আদিমজাতিদের মধ্যেও এইগুলি অবিদিত নহে। ইংরাজী শিশুসাহিত্য আজ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠসর্ম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ইংরাজী সাহিত্যের বয়স কতই বা। ইংরাজী শিশু-সাহিত্যে ম্যারিয়াট, ষ্টিভেনসন, কিংসলি, লুইস ক্যারল, ব্যালেণ্টাইন্ প্রভৃতি যাঁহারা ইংরাজের গৌরবের স্থল তাঁহারা কেহই অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন নাই। আমাদের চণ্ডীদাসকে বাংলার আদি কবি ধরিলেও আমাদের সাহিত্যের বয়স মাত্র ছয়শত বৎসর। আর গদ্যসাহিত্যের কথা ধরিলে উহার জন্ম হইয়াছে মাত্র দুইশত বৎসর। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের বয়সের দিক দিয়া বিচার করিলে বাংলা শিশু সাহিত্যের যথেষ্ট অঙ্গসৌষ্ঠব লাভ হইয়াছে বলিতে হইবে।

ঠিক কোন শুভদিনে বাংলার শিশুর জন্য বাঙ্গালী সাহিত্যিকের সর্ব্বপ্রথম প্রাণ কাঁদিয়াছিল তাহা আমরা অবগত নহি। তবে ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালী শিশুর নীরস পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে দৃষ্টিপাত করিবার অধিকার ছিল না, আর কেহ অনধিকারপূর্ব্বক করিলেও মরুভূমি ও মরীচিকা ভিন্ন অন্য কিছু নয়নগোচর হইত না। তখনকার দিনে সরস্বতীর আরাধনাক্ষেত্র বেত্রবনে কণ্টকিত ছিল। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্যশিক্ষার ইতিহাস তাঁহার কাব্যের অনেক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি প্রায় সর্ব্বত্রই শিক্ষাগারকে কারাগাররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি বোধ হয় শৈশবের দুঃখ স্মরণ করিয়া 'বালক' পত্রিকায় নানা বিষয়ে লিখিতে আরম্ভ করেন। এই 'বালক'ই বোধ হয় বাংলাভাষায় প্রথম শিশুপত্রিকা। 'কড়ি ও কোমলে'র যুগকে রবীন্দ্রনাথের শিশুকবিতার যুগ বলিতে পারা যায়। তাঁহার প্রথম শিশুকবিতা বাংলার বর্ষার আদি ছড়া 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান' অবলম্বনে লিখিত। এই ছড়াটীর সহিত প্রত্যেক বাঙালীর শৈশব-স্মৃতি জড়িত। 'সাতভাই চম্পা,' 'পুরাণো বট', 'কাঙালিনী' প্রভৃতি শিশুসাহিত্যে চিরস্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথকে সেইজন্য বাংলার শিশুসাহিত্যের বাল্মীকি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি আজ পর্য্যন্ত শিশুর মনোরঞ্জনার্থে কবিতা লিখিয়া থাকেন। তবে 'শিশু' বা 'শিশু ভোলানাথে'র সকল কবিতাই শিশুকবিতা নহে।

'বালক' পত্রিকা বহুদিন হইল উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু শিশুসাহিত্যে ইহা যে ধারা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে তাহার জন্য বাংলার বালকবালিকা বহুদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। আজকাল 'শিশুসাথী', 'মৌচাক', 'ভাই-বোন', 'পাঠশালা' প্রভৃতি অনেকগুলি শিশুদের মাসিক পত্রিকা চলিতেছে। ইহার পূর্ব্বে 'শিশু', 'সন্দেশ' নামক শিশুপত্রিকা বহুদিন শিশুদিগের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। বাংলা শিশুসাহিত্যের ইতিহাসে ৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। আধুনিক শিশুসাহিত্যে গান, ছড়া বা উপদেশপূর্ণ গ্রন্থের প্রবর্ত্তন তিনিই করেন। দক্ষিণারঞ্জন বাবুও 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদাদার ঝোলা' দান করিয়া শিশুদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের 'বামনের দেশ' 'দৈত্যপুরী'

অনবদ্য ভাষায় লিখিত। সুপণ্ডিত ৺ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলেজের অধ্যাপক হইয়াও শিশুদিগকে ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার 'রসকরা' অফুরন্ত রসের ভাণ্ডার। তাঁহার প্রণীত 'ছড়া ও গল্প' ও 'আহ্লাদে আটখানা' প্রত্যেক শিশুকে আনন্দ দিয়াছে। কয়েকজন মহিলা-সাহিত্যিকও শিশুসাহিত্যে যশস্বিনী হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সুখলতা রাও, সীতাদেবী ও শান্তাদেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। এই স্থলে স্বীকার করিতে হইবে শিশুসাহিত্যের প্রচারে আশুতোষ লাইব্রেরী, দেবসাহিত্যকুটীর ও ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। বিশেষতঃ 'শিশুভারতী' শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটীর বিশিষ্ট দান। পাশ্চাত্যের অনুকরণ হইলেও বাংলাদেশে ইহার প্রয়োজন ছিল।

বাংলা শিশুর আজ সাহিত্যের দিক দিয়া যেন কোন অভাব আর নাই বলিয়া মনে হয়। ছড়া, কবিতা, রূপকথা, পুরাণ কথা, গল্প, উপন্যাস, অ্যাড্‌ভেঞ্চার, জীবন চরিত, ভ্রমণকাহিনী, জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা সমস্তই এখন শিশুসাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। সুন্দর সুচিত্রিত শিশুসাহিত্য-সজ্জিত বিপনি আজ পথের দুই পার্শ্বে দেখিতে পাই। শিশুসাহিত্য-জগতে নব নব সৃষ্টি দেখিয়া বয়স্কেরও চক্ষু ধাঁধিয়া যায়, আবার শিশু হইতে ইচ্ছা করে। তবে কি বাংলার শিশুসাহিত্যের পূর্ণ আদর্শ লাভ হইয়াছে? সত্য কথা বলিতে কি এখনও বাংলার শিশুসাহিত্য শিশু, এখনও তাহার অঙ্গপূরণ হয় নাই। বাংলার শিশুসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিতে হইলে শিশুসাহিত্যের একটা মোটামুটী আদর্শ গড়িয়া লইতে হইবে। এই জাতীয় সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে শিশুকে নির্ম্মল আনন্দ দান। কিন্তু এই আনন্দ সৃষ্টির জন্য ভাঁড়ামি বা নীচ ধরণের মনোবৃত্তির আশ্রয় লইলে চলিবে না। গল্পই শিশুদিগের প্রধান উপভোগ্য জিনিষ হইলেও গল্পের মধ্যে উচ্চ মনোভাব সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে গল্পের মধ্যে স্বার্থপরতা, ভীরুতা, মাৎসর্য্য বা নীচ জাতীয় চাতুর্য্য প্রশ্রয় না পায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নীতি শিক্ষাদান শিশুসাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য হইলেও সেটী প্রকট না হওয়াই বাঞ্ছনীয়; কারণ তাহা হইলে আর্টের দিক দিয়া শিশুসাহিত্যের দোষ হয়। মনে রাখিতে হইবে সাহিত্য যাহারই উদ্দেশ্যে লিখিত হউক না কেন তাহার ধর্ম্ম সাহিত্যের ধর্ম্ম হইতে হইবে। বলা বাহুল্য শিশুসাহিত্যের শুধু ভাষাটী শিশুর উপযোগী হইলে চলিবে না, ভাবটীও শিশুর উপযুক্ত হইতে হইবে। উপযুক্ত চিত্রসম্পদও শিশুসাহিত্যের একটী প্রধান অঙ্গ। শিশুর জন্য চিত্র নির্ব্বাচন প্রথমতঃ যত সহজ বলিয়া মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। বাহ্যসম্পদের জন্য মুদ্রণ, কাগজ প্রভৃতি অঙ্গ সৌষ্ঠবের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। এসব বিষয়ে ছাপাখানা ও দপ্তরীর উপর নির্ভর করিলেই হইবে না, বিচক্ষণ মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষকগণের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

বাহ্য আড়ম্বরের দিক দিয়া বাংলার শিশুসাহিত্যের অভাব খুব বেশী নহে। কেবল চিত্রসম্পদের বিষয় কিছু বলিবার আছে। দেশে চিত্রকরের অভাব ইহার একমাত্র কারণ নহে। চিত্রের সংখ্যা বাহুল্য বা উজ্জ্বল বর্ণসমাবেশই শিশুসাহিত্যের সৌষ্ঠব বা মূল্য বৃদ্ধি করে না। শিশুদিগের মধ্যে উজ্জ্বল বর্ণ প্রীতি আছে সত্য, কিন্তু বয়োভেদে চিত্রের যে আদর্শ ভেদ জন্মে একথা শিশুসাহিত্য প্রকাশকগণ অনেক সময় ভুলিয়া যান। অনেক চিত্রে খুঁটিনাটীর (details) বাহুল্য দেখা যায়, এরূপ চিত্র বয়স্কগণের চক্ষে প্রশংসনীয় হইতে পারে, কিন্তু শিশুমনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ঐরূপ চিত্র শিশুদিগের পক্ষে অনুপযোগী। ইহার কারণ শিশুমন একই সময়ে অধিক বিষয়ে মনোযোগী হইতে পারে না। ভূত প্রেত রাক্ষস খোক্কসের ভীতিপ্রদ ছবি দিয়া শিশুমনকে পীড়িত করাও উচিত নহে। কল্পনাশক্তির অযথা অনুশীলন কোন মতে বিধেয় নহে। সাধারণ বাংলা সাহিত্যের অনেক কুদৃষ্টান্তও শিশুসাহিত্যে প্রবেশ করিতে সুরু করিয়াছে। বর্ত্তমান শিশুসাহিত্যে এরূপ চিত্র সন্নিবেশিত হইতেছে যাহা হুবহু বিলাতী চিত্রের অনুকরণ। সেই চিত্রাবলীর মধ্যে এমন চিত্র আছে যাহা আমাদের দেশের শিশুদিগের মনে এমন কতকগুলি বৃত্তি অকালে পরিস্ফুট করিয়া তুলে যাহা আরো কিছুদিন সুপ্তাবস্থায় থাকিলে ভাল হইত। তথাকথিত প্রগতিবাদীরা এইরূপ

স্থলে যৌনশিক্ষা (sex-education)র ধুয়া তুলিতে পারেন। এইখানে স্মরণ রাখিতে হইবে পশ্চিম দেশের সামাজিক আবহাওয়া আর ভারতবর্ষের আবহাওয়া একই নহে। বিলাতী শিশুর পক্ষে যাহা খাদ্য আমাদের দেশের শিশুর পক্ষেও যে তাহা খাদ্য হইবেই এমন কথা কে বলিল ? বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতি যদি রক্ষা করা সমীচীন হয় তাহা হইলে অনর্থক বিদেশী আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া লাভ নাই।

বর্ত্তমান শিশুসাহিত্যের বিষয়বস্তু ও তাহার প্রকাশ-ভঙ্গীর বিরুদ্ধেও কিছু বলিবার আছে। অনেক স্থলে শিশুসাহিত্যে স্পষ্ট দুর্নীতি ও কুরুচির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 'শনিবারের চিঠি'র সংবাদ যদি সত্য হয় তাহা হইলে বিশেষ ভয়ের কথা। এই পত্রিকার "ছোটদের লেখার মাসিক পত্রিকা" 'আলো'র পৃষ্ঠা হইতে যে পংক্তিগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে সেগুলি আমাদের মনে গাঢ় অন্ধকার সৃষ্টি করিতে পারে। শিশু মনের অবচেতন স্তরে যাহা কিছু ভাসিতে থাকে তাহাই যে সাহিত্যে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে এমন কথা নাই এইটুকু সাধারণ বুদ্ধি 'আলো' সম্পাদকের থাকা উচিত ছিল। বাস্তবতার দিক দিয়াও ইহার কোন কৈফিয়ৎ থাকিতে পারে না। শিশু মনের সব ইচ্ছাই যে সু বা সাহিত্যে প্রকাশ্য এ মত যে ঠিক নহে ইহা বাংলার কোন কোন শিশু-সাহিত্যিক মনে রাখিতেছেন না। সাহিত্যিকের মনস্তত্ত্ববিৎ হইতে কোন বাধা নাই, কিন্তু সাহিত্য রচনার সময় তাঁহাকে সাহিত্যের পন্থায় চলিতে হইবে, তাঁহাকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে সাহিত্য 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'কে আদর্শ বলিয়া স্বীকার করে। বাংলার সকল শিশু পত্রিকায় যে শিশুদিগকে যথাসম্ভব জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করাইবার চেষ্টা চলিতেছে তাহা নহে। তবে যুগধর্ম্ম অনুযায়ী 'প্রগতিবাদ' শিশু সাহিত্যেও আসর জমাইবার চেষ্টা করিতেছে। পূজার সময় আজকাল বার্ষিকী নামধারী কতকগুলি শিশুসাহিত্য প্রকাশিত হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'শিশুসাথী'র বার্ষিক সংখ্যায় একটী খ্যাতনাম্নী লেখিকার লেখনী প্রসূত একটী গল্পের কেন্দ্রগত ভাব ছিল স্বামীর প্রেমে স্ত্রীর সন্দেহ। প্রেম, বিরহ, ঈর্ষ্যা প্রভৃতি ভাব দুনিয়াতে অত্যন্ত সত্য জিনিষ এবং সাহিত্যেও তাহাদের যথাযোগ্য স্থান আছে। কিন্তু শিশু সাহিত্যে সেগুলি স্থান পাইবার অধিকারী কি হিসাবে ?

শিশুসাহিত্যে নরনারীর যৌন-সম্বন্ধে এই যে ইঙ্গিত প্রদান ইহার মূলে আছে দুইটী কারণ। প্রথম কারণ হইতেছে যুগধর্ম্ম, আর দ্বিতীয় কারণ পাশ্চাত্য সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণ। য়ুরোপীয় শিশুর মনে যে দৃশ্য বা যে বাক্য বিকার আনয়ন করে না, তাহা বাঙালী শিশুর মনে করিবে না, তাহা কে বলিল ? য়ুরোপীয় সমাজের রীতিনীতির সহিত আমাদের সমাজের রীতিনীতির যে প্রভেদ আছে তাহা ভুলিলে চলিবে না। য়ুরোপীয় স্বামী স্ত্রী শিশুদিগকে পরস্পরকে চুম্বন বা আলিঙ্গন করিতে বিশেষ দ্বিধা বোধ করে না বলিয়া আমাদের দেশেও কি ঐরূপ কার্য্য সুরুচি-সঙ্গত হইবে ? ইংরাজী fairy tales বা অন্যপ্রকার শিশু সাহিত্য যদি অনুবাদ করিতে হয় তাহা হইলে ভারতীয় সমাজনীতি মানিয়া তাহা করা উচিত।

আমাদের দেশের শিশুসাহিত্য মাঝে মাঝে নিতান্ত উদ্দেশ্যহীন বলিয়া মনে হয়। তাহার কারণ এরূপ কতকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হয় যাহার মধ্যে কোন উচ্চ ভাব নাই, হয়ত নিছক ইয়ারকি বা ফাজলামি মাত্র থাকে। ভূত প্রেতের গল্পও প্রকাশিত হয়। বাঙালীর ছেলে একে জন্মভীরু, সুতরাং তাহাকে জুজুর ভয় দেখাইবার কোন আবশ্যকতা নাই। আষাঢ়ে বা গাঁজাখুরি গল্প শুনাইয়া কল্পনা শক্তির অপব্যবহার করাও উচিত নহে।

উপরে উল্লিখিত দুর্নীতি ও কুরুচির কথাগুলিই বর্ত্তমান বাংলা শিশুসাহিত্যের সমস্যা। বাংলার শিশুসাহিত্যের অভাবও অনেক আছে। বিদেশী সাহিত্যের যাহা সু তাহা অনুকরণ করিতে দোষ নাই। প্রতিভাশালী সাহিত্যিক ইচ্ছা করিলে অনুকরণ না করিয়া স্বীকরণ করিতে পারেন, যেমন উপন্যাসক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র করিয়াছেন। বাংলা শিশুসাহিত্যের অভাবগুলির মধ্যে একটী প্রধান হইতেছে খ্যাতনামা গ্রন্থসমূহের শিশু সংস্করণের অভাব। ইংরাজী সাহিত্যের 'Told to the children' সংস্করণের

মত আমাদের দেশেও কিছু কিছু হওয়া আবশ্যক। যাহা কিছু আছে তাহা সামান্যই বলিতে হইবে। শিশুসাহিত্যের এই যে অভাব ও সমস্যা রহিয়াছে তাহার জন্য শুধু সাহিত্যিকের উপর নির্ভর করিলে চলিবে-না। শিশুর মঙ্গলের উপর যে জাতির ও সমাজের মঙ্গল নির্ভর করিতেছে তাহা সমাজসংস্কারক ও দেশের নেতৃগণকে স্মরণ রাখিতে হইবে। এমন একটী সমিতি বা সাহিত্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহার কার্য্য হইবে শিশুসাহিত্য পরীক্ষা করা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিসদের দ্বারা এইরূপ একটী শাখা গঠন অসম্ভব নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও শিক্ষা বিভাগেরও এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবার সময় আসিয়াছে। দেশের মাতাপিতা ও অভিভাবকগণের সহযোগিতারও বিশেষ প্রয়োজন। প্রকাশক বা গ্রন্থকারের নামের খ্যাতি দেখিয়াই শিশুর হাতে যে কোন পুস্তক তুলিয়া দিলে হইবে না। তাঁহাদের মনে রাখিতে হইবে ছেলের হাতে ভেজাল ঘৃত বা তৈলের খাবার তুলিয়া দেওয়া অপেক্ষা কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য তুলিয়া দেওয়া শতগুণ অধিক ক্ষতিকর।

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ

স্মৃতি

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়নের নভে তব হয়তো এবার নব বাষ্প-মেঘ বাঁধিয়াছে বাসা,
পল্লব-অধরে বুঝি নিঃশব্দে স্ফুরিছে কোনো অর্দ্ধস্ফুট লাজ-ভীরু বাণী ;
কোলের উপর খোলা রয়েছে আমার এই ছন্দোময়ী চতুর্দ্দশীখানি,
অন্তরের অন্তঃপুরে লুকায়ে কাঁদিছে রিক্তা বিরহিণী বালিকা নিরাশা।
বেদনা-বিধুর হিয়া উচ্ছলিয়া তুলিয়াছে অশ্রুলেখা কবিতার ভাষা,
কিসের ক্ষণিক মোহ বৈরাগী মনের কোন্ নিরুদ্দেশে নিয়ে গেছে টানি ;
পুরাণো দিনের স্মৃতি সহসা নূতন হোয়ে মর্ম্ম-তলে করে কানাকানি,
বুঝিতে পেরেছ আজ একখানি মুসাফির ব্যর্থ-কবি-হৃদয়ের আশা।

সাতটি সাগর সখি, দুলিছে বুকের মাঝে শুধু মোর রাতদিন ধরি,
জীবন আঁধার করি' নেমেছে নিবিড়-ঘন দুর্য্যোগের সুদীর্ঘ শর্ব্বরী।
স্মৃতির জানালাগুলি খুলে দিয়ে শূন্য মন কেঁদে কেঁদে পায় নাক' দিশে,
বাদল-ধারার সাথে ব্যথাতুর মোর দুটি নয়নের জল যায় মিশে।
অবসন্ন হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনে খালি কবিতার ছন্দ পায় মিল,
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস অতীতের ফুল-গন্ধে ভরি তোলে আমার নিখিল।

মাণ্ডু

শ্রীমতী উষা দেবী

কথায় আছে, "কালীঘাটের লোক কখনও মা কালী দেখে না," আমার অবস্থাও হয়েছিল তাই। চিরদিনের জন্যে যখন ইন্দোরে এসে নীড় রচনা করলুম, আশ পাশের জিনিষগুলো দেখে নেবার বা দেখিয়ে দেবার কারও আগ্রহ থাকল না। কিন্তু শীগগিরই বাড়ীতে কয়েকজন আত্মীয়ের সমাগম হোল, এবং তাঁদের কল্যাণে প্রায় সবক'টী দ্রষ্টব্য স্থানই দেখা হ'য়ে গেল। কিন্তু সে সকলের মধ্যে মনের পাতায় সব চেয়ে গভীর দাগ যে দিয়েছিল, সে ইতিহাসের লীলাভূমি, প্রেমের অমরতীর্থ মাণ্ডু।

বিন্ধ্যাচলের একটী শাখার চূড়ায়, সমুদ্র গর্ভ হ'তে ২০৭৯ ফিট উপরে এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগরী আজ ঘুমিয়ে আছে। তিন দিক হ'তে মায়ের অভয় আঁচলের মত গভীর খাদ একে ঘিরে রেখেছে, আর দক্ষিণে ১২০০ ফিট নীচে দিগন্ত বিস্তৃত নীমার সমতলভূমি নর্ম্মদার কোলে গড়িয়ে গেছে। আশপাশের মধ্যে থেকে মণ্ডপের মত উঠেছে ব'লে এক সময় এর নাম ছিল মণ্ডপ দুর্গ। অধুনা এ স্থানটী ধার রাজ্যের অন্তর্গত। রূপমতীর মোহে প্রায় প্রত্যেক বড়লাটই একবার এখানে পদার্পণ ক'রেছেন। সেইজন্যই বোধহয় ধার রাজ্য তার এ গর্ব্বের সামগ্রীটীকে সযত্নে রক্ষা ক'রছে।

এখানে জুনের মাঝেই বর্ষা আরম্ভ হয়। নববর্ষার একটী শ্যামল সজল সকালে আমরা রওনা হলুম মাণ্ডুর পথে। মধ্য ভারতের ছোট ছোট পাহাড়ের খেলা আমার বড় ভাল লাগে। তার ওপর কালো মেঘের ভয়ে শিশু পাহাড়েরা সবুজ আঁচলের তলায় মুখ ঢেকেছে। সারাটী পথ মনটা যেন প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে হারিয়ে যায়। মধ্যে মধ্যে মোঃ ধার প্রভৃতি তাদের ইট পাথরের সজ্জায় নিয়ে মনটাকে রূঢ়ভাবে প্রতিহত করে।

ঘাটের বাঁকাচোরা, উচু নীচু পথের মধ্যে থেকে মোটর এসে ঢোকে মাণ্ডুর সীমানায়, নগরীর প্রথম বৃহৎ দ্বারের মধ্যে। কিন্তু এখনও নগরী দূরে আছে, তিন চারটী এই রকম প্রবেশ দ্বার পার হ'তে হবে। রাস্তার একদিকে গভীর খাদ, অপর দিকে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী। মনটা অপার বিস্ময়ে ভ'রে যায় এই ভেবে যে কতখানি দূরদর্শিতা ও অন্তঃদর্শিতা নিয়ে নিরাপদ শৈলশ্রেণীর ক্রোড়ে এই নগরীর পত্তন হ'য়েছিল।

কতক্ষণ পরে জানি না হঠাৎ মোটরের ঝাঁকুনিতে চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল, দেখি মোটরটা দাঁড়িয়ে গেছে। আর অদূরেই একটী লৌহ ফলকে লেখা আছে, Echo point. প্রতিধ্বনি অনেক জায়গায় শুনেছি, কিন্তু এমন পরিষ্কার কোথাও শুনিনি। খানিকক্ষণ সেখানে সকলেই নিজ নিজ কণ্ঠের মাধুর্য্য পরীক্ষা ক'রে আবার মোটরে উঠলুম।

যে রূপমতীর মোহে মাণ্ডু আসা সকলের মতে সবার আগে সেখানেই যেতে হবে। কাযেই পথের ২।১টী দ্রষ্টব্য স্থান উপেক্ষা ক'রে আমরা রূপমতীর প্রাসাদে পৌঁছলুম। ছাদের ওপর উঠে সকলে সতৃষ্ণ নয়নে নর্ম্মদার সন্ধান করতে লাগলুম, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর দর্শন মিলল না। এই ছাদের একটু রহস্য আছে। রূপমতী প্রত্যহ নর্ম্মদার পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করতেন এবং তিনিই ছিলেন তার অন্তরাধিষ্ঠাত্রী দেবী। ঘটনাচক্রে পথ হারিয়ে বাজবাহাদুর একবার মাত্র রূপমতীকে দেখে তাঁর প্রেমে আত্মহারা হলেন। তিনি রূপমতীর পাণি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু নর্ম্মদাকে ছেড়ে রূপমতী যেতে রাজী হলেন না—তিনি বল্লেন, যদি বাজবাহাদুর নর্ম্মদাকে নিয়ে যেতে পারেন, তবেই তিনি তাঁর রাণী হবেন।—প্রেমান্ধ বাজবাহাদুরের কাছে অসম্ভব কিছুই ছিল না। তিনি রূপমতীর প্রাসাদ গড়ে তুললেন,

তারই ছাদে বসে নর্ম্মদার নীল জল প্রত্যহ রূপমতীর মন প্রাণ জুড়িয়ে দিত। আজও পরিষ্কার দিনে রূপমতীর ছাদে বসে নীমার সমতলভূমির কোলে নর্ম্মদার নীল রেখা দেখা যায়। রূপমতীর প্রাসাদের নিম্নতলটী অভগ্ন অবস্থায় আছে। উপরে বিস্তীর্ণ ছাদ, দুধারে দুইটী সুদৃশ্য মণ্ডপ। না জানি এই ছাদের ওপর দুটি প্রেমাতুর হৃদয়ের কত মাধুর্য্যময়ী দিন-রজনী স্বপ্ন বুনে বুনে কেটেছে। জগৎকে তাঁরা ভুলেছিলেন, কিন্তু জগৎ তাঁদের ভোলেনি। অল্প-দিনের মধ্যেই শত্রুর বজ্রনির্ঘোষে সে কথা দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। তারপর—সেই অনলে এই দুটি পতঙ্গের রঙীন জীবনের আহুতি হ'য়ে গেল। আকবরের সাম্রাজ্যের ভিতে আর একখানি সুদৃঢ় পাথর লাগল।

রূপমতীর প্রাসাদ থেকে আমরা বাজবাহাদুরের প্রাসাদে গেলুম। সুন্দর চকমিলান দালান। প্রাঙ্গণের মধ্যে একটী বাঁধান জলাশয়। রূপমতীর প্রাসাদ অপেক্ষা বাজ-বাহাদুরের প্রাসাদ অভগ্ন অবস্থায় আছে।

চায়ের তৃষ্ণা এবং টিফিন বাস্কেটভরা সুখাদ্যগুলি আমাদের মন ভীষণ বিচলিত করে তুলেছিল, তাই মরা পাথরের মধ্যে জীবন খুঁজে বেড়ানর চেয়ে নিজেদের জীবন রক্ষা করাই বেশী বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলুম। নাম না জানা এক লেকের ধারে, ঘাসের গালিচায় বসে সেদিন বুঝেছিলুম, চা খাওয়ার মধ্যে কত আনন্দ থাকতে পারে।

বিকেল হয়ে এল, এখনও অনেক জিনিষ দেখতে হবে। তবে মাণ্ডুর এই একটা খুব সুবিধা, প্রত্যেকটী দ্রষ্টব্য স্থানই মোটরে যাওয়া যায়, তাই একদিনের মধ্যে মাণ্ডু দেখা সম্ভব হয়। পথে "রিয়াকুণ্ড" পড়ল। সাধারণ লোকে একে নর্ম্মদার অংশ মনে করে ভক্তি করে থাকে। কিন্তু তার "এঁদো পড়া" চেহারা দেখলে মনে হয়, নর্ম্মদাকে এতখানি অপমান না করলেও চলত।

এরপর আমরা "জামি মসজিদে" এলুম। প্রকাণ্ড বাড়ী, বিশাল প্রাঙ্গণ, একসঙ্গে ২।৩ হাজার লোক সেখানে অনায়াসে প্রার্থনা করতে পারে। এটি নাকি মহমুদ খিলজীর হাতে সম্পূর্ণ হয়। মসজিদের অপর দিকেই মহমুদ খিলজীর কবর। বাড়ীর চিহ্ন নেই, শুধু ভিতটুকুই মহমুদ খিলজীর স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে।

তারপর এলুম আমরা "হিন্দোলা মহলে"। নামটীতে যেমন কবিত্ব আছে, জায়গাটীও তেমনি ভাল লাগে। এর দেয়ালগুলি কেমন ঢালু হয়ে নেমে গেছে, সত্যিই দোল খাচ্চি মনে হয়। এর আর কিছু বিশেষত্ব নেই।

এরপর আমরা "জাহাজ মহলে" এলুম। রূপমতীর প্রাসাদের পর এই প্রাসাদটী আমার সব চেয়ে ভাল লেগে-ছিল। বাড়ীটী লম্বা ধরণের, আর দুপাশে দুটি লেক। ছাদের ওপর দাঁড়ালে সত্যিই যেন জাহাজে রয়েছি মনে হয়। মুসলমানদের সময়ে সম্ভবতঃ এই প্রাসাদটি বেগমদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সুবৃহৎ সন্তরণের চৌবাচ্চা দেখে লোভ হচ্ছিল। অবশ্য এখন জল নেই তাতে।

ছোট বড় আরও কয়েকটী ভগ্নাবশেষ দেখে আমরা নীলকণ্ঠের মন্দিরে এলুম। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে এটি মহাদেবের মন্দির। সুন্দর জায়গাটি। স্থানটীর নির্জ্জনতা মনটাকে খুব স্পর্শ করে। অনেকগুলি সিঁড়ি নেমে যেতে হয়, তারপর মন্দির। একটী ক্ষীণকায়া ঝর্ণার জল মহাদেবের মাথায় পড়ছে। মন্দিরের প্রাঙ্গণের পরই গভীর খাদ নেমে গেছে। সারাদিনের গোলমাল ও উত্তেজনার পর হঠাৎ যেন মনটার ওপর শান্তির প্রলেপ লেগে গেল।

কিছুদিন হোল এখানে কয়েকটী গুহা আবিষ্কৃত হয়েছে, অবশ্য সেগুলির সম্বন্ধে কোনই তথ্য জানা যায়নি। তবুও আমাদের কৌতূহল কিছু কম ছিল না। কিন্তু দিনের লালিমা পশ্চিম গগনে অনেকক্ষণ ম্লান হয়ে গেছে, সুতরাং ফিরতেই হোল এবার। সারাটী পথ সকলেই কেমন নিস্তব্ধ ছিল। বোধহয় সারা দিনের দেখা ভগ্নাবশেষগুলির সংশ্লিষ্ট নানা রকম স্মৃতি মনের মধ্যে ভিড় করেছিল।

তারপর অনেকদিন হয়ে গেছে আর মাণ্ডু যাইনি। আরও কয়েকবার যাবার সুযোগ হয়েছিল, কিন্তু বন্ধুদের পীড়াপিড়িতেও আর যাইনি। আমার কেমন মনে হয়, প্রথমবার মাণ্ডু যেমন করে মনটাকে স্পর্শ করেছিল, তেমন করে আর হয়ত করবে না। আলোয় আঁধারে মেশা, অস্পষ্ট বিচিত্র, সে কেমন একটু মধুর পরশ, সেটুকু আমি হারাতে চাই না।

শ্রীউষা দেবী

কবিতা

শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য

উত্তর-বাঙলায় কোন এক থানার ভারপ্রাপ্ত নামজাদা দারোগা ছিলেন আমার কাকা। প্রতাপ ছিল তাঁর প্রচণ্ড; সাহস ছিল তাঁর অদ্ভুত; চোর বদমাইস জব্দ করতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

একদিন আষাঢ়ের শেষ বেলায় সুটকেস হাতে তাঁর বাসায় গিয়ে উঠলাম। তিনি তখন মফঃস্বল থেকে ফিরে এসে ইজিচেয়ারের ওপর তাঁর দেহটা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে নির্জীবের মত পড়ে আছেন। তাঁর উড়ে চাক ভোলা তাঁকে হাওয়া করছিল। গায় স্পর্শানুভব ক বললেন, কে? তারপর চোখ মেলে বললেন, প্রভাত এই সবে মাত্র এলি বুঝি! তা' বেশ! ভাল আছি তো?

কাকার সঙ্গে অনেক কথা হল, অনেক গল্প হল। ঠি হল, অন্ততঃ দু'মাস তাঁর বাসায় আমাকে থাকতে হবে...

বেশ আছি। দারোগার বাসা; খাওয়া-দাওয়ার কো অসুবিধা নেই; কাজ-কর্ম্মেরও কোন তাড়া নেই,—বে অলস, নিষ্ক্রিয়, নিদ্রালু কুম্ভকর্ণের মত জীবন!

সকাল বেলার ডাকে কল্‌কাতা থেকে 'সুরুচি' পত্রিকা সম্পাদকের কাছ থেকে এক চিঠি পেলাম। চিঠির মর্ম্ম-- অন্ততঃ একটি কবিতা লিখে তাঁকে পাঠাতে হবে। আমার ন্যায় উদীয়মান কবির লেখা অনেকদিনের ভেতর ছাপার অক্ষরে তাঁর কাগজে বের না হওয়ায় তিনি আন্তরিক দুঃখিত।

কলকাতার সাহিত্যিক মহলে কবি বলে আমার কিছু খ্যাতি ছিল। নিরাশ প্রেমের কবিতা, বিশেষতঃ বিরহী হৃদয়ের বেদনায় ভরা বিরহের কবিতা লিখতে আমার হাত নাকি বেশ পাকা হয়ে এসেছিল। কিন্তু...অদৃষ্টের ফের! নিজেই একদিন কোন এক কলেজে পড়া, আপ-টু-ডেট, মেয়ের প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খেয়ে তারপর নির্ম্মমভাবে উপেক্ষিত হয়ে নিরাশ প্রেমিকদের দল ভারি করলাম। কলকাতায় আর মন টিকল না। ভবঘুরে হয়ে বেরিয়ে পড়লাম কলকাতার বাইরে। তারপর?...দিন একভাবে কেটে যায় যেখানে সেখানে।

সম্পাদকের অনুরোধ—একটি কবিতা পাঠাতেই হবে কিন্তু শুধু অনুরোধেই কি আর কবিতা লেখা চলে,

একটু আগেই আষাঢ়স্য দিবসের বারিবর্ষন হয়ে গেছে আকাশে মেঘ সমানে ডেকেই চলেছে। হয়ত আবার বৃষ্টি আরম্ভ হবে। সমস্ত পৃথিবী যেন দুঃখভারে ব্যথিত, সন্ত্রস্ত। ছাতি মাথায় দিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে কতক-গুলি সাদা কাগজ, আর ফাউনটেন পেনটি। পায়ে রবার সু...পিচ্ছিল কাদামাখানো পথে চলতে সে কি আরাম! কোন দিকে আর দৃকপাত নেই। কারণ?...মনটি আজ আমার উদাস, উদ্‌ভ্রান্ত। কবিতা আজ লিখতেই হবে! এমনি একদিনে আষাঢ়ের মেঘ দেখে প্রিয়া-বিরহের বেদন-বাণী বেরিয়েছিল যক্ষের মুখ দিয়ে। কালিদাস তাই নি... অমর হয়েছেন। জানি, কালিদাস হতে পারব না। তবুও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে দোষ কি? হ্যাঁ, সত্যিই বিরহী হৃ আমার আজ কোন এক লুকান ব্যথায় গুমরে-গুমরে ওঠে। ...টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ে; মেঘ ডাকে; বাতাসে কি যেন চঞ্চলতা! নদীর জল বেড়ে চলেছে। নদীর ওপর একটি ব্রিজ। ব্রিজের ওপর এসে ছাতি মাথায় বসে পড়ি অন্তর-মন কেঁদে ওঠে, ওগো, কোথা আজ, কোথা আজ "আমার অসীম দূরের প্রিয়া?"...ফাউনটেন পেনটি বের করে কবিতা লিখতে আরম্ভ করলাম:—

মেঘ তমসায় দিন কাটে হায় বৃথা পথ পানে চাই।
মনের আকাশে কাঁদিছে বাতাস, তুমি নাই, তুমি নাই।

তৃতীয় লাইন কি লিখব ভাবছি, এমন সময় আমার পিছন হতে কে বললে,—প্রভাত বাবু যে! আপনি—আপনি এখানে?

বিস্মিত হয়ে ফিরে চাইতেই দেখি, পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মিস্ কবিতা রায়—আমার ছাত্রী অনুপমার সই, আর আমার, আমার…

আশ্চর্য হয়ে বলি,—কবিতা! তুমি—তুমি এখানে?

হেসে কবিতা বলে, আমার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখনও পাইনি…

বলি,—এদেশে এসেছি বেড়াতে—আমার কাকার বাসায়। আর তুমি?

—ও! আমি, আমি এসেছি এখানকার গার্লস হাইস্কুলের লেডি টিচার হয়ে। সম্প্রতি বেড়াতে বেরিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে জবু থবু হয়েছি অল্পবিস্তর টায়ার্ডও বটে!…

তারপর প্রায় এক মিনিট চুপ-চাপ…চোখোচোখি হয়।…মেঘের কোলে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে…বোধ হয় চোখের।

কবিতা লেখা আর হল না। ছাতাটা কবিতার দিকে এগিয়ে তার মাথার ওপর ধরি।

গম্ভীর হয়ে কবিতা বলে, মেনি থ্যাঙ্কস্…

দু'জনে পাশা-পাশি হয়ে চলি। দু'একটা মামুলী কথা ছাড়া আর কোন বিশেষ আলাপ হয় না।

হঠাৎ থেমে যেয়ে কবিতা বলে, এইটে হচ্ছে আমার বাসা। আসুন না, ভেতরে আসুন। অতসি-দি…তাইতো, অতসি-দি বোধ হয় সেক্রেটারীর বাড়ীতে বেড়াতে গেছেন। অতসি-দি স্কুলের হেড মিসট্রেস। আমরা দু'জনে এই এক বাসাতেই থাকি।

চা পান করতে করতে জিজ্ঞাসা করি, কবিতা, মাষ্টারী জীবন তোমার কেমন লাগে?

বিরক্ত হয়ে কবিতা বলে, ছাই! অনেক সময় আমার কান্না পায়, প্রভাত বাবু! একদিন গর্ব করে আপনাকে বলেছিলুম, পুরুষের সাহায্য ছাড়াও নারী তার জীবন চালিয়ে নিতে পারে। সেটা ভুল,—মস্ত ভুল বলেই আজ মনে হয়। বাবা মারা গেলেন; পথে বসলুম। ভাগ্যি বি-এটা পাশ করেছিলাম, তাই চাকরীটা পেয়ে দু'টো খেয়ে পরে বেঁচে আছি। এই কি সত্যিকার লাইফ! সত্যিকার আপনার লোক আমার কেউ নেই…

আমার মুখে হয়ত একটু চাপা হাসি লক্ষ্য করে ভীষণ গম্ভীর হয়ে কবিতা বলে,—কান্নায় যখন আমর বুক ভেঙে যাচ্ছে, তখন হয়ত হাসবার কোন কারণ আপনার থাকতে পারে! আমি কিন্তু…

ব্যথিত সুরে বলি—কবিতা! তুমি বোধ হয় আজও আমায় বুঝতে ভুল করছ…

—ভুল? আপনাকে আজ বুঝতে আমার হয়ত একটু ভুল হতে পারে…কিন্তু সে-দিন আমার কোন ভুল হয় নি। কিন্তু আপনি? আমার সামান্য একটা কথা শুনে সহ্য করতে না পেরে একেবারে কল্‌কাতা ছেড়েই পালিয়ে গেলেন! আশ্চর্য্য লোক আপনি! উঠে পড়ছেন যে…

—আজ আসি, বিদায়…

—কত দিন থাকবেন এখানে?

—ঠিক নেই, তবে কিছুদিন আছি।

—আর দেখুন, সকাল-সন্ধ্যায় দু'বেলা একঘণ্টা করে বেড়ানর হ্যাবিট্ আমি করে ফেলেছি। আপনাকে ঐ সময়ে টোয়াইস-এ-ডে আমি দেখতে চাই নিয়ার দি ব্রিজ, অবিশ্যি আপনার যদি কোন অসুবিধা না থাকে। কেমন রাজি তো?

—অল্‌রাইট। আচ্ছা, আসি।…

দু'লাইন কবিতা লিখে সেটা আর শেষ করতে পারিনি। বিরহের কবিতা আরম্ভ করতেই মিলনের অনুভূতি এনে দেবে জীবনে আমার মানস-প্রতিমা মিস্ কবিতা রায়, তা'কি সেদিন ভাবতে পেরেছিলাম?…

প্রত্যহ দু'বেলা মিস্ কবিতার সাহচর্য্য লাভ, তার সরল আলাপ, মধুর পরশ, প্রাণঢালা ভালবাসার দান-প্রতিদান…আমার জীবনটাই যেন রসঘন কবিতা হয়ে উঠল!

কাগজ-কলম নিয়ে কবিতা লেখার কথা আর মনে পড়ে না! সম্পাদকের কাছ থেকে চিঠির পর চিঠি পাই।

উত্তর দেই,—মারাত্মক ভাবে পীড়িত আমি। কবিতা লেখার সময়াভাব। আন্তরিক দুঃখিত হলুম, কোন কবিতা না পাঠাতে পেরে...

কাকার বড় মেয়ে অর্থাৎ আমার দিদি একদিন হেসে বলে—প্রভাত, তুই কবিতাকে বিয়ে করতে রাজি আছিস?

কবিতা!...দারোগার মেয়ে দিদি আমার ডিটেকটিভ পুলিস নাকি! আহা বেচারা আবার বিধবা!

বিস্মিত হয়ে বলি—দিদি, তুমি কি করে জানলে যে কবিতা···

আমার ডায়েরীটা দিদি আমাকে ফিরিয়ে দেয়। তাইতো! কী বেহুঁস আমি! দিদি নিশ্চয়ই আমার ডায়েরী পড়েছে, আমার সবটুকু গোপন কথা নিশ্চয়ই জেনে নিয়েছে। যাক, সত্যি কথায় আর লজ্জা কি?

নির্ভয়ে দিদিকে বলি—কবিতা যে আমার জীবনে এগিয়ে চলার পথে সঙ্গিনী তা' শুধু তুমিই জানতে পেরেছ। ভেবেছি, তাকে বিয়ে করব। এখন তোমাদের মনে পছন্দ হলে হয়?

দিদি বলে,—কবিতাকে দেখতে আমার বাকি আছে কিনা! পছন্দ আমাদের হয়ে গেছে। সুন্দরী, শিক্ষিতা.. পছন্দ হবেনা কেন? তোকে পড়িয়ে দিতে পারবে কিন্তু! ···তোর যা বিদ্যে...ইঃ, ভারি আমার এম-এ পাশ করা কবিরে!···

—সেই ছেলে বেলার ঝগড়া আরম্ভ করলে যে! তোমার সেন্টিমেন্টে আমি কিন্তু আঘাত করতে চাই না—

—আচ্ছা, আচ্ছা, আর উদারতা দেখাতে হবে না! বাবাকে আজই কবিতার সঙ্গে তোর বিয়ের কথা বলব। তোর জন্যে গজা তৈরী করে রেখেছি,···আর ছানার জিলিপী···বুঝলি? খাবি, আয়—

কবিতাকে দেখে কাকার খুবই পছন্দ হল। পুরুত ডেকে ১৬ই শ্রাবণ বিয়ের দিন ঠিক করলেন।

১৫ই শ্রাবণের সন্ধ্যা। মনটা আনচান করতেই কবিতার বাসায় বেড়াতে গেলাম।

কবিতার আমার এত রূপ! গায়ে হলুদ মেখে কবিতার রূপ যেন আরও শত গুণ বেড়েছে...বধূবেশের পূর্ব্বাভাষ;···চোখে তার অলস ক্লান্তি, মুখে মৃদু হাসি, দেহে লীলায়িত গতিভঙ্গিমা!

অতসি-দি হেসে বলেন,—এস, এস ভাই, বোস। আসছে কালই তো তুমি আমার আদরিণী গরবিনী বোনটিকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে।...কী নিষ্ঠুর তুমি!

অতসি-দির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চিরকুমারী তিনি। উঃ, চিরকুমারী! কল্পনা করতেই গাটা কেমন শিউরে ওঠে! তাঁর নারীজন্ম মেয়ে পড়িয়ে পড়িয়েই গেল! দরিদ্র-নারায়ণের সেবা, দেশমাতৃকার চরণ পূজা ইত্যাদি বড় বড় কথার ভেতর দিয়েই তাঁর পঞ্চাশ বছরের জীবন তিনি চালিয়ে নিয়েছেন।

পরে একটু হেসে আবার বলেন,—কি চমৎকার মুন-লাইট! কবিতা, তোর সেই নতুন শেখা গানটা শোনা না, ভাই!

হারমোনিয়াম সংযোগে কবিতার গান চলে। পৃথিবী সে-গান শুনে মুগ্ধ হয়; দমকা বাতাস ঘরে ঢুকে কবিতার অঙ্গ স্পর্শ করে যায়; চাঁদের কিরণ জানলা দিয়ে এসে আমার সামনেই আমার কবিতাকে চুমো দিয়ে যায়.

গান থেমে যায়। কবিতা বলে,—অতসি-দি, চলুন, ওই খোলা মাঠে আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।

অতসি-দি মুখ বেঁকিয়ে একটু ঈর্ষ্যাপূর্ণ স্বরে বললেন, —মুন লাইট এনজয় করে জীবন সার্থক করবার মত বয়স আমার নেই। অনেক দিন পেরিয়ে গেছি সেই গোল্ডেন এজ···সখ হয়েছে তোর আচ্ছা,—প্রভাতকে সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়ে আয়···দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বই পড়ায় মনোনিবেশ করেন। জানি না, বই পড়বার মত মনের অবস্থা তাঁর তখন ছিল কিনা!

জ্যোৎস্না রাত। খোলা মাঠে এসে দাঁড়ালাম আমি আর কবিতা,—আমরা দু'জনে সেই নিভৃত নির্জনে যেন সত্যিই একা!

শঙ্কিত ভাবে কবিতা বলে—কমরেড, আমার যেন কেমন আজ ভয়-ভয় করছে। দেখি, তোমার হাতটা—

আমার হাতখানি নিয়ে সে তার নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে। অপূর্ব্ব পুলক শিহরণ জাগে বুকে। কচি কীটির মত বুকের কাছে এসে আর এক হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে।···তাকে বুকে চেপে ধরে আদর করি···সে যেন একেবারে এলিয়ে পড়ে!

কবিতা আমার কাণের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি বলে,—প্রিয়তম বন্ধু, বলতে পার আমাদের এই অতল-গভীর সুখের কাছে সামান্য কোন দুঃখও লুকিয়ে থাকতে পারে কিনা? আনন্দ, সুখ, মিলন—এদের স্থায়িত্ব কতটুকু সময়?

আবেগভরে উত্তর দিলুম,—অনাদি—অনন্ত কাল ধরে। আমাদের মিলন আত্মার। আত্মার বিনাশ নেই—

—উঁহু,...উঃ—মলুম···

কি একটা কালো দড়ির মত কবিতার পায়ের কাছ দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—কবিতা, কি হল?

ঢলে পড়তে পড়তে কবিতা বলল—সাপ! সাপে কামড়েছে। আমাকে ভাল করে ধর···উঃ···তোমার কোলে মাথা রেখে—

তাড়াতাড়ি পরণের কাপড় ছিঁড়ে ক্ষতস্থানের ওপর ভাল করে বেঁধে ফেললুম।

আকাশে কালো মেঘ জমাট বেঁধে চাঁদকে ঢেকে ফেলেছে। মেঘগর্জ্জন, বারিবর্ষণ শুরু হল...ঝড় উঠল। স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল যেন আজ একসঙ্গে কাঁপতে আরম্ভ করেছে।

কবিতাকে বুকে তুলে নিয়ে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ছুটে চলেছি উন্মাদের মত। কবিতার বাসার কাছে এসে ডাকি—অতসি-দি—সর্ব্বনাশ হয়েছে!···

তারপর ডাক্তার-কবিরাজ, ওঝা-বদ্যি, আরও কতশত লোক এল, গেল। সকলের হা-হুতাশ, আমার চোখের জল, এমন কি অতসি-দির, আর আমার দিদির ভগবানের কাছে ঐকান্তিক প্রার্থনা কবিতার জীবন ফিরিয়ে পাওয়ার জন্যে—এ-সব ব্যর্থ করে দিয়ে কবিতা আমার চলে গেল অচীন দেশে। আর আমি?...

না-শেষ করা কবিতাটি শেষ করে সম্পাদককে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কবিতাটির সমালোচনা বেরিয়েছিল অনেক কাগজে।...কেউ কেউ খুব উচ্চ প্রশংসা করে আমাকে স্বর্গে তুলে দিয়েছিলেন। কি জিনিষ হারিয়ে কতটুকু প্রশংসা পেলুম তা' আমিই জানি! কোন সমালোচক আবার লিখেছিলেন, কবি শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার সেনের লেখা "কবির বিরহ" কবিতাটি পড়লে মনে হয়, এ যেন কবির বুকের রক্ত দিয়ে লেখা!

শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য

পুস্তকপরিচয়
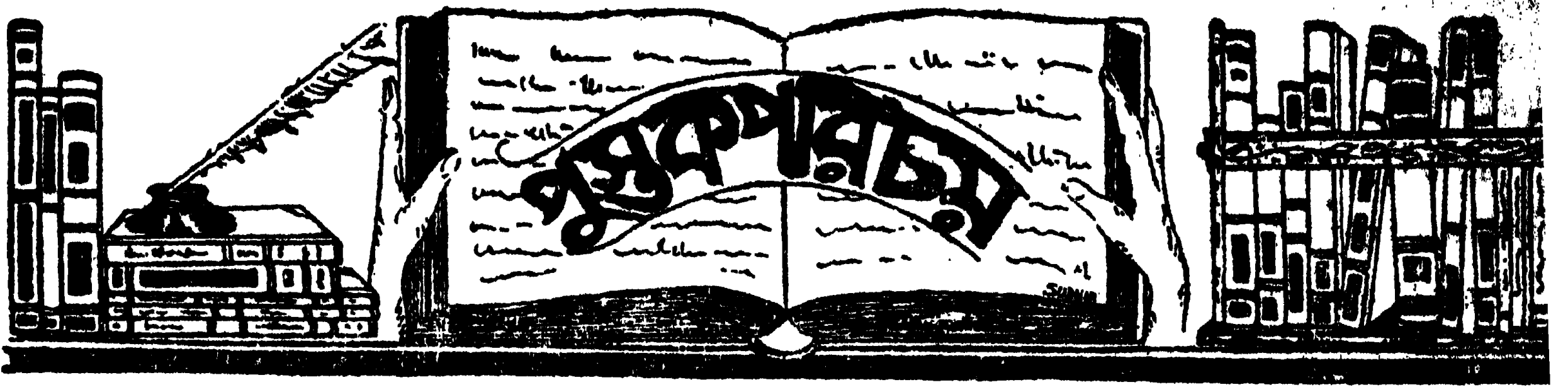
আশ্চর্য—শ্রীদিলীপকুমার রায়ের প্রথম স্বদেশী উপন্যাস—ধর্মজীবনকে কেন্দ্র করে লেখা। ১৩০ পৃষ্ঠা, ৪ খানি সুন্দর হাফটোন ছবি সহ। কাগজ, ছাপা সুন্দর। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত। মূল্য একটাকা।

কেহ কেহ বলেন সম্পূর্ণভাবে প্রণয় চিত্র বর্জ্জন করে কেবল মাত্র ধর্মজীবন অবলম্বন ক'রে উপন্যাস রচনা করা অসম্ভব। কিন্তু এ কথা যে সম্পূর্ণ সত্য নয় একটু ভে'বে দেখলেই তা' বুঝা যায়। প্রেম বা নারীসঙ্গ-কামনার মতো ধর্মাকাঙ্ক্ষা বা ভগবৎপ্রীতিও মানব জীবনের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি, এবং মানুষ তার থেকেও প্রচুর আনন্দ পেয়ে থাকে,—যদিও সকলের পক্ষে এ কথা সমান সত্য নাও হ'তে পারে। কিন্তু অধিকা'রী ভেদ তো সকল ক্ষেত্রেই আছে। তাই একথা হয় তো নির্ভয়েই বলা চলে যে, মানব মন যে সকল বৃত্তি থেকে আনন্দ পেয়ে থাকে, তাদের অবলম্বন করে উপন্যাস রচিত হতে পারে নিশ্চয়ই,—অন্তত না হবার কোনোই কারণ নেই। শুধু রচিত হতে পারে তাই নয়—অত্যুৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস রচিত হতে পারে, তার প্রমাণ দিয়েছেন দিলীপকুমার তাঁর 'আশ্চর্য' লিখে।

বইখানি সত্যিই চমৎকার হয়েছে,—প'ড়ে মুগ্ধ হতে হয়। বর্ত্তমান যুগের বাস্তবতার দোহাই দিয়ে বস্তি-জীবনের একঘেয়ে নোংরামীর চিত্রে যাঁদের মন তিক্ত হ'য়ে উঠেছে, তাঁদের কাছে বইটি অমৃতের আস্বাদ এনে দেবে একথা জোর করে বলা যায়। দিলীপকুমারের উদার বলিষ্ঠ মনের আলোকপাতে, তাঁর অননুকরণীয় রচনাভঙ্গীতে, তাঁর সংস্কৃতিপ্রবণ দরদপূর্ণ সূক্ষ্ম বিচার-রীতির মধ্য দিয়ে যে অপরূপ পরিণতি লাভ করেছে 'আশ্চর্য', তার তুলনা মেলে না। চরিত্রগুলি এমন জীবন্ত যে মনে হয় যেন এদের কোথায় দেখেছি, যেন এদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে।

হয়তো বাস্তব জীবনের ছায়া এর মধ্যে একটু বেশী পরিমাণেই আছে, কিন্তু তবুও দিলীপকুমারের অতুলনীয় কল্পনা শক্তিতে এবং অপরূপ লিপিচাতুর্য্যে সেটুকু একেবারেই ধরা পড়ে না,—অনাবিল ঔপন্যাসিকতার আস্বাদে মন খুসী হয়ে উঠে।

নানা কারণে কেহ কেহ আশ্চর্যের প্রকাশ এবং প্রচার তত বাঞ্ছনীয় মনে করেন নি, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের তরফ থেকে আমাদের মনে হয়, কোনো কারণেই এমন চমৎকার উপন্যাসের প্রকাশ অবাঞ্ছনীয় হতে পারে না,—তার কারণ যত গুরুতরই হোক না কেন।

মানুষ সামাজিক জীব। তারা চায় তাদের আত্মীয় স্বজন তাদের সঙ্গে তাদেরই মতো সংসারে বদ্ধ হয়ে বাস করুক। তাই আত্মীয়দের মধ্যে যদি কেউ ধর্ম্মের জন্য সংসার ত্যাগ করতে চায়, তো তারা প্রাণপণে বাধাই দিয়ে থাকে। এ তো খুব সহজ কথা। কিন্তু আশ্চর্য এই যে তারাই আবার অন্যত্র শঙ্করাচার্য, মীরাবাই, বিবেকানন্দের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠে। যা' তা'রা নিজেদের সংসারে একান্তভাবে ঘটতে দিতে চায় না, তাকেই আবার অন্যত্র আদর্শ বলে গ্রহণ করে কেমন ক'রে, এইটাই সব চেয়ে আশ্চর্য কথা। শ্রীঅরবিন্দ ঠিকই বলেছেন, "The average Hindu considers the spiritual life the highest, revers the Sannyasi, is moved by the bhakta, but if one of the family circle leaves the world for the spiritual life, what tears,

arguments, remonstrances, lamentations! It is almost worse than if he had died a natural death."

এই অত্যাশ্চর্য পরস্পরবিরোধী মানব মনোবৃত্তির উপর ভিত্তি করে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে।

'আশ্চর্য' বাংলা সাহিত্যে প্রথম অবিমিশ্র ধর্ম সম্বন্ধীয় উপন্যাস, এবং আশা করি ক্লাশিক পর্যায়ে স্থান লাভ করে চিরদিন সমাদর লাভ করবে। মোট কথা বইটি পড়ে আমরা অত্যন্ত খুসী হয়েছি এবং বাংলার পাঠকমণ্ডলীকে পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

নূতন অধ্যায় :—শ্রীআশালতা সিংহ প্রণীত। মডার্ণ পাব্লিশিং সিণ্ডিকেট, ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্তা আশালতা সিংহের রচনাবলীর বিশেষত্ব এই যে তিনি কোন মামুলী ধরণের বিষয়বস্তু লইয়া উপন্যাস লেখেন না—তাঁর বিষয়বস্তু সব সময়েই মনস্তাত্ত্বিক। এইরূপ বিষয়বস্তু মনোনয়ন করিলে তার মুস্কিল এই হয় যে উপন্যাসের আখ্যানভাগ নিজের অভিজ্ঞতা হইতে সংগ্রহ করিতে হয় এবং মনের অন্তর্নিহিত ভাবকে রূপ দিবার সময় মাঝ পথে যে সমস্ত জটিলতার সৃষ্টি হয়, নিজের বুদ্ধির দ্বারা তার মীমাংসা করিতে হয়। উপরন্তু প্রয়োজন হয় সাহিত্যের ভাষা —নয় ত সমস্ত রচনা শুষ্কতায় পর্যবসিত হয়। ভাষার শক্তি না থাকিলে তাহা পাঠককে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না —ফলে খানিক দূর অগ্রসর হইয়া পাঠক ক্লান্ত ভাবে উপন্যাস পাঠ ত্যাগ করেন।

শ্রীযুক্তা আশালতা দেবী আশাতীত ভাবে এই কঠিন উপকরণ কাজে লাগাইয়া সফল হইয়াছেন। বক্ষ্যমান উপন্যাসে কমলা নামক একটি মেয়ের সতীশ নামক একটি ছেলের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পূর্বে দাদার বন্ধু শিবেশ্বরের সহিত কমলার একবার পরিচয় হয় এবং শিবেশ্বর মুগ্ধ হইয়া কমলাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সাংসারিক ঘটনাচক্র এমন ভাবে প্রবাহিত হইল যে শেষে কমলার বিবাহ হইল সতীশের সঙ্গে এবং শিবেশ্বরের বিবাহ হইল নলিনীর সঙ্গে। বাহির হইতে দেখিতে গেলে কমলা এবং শিবেশ্বরের জীবনে কোন ত্রুটি বা ব্যর্থতা ধরা পড়ে না—দুইজনেই অভ্যস্ত কর্তব্য নিঁখুত ভাবে সম্পন্ন করিয়া চলিতেছিলেন। কিন্তু মনের যে গোপন-লোকে বাহিরটাই সব নয়, মন যেখানে আপন খুশী এবং খেয়াল মত হাসি কান্নার বিপণি সাজায়, সেই অন্তরপুরের দুয়ার উদ্ঘাটিত করিয়া লেখিকা দেখাইয়াছেন শিবেশ্বর কিরূপে নলিনীকে পাইয়াও উদাসীন রহিয়া গেল এবং কমলা কিরূপে সতীশের মত প্রেমময় স্বামী পাইয়াও নিজেকে কিছুতেই অবাধে বিলাইয়া দিতে পারিতেছিল না। ঘটনাগুলি সামান্য—উভয়ের এক আধবারের দেখা সাক্ষাৎ—দুই চারিটি সাধারণ কথাবার্ত্তা। কিন্তু ইহারই ফলে মানসলোকে যে আলোড়ন জাগিয়াছে তাহার গুরুত্ব এবং উভয়ের জীবনের উপর তার প্রভাব লেখিকা সবলতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন।

বইখানির প্রচ্ছদপট এবং ছাপা বাঁধানো ইত্যাদি সুরুচির পরিচয় প্রদান করে। 'নূতন অধ্যায়' নামটি connotative. লেখিকা যে আধুনিকতার মোহে সেই হারাইয়া ফেলেন নাই, তাহার নির্দেশ নামটির মধ্যে পাওয়া গেল।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

বিজলী—শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। প্রকাশক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। দামের উল্লেখ-নেই।

বিজলী বইটি গল্প বা উপন্যাস নয়। গ্রন্থকারের পরলোকগতা কন্যা বিজলীর স্মরণে লিখিত। বিজলী বিজলীর মতই ক্ষণিকা, চম্‌কে চেয়ে মিলিয়ে গেছে। রেখে গেছে স্নেহময় শোকার্ত্ত পিতার চিত্ত-পটে নিজের ছবি অঙ্কিত ক'রে। তাঁর শৈশব কৈশোর মুকুলিত যৌবন অম্লান অক্ষয় হ'য়ে বিরাজ করছে পিতার স্মৃতি-মন্দিরে। আবির্ভাব থেকে অবসান অবধি সরস সুন্দর ভাষায় বর্ণিত হ'য়েছে। বিষয়টি ব্যক্তিগত, কিন্তু লেখার গুণে সকলের মনকে

অভিভূত ক'রবে। লেখক লিখেছেন প্রাণ দিয়ে, তাই ত ক'রছে এ প্রাণকে স্পর্শ। সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা একটি কল্যা কুসুম অকালে ঝ'রে গেছে দুর্ঘটনার ফলে, তারই সৌরভ ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছে বইটির পাতায় পাতায়। খিজলীর স্মৃতির উপর পাঠককে দুটি বিন্দু অশ্রু উৎসর্গ করতে হ'বে।

শ্রীমমতা ঘোষ

মানস-বিরহ :—(কবিতা গুচ্ছ)—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী। প্রকাশক—বাগচী এণ্ড সন্স। ২এ, কুপারস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা। দাম—আট আনা।

অতি আধুনিক কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রযুগের কাব্যের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে সেটা এক কাব্যের বিরুদ্ধে পরবর্ত্তী কালের কাব্যে'র কাল-ধর্ম্ম সঙ্গত বিদ্রোহ নয় –এই দড়িছেঁড়া বিদ্রোহের কোন অর্থ হয় না। এতে নেই কোন নতুন যুগের অননুকরণীয় ভঙ্গি—নেই কোন সার্থক রস পরিবেশনের চেষ্টা বা নতুন সৃষ্টির ইঙ্গিত—এ যেন কম দামী ইমিটেশন সিল্ক। সুষ্ঠু অনুকরণও নয়। রবীন্দ্রনাথের বাহ্যিক আবেষ্টনী হ'তে মুক্ত হবার কেবল একটা অক্ষম ব্যর্থ প্রয়াস। কোন একটা নতুন কিছু করার ঝোঁক—এ বিদ্রোহ কেবল বিদ্রোহ কথাটা আছে ব'লেই। কবিতা মজুর পড়বে কি মহাজন পড়বে—কবির সে দিকে দৃষ্টি রাখলে চলে না। যাই হোক, নানান কারণে অতি আধুনিক কাব্য জগতে একটা crisis-এর কাল চলবে। সত্যকারের রসিকজন তাকিয়ে আছে উদয়াচলের দিকে—নতুন ভোর সুরু হবে কবে?

এর মাঝখানে হেমবাবুর কাব্যলক্ষ্মীর আবির্ভাব কতকটা যেন অপ্রত্যাশিত। কাব্য বলতে আমরা যা বুঝি অর্থাৎ তার সুর, সৌন্দর্য্য অনুভূতি ও রসপ্রকাশ। ইতিমধ্যে হেমবাবুর 'দীপান্বিতা' ও 'তীর্থপথে' আমরা পেয়েছি। তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ এই 'মানস-বিরহ।' এতে তাঁর সেই ধ্যানলোক, চিন্তার আভিজাত্য, রস পরিবেশন অক্ষুণ্ণ আছে।

কবিতাগুলিকে 'বাসন্তিকা' ও 'মানস-বিরহে' পৃথক করা হ'য়েছে। শীতরাত্রির মৃত্যুর পরে পলাশের স্বপ্নে যে প্রেম-বাসন্তিকা রঙীন হ'য়ে উঠেছিল—সেই প্রেম 'মানস-বিরহে' এসে হ'য়েছে শেষ। পৃথিবীর রঙের প্রাচুর্য্যের মাঝখানে যে পরম শোভনীয়া নারী স্বপ্নমর্ম্মরিত হ'য়ে আছে 'বাসন্তিকা'র মাঝে কবি তাকেই ভালোবেসেছেন স্বপ্নে—আবার স্বপ্নের 'মানস বিরহে' সেই অনাগত নারীর বিরহ পৃথিবীর বিচিত্র সুরের মাঝখানে মধুরতর হ'য়ে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর সাজঘরে ভালোবাসার অবসর নেই—নেই তার মিথ্যে একটু স্বপ্নও; পড়ে আছে কেবল কামনা'-কলঙ্কিত খোলসটা। বন্ধ পৃথিবীর মাঝখানে যে উচ্ছল প্রাচুর্য্য আর অনন্ত অবসর মানুষকে ভালোবাসায় আদিম উদ্দাম করে তোলে—সেই পৃথিবীরই পটভূমিতে মানস বিরহের কবিতাগুলি এক একটি জোনাকীর মতো। এই ধ্যানালোকের মাঝখানে কবির মানসী রূপ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে—

> আমের মঞ্জরী ল'য়ে রেখেছ কি কবরী-সীমায়,—
> গৌর দু'টি স্তন তটে চন্দন-অঙ্কন!
> যবাঙ্কুর-পাণ্ডু গণ্ডে আষাঢ়ের মায়া কি ঘনায়—
> অধরের প্রান্তে আসি' শিহরে চুম্বন!

হেমবাবুর দশ বছর পূর্ব্বের পুরাণো এই কবিতাগুলি পুরাণো স্মৃতির মতোই মিষ্টি। বর্ত্তমান কাব্য নগরীর ফুটপাতের হল্লায় হেমবাবুর খাপছাড়া আবির্ভাব হয়তো অসঙ্গত—কিন্তু প্রত্যেক কাব্যরসিকেরই এই কবিতাগুলি ভালো লাগবে। কাব্য চর্চ্চা যদি এক রকমের চিন্তা বিলাস হয় তা হ'লে হেমবাবুর আভিজাত্যের মাঝখানেই চিন্তা বিলাসী হওয়ায় সুখ আছে, শান্তি আছে। হেমবাবুর কবিতাগুলি প্রত্যেক কাব্যরসিককেই আস্বাদ ক'রতে অনুরোধ করি।

শ্রীসুশীল জানা

এখনো রজনী যায়নি ফুরায়ে

শ্রীসুধীর গুপ্ত

এখনো রজনী যায়নি ফুরায়ে
আঁধারে আঁধারে কালো ;
অঘোরে ঘুমায় এ মহানগরী,
রাজপথে শুধু আলো।
বাতায়ন হ'তে ঘরের ভিতরে
পড়েছে তাহার ফালি,
আঁধারের মাঝে ক্ষীণ আশা ফেলে ;
আমি জেগে আছি খালি।
বিংশ যুগের যুবক-মনের
বিপুল ভাবনা-ভারে,
তন্দ্রাই শুধু চোখে হানা দেয়
ঘুম নাহি একেবারে।

বার-নারী সম এ মহা-নগরী
তার মেকী রূপ নিয়া,
পুতুল নাচের নাচনে নাচায়
কেবলি মানব হিয়া।
মানবিকতার মাধুরী কোথায় ?
ভ্রূকুটী-কুটিল-ভুরু,
লক্ষ্মী-ছাড়া এ লক্ষ্মীর লাগি'
মারামারি করে সুরু।
ধনিকে ধনিকে, ধনিকে গরীবে,
ধনিকে বণিকে এ কী ?
সভ্যতা তবে সবি কি স্বপন !
উন্নতি যতো মেকী !
এ মহাজাতির কি হবে তাহলে ?
পীড়িত ভাবনা-ভারে,
তন্দ্রাই শুধু চোখে হানা দেয়,
ঘুম নাহি একেবারে।

নানাকথা

পরলোকগত জলধর সেন

গত ২৬শে চৈত্র রায় বাহাদুর জলধর সেন পরলোক গমন করিয়াছেন। তাহার ২৫ দিন পূর্বে ১লা চৈত্র তারিখে তিনি ৭৯ বৎসর বয়স পূর্ণ করিয়া ৮০ বৎসরে পদার্পণ করেন। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর ২৫ দিন হইয়াছিল।

বয়সের দিক হইতে বিবেচনা করিলে তাঁহার মৃত্যুতে দুঃখ করিবার বিশেষ কিছু নাই,—কারণ বাঙ্গালীর পক্ষে ৮০ বৎসরের জীবন দীর্ঘ জীবন ত' নিশ্চয়ই সুদীর্ঘ জীবন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু জলধর বাবুর জীবনকে ত শুধু বৎসর মাসের অঙ্কে মাপিলেই চলিবেনা—সে জীবনের অন্য মাপও আছে যাহার কাছে বৎসর মাসের হিসাব অকিঞ্চিৎকর। একটা সুরেলা বীণ যন্ত্র হারাইয়া ক্ষতিটা কাষ্ঠ ও তাঁরের ওজনের হিসাবে মাপিতে গেলে ভুল হইবে। সেই হিসাবে, জলধর বাবুর মৃত্যুতে আমাদের যে ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে ৮০ বৎসর ঠিক তাহার সান্ত্বনা নয়।

আকারে এবং প্রকারে জলধর সেন বাঙলা সাহিত্যকে যাহা দান করিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য বাঙলা দেশ বহু দিনাবধি তাঁহাকে কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করিবে। তিনি একজন উচ্চদরের সাহিত্যিক ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু জরা এবং বার্দ্ধক্য হেতু কিছু দিন হইতে সেই দানের উৎস বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত যাহা বন্ধ হয় নাই, বরং উত্তরোত্তর অধিকতর দীপ্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল, তাহা তাঁহার হৃদয়ের অনন্য-সাধারণ ঔৎকর্ষ্য যাহার দ্বারা তিনি অগণিত বঙ্গবাসীর শ্রদ্ধা এবং প্রীতির উদ্রেক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাহিত্যিক জলধরকে আমরা সম্পূর্ণরূপে খুঁজিয়া পাইব তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে; কিন্তু মানুষ জলধর এখন হইতে রহিলেন আমাদের অন্তরের মধ্যে স্মৃতির সামগ্রী হইয়া। বাহির তাঁহাকে হারাইয়াছে।

জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত জলধর সেন 'রবিবাসর' সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের সর্বাধ্যক্ষ হইয়া ছিলেন। এই স্বহস্ত-নির্মিত রবিবাসর তাঁহার বড় আদরের বস্তু ছিল। কদাচিৎ কখনো নিতান্ত অসমর্থ না হইলে তিনি ইহার অধিবেশনে অনুপস্থিত হইতেন না। বার্দ্ধক্যের ওজুহাতে কিছুদিন হইতে তিনি সর্বাধ্যক্ষের দায়িত্বপূর্ণ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার জন্য মাঝে মাঝে পীড়াপীড়ি করিতেন। পক্ষান্তরে আমরা সদস্যরা অনুভব করিতাম সর্বাধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্যতা তাঁহার দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। আমরা তাঁহার অনুরোধ নির্বন্ধ অগ্রাহ্য করিয়া দিতাম। পঞ্চাশটি বিভিন্ন মতের এবং পথের সদস্যকে মালার মত একত্র গাঁথিয়া রাখিবার সূত্রের সন্ধান তাঁহার চেয়ে অধিক আর কাহারও ছিল না।

অর্দ্ধ শতাব্দকালব্যাপী সাহিত্য-জীবনের মধ্যে জলধর সেন বহু সংবাদপত্র এবং মাসিক পত্রের সম্পাদনা করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ ২৬ বৎসর "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রের সম্পাদনা তাঁহার গৌরবময় কীর্ত্তি। এই সুদীর্ঘ-কালের মধ্যে তিনি নানাভাবে নানা উপায়ে যে সুযোগ

সুবিধা দিয়া গিয়াছেন তাঁহার কথা বাঙলা দেশের বহু সাহিত্যিক কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করিবে।

সারদেশ্বরী আশ্রম—

বিগত ৮ই বৈশাখ শনিবার অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ভবনে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় মহিলাদিগের একটী ধর্ম্ম সভার অনুষ্ঠান হয়। সভার উদ্বোধনে আশ্রমকুমারীগণ এবং শ্রীমতী ছবিরাণী চৌধুরাণী কর্ত্তৃক স্তোত্র ও সঙ্গীত গীত হয়। অতঃপর আশ্রম সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা দুর্গাপুরী দেবী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবী মাতাঠাকুরাণীর পুণ্য জীবন চরিত আলোচনা করিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীই নারীর আদর্শ এবং সেই আদর্শানুশীলনই যে নারী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ এবং মহিমান্বিত করিতে পারিবে তাহা মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দেন এবং শ্রীশ্রীগৌরীমাতার অলোকসামান্য জীবনের ভগবদ্‌ভক্তি, তেজস্বিতা এবং আদর্শ নিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তাঁহার এই ভক্তিমূলক এবং সারগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণে উপস্থিত মাতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হন। অতঃপর শ্রীযুক্তা প্রভাবতী মিত্র শ্রীশ্রীগৌরীমাতার অপূর্ব্ব চরিত কথা সুললিত ভাষায় ব্যক্ত করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দ দান করেন।

মিসেস বি, এন, কোলে, মিসেস পি, সি, দে, রাণী গিরিজাকুমারী রায়, শ্রীযুক্তা সুকুমারী দেবী, মিসেস কুঞ্জবালা ঘোষ, শ্রীযুক্তা নির্ঝরিণী সরকার, মিসেস এ, এল, মিত্র, শ্রীযুক্তা নিরুপমা সরকার, শ্রীযুক্তা প্রফুল্লকুমারী দত্ত, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের মাতাঠাকুরাণী, মিসেস, বি, কে, রায় প্রমুখ অনেক মহিলা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

পরলোকগত প্রমোদচন্দ্র পালিত—

কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা এটর্ণী প্রমোদচন্দ্র পালিতের অকাল মৃত্যুতে আমরা অতিশয় ব্যথিত হইয়াছি। প্রমোদচন্দ্র শুধু বিচিত্রা নিকেতন লিমিটেডের এটর্ণী ছিলেন না, তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র পালিত এবং শ্বশুর সুবিখ্যাত সাহিত্যিক ও জীবনচরিতকার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ উভয়েই আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। জগদীশ্বর ক্ষীরোদ বাবুর ও মন্মথ বাবুর দুঃখদীর্ণ হৃদয় শান্ত করুন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী—

ময়মনসিংহ সন্তোষের সুবিখ্যাত ভূম্যধিকারী মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর মৃত্যুতে বঙ্গদেশ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মহারাজার মধ্যে বহু গুণ ছিল সে জন্য তিনি অতিশয় জনপ্রিয় ছিলেন। কর্মজীবনের প্রথম পর্বে তিনি স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসে যোগদান করেন। কিন্তু পরে মতভেদ হেতু মডারেট দলের সহিত কংগ্রেসের সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন। কংগ্রেস ত্যাগ করিলেও নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগ স্থাপিত করিয়া তাঁহার দেশ-সেবা বাড়িয়াই উঠে। তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত তিন বৎসর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি নিজে একজন ভাল খেলোয়াড় ছিলেন, এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যায়াম ও ক্রীড়ার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। পরপর ছয় বৎসর তিনি ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। তাঁহার পূর্বে আর কোনো ভারতীয় ঐ পদ অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই এবং এতদিনও কেহ ঐ পদ অধিকার করিয়া থাকিতে পারেন নাই। মৃত্যুর দ্বারা স্যার মন্মথনাথ নানা ভাবে বাঙলা দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং কলিকাতা, ২৭নং কড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, সাহিত্য-ভবন প্রেস হইতে শ্রীবিভূপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
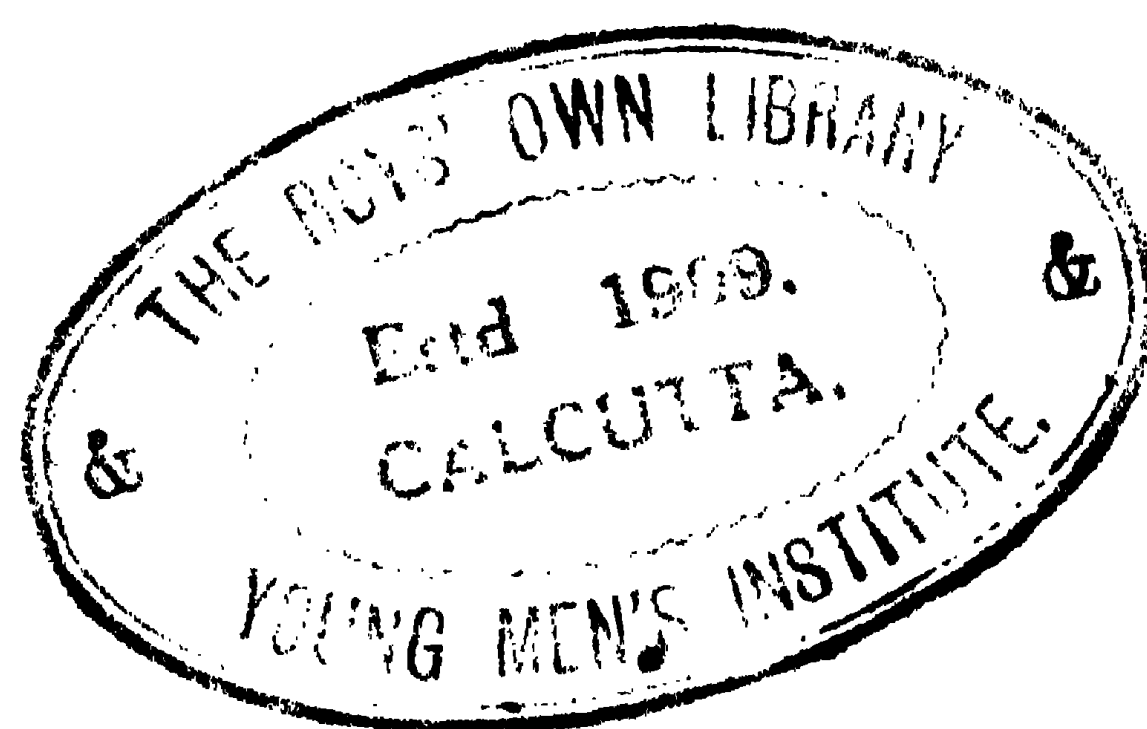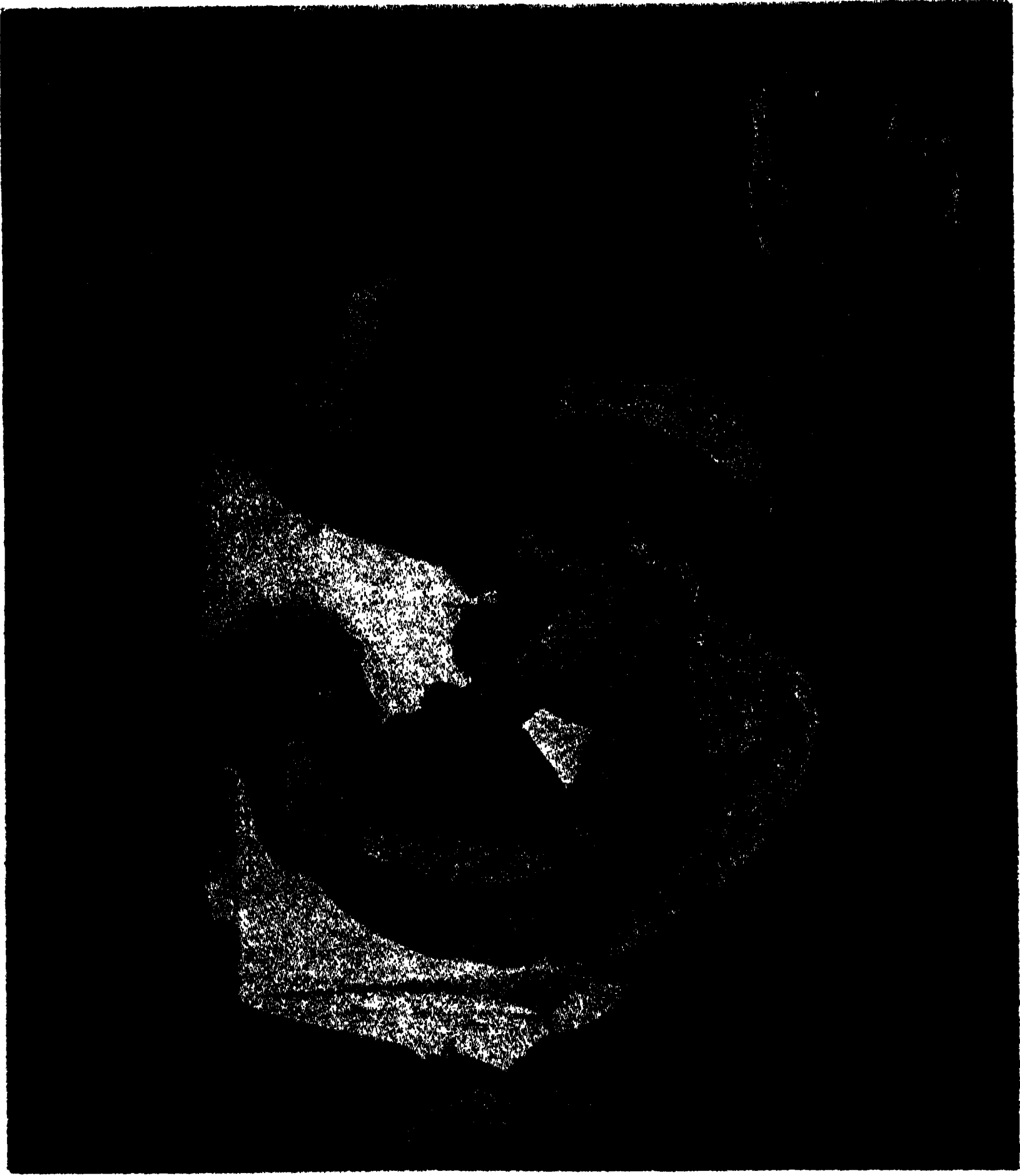
আতিথ্য।

বিচিত্রা

দ্বাদশ বর্ষ, ২য় খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬ | ৫ম সংখ্যা

বাঙলা সাহিত্যের অন্ত্য-মধ্যযুগ

ডক্টর শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম-এ, পি-এইচ-ডি, কাব্যতীর্থ

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সংস্কৃত পুরাণ এবং রামায়ণাদি অনুবাদের যে ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বাঙলা সাহিত্যের অন্ত্য মধ্যযুগেও তাহা বেশ সজীবভাবে প্রবাহিত ছিল। কৃত্তিবাসই এই ধারার প্রথম প্রবর্ত্তক। তাঁহার রচনার বহুল প্রচার ও প্রশংসা দেখিয়া পরবর্ত্তী কালের অনেক কবিই রামায়ণ রচনায় হাত দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে অদ্ভুতাচার্য্য (আঃ ১৫৪৭ খৃঃ), চন্দ্রাবতী (আঃ ১৫৫০ খৃঃ), ষষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস, জগদ্রাম, রঘুনন্দন, রামমোহন, ভবানী দাস, ঘনশ্যাম দাস, দয়ারাম, দুর্গারাম, শিবচন্দ্র, শঙ্কর কবিচন্দ্র (জন্ম ১৫৭১ খৃঃ) লক্ষ্মণ, মধুকণ্ঠ, কৃষ্ণদাস ইত্যাদির নাম ঐতিহাসিকের পরিচিত। এই রামায়ণ রচকগণের অধিকাংশই প্রতিভাহীন অনুকরণকারী মাত্র। কেবল অদ্ভুতাচার্য্য এবং চন্দ্রাবতী সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। অদ্ভুতাচার্য্যের রচনায় কিছু মৌলিকতা এবং শক্তির পরিচয় রহিয়াছে। প্রথম শ্রেণীর কবি না হইলেও লোকরঞ্জনের কৌশল তাঁহার ভালরূপে জানা ছিল। তাই তিনি কেবল কৃত্তিবাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রামচরিত রচনা করেন নাই। লোকপ্রচলিত বা স্বকপোল-কল্পিত সরস কাহিনী-সকল গ্রথিত করিয়া তিনি নিজ রচিত রামায়ণের লোকপ্রিয়তা বাড়াইয়াছেন। বিশেষজ্ঞের মতে (১) বাঙলা দেশের প্রায় অর্দ্ধাংশের অধিবাসী অদ্ভুতাচার্য্য রচিত রামায়ণের ভক্ত ছিল। কিন্তু রামায়ণ গায়কগণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের সহিত না মিলাইয়া খুব কম ক্ষেত্রেই অদ্ভুতাচার্য্য রচিত রামায়ণ গান করিতেন। ইহাদের ব্যবহৃত অদ্ভুতাচার্য্যের রচনা মিশ্রিত কৃত্তিবাসের রামায়ণই অধুনা মুদ্রিত হইয়া ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে। অর্বাচীন রামায়ণ রচকগণের মধ্যে অদ্ভুতাচার্য্যের পরই চন্দ্রাবতীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহার সম্পূর্ণ রামায়ণ পাওয়া যায় নাই। যেটুকু পাওয়া গিয়াছে তাহাতেই ইঁহার রচনার স্ত্রীজনসুলভ মনঃপ্রাহী বর্ণনাভঙ্গী এবং প্রাঞ্জলতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার রচিত 'সীতা সরমার আলাপে' সীতা বলিতেছেন :—

লতাপাতা দিয়া গো কুটির বাঁধিল লক্ষ্মণে।
কুটিরের মধ্যে গো থাকি মোরা দুইজনে॥

* * *

রসাল বনের ফল গো পাতার কুটির পাইয়া।
অযোধ্যার রাজ্য পাট [গো] গেলাম ভুলিয়া॥
লক্ষ্মণ কানন হইতে গো আনি দেয় ফল।
পদ্মপত্রে আনি আমি গো তমসার জল॥
চরণ ধুইয়া প্রভুর গো তৃণশয্যা পাতি।
মনের আনন্দে কাটি গো বনবাসের রাতি॥
কি করিবে রাজ্য সুখ গো রাজ সিংহাসনে॥
শত রাজ্য পাট আমার গো প্রভুর চরণে॥ (২)

(১) ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের ভূমিকা, পৃঃ ২—৩/০ দ্রষ্টব্য।

(২) রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন কৃত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্করণ) হইতে উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৪১।

চন্দ্রাবতীর এই রচনা পড়িয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত কৃত মেঘনাদ বধের চতুর্থ সর্গের কথা আমাদের মনে পড়ে। মাইকেলের রচনায় সীতার উক্তিতে অলঙ্কার-বাহুল্য এবং শব্দবিন্যাস-পারিপাট্য দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই, কিন্তু পল্লী-কবি চন্দ্রাবতীর সহজ সরল বর্ণনাভঙ্গী আমাদের প্রাণকে অতি অনায়াসে স্পর্শ করে।

অপর অর্বাচীন রামায়ণ রচকগণ বিশেষ সাহিত্যিক শক্তির পরিচয় না দিয়া স্থানে স্থানে গ্রাম্যতা দ্বারা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যেমন, রামমোহন (১৮৩৮ খৃঃ) কৃত রামায়ণ হইতে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। লঙ্কা দহনের পর বন্দীকৃত হনুমানকে লইয়া রাক্ষসগণ যখন বিজয়-গর্ব্বে ঢাক ঢোল বাজাইয়া লঙ্কার পথে চলিতেছিল তখন দর্শকদিগকে লক্ষ্য করিয়া—

হনুমান কন মোর বিবাহ না হয়।
কন্যাদান করিবে রাবণ মহাশয়॥
রাবণের কন্যা মোর গলে দিবে মালা।
রাবণ শ্বশুর মোর ইন্দ্রজিৎ শালা॥
চারিদিকে হাসয়ে যতেক নিশাচর।
কেহ বা ইষ্টক মারে কেহ বা পাথর॥
হনুমান কন বিবাহের কাজ নাই।
এমন মারণ খায় কাহার জামাই। (১)

এই রচনায় লেখক ও তাঁহার শ্রোতৃবর্গের যে স্থূল রুচির সন্ধান পাওয়া যায় তাহাই তৎকালীন সাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট আভাস দেয়। শঙ্কর কবিচন্দ্র রচিত প্রচলিত রামায়ণের অন্তর্ভূত 'অঙ্গদ রায়বার'ও এই শ্রেণীর রচনা। নিম্নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ রায়বার হইতে কিছু উদ্ধৃত হইল। অঙ্গদ রাবণের সভাতে গিয়া কুণ্ডলীকৃত লাঙ্গুলের উপর ভর দিয়া বসিলে পর ইন্দ্রজিৎ ব্যতীত সব রাক্ষসই রাবণের রূপ ধারণ করিল। তখন ইন্দ্রজিতকে লক্ষ্য করিয়া :—

"অঙ্গদ বলে সত্য করিয়া কওরে ইন্দ্রজিতা।
এই যত বসিয়াছে সবাই কি তোর পিতা॥
তারি জন্যে এত তেজ গুরু লঘু না মানিস্॥
তোর বাপের এত তেজ ইন্দ্রে বেঁধে আনিস্॥
ধন্য নারী মন্দোদরী ধন্য তোর মাকে।
এক যুবতী এত পতি ভাব কেমনে রাখে॥
কোন বাপ তোর দিগ্বিজয় কৈল তিন লোকে।
কোন বাপ তোর কোথা গেল পরিচয় দে মোকে॥
কোন্ বাপ তোর চেড়ীর অন্ন খাইল পাতালে।
কোন বাপ তোর বাঁধা ছিল অর্জ্জুনের অশ্বশালে॥
* * * *
কোন বাপ তোর জন্ম হৈল জামদগ্ন্য তেজে।
মোর বাপ তোর কোন বাপকে বেঁধেছিল লেজে॥
একে একে কহিলাম তোর সকল বাপের কথা।
এ সবারে কাজ নাই তোর যোগী বাপটি কোথা॥

বলা বাহুল্য রাম চরিতকে সরসতর করিবার জন্য প্রতিভাহীন কবিগণ এই যে স্থূল হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছিলেন তাহা আধুনিক মার্জ্জিত রুচি পাঠক পাঠিকার অনুমোদন লাভ করিবে না।

রামায়ণের পরেই বাঙালীর দৃষ্টি পড়িয়াছিল ভাগবতের উপর। কৃত্তিবাসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যেমন অনেকে বাঙলায় রামচরিত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তেমনই মালাধর বসুর প্রদর্শিত পথেও মুখ্যত ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে একাধিক কৃষ্ণচরিতমূলক কাব্য রচিত হইয়াছিল। এই সকল কাব্যের রচয়িতাগণের মধ্যে মাধবাচার্য্য, শঙ্কর কবিচন্দ্রের নাম ঐতিহাসিকের বিশেষ পরিচিত। মাধবাচার্য্য চৈতন্যদেবের অনুচর ও ভক্ত ছিলেন (২)। মহাপ্রভুরই সম-সাময়িক কবি দেবকীনন্দন নিজ গ্রন্থে তাঁহার বন্দনায় বলিয়াছেন :—

মাধব আচার্য্য বন্দোঁ কবিত্ব শীতল।
যাঁহার চরিত গীত শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল॥

পরবর্ত্তীকালের কবি বৃন্দাবন দাসও তাঁহার বন্দনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

তবে ত বন্দনা কৈলুঁ মাধব আচার্য্য।
কৃষ্ণ গুণ বর্ণন সদাই যাঁর কার্য্য॥

উল্লিখিত স্তুতি হইতে মাধবাচার্য্যের কাব্যের বিশেষ লোকপ্রিয়তা বুঝিতে পারা যায়। এই লোকপ্রিয়তা যে তিনি কেবল কৃষ্ণ ভক্তির প্রচারকরূপে লাভ করিয়াছিলেন তাহা নয়। তাঁহার 'কৃষ্ণ মঙ্গল' প্রচলিত ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুসরণে রচিত হইলেও উহাতে নিজস্ব কৃতিত্বের

(১) পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তক ৪৪৬ পৃঃ।

(২) ইনি চৈতন্যদেবের শ্যালক মাধব মিশ্র হইতে পৃথক ব্যক্তি।

পরিচয় রহিয়াছে প্রচুর। তিনি মূল ভাগবতের দশম স্কন্ধকে অনুসরণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, স্থানে স্থানে স্বীয় কল্পনার সাহায্যে ভাগবতের বর্ণিত বিষয়কে শ্রোতৃবৃন্দের নিকট মধুরতর করিয়া তুলিয়াছেন। কৃষ্ণের মথুরা গমনকালে যশোদার বিলাপ প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন :—

প্রাণের পরাণ তুমি শুনরে কানাই।
তোম্যরে ছাড়িয়া মোর সংসারে কেহ নাই॥
আঁচলের সোণা তুমি আঁখির পুতলি।
গলায় বান্ধিয়া আমি রহিমু চক্ষু মেলি॥
প্রভাতে উঠিয়া পুত্র লয়্যা ধেনু ধন।
গোঠেরে বিজয় কর লয়্যা শিশুগণ॥
যত বেলি ঘরে আইস তুমি গুণনিধি।
পথপানে চাহি আমি থাকি তদবধি॥
তিল এক না দেখিলে জীবন সংশয়।
সে তুমি আমারে ছাড়ি যাবে মথুরায়॥
ধরিতে না পারি হিয়া বিদরে মেনে বুকে।
কহে মাধব প্রাণ মোর যাবে এই শোকে॥

এই অংশে খুব সরলভাবে যশোদার যে মাতৃস্নেহ বর্ণিত হইয়াছে তাহা সহজেই শ্রোতার হৃদয়ে রসের উদ্রেক করে। কৃষ্ণের এই মথুরা গমনকালে গোপীগণের উক্তিতেও এই শ্রেণীর সাহিত্যিক উৎকর্ষ বর্তমান।

জীউকে অধিক পিউ যশোদা নন্দন।
দুখিনী শরণ মঝু সবে সেই ধন॥
তিলেক না দেখিলে যাহে যুগ শত হয়।
তাহা মধুপুরী পাপ হরি লৈয়া যায়॥
শুন শুন আল সখি সেহ লোক মূঢ়।
এ ছার ক্রুরের নাম যে বলে অক্রূর॥

অথবা

যাউ জীউ রহু পিউ বিফল বিষাদ।
পরাণ প্রয়াণে আর কি করিবে লাজ॥

* * *

যাহার মধুর ভাষ হাস আলিঙ্গনে।
রাস রভসে মিলি গোঙাইল ক্ষণে॥
সো পহুঁ বিহনে বিরহ ঘোরতমে।
কেমনে বঞ্চিব গোপী বিরহ বিষমে॥
যো দিন অবসানে গো-রেণু রঞ্জিত।
সোঙরি মুরলী রবে হরিল এ চিত॥
সো বিধি বিঘটনে কাঠ জীবন হামারা।
কহে মাধব কাহে রহব জিআরা॥

এইরূপ যে সকল অংশ মাধব আচার্যের কৃষ্ণমঙ্গলে রহিয়াছে তাহা পদাবলী সাহিত্যের রসমাধুর্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

মাধবাচার্য্য ভাগবত বহির্ভূত যে দুইটী কৃষ্ণলীলার কাহিনী তাঁহার কৃষ্ণ মঙ্গলে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তাহা হইতেছে দান ও নৌকা লীলার আখ্যান। চৈতন্য পূর্ববর্ত্তী (বড়ু) চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ কীর্ত্তনে প্রাপ্ত 'দান খণ্ড' ও 'নৌকা খণ্ডে'র গীতগুলির সঙ্গে কৃষ্ণমঙ্গলস্থিত দান খণ্ড ও নৌকা খণ্ডের কোনও বিশেষ বিশেষ অংশে মিল দেখিতে পাওয়া যায়। যথা মাধবাচার্য্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ব্যাখ্যাতাগণের মত দধি দুগ্ধ বিক্রয়ার্থে রাধিকার মথুরায় গমন অস্বীকার করেন নাই। দানখণ্ডে তিনি লিখিয়াছেন—

রাই বলে শুন কানু যাই মথুরারে।
ঘৃত ঘোল দধি দুগ্ধ সাজিয়া পসারে॥
কানু বলে যাহ ঠিকে আপনার সুখে।
কি দেখি গোরস আগু ওলাহ সম্মুখে॥
রাই বলে বিকির বেলা হৈল উচ্চতর।
কোন বা ওলাব পসার তোমার গোচর॥

কৃষ্ণমঙ্গলের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড বিশেষ অপূর্ব্ব সাহিত্যিক সৃষ্টি না হইলেও বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে অতিশয় মূল্যবান। বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ কীর্ত্তন যে তাঁহার জানা ছিল এই গ্রন্থে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে যথেষ্ট।

ভাগবত রচয়িতাদের মধ্যে মাধবাচার্য্যের পরেই উল্লেখযোগ্য শঙ্কর কবিচন্দ্রের নাম। রামায়ণ রচক হিসাবে ইঁহার নাম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি ভাগবতের দশমস্কন্ধ অবলম্বনে বাংলায় 'ভাগবতামৃত' নামে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহাও বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল। লোক-চরিত্রমূলক সরস বর্ণনায় তিনি বেশ পটু ছিলেন। রাজা চিত্রকেতুর প্রধানা মহিষীর সন্তান হইলে তাঁহার সপত্নীরা কিরূপ ঈর্ষান্বিত হইয়া ছিলেন তাহার বর্ণনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।
ঐ সপত্নীগণের মধ্যে—

কেহ বলে হায় মরি কি করি উপায়।
মাগীর বেটার গরব সহা নাহি যায়॥
হোয়েছে পুত্রের মা রাজা ভালবাসে।
মাসে পক্ষে আমাদের নাহি আসে পাশে॥

রাখে কিনা রাখে প্রাণ অভিপ্রায় বাসি।
ও হবে রাজার মা মোরা হব দাসী॥
গরবের তেজে ভুঁয়ে নাহি পড়ে পা।
চলে যায় কত রঙ্গে হেলাইয়া গা॥
শাঁখা ভাঙ্গি পরে মাগী কনকের চুড়ী।
দিনে খান দশ পরে তসরের সাড়ী॥

ঈর্ষ্যান্বিত সপত্নীদের বিষদানে পুত্রের মৃত্যু হইলে রাণী যে বিলাপ করিয়াছেন তাহাও কবিচন্দ্রের সুন্দর বর্ণনা শক্তির পরিচায়ক। বিলাপের মধ্যে রাণী বলিতেছেন :—

হাসিয়া হাসিয়া আর কে ধরিবে গলে।
ধামালি করিয়া আর কে বসিবে কোলে॥
আর না দেখাবে বাপু ও চান্দ বদন।
এতদিনে শূন্য মোর হইল ভবন॥
শয়ন করিয়া আর কে থাকিবে বুকে।
ঘুম ঘোরে গলা ধরি দিয়া মুখ মুখে॥

ভাগবতের উপাখ্যান এরূপ সরসভাষায় বর্ণনা করিয়া শঙ্কর কবিচন্দ্র বিশেষ লোকপ্রিয়তা লাভ করিয়া গিয়াছেন।

উল্লিখিত কৃষ্ণচরিত রচয়িতাগণ ব্যতীতও ভাগবত অবলম্বনে কৃষ্ণলীলার ব্যাখ্যাতা রূপে শ্যামদাস, রঘুনাথ, রামকান্ত, গৌরাঙ্গ, নরহরি, কবিশেখর, হরিদাস, দৈবকীনন্দন, অভিরাম, নরহরি, অচ্যুত, রাজারাম, গদাধর, পরশুরাম, শঙ্কর, জীবন, ভবানন্দ, উদ্ধবানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র ও রাধাকৃষ্ণের নাম ঐতিহাসিকের পরিচিত।

ভাগবতের অনুসরণে রচিত না হইলেও বর্ত্তমান প্রসঙ্গে কবি ভবানন্দকৃত হরিবংশের আলোচনা করা যাইতে পারে (১)। কারণ এ গ্রন্থ খানিও কৃষ্ণলীলাত্মক কাব্য। তবে ইহার উপাখ্যান ভাগ পুরাণানুগত না হইয়া স্থানে স্থানে স্বকপোল কল্পিত। নামে হরিবংশ হইলেও ঐ নামের সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত উহার সাদৃশ্য অতিশয় অল্প। নিম্নে হরিবংশের আখ্যানভাগ সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে :—

কৃষ্ণ একদিন যমুনার তীরে অন্য বালকগণ সহ খেলা করিতেছিলেন এমন সময় জল আনিতে রাধা হইলেন সেখানে উপস্থিত। রাধাকে দেখিয়া কৃষ্ণ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইলেন ও উভয়ের বাক্যালাপ হইল। তৎপরে রাধা প্রেমবিহ্বল হইয়া কোন সঙ্গীকে কৃষ্ণের নিকট দূতী করিয়া পাঠাইলেন কিন্তু কৃষ্ণ তাহাতে কোন সাড়া দিলেন না। সংবাদ শুনিয়া রাধা মূর্চ্ছিত হইলেন। সংজ্ঞা পাইয়া রাধা এবারে নিজ মাতামহী বড়াইকে পাঠাইলেন। এইবারে রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটিল। মিলনের ক্ষণে রাধা মান করিলে কৃষ্ণ তাহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। মিলনান্তে কৃষ্ণ স্বস্থানে চলিয়া গেলে বিরহকাতরা রাধা তাঁহার দর্শনজন্য সখীসহ যমুনানদীতে জল আনিতে গেলেন। সেখানে পরস্পরের দর্শনলাভ ঘটিল কিন্তু লোক মুখে তাঁহাদের অনুরাগের বার্ত্তা রাধার শাশুড়ী ও ননদীর কানে পৌছিলে তাঁহারা রাধার লাঞ্ছনা করিলেন। এই লাঞ্ছনার ব্যাপার জানিয়া এক অলৌকিক উপায়ে কৃষ্ণ তাহার করিলেন প্রতিকার। তাহার ফলে ননদী রাধার অনুকূল হইলেন। তারপর কৃষ্ণ দর্শনার্থিনী রাধা একদিন দধি দুগ্ধাদি বিক্রয়ার্থ চলিলেন। পথে কৃষ্ণ দান (শুল্ক) আদায়কারী সাজিয়া সখীগণ সহ রাধাকে ধরিলেন। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যবলে যমুনার মাঝখানে সৃষ্ট চড়ায় রাধার সহিত তাঁহার মিলন হইল। দানলীলান্তে রাধা গৃহে ফিরিলেন। এদিকে কৃষ্ণের হাতে লাঞ্ছনা স্মরণ করিয়া শাশুড়ী রাধাকে বিনা পাহারায় নিজঘরে শুইতে পাঠাইলেন। গভীর রাত্রিতে কৃষ্ণ আসিয়া হইলেন তাঁহার সহিত মিলিত। বিলম্ব দেখিয়া রাধা কৃষ্ণের নিকট আকুলতা প্রকাশ করিলেন।

প্রভাতে উঠিয়া ননদী সহ রাধা যমুনায় জল আনিতে গেলেন। সেখানে কৃষ্ণ কদম্বের তলে বাঁশী বুকে করিয়া কপট নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন। রাধিকা তখন ধীরে ধীরে ঐ বাঁশীটি চুরি করিলেন।

তারপর বড়াই ঘাটে আসিলে কৃষ্ণ তাঁহাকে এ বিষয় জানাইলেন। বড়াই এই কথাটি হাসিয়া দিলেন উড়াইয়া। কিন্তু অনেক কথাবার্ত্তার পর রাধা হইতেই কৃষ্ণের বাঁশী উদ্ধার হইল। এইখানেই ঘটিল আবার রাধার ননদীর সহিত কৃষ্ণ সখা শ্রীদামের বিবাহ। এই ঘটনায় রাধাকৃষ্ণের মিলনের সুবিধা হইল প্রচুর।

এদিকে রাধার স্বামী আইমন (আয়ান) মথুরা হইতে

(১) এই গ্রন্থ ৺সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত হইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ফিরিয়া আসিলে তাহার মাতা রাধার ও কৃষ্ণের নামে অভিযোগ করিলেন। কিন্তু আইমন মথুরাতে নারদের মুখে শুনিয়াছিলেন যে নন্দের ঘরে যে নারায়ণ জন্মিয়াছেন তিনিই কংসের নিধন করিবেন। তাই সে মাতাকে কৃষ্ণের সহিত বিরোধ করিতে নিষেধ করিল ও নিজে নির্বিবাদে কৃষ্ণের আনুগত্য স্বীকার করিল। সে নিজেই কখনো রাধাকে কৃষ্ণের নিকট করিল প্রেরণ এবং কখনো বা কৃষ্ণকে করিল স্বগৃহে নিমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবাধে চলিতে লাগিল। ইহার মধ্যে কৃষ্ণ কর্তৃক গোপীদের বস্ত্রহরণ লীলা হইল। তাহার পরেই আবার রাধার ও গোপীগণের দুঃখের সময় আসিল নিকটে। অক্রূর আসিয়া কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গেল। রাধা, অন্য গোপীগণ এবং যশোদা বিলাপ করিলেন যথেষ্ট।

কিছুকাল পরে কৃষ্ণকে মথুরায় রাখিয়া নন্দ প্রভৃতি গোপগণ ব্রজে ফিরিয়া আসিল। এদিকে কৃষ্ণ কংস বধ করিয়া মথুরায় রাজভোগে থাকিয়াও গোয়ালিনী রাধাকে মনে রাখিয়াছিলেন। তিনি তাই রাধার সান্ত্বনার জন্য উদ্ধবকে পাঠাইলেন। উদ্ধব রাধার নিতান্ত কাতর অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে লইয়াই মথুরায় গেলেন।

বিরহদগ্ধ রাধিকা দ্বারকায় উপস্থিত হইলে তাহার তেজে দ্বারকা দগ্ধ হইতে লাগিল। এমন সময় নারায়ণ ও অন্য দেবগণের ইচ্ছায় ব্রহ্মা আসিয়া রাধাকে শরীর ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। রাধা তখন দেহত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে মিলাইয়া গেলেন।

হরিবংশের আখ্যানবস্তু পয়ার ছন্দে রচিত কিন্তু তাহাতে মাঝে মাঝে ত্রিপদী ছন্দে লেখা অনেক গান রহিয়াছে। আর সংস্কৃত কাব্য সুলভ অলঙ্কারও ইহাতে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান।

কিন্তু ছন্দ অলঙ্কার বা রচনাশৈলীর জন্য নহে কৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই মুখ্যত গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের জন্মস্থানের (পূর্ববঙ্গের) কোন কোন অংশে কিয়ৎ পরিমাণে সমাদর লাভ করিয়াছিল। তবু যে উহাতে সাহিত্যিক গুণ বর্তমান নাই তাহা নহে। আধুনিক কালের লোকের পক্ষে অবশ্য এই গুণের পরিচয় পাওয়া কতকটা কষ্টকর। কারণ উহাতে যে পরিমাণে কুরুচির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাহাতে ধৈর্য্য পূর্ব্বক উহা পাঠ করা দুঃসাধ্য।

কিন্তু যিনি ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন তাঁহার শ্রম একেবারে নিষ্ফল হইবে না। কারণ এই হরিবংশে (বৈষ্ণব) পদাবলী সাহিত্যের উৎকৃষ্ট পদ সমূহের সহিত তুলনীয় কয়েকটি পদ রহিয়াছে। যেমন,

তোর লাগি বেড়াই নাথ
তোর লাগি বেড়াই।
তুমি বিনে অন্য না জানি—
তোমার দোহাই॥ ধ্রু।
দেখিলে সে রহে প্রাণ
না দেখি মরিনু।
তুমি বিনে না লয় মনে
কি বুদ্ধি করিমু॥
তুমি বহি প্রাণ নাথ
নাহি কেহ আর।
তোমাকে তোমায় দিতে
কি যাবে আমার॥
তোর বাণে মন হালে
বিরলে কহিছি।
তোমার তোমারে দিয়া
তোমার হইছি॥

এই পদটির সহিত জ্ঞানদাস কৃত একটি সুপ্রসিদ্ধ আত্মনিবেদনের পদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

অক্রূরের ব্রজে আগমনের পর শ্রীরাধা ভাবী বিরহ শঙ্কায় যে উক্তি করিয়াছেন তাহাও পদাবলীর সাহিত্যের রচনার সঙ্গে তুলনীয়। একটি গানে রাধা বলিতেছেন:—

"অখনে জানিলু বন্ধু নিদয়া সে বড়।
মধুপুরে গেলে তুমি না আসিয়া দড়॥ ধ্রু।
আঁখির পলকে যদি তোমাকে না দেখি।
কত মাস পরিবর্ত অঙ্গুলিতে লেখি॥

আর একটি পদে তিনি বলিতেছেন—

শুনিয়া তোমায় মুখে কি শেল হানিল বুকে
যাবা শুনি রজনী প্রভাতে।
আমাক ছাড়ি গেলে সহজে বধিবা হেলে
রাধার বধ লাগিব তোমাতে॥
তুমি থাক তরুমূলে মুঞি যাই জলের ছলে
আসিতে যাইতে হয় দেখা।

নিরখি পথেতে রৈয়া কত যুগ যায় বৈয়া
আঁখির নিমিখ করি লেখা ॥
দধির পশার লৈয়া হাটে যাই পার হৈয়া
মাগন লইলা ঘাটে বসি।
কে আছে আমার বোল ভরি আনি দিব জল
কে ভাঙ্গিবে আমার কলসী ॥
বিনে সুরে গাঁথি হার কে আনিয়া দিব আর
চন্দন কে দিব মোর অঙ্গে।
ডাকিলে বাঁশরী গানে শুনিলে না শুনি কানে
চাতুরী করিব কার সঙ্গে ॥

হরিবংশে এই শ্রেণীর আরও কয়েকটি পদ আছে।

রামায়ণ এবং ভাগবতের পরেই মহাভারত সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ। মহাভারত এক মহাগ্রন্থ; কেবল বিরাট আকারের জন্য নহে, বিভিন্ন ও বিচিত্র চরিত্র, বহু হৃদয়গ্রাহী উপাখ্যান, ধর্ম্ম, দর্শন, রাজনীতি, লোকাচার আদির অফুরন্ত ভাণ্ডার হিসাবে এই গ্রন্থ অতুলনীয়। ইহার শ্রেষ্ঠতা অবিসংবাদিত হইলেও লোকের চক্ষে সাধারণত রামায়ণই সমধিক প্রিয়। তাহার কারণ এই যে, গ্রন্থে রামসীতার কাহিনীর মধ্য দিয়া এক পরম লোকপ্রিয় গার্হস্থ আদর্শের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনায় কিরূপে এই আদর্শ বাঙালী জনসাধারণের সহজলভ্য হইল তাহা স্থানান্তরে বলিয়াছি। দেশ-ভাষায় এই রামায়ণের আস্বাদ গ্রহণ করার পরই বাঙালী পাঠকদের দৃষ্টি পড়িল মহাভারতের উপর। কিন্তু লক্ষ শ্লোকে রচিত এই বিরাট গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ এক দুঃসাধ্য কাজ। খুব সম্ভব তাই কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার পূর্ব্বে কেহ এ কাজে হাত দিতে সাহস করেন নাই। কৃত্তিবাসকেও বিরাট বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনী সংক্ষিপ্ত করিয়াই অনুবাদ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি পথ দেখাইলে তাঁহারই প্রদর্শিত পথে যে মূল মহাভারতকে সংক্ষিপ্ত করিয়া তাহার অনুবাদের কাজে কেহ কেহ হাত দিলেন।

সর্ব্বপ্রাচীন যে বাঙলা মহাভারতকারের নাম পাওয়া যায় তিনি হইতেছেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর। চট্টগ্রাম অঞ্চলে পরাগল খাঁ নামে হুসেন সাহের যে সেনাপতি ছিলেন তাঁহারই আদেশে কবীন্দ্র সমগ্র মহাভারতের কাহিনী বাঙলা পয়ারে রচনা করেন। এজন্য কবীন্দ্রের মহাভারতকে 'পরাগলী মহাভারত'ও বলা হয়। সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাব বশত কেহ কেহ এই মহাভারতের রচনা সঞ্জয় বা বিজয় পণ্ডিতের উপরও আরোপ করিয়াছেন। কবীন্দ্রের পর পরাগল খাঁরই পুত্র ছুটি-খানের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকর নন্দী নামক এক ব্যক্তিও বাঙলা কবিতায় সমগ্র মহাভারত কাহিনী নিবদ্ধ করেন। ইহাদের পর নিত্যানন্দ এবং কবিচন্দ্র নামক দুই জন কবির মহাভারত রচিত হয়। এই সকল রচনা এক সময়ে খুব লোকপ্রিয় হইয়া থাকিলেও পরবর্ত্তীকালে রচিত কাশীরাম দাসের মহাভারত ইহাদিগকে বিস্মৃতির অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণের কেহ কেহ মনে করেন যে স্বীয় পূর্ব্বগামী মহাভারতকারগণের রচনা আত্মসাৎ করিয়া কাশীরাম দাস তাঁহার রচনায় উৎকর্ষ সম্পাদন করিয়াছেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত কবীন্দ্র শ্রীকরণ, নিত্যানন্দ এবং কাশীরামের গ্রন্থের প্রামাণ্য সংস্করণ প্রস্তুত না হওয়ায়, এ সম্পর্কে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। তবে কাশীরাম দাসের নামে প্রচলিত মহাভারতে যে পরবর্ত্তীকালে রচিত কোনও মহাভারত হইতে কিছু কিছু অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা কঠিন।

এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে কাশীরাম দাস সমগ্র আদি, সভা বনপর্ব্ব এবং বিরাট পর্ব্বের কিয়দংশ রচনা করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার বা আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন। মোটামুটি ভাবে প্রাচীন বাঙলা মহাভারত সমূহের সাহিত্যিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে প্রচলিত কাশীদাস মহাভারতের উপর নির্ভর করিতে পারা যায়। কারণ প্রাপ্ত বিভিন্ন মহাভারতের নমুনা হইতে মনে হয় যে উহাদের সব কয়খানিই অল্প বিস্তর একই ছাঁচে গঠিত। তবে কাশীরাম দাসের রচনা একটু সংস্কৃত ঘেঁষা। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সেই রচনা জনসাধারণের দুর্ব্বোধ্য বা নীরস নহে। স্থানে স্থানে কাশীরাম মূল সংস্কৃত মহাভারতের যথাযথ অনুবাদ করিয়াছেন। এবং মূলের সৌন্দর্য্য তাঁহার রচনায় একাধিক স্থানে প্রতিফলিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুষ্মন্ত

শকুন্তলাকে অ-পূর্ব্ব-পরিচিতা জ্ঞানে বিদায় করিতে চাহিলে মুনি কন্যা তাঁহাকে তেজোদৃপ্ত ভাষায় যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা প্রায় মূল সংস্কৃতের অনুরূপ। যেমন :—

জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কহে যেই জন
সহস্র বৎসর তার নরকে গমন ॥
লুকাইয়া যেই জন করে পাপকর্ম্ম।
লোকে তা না জানিলেও জানেন তা ধর্ম্ম ॥
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু অগ্নি মহী আর জল।
আকাশ শমন ধর্ম্ম জানয়ে সকল ॥
দিন রাত্রি সন্ধ্যা প্রাতঃ নরবৃত্তি জানে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল তারে দেয় ত শমনে ॥
মিথ্যা কথা বলা রাজা, কভু ভাল নহে।
মিথ্যা সম পাপ নাহি সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥

সর্ব্বত্র সমানভাবে মূলের অনুগত না হইলে সংস্কৃতের প্রভাব অন্যান্য স্থলেও বেশ সুস্পষ্ট। যেমন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে ব্রাহ্মণগণ যখন ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুনকে লক্ষ্য বেধে উদ্যত দেখিয়া নিবৃত্ত করিতেছিলেন তখন অন্য কেহ কেহ অর্জ্জুনের বীরোচিত সুলক্ষণযুক্ত রূপ বর্ণনা করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইতেছেন :—

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্ম নেত্র পরশয়ে শ্রুতি ॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখ রুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা ॥
* * * *
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর ॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুবলিত ॥
বুকপাটা দন্তচ্ছটা জিনিয়া দামিনী।
দেখি এরে ধৈর্য্য ধরে কোথা কে কামিনী ॥
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।
অগ্নি অংশু যেন পাংশু জালে আচ্ছাদিত ॥
লয় মনে এই জনে বিন্ধিবেক লক্ষ্য।"

এই বর্ণনায় সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণ বেশ সুস্পষ্ট কিন্তু ইহা সত্বেও ইহা খুব বেশী দুরূহ নহে। স্থানে স্থানে মূলের অনুসরণ অথবা সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব দেখা গেলেও কাশীরাম দাসের রচনা যে লোক সাধারণের প্রিয় হইয়াছিল তাহার কারণ তিনি মহাভারতের কাহিনীকে সরলতর করিয়া তাহার মধ্যে পারিবারিক এবং সামাজিক আদর্শের সর্ব্বজনবোধ্য অংশটিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। দার্শনিক রাজনীতিক এবং অন্যবিধ গুরুতর আলোচনাকে সযত্নে পরিহার করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভীষ্মপর্ব্বস্থিত গীতাপর্ব্বাধ্যায়ের উল্লেখ করা যায়। কাশীরাম খুব সংক্ষেপেই ভগবদ্ গীতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু কেবল স্থল বিশেষ বর্জ্জনের গুণে নয়, ঘটনা বিন্যাসের নাটকীয়তা, সরস উক্তি প্রত্যুক্তি এবং স্থানে স্থানে হাস্যরস সৃষ্টি দ্বারাও কাশীরামের মহাভারত পাঠক পাঠিকার মনোরঞ্জন করে।

কাশীরামের রচনায় উপাখ্যানাংশে নাটকীয় রীতিতে ঘটনা বিন্যাসের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের বর্ণনায়। অর্জ্জুন কর্তৃক লক্ষ্য বিদ্ধ হইবা মাত্র—

আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি কৈল।
জয় জয় শব্দ দ্বিজ-সভা মধ্যে হৈল ॥
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি হৈল মহাধ্বান।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন যত নৃপমণি ॥
হাতেতে দধির পাত্র লৈয়া পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা ॥

কিন্তু লক্ষ্যবেধে অকৃতকার্য্য রাজমণ্ডলের নিকট এ দৃশ্য অসহ্য বোধ হইল, তাহারা দ্রৌপদীকে মালাদান বন্ধ রাখিতে আদেশ করিয়া বলিলেন—

ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে হীন জাতি।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে কোথা ইহার শকতি ॥
মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ।
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ।
* * *
পঞ্চ ক্রোশ উর্দ্ধে লক্ষ্য শূন্যেতে আছয়।
বিন্ধিল কি না বিন্ধিল কে করে নির্ণয় ॥
* * * *
তবে ধৃষ্টদ্যুম্নসহ বহু দ্বিজগণ
নির্ণয় করিতে জলে করে নিরীক্ষণ ॥
শিষ্টে বলে বিন্ধিয়াছে দুষ্টে বলে নয়।
ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে প্রত্যয় ॥
শূন্য হইতে মৎস্য যদি কাটিয়া পাড়িবে।
সাক্ষাতে দেখিলে তবে প্রত্যয় জন্মিবে ॥

তখন লোকের অকারণ সন্দেহ দেখিয়া—

হাসিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন।
অকারণ মিথ্যাদ্বন্দ্ব কর কেন সভে।

মিথ্যা কথা কহে যে, সে কার্য্য নাহি লভে ॥
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে।

একবার নয় বলি সম্মুখে সবার।
যতবার বলিবে, বিন্ধিব তত বার ॥
এত বলি অর্জ্জুন নিলেন ধনুঃশর ॥
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধিলেন দৃঢ়তর।
সুরাসুর নাগ নর দেখয়ে কৌতুকে ॥
কাটিয়া পড়িল লক্ষ্য সভার সম্মুখে ॥

সরস উক্তি প্রত্যুক্তি রচনায় কাশীরাম দাস বেশ সিদ্ধ হস্ত। কোন কোন স্থলে এই রচনায় বাক্‌কলহের ভিতর দিয়া হাস্য রস ফুটিয়াছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদীর সঙ্গে একত্রে দেখিয়া অর্জ্জুন নারদকৃত নিয়মানুসারে দ্বাদশ বৎসরের জন্য নির্ব্বাসনে গমন করেন। সেই সময়ে কিছু কাল তিনি দ্বারকাবাসী হন। তৎকালে একদা মধ্য রাত্রে সত্যভামা সুভদ্রা সহ অর্জ্জুনের দ্বারে আঘাত করিয়া নিজ পরিচয় দিলে—

অর্জ্জুন বলেন হৈল অর্দ্ধেক রজনী।
এত রাত্রে আইলেন কি হেতু আপনি ॥
যদি কার্য্য ছিল পাঠাইতে দূতগণ।
আজ্ঞা মাত্রে করিতাম তথায় গমন ॥

* * *

সত্যভামা বলে পার্থ দূতকর্ম্ম নয়।
সে কারণে আপনি আসিনু ধনঞ্জয় ॥
তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া শ্রবণে।
না হইল নিদ্রা মম মহা তাপ মনে।
এক ভার্য্যা পঞ্চ ভাই কি সুখ বিলাস।
যেই হেতু দ্বাদশ বৎসর বনবাস ॥
সেই হেতু আইলাম হৃদয়ে বিচারি।
আমি দিব আর এক পরমা সুন্দরী ॥

তখন সত্যভামা অর্জ্জুনকে সুভদ্রার পরিচয় এবং রূপগুণের বর্ণনা করিয়া ত্বরায় গন্ধর্ব বিধানে বিবাহের অনুরোধ জানাইলে—

অর্জ্জুন বলেন এ কি আমার শকতি।
বলভদ্র জনার্দ্দন যদুকুল পতি ॥
তাঁদের অজ্ঞাতে আমি লইব যাদবী।
মোরে হেয় করাইতে চাহ মহাদেবী।
দেবী বলিলেন ইহা করিবা কেমনে।
মন বান্ধিয়াছে কৃষ্ণা ঔষধের গুণে ॥
পাঞ্চালের কন্যা জানে মহৌষধ গাছ।
এক তিল পঞ্চ স্বামী নাহি ছাড়ে পাছ।
যে লোভে নারদ বাক্য করিলা হেলন।
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমিতেছ বনে বন ॥
ইহাতে তোমার লজ্জা কিছু নাহি হয়।
কি মতে করিবা বিভা দ্রৌপদীর ভয় ॥
পার্থ বলিলেন দেবী না নিন্দ দ্রৌপদী।
ত্রিজগৎ জনে খ্যাত তব মহৌষধি ॥
ষোড়শ সহস্র শত অষ্ট পাটরাণী।
সবা হৈতে কোন গুণে তুমি সোহাগিনী ॥
অপুত্র কি রূপহীনা হীনকুল জাত।
রুক্মিণী প্রভৃতি অন্যা পাটরাণী সাত ॥
ঔষধের গুণে হরি তোমারে ডরান।
তোমার সাক্ষাতে চক্ষে অন্যে নাহি চান ॥

অর্জ্জুন ও সত্যভামার এই কথোপকথনে বেশ সুন্দর হাস্যরস ফুটিয়াছে। কিন্তু নারীদ্বয়ের কোন্দল বর্ণনায় কাশীরাম যে হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা একটু নিম্নশ্রেণীর। যেমন, পারিজাত লইয়া ইন্দ্র এবং কৃষ্ণের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে—

উপেন্দ্রাণী দেখিয়া ইন্দ্রাণী বলে ক্রোধে।
কহনা ভারতী কেন এত গর্ব্ব তোর।
আসিয়াছ লইতে ভূষণ পুষ্প মোর ॥
নিজের মর্য্যাদা চাহ যাহ বাহুড়িয়া।
যথা ছিল পারিজাত তথায় রাখিয়া ॥
বামন হইয়া চাহ ধরিতে চন্দ্রমা।
দিব প্রতিফল আজি ভাঙ্গিব গরিমা ॥
সত্যভামা বলে শচী মিছে কর গর্ব্ব।
পরাক্রম তোমার জানি আমি সর্ব্ব ॥
শাশুড়ীর কুণ্ডল নরক নিল বলে।
নারিলা আনিতে তাহা কহি আখণ্ডলে ॥
লুটিয়া পুটিয়া স্বর্গ কৈল ছারখার।
রাখিতে নারিলু কেন তোমার ভাতার ॥

রাজসূয় যজ্ঞকালে হিড়িম্বা ও দ্রৌপদীর মধ্যে যে ঝগড়া হইয়াছিল তাহাতেও এইরূপ গ্রাম্য-রুচির সন্ধান পাই। কিন্তু এইরূপ স্থুলের পরিচয় তিনি অধিক স্থলে দেন নাই। অনিন্দ্য হাস্যরসও তিনি ফুটাইয়াছেন বহুস্থলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সুভদ্রা বিবাহে আশান্বিত দুর্য্যোধনের বিড়ম্বনার উল্লেখ করা যায়।

বলরাম সুভদ্রাকে অর্জ্জুনের হস্তে অর্পণের প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠাইলে দুর্য্যোধন ও তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ সকলেই অত্যন্ত উল্লসিত হইলেন। কিন্তু বিদুর ও কৃপাচার্য্য এই ব্যাপারে আশান্বিত হইতে পারিলেন না। কৃপাচার্য্য স্পষ্টই বলিলেন :—

দুর্য্যোধনে অপ্রীত গোবিন্দ মহাশয়।
এমত হইবে কর্ম্ম মনে নাহি লয়॥

এমন সময় দূত বলিলেন :—

দ্বারকায় আছেন অর্জ্জুন কুন্তীসুত।
তাঁহাকে সুভদ্রা দিব বলেন অচ্যুত॥
পাণ্ডবে অপ্রীত রাম না করে স্বীকার।
দুর্য্যোধনে দিব বলে রোহিণী কুমার॥
গোবিন্দের ইচ্ছা নহে দুর্য্যোধনে দিতে।
না হয় নির্ণয় কিছু যা হয় পশ্চাতে॥
ভীষ্ম বলে দুর্য্যোধন লজ্জা পাবে মাত্র।
যে কেহ করুক বিভা মোরা বরযাত্র॥

এদিকে দুর্য্যোধন কিন্তু সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের গান্ধর্ব্ব বিবাহের কথা না জানিয়া যুধিষ্ঠিরকে বরযাত্রী হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। যুধিষ্ঠির পড়িলেন একটু সমস্যায়; তাই নিজে না গিয়া সসৈন্যে ভীমসেনকে বরবেশী দুর্য্যোধনের অনুযাত্রী করিয়া দিলেন। বাদ্যভাণ্ড সহকারে বরবেশে দুর্য্যোধন চলিলেন দ্বারকার পথে। মনের ভাব চাপিয়া রাখা মধ্যম পাণ্ডবের পক্ষে ছিল অসম্ভব; তাই—

দুর্য্যোধন বেশ দেখি ভীমে হৈল ক্রোধ।
ডাকিয়া বলেন তোরা সবাই নির্ব্বোধ॥
হেথা হৈতে দ্বারকা আছয়ে দূরদেশ।
এইখানে কি হেতু করিলা বরবেশ॥
দুঃশাসন বলে কহ কি দোষ ইহাতে।
দেখিতে না পার যদি আইস পশ্চাতে॥
ভীম বলে ভাল মন্দ বুঝিবা হে শেষে।
কোন কন্যা বিবাহিতে যাও বরবেশে॥
তোমার নিকটে দূত পরশ্ব আইল।
সুভদ্রা বিবাহ আজি সপ্তাহ হইল॥
অকারণে সভামাঝে গিয়া পাবে লাজ।
তাইত বলিনু বরবেশে কিবা কাজ॥

লোকশিক্ষার সাধন হিসাবেও যে সাহিত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ হইতে পারে তাহা প্রাচীন ভারতীয় সমালোচকগণ স্বীকার করিয়াছেন। কাশীরাম দাসের মহাভারতের স্থলে স্থলে যে উত্তম সামাজিক আদর্শ এবং নীতির সন্ধান পাওয়া যায় সেই আদর্শ এবং নীতি মূল সংস্কৃত মহাভারত হইতে গৃহীত। তাহার গুণেও তদীয় রচনা জনসাধারণের চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল।

প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ভার্য্যার গৌরব সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনাইয়াছেন প্রায় সকল গৃহীই তাহার অনুমোদন করিবে।

শকুন্তলা বলিতেছেন :—

পতিব্রতা নারী আমি না কর হেলন।
আমারে নীচের প্রায় না ভাব রাজন॥

* * *

অর্দ্ধেক শরীর ভার্য্যা সর্ব্বশাস্ত্রে লেখে।
ভার্য্যা সম বন্ধু রাজা নাই মর্ত্ত্য লোকে॥
পরম সহায় হয় পতিব্রতা নারী।
যাহার সাহায্যে রাজা সর্ব্ব ধর্ম্ম করি॥
ভার্য্যা বিনা গৃহ শূন্য অরণ্যের প্রায়।
বনে ভার্য্যা সঙ্গে যদি গৃহস্থ বলায়॥
ভার্য্যাহীন লোকে কেহ না করে বিশ্বাস।
সর্ব্বদা দুঃখিত সেই সর্ব্বদা উদাস॥

সাধারণ ক্ষমার খুব গুণকীর্ত্তন করা হয় কিন্তু সেই ক্ষমার আতিশয্যকে মহাভারতে নিন্দা করা হইয়াছে। বনপর্ব্বে দ্রৌপদীর উক্তিতে আছে :—

সদা ক্ষম না হইবে সদা তেজোবন্ত।
সদা ক্ষমা করে তার, দুঃখে নাই অন্ত।
শত্রুর আছুক কার্য্য মিত্র নাহি মানে।
অবজ্ঞা করিয়া কেবা বাক্য নাহি শুনে॥
কার্য্যে অবহেলা করে নাহি কিছু ভয়।
যথাস্থানে যাহা করে ক্রমে হয় লয়॥
অতি ক্ষমাশীল দেখি ভার্য্যা নাহি মানে।
সে কারণে সদা ক্ষমা ত্যজে বুধগণে॥

কাশীরাম দাসের রচনায় উল্লিখিত নিদর্শন নিচয় হইতেই বাঙলা পদ্য মহাভারত সমূহের সাহিত্যিক মূল্যের একটা আন্দাজ পাওয়া যাইতে পারে। কতকটা বিভিন্ন বিচিত্র চরিত্র সমাবেশে চিত্তাকর্ষক আখ্যানবস্তুর জন্য এবং কতকটা স্বল্প পরিমাণ সাহিত্যিক গুণের জন্য মহাভারতও রামায়ণের মত বাঙালী পাঠকদের প্রিয় হইয়াছিল। এইহেতু প্রায় ত্রিশজন লোক (সমগ্র ভাবে বা অংশত) বাঙলায় মহাভারত কাহিনী রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত মহাভারতকারগণ ব্যতীত অভিরাম, ঘনশ্যাম, রাজেন্দ্রদাস, নিত্যানন্দ, গঙ্গাদাস, বিশারদ, শ্রীনাথ বাসুদেব,, নন্দরায়, সারল কবি, কৃষ্ণানন্দ, দ্বৈপায়নদাস, অনন্ত, রামচন্দ্র, কৃষ্ণরায়, ত্রিলোচন, রামেশ্বর ও লক্ষ্মণই ঐতিহাসিকের নিকট বিশেষ পরিচিত।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গলার বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা উপস্থিত কিরূপ তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই বলিবেন বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত মন্দ; বিদ্যাবুদ্ধিজীবীই হ'ক, অথবা কায়িক-শ্রম-জীবীই হউক, সকলেরই আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বিচারকগণের রায় হইতেছে—বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা অবনতির দিকেই চলিয়াছে কিন্তু এক দল গবেষক ও বিচারক আছেন যাঁহারা তিমির-বরণ মেঘের কোলে রূপালি-সোনালি আলোক দেখিয়া থাকেন। না দেখিবার কারণ নাই; যাঁহারা বলেন বাঙ্গালীর আর্থিক দুর্গতি ঘটিয়াছে তাঁহারাও বাঙ্গালীর সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির বিষয় অস্বীকার করিতে পারেন না। তবে যাহাকে অপর দল সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্য বলিয়া প্রচার করেন তাহা বাস্তবিক সম্পত্তি কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ঐশ্বর্য্যকে সর্ব্বত্র সম্পত্তি বলা চলে না, যথা অট্টালিকা, মোটর গাড়ী, ব্যোমযান, রেডিও, শাল, জামিয়ার এবং ক্ষয়প্রবণ দ্রব্যসম্ভার। এইগুলি ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন হইতে পারে কিন্তু সম্পত্তি নহে; সম্পত্তি সম্বন্ধে এবং ধন সম্বন্ধে আমাদের সংস্কারের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া ধনী, ধন, সম্পদ ও সম্পত্তি সম্বন্ধে আমাদের মতেরও যথেষ্ট ওলোট পালোট হইয়াছে। গোলা বা মরাইএর ধান্য-শস্য অপেক্ষা ব্যাঙ্কের জমা টাকা, কোম্পানীর কাগজ ও নানারূপ সুদী বন্ধকী কাগজ, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি আজকাল আমাদের নিকট অধিকতর সম্মানিত হইয়াছে। ধানের গোলা বা মরাইএর উপর ব্যাঙ্ক সাধারণ লোককে ঋণ দেয় না; অট্টালিকা, এমন কি জমীদারীর, উপরও ঋণ দেয় না কিন্তু কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার, ডিবেঞ্চার এমন কি কারবারীদের রেল ষ্টীমারের রসিদ ও বিলের উপর ঋণ দিয়া থাকে। এই ব্যবস্থা ও ব্যবহারের ফলে সম্পত্তি ও ধনের সংজ্ঞার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও সংস্কারের রদ বদল হইয়াছে।

বাঙ্গালীর আর্থিক অবনতি ঘটিয়াছে একথা সম্পূর্ণ স্বীকার করা যায় না; তবে বাঙ্গালীর অর্থ বৃদ্ধি বা রোজ-গারের উন্নতি না হইয়া ক্রমশঃ অবনতির দিকে চলিয়াছে; সম্পত্তির রূপ পরিবর্ত্তন হওয়ায় জমীদার অপেক্ষা ধনী এবং ধনী অপেক্ষা কারবারীর সম্মান বৃদ্ধি পাইতেছে। অর্থ সমষ্টিভূত হওয়ার ব্যক্তিগত ধনের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় তাহাদেরও সম্মান হ্রাস পাইতেছে। পূর্ব্বের লক্ষপতির যে সম্মান ও খ্যাতি ছিল, বর্ত্তমানে কোটীপতির সে সম্মান ও খ্যাতি নাই। এখন লক্ষপতি স্বাধীন ধনী নহেন, ব্যাঙ্কের নিকট তাঁহার উদ্বৃত্ত অর্থ গচ্ছিত রহিয়াছে; প্রয়োজনের সময় তাঁহাকেও ব্যাঙ্কের নিকট হস্ত প্রসারণ করিতে হয়। এদেশেও যেমন বিলাতেও তদ্রূপ; ব্যাঙ্ক স্থাপন করিলে প্রায়ই তাহার মূলধন, লগ্নী অর্থ এবং জমার অর্থ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ধনী ব্যক্তির আর সে প্রতাপ প্রতিপত্তি নাই। বিলাতেও অর্থ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধনীদের বংশ-গত সম্পত্তি ছিল। দেশের রাজার তাঁহারাই ছিলেন মহাজন। রাষ্ট্রে যুদ্ধবিগ্রহ ও দুর্ভিক্ষের সময় রাজা এই সকল বংশগত ধনীর নিকটে কর্জ্জ লইতে বাধ্য হইত। পাশ্চাত্য রাষ্ট্র এইদেশে অধিকার বিস্তারের সঙ্গে তাহাদের দেশের অনুরূপ ব্যাঙ্কিং প্রথা এই দেশে চালাইতে আরম্ভ করে, কিন্তু এদেশে ব্যাঙ্কিং, বিশেষতঃ কারবারী ব্যাঙ্কিং, প্রথা অতি প্রাচীন। একথা বলিলে আদৌ অতিরঞ্জিত হইবে না যে সওদাগরী-মহাজনী ইংরাজ এদেশ হইতেই শিক্ষা করে এবং বাঙ্গালী বণিক সম্প্রদায়ই এবিষয়ে ইংরাজের গুরু ও শিক্ষক। প্রমাণের অভাব নাই এবং ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে ইহার প্রামাণ্য সাক্ষ্য বর্ত্তমান।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি, বিশেষতঃ অর্থ সম্পত্তি, কাহার কত তাহা এখন জানিবার যেমন সুযোগ আছে পূর্ব্বে তাহা ছিলনা। ব্যাঙ্কের ও কোম্পানীর কাগজ, পোষ্ট্যাল সেভিংস ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স, ক্যাশ সার্টিফিকেট, ক্রেডিট কো-অপারেটিভ, মিউনিসিপ্যাল এবং পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার,

লিমিটেড কোম্পানী সমূহের শেয়ার ইত্যাদির ভিতর দিয়া প্রাদেশিক অর্থ সম্পত্তির পরিমাণের অনুমান করা যায়। এ সকল হিসাব বাঙ্গালীর আর্থিক পরিচয়ের পক্ষে মোটেই নৈরাশ্যজনক নহে, তবে চিন্তার বিষয় এই, যে এই সকল ন্যস্ত অর্থ হইতে বাঙ্গালী কোনও সুযোগ আদায় করিয়া অর্থ-সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতে পারিতেছে না। অথচ বোম্বাই প্রদেশবাসী এই ন্যস্ত অর্থের জামিনে মূলধন সংগ্রহ করিয়া সেই অর্থে কারবার—কারখানা পরিচালিত করিতেছে। বাঙ্গালী কেবল ন্যস্ত অর্থের সুদমাত্র লাভ করিয়া থাকে; ফলে যে পরিমাণে বোম্বাই ধনী সম্প্রদায়ের অর্থ বৃদ্ধি পাইতেছে বাঙ্গালার তাহা হইতেছে না। বাঙ্গালী এমন কি সুদের টাকাটা অবধি কোম্পানীর কাগজেই ন্যস্ত করিয়া থাকে। তবু ঐ অর্থ ভরসা করিয়া অন্য কারবার বা কারখানায় খাটায়না, ফলে বাঙ্গালী ধনীর অর্থ-সম্পত্তি কচ্ছপ-গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কোনও আকস্মিক অভাবনীয় আঘাত পাইলে তাহারা তাল সামলাইতে পারে না।

অর্থ সকল শ্রেণীর মধ্যেই কিছু না কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। আমরা প্রথমতঃ সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখিতে চাই ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র, কৃষক, দোকানদার, ফেরিওয়ালা, চাকুরিয়া ইত্যাদি কোন শ্রেণীর কত অর্থ উদ্বৃত্ত আছে; যখন ১৮৮২।৮৩ সালে সর্ব্ব-প্রথম পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হয় তখন হইতে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত আমানতকারীদের শ্রেণী বিভাগ করা হইত, তাহা হইতে কোন শ্রেণীর মধ্য হইতে কত অর্থ সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা হইত তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। উপস্থিত সে শ্রেণী বিভাগ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এ কথা স্থির যে মফঃস্বল ও সহরে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ব্যক্তিগণ তাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ পোষ্ট আফিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া থাকে।

১৮৮০-৮১ সালে সর্ব্ব-প্রথম পোষ্টাফিস সমূহের মারফৎ দেশের লোকের টাকা সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা লইবার ব্যবস্থা হয়। সে সময়ে কলিকাতা, হাওড়া, বোম্বাই ও মাদ্রাজ সহরে এরূপে টাকা জমা লইবার বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গল, বোম্বাই ও মাদ্রাজ আপত্তি করায় এই সকল সহরে সেভিংস ব্যাঙ্ক খোলা হয় নাই। এক বৎসর কার্য্য করিবার পর সমগ্র ভারতবর্ষে জমা হয়—

	১৮৮২-৮৩	১৯০০-১৲
জমা—	৪৩,৫০,০০০৲	১৪,৭৬,১২,৭১৫৲৲
উঠাইয়া লওয়া হয়	২৭,৫০, ৲	৪,৭১,৮০,১৪৬৲
উদ্বৃত্ত অর্থ—	১৬,০০,০০০৲	১০,০৪,৩২,৫৬৯৲
সুদ—	৫০,০০০৲	২৯,০০,৪৭৬৲
নেট উদ্বৃত্ত—	২৮,০০,০০০৲	১০,০৪,৩২,৫৬৯৲

এই হিসাব হইতে আমরা দরিদ্র শ্রেণীর উদ্বৃত্ত অর্থের লেন-দেন সম্বন্ধে বেশ একটা সুস্পষ্ট পরিচয় পাই। গড়ে প্রতি বৎসর বাঙ্গালার উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ প্রায় এক কোটী টাকা। কেবল ১৯৩০—৩১ সালের প্রায় ৫৮ লক্ষ টাকা জমা অপেক্ষা বেশী অর্থ উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ঐ টাকা পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেটে ন্যস্ত করা হয় বলিয়া প্রকাশ।

দেশের এই অর্থ কি কেবল ১৮৮০—৮১ সাল হইতেই উদ্বৃত্ত হইতেছে? পূর্ব্ববর্ত্তী লোক সকল কি মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়শীল ছিল না? বিশ্বাস হয় না। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক পদ্ধতি প্রচলনের পুর্ব্বেও সাধারণ দরিদ্র লোক তাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিত। তাহারা উদ্বৃত্ত অর্থ নিজেরা শতকরা মাসিক এক টাকা অর্থাৎ বার্ষিক বার টাকা সুদে খাটাইত, নতুবা স্থানীয় বিশ্বাসী গোলদার, মহাজন বা ব্যবসায়ীদের নিকট উক্ত টাকা বার্ষিক নয় টাকা হইতে বার টাকা সুদে গচ্ছিত রাখিত। এই অর্থ মহাজন ও ব্যবসায়ীগণ তাহাদের কারবারে অথবা অন্য রকমে আরও অধিক সুদে খাটাইত। নানা কারণে দেশের লোকের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের সঞ্চার হয় এবং তাহারা স্ব-স্ব পল্লীর মহাজন ইত্যাদি অপেক্ষা গভর্ণমেণ্টকে অধিকতর বিশ্বাসভাজন বলিয়া মনে করে; ইহার ফলে ক্রমশঃ ঐ সকল অর্থ পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা পড়িতে থাকে; ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহাজন ও কারবারীগণ উক্ত টাকা হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ তাহাদের কারবার গুটাইতে বাধ্য হয়। এক-দিকে ইহার ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ শিল্প-বাণিজ্য

প্রভৃতির ক্ষতি ঘটে, অন্যদিকে তেমনই সাধারণ লোক বার্ষিক বার টাকা সুদের পরিবর্ত্তে বার্ষিক তিন টাকা, পরে আড়াই টাকা এবং যখন দুই টাকা সুদে তাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থের উপর সুদ পাইতে থাকে ; এইজন্য তাহারাও ক্রমশঃ অর্থহীন এবং নির্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বাস এত বড় একটা জিনিস যাহার জন্য আজ দেশের লোক নিজের অর্থ পরহস্তে তুলিয়া দিয়া সন্তুষ্ট আছে। আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও অবিশ্বাস কতদূর কার্য্যকরী তাহা আমরা এই পোষ্ট্যাল সেভিংস ব্যাঙ্কের কার্য্য-প্রণালী হইতে সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাই। বাঙ্গলার প্রায় বিশ কোটী টাকা এখন গভর্ণমেণ্ট মারফৎ ইংরাজ শাসিত ব্যাঙ্ক সমূহ কর্ত্তৃক তাহাদের স্বজাতি কারবারীগণের ব্যবসা, কল, কারখানা ইত্যাদিতে নিয়োজিত হইয়া তাহাদেরই শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে আর আমাদের বিশ কোটি টাকা থাকিতেও আমরা হাহাকার করিয়া অন্নাভাবে, অর্থাভাবে কীট-পতঙ্গের ন্যায় মরিতে বসিয়াছি। শুধু বাঙ্গলা নহে অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ অবস্থা, তবে কম আর বেশী। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ায় এ দেশের লোকের কিছুই সুবিধা হইবে না। মধ্য হইতে গভর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি হইবে মাত্র এবং সেই অবসরে তাহারা আরও নিজের কোলে ঝোল টানিতে সমর্থ হইবে। বিদেশী ব্যাঙ্কসমূহ "যথা পূর্ব্বম্ তথা পরম্" সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে না।

মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোক পোষ্ট্যাল সেভিংস ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্য রূপেও গভর্ণমেণ্টের হাতে বহু অর্থ তুলিয়া দিতেছে যথা, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, ইন্সিওরেন্স, ক্যাস সার্টিফিকেট এবং ক্রেডিট কো-অপারেটিভ। প্রত্যেকটী বিভাগেই দেশীয় দরিদ্রতর লোকের অর্থ যাইয়া জমা হইতেছে। ফলে দেশীয় ক্ষুদ্রতর কারবারী সম্প্রদায় দেশের লোকের উদ্বৃত্ত অর্থের দ্বারা কোন উপকারই পাইতেছে না। পূর্ব্বোক্ত বিভাগ সকলকে যতই দেশের কল্যাণকর বলিয়া মনে করা হউক না কেন, প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। এই সকল বিভাগের কত অর্থ উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে তাহার হিসাব দেখিলেই বেশ বুঝা যায় যে, আমাদের আর্থিক অবস্থা কেন ক্রমশঃ হীনতর হইতেছে। ব্যক্তিগতভাবে কেহ কেহ বলিবেন যে যাহারা অর্থ উদ্বৃত্ত রাখিতে পারিত না তাহারা এখন টাকা জমাইতে শিখিয়াছে এবং অনেক লোক এই সকল অনুষ্ঠানের সাহায্যে তবু কিছু উপকৃত হইতেছে। কথাটা কতক সত্য হইলেও ইহার দ্বারা উপকার অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতি হইতেছে, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যায়।

বর্ত্তমান যুগে অর্থই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু এবং অর্থই দেশের কল্যাণ বৃদ্ধি করে। পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠান সমূহের অর্থ যদি পূর্ব্বের ন্যায় দেশীয় মহাজনের, কারবারীদের ঘরে জমা হইত তাহা হইলে আজ কি অর্থাভাবে দেশের ব্যবসায়, শিল্প, কল, কারখানার সংখ্যা ও শ্রীবৃদ্ধি হইত না? যাদের অর্থ এখন সেভিংস ব্যাঙ্কে ন্যস্ত আছে তাহারা যদি ভরসা ও বিশ্বাস করিয়া বিশ কোটি টাকা দেশীয় কারবার, শিল্প, কৃষি, কল ও কারখানায় ন্যস্ত করিত, তাহা হইলে কি বাঙ্গলার এই দুর্দ্দশা হয়? দেশের গভর্ণমেণ্ট যদি বাস্তবিকই দেশের কল্যাণের প্রতি দরদী হইত তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট কি দেশের এই অর্থ কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, কল, কারখানা সৃষ্টি ও পরিপুষ্টির জন্য ন্যস্ত করিতে পারিত না? ক্রেডিট কো-অপারেটিভের অর্থ ব্যক্তিগতভাবে কর্জ্জ না দিয়া যদি সমষ্টিগত কারবারে ন্যস্ত হইত তাহা হইলেও কি এ দেশে নিজেদের যাবতীয় অভাব নিজেরা পরিপূরণ করিয়াও রপ্তানী কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারিতাম না? কো-অপারেটিভ ক্রেডিটের সমুদয় অর্থ সভ্যদের মধ্যে খাটেনা, সেই উদ্বৃত্ত অর্থও বড় কম নহে। সেভিংস ব্যাঙ্কের এবং ক্রেডিট কো-অপারেটিভের উদ্বৃত্ত অর্থের অর্দ্ধেকও যদি দেশের নানাবিধ কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও কল কারখানায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মারফৎ বিশ্বাসী লোকদের দ্বারা খাটান হয় তাহা হইলে আজ সমগ্র বাঙ্গলায় অর্থাভাবে কোন কার্য্যই অসমাপ্ত থাকে না।

বাঙ্গলা কেন সমগ্র ভারতবর্ষের এক শ্রেণীর অর্থবান লোক তাঁহাদের অর্থ কোম্পানীর কাগজে লগ্নী করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বার্ষিক তিন টাকা সুদ আহরণ করিয়া ব্রাহ্মণের বিধবার ন্যায় দিন যাপন করেন। এই অর্থ গভর্ণমেণ্টের নানাকার্য্যে প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক তথা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফৎ খাটিতেছে এবং তাহা খাটাইতেছে ইংরাজ রাজের স্বজাতি

ব্যবসায়ীসকল। সর্ব্ববিধ কাজের লাভ তাহারা পকেটস্থ করিয়া মূলধনীদিগকে মাত্র বার্ষিক তিন, সাড়ে তিন টাকা সুদ দিতেছে। যদি কোম্পানীর কাগজের অর্থ এ দেশের লোকদের মারফৎ খাটিত তাহা হইলেও আমাদের দুঃখের কিছু ছিলনা, টাকা আমাদের খাটাইতেছে অন্য দেশের লোক; ধনী হইতেছে তাহারা, আর আমরা কোনও রকমে গোয়ালে বাঁধা গরুর ন্যায় মাত্র খড়জলে জীবন ধারণ করিতেছি। পালকের দৃষ্টি কেবল কোনও রকমে আমাদের বাঁচাইয়া রাখা, পুষ্টি করা নহে। আমরা বিদেশী রাজতন্ত্র কর্ত্তৃক শাসিত পালিত হইতেছি বলিয়াই এইরূপ অবস্থা ঘটিতেছে। যদি এরূপ না হইত তবে আমরাও গভর্ণমেণ্টকে আমাদের যথা-সর্ব্বস্ব দিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। লোকের যত চক্ষু ফুটিতেছে ততই লোক গভর্ণমেণ্টের এই সকল বৈষম্য-মূলক কার্য্যের জন্য ব্যথিত বা অসন্তুষ্ট হইতেছে।

গভর্ণমেণ্টের মুদ্রা প্রচলন ও অর্থ বিনিময় পদ্ধতি ও নীতি এ দেশের অর্থ-হীনতার স্বল্প হেতু নহে। ভারতবর্ষে পূর্ব্বে বিভিন্ন জাতীয় মুদ্রার প্রচলন হেতু এক শ্রেণীর লোক মুদ্রা বিনিময় করিয়া দিন গুজরান করিত। সে সময়ে ব্রিটিশের জগদ্ব্যাপী ব্যবসায় ছিল না। তাহারা এই মুদ্রা বিনিময় ব্যবসায় কিছুই জানিত না। ভারতের অর্থ-ব্যবসায়ী শ্রফদের নিকট হইতে ইহা তাহারা শিক্ষা করে এবং সমগ্র ভারতে এক রকম মুদ্রা প্রচলন করে। উক্ত শ্রফ শ্রেণীর লোক বেকার ও অন্নহীন হইয়াছে। তাহারা যদি দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য আভ্যন্তরীণ অর্থ বিনিময় কারবার করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলেও এই কারবারটী হইতে ঐ শ্রেণীর লোক প্রতিপালিত হইত, কিন্তু তাহা না দিয়া আন্তর্জ্জাতিক অর্থ বিনিময় ব্যবসায়টি সম্পূর্ণরূপে ইংরাজ স্বজাতীয় এবং পরে স্বজাতীয় এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের হাতে তুলিয়া দিয়া দেশের এক শ্রেণীর প্রজাকে অন্নহীন করিয়াছে। এই অর্থ বিনিময় কারবারে কয়েকটি ইংরাজ কারবারী এ দেশে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। এখানেও ব্যাঙ্ক সমূহ স্থাপনের ফলে ইহাঁদের প্রথমে কিছু অসুবিধা হইলেও পরে ইহাঁরা সামলাইয়া লইয়াছেন কিন্তু দেশী অর্থ-বিনিময় কারবারীদের উৎসন্ন যাইবার সময়ে এরূপ কোনও ব্যবস্থা করা হয় নাই। প্রচলিত মুদ্রানীতির আরও জটিল বিষয় আছে যেগুলি লইয়া আমাদের উপস্থিত আলোচ্য বিষয়কে গুরু-ভারাক্রান্ত করিতে চাহিনা। বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তাহা নহে।

এদেশে ইনসিওর বা বীমার ব্যবসা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে কিন্তু অন্য স্বাধীন দেশে ইনসিওরের অর্থ হইতে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং কল, কারখানা, কারবারে ঐ অর্থ হইতে যে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায় এদেশে তাহা হয় না। এদেশের লোকের প্রিমিয়মের ও মূলধনের বহু অর্থ গভর্ণমেণ্টই টানিয়া লয়। নূতন আইনে আরও টানিয়া লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা ইহাতে সুখী, কারণ আমরা দেশের লোকের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছি। দেশী কারবারে অর্থ ন্যস্ত করা অপেক্ষা গভর্ণমেণ্টের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে আমরা অধিকতর তৎপর। এমন কি গভর্ণমেণ্ট ন্যস্ত অর্থের উপর সুদ দিতে অরাজী হইলেও আমরা বিনাসুদেও গভর্ণমেণ্টের নিকট টাকা রাখিতে তৎপর। ইনসিওর বিলের উপর তর্ক বিতর্কের সময় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বক্তৃতায় উহা স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছিল! জামীনবাবদ গচ্ছিত টাকার উপর গভর্ণমেণ্ট সুদ দিতে অসম্মত হইলে আমরা তাহাতেই রাজী হইয়াছি। দেশের লোকের পরস্পর বিশ্বাসের অভাবই ইহার মূল কারণ। এই ইনসিওর বিভাগে ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকের অর্থই সর্ব্বাধিক ন্যস্ত হইয়া থাকে। নানাদিক দিয়া যদি দেশের উদ্বৃত্ত অর্থ গভর্ণমেণ্ট এবং বিদেশী ব্যাঙ্ক সমূহের এবং তাহাদের মারফৎ অ-ভারতীয় কারবারীদের হাতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে দেশ দরিদ্র ও নির্বীর্য্য না হইবে কেন? বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি না পাইবে কেন? পরদেশীয় শিল্প, কল-কারখানা, এবং বৈদেশিক ব্যবসায়ীগণের শ্রীবৃদ্ধি না করিবে কেন?

বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাহার নিবারণ খুব বড় বেশী সমস্যা নহে। দেশের লোক যদি কিঞ্চিন্মাত্র আত্মনির্ভরশীল ও পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ হইত, তাহা হইলে আমাদের দেশের বেকার সমস্যার অতি সহজে সমাধান হইতে

পারিত। কেবল গভর্ণমেণ্টের চাকুরী-সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে বেকার সমস্যার শতাংশের একাংশেরও সমাধান হইবে না। স্বজাতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও প্রীতি বৃদ্ধি না পাইলে এ সমস্যা দূর হইবার নহে। কেবল গভর্ণমেণ্টকে দায়ী বা দোষী করিলে হইবে না। দেশের কারবারাদি বৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজন, এইজন্য আবশ্যক অর্থ। কিন্তু সেই অর্থ ক্রমশঃ হস্তান্তরিত হইতেছে; সুতরাং যতক্ষণ অর্থ সরবরাহের সুবিধা বৃদ্ধি না হয়, যতক্ষণ গভর্ণমেণ্ট স্বীয় কুক্ষিগত অর্থ দেশের কৃষি, শিল্প ও কল-কারখানা স্থাপনে ন্যস্ত না করেন, ততক্ষণ কোনও দিকে কোনও সুবিধা হইবে না। সমগ্র জগৎ এখন মুদ্রাশাসিত, মুদ্রাই এখন জগতের রাজা ও সুখ-দুঃখ নিয়ামক। সুতরাং এই অর্থকে পরহস্তে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। গভর্ণমেণ্ট আমাদের স্বায়ত্ব শাসন, তথা কল্পিত স্বরাজ, সব কিছু দিতে পারেন কিন্তু অর্থ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে এক ইঞ্চি স্থান বা তিল পরিমাণ ক্ষমতা দিতে কুন্ঠিত; সুতরাং আমাদের এখন এমন উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য যাহাতে আমাদের উদ্বৃত্ত অর্থ পরহস্তগত না হয়।

বেকার সৃষ্টির অন্য কারণ আছে যাহার জন্য আমাদের শিক্ষা ও সংস্কার সম্পূর্ণরূপে দায়ী। সে দায়িত্ব কোথায় তাহা দেখা প্রয়োজন।

১৮৮২-৮৩ সালে সর্ব্বপ্রথম পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের কার্য্য আরম্ভ হয়। ইহার পুর্ব্বে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের ট্রেজারি সমূহের মারফৎ সেভিংস ব্যাঙ্কের কার্য্য হইত।

১৮৭০ সাল হইতে ১৮৮১ সাল অবধি কণ্ট্রোলার জেনারেলের অধীনে সেভিংস ব্যাঙ্কের কার্য্য চালিত হইত। ১লা এপ্রেল ১৮৮২ সাল হইতে উহা পোষ্ট আফিসের হস্তে দেওয়া হয় এবং প্রথম বৎসরে মোট ৪,২৩৮ পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক খোলা হয়। কলিকাতা, হাওড়া, বোম্বাই ও মাদ্রাজ সহরে তৎকালীন প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক সমূহের বিরোধিতার জন্য কলিকাতাদি সহরে সেভিংস ব্যাঙ্ক খোলা হয় নাই। ইহার পূর্ব্বে ট্রেজারি ও গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ে বিভাগে মাত্র ১৯৭ সেভিংস ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা ছিল। প্রথম বৎসরে মাত্র ৪৭,২৮৭ জন লোক টাকা জমা রাখে এবং তন্মধ্যে ৮,১৬৬ জনে ঐ বৎসরেই হিসাব বন্ধ করে। বৎসরের শেষে জমাকারী লোকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯,১২১; মোট জমার পরিমাণ হইয়াছিল ৪৩,৫৩,৫৫৯৲ টাকা। ইহা হইতে ১৬,০৫,৭৮৩৲ টাকা ঐ বৎসরেই উঠাইয়া লওয়া হয়; বক্রী থাকে প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা, ইহাই ১৮৮২-৮৩ সালের ৩৯১,২১ ব্যক্তির জমার পরিমাণ। পর বৎসর জমার পরিমাণ হয় ১,০৩,৫৭,৫০৪৲ টাকা, তন্মধ্যে উঠাইয়া লওয়া হয় ৫৮,২৭,০৬৯৲ টাকা; সুদ শতকরা বার্ষিক ৩৷৹ হিসাবে দাঁড়ায় ১,৮৭,২১৭৲ টাকা; মোট নেট উদ্বৃত্তের পরিমাণ হয় ৭৫ লক্ষ ১৮ হাজার ৪৬৪৲ টাকা অর্থাৎ এক বৎসরে জমা বৃদ্ধি পাইয়াছিল ৪৭ লক্ষ ১৭ হাজার ৬৫৩৲ টাকা।

১৮৮২-৮৩ সালের বাঙ্গলা, বিহার, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম বিভাগের হিসাব হইতে দেখিতে পাই—

খাস বাঙ্গলায় ১০,৫৮১ জনের হিসাব খোলা হয়।
১,৮৪৫ জনের হিসাব বন্ধ হয়।
৮,৭৩৬ জনের হিসাব চলতি থাকে।

টাকার কারবারের হিসাব:—

জমা ১১,৪৭,৬৭৬৲ টাকা উদ্ধার, ৪,১২,৪৯১৲
বক্রী, ৭৪৮,৩৮৬৲

ঐ সময়ে বাঙ্গালী আমানৎকারীর সংখ্যা	৮,৪৪৩ জন
জমার পরিমাণ	৬,০৭,১৪১৲ টাকা
ইউরোপীর আমানৎকারীর সংখ্যা	২৯৩ জন
জমার পরিমাণ	৫১,২৪৫৲ টাকা
মোট আমানৎকারীর সংখ্যা	৮,৭৩৬ জন
জমার পরিমাণ	৭,৪৮, ৩৮৬৲ টাকা
সমগ্র ভারতবর্ষে আমানৎকারী (এদেশী)	৩৫,৬২৩ জন
জমা অর্থের পরিমাণ	২৩,০২,৬৭২৲ টাকা
ইউরোপীয়	৩,৪৯৮ জন
টাকার পরিমাণ ...	৪,৯৩,১২৩৲ টাকা
মোট আমানৎকারীর সংখ্যা ...	৩৯,১২১ জন
জমার পরিমাণ ...	২৭,৯৬, ৭৯৬৲ টাকা

যে সময়ে ১৮৮২-৮৩ সালে সেভিংস ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় তখন আমানৎকারীগণকে ছয়টি বিশিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত, যথা:—(১) পেশা (ক) নির্দ্দিষ্ট আয় (খ) অনির্দ্দিষ্ট আয় (২) গার্হস্থ্য ভৃত্য (৩) কারবারী (৪) কৃষি (৫) কারীকর (৬) অনির্দ্দিষ্ট পেশা।

১১৮২-৮৩ সালে বিভিন্ন পেশানুযায়ী আমানৎকারীর সংখ্যা:—

	ভারত	বাঙ্গলা	বেহার	আসাম	পুঃ বঙ্গ
১ম শ্রেণী পেশাজীবী (ক)—নির্দ্দিষ্ট আয়	১৪,৯০৪	৩,২১০	৮৯১	৩৪১	৫১৭
(খ) অনির্দ্দিষ্ট আয়	২,১৪৩	৭৪১	১২১	৬৭	১৭৪
২য়—গার্হস্থ্য ভৃত্য	৭,৫০৯	৮৬৫	২৯৯	৮৩	১০৯
৩য়—কারবারী	২,৯১২	৫৩৫	১১৮	১৭	২৯
৪র্থ—কৃষিজীবি	৯০৪	১৩৩	৬৪	১৬৫	৮
৫ম—কারিকর	৬৬৫	১৩১	২৮	২৮	৫
৬ষ্ঠ—অনির্দ্দিষ্ট	১০,০৮৪	৩,০৬১	৬৪৩	২৭৮	৪৯৯
মোট সংখ্যা	৩৯,১২৭	৮,৭৩০	২,৭৭০	৯৭৯	১,৩৪১

অন্যান্য প্রদেশের হিসাব বাদ দিয়া চারিটা প্রদেশ লইয়া পুরাতন বাঙ্গলার হিসাব গ্রহণ করা হইয়াছে, যে হেতু আসাম, পূর্ব্ববঙ্গ, বেহার, উড়িষ্যা ও বাঙ্গলা লইয়া কয়েকবার বিভক্তাদি করা হইয়াছে সুতরাং এই চারিটা বিভাগের হিসাব একত্রে তুলনা করিলে প্রকৃত অবস্থা সম্যক অবগত হওয়া যাইবে।

প্রায় বার বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৯৫-৯৬ সালে আমানৎকারীদের সংখ্যা সমগ্র ভারতে হয় ৬ লক্ষ, ৫৩ হাজার, ৮৯২৲ টাকা এবং জমার টাকা দাঁড়ায় ৯ কোটী ৩৪ লক্ষ ২৩ হাজার ৭০২৲ টাকা: কিন্তু ১৮৯৫-৯৬ সাল হইতে ১৮৯৯-১৯০০ সালে আমানৎকারীদের সংখ্যা ১৯০০-১ সাল অপেক্ষা বেশী ছিল। ১৮৯৬-৯৭ সালে প্রেসিডেন্সী সেভিংস ব্যাঙ্ক বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং ২৩,০০০ নূতন আমানৎকারী প্রেসিডেন্সী সেভিংস ব্যাঙ্ক হইতে পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে বদলী করিয়া দেওয়া হয় এবং প্রায় ৭০ লক্ষ জমার টাকা সেভিংস ব্যাঙ্কে বৃদ্ধি পায়। এই সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাব হইতে দেশের সাধারণ জনশ্রেণীর আর্থিক অবস্থা বেশ বুঝা যায়। গত পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর কয়েকবার বার্ষিক জমা অপেক্ষা খরচের পরিমাণ বেশী হইয়াছিল; যথা—১৮৯৯-১৯০০ এবং ১৯৩০-৩১ সালদ্বয়ে। সমগ্র ভারতের হিসাবে দেখা যায় যে ঐ দুই বৎসর সাম্বৎসরিক জমা অপেক্ষা খরচের পরিমাণ বেশী হইয়াছিল। ১৯৩০-৩১ সালে পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশ ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রদেশেই বাৎসরিক জমা অপেক্ষা অধিক টাকা উঠাইয়া লওয়া হয় এবং ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ১৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭৮১ টাকা, সুতরাং এই সালকে দুবৎসর বলিয়া নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় এবং সমস্ত প্রদেশের আমানৎকারী প্রতি গড়পড়তা জমার টাকার হিসাবে দেখা যায় যে পাঞ্জাবের আমানৎকারীদের গড়পড়তা উদ্বৃত্ত অর্থ অন্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিক। এসম্বন্ধে আমি Insurance & Finance Review নামক পত্রিকায় ১৯৩৩ সালের এপ্রেল ও মে মাসের সংখ্যায় বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছিলাম। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্যক আলোচনা করিলে শ্রোতা ও পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে। মোটকথা সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা-খরচের হিসাব হইতে দেখা যায় যে আমাদের সমগ্র দেশ ও বিভিন্ন প্রদেশের দরিদ্র জনসাধারণের কত কোটি অর্থ মাত্র বার্ষিক দুই টাকা সুদে গভর্ণমেণ্টের হস্তে খাটিতেছে। আর একটি প্রয়োজনীয় তথ্য জানিয়া রাখা দরকার যে সম্বৎসরের জমার টাকার এক পঞ্চমাংশ হইতে দশমাংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ শতকরা ৮০৲ হইতে ৯০৲ টাকা জমা হইতে খরচ হইয়া যায়।

১৯৩১-৩২ সালের হিসাবটার কিছু পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

সমগ্র ভারতে	অমানৎকারীর সংখ্যা	অতীতের জমা	১৯৩১-৩২ সালে জমা
	২৪,০১,৫২৭	৩৭,০২,৫৯,৮৭৪৲	৩১,০৯,৪২,২৯৫৲

১৯৩১-৩২ সালে উত্তোলিত ৩১,০০,১৬,৫৬১৲ টাকা

সুদ:—১,০৮,৪৮,৪৭৬৲

বর্ষশেষে বাকী জমা—৩৮,২০,৩৩,০৮৪৲

এই বৎসর মোট ৭৯,৩৪,৯৭২৲ টাকা বেওয়ারিশ হিসাবে জমা করা হয় এবং সম্বৎসর ৩,৩৩,৩৮১৲ বেওয়ারিশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

বাঙ্গলা ও আসাম আমানৎকারীর সংখ্যা—৬১১,২৯১

পূর্ব্বজমা—৮,৯৯,৮৩,৬২৭৲

সম্বৎসরের জমা—৬,৭৭,৬৩,০৩০৲

সম্বৎসরে উত্তোলিত—৬,৭৯,৫০,২৩৬৲

বাকী জমা—৯,১৪,১৪,৭৩০৲ টাকা

সুদ—২৬,১৮,০৩৯৲

বিহারে আমানৎকারীর সংখ্যা—১,৪৭,১১৮ জন

পূর্ব্ব বৎসরের বাকী জমা—২,৫৫,৭১,০৬৯৲ টাকা

সম্বৎসরের জমা—১,৮৩,৩৫,৬৮৬৲

সুদ—৭,২৯,২০৯৲

-১,৯৯,১৭,৮১৯৲

বাকী জমা—২,৪৭,১৮,১৪৬৲

গড় পড়তা হিসাবে বাঙ্গলায় আমানৎকারীদের

জন প্রতি জমা—১৮৯৲ টাকা

বিহার উড়িষ্যার—১৩৭৲ টাকা

আজ বাঙ্গলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যায় মোট ১১,৬১,৩২,৮৭৬৲ টাকা গভর্ণমেণ্ট যদি কয়েকটী ব্যবসা, কৃষি, শিল্প, কলকারখানার কার্য্যে নিয়োজিত করিতেন তাহা হইলে বাঙ্গলার শ্রী ফিরিত, কিন্তু ঘরের লক্ষ্মী পরকে তুলিয়া দিয়া আজ আমরা নিজেরা হাহাকার করিতেছি। এ সমস্ত অর্থই দরিদ্র শ্রেণীর। মধ্যবিত্ত সরকারী চাকুরেদের কত অর্থ গভর্ণমেণ্টের হস্তে খাটিতেছে তাহারও পরিচয় শুনুন :—

১৯৩০-৩১ সালে কত টাকার ২০৲ মূল্যের ক্যাশ সার্টিফিকেট কেনা হইয়াছে তাহার পরিচয় :—

বাঙ্গলা ও আসাম	১,৬৯,৪২,২৪২৲
বিহার ও উড়িষ্যা	৩৯,৫৯,৭৩৬৲
বোম্বাই	২,৭৯,৮১,৬১৩৲
যুক্তপ্রদেশ	১,৫৩,৬০,৬৯৯৲
সিন্ধু	৯৭,২৪,৭৪৭৲
পাঞ্জাব	২,৬:,৮৩,৭৩৪৲
মধ্যপ্রদেশ	৮,৪০,৮০,৩০০৲
মাদ্রাজ	৬৯,৩৭,৮৮৯৲
ব্রহ্ম	২৪,৫৬,২৯১৲

১৯২০-২১ সালে সমগ্র ভারতে ৫১,৮৭,২৬২৲ এবং ১৯৩০-৩১ সালে ১১,৭৮,২৭,৪১৬ টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেট বিক্রয় হয় ; ইহাও মধ্যবিত্ত এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ব্যক্তির উদ্বৃত্ত অর্থ—

পোষ্টাফিসের মারফৎ ১৯৩০-৩১ সালে ১,৫০,৩৮,২৩০৲ টাকার জীবনবীমা হয়, ইহার জন্য প্রিমিয়ামের পরিমাণ ৬১, ৫১,৭৭২৲ টাকা আদায় হয়, ইহা সরকারী চাকুরেদের উদ্বৃত্ত অর্থ। ১৯২৯-৩০ সালে প্রিমিয়ামের পরিমাণ আদায় ৫৬,২৩, ২৯৯৲ টাকা, দশ বৎসরের মধ্যে এই কার্য্যে কত বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত হিসাব হইতে বুঝা যাইবে :— ১৯২০—২১ ১৯৩০-১৯৩১

ইনসিওরের সংখ্যা—৪৭,২৮০, ১,০৮,৩২৯ জন

প্রিমিয়াম আদায় (টাকা)—২,৪০,৭৭,৭৫৭৲

১৯৩০-৩১—৬,৪২,৯৯,০৩০৲ টাকা

ইনসিওরের পরিমাণ (টাকা) ৬,৩৪,৮৯,৫৪৯৲

১৯৩০-৩১—১৮,৮৭,০৩,০৮৪৲ টাকা

ক্লেম বা দাবীর পরিমাণ—১,৩০,৯৩,৭৫৩৲ টাকা। যে দেশের গভর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরের কার্য্য করেন এবং দরিদ্রতম প্রজার অর্থ স্বল্পতম সুদে গ্রহণ করেন সে দেশের ব্যবসায়ের জন্য অর্থ আসিবে কোথা হইতে? লোকের গচ্ছিত অর্থ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু দেশের ব্যবসায়ী ইত্যাদি কোনও লাভজনক ব্যবসায়ে ঐ উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে সাহায্য পাইতেছে না, অথচ বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণ আসিয়াই লক্ষ ও ক্রোড়পতি হইতেছে। ইহা হইতেই দেশের আর্থিক অবস্থা এবং তাহাদের দুরবস্থার কারণ নির্দ্দেশ করা যায়।

প্রাইভেট বা বে-সরকারী ইনসিওরেন্স কোম্পানী-সকল বীমাকারিগণের অর্থ কি ভাবে ব্যবহার করিতেছে? তাহাদের মূলধনের এবং প্রিমিয়মের মোটা অংশ কোম্পানী কাগজে ন্যস্ত। তাহা না হইলে নাকি দেশের লোক তাহাদের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব বিশ্বাস করে না!! সংশোধিত বীমা আইনে আরও অধিক অর্থ গভর্ণমেণ্টে জমা রাখা বাধ্যতামূলক হইয়াছে। প্রিমিয়মের অর্থ ধনী ও মধ্যবিত্তের এবং ইহাও গভর্ণমেণ্টের কুক্ষিগত। অন্য স্বাধীন রাজ্য-সমূহে এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উপনিবেশ ও কানাডা ইত্যাদি রাজত্বে ইনসিওর কোম্পানীর অর্থ বেশীর ভাগ সার্ব্বজনীন উপকার ও ব্যবহারের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান-সমূহে ন্যস্ত হয়, যথা :—ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস, রেলওয়ে, কাপড় ও চিনির কারখানা ইত্যাদি, কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ অর্থ গভর্ণমেণ্টের হস্তে তুলিয়া দেওয়া হয়। ইহাও যে দেশবাসীর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অভাবের পরিচায়ক তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। প্রকৃত পক্ষে এ দেশের ইনসিওর কোম্পানী সকল পরের পয়সায় কোম্পানী কাগজের দালালী ও কারবার করে মাত্র। ইহাতে দেশ দরিদ্র না হইবে কেন? এদেশে রেলওয়ের মালিক গভর্ণমেণ্ট; টেলিফোন, বৈদ্যুতিক আলোক, ট্রাম, গ্যাস ওয়ার্কস ইত্যাদি যে সকল জনহিতকর কারবার চলিতেছে, সে সমস্ত বিদেশের মূলধনে পরিচালিত ; কাজেই সমস্ত উদ্বৃত্ত অর্থ নানা উপায়ে গভর্ণমেণ্টের এবং তাহাদের মারফৎ বিদেশী ব্যাঙ্ক সমূহের হাত দিয়া যাবতীয় বিদেশী কারবারে খাটিতেছে, আর আমাদের দেশের লোক শতকরা তিন টাকা সুদে সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। উপায় কি?

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পদ্মা: প্রমত্তা নদী

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীসুবোধ বসু

চৌদ্দ

প্রশস্ত ঘরের মধ্যে কোনও আসবাবই নাই; এক দিকে গোটা দুই খোলা সুটকেশ, এবং অন্য প্রান্তে একটা দামী কম্বলের উপর বিছানার চাদর পাতিয়া রজত এখনও ঘুমাইতেছে।

এক পক্ষকাল মাত্র রজতের এ-বাড়ি হইয়াছে; রজতের মনের অবস্থা বাসা বাঁধার অনুকূল নহে, কিন্তু কোনও জনাকীর্ণ হোটেলে যাইয়া বাস করার কথা কল্পনা করা মাত্র তার শোকবিদগ্ধ মন গভীর প্রতিবাদ করিয়া বসিয়াছিল। নির্জ্জনতার তার প্রয়োজন,—বড় প্রয়োজন। সত্যানন্দবাবু পর্য্যন্ত তাকে নিজ বাড়িতে লইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন।

তারপর এই সুদীর্ঘ পক্ষকাল ধরিয়া রজত পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো এই পৃথিবীর প্রতি লৌহ-গরাদে মাথা আছড়াইয়া ফিরিয়াছে, গভীর নিষ্ফল আক্রোশে নিজেকে আঘাত করিয়া অতি নিষ্ঠুর ভাগ্যের উপর প্রতিশোধ তুলিতে চাহিয়াছে,—বাতবিক্ষুব্ধ পদ্মার মতো নিজেকে লইয়া ক্ষুরধার আবর্ত্ত রচনা করিয়া ফিরিয়াছে। জীবনের কোনও উদ্দেশ্য নাই, বাঁচিবার কোনও সার্থকতা নাই, জগতের কোনও প্রয়োজন নাই,—শুধু একটা বিরাট ব্যর্থতা সৃষ্টি জুড়িয়া আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে!

রজতের যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন বেশ বেলা হইয়াছে। রৌদ্রপ্রদীপ্ত বাহিরের দিকে একবার তাকাইয়া রজত পাশ ফিরিয়া শুইল। গত রজনীর প্রমত্ততায় অবসাদ তার সর্ব্ব অঙ্গে এবং মনে ভারী হইয়া চাপিয়া বসিয়াছে—নিজেকে সে আরও দুর্ব্বল, আরও অসহায়, এবং আরও ব্যর্থ মনে করিল। কিন্তু লজ্জিত বোধ করিল না; বরঞ্চ এক প্রকার অদ্ভুত আত্মতৃপ্তিতে সে যেন কতকটা আশ্বস্ত বোধ করিল; যে ছন্নছাড়া, উদ্দেশ্যরহিত, পূর্ণতাহীন জীবন লীলায় ক্রূর ভাগ্য তাহাকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে, এ যেন তাহারই স্বাভাবিক পরিণতি; জীবনটাকে নষ্ট করিয়া নিষ্পেষিত ইক্ষুর ছিবড়ার মতো সে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে; ছিঁড়িয়া দুমড়াইয়া, ভাঙ্গিয়া মোচড়াইয়া ইহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে—ভাঙ্গা মৃৎকলসীর মতো অত্যন্ত হেলাভরে ইহাকে শত টুকরা করিয়া আবর্জ্জনার স্তূপে ছুড়িয়া ফেলিবে।

হীরা বাইজি? সেই ঘৃণিত মেয়েটা! নাঃ, পাপ বলিয়া কিছু নাই,—যেমন পুণ্য বলিয়াও কিছু নাই। যদি পাপ বলিয়া সত্যই কিছু থাকে, রজত অত্যন্ত [illegible] বিবেকদংশনরহিত তৎপরতার সঙ্গে তাহার পুনরভিনয় করিবে; তথাকথিত পাপের উর্দ্ধে থাকিয়া রজত কি বিধাতার কাছ হইতে কোন্ পুরস্কার লাভ করিল? কোন্ অনুগ্রহ তার উপর বর্ষিত হইল?

হীরা বাইজি! নিশ্চয়, হীরা বাইজির অপরাধ অতি সামান্য; শুধু নির্ম্মম ভাগ্য ওকে এই বিড়ম্বিত জীবনের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছে; তোমাদের ঈশ্বর তাহাকে একটু সাহায্য করিতেও অগ্রসর হন নাই। হীরা বাইজিকে আমি ঘৃণা করি না,—রজত মনে মনে বলিতে লাগিল,—ওর কাছে আমি আবারও যেতাম; কিন্তু যে-রস আমাকে তৃপ্ত করতে পারে, হীরা বাইজির সাধ্য নাই, সে-রস পরিবেশন করে—ও বেচারী বড় দুর্ভাগা!

নিজেকে বিনষ্ট করিবার এই দুর্ব্বার প্রবৃত্তি ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া ঈশ্বরের উপর এক গভীর আক্রোশে দাঁড়াইল। বিচারহীন এক শিশুর অকৃত্রিম ক্রোধে সে ঈশ্বরকে তিরস্কার করিতে লাগিল, অভিশাপ দিল। স্বেচ্ছাচারী, তুমি বোঝোনা, তোমার অসম্ভব ক্ষমতার অপপ্রয়োগে, তোমার স্বেচ্ছাচারলীলার উন্মত্ত আনন্দে সৃষ্টি জুড়িয়া তুমি কি নির্ম্মম নিষ্ঠুরতার তাণ্ডব করিয়া বেড়াও! জীবের দেহে বেদনা-বোধ দিয়া তুমি তাহাকে আঘাত কর, তাহার উদরে ক্ষুধার জ্বালা সৃষ্টি করিয়া তুমি তাহাকে অন্ন হইতে বঞ্চিত কর, নিষ্পাপ শিশুর উপর তুমি পিতার অপরাধের হিংস্র প্রতিশোধ লও,—বুকের মধ্যে প্রেম দিয়া প্রেমাস্পদকে তুমি ছিনাইয়া লইয়া যাও! বর্ব্বর স্বেচ্ছাচারিতায় তুমি জগতের নিষ্ঠুরতম সম্রাটকে লক্ষবার পরাজিত করিতে পার: মানুষ তোমার তুলনায় কতটুকু অত্যাচার করিতে পারে।

রজত সহসা সিদ্ধান্ত করিল, চিকিৎসা-বিষয়ক গবেষণার জন্য সে তাহার সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া দিবে। পরীক্ষাগারে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, শত শত বীর যোদ্ধা, যারা মৃত্যুর মারণ-অস্ত্র প্রস্তুত করিতে আত্মনিয়োজিত করিয়াছে, তাহাদের রজত সর্ব্বস্ব দান করিয়া সাহায্য করিবে। ঈশ্বরের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে যাহাদের অভিযান,—মা'র কোল হইতে যে ঈশ্বর সন্তান কাড়িয়া লয়, তাহাকে যারা বাধা দিতে দাঁড়ায়, স্ত্রীর বুক হইতে যে-জন স্বামীকে হরণ করিয়া লয়, তাহাকে যারা শাসন করিতে অগ্রসর হয়, রজত তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাহাদের সাহায্যে নিয়োজিত করিবে!

যুগে যুগে মানুষ রাজার স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে; ডেমোক্রেসির জন্য মানুষ কত রক্ত উৎসর্গ করিয়াছে; ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য মানুষের কত বিক্ষুব্ধ অভিমানের পুণ্য-স্মৃতি অক্ষয় হইয়া আছে; স্বাজাতিক স্বাধীনতার জন্য মানুষের মহত্তম প্রচেষ্টা নিয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের অপেক্ষা কোটিগুণ নির্ম্মম যে স্বেচ্ছাচার প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের মধ্যে সংঘটিত দেখিতে পাই,—রজত ভাবিতে লাগিল,—মানুষ কেন তার প্রতিবাদ করে নাই? কেন এই স্পর্দ্ধিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে একবার বিদ্রোহের ধ্বনি উঠায় নাই, কেন অসহায় বেদনা প্রতিবাদহীন অপমানের সঙ্গে সহ্য করিয়াছে? এই অসীম শক্তির তুলনায় মানুষ একান্ত দুর্ব্বল, তাই কি এই সহনশীলতা, তাই কি এই নির্ভরতার ভাণ? ভক্তি কি দুর্ব্বলতারই নামান্তর নয়!

রজত মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল,—ভবিষ্যতে জগতে যে নতুন বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহা ঈশ্বর-দ্রোহিতার রূপ লইবে; তাহা হইবে স্বেচ্ছাপরতন্ত্র, শাসিতানুমোদনহীন, ক্ষমতাগর্ব্বদৃপ্ত এক তেজান্ধ শক্তির বিরুদ্ধে মানব মনের এক গভীর প্রতিবাদ! বৈজ্ঞানিকদের প্রাণপাত মহৎ প্রচেষ্টার মধ্যে রজত সেই যুগের আভাস পাইতেছে।

ক্রমে রজতের এই অতি আক্রোশ মন্দীভূত হইয়া আসিল। ক্রমে সে প্রার্থনা সুরু করিল। কহিল—প্রভু, সত্যই কি তুমি আছ? সত্যই কি তুমি বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ কর? তোমার প্রজ্ঞারই কি সমস্ত বিধান গড়িয়া উঠিয়াছে? জীব ভাগ্যের তুমিই কি কর্ণধার? মানুষের আত্মা কি মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে? পরলোক কি সত্যই আছে? সুমিত্রা কি সত্যই আছে? কোন্ অদৃশ্য লোকে, কোন্ অজানা রহস্যের মধ্যে তুমি আমার সুমিত্রাকে লইয়া গেলে? এ তোমার কোন্ কৌতুক, প্রভু! কোন্ গভীর মঙ্গলেচ্ছায়, কোন্ চিরানন্দের ব্যবস্থা করিবার জন্য তুমি সাময়িকভাবে সুমিত্রাকে অপসারিত করিলে?

কিন্তু সত্যসত্যই যে তুমি আছ,—রজত মনে মনে প্রশ্ন করিল—গভীর প্রজ্ঞাবান্, মহাচৈতন্যময় এক প্রভু যে সত্যই কর্ণধার রূপে রহিয়াছ, সত্যই যে পরলোক আছে, সুমিত্রার আত্মা যে অবিনশ্বর, তাহার প্রমাণ কোথায়? একটা সুনিশ্চিত প্রমাণ যে আমার কাছে বড় প্রয়োজন! দয়া করো, দয়া করো, একবার ভবিষ্যতের আশায় আমাকে বুক বাঁধতে দাও!

সম্পূর্ণ একটা মাস রজত প্রার্থনা করিল, ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিল, অতীন্দ্রিয় জগত সম্বন্ধে একটু ক্ষীণতম আভাস পাইবার জন্য ঈশ্বরের কাছে মাথা কুটিয়া মরিল।

কিন্তু কোনও ফল হইল না ;—কোনও ছায়ামূর্ত্তি দেখিল না, কোনও দৈববাণী শুনিল না ; মনের মধ্যে সন্দেহ তেমনি সবল রহিল, কোনও আধ্যাত্মিক জ্ঞানোদয়ে তাহা পরাভূত হইল না।

রজত আরও প্রার্থনা করিল, আরও কাঁদিল, তীব্র অধীরতায় সে গভীর বিশ্বাস সংগ্রহ করিয়া এক অজানা অদৃশ্য জগতের জন্য বারম্বার হাতড়াইয়া মরিতে লাগিল, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য কোনও কিছুতেই পৌঁছাইল না। হতাশা বেদনা, উপায়হীন ভরসাহীন ব্যর্থতা তাহাকে প্রায় উন্মত্ত করিয়া তুলিল।

ঈশ্বর কি সত্যই আছে! মহাচৈতন্যময় মহাকরুণাময় যে-শক্তিতে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সশ্রদ্ধ আড়ম্বরের সঙ্গে পূজা করে, তাহার অস্তিত্ব কি সত্যই আছে, না তাহা মানুষের সান্ত্বনা পাইবার এক অভিনব পন্থা—জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দিহান মানুষের এক কাল্পনিক আবিষ্কার?

মনের গভীর হতাশায় রজত জড়বাদী দর্শনের দিকে আকৃষ্ট হইল। চার্ব্বাকবাদীদের গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি আধুনিক মেটেরিয়ালিষ্টদের দর্শন পর্য্যন্ত জড়বাদের সকল বক্তব্য সে পড়িয়া ফেলিল। পড়িয়া জড়বাদের সত্যতা সম্বন্ধে রজতের গভীর প্রতীতি জন্মিল।

সমস্ত জগত পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে এক অন্ধশক্তি ; তার বিচার নাই, তার বুদ্ধি নাই, চৈতন্য নাই। বিদ্যুৎ-শক্তির যেমন অসীম ক্ষমতা, অথচ একমাত্র বুদ্ধি নাই, বিশ্বের কেন্দ্রীয় মহাশক্তিও তেমনি। অসীম, অমোঘ ইহার শক্তি, অবিশ্বাস্য জগতমণ্ডলী এই শক্তি হইতে উদ্ভূত হয়,—পাথরে আঘাত খাইয়া জলস্রোত যেমন নিজের অজ্ঞাতসারে জলবিন্দু ও জলবুদ্বুদ উৎক্ষিপ্ত করে, এই শক্তি তেমনি অজ্ঞাতসারে বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করিয়াছে ; এই অন্ধশক্তির বুদ্ধিহীন আলোড়নেই জড়সৃষ্টি হইয়াছে, জীব সৃষ্টি হইয়াছে, মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্বসৃষ্টির কেন্দ্রে কোনও প্রজ্ঞাময়, প্রেমময় ভগবান বর্ত্তমান নাই, একটা বিরাট ব্যর্থতার দিকে দৃশ্যমান সর্ব্ববস্তুর যাত্রা। ফুলের সঙ্গে গন্ধ যেমন ওতঃপ্রোত, মানুষের মধ্যে চৈতন্যও তদ্রূপ ; ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকিবার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আধুনিক জড়বাদী দার্শনিকেরা যেসব যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, রজতের কাছে তাহা অতিশয়ই যুক্তিযুক্ত মনে হইল।

রজত স্থির করিল, ঈশ্বর নাই।

তবে মদ খাও ; তবে পাপ করো, ক্লেদময় সম্ভ প্রমত্ততার অভিনয় করো। ভালো মন্দে, পাপে পুণ্যে ত্যাগে স্বার্থপরতায়, মহত্বে এবং ইতরতায় পার্থক্য করিয় সুবিচার করিবার যদি কেহ নাই, তবে হও স্বার্থপর আপাতমধুর শারীর সুখের সমস্ত সম্ভার জোগাড় করো,— মদ, নৃত্য, হীরা বাইজি—

দ্বিতীয়বার, এবং সজ্ঞানে, রজত হীরা বাইজির বাড়ি উদ্দেশে যাত্রা করিল।

হীরা বাইজি অতিশয় আদর আপ্যায়ন করিল। পা ও আতর আনিল,—এবং ইহার জন্য পূর্ব্বাহ্নে পয়সা পর্য্য চাহিল না। এবং রজত যখন সে সব কিছু স্পর্শ না করি অদ্ভুত নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে শুধুই তাকাই রহিয়াছে দেখিল, তখন হীরা বাই যেন নিজেকে তা দুর্ব্বল এবং অপটু বোধ করিতে লাগিল ; তার মনে হইতে লাগিল--তাহার ছলাকলা এই অদ্ভুত লোকটির কাছে যে যথেষ্ট কার্য্যকরী, যথেষ্ট মনভুলানো নয়। তবু কাঁধের এ লাস্যময় ভঙ্গি করিয়া, বাঁকা কটাক্ষের আবেদন হানিয় সহাস্যমুখে আব্দারভরা কণ্ঠে কহিল—কেত্না রোজ সে আপ আয়া নেই, বাবুজি—

রজত সে-প্রশ্নের কোনও জবাব দিল না। কহিয়া উঠিল,—আনন্দ দিতে পার, বাইজি, একটু আন দিতে পার?—

'হাঁ, হাঁ, ও সি ওয়াস্তে তো হম্ হয়। নাচে গা? গা গা? আপ যো ফরমাইয়েগা, ওই করে গা, বাবুজি—

'তুমি তা পারবে না।'

'আপ বাতাইয়ে তো।'

রজত চাহিয়া দেখিল, এই মধ্যযৌবনা কৃত্রিমরঞ্জিতবদনা অবসাদাভূষ্টদেহা মেয়েটী কী গভীর অনুনয়ের সঙ্গে তাহার তুষ্টি সাধনের জন্য আদেশ অপেক্ষা করিতেছে। কী করুণ, কী বিভৎস করুণ পণ্য-স্ত্রীর জীবন! ভালোবাসার যেখানে সংস্পর্শ মাত্র নাই, মুদ্রার বিনিময়ে দেহ এবং মনকে সেখানে গভীরভাবে নিপীড়িত করিয়া সে প্রতিনিয়ত আত্মহত্যা করিতেছে।

রজত উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল,—ভুল করেচি, বাইজি; অত্যন্ত ভুল করেচি।—সত্যই, তোমার কাছ থেকে আনন্দ পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়; আমি যা চাই, কোথায় তুমি তা পাবে?—আশীর্ব্বাদ করি, এই বিড়ম্বিত জীবন থেকে তুমি মুক্তি পাও। এই নাও টাকা; কিন্তু আর কোনও দিন তুমি আমাকে আশা ক'রো না। বলিয়া রজত কতগুলি নোট বাহির করিয়া হীরা বাইজির নিকট রাখিয়া দিল এবং আর বাক্য ব্যয় না করিয়া যাত্রা করিল।

হীরা বাইজি টাকা ছুঁইল না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'কুছ্ কসুর হুয়া বাবুজি?'

রজত কহিল,—কিছু না।

'তব্?'

'তবে আর কিছু নেই।'

'আপ্‌কা ক্যায়া হুয়া, বাবুজি?—'

'জগত আমার কাছ থেকে কোথায় জানি সরে' গিয়েচে; তাকে আর খুঁজে পাচ্ছিনা।' বলিয়া রজত প্রায় দৌড়াইতে দৌড়াইতে নিচে নামিয়া গেল। এবং আজ বহু বৎসর পরে এই সুপটু অভিনেত্রীর বুক হইতে সর্ব্ব প্রথম একটা অকৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

সুমুখ দিয়া একটা ট্যাক্সি যাইতেছিল। সেটাকে ডাকিয়া রজত চড়িয়া বসিয়া কহিল—ইডেন গার্ডেন্‌স্। এবং ইডেন্ বাগানের সমুখে নামিয়া গঙ্গার দিকে হাঁটিয়া চলিল। গঙ্গার পারে পৌছাইয়া সমুখেই দেখিল একটা খালি বেঞ্চ; রজত নির্জ্জীবের মত তাহাতে শুইয়া পড়িল।

গঙ্গার জল পাড়ের সঙ্গে আসিয়া শব্দ করিতেছে, ছলাৎ, ছলাৎ। আকাশ তারায় তারায় ছাইয়া গেছে; কত জ্যোতির্বর্ত্ম, কত অস্পষ্ট নীহারিকা, অন্তহীন গভীরতার মধ্যে কত নব নব জ্যোতির্ম্ময় জগতের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। আকাশের পটে অগণিত সৃষ্টির ইঙ্গিত; বাতাস, জল, বিস্মৃতি,—মুক্তি,—শান্তি,—প্রেম, সুমিত্রা—

না, না, ঈশ্বর আছে; নিশ্চয়ই আছে। রজত সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসিল। রহস্যের কি অন্ত আছে? অন্ত যদি নাই, তবে কি করিয়া বলা যায়, এই রহস্যের আড়ালে রহস্যময় বিরাজ করিতেছে না? নিশ্চয়, ঈশ্বর নিশ্চয়ই সত্য; নিশ্চয়ই তিনি বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। নইলে—রজত ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিল—কিছুই যে নাই, পরলোক নাই, পরিণতি নাই.—নইলে, নইলে যে সুমিত্রা নাই—। সুমিত্রা নাই? না, না, তাও কি সম্ভব? ঈশ্বর আছে, ঈশ্বর আছে!

ভারতবর্ষে যুগে যুগে কত গৃহী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এই অদৃশ্য ঈশ্বরের সন্ধানে ছুটিয়া গিয়াছে; তপে, ধ্যানে, কৃচ্ছ সাধনায়, যোগ- সাধনায়, এই চিরন্তন রহস্যের জন্য মানব-মনের চিরন্তন জিজ্ঞাসার তাহারা জবাব খুঁজিয়া ফিরিয়াছে। মানুষ কোথা হইতে আসে, কোথায় যায়, কোন্ অদৃশ্য শক্তির সঙ্কেতে প্রতিনিয়ত জীব-জগতের বিস্ময়কর প্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে? সে-শক্তি তো মিথ্যা নয়;—সেই অদৃশ্য, জ্ঞানের অগোচর এবং বুদ্ধির অনধিগম্য শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনই হেতু নাই। আর এই যে বিশ্ব-ব্যাপী শৃঙ্খলা, এই যে জগত-জোড়া নিয়মানুবর্ত্তিতা, ইহার পিছনে কি কোনও মহাচৈতন্যের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট আভাস পাই না?—রজত ভাবিতে লাগিল।

মানুষের দৃষ্টিশক্তির বহির্ভূত, মানুষের বুদ্ধি শক্তির অন্তরালস্থিত কী এই মহাশক্তি? ক্ষণে ক্ষণে তাহার আভাস মনের মধ্যে আসিয়া পৌছায়, জীবনে সতত তাহার স্পর্শ পাই. সর্ব্বক্ষণ মানুষের আশা এবং আকাঙ্খা তাহার ধ্যান করিয়া মরে,—অথচ, একবারও তাহাকে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশিত হইতে দেখি না, আমার বুদ্ধি তাহাকে শৃঙ্খলিত করিতে পারে না, আমার ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলি তাহাকে আবিষ্কার করিতে যাইয়া স্ব স্ব ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে। এ কি অসীম বিস্ময়!

এই শক্তিকে জানিতে পারা, মানুষের জ্ঞান সাধনার ইতিহাসের মহত্তম সাধনা। সুন্দর কি? সার্থক কি? কোন পরম সত্যের মধ্যে আমাদের আনন্দময় সমাপ্তিহীন পরিণতি?

পুত্রের জন্য যে বাসা দুর্গাপ্রসন্ন এত যত্ন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, রজত আর তাহাতে কোনও দিনই প্রবেশ করিল না।

দশ পনেরো দিন পরে সত্যানন্দ একদিন যখন অপিসে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় ডাক-পিয়ন আসিয়া তাঁর হাতে রেজিষ্টারি করা একটা লম্বা খাম দিয়া গেল। হাতে সময় অত্যন্ত কম ছিল; সত্যানন্দ একবার ভাবিলেন,—অপিসে লইয়া যাইবেন, কিন্তু তারপর খুলিয়াই ফেলিলেন।

ভিতর হইতে রেজিষ্টারি-কৃত একটা দলিল বাহির হইল। অপিস-সংক্রান্ত দলিল-পত্র তাঁর বাড়িতে আসে না,—অপিসের ঠিকানায়ই তারা আসে; তাই তিনি একটু বিস্মিত হইলেন; কিন্তু বিস্ময়টা তাঁর শত গুণ বাড়িয়া গেল, যখন চকিতে রজতপ্রসন্ন চৌধুরি এই নামটা সহসা তিনি দলিলের নিচের দিকে আবিষ্কার করিলেন; মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি সমগ্র দলিলে একবার দ্রুত চোখ বুলাইয়া লইলেন; দেখিলেন, ইহা এক দানপত্র!

তখন সঙ্গের চিঠিটাতে সত্যানন্দের দৃষ্টি পড়িল। কম্পিত হস্তে সেটা চোখের সমুখে উঠাইয়া, চশমা-হীন চোখের ভুরু কুঁচকাইয়া তিনি পড়িতে আরম্ভ করিলেন; পড়িতে পড়িতে লাইনগুলি বারবার এলোমেলো হইয়া উঠিল:—

"কাকাবাবু,

এই চিঠির সঙ্গে একটা দানপত্র পাঠাইলাম। আমার সমস্ত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি আমি নানা জনহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য আপনাকে একমাত্র অছি নিযুক্ত করিয়া গেলাম। আপনি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, এই দলিল বিধি অনুযায়ী রেজিষ্টারি করা হইয়াছে।

অর্থে আমার আর কোনও প্রয়োজন নাই। নিরুদ্দেশ পথে আমি যাত্রা করিলাম। জীবনকে যারা অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত করিয়াছে, দৃশ্যমান জগতের বাহিরের এক অদৃশ্য জগতের রহস্যের সন্ধানে যাহারা নিজেদের ব্যাপৃত করিয়াছে, তাহাদের কাছে আমি সর্ব্বপ্রথম যাইব। জীবনের কি কোনও বরণীয় পরিণতি আছে? সত্যই কি জগতের কর্ণধাররূপে চৈতন্যময়, মঙ্গলময় এক ভগবান আছেন? চরম সত্য কি?—এই সব প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া আমার পক্ষে একান্তই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

ঋষি-প্রদর্শিত পন্থায়ই প্রথমে আমি এই অনুসন্ধান আরম্ভ করিব। খোঁজ যদি সত্যই কিছু পাই, কাহারও কাছেই তাহা গোপন রাখিব না। আর যদি ব্যর্থ হই,—যদি বুঝিতে পারি, সাধু সন্ন্যাসীরা যুগ যুগ ধরিয়া নিজেদের আত্মসম্মোহিত, আত্মপ্রবঞ্চিত মাত্র করিয়াছে, তবে তাহাও জগতের কাছে জানাইতে দ্বিধা বা লজ্জা করিব না। এবং সেই ব্যর্থতার জন্য নিজেকে আমি কোনও দিনই এই বলিয়া অভিযুক্ত করিব না, যে একটা মিথ্যার পশ্চাতে ঘুরিয়া জীবনটাকে আমি নষ্ট করিয়া ফেলিলাম। যে বৃহৎ প্রশ্নের একটা সদুত্তরের জন্য আমি সংসার ত্যাগ করিয়া চলিলাম, একটা জীবনব্যাপী পরীক্ষা তাহার তুলনায় কিছুই নয়—একটা জীবন ইহার জন্য অনায়াসে বিসর্জ্জন দেওয়া যায়।—

আপনি এবং কাকিমা আমার প্রণাম জানিবেন; মন্দার মত লক্ষ্মী মেয়ের চিরকল্যাণ হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি! ইতি

-রজত"

পড়িয়া সত্যানন্দ সমুখের চেয়ারটার কাণ্ডচ্যুত বৃক্ষের ন্যায় বসিয়া পড়িলেন। নড়িবার শক্তি পর্য্যন্ত তাঁর অবশিষ্ট রহিল না।

ভৃত্যের মুখে সংবাদ পাইয়া সত্যবতী আসিলেন। স্বামীর মুখ দেখিয়া তাঁহারও মুখ শুকাইয়া গেল। স্খলিত কণ্ঠে কহিলেন—কি খবর, বল তো?—এ চিঠি কার? কি হয়েছে বলনা ছাই? এমন চুপ করে' রইলে কেন?

সত্যানন্দ কহিলেন,—রজত সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছে; এই তার চিঠি: এই তার দানপত্র,—সমস্ত সম্পত্তি সে দান করে' চলে গেছে। পাগল! পাগল! আস্ত একটা ক্ষ্যাপা—'

'কি কাণ্ড বল তো? সন্ন্যাসী? সন্ন্যাসী হবে সে কোন দুঃখে?'

'রক্তের মধ্যে ওর এই ঘর ভাঙ্‌বার প্রবৃত্তি: ভেঙে ফেলবার উন্মাদনার মধ্যে ও বড় হয়ে উঠেচে; পদ্মার মতোই ওর মন—পলাতক মন; সঞ্চয়ের মধ্যে বাঁধা থাক্‌তে চায় না; নিজের কীর্ত্তিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে অগ্রসর হয়ে যায়। কিন্তু, মা, না—এ হ'তে পারবেনা। —এমন তাকে আমি করতে দেব না। কেন সে এমন করবে? সব বিসর্জ্জন দেবে সে কেন? আমার হাতে যে দুর্গাপ্রসন্ন ওর ভার দিয়ে গেচেন; সে দায়িত্ব কি আমাকে এম্‌নি করেই লঙ্ঘন করতে হবে?—ও কি, কাঁদ্‌চিস কেন, মন্দা? সব শুনেচিস্‌?

দরজার গায়ে মাথা ঠেস দিয়া মন্দা কখন্ কাঁদিতে সুরু করিয়া দিয়াছে, সত্যানন্দ তাহা এতক্ষণ টেরও পান নাই। সকরুণ স্নেহে কন্যার আনত অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—কাঁদিস্‌ নে, মা, কাঁদিস্‌ নে। যা, যা তো মা, সোফারকে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিতে বল্ গিয়ে। —দেখিস্, তাকে আমি ধরে' আন্‌বই,—যেমন করে' পারি তাকে আমি ফিরিয়ে আনবই—

উত্তরভারত যাত্রী এক দ্রুতগামী ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর এক কক্ষে মুণ্ডিতমস্তক, এক-বস্ত্র-সম্বল রজতপ্রসন্ন তখন নিরুদ্দেশ যাত্রায় ছুটিয়া চলিয়াছে। শান্ত সমাহিত একটা পরিতৃপ্তিতে তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল; দুই চোখে গভীর বিশ্বাসের নির্ভরতা, ললাটে ঔদার্য্যের মহিমা। জীবনে দুঃখ বলিয়া ওর যেন কিছু নাই; ব্যর্থতায় কোনও দিনই যেন সে বেদনা পায় নাই,—জীবন যেন ওর উপর দিয়া স্বচ্ছন্দগতি জল-স্রোতের মতন প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যারাগ-রক্তিম আকাশের দিকে রজত চোখ মেলিয়া চাহিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া রহিল। সহসা অস্তরাগরঞ্জিত আকাশ চন্দ্রালোক-প্রতিফলিত পদ্মায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। দেখিল, ফেনিলোচ্ছল পদ্মা সৃষ্টির এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত উর্ম্মি বিক্ষিপ্ত করিয়া, আবর্ত্ত রচনা করিয়া, খরস্রোতোবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর বুকে ভীম বিক্রমে সে আঘাত করিতেছে। বলিতেছে,—ভাঙ্‌, ভাঙ্‌, ভাঙ্‌। যাহা ভঙ্গুর, যাহা দুদিনের, পদ্মপত্র জলের মত যাহা ক্ষণস্থায়ী, তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিস্‌ না। যাহা শাশ্বত, যাহা চির সত্য, একবার সে দিকে চোখ ওঠা।—তোর চারদিকে যে শৃঙ্খল তুই নিজে রচনা করিয়া রাখিয়াছিস্, তাহা ভাঙ্‌, ভাঙ্‌, ভাঙ্‌—; যে-মুক্তির বাণী তোর কর্ণে আমি নিরন্তর চিৎকার করিয়া, কহিতেছি, একবার কান পাতিয়া শোন্—

রজত পদ্মার উদ্দেশ্যে বারম্বার প্রণাম করিল।

সমাপ্ত

শ্রীসুবোধ বসু

কথাসাহিত্য

শ্রীনলিনীমোহন সান্ন্যাল এম্‌-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন

আজকাল কথাসাহিত্য প্রায় সকল দেশের সাহিত্যেরই প্রধান অঙ্গ। কথাসাহিত্যে পাঠকগণের রুচি অসীম।

কয়েকপ্রকারের রচনা কথাসাহিত্যের অন্তর্গত। কতক রচনার নাম উপকথা, যাহাকে চলতি ভাষায় রূপকথা বলে। আজকাল বঙ্গদেশে বালোপযোগী অনেকগুলি সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে, এবং সবগুলিতেই বালকবালিকাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উপকথা-পর্যায়ের অনেক গল্প থাকে। পূর্বে তাহারা পিতামহী বা মাতামহীর নিকট রূপকথা শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইত। এখন তাহারা সাময়িক পত্র হইতে উহা সংগ্রহ করে। হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র বা ঈসপের গল্পগুলি উপদেশমূলক। বৌদ্ধজাতক গ্রন্থে বুদ্ধদেবের ৫৫০টী পূর্বজন্মের অদ্ভুত গল্প সন্নিবিষ্ট আছে। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ সমূহের মধ্যে অনেক বিবরণাত্মক কাহিনী আছে, যেমন নলদময়ন্তীর উপাখ্যান, সাবিত্রী-সত্যবানের আখ্যায়িকা। এই কথাগুলির মধ্যে উপদেশ ব্যতীত মানবজীবনের নানা বেদনারও পরিচয় পাওয়া যায়। আরব্য উপন্যাস, চাহার-দরবেশ ইত্যাদিতে অদ্‌ভুত অদ্‌ভুত গল্প পাওয়া যায়। কথাসরিৎসাগর গল্পের খনিবিশেষ, এবং দশকুমারচরিতে দশটি সুন্দর আখ্যান আছে। • উপন্যাস ও রমন্যাস (romance) আধুনিকযুগের সৃষ্টি। ইহারা কল্পনাপ্রধান রসসাহিত্য। ইহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই বাস্তব ঘটনার আধারে রচিত—কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত এবং অধিকাংশ নিছক কল্পনাপ্রসূত।

স্কটের উপন্যাসগুলি ইতিহাসমূলক; থ্যাকারে, ডিকেন্স ও জেন অষ্টেনের উপন্যাসসমূহ সামাজিক। জুলে ভার্ণের কাহিনীগুলি বিজ্ঞানমূলক। লা মিজারেব্লেতে ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত শাসনপ্রণালী ও সমাজের উৎপীড়নের হৃদয়গ্রাহী ও উচ্চ বিচারপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। কাদম্বরী প্রাচীন ধরণের সুন্দর কল্পনামূলক উপন্যাস। রমেশচন্দ্রের রচনাসমূহ মধ্যে কতকগুলি সামাজিক এবং কতকগুলি ঐতিহাসিক। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস প্রায়ই কল্পনামূলক এবং সামাজিক আচার ও ধর্মের আলোচনায় পূর্ণ। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি কল্পিত সামাজিক চিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির শিল্প ও আদর্শ অতি উচ্চ।

মনস্তত্ত্বে মনের তিনটী অবস্থার উল্লেখ আছে—জ্ঞানের অবস্থা, ভাবের অবস্থা ও সঙ্কল্পের অবস্থা। অবস্থাত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধি করা কঠিন—তিনটীরই ক্রিয়া এক সঙ্গে হয়। জ্ঞানে দুইপ্রকারের উপাদান বিদ্যমান—কতকগুলি বাহির হইতে প্রাপ্ত এবং কতকগুলি অন্তরেই সঞ্জাত। বাহির হইতে প্রাপ্ত উপাদানগুলি ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া মনে প্রবেশ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়লব্ধ উপাদানগুলির উপর অভ্যন্তরস্থ বৃত্তিসমূহের ক্রিয়া না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা জ্ঞানে পরিণত হয় না। এই মানসিক ক্রিয়াকে চিন্তা বা বিচার বলে। চিন্তা বা বিচারক্রিয়ার পর জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। চিন্তা বা বিচারে ইন্দ্রিয়লব্ধ উপাদানের সহিত পুরাতন উপাদানের তুলনা হয়, এবং উহাদের কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণীত হয়। মনে কিছু ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ ক্রিয়াও হয় এবং তাহা হইতে ভাবের উদয় হয়। ভাবে ও জ্ঞানে প্রভেদ আছে।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও আভ্যন্তরীণ ভাবের সাধারণ নাম অনুভূতি (experience)। অনুভূতি সমূহ ভিতর ও বাহির উভয়দেশ হইতেই উদ্দীপনা পাইতে পারে। চিন্তা বা বিচার জ্ঞানের ক্রিয়া, এবং কল্পনা ভাবের ক্রিয়া। ভাবের তীব্রতা হইতে আবেগ উৎপন্ন হয়। সাধারণ ভাষায় চিন্তা মানসিক ক্রিয়ার ফল, এবং ভাব ও কল্পনা

হৃদয়ের ক্রিয়ার ফল। অতএব চিন্তায় ও কল্পনায় প্রভেদ আছে। চিন্তায় আমরা বাস্তবকে অবাস্তব হইতে—সত্যকে মিথ্যা হইতে—পৃথক্ করিয়া থাকি। কিন্তু কল্পনায় এবংবিধ ভিন্নতা থাকে না। অনুমান হয় যে, মনুষ্যের কল্পনাশক্তির উদয় সেই আদিযুগে হইয়াছিল যখন মিথ্যাকে সত্য হইতে পৃথক্ করা যাইত না। অতএব ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, কল্পনাশক্তির উদ্ভব চিন্তাশক্তির পূর্বে হইয়াছিল

দেখিতে পাওয়া যায় যে সাধারণ লোকে যে সকল বিষয় বুঝিতে পারে না, তাহাদের কারণ তাহারা কল্পনা করিয়া লয়। অতএব অজ্ঞতাই কল্পনার মূল। ঋগ্বেদের ঋষিরা প্রাকৃতিক দৃশ্য ও শক্তিসমূহ দেখিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাহাদের কারণ জানিবার চেষ্টা করেন নাই। স্বীয় কল্পনা দ্বারা তাঁহারা প্রত্যেক প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে এক একটী দেবতার সত্তা অনুভব করিয়া ঐ কল্পিত দেবতাদের সম্বন্ধে এক একটী কথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই বৈদিক কথাগুলির আধারে পুরাণ-সমূহের অনেক কথা গঠিত হইয়াছে।

কাব্য ও কথা কল্পনামূলক—বাস্তব ঘটনাদ্যোতক নহে। বাস্তবিক ঘটনার ঠিক ঠিক বিবরণ ইতিহাসে থাকে। কাব্য ও কথায় রচয়িতার কল্পনা অনুসারে বাস্তবিক ঘটনা বা অনুভূতি পরিবর্তিত হইয়া একটী নূতন আকার ধারণ করে। এই নবীন নির্মাণে সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্ব উৎপন্ন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি তাহাতে এমন সব সংবেদনার সমাবেশ করিতে উৎসুক, যদ্দ্বারা পাঠকের হৃদয়তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতে পারে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কোনো কথার জন্য বহির্জগৎ হইতে কোন্ কোন্ উপাদান আবশ্যক? তাহার উত্তর এই যে, কতকগুলি মনুষ্য আবশ্যক এবং এক বা ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে তাহাদের কার্যাবলী আবশ্যক। রচয়িতা স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে এমন সব পাত্র ও ঘটনা বাছিয়া লইয়া থাকেন যাহা তাঁহার চিত্রের সম্পূর্ণ উপযোগী। তাঁহার উদ্দেশ্য তাঁহার কল্পিত চিত্রের দ্বারা কোনো আবেগ বা সংবেদনা পরিস্ফুট করা। একটি প্রধান সংবেদনার সহিত কতকগুলি গৌণ সংবেদনারও সমাবেশ হইতে পারে। সংবেদনাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত কল্পনার প্রয়োগ দ্বারা লেখক পাত্রগণের চরিত্র ও ঘটনাসমূহের ক্রম পরিবর্তিত করিয়া লয়েন, এবং তাহাদিগকে এরূপ অবস্থায় লইয়া যান যাহাতে কথাটী মনোরঞ্জনের বস্তু হইয়া পড়ে। ঘটনাপরম্পরার সুব্যবস্থিত সমগ্রতাকে ইংরাজীতে প্লট (plot) বলে। অতএব সংবেদনা, পাত্র, প্লট ও পরিস্থিতি —এই চারিটীর সমবায়ে কথা গ্রথিত হয়। পাত্র, প্লট ও পরিস্থিতির নিপুণ বিন্যাসে সংবেদনা পরিস্ফুট হয় এবং সহৃদয় পাঠকের হৃদয় প্রভাবিত হইয়া আনন্দে পরিপ্লুত হয়। মনের যে প্রদেশ হইতে ভাবসমূহের উদয় হয় তাহাকে হৃদয় বলে।

প্রধান সংবেদনার স্পষ্টীকরণের নিমিত্ত প্লট নানা-প্রকারের ঘটনা, পরিস্থিতি তথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংবেদনা দ্বারা পরিবৃত হইয়া স্বাভাবিক ক্রমে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু উহাতে কথার সজীবতা ও ঘটনাবলীর একতা ও ক্ষিপ্রতা অনুভূত হওয়া আবশ্যক। ভবভূতিলিখিত উত্তররামচরিতের ঘটনাপরম্পরা কি বেগে ধাবিত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

কথারচনার সমগ্রতার প্রতি দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আব-শ্যক। সংবেদনা, প্লট, পরিস্থিতি বা পাত্রের যে কোনোটির প্রতি অধিক মনোনিবেশ করিলে সামঞ্জস্যের অভাবে সমগ্রের প্রভাব নষ্ট হইয়া যায়। উপাদানসমূহের বিকাশ এরূপে হওয়া উচিত যে, সকলগুলির পুষ্টি যুগপৎ সাধিত হয়। সামঞ্জস্যের অভাবেই কতকগুলি কথা ঘটনাপ্রধান, কতকগুলি চরিতপ্রধান, কতকগুলি বর্ণনাপ্রধান এবং কতক-গুলি ভাবপ্রধান হইয়া পড়ে।

কল্পনার বিভিন্নতা এবং সংবেদনার তারতম্য হেতু বিভিন্ন শিল্পীর রচনা বিভিন্ন ধরণের হইয়া পড়ে। ইহাকেই শিল্পীর বিশিষ্টত্ব বা ব্যক্তিত্ব বলে। এই কারণেই গ্রন্থকার-গণের রচনাশৈলীতে (Style এ) বিভিন্নতা অনুভূত হয়। কখনো কখনো কোনো একটী লেখা পড়িবামাত্রই বোঝা যায় যে লেখাটী কাহার। সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। কোনো কোনো লেখায় ব্যক্তিত্বের ছাপ অধিক পাওয়া যায়।

ব্যক্তিত্ব থাকা হেতু কোনো কোনো লেখক নিজ নিজ রচনা এইরূপে বিন্যস্ত করেন যে তদ্দ্বারা তাঁহাদের সামাজিক, নৈতিক, ধার্মিক বা রাজ-নৈতিক আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণার্থ বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবীচৌধুরাণী," রবীন্দ্রনাথের "গোরা" ও শরৎচন্দ্রের "শেষ প্রশ্ন" উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। "বন্দেমাতরম্" বাক্যের উৎপত্তির মূলে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশানুরাগ। যদি আদর্শের সমাবেশ মুখ্য সংবেদনার অনুকূল হয় বা উহা হইতে অভিন্ন হয়, তবে সামঞ্জস্যের অভাব হয় না; কিন্তু উহাতে যদি উপদেশের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়, তবে আদর্শের সমাবেশ প্রশংসনীয় হয় না।

কথাসাহিত্যে যুক্তি বা বিচারের স্থান কম। কথা ভাবরাজ্যের অধিবাসিনী—উপদেশের জন্মস্থান বিচাররাজ্যে। জ্ঞান ও ভাবের উৎপত্তিস্থান মনের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে। সংবেদনার স্থান বিচার হইতে দূরে কিন্তু যদি উপদেশই মুখ্য সংবেদনা হয় তবে সে কথা ভিন্ন।

উপরে কথাসাহিত্যের কতিপয় সাধারণ লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে। উহাদের ভেদে নানাপ্রকার কথার উদ্ভব হয়। সকল লেখকেরই সাধারণ উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি করা, কিন্তু সকলে সমান সফলতা লাভ করেন না। কল্পনার ক্রটি অথবা প্রকাশ করিবার শক্তির ন্যূনতা হেতু উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। কুরূপতা প্রকৃতপক্ষে বিকৃত বা নষ্ট সৌন্দর্য, যেন সৌন্দর্য কোনো কারণে মলিন বা কলুষিত হইয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

ভারতীয় কবি বা ঔপন্যাসিকগণ পূর্বে সৌন্দর্যকে যে দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতেন এখন তাহা হইতে তাঁহারা দূরে সরিয়া গিয়াছেন। পূর্বে তাঁহারা রসের পরিপুষ্টির চেষ্টা করিতেন এবং তাহাতে প্রতিভাবান লেখকেরা বেশ সফল হইতেন। যাঁহাদের তেমন প্রতিভা ছিল না তাঁহারা অধিক কৃতকার্য হইতেন না। এখন ইউরোপীয় মনীষীদের অনুকরণে সংবেদনার ব্যবহার ফ্যাশন হইয়া পড়িয়াছে, এবং রসের পরিপুষ্টির নিমিত্ত সংবেদনাকে জাগরিত করাই অধিক আবশ্যক বিবেচিত হইতেছে। এদেশের অনেক প্রাচীন আখ্যায়িকা সংবেদনাশূন্য দেখা যায়।

কোনো কোনো বেদনা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয় না। পাঠক নিজ কল্পনা দ্বারা তাহার উপলব্ধি করেন—নিজ কল্পনা দ্বারা গল্পকে সংপূর্ণ করিয়া লয়েন। লেখক যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে বেদনা স্পষ্ট না হইয়া ব্যঞ্জিত হয়। যেখানে শব্দ স্বীয় প্রধান অর্থ ত্যাগ করিয়া ব্যঞ্জিত অর্থ প্রকাশ করে,* সেখানে পণ্ডিতেরা তাহাকে "ধ্বনি" বলেন।* ইহা কাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। বাচ্যকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া শ্রেষ্ঠ রচনার প্রকৃতি। † আলঙ্কারিকেরা বাচ্যাতিরিক্ত ধর্মকে ধ্বনি বলেন। কথাসাহিত্যে, বিশেষ করিয়া ছোট গল্পে, ইহা কম আবশ্যক নয়। কিন্তু এই ধ্বনি কাহার ধ্বনি? ধ্বনিবাদীরা উত্তর দেন, 'রসের ধ্বনি'। অতএব রসই কাব্যের আত্মা।

রস লৌকিক বস্তু নয়। বাহিরের উপদান অবলম্বন করিয়া মনে যে সকল ক্রিয়া উৎপন্ন হয় তাহা হইতে ভাবের উদয় হয়। এই ভাবগুলি লৌকিক ভাব। কবি যখন নিজ প্রতিভাবলে লৌকিক ভাব অবলম্বন করিয়া অলৌকিক

* যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতং স্বার্থৌ।
ব্যঙ্গঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ॥
ধ্বন্যালোক, ১১৩।

† বাচ্যকে অতিক্রম করার উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের 'সোণার তরী'—"গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা, কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা। * * * গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে? দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে। * * * ওগো তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে, বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে। শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে,—আমার সোনার ধান কূলেতে এসে। যতো চাও ততো লও তরণী পরে, সকলি দিলাম তুলে থরে বিথরে। এখন আমারে লও করুণা ক'রে। ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট সে তরী,—আমারি সোণার ধানে গিয়াছে ভরি। * * * শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি'—যাহা ছিল নিয়ে গেল সোণার তরী।" 'হৃদয় যমুনা'—"যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ—এস ওগো এস মোর হৃদয় নীরে;" 'তারকার আত্মহত্যা'—"জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধার সাগরে ঝাপায়ে পড়িল এক তারা।"

চিত্রের সৃষ্টি করেন, তখন তাহা হইতে সহৃদয় পাঠকের মনে রসের অনুভূতি হয়। রস একটি অলৌকিক অনুভূতি।

আর একটি কথা এখানে বলিব। কাব্য নাটক তথা কথাসাহিত্যে যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয় দেখিতে হইবে তাহা ব্যাপক ও স্থায়ী কিনা। যথার্থ সৌন্দর্য স্থানকালনিরপেক্ষ এবং চিরস্থায়ী।* এই কারণে শেক্সপীয়ারের নাটকসমূহ, গেটের ফাউস্ট, কালিদাসের শকুন্তলা ও মেঘদূত, বাল্মীকির রামায়ণের বিনাশ নাই।

এখন দেখা যাউক উপন্যাস ও ছোট গল্পে প্রভেদ কি? প্রথম কথা এই যে উপন্যাসে বিষয়ের বিস্তার অধিক হয়। উহাতে একটি প্রধান বেদনার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ছোট ছোট বেদনাও গর্ভিত করা যাইতে পারে। দেখিতে হইবে যে সেগুলি বিরোধী না হইয়া যেন মুখ্য বেদনার পরিপুষ্টি বিষয়ে সাহায্য করে। উপন্যাস লেখকের নিজ ইচ্ছানুসারে ঘটনাবলী ও পাত্রগণের কার্যাবলীর ব্যাখ্যা দিবার স্বাধীনতা থাকে। এই স্বাধীনতা থাকায় তিনি মুখ্য বেদনার বিকাশ করিবার যথেষ্ট অবসর ও সুযোগ পান এবং চরিত্র সমূহের বিশ্লেষণ ও প্লটের বিকাশসাধন করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে পারেন। উপন্যাসে পাত্র, প্লট, পরিস্থিতি, ছোট ছোট সংবেদনা ইত্যাদির বিকাশ হইয়া একটি অতি সুন্দর ঠাট (কাঠামো) গঠিত হয় এবং মুখ্য সংবেদনা অবশেষে পাঠকের মনে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

চিত্র অঙ্কনের জন্য একটি পটভূমি (background) আবশ্যক। চিত্রের শোভা বহু পরিমাণে ভূমির উপযোগিতার উপর নির্ভর করে। চিত্রের সফলতার নিমিত্ত কখনো কখনো ভূমির রং বদলাইতে হয়। রং কখনো হালকা, কখনো বা গাঢ় করিয়া লইতে হয়। চিত্রবিদ্যায়, যাহাকে ভূমি বলে, কথাসাহিত্যে তাহাকে পরিস্থিতি বলে। পরিস্থিতির গুরুত্ব সামান্য নহে। শকুন্তলা নাটক হইতে যদি তপোবন বাদ দেওয়া যায়, তবে ঐ নাটকের গৌরব ভূমিসাৎ হইয়া যায়।

সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য উপন্যাসকার স্বীয় উপন্যাসের ভূমি ও চরিত্রসমূহকে প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তিত করিতে পারেন। কিন্তু ছোট গল্পে ইহা করা চলে না। উহাতে ভূমি, চরিত্র ও গতির বিকাশ ধীরে ধীরে হয় না। উহাতে সমগ্র কাহিনী, উহার সম্পূর্ণ আলেখ্য, সমস্ত কার্যক্রম, সব চরিত্র ও সব ঘটনার ক্রমিক বিকাশ রচয়িতাকে পূর্ব হইতেই মানসপটে অঙ্কিত করিয়া লইতে হয়। ছোট গল্প একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র বা নকসা মাত্র। নাটক ও ছোট গল্পে প্রভেদ এই যে ছোট গল্প অনেক সময় নাটকের এক অঙ্কের সদৃশ। ছোট গল্পে আদ্যোপান্ত একটি পুরা কাহিনী নাও থাকিতে পারে। কেবল একটি বেদনা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতে পারিলেই উহার উদ্দেশ্য সফল হইল। ছোট গল্পও আজকাল নাটকের ন্যায় সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এখন সাহিত্যের ইতিহাসে উহার উৎপত্তি ও বিকাশের আলোচনা হইতেছে।

ছোট গল্পে উচ্চকোটির শিল্প দৃষ্টিগোচর হয়। উহার রচনার বিষয় ও বিষয়-গঠনের প্রতি যতটা মনঃসংযোগ আবশ্যক হয় তত আর কোনো সাহিত্যিক রচনায় হয় না। আভ্যন্তরিক সজীবতা, শৈলী (style) বিষয়ের গুরুত্ব, চরিত্র সমূহের গঠন—এই সকলের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ও একতা রক্ষা করিয়া লেখক কল্পিত রচনার দিকে অগ্রসর হন।

ভাস্কর্য ও চিত্রকলার প্রয়োগ পদ্ধতিতে যে প্রভেদ, ছোট গল্প ও উপন্যাসের রচনা পদ্ধতিতেও সেই প্রভেদ। চিত্রাঙ্কনের নিমিত্ত চিত্রকরের সম্মুখে ঈজেল বা ফ্রেমে আঁটা একখানি পট থাকে। চিত্রকর রঙের পাত্র হইতে তুলিকা দ্বারা প্রয়োজন অনুসারে রং লইয়া তাহা পটের উপর প্রয়োগ করেন। তাঁহার কল্পনাক্ষেত্রে যে রূপচিত্রটি অঙ্কিত আছে তিনি পটের উপর সেইটীর প্রতিরূপ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন। প্রয়োগের সময় যদি তাঁহার চিত্রে কল্পিত সৌন্দর্যের বিঘ্নকর কোনো ত্রুটি সহসা দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তিনি ঈপ্সিত সৌন্দর্য ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত রঙের পাত্র হইতে রং লইয়া পূর্বপ্রযুক্ত রংটী প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তিত করিয়া দেন।

কিন্তু একটি শিলাখণ্ড কাটিয়া তাহা হইতে মূর্তি বাহির করা অন্য ব্যাপার। মর্মরখণ্ডের উপর হস্তার্পণ

---

* "A thing of beauty is a joy for ever." Keats.

করিবার পূর্বেই শিল্পীর মনে মূর্তির সম্পূর্ণ সুনির্দিষ্ট আকৃতি বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, তবে তাঁহার বাটালী চলা সম্ভব হইবে। যদি সামান্যমাত্র ইতর বিশেষ হইয়া যায়, তবে ভ্রম সংশোধন করা অসম্ভব। বাটালী ও হাতুড়ীর প্রত্যেক আঘাতে হয় তিনি শিলাখণ্ডের ভিতর হইতে তাঁহার কল্পিত মূর্তির সম্পূর্ণ পরিস্ফুরণের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, নয় পাথরখানিকে সম্পূর্ণ অকেজো করিয়া ফেলিতেছেন। চিত্রণে যোগের কাজ হয় এবং তক্ষণে বিয়োগের কাজ।

কাট ছাঁট দ্বারা ছোট গল্প অনাবশ্যক অংশ পরিত্যাগ করিয়া একটি বিমল সারভূত পদার্থে পরিণত হয়। ইহাতেই উহার সজীবতা ও সবলতা, এবং সৌন্দর্য ও সংবেদনার চরম সীমা। অনাবশ্যক অংশ থাকিলে উহার কল্পনাত্মক সৌন্দর্য নষ্ট হইয়া যায়।

ছোট গল্পে উপন্যাসের বীজ পাওয়া সম্ভব, কিন্তু শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর উপন্যাসে ছোটগল্পের উপাদান সংগ্রহ করা কঠিন। আধুনিক ইয়োরোপে দেখা যায় যে ছোটগল্পের লেখকেরা অধিক শারীরিক ও মানসিক বলসম্পন্ন। কথা-লেখকদের সৃজনশক্তি যে পর্যন্ত প্রবল থাকে সে পর্যন্ত তাঁহারা ছোট গল্প লিখিয়া থাকেন। কিন্তু যখন তাঁহাদের শক্তির মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া যায় তখন তাঁহারা সেই শক্তির মিতব্যয় করিবার অভিপ্রায়ে ছোট গল্পের রচনা ছাড়িয়া দেন, কেন না অধিক একাগ্রতা নিয়োগ বশতঃ ঐ কাজ দেহ মনকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। তখন তাঁহারা উহার পরিবর্তে উপন্যাস রচনার সরল কার্য অবলম্বন করেন।

আবেগের সংখ্যা অনন্ত, কিন্তু মানবজীবনের প্রধান বেদনাগুলির সংখ্যা সীমাবদ্ধ। এই অল্পসংখ্যক মুখ্য সংবেদনা হইতে ছোট ছোট সংবেদনা পল্লবিত হয়। যত ছোট গল্প লেখা হইতেছে তাহা কোনো না কোনো ছোট সংবেদনাকে অবলম্বন করিয়া। প্রভেদ কেবল দেশ, কাল, পাত্র, বস্তুবিন্যাস, শৈলী (style), ঢং (ভঙ্গী) ও লেখকের ব্যক্তিত্ব লইয়া। কয়েকটী সংবেদনার নাম এখানে দেওয়া হইতেছে—মাতৃস্নেহ, পিতৃস্নেহ, ভ্রাতৃস্নেহ, পতিপরায়ণতা, সখ্য, দাস্য (প্রভু-সেবকের সম্বন্ধ), স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ (বৈধ ও অবৈধ), বিরহ, বিয়োগজনিত দুঃখ, সপত্নী বিদ্বেষ, ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, ভ্রাতৃদ্রোহ, দারিদ্র্য, পরাধীনতা, ঐশ্বর্য-মদ, প্রভুত্ব-মদ, অবিবেকিতা, সুরাপান, মাদকদ্রব্যের আকর্ষণ, বারাঙ্গনাসক্তি, দ্যূতব্যসন, অমিতব্যয়িতা, প্রজাপীড়ন, অসন্তোষ, ঋণদায়, প্রেম, ঈশ্বর-পরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা, উদ্যম, প্রবাসের ক্লেশ, কারাবাসের নিগ্রহ, স্বদেশবৎসলতা, পরদুঃখকাতরতা, দয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছোট গল্প রচনায় ইয়োরোপের বালজাক, আনাতোল ফ্রান্স, মোপাসাঁ, টলস্টয়, তুর্গেনেভ, শেকভ, কানরাদ, শেরউড আণ্ডার্সন, পো (আমেরিকান) ইত্যাদি খুব প্রসিদ্ধ।

বাংলাতে আজকাল অসংখ্য ছোট গল্প লিখিত হইতেছে, কিন্তু উপরিউক্ত কষ্টিতে কতগুলি টেকে বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের "কাবুলীওয়ালা" ও শরৎচন্দ্রের "মহেশ" উৎকৃষ্ট ছোট গল্পের উদাহরণ।

কথা সাহিত্য সম্বন্ধে আরো অনেক কথা রহিয়া গেল। যদি আয়ুতে, শরীরে ও ক্ষমতায় কুলায় তো আর যাহা কিছু বলিবার থাকিল তাহা লইয়া বারান্তরে আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইব।

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

কাল যে কোল্‌কাতা রওনা হবো একটা গাঁয়ের কারোই জানতে আর বাকি নেই। পত্র আর পুলিন্দা পোট্‌লা পুট্‌লি সেই যে সকাল থেকে আসা আরম্ভ হয়েছে এখনো তার শেষ হোলো না। এতো বিশ্রী লাগে! 'না' করাও চলে না, অথচ—প্রত্যেকবারই কোল্‌কাতা থেকে আসার সময় আর বাড়ী থেকে কোল্‌কাতা যাওয়ার সময় আমাকে গাঁয়ের মেলগাড়ী হোতে হয়। চাক্‌লাদার ঠাকুরদা "বলেন" 'স্পেশাল পশ্‌ট্‌-মেল,' বছরে দু'বার কোরে রান করে, সদরদি টু কোল্‌কাতা, বিনা মাশুলে পত্র-প্রেরণের এই দুর্লভ সুযোগ কেউ ছাড়বে এ ধরণের আশা করাই তো মূর্খতা, মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। চিঠিগুলির ঠিকানা পড়ে পড়ে স্যুট্‌ কেসে গুছিয়ে রাখ্‌তে লাগলাম। কালীঘাট, শ্যামবাজার উল্টাডাঙা, বেলেঘাটা—কোল্‌কাতার কোন অংশই আর বাকি নেই, দেখতে দেখতে মনে হোচ্ছিল, এক কাজ করলে হয় না, চিঠিওয়ালাদের প্রত্যেককে ডেকে এক আনা করে পয়সা দিয়ে দি, তাতে সময় আর পয়সা দুই-ই আমার বাঁচবে। এর যে-কোন জায়গায় যেতে হোলে ট্রাম্‌ বাসে যাতায়াতে অন্ততঃ চার আনা ছ আনার দরকার। অথচ সে ধারণা গাঁয়ের কোন লোকেরই নেই। এমন কি কোল্‌কাতার সঙ্গে যাঁদের কিছু কিছু পরিচয় আছে তাঁরাও একথা ভুলে যান। প্রত্যেকেই ভাবেন কোল্‌কাতার সব জায়গাই যেনো এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ী, এ পাড়া থেকে ও পাড়া।

মণি কাকা এসে বল্‌লেন, "ভালো কথা, রাহা বাড়ী থেকে দেখা কোরে এসেছিস্‌ তো! ওদের যদি কোনো চিঠি পত্র খবর টবর দেওয়ার থাকে—"

মণি কাকার পরহিতৈষণা জগৎ বিখ্যাত। বল্‌লাম, "না, বিকালে যাবো।"

রাহা বাড়ীতে বিশেষ যাওয়া হয়ে ওঠে না এক দিগিন কাকা যখন বাড়ী থাকেন তখন ছাড়া। রাহা বাড়ী বল্‌তে ছেলেবেলার মতো এখনো আমার শুধু দিগিন কাকাকেই মনে পড়ে। এই একটি মাত্র লোক রাহা বাড়ীতে, শুধু রাহা বাড়ীতে কেনো সমস্ত গ্রামে, যাকে আমার সব চেয়ে বেশী ভালো লাগে। কিংবদন্তী, শৈশবে নাকি আমি ভয়ানক ভগবদ্ভক্ত ছিলাম। তিনশ পঁয়শট্টি দিনের কোনো দিনই পূজা অর্চনা বাদ যেত না, তেত্রিশ কোটী দেবতার কোন না কোন একজনকে আমার ছোট মন্দিরে মৃণ্ময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ কোরে বিরাজ কোরতেই হোত! দেখে শুনে কীর্ত্তনীয়া অক্ষয় মাষ্টার মশাই নাকি ভবিষ্যদ্বাণী কোরে রেখেছিলেন উত্তর জীবনে রামকৃষ্ণ কি ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মতো একজন মহা সাধক এ ছেলে না হোয়েই যায় না।

সে সব কথা আজ আর মনে নেই কিন্তু কৈশোরে দিগিন কাকা যে মর্ত্ত্য লোকের একজন দেবতা বিশেষেয় মতই ছিলেন আমার কাছে সে কথা আজও বেশ মনে পড়ে। তা ছাড়া রাহা বাড়ীর আরও একজনকে আমার মন্দ লাগে না, কিন্তু তার অনেকখানিই দিগিন কাকাকে ভালো লাগে বলেই। কারণ ছোট কাকীমার মধ্যে খুব ভালো লাগার মতো কিছু নেই। যদিও মণি কাকার মতে এই রেণু কাকীমাই গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে বেশী সুন্দরী এবং বেশী বুদ্ধিমতী (কারণ মণি কাকাই দিগিন কাকার বিয়ের সময় মেয়ে পছন্দ কোরেছিলেন), কিন্তু আরও অন্যান্য বিষয়ের মত এ দিক্‌ দিয়েও মণি কাকার সঙ্গে আমার মতদ্বৈধ আছে।

বিকালে এসে দেখলাম ছোট কাকীমা কী একটা সেলাই করছেন বসে বসে। বল্‌লাম, "যে হেতু দিগিন কাকা সম্প্রতি চশমা নিয়েছেন সেজন্য আপনারও বুঝি চশমা নিতেই হবে কাকীমা?"

কাকীমা হাসলেন, "কালই আপনার যাওয়া ঠিক হোয়ে গেলো বুঝি ?"

"হুঁ, আপনার চিঠিপত্র খবর টবর কি দেওয়ার আছে তাড়াতাড়ি দিয়ে ফেলুন।"

"কিছু না, বল্‌বেন শুধু আমরা এখনও আছি—ভালোই আছি।"

বল্‌লাম, "আছেন তা' ঠিক, তবে ভালো যে নেই তা' বুঝ্‌তে পাচ্ছি। কিন্তু কেনো বলুন তো? দিগিন কাকার চিঠিপত্র পাননি বুঝি শিগ্‌গির?"

"কাজের মানুষ, চিঠিপত্র লেখার সময় পান কোথায়!"

"সেতো ঠিকই, দিগিন কাকা কোলকাতা গেলে একেবারে সম্পূর্ণ বদ্‌লে যান। সব সময়েই ভয়ানক ব্যস্ত থাকেন এবং দোকানে থাকেন না। পর পর পনের দিন গেলে একদিন হয়তো ভাগ্যক্রমে দেখা মেলে। কিন্তু ওকি কাকীমা? দিগিন কাকার মাথায় টাক আছে বলে আপনারও কি সামনের দিকে ছোট খাট একটু টাক না হোলে চল্‌বে না? কী জানি দিগিন কাকাকে হয়তো এই জন্যই অত্যন্ত ব্যস্ত থাক্‌তে হয়, হয়তো এই জন্যই তিনি সময় পান না। একটা ভালো তেলটেল ব্যবহার কোরলেই তো পারেন।"

কাকীমার মুখ লাল হোয়ে উঠ্‌লো, মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে দিয়ে বল্‌লেন, "ক'দিন কোল্‌কাতায় থেকেই আপনি বেশ ফাজিল হোয়ে উঠেছেন দেখ্‌ছি।"

বল্‌লাম, "কোল্‌কাতায় থাক্‌লেই বুঝি লোকে ফাজিল হয়? কিন্তু সত্যই আমার বেশী সময় নাই, ওপাড়া যেতে হবে আর একবার। চিঠি-পত্র যা' দেওয়ার থাকে দিন।"

"অতো কষ্ট করবার দরকার হবে না আপনার। যদি দেখা হয় বল্‌বেন ভালোই আছি।"

"বেশ, চলি তা' হলে।"

"শুনুন", কাকীমা একটু ইতস্ততঃ কোরে বললেন, "আপনার কাকার সঙ্গে সত্যিই কি আপনার আজকাল আর দেখা হয় না? যে আসে তার মুখেই তো ঠিক এই কথা শুনি।" মুহূর্তের জন্য আমার চোখ কাকীমার চোখের ওপর পড়লো। আর তিনি তৎক্ষণাৎ চোখ নামিয়ে নিলেন। বল্‌লাম, "মাঝে মাঝে হয় বই কি। আর একটা দোকান খুলেছেন পুরাণো বাজারে, তা ছাড়া আছে সেয়ার মার্কেট, আছে হিন্দুস্থানের এজেন্সী এবং আরো যে কী কী আছে তা' আমি ভালো কোরে জানিনে। সব সময়েই ব্যস্ত থাকেন আজকাল।"

"কিন্তু বাড়াবাড়িও আছে। আজকাল চিঠি লেখেন কেমন জানেন?"

"কী কোরে জানবো? আজকাল তো চিঠি আপনি আর দেখান না!"

"কী কোরে দেখাবো? আপনি তো রীতিমতো সহরের লোক হোয়ে গেছেন। ছুটি ছাটাতে যদিই বা আসেন, আমাদের বাড়ীতে ভুলেও আসেন না। যার কাছে আসবেন আপনি তিনি তো আর আসেন নি।"

"আচ্ছা, এবার কোলকাতা গিয়েই আমার প্রথম কর্ত্তব্য হবে তিনি যাতে তাড়াতাড়ি চলে আসেন তার ব্যবস্থা করা।"

কাকীমা এ কথার জবাব না দিয়ে বললেন, "তা' ছাড়া চিঠিতে আজকাল দেখাবার মতো কিছু থাকেও না। ছেঁড়া হ্যাণ্ডবিলের সাদা পিঠে হাত পেনসিল দিয়ে যেমন তেমন ভাবে কয়েক লাইন লিখে' কর্ত্তব্য সারেন আজকাল।"

হেসে বল্‌লাম, "ওরে বাপরে! একেই বলে careful-carelessness. এই অনাদর অযত্ন দেখাবার জন্য দিগিন কাকার কতো যত্ন কোরতে হয় জানেন? প্রথমতঃ হ্যাণ্ড-বিল পাওয়া মাত্রই ফেলে না দিয়ে একখানা অন্ততঃ মনে কোরে পকেটে রাখতে হয়। তারপর তিনি ফাউন্টেন পেন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে লেখেন না, কোন পেনসিল তাঁর নেই এবং কিনলেও একদিনের বেশী নিশ্চয়ই রাখতে পারেন না। তাই প্রত্যেকবার চিঠি লেখার সময় তাঁকে কষ্ট কোরে আধ মাইল হেঁটে যেতে হয় ছুরি আর পেনসিল সংগ্রহ কোরবার জন্য। কারণ তাঁর দোকানের কাছে ধারে কোন ষ্টেসনারী দোকান নেই। সুতরাং ক্ষুব্ধ কিংবা শঙ্কিত হবার কিছুমাত্র কারণ নেই। এটা বিরাগ নয়, অনুরাগের নতুন রূপ।"

কাকীমা হেসে বল্‌লেন, "কথায় আপনার সাথে পারবার জো নেই। কিন্তু কোন কিছুতেই ভয় পাওয়ার বয়স অনেকদিন চলে গেছে। আপনিই তো বললেন আমার মাথায় প্রায় টাক পড়ে এসেছে, আর তাঁর মাথায় এখন টাকা। কিন্তু বুড়োবয়সে এ সব কী ছেলেমানুষী বলুন তো?"

"বুড়ো আপনারা কেউ এখনো হন'নি। ওটা নিতান্তই অহেতুক আত্ম-নিগ্রহ। তবে ধরেছেন ঠিক। দিগিন কাকার এ সব ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছুই না। কিন্তু মাঝে মাঝে ছেলেমানুষীও কি বেশ ভালো লাগে না? ধরতে গেলে আমাদের শৈশবটাই তো একমাত্র রোমান্টিক্। যৌবনে তো আমরা বৃদ্ধই হোয়ে পড়ি। কিন্তু চিঠিটিঠি কী দেবেন দিন।"

"চিঠি আপনি একখানা নেবেনই?"

"নিশ্চয়ই।"

"কিন্তু সত্যিই আমি কিছু লিখিনি।"

"বেশ। আজ রাত্রে লিখে কাল ভোরে পাঠিয়ে দেবেন আমাদের বাড়ীতে। আচ্ছা, চলি এবার। ভয় পাবেন না, ভাবড়াবার কিছু নেই। সব ঠিক হোয়ে যাবে।"

ছেলেমানুষি! না, আজকাল আর দিগিন কাকা কোনো ছেলেমানুষি করেন না। তিনি পুরোপুরি প্রাজ্ঞ হোয়ে উঠেছেন। যে ছেলেমানুষিটুকু থাকার জন্যই তিনি আমাদের কাছে লোভনীয় হোয়ে উঠেছিলেন, ছেলেবেলা থেকেই যার জন্য তাঁকে অতো ভালো লেগেছিল, সেই দিকটা তিনি বড়ো তাড়াতাড়ি হারিয়ে ফেলছেন; আর ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছেন আমার কাছ থেকে। কিছুদিন থেকে বেশ টের পাচ্ছি 'দেবত্বের' ওপর তাঁর আজকাল আর লোভ নেই, তিনি পেতে চান 'কুবেরত্ব'।

একটা জিনিস লক্ষ্য কোরেছি, দিগিন কাকা যখন যা' ধরেন তা বেশ আঁকড়েই ধরেন। দুর্লভ একনিষ্ঠা তাঁর আছে। ছেলেবেলায় দেখেছি তাঁর বই পড়া আর বই লেখার বাতিক। আমাদের বাড়ীতে যখনই আসতেন সব সময়েই তাঁর হাতে দেখতাম মোটা মোটা গ্রন্থাবলী। আমাদের বাড়ীতে বেশ নিরিবিলি পড়বার জায়গা আছে যা' তিনি নিজেদের বাড়ীতে পেতেন না। আর যেই আসতেন অমনিই তাঁর পিছু নিতাম। "মোটা গল্পের বইটা থেকে আমাকে গল্প পড়িয়ে শোনাতে হবে।"

"এ গল্প ছেলেদের জন্য নয়। এসব তুই এখন কিছুই বুঝ্‌তে পারবিনে"। দিগিন কাকা পরিত্রাণ পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌তেন। কিন্তু না শুনিয়ে পরিত্রাণ তিনি কোন দিনই পেতেন না। ক্রমে ক্রমে আমার সঙ্গে সাহিত্যালাপ তাঁর অভ্যাস হোয়ে এলো এবং ভালোই লাগ্‌তে লাগলো। একদিন তাঁর নিজের লেখা একটা গল্প আমাকে পড়িয়ে শোনালেন। তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন হোয়েছে বল্ দেখি।"

"সোৎসাহে বলে উঠলাম, "চমৎকার, গ্রন্থাবলীর গল্পের চেয়ে অনেক—অনেক ভালো।"

"তাই না কি?" দিগিন কাকার মুখ উজ্জ্বল হোয়ে উঠলো।

আমাদের অন্তরঙ্গতা ঘনিষ্ঠতর হোতে লাগলো। চমৎকার লোক! একেই বলেই 'কাকা!' মণি কাকার মতো বই বল্‌তে শুধু গ্রামার, ট্রান্‌স্লেসন, আর পাটীগণিত বুঝেন না ইনি। এঁর কাছে বই মানে সব বড়ো বড়ো গল্পের বই। এই সব বই থেকে প্রশ্ন থাকলে আমি নিশ্চয়ই ফার্ষ্ট হোতে পারি।

তারপর কদিন আর দিগিন কাকাকে দেখিনে। মণি কাকার কাছে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর কথা। তিনি বল্‌লেন "তার দাদার সঙ্গে রাগারাগি কোরে কদিন হোলো সন্ন্যাসী হোয়ে চলে গেছে। আমার কাছে চিঠি দিয়েছে, গয়ায় আছে এখন হতভাগা।"

ভয়ানক বিশ্রী লাগতে লাগলো শুনে। গয়া, সে আবার কোথায়? দিগিন কাকা মাঝে মাঝে কোল্‌কাতা যেতেন এই তো জানি। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা কোরলাম, "গয়া কোথায় মণি কাকা?" মণি কাকা ধমকে উঠলেন, "গয়া কোথায়? আমাকে জিজ্ঞেস করছিস্? লজ্জা করে না? ভারতবর্ষের ভুগোল পড়ায় না তোদের আজকাল ক্লাস সিক্সে? যা' এখনি এ্যাটলাস্ খুলে দেখ্ গিয়ে।"

অনেক খুঁজে খুঁজে গয়া পাওয়া গেলো। এতো আনন্দ

লা! যেন দিগিন কাকাকেই পেলাম ফিরে। যে যার
াকেই ডেকে দেখাতে লাগলাম "এই যে গয়া। ঠিক
ইখানেই আছেন দিগিন কাকা আজকাল।" পেন্‌সিল্‌
য়ে বেশী দেখাতে দেখাতে মানচিত্র থেকে 'গয়া' একটা
াট ছিদ্রের মধ্যে চিরতরে অদৃশ্য হোয়ে গেলো। কিন্তু
িগিন কাকা বেশীদিন অদৃশ্য রইলেন না। কদিন পরেই
াবার দেখা দিলেন। শুধু 'গয়া' নয় ভারতবর্ষের ভূগোলের
নেক ভালো ভালো জায়গাই তিনি ঘুরে এসেছেন। মণি
াকার কাছে বসে বসে গল্প করতে লাগলেন। এতে
িনি আমার কাছে আরও চমৎকারতর হোয়ে উঠলেন।
কী সাংঘাতিক লোক! আদর্শ ভূগোলের ভারতবর্ষ
ধ্যায়ের সব বড় অক্ষরে লেখা জায়গাগুলিই দিগিন কাকা
েখে এসেছেন!

তারপরে একদিন চমৎকারতম খবর পাওয়া গেলো,
িগিন কাকার বিয়ে, খবরটা অবশ্য আমার কাছে তেমন
নোহর মনে হলো না, কেনোনা দিগিন কাকা এর আগে
নেকদিন আমার কাছে বলেছিলেন তিনি কোন দিন
িয়ে কোরবেন না। আমি প্রত্যেকবার প্রতিধ্বনি কোরতাম
আমিও না"। কী কোরবেন? দেশের কাজ কোরবেন,
ই লিখবেন, এবং সমস্ত পৃথিবী ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন।

"সমস্ত? এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা—"
িগিন কাকা ফিল আপ কোরে বললেন, "আর অষ্ট্রে-
লিয়া, সব।"

"আমি নিশ্চয়ই সঙ্গে থাক্‌বো।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, তা' ছাড়া আর সঙ্গী পাবো
কাকে?"

সেই দিগিনকাকা শেষ পর্যন্ত বিয়ে কোরলেন। দেশের
কাজ কোরলেন না, বই লিখলেন না, পৃথিবী বেড়ালেন না,
শুধু বিয়ে কোরলেন। এবং তার পরেই দিগিনকাকাকে
প্রায় হারালাম। তিনি আজকাল মাঝে মাঝে ক্বচিৎ
কখনো আসেন, কিন্তু তাঁর হাতে আর বই নেই মুখেও
বইর কথা নেই। আমাকে এসে জিজ্ঞেস কোরলেন,
'কীরে কাকীমা পছন্দ হোয়েছে তো?' ঘাড় নাড়লাম।
কারণ কী কোরে যেন বুঝতে পারলাম আমার তেমন পছন্দ
না হোলেও তাঁর খুবই পছন্দ হোয়েছে। দিগিনকাকাকে
গুন্‌ গুন্‌ কোরতে শুনলাম

"জীবনের বাটে ঘাটে বাজাইছে বেণু
রেণু।"

আফ্রিকা আমেরিকা আর অষ্ট্রেলিয়া সবই রাহু বাড়ীর
একখানা 'ছোট জীর্ণ টিনের' ঘরের মধ্যে ধরা পড়ে গেলো,
দিগিনকাকার যথার্থ একনিষ্ঠা আছে।

পৌছলাম কোলকাতায়। বাঁচা গেলো, অনেক দিন
কোলকাতা থাকার পর গ্রামে মাঝে মাঝে অবশ্য যেতে ইচ্ছা
করে, কিন্তু দু'দিন গ্রামে থাকলেই তৃতীয় দিনে ফিরে
আসতে ইচ্ছা করে আবার কোলকাতায়। গ্রামের একমাত্র
আকর্ষণ ভান্ডার বাজারের খাঁটি দুধ আর টাট্‌কা মাছ।
আর কী আছে গ্রামে? অবশ্য কোলকাতায় যখন থাকি
তখন মনে হয় আর কিছু না থাক্‌লেও গ্রামের এখনো যা'
আছে তা অতুলনীয়, কোলকাতায় তা' মাথা কুটলেও মিলবে
না, যতো রসই থাক না সব কিছুর মূলে রসনা। কিন্তু
গাঁয়ে ফিরলে দু'দিনেই এ কথা ভুলে যাই। কোলকাতার
জন্য আবার মন চঞ্চল হোয়ে ওঠে। দিগিন কাকারও
শুনেছি তাই, তাঁর মতেও কোলকাতার মতো জায়গা আর
নেই। কিন্তু আশ্চর্য্য, আর এক দিক দিয়ে তিনি আমার
সম্পূর্ণ বিপরীত। কোলকাতায় যখন থাকেন তখন তাঁর
সদরদির কথা একেবারে মনেই থাকে না। আবার যখন
গাঁয়ে ফেরেন তখন কোলকাতাকে একেবারেই ভুলে যান।
আসার সময় পঞ্জিকায় ভালো দিন পেতে অনেক দেরী
হোয়ে যায়। তারপর ভালো দিন যদি-বা মেলে সেদিন
শরীর কিছুতেই ভালো থাকবে না কিংবা ভান্ডার গিয়ে
মোটর কি লঞ্চ ধরবার জন্য নৌকা ঠিক কোরতে ভুলে
যাবেন। একটা না একটা বিভ্রাট সে দিন ঘটবেই। আর
একটা ভালো দিন যদি কোন রকমে এভাবে ফসকে যায়
তারপরে আবার দীর্ঘ দিন ধরে চলে যাত্রার পক্ষে অশুভ
দিনের পালা। এও হয়তো দিগিন কাকার একনিষ্ঠা
যখন যা তাঁর ভালো লাগে তখন একমাত্র তাই তাঁর ভালো
লাগে, তাতেই তিনি ভুলে থাকেন। আর কিছুর কথা
তখন আর তাঁর মনে থাকে না।

"এই যে কবে এলি!"

প্রণাম কোরে বললাম, "ভোরে, তারপরে, ভালো আছেন তো!"

দিগিন কাকা বললেন, "এই কেটে যাচ্ছে কোনো রকমে। বাড়ীর সব ভালো?"

"হ্যাঁ, সেখানেও কেটে যাচ্ছে কোন রকমে, চিঠিপত্রটত্র দেন না কিছু একেবারে! কাকীমা—"

দিগিন কাকা থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আগে বোস্ ওখানে, তার পরে ধীরে ধীরে সব শোনা যাবে। পরাণ, ওই ফোল্ডিং চেয়ারটা পেতে দাও তো এখানে। তারপর, রাইটার্স বিল্ডিংএর অর্ডারগুলি সব ঠিক কোরে রেখেছ তো পরাণ? টেবিল কটা পালিশ কোরতে এখনও বাকি আছে বুঝি! কী যে করো—এতো শ্লো হোলে কি কাজ চলে?"

ইঙ্গিত বোঝা গেলো। পারিবারিক ব্যাপার দোকান ঘরে বসে ডিসকাসন কোরতে যাওয়া অশোভন অনার্জনীয়। খেয়াল ছিলো না।

তারপর দিগিন কাকা অনেকক্ষণ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে বৈষয়িক আলাপে ডুবে রইলেন। আজ যে তিনি আর কিছু মাত্র অবসর পাবেন তা মনে হোলো না। এক ফাঁকে বললাম, "আমি তা হোলে চলি, আর একদিন আসা যাবে।"

দিগিন কাকা মাথা নেড়ে বললেন, "না, দাঁড়া এক মিনিট, আমিও বের হবো।" তারপর দিগিন কাকা প্যাড খুলে কয়েকটা চিঠির ড্রাফট কোরতে বসলেন, তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। দিগিন কাকার চোখ তখন প্যাডে। প্রত্যহ সেভ কোরে কোরে দাড়ির রঙটাই মুখের রঙে দাঁড়িয়েছে। আর মনে হোলো কেমন একটা কাঠিন্যের ছাপ এসে পড়েছে মুখের সর্ব্বত্র। কেমন একটা রুক্ষতা। মনে হোলো এ মুখ সেই অকেজো গাল্পিক দিগিন কাকার নয়। কাজের ভিড়ে তিনি হারিয়ে গেছেন। অথবা এই হয়তো প্রৌঢ়ত্বের চিহ্ন। দিগিন কাকাও ক্রমে ক্রমে প্রৌঢ় হোয়ে পড়লেন। সেই দিগিন কাকা! এই সেদিনও যিনি পেয়ারা গাছের আগ ডালে গিয়ে পাকা পেয়ারা পেড়ে এসেছেন। আর এর পরের ষ্টেজই তো বার্দ্ধক্য। দিগিন কাকাও ক'দিন পরে বৃদ্ধ হবেন। বুড়ো হোলে কেমন দেখাবে দিগিন কাকাকে? মানাবে কি? মানাবে বই কি। একভাবে না একভাবে মানিয়ে যাবেই, এই যেমন প্রৌঢ়ত্বের গাম্ভীর্য্যও তাঁকে মানাচ্ছে। বড়ো আশ্চর্য তো! দিগিন কাকা ঘৃণা কোরতেন কাজের মানুষকে। দিগিন কাকা ঘৃণা কোরতেন বুড়োদের। তাঁর চেয়ে যারা মাত্র দু'এক বছরের বড়ো তাঁদেরও দিগিন কাকার বুড়ো মনে হোতো। তিনি বলতেন যৌবনই জীবন। যৌবন চলে গেলে তারপর আর বাঁচবার কোন মানে হয় না। আজ হয়ত কথাটা আবার ঘুরিয়ে বলবেন, 'যৌবন দেহে নয় মনে, যৌবন কর্ম্মে অর্থোপার্জনে।' একথাও দিগিন কাকার মুখে অশোভন শোনাবে না, এই নীতি-গর্ভ কথাগুলিও তাঁর মুখে বেশ মানিয়ে যাবে। এই তো স্বাভাবিক। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মত বদলায়, চিন্তাধারা বদলায়, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বদলায় মুখের চেহারা, সবই মানিয়ে যায়। কিন্তু তবু যেন মন খুঁৎ খুঁৎ করে। সব রকম পরিবর্ত্তনে মন সায় দেয় না। যে লোক চিরকাল ভাঁড়ামি কোরে এসেছে তাকে যদি হঠাৎ ভারি হোয়ে যেতে দেখি, ভালো লাগে না, তার গাম্ভীর্য্য অপরাধ বলে মনে হয়। এতো কাল যে লঘু হাস্যরস পেয়ে এসেছি আজও তার কাছে তাই চাই। অন্য ভালো কিছু দিতে গেলেও তার কাছ থেকে তা' নিতে ভরসা হয় না, মনে হয় এ তার অনধিকার চর্চ্চা, এটা সে ভালো পেরে উঠবে না।

পরিবর্ত্তন আমরা চাই কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে অপরিবর্ত্তনীয়তারও আমাদের লোভ আছে। শৃঙ্খলার উপর পক্ষপাতিত্ব আছে। মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমাদের এম-ই স্কুলের থার্ড মাষ্টার জগদানন্দবাবুকে নাগেদের বাজারে দেখে ভয়ানক অবাক হোয়ে গিয়েছিলাম। মণি কাকাকে বিস্মিতভাবে জিজ্ঞেস কোরেছিলাম "মাষ্টার মশাইদেরও আবার বাজার কোরতে হয় না কি?" মানে, স্কুলের বাইরে মাষ্টার মশাইদের যে শারীরিক অস্তিত্বও থাকতে পারে তা' তখন ভাবতে পারিনি। এখনও অভ্যস্ততার সেই সঙ্কীর্ণতা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পেরেছি কি? ডাক্তার স্কুলের

সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাইর মুখে সেদিন অকস্মাৎ রবিঠাকুরের কবিতার প্রশংসা শুনলাম, তাঁর কবিতার একাধিক উদ্ধৃতিও শুনলাম, চমক্ লাগলো কিন্তু ভালো লাগলো না। মনে হোলো সংস্কৃত শ্লোক যেমন ভালো শোনা যায় তাঁর মুখে এ যেনো তেমন হোলো না

দিগিন কাকার চিঠি লেখা শেষ হোয়েছে এতোক্ষণে। বললেন, "পণ্টু, তোর একটা জিনিস্ আজও গেলো না।"

"কী?"

"অমনোযোগিতা বা অতি-মনোযোগিতা। পারিপার্শ্বিককে গ্রাহ্যই কোরতে চাস্না। তা' যেন তোর চোখেই পড়ে না। কোলকাতার রাস্তায় এভাবে এক নিজের নাকের দিকে তাকিয়ে চলতে গেলে তো মুসকিল। কোন্ দিন গাড়ী চাপা পড়বি তার ঠিক নেই। চারদিক্ দেখে পথ চলতে হয় এবং কথা বলতে হয়।"

"আমি যদি বলি এ অভিযোগটা আপনার সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য। আপনিও ঠিক নিজের নাকের কথাই মনে রাখেন। অন্যেরও যে নাক থাকতে পারে তা' ভেবেও দেখেন না।"

দিগিন কাকা কথা ঘুরিয়ে নিলেন, এবং তীক্ষ্ণ একটু হেসে বললেন, 'ঘুসি তোলার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য অন্যের নাকের কথা মনে পড়ে, আর ঘুসিটা ঠিক নির্ঘাত যথাস্থানেই পড়ে যদি সে নাকটা একটু বেশী লম্বা হোয়ে উঠে আপন অধিকারের সীমানা ছাড়িয়ে যায়।"

ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম, "আগে তো আপনি এতো অসহিষ্ণু ছিলেন না দিগিন কাকা। কান মলা, বড়ো জোর দু' একটা চড় চাপড়ই দিতেন, তাও দীর্ঘ নাসিকার জন্য নয়, অন্য কারণে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ঘুষি তুল্তেও আজকাল শিখেছেন। নাকটা কী জানি হয়তো একটু দীর্ঘ হোয়ে পড়তেও পারে বা, মাপ কাঠি যে আপনার এতো ছোট হোয়ে গেছে তা জান্তাম না। যাহোক্ দীর্ঘ হোক, হ্রস্ব হোক্ নিজেরই তো নাক বাঁচাবার চেষ্টা করাই বোধ হয় ভালো, অতএব চলা যাক।" পা বাড়ালাম, দিগিন কাকা তাড়াতাড়ি হাত ধরে টেনে বসালেন আবার। 'আরে চটে গেলে নাকি? কোথাকার বোকা?" বহু দিনের পুরানো সুর। মনে হোলো, অতীতের দিগিন কাকা আবার ফিরে এসেছেন।

বল্লাম, "না, চট্বার কি আছে? তবে কাজ দিন।"

"কী কাজ? পড়াশুনো! সে ভালো। মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনোই করো বাপু, যে দিনকাল পড়েছে আজ কাল। ও সব কাব্য সাহিত্য আজ কাল রেখে দাও যদি বেঁচে থাকতে চাও।"

"সবই ছেড়ে দিচ্ছি কাকা, পড়াশুনোও। কী হবে ও দিয়ে! বাঁচ্তে গেলে ঘুসি আর পালিসের কাজই এখন একমাত্র শেখা দরকার।"

দিগিন কাকা একটু স্নিগ্ধ হাস্লেন। বোঝা গেলো তিনি ক্ষমা কোরলেন। আজকাল দিগিন কাকা মিষ্টভাষী না হোক মিতভাষী হওয়ার চেষ্টা ক'রছেন মনে হয়। হাসি দিয়েই অনেক সময় কথা বলার কাজ সার্তে চান। তাতে সুবিধা আছে। এ কথা মনে করা ভুল দিগিন কাকা তৎক্ষণাৎ ঠিক যথাযথ কথা খুঁজে পেলেন না বলেই হাস্লেন। বল্লেন, "এক সময় আমাদেরও এ দিন ছিল। কিছু সহ্য কোরতে পারতাম না, বিশেষতঃ আদেশ আর উপদেশ। কিন্তু আজ মনে হয়, জীবনে এ সবেরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে শ্রদ্ধার, বিনয়ের, সহিষ্ণুতার।"

বল্লাম, "দিগিন কাকা, আপনিও ধৈর্য্য ধরুন, সহিষ্ণু হোন। এই সব প্রয়োজনের কথা, আপনার বয়সে আমারও একদিন নিশ্চয়ই মনে হবে। কিন্তু আমার বয়সে এ সব প্রয়োজনের কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে পড়েনি সে কথাও একবার মনে কোরে দেখ্তে চেষ্টা করুন। একের অভিজ্ঞতা অন্যের কাজে লাগে না। তা' ছাড়া আপনার মন্ত্রশিষ্য আমাকে তো চিরকালই জানেন। দেখে কোনদিন শিখতে পারিনা, ঠেকে ও ঠকে শিখি।"

দিগিন কাকা আবার আপোষের হাসি হাস্লেন। তোর মাথা গরম হোয়ে উঠছে, চল বেড়িয়ে আসি।"

"চলুন।"

আমারও ক্লান্তি লাগছিল।

ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্ দিয়ে সোজা পশ্চিমে এগিয়ে যেতে লাগলাম আমরা। প্রথম দিকটায় তত ভিড় নেই। কিন্তু সামনে যত এগিয়ে যাই ততো বাড়ে সমৃদ্ধি আর ততো বাড়ে ভিড়। বৈদ্যুতিক দীপ্তি ক্রমে ক্রমে উজ্জ্বলতর হোয়ে উঠছে। মোড়ে এসে থাম্‌তে হোলো। অবিশ্রান্ত ট্রাফিকের তীক্ষ্ণ স্রোত। দিগিন কাকা বল্‌লেন, "এই আসল কোল্‌কাতা। কিন্তু এ আমাদের জন্য নয়।" চাপা নিঃশ্বাসে শোনা গেলো।

বললাম, "হোতে কতোক্ষণ? ধর্ম্মতলা থেকে চৌরঙ্গী আস্‌তে বেশীক্ষণ লাগবে না আপনার।"

"চল্ তাড়াতাড়ি পার হোয়ে যাই এক ফাঁকে।"

"কোথায় যাবেন?"

"গড়ের মাঠ দিয়ে খানিকটা হেঁটে আসি একটু চল।"

"এই শীতের রাত্রে? শুধু মাথা নয় সবই ঠাণ্ডা হোয়ে যাবে যে।"

কাকা অন্যমনস্ক ভাবে বল্‌লেন "চল্"।

কোলকাতা, আসল কোলকাতা পিছনে ফেলে আমরা এগিয়ে চললাম। অন্ধকার, অসাড় নির্জন মাঠ। ভিড় শুধু উপরে আকাশে। তারার ভিড়।

দিগিন কাকা কথা বলছেন না। শুধু আগে আগে হেঁটে চলছেন।

শীতের শিরশিরে তীক্ষ্ণ হাওয়ায় কাণ ছিঁড়ে যাচ্ছে। কোথায় চলেছি আমরা? পিছনে পিছনে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে দিগিন কাকা?

মনে পড়লো ছেলে বেলার আর এক রাত্রের কথা। ঘোড়দৌড় দেখে চোমরদির মাঠ আমরা পাড়ি দিচ্ছিলাম। ঠিক এই রকম অন্ধকারে, এই শীতের রাত্রে। একটা জায়গা ভূতের বাসস্থান বলে বিখ্যাত ছিলো। ভয়ে দিগিন কাকার হাত শক্ত কোরে ধরে তাঁর সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে চলছিলাম।

আজও আমার কেমন যেনো অদ্ভুত ভয় হোচ্ছে। ভূতের নয়, দিগিন কাকার।

দিগিন কাকা আমাকে বশীভূত কোরেছেন, জয় কোরে নিয়েছেন। অতীতের স্মৃতির কাছে আর বার্দ্ধক্যের কাছে আমি পরাজিত হোয়ে যাচ্ছি।

আমার তীক্ষ্ণতা আমার দৃঢ়তা কোন্ প্রয়োজনে এলো? শেষ পর্য্যন্ত আমাকে surrender কোরতেই তো হোলো, surrender কোরতে হোলো বার্দ্ধক্যের কাছে যৌবনকে।

দিগিন কাকার সঙ্গে দিগিন কাকার প্রদর্শিত পথে আমাকেও চলতে হোচ্ছে, আমাকেও চলতে হোচ্ছে সেই গতানুগতিক পুরানো' রাস্তায়।

আমার পাঁচ বছরের ভাইপো বেণুকে আমিও একদিন বলবো "আমিও তোদের মতোই একদিন ছিলাম।"

হাস্যকর করুণ কণ্ঠে, ওদের অনুকম্পা আকর্ষণ কোরে বলতে হবে "ওরে, আমিও তোদের মতোই একদিন ছিলাম।"

ওদের অবিশ্বাস, ওদের বিদ্রূপ, ওদের ঘৃণা আর অবহেলাকে শাস্তি দেওয়ার শক্তি থাকবেনা, থাকবেনা ক্ষমা কোরবার শক্তি, সহ্য কোরবার শক্তি।

দিগিন কাকা একদিন আমার মতোই ছিলেন, আর আমাকেও হোতে হবে একদিন দিগিন কাকার মতো।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র
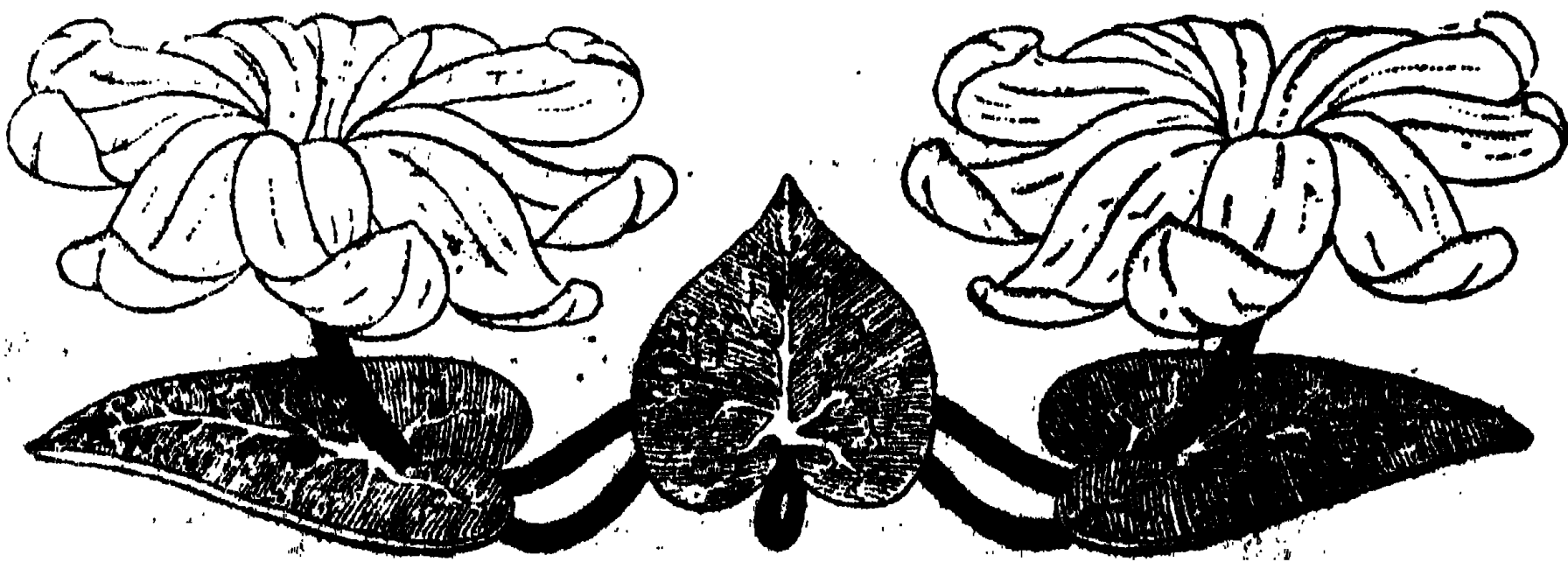
সাহিত্য

এস, ওয়াজেদ আলি, বি-এ (কেন্‌টাব), বার-এট-ল

সজাগ জীবনের কোন একটা অংশ নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবেন তাতে তিনটী জিনিস বর্ত্তমান আছে, যথা, Cognition বা জ্ঞান, Volition বা সঙ্কল্প, আর Feeling বা অনুভূতি। মানুষের ব্যষ্টি এবং সমষ্টিগত জীবন এই তিন মনোবৃত্তিরই অভিব্যক্তি; দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি হচ্ছে জ্ঞানের অভিব্যক্তি; সাহিত্য, সঙ্গীত, চারু-শিল্প প্রভৃতি হচ্ছে অনুভূতির অভিব্যক্তি; আর রাষ্ট্র, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি হচ্ছে সঙ্কল্পের অভিব্যক্তি। অবশ্য এ তিন মনোবৃত্তি পৃথক পৃথকভাবে আমাদের মনে অবস্থান করে না—এক সঙ্গে, অবিভাজ্যভাবেই তারা থাকে। এইজন্য তাদের সম্মিলিত ধারাকে Stream of consciousness বা চেতনার ধারা বলা হয়ে থাকে। তবে বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্য চেতনার এই তিনটী সূত্রকে পৃথক করে দেখা দরকার।

প্লেটো (Plato) বলেছেন—Philosophy begins in wonder—মানুষের বিস্ময় থেকেই দর্শন এবং বিজ্ঞানের উদ্ভব। দর্শন এবং বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে বিশ্বকে জানা, বিশ্বের বিভিন্ন উপকরণের সঙ্গে, বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে পরিচয় লাভ করা। সে কাজ হল, বিশেষ করে, Cognition বা জ্ঞানের, চিন্তা এবং পর্য্যবেক্ষণের। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত কাজ-কর্ম্ম আমরা Volition সঙ্কল্প বা ইচ্ছা শক্তির দ্বারা করে থাকি। জানবার সময় এবং কাজ করবার সময় আমাদের মনে অনুভূতি বা Feeling আসে। আমরা আনন্দিত কিম্বা বিষাদিত হই; আমাদের মনে সহানুভূতির কিম্বা ক্রোধের সঞ্চার হয়; আমরা গর্ব্বিত হই কিম্বা লজ্জিত হই। এই যে বিভিন্ন রকমের অনুভূতি এই থেকেই চারুশিল্প Fine arts, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা প্রভৃতি জন্ম লাভ করে।

কর্ম্ম-নিরপেক্ষ ভাবের অনুশীলনে মানুষ আনন্দ পায়; তার মনে উত্তেজনা আসে, সে উত্তেজনা সে উপভোগ করে। সুতরাং যে জিনিস থেকে সে এই উপভোগ্য উত্তেজনা এবং আনন্দ পায় তার কাছে সে যেতে চায়, অন্যকে তার কাছে নিয়ে যেতে চায়। তারপর আবার বিরলে বসে সে জিনিসের কথা সে ভাবতে ভালবাসে কেবল তাই নয়, সেই উপভোগ্য জিনিসের একটা প্রতীক তৈয়ের করে অন্যের কাছে উপস্থিত করতে সে অন্তরে একটা আগ্রহ অনুভব করে। তাই সে গাইতে চেষ্টা করে, ছবি আঁকতে চেষ্টা করে, মনের কথা লিখে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। এইভাবে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। অন্যান্য চারু-শিল্পের মত মুখ্যতঃ ভাবকে নিয়েই সাহিত্যের কারবার।

তবে ভাব কোন একটা বিষয়-বস্তুকে অবলম্বন করেই আমাদের চেতনায় দেখা দেয়। ভাবের এই বিষয়-বস্তু বাইরের জগতের জিনিসও হতে পারে, আর আমাদের কল্পনার কিম্বা চিন্তার জিনিসও হতে পারে। বাইরের জিনিসই হোক, আর কল্পনার জিনিসই হোক, ভাবের মূল্য একান্তভাবে তার বিষয়-বস্তুর উপরই নির্ভর করে। বিষয়-বস্তু নিন্দনীয় হলে ভাব নিন্দনীয় হয়, আর বিষয়-বস্তু প্রশংসনীয় হলে ভাবও প্রশংসনীয় হয়। ভাবের নিজস্ব বিশেষ কোন নৈতিক মূল্য নাই। আমি যদি আমার প্রতিবেশীর দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখে আনন্দিত হই, তা হলে সে ভাব নিন্দনীয়; আর আমি যদি ধর্ম্মের কিম্বা সত্যের জয় দেখে আনন্দিত হই, তা হলে সে ভাব প্রশংসনীয়। পক্ষান্তরে আমি যদি আমার প্রতিবেশীর সুখ এবং শ্রীবৃদ্ধি দেখে আনন্দিত হই সে ভাব প্রশংসনীয়; আর আমি যদি সত্যের এবং ধর্ম্মের লাঞ্ছনা দেখে আনন্দিত হই, তা হলে সে ভাব নিন্দনীয়। সুতরাং একই ভাব বিষয়-বস্তু ভেদে কখনও প্রশংসনীয় এবং কখনও নিন্দনীয় হয়।

তাই যদি হয় তা হলে Art for Arts sake কথাটা ঠিক নয়। কেন-না আর্টের কারবার ভাবকে নিয়ে, আর ভাবের মূল্য নির্ভর করে তার বিষয়-বস্তুর উপর। আমাদের বলা উচিত Art for humanity's sake, অর্থাৎ মানুষ শিল্পের জন্য নয়, শিল্প হচ্ছে মানুষের জন্য। মানুষ সাহিত্যের জন্য নয়, সাহিত্য হচ্ছে মানুষের জন্য। কোন্ সাহিত্য প্রশংসনীয়, আর কোন্ সাহিত্য প্রশংসনীয় নয়, তার বিচার করবার আগে আমাদের স্থির করতে হবে কোন্ জিনিসটা কাম্য, আর কোন্ জিনিসটা কাম্য নয়—মানুষের জন্য।

সাহিত্যের মূল্য যেমন তার বিষয়-বস্তুর উপর নির্ভর করে, তেমনি তার উপকরণের উপরও নির্ভর করে। মনের আদর্শের একটা মাটির মূর্ত্তির চেয়ে তার মার্ব্বেল পাথরের মূর্ত্তির মূল্য বেশী। ইটের ঘর যতই ভাল হোক, সেই একই ঘর যদি পাথরের হয়, তা হলে তার মূল্য অনেক বেশী।

মানুষের মঙ্গলই হবে সাহিত্যের লক্ষ্য, আর সেই লক্ষ্য সাধনের জন্য সাহিত্যিককে শ্রেষ্ঠতম উপকরণ নির্ব্বাচন করতে হবে, আর যথাসম্ভব তারই ব্যবহার করতে হবে। উচ্চতম আদর্শ এবং শ্রেষ্ঠতম উপকরণের সাহায্যে বিমল আনন্দের পরিবেশন—এই হল সাহিত্যিকের কাজ।

মানুষের মঙ্গল আর বিমল আনন্দের পরিবেশন এই হল সাহিত্যের কাজ। তাই যদি হয়, তাহলে শ্রেয়ের সঙ্গে, কাম্যের সঙ্গে সাহিত্যিককে পরিচিত হতে হবে। তার জন্য দরকার জ্ঞান-সাধনার, গভীর অন্তর-দৃষ্টির। জ্ঞানের সাধনা সাহিত্যিকের জন্য অপরিহার্য্য। জ্ঞানের বর্ত্তিকার সাহায্যেই মঙ্গলের পথ তাকে বার করতে হবে; আর লেখনীর সাহায্যে পাঠকের জন্য সে পথকে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

ভাবের ব্যঞ্জনার উপরই সাহিত্যিকের সাফল্য নির্ভর করে; সুতরাং ভাবের অনুশীলনে সাহিত্যিককে আত্ম-নিয়োগ করতে হবে। সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখা, ভাল ভাল বই পড়া, ভাল ভাবের স্রোতে গা ঢেলে দেওয়া, এই রকম বিভিন্ন উপায়ে ভাবের অনুশীলন করতে হবে। আগেই বলেছি, ভাব বিষয়-বস্তুকে অবলম্বন করেই আত্ম-প্রকাশ করে; আর ভাবের মূল্য তার বিষয়-বস্তুর উপর নির্ভর করে। সুতরাং বিষয়-বস্তু নির্ব্বাচনে জ্ঞানের, Cognition-এর সম্যক ব্যবহার করতে হবে।

পৃথিবীতে মানুষ হল রাম, কিম্বা রহিম, কিম্বা রবার্টস; যেমন ফুলের মধ্যে আছে—গোলাপ, কিম্বা বেল, কিম্বা গন্ধরাজ। সাধারণ মানুষ, কিম্বা সাধারণ ফুল বলে কোন একটা জিনিস পৃথিবীতে নাই। তবে বিভিন্ন ফুলের মধ্যে যেমন কতকগুলি গুণ পাওয়া যায়, তেমনি সাধারণ মানুষের মধ্যেও কতকগুলি গুণ পাওয়া যায়। গোলাপকে যদি বলা হয় তোমার নিজের বিশেষত্ব বর্জ্জন কর, ফুলের সাধারণ বিশেষত্ব প্রকাশ কর, সে কাজ সে কখনও করতে পারবে না; সে চেষ্টা করলে মৃত্যু তার অনিবার্য্য। কোন মানুষকেও সেইরূপ যদি বলা হয়, তোমার নিজের বিশেষত্ব বর্জ্জন করে সাধারণ মানুষের বিশেষত্ব প্রকাশ কর, সে কাজও সে করতে পারবে না। কেন-না, নিজেকে কেউ ছাড়তে পারে না। সে নিজেকেও প্রকাশ করবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষকেও প্রকাশ করবে নিজের দ্বারাই সাধারণ মানুষকে প্রকাশ করবে। এই হল জীবনের রীতি। সাহিত্যিক যদি তার সাধনা সার্থক করতে চায়, তা হলে নিজেকে তাকে চিনতে হবে এবং প্রকাশ করতে হবে। তার দৃষ্টিকে অন্তরমুখী করতে হবে। তাকে Introspection করতে হবে; নিজের মধ্যে তাকে ডুব দিতে হবে।

মানুষ রাম, কিম্বা রহিম, কিম্বা রবার্টস হিসাবে এক একটি স্বতন্ত্র জীব। তার আবার নিজস্ব একটা বেষ্টনীও আছে। সে হিন্দু, কিম্বা মুসলমান, কিম্বা খৃষ্টান। সে ভারতবাসী, কিম্বা আরব, কিম্বা ইংরাজ; তার গায়ের রং সাদা, কিম্বা কাল, কিম্বা হলদে। উচ্চ শ্রেণীতে তার জন্ম, কিম্বা নিম্ন শ্রেণীতে। সে ধনী, কিম্বা নির্ধন ইত্যাদি।

গাছ যেমন মাটি, সার, আবহাওয়া, বেষ্টনী প্রভৃতির প্রকৃতি অনুসারে বাড়ে, তাদেরই প্রকৃতি অনুসারে যেমন তার আকার-প্রকার হয়, মানুষের বিশেষত্বও তেমনি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাকে আত্ম-প্রকাশ করতে হলে, পরিপূর্ণভাবে নিজেকে ব্যক্ত করতে হলে, তার পারিপার্শ্বিক বিশেষত্বকেও ব্যক্ত করতে হবে,

প্রকাশ করতে হবে। তা যদি সে করতে না পারে, তাহলে তার আত্ম-প্রকাশের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে করতে হবে। আমরা যেমন রূপ, রস, গন্ধহীন ফুলের কল্পনা করতে পারি না, তেমনি বিশেষত্বহীন মানুষেরও কল্পনা করতে পারি না। ফুলকে যেমন তার বেষ্টনী অবলম্বন করে আত্ম-প্রকাশ করতে হয়, মানুষকে—তথা সাহিত্যিককেও তেমনি তার বেষ্টনী অবলম্বন করে আত্ম-প্রকাশ করতে হবে।

ভাল ফুল পেতে হলে অনেক কিছু করতে হয়। ভাল মাটি চাই, ভাল সার চাই, জল সরবরাহের যথোচিত ব্যবস্থা চাই, ভাল মালী চাই, আলো-ছায়ার আসা-যাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখা চাই, আরও কত কিছুর সংস্থান করা চাই। তারপর আবার ভাল জাতের বীজ কিম্বা ভাল জাতের চারা পাওয়া চাই। সাহিত্যের জন্যও এই ভাবের আয়োজনের দরকার।

প্রকৃতি-দত্ত প্রতিভা না থাকলে কেউ সাহিত্যিক হতে পারে না। তারপর উপযুক্ত শিক্ষার, উপযুক্ত দীক্ষার প্রয়োজন। আমরা নিজেদের মুসলমান বলে মনে করি, নিজেদের ভারতবাসী বলে মনে করি, নিজেদের বাঙালী বলে মনে করি, আর সর্ব্বোপরি নিজেদের মানুষ বলে মনে করি; আমাদের সাহিত্যে, আমাদের এই সবগুলি বিশেষত্বকেই সম্যকরূপে ফুটিয়ে তুলতে হবে, তা না হলে আমাদের সাহিত্য-সাধনা সার্থক হবে না, তার মধ্যে বড় একটা অভাব, বড় একটা শূন্যতা থেকে যাবে।

কেউ মনে করবেন না আমি সাহিত্যিককে গোঁড়া মুসলমান, কিম্বা গোঁড়া ভারতবাসী, কিম্বা গোঁড়া বাঙালী হতে বলছি। গোঁড়ামী সর্ব্বথাই বর্জ্জনীয়, বিশেষতঃ সাহিত্যে। গোঁড়ামীর সংকীর্ণতা এবং অনুদারতা সাহিত্যে যত কম আসে ততই ভাল। অনেকে হয়তো বলবেন, আমি তাহলে নিজেই নিজের প্রতিবাদ করছি। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তা নয়। গোঁড়া ধার্ম্মিক প্রকৃতপক্ষে ধার্ম্মিক নয়, সে হল ধর্ম্মের একটা বিকৃত প্রতিচ্ছবি, ইংরাজিতে যাকে বলে Caricature। সেই রকম গোঁড়া ভারতবাসী কিম্বা গোঁড়া বাঙালীও প্রকৃত দেশ-প্রেমিক নয়; সেও হল দেশ-প্রেমের বিকৃত প্রতিকৃতি—Caricature! এইখানেই মানবতার কথা আসে।

আমি মুসলমান সমাজের বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ; আমি ভারতবাসী বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ; আমি বাঙালী বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ। একটা গোলাপের গাছ যেমন সাধারণ উদ্ভিদের ধর্ম্ম অবহেলা করে গোলাপের গাছরূপে আত্ম-প্রকাশ করতে পারে না, তেমনি একজন মানুষও সাধারণ মানুষের ধর্ম্ম অবহেলা করে আদর্শ মুসলমান, আদর্শ ভারতবাসী, কিম্বা আদর্শ বাঙালী হতে পারে না। সে যদি তা হবার চেষ্টা করে তাহলে সে বিকৃত—বর্জ্জনীয় এক জীবে পরিণত হবে। পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষের ধর্ম্ম রক্ষা করে সে যদি মুসলমান হয়, কিম্বা ভারতবাসী, কিম্বা বাঙালী হয়, তাহলে লোকে তার সম্মান না করে থাকতে পারবে না। সাহিত্যিককে এই শেষোক্ত ধরণের মুসলমান, এবং ভারতবাসী এবং বাঙালী হতে হবে।

শিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাই মানুষের মধ্যে তারতম্যের সৃষ্টি করে। শিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাই ইংরাজকে ইংরাজ করেছে, মুসলমানকে মুসলমান করেছে এবং খৃষ্টানকে খৃষ্টান করেছে। শিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতিকূল হলে অনেক উচ্চাঙ্গের প্রতিভাও নষ্ট হয়ে যায়, আর শিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল হলে অনেক সাধারণ ধরণের মানুষও বড় বড় কাজ করতে পারে। ইংরাজেরা যে সাধারণতঃ আমাদের চেয়ে বেশী প্রতিভাশালী, সে কথা বলা যায় না। অথচ ইংরাজদের দেশে আমাদের দেশের তুলনায় অনেক বেশী বড় বড় লোক জীবনের সব বিভাগেই হয়ে থাকে। তার কারণ হচ্ছে ইংলণ্ডের শিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা, মানুষের প্রতিভার বিকাশের অনুকূল, আর আমাদের দেশের শিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার প্রতিভার বিকাশের অনুকূল নয়। এই গত একশত বৎসরে আমাদের দেশে বাঙালী হিন্দুর প্রতিভা যেভাবে বিকাশ লাভ করেছে, বাঙালী মুসলমানের প্রতিভা সেভাবে বিকাশ লাভ করতে পারেনি। প্রতিভার হিসাবে মুসলমান যে হিন্দুর চেয়ে নিকৃষ্ট তা নয়। তবে শিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা হিন্দুর প্রতিভার বিকাশের অনুকূল আর মুসলমানের প্রতিভার বিকাশের অনুকূল নয়। যথা

মুসলমানের শিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতিভার বিকাশের অনুকূল হবে, তখন মুসলমানদের মধ্যে প্রতিভার সম্যক বিকাশ দেখতে পাওয়া যাবে।

আমরা সাহিত্যের সাধক। আমাদের সমাজে আমরা সাহিত্যের সম্যক বিকাশ দেখতে চাই। সুতরাং নাগরিক হিসাবে, ভোটার হিসাবে এবং মুসলমান হিসাবে আমাদের বড় একটা কর্ত্তব্য আছে। সে কর্ত্তব্য হচ্ছে, এমন শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা এবং এমন পারিপার্শ্বিকতার সৃষ্টি করা, যার ফলে সাহিত্য-প্রতিভার সম্যক বিকাশ আমাদের সমাজে হতে পারে। এই আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের রাজনীতিকে পরিচালিত করতে হবে, আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা এবং সংস্কার করতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য যদি পরিষ্কার থাকে, তাহলে এখন এ কাজ করা তত কঠিন হবে না।

তবে মুসলমান বললে এখন আমাদের চোখের সামনে স্থবির এক মানবের ছবি ফুটে উঠে, যার চিন্তার প্রধান বিষয় হচ্ছে দাড়ি আর গোঁফের আকার-প্রকার, পোষাকের বিশেষত্ব, আর ধর্ম্মের খুঁটিনাটি ক্রিয়া-কর্ম্মের জটিল বিধি-নিষেধের সুদীর্ঘ তালিকা। সে এই সব অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ জিনিষকে অনাবশ্যক গুরুত্ব দিয়ে থাকে; সে ধর্ম্মে বাইরের আচার-অনুষ্ঠানের কথাই ভাবে, তার অন্তর্নিহিত সত্যের দিকে চেয়ে দেখে না। কোরবানী তার কাছে পশুর বলি ছাড়া আর কিছুই নয়; কোরাণ শরিফ তার কাছে একখানা Penal Code মাত্র। আল্লার রসুলের নাম সর্ব্বদা তার মুখে বটে; কিন্তু সে তাঁর অতুলনীয় সাধনার কথা, তাঁর বিমানবিহারী চিন্তার কথা, তাঁর নিহারিকার চেয়ে উচ্চ আদর্শের কথা কখনও ভাবে না। সে তাঁর সেই সব আচার-ব্যবহার প্রভৃতির কথাই ভাবে, যার উপর দেশের, সমাজের এবং যুগের ছাপ সুস্পষ্ট; যা বিশ্ব-মানবের জন্য নয়; যা চিরকালের জন্য নয়; যা সব দেশের এবং সব জাতির জন্য নয়। এই সব দেশ, কাল এবং সমাজ-সাপেক্ষ জিনিসগুলিকে নিয়েই সে তর্কাতর্কি করে, আর এই সবের চিন্তায় সে ভুলে যায় সেই সব অমূল্য জিনিসের কথা, যা দেশ, কাল এবং সমাজের বহু উর্দ্ধে। আল্লাকে সে মুসলমান সমাজের যুদ্ধপ্রিয় এক দলপতিরূপেই দেখে; তাঁকে বিশ্বের দয়ালু এবং ক্ষমাশীল প্রভুরূপে দেখে না; ইসলামের অমূল্য আদর্শকে সে মুসলমান সমাজের আদর্শরূপেই দেখে, বিশ্ব-মানবের আদর্শরূপে দেখে না। ইসলামকে সে বিশেষ এক সমাজের ধর্ম্মরূপে দেখে, বিশ্ব-মানবের চরম এবং পরম ধর্ম্মরূপে দেখে না; সে ভৌগোলিক আরব দেশকেই মানবের তীর্থরূপে দেখে, অন্তরের চিরন্তন আরবদেশকে মানবের তীর্থরূপে দেখে না; এক কথায় ইসলামের দেহটাকেই সে দেখে, তার অন্তরকে, তার অন্তর্নিহিত সত্যকে সে দেখতে পায় না।

সাহিত্যের কারবার এই আচারপন্থী মুসলমানদের নিয়ে নয়, তার কারবার হল আদর্শপন্থী মুসলমানদের নিয়ে; প্রাণহীন স্থবির মুসলমানদের নিয়ে নয়, জীবন্ত, চলন্ত মুসলমানদের নিয়ে; সাহিত্য জড়ের ধর্ম্ম প্রকাশ করে না, প্রাণের ধর্ম্মই প্রকাশ করে; সাহিত্যের কারবার ডোবাকে নিয়ে নয়, সমুদ্রকে নিয়ে, স্রোতস্বতীকে নিয়ে।

দুই শ্রেণীর মানুষ আছে, Static অর্থাৎ স্থবির, এবং Dynamic অর্থাৎ জীবন্ত। অবশ্য প্রত্যেক মানুষের মধ্যে—তথা প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে একটা স্থবির অংশ, এবং একটা জীবন্ত অংশ আছে। তা যদি না হতো, তাহলে জীবন চলতো না; কেন-না জীবনের মানেই হচ্ছে সঞ্চয় এবং গতি, Acquisition and movement। তবে কারও মধ্যে জীবনের অংশ বেশী, আর কারও মধ্যে স্থবিরত্বের, জড়ত্বের অংশটাই বেশী। বিশ্বের এমনই ব্যবস্থা যে, যার মধ্যে জীবনের অংশ Dynamic element বেশী, সেই উর্দ্ধে উঠে, আর যার মধ্যে জড়ত্বের ভাব Static element বেশী, সেই নীচের দিকে যায়।

সাহিত্য, আর্ট, দর্শন, বিজ্ঞান এ সবেরই দৃষ্টি হল উর্দ্ধমুখী। জীবন্ত মানবতার এ সবই হল বাইরের রূপ। স্থবির মানবের এ সব বালাই নাই। যা আছে তাই নিয়েই সে সন্তুষ্ট। নূতন কিছু সে চায় না, উপরে উঠিবার আগ্রহ তার প্রাণে নাই। জীবন্ত মানুষ যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। সে উপরে উঠতে চায়; জীবনকে ভাঙতে এবং গড়তে চায়। আর নূতন কিছু আনবার জন্য সে চিন্তা

করে, সাধনা করে। তার চিন্তা, তার সাধনা, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন প্রভৃতির রূপ নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করে।

আমি যে মুসলমান সাহিত্যিকের কল্পনা করি সে এই জীবন্ত Dynamic শ্রেণীর মানুষ হবে। সে বর্ত্তমানকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে না। নূতনের সৃষ্টির চেষ্টায় সে তন্ময় হয়ে থাকবে। নূতনের সে স্বপ্ন দেখবে, নূতনের সে ছবি আঁকবে, নূতনের সে আবাহন-গীতি গাইবে; সে হবে গতিশীল-জীবনের মূর্ত্ত একটী প্রতীক।

যেদিন থেকে জড়পিণ্ড (Inert matter) চলতে আরম্ভ করল, সেই দিন থেকেই বিশ্বের প্রকৃত ইতিহাস, Creative Evolution নূতনের সৃষ্টি, আরম্ভ হল। এই চলার পথে যে প্রাণী সময়ের প্রয়োজন মত যত নিজেকে পরিবর্ত্তিত করতে পেরেছে, সেই প্রাণীই তত দূর যেতে পেরেছে। কোন্ এক অপরিজ্ঞাত যুগে মানুষের জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়। যুগ-যুগান্তরের সংগ্রামের ফলে প্রাণী-জগতের সে রাজা হল, কেন-না তাদের বুদ্ধি ছিল বেশী, প্রয়োজন মত নিজেকে পরিবর্ত্তিত করবার শক্তি ছিল তার বেশী, তার উদ্ভাবন শক্তি ছিল বেশী, দলবদ্ধ হয়ে কাজ করবার শক্তি ছিল তার বেশী, আর দলের ভালর জন্য ত্যাগ স্বীকার করবার জন্য তার শক্তি ছিল বেশী।

মানুষের বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে, বিভিন্ন সমষ্টির মধ্যে, আবার জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ হল। কত জাত উঠল, কত জাত নামল; কত রাজ্য এল, কত রাজ্য গেল; কত সভ্যতা এল, কত সভ্যতা গেল। বিভিন্ন জাতের মধ্যে, বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে অবিরাম এক সংগ্রাম এখনও চলেছে এবং যতদিন এই পৃথিবী থাকবে, ততদিন চলবে; কেন-না এ সংগ্রাম স্বয়ং প্রকৃতিই নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছে, এ থেকে পালাবার উপায় নাই, একে বর্জ্জন করবার উপায় নাই, এর সঙ্গে অসহযোগ করবার পথ নাই। এই বিরামহীন সংগ্রামের অনিবার্য্যতার কথা যে প্রাণী ভুলে যাবে, যে মানুষ ভুলে যাবে, যে সমাজ ভুলে যাবে, সেই প্রাণীই মরবে, সেই মানুষই মরবে, আর সেই সমাজই মরবে। বাঘ আর মেষ এক ঘাটের পানি কখনও খাবে না, কেন-না, বাঘ মেষের মাংস খেয়ে তারপর পানি খাওয়াকেই বেশী যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করবে। মেষের পানি খাওয়া বাঘের পেটের মধ্যেই হবে। মশা-মাছি প্রভৃতি জীবদের মেরেই আমাদের এ বিশ্বে বাঁচতে হবে তা না হলে আমাদের মেরে তাঁরা বাঁচবে। এই পৃথিবীর আবাদের জমীর একটা সীমা আছে, আর মানবের ব্যবহার্য্য ভাণ্ডারেরও একটা সীমা আছে; কিন্তু মানুষের সংখ্যা-বৃদ্ধির কোন সীমা নাই, তার লোভের এবং লালসার কোন সীমা নাই, তার আশার এবং আকাঙ্ক্ষার কোন সীমা নাই। অন্তহীন, বিরামহীন সংগ্রাম তাই অনিবার্য্য। আর আবহমান কাল থেকে তাই চলে আসছে।

তবে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, এই অনিবার্য্য এবং অপরিহার্য্য সংগ্রামের ফলেই মানুষের বুদ্ধি বাড়ে, বিদ্যা বাড়ে শক্তি বাড়ে, সংহতি বাড়ে, সে উচ্চতর শ্রেণীর জীবে পরিণত হয়। বিপদের মধ্যেই জীবনের বিকাশ হয়, প্রতিভার এবং শক্তির স্ফুরণ হয়। যে জাতির জন্য সংগ্রাম শেষ হয়, সে জাতি পরাধীন হয়, যে জাতির জীবন মরণ পরের উপর নির্ভর করে, যে জাতির আত্মরক্ষার জন্য সাধনার প্রয়োজন হয় না, সে জাতি দ্রুত নিম্নপথগামী হয়; কি স্বাস্থ্যে, কি শক্তিতে, কি বিদ্যায়, কি বুদ্ধিতে, কি যুদ্ধে, কি শান্তিতে, কি ত্যাগে, কি সাধনায়, সর্ব্ববিষয়েই স্বাধীন, আত্ম-নিয়ন্ত্রণশীল জাতিদের তুলনায় সে জাতি তুচ্ছ, হীন, অকিঞ্চিৎকর। তুর্কি, জাপানী, ইরাণী প্রভৃতি স্বাধীন জাতির লোকদের সঙ্গে আমাদের পরাধীন ভারত-বাসীদের তুলনা করলেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করবেন। স্বাধীন এবং পরাধীন জীবনের এই অনতিক্রম্য প্রভেদ যে কেবল মানুষের মধ্যেই দেখা যায় তা নয়, পশু-পক্ষীর মধ্যেও এ প্রভেদ দেখতে পাওয়া যায়। একটা বন্য কুক্কুটের সঙ্গে, ঘরের একটা পোষা মুরগীর তুলনা করুন; একটা বন্য ছাগলের সঙ্গে, ঘরের পোষা ছাগলের তুলনা করুন, দুইয়ের প্রভেদ দেখে চমৎকৃত হবেন।

তবে পরাধীন জাতির মধ্যে যখন স্বাধীনতার জন্য আগ্রহ এসে দেখা দেয়, তখন সে জাতির মধ্যে ধীরে ধীরে স্বাধীন জাতির গুণাবলীর উন্মেষ হতে থাকে। এ যেন বসন্ত সমাগমে বিহঙ্গমের কাকলী। আমাদের যুগে আমাদের হিন্দু

প্রতিবেশীদের মধ্যে এই স্বাধীনতার আগ্রহ এসে দেখা দিয়েছে। আর তার ফলে তাদের সমষ্টিমূলক জীবন, ত্যাগের এবং সাধনার মহিমায় গরীয়ান্ হয়ে উঠেছে। আত্মোন্নতির উৎকর্ষের প্রচেষ্টা নিবিড়ভাবে তাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করেছে। স্থবিরত্বের কর্দ্দমাক্ত গলি ছেড়ে সাধনার রাজপথ বেয়ে তারা জীবন-পথে অগ্রসর হচ্ছে।

মুক্তির প্রচেষ্টার মধ্যেই সভ্যতার ইতিহাস অন্তর্নিহিত আছে। মুক্তির সাধনাতেই জলচর জীব শেষে গগন-বিহারী পক্ষীতে পরিণত হয়েছে, বানর শ্রেণীও জীব-মানুষে পরিণত হয়েছে, মানুষ পশুর হীন জীবন ছেড়ে সভ্যতার বিচিত্র উদ্যানে এসে পৌচেছে। মুক্তির সাধনা থেকেই উড়তে শিখেছে, সমুদ্র পার হতে শিখেছে, মাসেয় পথ ঘণ্টায় অতিক্রম করতে শিখেছে; মুক্তির সাধনা থেকেই দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে। মুক্তির সাধনা থেকেই ধর্ম্মেরও উদ্ভব। আত্মা তার জড়ের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে চায়, রিপুর বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে চায়, পারিপার্শ্বিকতার কারাগার থেকে মুক্তি পেতে চায়, দেহের দুর্ব্বলতা থেকে, দেহের সীমা থেকে মুক্তি পেতে চায়, অভাব থেকে মুক্তি পেতে চায়, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে চায়, সর্ব্বপ্রকার সীমার বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে চায়। এই মুক্তির চেষ্টা থেকেই আসে সৃষ্টি, বিকাশ, উন্নয়ন।

সাহিত্যিক হল জাতির পথ-প্রদর্শক—তার জীবন্ত জীবনের মুখপাত্র এবং প্রতীক। সাহিত্যিক যখন মুক্তির বাণী প্রচার করে, তখনই তার লেখা থেকে জলন্ত স্ফুলিঙ্গ বের হয়, তার কথায় বৈদ্যুতিক শক্তি দেখা দেয়। উনবিংশ শতকে দুইজন ভারতীয় Sir Walter Scott অনুসৃত পথ অবলম্বন করে সাহিত্য-সাধনা করেন। তাঁদের একজন হলেন বাঙালী সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আর একজন হলেন উর্দ্দু সাহিত্যিক আবদুল হালিম শাররা। প্রতিভা এবং সৃষ্টির দিক থেকে, শাররা বঙ্কিমের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নন। পক্ষান্তরে শাররের লেখার মধ্যে যে উদারতা এবং সার্ব্বভৌমিকতা পাওয়া যায়, বঙ্কিমের লেখায় তার অভাব একান্তভাবেই অনুভূত হয়। অথচ শাররের লেখার চেয়ে বঙ্কিমের লেখা দেশের জীবনে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে এবং এখনও করছে। এর কারণ হচ্ছে, বঙ্কিম ইংরাজি সাহিত্য থেকে Patriotism দেশপ্রেম জিনিসটাকে বাংলা সাহিত্যে আমদানী করেছিলেন, আর শাররা তা করেন নি। জাতীয় স্বাধীনতার সঙ্গে দেশপ্রেমের সম্বন্ধ, দেহের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধের মত নিবিড়। বঙ্কিম দেশপ্রেম—তথা স্বাধীনতার বাণী সাহিত্যে এনে এদেশে এক নবযুগের আমদানী করেছেন। শাররা সে পথে যাননি বলে তাঁর লেখা সমাজে ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। দোষ শাররের নয়, দোষ হল তাঁর বেষ্টনীর। তিনি যে দেশে সাহিত্য-সাধনা করেছিলেন, সে দেশের, যুক্তপ্রদেশের, শতকরা নব্বইজন লোক হিন্দু, আর দশজন লোক শাররের সমধর্ম্মাবলম্বী অর্থাৎ মুসলমান। মুসলমান দেশপ্রেমের আদর্শ গ্রহণ করে দেশের শাসনের ভার হিন্দুর হাতে তুলে দিতে পারে না। শাররা তাই দেশপ্রেমের আদর্শ প্রচারের দিকে যাননি। বঙ্কিম যে দেশে সাহিত্য-সাধনা করেছিলেন, সে দেশের অর্থাৎ বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার শতকরা ৭০ জনেরও অধিক লোক ছিল হিন্দু - বঙ্কিমের সমধর্ম্মাবলম্বী। তাঁর দেশপ্রেমের লক্ষ্য ছিল হিন্দুজাতির প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা। গোঁড়া হিন্দু হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র সে আদর্শকে অন্তরের সঙ্গে বরণ করেছিলেন, আর তাঁর সমস্ত প্রতিভা সেই আদর্শের প্রচারে নিয়োজিত করেছিলেন। তাই তাঁর লেখনী থেকে আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতি বের হতে পেরেছিল, আর তাই তিনি বন্দেমাতরম সঙ্গীত লিখতে পেরেছিলেন।

এই দেশপ্রেমের প্রসঙ্গ নিয়ে ভারতের মুসলমান সাহিত্যিকেরা এক বদ্ধ দ্বারের সম্মুখীন হন। দেশপ্রেমই হল বর্ত্তমান যুগের সার্ব্বজনীন জীবন্ত আদর্শ, অথচ ভারতীয় মুসলমান সাহিত্যিকেরা এ আদর্শের দিকে যান না। কেন না, তাঁরা মনে করেন, এ আদর্শের সঙ্গে তাঁদের সামাজিক স্বার্থের বিরোধ আছে, আর স্বভাবতঃই তাঁরা দেশপ্রেমের আদর্শ প্রচার করে তাঁদের সমাজকে বিপন্ন করতে চান না। ফলে জীবন্ত, প্রাণবন্ত আদর্শের এবং লক্ষ্যের অভাবে তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে একটা সংকীর্ণতা, একটা পশ্চাত্মুখীতা

দেখা দিয়েছে—যার দরুণ তাঁদের সৃষ্টি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে উঠতে পারেনি। আর তাই তাঁদের রচনা অ-মোস্‌লেমদের এবং নবযুগ-প্রভাবান্বিত মোস্‌লেমদের নিকট ততটা আদর এবং সম্মান লাভ করতে পারেনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হালীর "মোসাদ্দেশে"র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

মহাকবি একবার আমাদের সাহিত্য-জীবনের এই অসন্তোষজনক অবস্থার কথা বুঝতে পেরেছিলেন, আর তাই তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে তিনি Pan-Islamism বা বিশ্ব-মোস্‌লেম-রাষ্ট্রের আদর্শ প্রচার করে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ এবং সংকীর্ণতার ঊর্দ্ধে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টাও সন্তোষজনক হয়নি। ধর্ম্ম হিসাবে ইসলাম আমরা সকলেই চাই; আর মুসলমান যে দেশেরই হোক না কেন, তাকে আমরা ভাই বলেই মনে করি; কিন্তু কার্য্যকরী রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে খেলাফৎ, Pan-Islamism প্রভৃতি এখন অচল হয়ে গিয়েছে। এসব আদর্শের মধ্যে এখন আর প্রাণের স্পন্দন দেখতে পাওয়া যায় না। স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্রগুলিতে এখন Nationalism বা জাতীয়তার আদর্শই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এখন যদি আমরা অতীত যুগের একটা প্রাণহীন আদর্শকে আকড়ে ধরে থাকি, তাহলে আমাদের সাহিত্য সাধনাও ব্যর্থ হবে, আর রাষ্ট্রীয় সাধনাও ব্যর্থ হবে। অথচ আমরা যদি অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তার আদর্শ গ্রহণ করি, তাহলে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুজাতির প্রাধান্য মেনে নিতে হয়। আর বর্ত্তমান অবস্থায় কোন মুসলমান সে আদর্শকে, সে সম্ভাবনাকে অন্তরের সঙ্গে বরণ করতে পারে না। অথচ পরাধীনতাকেও আমরা কায়েমী ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করতে পারি না। এখন উপায় কি?

বাঙালীর জন্য, বাঙালী মুসলমানের জন্য, এর প্রতিকার হচ্ছে বাঙালীত্বের, বাংলার স্বাতন্ত্র্যের আদর্শকে ফুটিয়ে তোলা। আমরা ভারতবর্ষ থেকে, কিম্বা কোন না কোন ভারতীয় জাতি-সঙ্ঘ থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হতে পারি না, তবে সেই সঙ্ঘের মধ্যে আমাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারি। আমাদের লক্ষ্য হবে, ভারতীয় জাতীয়তা নয়, পক্ষান্তরে সমান অধিকারসম্পন্ন রাষ্ট্র-সঙ্ঘের মধ্যে বাঙালীর স্বতন্ত্র জাতীয়তা; যেমন সমান অধিকারসম্পন্ন বৃটিশ রাষ্ট্র-সঙ্ঘের মধ্যে আছে কেনেডার, অষ্ট্রেলিয়ার এবং আয়রল্যাণ্ডের স্বতন্ত্র জাতীয়তা। এই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলি সর্ব্ব বিষয়েই স্বাধীন এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণশীল; অথচ সামবায়িক স্বার্থ এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তারা একসঙ্গে কাজ করে, সঙ্ঘের বাইরের রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন আলাপ-আলোচনা, কোন চুক্তি, কিম্বা বিরোধ চালাতে হলে একসঙ্গে মিলিত এক রাষ্ট্র-সঙ্ঘ হিসাবে তা চালায়। এ জাতি-সঙ্ঘের প্রধান অংশীদার ইংলণ্ড, সঙ্ঘের কোন অংশীদারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার কথা স্বপ্নেও ভাবে না। প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজ নিজ আদর্শ অনুযায়ী, নিজ নিজ স্বার্থ অনুযায়ী চলে, তবে সঙ্ঘের বাইরের রাষ্ট্রের ব্যাপারে তারা এক যোটে কাজ করে, সমগ্র একটী শক্তি-রূপে নিজেদের পরিচালিত করে। এভাবে তারা সঙ্ঘবদ্ধ এবং ব্যষ্টিগত উভয় ধরণের জীবনেরই উপকারগুলি পায় এবং উভয় ধরণের জীবনের অভাব এবং ত্রুটিগুলি থেকে বেঁচে যায়। আমাদের পক্ষে এই আদর্শকে বরণ করে নেওয়াই হল মঙ্গলের প্রশস্ততর পথ। এ আদর্শের সঙ্গে আমাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের, আমাদের ধর্ম্মগত এবং কালচারগত স্বার্থের কোন বিরোধ হবে না। বাঙালী হিন্দুর বিষয়ও সেই কথা বলা যেতে পারে। কেননা বাংলার হিন্দু এবং মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। সংখ্যার অনুপাতে মুসলমান কিছু বেশী হলেও, প্রভাব এবং প্রতি-পত্তির হিসাবে হিন্দুর অনেকটা প্রাধান্য আছে। সুতরাং উভয় সমাজ অকুণ্ঠিতচিত্তে এই আদর্শকে বরণ করে দেশ-মাতৃকার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করতে পারেন।

এখন যাঁরা অখণ্ড ভারতীয়তার আদর্শ প্রচার করছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন না কোন উপায়ে ভারতবর্ষে হিন্দুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা। এ আদর্শের আমরা সমর্থন করতে পারি না। আমরা যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, তাতে বাংলার হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সব জাতিরই মঙ্গল হবে, আর অখণ্ড ভারতীয়তার আদর্শ থেকে বাংলার, তথা বাংলার হিন্দু এবং মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের মঙ্গল হবে না। তা থেকে বাংলার বাইরের হিন্দুদের স্বার্থ সিদ্ধি

হতে পারে, এই পর্য্যন্ত। এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করবার স্থান এখানে নয়। রাজনীতির আসরই তার উপযুক্ত স্থান। তবে সাহিত্যিক জাতির রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং স্বার্থ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করতে পারে না। সেইজন্য সাহিত্যিক হিসাবে আমি এইটুকু বলতে চাই যে, স্বাধীন বঙ্গের আদর্শ সম্মুখে রেখেই ভবিষ্যতে আমাদের সাহিত্য-সাধনার পথে অগ্রসর হতে হবে, এই আদর্শকে অবলম্বন করেই আমাদের দেশ প্রেমের গান গাইতে হবে, দেশ-প্রেমিকের ছবি আঁকতে হবে, দেশ-সেবার কল্পনা-জল্পনা করতে হবে। চিন্তার, কল্পনার, সেবার এবং সাধনার যে বিরাট এক জগৎ এখন আমাদের কাছে বন্ধ আছে, বাঙালীত্বের মনোমুগ্ধকর আদর্শের যাদু-স্পর্শে তার দুয়ার খুলে যাবে। আমরা তখন বাঙালীদের সৈনিক করবার চেষ্টা করব, বৈমানিক করবার চেষ্টা করব, আত্মরক্ষায় সমর্থ—যুদ্ধকুশল জাতিতে পরিণত করবার চেষ্টা করব। বাংলার স্বতন্ত্র অর্থনীতির, বাংলার স্বতন্ত্র সমাজনীতির, বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রনীতির সৃষ্টি করবার চেষ্টা করব। বাঙালীত্বকে এবং বাঙালীকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করব। এর চেয়ে উচ্চতর, এর চেয়ে সহজতর, এর চেয়ে কাম্যতর আদর্শ বাঙালীর জন্য আর কি হতে পারে?

এ আদর্শকে সত্যই যদি আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, আর এ আদর্শ ছাড়া অন্য কোন আদর্শ আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করতে না পারে, তাহলে বাংলার হিন্দুদের সঙ্গে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে, আমাদের বন্ধুত্ব আরও দৃঢ়তর করতে হবে। সকলে যাতে অকুণ্ঠিত চিত্তে দেশ-মাতৃকার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করতে পারে, তার অনুকুল ব্যবস্থা করতে হবে, আর সাহিত্যিকদের সেদিকে লক্ষ্য রেখে সাহিত্য-সাধনা করতে হবে। আমাদের মনের উচ্চতার উপর, আমাদের ব্যবহারের উদারতার উপর, আমাদের সাধনার ঐকান্তিকতার উপর, আমাদের আদর্শের সাফল্য নির্ভর করবে।

অনেকে আজকাল বলেন, ভারতবর্ষ এক অখণ্ড দেশ, তার জন্যে অখণ্ড এক কেন্দ্রীভূত শাসন-তন্ত্রের দরকার। বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষ একই বৈদেশিক শক্তির শাসনাধীনে আছে বলেই তাঁরা এ কথা বলেন। ইতিহাসের কথা কিন্তু তাঁরা ভুলে যান। আলমগীরের মৃত্যুর পর থেকে সিপাহী-বিদ্রোহ পর্য্যন্ত অখণ্ড ভারতবর্ষ বলে কোন কিছু ছিল না। দেশ ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। মোগলদের এবং পাঠানদের গৌরবের যুগেও অখণ্ড ভারতবর্ষ বলে কিছু ছিল না। দাক্ষিণাত্য, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে অনেকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র বর্ত্তমান ছিল। আলমগীর দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির ধ্বংস সাধন করেন। কিন্তু সে কয়দিনের জন্য। হিন্দুদের আমলেও অখণ্ড ভারতবর্ষ বলে কিছু ছিল না। দেশ বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্য জয় করেন এবং ভারতবর্ষে এক অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু সে অতি অল্পকালের জন্য। তাঁর পৌত্রের পরই আবার ভারতবর্ষ বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, সাধারণতঃ ভারতবর্ষ বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল; তবে কখনও কখনও কোন না কোন দিগ্বিজয়ী বীর স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে পরাভূত করে নিজের একচ্ছত্র শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তিনি তা করেছিলেন নিজের বাহু বলে, স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির স্বাধীন সম্মতি নিয়ে নয়। আর দিগ্বিজয়ীর সৃষ্ট সাম্রাজ্য তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই লয় পেয়েছে। অপহৃত রাজ্যগুলি আবার তাদের স্বাধীনতা লাভ করেছে। সাধারণতঃ ভারতবর্ষ, বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের সমষ্টিরূপেই রাজনৈতিক জীবন যাপন করেছে, কখন কখন এই রাষ্ট্র-সমষ্টির মধ্যে থেকে এক একটি সাম্রাজ্য দেখা দিয়েছে অল্পদিনের জন্য, তারপর আবার সেই পুরাতন প্রথাগত রাষ্ট্র-সমষ্টি। ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রাখলে ভারতবর্ষকে বিভিন্ন রাষ্ট্র-সম্বলিত মহাদেশ বলাই ঠিক হয়, তাকে অখণ্ড এক সাম্রাজ্য বললে, ইতিহাসের উপর অবিচার করা হয়।

ভারতবর্ষে যেমন মধ্যে মধ্যে এক একটি সর্ব্বগ্রাসী সাম্রাজ্য দেখা দিয়েছে, ইউরোপেও অনেকবার তাই ঘটেছে, মোস্লেম-জগতেও ঘটেছে। বর্ত্তমানকালের ভারতীয় রাজনীতিকদের মত, ইউরোপেরও একজন সার্ব্বভৌমিক সাম্রাজ্যের সমর্থক, প্রাচীন রোমান এম্পায়ারের দোহাই দিয়ে, হোলি রোমান এম্পায়ারের দোহাই দিয়ে, নেপোলিয়ানের

এম্পায়ারের দোহাই দিয়ে, বলতে পারেন ইউরোপের আদর্শ এবং লক্ষ্য বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র-সমষ্টির নয়, তার আদর্শ এবং লক্ষ্য হচ্ছে, অখণ্ড ইউরোপীয় রাষ্ট্রের।

খেলাফৎবাদী একজন মোস্‌লেম রাজনৈতিকও সেইরূপ আরব-খেলাফৎগুলির দোহাই দিয়ে, তুরস্ক-সাম্রাজ্যের দোহাই দিয়ে, বলতে পারেন, মোস্‌লেম-জগতের আদর্শ বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র-সমষ্টির নয়, তার আদর্শ এবং লক্ষ্য হচ্ছে, অখণ্ড বিশ্বব্যাপী এক মোস্‌লেম-সাম্রাজ্যের। কিন্তু কোন ইউরোপীয়, কিম্বা কোন মুসলমান যদি এভাবে এখন কথা বলেন, ইউরোপবাসী এবং স্বাধীন মোসলেম রাষ্ট্রের লোকেরা তাকে পাগল বলবে। আমাদের দেশের রাজনৈতিকেরা যে এমন কথা জোর গলায় বলতে পারেন, তার কারণ হচ্ছে (১) বৈদেশিক শক্তির অপ্রতিহত প্রভাব; আর (২) বড় বড় কথা বলা হচ্ছে আমাদের একটা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা। এটা হচ্ছে দুর্ব্বলের সাধারণ বিশেষত্ব। দুর্ব্বল বড় বড় কথা বলতে ভালবাসে, কেন-না, সেইভাবে সে তার কাজ করবার দৈন্য চাপা দেবার চেষ্টা করে। চীৎকারের বেলায় খেঁকী কুকুর যে সব কুকুরের চেয়ে দক্ষ, সে কথা কে না জানে? সেইজন্য আমি বলি, বর্ত্তমান রাজনৈতিকদের লম্বা লম্বা কথা শুনে আমাদের আদর্শের বিষয়ে সন্দিহান হবার, কিম্বা আমাদের আদর্শের পথ থেকে বিচলিত হবার দরকার নেই। দরকার হচ্ছে আদর্শকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করে দৃঢ়ভাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার।

মানুষের যেমন রাষ্ট্র না হলে চলে না, তেমনি ধর্ম্ম না হলেও চলে না। ধর্ম্মের প্রয়োজন রাষ্ট্রের চেয়েও গভীরতর। কেন-না রাষ্ট্রের কারবার হল মানুষের নশ্বর জীবনকে নিয়ে, আর ধর্ম্মের কারবার হল তার অবিনশ্বর জীবনকে নিয়ে, তার চিরন্তন আত্মাকে নিয়ে; রাষ্ট্রের কারবার হল মানুষকে, আর মানুষের সমষ্টিকে নিয়ে, আর ধর্ম্মের কারবার হল, মানুষের স্রষ্টাকে, অব্যয়-অক্ষয় সত্যকে নিয়ে। সাহিত্যিকের প্রকৃত কারবারই হল, মানুষের অমর আত্মাকে নিয়ে। সুতরাং সাহিত্য থেকে, সাহিত্যের আলোচনা থেকে, ধর্ম্মকে বাদ দেওয়া যায় না।

রাষ্ট্রের যেমন দুইটি বিভাগ আছে, যথা (১) তার আদর্শ; আর (২) আদর্শের উপলব্ধির ব্যবহারিক বিধি-ব্যবস্থা প্রভৃতি। ধর্ম্মেরও সেই রকম দুইটী বিভাগ আছে, (১) তার অন্তর্নিহিত আদর্শ, আর (২) সেই আদর্শের উপলব্ধির জন্য নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া-কর্ম্ম, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি। রাষ্ট্রের আদর্শ হচ্ছে জাতির সংরক্ষণ এবং মঙ্গল সাধন। আর তার ব্যবহারিক দিক হচ্ছে, এই দুই আদর্শের উপলব্ধির জন্য সৃষ্ট বিভিন্ন আইন-কানুন, এবং এবং আফিস-আদালত প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। ধর্ম্মের আদর্শ হচ্ছে, বিশ্ব-শক্তির সঙ্গে মানুষের প্রীতিময় নৈকট্য স্থাপন। আর তার ব্যবহারিক দিক হচ্ছে, উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্দ্দেশিত রোজা, নামাজ, হজ্জ, জাকাত প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রিয়া-কর্ম্মের অনুষ্ঠান। রাষ্ট্রের ব্যবহারিক অংশের বিচার এবং ব্যবহারিক বিধি-নিষেধের মূল্যের যাচাই যেমন তার আদর্শের মাপকাটি দিয়ে করতে হয়, ধর্ম্মের ক্রিয়া-কর্ম্মের এবং আচার-অনুষ্ঠানের মূল্যের বিচারও তেমনি তার আদর্শের মাপকাটি দিয়ে করতে হয়। আমাদের রসুলে-করিম এই উসুলের দিকে লক্ষ্য রেখেই ধর্ম্মের বিধি-ব্যবস্থা করে গিয়েছেন, আর আমরা যাতে এই উসুলের কথা মনে রেখে ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হই, তার জন্য তাগিদ দিয়ে গিয়েছেন। এইটাই হল ইসলামের প্রধানতম বিশেষত্ব —আর এরই দরুণ ইসলাম হল বিশ্ব-মানবের পূর্ণতম ধর্ম্ম—ইন্নাদ্দীনা ইন্দাল্লাহে আল ইসলাম—আল্লার কাছে ধর্ম্মই হল ইসলাম।

রসুলোল্লা বলেছেন—"আমাদের অর্থাৎ পয়গম্বরদের প্রতি আদেশ আছে, আমরা যেন মানুষের সভ্যতার অবস্থার কথা মনে রেখে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করি; আর তাদের বিদ্যা-বুদ্ধির কথা মনে রেখে তাদের সঙ্গে কথা বলি।" আদর্শের দিক থেকে নবীরা চিরন্তন আদর্শেরই অনুসরণ করেছেন, আর ব্যবহারের দিক থেকে তাঁরা মানুষের সভ্যতার কথা মনে রেখে বিধি-ব্যবস্থার প্রণয়ন করেছেন এবং যুক্তি-তর্কের দিক থেকে, তাদের বিদ্যা-বুদ্ধির অবস্থার কথা মনে রেখে, তাদের উপযোগী কথাবার্ত্তা বলেছেন। এইজন্য আমরা বিভিন্ন আউলিয়াদের

প্রবর্ত্তিত বিধি-নিষেধের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাই ; তাঁদের ব্যবহৃত যুক্তি-তর্কের মধ্যে প্রভেদ দেখতে পাই ; অথচ তাঁদের সকলেরই আদর্শ ছিল এক, আর সে আদর্শ হচ্ছে আল্লার সঙ্গে মানুষের নিবিড় নৈকট্য স্থাপন। মওলানা রুমী সত্যই বলেছেন :—

"তুমি যদি একটা ঘরে দশটা প্রদীপ জ্বাল, তাহলে দেখবে প্রত্যেকটা প্রদীপ অন্য প্রদীপগুলি থেকে ভিন্ন ; কিন্তু যখন আলোর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, তখন দেখবে যে, তাদের আলো সেই একই জিনিস (সে আলো অন্ধকার দূরীভূত করে, দেখতে আমাদের সাহায্য করে)।"

"কোরাণের অন্তর্নিহিত অর্থের সন্ধান কর, আর বল, রসুলদের মধ্যে আমি কোন ভেদাভেদ করি না।"

"বন্ধুদের সঙ্গে বন্ধুর মিলনই কাম্য, তুমি উদ্দেশ্যের অনুসরণ কর ; কেন-না, বাইরের রূপ বিরোধের সৃষ্টি করে।"

"অন্তরের প্রেম দিয়ে বাইরের রূপকে জ্বালিয়ে দাও, তাহলে দেখবে তাদের ভিতরে একতারূপ মাণিক আছে।"

ধর্ম্মকে প্রত্যেক যুগে নূতন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে ; নব নব সমস্যার, নব নব সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। নবযুগের আশার সঙ্গে, নবযুগের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিবিড়-ভাবে তাকে সুসংযোজিত করে দিতে হবে। তা যদি করতে না পারা যায়, তাহলে ধর্ম্ম কতকগুলি অর্থহীন বিধি-নিষেধের তালিকায় পর্য্যবসিত হবে। নবীরা পূর্ব্বে এই কাজই করেছেন। এখন আর কোন নবী আসবেন না। এখন এ কাজ আমাদেরই করতে হবে। ইসলাম এ অধিকার আমাদের দিয়েছে। কোরাণ-শরিফে এসেছে,—"ওয়াত্ত বেয়ু আহসানা মা উনজীলা আলায় কুম"—এবং আল্লার নিকট থেকে তাদের কাছে যা এসেছে, তার ভাল ভাল জিনিসগুলির অনুসরণ কর।

এই ভাল ভাল জিনিসগুলি কি ? অন্তরই তার বিচার করবে, অন্তরই মঙ্গলের পথ খুঁজে বের করবে, অন্তরই দেশ, কাল এবং পাত্রের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে নূতন বিধি-ব্যবস্থার প্রণয়ন এবং প্রবর্ত্তন করবে। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ আমীর-উল মুমেনীন হজরত আলি বলেছেন ;—

"তোমার ঔষধ তোমার মধ্যেই অথচ সে বিষয় তুমি

আর তোমার রোগও তোমার দরুণই অথচ তুমি তা বোঝ না ! তুমি মনে কর, তুমি হচ্ছ ক্ষুদ্র একটা সীমাবদ্ধ জিনিস ; অথচ সমস্ত বিশ্বই তোমার মধ্যে জড়ান রয়েছে !

তুমি সেই উজ্জ্বল মহাগ্রন্থ যার হরফের সাহায্যে সমস্ত প্রচ্ছন্ন সত্য প্রকটিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, অন্যের সাহায্যের তোমার প্রয়োজন নাই ; তোমার অন্তর সমস্ত লিপিকাই তোমায় পড়িয়ে দেয় !"

ইসলাম মানুষের উন্নতির পথ, তার বিকাশের পথ, তার প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনের পথ রুদ্ধ করে না। মোস্‌লেম জাতি যুগে যুগে সময়ের স্থানের এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন মত তাদের সামাজিক জীবনকে পরিবর্ত্তিত করে এসেছে এবং এখনও করছে, আর ভবিষ্যতেও করবে। "মুসলেহাতুল ওয়াক্ত" (সময়ের প্রয়োজন) বিধি-নিষেধের পরিবর্ত্তনের অন্যতম আইন এবং ধর্ম্ম-সঙ্গত কারণ। মি: আমির আলি সত্যই বলেছেন,—"The Principle of development is embodied in the Law itself. The dictum clearly stated in Radd-ul-muhtar that Judicial interpretation must be subject to the necessities of time (muslhatul Wakt) points to the adoption of rules to circumstances arising from changing conditions in the affairs of the world."

W. E. Hocking তাঁর The Spirit of World Politics গ্রন্থে বলেছেন "The Principle of Public advantage : if a literal application of a Quoranic rule works evident disadvantage, it cannot be meant in that sense For—and here appeal is made to one of the great Islamic Generalities—'In Islam there is no injury.' This mallkite Principle would seem to allow room for a modern Sociological Jurisprudence—and if

legal logic is to be subordinated to an evident public good. the way is open for progress."

মিঃ খোদা বক্স বলেছেন :

In one of the four orthodox Sects, the one linked with the name of Malik Ibn Anas, the muslah utilitas Publica or the common interest, was recognized as the normal point of view in the application of the law. It was permitted to deviate from the normal law if it could be shewn that the interest of the Community demanded a different decision from that given in the law, corresponding to the principle of corrigere jus proter utilitatum Publicam of Roman Law. This liberty, to be sure, is restricted to each case as it arises, and does not carry with it a definite setting aside of the law. But the Principle involved is, in itself, "an indication of the willingness to make concessions within the Law—Significant is an important utterance of the highly esteemed theologian Zur Kani (D. 1122—1710) who in a passage in his Commentary to the Code (Muwatta) of malik, distinctly asserts that decisions may be made in the measure of new circumstances." "There is nothing strange" he concludes "in the view that laws must accomodate themselves to circumstances."

Vide Khuda Baksh ;
Islamic Civilization vol 2

ব্যক্তিগত উন্নতি এবং বিকাশের পথে যেমন মোস্‌লেম সভ্যতার কোন বাধা-বিঘ্ন নাই, সামাজিক উন্নতি এবং বিকাশের পথে যেমন কোন বাধা বিঘ্ন নাই, রাষ্ট্রীয় উন্নতি এবং বিকাশের পথেও তেমনি আমাদের সভ্যতার কোন বাধা বিঘ্ন নাই। রাষ্ট্রকে নিজের সংরক্ষণের জন্ত, নিজের উন্নতির জন্ত, নিজের বিকাশের জন্ত, যে নিত্য-নতুন পথ অবলম্বন করা দরকার, সে কথা মুসলমানেরা খুব ভাল করেই জানতেন, আর রাজ্য-শাসন ব্যাপারেও তাঁরা বিশ্বে তাই অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গেছেন। মহানুভব বাদসাহ আকবরই সর্ব্বপ্রথম এই পৃথিবীতে ধর্ম্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের, Secular State-এর প্রবর্ত্তন করেন। আর তাঁর প্রবর্ত্তিত আদর্শ মতই দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরে ভারতের মোগল-সাম্রাজ্য পরিচালিত হয়েছিল। মোগল-সাম্রাজ্যের আদর্শে পরিচালিত হায়দারাবাদের নিজাম বাহাদুর বার বার মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, যে, রাষ্ট্রের বিশেষ কোন ধর্ম্মমত নাই ; প্রজার মঙ্গলই তার একমাত্র ধর্ম্ম। . . . .

মোস্‌লেম অধ্যুষিত দেশে দুই প্রকারের রাষ্ট্র থাকতে পারে, যথা, (১) ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র, এবং (২) ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। বর্ত্তমান যুগে তুরস্ক নিজেকে ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করেছে। তুরস্কের শাসন-তন্ত্র বা Constitution থেকে "The religion of the Turkish State is religion of Islam" এই কথাগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে মিশরের শাসন-তন্ত্রে ইসলামকেই রাজকীয় ধর্ম্মরূপে ঘোষণা করা হয়েছে।

তবে তুর্কী-রাষ্ট্রের কোন সরকারী ধর্ম্ম থাকুক, আর না থাকুক, তুর্কীরা মুসলমান। রাষ্ট্রের বিশেষ কোন ধর্ম্ম থাকার প্রয়োজন নাই ; দেশের মঙ্গলই তার ধর্ম্ম। বর্ত্তমান যুগে শিক্ষার এবং চিন্তার যে অচিন্তনীয় প্রসার হয়েছে এবং হচ্ছে, তার সঙ্গে রাষ্ট্রকে তাল রক্ষা করে চলতে হলে, ধর্ম্মের বিষয় নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা এবং নিজের রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন মত বিধি নিষেধের সৃষ্টি এবং প্রবর্ত্তন করাই হল তার পক্ষে প্রশস্ততর পথ। ফ্রান্স, ইউনাইটেড ষ্টেটস, ইটালী প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি এই পথেই চলেছে ; কিন্তু তাই বলে একথা কোন মতে বলা চলে না যে, ঐ সব দেশের লোকদের কোন ধর্ম্ম নাই ; কিম্বা ঐ সব দেশের লোকেরা ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষেরও কোন রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম নাই। ভারতীয় রাষ্ট্রও ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। অথচ ধর্ম্মের প্রভাব যে ভারতীয় জীবনে প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। . . . .

ভারতীয়দের পক্ষে—তথা বাঙালীদের পক্ষে, ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রই একমাত্র সম্ভবপর, এবং বাঞ্ছনীয় আদর্শ। চারশত বৎসর পূর্ব্বে মহানুভব সম্রাট আকবর এই সত্যটি সম্যকরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। এই আদর্শেই ভারতের শাসন-তন্ত্র সুচারুভাবে পরিচালন করা সম্ভবপর, অন্য কোন আদর্শে নয়। এখানে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা বাস করে। সুতরাং কোন বিশেষ এক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকে রাজকীয় ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে না। ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ সম্মুখে রেখেই আমাদের জীবন-পথে অগ্রসর হ'তে হবে।

তবে দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে একথা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ইসলাম রাষ্ট্রের উন্নতির পথে রাষ্ট্রের নিজস্ব আদর্শের উপলব্ধির পথে, কোন বিঘ্নের সৃষ্টি করে না। সমাজ-বিজ্ঞানের স্রষ্টা ইবনে খালদুন, রাষ্ট্রের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে, রাষ্ট্রের সমস্যার দিকে লক্ষ্য রেখে, রাষ্ট্রের স্বভাবদত্ত প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে, তাকে "মোজাদ্দেদ" নামে অভিহিত করেছেন; অর্থাৎ রাষ্ট্র তার জীবনের প্রয়োজন মত নিত্য-নূতন বিধানের সৃষ্টি করতে পারে, নিত্য-নূতন নিষেধ আজ্ঞা জারি করতে পারে, নিত্য-নূতনভাবে তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করতে পারে। অবশ্য এখানে আদর্শের কথাই বলা হল। সম্প্রদায় বিশেষের সাময়িক স্বতন্ত্র স্বার্থের কথা—চাকুরির ভাগ-বাটোয়ারার কথা আপাতঃ দুর্ব্বল সম্প্রদায় বিশেষের বিশেষ অধিকারের দাবীর কথা, এসব হল দৈনন্দিন রাজনৈতিক সমস্যার অন্তর্গত। এ সবের আলোচনার স্থানও এখানে নয়, আর সে কাজও আমার নয়।

অ-মোসলেমদের মধ্যে সাধারণতঃ এবং অনেক মুসলমান-দের মধ্যেও একটা ধারণা আছে যে, ইসলামের সঙ্গে দর্শন এবং বিজ্ঞান খাপ খায় না। ইস্‌লামের দার্শনিক ভিত্তি দুর্ব্বল, ইসলামের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অতীত যুগের বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ বড় মারাত্মক ধারণা। এ ধারণা কুসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের সঙ্গে দর্শন এবং বিজ্ঞানের প্রকৃত পক্ষে কোন বিরোধ নাই। দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তা, গবেষণা এবং আলোচনার পথ, ইসলাম যেমন পরিষ্কার এবং প্রশস্ত করে দিয়েছে, অন্য কোন ধর্ম্মমত তেমন করেছে ব'লে আমার মনে হয় না। ধর্ম্মকে যে রূপকের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করতে হবে, আল্লার অভাবনীয় সত্তাকে যে আমাদের মহত্তর গুণাবলীর সাহায্যে আমাদের প্রয়োজন মত বুঝে নিয়ে জীবন-পথে অগ্রসর হতে হবে, মানুষের অভিজ্ঞতা এবং পর্য্যবেক্ষণের ভিত্তির উপর যে ধর্ম্মের বিরাট সৌধ প্রস্তুত করতে হবে; অথচ ধর্ম্মের কারবার যে অচিন্তনীয় আল্লাকে নিয়ে এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির উর্দ্ধে অবস্থিত সত্যকে নিয়ে; ধর্ম্মের সত্য যে মানুষের সাময়িক সীমাবদ্ধ জ্ঞানের এবং অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না, বিশেষ কোন যুগের দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক মতবাদের উপর নির্ভর করে না, অথচ আমাদের যে এই সবকে অবলম্বন করেই সাধনার পথে অগ্রসর হতে হবে; এই মহাসত্যগুলোকে কোরাণ শরিফে যেমন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, তেমন আর কোথাও হয়েছে বলে আমার জানা নাই।

এ প্রসঙ্গে সুরা আল ইমরাণে যে অমূল্য কথাগুলি এসেছে, তা সর্ব্ব মানবের এবং সর্ব্ব যুগের প্রণিধান যোগ্য,—

"আলিফ, লাম, মিম; আল্লাহ! তিনি ছাড়া কোন প্রভু নাই; জীবন্ত, চিরন্তন; তোমার নিকট তিনি সত্য সম্বলিত গ্রন্থ পাঠিয়েছেন! এ গ্রন্থ পূর্ব্বেকার প্রেরিত গ্রন্থাবলীর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করে; এবং তিনিই তওরাত এবং ইন্‌জিল অবতীর্ণ করেছেন, এ গ্রন্থের পূর্ব্বে! এবং তিনিই পাঠিয়েছেন সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে বিচার করবার উপায়। নিশ্চয় জেনো, যারা আল্লার প্রেরিত নির্দ্দেশাবলী অস্বীকার করে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা আছে! আল্লা হচ্ছেন শক্তিশালী শাস্তিদাতা!

নিশ্চয় জেনো, এই পৃথিবীর এবং নভোমণ্ডলের কোন কিছু আল্লার কাছে প্রচ্ছন্ন নাই। তিনিই মাতার জরায়ুতে তোমাদের গড়েন, তাঁর ইচ্ছা মত! তিনি ছাড়া কোন প্রভু নাই! তিনি হলেন জ্ঞান এবং ক্ষমতার স্বরূপ! তিনিই তোমাদের নিকট গ্রন্থ পাঠিয়েছেন!

এ গ্রন্থের কতক অংশ হল স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার; এই গুলিই হল গ্রন্থের মূল! গ্রন্থের বাকি অংশ রূপক স্বরূপ; তার বিভিন্ন অর্থ করা যায়! যাদের মনে কুটিলতা বর্ত্তমান, তারা গ্রন্থের যে অংশকে রূপক স্বরূপ পাঠান হয়েছে, তাকে নিয়ে তর্কাতর্কি করে, কলহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে; এবং নানা প্রকার আজগুবি অর্থ বার করবার উদ্দেশ্যে! তার প্রকৃত অর্থ কিন্তু আল্লা ছাড়া কেউ অবগত নয়! যারা প্রকৃত জ্ঞানী, তারা বলে, আমরা সবতাতেই বিশ্বাস করলুম; সবই আমাদের স্রষ্টা এবং পালকের নিকট থেকে এসেছে! জ্ঞানী ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না!"

এই আয়েতটি অতি মূল্যবান, গভীর তত্ত্ব এবং অর্থপূর্ণ। আয়েতের গোড়াতেই তিনটি অক্ষর আছে, আলিফ-লাম-মীম, যার অর্থ কেউ বোঝে না। কোরাণ শরিফে অনেক যায়গায় এইভাবে রহস্যপূর্ণ হরফের অবতারণা করা হয়েছে। কেন তা করা হয়েছে? আমার মনে হয়, এরূপ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে (কোরাণে উদ্দেশ্যহীন কিছু নাই) মানুষকে অতি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যে, আল্লার সৃষ্টি, আল্লার জ্ঞান, আল্লার উদ্দেশ্য আমাদের ক্ষুদ্রশক্তির আয়ত্তের অনেক ঊর্দ্ধে। যতই বুঝি না কেন, এবং যতই বুঝতে চেষ্টা করি না কেন, আল্লার সৃষ্টি, তাঁর জ্ঞান, তাঁর উদ্দেশ্য আমাদের অপরিজ্ঞাতই থেকে যাবে, পরিপূর্ণভাবে সে সব কখনও আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আসবে না। কোরাণ শরিফের বিষয়েও সেই কথাই প্রযোজ্য। যত তাকে বুঝি না কেন, এবং বুঝতে চেষ্টা করি না কেন, সমগ্রভাবে তাকে বোঝা আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অতীত। আল্লার সত্তা এবং সৃষ্টির মত, আল্লার বাণী কোরাণও দুর্ভেদ্য একটা রহস্যই থেকে যাবে। তবে যুগে যুগে মানুষ আল্লাকে এবং তাঁর সৃষ্টিকে বোঝে তার প্রয়োজন মত, তার জীবনের তাগিদ মত। কোরাণকেও সেই রকম সে যুগে যুগে তার প্রয়োজন মত, তার জীবনের তাগিদ মত বুঝেছে। আর নূতন নূতন যুগে আল্লাকে, তাঁর বিশ্বকে, তাঁর বাণী কোরাণকে নূতন নূতন ভাবে বুঝতে হবে। কোন বিশেষ যুগের কোন মানব-সন্তান কখনও বলতে পারবে না যে, আমি আল্লাকে বুঝে ফেলেছি, কিম্বা তাঁর সৃষ্টিকে বুঝে ফেলেছি, কিম্বা তাঁর কোরাণকে বুঝে ফেলেছি। আলিফ-লাম-মিম তার সেই ভিত্তিহীন দাবীকে রদ করে দেবে।

কিন্তু আল্লাকে, তাঁর সৃষ্টিকে এবং তাঁর উদ্দেশ্যকে পুরাপুরিভাবে না বুঝলেও মানুষকে মানতে হবে যে, তিনি আছেন; এ বিশ্ব তাঁরই রাজ্য; তিনি চিরন্তন; তিনি চির জীবন্ত, চির জাগ্রত! নবীর কাছে বাণী পাঠান তার পক্ষে কোন নূতন কাজ নয়। যুগে যুগে মহাপুরুষদের কাছে তিনি এইভাবে বাণী পাঠিয়েছেন মানুষের মঙ্গলের জন্য। সেই সব সত্য বাণীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই কোরাণের আবির্ভাব। ইনজীল এবং তওরাতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থের দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। মুসলমান প্রত্যেক সত্য ধর্ম্মের, প্রত্যেক সত্য গ্রন্থকেই মানতে বাধ্য!

তারপর বলা হয়েছে কোরাণের কতক অংশ পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ।* সেই অংশকে ভিত্তি করেই আমাদের জীবন চালাতে হবে। আর বাকী অংশ রূপক স্বরূপ। তার বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। সে অংশ নিয়ে বাদ-বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। কেন-না সে অংশও আল্লাই পাঠিয়েছেন। তার পর আল্লার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে, তিনি যেন আমাদের অন্তরকে বিকৃত হতে না দেন, তিনি যেন আমাদের প্রতি করুণা করেন, আমাদের পথ দেখান। স্বচ্ছ অন্তর না হলে, আল্লার করুণা না থাকলে, মানুষ সত্যকে দেখতে পায় না। সুতরাং এই দুইটি জিনিষের আমাদের একান্ত দরকার।

এই আয়েতের ব্যাখ্যায় মহা মনস্বী সার সৈয়দ আহম্মদ তার তফসীরে যে মূল্যবান কথা বলেছেন, তা বিশেষভাবে আমাদের প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—

"কোরাণে মজিদে এমন অনেক বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে যা মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয় (দৈহিক কিম্বা মানসিক) অনুভব করেনি; এবং যার বিশেষত্বের সঙ্গে মানুষের সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। সুতরাং সে সব বিষয় স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার-ভাবে ব্যক্ত করা সম্ভবপর নয়। আর এইজন্য সে সব বিষয়ের রূপকের সাহায্যে বর্ণনা করার প্রয়োজন। তা

ছাড়া কোরাণ সমগ্র মানবজাতির পথ-প্রদর্শনের জন্ম অবতীর্ণ হয়েছে। তার লক্ষ্য হচ্ছে যে, তা থেকে বিজ্ঞ এবং জ্ঞানী লোকেরাও উপদেশ লাভ করুক; এবং অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনসাধারণ, তথা মেষ, ছাগল এবং উষ্ট্র-পালক প্রভৃতিও উপদেশ লাভ করুক। সাধারণ লোকেরা কোন বিষয়ের অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্বের কথা বুঝতে পারে না। এমন কি শিক্ষিত লোকেরাও যুগের সংস্কারের উর্দ্ধে উঠতে পারে না। যুগের শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক ধারণার উর্দ্ধে উঠতে পারে না। ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের, আধ্যাত্মিক পথ-প্রদর্শকের এবং পয়গম্বরের সাধারণের শিক্ষার সাময়িক অবস্থার সঙ্গে, কিংবা বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাময়িক অবস্থার সঙ্গে এবং বৈজ্ঞানিক মতামতের সত্যাসত্যের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ট কোন সম্পর্ক নাই। তিনি তাই, তাঁর মূল উদ্দেশ্য, আধ্যাত্মিক শিক্ষা, এবং নৈতিক সংস্কারের কথা মনে রেখে নিজের বক্তব্যকে এমনভাবে এবং এমন ভাষায় বর্ণনা করেন, যা স্বভাবতঃই রূপকের আকার ধারণ করে। তাঁর প্রচারিত বাণীর দিক বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করলে, তাতে সেই সব জিনিষ পাওয়া যাবে, যা, তাঁর যুগের সাধারণ সংস্কাররূপে প্রচলিত, কিংবা যা তাঁর যুগের শিক্ষিত লোকদের সাধারণ বিশ্বাসের অনুরূপ। কিন্তু তাঁর সেই বাণীর মধ্যে আর একটা জিনিষ প্রচ্ছন্ন থাকে যার বিষয় মানুষ তখনই অবহিত হয়, যখন শিক্ষা এবং বিজ্ঞান সে যুগের মানসিকতা ছেড়ে উচ্চতর স্থানে গিয়ে পৌঁছে। সুতরাং কোরাণের মত একটি গ্রন্থে রূপক-মূলক একটা অংশ থাকা অবশ্যম্ভাবী এবং অপরিহার্য্য। উপরন্তু কোরাণের সেই রূপক মূলক অংশ, তার সত্যের এবং তার আল্লার বাণী হবার দাবীর সমর্থনই করে। প্রকৃতপক্ষে এটী হচ্ছে কোরাণের অন্যতম মাজেজা (অলৌকিকত্বের নিদর্শন)।

তা ছাড়া, এমন অনেক বিষয় আছে, যার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক শিক্ষার বিস্তার এবং প্রতিষ্ঠা; আর সেই বিষয়গুলিকে বর্জ্জন করে আধ্যাত্মিক শিক্ষা যথোচিৎভাবে দেওয়া যায় না। এই বিষয়গুলি এমনভাবে বর্ণিত হওয়া চাই যে, তাদের অর্থ যেন অপরিস্ফুট না থাকে; এবং তাদের প্রতি একাধিক অর্থ যেন আরোপিত না হয়। কোরাণের এই অংশকে স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার বলা হয়েছে।

ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে তওহিদ—আল্লার একত্ব। তারপর আসে ধর্ম্মের পাঁচটী অনুষ্ঠান (রোজা, নামাজ প্রভৃতি)। এইগুলির বিষয় কোরাণের "স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার" অংশে এমন সুন্দরভাবে বলা হয়েছে যে, তা থেকে একের অধিক অর্থ করা যায় না, একের অধিক ব্যাখ্যা করা যায় না। সুরা আনামে বলা হয়েছে, খোদা ছাড়া কোন উপাস্য নাই; তিনিই সবের স্রষ্টা; তোমরা তাঁরই উপাসনা কর!

* * * *

আল্লার সত্তার বিষয় এছাড়া আর কিছু বলা যায় না যে, তিনি আছেন, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নাই; কোন জিনিষের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যায় না। "স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার" কথার সাহায্যেও তাঁর বর্ণনা করা যায় না, আর রূপকের সাহায্যেও তাঁর উচিত বর্ণনা করা যায় না। এইজন্য, কোরাণে আল্লার গুণাবলীর কথা যেখানে বলা হয়েছে, রূপকের সাহায্যেই তা করা হয়েছে। "লা ইয়ামুত" "তাঁর মৃত্যু নাই"—একথা শুনে আমাদের সেই জীবন-মরণের কথাই মনে আসে, যা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের প্রতিই প্রযোজ্য! অথচ আল্লার সত্তা আমাদের এই জীবন-মরণ থেকে মুক্ত! "সামীউন" "বসীরুণ" "আলীমুন"—শ্রোতা, দর্শক, জ্ঞানী—এই সব কথা আল্লার বিষয় বলা হয়েছে; অথচ, আমরা কান দিয়ে শুনি, চোখ দিয়ে দেখি, আর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান লাভ করি। অন্য কি ভাবে এ সব অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়, কিংবা যেতে পারে, আমরা তা জানি না; অথচ আল্লার সত্তা এ সবের বন্ধন থেকে মুক্ত।

"রহম" "গজব" "কাহ্‌র" (দয়া, ক্রোধ, শাস্তি) এ সব কথা যখন আল্লার সম্পর্কে বলা হয়, তখন আমরা সেই সব মানসিক অবস্থার কথা ভাবি, যা আমাদের মধ্যে বিশেষ কোন উত্তেজনার অবস্থায় আবির্ভূত হয়; আর এই সব অনুভূতি যখন আমাদের মনে এসে দেখা দেয়, তখন আমাদের মনে চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনা এসে দেখা দেয়; আমাদের ইচ্ছার প্রতিরোধকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতি-হিংসা প্রবৃত্তি জেগে উঠে, আমরা তখন প্রতিশোধ নেবার

চেষ্টা করি, কিম্বা এমন কিছু করিতে চেষ্টা করি, যা আমাদের অন্তরের উত্তেজনাকে প্রশমিত করতে পারে; কিন্তু আল্লার সত্তা এসব ভাব থেকে, দয়া এবং ক্রোধ উভয় থেকেই মুক্ত!

আল্লার বিষয় বলা হয়েছে, তিনি আরশে (স্বর্গের সিংহাসনে) সমাসীন, তাঁর হাত আছে, তাঁর মুখ আছে, ইত্যাদি! এ সব শুনে আমরা সেই সিংহাসনের কথাই ভাবি, যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, সেই হাতের কথাই ভাবি, যা আমাদের দেহের মধ্যে আছে, সেই মুখ বিশেষের কথাই ভাবি যা আমাদের অভিজ্ঞতায় সব চেয়ে মহিমময়! কিন্তু খোদার সত্তা এই সিংহাসনে বসা থেকে, এই হাত এবং মুখের বন্ধন থেকে মুক্ত!

স্বশরীরে শেষ-বিচারের দিন হাশরের ময়দানে একত্রিত হওয়া, স্বর্গের আমোদ-প্রমোদ, নরকের শারীরিক শাস্তি প্রভৃতির কথা যে সব আয়েতে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলিকে রূপক রূপেই মেনে নিতে হবে। স্বশরীরে হাশরের ময়দানে একত্রিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, আমাদের বর্ত্তমান ধরণের দেহ নিয়ে একত্রিত হওয়া; কিন্তু নিঃসন্দেহরূপে বলা যেতে পারে যে, উক্ত আয়েতগুলির উদ্দেশ্য এ কথা প্রকাশ করা নয় যে, আমরা আমাদের এই নশ্বর দেহ নিয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হব। স্বর্গের আমোদ-প্রমোদ, নরকের দুঃখ-যন্ত্রণা প্রভৃতির বিষয় যা কোরাণে বলা হয়েছে, সে সব আমাদের দেহের কথা না ভেবে বোঝা যায় না; অথচ এ কথা নিঃসন্দেহরূপে বলা যেতে পারে যে, পরলোকের সেই সুখ এবং দুঃখ সম্পূর্ণ পৃথক্ ধরণের জিনিষ হবে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কোরাণের এই অংশগুলি রূপক-মূলক; তাদের বিভিন্ন অর্থ করা যেতে পারে, অথচ, তাদের প্রকৃত অর্থ নির্দ্দিষ্ট করা যায় না; অথবা তাদের মধ্যে এমন প্রচ্ছন্ন অর্থ আছে, যা মানুষ তার বর্ত্তমান অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারে না, আর সেইজন্য রূপকের সাহায্যে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। কুটিল এবং কলহপ্রিয় লোকেরা বিতণ্ডা সৃষ্টি করবার জন্য ঐসব আয়েতের আলোচনায় মত্ত থাকে, আর ওসবের কদর্থ করে থাকে। আর যাঁরা জ্ঞানের উপর দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা বলেন, যা কিছু এসেছে, সব খোদার নিকট থেকেই এসেছে। তাঁরা এই সব আজগুবি অর্থের পিছনে যান না, অথবা টিকা-টিপ্পনী নিয়ে মত্ত হন না। তাঁরা বলেন, সেই কার্য্য-কারণের মূল, যাঁকে আমরা খোদা বলি, তাঁর কোন অংশীদার নাই। তিনি হচ্ছেন সব জিনিষের স্রষ্টা। তাঁর মধ্যে এমন এক গুণ থাকা দরকার, যাকে আমরা জীবন নামে অভিহিত করি; তিনি সেই হীনতা থেকে মুক্ত, যাকে আমরা মৃত্যু নামে অভিহিত করি; তাঁর মধ্যে সেই সব গুণ থাকা দরকার, যাদের আমরা শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি, জ্ঞান, দয়া, ক্রোধ, বিরক্তি প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে থাকি; তাঁর মধ্যে এমন কিছু থাকার দরকার, যার সাহায্যে, তিনি সেই সব কাজ করেন, যা আমরা হাত, পা, মুখ প্রভৃতির সাহায্যে করে থাকি। তাঁকে সব জিনিষের কার্য্য-কারণ হতে হলে, সব জিনিষের স্রষ্টা হতে হলে, এই সব শক্তির তাঁর প্রয়োজন। এইজন্য আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি দেখতে পান; আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি শুনতে পান; আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি জ্ঞানী; আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি দয়ালু; আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি দানশীল; আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি শাস্তিদাতা; আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি শক্তিমন্ত। কিন্তু কিভাবে তিনি জীবন ধারণ করেন, তাঁর মৃত্যু-হীনতার অর্থ কি, এই বিভিন্ন গুণাবলী কিভাবে তাঁর মধ্যে বিরাজ করে, এ সব বিষয় আমাদের জ্ঞানের অগম্য। এ সব বিষয় আমাদের বলতে হয় যে, এ সবের অর্থ এক আল্লা ছাড়া কেউ বোঝে না; আমরা কেবল এই পর্য্যন্ত বলতে পারি যে, তিনি আমাদের মত নন; আমরা যে ভাবে অনুভব করি, তিনি সে ভাবে অনুভব করেন না। আমাদের বিশ্বাস, রূপক-মূলক আয়েতগুলিতে যে ইমান আনতে বলা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের মধ্যে এই ধরণের মনোভাবের সৃষ্টি করা। আর মানুষের প্রকৃতিও তাই চায়!"

Great minds think alike. ইউরোপের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক Emanuel Kant আল্লার প্রতি গুণাবলী আরোপের বৈধতার আলোচনা প্রসঙ্গে যে মূল্যবান কথাগুলি বলেছেন তার সঙ্গে সার সৈয়দ আহমদের মতের বিশেষ ঐক্য আছে। তিনি বলেছেন—

"Our notion of the Deity is a pure concept of Reason, but represents only a thing containing all realities, without being able to determine any of them ; because for that purpose an example must be taken from the sensuous world, in which case we should have an object of sense only, but something quite heterogenous, which cannot be such. For suppose I attribute to the Supreme Being understanding, for instance ; I have no concept of an understanding other than my own, one that must receive intuitions by the senses, and which is occupied in bringing them under rules of the unity of Consciousness. Then the elements of my concept would always lie in the phenomenon ; I should, however, by the insufficiency of the phenomena be necessitated to go beyond them to the concept of a being which neither depends upon phenomena, nor is bound up with them as conditions of its determination. But if I seperate understanding from sensibility to obtain a pure understanding then nothing remains but the mere form of thinking without intuition, by which form alone I can cognize nothing determinate, and consequently no object. For that purpose I must conceive another understanding which should intuite objects but of which I have not the least notion ; because the human understanding is discursive, and can only cognize by means of general concepts. And the very same difficulties arise if we attribute a will to the Supreme Being ; for we have this concept only by drawing it from an internal experience, and therefore, from our dependence for satisfaction from objects whose existence we require ; and so the notion rests upon sensibility, which is totally repugnant to the pure concept of the Supreme Being.

Hume's objections to Deism are weak, and affect only the proofs, and not the deistical assertion itself. But as regards theism, which depends on a stricter determination of the Deist's merely transcendent concept of the Supreme Being, they are very strong ; and after (and according as) this concept is formed, in certain (in fact in all common) cases irrefragable. Hume always insists, that the mere concept of an original being to which we only apply ontological predicates (eternity, omnipresence, omnipotence) we think nothing determinate, and that properties which can yield a concept 'in concreto' must be super added ; that it is not enough to say, it is cause but we must explain the nature of its causality, for example, that of an understanding, and of a will. He then begins his attacks on the assertion itself, theism, as he had previously directed his battery only against the proofs of deism an attack which is not very dangerous in its consequence. All his dangerous arguments refer to anthropomorphism, which he holds inseparable from theism, and to make it absurd in itself ; but if the former be abandoned, the latter must vanish with it, and nothing remains but Deism, of which nothing can come, which is of no value, and which cannot serve

as any foundation to religion or morals. If this anthropomorphism were really unavoidable, no proofs whatever of the existence of a Supreme Being, even were they all granted, could determine for us the concept of this Being without involving us in contradictions.

If we connect with the command to avoid all transcendent judgments of pure reason, the command (which apparently conflicts with it) to proceed to concepts that lie beyond the field of its immanent (empirical) use, we discover that both can subsist together, but exactly at the boundary of all lawful use of reason. For this boundary belongs as well to the field of experience, as to that of the beings of thought, and we are thereby taught, as well, how these so remarkable ideas merely serve for marking the bounds of human reason. Thus we are told, on the one hand, not to extend cognition of experience without bounds, as if nothing but mere world remained for us to cognize, and yet, on the other hand, not to transgress the bounds of experience, and to think of judging about things beyond them, as things in themselves.

But we stop at this boundary if we limit our judgment merely to the relation which the world may have to a being whose very concept lies beyond all the knowledge which we can attain within the world. For we then do not attribute to the supreme being any of the properties in themselves, by which we represent objects of experience, and thereby avoid dogmatic anthropomorphism; but we attribute them to his relation to the world, and allow ourselves a symbolic anthropomorphism, which in fact concerns language only, and not the object itself.

If I say that we are compelled to consider the world, as if it were the work of a supreme understanding and will, I really say nothing more, than that a watch, a ship, a regiment, bears the same relation to the watch maker, the ship builder, the commanding officer, as the world of sense (or whatever constitutes the substratum of this complex phenomena) does to the unknown, which I do not hereby cognize as it is in itself, but as it is for me, or in relation to the world, of which I am a part. Such a cognition is analogical, which does not signify, as is commonly understood, an imperfect similarity of two things, but a perfect similarity of relations between two quite dissimilar things. By means of this analogy, however, there remains the concept of a supreme being, sufficiently determinate for us, though we have left out every thing that could determine it absolutely as in itself; for we determine it as regards the world, and as regards ourselves, and more we do not require. The attacks which Hume makes upon those who would determine this concept absolutely, by taking in the materials for so doing from themselves and the world, do not affect us; and he cannot object to us, that we have nothing left if we give up the objective anthropomorphism of the concept of the supreme being.

Vide Kant's Prologomena (Mahaffy's translation).

মানুষের জীবন নিয়ে সাহিত্যিকের কারবার। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য কি? ভাল কাজ, ভাল চিন্তা, ভাল আদর্শ এই হ'ল মানব-জীবনের লক্ষ্য। কোরাণে এসেছে "খালাকাল মাওতা ওয়াল হায়াতা লে ইয়াবলুয়াকুম আইয়োকুম আহসানো আমেলা"—আল্লা জন্ম-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন, পরীক্ষা করবার জন্য, তোমাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে।"

প্রশ্ন উঠে কি কাজ ভাল, আর কি কাজ মন্দ; কোন চিন্তা ভাল, আর কোন চিন্তা মন্দ; কোন আদর্শ ভাল, আর কোন আদর্শ মন্দ?

এ বিষয় কোরাণ চিরকালের জন্য আমাদের পথ দেখিয়ে গেছে—"সবেগাতাল্লাহ্ ওয়া মান্ আহসানো মিনাল্লাহে সাবেগাতান্—ওয়া নাহনো লাহো আবেদুন।"

—আল্লা আমাদের রং দিয়েছেন। আর আল্লার মত রং দিতে কে পারে? আর আমরা তাঁরই নির্দ্দেশ মত চলি!

পাঠক প্রশ্ন করিবেন, কি রং আল্লা আমাদের দিয়েছেন? কোন পথে চলতে তিনি আমাদের বলেছেন? কি ভাবে জীবনযাপন করলে তাঁর নির্দ্দেশমত, তাঁর ইচ্ছামত চলা হয়?

মহাগ্রন্থ কোরাণ অতি স্পষ্টভাবেই আমাদের—তথা সমগ্র মানবজাতির গতি এবং লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছে; মুক্তির, সাফল্যের, কাম্যের পথ তাদের দেখিয়ে দিয়েছে। "ফাকিম ওয়াজহাকা লিদ্দিনেহানিফা ফিতরাতাল্লাহিল্লাতি ফাতারান্নাসা-আলায়হা—লাতাবদিলা লেখাল কিল্লাহ্-যালেকাদ্দীনুলকাইয়েম-ওয়ালাকেন্না আকসারান্নাসে লা ইয়ালামুন!"

তোমরা সরল-ধর্ম্মের দিকে মুখ কর; আল্লার সৃষ্ট স্বভাব ধর্ম্মের দিকে, যে স্বভাব দিয়ে আল্লা মানুষকে গড়েছেন; আল্লার সৃষ্টির পরিবর্ত্তন হয় না; এই হল সরল এবং সুপ্রতিষ্ঠিত পথ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ, এই সত্যের সঙ্গে অপরিচিত!"

প্রত্যেক আইনের একটা করে Preamble, প্রস্তাবনা থাকে। তাতে আইনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। আইনের বিশেষ কোন্ ধারা বুঝতে অসুবিধা হলে সেই Preamble এর দিকে লক্ষ্য রেখে তার ব্যাখ্যা করতে হয়। উপরোক্ত অমূল্য আয়েতটাই হল ইসলামের জীবন-নীতির Preamble। এই আয়েতকে অবলম্বন করেই আমাদের ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করতে হবে, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করতে হবে, আমাদের জীবনের গতির নির্দ্দেশ এবং নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এ আদর্শ কেবল মুসলমান জাতির জন্য নয়; এ আদর্শ হল বিশ্ব-মানবের জন্য। বিশ্বে এ আদর্শকে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

পাঠক হয়ত বলবেন, সাহিত্যের আলোচনায় এসব ধর্ম্মের কথা কেন, দর্শনের কথা কেন? একটা বাগান বানাতে হলে জমীর আকার প্রকার, তার পরিসর, তার অবস্থান, তার আব-হাওয়া, তার বেষ্টনী, সবকেই গণনার মধ্যে আনতে হয়; আর এসবের পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করে তবে বাগানের ভিত্তি স্থাপন করতে হয়। তবে গিয়ে বাগান আমাদের চিত্ত-বিনোদন করে, আমাদের সৌন্দর্য্যের কামনাকে মনোরম একটা রূপ দেয়। একটা সমাজ কিম্বা রাষ্ট্র গঠন করতে হলে, দেশের ভৌগলিক আকার-প্রকার, তার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিশেষত্ব, তার ধর্ম্ম এবং কৃষ্টি, তার ইতিহাস, তার পারিপার্শ্বিক জগতের অবস্থা, এসবকে গণনার মধ্যে এনে, এসবের গুরুত্বের উপযুক্ত সংস্থান সেই সমাজ কিম্বা রাষ্ট্রের মধ্যে করে, তবে গঠন-কার্য্যে অগ্রসর হতে হয়। সাহিত্যের বিষয়ও ঠিক সেই একই কথা বলা চলে। সাহিত্য গড়তে হলে, প্রথম দেখতে হবে, কাদের জন্য সাহিত্য গড়া হচ্ছে,—তাদের দেশ কিরূপ, তাদের সমাজ কিরূপ, তাদের কালচার কিরূপ, তাদের ধর্ম্ম কিরূপ, তাদের বেষ্টনী কিরূপ, তাদের আদর্শ কিরূপ ইত্যাদি। বাগানের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভাল ফুল এবং ভাল ফলের সৃষ্টি করা. সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চতর মানবতার সৃষ্টি করা। মালিকে বাগানের বিভিন্ন বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে, ভাল ফুল এবং ভাল ফল সৃষ্টির চেষ্টা করতে হয়; সাহিত্যিককে সমাজের বিভিন্ন বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে, উচ্চতর মানবতার সৃষ্টি করবার চেষ্টা করতে হবে।

ভাল বাগান করতে হলে, কেবল স্থান এবং উপকরণের দিকে লক্ষ্য রাখলে চলে না, বাগানের পাট করাও দরকার, আগাছা উপড়ান দরকার, জল-নিকাশের ব্যবস্থা করা দরকার, কীট-পতঙ্গ এসে বীজ এবং চারা গাছগুলিকে যাতে নষ্ট করতে না পারে, তার ব্যবস্থা করা দরকার। ভাল সাহিত্য গড়তে হলে, মানুষের যোগ্য সাহিত্য গড়তে হলে, সাহিত্যের সাহায্যে উচ্চতর মানুষ গড়তে হলে, সমাজ-জীবনেরও পাট করার প্রয়োজন। যে সব সংস্কার, যে সব সামাজিক ব্যবস্থা, যে সব পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৎ সাহিত্যের সম্যক বিকাশের প্রতিকূলতা করে, আমাদের সে সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, সে সবের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করতে হবে, সে সবের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলতে হবে।

এই ধরুন আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা। এমন মারাত্মক ও অবৈজ্ঞানিক একটা প্রথা শিক্ষার নামে আর কোন দেশে প্রচলিত আছে বলে আমার জানা নাই। এই ব্যবস্থায়, বিভিন্ন ভাষার, বিভিন্ন বিষয়ের এবং বিভিন্ন আদর্শের চাপে পড়ে, শিশুর সুকুমার ভাবগুলি, তার স্বাভাবিক প্রতিভা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। শিক্ষনীয় বিষয়-গুলির প্রতি তার অন্তর বিদ্রোহী হয়ে উঠে। ফলে, মুখস্থ করে সে পরীক্ষায় পাস করে বটে, কিন্তু শিক্ষা তার বাহিরের আবরণের মতই রয়ে যায়; তার অন্তরের মানুষটীকে স্পর্শ করে না, তাকে প্রভাবান্বিত করে না। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি এবং সে উদ্দেশ্য সাধনের সহজ বৈজ্ঞানিক উপায় কি সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির আলোচনা এবং সমালোচনা করতে হবে।

Inferiority Complex বা হীনতাসূচক মনোবৃত্তি বাঙালী মুসলমানের জীবনে অতি গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসে আছে, আর তাদের উন্নতি, বিকাশ, এবং প্রতিষ্ঠার পথে নানাপ্রকার বিঘ্নের সৃষ্টি করছে। এ মানসিকতা কেমন করে এল, কি করে একে তাড়াতে পারা যায়, এ সমস্যা নিয়েও সাহিত্যিকদের গবেষণা করতে হবে এবং লেখনী চালনা করতে হবে।

হিন্দু-কালচারের প্রভাব বাঙালী মুসলমানের জীবনে প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত। আর তার দরুণ তার নিজস্ব কালচারের আদর্শগুলি সম্যকভাবে বিকাশ লাভ করতে পারছে না। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, আমাদের কালচার সেমিটিক (Semitic) এবং হিলেনিক (Hellenic) এই দুই কালচারের সংমিশ্রণের ফল। ইউরোপের বর্ত্তমান কালচারও তাই, সুতরাং আমাদের কালচারের সঙ্গে হিন্দু কালচারের চেয়ে ইউরোপীয় কালচারের সম্বন্ধ এবং সম্পর্ক ঘনিষ্টতর। আশা করি, আমাদের সাহিত্যিকেরা এই সরল সত্যটী মনে রেখে সাহিত্য সাধনার পথে অগ্রসর হবেন।

আর্থিক দুরবস্থা আমাদের সর্ব্বাধিক দুরবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ। আমাদের বর্ত্তমান দারিদ্র্যের কারণ কি, কি করে সে দারিদ্র্য বিদূরিত করা যেতে পারে, এ প্রসঙ্গের আলোচনাও সাহিত্যিকের জন্য অপরিহার্য্য।

Mathew Arnold বলেছেন 'Literature is the criticism of life'—সাহিত্য হচ্ছে জীবনের সমালোচনা। কথাটা সত্য হলেও, এতে একটু যোগ দেবার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয়, আমি তাই বলি Literature is the criticism of life from the view point of the ideal immanent in life—সাহিত্য হচ্ছে জীবনের সমালোচনা, জীবনের অন্তর্নিহিত আদর্শের দিক থেকে।

জীবনের কাজ শেষ করে, অতুলনীয় সাধনার সাহায্যে বিশ্বে আল্লার রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে, বন্ধুবরের সঙ্গে মিলিত হবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, বিদায় হজ্জের মহাদিনে, হজরত মোহাম্মদ বলেছিলেন,—

"ইন্নাজামানো কাদাস্তাদারা কাহিয়াতা ইউমা খালা-কাল্লাহোস্‌সামাওয়াতে ওআল আরদে।"

"আল্লা সৃষ্টির প্রথমদিনে, যেদিন তিনি আকাশ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছিলেন, সেদিন বিশ্বকে যে রূপ দিয়েছিলেন, ঘুরে-ফিরে মহাকাল সেই রূপেই তাকে ফিরিয়ে এনেছে!" এত বড় কথা কোন মানুষ কখনও বলেনি এবং বলতে পারবেও না। এত বড় কথা বলবার অধিকার কোন সাহিত্যিক কখনও পাবে না। তবে সাহিত্যিক যদি বলতে পারে যে, আল্লা সৃষ্টির প্রথমদিনে, যেদিন তিনি আকাশ এবং ধরাকে সৃষ্টি করেছিলেন, সেদিন বিশ্বকে তিনি যে রূপ দিয়েছিলেন, সে রূপের ক্ষীণ একটা আভাস আমি দেখতে পেয়েছি, আর আমার কলমের সাহায্যে তাকে রূপায়িত করেছি, তা হলেই তার সাধনা সার্থক হবে।*

এস, ওয়াজেদ

* বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

গোযানে গৌড় ভ্রমণ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মল্লিক বি. এস্-সি; বি. ই., সি. ই.

বহরমপুরস্থ কতিপয় বন্ধু বড়দিনের ছুটী উপলক্ষে ‘ৌড়ের ধ্বংসাবলির মধ্যে বিচরণ এবং শিকার সংগ্রহ নসে সহসা গত ২৪শে ডিসেম্বর ৩৮ সালে অতি প্রত্যূষে হ হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া ই, আই, রেলের হল্টিং ষ্টেশন ন্দুপাড়ায় নামিলেন। এবং দে-বাবুর গৃহে অতিথি হসাবে চর্ব্ব-চূষ্য-লেহ্য এবং পানীয়ে পরিতৃপ্ত হইয়া. ফরক্কার াটে পদ্মা পার হইলেন। অতঃপর বরাবর গোযানে ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গৌড়ের নিকটবর্ত্তী শেরসাহী গ্রামে স্থানীয়া জমিদার দেবী চৌধুরাণীর গৃহে আশ্রয় লাভ করিলেন। চতুর্থ বন্ধুটী সরকারী চাকুরিয়া। কর্ম্মস্থল পরিত্যাগের অনুমতি পত্র ২৪শে সাড়ে আটটার সময় পাইলেন। দশটার ট্রেনে ই, বি, রেলওয়ে যোগে লালগোলা ঘাটে পদ্মা পার হইয়া সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় মালদহের ইংলিশ বাজারে উপনীত হইলেন এবং শুনিলেন যে সহরটীতে ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায় না। এবং অপর কোন যানও নাবি এই পুরাতন দেশে রাত্রে চলে না। সুতরাং স্থানীয় ডাক বাংলায় রাত্রি যাপন করিয়া বন্ধুবর পরদিন প্রাতে মোটর যোগে শেরসাহী গ্রামে আসিয়া পুর্ব্বোক্ত বন্ধুত্রয়ের সহিত মিলিত হইলেন; এবং পুর্ব্বোক্ত জমিদারের গৃহে সমাদর ও আতিথ্য লাভ করিলেন।

ম্যাপ

এই শেরসাহী গ্রাম মালদহ হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। রাস্তা কতক পাকা এবং কতক কাঁচা। পোলগুলি দারু-নির্ম্মিত এবং বিপজ্জনক। রেশম কীটের ব্যবসা এই অঞ্চলে এখনও চলিত আছে। এই গ্রামের ১৫০০ শত লোকের জীবিকার উপায় এই রেশম কীট। বৎসরে ৭০, ৮০ লক্ষ টাকার রেশম মালদহ জেলায় উৎপন্ন হয়। সস্তা

বিদেশী সিল্কের সহিত প্রতিযোগিতায় যে এখনও ইহা টিকিয়া আছে—তাহা আশ্চর্য্য মনে হইল। এখানে অভয় আশ্রমের কর্ম্মীরা একটী সিল্কের কেন্দ্র খুলিয়া কার্য্য চালাইতেছেন। তাঁহাদের অক্লান্তকর্ম্মা সদালাপী কর্ম্ম-সচিব র'-বাবুর সহিত পরিচয়ে সকলে মুগ্ধ হইলেন।
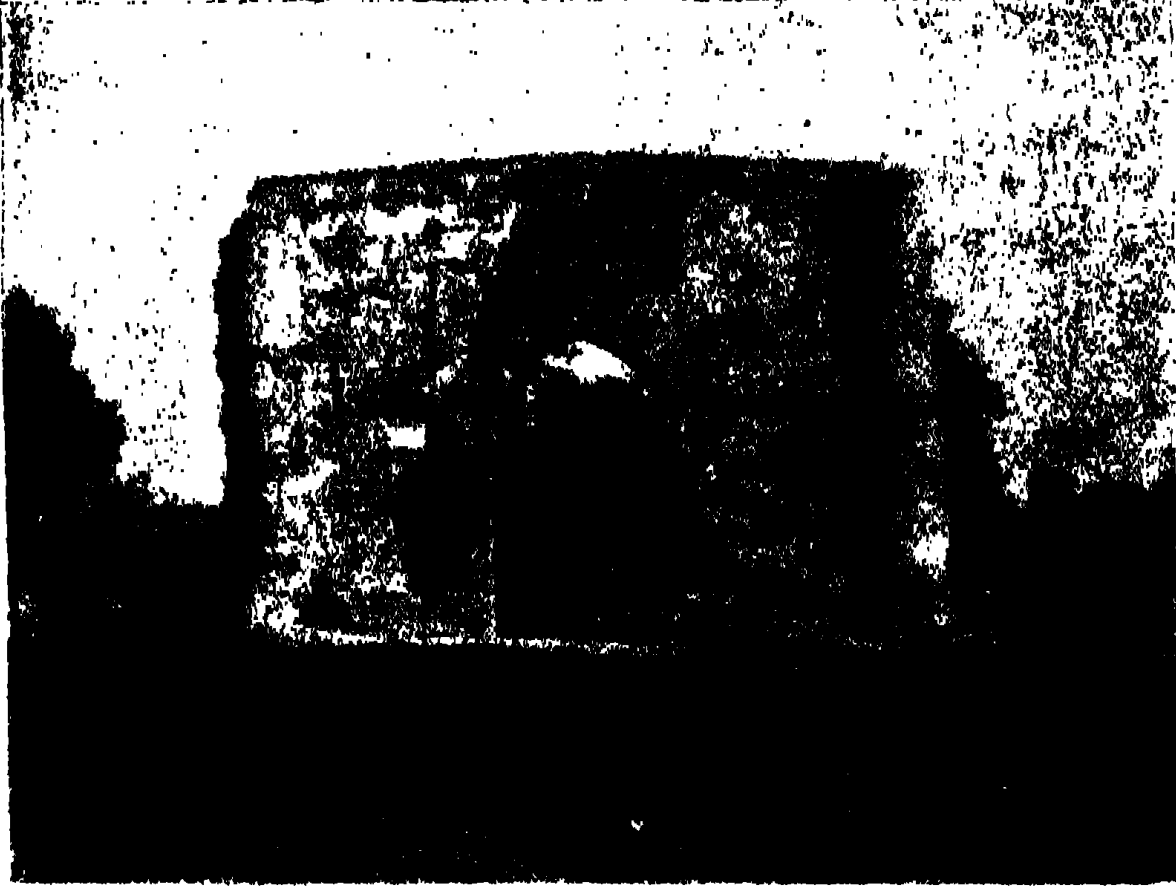
বারদুয়ারীর পূর্ব্ব তোরণ

শেরসাহী গ্রামের সান্নিধ্যে "পাগলা" নামীয় একটী নদী প্রবাহিত। তাহার অনতি-দূরেই আর একটী তদ্রূপ নদী "ভাগীরথী" প্রবাহমান। পদ্মা এখন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। এই নদীগুলির স্থান পরিবর্ত্তন পূর্ব্ব পৃষ্ঠার নকসায় বুঝা যাইবে। যেহেতু ভাগীরথীর একটী অংশ পদ্মার উত্তরে চলিয়া আসিয়াছে—তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে পদ্মা আরও উত্তর দিয়া প্রবাহিত ছিল। বোধহয় বর্ত্তমান পাগলা ও কালীন্দী নদীই উত্তরে পদ্মার বাহিকা পথ ছিল। গৌড়ের পূর্ব্ব এবং উত্তর দিকে বিরাট বিরাট মাটীর বাঁধ দেখিয়া সাধারণতঃ মনে হয় যে পদ্মা গৌড়ের উত্তরে অবস্থিত সাদুল্লাপুরের ঘাট হইতে ক্রমশ ঘুরিয়া নগরীর পূর্ব্বদিক ধৌত করিয়া যাইত। এবং ভাগীরথীও সাদুল্লাপুরের ঘাট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহার প্রাচীন খাদ বাহিয়া নগরীর পশ্চিম দিক দিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত ছিল। অর্থাৎ গৌড় নগরী প্রায় একটী দ্বীপের মত ছিল। নিকটবর্ত্তী ভাতিয়ার বিলটীও যে পদ্মার গর্ভ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজধানীর এইরূপ অবস্থান স্বাস্থ্যের এবং বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ নিরোধের দিক দিয়া সুন্দর ছিল বটে কিন্তু নদীমাতৃক পলিমাটীর দেশে বন্যার ভাঙ্গনেরও যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল।

বাংলার বৌদ্ধ পাল রাজাদের সময়েও যে গৌড় সমৃদ্ধ ছিল—তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের অনুসন্ধানে পাওয়া যায়। এখনও বহু বৌদ্ধ মূর্ত্তি, শিলা, এবং ভাস্কর্য্য গৌড়ের মাঠ হইতে সংগৃহীত হইয়া গুমটী মসজীদে প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। ৬০০শত খৃঃ অব্দ হইতে ১২০০ শত খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ৬০০ শত বৎসর হিন্দু গৌড় নগরী বাঙ্গালীর শিল্প-কলা বাণিজ্যের এবং রাজশক্তির কেন্দ্রস্থল ছিল। এখন হিন্দু সময়ের কোনও ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল কতকগুলি বিরাট বিরাট দীঘি এবং পুষ্করিণী যথা বড় এবং ছোট সাগরদীঘি, বল্লাল দীঘি, ট্যাকশাল দীঘি, ইত্যাদি প্রাচীন যুগের রাজাদের জনহিতকর কার্য্যের সাক্ষ্য দিতেছে। এই সকল জলাশয় উত্তর পশ্চিমে লম্বা এবং মুসলমান আমলের খোদিত নহে।

রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে গৌড়ের উত্তর পশ্চিম সহরতলীর নামকরণ হয় লক্ষ্মণাবতী (বা লখ্‌নাওতি)। এই সময় রাজপ্রাসাদ ও ধর্ম্মাধিকরণগুলি ঐ ধারে লইয়া যাওয়া হয়। এই সময় হইতে মুসলমান নরপতিগণের দ্বারা সমগ্র গৌড় রাজ্য অধিকৃত হয়। কিন্তু রাজধানী গৌড়েই খৃঃ অঃ ১৩৫০ সাল পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে। ১৩৫০ সালে বাঙ্গালার পাঠান রাজারা নিকবর্ত্তী পাণ্ডুয়ায় রাজধানী
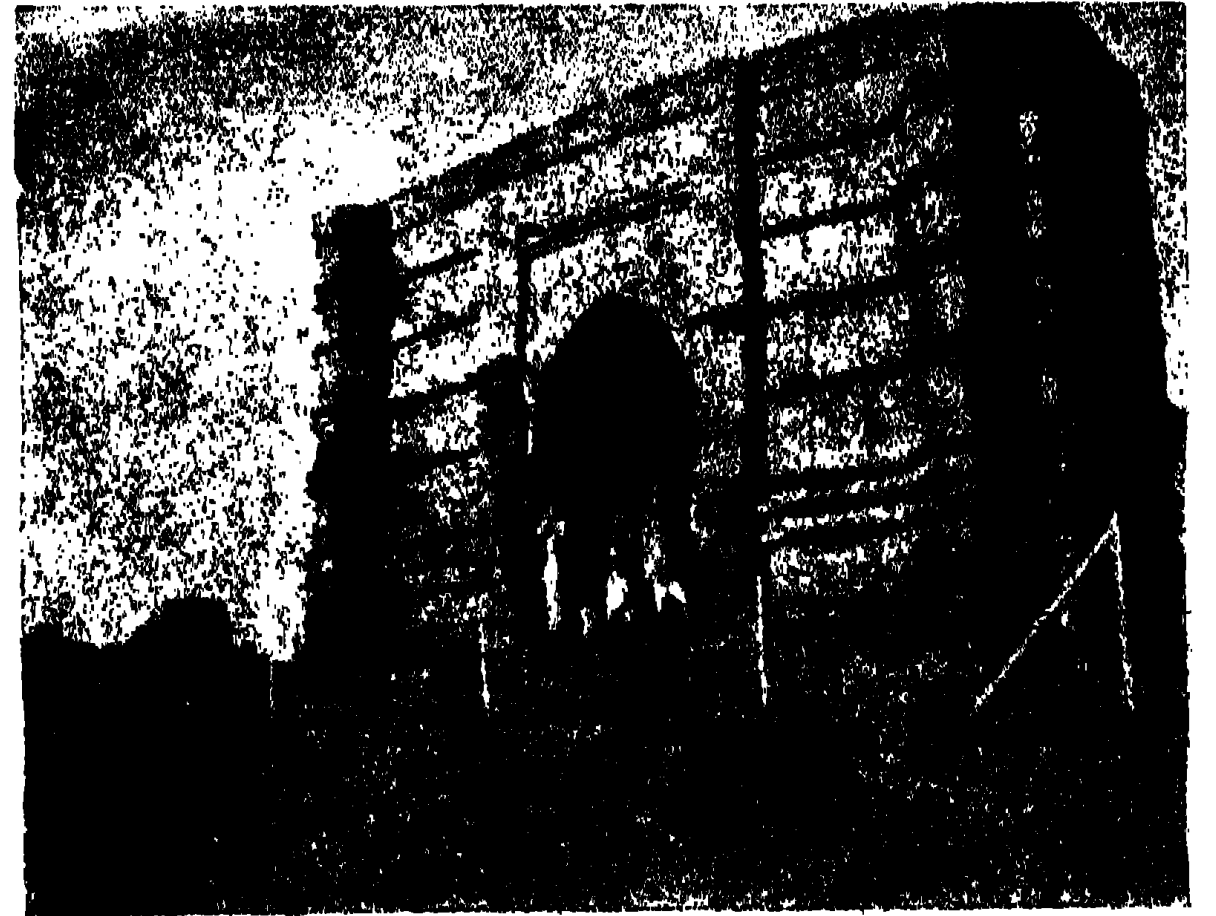
বারদুয়ারীর উত্তর তোরণ

স্থানান্তরিত করেন। এবং গৌড়ের বহু সুন্দর সুন্দর সৌধমালা ধ্বংশ করিয়া পাণ্ডুয়ার গৃহাদি নির্ম্মাণের মালমশলা সংগ্রহ করেন। ১৪৫৩ সালে রাজধানী পুনরায় গৌড়ে ফিরিয়া আসে। এবং ১৬০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত থাকিয়া সহসা এক মহামারীর আবির্ভাবে সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। অস্তিত্ব হিসাবে গৌড়ের তুলনায় কলিকাতার এখন শৈশবকাল চলিতেছে বলিতে হইবে।

বারদুয়ারীর বামার্দ্ধ
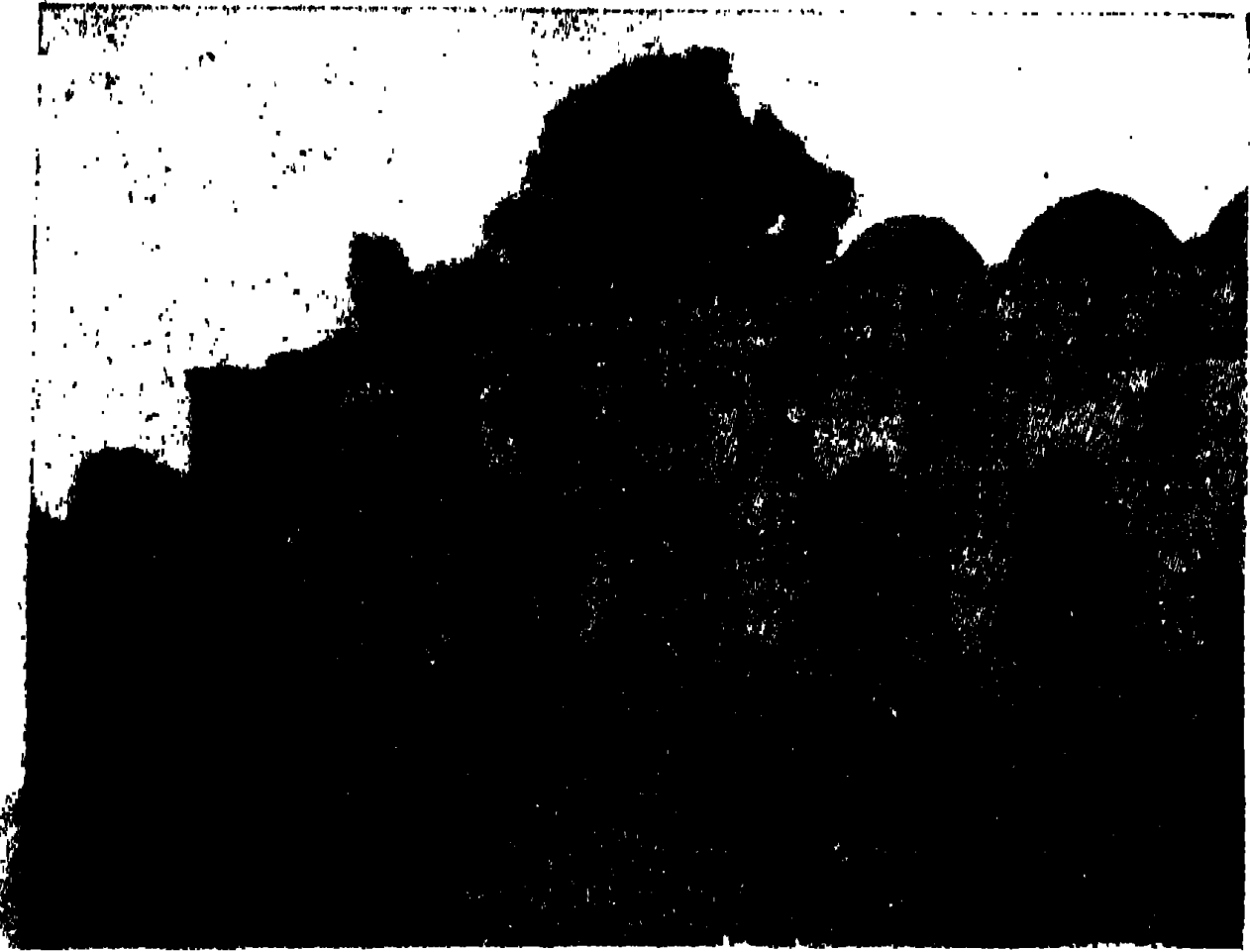
ধ্বংসাবশেষের বিস্তৃতি দেখিলে মনে হয় গৌড় নগরী উত্তর দক্ষিণে ৮।৯ মাইল ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৪।৫ মাইল, প্রায় ৪০ বর্গমাইল, বিস্তৃত ছিল। পর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিক '[illegible]'র [illegible] অনুসারে মহামরীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ১৬০০ খৃঃ অব্দে গৌড়ের লোক সংখ্যা ১২ লক্ষ ছিল। [illegible] এবং লোক সংখ্যায় হাওড়া বাদে কলিকাতার মত নগরী বিরাট এবং জনবহুল ছিল। এতবড় নগরীর জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের বোধ হয় বিশেষ সুব্যবস্থা ছিল না। মহেঞ্জো দারো কিম্বা হারাপ্পায় পথঘাট, স্নানাগার, এবং পানীয় জল সরবরাহের যে সমস্ত ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহার অনুরূপ এখানে কিছুই নাই। হয়ত মহামারীর ইহা অন্যতম কারণ হইতে পারে।

২৫শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় চায়ের আসরে স্থির হইল যে পরদিন প্রত্যুষে আটার সময় সেরশাহী হইতে আমাদিগকে গোপনে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পশ্চিমমুখে [illegible] হইতে হইবে। তদবস্থায় সকাল ৭॥০টায় রামকেলী গ্রামে শীতে রামকেলী রাগিনী ভাঁজিতে ভাঁজিতে বড়সোনা মসজিদ্ ওরফে বারদুয়ারী প্রদক্ষিণ করিতে হইবে! দেখিবার পালা নাকি এইভাবে সুরু হইবে। এবং দেখিতে দেখিতে আমরা ফিরোজপুর গ্রামের ছোট সোনা মসজিদে প্রায় গোধূলি লগ্নে পৌছিব। সেই স্থানে ট্যাঁকশাল দীঘির ট্যাঁকে অবগাহন সারিয়া মধ্যাহ্নে খিচুড়ী ভোজন পূর্ব্বক অপরাহ্নে গোশকটে মির্জাপুরে ফ-বাবুর সদ্য প্রস্তুত কাছারী বাটীতে গৃহস্বামীর সহিত গৃহ প্রবেশ করিতে হইবে। পরদিন নিকটবর্ত্তী বিশাল ভাতিয়ার বিলে পক্ষী শিকার ইত্যাদি। প্রোগ্রাম শুনিয়া সকলে নড়িয়া চড়িয়া উঠিয়া বসিলেন। ফ-বাবু এবং র-বাবুদ্বয় হিংস্র শিকারী ও বন্দুকধারী। তাঁহারা তাঁহাদের বন্দুকে শান দিতে এবং কার্ত্তুজ গুছাইতে সুরু করিলেন। শ, ফ এবং নী বাবুরা অহিংস নীতির এবং নস্যের উপাসক সুতরাং তাঁহারা নস্যেরদানী এবং ফটোগ্রাফির সরঞ্জাম সাজাইয়া লইলেন। অতঃপর ভূরি ভোজনের পরে একটী বিরাট ফরংকা প্রান্তরে সকলে লেপাবৃত হইয়া নাসারন্ধ্রে নানা প্রকার বৈতালিক সুর-সঙ্গত করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর মন্দির—রামকেলী

হঠাৎ গভীর রাত্রে দারুণ গোলমাল শুনিয়া সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল! এবং কোন এক অদৃশ্য-নিপুন-হস্তের টানে সমুদায় লেপগুলি লুপ্ত হইয়া গেল! শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া পড়িলাম। একটী হ্যারিকেন লণ্ঠনের

ক্ষীণালোকে ক-বাবুর—কর্ম্ম-কোলাহল মূর্ত্তি পরিদৃশ্যমান হইল। তিনি বলিতেছিলেন—"ওহে—আর ঘুমাইও না—দেখ চক্ষু মেলি! তিনটা বাজিয়াছে! এইবার রওনা দেওয়া যাক। এখন রওনা দিলে রামকেলী পৌছাইতে ঠিক ভোর হইয়া যাইবে।"

রূপসাগর এবং মার্কেল ফলক

আহা—এই ভোর রাত্রে এরূপ নির্দ্দয় ভাবে লেপ টানা-টানি না করিয়া কেহ যদি মিশ্র রামকেলী ভাঁজিয়া ঘুম ভাঙাইত!

যাহা হউক, বাহিরে আসিয়া দেখা গেল গভীর আঁধার। কেবল কতকগুলি তারা আকাশে বিনিদ্র অবস্থায় পাহারা দিতেছিল। ক-বাবুদের মন্দির প্রাঙ্গণে পাঁচটী ছাউনি-বিশিষ্ট গোযান সারি সারি গরু সহ দণ্ডায়মান। এবং সেই বিলুপ্ত লেপগুলি গাড়ীগুলির ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে দেখা গেল। বহু কসরৎ করিয়া প্রত্যেক গাড়ীতে ২।৩ জন বিশালদেহী ভ্রাম্যমান প্রবিষ্ট হইলেন এবং লেপাবৃত-লম্বমান অবস্থায় গভীর আঁধারে নিরুদ্দেশ যাত্রা সুরু করিলেন! সে অতি আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা। যাঁহারা কখনও গোশকটে আরোহণ করেন নাই—তাঁহারা হয়ত শুনিয়া নাসা কুঞ্চিত করিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের ধূলিমলিন গর্ত্তসঙ্কুল কাঁচা পথের যোগ্য আর কোনও যান নাই। দেশব্যাপী দারিদ্র্যের ভিতরও কেমন করিয়া স্বাবলম্বী হওয়া যায় তাহা এই গরুর গাড়ীতে চড়িয়া, গরু, গাড়োয়ান ও দেশের মাটীর অত্যন্ত সান্নিধ্যে না আসিলে, ঠিক অনুধাবন করা যায় না। ইহার ভিতর একটী নীরব আত্ম-সম্মান লুকায়িত আছে।

ক্রমে চারিধার পরিষ্কার হইয়া গেল; ভাগীরথী নদী অতিক্রম করিয়া ৬।৭ মাইল পরে রামকেলী গ্রামে গাড়ীগুলি আসিয়া পড়িল। ২টী গাড়ী নাই দেখিয়া অতীব শঙ্কিত চিত্তে বী-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাহারা কোথায় গেল?" কারণ তাঁহার প্রাতঃকৃত্যাদির সরঞ্জাম সেইগুলির একটীতে ছিল। ফ-বাবু—বলিলেন—"তাহারা ছোট সোনা মসজিদে গিয়া রন্ধন প্রস্তুত করিয়া রাখিবে।" যাহাই হউক, চায়ের সরঞ্জাম আমাদের গড্ডালিকায় ছিল।

সম্মুখেই একটী বিশাল মসজিদ পরিদৃশ্যমান হইল। ফ বাবু আমাদের গাইড এবং রা-বাবু ঐতিহাসিক। তিনি বলিলেন—"ইহার নাম বারদুয়ারী।" পরে জানিলাম ইহাকেই বড় সোনা মসজিদ বলে। ইহার অধিকাংশ কাল গ্রানাইট পাথরে প্রস্তুত। ডোমগুলি পাতলা ইটে গাঁথা।
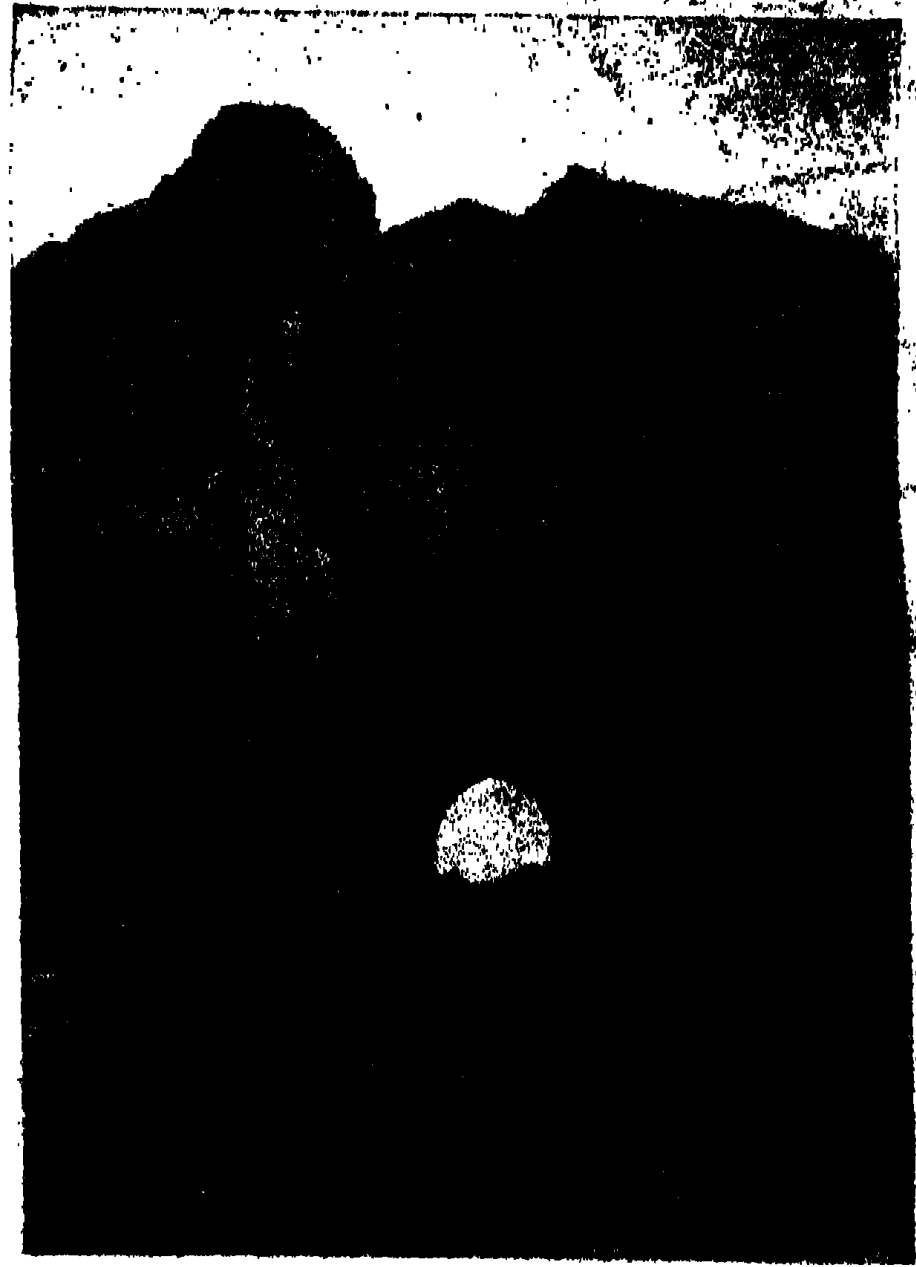
দাখিল দরওয়াজা

ইহা উত্তর দক্ষিণে ১৬৮´ ফুট লম্বা এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৭৫ ফুট চৌড়া। একটী ২০০×২০০ প্রকাণ্ড প্রাঙ্গনের পশ্চিম দিক ঘেঁষিয়া মসজিদটী স্থাপিত। সম্মুখ হইতে ১১টী খিলান এবং ১১টী ডোম দৃষ্ট হয়। ছাদের ভিতর

দংশ পড়িয়া গিয়াছে। বেশ দেখা যায় যে গোটা ছাদটী ৪৭টী ডোমে প্রস্তুত ছিল। ঘরের উচ্চতা ২০ ফুট। দালানটী রাজা হোসেন শাহ কর্ত্তৃক আরব্ধ হইয়া তদীয় পুত্র নশরৎ সাহের আমলে ১৫২৬ সালে শেষ হয়। একটি পুরাতন বাঁধ এই মসজিদ পর্য্যন্ত আসিযাছে। ইহার উপর দিয়াই রাস্তা ছিল। এখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। নিকটে একটী দীঘি আছে, কথিত যে ইহা সনাতন গোস্বামী কর্ত্তৃক স্থাপিত।

ফিরোজ মিনার

বারদুয়ারীর পূর্ব্বে এবং উত্তরে দুইটী অতি সুদর্শন তোরণ আছে। চিত্র দেখুন। ইহাদের পাথরের কাজ মনোরম।

পরে রামকেলী গ্রামে আসিয়া শ্রীশ্রীমদনমোহন ঠাকুরের মন্দির, শ্রীরূপ সনাতন প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ রূপ সাগর, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড এবং মন্দিরের প্রাঙ্গনস্থ বাঁধান কদম্ব বৃক্ষতলে মহাপ্রভুর প্রস্তর পদচিহ্ন দেখা গেল। শ্রীচৈতন্যদেবের আগমন স্মৃতি রক্ষার্থ প্রতি বৎসর আষাঢ়ের প্রথম ভাগে রামকেলী গ্রামে ২।৩ দিন ব্যাপী বৈষ্ণবদের মেলা বসিয়া থাকে। বহু বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর সমাগম হয়। চৈতন্য চরিতামৃতে কথিত আছে রূপ ও সনাতন গোস্বামীদ্বয় বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বনের পূর্ব্বে হোসেনসাহী আমলে উচ্চ রাজস্ব কর্ম্মচারী ছিলেন এবং অত্যন্ত প্রজাপীড়ন করিয়া রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন। যথা—

"তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার
জীব জন্তু মারি কৈল চাকলা সব নাশ
এথা তুমি কৈলে মাত্র সর্ব্ব কার্য্য নাশ ইত্যাদি"

—চৈতন্য চরিত ১৯শ পরিচ্ছেদ।

পরে মহাপ্রভুর চরিত্র মাহাত্ম্যে শুদ্ধ হইয়া প্রজা-পীড়ন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া উভয়ে বৃন্দাবনে বাস করিতে লাগিলেন।

রামকেলী ছাড়িয়া ক্রমে সকলে হোসেনসাহী কেল্লার ভগ্নাবশেষে উপনীত হইলেন। এই কেল্লার এখন মাত্র তিনটী তোরণের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে, যথা দাখিল দরওয়াজা, লুকোচুরি দরওয়াজা এবং কোতওয়ালী দরজার দুইটী ঢিবি মাত্র। এই তোরণগুলির সম্মুখ দিয়া একটী

ছোট সোনা মসজিদ

আঁকা বাঁকা জলপূর্ণ খাল এবং তাহার পশ্চাতে বৃহৎ মৃণ্ময় প্রাচীর বর্ত্তমান আছে। সেতুগুলির এবং ভিতরের রাজপ্রাসাদের কোনও চিহ্ন এখন নাই। ভিতরে একটী ২২ গজী প্রাচীর ও তিনটী ছোট বড় পুষ্করণী আছে।

দাখিল দরওয়াজা দুর্গের প্রধান প্রবেশ দ্বার রাজপ্রাসাদের উত্তরে অবস্থিত ছিল। এই দরওয়াজা যে এককালে খুবই সুদৃশ্য এবং মজবুত তোরণ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রবেশ পথ ১১২ ফুট লম্বা এবং ৫০´ ফুট উচ্চ। উভয় পার্শ্বে শান্ত্রীদের থাকিবার জন্য বৃহৎ বৃহৎ

তাঁতিপাড়া মসজিদ

ব্যারাক-ঘর অবস্থিত। উপরের দেওয়ালের এবং গম্বুজের গাঁথনি পাতলা কাজকরা ছোট ইঁটে। নীচের দিকে গ্রানাইট পাথরের ব্যবহার আছে। সম্ভবতঃ ১৪৭৪ খৃঃ অব্দে ইহা নির্ম্মিত।

এই স্থান হইতে অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে ফিরোজ মিনার অবস্থিত। নির্ম্মাতা সম্বন্ধে ইতিহাসে মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ বলেন ক্রীতদাস রাজা সৈফাউদ্দীন ফীরোজসাহ তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ এইটী গঠিত করিয়াছিলেন। আবার কাহারও মতে হোসেন সাহ ১৫০৯ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যা, আসাম, এবং মিথিলারাজ্য ধ্বংস করিয়া ১৫১০ খৃঃ অব্দে ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পার্সি ভাষায় ফিরোজ-মিনার এর অর্থ বিজয় স্তম্ভ। সুতরাং মনে হয় হোসেন সাহী কেল্লা প্রভৃতির সহিত এটীও নির্ম্মিত হয়।

স্তম্ভটী ৮৪´ ফিট উচ্চ। একটী সুগঠিত প্রস্তরের ঘুর্ণী সিঁড়ি বরাবর উপর পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। তাহাতে ৮৩টী ধাপ আছে। বাহিরের সিঁড়ীটী বোধ হয় পূর্ত্ত বিভাগ কর্ত্তৃক সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে ২০টী ধাপ আছে। মিনারে মধ্যে মধ্যে জানালা থাকায় উঠিতে কোনও কষ্ট হয় না। ছাদটী নূতন গঠিত। পূর্ত্ত বিভাগ সম্প্রতি স্তম্ভের গোড়ায় মাটী দিতেছেন দেখিয়া মনে হইল—স্তম্ভটী কোন বৃক্ষজাতীয় বস্তু হইবে!

নিকটে কদমরসুল মসজিদ ও ফতিহার খাঁর সমাধি আছে। এই মসজিদের ইঁটের কারু কার্য্য অতি সুন্দর। ইহা ১৫৩০ সালে গঠিত। মসজিদে রসুলের প্রস্তর পদচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই কারণে স্থানীয় মুসলমানদের নিকট ইহা অতীব পবিত্র।

নিকটেই দ্বিতল লুকোচুরী তোরণ অর্থাৎ হোসেনসাহী কেল্লার পূর্ব্ব গেট। ইহার উপরের নহবৎখানা এখনও আছে। মনে হয় ইঁটের উপর পলস্তরা করা ছিল।

কিছু দূরে আছে চিকা মসজিদ (অথবা শঃ বাবুর মতে চামচিকা মসজিদ)। এবং আরও একটী মসজিদ, গুমুটী মসজিদ। বর্ত্তমানে ইহা একটী মিউজিয়াম। জলাল-উদ্দীনের পুত্র মামুদের সমাধি চিকা মস্‌জিদে আছে।

চিকা মসজিদ

মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে—গৌড়ের মাঠ হইতে পাওয়া বহু পাথরের কারুকার্য্য, লতাপাতা, দুয়ারের অগ্রভাগ, বৌদ্ধ ও হিন্দু বিগ্রহ। অনেকগুলি ধ্যানী বুদ্ধ ও নৃত্যশীল নটরাজের মূর্ত্তিও রহিয়াছে। এইগুলি হিন্দু গৌড়ের স্মৃতি।

কিছুদূর দক্ষিণে নগরীর দক্ষিণ প্রবেশ পথ—কোতওয়ালী দরওয়াজার ভগ্নাবশেষ আছে। ইহার খিলানটী

নাই। আরও কিছু দূরে অবস্থিত তাঁতিপাড়া ও লোটন মসজিদ। ১৪৮০ খৃঃ অব্দে প্রস্তুত। লোটন মসজিদে রঙ্গীন এনামেল করা হালকা ইঁটের ব্যবহার আছে। হোসেনসাহী রাজ-অন্তঃপুরের কোন প্রিয় নটীর স্মৃতিসৌধ এই মসজিদ। পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের রাজমিস্ত্রী, ইষ্টকার এবং স্থপতি-বিদ্‌গণের কলা-নৈপুণ্য যে কতদূর মনোরম ছিল তাহার নিদর্শন এই মসজিদ। প্রত্ন-তত্ত্ব বিভাগ একটী নীল এনামেল ফলকে ইহাকে 'রক্ষিত কীর্ত্তি" বলিয়া নির্দ্দেশ দিতেছেন।

গুমটি মসজিদ, বর্ত্তমানে মিউজিয়াম

অতঃপর কতক পদব্রজে এবং কতক শকটে আমরা ফিরোজপুর গ্রামে বেলা আড়াইটার সময় আসিয়া দেখিলাম ছোট সোনা মসজিদের সামনে হারাণ গরুর গাড়ী দুইটী দাঁড়াইয়া আছে এবং খাঁ-বাবু আমাদের জন্য খিচুড়ী ভোগ প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। পার্শ্বস্থ ট্যাঁকশাল দীঘির স্বচ্ছ কাল জলে সকলে স্নান করিয়া লইলেন। পরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সোনা মসজিদের ছায়ায় বসিয়া গরম গরম খিচুড়ী সেবন বহুদিন সকলের মনে থাকিবে।

ছোট সোনা মসজিদ অথবা "জানই মসজিদ" হোসেন সাহের রাজত্ব কালে ১৫১০ খৃঃ অব্দে তৈয়ারী হইয়াছিল। পাতলা ইঁটের উপর কাল গ্রানাইট পাথর দিয়া মুড়িয়া এইটী প্রস্তুত এবং কারুকার্য্য ও নকসায় ইহা অপেক্ষা সুন্দর মসজিদ বাঙ্গলায় নাই।

পির নিয়ামৎ উল্লার দরগা এই গ্রামেই অবস্থিত। বার্ষিক ৬০০০৲ টাকা মুনাফার জমিজমা পীরসেবায় উৎসর্গীকৃত আছে। গুণমত মসজিদ সন্নিকটে ছিল।

সন্ধ্যার প্রাককালে মির্জাপুরে ফ-বাবুর কাছারী বাটীতে সকলে গৃহ-প্রবেশ করিলাম। সমস্ত দিনের ভ্রমণের ফলে সকলে নিতান্ত ক্লান্ত। হাত মুখ ধুইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখি—সেই পূর্ব্বোক্ত লেপগুলি সদ্য প্রস্তুত বিশাল বিছানার উপর সারি সারি পড়িয়া হাসিতেছে! সেই অদৃশ্য লেফ্‌টানান্ট্‌—যাঁহার নিপুন হস্তের টানে লেপগুলি ক্রমাগত স্থানচ্যুত হইয়াও আবার যথাস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে—তাঁহাকে সকলে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন। পরে জানা গেল তিনি ফ-বাবুর ভৃত্য—"তেনু" ওরফে তিনু অথবা তিনকড়ি।

সেই লেপগুলি আকর্ষণ করিয়া বসা মাত্র গরম গরম চা এবং সুবৃহৎ এক হাঁড়ী রসগোল্লার আবির্ভাব হইল। ফ-বাবুর বন্ধু ডাক্তার বাবু অত্যন্ত বিনয় সৌজন্যে বলি-লেন—"এই অজ পাড়াগাঁয়ে আর ভাল কিছু পাওয়া গেল না!"

কদম-রসুল, পার্শ্বে সাধু ফতিহার খাঁর সমাধি

কিন্তু নিমেষের মধ্যে সমুদায় চা ও আহার্য্য উদর নামক অনন্ত গহ্বরে প্রেরণ করিয়া ভ্রাম্যমানেরা পুনর্ব্বার ধন্য ধন্য রব করিলেন। এমন সময় ফ-বাবুর গোমস্তার প্রবেশ।

ফ-বাবু। "গোমস্তা—এখন বাঘের খবর বল।"

গোমস্তা। "আজ্ঞে—মালদা' থেকে দুইজন ভদ্রলোক এসে বাঘের পেছনে আজ ২।৩ দিন এমনি লেগেছেন যে বাব দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।"

শিকারীরা হায় হায় করিয়া উঠিয়া বসিলেন।

বদন-রসুলের কারুকার্য্য

শ-বাবু একটিপ নস্য টানিয়া বলিলেন—"বেড়ে হয়েছে—পালাবে না? ভদ্রলোকদের দুর্ব্যবহারে মানুষই বিবাগী হয়ে যায় ত' বাঘ কোন ছার—"

নৈশ ভোজনান্তে গল্প-গুজব ও নাসিকা-ক্রন্দনে রজনী ভোর হইল। নিকটেই ভাতিয়ার বিশাল বিল। এ জেলায় ইহা অপেক্ষা বড় বিল আর নাই। চা পান পর্ব্ব শেষ করিয়া সকলে দুই দলে দুইটি বিভিন্ন দিক দিয়া বাহির হইলেন।

প্রভাতে বিশাল বিলের কি সুন্দর দৃশ্য! চারিধারে লক্ষ লক্ষ পাখী নানাপ্রকার রব করিতেছে। মধ্যে মধ্যে নলখাগড়ার দ্বীপের ভিতর হইতে লম্ব-কণ্ঠ কাঁকপাখী একাগ্র চিত্তে এক-চক্ষু দিয়া নৌকার আরোহীদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছে। ফ-বাবুর সহিত তাঁহার আত্মীয় দুইটি বালক নৌকায় আসিয়াছিল। পাখী দেখিয়া তাহাদের অত্যন্ত আনন্দানুভব হইল। ধী-বাবু বলিতেছিলেন—

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল—

মধ্যাহ্নে সকলে কাছারী বাড়ীতে ফিরিলেন। শিকারীরা অনেকগুলি পাখী মারিয়া আনিয়াছিলেন। বলিলেন—"পাখীরা বড় চমকাইয়া গিয়াছে। মোটেই রেঞ্জ দিল না।"

শ বাবু বলিলেন—"পাখীর আর কি দোষ! ভদ্রলোকের অত্যাচারে বৃহল্লাঙ্গুলই রেঞ্জের বাহিরে পলাইয়াছেন ত' ক্ষুদ্র পাখী।"

রাত্রের আহার মন্দ হইল না। একটি পরলোকগত পাঁঠার সদ্গতি কামনা করিয়া সকলে নিদ্রিত হইলেন। র-বাবু স্বপ্নঘোরে বলিতেছিলেন—আহা যদি বাঘটিকে নিকটে পাওয়া যাইত। হ'-বাবুর একটি অদ্ভুত ক্ষমতা আছে! তিনি সজাগ অবস্থাতেও সমানে নাসিকাধ্বনি করিতে পারেন। এবং নিদ্রিত অবস্থায় গল্পে যোগদানও করিয়া থাকেন।

হঠাৎ মধ্য রাত্রে সোরগোল শুনিয়া সকলে জাগিয়া উঠিলেন। নিকটে কোন বৃদ্ধার কণ্ঠে ক্রন্দন উত্থিত হইতেছিল। —"মেলেরে—মেরে ফেল্লেরে—"

ধী-বাবু স্বপ্নঘোরে শুনিতেছিলেন—"খেলেরে—খেয়ে ফেল্লেরে—" তড়াক করিয়া লাফ দিয়া ধী-বাবু শ-বাবুর পেটের উপর দাঁড়াইয়া হাঁক দিলেন—"বেরিয়েছে—বেরিয়েছে—" অর্থাৎ কিনা বাঘ বাহির হইয়াছে!

গুণমত মসজিদের পাথরের কার্য্য

শ-বাবু সরকারী উকিল। এসব ঘটনা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। বলিলেন—"না হে বাঘ বেরয় নি! এখানে কোথায় ডাকাত পড়েছে—"

হ এবং রা-বাবুদ্বয় বাঘের পরিবর্ত্তে ডাকাত শিকারের মানসে কম্পিত কলেবরে বন্দুক হস্তে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন। ধী-বাবুর বন্দুক নাই। একটী সরু লাঠি ও টর্চ্চ হস্তে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। শ-বাবু হাঁকিলেন—"ওহে শীঘ্র দুইটা ফাঁকা আওয়াজ করে যেও—"
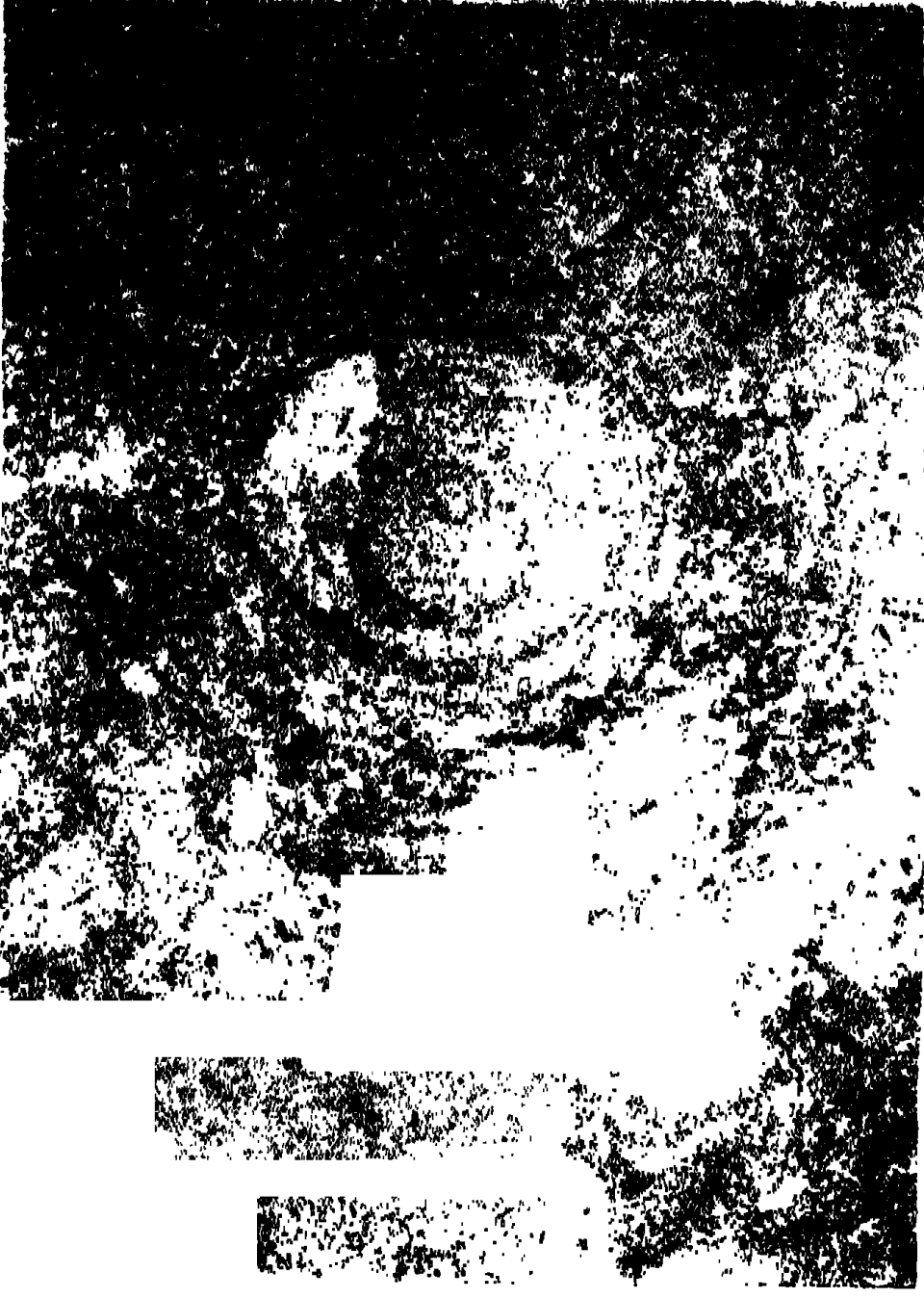
লোটন মসজিদের ডুম, রঙিন এনামেল করা ইঁটের গাঁথুনি

ধী-বাবু ইঞ্জিনীয়ার ব্যক্তি। ভাবিলেন—"ইহা একটী Diversion ডাকাতি হতে পারে। এক সঙ্গে সকলে চলিয়া গেলে—নিকটে লুকায়িত ডাকাতের দল সমুদায় লেপ-তোষক কম্বল বালিস ইত্যাদি লইয়া যাইতে পারে। সুতরাং rear guard স্বরূপ শ-বাবু, ডাক্তার ও শ্যা-বাবু, এবং তেজু, অ— ও গাড়োয়ানগুলি থাকুক।" এখানে বলা বাহুল্য শ-বাবুর নস্যদানি ব্যতীত অন্য কোনও অস্ত্র শস্ত্র ইঁহাদের ছিল না।

চারিধারে এত অন্ধকার যে সূচ্যগ্র পরিমিত স্থানও এধারে ওধারে লক্ষ্য হয় না। সকলে অকুস্থলে আসিয়া দেখেন—যে ডাকাতগুলি ফাঁকা আওয়াজ শুনিয়া পূর্ব্বেই পালাইয়াছে। কিন্তু গৃহ-স্বামী ও তাহার পরিবারবর্গকে খুঁটীর সহিত বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে। সকলেই অল্প-বিস্তর প্রহৃত হইয়াছে—বিশেষতঃ জামাতাটী অত্যন্ত জখম হইয়াছে দেখা গেল।

সমুদায় বর্ণনা শুনিয়া এবং রাত্রে পাহারার ব্যবস্থা করিয়া সকলে ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রে আর ঘুম হইল না।

পরদিন প্রাতঃকালে চা পানান্তর আমরা পূর্ব্ববৎ গরুর গাড়ীতে সেরসাহী রওনা হইলাম।

সেরসাহীতে পৌছিতে বারটা বাজিয়া গেল। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সকলে গ্রাম দেখিতে বাহির হইলেন। কেবল ধী-বাবু একটী রাবিশাণ নভেলের মধ্যস্থলে আসিয়া পড়ায় আর বহির্গত হইলেন না—গভীর মনোনিবেশে তাহা পড়িয়া যাইতে লাগিলেন।

গুণমন্ত মসজিদ

ক্রমে ক্রমে ঘরে ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। আরতির শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি ফ-বাবুদের মন্দির হইতে উত্থিত হইল।

অভয় আশ্রমের কর্ম্ম সচিব র-বাবু আসিলেন। ঘরে একটী টেবিল বাতি জ্বলিল। ভ্রাম্যমানেরা প্রত্যাগত হইলেন এবং একটী সান্ধ্য মজলিশ গড়িয়া উঠিল

একটী শুভ্র গৃহপালিত রেশম কীট টেবিলের উপর রাখিয়া র-বাবু কিরূপে এই গ্রামে কীট প্রতিপালন ও রেশমসূত্র উৎপন্ন হয়—বর্ণনা করিতেছিলেন। ধী-বাবু টেবিলচারী ক্ষুদ্র কীটের ঐশ্বর্য্য গড়া শক্তি জানিতে পারিয়া সস্নেহে পোকাটীর কোমল পৃষ্ঠদেশে আঙ্গুল বুলাইতে লাগিলেন।

ফ-বাবুর মীর্জাপুরস্থ কাছারি বাড়ী (ট্যেক্সি বাসন ধুইতেছে। ফ এবং রা-বাবুর পিছন এবং শ ও ফ-বাবুদের সম্মুখ দৃশ্য)।

র-বাবু বলিতেছিলেন—"অসম-প্রতিযোগিতায় রেশমের মূল্য পাউণ্ড করা বড়ই কমিয়া গিয়াছে। দেশী ও বিদেশী ধনিকের কবলে পড়িয়া ব্যবসাটী মাটী হইতে বসিয়াছে।"

শ-বাবু বলিলেন—"প্রটেকশন দরকার।"

রা-বাবু সরোষে বলিয়া উঠিলেন—"কে দেবে মশায়? কাহার আমাদের জন্য গরজ আছে?"

ক্রমে তর্ক কোলাহল চৌদুনে চড়িল। কণ্ঠ তৎপরতায় কেহই পরাজয় স্বীকার করিলেন না। যখন মীমাংসা প্রায় ধ্বস্তাধ্বস্তিতে উপনীত হইবার উপক্রম করিতেছে—তখন আহ্বান আসিল—"আসুন—সব তৈয়ারী—"। একটী স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া তার্কিকেরা উঠিয়া পড়িলেন।

ভোজ্য দ্রব্যের উৎকর্ষ্য এবং একটী প্রাজ্ঞ খাসীর পরার্থে আত্মত্যাগ সকলকে একান্ত মুগ্ধ করিয়াছিল। উদর নামক ভগবৎদত্ত অভ্যন্তরের স্থিতিস্থাপকতা সম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ রহিল না।

স্থির হইল অতি প্রত্যুষে পরদিন ট্যাক্সীযোগে সকলে মালদহ পৌঁছিয়া দশটার ট্রেণ ধরিবেন।

পরদিন প্রত্যুষে এই চারিদিনের সাথী সেই লেপগুলির মায়া কাটাইয়া যাত্রা সুরু করা গেল। মন্দির প্রাঙ্গনের তীক্ষ্ণ মোড় ঘুরাইয়া গাড়ী বাহির করিতে ট্যাক্সী চালক অক্ষম হইল দেখিয়া ধী-বাবু "ধুত্তোর—" বলিয়া ষ্টীয়ারীং চক্র ধরিয়া বসিলেন। সকলে দুর্গা নাম জপ করিতে লাগিলেন। রথ নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজপথে পড়িলে ধী-বাবু স্বস্থানে উপবিষ্ট হইলেন। ফ-বাবুদের নিকট বিদায় গ্রহণান্তর রওনা দেওয়া গেল।

২।৩ মাইল যাওয়ার পর ইঞ্জিন ক্রমশ বন্ধ হইয়া আসিল। বেগতিক দেখিয়া শ-বাবু বলিলেন—"চলহে ফিরে যাওয়া যাক।" হ-বাবু বলিলেন—"তাঁহারা কি ভাববেন?" রা-বাবু হিসাব করিতেছিলেন যে গরুর গাড়ীতে ভোরে রওনা দিলে ট্রেণ ধরা যাইত। ধী-বাবু মনে মনে ভাঁজিতেছিলেন—

"বিদায় করেছ যারে চোখের জলে
এখন ফিরাবে বল কিসের ছলে?"

মীর্জাপুরস্থ কাছারি বাড়ী—গ্রাম্য লোকেরা ডাকাতির বর্ণনা করিতেছে

ড্রাইভার তাড়া খাইয়া পিছনের ট্যাঙ্ক হইতে তলানি তৈল একটী কেটলিতে করিয়া ভ্যাকুয়াম পটে ঢালিতে ঢালিতে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া—মধুঘাট পর্য্যন্ত আসিয়া হাল ছাড়িয়া দিল। সেখান হইতে একটী গরুর গাড়ীতে

নবাবগঞ্জের পথে তিনমাথা খেজুর গাছ

সমুদায় মাল চাপাইয়া পদব্রজে রওনা দিলাম। হাঁটিতে হাঁটিতে আট মাইল পথ অতিক্রম করিয়া প্রায় বারটার সময় ইংলিশ বাজারের মকদুমপুরে উপস্থিত হওয়া গেল। পথিমধ্যে একটী খেজুর গাছের তিনটী মাথা দেখিয়া ধী-বাবু বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া একটী ফটো লইলেন।

ইংলিশ বাজারে আসিতে রা-বাবুর পাদুকাদ্বয় শিরোধার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। আট মাইল হাঁটার পর যখন ভ্রাম্যমানেরা ক্ষুধায় ক্লিষ্ট, ধূলায় ধূসর এবং পথশ্রান্ত অবস্থায়, ঘাড়ে বন্দুক, মাথায় হ্যাট, হাতে হাঁড়ী এবং জুতা, বগলে খবরের কাগজ, কলাপাতা, বই ইত্যাদি লইয়া অন্নপূর্ণা বোর্ডিংএর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন তখন ধী-বাবু একটী ফটো লইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। শ-বাবু

মকদুমপুর

দাঁড়ানর ভুলে ক্ষুদ্র ফটোর অন্তর্ভুক্ত না হইয়া বহির্ভুক্ত হইয়াছিলেন।

মালদহ ষ্টেশনে আসিয়া ওয়েটিং রুমের বারাণ্ডায় রন্ধন চাপান গেল। গরুর গাড়ীর ঝাকুনিতে টিফিন বাক্সের অন্তর্গত আলু ও বেগুনগুলি ষ্টোভ নিঃসৃত কেরাসীন তৈল-নিষিক্ত হইয়াছিল। শ-বাবু সেগুলিকে সাবান দিয়া ধুইতে আদেশ করিলেন। ধী-বাবু সেগুলি সাবান দিয়া ধৌত করিয়া কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক হ-বাবুর দিকে আগাইয়া দিলেন। হ-বাবু তাঁহার তীক্ষ্ণ ঘ্রাণ শক্তির দ্বারা বেগুন এবং আলুগুলি 'পাশ' করিতে লাগিলেন।

অতঃপর এই 'পাশ' করা বেগুন ও আলুভাজা সংযোগে

ক্ষুধিত ও পথশ্রান্ত রা ও ফ-বাবু

গরম গরম খিচুড়ী খাইয়া সকলে পরিতৃপ্ত হইলেন। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান বাসনগুলি মাজিয়া দিল।

গোদাগাড়ী ঘাটে রাত্রি ১০টার সময় ষ্টিমার যোগে পদ্মা পার হওয়া গেল। লালগোলাঘাট ষ্টেশনে একটি দোকানে গরম গরম লুচি ভাজা হইতেছে দেখিয়া সকলেই নিজ নিজ অভ্যন্তরের শূন্যতা অনুধাবন করিয়া সেইদিকে ছুটিলেন। এবং আকারপ্রকারহীন কাঁচা কাঁচা লুচিগুলি লবণাক্ত তরকারীযোগে জঠরে প্রেরণ করিয়া ট্রেণে স্থির হইয়া বসিলেন। রাত্রি প্রায় ১টার সময়ে সকলে নিজ নিজ গৃহে পৌঁছিলেন। মালদহ ভ্রমণের প্রথম পর্ব্ব এখানে শেষ হইল।

আদিনা, একলক্ষী ও পাণ্ডুয়ার সচিত্র বৃত্তান্ত পরে লিখিত হইবে।

বীরেন্দ্রনাথ মল্লিক

পরিবর্ত্তিতা

সুপ্রভা দত্ত এম-এ

এসেছে কি শুভদিন,
এসেছ কি দ্বারে প্রদীপ জ্বালায়ে, দেখা দিতে হে অতিথি ?
আনমনে বসি নিতি নিতি
তোমারে স্মরিয়া রঙিন স্বপ্ন গাঁথি
আজি কি পড়িল মনে ?

তোমারে একটি কাহিনী শোনাই : আমি জানিতাম তারে
তার কাছে এত শুনেছি তোমার কথা
তোমারে জানিয়া জীবন যাপিত সে যে !
তার সেতারের তারে
একটি রাগিনী হয়তো উঠিত বেজে
অথবা তাহারে ঘিরিয়া রহিত রাত্রির নীরবতা
শুধু জানিতাম আমি
সেই গান আর সেই কথা আর সেই মূক ব্যাকুলতা
প্রীতি দিয়ে তার বাঁধা ছিল আর সে প্রীতি কাহার তরে !

বহিত কালের স্রোত
একটি করিয়া দিন যেত আর রাত্রি আসিত নেমে
নাহি ছিল আশা, আসিত না কেহ, কোন সুগভীর সুখ
কোন সুকঠিন শোক
একদিন আর তার পরদিনে আর তারও পরদিনে
আশা ভাষাহীন স্থির অচপল বহিত কালের স্রোত।

তার পৃথিবীতে আর কোনদিন আসেনি মাধবী রাতি
জাগেনি নূতন চাঁদ
সে চাঁদে চাহিয়া হৃদয় সাগরে জোয়ার জাগেনি আর
একথা কেমনে বলি ?

ভাঙা জোড়া লাগে, সজল আঁখিতে চমকে হাসির ধার
সহসা ভাঙিয়া বাঁধ
নদী ছুটে চলে মত্ত প্রলাপে ধ্বংস পুলকে মাতি
একথা কেমনে বলি
আর কোনদিন ভালোবেসে তার মরিতে হয়নি সাধ !

তবু প্রতি রাতে কানে কানে মোরে কহিত ঘুমের আগে
একটি কাটিল দিন,
বিচ্ছেদ-নদী খেয়া দিয়ে আরো একটু এলাম কাছে।
ফুরাবে দুঃখ দিন !
দুঃখের টানে আনিব তাহারে এই আশা মনে আছে।

পথ চেয়ে চেয়ে কাটিল তাহার অনেক দীর্ঘ দিন
অধিক দীর্ঘ রাতি
তারপরে তার মৃত্যু ঘটিল ; থামিল হৃদয়-বীণ্
সেতারের তারে ঝঙ্কার নাহি আর,
ফুল তুলে আর সাজি ভ'রে কেহ সাজাইতে নাহি শেজ্
আশা নিরাশায় আঁখি ছলছলি' ফিরিতে বারম্বার
জীবন ফুরাল তার !

তবু দিন যায়—সে হৃদয়খানি আমারে যে গেল দিয়ে
সেই অনমিত মৃত্যুবিহীন প্রীতি।
তারপর হ'তে পথ চাই আর অবাক হৃদয়ে ভাবি
ঘরের সুমুখ দিয়ে
পরদেশী যারা আসা যাওয়া করে আমার দুয়ারে নিতি
তার চেয়ে মোর তারাও যে বেশী চেনা !
সম্ভব হবে না
কোনদিন তার এপথে আসার, তবু যদি কভু আসে
কোন মধু অবকাশে
তারে আমি হায় চিনে লব বলো চিনিব কেমন করে ?

আমার হাসিতে, বেদনায় মম, ক্ষণে ক্ষণে ছায়া পড়ে
সেই ছায়া দেখে মূরতি গড়েছি তার।
তবু আমি জানি, কঠিন পৃথিবী, বিধাতা নিদয় মতি
কঠিন নিয়তি অতি
কোন পরিচয়ে চিনে লব বলো দেখা যদি মেলে তার ?

তারে কি পড়েছে মনে
সজল এ সমীরণে ?
ভুলে গেছো তুমি, মাধবী রাত্রি সেও যে পোহায়ে যায়
ঘনায় বরষা হায় !
মেঘ গরজন, আকাশ আঁধার, রুদ্ধ ভবন যত
মাধবী রাত্রি গত !
ম্লান দীপালোকে বন্ধু আজিকে দুঃখের পরিচয়
চেয়ে দেখো দেখি আমারে তোমার তার মত মনে হয় ?

শ্রীসুপ্রভা দত্ত

জীবন-প্রভাত-বেলা

শ্রীমতী অরুণা সিংহ বি-এ

উষার স্বচ্ছ আলোক আভাষ সম
ছবিখানি তব জাগে অন্তরে মম
গহন তিমির নাশি',
হৃদয় আমার উঠেছে প্রথম জেগে,
তরুণ-তপন-প্রথম কিরণ লেগে
উঠিয়াছে উদ্ভাসি'।

তোমারে আমার জীবন-প্রভাত-বেলা
মনে মনে স্মরি' করেছি অনেক খেলা,
সুচির-স্বয়ম্বরা,—
গেয়েছি পূজায় তব বন্দনা গান,
প্রদীপ জ্বালিয়া মাগিয়াছি কল্যাণ,
সে ধ্যানে হৃদয় ভরা !

কতদিন আমি নিতল দীঘির তীরে
একাকী আসিয়া দাঁড়ায়েছি ধীরে ধীরে
তোমারে করিয়া মনে,
সন্ধ্যাতারার পানে বিস্ফারি আঁখি
সুধাই প্রশ্ন আর কত কাল বাকী
তোমার অন্বেষণে !

আমার সকল বেদনা মাধুরী দিয়ে
সব-সুন্দর সুষমা সঞ্চারিয়ে
সকল রূপের পরে,

তোমার প্রতিভা-উদার ছবিটি গড়ি'
স্নিগ্ধ তোমার কান্ত মহিমা স্মরি'
অন্তর উঠে ভ'রে ।

আমার মনের যে তুলি রঙীন রসে
চিত্র তোমার উজলিয়া তুলিল সে,
তাহারে কী তুমি চেনো ?

পাষাণের তলে জাগিছে কষিত হেম
হতাশার মাঝে পুণ্য গভীর ক্ষেম,
কুসুমেতে মধু যেন !

একটি দেবতা গড়িয়াছি মন্দিরে,
একখানি হিয়া ভরিয়া তীর্থনীরে
অর্ঘ্য সাজায়ে রাখি ;

সুখস্পন্দনে বাজিবে তোমারি গীতি,
চিতনন্দনে রাখি আল্পিনা নিতি
অশ্রু চিহ্ন আঁকি' ।

প্রীতি মোর যেন তোমারে লয়েছে গড়ি',
আপন সৃজনে আপনি নূতন করি',
হে দেবতা নিরুপম,

এ পূজায় মোর মিশিয়া গিয়াছে প্রেম,
তব দ্বারে তাই তারে আজ আনি যেন
ফুল-চন্দনসম !

অরুণা সিংহ

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

৫

গদ্য-সাহিত্য

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের গদ্য-সাহিত্যের ভাষা বহুকাল পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী লেখকগণের রচনার আদর্শ ছিল। একথা সত্য যে তাঁহাদের মধ্যে কেহই সংস্কৃতের মোহ পাশ হইতে সম্পূর্ণ বিনির্ম্মুক্ত হইতে পারেন নাই। ঐ ভাষার নাম ছিল "বিদ্যাসাগরী ভাষা"। তৎপূর্বে সাধুভাষা শুধু লেখায় নহে কথোপ-কথনেও ব্যবহৃত হইত। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সবিশেষ উপভোগ্য।

"তখন পণ্ডিতেরা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না, 'খদির' বলিতেন। কদাচ 'চিনি' বলিতেন না, 'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্য'ই বলিতেন, কদাচিৎ কেহ কেহ ঘৃতে নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না, 'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না, রম্ভা বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। পণ্ডিতগণের কথোপকথনের ভাষা যেখানে এইরূপ ছিল, তখন তাঁহাদের লিখিত ভাষা কি ভয়ঙ্কর ছিল তাহা বলা বাহুল্য।" বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের আমলে লিখিত ভাষা ঐরূপ ভয়ঙ্কর দশা হইতে মুক্ত হইলেও তৎপূর্ব্বে তারাশঙ্করের "কাদম্বরী" ও মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের বাংলা অনুস্বার বিসর্গহীন সংস্কৃত ভাষারই নামান্তর। সে বাংলা এইরূপ জটিল ও দুর্ব্বোধ্য যে তাহা দন্তস্ফুট করে কাহার সাধ্য? বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার ঐ ভাষা পরিমার্জ্জিত করিয়া সরল ও সহজবোধ্য করিলেও উহাতে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বিপুল পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল।

ঐ ভাষার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন, প্যারিচাঁদ মিত্র। তিনি টেকচাঁদ ঠাকুর এই ছদ্মনামে আলালের ঘরের দুলাল প্রকাশ করিয়া কথোপকথনের ভাষায় একখানি উপন্যাস রচনা করেন। বিলাতী নবেল বা উপন্যাস যে জাতীয়, উহা সে জাতীয় নহে। ফলতঃ তখনও কেহ বিলাতী নবেলের অনুকরণে বাংলায় উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই। চল্‌তি কথায় লেখা "আলালের ঘরের দুলাল"—গল্পাকারে প্রকাশিত হয়। ঐ আখ্যায়িকায় আঁটকুড়ে ধনীর এক আদুরে ছেলের শোচনীয় পরিণাম বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থ দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন, যে তাঁহার প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ ঐরূপ ভাষায় রচিত। যে স্থলে বর্ণনার বিষয় গভীর প্যারিচাঁদ মিত্র তথায় তদনুরূপ ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার "অভেদী" 'আধ্যাত্মিকা' "রামা রঞ্জিকা" গ্রন্থ শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার-মূলক। "আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশের পূর্ব্বে "নববাবু বিলাস" ও "নববিবি বিলাস"এ কথোপকথনের ভাষা ব্যবহৃত হয় সত্য। কিন্তু "আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষা আপনার স্বাতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। উহাদের সহিত ইহার তুলনাই চলে না। 'আলালের ঘরের দুলাল' তৎকালে বঙ্গসাহিত্যের এক অভিনব সৃষ্টি। তৎপূর্ব্বে, সরল, স্বাভাবিক কথোপ-কথনের ভাষায় ঐরূপ সুন্দর গ্রন্থ আর একখানিও রচিত হয় নাই। ঐ গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় পড়িতে পড়িতে মনে হইবে যে উহার বিষয় বস্তু যেন জীবন্ত ভাবে চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। ইহার লিপিকুশলতাও অসামান্য। ঐ পুস্তকের নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি হইতে সহজেই উহা প্রমাণিত হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষা আদর্শ ভাষা না হইলেও, গাম্ভীর্য্য ও বিশুদ্ধির অভাব থাকিলেও প্যারিচাঁদ দেখাইয়াছেন যে-বাঙ্গালা সর্ব্বজন মধ্যে কথিত ও প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ

চনা করা যায় এবং যে সর্ব্বজন হৃদয়গ্রাহিতা সংস্কৃতানু-
াারিণী ভাষায় দুর্ল্লভ, এ ভাষায় তাহা সহজ গুণ। যে
ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক
ব্যবহৃত, প্রথম তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়নে তাহা ব্যবহার করেন
এবং তিনি প্রথম ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী
লোকদের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া স্বভাবের অনন্ত
ভাণ্ডার হইতে আপনার উপাদান সংগ্রহ করেন। তিনিই
দেখাইলেন যে সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই
আছে, তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা
চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন ঘরের সামগ্রী
যত সুন্দর পরের সামগ্রী তত সুন্দর হয় না। তিনিই প্রথম
দেখাইলেন যে যদি সাহিত্য দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত
করিতে হয় তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য
গড়িতে হইবে।

আলালের ঘরের দুলাল

১

"রবিবারে কুঠীওয়ালারা বড় ঢিলে দেন। হচ্ছে হবে, খাচ্চি খাব বলিয়া অনেক বেলায় স্নান আহার করেন। তাহার পরে কেহ বা বড়ে টেপেন, কেহ বা তাস পেটেন, কেহ বা মাছ ধরেন, কেহ বা তবলায় চাটি দেন, কেহ বা সেতার লইয়া পিড়িং পিড়িং করেন, কেহ বা শয়নে পদ্মনাভঃ ভাল বুঝেন, কেহ বা বেড়াতে যান, কেহ বা বহি পড়েন, কিন্তু পড়াশুনা অথবা সৎ-কথার আলোচনা অতি অল্প হইয়া থাকে। হয় তো মিথ্যা গাল-গল্প কিম্বা দলাদলির ঘোঁট, কি শম্ভু তিনটা কাঁঠাল খাইয়াছে, এই প্রকার কথাতেই কাল ক্ষেপন হয়।......ইতিমধ্যে চৌদ্দ বৎসরের একটি বালক গলায় মাদুলী, কানে মাকড়ি, হাতে বালা ও বাজু সম্মুখে আসিয়া টিপ করিয়া গড় করিল। বেণুবাবু একমনে পুস্তক দেখিতেছিলেন, বালকের জুতার শব্দে চম্‌কিয়া উঠিয়া দেখিয়া বলিলেন, এসো বাবা মতিলাল এঁস, বাটীর সব ভাল তো ?"

২

"শ্যামের নাগাল পালাম না গো সই। ও গো মরমেতে মরে রই—" টক্‌টক্ পটাস্ পটাস্—মিয়াজান গাড়োয়ান এক একবার গান করিতেছে, টিট্‌কারি দিতেছে ও শালার গরু চল্‌তে পারেনা বলে লেজ মুচড়াইয়া সপাং সপাং মারিতেছে। একটু একটু মেঘ হইয়াছে, একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে। গরু দুটা হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া একখানা ছকড়া গাড়ীকে পিছে ফেলিয়া গেল। সেই ছকড়ায় প্রেম-নারায়ণ মজুমদার যাইতেছিলেন। গাড়ীখানা বাতাসে দোলে। ঘোড়া দুটা বেটো ঘোড়ার বাবা, পক্ষিরাজের বংশ, টংয়স, টংয়স, ডংয়স ডংয়স করিয়া চলিতেছে, পটাপট্ পটাপট্ চাবুক পড়িতেছে, কিন্তু কোন ক্রমেই চাল বেগড়ায় না। প্রেমনারায়ণ দুটা ভাত মুখে দিয়া সওয়ার হইয়াছেন। গাড়ীর হেঁকোচ হেঁকোচ শব্দে প্রাণ ওষ্ঠাগত। গরুর গাড়ী এগিয়ে গেল, তাহাতে আরও বিরক্ত হইলেন।......প্রেম-নারায়ণ বিরক্ত হইয়া আপন মনের কথা আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন। চাকরি করা ঝক্‌মারি, চাকরে কুকুরে সমান, হুকুম করলেই দৌড়িতে হয়। মতে, হলা, গদার জ্বালায় চিরকালটা জ্বলে মরেছি, আমাকে খেতে দেয় নাই। আমার নামে গান বাঁধিত, আমাকে ত্যক্ত করিবার জন্য রাস্তার ছোঁড়াদের টুইয়ে দিত ও মধ্যে মধ্যে আপনারাও আমার পেছনে হাততালি দিয়া হো হো করিত।"

৩

"বৈদ্যবাটীর বাবুরামবাবু বাবু হইয়া বসিয়াছেন, হরে পা টিপিতেছে। একপাশে দুইজন ভট্টাচার্য্য বসিয়া শাস্ত্রীয় তর্ক করিতেছেন, আজ লাউ খেতে আছে, কাল বেগুন খেতে নাই, লবণ দিয়া দুগ্ধ খাইলে গোমাংস ভক্ষণ করা হয় ইত্যাদি কথা ঢেঁকির কচ্‌কচি করিতেছেন। একপাশে কয়েকজন শতরঞ্চ খেলিতেছে। তাহার মধ্যে একজন খেলওয়াড় মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে, তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, উঠসার কিস্তিতেই মাত। একপাশে দুই একজন গায়ক যন্ত্র মিলাইতেছে, তানপুরা মেও মেও করিয়া ডাকি-তেছে। একপাশে মুহুরিরা বসিয়া খাতা লিখিতেছে। সম্মুখে কর্জ্জদার প্রজা ও মহাজন সকলে দাঁড়াইয়া আছে, অনেকের দেনা পাওনা ডিগ্রি ডিস্‌মিস্ হইতেছে, বৈঠক-

খানা লোকে থই থই করিতেছে। মহাজনেরা কেহ কেহ বলিতেছে, "মহাশয়, কাহার তিন বৎসর, কাহার চার বৎসর হইল আমরা জিনিষ সরবরাহ করিয়াছি। কিন্তু টাকা না পাওয়াতে বড় ক্লেশ হইতেছে। আমরা অনেক হাঁটা-হাঁটি করিলাম, আমাদের কাজ-কর্ম্ম সব গেল।" খুচরা খুচরা মহাজনেরা—যথা তেলওয়ালা, কাঠওয়ালা, সন্দেশ-ওয়ালা, তাহারাও কেঁদে কোঁকিয়ে কহিতেছে, "মহাশয়, আমরা মারা গেলাম, আমাদের পুঁটি মাছের প্রাণ, এমন করিলে আমরা কেমন করিয়া বাঁচিতে পারি? টাকার তাগাদা করিতে করিতে আমাদের পায়ের বাঁধন ছিড়িয়া গেল। আমাদের দোকান পাট সব বন্ধ হইল, মাগ ছেলেও সব শুকিয়ে মরিল।" দেওয়ান এক একবার উত্তর করিতেছে, "তোরা আজ যা, টাকা পাবি বই কি, এত বকিস্ কেন?" তাহার উপর যে চোড়ে কথা কহিতেছে, অমনি বাবুরাম বাবু চোখ মুখ ঘুরাইয়া তাহাকে গালি-গালাজ দিয়া বাহির করিয়া দিতেছেন। বাঙ্গালি বড় মানুষ বাবুরা দেশশুদ্ধ লোকের জিনিষ ধারেলন, টাকা দিতে হইলে গায়ে জ্বর আইসে। ব্যাঙ্কের ভিতর টাকা থাকে, কিন্তু টাল মাটাল না করিলে বৈঠকখানা লোকে সরগরম ও জমজমা হয় না।"

৪

"শেওড়াপুলির নিস্তারিণীর আরতি ডেডাং ডেডাং করিয়া হইতেছে। বেচারামবাবু ঐ দেবীর আলয় দেখিয়া পদব্রজে চলিয়াছেন। রাস্তার দুধারি দোকান—কোনখানে বন্দিপুর ও গোপালপুরের আলু স্তূপাকার রহিয়াছে, কোন-খানে মুড়ি-মুড়কি ও চাল-ডাল বিক্রয় হইতেছে, কোনখানে কলুভায়া ঘানিগাছের কাছে বসিয়া ভাষা রামায়ণ পড়িতেছে। গরু ঘুরিয়া যায়। অমনি টিট্‌কারী দেন। আবার আল ফিরিয়া আসিলে চীৎকার করিয়া উঠেন, "ও রাম আমরা বানর—ও রাম আমরা বানর"—কোনখানে জেলের মেয়ে মাছের ভাগা দিয়া নিকটে প্রদীপ রাখিয়া "মাছ নেবেগো, মাছ নেবেগো" বলিতেছে। কোনখানে কাপুড়ে মহাজন বিরাটপর্ব্ব লইয়া বেদব্যাসের শ্রাদ্ধ করিতেছে।"

৫

"বৃষ্টি খুব এক পসলা হইয়া গিয়াছে—পথঘাট পেঁচ পেঁচ সেঁত সেঁত করিতেছে—আকাশ নীল মেঘে ভরা—মধ্যে হড়্‌মড় হড়্‌মড়্ শব্দ হইতেছে। বেঙগুলা আশেপাশে বাঁওকো বাঁওকো করিয়া ডাকিতেছে। দোকান পসারীরা ঝাঁপ খুলিয়া তামাক খাইতেছে—বাদলার জন্যে লোকের গমনাগমন প্রায় বন্দ—কেবল গাড়োয়ান চীৎকার করিয়া গাহিতে গাহিতে যাইতেছে ও দাসো কাঁদে ভার লইয়া—"জাংগো বিসখা সে যিবে মথুরা" গানে মত্ত হইয়া চলিয়াছে। বৈদ্যবাটীর বাজারের পশ্চিমে কয়েক ঘর নাপিত বাস করিত। তাহাদের মধ্যে একজন বৃষ্টির জন্য আপন দাওয়াতে বসিয়া আছে। এক একবার আকাশের দিকে দেখিতেছে ও এক একবার গুন গুন করিতেছে, তাহার স্ত্রী কোলের ছেলেটি আনিয়া বলিল, "ঘরকন্নার কর্ম্ম কিছু থা পাইনে,—হেদে ছেলেটাকে একবার কাঁকে কর—এদিকে বাসন মাজা হয়নি—ওদিকে ঘর নিকোন হয়নি, তারপর রাঁদা বাড়া আছে—আমি একলা মেয়ে মানুষ এ সব কি করে করব, আর কোন দিকে যাব আমার কি চাট্টে হাত চাট্টে পা?"

নাপিত অমনি খুর ভাঁড় বগলদাবা করিয়া বলিল, "এখন ছেলে কোলে করবার সময় নয়—কাল বাবুরামবাবুর বিয়ে, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।" নাপ্তেনী চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "ওমা আমি কোজ্জাব? বুড়ো ঢোস্কা আবার বে করবে। আহা! এমন গিন্নি—এমন সতী লক্ষ্মী—তার গলায় আবার একটা সতীন গেঁথে দেবে—মরণ আর কি! ও মা, পুরুষজাত সব করতে পারে।" নাপিত আশা বায়ুতে মুগ্ধ হইয়াছে—ও সব কথা না শুনিয়া একটা টোকা মাথায় দিয়া সাঁ সাঁ করিয়া চলিয়া গেল।"

৬

"সময় জলের মত যায়। দেখিতে দেখিতে সোমবার হইল। গির্জার ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল। সারজন, সিপাই, দারোগা, নায়েব, ফাঁড়িদার, চৌকিদার ও নানা প্রকার লোকে পুলিস পরিপূর্ণ হইল। কোথাও বা কতক-

গুলা বাড়ীওয়ালী ও বেশ্যা বসিয়া পানের ছিবে ফেলছে, কোথাও বা কতকগুলা লোক মারি খেয়ে রক্তের কাপড় সুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বা কতকগুলা চোর অধোমুখে এক পার্শ্বে বসিয়া ভাবছে, কোথাও বা দুই একজন টয়ে বাঁধা ইংরাজীওয়ালা দরখাস্ত লিখছে, কোথাও বা ফরিয়াদীরা নীচে উপরে টংয়স টংয়স করিয়া ফিরিতেছে, কোথাও বা সাক্ষীসকল পরস্পর ফুস্‌ফুস করিতেছে, কোথাও বা পেশাদার জামিনেরা তীর্থের কাকের ন্যায় বসিয়া আছে, কোথাও বা উকিলদিগের দালাল ঘাপ্টি মেরে জাল ফেলিতেছে, কোথাও বা উকিলেরা সাক্ষীদের কানে মন্ত্র দিতেছে, কোথাও বা আমলারা চালানী মকদ্দমা টুকছে, কোথায় বা সারজনেরা বুকের ছাতি ফুলাইয়া মস্‌মস্‌ করিয়া বেড়াচ্ছে, কোথাও বা সর্দার সর্দার কেরানিরা বলাবলি করছে, ও সাহেবটা গাধা, ও সাহেব পটু, এ সাহেব নরম, ও সাহেব কড়া, কালকের ও মকর্দ্দমাটার হুকুম ভাল হয় নাই। পুলিস গস্‌ গস করিতেছে, সাক্ষাৎ যমালয়, কার কপালে কি হয়, সকলেই সশঙ্ক।"

"বাবুরাম বাবুর শ্রাদ্ধে লোকের বড় শ্রদ্ধা জন্মিল না। যেমন গর্জ্জন হইয়াছিল, তেমন বর্ষণ হয় নাই। অনেক তেলা মাথায় তেল পড়িল—কিন্তু শুক্‌না মাথা বিনা তৈলে ফেটে গেল। অধ্যাপকদের তর্ক করাই সার, ইয়ার গোচের বামুনদিগের চৌচাপটে জিত। অধ্যাপকদিগের নানা প্রকার কঠোর অভ্যাস থাকাতে এক রোকা স্বভাব জন্মে—তাঁহারা আপন অভিপ্রায় অনুসারে চল্লেন—সবকে হাঁ না বলেন না। ইয়ার গোচের ব্রাহ্মণেরা সহরঘেঁষা বাবুদিগের মন যোগাইয়া কথাবার্ত্তা কহেন—ঝোপ বুঝে কোপ মারেন। তাঁরা সকল কর্ম্মেই বাওয়াজীকে বাওয়াজী—তরকারীকে তরকারী। অতএব তাঁহাদিগের যে সর্ব্বস্থানে উচ্চ বিদায় হয়, তাহার আশ্চর্য্য কি? অধ্যক্ষেরা ভাল থলিয়া সিঞ্চাইয়া বসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কাঙ্গালী বিদায় বড় হউক বা না হউক—তাঁহাদিগের নিজের বিদায়ে ভাল অনুরাগ হইলেই হইল। যে কর্ম্মটি সকলের চক্ষের উপর পড়িয়াছিল ও এড়াইবার নয় সেই কর্ম্মটি রব করিয়া হইয়াছিল—কিন্তু আগু পাছুতে সমান বিবেচনা হয় না। এমন অধ্যক্ষতা করিয়া কেবল চিতেন কেটে বাহবা লওয়া।"

"আলালের ঘরের দুলাল" যদিও মুখ্যত চলতি ভাষায় লিখিত তথাপি স্থান বিশেষে সাধুভাষার প্রয়োগও দেখা যায় তবে তাহার সংখ্যা অত্যল্প; নিম্নে ঐরূপ একটির দৃষ্টান্ত দিতেছি।

৮

"সদুপদেশ ও সৎসঙ্গে সুমতি জন্মে, কাহার অল্প বয়সে হয় কাহার অধিক বয়সে হইয়া থাকে। অল্প বয়সে সুমতি না হইলে বড় প্রমাদ ঘটে—যেমন বনে অগ্নি লাগিলে হুহু করিয়া দিগ্‌দাহ করে, অথবা প্রবল বায়ু উঠিলে একেবারে বেগে গমন করত বৃক্ষ অট্টালিকাদি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, সেইরূপ শৈশবাবস্থায় দুর্ম্মতি জন্মিলে ক্রমশঃ রক্তের তেজ সতেজ হওয়াতে ভয়ানক হইয়া উঠে। এ বিষয়ের ভূরি ভূরি নিদর্শন সদাই দেখা যায়। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি কিয়ৎকাল দুর্ম্মতি ও অসৎ কর্ম্মে রত থাকিয়া অধিক বয়সে হঠাৎ ধার্ম্মিক হইয়া উঠে। ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ পরিবর্ত্তনের মূল সদুপদেশ অথবা সৎসঙ্গ। পরন্তু কাহারো দৈবাৎ কাহারো বা কোন ঘটনায়, কাহারো বা একটি কথাতেই কখন কখন হঠাৎ চেতনা হইয়া থাকে—এরূপ পরিবর্ত্তন অতি অসাধারণ।"

"আলালের ঘরের দুলালে" অনেক অপ্রচলিত গ্রাম্য শব্দের আরবি ও ফার্সী কথার অনেক প্রয়োগ দেখা যায়। আইন (আবদার) বুড়িকা (শত পর্য্যন্ত বুড়ির অঙ্কের পাঠ) যে (আরবি ও ফারসী বর্ণমালার দ্বিতীয় বর্ণ) মস্‌নবি (কবিতা) বেতমিদ (অবিবেচক) ভেটেল (ভাটার অভিমুখে যে নৌকা যায়) কুঁতিয়া (প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া) কমজম (অল্প) দাঁদুড়ে (অত্যন্ত তোল-পাড় করিয়া) ভেলসা (নরম তামাক) ধাবকা (ধারা) তাঁইস (ক্রোধ) জড়ুঙ্গে (বাহ্য আড়ম্বরযুক্ত) সহবত (সঙ্গ) তজবিদ (বিচার) ফয়তা (পীরের দরগায় অর্ঘ্যাদি

দান ও উপাসনা) কুদরত (গৌরব)।ফজরে (প্রত্যুষে) কেল (আগামী দিন) এজ (এই দিন) চৌকাট (কৌটার মত) ত্যালাখড়ের বাত (অবান্তর কথা) কেয়া খুব (বাঃ) হুনুরে (হাতের কাজ) ওয়াজিব (ঠিক্) মদৎ (সাহায্য) টয়ে (ঘরের চূড়া) বুজর্গ (পীর) তসবি (মুসলমানের জপমালা) আমপক (জনপ্রিয়) হুরমত (মান) এফিদা (নিষ্ঠা) ফয়সালা (রায়) সওয়াল (জেরা) মসনৎ (পরামর্শ) ছতরি (নৌকার ছই) বাকুলে (বাড়ীতে) আফৎ (বিপদ) সুপিনা (সমন) তাকুব (শুশ্রূষা) জীঞ্জির (দ্বীপান্তর) পুসিদা (গোপন) তাজ (মুকুট) সাদি (বিবাহ) ইত্যাদি। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়চন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রধানতঃ সংস্কৃত বা ইংরাজী ভাষা হইতে অনুবাদ। উহাতে উদ্ভাবন শক্তির বিশেষ পরিচয় নাই। আখ্যায়িকার ভিতর দিয়া কল্পনাকুশলতা 'আলালের ঘরের দুলালে' পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে সংস্কৃত ভাষাকে যথাসাধ্য দূরে পরিহার করিয়া গ্রাম্য-ভাষায় ভাব প্রকাশ।

যখন কেহ একটা নূতন সংস্কার লইয়া আসেন, তখন তাহার বিরুদ্ধে একটা প্রবল জনমত সৃষ্ট হয়। প্যারিচাঁদ ইহা ভালরূপেই জানিতেন এবং তজ্জন্য "আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশের সময় 'টেকচাঁদ ঠাকুর' এই ছদ্ম নাম তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তৎকালে আলালী ভাষার প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপের নিশিত শর অজস্র-ভাবে বর্ষিত হইয়াছিল। একদিকে সংস্কৃত ভাষার বাহুল্য, অন্যদিকে গ্রাম্যভাষার প্রাচুর্য্য, ইহার কোনটি লোকের রুচিকর হইল না। এই সন্ধিক্ষণে মহাপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার আলোক অপরূপ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়
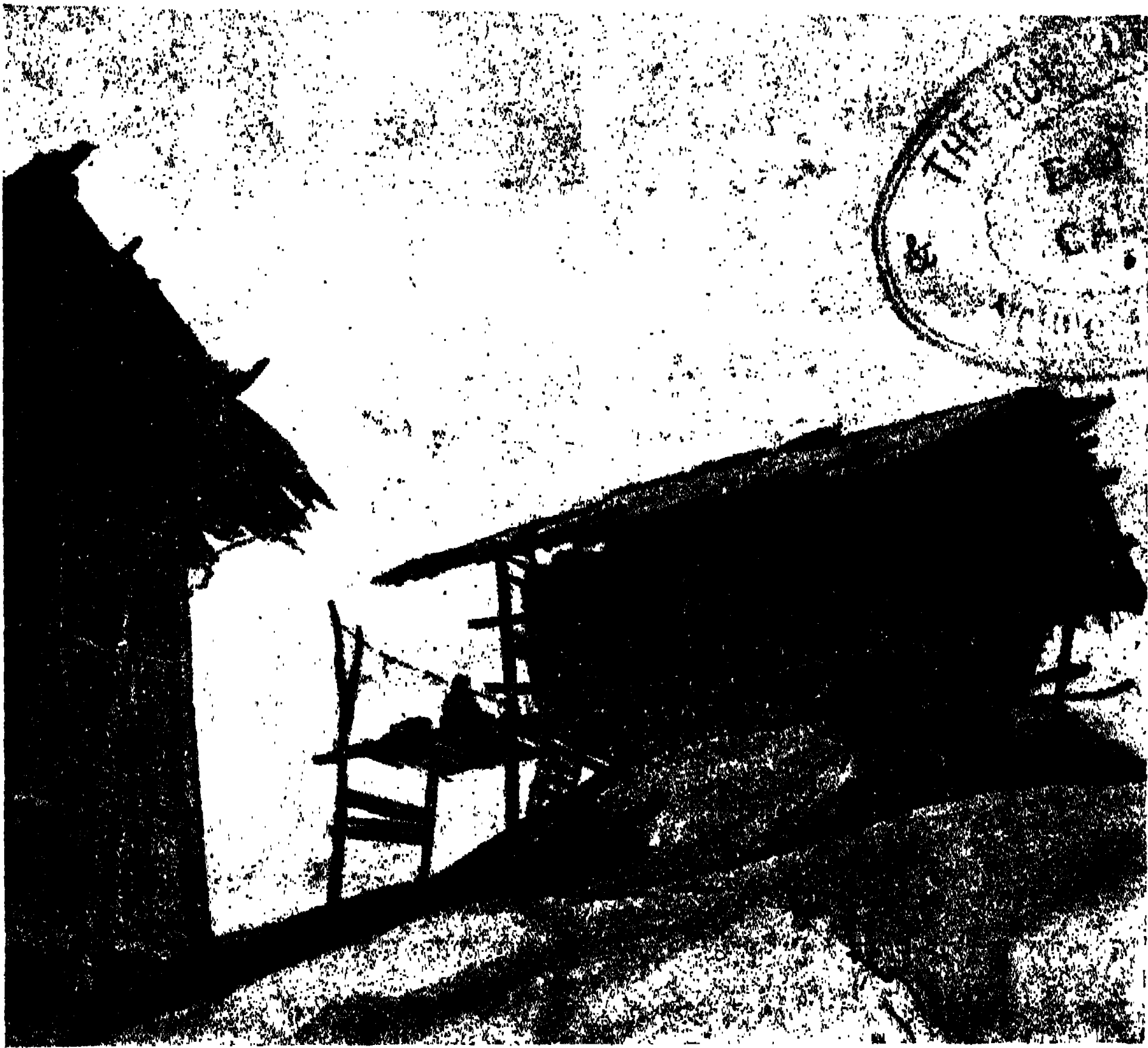
সিকিমের চন্দ্র শিল্পী—এম. ড্রেপার

পূর্ব্ব আফ্রিকার জঙ্গলে সাত হাজার মাইল

শ্রীহীরেন বসু

টাঙ্গানিকার প্রধানতম সহর এবং বন্দর হচ্ছে "ডারেস্-সালাম"। সৌন্দর্য্যে ও প্রাকৃতিক সংগঠনে এটি পূর্ব্ব আফ্রিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহর। এর তুলনা দিতে ইংরাজীতে নামকরণ হয়েছে "Haven of Peace". এরপর আর একটী ছোট বন্দরও বিশিষ্ট ভাবে জগতের কাছে পরিচিত যার নাম হচ্ছে "Port Tanga" পোর্ট টাঙ্গা।

পূর্ব্ব আফ্রিকার নক্সা

আরুষা টাঙ্গানিকার রাজধানী না হলেও এর নিজস্ব বিশিষ্টতা একে প্রধান করে তুলেছে। মাউন্ট কিলিম্যান-জারোর উপত্যকা শেষ না হতেই আরুষার এলাকা সুরু হয়। মাউন্ট মেরুর অত্যুচ্চ মেঘাবৃত শিখর ও উপত্যকা ঘিরে এই আরুষা সহর গড়ে উঠেছে। কাজেই সৌন্দর্য্যে এবং ঋতু বৈষম্যে আরুষা বিলাতের যে কোন সহরের সমকক্ষ হতে পারে।

মাউন্ট মেরুর উচ্চতা ১৪৪৪০ ফিট্। সর্ব্বদাই মেঘে আবৃত। সারাদিনের মধ্যে তিনবার ঋতু পরিবর্ত্তন এই আরুষা সহরে পরিলক্ষিত হয়। সকালে শীতের আর অবধি থাকে না—দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড গরম এবং সন্ধ্যায় ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে বৃষ্টি। এক অদ্ভুত বিচিত্রতা। দুপুরের গরমে মাঝে মাঝে মাউন্ট মেরুর সারা গা ধূ ধূ জ্বলে উঠে—সারা আকাশ সে আগুনের ধোঁয়ায় ও শিখায় গেরুয়া-লাল হয়ে উঠে আর তারই মাঝে দিনের প্রচণ্ড সূর্য্যকে দেখায় যেন মেটে সিঁদুরের টীপ। সূর্য্য গ্রহণের সময় কাচে ভুযো লাগিয়ে সূর্য্যকে দেখলে যেমন দেখায় ঠিক তেমনিই।

সহরের ছোট বড় সব দোকানই ইংরাজী কায়দায় সাজানো। যে ক'টি হোটেল আছে সব কটাই সুন্দর ও সুব্যবস্থাযুক্ত। ইংরাজ ছাড়া জার্ম্মাণদের বাস এ সহরে বেশী কারণ টাঙ্গানিকা জার্ম্মাণদের অধিকারেই ছিলো। আমরা কিন্তু "ক্যাম্প" স্থাপনা করেই বসতি বসিয়ে-ছিলাম। সেই দিনই ওখানকার ইমিগ্রেসন অফিসারের সঙ্গে দেখা করে এলাম এবং ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনারের কাছে ছবি তোলবার ছাড়পত্রের অনুমতি নিলাম। সেই ছাড়পত্র সাথে করে গেলাম "ফরেষ্ট অফিসারের" সঙ্গে দেখা করতে।

টাঙ্গানিকার জঙ্গল ও প্রান্তর জগৎ-বিখ্যাত। এই সব জঙ্গলে নেই হেন জন্তু নেই। প্রান্তরগুলি ধুধু মরুভূমি অথচ পাহাড় চূড়ায় শীতেরও অন্ত নেই। এবার আমরা চলেছি জীবনের সব চেয়ে বড় উত্তেজক কাজ কর্ত্তে, তাই সকলের মনই উত্তেজিত—এখান থেকে ৩০০ মাইল দূরে গরোঙ্গোরো পাহাড়—তারই অপর পারে "মারেঙ্কাটী" প্রান্তর,

সেথায় পাব সিংহ, গণ্ডার, মহিষ ইত্যাদি; এদেরই ছবি তোলবার জন্মে প্রস্তুত হচ্ছি চিন্তা করতেও যেমন সমস্ত প্রাণ ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তেমনি এই বিরাট অভিজ্ঞতার আশায় মন স্ফীত হয়েও ওঠে।

আমাদের দলের পরিচয় এইবার দেবো। আমাদের চিত্র-প্রতিষ্ঠানের নাম "আদর্শ-চিত্র লিমিটেড্"। এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হচ্ছেন কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুত শেঠ্ গোবিন্দদাস। আফ্রিকা অধিবাসী ভারতীয়দের মধ্যে এক বিশিষ্ট মহাশয় এ ছবি তোলার সমস্ত আয়োজন করেন; নাম তাঁর শ্রীযুত দয়াভাই পাটেল। আমাদের আফ্রিকা ভ্রমণের যাবতীয় ব্যবস্থা ইনি; এবং এঁর পরম বন্ধু কিসুমু মটর ওয়ার্কসের সত্বাধিকারী মিঃ সাহা করেন। আমাদের দলের কর্ম্মী-বৃন্দের মধ্যে ছিলাম আমি, শ্রীযুক্ত শচীন বন্দোপাধ্যায়, ইনি সহকারী পরিচালক, চিত্রকর শ্রীযুত সুধীর বসু, শব্দযন্ত্রী শ্রীযুত পরিতোষ বসু, ও কন্টিনিউটী-ম্যান শ্রীযুত অশ্বিনী মিত্র। এ ছাড়া আমাদের দলে ছিলেন শিল্পীবৃন্দ মিঃ নাদ্রেকার, মিসেস্ উর্ম্মিলা গুপ্তা, মিসেস্ শর্ম্মা ইত্যাদি। সহকারী ও বয় ইত্যাদি নিয়ে আমাদের দলে মোট ২৯ জন।

আরুষা ক্যাম্পে আমাদের দলের মেয়েদের ও শব্দযন্ত্রী ইত্যাদিদের রেখে আমরা মাত্র দশজন এই শুভ যাত্রায় বেরিয়ে পড়বার উদ্যোগ করলাম। ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ সকাল ৫॥টা থেকে সর্ব্ব আয়োজন সম্পন্ন করে বেলা ৮॥ সময় এই নতুন অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। সঙ্গে রইল তিনখানি বাস্ ও একখানি লরি।

আমাদের যাত্রার পুরোহিত হলেন আমাদের নব-পরিচিত সুইডিস্ বন্ধু ও শিকারি মিঃ একম্যান। ইনি লরিতে সমস্ত মালপত্তর নিয়ে পথপ্রদর্শক হয়ে আগে যাত্রা করলেন; এঁরই পিছু পিছু আমাদের আর তিনখানি মটর অনুসরণ করল।

গরঙ্গোরো শিখর—উচ্চতা ৮৫২২ ফিট
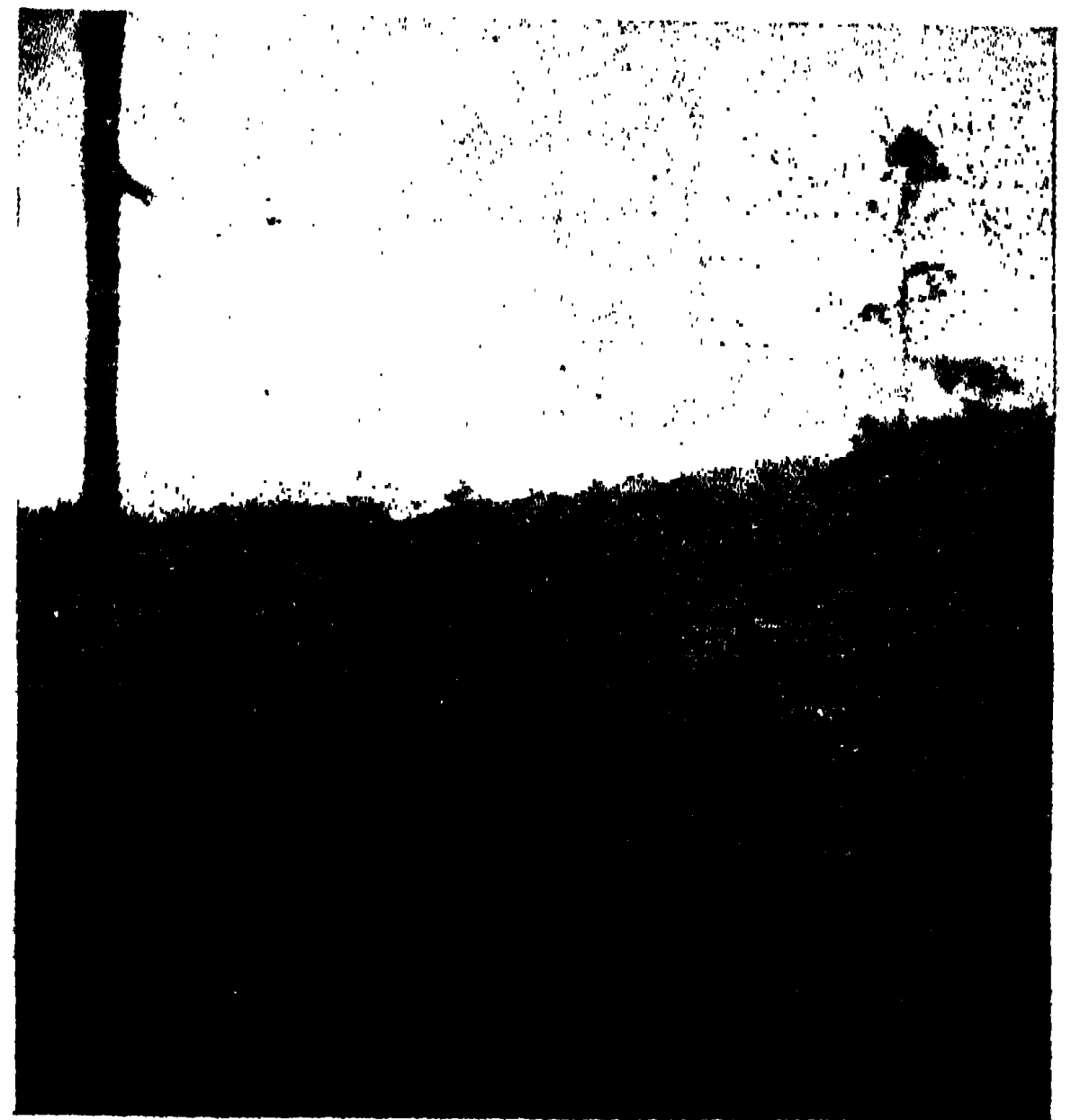
বিশ্ববিখ্যাত গ্রেট-রিফ্ট উপত্যকা ও গিরি-প্রাচীর

রাস্তায় পেলাম প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের বাগিচা আর তারই মাঝে দলে দলে হরিণ (oryx) চপল গতিতে ছুটে পালাতে লাগলো মটরের শব্দে। এইভাবে পলাতকাদের ছবি তোলার অবকাশ না পাওয়ায় মন হলো ক্ষুণ্ণ। ধীরে ধীরে মটর চালাতে আদেশ করলাম। কিছুক্ষণ পরে অদূরে পেলাম একদল হরিণ। মটর থেকে নিঃশব্দে নেমে পড়ে ক্যামেরা ঘাড়ে করে চললাম তাদের অনুসরণে। অশেষ চেষ্টায় তাদের ছবি সেলুলয়েডে ভরে নিলাম। তৃপ্তির নিশ্বাসে সারা বুক ভরে গেলো।

প্রায় বেলা ১২॥টার সময় আমরা এসে পৌঁছিলাম গরোঙ্গোরোর বাহির ফটকে। এখানে দুচার খানা দোকান যৎসামান্য কিছু নিয়ে বসে আছে খরিদ্দারের প্রত্যাশায়। সেখান থেকে আমরা কিছু ফল-পাকড়া কিনলাম আর সঙ্গে নেবার মত নিলাম রুটি মাখন জ্যাম জেলি ইত্যাদি। এখান থেকে ১ মাইল দূরে আমাদের মধ্যাহ্ন আহার সমাপন হলো সে এক নদীর ধারে। নদীটির নাম মটুয়াম্বা। পাহাড়ের উপর থেকে নৃত্যচপল ছন্দে থাকে থাকে নেমে আসছে। জল যেমন মিষ্টি তেমনি শীতল। মটুয়াম্বা হচ্ছে দেশীয় নাম, মানে জেনে নিলাম, বোর্ডে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। যাক্ আমরা নদীর ধারে বসে মধ্যাহ্ন আহার সমাপন করলাম। এবং লরিতে রাখা খালি পিপেগুলি জলে ভরে নিলাম কারণ গরোঙ্গোরোর নিম্ন প্রান্তে ২৫০ মাইলের মধ্যে জলের নাম গন্ধও নেই। কাজেই সময়কালে জলের সংস্থান না রাখলে শেষে জল তেষ্টায় প্রাণ পর্য্যন্ত খোয়াতে হয়।

বেলা ২॥টার সময় নদীর ব্রিজ পার হয়ে গরোঙ্গোরো পাহাড়ের উপর গাড়ী চড়াই ঠেলে উঠ্‌তে লাগলো। পাহাড়ের উচ্চতা হিসাবেই চড়াই উৎরাই। ঘুরপাক খেতে খেতে পাহাড়ের গায় গাড়ী পথ বেয়ে উঠতে লাগলো।

পলাতকার দল

এমন নদী যার ধারে ধারে মক্ষিকার বাস। এই মাছিগুলির গুণ অশেষ। এরা যাদের উপর দয়া করে হুল ফোটান তাদের আর জীবিত থাকতে দেন না। প্রথমে তাদের সারা শরীর ফুলে উঠে, পরে ঘুমপাড়ানি বুড়োর নিদ ছেয়ে আসে সারা অঙ্গে ও দুচোখে, কিন্তু ঘুমুবার অবকাশ দেয় না, তাদের টেনে নেয় মৃত্যুর কঠিন কোলে। সুখের মধ্যে এই জায়গাটিতে যে মক্ষিকাগুলির বাস তারা এখনও বিষাক্ত মাছির পরশ পায়নি অর্থাৎ infectious নয়। এই ঘুমপাড়ানি মাছির ইতিহাস শুনে আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে রইলাম। শুনলাম এদের বসতির ৫০ মাইল দূরে গভর্ণমেণ্ট থেকে দুপাশে যেন সৌন্দর্য্যের হাট বসে গেছে। সত্যই কি অদ্ভুত ও বিচিত্র এই রচনা!

এই পাহাড় হাজার বছর আগে নাকি আরও উঁচু ছিলো। আগ্নেয়গিরির ধূম ও লাভা উদ্গীরণ করে ৭০ স্কোয়ার মাইল অর্থাৎ প্রায় ৬০ হাজার একর মাটির তলায় এর অত্যুচ্চ শিখরকে প্রোথিত করেছে। নীচে ২০০০ হাজার ফিট জঙ্গলে ভরা; তার মাঝে প্রকৃতির কোলে যাদের বাস নেই সেই জন্তুদের আবাস। প্রায় এক লাখ পশু গভর্ণমেণ্ট ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে সুরক্ষিত হয়ে এরাই কোলে নির্ব্বিবাদে ঘুরে বেড়ায়। নীচে একটা পথ

নেমে গেছে, তারই শেষ সীমান্তে গভর্ণমেণ্টের ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের কুঠী।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমাদের মটর ৪০০০ হাজার ফিট উচ্চতায় উঠ্‌লো। পাহাড়ের দক্ষিণ পাশে এই অত্যদ্ভুত

মটুওয়াম্বা অর্থাৎ মুশপাড়ানি মাছির নদী

গরোংগোরো (Ngoronger) ক্রেটার (crater) আর বামদিকে শ্যামল বিটপী ছাওয়া চিরাঙ্কিকার উপত্যকা। বড় বড় শিরীষ ও ইউক্লিপটাসের গগনস্পর্শী উচ্চ শীর চেয়ে আছে অনন্ত আকাশের দিকে। আর তারই সারা গা ছেয়ে সবুজ শস্পরাজি হাওয়ায় দুল্‌ছে। বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম এই প্রকৃতির ঝুলন দোলার দিকে। মিঃ একম্যানের মটর এসে উপস্থিত হলো; তিনি তাড়াতাড়ি মটর থেকে নেমে এসে আমায় বল্লেন, "মিঃ বোস, দূরে ওই পাহাড়শ্রেণী দেখেছেন?" আমি বল্লাম পাহাড়শ্রেণীর আর দেখবার কি আছে?" তিনি বল্‌লেন "ওর নাম Great Rift Wall গ্রেট রিফট্ ওয়াল, ওরই ধারে বিশ্বের বিখ্যাত উপত্যকা Great Rift Valley of the world." আমি এবং আমার সঙ্গীরা উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলাম পাহাড়ের প্রাচীরের দিকে। তিনি বললেন—"In this region profound geological changes were accompanied by great volcanic activity, during which the summit of this highland plateu sank and formed the long dipression known as the Rift Valleys, the more western Valley extending from the southern end of Lake Nyasa in a

আমাদের সুইডিস বন্ধু ও শিকারী মিঃ একম্যান

long avenue filled with lakes and waterways as far as the Nib and the eastern or Great Rift Valley, breaking off at the northern end of Lake
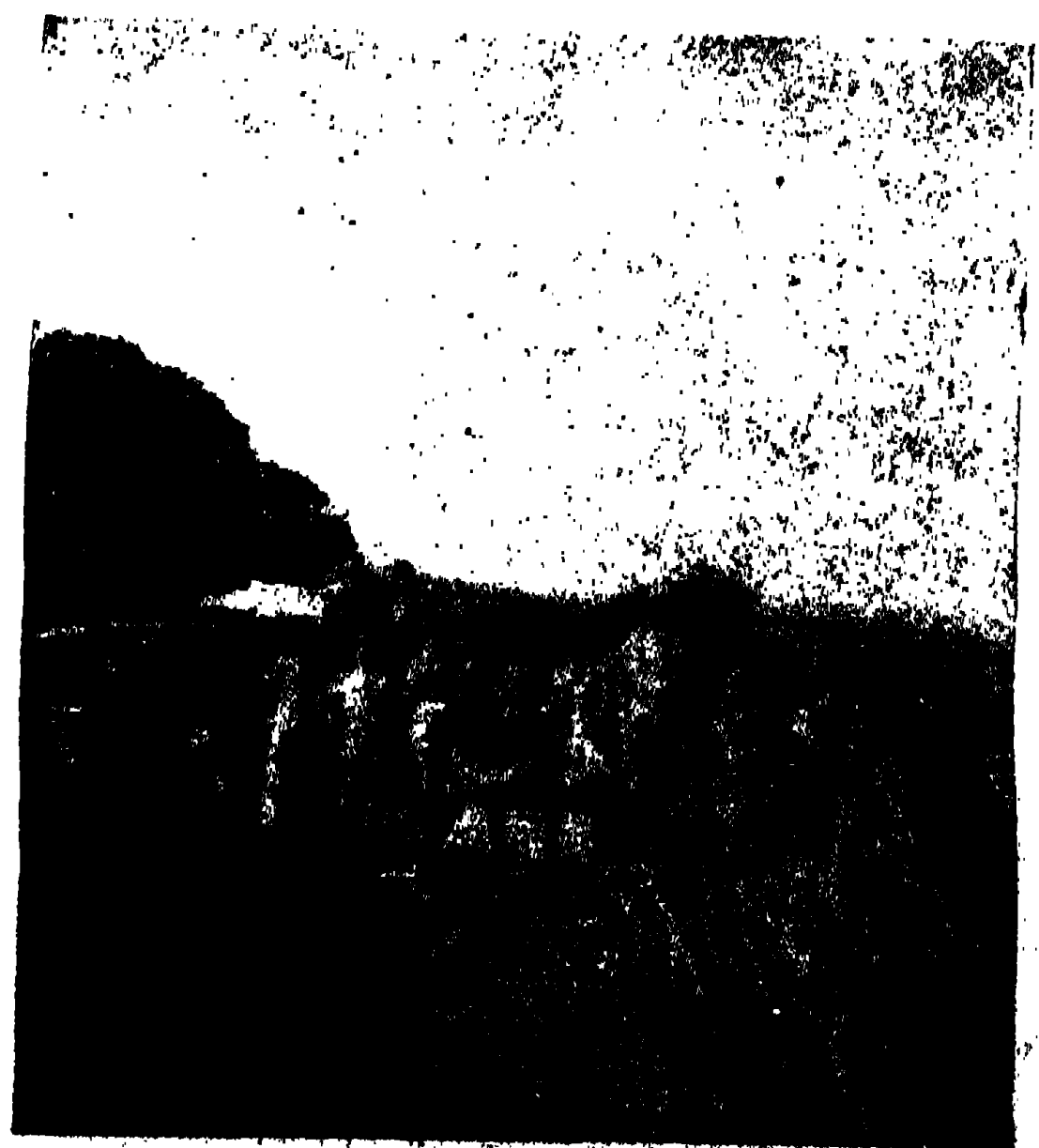
আমাদের আরুষা ক্যাম্প

Nyasa and extending as a depressed area, frequently bounded by steep parallel sides, northward across the Tanganyika Territory and Kenya to Lake Rudolf and thence to the Red Sea. This great rift can be traced northward into Palestine and across the Mediteranean and along the Adriatic to the Alps. Its length is equal to one-sixth of the circumference of the Earth." শুনে স্তম্ভিত হয়ে সকলে দেখতে

গরোঙ্গোরোর উপত্যকা

লাগলাম। মিঃ একম্যান দুরবীন খুলে আমার হাতে দিলেন তারই সাহায্যে এই অনন্ত প্রাচীর ও উপত্যকাকে কাছে টেনে নিয়ে দেখতে লাগলাম। সারা উপত্যকা জুড়ে এক বিরাট ব্যবধান মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে—যেন সভ্যতা আর বর্ব্বরতার মাঝে দুর্লঙ্ঘ্য দ্বন্দ্ব প্রাচীর। কেবলই মনে হতে লাগলো যে আজও তাই আফ্রিকার বুক জুড়ে বসতি রয়েছে পৃথিবীর জন্মদিনের আদিম অধিবাসীদের, আজও নিরালায় এই প্রাচীরবেষ্টিত নতুন জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছে শত সহস্র হিংস্র শ্বাপদের দল। আধুনিক সভ্যতার আবহাওয়ার ঝটকা বাতাস এদের কারো গায়ে যাতে না লাগে তারই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন স্থষ্টিকর্ত্তা তাঁর স্থষ্টির আদি রূপকে সঞ্জীবিত রাখবেন বলে।

গরোঙ্গোরোর অর্দ্ধ মণ্ডলাকৃতি শিখর দিয়ে আমাদের মটর আবার চললো। এখানে পাহাড়ের শেষ উচ্চতা ৮০০০ ফিটের উপর; তাই পার হয়ে পাহাড়ের অপর পারে এসে উপস্থিত হলাম। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে—শীতের আর অবধি নেই। দাঁতে দাঁত লেগে যেতে লাগলো। ক্যাম্প ফিট হতে লাগলো, পাশে আগুন জ্বলেছে তারই পাশ ঘিরে নেটিভ বয়রা তাদের নিজেদের ভাষায় গান ধরলো।
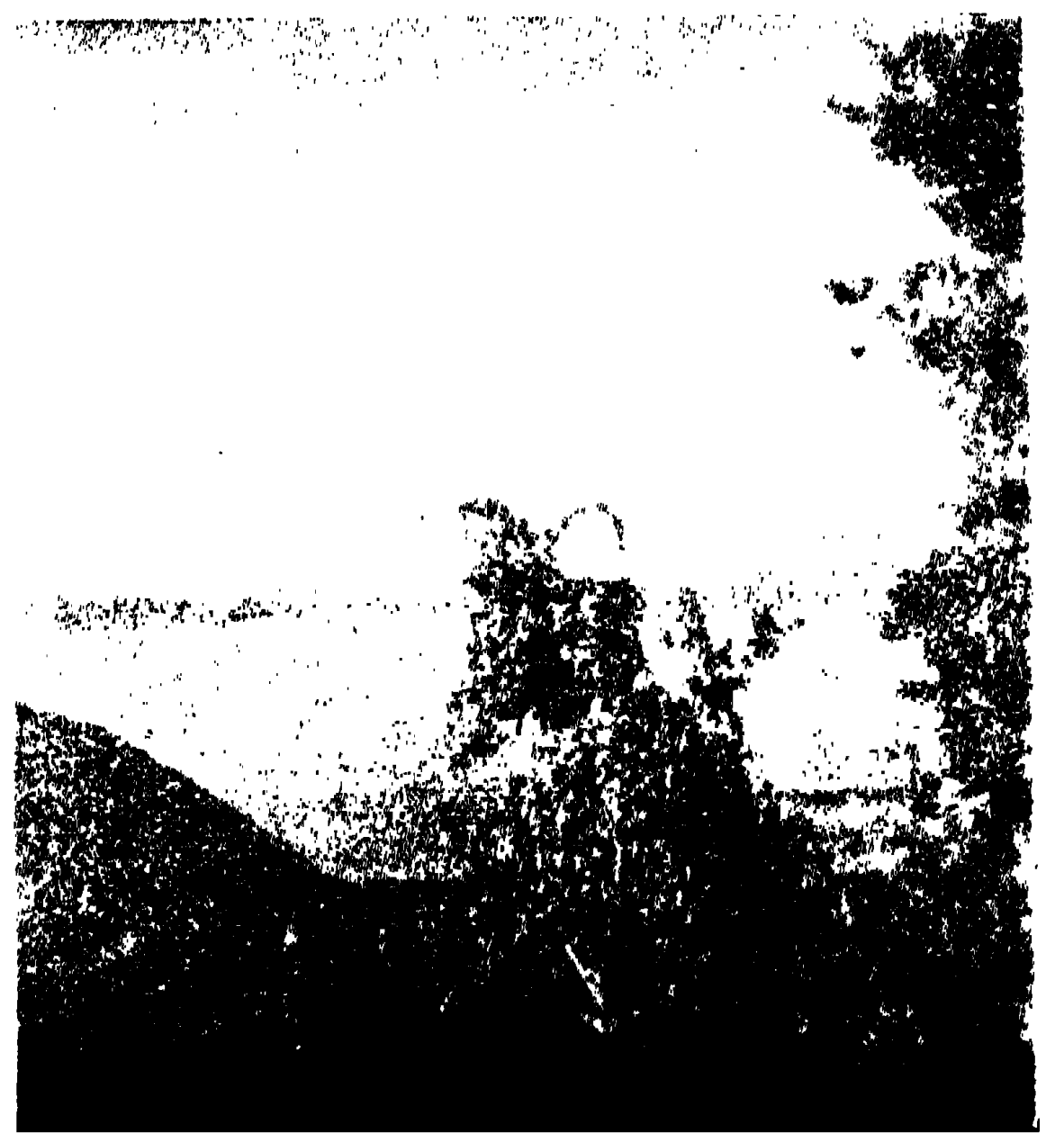
জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রেটার বা খাদ—নাম গরোঙ্গোরো

গরোঙ্গোরো এই শিখরে গভর্ণমেণ্টের পাকা তাঁবু আছে —তারই পাশে আমাদের তাঁবু। নিরালায় লোকালয় বর্জ্জিত ভয়াবহ অন্ধকার রাত্রে পাহাড়ের গায়ে আমাদের বনের রাজত্ব বসেছে এই দশজনকে ঘিরে। দূরের বনরাজী চন্দ্রকিরণে স্বপ্নপুরী রচনা করছে। ক্যাম্পে শুয়ে পড়ে তাই দেখতে দেখতে অভিভূত হয়ে পড়লাম। খাবার তৈরী—তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। কাল আবার গরোঙ্গোরোর অপর পারে সারেঙ্গাটী প্রান্তরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হবে—সেথায় আছে এই বনানীর রাজারা—"সিংহ-রাজপরিবার"। (ক্রমশঃ)

শ্রীহীরেন বসু

গীতা ও শাস্ত্র

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

১

অনিলবাবু লিখিয়াছেন, "আমাদের সনাতনী ভ্রাতাগণ গোড়ায় গলদ করিয়াছেন, তাঁহারা ধর্ম ও সমাজকে অচলায়তন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।" কিন্তু এজন্য সনাতনীদিগকে অভিযুক্ত না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানই অনিলবাবুর সঙ্গত ব্যবহার হইত। কারণ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে শাস্ত্র বিধান অনুসারে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবে (গীতা ১৬।২৪)। তিনি যদি বলিতেন যে যাহার বুদ্ধিতে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইবে, সে সেইরূপ কার্য্য করিবে তাহা হইলে না হয় ধর্ম ও সমাজকে অচলায়তন না করিয়া "হাওয়ার" ফানুষ করা যাইত। শ্রীকৃষ্ণ যখন গীতা উপদেশ দিয়াছিলেন তখন অন্ততঃ পক্ষে বেদ, উপনিষদ, মনুসংহিতা এবং রামায়ণ এই কয়টি শাস্ত্র যে বিদ্যমান ছিল এ বিষয়ে কোনও সংশয় হইতে পারে না। সুতরাং যিনি গীতা বিশ্বাস করেন তিনি যে এই কয়টি শাস্ত্র দ্বারা সমাজকে অচলায়তন করিয়া রাখিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। বিচিত্র ইহাই যে গীতার পরম ভক্ত অনিলবাবু কিরূপে ইহাতে আপত্তি করিতে পারেন।

অনিলবাবু যখন গীতায় বিশ্বাস করেন তখন তাঁহার জন্য আর কোনও যুক্তি দেওয়া প্রয়োজন নয়। কিন্তু বিচিত্রার পাঠক পাঠিকার মধ্যে অনেকে হয়ত অনিলবাবুর ন্যায় গীতায় পূর্ণ বিশ্বাসী না হইতে পারেন, এবং তাঁহাদের মনে এই সংশয় হইতে পারে যে জগতে সকলই যখন পরিবর্ত্তনশীল তখন শাস্ত্রই বা কেন পরিবর্ত্তনহীন হইবে। তাঁহাদের নিকট আমার নিবেদন এই যে প্রকৃতি যদিও পরিবর্ত্তনশীল তথাপি প্রকৃতির নিয়ম সকল পরিবর্ত্তনহীন বা সনাতন। হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বেও জল ঠাণ্ডা লাগিয়া বরফ হইত, গরম লাগিয়া বাষ্প হইত,—ঠিক এখন যেমন হয়। প্রকৃতির নিয়ম যেমন পরিবর্ত্তনহীন, শাস্ত্রের নিয়মও সেইরূপ পরিবর্ত্তনহীন। ঋষিগণ তপস্যার দ্বারা বেদ মন্ত্র এবং তাহার অর্থলাভ করিয়া মানবের কল্যাণের জন্য যে সকল নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেইগুলিই শাস্ত্রে নিবদ্ধ আছে। গুরুর সেবা করিয়া ছাত্র উত্তমরূপে বিদ্যা লাভ করিতে পারে, পিতার আদেশ পালন করিয়া পুত্রের চরিত্র উন্নত হইতে পারে, স্বামীর সেবা করিয়া রমণী আদর্শ চরিত্রবতী হইতে পারে, শাস্ত্রবিহিত এই সকল নিয়ম পূর্ব্বে যেরূপ সত্য ছিল এখনও সেরূপ সত্য।

অনিলবাবু লিখিয়াছেন যে আজকাল "এমন সব চিন্তাশক্তিশালী লোকের আবির্ভাব হইয়াছে যাঁহারা শাস্ত্রের সকল বিধি বিধানকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছেন।" শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাশক্তি নিশ্চয়ই খুব কম ছিল, তাই তিনি শাস্ত্রের বিধিবিধানকে গ্রাস করিবার কথা বলেন নাই, সেই সকল বিধিবিধানকে পালন করিতেই বলিয়াছেন। তথাপি কেন যে অনিলবাবু শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া মানেন এবং গীতায় বিশ্বাস করেন ইহা বলা কঠিন।

অনিলবাবু বলিতেছেন "শাস্ত্র আচার এ সব-ই হইতেছে সাময়িক সহায় মাত্র, যতক্ষণ না আমরা ভিতরের অধ্যাত্ম সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি ততক্ষণই ইহাদের উপযোগিতা।" অনিলবাবুর উদ্দেশ্য এই যে সাধারণ লোকেরা শাস্ত্র মানিয়া চলুক কিন্তু মহাপুরুষগণ—যাঁহারা অধ্যাত্ম সত্যে প্রতিষ্ঠিত হন—তাঁহাদের শাস্ত্র লঙ্ঘন করিলে দোষ নাই, কিন্তু ইহা সমীচীন নহে। অন্ততঃ এই মত গীতার বিরোধী। কারণ গীতা ৩।২১ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করেন, সাধারণ ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃই তাহা অনুসরণ করিয়া থাকে। সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে যদি শাস্ত্র অনুসরণ করা প্রয়োজন হয় তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরও

শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া সৎদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ অনিলবাবু এখানে বলিতেছেন যে সাধারণ লোকদের শাস্ত্র অনুসরণ করা উচিত, আবার অন্যত্র বলিয়াছেন যে সাধারণ লোকদেরও শাস্ত্র লঙ্ঘন করা উচিত, কারণ শাস্ত্র যে যুগের জন্য রচিত হইয়াছিল, সে যুগ চলিয়া গিয়াছে। অতএব অনিলবাবুর মতের মধ্যে পরস্পর সঙ্গতি নাই।

অনিলবাবু বলিয়াছেন যে জাতিবিভাগ বিষয়ে মনুসংহিতার সহিত গীতা ও বেদের মিল নাই। তাঁহার মত এইরূপ :—বৈদিকযুগে "বর্ণ হইতে বর্ণান্তর গমনে কোন বাধা ছিল না" "জন্মকে বেশী বা কিছুই প্রাধান্য দেওয়া হইত না", পরে মনুসংহিতাতে দেখা যায় বর্ণ জন্মগত হইয়াছে এবং বৃত্তিই বর্ণবিভাগের মূল কথা; কিন্তু গীতার আদর্শ মনুসংহিতার অনুরূপ নয়, বৈদিকযুগের অনুরূপ, কারণ গীতা ব্রাহ্মণের লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছে শান্তভাব, আত্মসংযম, শুচিতা, ইত্যাদি এবং মনুসংহিতা ব্রাহ্মণের লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ; গীতা বলিয়াছেন যাহার যেমন প্রকৃতি যেমন গুণ তদনুসারেই তাহার কর্ম নির্দ্ধারণ করা উচিত; কিন্তু মনু বলিয়াছেন যাহার যেমন জন্ম তদনুসারেই তাহার কর্ম নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।" আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব এই মত যথার্থ নহে; বেদ, গীতা এবং মনুসংহিতার মধ্যে কোনও মতভেদ নাই, অনিলবাবু গ্রন্থে যে বিরোধ কল্পনা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। যদি প্রকৃতই বিরোধ থাকিত তাহা হইলে বেদ একথা বলিতেন না "যৎ কিঞ্চ মনুঃ অবদৎ তৎ ভেষজম্" অর্থাৎ মনু যাহা বলিয়াছেন তাহা ঔষধের ন্যায় হিতকারী, এবং মনুসংহিতা বলিতে পারিতেন না যে মনুর সকল ব্যবস্থা বেদানুযায়ী—

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিৎ ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।

স সর্বোঽভিহিতো বেদে—(মনু ২।৭)

যদি গীতা ও মনুসংহিতাতে বিরোধ থাকিত তাহা হইলে গীতা একথা বলিতে পারিতেন না যে কর্ত্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ (গীতা ১৬।২৪), কারণ মনুসংহিতা একটি প্রসিদ্ধ শাস্ত্র এবং ইহা গীতার পূর্বে রচিত হইয়াছিল।

বৈদিক যুগে বর্ণ হইতে বর্ণান্তরে গমনে কোন বাধা ছিল না ইহার সমর্থনে অনিলবাবু ঋগ্বেদ ১০-১৩২-৩ হইতে এই প্রমাণ দিয়াছেন যে "এক ঋষির পিতা চিকিৎসকের কার্য্য করিতেন এবং তাঁহার মাতা শস্য নিষ্পেষণ করিতেন।" কিন্তু ইহা হইতে কিরূপে প্রমাণ হয় যে পিতা, মাতা ও পুত্রের বর্ণ বিভিন্ন ছিল? ইহা প্রমাণ করিতে হইলে অনিল বাবুর এরূপ বেদবাক্য উদ্ধৃত করা উচিত ছিল, যাহাতে বলা হইয়াছে যে ঋষিগণ সকলে ব্রাহ্মণ, চিকিৎসকগণ বৈদ্য, এবং কোনও স্ত্রীলোক যদি শস্য নিষ্পেষণ করে তাহা হইলে তাহার বর্ণ বৈশ্য বা শূদ্র। কিন্তু অনিলবাবু এরূপ কোনও প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই। অনিলবাবুর দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও পুরোহিতের কার্য্য করিতেন। কিন্তু ইহার কারণ এই যে বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা করিয়া তাঁহার বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তপস্যার দ্বারা অসাধ্যসাধন হয়। সুতরাং বর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল ইহা বিচিত্র নহে। বর্ণ হইতে বর্ণান্তরে যাওয়ার বাধা ছিল বলিয়াই এত কঠোর তপস্যার প্রয়োজন হইয়াছিল। বৈদিকযুগে বর্ণ হইতে বর্ণান্তর গমনে কোনও বাধা ছিল না অনিলবাবুর এই উক্তি যদি সত্য হইত তাহা হইলে বিশ্বামিত্রকে বারম্বার এত কঠোর তপস্যা করিতে হইত না। অনিলবাবুর তৃতীয় প্রমাণ এই যে মহর্ষি ভৃগুর বংশধরগণ সূত্রধর হইয়াছিলেন, তাঁহারা রথনির্ম্মাণ করিতে নিপুণ ছিলেন। তাঁহারা রথ নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন অতএব তাঁহাদের বর্ণের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, অনিলবাবুর এই সিদ্ধান্তও ভুল। কোন্ দিন অনিলবাবু বলিয়া বসিবেন যে শ্রীকৃষ্ণ রথ চালাইতে পারিতেন অতএব তাঁহার বর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ভৃগুর বংশধরগণের যে প্রকৃতই বর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল অনিলবাবু এরূপ কোনও প্রমাণ দেন নাই। অনিলবাবুর পঞ্চম প্রমাণ এই যে ঋষি মুদ্গল যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অনিলবাবু বোধ হয় ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মুদ্গলের বর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, ইঁহারা সকলেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তথাপি

ব্রাহ্মণই ছিলেন, বর্ণ পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাহার পর অনিলবাবু বলিয়াছেন যে ঋগ্বেদে দেখা যায় যে যুবতীগণ যে কোনও বর্ণ হইতে পতি বাছিয়া লন। এরূপ কথা ঋগ্বেদে নাই। অনিলবাবু মূল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ না করিলে ইহা স্বীকার করা যায় না।

অনিলবাবু যে বলিয়াছেন গীতায় ব্রাহ্মণের লক্ষণ শমদমাদি গুণ, কিন্তু মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণের লক্ষণ অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রভৃতি বৃত্তি, অনিলবাবুর এই উক্তি যথার্থ নহে। প্রথমতঃ মনুসংহিতায় কোথাও অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রভৃতিকে ব্রাহ্মণের লক্ষণ বলা হয় নাই। মনুসংহিতায় ইহাই বলা হইয়াছে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা প্রভৃতি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম। মনুসংহিতার শ্লোকগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে :—

১ সর্বস্য অস্যতু সর্গস্য গুপ্ত্যর্থং স মহাদ্যুতিঃ
মুখবাহুরুপজ্জানাং পৃথক্‌কর্ম্মাণি অকল্পয়ৎ ॥

মনু ২।৮৭

"সমগ্র সৃষ্টি রক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মা চারিবর্ণের পৃথক পৃথক কর্ম সৃষ্টি করিলেন।

অধ্যাপনং অধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহংচৈব ব্রাহ্মণানাম্ অকল্পয়ৎ ॥ ২।৮৯

"অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ, ব্রাহ্মণের জন্য এই সকল কর্ম সৃষ্টি করিলেন।"

সুতরাং অধ্যয়ন, অধ্যাপন প্রভৃতি ব্রাহ্মণের লক্ষণ নহে, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম মাত্র। বলা বাহুল্য সকলে কর্ত্তব্য কর্ম করে না। সুতরাং কর্ত্তব্য কর্মকে কাহারও লক্ষণ বলা যায় না। দরিদ্রকে অর্থ দান করা ধনীর কর্ত্তব্য কর্ম। কিন্তু সেজন্য ইহা বলা যায় না যে দরিদ্রকে অর্থ দান করা ধনীর লক্ষণ। ব্রাহ্মণের (এবং অন্য সকল জাতির) লক্ষণ কি তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে বলা হইয়াছে।

সর্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষু অক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াঃ ত এব তে ॥

মনুসংহিতা ১০।৫

সমান বর্ণের অক্ষতযোনি পত্নীতে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তাদের জাতি পিতা-মাতার জাতির সহিত অভিন্ন।

ইহাই ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণের মনু নির্দিষ্ট লক্ষণ। গীতা ও মহাভারতের মতেও ইহাই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের লক্ষণ। এজন্য দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা যুদ্ধ ব্যবসায় অবলম্বন করিলেও তাঁহারা ব্রাহ্মণ-ই ছিলেন। গীতার উপদেশের মূলেও জন্ম অনুসারে বর্ণ নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ গীতায় ভগবান বলিয়াছেন যে অর্জুন ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এজন্য যুদ্ধ তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম ; যুদ্ধ না করা তাঁহার পাপ। জন্ম অনুসারে বর্ণ নির্দেশ না করিলে অর্জুন ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিলে কোনও পাপ হইত না, কারণ ব্রাহ্মণোচিত সৎগুণ অর্জুনের যথেষ্টই ছিল। এবং ভিক্ষা করা ব্রাহ্মণের বৈধ বৃত্তি। গীতা ১৮।৪২ শ্লোকেও শম, দম, তপস্যা, শৌচ, প্রভৃতিকে "ব্রহ্ম কর্ম" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণের লক্ষণ বলা হয় নাই। মনুনির্দিষ্ট ব্রাহ্মণের কর্ম অধ্যয়ন, অধ্যাপনা প্রভৃতি এবং গীতা নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণের কর্ম শম দমাদির মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। এজন্য গীতা ও মনুসংহিতার মধ্যে অনিল বাবু যে বিরোধ কল্পনা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অলীক। গীতা ১৮।৪১ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতির কর্ত্তব্য কর্ম "স্বভাবজাত গুণের" দ্বারা বিভক্ত করা হইয়াছে। স্বভাবজাত গুণ পূর্বজন্মের কর্মের উপর নির্ভর করে। এজন্য বেদ বলিয়াছেন—

রমনীয়চরণা রমনীয়াঃ যোনিম্ আপদ্যন্তে
ব্রাহ্মণ যোনিংবা বৈশ্যযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা
কপূয়চরণা কপূয়াং যোনিম্ আপদ্যন্তে
শ্বযোনিং বা শূকর যোনিং বা চণ্ডাল যোনিং বা ॥

ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫।১০।৭

"যাহারা উত্তম কর্ম করে তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য রূপ উত্তম যোনি প্রাপ্ত হয়, যাহারা মন্দ কর্ম করে, তাহারা কুকুর, শূকর অথবা চণ্ডাল যোনি প্রাপ্ত হয়।"

কর্ত্তব্য কর্মকে গীতায় "সহজং কর্ম" বলা হইয়াছে (গীতা ১৮।৪৮) অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মের সহিত তাহার কর্মও জন্মগ্রহণ করে। জন্ম অনুসারে বর্ণ নির্দেশ এবং বর্ণ অনুসারে কর্ম নির্দেশ হইলেই এই বাক্য সুসঙ্গত হয়। সুতরাং বেদ, গীতা, মনুসংহিতা সর্বত্রই এ বিষয়ে সুসঙ্গতি আছে। ইহাদের মধ্যে অনিল বাবু যে বিরোধ কল্পনা করিয়াছেন তাহা অলীক।

বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে বিরোধ আছে ইহার অনিল বাবু নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দিয়াছেন :—

(১) ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতিতে বলা হইয়াছে যে ঔরস পুত্র ভিন্ন ক্ষেত্রজাদি পুত্রের জন্ম ও মৃত্যুতে ত্রিরাত্র অশৌচ ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বৃদ্ধ গৌতম ও বৃহৎ মনু বলিয়াছেন দত্তক পুত্র যদি সপিণ্ড হইতে গৃহীত হয় তাহা হইলে তাহাদের জন্ম ও মৃত্যুতে পূর্ণ অশৌচ পালন করিতে হয়। অতএব উভয় ব্যবস্থা পরস্পর বিরোধী।

কিন্তু ব্রহ্মপুরাণের ব্যবস্থা সপিণ্ড দত্তক পুত্র ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে এই বিরোধ পরিহার করা যায়। যে ক্ষেত্রে বিশেষ বিধি পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে সামান্য বিধির (অর্থাৎ সাধারণ নিয়মের) প্রয়োগ হয় না, ইহা মীমাংসা শাস্ত্রের সুবিদিত সিদ্ধান্ত।

(২) যমস্মৃতিতে বলা হইয়াছে যে, উপবাসের অর্থ বাহ্যিক ভোজন নিবৃত্তি নহে, পাপ হইতে নিবৃত্তি। কিন্তু কাত্যায়ন বলিয়াছেন যে বিধবাদের পক্ষে একাদশীতে অন্নাহার নিষিদ্ধ।

কিন্তু ইহার মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। যমের বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে কোনও বিধবা যদি একাদশীতে অন্নাহার বর্জ্জন করেন কিন্তু পাপ হইতে বিরত না হন, তাহা হইলে তাঁহার উপবাস নিষ্ফল। বলা বাহুল্য যমের এরূপ অভিপ্রায় হইতে পারে না যে একাদশী ভিন্ন অন্য দিন বিধবা পাপ করিলে দোষ নাই।

অনিলবাবু লিখিয়াছেন যে "মানবজাতি ক্রমবিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া এক পরম ভাগবত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে।"

কিন্তু ইহা হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী মত নহে। হিন্দু শাস্ত্রের মতে প্রথমে ঋষিগণ সত্য ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তখন মানব সমাজ উন্নত ও পবিত্র ছিল, কিন্তু মানব স্বাভাবিক ভোগ প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া অধোগতি লাভ করে, যখন অধোগতি বেশী হয়, অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখন ভগবান অবতার গ্রহণ করিয়া সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। গীতা ভাষ্যের উপক্রমণিকায় শঙ্করাচার্য্য এই মত প্রচার করিয়াছেন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥

গীতা ৩।৭

"যখন ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের উত্থান হয়, তখন আমি অবতীর্ণ হই।" পুনশ্চ অন্যত্র গীতায় ভগবানকে "শাশ্বত ধর্ম গোপ্তা" বলা হইয়াছে। উপনিষদে নানা স্থানে দেবাসুর সংগ্রামে মধ্যে মধ্যে অসুরদের জয়লাভের উল্লেখ আছে। এ সকল কথা প্রতিপাদন করে যে মানব সমাজের স্বাভাবিক গতি নিম্নমুখিনী; ভগবান যখন অবতীর্ণ হন তখন এই নিম্ন গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই বিভিন্ন যুগের মধ্যে সত্য যুগই প্রথমে, তাহার পর ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। কলির পর ভগবান পুনরায় সত্য যুগ প্রতিষ্ঠা করেন। আবার ত্রেতা, দ্বাপর, কলির মধ্য দিয়া অবনতি হয়। বলা বাহুল্য অনিল বাবুর মত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কল্পনার প্রতিধ্বনি মাত্র। কিন্তু সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতের এইরূপ মত নহে। কেহ কেহ বলেন মানব সমাজের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে, অনিল বাবুর ভাষায় "পরম ভাগবত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে"। আবার কেহ কেহ বলেন, (আজকাল এইরূপ কথাই বেশী শোনা যাইতেছে)—যে পাশ্চাত্য সভ্যতা ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে।

অনিলবাবু লিখিয়াছেন "বৈদিক যুগ আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া খুবই বড় ছিল, কিন্তু ভারতের সামাজিক জীবনে শ্রেষ্ঠ যুগ আসিয়াছিল বুদ্ধের আবির্ভাবের পর।" পাশ্চাত্যের নকল-নবিশের পক্ষে অনিলবাবুর মতগুলি বড়ই মুখরোচক। কিন্তু অনিলবাবু গোড়ায় গলদ করিয়াছেন তিনি নিজকে গীতাভক্ত বলিয়া প্রচার করিয়া। কারণ গীতা বলিয়াছেন যে কর্ত্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ, শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান হইতেছে বেদ, সুতরাং যিনি গীতা মানিবেন তাঁহাকে বলিতে হইবে যে বেদ অনুসরণ করিয়া শ্রেষ্ঠ সামাজিক জীবন লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু অনিলবাবু তাহা মানিতে রাজি নহেন। কারণ বেদে বর্ণ বিভাগের কথা আছে, এবং লোহিত বস্ত্রখণ্ড দেখিলে বৃষভের যে অবস্থা হয় বর্ণ বিভাগের কথা শুনিলে পাশ্চাত্যের নকলনবীশের সেই অবস্থা হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উপনিষদের আধ্যাত্মিকতার প্রশংসা

করিয়াছেন, কিন্তু বর্ণ বিভাগের নিন্দা করিয়াছেন ; এজন্য আমাদের দেশের পাশ্চাত্য প্রভাবগ্রস্ত বিদ্বানগণও বৈদিক আধ্যাত্মিকতার প্রশংসা করেন, কিন্তু বৈদিক সমাজ ব্যবস্থা পছন্দ করেন না। তপঃপরায়ণ ঋষিগণের নিকটই বেদ সকল প্রকাশিত হইয়াছিল, বেদ কোনও মানবের রচনা নহে, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর কর্তৃক বেদ প্রচারিত হইয়াছিল, অতএব বেদের যে অংশে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে সেই অংশ যেমন সত্য, যে অংশে সমাজ ব্যবস্থার কথা আছে সে অংশও সেইরূপ কল্যাণজনক।

বুদ্ধধর্ম অবিচারে সকলকেই সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য আহ্বান করিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দের মতে ইহাই ভারতের জাতীয় শক্তি হ্রাসের কারণ। তথাপি বুদ্ধধর্মের সামাজিক ব্যবস্থা অনিলবাবুর নিকট অতি উৎকৃষ্ট বোধ হইয়াছে। কারণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বুদ্ধধর্ম প্রশংসা করেন। অপরদিকে শঙ্করাচার্য্য যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া কেবল মাত্র তাহাদিগকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন বলিয়া অনিলবাবু প্রচার করিয়াছেন যে শঙ্করাচার্য্যই ভারতের অধঃপাতের কারণ। (ভারতবর্ষ মাঘ ১৩৪১) বুদ্ধধর্মে অহিংসা নীতির উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হইয়াছিল, বলা হইয়াছিল, কোনও অবস্থায় কাহাকেও আঘাত করা পাপ। হিন্দু ধর্মে যদিও অহিংসাকে উৎকৃষ্ট ধর্ম বলা হইয়াছিল, তথাপি ইহাও বলা হইয়াছিল যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে (যথা ক্ষত্রিয়ের ধর্মযুদ্ধে) হত্যা করিলেও পাপ হয় না। গীতারও ইহাই মত এবং অনিলবাবুও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। বুদ্ধ ধর্মের সামাজিক ব্যবস্থায় এই সকল গুরুতর ত্রুটি থাকিলেও অনিলবাবু বুদ্ধ ধর্মের সামাজিক ব্যবস্থাকে উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন ইহা বড়ই বিচিত্র।

অনিলবাবু বলিয়াছেন "ধর্ষিতা নারীর কোন পাপ হয় না, অতএব তাহার প্রায়শ্চিত্তের কোনও প্রয়োজন নাই।" কোনও ব্যক্তির কঠিন ব্যাধি হইলে কোনও পাপ হয় না। কিন্তু হিন্দু-ধর্মে তাহারও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। কারণ ঐ ব্যক্তি পূর্বে কোনও পাপ করিয়াছিল, তাহার ফলেই তাহার কঠিন ব্যাধি হইয়াছে, সেই পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। সেইরূপ কোনও রমণী যদি ধর্ষিতা হন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তিনি পূর্ব্বে কোনও পাপ করিয়াছিলেন তাহার ফলেই তাঁহার এই দুরদৃষ্ট হইয়াছে। জগতে কোনও ঘটনা অহেতুক ঘটে না, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই ঘটিতে পারে না, আমরা সুখ দুঃখ যাহাই ভোগ করি সকলই পূর্বকৃত কর্ম্মের ফলে অতএব অনিচ্ছাপূর্ব্বক ধর্ষিত হওয়াতে যদিও রমণীর কোনও পাপ নাই, কিন্তু যে পূর্বকৃত পাপের ফলে রমণীকে ধর্ষিত হইতে হইল, তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা থাকা অযৌক্তিক নহে।

অনিলবাবু বলিয়াছেন যে পাপের দ্বারা মানুষ যখন এমন অবস্থায় উপনীত হয় যখন তাহার পাপ পুণ্যের বোধ থাকে না, তখন সে অপরাধ করিলে আর কোনও পাপ হয় না। অনিলবাবুর এই সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা যায় না। দাগী চোর চুরি করিয়া করিয়া এরূপ অবস্থায় উপনীত হয় যখন তাহার পাপ পুণ্যের বোধ থাকে না। কিন্তু বিচারক তাহার বেশী দণ্ড দেন। কোনও উকীল এ পর্য্যন্ত আদালতে এরূপ যুক্তি প্রয়োগ করেন নাই, "হুজুর আমার মক্কেল এতবার চুরি করিয়াছে যে তাহার পাপ পুণ্যের বোধ নাই, সে পশু হইয়া পড়িয়াছে, পশুর আবার পাপ কি? বিড়াল মাছ চুরি করিয়া খাইলে তাহার যেমন পাপ হয় না, সেইরূপ আমার মক্কেলের পাপ হয় না, তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হুকুম হউক, সে যত খুসী চুরী করিয়া বেড়াক।" এই অভিনব যুক্তি বোধ হয় জগতে অনিলবাবুই সর্ব প্রথম ব্যবহার করিলেন। ইহা যে অনিলবাবুর আধ্যাত্মিক গবেষণায় মৌলিকতার পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনিলবাবুর মনে সংশয় হইয়াছে যে হয় ত মুসোলিনী ও জাপান "অহং বুদ্ধি লইয়া লোভের বশে যুদ্ধে প্রবৃত্ত" হয় নাই, হয় ত তাহাদের "ভিতরে এই উপলব্ধি আছে যে জগতের কল্যাণের জন্য ভগবদ্ প্রেরণাতেই এই কর্ম করিতেছে, এবং তাহা হইলে মুসোলিনী ও জাপানের কোনও পাপ হয় নাই। ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক। জগতের সর্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠকেও অনিলবাবু বেকসুর খালাস দিতে

পারেন যদি সে বলে যে তাহার অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি হইয়াছে যে সে ভগবদ্ প্রেরণাতেই কোনও কর্ম করিয়াছে। অনিলবাবু যদি দণ্ডবিধির আইন প্রণয়ন করেন, বা বিচারকের আসনে উপবিষ্ট হন, তাহা হইলে চোর ও দুষ্কৃতকারিদের "পৌষ মাস" উপস্থিত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?

গীতায় অর্জুন বলিয়াছেন "সঙ্করো নরকায় এব" অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করিলে নরকে গমন করিতে হয়, এজন্য অনিলবাবু বলিয়াছেন যে ইহা অর্জুনের মত, শ্রীকৃষ্ণের নহে, অর্জুন তামসিকতায় আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, এজন্য অর্জুনের এই মত ভুল। কিন্তু অনিলবাবুর এ সিদ্ধান্তও ভ্রান্ত। বর্ণ সঙ্কর করিলে পাপ হয় ইহা শাস্ত্রের মত, গীতা ১৬।২৪ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন যে কর্ত্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। ("শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ"), সুতরাং বর্ণসঙ্কর করিলে পাপ হয় ইহা শ্রীকৃষ্ণেরও মত বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অর্জুন শোকাচ্ছন্ন চিত্তে কর্ত্তব্য নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেজন্য এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে অর্জুন যাহা কিছু বলিয়াছিলেন প্রত্যেক কথাই ভুল। অর্জুন বলিয়াছিলেন যে গুরুজনদিগকে পূজা করা উচিত, রাজ্য লোভে স্বজন বধ করা অন্যায়, এ সকল কথা ভুল নহে। রাজ্য লোভের বশবর্ত্তী না হইয়া, স্বধর্ম পালন করিবার জন্য, অনাসক্ত ও নিষ্কাম ভাবেও যুদ্ধ করা যায়, এবং তাহা করাই অর্জুনের উচিত, অর্জুন এই সত্য দর্শন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার প্রত্যেক কথাই ভুল নহে।

অনিলবাবু লিখিয়াছেন যে শঙ্কর বা রামানুজ কেহ যে পশুবলি সমর্থন করেন তাহা তাঁহার জানা নাই। শঙ্কর ও রামানুজ ব্রহ্মসূত্রের যে দুইটি সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহা পড়া থাকিলে অনিলবাবু এরূপ অমার্জনীয় ভ্রম করিতেন না। স্বয়ং ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রে এই বিষয়ে বিচার করিয়াছেন। সাংখ্য দর্শনের মত এই যে বৈদিক যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ হয় বটে, কিন্তু বৈদিক যজ্ঞে পশুবধ করিতে হয়; হিংসা করা পাপ, তাহার ফলে প্রথমে স্বর্গলাভ করিলেও, পরে কিছু দুঃখ ভোগ করিতে হয়, কিন্তু ব্যাসদেব এই মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন বৈদিক যজ্ঞে পশু বধ করিলে পাপ হয় না, কারণ বেদে যাহা করিতে বলা হইয়াছে তাহা কখনও পাপ হইতে পারে না, যাহা বেদে নিষেধ করা হইয়াছে তাহাই পাপ। যজ্ঞে পশুবধ করিতে যখন বেদই আদেশ দিয়াছেন, তখন ইহা পাপ নহে, ইহা পুণ্য কর্ম। বলা বাহুল্য শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ উভয়েই ব্যাসদেবের সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে রামানুজ বলিয়াছেন যে বেদে যখন উক্ত হইয়াছে যজ্ঞে যে পশুকে বধ করা হয় সে স্বর্গে গমন করে, সুতরাং এবিষয়ে যখন কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে চিকিৎসক রোগীর মঙ্গলের জন্য তাহার অঙ্গচ্ছেদ করিলে যেমন কোনও পাপ হয় না, সেরূপ যজ্ঞে পশুবধ করিলে কোনও পাপ হয় না। "অশুদ্ধম্ ইতি চেৎ ন শব্দাৎ" এই ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজকৃত ভাষ্য দেখিলে অনিলবাবুর এ বিষয়ে সংশয় মিটিয়া যাইবে। অবশ্য ব্যাসদেব শঙ্কর ও রামানুজ সকলের দ্বারাই গৃহীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বা না করা অনিলবাবুর ইচ্ছাধীন। কিন্তু তাঁহারা যজ্ঞে পশুবধ সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া অনিলবাবুর জানা নাই একথা বলিলে তিনি পণ্ডিত সমাজে হাস্যাস্পদ হইবেন।

অনিলবাবু লিখিয়াছেন "বসন্তবাবু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি বাংলাদেশের বৈষ্ণব বা শাক্ত কোন সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত নহেন" এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হইতেছে যে বসন্তকুমার ভারতের কোনও শাস্ত্র কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যেই আসেন না।" আমি কোন্ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সে কথা বলিয়া বিচিত্রার পাঠক পাঠিকাগণের সময় নষ্ট করিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু যখন অনিলবাবু বারম্বার সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছেন, এবং অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন যে আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেছি না, তখন বলিতে বাধ্য হইতেছি যে শ্রীরামানুজ স্বামী প্রবর্ত্তিত শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত আমি একজন অতিশয় অযোগ্য ব্যক্তি। বাসুদেব রামানুজ দাস নামক শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একজন

মহাপুরুষ পুরীধামে বাস করিতেন। পাঁচ ছয় বৎসর পূর্বে তিনি দেহ রক্ষা করিয়াছেন। জগন্নাথ দেবের মন্দির এবং সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থলে বাসুদেব আশ্রমে তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি কৃপা করিয়া আমাকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নির্দ্দিষ্ট আচারসমূহ আমি পালন করিতে পারি না। সেই মহাপুরুষের কৃপার উপর নির্ভর করা ব্যতীত আমার অন্য কোনও আশা দেখিতেছি না। আমি শ্রী সম্প্রদায়ের সকল নিয়ম পালন করিতে পারি না, অতএব আমি শ্রী সম্প্রদায়ের মধ্যে আসিতে পারি না, অনিলবাবুর এই যুক্তি ঠিক নহে। অধিকাংশ খৃষ্টানই যিশুখৃষ্টের সকল উপদেশ পালন করেন না। কিন্তু সে জন্য ইহা বলা যায় না যে তাঁহারা খৃষ্টান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। বাস্তবিক পক্ষে সকল সম্প্রদায়ের অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই সম্প্রদায়ের সকল নিয়ম পালন করিতে পারে। অধিকাংশ ব্যক্তিই সকল নিয়ম পালন করিতে পারে না। তথাপি তাহাদিগকে সেই সকল সম্প্রদায়ের অন্তর্বর্ত্তী বলা হয়, কারণ তাহারা সেই সকল নিয়ম মঙ্গলজনক বলিয়া বিশ্বাস করে।

অনিলবাবু লিখিয়াছেন যে সনাতনীগণের "রক্ষণশীলতার দ্বারা তাঁহারা হিন্দু-সমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন, নতুবা হয়ত ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে স্বধর্ম হইতে বিচ্যুত হইত।" পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব এখনও কাটিয়া যায় নাই। অনেকেই সনাতন ধর্ম শাস্ত্রের যথেষ্ট আলোচনা না করিয়াই তাহার নিন্দা করেন। অনিলবাবু গীতা অধ্যয়ন করিয়াছেন, গীতাকে শ্রদ্ধা করেন, গীতায় ভগবান স্পষ্ট ভাবে শাস্ত্রকে প্রামাণিক বলিয়া মানিতে বলিয়াছেন, তথাপি অনিলবাবু নানারূপ ছলে সে কথা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন। সনাতনীগণ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথ মঙ্গলজনক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অনিলবাবু বলিতেছেন "সনাতনী ভ্রাতারা হিন্দু-সমাজের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য শাস্ত্র বচন আওড়াইতেছেন।" এ সকল পাশ্চাত্য প্রভাবের মোহ। সুতরাং সনাতনীগণের প্রচারের এখনও প্রয়োজন আছে।

অনিলবাবুর এই দুইটি উক্তি কিরূপ পরস্পর সঙ্গতি-পূর্ণ! সনাতনীগণ হিন্দু-সমাজকে পাশ্চাত্যমোহ হইতে রক্ষা করিতেছেন, এবং সনাতনীগণ হিন্দু-সমাজের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন!

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মায়ামুকুল

উষারাণী দেবী

'বৌরাণী'!

সুলতা বইয়ের উপর হইতে চোখ না তুলিয়াই বলিল—'কে রে, ছিমি?'

ছিমি ঝি সুলতার সম্মুখে আসিয়া বলিল—'কুসুমপুর মহাল থেকে একটা মেয়ে লোক দুপুর থেকে এসে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করবার লেগে বড় ব্যাগাতা কচ্ছে বৌরাণী! এতটা পথ পায়ে হেঁটে এসেছে, সবাই মিলে তাকে কত বল্‌লাম্ চান টান করে খাওয়া দাওয়া কর তার পর বৈকালে বৌরাণীকে বলে দেখবো যদি দেখা করেন। তা সে কিছুই শোনেনা, বলে দেখা না করে সে কিছুই খাবে না, যদি আপনি দেখা না করেন তাহলেও আবার অমনি অনাহারেই চলে যাবে। সন্ধে হয়ে আসতে গেল; সেই একই ভাবে পুকুরঘাটের কুলগাছটার তলায় বসে আছে, কিছু বলেও না, কিছু শোনেও না।'

সুলতা বিরক্ত স্বরে বলিলেন—'আমার সঙ্গে আবার কি দরকার তার? বাবু তো ওই কুসুমপুর মহালেই আছেন। তাই খাজনা টাজনা মাপ চায় হয় তো। ওকে কাছারী বাড়ীতে ম্যানেজার বাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলেই পারতিস।'

ছিমি বলিল—'কাছারী বাড়ীতেই তো তাকে আমরা পেত্থম থেকে যেতে বলছিনু, সরকার মশাই শুদ্ধ তাকে বল্লে, তা সে ওই এক কথাই বলে আপনি ছাড়া কারুকেই বলবে না সে।'

সুলতা বলিলেন—'আচ্ছা জ্বালা, আমি এসব হেঙ্গাম ভালবাসি না, তবু সবাই আসবে আমারই কাছে! যা তাকে এনে দালানে বসা, আমি যাচ্ছি।'

ছিমি চলিয়া গেল। সুলতা বইখানি মুড়িয়া পাশের ছোট টেবিলটার উপর রাখিয়া দিয়া যে ইজিচেয়ারটীতে বসিয়াছিলেন তাহাতেই হেলান দিয়া শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন—'কি এমন দরকার হতে পারে ওই মানুষটার যাতে সে দশ ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে এসেও অন্ন জল মুখে দিয়ে ক্লান্তি দূর করবার অনুরোধ উপেক্ষা করে অস্নাত অভুক্ত হয়ে অপেক্ষা কচ্ছে আমার দেখা পাবার জন্যে। কি তার আবেদন। স্বামী তো আজ মাসাবধি আছেন ওই ওদেরই গ্রামে, তাঁরই শাসন এমন ভীষণ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে কি? স্বামীর পীড়নের নির্য্যাতন হতে নিস্তার পেতে ও কি এসেছে আজ স্ত্রীর আশ্বাসে আত্মরক্ষা করতে, নারীর কাছে নারীর সহজ দাবী নিয়ে।

কিন্তু কেন ওরা বুঝে না আমিও ওদেরই মতো তাঁর ইচ্ছার ঝড়ে কুটোর মতোই উড়ে বেড়াই। কেন ওরা আসে এমন করে প্রত্যক্ষ করিয়ে দিতে আমার অবস্থিতির মূল্য। দিনে দিনে তিলে তিলে কেন এমন করে কেড়ে নেয় আমার জীবনের সমস্ত আনন্দ, উৎসব, আলো। কেন এমন করে ওদের রিক্ততার সৃষ্টি দিয়ে বিষাক্ত করে দেয় আমার বিলাস; আমার ব্যসন, আমার আরাম। বহু সহস্রের বুকের রক্তে চোখের জলে সঞ্চিত হয়েছে যে ঐশ্বর্য্য কেন আমায় ডুবে থাকতে দেয়না তারই অন্তলতায়।

এই যে দুর্ভাগিনী বহু আশা নিয়ে ছুটে এসেছে আমারই কাছে প্রতিকারের প্রত্যাশা নিয়ে, কি নিশ্চিন্ততা আমি দিতে পারি ওকে। হয়তো যে কটা টাকার জন্য উৎপীড়িত হচ্ছে, এবারের মত সেই টাকা কটা দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তাতেই তো শেষ হবে না ওদের দুঃখের। এমন করে জের টেনে চলবে ওরা কতকাল। কতকাল ওদের বঞ্চিত দৃষ্টির সামনে চলবে আমাদের বাহুল্যতার ভোজ, ওদের রক্তে সিক্ত পথের ওপর দিয়ে চলবে আমাদের বিজয়

অভিমান। যে শক্তি, যে প্রাচুর্য্য, বদ্ধ হয়ে থাকে শুধু নিজের গণ্ডির মধ্যে, আত্মসুখ আর আত্মতৃপ্তির আবর্জ্জনায় লুপ্ত হয়ে থাকে যে সঞ্চয়, সে শক্তি, সে সঞ্চয়, যে ব্যর্থ, একি এরা কোনদিন বুঝবে না।

কিন্তু শুধু আমার মুকুল,—যার রক্তে আছে বহু পুরুষের পীড়নের বীজ, সংগ্রহের লোভ, সেও কি সবল সমর্থ হয়ে অসহায় অক্ষম অধীনস্থদের ওপর করবে এমনি হৃদয়হীন অত্যাচার? মানুষের রোগ শোক দুঃখ বেদনায় থাকবে এদেরই মতো নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত? ভগবান! ভগবান! আমার জীবনে কেন এনে দিলে এমন অভিশাপ!' সুলতা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অনেকক্ষণ শুইয়া রহিল। তারপর উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

মীরপুরের জমীদার বাড়ীতে সুলতার শয়ন ঘরের প্রকাণ্ড খাটের পরিপাটী শয্যার উপর বসিয়াছিলেন জমীদার সতীপ্রসন্ন। খাটের অপর পাশে হাতের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়াছিল সুলতা। সতীপ্রসন্ন বিরক্ত স্বরে বলিতেছিলেন —'দেখ লতা, সব বিষয়েরই একটা সীমা আছে। তোমার বাবা তোমায় দুপাতা ইংরেজি পড়িয়েছেন বলে তুমি ভেবনা তুমি মস্ত বুদ্ধিমতী হয়ে উঠেছ। আমাদের সাত পুরুষের অভিজ্ঞতায় যা আমি জানি, তুমি শুধু সেন্টিমেণ্ট্যালিটির ধোঁয়ায় তাকে উড়িয়ে দেবে নাকি? কি ক্ষতিটা ওদের হয়েছে শুনি, ধেড়ে মেয়ে হয়েছিল বিয়ে দিতে পারছিল না। যদি আমার নজরে পড়ে তার একটা কিনারা হয়েই থাকে, তাতে দুঃখটা কি? বাসন মেজে আর ধান ভেনে কাটতো যার জীবন, এ তো তার রীতিমত সৌভাগ্য। মাগীটা একটু বোকা, তাই এই নিয়ে অত কাঁদা কাটা কচ্ছে। এর পর দেখ সবই ঠিক হয়ে যাবে। মেয়েটা যদি বাড়ীতে থাকতেই রাজী হোত তা হলে কোন গোলমালই হোত না। তাকে কলকাতা নিয়ে যেতে চেয়েছি বলেই এত হেঙ্গাম। এও তুমি দেখ দুদিনে ঠিক হয়ে যাবে। যে লোক তিন দিন না খেয়ে দশ ক্রোশ পথ হেঁটে এসে তোমার কাছে প্রতিকার চেয়েছে, সেই দেখবে বছর বছর যাবে কলকাতায় কালী দর্শন কর্তে। আর বছর বছর ওদের জমী জায়গা দালান কোঠার বাড় বাড়ন্ত দেখে আজ যে প্রতিবাসীরা লজ্জা দিচ্ছে অপমান কচ্ছে তারাই করবে খাতির, হিংসে। আমি যে নিজের খরচে ওদের এত বড় একটা আয়ের পথ দেখিয়ে দিয়েছিলাম এর জন্যে তখন ওরা খুসীই হয়ে উঠবে আমার ওপর। তুমি ওদের কতটুকু জান লতা, আমার কথা বিশ্বাস কর ওদের কোন ক্ষতি করিনি আমি। তবে তোমার নিজের দিক থেকে কিছু বলবার আছে তা তো আমি স্বীকার কচ্ছি লতা! কিন্তু আমাদের আট বছর বিয়ে হয়েছে তার মধ্যে এই প্রথম জানলে তুমি আমার এ রকম অপরাধ। এতদিন কত চেষ্টায় কত যত্নে তোমার কাছে সব গোপন রাখবার চেষ্টা করেছি তা তুমি জান না। তোমাকে বিয়ে করবার পর, নিজের গ্রামে আমি রীতিমত সৎ হয়ে উঠেছি লতা!

সতীপ্রসন্নের শেষ কথাগুলি শুনিয়া সুলতা মাথা তুলিয়া বলিল—'তা হ'লে এর আগে এ রকম কাজ তুমি আরও অনেক করেছ?'

সতীপ্রসন্ন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—'ঠিক এ রকম, মানে বাড়ী থেকে বাইরে আর কাউকে নিয়ে যাইনি, তবে বাড়ীর লোকের সহযোগিতায় আর ইচ্ছায় অনেক মেয়েই আমার কাছে এসেছে লতা, আমিও কোন দিন তাদের অসন্তুষ্ট করিনি। এ বিষয়ে আমি একেবারে অকৃপণ। আর আমার দাক্ষিণ্যে এদের অভিভাবকরা দু হাত তুলে আমায় আশীর্ব্বাদ করেছে।'

সুলতা উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"এরা সবাই ভদ্র?"

সতীপ্রসন্ন তেমনি ঈষৎ হাসির সঙ্গে বলিলেন 'ভদ্র বলতে তুমি যদি কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ বোঝ তা হলে ভদ্র।'

সুলতা বলিল—'এরা সবাই হয়তো এ অন্যায় করতে বাধ্য হয়েছে তোমার ভয়ে, কিন্তু তুমি কেন করেছ? যাদের তুমি রক্ষাকর্ত্তা, যে সমাজের তুমি শাসনকর্ত্তা, সেই সমাজের স্তরে স্তরে এই পাপের বীজ কেন ছড়িয়েছ? তোমার শক্তির, তোমার অর্থের এই যে অপচয় করেছ মনুষ্যত্বের দরবারে এর কোন শাস্তি নেই বলেই কি তুমি এত দুঃসাহসী, লজ্জাহীন, আত্মসুখী, স্বার্থপর?'

সতীপ্রসন্ন বিরক্ত ও বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিলেন 'তোমার কথাগুলো শোবার ঘরের খাটের উপর শুয়ে শুয়ে না বলে যদি বক্তিতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলতে তাহলে খুব হাততালির মধ্যে ওগুলো সমাদর পেত, এখানে একদম মাটি হো'ল।'

সুলতা অবজ্ঞা পূর্ণ স্বরে বলিলেন—'যত খুসী উপহাস তুমি করতে পার আমায়। তোমার কোন ব্যবহারে বিচলিত হবার মন আর আমার নেই। এতদিন শুধু জানতুম তোমরা টাকার জন্ম প্রজাদের গরু বাছুর থালা বাসন জমী জায়গা নিলাম করে নিয়ে তাদের দেশত্যাগী করতে কুণ্ঠিত হওনা। তাদের রোগ শোক অনাহার অর্দ্ধাহার দেখেও দুঃখিত হও না। এখন দেখছি তাদেরই কাছ থেকে সংগ্রহ করা টাকা দিয়ে তাদের বউ বোন মেয়েদের সতীত্ব কিনে আনন্দ উপভোগ করতেও সঙ্কুচিত হও না। তোমরা পার না এমন কাজ কিছুই নেই। তাই এখন তোমার কোন ব্যবহারেই আমায় অবাক করতে পারবে না।'

একটা বালিশ টানিয়া লইয়া শুইতে শুইতে সতীপ্রসন্ন বলিলেন—'শুনে সুখী হলুম। এখন মুখটা বন্ধ করে চুপ চাপ ঘুমিয়ে পড়লেই নিশ্চিন্ত হই।'

সুলতা বলিল—'চিন্তিত যে তুমি একটুও হওনি তা' আমি জানি। কিন্তু ঘটনাটা যদি ঠিক উল্টো হোত, বাড়ী এসে যদি শুনতে তোমার কোন প্রজার বাড়ী রাতে আমি যাই, তাহলে কি করতে শুনি? কি রকম আনন্দ-টাই বা পেতে আর কি পুরস্কারই বা দিতে আমাদের, সেটা একবার ভেবে দেখ দেখি।"

গলার স্বর অত্যন্ত কোমল করিয়া সতীপ্রসন্ন বলিলেন—'তোমার কাছে যে আমি অপরাধী সে তো স্বীকার কচ্ছি, সচ্চরিত্র আমি নই তবু আট বছরের মধ্যে তুমি এই প্রথম জানলে আমার অপরাধ। এতদিন কেন এত যত্নে তোমার কাছে এ সব আমি গোপন রেখেছি লতা? তোমায় আমি ভালবাসি, দুঃখ দিতে পারি না, অথচ আমার রক্তে আছে ভোগ-লোলুপতা, এ আমি ছাড়তে পারি না। এ আমার সম্পত্তির মতো উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। 'তুমি জান আমার বাবা যখন মারা যান আমি তখন মাত্র দুবছরের আর ঠাকুরদাদা যখন মারা যান আমার বাবা তখন মাত্র পাঁচ বছরের। এঁরা দুজনেই ছিলেন অতি মাত্রায় উচ্ছৃঙ্খল। তাই আমার মা চেয়েছিলেন আমি যেন জীবনে মদ কখনও চোখেও না দেখি। কিন্তু আমার বয়েস যখন আঠার বছর তখনই আমার মা দেখেছিলেন আমি আমার ঠাকুরদাদার আমার বাবার যোগ্য বংশধর। আমাকে এ পথ থেকে ফেরাবার চেষ্টা করেও ছিলেন আমার মা যথেষ্ট, কিন্তু পারেন নি। বিফলতায় মা আমার আর বেশি দিন বাঁচলেন না।

ছেলে যে চরিত্রহীন হয়েছিল বলে তাঁর দুঃখ হয়েছিল তা নয়, তাঁরা জানতেন বড়লোকের ছেলেরা অমনিই হয়। তাঁর ভয় ছিল পাছে এই সব অত্যাচারে আমি আমাদের বংশের নিয়ম মত অল্প বয়সে মরে যাই, আর তাঁকে সেটা সহ্য করতে হয়। তাই অযত্নে অত্যাচারে নিজের শরীর-টাকে নষ্ট করে, বছর দুই পরে সব ভয় ভাবনার হাত এড়িয়ে আমাকে একেবারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

মা যখন মারা যান তখন আমার বয়েস কুড়ি, তোমায় যখন বিয়ে করি তখন বাইশ, এই দুবছর যে নিয়মে দিন আমার কাটছিল আরো আট বছর যদি সেই নিয়মেই কাটতো তাহলে আমার পয়সা আর পরমায়ু দুটোই এতদিন শেষ হয়ে যেত। একথা আজ তোমার কাছে স্বীকার কর্ত্তে আমার লজ্জা নেই লতা! তুমিই আমায় এই সর্ব্বনাশ থেকে বাঁচিয়েছ, এই আট বছর যতদিন তোমার কাছে থাকি মদ আমি ছুঁই না।'

সুলতা বিস্মিত কণ্ঠে বলিল—'দূরে থাকলে খাও নাকি?"

সতীপ্রসন্ন—'খাই লতা, কিন্তু খুব কম।'

সুলতা—'কেন খাও?'

সতীপ্রসন্ন—'অভ্যাস, নেশা লতা, কিন্তু এতে তোমায় কোন দুঃখ পেতে হয় নি তো।'

সুলতা—'কিন্তু প্রত্যেক সতী স্ত্রী চাইবে যে তাদের স্বামীরা সচ্চরিত্র হবে একথা কি তুমি জানতে না।'

সতীপ্রসন্ন—'আগে জানতুম না লতা! আমার মা আমার ঠাকুরমা এঁরা ছিলেন সতীধর্ম্মপরায়ণা, কিন্তু আমার বাবার ঠাকুরদাদার কোনও অন্যায়েই তাঁদের আপত্তি

ছিল না। বাংলা দেশের প্রায় সব বনেদী বংশেই তুমি এমনি দৃষ্টান্তই দেখতে পাবে লতা! কিন্তু আমি নিজে তোমার এই দাবী তো এক রকম স্বীকার করেই নিয়েছিলুম আমার এই অন্যায়গুলোকে অতি সংকীর্ণ করে আর অতি সাবধানে তোমার কাছে সব গোপন রেখে। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে এটা প্রকাশ হয়ে না পড়লে তুমি তো কিছুই জানতে পারতে না।'

সুলতা—'স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে গোপনতা থাকলে সে সম্পর্ক ব্যর্থ হয়, বিষাক্ত হয় এ কথা তুমি না মানলেও আমি মানি।'

সতীপ্রসন্ন—'এবার থেকে আমিও মানবো লতা, এখন থেকে তোমার কাছে আর আমার কিছু গোপন থাকবে না।'

সুলতা—'কিন্তু আমি আর তোমায় কেমন করে বিশ্বাস করবো। যে আট বছর ধরে এমন প্রতারণা করে এসেছে কেমন করে তাকে শ্রদ্ধা করবো। আর যেখানে বিশ্বাস নেই, শ্রদ্ধা নেই, সেখানে প্রেমও থাকতে পারে না।'

সতীপ্রসন্ন—'পারে লতা পারে, আজ তোমার মাথার ঠিক নেই, দুদিন পরে বুঝবে প্রেমাস্পদের শত অপরাধেও প্রেম মরে না।'

সুলতা অসহিষ্ণু স্বরে বলিল—'থাক, তোমার কাছে আর প্রেমের ব্যাখ্যা আমি শুনতে চাই না।'

সতীপ্রসন্ন—'তবে কি শুনতে চাও, ক্ষমা প্রার্থনা, বল কি বলে, কেমন করে ক্ষমা চাইলে তুমি খুসী হবে?'

সুলতা—'তুমি কি মনে কর তোমার অপরাধ এখনও ক্ষমার সীমা অতিক্রম করে নি?'

সতীপ্রসন্ন—'আমার তো তাই মনে হয়।'

সুলতা—'হওয়াই সম্ভব। কেননা অপরাধী অপরাধের গুরুত্ব বুঝতে পারলে নিজেই সংযত হয়।'

সতীপ্রসন্ন—'এবার সত্যিই সংযত হবো লতা! আর এমন অপরাধ আমার হবে না। তুমি দেখো লতা!'

সুলতা—'দেখবার সৌভাগ্য আর আমার হবে না।'

সতীপ্রসন্ন বিস্মিত স্বরে বলিলেন—'তার মানে?'

সুলতা নির্লিপ্ত স্বরে বলিল—'আমি বাবার কাছে চলে যাব। এর পর তোমার সঙ্গে বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

সতীপ্রসন্ন উদ্বিগ্ন স্বরে বলিলেন—'পাগলামি কোর না লতা। যা করতে হয় এখানেই কর। যা বলতে হয় আমাকে বল। বাবাকে কেন এর মধ্যে জড়াচ্ছ। তিনি এতে কষ্ট পাবেন তো।'

সুলতা—'উপায় কি। এতদিন মেয়ের সৌভাগ্যের গর্ব্ব অনুভব করেছেন, এখন তার দুর্ভাগ্যের দুঃখ থেকেই বা দূরে থাকবেন কি করে।'

সতীপ্রসন্ন কোমল মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন—'ছিঃ লতা অবুঝ হয়োনা। এখন তো আমরা দুজনই শুধু নই, আমাদের মাঝখানে রয়েছে মুকুল, তার কথা তো ভুললে চলবে না।'

সুলতা—'তার কথা ভুলতে পারি না বলেই আমি আরো এখানে থাকতে পারি না। এখানকার এই বিষাক্ত আবহাওয়ায় তাকে বাড়তে দেব না আমি।'

সতীপ্রসন্ন—'কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ লতা! সে রায় বংশের ছেলে। রায় বংশের ছেলেরা কখনও পরের আওতায় মানুষ হয় নি, হতে পারে না।'

সুলতা—'সে কথা মনে রাখবার আমার কোন দরকার নেই। আমি জানি সে আমার ছেলে, আর আমার ছেলে কখনও এই অন্যায় পাপ আর অত্যাচারের আওতায় মানুষ হতে পারে না।' কথাগুলি বলিতে বলিতে সুলতা খাট হইতে উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সতীপ্রসন্ন অত্যন্ত বিপন্নভাবে উঠিয়া বাহিরে যাইতে যাইতে বলিলেন—'তাই তো মহা মুস্কিল বাধালে দেখছি।'

৩

কলিকাতা হইতে মাইল পাঁচেক দূরে হরমোহন বাবুর বাড়ীর অন্দরের সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে হরমোহন বাবু ডাকিলেন—'মা কোথায়, মা।'

সিঁড়ির উপরের দালানের কোণে সারি সারি ঘর, তাহার শেষ ঘরখানি হইতে সুলতা বাহির হইয়া সিঁড়ির সম্মুখে আসিয়া বলিল—'আমায় ডাকছেন বাবা।'

হরমোহন বাবু উপরে উঠিয়া দালানে যে চেয়ারগুলি ছিল

তাহার একখানিতে বসিতে বসিতে বলিলেন 'হ্যাঁ, মা, তোমার সঙ্গে কটা কথা আছে মা, এস আমার কাছে বোসো মা।'

সুলতা আসিয়া পিতার পায়ের কাছে বসিলে হরমোহন বাবু পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিতে করিতে বলিলেন—'আজ সতীর কাছ থেকে এই চিঠিটা পেয়েছি মা, পড়ে দেখ।'

সুলতা মুখ নীচু করিয়া বলিল—'থাক বাবা। চিঠি পড়বার কি দরকার, আপনি বলুন কি বলতে চাইছিলেন।'

হরমোহন বাবু—'চিঠিটা যে তোমার দেখা দরকার, তা না হলে আমার কথাগুলো বলবার ঠিক সুবিধা হবে না।'

সুলতা—'আপনিই বলুন বাবা কি ওতে লেখা আছে। আমাদের সেখানে পাঠিয়ে দেবার কথা তো?'

হরমোহন বাবু—'হ্যাঁ মা, অনেক মিনতি করে লিখেছে। এ দু মাসে তোমায় ও যতগুলো চিঠি দিয়েছিল তুমি নাকি তার একখানিরও উত্তর দাও নি, শেষে ও বৌমাকে লেখে, তিনি ওকে বলেন আমায় লিখতে তাই ও এবার আমায় লিখেছে। তুমি অমন হঠাৎ চলে আসায় আর এতদিন না ফেরায় ও নাকি সেখানে একটা লজ্জাজনক অবস্থায় পড়েছে। লিখেছে সে সময় তুমি নাকি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলে তাই তোমায় আসতে দিয়েছিল, ভেবেছিল তোমার মন শান্ত হলে তুমি আবার ফিরে যাবে। আর এই দুমাস নাকি ও তোমায় প্রতি চিঠিতেই ফিরে যাবার জন্যে মিনতি করেছে, তুমি তার উত্তরই দাও নি। ওর দিকটাও তোমার একটু ভেবে দেখা উচিত মা।'

সুলতা—'তার মানে আপনি কি আমায় ফিরে যেতে বলেন বাবা।'

হরমোহন বাবু—'মণ্টুর দিক থেকে ভেবে দেখলে তোমার তাই করা উচিত মা। পিতৃ-স্নেহ আর সম্পত্তি থেকে ওকে বঞ্চিত করবার অধিকার তো তোমার নেই মা।'

সুলতা—'কিন্তু সেই স্নেহ, সেই সম্পত্তি, যদি ওর মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্তরায় হয়, তাহলে তার থেকে ওকে সরিয়ে আনবার অধিকার আমার কেন থাকবে না। মানুষের সব চেয়ে কামনার ধন তার চরিত্রের নির্ম্মলতা, আমার সন্তানকে যদি আমি সেই ধনের অধিকারী করে গড়ে তুলতে চাই তাতে বাধা দেবার অধিকার কারো থাকতে পারে না বাবা।'

হরমোহন বাবু—'সন্তান তো ওরও মা, আইন এখানে তোমাদের ওপর বড় অকরুণ মা। যে বংশের সন্তান ও, ওকে সেই বংশের ধারায় বেড়ে উঠবার সাহায্যই করবে আইন, বিশেষ করে এমন বনেদী বড় বংশের ছেলেকে।'

সুলতা—'আমি ইচ্ছায় যদি না যাই বা মণ্টুকে না দেই তাহলে আইনের সাহায্য নেবেন বলেই লিখেছেন নাকি?'

হরমোহন বাবু—'না, তা স্পষ্ট কিছুই লেখে নি, তবে লিখেছে এই মাসের মধ্যে যদি তুমি ফিরে না যাও তা হলে ও অন্য ব্যবস্থা কর্ত্তে বাধ্য হবে।'

সুলতা—'অন্য ব্যবস্থা মানে কি আইনের সাহায্য।'

হরমোহন বাবু—'কি জানি মা, তবে মনে হয় নিজের মর্য্যাদার দিকে চেয়ে আইনের সাহায্য ও হয়তো নেবে না।'

সুলতা—'তা হলে আর কি করতে পারবেন?'

হরমোহন বাবু—'বয়স তো তার খুব বেশী নয় মা, আর এই বাংলা দেশে মেয়েও খুব সস্তা। তাই মনে হয় ব্যবস্থাটা সে হয় তো বিয়েরই করবে মা।'

সুলতা—'তাতে আমাদের তো কোনও ক্ষতি নেই বাবা।'

হরমোহন বাবু—'কথাটা ভাল করে ভেবে চোলো মা, শুধু তোমার ক্ষতিই এখানে বড় নয় মা। মণ্টু একদিন হয় তো এর জন্যে তোমায় দোষী করবে। এতে তার যা ক্ষতি হবে সে ক্ষতি পূরণ করে দেবার ক্ষমতা তো আমার নেই মা, আমি শুধু পারি তার কোন রকমে দিন চলবার বন্দোবস্ত করে দিতে। কিন্তু সে যখন বুঝবে তার বাপের কত ঐশ্বর্য্য, আর সেই ঐশ্বর্য্য থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে তোমার জন্যে তখন তাকে তুমি কি বলবে মা?'

সুলতা—'কিছুই বলবো না বাবা। আবার বিয়ে করলেও মণ্টুর অধিকার তো কেউ কেড়ে নিতে পারে না। যখন ওর এ সব বোঝবার মতো বয়স হবে আমি নিজেই ওকে সব বলবো—ওর ইচ্ছা হলে ও তখন সচ্ছন্দে ফিরে যেতে পারবে। হয় তো এর মধ্যে বিষয়ের আরো

দু একটি অংশীদার আসতে পারে কিন্তু সে তো ওর নিজের ভাইও হতে পারত। তাই সেদিক থেকেও ওর তেমন কোন ক্ষতি হবে না।'

হরমোহন বাবু—'এ ছাড়া আরো একটা ভাববার আছে মা। সতীকে তো খুব কঠিন কর্কশ বলে মনে হয় না, আর এই ঘটনাতে খুব একটা সক্ পেয়েছে, এখন যদি তুমি ফিরে যাও হয় তো ওকে ভাল পথেই চালাতে পারবে। ওর এত টাকা, এত শক্তি, দেশের অনেক উপকারে আসবে। আমি এই আশা নিয়েই তোমাকে ওর হাতে দিয়েছিলুম মা।'

সুলতা—'সে হবে না বাবা! বাইরে থেকে দেখলে সমপদস্থ লোকের কাছে ওরা খুব ভদ্র, খুব জালিশ, খুব নম্র ওদের ব্যবহার। কিন্তু নিজের গণ্ডির মধ্যে ওরা দুর্জ্জয়, অনমনীয়। সেখানে কোনও শক্তিই ওদের সঙ্কল্প থেকে এতটুকু টলাতে পারে না, এই আট বছর থেকে আমি তা ভাল করেই বুঝেছি বাবা। কখনও কোনও দুর্ব্যবহার করেন নি, কিন্তু কখনও আমার অতি বড় ইচ্ছার জন্যেও নিজের সামান্য ইচ্ছাকে এক চুল ছোট করেন নি। সাত পুরুষ ধরে ওদের রক্তে আছে আধিপত্যের গর্ব্ব। কোনও অবস্থায়, কোনও কারণে, ওরা সেটাকে ছোট করতে পারে না। নিজের ইচ্ছাটাই ওদের সকলের চেয়ে বড়।'

হরমোহন বাবু—'তোমার মন্টুও তো মা ওদেরই ছেলে, ওর উপরই বা মা তুমি এতখানি ভরসা রাখছো কি করে?'

সুলতা—'তার সঙ্গে আমাদের বংশের ধারাও তো মিশে আছে বাবা। তার ওপর যদি আমার জীবনের প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত খরচ করি শুধু ওকেই মানুষ করে তোলবার জন্যে তবুও কি পারবো না বাবা।'

হরমোহনবাবু সুলতার মাথাটি কোলের উপর টানিয়া লইয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন 'তাই যদি তুমি জীবনের একমাত্র শ্রেয় বলে স্থির করে থাক আশীর্ব্বাদ করি সফল হও। তোমার মা নেই, তাই তোমাদের জন্যে আমার ভাবনা এত বেশী মা। তোমার দাদা যখন চার বছরের আর তুমি দুবছরের তখন তিনি মারা গেছেন, তখন অনেকেই আমায় বলেছিলেন সন্তান মানুষ করা নাকি পুরুষের কাজ নয়, নিজে আমি সে কথা স্বীকার করিনি। তোমরাও দুই ভাইবোন এতদিন এতে সন্দেহ করবারও কোনও অবকাশ দাওনি। এজন্য বরাবর বরং আমার একটা গর্ব্বই ছিল। সন্তানকে সত্যিকারের মানুষ করবার কামনা যে কত বড় আনন্দের, কত বড় কর্ত্তব্য ও যে এটা, তা আমি আজ বুঝি মা, তবু আমি আজ আমার কর্ত্তব্য ঠিক কর্ত্তে পাচ্ছিনা। যে দ্বিধা যে দুশ্চিন্তা আজ আমার হচ্ছে মা, এত বছরের মধ্যে কখনও এমন হয় নি।'

সুলতা—'সব দুশ্চিন্তা, সব দ্বিধা মন থেকে মুছে ফেলুন বাবা! মনে করুন আমি সেই আট বছর আগের শুধু আপনারই লতি। মীরপুরের জমীদার বাড়ীর সঙ্গে আমাদের কখনও কোন পরিচয় হয় নি। মন্টুকে আমরা কুড়িয়ে পেয়েছি পথে।'

হরমোহনবাবু উঠিতে উঠিতে বলিলেন—'তাই হোক মা, তোমার ইচ্ছায় আর আমি বাধা দেব না। সতীকে আজই সব লিখে দেব।'

হরমোহনবাবু আবার সেই সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেলেন। সুলতা তাঁহার পরিত্যক্ত চেয়ারখানির উপর মাথা রাখিয়া সেখানেই বসিয়া রহিল।

৪

কুড়ি বছর পরে।

কলিকাতার বিডন ষ্ট্রীটের উপর একখানি মাঝারি ধরণের বাড়ীর দোতলার রাস্তার দিকের বারান্দায় বসিয়া আছেন সুলতা। কুড়ি বৎসর আগের সুলতার সৌন্দর্য্যে ছিল যে সতেজ দীপ্তি আজ তাহারই সাথে মিশিয়াছে মাতৃত্বের মহিমাময় মাধুর্য্য। সমস্ত দেহে মুর্ত্ত হইয়া আছে একটা অনাবিল আনন্দের আলো, একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তির ভঙ্গী। তাঁর হাতে ছিল একখানি বই কিন্তু দৃষ্টি ছিল পথের উপর। আর মন ছিল কুড়ি বছর আগের একটি দিনের দ্বারে। সেই দ্বারের ফাঁক দিয়া তিনি দেখিতেছিলেন—

পদ্মার বিশাল বুকে একখানি ষ্টীমার। তাহারই ভিতরের প্রথম শ্রেণীর কামরার মধ্যে দাঁড়াইয়া একটি ত্রিশ বছরের সুন্দর যুবা পাঁচ বছরের একটি বালককে

আদর করিতে করিতে বলিতেছেন—'মাকে নিয়ে শীগগার ফিরে এস মণ্টু, দেখছো তোমরা চলে গেলে এখানে আমি একেবারে একা থাকবো।'

সেদিন যে বালক হাসিমুখে উত্তর দিয়াছিল 'হাঁ বাবা, আসবো আর আসবার সময় দাদুকেও আনবো সঙ্গে করে, তাহলে খুব মজার হবে এখানে।' সে বালক আজ হারাইয়া গিয়াছে পঁচিশ বছরের মুকুলের মধ্যে। বিস্মৃতির বাতাসে মিশাইয়া গিয়াছে তার সেদিনের সেই সহজ স্বীকৃতি। আর সেই যুবা আজ প্রৌঢ়, নারীর হাস্যে, সন্তানের কলরবে, আজ মুখরিত তাঁর সেদিনের একাকীত্বের আশঙ্কাভরা ঘর।

সুলতার চোখের উপর পথের প্রান্তে জাগিয়া উঠিল মণ্টুর দীর্ঘ বলিষ্ঠ সুঠাম অবয়ব যাহা বহুর মধ্যেও বিশেষ হইয়া দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। সমস্ত চিন্তা মন হইতে মিলাইয়া গিয়া সুলতার মুখে ফুটিয়া উঠিল একটা প্রশান্তির আভা। অল্প পরেই মণ্টু আসিয়া সুলতার পাশে বসিয়া রেলিংগুলার উপর পিঠের হেলান দিয়া বসিল। সুলতা জিজ্ঞাসা করিলেন—'আজ এত দেরী হোল কেন রে?''

মণ্টু ক্লান্ত বিরক্ত কণ্ঠে বলিল—'সেই চাঁদা তোলার হেঙ্গামে মা। এমন বিশ্রী মনোভাব এই আমাদের দেশের লোকগুলার, চাঁদা চাইতে গেলেই ভাবে আমরাই বুঝি ওদের কাছে গেছি ভিক্ষায়। এমন সব কথা বলবে যেন কত স্বার্থই আছে এতে আমাদের, আর কত সহজেই ওরা সেটা ধরে ফেলেছে। এমন ব্যবহার করবে যে নেহাত ঠাণ্ডা রক্ত না হলে সহ্য করা যায় না। আজ মায়ার বাবার কাছে গিয়েছিলুম ক্লাসের কজন ছেলেকে সঙ্গে করে, রতন বাবুর জন্যে মাসিক কিছু মোটা সাহায্য করেন যদি সেই আশায়। ওঃ কি সাংঘাতিক লোক মা। মাসে প্রায় দশ বারো হাজার টাকা আয়। নিজেদের সুখ আর আরামের জন্যে যত রকম উপকরণ সংগ্রহ করা যায় তার কিছুরই অভাব নেই। বাড়ীর কর্ত্তা, গিন্নি, ছেলেমেয়েদের, সমান তালে চাল উপভোগের রেস। বড় লৌকিকতার বাহুল্যে কে কাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, সম-শ্রেণীর সঙ্গে চলচে তারি প্রতিযোগিতা। আর তারই উৎসাহে হাজার হাজার টাকা উড়ে যাচ্ছে ধোঁয়ার মত। আর দুঃখী দুর্দ্দশাগ্রস্তদের দুটো টাকা দিতে ওদের হাত কাঁপে, অনিচ্ছায় কুঁকড়ে যায় কপাল।

আমি এত করে বুঝিয়ে বললুম রতন বাবুর সব অবস্থা। ভদ্রলোকের মা স্ত্রী বিধবা বোন একটি, আর পাঁচটী ছেলে-মেয়ে। এদের মুখ চেয়ে তিনি শক্তির শেষ কণাটুকু খরচ করে পরিশ্রম করেছেন এদের মুখে দিনান্তে অন্ততঃ একবারও যাতে দিতে পারেন এক মুঠো ভাত, আর আশ্রয়ের জন্য এক ফালি মাটী। তারই ফলে ভদ্রলোক আজ এই দুঃসাধ্য ব্যাধির হাতে পড়তে বাধ্য হয়েছেন। এখন ইচ্ছা থাকলেও শক্তির অভাবে তাঁকে অবসর নিতে হবে। আমাদের চেষ্টায় তাঁর ছুটি হয়তো মিলবে আর য়ুনিভারসিটি হয়তো আদ্ধেক মাইনেও দিতে পারে কিন্তু তাতে কি হবে ওঁর। নিজের চিকিৎসা চাই, পথ্য চাই, ভাল আলো, হাওয়া রোদ্দুর পাওয়া যায় এমন বাড়ী চাই, তবে-ই না সারবার আশা। তা ছাড়া ওইগুলি পোষ্য, ওদের ভাবনাও তো তিনি ভুলতে পারেন না, যতক্ষণ না একেবারে মৃত্যু এসে সব ভাবনা ভুলিয়ে দেয়।

এত কথা শোনবার পর বললে কি জান মা! রোজ যত লোক আসে আমাদের কাছে এমনি এক একটা হুজুগ নিয়ে, তাদের সকলের দাবী পূরণ করতে হলে আমাদের ফতুর হতে হয়। ভগবান যাকে মারেন মানুষ তাকে কোন সাহায্যই করতে পারেনা। খোদার উপর খোদকারী করবার উৎসাহ আপনাদেরও আর থাকবে না যখন বাবার পয়সায় পড়া শেষ হবে।'

মণ্টু মার পাশে শুইয়া পড়িতে পড়িতে বলিল—'এই কথাগুলো মুখের সামনে বুক ফুলিয়ে যখন ওরা বলে তখন কি মনে হয় বলতো? যাদের টাকা নেই তাদের থাইসিস, অচিকিৎসা, অনাহার হোল হুজুগ। আর ওদের টাকা আছে তাই ওদের হাঁচি, কাশি, ফুসকুড়ি, ফোড়াগুলোও হবে সর্ব্বনেশে, সাংঘাতিক; নির্লজ্জ কৃপণতা হবে ঈশ্বর বিশ্বাস।'

সুলতা মণ্টুর মাথাটা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া

মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—'অত মন উত্তেজিত করিসনে মুকুল, ওতে কাজ কিছু হয় না বাবা, শুধু শরীর খারাপ হয়। অত ভাবিসনে। এতগুলো ছেলে তোরা সবাই মিলে চেষ্টা করে কি একটা মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা আর তার বাড়ীর ভারটা নিতে পারবিনে। চল স্নান করে সুস্থ হয়ে কিছু খাবি। সারাদিন শুধু বকে বকে ঘুরছিস ওতে শরীর খারাপ হবে; সেটাই যে তোর একমাত্র সম্বল। তোর তো টাকা নেই কি দিয়ে আর দুঃখীর দুঃখ কমাবি বল। ওঠ, চল।'

মণ্টু চোখ বুজিয়াই উত্তর দিল—'একটু পরে মা। এখন একটু তোমার কাছে শুয়ে থাকি, মনটা সুস্থ হয়ে যাক, তারপর সব করবো। আমি শুধু ভাবছি মা, মায়ার কথা, অমন বাড়ীর মেয়ে কি করে অমন হোল।'

সুলতা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—'ওকথা তোর সম্বন্ধে তোর ক্লাসের ছেলেরাও তো ভাবতে পারে।'

মণ্টু চোখ খুলিয়া মার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—'না নিশ্চয় না, আমি তোমার ছেলে, কিন্তু মায়ার বাবা মা ওর সমস্ত পারিপার্শ্বিক ওর বিপরীত। সে বাড়ীর দারোয়ানটারও মাথার চুল থেকে পায়ের আঙুল পর্য্যন্ত মাথা আছে মনিবের পয়সার গর্ব্ব। সেই বাড়ীর মেয়ে ও, তার উপর তিনটে পাশ, ওর কেমন করে এমন নম্র লাজুক কোমল স্বভাব, অমন উদার সমদর্শী মন হোল এত আমি ভেবেই পাইনা।

প্রথম যখন আমাদের ক্লাসে দেখতুম ওকে, ছেলেগুলোর জ্বালায় লজ্জায় বিরক্তিতে মেশান এক অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে বসে থাকতো। ওরই পাশে বসে থাকতো ক্লাসের আর যে দুটী চঞ্চল মুখর মেয়ে, তাদের সঙ্গে ও ভাল করে কথা বলতে পারতো না। প্রফেসরের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারতো না। কখনও হঠাৎ চোখে চোখ পড়ে গেলে থরথর করে কাঁপতো ওর চোখের পাতা। তখন ওকে দেখে আমার মনে হোত যেন মোগল সম্রাটদের অন্তঃপুরবাসিনী কোন শাহজাদী, বহু শতাব্দীর পর্দ্দা সরিয়ে হঠাৎ কলকাতার এই পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের কতগুলো চঞ্চল ছেলের মধ্যে এসে পড়ে বিব্রত বিপন্ন হয়ে পড়েছে। জান তো মা, বড়লোকদের আমি আমার সমস্ত সত্বা দিয়ে ঘৃণা করি। মায়া আসতো সুন্দর মোটরে, সঙ্গে আসতো একজন নেপালী। সেই নেপালী আর মোটর থাকতো মায়ার প্রতীক্ষায় যতক্ষণ মায়া থাকতো ক্লাসে। তাই কারু আর বুঝতে বাকী ছিলনা ওদের আভিজাত্য। তা ছাড়া এ অঞ্চলটায় ওদের চেনেও সকলে—সেই বাড়ীর সুন্দরী মেয়ে মায়া। ওর সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে ক্লাস শুদ্ধ ছেলে ব্যগ্র ব্যাকুল। কত ছল ছুতা, মায়া কিন্তু কারুকেই সুযোগ দেয় না, দিনের পর দিন ওর নির্ব্বাক আসা যাওয়ায় এতটুকু পরিবর্ত্তন নেই। দেখে দেখে ছেলেগুলো গেল ক্ষেপে। ওর নাম দিলে খুকি, মমি, আরো কত কি। এই নিয়ে ওদের সঙ্গে প্রায়ই হতে লাগলো আমার তর্ক, কোন মেয়ে সহপাঠীর জন্যে বিশেষ কোনও আগ্রহ আমাদের কেন থাকবে। কেন আমরা ঠিক সহজ ভাবে ছেলেদেরই মতই ওদেরও মনে করতে পারবো না, ওদের জয় করবো, ওদের যুদ্ধ করবো, এই মনোভাব নিয়ে কো-এডুকেশানকে আমরা কেমন করে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলতে পারবো। এ তর্কের আজও শেষ হয়নি মা। আশ্চর্য্য এই যে ক্লাসে আর যে দুটী মেয়ে আছে তারা পর্য্যন্ত আমার পক্ষে নয়। মুখে বলে নিরপেক্ষ, কিন্তু তারাও করে মায়াকে নানা রকমে লজ্জিত বিব্রত করবার উপায়ে ওদেরই সাহায্য। ওদেরই সকলের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্তেই বোধ হয় মায়া একদিন নিজেই এসে চেয়েছিল পড়ার বিষয়ে আমার সাহায্য। হয়তো ওরই উপলক্ষ্যে ও ক্লাসের একটা ছেলেকেও পেতে চেয়েছিল ওর পক্ষে। এর পরেই ধীরে ধীরে পেলুম ওর মনের পরিচয়। এখন সে আমার বন্ধু মা। তার সেই লাজুক নম্র ভাব এখন অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে, এখন তার সঙ্গে আর নেপালী পাহারা থাকে না। নিজের গাড়ী সে নিজেই চালিয়ে আসে একা। ছেলেদের কথার দু একটা উত্তরও দেয় মাঝে মাঝে। ছেলেগুলোর সব রাগটা পড়েছে এবার আমার ওপর। কিন্তু কিছুতেই তো এঁটে উঠতে পারে না, তাই কি আর করবে। সব দিক থেকে সব রকমে এত হীন আমরা হয়ে গেছি মা, ভাবলে মন ভারী খারাপ হয়ে যায়। নীতি বলে, নিন্দা

বলে গভীরতা বলে কোনও জিনিস যেন বাংলার যৌবন আজ মানতে চায় না। শুধু দিন যাপনের প্রাণ ধারণের গ্লানিই তারা বহন করবে বলে যেন পণ করে বসেছে। এই পণ ওদের ভুলিয়ে দিয়ে মহৎ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের আদর্শ ওদের মনে এঁকে দিয়ে ওদের মানুষ করে তুলতে পারে এমন মহামানবের দেখা কি বাংলা পাবে না মা, ধীরে ধীরে আমরা ডুবে যাব অধঃপতনের অতলতায়?'

মণ্টুর কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে সুলতা বলিলেন—'না বাবা, ঘরে বাইরে ঘা খাওয়া এই সবে বাংলার সুরু হয়েছে। এরই আঘাতে ভেঙ্গে যাবে ওদের নিশ্চিন্ত আরামের এই সব উপসর্গগুলা। দশের সঙ্গে সমান হয়ে চলতে হলে চাই মানুষ হবার যোগ্যতা, এই জ্ঞান ওদের এইবার আসবে বাবা।'

মণ্টু চুপ করিয়া রহিল। সুলতা তার চুলগুলিকে বিস্রস্ত করিতে করিতে বলিলেন—'ওঠ্ মণ্টু, স্নান করে আয়, কতক্ষণ কিছু খাসনি বলতো? ক্ষিদে পায় নি তোর।"

মণ্টু ধীরে ধীরে উঠিয়া সম্মুখের ঘরের মধ্য দিয়া বাড়ীর ভিতর দিকে চলিয়া গেল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল তাহার [illegible] দীপ্ত দেহের নির্ভীক অভিজাত-পূর্ণ চলন ভঙ্গীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া সুলতার দুটী চোখে ঘনাইয়া উঠিল তৃপ্তির ঘন ছায়া। মনে হইল মীরপুরের জমীদার বাড়ীর আড়ম্বরের শাখায় মুকুলিত হইয়াছিল এই মুকুল। কুড়ি বছর আগে ঐশ্বর্য্যের পুরু আবরণে ঢাকা ছিল, অস্ফুট ছিল এর রূপ রং গন্ধ। কুড়ি বছর ধরে নিজের মনের উত্তাপ, ইচ্ছার আলো দিয়া ধীরে ধীরে সে ফুটাইয়া তুলিয়াছে জীবনের সতেজ বৃন্তে, রূপে গন্ধে সুন্দর সম্পূর্ণ এই মুকুলকে। সুলতার এই দুস্তর সাধনার যে গৌরব বহন করে বেড়ায় আজ ওই মণ্টু। এর চেয়ে বেশি গৌরব দিতে পারে কি মীরপুরের জমীদার বাড়ীর গৃহিণীজীবন। বেশি আনন্দ দিতে পারে কি বহু ধন আর বহু জনের উপর প্রাণহীন কর্তৃত্ব।

সুলতার মনে পড়িল সেই দিনটি যেদিন কল্পনায় আজকার এই মুকুলকে আঁকড়িয়া লইয়া, সমস্ত বাধা, নিষেধ, সুখ, দুঃখের আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া বাহির হইয়াছিল সে মেয়েদের চিরন্তন আশ্রয় ত্যাগ করিয়া; আত্মীয় পরিজন সবার বিরুদ্ধে সে দাঁড়াইয়াছিল একা।

অবোধ মণ্টুকে বুকে লইয়া অনিশ্চিত আশার ব্যর্থতার আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া দেখিয়াছিল ওর মুখ, যে মুখে ছিল ওর বাবার ওর ঠাকুরদাদার সাদৃশ্য, রঙে ছিল তাঁদেরই রক্তের গোলাপী আভা, যে মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া সন্দেহে সংশয়ে কাঁপিতেছিল তাহার মন। আজকার এই দীপ্ত দৃঢ় নির্ভীক মুকুল সেদিনের সেই ছোট মুকুল। যার জন্মসূত্রে পাওয়া নির্ভীকতা আর দমনপ্রিয়তাকে, অতি সন্তর্পনে ন্যায় আর নীতির পথে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য অস্ত্র করিয়া সার্থকতার সুখে স্বপ্নালু হইয়া উঠিল সুলতার মন। সেই মনে ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিল অদেখা মেয়ে মায়া। যে কোমল ভীরু স্বভাবের অন্তরালে উদার মহৎ মন নিয়ে নিজের চারি পাশের অসমতার একাকিত্বের আবেদনে আশ্রয় পেয়েছে মুকুলের। মুকুল আজ দেহে মনে বলিষ্ঠ পরিণত পুরুষ। তাই আশ্রয় হইবার, অন্যের মধ্যে নিজেকে প্রতিফলিত করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছায়, সে আজ মায়ার বন্ধু। মায়ার আশ্রয় হইয়া আনন্দ পায় আপনার অজ্ঞাতে সে।

সুলতার চিন্তায় বাধা দিয়া চাকর সুখলাল আসিয়া জানাইল মণ্টুর স্নান শেষ হইয়াছে, সে খাবার চায়। সুলতা উঠিয়া ভিতরে গেলেন।

৫

কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলের সহর থেকে অনেকখানি দূরে একটা প্রকাণ্ড জনশূন্য মাঠের পাশে একটা আম গাছের পাতা আর মুকুলের নিবিড়তার ছায়ায় বসিয়াছিল—মুকুল আর মায়া। মুকুলের হাতে ছিল এক গোছা আমের মুকুল। সে সেইটী দোলাইতে দোলাইতে বলিতেছিল—'এতে তোমার এত কুন্ঠিত হবার কি আছে মায়া! তোমার বাবার মত বা মনের জন্যে তো তুমি দায়ী হতে পার না। তোমার জীবনে যদি ওগুলি বর্জ্জন করতে না পার, তোমার নিজের আদর্শে, লক্ষ্যে, যদি রাখতে না পার অটুট নিষ্ঠা, সেই হবে তোমার লজ্জার, কুন্ঠার কারণ, মায়া।'

মায়া বলিল—'নিজের আদর্শে, নিজের লক্ষ্যে অটুট নিষ্ঠা রাখবার স্বাধীনতা কি মেয়েদের আছে মুকুল। মেয়েদের আদর্শ মেয়েদের লক্ষ্য তাই তাদের জীবনে দুঃখ পীড়ন আর ব্যর্থতা আনে। আজ আমি দুঃখ পাচ্ছি বাবার বাড়ীর বিধি ব্যবস্থা চিন্তার ধারায় আমার মনের, আমার আদর্শের কোনও মিল নেই বলে। এর পর আসবে স্বামী, শ্বশুর কুল, তাদের রীতি তাদের নিয়মই হবে আমার জীবন। সেই স্বামী বা শ্বশুর-কুল আমার নিজের নির্ব্বাচিত হবে না। তাই তাদের সঙ্গে যদি দ্বন্দ্ব বাধে আমার আদর্শের তাতে কে জয়ী হবে বল তো?

এই যে আমাদের ছাত্র জীবনের শিক্ষা, আদর্শ, এর কতটুকু স্থান থাকে আমাদের সংসার জীবনে। ব্যক্তিত্বের কতটুকু মূল্য আছে আমাদের জীবনে। আজকাল তোমরা চাও শিক্ষিতা স্ত্রী ফর শো, তাই বাপ মা-রা আমাদের দিচ্ছেন এই বই মুখস্থ করবার সুযোগ; যেই খুঁজে পাবেন সারা জীবন পথ দেখাবার একটি লোক তখনি বলবেন বন্ধ কর তোমার পড়া। এতদিনের সমস্ত অভ্যাসগুলো ভুলে গিয়ে এরই সঙ্গে গিয়ে নাও এর সুখ সুবিধা আরাম আনন্দের ভার। সারা জীবন এই ভার যোগ্যতার সঙ্গে বহন করা, নির্ব্বিচারে পথে বিপথে এঁর অনুসরণ করাই হবে তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য, তোমার ধর্ম্ম। এই তো আমাদের শিক্ষার পরিণতি। এতে কতটুকু মর্য্যাদা আমাদের বেড়েছে আগের সেই অশিক্ষিতা মেয়েদের চেয়ে, শুধু নষ্ট হয়েছে সেই সহজ সন্তুষ্টি।'

মুকুল—'তোমার কথাটা ভাববার মত কথা মায়া, এই ভাবনাটা খুব বড় হয়ে ওঠাই উচিত; কিন্তু আজও তেমন বড় হয়ে ওঠেনি এইজন্যে যে, কটা মেয়েই বা জীবনকে ঠিক এ ভাবে বিচার করে। তারাও যে শিক্ষাটাকে ব্যবহার করে ফর শো, ভাল একমপ্লিসড্ না হলে ভাল স্বামী পাওয়া যায় না, তাই করে সব রকম বিদ্যার চর্চ্চা। যেই সেটা সংগ্রহ হয়ে যায়, শিক্ষার বালাই বিসর্জ্জন দিয়ে প্রজাপতির মত বৈচিত্র্যের ফুলে ফুলে খুঁজে বেড়ায় শুধু আনন্দের মধু। জীবনকে গভীর ভাবে নেবার মত মন কটা ছেলের বা কটা মেয়ের তুমি দেখেছ মায়া? এরা শুধু স্রোতের ফুল, শুধু ভেসে চলতে চায়।'

মায়া—'কিন্তু স্রোতের মানুষ হয়েই বা লাভ, কি যদি সেই স্রোতের প্রতিকূলে যাবার শক্তি না থাকে।'

মুকুল—'শক্তি কেন থাকবে না মায়া! মানুষের শক্তি যে কত অসীম কত অসাধ্য সাধন সে করতে পারে এ কথা তো আজ কারু অজানা নেই। আর এই শক্তি নিজের মধ্যে সঞ্চয় করাই তো শিক্ষা। জীবনে যা সত্য বলে, শ্রেয় বলে মনে হবে তারই প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা নিয়ে, দুর্জ্জয় সঙ্কল্পে দৃঢ় হয়ে ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্র বিদ্যুতের বাধা অতিক্রম করে যদি লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে না পারি ব্যর্থ আমাদের শিক্ষা।

সব দেশে সব কালে অধিকারের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে, সংগ্রাম ক'রে জীবন উৎসর্গ করে মহামানবেরা মহাকালের বুকে আগুনের অক্ষরে লিখে রাখেন তাঁদের অমর বাণী; তারই শিখায় জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে জীবনের চলবার জন্যেই শিক্ষার দরকার। অন্ধ মন, আর বোবা বিবেক নিয়ে তুচ্ছতার অন্ধকারে ডুবে থাকবে তারা, যারা পায়নি শত শতাব্দীর এই সব সূর্য্যের উত্তপ্ত আলো; যাদের জ্ঞানের দরজা বন্ধ হয়ে আছে শুধু নিজেদের ছোট ছোট আনন্দ আর আরামের আবর্জ্জনায়। তুমি আমিও যদি এক হয়ে যাই ওদের সঙ্গে, সায় দেই ওদের অজ্ঞানতায় অসংখ্য অনাচারে, তবে কেন জীবনের এই শ্রেষ্ঠ দিনগুলা ব্যয় করি অধ্যয়নের সুকঠিন তপস্যায়। একি শুধু য়ুনিভার্সিটির ডিগ্রীগুলো নিয়ে গর্ব্ব করবার জন্যে আর অল্প শিক্ষিত জনসাধারণকে বঞ্চিত করে উপার্জ্জনের আরামজনক উপায়গুলো আয়ত্ত করবার জন্যে। শিক্ষার এমন ব্যর্থতা তুমি নিজের জীবনে এনো না মায়া। তোমাকে মানুষের মত মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। তোমার সুন্দর মনের আলো ছড়িয়ে দিতে হবে দিকে দিকে। অন্যায় আর আগুন সমধর্ম্মী; এদের প্রশ্রয় দিলে এরা ধ্বংস করে গ্রাস করে মানুষের সম্পদ। পৃথিবীর দিকে দিকে আজ মৌন মূঢ় মানুষগুলোর অন্ন বস্ত্রের ভাঁড়ারে জ্বলে উঠেছে অন্যায়ের আগুন, ভীরু দুর্ব্বল মানুষগুলার সর্ব্বস্বের ইন্ধন পেয়ে অত্যুগ্র আকাশস্পর্শী হয়ে উঠেছে এই আগুন। প্রতিবাদের প্রবল ঝাপটায় এই আগুন নিবিয়ে দিয়ে সর্ব্বহারা লোক-

গুলোর অন্নবস্ত্র রক্ষা করবার ভার নিতে হবে আমাদের, তাই আমাদের ভুলে যেতে হবে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, আনন্দ, আরাম।'

মায়া—'তোমার কাছে যখন থাকি তখন মনে হয়, অমনি শক্তিই আছে আমার মধ্যে। কিন্তু যখন ফিরে যাই আমার প্রতিদিনের জীবনে তখন নিজেকে মনে হয় এত দুর্ব্বল। কাল যখন বাবা তোমাদের অনেকগুলা কথা বলে মাত্র পাঁচটী টাকা দিয়ে বিদায় দিলেন তখন এমন একটা বিদ্রোহ সাড়া দিল মনে যে মনে হোল তখনই মার কাছে গিয়ে বলি—মা তুমি তো মেয়ে মানুষ, সন্তানের মা, স্বামীর স্ত্রী, তুমি কেন বুঝলে না রতন বাবুর জীবনের মূল্য, তুমি কেন বুঝলে না ছেলেকে স্বামীকে অভাবের জন্যে অচিকিৎসায় অচেষ্টায় মরণের মুখে তুলে দেওয়ার দুঃখ কত। কেন বুঝলে না গরীব মার গরীব স্ত্রীর বুকেও আছে তোমারই মতো মমতা। কেন বুঝলে না তোমাদের এই অজস্রতার সামনে বসে মরছে যারা অভাবে, অনাহারে, পরিশ্রমে, তাদের বঞ্চিত বুকের উত্তাপে একদিন জ্বলে যাবে তোমাদের অর্থের আরাম। কিন্তু পারলুম না; বাবার বিরক্তি মার বকুনী দাদাদের উপহাস সব কল্পনায় এক হয়ে থামিয়ে দিলে সব বিদ্রোহ। শুধু মনে জেগে উঠলো একটা অসহায় চঞ্চলতা; মনে হোল তখনি চলে আসি তোমার কাছে। কিন্তু সেখানেও সেই বাধা সেই নিষেধ। তাই শুধু নিজের মনটাই রইল বিশ্রী হয়ে। সারা রাত ঘুমুতে পারলুম না। আর তারই ফলে আজ নিজেও ক্লাস কামাই করলুম, তোমাকেও কামাই করিয়ে নিয়ে এলুম এখানে। নিজের তো আর পড়া শোনা হবেই না, দেখছি তোমারও ক্ষতি করলুম, আজকের দিনটা তোমার নষ্ট হোল।'

মুকুল—'দুএক দিন ক্লাস কামাই করলে আমার কোনও ক্ষতি হয়না মায়া। কিন্তু মনের অমন উত্তেজনা তোমার নিজের পক্ষে ক্ষতিকর। অত অল্পে বিচলিত হলে কাজের দৃঢ়তা নষ্ট হয়, জীবনে যাদের সংগ্রাম করতে হবে তাদের অচঞ্চল হতে হবে।'

মায়া—'রতন বাবুর কি ব্যবস্থা হোল, কত টাকা চাঁদা পাওয়া গেল?'

মুকুল—'দেড়শো টাকার মাসিক চাঁদার প্রতিশ্রুতি তো পেয়েছি, এখন মাসে মাসে আদায় করতে পারলে হয়।'

মায়া—'তা হলে এখনও মাসে পঞ্চাশ টাকা চাই, না হলে রতনবাবুর স্যানাটেরিয়মে থাকা হবে না।'

মুকুল—'হবে মায়া, কালই তাঁকে আমরা রেখে আসবো যাদবপুরে। পরে যদি দরকার হয়তো যাবেন ধরমপুরে।'

মায়া—'কিন্তু টাকা? দেড়শো টাকা তো রতন বাবুর লাগবে। ওঁর বাড়ীর সকলের কি হবে?'

মুকুল—'তাঁদের ভার আমার মা নিয়েছেন। আমাদের বাড়ীর অনেকগুলা ঘর খালি পড়ে থাকে সেইখানেই তাঁরা থাকবেন। আর যতদিন না রতন বাবু সুস্থ হয়ে ফিরে আসেন কিম্বা আমি অসুস্থ হই ততদিন ওঁদের সংসার চালাবার টাকা কটা আমাকেই যোগাড় করতে হবে দুবেলা দুটো ছাত্র বা ছাত্রীকে বিদ্যা বিক্রয় করে। যতদিন না ছাত্র এবং ছাত্রী সংগ্রহ করতে পারি ততদিন তিনি চালাবেন বলেছেন বটে কিন্তু সময় দিয়েছেন মোটে একটি মাস। এতেই বুঝতে পাচ্ছ তাঁর সঞ্চয় কত সঙ্কীর্ণ।'

মায়া—'কোন ছাত্র ছাত্রীর সন্ধান পেয়েছ।'

মুকুল—'না, শীগগীর যে পাব সে ভরসাও রাখি না। আমার মত বহু ছেলেই ভিড় করে আছে তাদের চারিপাশে। এদের ভিড়ে আমার হারিয়ে যাবার সম্ভবনাই বেশী সেটা আমি নিজে জানলেও মা বিশ্বেস করেন না। বলেন তুই ভিড় ঠেলতে ভয় পাশ, অকর্ম্মা কিনা তাই।'

মায়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। মুকুলও নিঃশব্দে মুকুলগুচ্ছটি নাড়িতে লাগিল। একটু পরে মায়া মৃদুস্বরে বলিল—'আমি একটা কথা বোলবো?'

মুকুল মায়ার দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল —'একটা কেন মোটে? অনেক কথাই তোমার শুনতে চাই যে আমি। আমরা অকপট বন্ধু হবো বলেই স্বীকার করেছি না, তবে শুধু একটা কথা বলতে এত ইতস্তত কেন।'

মায়া—'আমার ছোট ভাই বুলুকে পড়াবার জন্য যদি তোমায় বাবা রাখেন তা'হলে তোমার আপত্তি আছে? বুলু এবার ম্যাট্রিক দেবে। ইংলিশে ও একেবারে কাঁচা তাই বাবা ইংলিশে ষ্ট্রং একজন টিচার খুঁজছেন।'
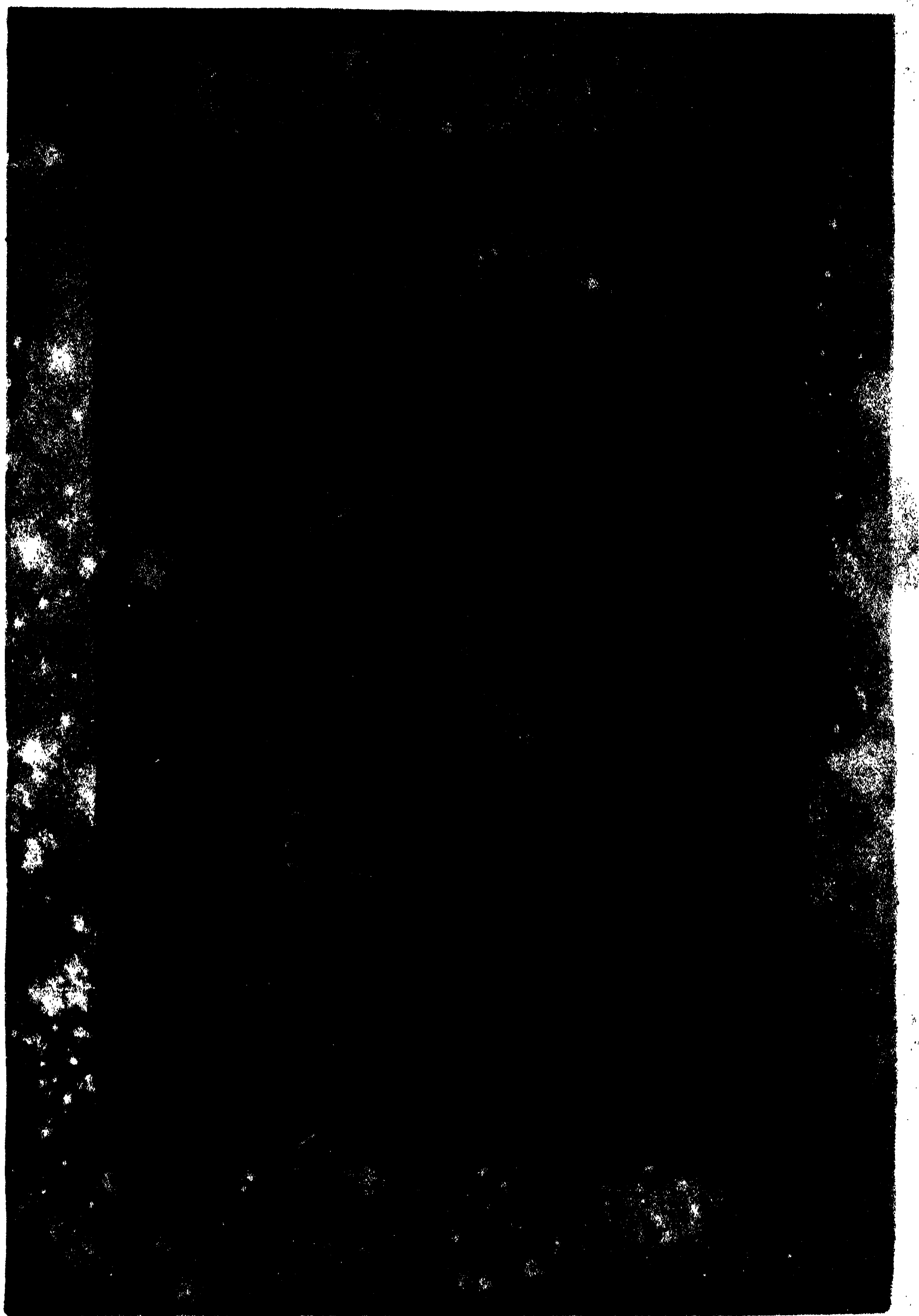
মুকুল—'আমার কেন আপত্তি হবে। এত শীগগীর বিনা ঘুরুণীতে পেয়ে গেলে তো আমি বেঁচে যাই, আর মার অকর্ম্মা উপাধীটাও অচল করে দিয়ে একটু মর্য্যাদা বাড়াতে পারি নিজের। কিন্তু তোমার বাবাই আমায় রাখবেন না মায়া, কাল অনেক তর্ক করেছি তাঁর সঙ্গে।'

মায়া—'সে সব আমি ঠিক করে নেব।'

মুকুল—'বেশ, দেখ চেষ্টা করে।'

মায়া কোন উত্তর দিল না। তাহাদের সম্মুখে মাঠের প্রশস্ত বুকে ধীরে ধীরে নামিতেছিল বেলা শেষের ছায়া। দূরের আম গাছগুলার মুকুলের মুকুটপরা মাথায় জ্বলিতেছিল সোণালী রোদ। আশে পাশে কত নাম না জানা গাছের পাতার উপর কাঁপিতেছিল সতেজ সবুজ, আর আলোর ঝিকিমিকি। মায়া আর মুকুল অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল এই নির্জ্জন মাঠের চারিপাশে প্রকৃতির নিঃশব্দ রংয়ের খেলা। অনেকক্ষণ পরে মায়া ধীরে ধীরে বলিল—'কি সুন্দর এই পাড়াগাঁয়ের নির্জ্জন মাঠগুলো, কি শান্ত, কি রহস্যময় এর রূপ, কি মিষ্টি এর গন্ধ, এরই একটি পাশে ছোট একটি বাড়ীতে সহজ সংক্ষিপ্ত গৃহস্থালীর নিশ্চিন্ততার মধ্যে যে আনন্দ থাকে, তার চেয়ে বেশি কি আনন্দ পাই আমরা সহরের প্রকাণ্ড বাড়ীতে বিরাট আড়ম্বরের বিলাসী জীবনে।'

মুকুল মায়ার দিকে ফিরিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—

ধন নয় মান নয়
শুধু কর তুমি আশা
নির্জ্জন মাঠের কোনে
ছোট একখানি বাসা

মায়া ধীরে ধীরে বলিল—'সত্যিই করি। আমার মনে হয় এমনি নির্জন মাঠের মধ্যে হঠাৎ একদিন আমি হারিয়ে যাই, একেবারে একা নিঃস্ব নিস্‌পরিচয়। আমার চারিপাশে থাকবেনা কোন দায়ের পাঁচীল, মাথার ওপর দাবীর কোন আচ্ছাদন। সামনে থাকবে না কোনও বহু দিনের বহু জনের চলা বাঁধা পথ। আমি নিজে পায়ে পায়ে গড়ে নেব আমার চলার পথ। দিনে দিনে সেই পথের দুপাশে করে নেব পরিচয়, খুঁজে নেব আশ্রয়।'

মুকুল বলিল—'কিন্তু বহুর মধ্যে বিশেষ হয়ে যারা জন্মায়, তারা জনতার মধ্যে দিয়ে বহু দিনের বাঁধা পথে আপনার আলো ফেলে আগে চলে। তার অপূর্ব্ব আলোয় বহু দিনের বাঁধা জীর্ণ পথ নতুন হয়ে দেখা দেয়; তার মনোহর আলোর মোহে জনতা ছোটে তারই পিছনে। তোমাকেও তাই চলতে হবে মায়া।'

মায়া একটু করুণ হাসির সঙ্গে বলিল—'কিন্তু আমার সে আলো কই বন্ধু। আমি নিজেই যে অন্ধকারে দিশেহারা।'

মুকুল বলিল—সময় হলে আপনিই জ্বলবে। আগে জাগে প্রয়োজন তার পর হয় সৃষ্টি।'

মায়া কোনও উত্তর দিল না। ধীরে ধীরে গাছের উপর হইতে রোদটুকু মিলাইয়া গেল। মায়া বলিল—'এইবার চলো ফিরি; এরপর অন্ধকার হয়ে যাবে। দূরে মায়ার ঝকঝকে 'মরিস মাইনার'খানি দাঁড়াইয়াছিল। মুকুল নিরুত্তরে উঠিয়া সেইদিকে চলিল। মায়াও উঠিয়া সেই দিকে চলিল। মুকুল গাড়ীর নিকটে গিয়া দরজা খুলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, মায়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে মুকুল উঠিয়া গাড়ীতে ষ্টার্ট দিতে লাগিল।

মায়া বলিল—'তুমি বড় জোরে বেপরোয়া গাড়ী চালাও মুকুল, অত জোরে চালিও না।'

মুকুল উত্তর দিল—'দুপাশের লোকগুলাকে ত্রস্ত ব্যস্ত করে উল্কার মতো ছুটে চলতেই তো আনন্দ মায়া।'

৬

দুই মাস পরে, একদিন মুকুলকে বাগানের পথে আসিতে দেখিয়া বুলু আসিয়া বলিল—'আজ আর পড়বোনা স্যার।'

মুকুল বলিল—'কেন? শরীর খারাপ নাকি?'

বুলু বলিল—'না স্যার, শরীর খারাপ নয়। ছোড়দিকে আজ দেখতে আসবে কিনা তাই। জানেন স্যার, ছোড়দিটা এমন ভীতু, দেখতে আসবে শুনে এমন ভয় পেয়েছে, যে মুখ-টুক শুকিয়ে চোখের কোলে কালি পড়ে গেছে। কাল যেই শুনেছে, কলেজ থেকে এসে অমনি ভাণ করে নাকি আর খেতে পর্য্যন্ত পারেনি ভয়ে। দিদিরা তো ওর

ভয় দেখে হেসেই খুন হচ্ছেন। বলছেন তিনটে পাশ করা মেয়ের একি ভয়রে বাবা! আমরাতো দেখতে এলে অমন ঘাবড়ে যেতুম না, তবু আমরা তখন সত্যিই ছোট ছিলুম।'

মুকুল বলিল—'কখন তাঁরা আসবেন? কে দেখতে আসবেন?'

বুলু বলিল—'যিনি আমাদের ছোট জামাইবাবু হবেন তিনি, আর তাঁর বাবা মা। এখনই তো তাঁদের আসবার কথা।'

মুকুল জিজ্ঞাসা করিল—'তাঁদের বাড়ী কোথায়? তোমার ছোট জামাইবাবু যিনি হবেন তিনি কি করেন?'

বুলু বলিল—'তাঁদের দেশ কোথায় জানি না, কোথাকার যেন খুব বড় জমীদার তাঁরা। আর যিনি জামাই বাবু হবেন তিনি নাকি পাঁচ বছর ছিলেন বিলেতে, আমেরিকায়। ও দেশের সব ফিল্‌ম ষ্টুডিওতে শিখ্‌ছিলেন ফিল্‌ম তোলার কাজ। এবার দেশে এসেছেন শিগ্‌গীর একটা নিজের ষ্টুডিও খুলবেন ফিল্‌ম তোলার। ও তাহলে যা মজাটা হবে, আমরাও নেবে পড়বো সব ছোট খাট পার্টে। মা তো বললেন—বিয়ের সবই ঠিক, আজই ওদের মেয়ে পছন্দ হলে সব কথা একেবারে স্থির হবে। ছোড়দিটা যতই অহঙ্কারী হোক, দেখতে ভালই তো, মুখটা শুকিয়ে গ্যাছে বলে একটু খারাপ দেখাচ্ছে; তা হলেও পছন্দ ওদের হবেই, কি বলেন স্যার? মা বলছিলেন বি-এ পাশ, এমন সুন্দরী, এত বড়-লোকের মেয়ে ওরা পাবে কোথায়, হলেই বা ওরা বড়লোক, ছেলে বিলেত ফেরত।'

বাড়ীর দিক হইতে চাকর মহেন্দ্র আসিয়া বুলুকে বলিল—'ছোটবাবু আপনি এখনও কাপড় জামা বদলালেন না, মুখ হাত পরিষ্কার করলেন না, মা বকছেন। চলুন শীগগীর।'

বুলু বলিল—'যা, যা, বেশি সদ্দারি করিস নে—আমি ঠিক সময় যাব।'

মহেন্দ্র চলিয়া গেল।

মুকুল বলিল—'তোমাদের লাইব্রেরীতে আমার এক খান বই দেখে নেবার দরকার ছিল, এখন যদি দেখি কিছু অসুবিধা হবে তোমাদের?'

বুলু বলিল—'কি আবার অসুবিধা হবে। আসুন।' মুকুল বুলুর সঙ্গে বাড়ীর দিকে চলিল।

দোতলায় গাড়ী বারান্দার সামনের সারি সারি ঘরগুলার ভিতর ছেলেদের প্রত্যেকের একটি করিয়া পড়িবার ঘর; তাহার মাঝের ঘরখানি লাইব্রেরী। বুলু মুকুলকে সেইখানে রাখিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। মুকুল ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড টেবিলটার পাশে গদী মোড়া চেয়ারখানিতে বসিল। অতর্কিতে মায়ার বিবাহ সংবাদ তাহাকে যেন ঈষৎ বিমূঢ় করিয়া ফেলিল। অল্পক্ষণ পরে বাহিরে তীক্ষ্ণ হর্ণের শব্দে সে বাহিরে আসিয়া দেখিল একখানি কাল রংয়ের সুবৃহৎ সুদৃশ্য গাড়ী কতগুলি সুবেশ আরোহী লইয়া গাড়ী বারান্দার নীচে ঢুকিয়া পড়িল। মুকুল সরিয়া গিয়া ওপাশের সরু বারান্দায় দাঁড়াইল। নীচে তখন গাড়ীখানির দরজা খুলিয়া নামিতেছিল একটি বছর তিরিশের যুবা। মুকুল তাহাকে প্রখর দৃষ্টি দিয়া দেখিতে লাগিল। যুবকটাকে বাঙ্গালীর সাধারণ মাপের তুলনায় খর্ব্বকায় না বলিলেও দীর্ঘ কায়ের গৌরব তার নেই। বহু প্রসাধনে পালিস ভেদ করে মুখে ফুটে আছে বর্ণের শ্যামলিমা। আর সেই শ্যামলিমাকে আরো গাঢ় করিয়াছে মুখের অত্যধিক লালিমা। রুক্ষ কর্কশ মুখের রেখায় রেখায় ফুটিয়া আছে অনেক অনিদ্র রজনীর ইতিহাস, য়ুরোপের ফিল্‌ম ষ্টুডিওর অনেক অভিজ্ঞতা। অভ্যর্থনাকারীদের দিকে ফিরিয়া যুবকের মুখে ফুটিয়া উঠিল একটু পরিমিত হাসি, যে হাসি দাবী করে অনেকখানি মর্য্যাদার। তারপর গাড়ী থেকে নামিলেন একটি বিশেষত্ব বর্জ্জিত নির্জ্জীব প্রকৃতির প্রৌঢ়, তাহার পর একটি পুষ্টাঙ্গী গৌরবর্ণা মহিলা।

মায়ার দিদি অনিতা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সিঁড়ির দিকে লইয়া গেল। মায়ার বড় দাদা পরিতোষ পিতা পুত্রকে লইয়া বাহিরের সুসজ্জিত হলের দিকে গেলেন। মুকুল ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া আসিল। তাহার মনে হইতে লাগিল—ওই লোকটা হবে মায়ার স্বামী। কল্পনায় ওর রুক্ষ কর্কশ মুখের পাশে মায়ার শতদলের মত সুন্দর মুখ মুকুল ভাবিতে লাগিল—যে মুখ মুকুলের মনে হয় করুণার শিশিরে, বুদ্ধির আলোয়, প্রভাত কমলের মতই অপরূপ।

ওরই হাতে মায়া তুলে দেবে তার সমস্ত জীবন। যে জীবন, শরতের সকালের মতো উদার নির্ম্মল আকাশের আলোয় অনাগত উৎসবের আভাষ নিয়ে সহস্র সম্ভাবনায় মর্ম্মর মুখর। ওই হবে সেই জীবনের বিধাতা।

মুকুল ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল নীচে তারপর ধীরে বাগানের পথ দিয়া বাহির হইল পথে।

৭

সুলতা ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন—'এত সকালে এসেই শুয়ে পড়লি কেন মণ্টু? শরীর খারাপ হোল নাকি রে?'

মুকুল মার দিকে চাহিয়া ম্লান হাসির সঙ্গে বলিল 'না মা, আজ বুলুকে পড়াতে হোল না তাই বাড়ীই চলে এলুম। মন ভারী খারাপ লাগছে।'

সুলতা খাটের উপর মুকুলের পাশে বসিতে বসিতে বলিলেন—'কার আবার কি হোল, মন খারাপ কেন?'

মুকুল বলিল—'মায়ার বিয়ে মা।'

সুলতা চকিত দৃষ্টিতে একবার পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া শান্ত সহজ গলায় বলিলেন—'সে তো আনন্দের কথা রে, তাতে মন খারাপ কেন?'

মুকুল বলিল—'আনন্দেরই হোত মা যদি মায়া ওর বাপের বাড়ীর ওই আবহাওয়ার বাইরে যেতে পারতো তার যোগ্য স্বামীর হাত ধরে। যেখানে আশ্রয় পেত ওর মন, বিকশিত হয়ে উঠতো ওর চরিত্রের অপূর্ব্ব সম্পদ, যা সংসারে আনতো অনেক শান্তি অনেক সাহায্য। কিন্তু এ যে বলি মা, এমন একটি সুন্দর সৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে দিনে দিনে শুকিয়ে যাবে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকে।'

সুলতা—'শুকিয়ে যাবেই তাই বা তুই আগে থেকে কেমন করে বুঝলি? যেখানে বিয়ে হচ্ছে তাদের তুই জানিস নাকি?'

মুকুল বলিল—'না, তবে যেমন শুনলুম বুলুর মুখে আর দেখলুম নিজের চোখে তাতেই মনে হচ্ছে মা। ছেলেটী য়ুরোপের বিভিন্ন ফিল্‌ম্ ষ্টুডিওতে থেকে পাঁচটী বছর ধরে অর্জ্জন করেছেন সেখানকার অভিজ্ঞতা। আর সেই অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে তার মুখে তার সমস্ত ভঙ্গীতে। মায়াদের বাড়ীতে আজ পর্য্যন্ত কেউ য়ুনিভার্সিটির দরজা-গুলো কোন মুখো তাও দেখে নি। ছেলেদের মধ্যে ম্যাট্রিক ক্লাশ পর্য্যন্ত উঠেছে বুলু। আর মেয়েদের মধ্যে মায়াই করেছে তিনটে পাশ। কাজেই তারা সকলে পাঁচ বছর বিলেতে বাস করাটাই গৌরব করবার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করে বলে, মায়াও কি তাই মনে কর্ত্তে পারবে। এতগুলা বছর যার কাটলো বিশ্বের কত জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা করে, পাঁচ বৎসর ফিল্‌ম ষ্টুডিওতে কোনও ধনী যুবক কি অভিজ্ঞতা যে অর্জ্জন করে আসে এ কথা কি সে জানে না। স্থির বুদ্ধিতে প্রত্যেক লোককে নিঃশব্দে বিশ্লেষণ করাই যার চরিত্রের বিশেষত্ব, সে কি ওই রুক্ষ কর্কশ মুখের রেখায় অনেক লেখাই আবিষ্কার করবে না। আর এই আবিষ্কারের পরেও ওরই ঘরে গিয়ে মায়া শতদলের মতো বিকশিত হয়ে উঠবে বলে কেমন করে বিশ্বাস করতে পারি মা।'

সুলতা—'কি রকম স্বামী মায়া চায়?'

মুকুল—'এ সম্বন্ধে কোনও আলোচনা তার সঙ্গে আমার কথনও হয় নি। তবে আমি জানি চরিত্রহীনতাকে সে সমস্ত মন দিয়ে ঘৃণা করে, বড়লোকরা প্রায়ই উচ্ছৃঙ্খল হয় বলে সে বড়লোক হওয়াটাই দুর্ভাগ্য বলে মনে করে। আর ওর মত নির্ম্মল নিষ্ঠাবতী মেয়েদের এটা হওয়াই স্বাভাবিক। এতদিন আমাদের দেশের মেয়েরা শিক্ষার কোন সৎ ব্যবহার করতে পারে না, তারা অন্তঃসার শূন্য হয় বলে কত নিন্দা করেছি। এখন দেখছি তাদের এই আত্মোপলব্ধির অভাব, তাদের ওপর বিধাতার আশীর্ব্বাদ। পরের খেয়াল খুশীর দাসী হয়েই যাদের জীবন কাটবে, তাদের ওটা অভিশাপ। তাই দেখা যায় সব দেশে সব কালে, ইবসেনের নোরা, গলস্‌য়ার্দ্দির আইরিন, শত সহস্রের মধ্যে আত্মগোপন করে নীরবে নিপীড়িত হচ্ছে সমাজের বিধি বিধানের চাপে। মাঝে মাঝে এক একটি দরদী মন তুলে ধরে তাদের লোক চক্ষুর সামনে, কেউ বা দেখে কেউ বা দেখে না। তাই যুগের পর যুগ ধরে একই নিয়মে ঘুরে চলছে চিরন্তনীর চাকা। মেয়েদের স্বতন্ত্র মত বা চাওয়াকে

চিরদিন অস্বীকার করে আসছে সব দেশের সমাজ। কি সে এর প্রতিকার, কোন পথে এদের মুক্তি এ সন্ধান আজ পর্য্যন্ত কেউ পেলে না। সব চেয়ে দুঃখ এই মেয়েরা নিজেরাই শতকরা নিরানব্বুই জন এটা ভাবতেই ভুলে যায়। যাদের অভিভাবকরা উদার হয়ে সামান্য একটু সুযোগ তাদের দেয় তারাও সেটার অপব্যবহার করে' এমন অশ্রদ্ধা এনে দেয়, যাতে করে লোকের মনে হয় ওদের ওপর ওই বিধি বিধানগুলাই ঠিক। আমি যদি তোমার ছেলে না হতুম, মায়াকে না দেখতুম, তাহলে আমিও ওই সব মেয়ে-গুলোকে দেখে পোষণ করতুম মেয়েদের ওপর পুরুষের চিরন্তন বিশ্বাস। আজ তাই মনে হচ্ছে, কেন দুঃখ পাবার জন্যে তোমাদের মতো এমন এক একটা ব্যতিক্রম দেখা দেয় না।'

সুলতা—'সব কেনর কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না বাবা! তাই আমাদের শাস্ত্র সব সমস্যার সমাধান করেছেন কর্ম্মফলের দোহাই দিয়ে। তা ছাড়া সহজ সুবিধাজনক মীমাংসাও আর হাতের কাছে সব সময় পাওয়া যায় না। তুই ও অই মীমাংসাই করে মনটা শান্ত কর মণ্টু, মায়ার ভাগ্য যদি ভাল হয়, নিশ্চয় সে সুখী হবে সার্থক হবে।'

মুকুল—'অশান্ত হয়েই বা আমি এক্ষেত্রে কি করতে পারি। এ তো রতন বাবুর চিকিৎসার চাঁদা তোলা নয়, যে, বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে করে ছেলে পড়িয়ে যোগাড় করবো। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, চরিত্রে, অর্থে, অভিজাত্যে সমৃদ্ধ এমন একটি মানুষ, যে মায়াকে সুখী করতে পারে, আমি কোথায় পাব এখনি। তাই সহ্য করা, শান্ত হওয়া ছাড়া আমার আর উপায় কি মা।'

সুলতা—'আমি তোকে অমনি একটি ছেলে দিতে পারতুম, যদি মায়া কায়স্থ না হোত।'

মুকুল—'এই একটা কি বিশ্রী বাধা বলতো মা, মানুষ সবই সমান, বিয়ের সময় দেখা দরকার, দুজনের প্রকৃতি, শিক্ষা, চিন্তা সমান কিনা, তা না জাত। কি তাতে আসে যায় কে বামুন কে কায়স্থ, যদি প্রকৃতি দুজনার সমান হয়, এক হয় আদর্শ।'

সুলতা ধীরে ধীরে বলিলেন—"হ্যাঁ, বাবা, তাই ঠিক; কিন্তু যখন এই জাত বিচারের সৃষ্টি হয়েছিল, তখন জাতে জাতে ওই জ্ঞানের শিক্ষার প্রভেদ ছিল অনেক, তাই তাদের মধ্যে অমিলও ছিল অনেক; একজন ব্রাহ্মণ আর একজন শূদ্রের প্রকৃতির অনেক প্রভেদ ছিল। তাই তাদের বিয়ের বাধা ছিল, অনেক অকল্যাণের ভয় ছিল। কিন্তু এখন তা' নেই, মানুষ হিসাবে সকলেই সমান শিক্ষা পাচ্ছে, সুযোগ পাচ্ছে, সমান চিন্তায় এক হয়ে উঠছে। তাই এই বাধাটা আর বেশি দিন থাকবে বলে মনে হয় না। এই আমাদের যুগের লোকগুলা, যাদের মনে যুক্তির চেয়ে সংস্কার বড়, জ্ঞানে বুঝলেও মনে মানতে বাধ্য হয় আজন্মের সংস্কার বলে, তারা যখন থাকবে না তখন বিয়েতে এই জাতের প্রশ্ন আর থাকবে না।'

মুকুল—'তখন হয়তো আবার প্রবল হবে ওদের দেশের মত অর্থের আভিজাত্য। মানুষ নিজের তৈরী নিয়মের বন্ধন থেকে কখনই মুক্তি পাবে না।'

সুলতা—'একটা বন্ধন যে মানুষের জীবনে দরকার হয় বাবা। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলোকে বন্দী করে সমাজের কল্যাণকে নিরাপদ রাখবার জন্যে। বন্ধনহীন মন মানুষকে বিপথে নিয়ে যাবার ভয়ই বেশি বলেই ওগুলার সৃষ্টি হয়েছিল।'

মুকুল—'মানুষের বিবেকই সে পথ থেকে মানুষকে রক্ষা করবে। তাই মিথ্যে যুক্তিহীন কতকগুলো নিয়মের বন্ধন না রেখে, বিবেককে বড় করে তোলবার সাহায্যই করা চাই। শুধু জ্ঞানহীন নিয়মের দোহাই দিয়ে প্রবৃত্তিকে বন্দী করা যায় না বলেই পৃথিবীর দিকে দিকে আজ এত অনাচার স্তূপাকার হয়ে উঠেছে।'

সুলতা উঠিতে উঠিতে বলিলেন—'আমার আর বসার সময় নেই রে, যাই এবার। তুই একা এখানে শুয়ে থাকবি?'

মুকুল বলিল—'হুঁ মা, এখন তাই ইচ্ছে করছে, তুমি কাজ সেরে এস।'

সুলতা ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইলেন। নীচের উঠানের ও পাশে রান্না ঘরের খোলা

জানলা দিয়া ঝলকে ঝলকে নীলচে ধোঁয়া বাহির হইয়া সুলতার সম্মুখটা আবছা অস্পষ্ট করিয়া ফেলিতেছিল। তাহারই দিকে চাহিয়া সুলতা ভাবিতে লাগিলেন—

কুড়ি বছরের মধ্যে আজ প্রথম তাঁহার মনে হইল মণ্টুর জীবনে কোনও দিন তাঁহার প্রয়োজন শেষ হইতে পারে। মনে হইল, মণ্টুর পঁচিশ বছরের পরিপূর্ণ মনে যে আলো দেবে, আনন্দ দেবে, সে মা নয়। কিন্তু, তার নিজের জীবনে ওই মায়া মেয়েটীকে উপলক্ষ্য করে আবার কি জেগে উঠবে সমস্যা। আজন্মের হিন্দুত্বের সংস্কার, স্বধর্ম্মের নিষ্ঠা, আর সন্তানের মুখ, এরই দ্বন্দ্বে আবার কি জর্জ্জরিত হবে জীবন। যে সন্তান তাঁর যৌবনের স্বপ্ন, তাঁর সারা জীবনের সাধনা, তাঁর বার্দ্ধক্যের আনন্দ আশ্রয়, জীবনের গৌরব, সেই সন্তানের সুখের প্রশ্ন অপেক্ষা করবে কি তাঁরই উত্তরের উপর, যে উত্তরের সম্মুখে থাকবে তাঁর নিজের সংস্কার।

আজ সুলতার অন্তরের অন্তস্থল হইতে বাহির হইল নিজের দুর্ভাগ্যের দীর্ঘশ্বাস।

বিধাতার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আজ জাগিয়া উঠিল সুলতার মনে। কেন এই সারা জীবনব্যাপী পরীক্ষা। কেন জীবনের অধ্যায়ে অধ্যায়ে এত পরিবর্ত্তন। এবার অদৃষ্টের অন্তরালে অপেক্ষা করছে কি একটা লক্ষ্যহীন নিঃসম্বল জীবন। সুলতা চোখ মুছিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেলেন।

৮

গ্রীষ্মের দুঃসহ মধ্যাহ্নে, বটানিক্যাল গার্ডেনের ছায়া-শীতল লতাগৃহে বসিয়াছিল, মুকুল আর মায়া। উভয়েরই অবয়বে ছিল বাহিরের গাছ-পাতাগুলির মত ক্লান্ত ক্লিষ্টতা।

মুকুল বলিতেছিল—'তুমি আগেই একেবারে কি করে স্থির করে ফেলতে পার মায়া, ওই লোকটাকে আত্ম-সমর্পণ করার চেয়ে মৃত্যুই তোমার শ্রেয়। এমনও তো হতে পারে ওর সব অভ্যাস আড়ম্বরের অন্তরালে আছে যে মন, সেটি সুন্দর, কোমল, তোমার ভালবাসায় সে সম্পূর্ণভাবে ধরা দেবে তোমার কাছে, তখন তুমি ধীরে ধীরে গড়ে তুলবে তোমার শিক্ষা দিয়ে তোমার চিন্তা দিয়ে এমন একটি আব-হাওয়া যাতে মুছে যাবে ওর স্বভাবের সমস্ত মালিন্য। অবশ্য এর জন্য চাই তোমার ধৈর্য্য, তোমার ত্যাগ। কিন্তু তোমার শিক্ষার, স্বভাবের, সমস্ত সম্পদের, স্বার্থকতা তো ওই গড়ার মধ্যেই থাকবে মায়া। সাধারণ পাঁচটা মেয়ের মত মনোমত স্বামী সংসারে পেলুম না বলে আত্মহত্যার ইচ্ছা হবার মত দুর্ব্বলতা তোমার থাকতে পারে এ আমি ভাবতেও পারি না।'

মায়া—'তোমায় সব আমি ঠিক বোঝাতে পারবোনা। ওই লোকটী যদি সর্ব্বগুণান্বিত হোত তবুও ওকে আমি স্বামী বলে স্বীকার করে নিজেকে ওরই হাতে দিতে পারতুম না।'

মুকুল বিস্মিত স্বরে বলিল—'কেন? তার কি কারণ? বিয়ে করতেই তোমার ইচ্ছে নেই এমন কথা তো কখন বলো নি মায়া? হঠাৎ তোমার এমন ধারণা কেন হোল বলতো?'

মায়া—'তাও তোমায় বলতে পারবো না।'

ঈষৎ আহতস্বরে মুকুল বলিল—'অথচ তোমার বিশ্বস্ত বন্ধু বলে নিজেকে মনে করে আমি আনন্দ পাই।'

মায়া মিনতিভরা সুরে বলিল—'রাগ করো না মুকুল! আমি জানি তোমার বন্ধুত্বের মূল্য, তবু একথা তোমায় বলা যায় না।'

মুকুল অসহিষ্ণু স্বরে বলিল—'কি আশ্চর্য্য, কেন? কি এমন কথা তোমার থাকতে পারে যা আমাকেও বলা যায় না। আমার নিজের জীবনের তো এমন কিছুই নেই যা তোমায় বলা যায় না। ভবিষ্যতেও যে এমন ব্যবধান আমাদের মধ্যে আসতে পারে এ ভাবলেই আমার কষ্ট হয়। তোমার বন্ধুত্ব যে আমার জীবনে কতখানি জায়গা অধিকার করেছে সেই দিন প্রথম বুঝলুম, যেদিন বুলুর মুখে শুনলুম তোমাকে হারাবার সম্ভাবনার কথা, তোমাকে যে আমার একদিন হারাতেই হবে। কোন বিবাহিতা মেয়েকে ঠিক এভাবে পাওয়া যায় না এটা আমার কোনদিন মনে পড়েনি। স্কুল কলেজে অনেক ছেলে মেয়ের সঙ্গে হয়েছিল পরিচয়। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন একটিকেও আমি

পাইনি যাকে আমি গ্রহণ করতে পারি, আমার স্বগোত্র, আমার মনের প্রতিবাসী, আমার বন্ধু বলে। আমার চারি পাশে জড়ো হয়ে থাকতো যে জনতা, তার মধ্যে নিজেকে মনে হোত বিদেশী। চারি পাশের এই অসঙ্গতি অমিলই দিনে দিনে আমায় করে তুলেছিল সিনিক—কোন মানুষকে আমি শ্রদ্ধা করতে, ভালবাসতে পারতুম না। মানুষ নিঃসঙ্গ থাকতে পারে না; তার মনের মুক্তির জায়গা একটা না থাকলে অসন্তুষ্ট অসুখী হয়ে ওঠে। একমাত্র আমার মার কাছেই ছিল আমার মনের মুক্তি। তবু সম্পূর্ণ তৃপ্ত হোত না আমার মন সে মুক্তিতে। তারপর পেলুম তোমায়, দিনে দিনে তোমার মনের পরিচয় পেয়ে তোমায় বন্ধু বলে কি আগ্রহে যে গ্রহণ করলে আমার মন তা তুমি বুঝবে না মায়া। সেই আনন্দের মধ্যে আমার মনের এমন অবকাশ ছিল না, যে, সে ভাবে তুমি মেয়ে, তুমি কুমারী, তোমার সঙ্গে আমার এ বন্ধুত্ব স্থায়ী হতে পারে না, আমি তোমার পরিবারের অপরিচিত, অস্বীকৃত পুরুষ। শুধু তোমায় পেয়েছি, আমি সৃষ্টিছাড়া, একা নই আর, এই আনন্দে ভরে থাকতো আমার মন। আজ আমাদের এই বন্ধুত্বের আসন্ন বিচ্ছেদের সামনে বসে, আমার বন্ধুত্ব তোমার সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হবার যোগ্য নয় বলেই কি বিদায় দেবে মায়া।'

মায়া ব্যগ্র ব্যাকুল ভাবে বলিল—'না, না, মুকুল, কেন অমন সব ভাবছো। কেন তুমি বুঝছো না এমন অনেক কথা থাকে যা বলবার বাধা না থাকলেও বলা যায় না।'

মুকুল বলিল—'সেই একই উত্তর, বিয়ে করবার এমন কি বাধা থাকতে পারে যা আমাকেও বলা যায় না।'

মায়া নিরুত্তর। মুকুল অনেকক্ষণ নিঃশব্দে তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে ডাকিল 'মায়া।'

মায়া চোখ তুলিয়া মুকুলের দিকে চাহিল। মুকুল অনেক দিন পরে মায়ার চোখের সেই লজ্জার কাঁপন দেখিল। সে নিজের দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া একটু থামিয়া বলিল—'তুমি কি কাউকে ভালবাস মায়া?'

মায়া মুখ নত করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিল—'হ্যাঁ।'

মুকুল—সে তোমায় ভালবাসে!'

মায়া তেমনি নত মুখে উত্তর দিল—'না'

মুকুল—'না, কেমন করে জানলে? তাকে জানিয়েছিলে।'

মায়া—'না।'

মুকুল—'তবে? সে বিবাহিত?।'

মায়া—'না।'

মুকুল—'তা হলে অন্য কাউকে ভালবাসে?'

মায়া—'না।'

মুকুল—'না না, না, আজকে হঠাৎ তুমি এমন হেঁয়ালী হয়ে উঠলে কেন মায়া? স্পষ্ট করে সহজ করে কি কিছু বলতে পার না, যাকে তুমি ভালবাস, যাকে ভিন্ন অন্য কাউকে স্বামী বলে স্বীকার কত্তে পার না, তাকেও তুমি এ অবস্থায় সব বলতে পার না, সাহায্য চাইতে পার না? কেন, তুমি যাকে ভালবেসেছ সে নিশ্চয়ই তোমার হবার অযোগ্য নয়, তবে কিসের বাধা?'

মায়া—'বাধা নিশ্চয়ই আছে মুকুল, ও কথা তুমি আর জিজ্ঞেস কর না। অন্য উপায় ভাব যে করে হোক এ বিয়ের হাত আমি এড়াতে চাই। কারুকে বিয়ে করবার জন্যে এখন আমি ব্যস্ত হয়ে পড়িনি। সেই উপায়ই ভাব।'

মুকুল—'বেশ, তাহলে তোমার বাড়ীতেই বল, যে, বিয়ে তুমি করবে না। এতে ভয় পাবার কিছুই নেই।'

মায়া—'তুমি পাগল মুকুল, তাহলে বিয়েতো বন্ধ হবে না, বরং আমার নানা রকম নিন্দা কুৎসা কেলেঙ্কারীর কথায় তারা পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে, যারা এতদিন লেখা পড়া শেখার জন্যে আমায় হিংসা করেছে। আর বাবা কড়া পাহারায় রেখে বিয়ে না দেওয়া পর্য্যন্ত বাড়ী থেকে বেরুনো একদম বন্ধ করে দেবেন। এখন পালাবার যে সুযোগটুকু পাচ্ছি তখন সেটি বন্ধ হবে, কাজেই সত্যিই মরা ভিন্ন পথ থাকবে না।'

মুকুল হতাশ সুরে বলিল—'আমি তো কোনই উপায় দেখতে পাচ্ছি না। বেশ, তুমি তারই ঠিকানা আমায় দাও আমি নিজে একবার দেখবো চেষ্টা করে। কেন তার সঙ্গে হতে পারবে না বিয়ে, সে যখন অবিবাহিত।'

একটু থামিয়া তারপর মুকুল মায়ার দিকে ফিরিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, 'এতদিন যার কথা এত সন্তর্পনে আমার কাছেও গোপন রেখেছিলে, তারই ঠিকানাটা আমায় দাও মায়া।'

মায়া মৃদু হাসিয়া বলিল—'সেটা আজও তোমার কাছে গোপন থাক বন্ধু।'

মুকুল—'এখন আর গোপন থাকতে পারে না মায়া, তাকে রাজী করান ছাড়া উপায় নেই কোনও।'

মায়া—'ও উপায়ও নেই। তার সঙ্গে বিয়ে আমার হতে পারে না।'

মুকুল উত্তেজিত ভাবে বলিল—'তুমি একেবারে বোকা হয়ে গেলে মায়া। উপায় নেই, হতে পারে না বলে, কোন কিছুই নেই সংসারে। সহজ সাধারণ অবস্থায় যা হতে পারে না প্রয়োজনের গুরুত্বে তা হতে পারে এমন দৃষ্টান্ত তুমি অনেক পাবে।'

মায়া—'বেশ, তাহলে মনে কর যে, আমিই চাইনা, যে আমার চায় না, তারই ঘাড়ে বোঝার মত ঝুলতে। প্রয়োজনের গুরুত্ব আর আত্মসম্মান এ দুটোর মধ্যে কাকে তোমার বড় বলে মনে হয় মুকুল?।'

মুকুল ঈষৎ অপ্রস্তুত ভাবে বলিল—'কিন্তু এমন তো হতে পারে সে তোমায় সম্পূর্ণ জানে না তাই চায় না। তাকে সব জানাবার সুযোগ দাও আমায় মায়া, তোমায় সম্পূর্ণ জানলে, তোমার কাছে গেলে কেউ না চেয়ে পারে না, আমার এ বিশ্বাস আছে বলেই তাকে জানতে চাইছি।'

মায়া নিজের হাতে বাঁধা ঘড়িটার দিকে চাহিতে চাহিতে বলিল—'আমার নিজের ওপর ততখানি বিশ্বাস নেই, কাজেই ও চেষ্টায় আমি রাজী নই।'

মুকুল হতাশভাবে বলিল—'তা হলে তো আমি আর কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।'

মায়া—'কিন্তু উপস্থিত এখানে বসে ভাববার আর সময় নেই, চারটে বাজে এখনই এখানে ভিড় জমতে সুরু হবে, এবার আমাদের উঠতে হয়, কাল আবার আসবে তো?

মুকুল—'কিইবা হবে এসে, আমার কোন কথাতে তুমি রাজী হতে পারবে না যখন। ঠিক তোমার ভাল মনে হবে এমন কোন উপায় তাও আমি ঠিক করতে পাচ্ছি না। কাজেই কোন নিরাপদ আশ্রয় তোমার যদি ঠিক করে দিয়ে সাহায্য না করতে পারি, কি দরকার এই গোপন দেখার দায় দিয়ে তোমার আর একটা দুঃখের বোঝা সৃষ্টি করার।'

মায়া মুকুলের দিকে চাহিয়া বলিল—'কিন্তু এমন নিরাপদ আশ্রয় যদি তুমি খুঁজে পাও আমার যে আশ্রয়ের আড়ালে আমি বাস করলে তোমার জীবন থেকে চির দিনের জন্যে হারিয়ে যাব, সেখানে আমাকে রেখে তুমি বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে আসতে পার মুকুল।'

মুকুল—'নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হলে নিশ্চিন্তে ফিরতে পারি বৈ কি। কিন্তু নিশ্চিন্ততা আর আনন্দ তো এক জিনিস নয় মায়া, আর সকলের চেয়ে বড় কথা তুমি আমার জীবনের একটি মাত্র বন্ধু, তোমার মুখ তোমার নিরাপদ নিশ্চিন্ত জীবনের জন্যে আমার চেষ্টা নিঃস্বার্থই হওয়া উচিত।'

মায়া কোন উত্তর দিল না নিরুত্তরে উঠিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল। মুকুলও ধীরে ধীরে তাহার অনুসরণ করিল।

সন্ধ্যায় সুলতার সেই রাস্তার দিকের বারান্দায় সুলতা বসিয়াছিলেন। তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়াছিল মুকুল। তাহার চুলগুলি লইয়া নাড়িতে নাড়িতে সুলতা বলিলেন—'দেখ এইবার আমি একটা উপায় ভেবে পেয়েছি। যার ঠিকানা মায়া তোকে জানায় নি, আমি জানি তার ঠিকানা।'

মুকুল মাথাটা তুলিয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিল—'সেকি মা, তুমি কি করে জানলে? তুমি যে মায়াকে কখনও চোখেও দেখনি, এই এক বছর তার সঙ্গে এমন করে মিশে, যার অস্তিত্বই আমি জানতে পারিনি। আমার মুখে শুনে শুনে তুমি জান তার ঠিকানা।'

সুলতা—'হ্যাঁ রে হ্যাঁ জানি। তোর জানবার মত বুদ্ধি আছে কি যে জানবি। নিজের মনটাকেই জানিস্ ভাল করে।'

মুকুল—'কি যে তুমি বল মা, তোমার বুঝি মনে হয় আমি এখনও তোমার সেই ছোট মণ্টুই আছি?'

সুলতা—'হয়ই তো, তা না হলে সে লোকটীর ঠিকানা পেতে তোর এত দেরী হয়, এত ভাবতে হয়?'

মুকুল—'কি আশ্চর্য্য, কি করে জানবো বলো, মায়ার কোন কথায়, কোন ব্যবহারে এমন কোন আভাষও কোন দিন পাইনি মা, আজও যদি ও না বলতো, যে, ওই লোকটী সর্ব্বগুণান্বিত হলেও ও তাকে বিয়ে কত্তে পারতো না, তাহলে আমার সন্দেহ হোত না। যাক, তুমি তার ঠিকানা কি করে জানলে বলো? যদি ঠিক জান মা, তাহলে এখনি আমি মায়াকে জিজ্ঞেস করে, সেই সত্যি কিনা জেনে, যাব তার কাছে।'

সুলতা—'তারপর সে যদি মায়াকে বিয়ে করতে রাজী হয়, আর বিয়ের পর মায়া একেবারে সরে যায় তোর জীবন থেকে, তুই সহ্য করতে পারবি।'

মুকুল—'সহ্য করতেই হবে, উপায় কি? মায়া আমার মনের অনেকখানি যে অন্ধকার করে দিয়ে যাবে সেটা এই কদিনেই বুঝেছি মা, তবু মায়া এখনও একেবারে হারায় নি। কিন্তু এখন আর উপায় কি? হয়তো এটা প্রথমেই আমার বোঝা উচিত ছিল যে, একজন মেয়ে আর একজন পুরুষের বন্ধুত্বের মধ্যে যত নির্ম্মলতাই থাক, সংসার তাকে স্বীকার করে না। অনাত্মীয়া কোন নারীর উপর শুধু বন্ধুত্বের কোনও অধিকার নেই। কিন্তু নিজের লাভ ক্ষতির হিসাব করে, মায়ার সুখ সার্থকতা ভোলবার মত নীচ কি তোমার ছেলে হতে পারে মা।'

সুলতা—'তা আমি জানি বাবা, তার সঙ্গে আরও জানি, আমার ছেলের বউ হলেই সার্থক হবে মায়ার জীবন, সম্পূর্ণ হবে তার সুখ।'

মার কোলের উপর হইতে মাথা তুলিয়া দ্রুত উঠিয়া বসিতে বসিতে মুকুল বলিল—'ছিঃ, এ কি তুমি বলছো মা।'

মৃদু হাসির সঙ্গে সুলতা বলিলেন—'ছিঃ কিরে, সত্যি কথাই বলছি, মায়াকে তুই ফোন করে জান যার ঠিকানা সে তোর কাছে গোপন রেখেছে সে হচ্ছে, 'মুকুল রায়'।'

মুকুল আবার মার কোলের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল—'না, মা, না, তা হতে পারে না, অসম্ভব, ও কথা তুমি আর বলোনা।'

সুলতা মুকুলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন—'এই সম্ভব বাবা, তুই মায়াকে জিজ্ঞেস করলেই বুঝতে পারবি।'

মণ্টু উত্তেজিত ভাবে বলিল—'আমি, আমি বলবো মায়াকে এই কথা, যে আমি, পুরুষ আর নারীর নির্ম্মল বন্ধুত্বের সম্ভবত্ব নিয়ে বলেছি কত বড় বড় কথা, কত সুন্দর আদর্শ কল্পনায় আলোচনায় কাটিয়েছি কত সন্ধ্যা কত সময়, সেই আমি এই কথা বলবো। তার আগে যদি আমায় মরতে হয় সেও রাজী তবু একথা যে আমার মনেও উঠতে পারে এ আমি মায়াকে জানাতে পারবো না।'

সুলতা বলিলেন—'বেশ, তা হলে তুমিও মনে কর আমি মরবো তবু মায়ার কাছে প্রকাশ হয়ে নিজেকে নীচু করবো না, সেও ভাবুক তাই, তারপর এরই ফলে দুজনার জীবনের আসুক একটা বিশ্রী পরিণতি বা বিরাট দুঃখ। তুই বলছিলি সেদিন, মানুষ নিজের হাতে গড়া সমাজের বিধি নিষেধের বন্ধন থেকে কখনও মুক্তি পাবে না, কখনও নিজের স্বাধীন নির্ব্বাচনে সুখী হতে পারবে না। কিন্তু মানুষের সম্পূর্ণ স্বাধীন, মুক্ত হবার সব চেয়ে বড় অন্তরায় তার নিজের ভদ্র সম্ভ্রান্ত মন। এই মনের নীতি যদি সে মানে, তা হলেই তার সামনে অনেক বাধা এসে দাঁড়ায়।'

মুকুল—'তোমার অনুমান সত্যিই যদি হয় তা হলে এ কথা মায়াকে জানাবার এটাও একটা প্রধান বাধা মা, আমি ব্রাহ্মণ মায়া কায়স্থ। মায়াকে আমাদের বাড়ী আনতে আমাদের সমাজ সম্মতি দেবে না মা।'

সুলতা—'না তা দেবে না, কিন্তু তোমাদের মনে যখন এর জন্যে কোনও অসম্মতি নেই তখন তার বাধা অগ্রাহ্য করা ছাড়া উপায় কি।'

মুকুল—'কিন্তু তুমি, তুমি কি প্রসন্ন মনে মায়াকে নিতে

পারবে মা, তোমার সংস্কার, তোমার নিষ্ঠার কোথাও বাধবে না ?'

সুলতা স্নিগ্ধ শান্ত কণ্ঠে বলিলেন—'আমার কথা ভাবিসনে বাবা, যখন আমার সামনে ছিল অনেকগুলী অনাগত বছর, তখন শুধু তোকে সত্যিকারের মানুষ করবো বলে অনেক বাধা অস্বীকার করেছিলুম। আর আজ যখন তুই আমার আশাকে সার্থক করে সুখ-স্বপ্নের মতো সত্যি হয়ে উঠেছিস, সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে দিন, এখন পারবো না মায়াকে তোর জীবনের আনন্দ বলে আলো বলে স্বীকার করে নিতে ?'

মুকুল—'কিন্তু এ তবুও হতে পারে না, এ কথা আমি মায়ার কাছে বলতেই পারবো না। যদি তোমার অনুমান মিথ্যে হয়, তা হলে চিরদিনের জন্যে মায়ার কাছে আমি হীন হয়ে যাব মা, এ আমি সহ্য করতে পারবো না।'

সুলতা—'বেশ কাল তা'হলে ওকে নিয়ে আসিস আমাদের বাড়ী, আমিই সব ঠিক করবো।'

মুকুল—'তুমি আমায় ভারী বিশ্রী অবস্থায় ফেললে মা, এ কথা আমার মনে আসার পর ওর সামনে ঠিক সহজ হয়ে দাঁড়াতে পারবো না। ওকে হারাবার সম্ভাবনা যেদিন থেকে হয়েছে সে দিন থেকে নিজের মনকে আমি নিজেই ভাল করে বুঝতে পাচ্ছি না এ কথা তোমার কাছে স্বীকার কচ্ছি মা, কিন্তু ওকে ঠিক এ ভাবে হয়তো আমি চাই না। ওকে সুখী করবার যোগ্যতা আমার নিজেরও আছে বলে আমার মনে হয় না। ওর মতো মেয়ের স্বামী হবার দায়িত্ব নিতে আমারও ভয় হয় মা, তাই ওকে ঠিক এ ভাবে পাবার কামনা মনে আসেনি কোনও দিন।'

সুলতা—'কিন্তু এ ভাবে ছাড়া আর কি করে চিরদিন তুই পেতে পারিস ওকে এমন ঘনিষ্ট করে।'

মুকুল—'কি জানি মা, আমার তো মনে হচ্ছে এ সবই আমাদের মিথ্যা কল্পনা। তোমার অনুমান একেবারে ভুল, এ হতেই পারে না সত্যি, কাল আমি ফোনে মায়াকে তোমার নাম করে এখানে ডাকবো, ও যখন আসবে আমি থাকবো না, তুমি যা জানবার জেনে নিও, কিন্তু দোহাই মা এমন কিছু বোল না যাতে তোমার অনুমান যদি মিথ্যে হয়, তা হলে মায়ার সামনে মুখ তুলে সহজ হয়ে দাঁড়ান আমার বন্ধ হবে। আমার কোনও দুর্ব্বলতা সে জানতে না পারে। আমি জানি এ তোমার ভুল ধারণা, তুমিও সেই বিশ্বাস নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বোলো। আর সুখ বা চাওয়ার কথা মনে রেখনা। আর সত্যিই আমায় বিশ্বাস কর, মায়াকে এ ভাবে আমি চাইনি কোনও দিন।'

সুখলাল চাকর দ্বারের নিকট আসিয়া জানাইল 'চুল জল গিয়া'। মুকুল উঠিয়া বসিল।

সুলতা উঠিতে উঠিতে বলিলেন—'তুই এখানেই শুয়ে থাকবি ?'

মুকুল—'তাই থাকি মা' বলিয়া শুইয়া পড়িল।

সুলতা চলিয়া গেলেন। কিন্তু যে পরম বিস্ময়কর বাণী শুনাইয়া গেলেন মুকুল একা শুইয়া তাহাই স্মরণ করিয়া লজ্জিত কণ্টকিত হইয়া উঠিতে লাগিল—মায়া সুদূর উদার আকাশের মতো মনোহর মনে হয় যার মন, দিনে দিনে, ক্ষণে ক্ষণে, আকাশের অপূর্ব্ব আলোর অপরূপ বিস্ফুরণের মতই মনকে মুগ্ধ বিস্মিত করে দেয় যে মনের প্রকাশ, সেই সুন্দর রহস্যময় মনের বিচিত্র আলোর আড়ালে সংগোপনে বাস করে সে নিজে ? একি সম্ভব। মুকুল নিজের ভাণ্ডার তন্ন তন্ন করিয়া মায়ার কথা হাসি দৃষ্টির মধ্যে সন্ধান করিতে লাগিল এই আবিষ্কারের সত্যতা। কিন্তু না, অনভিজ্ঞ মন মুকুলকে কিছুই নিশ্চয়তার সন্ধান দিল না। কিন্তু সে নিজে, যে মায়াকে তার মনে হয় শীতের ভোরে প্রথম পাওয়া রোদের মতো, যার স্পর্শের উত্তাপে মিলিয়ে যায় দেহের সমস্ত জড়তা, শিরায় শিরায় সঞ্চিত হয় উৎসাহ প্রেরণা শক্তি, সেই মায়াকে কি সে বন্দী করে চিরদিনের সঙ্গী করে চলতে চায় জীবনের পথে। যে পথের দুধারে থাকবে শুধু পীড়িত আর্ত্ত বঞ্চিতের আর্ত্তনাদ। যে পথে বিছানো থাকবে শুধু প্রতিবাদের কাঁটা, যে কাঁটার উপর চলতে চলতে ব্যথিত রক্তাক্ত হবে জীবন। সেই পথের জীবনের সাথী করবে সে ওই সুকুমারী ধনীর দুলালীকে। তার জীবনের এই নির্ব্বাচিত পথ তো মায়ার অজানা নেই, তবু যদি চায় সেই পথেরই সঙ্গী হতে সে, তাহলে, মুকুল কি 'আধেক কল্পনা আর আধেক মানবী'

হয়ে যে মায়া আজ আনন্দ দেয় উন্মাদনা দেয় তার মনে, তাকে সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে নিয়ে আসবে প্রতিদিনের জীবনের প্রত্যেক উপকরণে।

মুকুলের মন কোন মীমাংসাই করিতে পারিল না। কত বিচিত্র চিন্তায় বিহ্বল হইয়া গেল জ্ঞান আর সেই বিহ্বলতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিল সুলতার বিস্ময়কর বাণী। আনন্দে বিস্ময়ে চিন্তায় আচ্ছন্ন এলোমেলো হইয়া পড়িল বিচার বুদ্ধি।

১০

আসন্ন রাত্রির ম্লান মুহূর্ত্ত। মুকুলদের বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীর সামনে একখানি ট্যাক্সি আসিয়া থামিল। তাহার ভিতর হইতে নামিল মুকুল তাহার পর মায়া। মায়ার সীমন্তের রক্ত বর্ণ সিঁদুরের রেখায় তাহার মুখ এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ঝলমল করিতেছে। সারা মুখে একটা শান্তির অপরূপ প্রশান্তি। মুকুল মায়াকে লইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেই প্রথম দেখিল চাকর রূপলালকে। সে ব্যগ্রকণ্ঠে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'এই মা কোথায় রে?'

রূপলাল বলিল—'মাজী তো কাল যব আপ চলা গিয়া উসকো বাদ চলা গিয়া।'

মুকুল—'চলা গিয়া! কাঁহা?'

রূপলাল—'ও তো হাম জানতা নেই। মামা বাবু আয়াথা উনকো সাথ মাজী গিয়া, হামাকা বোলা যে হাম থোড়া রোজ বাদ আয়েগা। দাদাবাবু বহুজীকে লেকে কাল আয়েগা, তোম হুসিয়ারীসে উন লোককা খবরদারী করনা। আউর একঠো চিঠ্ঠি আপকো য়াস্তে রাখ গিয়া আপকো পড়নে কো টেবিল পর।'

মায়ার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া মুকুল প্রায় ছুটিয়া চলিল সিঁড়ির দিকে। তারপর এক সঙ্গে দুইটী করিয়া সিঁড়ি উঠিয়া দ্রুত উঠিল উপরে। তাহার নিজের পড়ার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল টেবিলের উপর পেপার ওয়েট চাপা একখানি খামের উপর সুলতার হাতের লেখায় তারই নাম লেখা। খামখানি তুলিয়া লইয়া নিকটেই চেয়ারখানিতে বসিতে বসিতে খামখানি ছিঁড়িয়া চিঠিখানি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। ঠিক সেই সময় রক্তহীন বিবর্ণ মুখে মায়া ঘরে ঢুকিয়া মুকুলের দিকে চাহিয়া দেখিল তাহার হাতে ধরা চিঠির কাগজগুলি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। মায়ার মনে হইল তাহার নিজের পা দুটাও যেন ওই রকমই কাঁপিতেছে। সে নিকটেই একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া মুকুলের দিকে চাহিয়া রহিল।

একটু পরে মুকুল চিঠিখানি টেবিলের উপর রাখিয়া, টেবিলের উপর দুই হাত রাখিয়া তাহার মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মায়া একটু ইতঃস্তত করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল মুকুলের কাছে, তারপর অল্পক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া—ধীরে মুকুলের পিঠের উপর একখানি হাত রাখিয়া মৃদু কোমল স্বরে ডাকিল—'মুকুল!' মুকুল মাথা না তুলিয়াই বলিল—'মায়া, এখন একটু একা থাকতে দাও আমায়। ওই মার চিঠিটা পড়ে দেখ, তিনি আমাদের ত্যাগ করেছেন, আর ফিরবেন না কোনও দিন।'

মায়া চকিতে উঠাইয়া লইল নিজের হাত, নিজের অজ্ঞাতে দুপা পিছাইয়া আসিয়া বসিয়া পড়িল পরিত্যক্ত চেয়ারটার উপর। তাহার মনে হইল পায়ের নীচের সব মাটী সরিয়া গিয়াছে—অসীম শূন্যে সে নিরাবলম্বন একা।

উষারাণী দেবী

মাণ্ডু
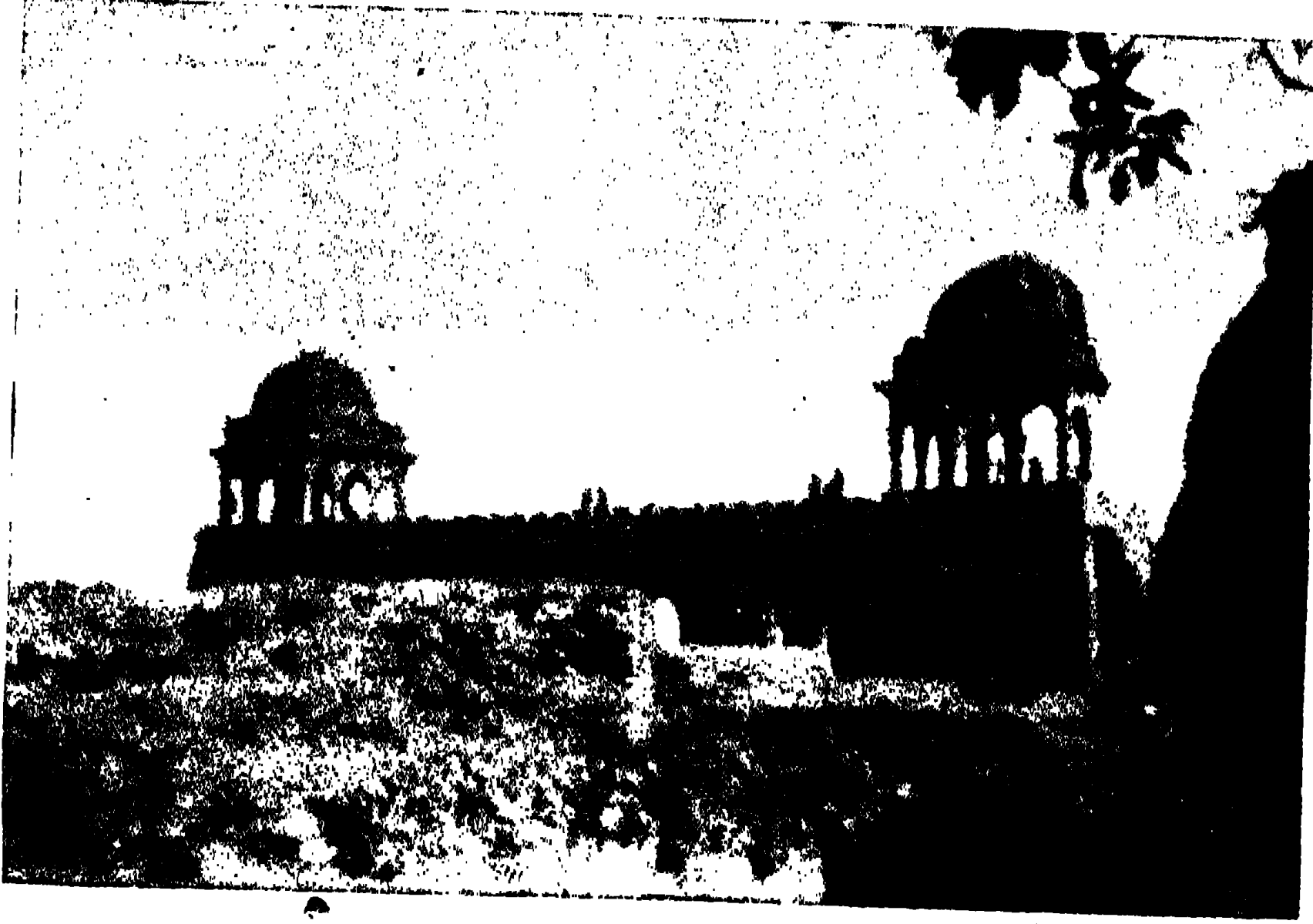
রূপমতীর প্রাসাদ

রূপমতীর প্রাসাদের নিম্নতল
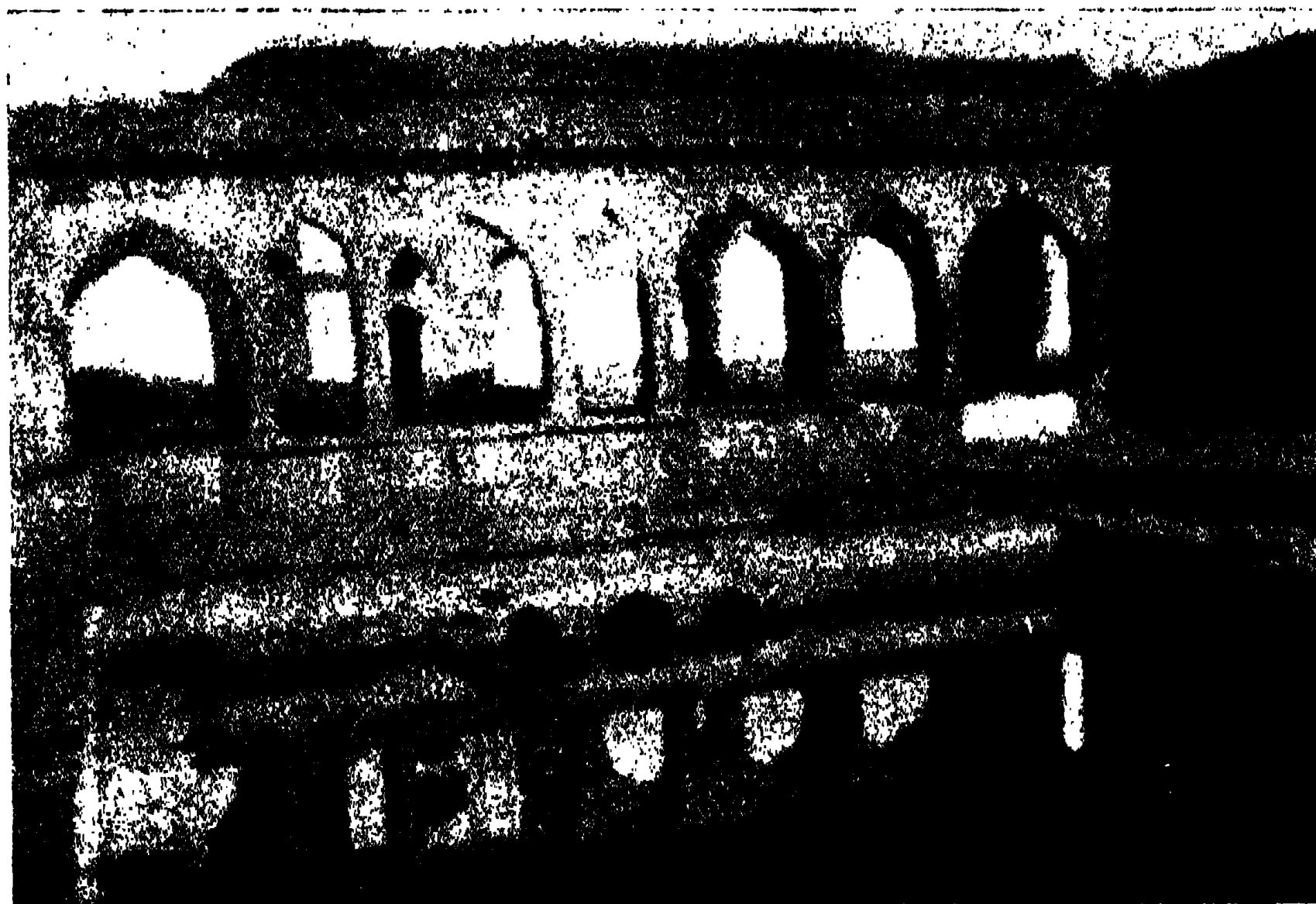
বাজ বাহাদুরের প্রাসাদের অন্তঃপুর

একটি ভগ্ন তোরণের মধ্য দিয়া জাহাজ মহল

গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'মাণ্ডু' নামক ভ্রমণ বিষয়ক প্রবন্ধে ভুলক্রমে চিত্রগুলি সন্নিবেশিত করা হয় নাই। উক্ত প্রবন্ধের বিষয়-বস্তুর ক্রম-অনুযায়ী আমরা সেই চিত্রগুলি উপরে প্রকাশিত করিলাম। বিঃ সঃ

নিভৃত-সাধনা

এস, শামছুল্ হুদা

ওগো আমার একাই ভালো
বিজন বনের আঙিনায়,
যদি তুমি না দাও ধরা
বাহু-লতার বাঁধন-ছায়।
আকাশ ভরা চঞ্চলতা
রাখ্‌বে ঢে'কে মুখের কথা ;
মন্দ লোকের সঙ্গ চেয়ে
সেই যে ভালো জীবন-নাথ ;
তোমার ভাবে বিভোর হ'য়ে
কাট্‌বে আমার দুখের রাত।

জীবন-প্রদীপ জ্বালি' তোমার
চিরন্তনী রূপ-শিখায়,
সাজ্‌বো তোমার পূজার থালা
মনের গোপন দেউল-ছায়।

সেই নিভৃতে তোমার খেলা
সেইখানে দ্বার হ'বে মেলা,
সেই নিভৃতে তোমার আসন
হে মোর দীপ্ত হৃদয়-রাজ ;
সেইখানেতেই তোমার সাধন
কর্‌বো আমি সকাল সাঁজ।

ছাড়্‌তে যারা চায় তোমারে
ছাড়ুক্ তারা হে রাজন ;
সঙ্গোপনে দিল্-মহলে
থাক্‌বে সোনার সিংহাসন।
সেথায় তুমি নিত্য এসে
বস্‌বে হে নাথ মোহন বেশে ;
চিত্তে আমার জাগবে হে'সে
তোমার নৃত্য-কল্লরোল,
ঘুচ্‌বে আমার সকল ব্যথা
দুল্‌বে পরাণ দোদুল্ দোল।

তোমায় ল'য়ে ঝর্ণাতীরে
বাঁধ্‌বো নতুন খেলার ঘর,
ঝাউয়ের এলোচুলের গুচ্ছ
ঢুলায় যেথা ধীর চামর।
চোখের ভাষায় তোমার সনে
কইবো কথা মনে মনে,
মুঞ্জরিত কুঞ্জবনে
তোমার লাগি' গাঁথ্‌বো হার,
ছন্দে মেতে' গন্ধ-গীতে
রচ্‌বো প্রাণের পুষ্পাধার।

সেইতো প্রিয় স্বপ্ন আমার
সে-ই জীবনের কল্পলোক,
নেই যেখানে রেষারেষি
নেই যেখানে দুঃখ শোক!
প্রেম ও প্রীতির সহজ ডোরে
যেথায় বাঁধা পরস্পরে,
বিহগ যেথা লতার ঘরে
গে'য়ে বেড়ায় ফুলের গান,
সবুজ মায়া-তৃণের চোখে
সেই যে স্বরগ মূর্ত্তিমান!

যেথা তোমার গোপন বাণী
আলোর পথে উপ্‌চে' যায়,
মর্ম্ম আমার বারে বারে
লুটায় সেথা তোমার পায়।
বিশ্বে তোমার যোগ যেখানে
সেখানে যোগ আমার সনে,
নদী যেথা কলতানে
বন্দে তোমায় জীবন-ধন;
সেইখানেতেই চিত্ত আমার
নন্দে তোমায় সর্ব্বখন।

সবার সাথে আমার মাঝে
থাক্‌বে তুমি রাত্রি-দিন,
সবার প্রেমে মর্ম্মে আমার
বাজ্‌বে তোমার প্রেমের বীণ্‌।
নিত্য তোমার অভিসারে
চল্‌বো নিশীথ অন্ধকারে,
সেইখানে লুট্‌ হচ্ছে তোমার
যবনিকার অন্তরাল,
সেই নিভৃতে রইবো বেঁচে
তোমার ধ্যানে খোশ-বেহাল!

এস শামছুল্ হুদা

ছায়াপট

বাণীনাথ

সাপুড়ে ঃ—

কাহিনী—নজরুল ইসলাম

পরিচালক—দেবকী বসু

আলোক চিত্রশিল্পী—ইউসুফ মূলজী

শব্দধর—অতুল চ্যাটার্জ্জি

সুরশিল্পী—রাইচাঁদ বড়াল

প্রধান পাত্রপাত্রী ঃ—

জহর—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

ঝুমরো—পাহাড়ী সান্যাল

বিশুন—রতীন বন্দোপাধ্যায়

ঘণ্টা বুড়ো—কৃষ্ণচন্দ্র দে

চন্দন—কানন

মৌটুসী—মেনকা
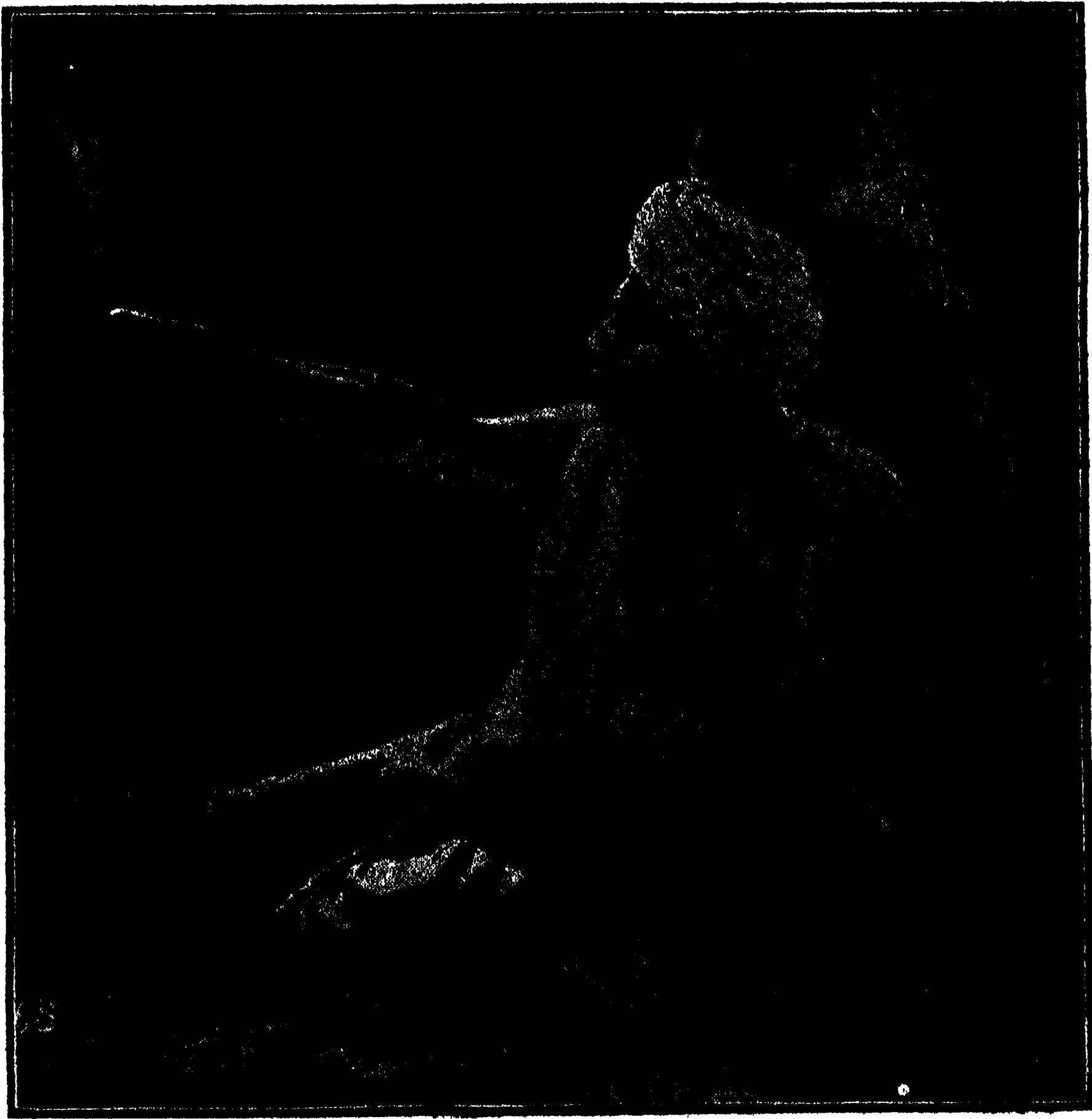
সাপুড়ে চিত্রে জহরের ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

সাপুড়ে চিত্রে একটি দৃশ্যে ঝুমরো (পাহাড়ী সান্যাল) ও চন্দন (কানন)

নিউ থিয়েটার্সের নূতন বাংলা চিত্র 'সাপুড়ে' কিছুদিন পূর্ব্বে চিত্রা ও নিউ সিনেমায় মুক্তিলাভ করেছে। ময়মনসিংহ গীতিকা পুস্তক অবলম্বনে নজরুল ইসলাম ইহার কাহিনী রচনা করেছেন এবং পরিচালক দেবকী বসুর পরিচালনায় 'সাপুড়ে' রূপালি পর্দায় রূপ নিয়েছে।

কানন, মেনকা, মনোরঞ্জন, রতীন, অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রভৃতি বহু নামজাদা অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সমাবেশ হ'য়েছে এই ছবিতে কিন্তু সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে ছবিখানি দর্শকদের বিশুদ্ধ আনন্দ দানে বঞ্চিত করেছে। ভেবেছিলুম, মধুর সঙ্গীত, অপরূপ অভিনয়, সুন্দর দৃশ্যপটাদি এই ছবির হ'বে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ, কিন্তু গল্পের মাল মসলা ও পরিচালনার দোষে সাপুড়ে নির্জ্জীব, প্রাণহীন, অস্পষ্ট, একঘেয়ে ছবি হ'য়েছে। পরিচালকের হাতে লেখা গল্প নয় ব'লেই সাপুড়ে ছবিতে চিত্রণোপযোগী কাহিনী ছিল কিন্তু এক শ্রেণীর দর্শকের মনোতুষ্টির প্রয়াসে পরিচালক দেবকী বসু সত্য সুন্দর আর্টকে আঘাত দিয়েছেন। বোধহয়, নামজাদা অভিনেতা ও অভিনেত্রী, বহু সুপার আর্টিষ্ট এবং বিষধর সাপ নাচাইতে গিয়া তিনি একটু বেসামাল হ'য়ে পড়েছেন; যদিও চন্দনের বেশে কাননের অপরূপ অভিনয় ছবিখানিকে চিত্তাকর্ষক করবার চেষ্টা করেছিল।

এখন ছবির গল্পের কথা বলি।

সাপুড়েদের সর্দ্দার জহর নিরানব্বুই বার নিজের দেহে সর্প দংশন করিয়ে অবলীলাক্রমে বিষমুক্ত হয়েছে। আরেকটি সাপের বিষ হজম করতে পারলেই সে সর্প মন্ত্রে সিদ্ধকাম হয়। এই সাধনার পথে স্ত্রীলোক পরম অন্তরায়। কিন্তু জহরের সাধনার পথে বিঘ্ন হয়ে দেখা দিল তারই পালিত পুরুষবেশী সুন্দরী চন্দন। চন্দনকে এই পুরুষ পোষাকে নিজের দীপ্ত যৌবনকে লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল নইলে দলের লোক জানতে পারলে তাকে এদের মায়া ছেড়ে বিদায় নিতে হতো। চন্দন ছাড়া জহরের সত্যিকার শত্রু ছিল বিশুন ও ঘণ্টা বুড়ো। তারা চায় জহরের নিপাত। চন্দনের দীপ্ত যৌবন জহরের মনে কামনা জাগায়। কিন্তু চন্দন ভালবাসত জহরের সাগরেদ সুদর্শন ঝুমরোকে তারা পালিয়ে গেল কিন্তু তাদের সুখস্বপ্ন খুব অল্পক্ষণই স্থায়ী হয়েছিল। ক্রুদ্ধ জহরের মন্ত্রমুগ্ধ সর্প ঝুমরোকে দংশন করে। চন্দনের মিনতিপূর্ণ অশ্রুতে জহরের মনে হয়ত করুণার উদ্রেক হয়েছিল, তাই সেই সর্পের বিষ নিজে হজম করে এদের সুখের জন্য প্রাণ দিলে।

গল্পের দিক দিয়ে অভিনবত্ব ছিল। যাদের আমরা ভুলতে চলেছিলাম সেই যাযাবর বেদের সুন্দর জীবনের প্রীতি, ভালবাসা, দ্বেষ, হিংসা হয়ত আমাদের প্রাণকে অভিভূত করে দিত। পরিচালক দেবকী বসু চিত্রনাট্যের

সাপুড়ে চিত্রে যথাক্রমে পাহাড়ী সান্যাল ও কানন

সাপুড়ে চিত্রে কানন, মনোরঞ্জন ও পাহাড়ী

দোষে ও নিপুণ পরিচালনার অভাবে 'সাপুড়ে'কে সজীব ও প্রাণবন্ত করেন নি। প্রথম হ'তে শেষ পর্য্যন্ত ছবির একটা সাবলীল গতির সন্ধান পাই না।

ছবির গোড়ার দিকটা বেশ মনোরম। বেদেনীদের নৃত্য ও গীত যখন আমাদের প্রলুব্ধ করেছিল সেই মুহূর্ত্তে হঠাৎ দিলখোলার দলের এমন হট্টগোল ও চীৎকার সুরু হ'লো যে দিশেহারা হতে হয়। মৌটুসীর ভূমিকায় মেনকার ন্যাকামি হয়ত সহ্য করা যায় কিন্তু মণিবর্দ্ধনের নেতৃত্বে একদল সুপার আর্টিষ্টদের যখন তখন লম্ফঝম্প অতি সাধারণ ওরিয়েণ্টাল নৃত্যকে লজ্জা দিয়েছে। বেদেদের নৃত্য ও সঙ্গীতে কত যে মাধুর্য্য থাকতে পারে তার পরিচয় সাপুড়ে ছবিতে পাইনা। ছবির শেষ দৃশ্যে জহর অর্থাৎ মনোরঞ্জনের নিকৃষ্ট অভিনয়ে সমস্ত দৃশ্যটি মাটী হয়ে গেছে। এরজন্যে পরিচালকও সমান দোষে দোষী। ঐ একটি দৃশ্য হয়ত "সাপুড়েকে" জীবন্ত ক'রে তুলত কিন্তু অভিনয় ও সূক্ষ্ম কলা-জ্ঞানের অভাবে আমাদের অন্তরকে একটুও স্পর্শ করেনি।

সু-অভিনয়ের দিক দিয়ে কাননের 'চন্দন' সবচেয়ে প্রশংসনীয় হয়েছে। সাপুড়ে চিত্রে বহু নির্জ্জীব অংশ শুধু কাননের চমৎকার অভিনয় গুণে উল্লেখযোগ্য হয়েছে। কাননের গানগুলি তেমন প্রথম শ্রেণীর হয়নি। কাননকে চন্দনের ভূমিকায় ছেলে সাজান দৃশ্যটা একটু হাস্যকর হয়েছে। ঘণ্টা বুড়োর চরিত্রটি একটু দুর্ব্বোধ্য হলেও কৃষ্ণ-চন্দ্র দের স্বাভাবিক অভিনয় প্রশংসনীয়। ভেড়ুয়া ঝুমরোর ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যালকে ঠিক মানিয়েছিল—অভিনয়ও মন্দ নয়। মৌটুসী বেশে মেনকার ন্যাকামি অসহ্য আর তেঁতুলে ও ভট্টের ভূমিকায় শ্যাম সাহা ও অহী সান্যালের ছ্যাবলামি উল্লেখযোগ্য। বিশুন অর্থাৎ রতীন বন্দোপাধ্যায় ছবির দিক দিয়ে ততখানি সুযোগ পাননি নিজের অভিনয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে। সত্য মুখার্জ্জি ও প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে ঝণ্টু ও বুড়ো সর্দ্দার হিসেবে মন্দ করেন-নি। ছবির প্রধান নায়ক হিসেবে মনোরঞ্জন অভিনয়-ভাব প্রকাশে পূর্ণ কৃতকার্য্য না হওয়ায় সকলকে হতাশ করে-ছেন। এই চরিত্রটি ছবির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা এবং অভিনয় কৌশল দেখাবার যথেষ্ট আবশ্যকও ছিল।

ছবির সুর-সংযোজনা বিশেষ চিত্তাকর্ষক নয় তবে গান-গুলির রচনা ও সুর ভালো।

ছবির শব্দধর অতুল চ্যাটার্জ্জি ও আলোকশিল্পী ইউসুফ মুলজীর কাজ বেশ উল্লেখযোগ্য। সম্পাদনা মন্দ নয়।

ষ্টুডিয়ো-সংবাদ :—

রাধা ফিল্ম কোম্পানি

নর-নারায়ণ—জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জির পরিচালনায় রাধা ফিল্ম কোম্পানির নবতম আকর্ষণ "নর-নারায়ণ" ৩০শে জুন রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করবে। সুন্দর পৌরাণিক চিত্র নির্ম্মাণ করে রাধা ফিল্ম কোম্পানি দর্শকদের সমাদর লাভ করেছেন। "শ্রীগৌরাঙ্গ', 'দক্ষ-যজ্ঞ', 'জনক-নন্দিনী', 'প্রভাস-মিলনে"'র নির্মাতা রাধার নূতন পৌরাণিক ছবি 'নর-নারায়ণে' বহু নামজাদা নট-নটীর মিলন ঘটেছে।

অহীন্দ্র চৌধুরী, ভূমেন রায়, রবি রায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, জহর গাঙ্গুলি, শীলা হালদার, রেণুকা রায়, রাণীবালা প্রভৃতি অবতীর্ণ হয়েছেন ছবির কাহিনী লিখেছেন মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। "স্যমন্তক মণির উপাখ্যান" এই ছবির প্রধান ঘটনা এবং সুন্দর সঙ্গীত, প্রশংসনীয় অভিনয়, মনোরম দৃশ্যপটাদি নর-নারায়ণ চিত্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

কালি ফিল্মস্ লিমিটেড

চাণক্য—বাঙ্গালি প্রতিষ্ঠান কালি ফিল্মস্ লিমিটেড আবার পূর্ণোদ্যমে ফিল্ম প্রস্তুত কাজে নেবেছেন; এ সুখবর সন্দেহ নাই। শিশির ভাদুড়ীর পরিচালনায় এঁদের চাণক্য ছবির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এলো এবং শীঘ্রই উত্তরা চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। ৺ডি, এল, রায়ের চন্দ্রগুপ্ত নাটককে আশ্রয় করে শিশির ভাদুড়ী 'চাণক্যে'র চিত্রনাট্য লিখেছেন। এই ছবির প্রধান নায়ক হচ্ছেন চাণক্য এবং যদিও চন্দ্রগুপ্ত নাটকের বহু ঘটনা এই ছবিতে স্থান

পেয়েছে তবুও শিশির ভাদুড়ীর "চাণক্য" একেবারে সম্পূর্ণ নূতনভাবে রূপালি পর্দ্দায় রূপ নেবে। চাণক্য ছবিতে রঙ্গালয় ও শিশির সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের দেখতে পাব।

শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, জহর গাঙ্গুলী, রতীন বন্দোপাধ্যায়, কঙ্কাবতী, বীণা প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় নেবেছেন।

শর্ম্মিষ্ঠা—নরেশ মিত্রের পরিচালনায় শর্ম্মিষ্ঠার কাজ দ্রুত চলেছে এবং ছবিখানি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে "শ্রী" সিনেমায়। কচ ও দেবযানীর উপাখ্যান সকলের নিকটই পরিচিত। সুষ্ঠু অভিনয়, নৃত্য, গীত, মনোরম দৃশ্যপটাদি এই ছবির প্রধান আকর্ষণ বস্তু। অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলি, রাণীবালা, বীণা প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় নেবেছেন। শর্ম্মিষ্ঠার কাহিনী লিখেছেন মনোজ বসু।

ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

রিক্তা—সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় ইঁহাদের নূতন বাংলা চিত্র "রিক্তা"র কাজ শেষ হয়েছে। এখন ছবির সম্পাদনার কাজ দ্রুত চলেছে এবং শীঘ্রই রূপবাণীতে মুক্তি-লাভ করবে। ছবির প্রধান নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন ছায়া-জগতের দুই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী—অহীন্দ্র চৌধুরী ও ছায়া দেবী। অন্যান্য ভূমিকায় রূপ দেবেন রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রমলা দেবী, তুলসী লাহিড়ী, সুশীল মজুমদার, সন্তোষ সিংহ, মোহন ঘোষাল প্রভৃতি। বিকাশের (অহীন্দ্র চৌধুরী) স্ত্রী করুণা ভাগ্য বিপর্য্যয়ের ফলে গৃহত্যাগ করে হঠাৎ একদিন কাঠ-গড়ায় হত্যাপরাধি আসামীবেশে দাঁড়িয়েছিল। করুণার পক্ষে তরুণ ব্যারিষ্টার যে তারই একমাত্র ছেলে সে রহস্য তার কাছে অজানা ছিল। এই দুঃখময় রোমান্টিক ছবি-খানির কাহিনী ও পরিচালনা বেশ উল্লেখযোগ্য হবে, আশা করা যায়।

ফিল্ম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার আগামী আকর্ষণ 'রিক্তা' চিত্রে রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছায়া দেবী

রমলা দেবী

ফিল্ম কর্পোরেশনের 'রিক্তা' ও দি রাইজ ছবিতে (হিন্দি) ইহাকে দেখা যাইবে

মতিমহল থিয়েটার্স

দেবযানী—এঁদের পৌরাণিক ছবির কাজ বেশ চলেছে। কালি ফিল্মস্ ও মতিমহল এই দুই চিত্র প্রতিষ্ঠান হতে দেবযানী বা শর্ম্মিষ্ঠা প্রস্তুত হওয়ায় বেশ চাঞ্চল্য হয়েছে। বাংলা চিত্র জগতে এমন প্রতিযোগিতা খুব অল্পই ঘটেছে। কালি ফিল্মসের শর্ম্মিষ্ঠা আগে মুক্তিলাভ করবে, তবে মতিমহলও অজস্র অর্থ ব্যয়ে ফণী বর্ম্মার পরিচালনায় দেবযানী ছবিখানি তুলছেন। নামজাদা নট-নটী ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা দেবেন, যেমন দেবযানী—ছায়া দেবী, কচ—কালিদাস মুখার্জ্জি, বৃহস্পতি—বিভূতি

গাঙ্গুলি, বৃষপর্ব্বা—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, শুক্রাচার্য্য—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ইন্দ্র—মোহন ঘোষাল, শর্ম্মিষ্ঠা—মীরা দত্ত, কজ্জলা—রাধারাণী প্রভৃতি।

ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

পরশমণি—শ্রীভারতলক্ষ্মীর নূতন সামাজিক ছবির কাজ প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় বহুদিন হল শেষ হয়েছে এখন ছবিখানি শীঘ্রই এক বিশিষ্ট চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে।

দেবদত্ত ফিল্মস্

রুক্মিণী—দেবদত্ত শীলের তত্ত্বাবধানে ইহাদের বাংলা ও হিন্দি সংস্করণের ছবির কাজ বেশ দ্রুত চলেছে।

বহু অর্থ ব্যয়ে ছবিখানি প্রস্তুত হচ্ছে এবং পান্না দেবী, প্রতিমা দাসগুপ্তা, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, রাধিকানন্দ, জহর গাঙ্গুলি, নিম্মলকার, মুজামিল, নন্দকিশোর, পূর্ণ চৌধুরী, বেচু সিংহ প্রভৃতি অভিনয় করছেন। হিন্দি রুক্মিণীর পরিচালনার ভার গ্রহণ করছেন ভোলা আঢ্য, আর বাংলা ছবি পরিচালনা করছেন জ্যোতিষ বান্যার্জ্জি। দেবদত্তের আরেকটি হাস্যকৌতুক ছবি 'পথ ভুলে' ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তোলা হচ্ছে। মিস্ প্রতিমা দাসগুপ্তা, ডি জি, সত্য মুখার্জ্জি, ভুমেন রায়, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পান্না দেবী, সুলেখা চ্যাটার্জ্জি প্রভৃতি অভিনয় করছেন।

নিউ থিয়েটার্স

রজত জয়ন্তী—মাত্র এই মাসের মধ্যে এই হাস্যকৌতুক ছবিখানি প্রস্তুত করে প্রমথেশ বড়ুয়া কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছবিখানি আগাগোড়া হাসির এবং বিভিন্ন ভূমিকায় বড়ুয়া, মেনকা, মলিনা, শৈলেন চৌধুরী, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, দীনেশ দাস, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। এত দিন দেবদাস, মুক্তি, অধিকার, গৃহদাহ প্রভৃতি ছবিতে প্রমথেশ বড়ুয়া প্রধান চরিত্রে নেবে দুঃখময় বিষাদ চরিত্রগুলির মাধুর্য্য ফুটিয়ে সকলের অন্তরকে স্পর্শ করেছেন, এবার সেই আঘাতের বদলে তিনি আমাদের পূর্ণ কৌতুকে শুধু আনন্দ দেবেন। মানুষ প্রেমে পড়লে সত্যই যে পাগল হয় তার হয়ত একটু নমুনা এই রজত (প্রমথেশ বড়ুয়া) চরিত্রে পাব। রজত সুন্দরী জয়ন্তীকে (মেনকা) ভালবাসার প্রমাণ দিতে গিয়ে রজত হয়েছে সকলের কাছে হাস্যাস্পদ। আমরা প্রমথেশ বড়ুয়ার দুঃখে সমদুঃখী।

জীবন-মরন—নীতীন বসুর নূতন বাংলা ছবির নামকরণ হয়েছে 'জীবন-মরণ'। এখানি হিন্দি 'দুষমনের' বাংলা সংস্করণ। দুষমণ হতে আলোচ্য ছবির শেষের দিকে পরিচালক কিছু অদল বদল করেছেন। ডাঃ বিজয় অর্থাৎ ভানু বন্দোপাধ্যায় খুব সৌভাগ্যবান। এখন ইনি গীতা দেবী অর্থাৎ মিস্ লীলা দেশাইয়ের হাতে সুমিষ্ট চা পানে বিভোর। আমাদের দুঃখ হচ্ছে রেডিয়োর গায়ক গীতার প্রেমিক মোহন অর্থাৎ সায়গলের জন্য। অন্যান্য ভূমিকায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মনোরমা, দেববালা প্রভৃতি অভিনয় করবেন।

জয় পরাজয়—হেমচন্দ্রের নূতন ছবির কাজ আরম্ভ হয়েছে, ছবির নামকরণ হয়নি তবে আপাততঃ জয় পরাজয় বলে চালিয়ে নিচ্ছে। ছবির প্রধান নায়ক ও নায়িকা হচ্ছেন ভানু ব্যানার্জ্জি ও কানন। অন্যান্য ভূমিকায় দেখা দেবেন মনোরমা, অমর মল্লিক, শৈলেন চৌধুরী, ইন্দু মুখার্জ্জি প্রভৃতি।

বাণীনাথ

পূরবী

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

দেওদার বনে সন্ধ্যা নামিছে রক্তরাগে,
এখানে আঁধার, ওখানে সোণার আলো ;—
স্তিমিত আমার আঁখির তারকা হয়েছে ম্লান,
আলো র'বে দূরে, আঁধার শিয়রে— লাগেনা ভালো !

ভরা দুপুরের দৃপ্ত সূর্য্য হলো করুণ,
দিনের চিকণ সবুজ পাতারা লুকালো কোথা ;
যে-আলো নিবিছে সে কি আর কভু আসিবে ফিরি',
ওই পশ্চিম আকাশের বুকে কিসের ব্যথা ?

দিগন্ত পারে ওখানেতে কোন্ অজানা সাগর,
ক্লান্ত সবিতা ডুবিল সেখানে কিসের আশে ?
মৃত্যুনিবিড় ঘনালো আঁধার চতুর্দ্দিকে—
অচেনা জগতে প্রাণ মোর ভরি উঠিছে ত্রাসে।

ধরার যে-রবি ডুবিল আজিকে ধূসর সাঁঝে
কাল সে তুলিয়া আনিবে আবার উজল দিন ;
পাখীরা জাগিবে, গাহিবে আবার, মাতিবে বন,
দেওদারশ্রেণী দেখা দেবে রূপে নব-নবীন !

আমার যে-আলো নিবিল বেদনা-হতাশ্বাসে,
যে-গভীর নিশি আনিল সন্ধ্যা অকালে ডাকি ;
সে-আলো হাসিবে ? সে-আঁধার রাতি পোহাবে কবে ?
মূক মহাকাশে শ্রান্ত দৃষ্টি রয়েছি চাহি !

গ্লানি মোচন

শ্রীসুখরঞ্জন রায়

তখন স্বদেশী যুগ। প্রণতি বি, এ পাশ ক'রে বিয়ের দরজা দিয়ে সংসারে প্রবেশ না করে' স্বদেশের সেবাব্রত নিয়ে বসল। বাধা দিবার মতও বড় একটা কেউ ছিল না। একমাত্র দাদা। তিনিও বাধা সৃষ্টি করার চেয়ে ইন্ধনই যোগাতেন বেশী। প্রণতি পাড়ার মেয়েদের নিয়ে সমিতি করল, পত্রিকা ছাপাল, শেষে মেয়েদের নিজ হাতে গড়ে তুল্‌বার জন্য, গড়পারে এক আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করবার খেয়াল তাকে পেয়ে বস্‌ল। দিন নেই রাত নেই আরম্ভ হ'লো দ্বারে দ্বারে চাঁদার জন্য ভিক্ষা ক'রে বেড়ানো।

দু'মাস অক্লান্ত পরিশ্রমের পর শ্যামবাজারের বিশিষ্ট কয়েকজন ধনীর বাড়ীতে তাঁদের প্রতিশ্রুতি মত তাগাদা চালিয়ে হতাশ হ'য়ে বাড়ী ফিরে এসে চাঁদার খাতাপত্র মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে সে সঙ্গিনীকে বল্‌ল—"না, এ পোড়া দেশে চাঁদার টাকায় আদর্শ বিদ্যালয় গড়ে' তোলার চেষ্টা বৃথা। যেদিন করব নিজের টাকাতেই করব। চাকরী করে' টাকা জমাব। তুইও একটা চাকরী নিয়ে ফেল্‌, রমা।" কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল প্রণতির মতে মোটেই আদর্শ নয় এমন একটি বালিকা বিদ্যালয়ে মাষ্টারি নিয়ে রোজ দশটায় রাজাবাজারে সে ট্রাম ধরতে সুরু করেছে।

দাদা বীরেন্দ্রকুমারও কিছুদিন খুব সভাসমিতি করেছে, পুলিশ ঠেঙ্গিয়েছে, জেল খেটেছে। একদিন সে এক চিঠি হাতে নিয়ে এসে বল্লে—"লক্ষ্ণৌয়ে প্রফেসারি পেয়ে গেছি দু' শ' টাকায়—তুইও চল্‌, পনু!"

প্রণতি বল্লে—"আমার আদর্শ বিদ্যালয়?"

বীরেন্দ্র বলে উঠল—"তা' সেখানেই স্থাপন করবার চেষ্টা করা যাবে—দু'জনের রোজগারে। তোরও একটা চাকরী জুটিয়ে নেওয়া যাবে।"

"না! লক্ষ্ণৌয়ের কথা পড়েছি শুধু জিওগ্রাফিতে, কিন্তু গড়পারের সঙ্গে আমার রক্তের যোগ।"

প্রণতি বেশী কথা কয় না। বন্দোবস্ত ক'রে প্রণতিকে কলিকাতাতেই রেখে যেতে হলো।

তারপর এক বৎসর কেটে গেছে। প্রণতি এখন নিউ গার্‌ল্‌স্‌ একাডেমীর মিস বোস। ভাইয়ে বোনে আদর্শ বিদ্যালয়ের জন্যে টাকা কতদূর সঞ্চয় করেছে জানি না, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই বোঝা গেল তার শূন্য মন যেন আর কিছুতেই ভরে উঠছে না। তার মনের কোন্‌ অতলে সে ডুব মেরেছে, সেখানে তার সঙ্গিনীরাও বড় একটা নাগাল পাচ্ছে না। নানা জনহিতকর কাজে বহু যুবকের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছে, কিন্তু সে বন্ধুত্বে কোথাও রঙ ধরেনি। কিছুদিন ধরে' তার শুধুই মনে হচ্ছে কলিকাতার জনসমুদ্রের কল কোলাহলে পরিবৃত হ'য়ে সে যেন এক নিঃসঙ্গ দ্বীপে একাকী বাস করছে, তার ঢেউ এসে চার দিক হ'তে গায়ে ভেসে পড়ছে কিন্তু তার সুগভীর মর্ম্মস্থলকে কিছুতেই ছুঁতে পারছে না। জনারণ্যের মধ্যে এমন ভীষণ নির্জ্জনতা আর কেউ ভোগ করেনি।

সেই সময় সুদীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটি এসে উপস্থিত, প্রণতি ভাব্‌লে কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুল্‌তে হবে—তার মনের নির্জ্জনতার বিষদাঁত ভাঙ্‌তে হ'বে বাইরের নির্জ্জনতা দিয়েই। কিন্তু ভিতরে যে বিরাট নির্জ্জনতা বিরাজ করছে তাকে দূর করতে বাইরের অনুরূপ নির্জ্জনতার দরকার, তার চাই বাইরেরও বিরাট নির্জ্জনতা সাগরের কিম্বা পাহাড়ের। পুরীর দিকে তার মন ঝুঁকে পড়্‌ল। সেই দিকে একটু সুবিধাও ছিল।

প্রণতিদের ভূতপূর্ব্ব প্রতিবেশী বিনোদবাবুরা সেখানে আছেন। বিনোদবাবু সেখানে কি একটা কাজ নিয়ে

আছেন। বীরেনের সঙ্গে তাঁর আগে চিঠিপত্র ব্যবহারও ছিল, বহু দিন তাঁদের খোঁজ খবর নেওয়া হয় নি। কিন্তু বিনোদের কাছে চিঠি লিখ্‌তে প্রণতির কেমন সঙ্কোচ বোধ হ'তে লাগল। লক্ষ্ণৌয়ে বীরেনের কাছে চিঠি গেল। তার উত্তর এল—"রাস্কেল্‌টা পুরীতে পুলিশের কাজ নিয়েছে। উড়িষ্যা সরকারে কি করে কাজ বাগালে জানি না। জানিস্ তো পুলিশ আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। বিনোদ লিখেছে তাদের বাড়ীতেই গিয়ে প্রথম উঠতে। কিন্তু সে কিছুতেই হ'তে পারে না! সমুদ্র পারে বাড়ী ঠিক করতে লিখে দিলাম। আমার ছুটি হলে আমিও তোর সঙ্গে যোগ দেব। কিন্তু খবরদার! বাড়ী ভাড়া করা পর্য্যন্তই! ওর সঙ্গে আর কোনো যোগ রাখিস্ না।"

পুরীতে সমুদ্র তীরে "নীলিমা কুটীর" ভাড়া করা হয়েছে খবর এল। ছুটি হ'তে না হ'তেই জিনিষপত্র বেঁধে ছেঁদে প্রণতি পুরী এসে উপস্থিত। বিনোদ মালতী নামে একটী বাঙালী ঝি ঠিক করে রেখেছে। তারপর তাদের বাজার সরকার মাখনকে রাত দিন খোঁজ খবর নিতে এবং বাজার করতে বলে গিয়েছে। সে নিজে জরুরি সরকারী কাজে তিন চার দিন যাবৎ মফঃস্বলে গেছে।

প্রণতি একা একা এই পুরী সহরে এবং সমুদ্রতীরে ভ্রমণ আরম্ভ করে দিয়েছে। মাখন বল্লে—"আমি সঙ্গে যাই।" প্রণতি প্রবল ভাবে হাত নেড়ে নিষেধ জানিয়ে বল্লে—"না, আমি একাই বেড়াতে চাই। কল্‌কাতার ট্রাম, মটর ও জনতার হিড়িকেও অভ্যেস আছে। আর এতো পুরী! বাস্তবিক! কাউকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যেতে হবে এ শুনে তার হাসিই পায়!

মন্দির ও কুণ্ডগুলো হেঁটে হেঁটে দেখা হয়ে গেল। ধর্ম্ম করবার জন্য নয়। সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখবার অন্তরের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের তাগিদে জগন্নাথ মন্দির গাত্রের বীভৎস চিত্রগুলোও তার দৃষ্টি এড়ালো না। কিন্তু সে এসেছে বিশেষ করে সমুদ্রের সঙ্গে তার অন্তরকে মুখোমুখি করবার জন্যেই, ফাঁক পেলেই সে বাড়ী হ'তে সমুদ্রের বালুকাময় তীরে বেরিয়ে পড়ে, বালি হ'তে চিত্রবিচিত্র ঝিনুকের খোলা কুড়োয়. সন্ধ্যার পর ফেনাঙ্কিত ঢেউয়ের চুড়ায় চূড়ায় ফস্‌ফরাসের যে আলো ঝলসে উঠে তাই ধরে এনে আংটীতে পাথরের মত করে রাখবার বিফল চেষ্টা করে, অতি প্রত্যূষে কভু বা সমুদ্রের উপর সূর্য্যোদয়ের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে, তারপর ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাতালোকের মধ্যে সমুদ্রের নৃত্য তার মনের অতল স্পর্শতায় ডুবে যায়।

এমনি ভাবে কয়েক দিন গেল। কিন্তু বাধা পড়ল।

একদিন বিকেলের দিকে সে দ্রুত ফিরে এসে বাড়ীর সদর দরজা সশব্দে লাগিয়ে দিয়ে হন্ হন্ করে উপরে চলে গিয়ে ডাকলে—"মালতী, মালতী।"

নীচ থেকে উত্তর এল—"এই তো যাচ্ছি, মা।"

হাতের কাজ সেরে মালতীর উপরে আস্‌তে একটু দেরী হ'লো। ততক্ষণে প্রণতির উত্তেজনা অনেকটা কমে এসেছে।

মালতীর পড়তি বয়স। মোটা কদাকার চেহারা। সিঁড়ী ভেঙ্গে উপরে উঠে হাঁপাতে লাগ্‌লো।

"ডেকেছিলে, মা!"

"হাঁ, ডেকেছিলাম। তোমাদের এ-দেশটা কি মগের মুল্লুক! ভদ্র মেয়েরা কি রাস্তায় বেরোতে পারবে না?"

"কেন, কি হয়েছে, মা? আমি তো রোজ রাস্তায় বেরোই।"

'পুলিশের বন্দোবস্ত এখানে কি রকম তাই ভাবি, পথে একটা পুলিশ দেখলুম না।"

"পুলিশ! ক'জন চাও বল। আমি মুখ থেকে কথা বের করেছি কি দৌড়ে পাঁচ সাতটা এসে পড়েছে। কি হয়েছে বল।"

"ভদ্র মেয়েদের যদি এমন দৃষ্টি দিয়ে গিল্‌তে থাকে তো বেরোই কি করে!"

"দৃষ্টি দিয়ে গিলতে থাকে! এ্যাঁ! বল কি! আমাকে দৃষ্টি দিয়ে গেল্‌বার সাহসটা কেউ করুক-দেখি একবার। ঝাঁটার শলায় চোখ গেলে দেব না! কুড়ি বছর এখানে আছি। এ সাহস তো কেউ করেনি এ পর্য্যন্ত।"

তার ভঙ্গী ও চেহারা দেখে এই অবস্থায়ও প্রণতির হাসি পেল। দৃষ্টি দিয়ে গেলবার মত চেহারাটাই তার বটে!

নীচে সদর দরজায় কড়া নড়ে উঠলো। মালতী নীচে নেমে দরজা খুলে দিল, তার শব্দ শোনা গেল। প্রণতি ভাব্‌তে লাগল তার কাছে কে আসতে পারে। একটু পরেই সিঁড়ি দিয়ে কয়েক পা উঠে মালতী হেঁকে বল্লে—"বিনোদ বাবু এসেছেন, মা, বৈঠকখানায় বসিয়েছি।"

কারো আগমনের সংবাদে এমন আরাম প্রণতি জীবনে কখনো পায় নি। একে তো বিদেশ। দাদাও আস্‌ছে না। বিনোদ বাবুই এখানে একমাত্র পরিচিত এবং নির্ভর। উপস্থিত বিপদে তাঁর কাছে ছাড়া উপদেশই বা চাইবে কার কাছে। আর ব্যাপারটাকে সে সত্যিকার বিপদ বলেই ভাবছে। প্রকাশ্যে বলল "নীচে বসিয়েছ কেন? নিয়ে এস উপরে।" বলে চিন্তা করতে লাগলো—কে জানে কেমন দেখতে হয়েছে এত দিন পরে! চিন্‌বে তো? অনেক যুবকের হাত ধরে গা ঘেঁষে সে সভাসমিতি করেছে, দেশের কাজে যোগ দিয়েছে—তার মনের কোণে কোনো দিন কোন সঙ্কোচ দেখা দেয় নি। কিন্তু বহু বৎসর পর এই অর্দ্ধ পরিচিত যুবকটির সঙ্গে দেখা করতে তার যেন কেমন বাধ-বাধ ঠেক্‌ছে।

বাংলা দেশের বাইরে এই অপরিচিত স্থানে তাকে একমাত্র আপন ঠেকছে; আবার তার সঙ্গে তেমন পরিচয় নেই, বহুদিন দেখা পর্য্যন্ত নেই এও মনে না করে সে পারছে না। তার মনে কতক্ষণ এ দ্বন্দ্ব চল্‌ছিল সে জানে না, সিঁড়িতে পায়ের শব্দে সে চম্‌কে উঠ্‌লো এবং দৃষ্টি পড়ে গেলো হঠাৎ নিজের পোষাকের দিকে। তবু ভালো বেড়াবার সাড়ী ব্লাউজই রয়েছে তার গায়ে। সে তাড়াতাড়ি আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে সাড়ীর আঁচলটা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করলো, চুলের বিদ্রোহী কয়েকটী গুচ্ছকে শাসন করলো। পর মুহূর্ত্তে বিনোদ এসে ঘরে ঢুক্‌লো।

প্রণতি বাংলা দেশের এই উড়িয়া পুলিস অফিসারটিকে কি বেশে দেখবে সেই সম্বন্ধে আশঙ্কা পোষণ করছিল। কিন্তু তাকে দেখে তা দূর হলো। ফুরফুরে কোঁচানো চাদর ও পাঞ্জাবীর মধ্যে বিনোদকে চিনে নিতে তার মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব হলো না। তারপর লোকটির চোখে মুখে এবং সারা গায়ে হাসি ঠিকরে পড়ছে দেখে এবং তার সরল সহাস্য সম্ভাষণ শুনে প্রণতির সব সঙ্কোচ এক মুহূর্ত্তে দূর হ'য়ে গেল।

বিনোদ মুখেই বল্লে—"নমস্কার, মিস বোস। আপনার পরিচালিত কাগজে আপনার প্রবন্ধাদি পড়েছি। মনে আছে বীরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম আর আপনি 'বব' ঢুলিয়ে দৌড়ে পালাতেন। তখন বোধ হয় ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়তেন আপনি। কেমন, পালাবেন এখন? পালান না!"

"কেন পালাব! আপনি বাঘ না ভালুক!"

"বড় কমও নই! শৃঙ্গী নখীর পর্য্যায় ভুক্তই বটে! পুলিশ তো! পুলিশ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! বীরেনবাবু তো পুলিশ ঠেঙাতে খুব ভালোবাসতেন। এখন একবার দেখাটা হলে হতো। হোঃ! হোঃ!"

প্রণতি ক্ষণকাল তার মনের অবস্থাটা ভুলেছিল। এখন হঠাৎ তার চোখে মুখে বিরক্তি এবং কণ্ঠস্বরে ক্ষুব্ধ অভিমান প্রকাশ পেয়ে উঠলো।

"পুলিশের লোক আপনি। শান্তি রক্ষা তো আপনার কাজ?"

"নিশ্চয়! কোথায় অশান্তি দেখা দিয়েছে বলুন।"

"আমি এলুম, একা মানুষ। আপনি তো নিশ্চিন্ত হ'য়ে কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন ক'দিন। আমি এখানে থাকি কি ক'রে।"

ক্ষণকালের জন্যে বিনোদের চোখ মুখের উজ্জ্বল হাসি নিবে গেল। ব্যস্ত হ'য়ে বলে উঠলো—"মাখনকে তো বিশেষ ক'রে বলে গেছলাম। কেন, কোনো অসুবিধা হয় নি তো?"

"অসুবিধা! আমি এখন দেশে থাকি কি ক'রে? ওঃ! মনে হ'লেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।"

"বলুন তো কি ব্যাপার!"

বিরক্তিকাতরকণ্ঠে প্রণতি বলল, দিনের পর দিন রাস্তায় যদি কোনো ভদ্র মেয়েকে কোনো মানুষ তার সর্ব্বগ্রাসী দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করতে থাকে তবে কেমন হয় ব্যাপারটা?"

"কাকে অনুসরণ করছে ?"

প্রণতির চক্ষে ভ্রুকুটি দেখা দিলে; বললে, "কি আশ্চর্য্য ! তাও বলতে হবে যে আমাকে ?"

বিনোদ হো হো করে হেসে উঠলো; বললো—"তার আর আশ্চর্য্য কি !"

প্রণতি রেগে বললো—"আশ্চর্য্য কি !"

"না, না, আমি তো তা বলতে চাইনি। আমি—আমি—" এই বলে বিনোদ গম্ভীর হয়ে গেল।

"শুনুন, আমি সব খুলে বলছি।"

দু'জনে চেয়ার টেনে কাছাকাছি বসল। প্রণতি বলল—"পুরী ষ্টেশনে নেমে গাড়ী ক'রে প্রথম বাড়ী এসে ঢুকতে গিয়ে দেখি একটি লোক দূর থেকে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আমি কাছে এলুম—লোকটি একটু ভদ্রতার খাতিরেও তার দৃষ্টি তুলে নিলে না। সে কী নির্লজ্জ দৃষ্টি ! মনে হয় খেয়ে ফেলতে চায় !"

"হায় ! বেচারি ! একেবারে প্রথম দৃষ্টিতেই—"

"বেচারি !"

"না, না, না, আমি বলতে চাচ্ছিলাম—এ ভারি অন্যায়। চলে যান। তারপর ? বেশ একটি উপন্যাসের মত ঠেকছে।"

"আপনি যেন আমোদ উপভোগ করছেন।"

"না, না, বলেন কি ! বলুন, তারপর ? তারপর ?"

"আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী ঢুকে পড়লুম এবং ব্যাপারটা ভুলে গেলুম। কিন্তু পরদিন মন্দিরের পথ দিয়ে বাড়ী ফিরছি দেখি সেই দৃষ্টি রাস্তার ওপার থেকে আমার উপর নিবদ্ধ রয়েছে। তখন আমাকে অন্য রাস্তা ধরে বাড়ী ফিরতে হ'লো।"

"আগে যাই থাকুক না কেন এখন পুরুষকে আপনার ভয় আছে বলে তো মনে হয় না। না পালিয়ে জিজ্ঞেস করে ফেল্লেই পারতেন ভদ্রলোকটিকে তাঁর এই দৃষ্টির অর্থটা কি ?"

"পুরুষকে ভয় কখনো করি না বটে, কিন্তু তার দৃষ্টিটাকে যে ভয় করতে হয় সেই অভিজ্ঞতা এই প্রথম হলো।"

"প্রথম ? পুরুষের তা'হলে চোখ নেই বলতে হবে !"

"আপনি কি চোখের বদলে রসনা চালাতে চাচ্ছেন নাকি ? সেটাকেও আমি কম ভয় করি না।"

বিনোদ নাটকীয় অভিনয়ের ভঙ্গীতে বললো—"মা ভৈঃ ! আমার কোনো দুরভিসন্ধি নেই।"

প্রণতি আবার রেগে উঠলো—"দেখুন বিষয়টা পরিহাসের নয়। পরদিন "রাধাকুণ্ড" দেখে গলির মোড় ফিরছি তখন আবার সেই দৃষ্টি ! আমি প্রায় তার গায়ের ওপর গিয়ে পড়েছিলুম আর কি ! লোকটা নিশ্চয়ই আমাকে আগে থাকতেই দেখতে পেয়েছিল, ইচ্ছা ক'রেই—"

"ভারি অন্যায় তো ! কেমন ভদ্রলোক !" বিনোদের মুখের ভাব বেশ গম্ভীর। তা'র মুখের দিকে বক্র কটাক্ষে চেয়ে নিয়ে প্রণতি বললো—"কালকে বিকেলে আবার সেই দৃষ্টির অনুসরণ ! নিকটেই এক বাড়ীতে যাত্রা হচ্ছিল, আমি তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ে মেয়েদের জন্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়ালুম। পর মুহূর্ত্তে দেখি সেও কখন ঢুকে প'ড়ে পুরুষদের জায়গার শেষ প্রান্তে এরূপ আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার সর্ব্বগ্রাসী দৃষ্টি চালাচ্ছে।"

"গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েও সর্ব্বগ্রাসী দৃষ্টি চালানো যায় না কি ? হাঃ হাঃ হাঃ।"

"আজকে সমুদ্রতীর থেকে অনুসরণ করে' বাড়ী পর্য্যন্ত এসেছে। সমুদ্রতীরে সূর্য্যোদয় উপভোগ আমার চুলোয় গেছে। আমার পুরীর জীবনকে বিষাক্ত করে তুলেছে। ওঃ ! আর এক মুহূর্ত্তও আমার এখানে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না।" ক্ষোভে বিরক্তিতে প্রণতি প্রায় কেঁদে ফেলল।

এবার বিনোদের প্রাণে বাস্তবিকই আঘাত লাগল। সে সান্ত্বনার সুরে বলল—"আমি এতটা জানতুম না। জরুরি তদন্তে গিয়েছিলুম মফঃস্বলে। বাংলার স্বদেশী ডাকাত "নেপানাগের" কথা শুনেছেন বোধ হয়। লোকটা এ অঞ্চলেও উপদ্রব আরম্ভ করে দিয়েছে। হাজার রকম ছদ্মবেশ ধরে লোকটা। তার প্রকৃত চেহারা কেউ জানে ব'লে বলতে পারে না। বাংলাদেশ ছেড়ে এখন উড়িষ্যার পুলিশকে সে বিব্রত ক'রে তুলেছে। আমি তারই এক ডাকাতি ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলুম। এখন তো আমি এখানেই আছি। রাস্তায় আপনার উপর আর কোন

উপদ্রব হ'বে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। একজন পুলিশকে দিয়ে ভদ্রলোকটিকে গোপনে একটু গলাধাক্কা দিয়ে দিলেই ওঁর দুর্ম্মতি দূর হবে।"

প্রণতি শ্বাস ছেড়ে বল্লে—"থাক্, তাও যদি করেন, নইলে আপনাদের পুরী আমি কালকেই ছেড়ে যাব। আপনাদের "নেপা নাগের" ডাকাতির চেয়ে এই ভদ্রলোকের দিনে ডাকাতি কিছু মাত্র কম ভয়ঙ্কর নয়।"

"এই "নেপানাগ" সম্বন্ধেও সাবধান হ'তে হ'বে আপনাকে। খাস্ পুরীতেই দুটো ডাকাতি করেছে সে। এ অঞ্চলে যদিও হয়নি তবু একজন পুলিশ পাঠিয়ে দেব প্রতি রাত্রে আপনার বাড়ীতে। মূল্যবান জিনিষ সাবধানে রাখবেন। গলার হারটি তো বহুমূল্য বোধ হচ্ছে। এটা বরং খুলেই রাখুন।"

নীচে গেটের কড়া ঘন ঘন ঠক ঠক করে উঠল। প্রণতি ও বিনোদ উভয়ে নীরব হয়ে কান পেতে রইল। একটু পরে মালতী এসে খবর দিল—"একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে মা।'

"না, না, বল গিয়ে এখন দেখা হবে না। আমার কাজ রয়েছে। বল গিয়ে আমি বাড়ী নেই। কে আস্‌বে আমার সঙ্গে দেখা করতে? কে আছে আমার পরিচিত এখানে!"

"আমি বলেছিলুম দেখা হবে না। কিন্তু কিছুতেই শুন্‌বে না। ভারি নাকি জরুরি কাজ।"

মালতী ফিরতে গিয়ে দেখে ভদ্রলোক সিঁড়িতে। "ওমা, এঁর যে আর তর সইলো না, সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসেছেন।" মালতী নেমে গেল।

ভদ্রলোক পরমুহূর্ত্তেই ঘরে এসে দাঁড়িয়ে দূর হ'তে নমস্কার করলেন। প্রণতি ছোট একটি চীৎকার দিয়ে আতঙ্কে কয়েক পা পিছিয়ে বিনোদের হাত ধরে দাঁড়াল। বিনোদ তার দিকে চেয়ে বল্লে—"পরিচিত নাকি?" প্রণতির নীরব আতঙ্কিত দৃষ্টির মধ্যে সে একটা উত্তর পেল।

ভদ্রলোকটির বাঙালী পোষাক; দীর্ঘ বলিষ্ঠ আকৃতি; মধ্যবয়স্ক। সমগ্র চেহারার মধ্যে তাঁর অত্যুচ্চ নাসিকাটিই প্রথমে চোখে পড়ে, সেটি ভদ্রলোকের মুখাকৃতিকে একটা অস্বাভাবিক বিশিষ্টতা দিয়ে দিয়েছে। তিনি ঘরের দূরতম প্রান্ত থেকেই নমস্কার জানিয়ে বল্লেন—"মাপ করবেন। অনুমতি না নিয়েই উপরে চলে এসেছি, নিতে গেলে হয়ত আসাই হতো না। কিন্তু আমার যে না এলেই নয়।" এই বলে অনুনয় পূর্ণ দৃষ্টিতে প্রণতির দিকে তিনি চেয়ে রইলেন।

প্রণতি বিনোদের একরূপ আড়ালে সরে গিয়ে বল্‌ল—"না, না, না বিনোদবাবু, ওঁকে চলে যেতে বলুন এখান থেকে। কেমন ভদ্রলোক উনি! রাস্তায় রাস্তায় ভদ্র মেয়েদের উত্যক্ত করে বেড়ান, এখন একেবারে বাড়ীতেই এসে চড়াও করে বসেছেন! বিনোদবাবু, বিনোদবাবু, তাড়িয়ে দিন লোকটাকে। না, না, ও কিছুতেই যাবে না। গ্রেপ্তার করুন একে, গ্রেপ্তার করুন। ডাকুন আপনার পুলিশকে।" প্রণতি উত্তেজনায় ও ভয়ে বিনোদের গায় সংলগ্ন হ'য়ে রইল এবং তাকে ঠেলতে লাগল।

বিনোদ প্রণতিকে আড়ালে রেখে আগন্তুকের দিকে কয়েক পা অগ্রসর হয়ে বলল—'মশায় আপনার এ কি রকম ব্যবহার।'

আগন্তুক তার দিকে ফিরেও তাকাল না, তার কথাও কানে তুলল না। তার ক্ষুধিত দৃষ্টি বিনোদের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তাঁর মাথার উপর দিয়ে গিয়ে প্রণতির উপর ন্যস্ত হ'য়ে রইল। সেই দৃষ্টির সামনে প্রণতির দৃষ্টি মাটীর দিকে নুয়ে পড়ল। আগন্তুক বলে উঠল—"রাস্তায় রাস্তায় ভদ্র মেয়েদের উত্যক্ত করে বেড়াইনে, শুধু আপনারই পিছনে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু কেন তা শুনলে আমার উপর আপনার মনোভাব একেবারে বদলে যাবে। একটা জীবন বাঁচান। দয়া ক'রে আমার কথা শুনুন। তারপর আপনি যাই করতে বলেন আমি করব, বেরিয়ে যেতে বলেন বেরিয়ে যাব। শুধু আমার কথাটা একবার শান্ত হয়ে শুনুন।" সে জোড় হাত ক'রে এম্‌নি অনুনয়ের ভঙ্গীতে চেয়ে রইল যেন ঐ কথার উপরই তার জীবন মরণ নির্ভর করছে।

প্রণতি একটু না এগিয়ে যেন আশ্রয় খুঁজে ডাক্‌ল—"বিনোদ বাবু! বিনোদ বাবু!"

বিনোদ তা'র দিকে ফিরে বল্‌ল—"আমিই তো রয়েছি, আপনার ভয় কিসের! শোনাই যাক না ওর কি বলবার আছে।"

প্রণতি কোন উত্তর দিল না। আগন্তুক সাহস পেয়ে বস্‌বার আসনের দিকে অগ্রসর হয়ে এল এবং শেষে স্থির হয়ে বস্‌ল। তার দৃষ্টি তখনো তেম্‌নি ভাবে প্রণতির উপর ন্যস্ত রয়েছে। প্রণতি অন্য দিকে সরে গেল। বিনোদ মাঝের একটি আসনে বস্‌লে তবে সে আগন্তুক হ'তে দূরতম স্থানে একটি আসন গ্রহণ কর্‌ল।

আগন্তুক বলতে লাগলো—"আমার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। আদিম বাসস্থান আমার বাংলা দেশে। কিন্তু এখন আমি উড়িষ্যারই অধিবাসী, বিয়ে করিনি এখনো, কোন দিন করব কি না তাও জানি না। করি বা না করি তা'তে কারো কিছু এসে যায় না। সংসারে আমার কেউ নেই। মা নেই, বাপ নেই, ভাই বোন কেউ নেই। হাওয়ার মুখে খড়কুটোর মত উড়ে বেড়াচ্ছি, ঠাঁই মিললো না আমার স্থির হ'য়ে বসবার।"

প্রণতির হৃদয়ে একটু আঘাত লাগলো। সে মাথা তুলে বললে—"আঃ! কেন অমন ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একটা বিয়ে ক'রে সংসারী হ'য়ে পড়ুন না।"

"বিয়ে! তা' আমারই কি তা'তে অসাধ! কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"দেখছেন তো আমার নাক! এ দেখে—"

"ওঃ!" প্রণতি আবার অন্য দিকে মাথা ফিরিয়ে বসল।

"এ নাক দেখে কোন মেয়ে আমাকে স্বেচ্ছায় বরণ করবে কি?" উত্তরের আশায় সে প্রণতির দিকে নীরবে চেয়ে রইল। সে মাথা তুলল না। তার বিপদ দেখে বিনোদ তা'র সাহায্যার্থে অগ্রসর হলো।

বিনোদ বললে—"তা কেন, এর চেয়ে অনেক বেশী অস্বাভাবিকতা নিয়েও তো—"

আগন্তুক বিনোদের অস্তিত্বকে মোটেই আমল না দিয়ে তার কথা শেষ না হতেই বলে উঠলো—"তা ছাড়া আমার দিক থেকেও বাধা আছে, ভয় আছে; সেটাই বড় বাধা, বড় ভয়।"

প্রণতি মুখ তুলে বলল,—"কি বাধা!"

"ঐ নাকেরই বাধা! আমার বরাবর এই ভয় রয়েছে—মাপ করবেন—লজ্জা সঙ্কোচের অবসর আমার নেই—লজ্জা করবেন আপনারা—আপনারা সুখে আছেন, স্বাভাবিক অবস্থায় আছেন, জীবনের আনন্দ আপনাদের জন্যই—আমি লক্ষীছাড়া, ছন্নছাড়া, জীবনের ব্যতিক্রম—আমার লজ্জা নেই, লজ্জা করবার উপায় নেই আমার। আমার বরাবর ভয় রয়েছে এই নাকের জন্যেই আমি কোনো মেয়েকে চুম্বন করতে পারব না।"

প্রণতির মুখ লাল হয়ে উঠলো। আগন্তুক বলে যেতে লাগলো—"বয়স প্রায় চল্লিশ হ'য়ে এল। বল্লে বিশ্বাস না করতে পারেন—কিন্তু এ ধ্রুব সত্য—আমি কোনো মেয়েকে এ পর্য্যন্ত চুম্বন করিনি। চুম্বনের কথা মনে করলেই আমার প্রাণ আঁৎকে উঠে। এ ভয় থাকাতেই আমি এ পর্য্যন্ত কোনো মেয়ের সঙ্গে মিশতে পারি নি, যুবতীদের সঙ্গ এড়িয়ে চলি। মেয়ে মহলে আমার মত লাজুক দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় নেই।"

প্রণতির ঠোঁটের আগায় একটু বক্র হাসি ফুটে উঠলো। তাহা আগন্তুকের দৃষ্টি এড়াল না। সে বল্‌লো—"আমার বর্ত্তমান ব্যবহারে আপনার সেটা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হ'বে না। আমার বর্ত্তমান নির্লজ্জতা ও প্রগলভতার কারণটা আপনাকে বল্‌ছি। আমার বন্ধু হীরালাল কিছু দিন হ'ল দেশ থেকে এখানে এসেছেন। তিনি কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনস্তত্বে ডক্টরেট পেয়েছেন। পুঁথির শুষ্ক পত্রের বাইরে জীবনের ক্ষেত্রে মানুষের মনস্তত্বেও তাঁ'র সুগভীর অন্তরদৃষ্টি রয়েছে।"

বিনোদ অধীর হয়ে ব'লে উঠলো—"বাজে কথা রাখুন, আপনার এখানকার আগমনের উদ্দেশ্যটা এক কথায় বলে ফেলুন না।"

প্রণতি আগন্তুকের কথায় একটু রস পাচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল একটা অদ্ভুত অথচ সকরুণ জীবন কাহিনীর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা তা'র চোখের সামনে ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। সে ব'লে উঠলো—"উনি বলুন না ও'র মত ক'রেই।"

আগন্তুক উৎসাহিত হ'য়ে বল্‌লো—"দুই বন্ধুতে একদিন কথা হচ্ছিল। মেয়েদের কথা উঠ্‌লো। আমার অবস্থা বুঝে নিতে তার বিলম্ব হ'লো না। সে বিদ্রূপ ক'রে বল্লে—'অজিত, তুই আবার একটা পুরুষ! মেয়েদের সঙ্গে মেশা মেয়েদের ভালোবাসা যা'দের ক্ষমতার অতীত তাদের কি নামে অভিহিত করব জানি না। তোর এই মিথ্যা ভয়ই তোকে মেয়েদের সম্বন্ধে 'নার্ভাস' ক'রে রেখেছে এবং চিরকাল রাখবেও।' আমি প্রথমটা কিছু কথা কাটাকাটি করেছিলুম। শেষে হীরালাল তা'র অক্ষয় তূণ থেকে এমন সব শ্লেষ, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপের শর আমার দিকে নিক্ষেপ করতে সুরু করলো এবং অবশেষে আমার সম্বন্ধে এমনি একটা অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ ক'রে বস্‌লো যে আমি ক্ষেপে উঠলাম, গর্জ্জন ক'রে বল্লাম—'আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আজ বিকেলে ৫টার গাড়ীতে যে যাত্রীরা এখানে নাম্‌বে তা'দের মধ্যে প্রথমে যে মেয়ের উপর আমার চোখ পড়বে তা'কে আমি—তা'কে আমি—এক সপ্তাহের মধ্যে চুম্বন করব—নইলে আমি মরব'"

"ওঃ! ওঃ! করেছেন কি! করেছেন কি!"

"তখন বেলা চারটে। চলে গেলাম ষ্টেশনে। সময় আর যায় না। গাড়ীও সেদিন হলো লেট। শেষে গাড়ী এল, হুইস্‌ল্ দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে কত দেশের কত বিচিত্র পোষাকের কত যাত্রী বহন ক'রে গাড়ী এসে ষ্টেসনে থামলো। আমার বুক দুরু দুরু ক'রে উঠলো। ঝাঁকে ঝাঁকে যাত্রী নেমে আসছে। শেষে গেরুয়া রঙের একটি মান্দ্রাজী শাড়ীর জরির অঞ্চলের একটি প্রান্ত আমার চোখে ফুটে উঠলো। হঠাৎ চোখ বুজে মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রতিজ্ঞাটি স্মরণ ক'রে মনে মনে বললুম—এ যেই হোক্, একে দিয়েই সপ্তাহের মধ্যে আমি প্রতিজ্ঞা পালন করব, নইলে মরব।"

"ওঃ! ওঃ! কেন এমন প্রতিজ্ঞা করলেন?"

"চোখ খুলেই দেখলুম সেই অঞ্চলধারিণীর সমগ্র মুখ ও দেহটি। শুনলুম গাড়োয়ানকে "নীলিমা কুটীরে" আস্‌তে বলা হ'লো। সাইকেলে আগেই আমি এখানে এসে উপস্থিত হলুম। তারপর কি হ'লো আপনি জানেন।"

তিন জনই ক্ষণকাল নীরব। প্রণতি শক্ত হ'য়ে আসনে বস্‌ল। বিনোদ ধীরে ধীরে বলে উঠল—"এখন আপনার উদ্দেশ্য কি বলুন।"

"প্রতিজ্ঞা পালন। প্রথম প্রতিজ্ঞা পালন।"

প্রণতি ছিন্নগুণ ধনুর মত চেয়ার হ'তে লাফিয়ে উঠে চীৎকার ক'রে বলল—"সেটা এখানে হ'বে না। আপনি বেরোন এখান থেকে, বেরোন।"

আগন্তুক আসন হতে একটুও নড়ল না, স্থির দৃঢ় কণ্ঠে বলল—"প্রথম প্রতিজ্ঞা পালন না করতে পারলে আমাকে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা পালন করতে হ'বে। আমাকে মরতে হ'বে। আজ শেষ দিন। আজকেই জলে ডুবে কিম্বা গলায় দড়ি দিয়ে আমাকে মরতে হবে। আজ আমি মরবই।"

"তা' মরতে হয় মরুন গিয়ে। এখানে সেটা হ'বে না। আর এর সঙ্গে আমার কোনো সংস্রব নেই, এর জন্যে আমি কোনো রকমে দায়ীও নই।"

"আর, আপনার পায়ের কাছেই যদি আমি এখন পড়ে মরি?"

"না, না, উঠুন আপনি, যান এখান থেকে। বিনোদ বাবু, বিনোদ বাবু, একে—"

আগন্তুক উঠে কয়েক পা সরে দাঁড়াল এবং পকেটে হাত রেখে বলল—"এখনো ভেবে দেখুন, একটি নিষ্পাপ নিরীহ লোকের মৃত্যুর দায়িত্ব আপনার উপরই গিয়ে পড়ছে। দয়া করুন, আপনার কাছে আমার এই জীবন ভিক্ষা করে নিচ্ছি। ভেবে দেখুন একটা মানুষ পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে চিরকালের মত লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, একটা বংশের ধারা মুছে যাচ্ছে। আর ব্যাপারটাও কিছু নয়, শুধু একটি—এ শুধু একটা সামাজিক বাধা বৈ তো নয়! আপনি তো শিক্ষিতা মহিলা। জানেন তো এটা শুধু একটা সামাজিক নিষেধ, শুধু একটা দেশাচার! অন্তরের পবিত্র ধর্ম্মের সঙ্গে বাইরের এই সংস্পর্শের কোনো সংস্রব নেই, সে ধর্ম্মের গায়ে এ থেকে কিছুমাত্র কলুষ লাগতে পারে না। জানেন তো পশ্চিমে বহু দেশে নিঃসম্পর্কিতের মধ্যেও এটা প্রচলিত—এটা সেখানে শুধু একটা সামাজিক

প্রথা—একটা greeting। আর আমার সম্বন্ধে বল্‌তে পারি—feeling তো কিছু নেই এতে, এ শুধু একটা যান্ত্রিক ব্যাপার।"

একটু থেমে আগন্তুক আবার বলতে লাগলো—"আমাদের দেশে নিঃসম্পর্কিতের মধ্যে সামাজিক নিষেধ রয়েছে সত্য, কিন্তু এতো শুধু একটা দেশাচার! হৃদয়ের সমুচ্চ নীতিবোধের সঙ্গে এর কোনো বিরোধিতা আছে কি? তা' ছাড়া আপনি বাংলা দেশের লোক; আপনার সমাজ ছেড়ে বহু দূরে রয়েছেন এখানে। ঐ জগন্নাথ তীর্থে সংকীর্ণ দেশাচারের কোনো মূল্য আছে কি? ঐ মহাসমুদ্রের তীরে মহাকালের চিরন্তন সত্যের প্রত্যক্ষ আলোকে দাঁড়িয়ে ক্ষুদ্র সামাজিক বিধিনিষেধকে কি আপনি বড় হ'তে দেবেন? অনন্ত জীবন-যাত্রায় পথের পথিক আমরা, ক্ষণকালের জন্যে আমাদের এই মিলন; আর কথনো আমাদের দেখা হবে কি? এক দিনের এক মুহূর্ত্তের এই স্মৃতি কে মনে ক'রে রাখবে? আপনার সঙ্গে আর তো আমার কোনো সম্পর্ক থাক্‌বে না, কোনোদিন আর বিরক্ত করতে আসব না আপনাকে। দু'জনে জীবনের নিজ নিজ পথে চলে যাব। অথচ এক মুহূর্ত্তের ক্ষুদ্র এক সম্মতি দ্বারা আপনি একটি জীবন রক্ষা করবেন, একটি মনুষ্য জীবন রক্ষা করার আত্ম-প্রসাদকে পাথেয় করে চলবেন জীবনের পথে। কত বড় সুখ, কত বড় আনন্দ সেটা! তুচ্ছ একটা দেশ-প্রথার বিনিময়ে যে সুখ সে আনন্দ কি আপনি লাভ করতে চান না? সামান্য একটা দেশাচারকে বলি দিয়ে একটা বহুমূল্য মানব জীবনকে যদি আপনি রক্ষা করতে পারেন সেটা কি আপনার কর্ত্তব্য নয়?"

"ওঃ! ওঃ! কি বল্‌ছেন আপনি! পারবো না—পারবো না!" প্রণতি দুই হাতে মুখ ঢাকলো।

আগন্তুক বিদ্যুদ্বেগে আরো কয়েক পা সরে গিয়ে প্রায় সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং পকেট থেকে একটি গুলিভরা পিস্তল বের করে বল্‌ল—"তা হলে তাই হোক। আপনার সম্মুখেই আমি আজ মরছি। একটা মানুষের জীবনের চেয়ে দেশাচারই আপনার কাছে বড় হোক্। কিন্তু মনে রাখবেন আমার মৃত্যুর এই রক্ত চিহ্ন আপনাকে আপন বিবেকের মধ্যে চিরকাল বহন করতে হবে।" এই বলে সে আপন গলার দিকে পিস্তল বাগিয়ে ধরল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রণতি ছিট্‌কে এসে আগন্তুকের সম্মুখে দাঁড়াল এবং তার পিস্তলশুদ্ধ হাত চেপে ধর্‌ল।

"থামুন, থামুন, থামুন! বিনোদবাবু, বিনোদবাবু—" প্রণতি অসহায় ভাবে চীৎকার করে বিনোদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এল। বিনোদ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে প্রণতিকে বলল—'কি করি বলুন, বাধা দিতে গেলেই লোকটা আত্মহত্যা করে বসবে। তার চেয়ে বরং সম্মতিই দিন—ব্যাপারটা চুকে যাক্।"

"বিনোদ বাবু, আপনিও তাই বলছেন?"

"কি করি না বলে।"

প্রণতি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—"বেশ তাই হোক। আপনার অনুমতি নিয়ে যাচ্ছি। এ কলুষ আমার গায়ে লাগবে না। আপনি মুখ ফিরিয়ে থাকুন।" আগন্তুকের কাছে এগিয়ে গিয়ে বল্লে—"পিস্তল পকেটে পুরুন। এক মুহূর্ত্তে কাজ সারুন। আর মনে থাকে যেন এ জীবনে যেন আর আপনার মুখদর্শন আমাকে না করতে হয়।"

বিনোদ মুখ ফিরিয়ে ছিল। সামান্য একটু শব্দ তাহার কানে গেল। সেদিকে মুখ ফিরাতেই বিনোদ দেখিল আগন্তুক সুগভীর কৃতজ্ঞতা সহকারে নমস্কার করে প্রণতির কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে একটা পকেট বই বের করে এই প্রথম যেন বিনোদ দেখে তাকে সম্বোধন করে বল্লে—"ভুলে গেছি বলতে, একটা সর্ত্ত ছিল আমার কাজের একজন সাক্ষী রাখতে হবে। অনুগ্রহ করে আপনার নাম ঠিকানা দিন, আমার বন্ধুকে নিয়ে কাল আপনার বাসায় যাব।"

বিনোদ নাম ঠিকানা বলল, আগন্তুক তাহা টুকে নিয়ে চলে গেল।

প্রণতি ও বিনোদ নীরব। বাইরে সদর দরজা খোলার এবং লাগবার শব্দ শোনা গেল। প্রণতি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, দেখল একটি ভৃত্যের মত লোক সাইকেল নিয়ে আগন্তুকের জন্যে অপেক্ষা করছিল। আগন্তুক সাইকেলে উঠে ভীষণ দ্রুতবেগে মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে

গেল। ভৃত্যও দ্বিতীয় একটি সাইকেলে তাকে অনুসরণ করল।

প্রণতি শ্বাস ছেড়ে বলল—"আমার চিত্তে কোনো গ্লানি নেই। একটা জীবন বাঁচাতে পারলুম। ভদ্রলোকটির জন্যে কষ্ট হয়।"

"স্ত্রী-হৃদয়কে কে বুঝতে পারে! এখন তার জন্যে কষ্টও হচ্ছে তবে। কালকে তো আমার কাছে যাবে। বলেন তো বিয়ের প্রস্তাবটাও করে ফেলতে পারি।"

"বিনোদবাবু, এ রকম কথা যদি দ্বিতীয় বার আপনার মুখে শুনি তাহলে আপনার সঙ্গে আমার জন্মের মত আড়ি। জন্মের মত আপনার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ এবং কথাবার্ত্তা বন্ধ এ স্থির জানবেন।"

সেই সময় মালতী এসে একটা কাগজের টুকরা এনে প্রণতির হাতে দিয়ে বল্ল—"ভদ্রলোকটি চলে গেলে পাঁচ মিনিট পর এই কাগজের টুকরোটি তোমাকে এনে দিতে বলে গেল।" মালতী চলে গেল।

প্রণতি কাগজ নিয়ে তাতে কি লেখা আছে পড়ল। এক মুহূর্ত্তে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সে গলায় হাত দিয়ে চীৎকার করে বলে উঠল—"আমার হার! আমার হার! দু'হাজার টাকার হার! মায়ের শেষ চিহ্ন। ওঃ! ওঃ!"

"কি হয়েছে? কি হয়েছে? হার নিয়ে গেছে? এঁ্যা। তাইত! দেখি কাগজে কি লেখা।"

বিনোদ কাগজ নিয়ে পড়ল—"মাপ করবেন, হারটি নিয়ে গেলাম। ষ্টেশনে দেখেই এটির প্রতি লোভ হয়েছিল। আপনার বন্ধুকে বলবেন তিনি যেন বৃথা আমার অনুসরণ না করেন। ইতি "নেপা নাগ"।" "পুঃ—মনে করে সান্ত্বনা পেতে পারেন টাকা দেশের কাজে লাগানো হবে।"

"নেপা নাগ? সেই স্বদেশী ডাকাত?"

"সেই তো দেখছি। যাই, লোকটার চেহারা দেখা গেল। এই নাক আর সে লুকোতে পারবে না।"

প্রণতি বলল—"কোনো ফল নেই। নাক কৃত্রিম। যখন সে—তখনই বুঝতে পেরেছি আমি। ওঃ! সব মিথ্যা তবে! কারো জীবন রক্ষা করিনি আমি। শুধু হারটি হারিয়েছি, আর—আর—ওঃ! জলে যাচ্ছে! আমার ঠোঁট জলে যাচ্ছে!" প্রণতি মাথায় হাত দিয়ে চেয়ারে বসে

বিনোদ এসে সান্ত্বনার স্বরে তা'র বাহু চেপে ধরে বল্লে—"শান্ত হোন্, শান্ত হোন্।"

প্রণতি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কেঁদে উঠল। "ওঃ! ওঃ! কেন এসেছিলেম এখানে আমি। আপনারি তো সব দোষ। কেন আপনি আমাকে বল্লেন। কেন অনুমতি দিলেন আপনি? আপনার অনুমতি না পেলে কি আমি কখনো—আপনি আমাকে কোথায় রক্ষা করবেন, না, কাপুরুষের মত ছেড়ে দিলেন ওর হাতে! ওঃ! ওঃ! কেন, বীরের মত রক্ষা করতে পারলেন না আমাকে? না, আমি রক্ষা করবার উপযুক্ত নই? যাও, যাও আমার কাছ থেকে।" বিনোদকে ঠেলে দিয়ে সে টেবিলে মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।

"সে কথা যে মনেই হয় নি। আমার অন্যায় হয়েছে। ক্ষমা চাই।"

"না আমি ক্ষমা ক'রব না, ক'রতে পারব না। সারা-জীবন এ গ্লানি নিয়ে আমি বাঁচব কি করে? কি দিয়ে আমি এ ধুয়ে মুছে ফেল্‌ব?"

"এ গ্লানি আমারি দেওয়া এ মোচন করবার ভারও আমিই নিচ্ছি, পনু।" এই বলে প্রণতির ঠোঁটে বিনোদ একটি চুম্বন অঙ্কিত ক'রে দিল।

প্রণতির সঙ্গে তার দাদা বীরেনের সব কথাই হতো। পরদিন সে বীরেনকে চিঠিতে সব জানিয়ে লিখে দিল—"আমার গ্লানি মোচন করেছে যে তাকে আমি গ্রহণ করতে বাধ্য, হোক না সে পুলিশের লোক। আর এখন তিন জনের রোজগারে আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করা যাবে। সব পরামর্শ হবে; তাড়াতাড়ি চলে এস; কালই তোমার আসবার কথা ছিল।"

কয়েকদিনের মধ্যেই বীরেনের উত্তর এল—"এক বন্ধুর বিয়েতে আট্‌কা পড়েছি। গ্লানি আমারও জীবনে জমেছে। মনীষার দিকে অনেকটা এগিয়ে গেছলাম তা' তো জানিসই। সেই গ্লানি মোচন করবার একটি লোক পাওয়া গেছে এখানে। রোজগারের ক্ষমতাও আছে তা'র। ভাবছি আমারো গ্লানি মোচন ক'রে আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে চতুর্থ একটি লোক সংগ্রহ ক'রে নেব। সেটি পুলিশের কন্যা না হ'লেও, ভাইঝি বটে।"

শ্রীসুখরঞ্জন রায়

উদ্বোধন

অখিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য

নূতন করিয়া মন্দিরে মোর বাজে আরতির গান,
নূতন লালিমা রঙ্ মেখে দেয় নব পূরবীর তান ;
সবুজ অবুঝ মনের মাঝারে কি যেন কাহার বাঁশী ;
কোন মিলনের সুমধুর গীতি গাহিছে প্রভাতে আসি।
নব ফাগুনের অরুণ রাঙিমা রাঙায়ে দিয়েছে মন
আমার হৃদয়ে আরতি প্রদীপ ; কাহার উদ্বোধন ?
আজি প্রভাতের নব কাকলীর তানে,
অজানা গানের ছন্দ উঠিছে প্রাণে ;
নাচিছে ভূলোক, নাচিছে দ্যুলোক নাচিছে বিশ্ববাসী ;
মহামানবের তীর্থের দ্বারে থামিছে পরাণ আসি।
আজি জীবনের প্রভাত বেলায় নূতন চেতন জাগে ;
বিস্ময়-ভরা পরাণ ডুবিছে মহিমার নব রাগে।
ওগো সুমহান্ ! আজি নব গান,
ধরণীর নব সাজে ;
সবুজ আমার অবুঝ হৃদয় প্রভাত বেলায় বাজে।
আজি সাগরের কোন নাচনের মাতন জাগিল মনে,
কোন জীবনের শত গীতি গাঁথা বাজে তাই ক্ষণে ক্ষণে ?
আমার জীবনে অমৃতের গান
ছন্দে উঠিল মাতি,
নূতন বোধনে নূতন চেতন, নব জীবনের ভাতি।

উপনিষদের আলো

অনিলবরণ রায়

ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত "উপনিষদের আলো" নামে একখানি সুন্দর বই সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বইখানির নাম সার্থক। উপনিষদের ঋষিরা এক নূতন দৃষ্টি লইয়া নূতন আলোকে এই সংসারকে দেখিয়াছিলেন এবং এই ভাবেই তাঁহারা সংসারের সকল শোক দুঃখের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাণীতে তাঁহারা সেই আলোকের স্পন্দন রাখিয়া গিয়াছেন চিরকালের জন্য; তাহা আমাদের মধ্যেও এক নূতন দৃষ্টি খুলিয়া দেয়। শব্দের এই শক্তি আছে, তাহা ব্রহ্মের অনুভূতি আনিয়া দেয়, তাই তাহাকে বলা হয় শব্দব্রহ্ম। সাধারণ কবিতার মধ্যেও কতকটা এই শক্তি আছে, তাহা শুধুই একটা বুদ্ধিগত অর্থ প্রকাশ করে না, পরন্তু সত্যের অনুভূতি জাগাইয়া তুলিয়া অন্তরে রসের, আনন্দের সঞ্চার করে। যে কবিতাতে এই শক্তি উচ্চতম স্তরে উঠিয়াছে তাহাই মন্ত্র, উপনিষদের ঋষিরা শ্রেষ্ঠ কবি, কারণ তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা, মন্ত্রের ভিতর দিয়া সত্যের, ব্রহ্মের বাঙ্ময়রূপ তাঁহারা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। মহেন্দ্রনাথ এই পুস্তকে উপনিষদের ঋষিগণের তত্ত্বদৃষ্টির কিছু পরিচয় দিয়াছেন।

সাধারণতঃ যে দৃষ্টি লইয়া আমরা এই জগতকে দেখি তাহাতে ইহা অতি দুঃখময় বলিয়া মনে হয়। যাহারা এখনও ইন্দ্রিয়ভোগে অত্যধিক আসক্ত তাহারা জগতের এই দুঃখময় স্বরূপ উপলব্ধি করে না, নীচ ইন্দ্রিয় ভোগের আনন্দকেই তাহারা জীবনের পরম সুখ বলিয়া মনে করে এবং সংসারকে এই সুখ ভোগের ক্ষেত্র বলিয়া দেখিয়া তাহা লাভ করিতে প্রাণান্ত চেষ্টা করে। কিন্তু যাঁহাদের মধ্যে কিছু জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে, তাঁহারাই অনুভব করেন যে, ইন্দ্রিয়ভোগে প্রকৃত সুখ নাই, তৃপ্তি নাই—এই জরা ব্যাধি মৃত্যুপূর্ণ সংসারের স্বরূপই হইতেছে দুঃখ, গীতার ভাষায়, অনিত্যং অসুখং লোকম্। তাই তাঁহারা এই দুঃখকে অতিক্রম করাকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। ভারতের সকল দর্শন শাস্ত্রের ইহাই লক্ষ্য।

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ—

"আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখে সর্ব্ববিধ জীব জর্জ্জরিত; অতএব এই সকল দুঃখ বিনাশের উপায় বিষয়ে জিজ্ঞাসা।"

অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ।

"ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ।

—সাংখ্য দর্শন।

তাই আমরা দেখিতে পাই, ভারতের রাজপুত্র জরামৃত্যু ব্যাধিকে জয় করিবার জন্য সমস্ত অনিত্য ভোগ বর্জন করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে হইল কি? কৃষ্ণ আসিলেন, বুদ্ধ আসিলেন, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য আসিলেন—জগতের দুঃখ দূর করিবার জন্য ধর্ম্মপ্রচার করিলেন, কিন্তু সে উদ্দেশ্য কতটুকু সাধিত হইয়াছে? তাঁহারা নিজেরাও ত কেহ মানবীয় দুঃখ ও মৃত্যুকে এড়াইতে পারেন নাই। বরং অন্যপথে মানুষ এই দিকে কিছু অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মানুষের সমাজের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক বিধি বিধানের সংস্কার করিয়া মানুষ অনেক দুঃখকে জয় করিয়াছে এবং অবশিষ্ট দুঃখকেও সম্পূর্ণভাবে জয় করিবার চেষ্টা করিতেছে। বিজ্ঞানের উন্নতির দ্বারা মানুষ সুখ ভোগের কত নূতন নূতন উপাদান সংগ্রহ করিতেছে, এমন কি এই রক্ত মাংসের শরীরটাকেই নীরোগ ও দীর্ঘজীবী করিবার প্রয়াসেও অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এই অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখিয়াই পাশ্চাত্য দার্শনিক

বার্গস'র মনে আশা জাগিয়াছে, জগতের মূলে যে প্রাণশক্তি রহিয়াছে, Elan vital, তাহা একদিন জরাব্যাধি এমন কি মৃত্যুকেও জয় করিয়া এই পৃথিবীতেই অমৃতত্বের প্রতিষ্ঠা করিবে।

কিন্তু এখনও তাহা কেবল একটি সম্ভাবনা মাত্র, একটি স্বপ্নমাত্র বলিলেই ঠিক হয়, যদিও এই সকল স্বপ্নই মানুষের জীবনকে স্মরণীয়, মহনীয় করিয়া তোলে। সংসারে, প্রকৃতিতে, জীবনে যে বাহ্য পরিবর্ত্তন আসিলে মানুষ জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর দুঃখ, সকল শারিরীক ও মানসিক দুঃখ জয় করিতে পারিবে তাহা এখনও বহুদূরে বলিয়াই মনে হয়। ইতিমধ্যে কি মানুষের পরিত্রাণ নাই? তাহাকে এই সকল দারুণ দুঃখের মধ্যেই নিমজ্জিত থাকিতে হইবে? উপনিষদের ঋষিগণ অন্তর্মুখী হইয়া এই প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছিলেন। আত্মাকে জানিয়া এখনই মানুষ সকল দুঃখ ও শোককে জয় করিতে পারে, মৃত্যুরও উপরে উঠিতে পারে। এ-দেহের জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এখনও অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু এই দেহই আমাদের প্রকৃত সত্তা নহে, ইহা কেবল একটা বাহ্যিক আধার মাত্র, এই আধারে যে বাস করিতেছে, ইহাকে ব্যবহার করিতেছে সে জরামৃত্যুহীন, অব্রণম্—সেই অজয় অমর সত্তার সঙ্গে যখন আমাদের একত্ব অনুভব করি তখন আমরা এই মর্ত্তজগতে থাকিয়াও অমৃতত্ব লাভ করি, উপভোগ করি। উপভোগ করি বলিলাম, কেন না সেই আত্মার স্বরূপই হইতেছে আনন্দ—তাহা সংসারের সকল দুঃখের ঊর্দ্ধে,

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। মুণ্ডক ২।২।৭

এই যে আত্মা আনন্দ ও অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, ইহাকে কেমন করিয়া জানিতে হয় উপনিষদগুলি তাহারই ইঙ্গিতে পূর্ণ। ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার তাঁহার "উপনিষদের আলো" গ্রন্থে এইরূপই কতকগুলি ইঙ্গিত উপনিষদ হইতে বাংলা ভাষায় আনিয়া দিয়াছেন। "সাধনের প্রথম ভূমিকাতে চিত্তশুদ্ধি দরকার। চিত্তশুদ্ধি বাহ্য ও অন্তর ইন্দ্রিয় নিয়মিত করে। একেই বলে শম ও দম। এই শম ও দম দুরীভূত করে ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য।" "ব্রহ্মচর্য্য ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। এতে শরীর, মন, প্রাণ সবই দৃঢ় হয়। তাদের ভিতর আসে সমতা। সমতাই দেয় উচ্চতর ধ্যান ও জ্ঞানের অধিকার। এ জন্যেই ব্রহ্ম চরণ করার কথা পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেওয়া হয়েছে।"

ধ্যান করিতে হইবে ব্রহ্মকে, অনাদি অনন্ত একমাত্র অদ্বিতীয় সত্তাকে। যখন আমরা এমন একটি বস্তু সম্বন্ধে ধ্যান করি যাহার আরম্ভ কখনও হয় নাই, যাহা চিরকালই আছে এবং চিরকালই থাকিবে—তখন আমাদের মধ্যে জাগে বিরাটের বোধ, আমাদের ক্ষুদ্র অহংয়ের গণ্ডীলুপ্ত হইয়া যায়, আমরা সেই এক অদ্বিতীয় সত্তার সহিত একত্ব অনুভব করি, তাহাই হইয়া উঠি। "উপনিষদ বিদ্যা এরূপে আমাদের সত্তার সব লাঘবতা দূর করে, ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মশক্তিতে পূর্ণ করে। অবশেষে সনাতন নৈঃশব্দরূপ চরম সার্থকতায় প্রতিষ্ঠিত করে।" এই বিরাটের বোধই হইতেছে উচ্চতম অধ্যাত্মজীবনের ভিত্তি। "চাই ব্যাপকত্ব, বিরাটত্ব—যে বিরাটের ভেতর জীবনের সকল প্রবাহ, সব স্পন্দন গরীয়ান, মহীয়ান হইয়া উঠে।" উপনিষদ তাই নানাভাবে এই বিরাটের বোধকে দৃঢ় করিবার ইঙ্গিত দিয়াছে।

উপনিষদের দৃষ্টি অন্তর্মুখী—নিজের অন্তরের ভিতর সন্ধান করিয়াই মানুষ আত্মার সন্ধান পায় এবং সেই আত্মাকে জানিলে ভিতরে বাহিরে আর কিছুই জানিতে বাকী থাকে না, কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি। (মুণ্ডক, ১।১।৩) বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তির বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সাধারণতঃ আমরা স্বপ্নকে মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকি, কিন্তু "স্বপ্ন জগৎও জগৎ। এই জগতের দ্রষ্টা ও ভোক্তা আত্মা। স্বপ্নের সৃষ্টি বলে এর কোন খর্ব্বতা নেই।" বাসনার চরিতার্থতা লইয়াই সাধারণ জীবন—জীবনে আমাদের যে-সব বাসনা পূর্ণ হয় না, স্বপ্নের মধ্যে অতি সহজেই সে-সব পূর্ণ হয়, এবং যতক্ষণ সে স্বপ্ন চলিতে থাকে তাহার ভোগ জাগ্রত জীবনের ভোগ অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহে। আর আমাদের অর্দ্ধেক জীবনই ত নিদ্রা, স্বপ্ন—

আধ জনম হাম নিঁদে গোঁয়াইনু।

এইভাবে স্বপ্ন জগতকে দেখিলে আমাদের বাসনা

অতৃপ্তির দুঃখ অনেকটা লাঘব হয়। অন্যদিকে জাগ্রত জীবনকেও এক রকম স্বপ্ন বলিয়াই অনুভব করিতে পারা যায়—কারণ তাহারই বা স্থায়িত্ব কতটুকু?

কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।

এইভাবে সংসারের অনিত্যতা যতই উপলব্ধ হয়, তেমনই নিত্য শাশ্বত আমার অনুভূতি দৃঢ় হয়। জীবনে একটা অনাশক্তভাব আসে এবং এই অনাশক্তিই আমাদিগকে সংসারের সকল দুঃখ হইতে চির-মুক্তি প্রদান করে। তখন আমরা এক নূতন দৃষ্টি লইয়া জগতকে দেখিতে পারি, একান্তভাবে নিজের ক্ষুদ্র বাসনা কামনার তৃপ্তির দ্বারা অল্প সুখের জন্য ছুটাছুটি না করিয়া, ব্রহ্মের আত্ম-প্রকাশরূপ জগৎ-লীলায় যে আনন্দ তাহা উপভোগ করিতে পারি—সকল বস্তু, সকল ঘটনার মধ্যেই এক আত্মা, এক ব্রহ্মকে দেখিয়া চিরশান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হই।

যস্মিন সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈ বা ভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত॥
—ঈশ ৭

ইহাই উপনিষদের বাণী। আত্মায় শোক নাই, দুঃখ নাই, মোহ নাই, মৃত্যু নাই—ইহা আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে, অন্তর্মুখী হইয়া ইহাকে জানিলে, ইহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেই আমরা অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি।

কিন্তু উপনিষদের এই শিক্ষার ফল ভারতের জাতীয় জীবনের উপর খুব ভাল হয় নাই। বৈদিক ঋষিরা যে বাহিরের জীবনকে রূপান্তরিত করিয়া সেখানেই অমৃতত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন, জীবনে, জগতে, যে আনন্দ-ধারা অনুস্যূত রহিয়াছে তাহা পান করিতে চাহিয়াছিলেন এবং সোমরস প্রস্তুত করার রূপকের ভিতর দিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছিলেন, ভারতবাসী ক্রমশঃ সে আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়া পড়ে, জগতকে, জীবনকে ছাড়িয়া আত্মার মধ্যে যে আনন্দ ও অমৃতত্ব রহিয়াছে তাহাকেই পরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করে।

উপনিষদের সাধনার চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "কাল ও দেশের অতীতে সর্ব্ব সম্বন্ধশূন্য হয়ে চেতনার স্বরূপ বোধে অবস্থিতিকে চরম মুক্তি বলে গ্রহণ করা হয়েছে। চেতনার যেখানে বিকাশ সেখানে ছন্দও আছে, কিন্তু জীবনের ছন্দ যেখানে সম্পূর্ণরূপে লয় পায়, সেখানেই উচ্চতর সত্তার সন্ধান পাই। জীবনের সকল চাঞ্চল্য সেখানে তিরোহিত, জ্ঞানের স্ফুরণ সেখানে নিত্য এবং সত্য সেখানে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত।"

এই মুক্তি লাভের সাধনাই ভারতবাসীকে সংসারে বিমুখ করিয়াছে। সকলেই কিছু বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস অবলম্বন করে নাই, করিতে পারে নাই, কিন্তু সংসারকেও তাহারা ভাল চক্ষে দেখিতে পারে নাই। ইহারই চরম পরিণতি হইয়াছে শঙ্করের মায়াবাদে। সম্ভবতঃ এইটি মানব চরিত্রে অপরিহার্য্য। একবার একদিকে সে ঝুঁকিয়া পড়িলে আর বিপরীত দিকে ফেরা তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব না হইলেও অতিশয় কঠিন হইয়া পড়ে। মানব জীবনকে দিব্য ভাবে রূপান্তরিত করিতে হইলে আগে আত্মার চৈতন্যে, ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেই হইবে —কারণ এইটিই হইতেছে ভিত্তি—কিন্তু সেখানে গিয়া থামিয়া যাইলে চলিবে না, ব্রহ্মকে লাভ করিবার পর যে নূতন দৃষ্টি খুলিবে সেই দৃষ্টি লইয়া জগৎকে দেখিতে হইবে। তখন যে অধ্যাত্ম শক্তিলাভ হইবে সেই শক্তি লইয়া বাহিরের জীবনকেও রূপান্তরিত করিতে হইবে। উপনিষদের মধ্যে ইহারও ইঙ্গিত রহিয়াছে, কিন্তু একদিকে ঝোঁক দিতে গিয়া ভারতবাসী এই দিককার ইঙ্গিতগুলি ঠিক মত ধরিতে পারে নাই। সেই জন্যই ক্ষতিপূরণ হিসাবে জগন্মাতা পাশ্চাত্য জাতিকে বহির্মুখী করিয়াছেন। তাহারা অন্তরের সন্ধান ছাড়িয়া বহির্জগতের মধ্যেই সত্যের সন্ধান করিয়াছে, অন্তরের রূপান্তরের উপর ঝোঁক না দিয়া বাহিরের জীবনকেই উন্নত ও রূপান্তরিত করিবার সাধনা করিয়াছে এবং এইদিকে তাহারা অনেকখানি সাফল্যও লাভ করিয়াছে। উপনিষদের ঋষিগণ অন্তর্মুখী হইয়া যে ব্রহ্মের সত্য লাভ করিয়াছিলেন, আজ পাশ্চাত্য জগৎ জড় বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া সেই একই সত্যে উপনীত হইতেছে, তাহারা উপলব্ধি করিতেছে যে, এই আশ্চর্য্যময় বিরাট জগৎ একই অদ্বিতীয় শক্তির খেলা, এবং সেই শক্তি চৈতন্যময়। উপনিষদের দৃষ্টি যদি মানব জাতিকে ইহার জন্য প্রস্তুত

করিয়া না রাখিত তাহা হইলে জড় বিজ্ঞানের এই অধ্যাত্ম পরিণতি সম্ভব হইত না। আর পাশ্চাত্য জাতি যদি বাহ্য জীবন ও জড় বিজ্ঞানের উপর ঝোঁক না দিত তাহা হইলে ভারতবাসীও তাহাদের সংসার বিমুখতাকে জয় করিয়া ইহ জীবনেই অমৃতত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্ণতম আদর্শটিকে ধরিতে পারিত না। আত্মায় অমৃতত্ব সকল সময়েই রহিয়াছে, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই দেহ, প্রাণ, মনের জীবনে অমৃতত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, এই মর্ত্ত্যের পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্যের অভ্যুত্থান করিতে হইবে, ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্। ইহা শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বা সামাজিক সংস্কারের দ্বারা সাধিত হইবে না, ইহা শুধু কতকগুলি মানসিক বা নৈতিক আদর্শের অনুসরণের দ্বারাও হইবে না—এই সবেরই মূলে চাই গভীর অধ্যাত্ম দৃষ্টি ; এই সবকেই অধ্যাত্ম ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে হইবে। বিশ্বকে ছাড়িয়া আধ্যাত্মিকতা নহে, এ বিশ্বময় আনন্দ বোধই প্রকৃত ব্রহ্ম জ্ঞান। "পৃথিবী মধু, ভূত সকল পৃথিবীর মধু।" উপনিষদের এই দৃষ্টি লইয়া জগতকে দেখিলে তবেই জীবনের দিব্য রূপান্তর সম্ভব হইবে। শ্রীঅরবিন্দ এই আদর্শটিই আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া ধরিয়াছেন—"যে দিন জ্ঞান কর্ম্ম ও ভাবের সামঞ্জস্যে ও একীকরণে আত্মগত ঐক্য দেখা দিবে, সমষ্টিগত বিরাট পুরুষের ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায়, সেদিন জগন্নাথের রথ জগতের রাস্তায় বাহির হইয়া দশদিক আলোকিত করিবে। সত্যযুগ নামিবে পৃথিবীর বক্ষে, মর্ত্ত্য মানুষের পৃথিবী হইবে দেবতার খেলার শিবির, ভগবানের মন্দির নগরী, Temple city of God—আনন্দপুরী।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উপনিষদের মধ্যেই এই দিব্য জীবনের ইঙ্গিত রহিয়াছে এবং মহেন্দ্রনাথ তাহারও পরিচয় দিয়াছেন। "বৃহদারণ্যকোপনিষদে মধুবিদ্যার কথা বলা হয়েছে। বিশ্বের সর্ব্বপদার্থের আনন্দরূপ আছে। সকলের ভেতরই ব্রহ্মানন্দের স্ফূর্ত্তি হয়। এই আনন্দ থাকে ওতপ্রোতভাবে। মধুবিদ্যায় বিশ্বের একটি আনন্দরূপের ছবি দেওয়া হয়েছে। এ শুধু আনন্দের আনন্দ মাত্র অনুভূতি নয়, আনন্দের উৎসব। আনন্দে বিশ্ব উদ্বেলিত। সকলে

কোনটি শ্রেষ্ঠ।

সমুদ্র মন্থনে শ্রেষ্ঠ—"শ্রী"
প্রাকৃতিক শোভায় শ্রেষ্ঠ—শ্রীনগর
বৈষ্ণবদের কাছে শ্রেষ্ঠ—শ্রীধর
মানবদেহে শ্রেষ্ঠ—শ্রীরাম
মহাভারতে শ্রেষ্ঠ—শ্রীকৃষ্ণ
ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—শ্রীফল
ফুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—শ্রীপর্ণ
কাষ্ঠের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—শ্রীখণ্ড
অবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—শ্রীঘন
দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—শ্রীনাথ
সওদাগরের শ্রেষ্ঠ—শ্রীমন্ত
বঙ্কিম চরিত্রের শ্রেষ্ঠ—"শ্রী"
শরৎ উপন্যাসে শ্রেষ্ঠ—শ্রীকান্ত
নামের আগে শ্রেষ্ঠ—শ্রী
পড়ুয়াদের কাছে শ্রেষ্ঠ—শ্রীপঞ্চমী
নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ—শ্রীমতী
ইংরাজের দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—"শ্রীঘর"
গৌরাঙ্গ সহচরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—শ্রীবাস
বৌদ্ধযুগের শ্রেষ্ঠ—মঞ্জুশ্রী
ঘৃতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঘৃত—"শ্রী"

আনন্দ, সকলেই অন্যের ভেতর আনন্দ আস্বাদ করে। প্রত্যেকে হয় প্রত্যেকের আনন্দ।" তাহা হইলে এই জগতকে, জীবনকে মিথ্যা, মায়া বলিয়া আত্মার নৈঃশব্দের মধ্যে চির নির্ব্বাণ-লাভের সার্থকতা কি? উপনিষদের দৃষ্টি খণ্ডের ভিতর সন্ধান পাইয়াছে অখণ্ডের, বৈষম্যের ভিতর সন্ধান পাইয়াছে পরম সমতার। এ দৃষ্টি স্ত্রীপুরুষের ভিতর, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চণ্ডালের ভিতর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে মৈত্রী, সমতা ও স্বাধীনতা। "শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পরাতত্ত্বকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হয়েছে, যে ব্রাহ্মণ তাকে ব্রহ্ম হতে ভিন্ন মনে করে সে সত্য হতে চ্যুত হয়। যে বৈশ্য তাকে ব্রহ্ম হতে ভিন্ন মনে করে সে মিথ্যার আচরণ করে। উপনিষদের দৃষ্টির গভীরতা এখানেই, ভেদের ভেতর অভেদকে দেখা, সসীমের ভেতর অসীমকে অনুভব করা। এ অনুভূতি যখন শুদ্ধ হয়ে জাগ্রত হয়, তখনই মানুষ তার প্রকৃতিগত বৈষম্য বা সঙ্কীর্ণতা মুক্ত হয়ে বিরাটের অনুসন্ধান পায়।" এই বিরাটের অনুভূতির উপর দিব্য মানব সমাজের প্রতিষ্ঠাই মর্ত্ত্যে মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য।

অনিলবরণ রায়

বাদল রাতে

শ্রীমতী বাসন্তী সেন বি-এ

সজল মেঘে ঢাকা কাজল রাতি,
বিজন গৃহকোণে নাহিকো বাতি,
তোমার ঘন-কালো আঁখির তারা,
সুদূর নভ পারে হয়েছে হারা।

বাতাস দুলাইল মেঘের ভেলা,
বলাকা তারি তলে করিছে খেলা।
দাদুরী কহে আজি করুণ কথা,
মেঘের আঁখিজলে কাঁপিছে লতা।

উদাস মেঘ হেরি বিরহী হিয়া,
ছুটিয়া চলে যেথা পরাণ-প্রিয়া,—
মনের যত বাধা যায় যে টুটি,
নিখিল প্রাণ আজি পেয়েছে ছুটী।

নীরব রাতি বঁধু নীরব গেহ,
সবাই ঘুমে ঘোর জাগেনি কেহ;
আমার মনোধারা তোমার মনে
মিশেছে এ নিশীথে এ শুভক্ষণে।

সুদূর মোরে আজি উঠেছে ডাকি,
কি ক'রে আপনারে লুকায়ে রাখি!
মধুর গীতি তব শুনায়ে প্রিয়,
সকল মলিনতা ঘুচায়ে দিও।

পুস্তক-পরিচয়
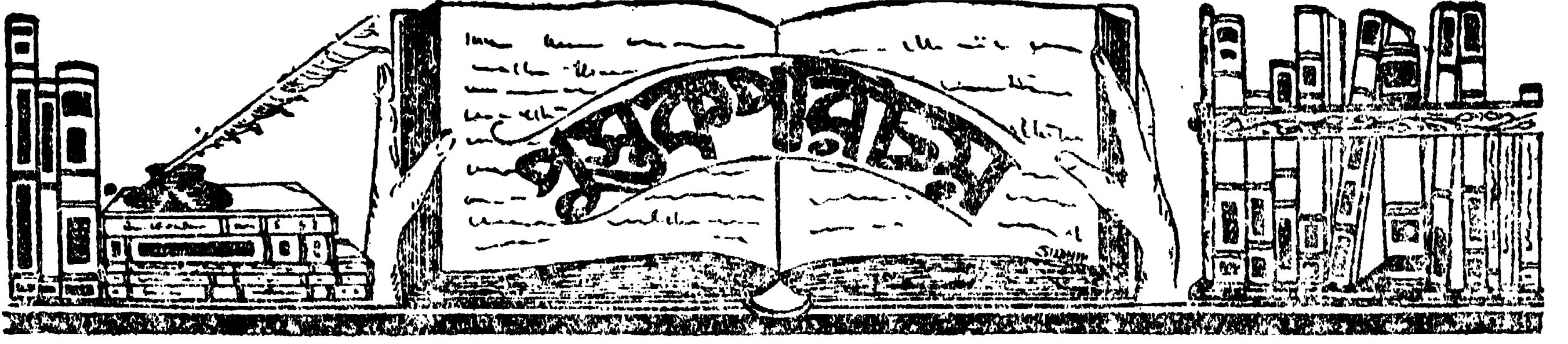
শেলী-সংগ্রহঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র অনূদিত: বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা, পত্র সংখ্যা ১—৮০।

রবার্ট ব্রাউনিঙের বহু বিখ্যাত কবিতার বাঙলায় অনুবাদ করিয়া ইতিপূর্ব্বেই মৈত্র মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতির আসন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদের একটী বিশিষ্ট ধর্ম্ম আছে: ইহা তথাকথিত তর্জ্জমা নয়। মূলের রসরক্ত ভাবের জারকরসে পরিপাক হইয়া ইহা এক অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করে। ফিট্‌জ্‌জেরাল্ড্‌-এর রুবায়তি অনুবাদে আমরা ইহাঁর কতকটা আভাস পাই। রবীন্দ্রনাথের বহু অনুবাদেও আমরা এই রূপান্তর লক্ষ করিয়াছি। অনেকের মতে কোনও কবিতার ভাষান্তর সম্ভবপর নহে। ভাষার পুষ্টি ও বিকাশের পথে এই নীতি সর্ব্বথা প্রযুজ্য নহে। 'অক্‌স্‌ফোর্ড বুক্‌ অফ্‌ গ্রীক্‌ ভার্স' আমাদের উক্তি সমর্থন করিবে।

বাঙলাদেশে শেলীর প্রেরণা শতাব্দী ছাড়াইয়া গিয়াছে। এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রাক্কালেই শেলীর গীতি কবিতা তদানীন্তন শিক্ষিত মহলে যথেষ্ট সমাদর পাইয়াছিল। শেলীর প্রেরণায় বহু শিক্ষিত তরুণ অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙলা সাহিত্যে ও ইংরাজী সাহিত্যে যশ অর্জ্জন করেন। শেলীর ভাবধারায় যে সঙ্গীত ও প্রকাশ ভঙ্গী আছে, তাহা বাঙলায় রূপান্তরিত করিতে হইলে কবির অনুভূতি, প্রেরণা ও শক্তির প্রয়োজন। মৈত্র মহাশয় বয়োবৃদ্ধ হইলেও যে তরুণ মনের পরিচয় দিয়াছেন এই অনুবাদ কার্য্যে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। 'এডোনেইস', 'প্রমিথিউস', ওয়েষ্ট উইণ্ড', প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত কবিতাগুলি অনুদিত মূর্ত্তিতে বহুস্থলে মূল কবিতা বলিয়া ভ্রম হয়। অনেকস্থলে মৈত্র মহাশয় যে ভাষা নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মূলে আছে তাঁহার সংস্কৃত ভাষার উপর অধিকার। শব্দের ব্যঞ্জনায় ইহা বিশেষ করিয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। এই শব্দ-মঞ্জুষার ভাগ্যবান্ ভাণ্ডারীকে আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি।

শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ

খ্যাতির বিড়ম্বনাঃ—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক দেব সাহিত্য কুটীর ২২।৫ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা। ১১৪ পৃষ্ঠা মূল্য বারো আনা।

বইখানি ছেলেদের উপযোগী করিয়া লেখা এবং শিশু সাহিত্যের একখানি বই বলিয়া মলাটের উপরে এবং ভিতরে ছবি দিয়া সজ্জিত করা হইয়াছে। কিন্তু আমার পড়িয়া মনে হইল পরিণত বয়স্ক পাঠক পাঠিকাদেরও ইহাতে জ্ঞান আহরণ করিবার অনেক বস্তু আছে।

সাধারণত আমাদের শিশু সাহিত্যে অ্যাড্‌ভেঞ্চার বলিতে ভূত প্রেতের গল্প কিম্বা রাক্ষস খোক্কসের গল্প বুঝায়। অপরিণত বয়সে শিশু মন এই ধরণের অবাস্তব গল্প পড়িয়া সাহস লাভ করা ত দূরের কথা, অকারণ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া ওঠে, ইহা আমি নিজের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি। সেই কারণে এই ধরণের গল্প লেখার প্রতিবাদও করিয়াছি। এইবার দেখিয়া সুখী হইলাম উল্লিখিত পুস্তকের লেখক পরিচিত পন্থা পরিহার করিয়া মুষ্টি যুদ্ধ এবং

আনুষঙ্গিক ব্যায়ামের ঘটনাবলী দ্বারা শিশু-মনকে জয় এবং ভবিষ্যতে এই শারীরবিদ্যার প্রতি তাহার অনুরূপ অনুরাগ জন্মাইবার সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

লেখক জো নামক এক অতিকায় নিগ্রোর চরিত্র যাহা অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা অনবদ্য হইয়াছে। একজন অর্দ্ধশিক্ষিত নিগ্রোর ভিতর যে এতটা সহানুভূতি এবং সৎসাহস লুক্কায়িত থাকিতে পারে তাহা আন্দাজ করা সহজ ছিল না। চিতাবাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জো যখন মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইল, অথচ মুখে সে বিষয়ে একবার উচ্চবাচ্য পর্য্যন্ত করিল না, তখন চোখের জলের সঙ্গে বলিয়াছি, সাবাস্। ইংহারাই সত্যিকারের মরা মরিতে জানে। কিন্তু হেঙ্গলারের বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার মনে একটু খটকা আছে। সে একটা বড় সার্কাসের অধিকারী—সে যে সঞ্জীব রায়ের মত একজন খ্যাতনামা মুষ্টিযোদ্ধাকে গুম করিয়া সহজে রেহাই পাইবে না ইহা তাহার বোঝা উচিত ছিল। সে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করিবার মানসে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিল তাহা তার বুদ্ধির পক্ষে প্রশংসনীয় নহে।

সিঙ্গাপুর থেকে স্থলপথে সঞ্জীব এবং জোর পলায়নের যে চিত্র লেখক দিয়াছেন তাহাতে সকলের ভৌগলিক জ্ঞান বাড়িবে।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

স্বস্তিকা

শ্রীসৌম্যেন্দ্র সান্যাল

হৃদয়ের অন্তঃপুরে নিবে আসে শ্রান্ত দীপশিখা,
হে মহেন্দ্র দেহ স্বস্তি ; দাও ফেলি ঘন-যবনিকা
দ্বারপ্রান্তে মোর ! সমাপ্তি সন্ধ্যায়
আজি থেমে যাক্ সব
পশ্চিম তপন সম হৃদয়ের সর্ব্ব কলরব !
মুহূর্ত্তে মিলায়ে যাক নিদারুণ নিঃসহ যৌবন
অনন্ত নির্ব্বাণে ! নিশীথের নিবিড় বন্ধন—
লুটাক্ ধূলার মাঝে ছিন্ন-ভিন্ন ধূলিক্লিন্ন হ'য়ে।
মনে রেখো হে অচেনা, একদিন বড় অসময়ে
মেনেছিনু তোমার আদেশ !!
আজি স্বস্তি চাহি !!
আনন্দে চলিবো ধেয়ে চেতনার ভগ্ন তরী বাহি.
অতীন্দ্রিয় মহালোকে। এ হৃদয়ে সে ধ্বনি রণিতে
তোমার তর্পণ করি বক্ষদীর্ণ সন্তপ্ত শোণিতে
মিটায়েছি তৃষ্ণা ধরণীর ! বুঝায়ে দিয়েছো রসময়
অনির্ব্বাণ জ্বালা হয়ে বক্ষ-মাঝে রয়েছো নির্দ্দয় !
ঝঞ্ঝাঘাতে যাক্ খসি ঝরি'
ভালোমন্দ দ্বিধাদ্বন্দ্ব, হৃদয়ের কুসুম-মঞ্জরী !
শান্তি চাহি হে ঈশ্বর। হেরি মোর বাতায়ন তলে
নিভে আসে মহাসূর্য্য ! রক্তরাঙা পশ্চিম অচলে
বিদায় বাণীতে লেখা সকরুণ মহা ইতিহাস
শতাব্দির নিষ্ঠুর গ্লানিমা। বাতাসের হাহাশ্বাস্
অকালের বৈজয়ন্তী ঘোষিতেছে চির-নিরন্তর,
তার মাঝে থাকি' থাকি' চমকিয়া উঠিছে অন্তর—
—চাহিয়া পাইনি যারে আজি তারে বৈরাগ্য বন্ধনে
একেবারে বেঁধে লব বারেকের আকুল ক্রন্দনে !!
আমার ভিতরে আমি পূর্ণ বেগে জাগিয়াছি আজ
চেতনার স্বর্ণপটে চিরকাল করিবো বিরাজ,—

নহে কভু দাসত্বের সাজে ? ধরণী আমার
সকলই আমার প্রাণ সবকিছু আমারই আধার
এই বোধ জাগিয়াছে মনে। আপনার বিশ্বপ্রেমে
মাতাবো বিশ্বের মন,—সিংহাসন হ'তে নেমে
সকলেরে বক্ষে তুলে লব। তুমি নাহি দাও,
মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে এ অন্তর না যদি রাঙাও
ত্রিদিবের আশীর্বাদ কোনো কালে নাহি যদি ঝরে
আমার এ ধরণীর মসীলিপ্ত দীর্ণ বক্ষপরে
বোধের আড়ালে থেকে নিজেরেই দিয়ে যাবো ভার
অন্তরের প্রেম দিয়ে জাতিহীন বিশ্ব রচিবার !!
হে আদি সৃজনমন্ত্র অনাদি স্বস্তিকা
আজও কি প্রদীপ্ত ঐ ধরণীর আবর্জ্জনা লিখা
ললাটে তোমার ? চিরমুক্ত ? কূপের গহ্বরে !

বিশ্ব-যোড়া দুঃস্থ ভার-নির্য্যাতীত ভগ্ন বক্ষপরে
কেন আজি গ্রহণের ছল ? অস্থায়ী এ ধরণীর
এ রহস্য-লীলা হেরি হয়ো না অস্থির
কাঁদিও না কারও তরে। দুর্বিবষহ যত দুঃখ শোক্
অনন্ত বেদনা গ্লানি নিঃশেষে দহুক মর্ম্মলোক্,
তুমি শুধু হে স্বস্তিকা রহ স্থির, হোক্ নিরাজন,
বাজুক বিজয়া-বাদ্য অট্টরবে—না হ'তে বোধন !
এই তব কর্ম্ম হোক প্রিয়
সুপ্তিরূপে চুপে চুপে বিশ্বজনে নিঃশব্দে কহিও
"পশ্চাতে এসেছি ফেলি অতীতের অস্ত অন্ধকার
পূর্ণতার বক্ষে আজি অপূর্ণের হীন অবিচার
বরি' স্তব্ধতায় !
তবু জেনো মনে
নির্ব্বাপিত রেশরশ্মি আজিকে জ্বলিবে শুভক্ষণে
রহিতে মূকের মত মৌন মন্ত্রে দিব দণ্ড তার"
চিরলগ্ন মগ্ন যেথা বন্ধাহীন বিশ্ব পারাবার !!

শ্রীসৌমেন্দ্র সান্যাল

বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যে মানবতা

শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, সি-এ-আই-বি

একটা জাতির মনের বিকাশ এবং ভাব তাহার সাহিত্যের ভিতর দিয়া যতটা ফুটিয়া উঠে এতটা আর কিছুর ভিতর দিয়া উঠে না। মনোজগতের অবিরাম যে গতি যাহা দিকে দিকে নব নব ধারায় ছড়াইয়া পড়ে দেশের সাহিত্যে তাহার একটা চিরস্থায়ী চিত্র অঙ্কিত হইয়া যায়।

কথা-সাহিত্য অর্থাৎ মহাকাব্য, কাব্য, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতির ভিতর দিয়া মানব চিরদিন তাহার জাতিগত মনস্তত্বের পরিচয় দিয়া আসিতেছে।

আমাদের দেশে মহাকবি বাল্মিকী ও ব্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গের বৈষ্ণব কবিকুল পর্য্যন্ত তাঁহাদের কাব্যের ভিতর দিয়া মানবকে দেবতার অবতার বলিয়া অথবা শুধু দেবতারই পূজা করিয়া আসিয়াছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য-জগতে ফরাসী বিদ্রোহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেবতারই স্তুতিগানে সাহিত্য মুখরিত। মনে হয় ফরাসী বিদ্রোহের পর হইতে মানব মনুষ্যত্বকে সম্মান করিতে শিখিল পাশ্চাত্য জগতে। দরিদ্রের এবং নিম্নশ্রেণীর নরনারীর ভিতরও যে দেবতা আছেন এবং নিদ্রিত দেবতা সুযোগ পাইলে যে জাগিয়া উঠেন এই চিন্তা ধারাটী সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ধূমায়িত বহ্নির মত জ্বলিতে জ্বলিতে আজ সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যের ভিতর দিয়া পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

Christ তাঁহার উপদেশাবলীর ভিতর বলিয়াছেন পাপীকে ঘৃণা করিও না, পাপকে ঘৃণা করিও। এ উপদেশের উদাহরণ স্বরূপ তিনি পতিতা মেরী ম্যাগডেলেনকে উদ্ধার করিয়া চরণে স্থান দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশের পর শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যে চিরদিন অধঃপতিত জাতির উপর অত্যাচার ও নিম্নশ্রেণী মানবকে পশুর মত ব্যবহার করা হইয়াছে। মানুষের মত মানুষকে সম্মান করিতে শিখাইল পাশ্চাত্য জগতে যখন ফরাশী বিদ্রোহ তখন বিদ্রোহী অস্ত্রে অনুপ্রাণিত ইউরোপীয় সাহিত্য গাহিতে লাগিল মানুষের জয় গান। এই যে জয়গান মুখরিত সাহিত্য ইহা গতানুগতিক Classicismএর বিরুদ্ধে Romanticismএর অভিযানের একটী দিক। Shellyর Promethius Unbound এযুগের এই চিন্তাধারার একটী বিশিষ্ট উদাহরণ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমাদের বঙ্গ সাহিত্যে মানবকে সম্মানের আসন দেওয়া এবং নিম্নস্তরের মানবকে সম্মানের চোখে দেখা বড় প্রাণস্পর্শী ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে কবি চণ্ডীদাসের কবিতার ভিতর। তাঁহার সহিত রজকিনী রামীর আধ্যাত্মিক প্রেমলীলার কথা সকলেই জানেন। তিনি এই সময়ে জগতকে শুনাইলেন—

> চণ্ডীদাস কহে বিনয় বচনে—শুনহে মানুষ ভাই
> সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

এই কথাগুলি এবং—

> রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়

অথবা,

> ওগো রজকিনী রামী
> ওদুটী চরণ শীতল জানিয়া
> শরণ লইনু আমি।

মানবকে যে কত উচ্চে স্থান দিয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আরও বিস্মিত হইতে হয় এই ভাবিয়া যে কত বড় মনের শক্তি থাকিলে সে যুগের বাংলায় তিনি এ কথা লিখিতে পারিতেন, কেননা তখন বঙ্গে সংস্কারের হোমশিখা এখনকার মত এত প্রবলভাবে জ্বলিয়া উঠে নাই।

আধুনিক যুগে অর্থাৎ নব বঙ্গ সাহিত্যে যাহা রবীন্দ্র-নাথের যুগ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে সে যুগে নবীন

চন্দ্রের কাব্যের ভিতর এই ভাবটী দেখিতে পাই—তিনি তাঁহার কাব্যের এক জায়গায় বলিয়াছেন—

দেবতার ঊর্দ্ধে তব মানবের স্থান।

কিন্তু এযুগে এ ভাবটীর পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের "বৈষ্ণব-কবিতা" শীর্ষক কবিতাটীর ভিতর। প্রকৃত পক্ষে এই প্রবন্ধটীকে আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় বস্তুর প্রকৃত উদাহরণ বলিয়া ধরিতে পারি। কবি এই কবিতার ভিতর দেবতার কল্পনা ও দেবতার লীলা যে বিশ্বের নিখিল নরনারীর প্রতি দিবসের আর প্রতি রজনীর তপ্ত প্রেমতৃষার ইতিহাস হইতে ধার করিয়া লওয়া তাহাই বলিতে চাহেন। এই যে ভাবটী ইহাকে পুরাপুরি Romantic বা নবজগতের ভাব বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। দেবতাকে মানুষের সমান আসনে সমান করিয়া দেখানো পূর্ব্বতন যুগের নীতিবাদি কবিকুল হয়ত কল্পনা করিয়া দেখিতেও সাহস করিতেন না। কিন্তু যিনি বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান চিন্তাধারার ভিতর একটা মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়া এক মহাসাহিত্যের রচনা করিয়াছেন তিনি নবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কহিলেন—

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেম ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ তাপিত ? হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে ?
বিজন বসন্ত রাতে মিলন শয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটী বাহুডোরে
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে'
রেখেছিনু মগ্ন করি ? এত প্রেমকথা
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ কার
আঁখি হতে ? আজ তার নাহি অধিকার
সে সঙ্গীতে ?

যে মন্ত্র বঙ্গসাহিত্যে কাব্য-জগতের ভিতর সঞ্চারিয়া উঠিতেছিল তাহা আরও কিছু পরে গভীরতর ভাবে প্রকাশ পাইল উপন্যাস জগতের যাদুকর শরৎচন্দ্রের উপন্যাসরাজির ভিতর।

পতিত সমাজ-প্রপীড়িত অসহায় মানব মানবীর জন্য দরদীর সমবেদনা লইয়া প্রত্যক্ষদর্শীর মমতা লইয়া ইনি সাহিত্যে এই নব চিন্তাধারার চরম পরিণতি করিলেন। বিগত বিশ বৎসর ধরিয়া গদ্য সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের যুগ চলিয়া আসিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ যুগের যুগধর্ম্ম, দুঃস্থ, পীড়িত নরনারীর অন্তরতম মৌন বেদনা সাহিত্যের ভিতর মুখর করিয়া তোলা। সমাজপীড়িতা 'জ্ঞানদা" "রমা" "সরযূ" "ষোড়শী" আমাদের মনকে যেন ব্যথায় ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। কিন্তু চিন্তারাজ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত করে তখন যখন আমরা তাঁহার, "অন্নদা দিদি ও অভয়া", "পিয়ারী ও কিরণময়ী," "সাবিত্রী ও বিজলীর" সম্মুখে উপস্থিত হই। এসব চরিত্রগুলি এত বিখ্যাত যে ইহাদের প্রত্যেকের বিস্তৃত বিবরণ দিয়া আপনাদের সময় নষ্ট করিব না। সমাজত্যক্তা ঘৃণ্য এই যে পতিতা নারী সমাজ কীটের মত আমাদের জাতীয় মর্ম্মস্থল কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছে ইহাদের মর্ম্ম ব্যথার ইতিহাস যখন তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব রচনার ভিতর দিয়া আমাদের জড়বৎ সমাজের উপর ছড়াইয়া দিলেন তখন আমাদের সাহিত্যে তিনি Tolstoy, Gorky, Bernard Shawর মত একটা বিদ্রোহ সৃষ্টি করিলেন মানবকে রক্ষা করিতে। এখানে যেন মূর্ত্ত হইয়াছে চণ্ডীদাসের প্রবল সত্য—

শুনহে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

নরজগতের প্রলোভনের তাড়নায়, শিক্ষা এবং সংযমের অভাবে কত সহস্র নরনারী ধীরে ধীরে নানা দিক দিয়া রসাতলের যাত্রী হইতেছে তাহাদের করুণ ইতিহাস বহু দিন, পর্য্যন্ত আমাদের সাহিত্যে স্থান পায় নাই। পাইলেও তাহাতে সমবেদনার নাম গন্ধ নাই। পাপের পরিণাম দেখাইবার জন্য পূর্ব্বে পাপীর চিত্র আঁকা হইত এবং পাপীর সহিত তুলনায় গ্রন্থের সর্ব্ব দোষত্রুটী-হীন, এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নায়ককে বড় করিয়া দেখান হইত। বঙ্কিম-সাহিত্যেও এ বিষয়ের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ইহার পরম পরিচয় পাই "চন্দ্রশেখরের" "শৈবলিনীর" চরিত্রে। "শৈবলিনী" চরিত্রের স্বাভাবিক

গতি ও পরিণাম শেষ অবধি বজায় রাখিতে বঙ্কিমচন্দ্র সাহস করেন নাই। তাহাকে অনুতপ্ত করাইয়া, স্বপ্ন দেখাইয়া সন্ন্যাসী প্রভৃতি আনিয়া তাহার পাপ ও মলিনতা শুদ্ধি করাইয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু পাপীকে শেষ অবধি সরল, সোজাসুজিভাবে পাপী রাখিয়া তাহাতে সমবেদনার ছাপ দিয়া যে সব চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন সেগুলি পুরাতনপন্থী নীতিবাদিদের হয়ত বিরক্তি সৃষ্টি করিল কিন্তু মনস্তত্ত্বের এবং মানবতার দিক দিয়া হইয়া রহিল এক একটী বড় বড় সৃষ্টি। যেমন ধরুন "কিরণময়ী" চরিত্র। অপূর্ব্ব সুন্দরী, শিক্ষিতা, কিরণময়ী জীবনে কোন দিন কারো কাছে সমবেদনা বা ভালবাসা পায় নাই। অথচ উপবাসী চিত্তের প্রবল ক্ষুধা তাহাকে পাগল করিয়া ফেলিয়াছে তাই সে স্বামীর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে পথভ্রষ্টা। তারপর যথার্থ ভাবে প্রেমে পড়িল উপেন্দ্রের। প্রাণভরা ব্যাকুলতা লইয়া করিতে গেল আত্মনিবেদন, পাইল নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান। প্রতিহিংসার নেশায় পাগল হইয়া সে উপেন্দ্রের প্রিয় ছাত্র ও আত্মীয় দিবাকরকে লইয়া করিল গৃহত্যাগ। ঠিক এই পর্য্যন্ত কিরণময়ী চরিত্র Salome বা Cleopatraর মত একটা মহা-উন্মাদতার জ্বালায় ক্ষিপ্তা উল্কার মত মহাশূন্যে তীব্র দ্যুতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ চরিত্রটীর একটী অদ্ভুত বিকাশ হইল আরাকানে। আরাকানের "কিরণময়ীর" দিবাকর ও স্থানীয় মাড়োয়ারির হাত হইতে নিজেকে উদ্ধারের জন্য যে প্রাণপণ প্রচেষ্টার ও সহস্র নির্য্যাতন সহ্য করার যে ছবিটী আমরা দেখিতে পাই সে ছবি কিরণময়ী চরিত্রের উপর এমন একটী সমবেদনার ছাপ দিয়াছে এবং তাহাকে এত মহান করিয়া তুলিয়াছে যে সে ছবি দেখিলে অতি বড় নীতিবাদিও 'আহা' না বলিয়া থাকিতে পারে না। আমার মনে হয় এইখানে কিরণময়ী চরিত্রের ও সেই সঙ্গে শরৎ-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। আলো ছাড়া অন্ধকার হয় না, অন্ধকারের পরই আলো দেখা দেয়। কিরণময়ী চরিত্রে এই আলোটুকু দেখিয়াই মনে হয়,—"সত্যিই কি সে পাপিষ্ঠা? করুণ স্পর্শ পাইলে সে কি মহীয়সী নারীরূপে ফুটিয়া উঠিতে পারিত না? এজন্য কে দায়ী? কিরণময়ীর পারিপার্শ্বিক আবরণ? না তাহার স্বামী না তাহার সমাজ? তাহার পর তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিল সতীশ। সতীশের নিকট সে যে সমবেদনা পাইল সে সমবেদনা কিরণময়ী জীবনে পায় নাই। কিন্তু এত আঘাতের পর যে শান্তি সে শান্তিও পূর্ণতা লাভ করিতে পারিল না উপেন্দ্রকে মৃত্যুশয্যায় দেখিয়া। এত ঘাত প্রতিঘাতের পর কোন নারী-ই মাথা ঠিক রাখিতে পারে না। তাই কিরণময়ী চরিত্রের পরিণতি হইল তাহার বিকৃত মস্তিষ্ক অবস্থার ভিতর দিয়া। শরৎচন্দ্র অপেক্ষা কোন নিম্নতর রসস্রষ্টা হয়ত কিরণময়ীকে শেষ অবধি হিমালয় প্রবাসিনী, সন্ন্যাসিনী করিয়া কলম ছাড়িতেন।

শরৎচন্দ্রের পর তাঁহার চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যে বহু শক্তিশালী লেখক নির্য্যাতিত নরনারীর করুণ কাহিনী লিখিয়া সাহিত্যকে এই নব চিন্তা-ধারাপুষ্ট করিয়াছেন। তাই মনে হয় এই সাহিত্য-মনস্তত্ত্বের শক্তিমান বিকাশের জোরেই বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যের চিন্তাধারার সহিত সমান তালে তাল রাখিয়া একদিন জগৎ-সাহিত্য সভায় আপনার বিশিষ্ট আসন চিরন্তন করিয়া লইবে।

শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নানাকথা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ—

গত ২৫শে বৈশাখ দিবসে রবীন্দ্রনাথের অষ্টসপ্ততি বৎসর বয়স পূর্ণ হইল। ঐকান্তিক চিত্তে কামনা করি এখনও তিনি বহুকাল ধরিয়া সুখে এবং স্বাস্থ্যে তাঁর গৌরবময় জীবন যাপন করুন, এবং বাঙলা দেশ হইতে উৎসৃষ্ট এই প্রদীপ্ত রবিকিরণ বিশ্বের চতুর্দিক আলোকিত করিয়া থাক।

এ বৎসর জন্মদিনের সময়ে উড়িষ্যা-রাজসরকারের বহু-সম্মানিত অতিথিরূপে কবি পুরীতে সমুদ্রতীরে বাস করিতে-ছিলেন। তৎকালে উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী এবং অপরাপর উচ্চ রাজকর্মচারী প্রমুখ সমগ্র উড়িষ্যাবাসী তাঁহাকে যে অপরিসীম সমাদর এবং সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন সংবাদপত্র পাঠকমাত্রই তাহা অবগত আছেন। এই নিরলস আন্তরিক অতিথিপরতা কবিকে সুপ্রচুর তৃপ্তি এবং সন্তোষ প্রদান করিয়াছে।

পুরী অবস্থান কালে রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যও বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। পুরীর জল বায়ু তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী তাহা এবার নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর গ্রীষ্মকালের কিছুদিন পুরীতে অতিবাহিত করিবার জন্য কবির এ বৎসরের নিমন্ত্রণকারীগণ কবিকে চিরস্থায়ী নিমন্ত্রণ দিয়া রাখিয়াছেন। স্বাস্থ্যের দিক বিবেচনা করিয়া কবির এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার ইচ্ছা আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি উড়িষ্যাবাসীর এই সকল আত্মীয়োচিত ব্যবহার উড়িষ্যার সহিত বঙ্গদেশের মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ়তর করিয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কবি পুরী পরিত্যাগ করিয়া মংপু যাইবার কিছু পরে আমি পুরী গিয়াছিলাম। তখনো লোকের মুখে মুখে কবির কথা, কবির গল্প। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ আসিয়া কিছুকাল বাস করিয়া গিয়াছেন, এই আত্মপ্রসাদে পুরীবাসীর মন তখনো বেশ একটু উত্তপ্ত। সেই উত্তাপ সামান্য রিক্সওয়ালারও মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতে অসমর্থ হই নাই।

চক্রতীর্থের দিকে একেবারে সমুদ্র তীরে অবস্থিত সার্কিট হাউস ভবনে রবীন্দ্রনাথের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। গৃহটি সুপ্রশস্ত এবং আরামপ্রদ। অট্টালিকা গাত্রে বড় বড় ইংরাজি অক্ষরে লিখিত পুরী (PURI) নামটি সৈকতচর নরনারীর দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট করে। সমুদ্রপথযাত্রী নাবিকগণের স্থান নির্ণয়ের সঙ্কেতের জন্য সন্ধ্যার পর এই অট্টালিকার উপর একটি বৃহৎ ও রঙিন আলোক দেওয়া হয়। দিবাভাগে বহু দূরস্থিত জাহাজের উপর হইতেও দূরবীক্ষণের সাহায্যে ইংরাজি অক্ষরে লিখিত পুরী নামটি পাঠ করা চলে।

পুরী—

পুরীতে অল্প কয়েক দিনের অবস্থান কালে যে সকল ব্যক্তি এবং তাঁহাদের কর্মকলাপের সহিত পরিচিত

হইয়াছিলাম তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় সম্প্রতি ব্যাপৃত আছেন তাঁহার সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থের পরিদর্শন (revision) কার্যে। বড় বড় ছয় খণ্ডে এই গ্রন্থ শীঘ্রই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইবে। প্রতি খণ্ডে চার পাঁচ শত পৃষ্ঠা। পঁচিশ বৎসরের ঐকান্তিক সাধনার ফল। বিষয়বস্তু শ্রীচৈতন্য এবং উড়িষ্যা। সমগ্র গ্রন্থটি বাঙলা ভাষায় লিখিত। গ্রন্থটি যে বিশেষভাবে বাঙলা ভাষার ইতিহাস সাহিত্যের সম্পদ এবং গৌরব বৃদ্ধি করিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এবার পুরীর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের পরিচয় একটু দিই। ইনি ঐতিহাসিক নন, ইতিহাসের অধ্যাপকও নন; ব্যবসায়ে ইনি কন্‌ট্র্যাক্টর। কিন্তু ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে ইনি বড় বড় ঐতিহাসিককেও বিস্মিত করিয়াছেন। পুরীতে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারা ত জানেনই, পুরী ভ্রমণে যাঁহারা গিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই Roy's Museum-এর কথা শুনিয়াছেন এই Roy's Museum শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের নিজ অর্থ এবং নিজ শক্তির দ্বারা সঞ্চিত সংগ্রহ ভাণ্ডার, তাঁহার নিজস্ব প্রত্নশালা। প্রধানত উড়িষ্যা হইতে সংগৃহীত মূর্তি, চিত্র, পুঁথি, মুদ্রা, অলঙ্কার প্রভৃতি দিয়া তিনি যে ভাণ্ডারটি গঠিত করিয়াছেন নিজ চক্ষে না দেখিলে তাহার উৎকর্ষ এবং বিস্তার সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা হইবে না। এ পর্যন্ত বীরেন্দ্রবাবু রাজ সরকার হইতে কোন প্রকার সাহায্য পান নাই বলিয়াই মনে হইতেছে। কিন্তু ভবিষ্যতে এক দিন এই সকল অমূল্য সম্পদ সরকারী প্রত্নশালায় সাদরে স্থান পাইবে সে বিশ্বাস সম্পূর্ণ করি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে নূতন সুবিধা—

হাওড়া-বোম্বাই যাতায়াতী যাত্রীদের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানী ১লা জুন হইতে উপস্থিত পরীক্ষার্থে এক বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত সর্ত্তে ভাড়া কমাইয়াছেন।

প্রথম শ্রেণী—২০৩৷৷১০

দ্বিতীয় শ্রেণী—১০১৸/১০

মধ্যম শ্রেণী—৬১৷৷১০

যে দিন টিকিট ক্রয় করা হইবে সেই দিনের মধ্যরাত্রি হইতে ৩০ দিনের মধ্যে প্রত্যাগমন শেষ করিতে হইবে। জি-আই-পি রেল অংশের কোনো ষ্টেশনে যাত্রা বন্ধ করা চলিবে না। কোনো কারণেই এই টিকিটের ভাড়া ফেরৎ হইবে না।

দীর্ঘপথ যাত্রার এইরূপে ভাড়া কমাইয়া দিয়া কোম্পানী জনসাধারণের সুবিধা করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণের সুবিধার জন্য এই কষ্টদায়ক গ্রীষ্মকালে কোম্পানী বরফদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। মাত্র চার আনা ব্যয়ে একটি বরফদানী পাওয়া যায়। এইরূপ একটি বরফদানী পাখার নীচে রাখিয়া দিলে কামরার ভিতরকার বায়ু এবং পানীয় প্রভৃতি সুশীতল হইয়া থাকে। এই নিদারুণ গ্রীষ্ম-তাপে গাড়ির ভিতর শীতল বায়ু এবং পানীয়ের ব্যবস্থা বিশেষ আরামদায়ক।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং কলিকাতা, ২৭নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, সাহিত্য-ভবন প্রেস হইতে শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।
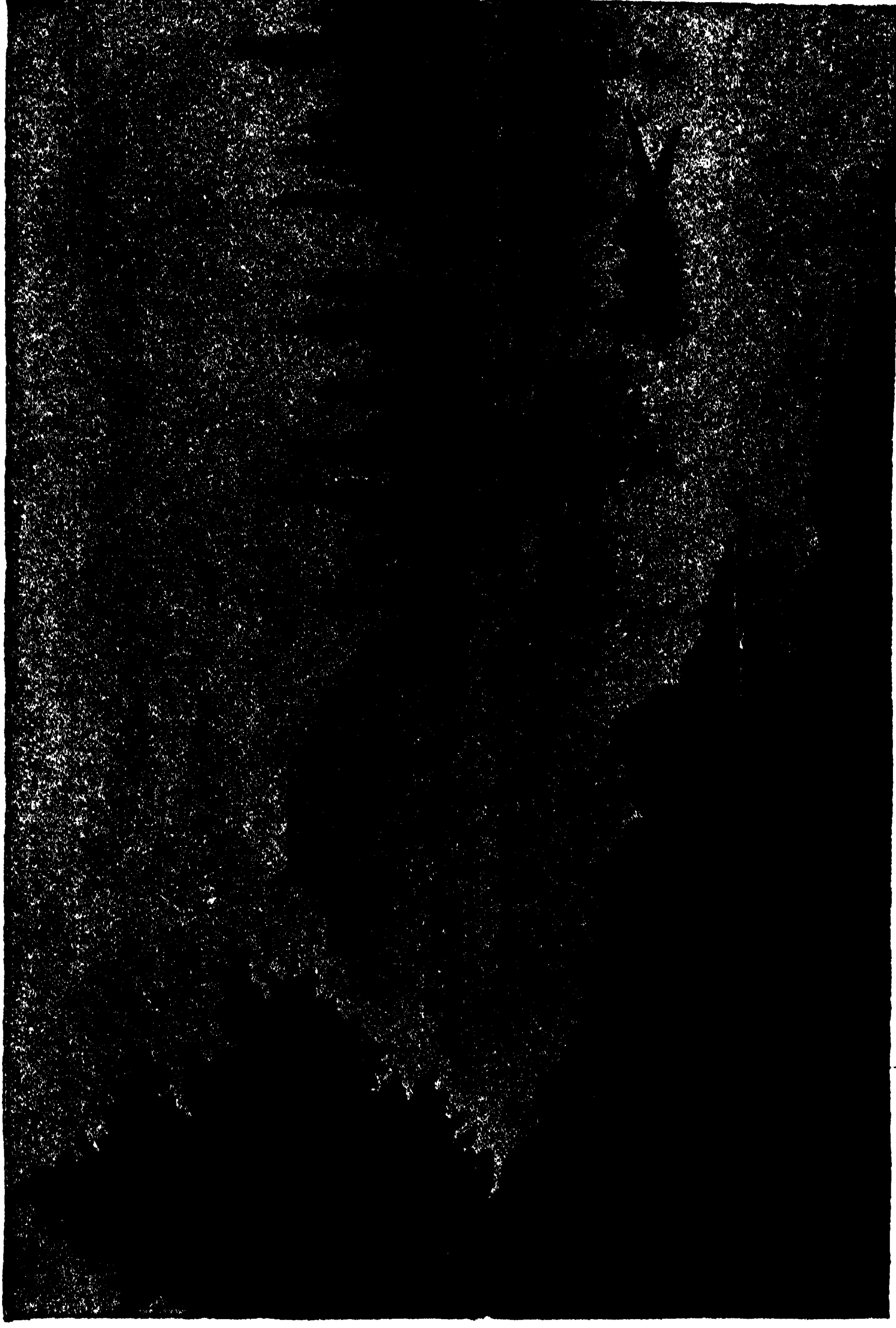
গাগরীবল—দূরে হরি পর্ব্বত।

সি, এচ্ আরান্ এণ্ড কোং'র সৌজন্যে—

"কাশ্মীরের কথা" হইতে উদ্ধৃত।

বিচিত্রা

দ্বাদশ বর্ষ, ২য় খণ্ড | আষাঢ়, ১৩৪৬ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

স্নান

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

এই পুকুরে ডুব দিয়েছে গাঁয়ের কতজনা,
কে করে গণনা!
তুমিও এলে তাদের মতন
আমার বুকে করলে গাহন,
স্নানের পরে এই রাণাতে মুছি আর্দ্রকেশ
হলে নিরুদ্দেশ।

আর যারা সব এল গেল চিহ্নলেশ কিছু
রাখেনি ত পিছু।
তাদের স্নানে আসা যাওয়া
তোমার শুধু নয়ত নাওয়া
যদিও বটে তাদের মত নেয়ে চলে গেলে,
কিছু গেলে ফেলে।

অবগাহন করলে যবে আমার কালো জলে
একটু গেলে গ'লে।
রইলে আমার বুকে মিশি
আভাস যে পাই দিবানিশি
শ্যামল-কান্তি একটু যে তাই করে ঝলমল
একটু পরিমল।

সেই সাথে যে ধরে ঘাটের ধাপের পরে ধাপ
পায়ের ক'টি ছাপ।
আর এলে না হেথায় ফিরে,
ডুবলে না মোর নিথর নীরে,
শুকিয়ে গেছি, তোমা'র আভায় বুকটি আমার মোড়া
গন্ধ আকাশজোড়া।

———

পৃথিবীর রূপধারণ

অধ্যাপক শ্রীকালীচরণ শাস্ত্রী এম্-এ

শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করিবার জন্য অরূপ শ্রীভগবানকে স্বরূপ হইতে হয়। পৃথিবীর ভার হরণার্থ নিরাকার সাকার হন। পৃথিবীরও নিস্তার নাই। দৈত্য-দানব প্রভৃতির উৎপীড়নে ভীত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাকেও বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে হয়। এমন অবস্থা বিপর্যয়ে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে পড়িতে হয় যে সর্বংসহা ধরিত্রী-দেবীরও পর্যন্ত সহিষ্ণুতার গণ্ডী অতিক্রম না করিয়া উপায় থাকে না। বেদ-পুরাণাদিতে দেখা যায় যে নিতান্ত অসহ্য অবস্থায় পড়িয়া তিনি বিভিন্ন প্রাণীর আকার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১) ইহার একটি সুন্দর আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। একবার তাঁহাকে সিংহীর রূপ ধারণ করিতে হইয়াছিল। গল্পটি এইরূপ—

একদা আদিত্যগণ (অদিতির পুত্রেরা) ও মহর্ষি অঙ্গিরাগণের মধ্যে স্বর্গলোকে প্রথমে যাইবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। 'আমরা পূর্বে প্রবৃত্ত হইয়া সোমযাগ অনুষ্ঠান-পূর্বক স্বর্গে যাইব' বলিয়া তাঁহারা পরস্পর স্পর্ধা করিতে লাগিলেন। স্বর্গলোক-প্রাপ্তির নিমিত্ত সোমাভিষব আগামী কল্য সম্পাদন করিব—অঙ্গিরাগণ প্রথমে এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন। এইরূপ ঠিক করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম অগ্নিকে আদিত্যদের নিকট পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন—আমরা স্বর্গলোক পাইবার জন্য সোমযাগ আগামী কল্য নিষ্পাদন করিব। তুমি আদিত্যগণের সমীপে গিয়া এই কথা বল,—'হে আদিত্যসকল, অঙ্গিরাগণ কল্য সুত্যা (সোমাভিষব) করিবেন। আপনারা আসিয়া ঋত্বিকের কর্ম করুন।' অগ্নি তাঁহাদের পরামর্শমত প্রস্থান করিলেন। আদিত্যগণ অগ্নিকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়াই তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া স্বর্গলোক-প্রাপ্তিহেতু তদ্দিবসেই সুত্যার অনুষ্ঠান করিবেন স্থির করিলেন।

অগ্নি আদিত্যদের সমীপে উপস্থিত হইয়া অঙ্গিরাগণের সঙ্কল্প নিবেদন করিলেন। আদিত্যেরা অগ্নিকে বলিলেন,—আপনার কথা শুনিলাম। আমরা কিন্তু স্থির করিয়াছি, স্বর্গলোকের সাধনভূত সোমাভিষব আমরা অদ্যই নিষ্পন্ন করিব। আপনাকেই যজ্ঞে হোতা করিয়া আমরা প্রথমে স্বর্গে যাইব। অগ্নি তাহাতে সম্মত হইয়া অঙ্গিরাগণের নিকট তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্য ফিরিয়া আসিলে, তাঁহারা বলিলেন,—অগ্নি, তুমি আদিত্যদের নিকট আমাদের অভিপ্রায় বলিয়াছ কি? তদুত্তরে অগ্নি যথাযথ বর্ণনা করিলে, অঙ্গিরাগণ বলিলেন,—তুমি কি তাঁহাদের হোতৃ-কর্ম অঙ্গীকার করিয়াছ? অগ্নি বলিলেন,—হাঁ, অঙ্গীকার করিয়াছি।

অগ্নি স্বীয় হোতৃকর্মগ্রহণ অঙ্গিরাগণের অনভীষ্ট বুঝিতে পারিয়া যুক্তিদ্বারা বলিতে লাগিলেন যে, যে ব্যক্তি ঋত্বিকের কর্ম গ্রহণ করে, সে যশস্বী হইয়া থাকে; আর যে প্রার্থিত হইয়াও ঋত্বিকের কর্মগ্রহণে প্রতিরোধ করে, সে নিজের যশেরই প্রতিরোধ করে; সেইজন্য আমি উহা অস্বীকার করিতে পারি নাই। ঐ ঋত্বিক-কর্ম অস্বীকার করার একমাত্র উপায় নির্দিষ্ট দিবসে স্বয়ং যজমান হইয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা। আর, শাস্ত্রীয় নিষেধানুসারে যজমান অযাজ্য হইলে অবশ্য ঋত্বিক-কর্ম সকল সময়েই প্রত্যাখ্যান করা চলে।

তখন সেই অঙ্গিরাগণ অগ্নির অঙ্গীকার অনুসারে, সকলে যাইয়া আদিত্যদের যাজকতা করিয়াছিলেন। আদিত্যগণ চতুঃসাগর-পরিবেষ্টিতা পূর্ণা পৃথিবী দক্ষিণা-

(১) ৩০শ অধ্যায়, ৮-৯ম খণ্ড; আনন্দাশ্রম-সংস্কৃত-গ্রন্থাবলি, পৃ—৭৯০-৭৯১।

কালে যাজকদিগকে দান করিলেন। দক্ষিণারূপে প্রদত্তা হইলে অঙ্গিরাগণের কর্তৃত্ব পৃথ্বীর মনঃপূত না হওয়ায় তিনি তাঁহাদিগকে তাপিত করিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা পৃথিবীকে বর্জন করেন। পৃথিবী তখন সিংহীর আকার ধারণ করিয়া জৃম্ভণ করিতে করিতে মাথা নাড়িয়া বেগে ধাবিত হইয়া সম্মুখস্থ জনসমূহকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তদানীং সমস্ত লোক ভয়ে পলাইয়া গেলে, শোকার্ত ও ক্ষুধাসন্তপ্ত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান প্রদররূপে বিদীর্ণ হইল। এখন যে সকল ভূভাগ বিদীর্ণ দেখা যায়, ইহার পূর্বে তাহা সমতল ছিল। এইজন্য বলা হয় যে—প্রদত্ত দক্ষিণা কোন কারণে পরিত্যক্ত হইলেও তাহা ফিরিয়া লইতে নাই। কেননা গো-ভূমি প্রভৃতি দক্ষিণারূপে (ঋত্বিক কর্তৃক) স্বীকৃত হইয়াও যদি কোন দোষ দেখিয়া যাজক পরিত্যাগ করে, দ্রব্যলোভে তাহা কখনই প্রতিগ্রহ করিবে না; কারণ সেই দক্ষিণা শোকবিদ্ধ হইয়া গ্রহীতার অমঙ্গল করিতে পারে। প্রমাদবশতঃ যদি বা তাহাকে ফিরিয়া লওয়া হয়, তবে উহা অত্যন্তবিরোধি শত্রুকে যে কোন ছলে দান করিবে, তাহা হইলেই নিশ্চয়ই তাহার পরাভব হইবে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই বৃত্তান্তকে দেবনীথ (১) নাম দেওয়া হয়।

অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া পৃথিবীকে একবার গোরূপ ধারণ করিতে হইয়াছিল। এই বিষয় আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে (২) দেখিতে পাই। শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের প্রসিদ্ধ কারণ নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতকার ব্যাসদেব নিম্নলিখিত আখ্যানটি বলিয়াছেন—ধরাতলে দৃপ্ত নরপতিচ্ছলে অনেক দৈত্য উৎপন্ন হইলে তাহাদের অসংখ্য সৈন্যের ভূরিভারে এই পৃথিবী আক্রান্তা হন। তখন ধরণী দুঃখিতা এবং অশ্রুমুখী হইয়া গাভীরূপ ধারণ-পূর্ব্বক সুমেরু-চূড়াস্থিত ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইয়া অতি করুণ-স্বরে নিজের ব্যসন নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা পৃথিবী, দেবগণ ও দেবাদিদেব ত্রিলোচনের সহিত ক্ষীর-সমুদ্রের তীরে গমন করিয়া সমাহিতচিত্তে পুরুষসূক্ত-দ্বারা সর্ব্বকামবর্ষুক, সর্বক্লেশনিবারক, দেবদেব জগন্নাথ পরম পুরুষ শ্রীভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষণকাল পরে ব্রহ্মা আকাশ-বাণী শ্রবণ করিয়া দেবতাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে অমরগণ, পরম-পুরুষ শ্রীভগবানের যে বাক্য শুনিতে পাইলাম, মনোযোগ-সহকারে প্রণিধান করিয়া শীঘ্রই সেইরূপ বিধান কর। অধুনা পৃথিবীর যে সন্তাপ হইতেছে—ইহা আমাদের নিবেদনের পূর্ব্বেই শ্রীভগবান তাহা জানিতে পারিয়াছেন। তোমরা যদুবংশ অংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া অপেক্ষা কর। ঈশ্বরেশ্বর শ্রীহরি স্বীয় কাল-শক্তিদ্বারা ভূ-ভার হরণ করিতে স্বয়ং ভূতলে প্রকট হইবেন।

পৃথিবীর গোরূপ-ধারণের আর একটি ইতিবৃত্ত আমরা এইরূপ জানিতে পারি। (১)

অত্যাচারী রাজা বেণের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণগণ তাঁহার দক্ষিণ বাহু মন্থন করিলে, পৃথু উৎপন্ন হন। স্বয়ং ব্রহ্মা দেবগণের সহিত সেই স্থলে আসিয়া পৃথুর দক্ষিণ করে ভগবানের চক্র ও চরণে পদ্মাদির রেখা দেখিয়া তাঁহাকে শ্রীভগবানের অংশ বলিয়া স্থির করিলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ পৃথুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

নরপতি পৃথু প্রজা পালন করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষিতিতল অত্যন্ত অত্যাচারের জন্য এ যাবৎ নিরন্ন থাকায় প্রজামণ্ডলী ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর ও ক্ষীণদেহ হইয়া অন্নের নিমিত্ত করুণ বিলাপ করিতে করিতে তৎ-সমীপে নিবেদন করিল। মহারাজ পৃথু তাহা শুনিয়া প্রজ্ঞাবলে জানিতে পারিলেন যে, পৃথিবী ওষধিসকলের বীজ গ্রাস করায় শস্যাদি উৎপন্ন হইতেছে না; সেই কারণেই প্রজাগণের বিলক্ষণ কষ্ট হইতেছে। তখন রাজা প্রজাদের এই ক্লেশ নিবারণের জন্য শরাসন লইয়া ক্রুদ্ধ

(১) সতেরটি পদ সূত্রকার আশ্বলায়ন বলিয়াছেন। ঐ পদসমূহের নাম দেবনীথ। উহা দেবলোক নয়নহেতু।—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, আনন্দাশ্রম-সংস্কৃত-গ্রন্থাবলি, পৃঃ-৭১০

(২) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, (১২৯৫ সাল) পৃঃ-২

(১) শ্রীমদ্ভাগবত, ৪র্থ স্কন্ধ। ১৫, ১৭, ১৮শ অধ্যায়; পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত ১২৯৫ সাল। পৃঃ—৪১-৪২, ৪৪-৪৭ ও পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, অষ্টম অধ্যায়, আনন্দাশ্রম-সংস্কৃত-গ্রন্থাবলি, ৩য় ভাগ, পৃঃ—৭৮৭-৭৮৯।

হইয়া পৃথিবীর দিকে ধাবিত হইলেন। প্রবেগমানা ধরণী মহারাজ পৃথুকে তদবস্থ দেখিয়া ভীতা মৃগীর ন্যায় গোরূপ-ধারণপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। রাজাও আরক্ত-লোচনে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

তখন বসুধা পলায়নে বিরত হইয়া ধর্ম্মজ্ঞ পৃথুকে নানাবিধ স্তব এবং হিতকর বাক্য বলিয়া নিজের ত্রাণ প্রার্থনা করিলেন। তথাচ পৃথুর ক্রোধ উপশম হইল না। তিনি পৃথ্বীকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধ-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তখন মহী প্রণত হইয়া প্রাঞ্জলিপূর্ব্বক পৃথুকে গুণ কীর্ত্তন দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া পুনরায় অতি বিনীত-ভাবে কহিলেন,—মহারাজ! পুরাকালে ব্রহ্মা আমার পৃষ্ঠে যে সকল ওষধি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অসজ্জনই সেই সকল সুখে ভোগ করিতেছে। আপনার ন্যায় কোন লোকপালক উপযুক্তরূপে প্রজাপালন ও যজ্ঞাদি করিতেছেন না দেখিয়া আমি অপালিত ও অনাদৃত হইয়া স্বার্থ ওষধিসকল গ্রাস করিয়া রাখিয়াছি। ঐ সকল ওষধি অনেক দিন যাবৎ আমার উদরে থাকায় কালে জীর্ণ হইয়াছে; এখন আপনি কোন উপায় অবলম্বন করিয়া ঐ সকল আকর্ষণ করুন; ইহাতে আপনার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে। হে মহাবাহো, ভূতভাবন, আপনি আমার বৎস, দোহন-পাত্র এবং দোগ্ধা স্থির করিয়া আমার দোহনের বন্দোবস্ত করুন; আমি আপনার সমস্ত কামনা পূর্ণ করিব।

পৃথিবীর এই প্রকার হিত ও মনোহারী বচনে নিতান্ত প্রীত হইয়া পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস করিয়া আপনার হস্তযুগলরূপ পাত্রে ওষধিসকল দোহন করিলেন। পৃথুর দোহন শেষ হইলে, সকলে পৃথুপদিষ্ট হইয়া নিজ নিজ জাতির মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহাকে বৎস কল্পনা করিয়া সর্ব্বকামদুহা ধরাকে অভিলাষানুরূপ দোহন করিয়াছিলেন।

পরে পৃথু পৃথিবীর প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দুহিতা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তখন পৃথ্বী সর্ব্ব সম্পদে বিভূষিত হইয়া প্রচুর শস্য উৎপন্ন করিলেন এবং প্রজাগণ আনন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

শ্রীকালীচরণ শাস্ত্রী

শ্রীধর স্বামী

শ্রীনৃত্যগোপাল রুদ্র বেদান্তরত্ন, এম্-এ

ভারতবর্ষে যাঁহারা দর্শন পুরাণাদির ভাষ্যটীকা প্রণয়ন করিয়া বিপুল গবেষণা ও মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন শ্রীধর স্বামী তাঁহাদের অন্যতম। বহুশত বর্ষ ধরিয়া সমগ্র ভারত অবনত শিরে সাদরে স্বামীর টীকা অধ্যয়ন করিয়াছে। বাস্তবিক ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশেই শ্রীধর স্বামীর অক্ষুন্ন প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ স্বামিকৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকা সারসংক্ষেপ ও ভাবগম্ভীর। সকল সম্প্রদায়ের নিকটই ইহা অতি প্রামাণিক টীকা বলিয়া চিরকাল সমাদৃত হইতেছে। এই টীকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের অনাবশ্যক আলোচনা না করিয়া স্বামী মহোদয় প্রয়োজনীয় স্থলসমূহের স্বল্প কথায় প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বামীর টীকার আর একটি বিশেষত্ব এই যে তিনি ভাগবতের শ্লোক নিচয়ের শৃঙ্খলা অতি সুন্দর রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। টীকাকার তাঁহার প্রতিভা শব্দার্থ-নিরূপণে নিয়োজিত না করিয়া সর্ব্বত্রই গ্রন্থের ভাবার্থ নির্ণয় করিয়াছেন। এই নিমিত্তই তৎকৃত টীকার ভাবার্থ দীপিকা নাম অন্বর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ভারতবর্ষের কি রাজনৈতিক ইতিহাস কি সাহিত্য বিষয়ক ইতিহাস সমুদয় বিষয়ই অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। যেমন বিক্রমাদিত্য ও লক্ষ্মণসেনের ইতিহাস বহুলাংশে কিম্বদন্তীর উপর স্থাপিত, তেমনই কালিদাস ও জয়দেবের ইতিহাসকে সমাশ্রয় করিয়া বহু কিম্বদন্তী উদ্ভূত হইয়াছে। এতাদৃক অনেক কিম্বদন্তী আবার অতিমানুষিক ব্যাপার সংশ্লিষ্ট। কালিদাস, শঙ্করাচার্য্য, জয়দেব—সকলের ইতিহাসেই অতি-মানুষিক ব্যাপার মিশ্রিত রহিয়াছে। শ্রীধর স্বামী সম্বন্ধেও এবম্বিধ অতিমানুষিক ব্যাপার পরিশ্রুত হওয়া যায়।

ভক্তমাল গ্রন্থে শ্রীধর স্বামীর কিছু ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীমৎ নাভাজি লিখিত ভক্তমাল গ্রন্থ অনেকাংশে কিম্বদন্তীর উপর সংস্থাপিত, ইহাই মনে হয়।

শ্রীধর স্বামী শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসীর একতম ছিলেন। পরে তিনি তৎকৃত টীকাগুলিতে ভক্তিবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আমরা শ্রীধর স্বামীর কাল সম্বন্ধে পুরীর গোবর্দ্ধন মঠে কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি। তদ্দ্বারা স্বামীর জীবন বৃত্তান্তে কিঞ্চিৎ আলোকপাত হইতে পারে মাত্র।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যদেব দশনামী সন্ন্যাসীর প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন; ইহা তাঁহার অতুল কীর্ত্তি খ্যাপন করিতেছে। আর তিনি পুরী, দ্বারকা প্রভৃতি স্থানে চারিটী মঠ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিরোভাবের পর সহস্রাধিক বর্ষ ধরিয়া সেই মঠসমূহের মঠাধিপগণ কর্ত্তৃক ও অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃক দর্শনাদি শাস্ত্রের সমালোচনা ও শাস্ত্র গ্রন্থের প্রচারণা হইয়া আসিতেছে।

পুরীর গোবর্দ্ধন মঠ এই মঠ-চতুষ্টয়ের অন্যতম। আদি শঙ্করাচার্য্যের পর যিনি যখন মঠাধিপ হইয়া থাকেন তিনিই তখন শঙ্করাচার্য্য আখ্যা লাভ করেন। গোবর্দ্ধন মঠে শঙ্করাচার্য্যগণের ও প্রধান প্রধান সন্ন্যাসীগণের যে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিখিত রহিয়াছে তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায়, শ্রীধর স্বামী আদি শঙ্করাচার্য্য হইতে অধস্তম একাদশ পুরুষ।

বলা বাহুল্য শঙ্করাচার্য্যদেবের কাল নির্ণয় করাও সুকঠিন। ৬৮৬-৭১৪ খৃষ্টাব্দ যদি শ্রীশঙ্করের জীবনকাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় এবং একাদশ পুরুষ ঘটিতে যদি আরও দুইশত বর্ষ গত হইয়াছে মনে করা যায় তাহা হইলে শ্রীধর স্বামী অন্ততঃ দশম শতাব্দীর লোক হইতেছেন।

গোবর্দ্ধন মঠের তালিকায় ইহা জানা যায় যে ২৬৩১ যুধিষ্ঠিরাব্দে শঙ্করাচার্য্যদেব এই মঠ স্থাপন করেন। বাস্তবিক এই সংখ্যাটীতে ঐতিহ্য সংকলনকারিগণকে অনেক সহায়তা করিবে বলিয়া মনে হয়। যুধিষ্ঠিরাব্দের কথা শ্রীমতী নামধেয় একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থেও উল্লিখিত রহিয়াছে। শ্রীমতীতে লিখিত আছে, যে ছয়জন অব্দ প্রবর্ত্তক যুধিষ্ঠির তাঁহাদের অন্যতম।'

বিদ্বদ্বর উইলসন সাহেবের মতে শ্রীধর স্বামী ভারতের কোন প্রাচ্য অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে, হয়ত উড়িষ্যায় গোবর্দ্ধন মঠে বসিয়া তিনি শাস্ত্র-গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

কিম্বদন্তী আছে, কাশীর দণ্ডিগণকে তিনি বিচারে পরাজিত করেন। তাঁহার টীকা প্রামাণিক কি না এমনি তর্ক উত্থিত হয়। তাহাতে স্থির হয়, বিশ্বনাথের মন্দিরে অন্যান্য টীকার সহিত স্বামীর টীকাও রাখা হইবে। প্রভাতে মন্দিরের দ্বার খোলা হইলে দেখা যায়, বিশ্বনাথ টীকার উপরে লিখিয়াছেন।

অহং বেত্তি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহ প্রসাদতঃ॥

ভক্তমাল গ্রন্থে শ্রীবেণীমাধবের মন্দিরের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যাহাহউক এই শ্লোকটী সর্ব্বজন পরিচিত।

শ্রীধর স্বামী যৎকালে টীকাগুলি রচনা করিয়াছেন, তখন তিনি যতি বা সন্ন্যাসী। তিনি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন, "শ্রীধর স্বামী যতিনা কৃতা গীতা সুবোধিনী।" কিন্তু তাঁহার গার্হস্থ্যাশ্রমের ইতিহাস কি?

শ্রীমৎ নাভাজি বলিতেছেন, শ্রীধরের যখন গৃহত্যাগের প্রবল ইচ্ছা, তখন গৃহে তাঁহার পূর্ণগর্ভা পত্নী রহিয়াছেন। অনন্তর তাঁহার ভার্য্যা পুত্র প্রসব করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীধর ভাবিতেছেন, এই অনাথ শিশুকে কাহার আশ্রয়ে রাখিয়া যাই? এমন সময় একটী টিকটিকির ডিম্ব ভূমিতে পড়িল; এবং ডিম্ব হইতে বাচ্চা নির্গত হইয়া সম্মুখের একটী মক্ষিকা ধরিয়া আহার করিল। শ্রীধর মনে মনে বিচার করিলেন, "সেই শিশু রক্ষিবে যে ইহারে রক্ষিল।"

ভক্তমালে বর্ণিত আছে, এই শিশু কালে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া ভট্টিকাব্য রচনা করেন। তাহা হইলে ভট্টিকাব্যের সময় দশম শতাব্দী হইয়া পড়িতেছে। ম্যাক্‌ডোনেল বলেন ভট্টি সপ্তম শতাব্দীতে বিরচিত হয়। বৈয়াকরণ ভর্ত্তৃহরি ইহার প্রণেতা। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের জীবনকাল সপ্তম অষ্টম শতাব্দী বা আরও পূর্ব্ববর্ত্তী সময় ইহাও চিন্তার বিষয়।

দেখা যায় ষোড়শ শতাব্দীতে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া শ্রীধর স্বামীর অসীম প্রতিপত্তি। এক সময় সুদূর পশ্চিমাঞ্চলের সুবিখ্যাত বল্লভাচার্য্য পুরীধামে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের সকাশে স্বামীর অগৌরবসূচক কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীবল্লভ বলিলেন, স্বামীর টীকায় সর্ব্বত্র একবাক্যতা নাই; আমি এই টীকা খণ্ডন করিয়াছি।

প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিবে গণন॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেব আরও বলিয়াছেন,

শ্রীধর স্বামী প্রসাদেতে ভাগবত জানি।
জগদ্‌গুরু শ্রীধর স্বামী গুরু করি মানি॥

স্বামীর টীকাগুলি পড়িয়া আমরা জানিতে পারি তিনি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, এবং নৃসিংহ দেবই ছিলেন তাঁহার উপাস্য দেবতা। অনেক স্থলেই তিনি নৃসিংহ বা নৃহরির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, নৃসিংহই তাঁর গুরু; নৃসিংহ যাহা বলাইয়াছেন, তিনি তাহাই লিখিয়াছেন। নৃসিংহের কৃপালাভ সম্বন্ধেও অনেক জনশ্রুতি আছে। ভক্তমালকর বলেন, শ্রীমান পরমানন্দপুরীর প্রসাদে শ্রীধর নৃসিংহের কৃপা লাভ করেন।

শ্রীধর স্বামী সর্ব্বত্রই ভক্তিবাদ স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ কহিয়াছেন, "শ্রীধর স্বামিপাদাং-স্তান্ বন্দে ভক্ত্যেকরক্ষকান্"—ভক্তির একমাত্র রক্ষক শ্রীধর স্বামীকে বন্দনা করি। ভাগবতের টীকার ন্যায় গীতা ও বিষ্ণু পুরাণের টীকাতেও স্বামীর ভক্তিবাদের সংরক্ষক যুক্তিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়।

গীতার সুবোধিনী টীকার উপসংহারে শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন, যদি ভক্তিই জীবের মোক্ষের হেতু হয় তাহা হইলে বেদে জ্ঞানের সাধনার উল্লেখ রহিয়াছে কেন? উপনিষৎ কহিতেছে, "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যু মেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"—তাঁহারে জানিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, মোক্ষের অন্য পন্থা নাই। স্বামী কহিতেছেন, কাষ্ঠের দ্বারা পাক কর বলিলে অগ্নির অসাধনত্ব কথিত হইল না। পরন্তু অগ্নিই পাক ক্রিয়ার প্রকৃষ্ট সাধন এবং কাষ্ঠে অগ্নিরই আনুকূল্য করিবে। তেমনই জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির অনুগত হইয়া পরোক্ষে ভক্তির হেতুভূতা হইতে পারিবে। শ্রীধর স্বামীর সিদ্ধান্ত হইতেছে যে ভগবদ্ভক্তিই মোক্ষের হেতু স্বরূপ "ভগবদ্ভক্তিরেব মোক্ষহেতু রিতি সিদ্ধম্।"

শ্রীনৃত্যগোপাল রুদ্র

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সঙ্গীতের আদর্শ

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এম, এল, এ

সঙ্গীত বললে এদেশে প্রাচীনকালে গীত, বাদ্য ও নৃত্য বোঝাত। সঙ্গীতদর্পণে আছে :—

"গীতং বাদ্যং নর্ত্তনঞ্চ ত্রয়ঃ সঙ্গীতমুচ্যতে।"

আমরা নৃত্যকে সঙ্গীত মনে করি না। ইউরোপেও সঙ্গীত বলতে vocal ও instrumental music মনে করা হয়। অর্থাৎ কলাবিদ্যার ভিতর যা শ্রবণেন্দ্রিয়কে চরিতার্থ করে তৃপ্তি দেয় তাকে আমরা সঙ্গীত কলা বলি। কথাটি যতটা সহজ মনে হয় আপাততঃ বাস্তবিক তা' নয়। কারণ সঙ্গীতে বাক্যের প্রয়োগ হয় এবং বাক্য শুধু সঙ্গীতের বাহন নয় কাব্যেরও বাহন, কাজেই প্রশ্ন উঠে সঙ্গীতে বাক্যের প্রাণ কে?

সঙ্গীত হিন্দু আদর্শে ও ইউরোপীয় আদর্শে দুরকমের সৃষ্টি। আমরা আমাদের সঙ্গীতকলাকে পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে ওদের সঙ্গীতের চেয়ে ভাল বলব এরূপ সম্ভাবনা আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিচার হবে প্রামান্ত ভাবুকগণের মতামতের উপর ওখানকার সঙ্গীতরসিকগণ সঙ্গীতের লক্ষ্য কি বলেছেন এবং এদেশের সুধীগণই বা সে বিষয়ে কি মন্তব্য করেছেন তা লক্ষ্য করতে হয়।

পশ্চিম দেশে বলা হয় arts for art's sake অর্থাৎ কলার খাতিরে কলা। এর আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। অর্থাৎ আনন্দ ভোগের খাতির ছাড়া আর্টের সকল খাতির অগ্রাহ্য। এ আনন্দ কি রকমের আনন্দ বা কোন স্তরের আনন্দ সে বিষয়ে কোন গবেষণার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। এক সময়ে আর্টকে ধর্ম্মের বাহনও করা হয় পাশ্চাত্য প্রদেশে। সে ভাব ও আদর্শ বর্জ্জিত হয় এবং নিখুঁত সৌন্দর্য্য চর্চ্চার কোন গৌণ উদ্দেশ্য স্বীকার করা হয় না।

এদেশেও চিত্তরঞ্জন যে সঙ্গীত বিদ্যার উদ্দেশ্য এ বিষয়ে ক্বারও অমত নেই। কিন্তু শুধু একটা অহেতুকী হর্ষ উৎপন্ন করাকে এদেশে চরম ব্যাপার মনে করা হয়নি। কিন্তু তা' বলে লোকরঞ্জন যে এর একটা বিরাট দিক একথা অস্বীকৃত হয়নি। সঙ্গীতদর্পণ বলেন :—

"গীতবাদিত্রনৃত্যানাং রক্তিঃ সাধারণো গুণঃ
অতো রক্তিবিহীনং যৎ তন্ন সঙ্গীতমুচ্যতে॥"

রক্তিবিহীন হ'লে তাকে সঙ্গীতই বলা হ'বে না। অথচ শুধু রক্তি বা লোকরঞ্জন অতি লঘুস্তরে সঙ্গীত কলার পীঠ স্থাপন করে। এদেশের নৃত্য কলার প্রবর্ত্তক যেমন স্বয়ং নটরাজ এবং নৃত্য ব্যাপারটি যেমন একটি তুরীয় স্তরের সৃষ্টি হ'য়ে ক্রমশঃ গাঢ়তর স্তরে সংক্রামিত হয়ে ঐহিক চিত্তবিনোদনের ব্যাপার হয়েছে—সঙ্গীতও তেমনি একটি তুরীয় সৃষ্টি ক্রমশঃ মর্ত্ত্যে তা' সংক্রামিত হয়েছে। মর্ত্ত্যে প্রচলিত হয়ে শুধু ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারে সঙ্গীতকলা পর্য্যবসিত হয়নি। এ বিষয়ে সঙ্গীতদর্পণকার বলেন—এক শ্রেণীর সঙ্গীত 'মুক্তিদায়ক', তার পথ-প্রদর্শক হচ্ছে ব্রহ্মা, মহাদেবের সম্মুখে তা' ভরত কর্ত্তৃক প্রযুক্ত।

সঙ্গীতের দ্বারা মুক্তি লাভের অর্থ কি? নিশ্চয়ই সঙ্গীতের ভিতর এমন কিছু পদার্থ আছে যা' দিব্য—এই দিব্যত্বের সংস্পর্শেই মুক্তি সিদ্ধ হয়। আমাদের দেশে রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধকগণ সঙ্গীতের সাহায্যে সাধন ভজন করে' মুক্তিলাভ করেছেন এরূপ শোনা যায়।

ইউরোপীয় কলাজগতের ইতিহাসে একটা প্রশ্ন বার বার উঠেছে। যা' ইন্দ্রিয় তৃপ্তি আনয়ন করে তা'কে এক সময় দিব্য বলতে ইউরোপ কুণ্ঠিত হয়। "Flesh is death—Spirit is life" এ হল বাইবেলের কথা—এজন্য চিত্রকলাক্ষেত্রে ইউরোপ কুরূপ এঁকে তাকে আধ্যাত্মিক বলেছে—কারণ তাতে ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ যৎসামান্য। Byzantine চিত্রে খ্রীষ্টের চেহারা বিষন্ন ও জীর্ণ। অপর দিকে রিনেসাস

যুগে ইন্দ্রিয় তর্পণই মুখ্য ব্যাপার হ'য়ে উঠে। হৃষ্টপুষ্ট দেহ, লোভনীয় মাধুর্য্য, প্রভৃতি ইন্দ্রিয় তৃপ্তির যাবতীয় উপকরণকে সংযুক্ত করা হ'য়েছে। বস্তুতঃ এ যুগে ভোগের মাথায় জয় মুকুট দেওয়া হ'য়েছে।

সঙ্গীত জগতেও সঙ্গীতের আকর্ষণ অনেক সময় ভগবদ্ আরাধনার বিরোধী মনে করা হয়েছে। সেণ্ট অগাষ্টিন তাঁর স্বীকারোক্তিতে বলেছেন আমার মনে হয় যে অনেক সময় সঙ্গীতের মাধুর্য্য চিত্তকে ইন্দ্রিয়জ আকর্ষণে ভগবানের নিকট হ'তে আমাদের দূরে নিয়ে যায়। এ ভয় বার বার আমার মনে জাগে।

যা হোক এ সব সমস্যা এদেশে হয় নি। এদেশে সাধকের সঙ্গীতই অনেক সময় মুক্তির বাহন হয়েছে এবং ভগবদ্-সঙ্গীতই এদেশে প্রধান স্থান অধিকার করেছে ওস্তাদগণের কালোয়াতীর লক্ষ্য রূপে। মীরাবাঈর গান, তুলসীদাসের গান প্রভৃতি ভারতবিখ্যাত।

কলামাত্রই শুধু ঐহিক বস্তু নয়। প্রত্যেক কলাতেই অসীমের যোগ আছে তজ্জন্য প্রত্যেক সঙ্গীতে বা সুরে অফুরন্ত পুলক সঞ্চিত থাকে। এক একটি রাগ ও রাগিণী অনাদিকাল হ'তে গীত হয়ে এসেছে অথচ সে সব প্রাণহীন হ'য়ে যায় নি। এক একটি সুরের কুঞ্চিত হিল্লোলে অসীম বিকাশ ও বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা থাকে। কাব্য সম্বন্ধে রসাত্মক বাক্যকে যেমন "অনির্ব্বচনীয়" ও "ব্রহ্মাস্বাদনহোদর" বলা হয়েছে সঙ্গীত সম্বন্ধে 'সুর' ও তেমনি অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার এবং এই রস আস্বাদনে ইন্দ্রিয়চর্চ্চা মাত্র হয় না—ব্রহ্মাস্বাদই লাভ করা হয়।

প্রশ্ন উঠেছে সঙ্গীতের ভিতর বাক্যের স্থান কি? বাক্যটাই বড় না সুরটাই বড় না ছুটিই বড়। এ নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়েছে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে কাব্যাংশ অতি সামান্য। মোটামুটি কতগুলি কথার সমষ্টিই অনেক যথেষ্ট ব্যাপার হয়ে পড়ে। সেগুলি নিয়ে ওস্তাদেরা সুরের তালে ফেলে এক অপরূপ চেহারা দেয়। বস্তুতঃ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে আখ্যান ভাগ বা ভাষাগত সংযোজনে বিশেষ লালিত্য বা কাব্যশ্রী দেখতে পাওয়া যায় না। এমনকি বাঙ্গলা দেশের ওস্তাদী সঙ্গীতও কাব্যাংশে অকিঞ্চিৎকর। অথচ আধুনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান কাব্যাংশে অতি মনোহর এমনকি তুলনাহীন।

প্রশ্ন হচ্ছে ভাল গান কি কাব্যরসেও উৎকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন? আধুনিক ইউরোপীয় সৌন্দর্য্যতত্ত্ব (asthetics) এই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। কারণ সাহিত্যিক 'কাঠামো'টি সঙ্গীতের একটা উপলক্ষ্য মাত্র, ওটা গৌণ ব্যাপার, সঙ্গীতের মুখ্য ব্যাপার হচ্ছে 'সুর'। "It is a long way to Tepperarsy" কিম্বা সুরদাসের—

"তিহারী লাল মুরলী শ্যাম বজাউঁ
জো মুরলী প্রভু মুখমে বজয়ং সো মুরলী সৈঁ পাউঁ।"

এসব কথা কাব্যাংশে এমন কিছু অভুতপূর্ব্ব বা বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। অথচ সুর সংযোগে মনে হয় যেন সৌন্দর্য্যের অজাগ-নহবৎ বেজে উঠ্‌ল। আবার নিধু বাবুর—

"ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে
আমার এই স্বভাব এই যে তোমা বই আর জানিনে।'

এতে কাব্যরস ও সুরের রসে যুগ্ম সম্মিলন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীত কাব্যাংশে অতুলনীয়, সুরের বৈচিত্র্য বিধানের মৌলিকত্বে তার ভিতর একটা নূতন বার্ত্তা এনেছে। বাঙ্গলা দেশে তাই এই বিচিত্র ব্যাপার সম্ভব হয়েছে। এখনকার আধুনিক সঙ্গীত কাব্যরস ও ধ্বনিরসে পরিপূর্ণ। 'বন্দেমাতরম্' এর সুরের দোহাইকে বিশিষ্টতা দান করিতে হলেও এর কাব্যাংশ অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথের 'জনগনমন-অধিনায়ক ভারতভাগ্য বিধাতা'র ভিতর বাঙ্গলার এই নূতন সৃষ্টির দ্বৈতমূর্ত্তি উদ্ভাসিত হয়। এদেশের মার্গ ও দেশী সঙ্গীত আলোচনায় এরকম সঙ্গীতের স্থান নির্দ্দেশ সম্ভব হ'বে। কারও মতে এই কাব্যাংশ সুরের প্রতিমা হ'তে দূরে নিয়ে যায়—এমন কি বিশুদ্ধ সঙ্গীতের সুরসাধন তা-না-না-নার সাহায্যে যতটা 'pure' সুন্দর হ'বে ভাষাগত ঐশ্বর্য্যের সমবায়ে তা হবে না। এজন্য অনেক সময় মিষ্ট আওয়াজও কোন কোন রসজ্ঞের মতে খাঁটি সঙ্গীতের টান হ'তে মনকে বিভ্রান্ত করে দেয়। এজন্য শুধু মিষ্টি গলাতে সুরের বিন্যাস পূর্ণতা লাভ করে না। সুন্দরী নটীর যৌবনশ্রী ও দেহলতার কমনীয়তা যেমন দর্শকদের নৃত্য কলার বিশুদ্ধ রূপ হ'তে মনকে দূরে নিয়ে যায় এও তেমনি ব্যাপার। শব্দ যোজনের ভাবগত মাধুর্য্যও লোভনীয় ব্যাপার কিন্তু সঙ্গীত কলা চায় তৈরি করতে সুরের তাজমহল।

সুন্দরীর নটনভঙ্গী যদি উচ্চস্তরের হয় তা হলেই নৃত্য হয় সার্থক, তেম্নি বাক্যের ভাবগত মাধুর্য্য যদি সুরের গভীর রসস্রোত অনুসরণ করে চলে তবে তাই হবে আদর্শ সঙ্গীত।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

সনেট পঞ্চক

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

নবারম্ভ

আমার অন্তরে শান্তি নাই।
ভূকম্প জেগেছে প্রাণমূলে,
পাষাণের ভিত্তি ওঠে দুলে,
জানিনা বুঝিনা কী যে চাই!
নাই আস্থাপূর্ব্ব সংস্কারে,
জীবনে কি আসিছে প্রলয়?
চিত্ত মোর তাই ঝঞ্ঝাময়,
সহসা ডুবিল অন্ধকারে?

বক্ষে তবু জাগে না সন্ত্রাস,
আশায় উল্লাসে মত্ত হই।
আসুক দারুণ সর্ব্বনাশ,
ভবিষ্যের পানে চেয়ে রই,
ধ্বংসস্তূপ হতে পুনরায়
প্রাণ কি পুনর্ভূ হ'তে চায়?

দ্বিধান্বিতা

বাঁশরির সুরে কেঁদে মর',
অভিসার পথে বাহিরিতে
দুঃসাহস জাগে তব চিতে
লাজে ভয়ে পুন বাঁধা পড়'।
ভীরু হিয়া কাঁপে থর থর
দাঁড়ায়ে আপন দেহলিতে,
রুদ্ধদ্বার পার' না খুলিতে,
চলিতে শকতি নহি ধর'।

সে মুরলী বাজে না ত আর,
নীরবে দাঁড়ায়ে বাতায়নে
চেয়ে রও আকুল নয়নে
নৈঃশব্দ্যে ঘনায় অন্ধকার।
বাঁশরি যে মরে রুদ্ধশ্বাসে,
দ্বিধান্বিতা ভীরুর সন্ত্রাসে।

পক্ষহারা

উড়িবার আকুল আগ্রহে
পিপীলিকা লভিল কি পাখা?
যে গতি নৈস্পন্দে ছিল ঢাকা
কম্প্র পক্ষে আজি মোরে বহে
বাধাহীন উদার অম্বরে।
উড়িবার শক্তি কতটুক?
উড়িতে উড়িতে পক্ষ ঝরে,
ভীরু বক্ষ করে ধুক ধুক।

আরবার পড়েছি ধূলায়,
হৃতপর্ণ এ মাটির কীট
নীলিমায় বেঁধেছে কুলায়।
মেঘাবৃত মেদুর প্রাবৃট,
শুক্লা রাকা কৃষ্ণা অমানিশি
আমার অন্তরে আছে মিশি।

বুদ্বুদ

স্পন্দহীন স্তব্ধ সরোবর,
আলো ছায়া পড়ে তার বুকে
তরু ছায়া তীর হতে ঝুঁকে
দেখে তার নিস্বচ্ছ অন্তর।
খেলা করে—শৈবালের ফাঁকে
লঘুগতি ক্ষুদ্র মীনগুলি,
বুলায়ে কাজলঘন তুলি
মেঘচ্ছায়া কত ছবি আঁকে।

যে কল্লোল জাগে সমীরণে
প্রতিবিম্ব যে ছবি ফুটায়,
বুঝিনা'সে মর্ম্মরে আভায়
কী আছে হ্রদের মৌন মনে।
তার অন্তর্গূঢ় মর্ম্মবাণী
রঙিন বুদ্বুদে ফোটে জানি।

জিগমিষা

মতের বালাই মোর নাই।
আমি শুধু চাই অগ্রগতি,
নাই দৃষ্টি বাহনের প্রতি।
পথপার্শ্বে যারে কাছে পাই
চড়ে বসি, বলি চল আগে,
ঠিকানা শুধালে শুধু বলি,
সবেগে সম্মুখে যাও চলি'
থামিব যেথায় ভাল লাগে।

কত রথ হয়েছে অচল,
নৌকাডুবি হল কতবার,
হস্তপদে পড়েছে শৃঙ্খল,
তথাপি থামেনা অভিসার।
গন্তব্যবিহীন দরবেশ,
যাত্রা তার চিরনিরুদ্দেশ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

সাহিত্যে-অবহেলা

শ্রীআশালতা সিংহ

সাহিত্য জিনিষটার যা প্রভাব তা নিগূঢ়। খালি চোখে চট্ করে হয়তো ধরা যায় না, কিন্তু তার অলক্ষ্য শক্তি একেবারে অলঙ্ঘ্যনীয়। মনে হয় আধুনিক মানব আজ সাহিত্যকে অবহেলা করচে। এবং সেই পাপে তার অদৃষ্টাকাশে ঘন মেঘ ক্রমশঃ কালো হয়ে উঠচে। সাহিত্যকে অবহেলা কথাটা শুনলে প্রথমটায় মন সায় দেয় না। মাথা নেড়ে বলে, উঁহু, তা কি হয়। আজো তো ভালো নাট্যকার ভালো ঔপন্যাসিক ভালো কবির লেশমাত্র অভাব ঘটেনি। দেশে বিদেশে কত সাহিত্যিক সাহিত্যের জন্য নোবেল প্রাইজ পাচ্ছেন। সাহিত্যে অবহেলা আবার ঘটেচে কোনখানটায়। এদিক দিয়ে আমি কথাটা ধরচিনা। ব্যক্তিগত প্রতিভার উন্মেষ এবং বিকাশ সাহিত্যক্ষেত্রে এখনও যথেষ্ট ঘটচে কিন্তু জনসাধারণের জীবনের সাহিত্যের সহিত যোগ ক্রমশঃ ভাসা ভাসা হয়ে আসছে। সাহিত্যে গভীর হয়ে তন্ময় হবার তার ভিতর থেকে রস টেনে নিয়ে নিজের জীবনকে প্রশান্ত এবং সরস করবার সাধনায় আমরা ক্রমশঃ ঢিল দিচ্ছি। এর ফল দাঁড়াচ্ছে শোচনীয়। এত শোচনীয় যে, আমরা আমাদের ক্ষতির পরিমাণটাও বুঝতে পাচ্ছিনে। সেইটেই আমাদের যথাশক্তি আজ কথঞ্চিৎ বোঝাবার চেষ্টা করবো। যুদ্ধের আসন্ন বিভীষিকায় আজ সারা পাশ্চাত্য জগত ভীত, সন্ত্রস্ত। এ যুদ্ধ যে কত ভয়াবহ, প্রত্যেকে অন্তরে অন্তরে তা অনুভব করচেন। বড় বড় চিন্তাবীররা প্রতি ছত্রে সংশয় প্রকাশ করচেন, আগামী মহাযুদ্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতা যদি না ধ্বংস হয়ে যায় ইত্যাদি……

অথচ একটু প্রণিধান করলে দেখা যায় ওদেশে ব্যক্তিগত প্রতিভার তো কোন অবনতি বা অবসান ঘটেনি। বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা সত্য সন্ধানে নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে তুচ্ছ করছেন। সাহিত্যিকরা বাণীর পূজায় ধ্যানতন্ময়। যাদের জাতির ভাণ্ডারে এমন সব অক্ষয় সম্পদ তারাও কেন বর্ত্তমান যুদ্ধ পদ্ধতির মত এমন অমানুষিক নৃশংস ন্যায়-পরতাহীন সর্ব্বব্যাপী হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হচ্চে

নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং তার কাণ্ডজ্ঞানহীন দ্বিধাশূন্য বিবেকশূন্য অপব্যবহারের ফলে বর্ত্তমান যুদ্ধ পদ্ধতিটা যে কোন স্তরে দাঁড়িয়েছে তা বুঝতে তো আজ আর কারও বাকী নেই। ভবিষ্যতে যে অনিবার্য্য মহা-সমর ইউরোপের প্রাঙ্গনে জ্বলে উঠবে তাতে সমস্ত সভ্য-জাতি তার সংস্কৃতি সমেত অতল তলে লীন হবে। এ যুদ্ধ যখন থামবে তখন যে জিতেছে তারও আর বড় বাকী কিছু থাকবে না। পরাজিত এবং অপরাজিত একই নিকষ কালো পটভূমিতে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু এই সহজ কথাটা ওদেশের বড় বড় চিন্তাশীল রাষ্ট্রনায়কেরা কি বুঝতে পারচেন না?

একথার উত্তর নিজের মনে সমাহিত হয়ে খুঁজতে বসলে আমরা অনুভব করতে পারি, সাধারণ জাতি হিসাবে আধুনিক মানবের নীতিজ্ঞান এবং সৌন্দর্য্য জ্ঞান ক্রমশঃ কমে আসচে। নীতির সঙ্গে সৌন্দর্য্য কথাটা আমি কেন জড়ালেম তার কৈফিয়ত দিতে হ'লে এই কথা বলতে হয়, অসুন্দর কাজের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা, সেও কি নীতির একটা অঙ্গ নয়?

বর্ত্তমানে চেকোশ্লোভেকিয়ার প্রতি যে অত্যন্ত বিশ্বাস-ঘাতকতা করা হয়েছে সে মিথ্যাচরণের অসুন্দরতা যে কত গভীর সে কথা বুঝবার মত সৌন্দর্য্যজ্ঞান আজও কি ওখানকার রাষ্ট্র-নায়কদের অবশিষ্ট আছে? মানুষে মরণান্তিক দুঃখ পাবে কিন্তু তবু নিজের মনুষ্যত্বকে মরতে দেবেনা, এ নীতি য়ুরোপ এককালে মেনেছিলো। কিন্তু আজ তার অর্ন্তধারা শূন্য। মানবসভ্যতার বেদীতলে

আজ কেবল ফাঁকা আওয়াজ, অন্তঃসারশূন্য বাণী, মিথ্যা বাক্য এবং মিথ্যা আচরণ ও স্বার্থপরতার একান্ত অলজ্জ নগ্ন রূপ ছাড়া তার দেবার কিছু বাকী রইলো না। এমনটা কেন হ'লো? এর একটা প্রধানতম কারণ আধুনিক নর-নারী সাহিত্যের স্নিগ্ধ প্রভাবকে অর্জ্জন করবার যে সুদীর্ঘ সাধনা তাতে টিপ্পনী দিয়েছে। গত শতাব্দী অর্থাৎ যখন থেকে বিজ্ঞানের বড় বড় আবিষ্কারগুলোর সুরু, তখন থেকেই তারা সাহিত্যিক আবহাওয়ার স্পর্শ এড়িয়ে বৈজ্ঞানিক স্রোতের দিকেই ঢলে পড়েচে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে ছাপাখানা হয়েচে। ছাপার অক্ষরে বই বার করা যারপর নাই সুলভ। পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, দৈনিক কাগজের আর অবধি নেই।

বেতার যন্ত্রে দুনিয়ার আধুনিকতম সংবাদ আমরা ঘরে বসে আরাম করে শুনচি। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় এ সমস্তই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এবং তৎসঙ্গে মানুষের নব-জীবনেরও জয়গান। কিন্তু হিসাবে গলদ রয়ে যায়। কোথা থেকে একটা কালো ছায়া এসে এই বিজয় অভিযানে করাল সম্ভাবনার ভয় দেখাচ্চে। এই আধুনিক যন্ত্রযুগের সঙ্গে সমান তালে আধুনিক হবার পাল্লা রেখে আমরা যে ঘোড়দৌড়ে নেমেচি তাতে আমাদের তথ্যের বোঝা এবং আবিষ্কারের বোঝা ক্রমশঃ ভারি হচ্চে বটে কিন্তু মনকে নষ্ট করে ফেলচি। হারাতে বসেচি মনের আত্মসমাহিত প্রসন্ন-প্রশান্তি, হারাতে বসেচি মনের আভিজাত্য। এক কথায় আধুনিক মনের কৌলীন্য নষ্ট হচ্চে।

সকালে উঠে আমরা চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজের দ্রুত পাতা উলটিয়ে যাই। হেড্ লাইনগুলোর উপরে একবার চোখটাকে বুলিয়ে নিতে হবে। কোন জিনিষেই নিবিড়-রূপে মনঃসংযোগের উপায় নেই। কারণ এত জিনিষ সম্বন্ধে খবর রাখতে হবে, জানতে হবে বা জানবার ভাণ করতে হবে যে, জলদ তাল অভ্যাস করা ছাড়া অন্য গতি নেই। তা নইলে বিংশ শতাব্দীর আধুনিক সভায় দু'কথা বলার স্পর্দ্ধা রাখা যায় না, বোবা হয়ে থাকতে হয়। তারপরে দিবসের নানা কাজের অন্তে সন্ধ্যেবেলায় হয়তো বেতার যন্ত্রটা একটু খুলে বসতে হোল। একটা সুইচ মাত্র টিপেই জার্ম্মানীর হের হিট্‌লার সদম্ভে কি বাণী বিতরণ করচেন ঘরে বসে তা শুনলুম। শুনতে শুনতে গর্ব্বে বিস্ফারিত হয়ে উঠলুম। বিজ্ঞানের বলে কীই-না সম্ভব হয়েচে! ও ভবিষ্যতে আরও কত হবে। কিন্তু জগত-জোড়া খবর সংগ্রহ করে আমরা মনকে বোঝাই দিলাম বটে এবং ফলে well informed হলুম, কিন্তু আরও কি কিছু বাকী রইলো না কোথাও জমা খরচ মিলিয়ে দেবার? কোথায় পেলুম আমরা নিভৃত অখণ্ড পরিপূর্ণ অবকাশ, যে অবকাশে মনকে ভরে নিতে পারি। নিজের মনের সঙ্গে মুখোমুখি একা দাঁড়াতে পারি। নিজের মনের একটা বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য গড়ে তুলতে পারি, যার বলে সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে একা দাঁড়াতে পারে। গতানুগতিক সকল চিন্তা সবলে অতিক্রম করে অকুতোভয়ে সত্যের পতাকা তুলে ধরতে পারে। এ মনের গঠন খবরের কাগজের হেডলাইনগুলো পড়লে হয় না বা বিশেষ কিছু না জেনে গোল্ডষ্টাওার্ড সম্বন্ধে খানিকটা বক্ বক্ করে বকলেও হয় না, কিংবা রেডিওতে রাজনীতি সম্বন্ধে সেরা বক্তৃতাগুলো শুনলেও হয় না। তার জন্য অন্য সাধনা প্রয়োজন। একটা টেষ্ট নেওয়া যাক। রবীন্দ্রনাথের "ছিন্নপত্র" কিংবা রবীন্দ্রনাথের কবিতা সমাহিত হয়ে পড়বার পরে একখানা খবরের কাগজ খুলে বসুন। সঙ্গে সঙ্গে কত তীব্রভাবে বুঝতে পারবেন, গোটা জগত জুড়ে রাষ্ট্রবিধাতাদের যে হাতের পাঁচ রাখবার লুকোচুরি খেলা এবং কপট মিথ্যাচার চলছে তার পুতিগন্ধ কী তীব্র!

অন্যসময়ে এত তীক্ষ্ণরূপে তা হয়তো অনুভবগম্য হবে না। এটা কেন হয়, না একটা অখণ্ড সৌন্দর্য্য বস্তুতে আমরা যখন মনকে নিঃশেষে নির্ম্মল করে ডুবিয়ে দিই তখন সে current news সম্বন্ধে যতই পিছিয়ে থাক, যুগে যুগে মানবতার আদর্শ যে কি, সেটা উজ্জ্বল হয়ে তার কাছে প্রতিবিম্বিত হয়। আধুনিক জন-সাধারণের খবরের কাগজ, সস্তা নভেল, সস্তা সিনেমা, সস্তা রেডিওর প্রতি এত অমানুষিক টান না জন্মিয়ে, সত্যকার সাহিত্যের প্রতি যদি কিছু প্রবণতা থাকতো তবে তাদের মনের একটা

ভিন্ন খাতে বইতো। সাহিত্যিক শিক্ষার যা প্রভাব, সেটা নিগূঢ় হ'লেও চিত্তের গভীরতম তলদেশ অবধি পরিব্যাপ্ত। ধরা যাক যে যুবক সেক্সপীয়রের নাটক হৃদয় দিয়ে অনুভব করেচে বা রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে কেবলমাত্র প্রবন্ধ না লিখে তার অন্তর্নিহিত সুরটিকে ধরবার চেষ্টা করেচে, তার শিক্ষার মধ্যে একটা আভিজাত্য বোধ, সৌন্দর্য্যের প্রতি একটা আকর্ষণ এবং অন্যায়ের প্রতি স্বভাবতঃ বিতৃষ্ণা থাকবে। অথচ ও বইগুলির কোনটাই নীতি-শাস্ত্রের বই নয়।

তাছাড়া মানুষের মনে চিরদিনই সাহিত্যকে নিজের জীবনে নকল ক'রবার একটা দুর্নিবার প্রবৃত্তি আছে। একদল লোক বলেন, সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি কিন্তু জীবনও কি খানিকটা সাহিত্যের প্রতিচ্ছবি নয়? নিজেদের অজ্ঞাতসারে আমরা সাহিত্য থেকে অনেক কিছু চুরী করে জীবনে আমদানী করি। তাই যে যুগের সাহিত্য সস্তা চাকচিক্যে এবং রোমাঞ্চে কণ্টকিত, বাজে, বিকৃত, সে যুগে মানব চিন্তার ধারাটাও সেই পরিমাণে অগভীর, অস্বচ্ছ। এ সম্বন্ধে চিন্তাশীল লেখক Aldows Huxley গুটিকতক কথা খুব সুন্দর লিখেচেন; "We tend to think and feel in terms of the art we like; and if the art we like is bad, then our thinking and feeling will be bad. And if the thinking and feeling of most of the individuals composing a society is bad, is not that society in danger?"

বিজ্ঞান আজ জগতে যুগান্তর এনেছে। কিন্তু যুগান্তর রচনা করবার যে বিপুল শক্তি সে মানুষের করায়ত্ত করে দিয়েচে, সে শক্তি আধুনিক মানব ধ্বংসলীলার চর্চ্চায় নিয়োজিত করেচে। এ যেন এক উন্মাদের হাতে এনে দেওয়া হয়েচে সহস্র শিখাময় দীপ। এ দীপালোকে অগ্নিলীলা আরম্ভ না করে যদি সভ্যতার মণিহর্ম্ম্য সাজাতে হয় তবে সে উন্মাদকে প্রকৃতিস্থ করতে হবে। কিন্তু প্রকৃতিস্থ করবার আয়োজন কোথা আছে? রাষ্ট্রক্ষেত্রের হানাহানি বা মিথ্যা কচকচির মাঝে নেই। উন্মাদনাপূর্ণ সিনেমাপর্দ্দায় নেই। রেডিওবাহিত টাটকা খবরের মাঝে নেই। আছে সাহিত্যের অমরাবতীতে। যেখানে বাণীর দেউলে মানুষের অশ্রুজল গোধূলির স্বর্ণাভায় জড়িত হয়ে রয়েচে। যেখানে মানবের প্রেম, আশা, কামনা, আনন্দ, বেদনা এক শান্ত করুণ আভায় মিশ্রিত জড়িত হয়ে বাণীর অটল সিংহাসনে বিরাজ করচে। অত্যন্ত কাজের লোক হয়ে ওঠার চেয়ে আমরা যদি এই সিংহাসনের তলায় বসে একটুখানি স্বপ্ন দেখবার চেষ্টা করি তবে মাথাও ঠাণ্ডা হয় আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানও খানিকটা ফিরে আসে। মনের ষ্টাইল যাকে বলে সেই বিশিষ্ট মৌলিকতাও খুঁজে ফিরে পাই।

আমরা এতদিন ভক্তিতে গদগদ হয়ে যাদের উপাসনা করতুম এবং আমাদের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ মনে করে যাদের অন্ধ অনুকরণ করতুম সেই য়ুরোপীয়রাও আজ তাদের জাতির ষ্টাইল হারিয়ে বসে আছে। তাই খামোকা এমন সব অভাবিত নীচ কাজ করে বসে থাকে যার সঙ্গে তাদের জাতির পূর্ব্বাপর ছন্দ এতটুকুও মেলে না। এটা কেন হলো তার কারণ দর্শাতে যেয়ে চিন্তাশীল Aldows Huxley বলচেন, আজকাল আমরা খবর সংগ্রহ করি মাত্র। মননের চর্চ্চা করি না। কাজে কাজেই মন খোয়াতে বসেচি। তিনি এ সম্বন্ধে লিখচেন;—"In a rapidly changing age, there is a real danger that being well informed may prove incompatible with being cultivated. To be well informed, one must read quickly a great number of merely instructive books. To be cultivated, one must read slowly and with a lingering appreciation the comparatively few books that have been written by men who lived, thought and feet with style.

যে জাতির অধিকাংশ লোকে নিজেদের মনের ষ্টাইল হারিয়ে বসেচে, তাদের পক্ষে সব রকম উৎকট বেখাপ্পা কাজই সম্ভবপর। কারণ তাদের মন থেকে তখন পূর্ব্ব পুরুষদের সংস্কার এবং কৌলীন্যবোধ মুছে গেচে।

জাতির সংস্কৃতি এবং সুষমাজ্ঞান ও তৎসঙ্গে কাণ্ডজ্ঞান ফিরে পেতে হ'লে ভালো সাহিত্যের সম্যক চর্চ্চা করা ছাড়া উপায় নেই।

শ্রীআশালতা সিংহ।

ব্যবধান

ডাক্তার এ, গুপ্ত, এম-বি, বি-এস

গল্পে শুনিতে পাওয়া যায়, একদা সায়ংকালে বিলাতে কোন অধ্যাপকের স্ত্রী তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী সঙ্গিনীকে বলিলেন, ডাক ঘরটী অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত হওয়ায় তাঁহাদের বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এমন সময় পাশের কক্ষ হইতে অধ্যাপক মহাশয় বাহির হইয়া বলিলেন, "আমি এতক্ষণ শনিগ্রহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলাম। একটী দেখিবার বস্তুই বটে!" আগন্তুকা মহিলা বলিলেন "ইহা' ত স্থানীয় পোষ্ট অফিস অপেক্ষা বহু দূরে! নয় কি?" জ্যোতির্ব্বিদ্ অধ্যাপক বলিলেন, "সূর্য্য হইতে আটশত তিরাশী লক্ষ মাইল দূরে!"

দীর্ঘ ব্যবধান যেমন অনেক সময়ে আমাদিগের নানা অসুবিধার কারণ ঘটায়, আবার তেমন কথন কথন সৌভাগ্যের সঞ্চার করে। পরিশ্রান্ত দেহে এক বা অর্দ্ধ শ ভ্রমণ করা পথিকের পক্ষে বিরক্তিজনক বলিয়া বোধ হয়। সন্তরণকারীর অবসন্ন দেহ উহা অপেক্ষাও কম পথ অতিক্রম করিতেই শিথিল হইয়া পড়ে। তথাপি আমাদের বহু ভাগ্য যে পৃথিবী সূর্য্য হইতে অনেক অনেক দূরে অবস্থিত এবং পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু হইতে আমাদের ভারতবর্ষও এক নিরাপদ ব্যবধানে সুরক্ষিত।

দূরত্বের পরিমাণ আবার অবস্থা ভেদে নিরূপণ করা হয়। যেমন পল্লীগ্রাম হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে গরুর গাড়ী সম্বল করিয়া কোন সহরে যাইতে হইলে ব্যবধানের পরিমাণ অনেকটা চন্দ্র হইতে পৃথিবীর অনুরূপ বলিয়া মনে হইবে। ঘোড়ার গাড়ীতে দূরত্বের পরিমাণ অবশ্য কিছু কমিয়া যাইবে। মোটর গাড়ীতে মনে হইবে, প্রাতর্ভ্রমণের অনুরূপ একটা কিছু করিতে যাইতেছি। আকাশ যানের বেলায় মনে হইবে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণকালে এই সবেমাত্র প্রথম ক্রোশ অতিক্রম করিলাম। কাজেই জগতের আর সমস্ত বিষয়ের ন্যায় দূরত্ব নামক বস্তুটীও আপেক্ষিক। পারিপার্শ্বিক বিষয় বা অবস্থার সহিত সন্নিবিষ্ট করিয়া ধারণা করিতে হয়। কলিকাতা হইতে বোম্বাই প্রদেশ অনেক দূরে। যতদূরেই হউক কলিকাতা হইতে লণ্ডনের তুলনায় অবশ্যই কাছে। এই কাছের রাস্তাটুকু যদি যানবাহনাদির পরিবর্ত্তে আমাদিগকে পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হয় তাহা হইলে মনে হইবে অসীম ব্রহ্মাণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে চলিয়াছি—এ পথ কখনও ফুরাইবে না, ইহার সীমা নাই, সমাপ্তি নাই—ইহা অনন্ত!

দূরত্ব সম্বন্ধে বিচার করিবার আর একটী অদ্ভুত প্রণালী আছে। জনৈক ভারতীয় ছাত্র তাহার এক ইংরাজ শিক্ষককে বলিয়াছিল, বাষ্পীয় তরীর আবির্ভাবের সাথে সাথে বিলাত ও ভারতবর্ষের ব্যবধান বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ কি? পুরাকালে সমুদ্র বিহারে ইংরাজগণ এত ঘন ঘন স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারিতেন না। বহুদিন তাঁহাদিগকে ভারতে থাকিতে হইত। আচারে ব্যবহারে ভারতীয়দিগের সহিত একত্র হইয়া যাইতেন। তাহাতে পরস্পরের অন্তরঙ্গতাও বৃদ্ধি পাইত। আর এখন বাষ্পীয় তরীর আবিষ্কারের সঙ্গে তাঁহারা প্রায় প্রতিবৎসর স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হন। পূর্ব্বের ন্যায় ভারতবর্ষকে আর আপনার বলিয়া মনে করেন না। কাজেই, ইংরাজ ও ভারতবাসীদিগের মধ্যে যে অল্প ব্যবধান ছিল তাহা বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে।

এই মানসিক ব্যবধানের বিষয় কিঞ্চিৎ চিন্তা করিবার আছে। পাঠক হয়'ত একজনকে বহুকাল ধরিয়া জানেন অথচ তাহার কিছুই জানেন না। অপর একব্যক্তি যাহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই, স্বল্প আলাপের পর মনে হইল, সে যেন কত কালের পরিচিত। তাহার ভিতর এমন

একটা কিছু আছে যাহা পরস্পরের ব্যবধান ঘুচাইয়া দিতে সমর্থ হইল। যে শক্তি এই আত্মা হইতে আত্মার দূরত্ব হ্রাস করিতে সমর্থ হইল তাহার নাম, প্রেম—নিঃস্বার্থভাবে একান্ত সঙ্গোপনে এমন কি মনশ্চক্ষুর অন্তরালে সে তাহার কার্য্য সম্পাদন করিল।

এই মানসিক ব্যবধানের আর একটী ধারা কেন্দ্র করিয়া কিছু বলিতে চাই। মানবের পরম গৌরবের সামগ্রী পুস্তক ও নিম্ন পর্য্যায়ের নিরক্ষর মানবের মধ্যে যে আকাশব্যাপী ব্যবধান রহিয়াছে তাহার পরিমাণ হয় না। একজন আদিম যুগের বর্ব্বর মনুষ্যকে যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাঠাগারের কক্ষে দাঁড় করান হয়, সৌন্দর্য্য ও আনন্দের খনি ঐ পুস্তক-গুলি হইতে সে অবশ্যই বহুদূরে অবস্থান করিবে। এ যেন কতকটা চন্দ্রমল্লিকার মধু আহরণরত প্রজাপতিকে রাজধানীর কোন বিলাস কক্ষে প্রতিষ্ঠিত করা। যে বালক সামান্য লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে, সে কল্পনায় যে আকাশ জাহাজখানি সৃজন করে তাহার দ্বারা উপকথার সোনার খনির দেশের সহিত অতি অল্পই ব্যবধান রাখে। দরিদ্র হইলেও সে কুবের অপেক্ষা বিত্তশালী; দুর্ব্বল হইলেও ভীমসেনের ন্যায় বলবান। নিঃসঙ্গ হইলেও সে কল্প-লোকের নৃপতিগণের বান্ধব। বাষ্পীয় জলযান ও বৈদ্যুতিক বিমান বাহ্যিক স্থূল জগতে যতখানি দূরত্ব অতিক্রম করিতে পারিয়াছে, শিক্ষা ও মনের প্রসারতাও মনো-জগতের ব্যবধান সেইরূপে অতিক্রম করিতে পারে।

বর্ত্তমান জগতের রাজনীতিতে "ব্যবধান" সম্পর্কিত বহু আলোচনার সৃষ্টি হইয়াছে। গ্রেটবৃটেনে এমন বহুলোক আছেন যাঁহারা যুদ্ধ বস্তুটী ভুলিয়া যাইতে চাহেন ও মন হইতে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ভাব সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসিত করিয়া মানব জগতের যথার্থ কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের আকাঙ্খা রাখেন। কিন্তু ফরাসীরা বলেন, "তোমার ও প্রাশিয়ানদিগের মধ্যে যদি উত্তর সমুদ্রের ব্যবধান না থাকিত, তাহা হইলে তোমার কণ্ঠে সাম্যনীতির সুর এমন সুমধুর ভাবে বাজিয়া উঠিত না। প্রতিবাসী শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইলে তোমার ও মনোভাব সম্পূর্ণ বিপরীতরূপ ধারণ করিত।"

এইরূপ প্রতিবাদের উত্তরে, স্থূল জগতের ব্যবধান অপেক্ষা মনোজগতের দূরত্বের উপর অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করাই সমগ্র সভ্য মানবসমাজের একমাত্র কামনার বস্তু।

ইংরাজ হয়ত ফরাসীকে ডাকিয়া বলিবেন, 'সত্য বটে, তোমরা আমাদের অপেক্ষা জার্ম্মাণী হইতে অল্প ব্যবধানে অবস্থান করিতেছ। তোমাদের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের নিমিত্ত আমরা পূর্ণমাত্রায় সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু তৎসহিত, তোমাদের পরস্পরের মানসিক দূরত্ব বাহ্যিক ব্যবধান হইতে সহস্র গুণ অধিক কিনা তাহাও বিচার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। পরস্পরের বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির দ্বারা এই মনোজগতের ব্যবধানকে লাঘব করিতে পারিলে তোমাদের ভয়ের কোন সঙ্গত কারণ থাকিবার নহে।"

নিখিল বিশ্বের জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাকালে উক্তরূপ অনু-প্রেরণার উদ্ভব হইয়াছিল। নৈতিক বৈষম্য হেতু ইয়োরোপে জাতিতে জাতিতে যে সঙ্ঘর্ষ বাধিয়াছিল, মহাযুদ্ধের অব-সানের পর যদি উক্ত পার্থক্যের বিনাশ সাধন করিতে পারা যায় তাহা হইলে পৃথিবীতে সদিচ্ছা প্রণোদিত শান্তির প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। বাষ্পযান, জলযান ও বিমান যেরূপ ভৌগোলিক পার্থক্য অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই-রূপ মানবের আধ্যাত্মিক বিকাশ ফলে মনোজগতের বৈষম্য অতিক্রম করিয়া জগতে শান্তি ও সাম্যনীতির প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে।

এই একই ভাব জগতের প্রত্যেক সত্যধর্ম্মে পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতান্ত্রিক ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন, অসীম ব্রহ্মাণ্ডের সাগর প্রমাণ অনন্ত শূণ্যে ক্ষুদ্র বালুকণার ন্যায় ভাসমান এই অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবীর প্রতি ভগবানের যে কোন-রূপ দৃষ্টি আছে তাহা বলা যায় না। আকাশের কোটী কোটী যোজনব্যাপী কোটী কোটী গ্রহ নক্ষত্রের আয়তন ও দূরত্বের পরিমাণ অনুধাবন করিতে পারিলে এই অতি ক্ষুদ্র পৃথিবীর অস্তিত্বের আবশ্যকতা নিষ্ফল বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে আকাশে অগণিত তারকারাজির সমষ্টিগত আলোকরশ্মি একটী দ্বাদশ হস্ত পরিমিত আয়তন সমুজ্জ্বলকারী ক্ষুদ্র প্রদীপের জ্যোতি অপেক্ষাও উজ্জ্বল নহে।

নিকটতম নক্ষত্র সৌরজগতের ব্যাস্ অপেক্ষা মাত্র তিন সহস্রগুণ দূরে অবস্থিত! আকাশে বহু নক্ষত্রের আলোক আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় যাহারা বহু লক্ষবৎসর পূর্ব্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আজ যাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে তাহাদের শেষ ক্ষীণ রশ্মিটুকু কত দীর্ঘকাল পরে আমাদের নয়নপথে পতিত হইতেছে। কবে কোন অনাদিকালের এক প্রত্যুষে অনন্ত আকাশে তাহাদের আলোক রশ্মির প্রথম অভিযানের সূত্রপাত হয়, কবে সে কোন অতীত যুগে যখন পৃথিবীর জন্ম হয় নাই, আরও কত লক্ষ শতশত গ্রহ উপগ্রহের সৃষ্টি হয় নাই, আজ যুগ যুগান্তর পরে সেই ক্ষীণ জ্যোতিটুকু আমাদের দৃষ্টিপথে গোচর হইতেছে!

তথাপি মানুষ ভগবানের কথা বলে ও মৃত্যুর পরপারে আর একটা জীবনের কথা স্মরণ করে!

কিন্তু কেমন করিয়া মানুষ স্বর্গরাজ্যে আরোহণ করিয়া সৌরজগতের ব্যাস্ পরিমাণ করিল? সূর্য্যের আয়তন ও পরিধি নির্ণয় করিল? কেমন করিয়া অদৃশ্য নক্ষত্রের লুক্কায়িত স্থান নিরূপণ করিতে সমর্থ হইল? সে অবশ্যই কোন যন্ত্রের সহায়তায়। এরূপ যন্ত্র উদ্ভাবনার সাথে সাথে আকাশব্যাপী বিরাট ব্যবধানের লোপ সাধন হইল। তেমনই একাগ্র সাধনা ও প্রেমের দ্বারা মানুষ স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যে ব্যবধান আছে তাহারও বিনাশ সাধনে সমর্থ হয়। ধরণী যতই ক্ষুদ্র হউক সে ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক ক্ষুদ্রতম অংশ। মানুষ তাহার ভিতর সৃষ্ট জীব। মানুষ বলিতে মানুষের মনকেই বুঝায় এবং এই মনই আমাদের আসল স্বরূপ—এই মনের কাছে কোন ব্যবধানই অনতিক্রম্য নহে।

সুতরাং মানুষ আর ভগবানকে এক দুর্লঙ্ঘ্য অপার্থিব স্বর্গীয় পুরুষরূপে কল্পনা করিতে চাহেন। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সত্তারূপে তিনি সর্ব্বভূতে বিরাজমান এবং আমাদিগেরও অপ্রাপনীয় নহেন। অনুভূতিদ্বারা আমরা বুঝিতে পারি তিনি আমাদের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই সমভাবে বিরাজ করিতেছেন। তাই গীতায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ..
৭অঃ—৭শ্লোক

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ১৮।৬১
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথাসর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ৯।৬
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৬.৩০

অর্থাৎ, হে ধনঞ্জয়, আমি ভিন্ন জগতে সৃষ্টি সংহারের কারণান্তর আর কিছুই নাই; সূত্রে মণিগণ যেরূপ গ্রথিত থাকে, সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠানস্বরূপ আমাতে এই সমস্ত জগৎ সেইরূপ গ্রথিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। হে অর্জ্জুন, সর্ব্বান্তর্য্যামী নারায়ণ স্বীয় মায়াশক্তি প্রভাবে শরীররূপ যন্ত্রে আরূঢ় অর্থাৎ দেহধারী ভূতগণকে পরিভ্রমণ করাইয়া (অর্থাৎ তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া) তাহাদের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন। যেমন সর্ব্বদা সর্ব্বত্রগামী মহান বায়ু আকাশে অবস্থিত, ভূতগণও সেইরূপে আমাতে অবস্থিত, জানিও। যিনি আমাকে সর্ব্বত্র দেখেন ও সর্ব্ব আমাতে দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না, তিনিও আমার অদৃশ্য হন না। (অর্থাৎ আমি প্রত্যক্ষ হইয়া কৃপাদৃষ্টিপাতে তাঁহাকে অনুগ্রহ করি।)

যেমন "ওদের কথায় ধাঁধা লাগে
তোমার কথা আমি বুঝি,
তোমার আকাশ তোমার বাতাস
এইত সবি সোজাসুজি।
হৃদয় কুসুম আপনি ফোটে
জীবন আমার ভরে ওঠে
দুয়ার খুলে চেয়ে দেখি
ঃ সকল পুঁজি।

রবীন্দ্রনাথ

স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যে অন্তরায় বিরাজ করিতেছে তাহা মনের প্রসারতার দ্বারা অতিক্রম করা যায়। অনুভূতির দ্বারা মানুষ স্বীয় আত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ সাধন করিয়া থাকে। বাল্মীকির রামায়ণ যেরূপ আমাদিগকে বাল্মীকির সহিত অবিচ্ছিন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, পৃথিবীর কবি ও জ্যোতির্ব্বিদ্গণও সেইরূপে এই ধরণীর প্রতি ধূলি

কথাটীর সহিত অসীম গগনের এক অপূর্ব্ব সংযোগ সঙ্ঘটনে সক্ষম হইয়াছেন।

ব্রহ্মের প্রভাব যে ক্ষুদ্র মনুষ্য একবার উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, শত ব্যবধানও তাহাকে ভগবান হইতে দূরে রাখিতে পারে নাই। আইনষ্টাইন প্রমুখ মনীষীগণ বলিয়াছেন, ব্যবধান বস্তুটী সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। সুদূর আফ্রিকার জঙ্গলে এক কাফ্রি অধিবাসী ও ভারতের একজন শ্রমজীবীর মধ্যে প্রচুর ব্যবধান রহিয়াছে বটে কিন্তু ঐ ভারতীয় শ্রমজীবী ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহার তুলনায় প্রথমোক্ত ব্যবধানে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ব্যবধানের বিনাশ সাধন করিতে হইলে অজ্ঞানের নাশ সাধন প্রয়োজন। পাশ্চাত্য দেশের নাবিকগণ একদা আমেরিকার বৃক্ষ-কোটরবাসী আদিম অধিবাসীদিগের অজ্ঞানতা দূর করিতে পারিয়াছিল, তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তিগণ ইথারের আবিষ্কারের সাথে সাথে জনসাধারণের বেতার সম্বন্ধে অজ্ঞতার নিবারণ করিয়াছেন, চিকিৎসকগণ মারণ উচাটন মন্ত্রের উপাসক রোগীদিগের অজ্ঞানতা অপসরণ করিতেছেন। আর আজ জগতের আদর্শবাদীরা জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষজনিত পার্থক্যের ঐক্য সঙ্ঘটনে প্রয়াস পাইতেছেন।

সকল ব্যবধানই প্রেম ও জ্ঞানের দ্বারা অতিক্রম করিতে পারা যায়। মানবমনে সেই প্রেমের অনুভূতি ও জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা জন্মিতে পাইলে একের সহিত অন্যকে অন্তরঙ্গ করিয়া গ্রথিত করিয়া থাকে। প্রাণের অনুভূতির দ্বারা যিনি বুঝিতে পারিয়াছেন ব্যবধান বস্তুটীর উৎপত্তি বাহিরে নহে পরন্তু হৃদয়ের অভ্যন্তরে—তিনিই বাহ্যিক জগতের কোন বৈষম্যেই অভিভূত হন না। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই জ্যোতির্ব্বিদের নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছেন, পৃথিবীর পরিক্রমণ রেখার দুই প্রান্তের ব্যবধান ১ শত লক্ষ ক্রোশ এবং পদার্থ বিদ্যার সাহায্যে ইহাও জানিতে পারিয়াছেন যে ঐ দীর্ঘ রেখার প্রতি ইঞ্চি কোটী কোটী অণুর দ্বারা আবৃত হইতে পারে এবং এক একটী অণুতে যে পরিমাণে অগণিত পরমাণুর সংখ্যা আছে তাহারা ঐ স্বল্প গণ্ডীতে আকাশের কোটী কোটী গ্রহ উপগ্রহের ভিতর পৃথিবীর ন্যায় পরিক্রমণ করিবার মত যথেষ্ট স্থানও পাইতে পারে।

ঐ সকল তথ্য সংগ্রহকালে যে কোনও ভাবুক ব্যক্তির মনে নিরাশা বা ভীতির সঞ্চার হলো যেহেতু তিনি মনে মনে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই মানসসম্ভূত। সুতরাং শান্ত হৃদয়ে স্থির নেত্রে তিনি অসীম বিরাট হইতে সসীম ক্ষুদ্রতম পর্য্যন্ত সকলের প্রতি আপন দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া তাহাদের অপরিমিত ব্যবধানের কথা ভুলিয়া যান এবং সকলকে সমষ্টিগতরূপে ধারণ করিয়া তাহার ভিতর আপনার স্থানটীও নির্ব্বাচন করিয়া লয়েন।

এ, গুপ্ত

আত্মঘাতী

কানাই সামন্ত

আত্মহত্যা করিলাম। সুস্বাদ বিস্বাদ
সব কিছু চেখে দেখে এতদিনে মিটিয়াছে সাধ
মর্ত্যজীবনের। একি ঘূর্ণ্যতাণ্ডবিনী
ভৈরবীর রাত্র দিনই
উন্মত্ত আবেগ ?—তাও নয় ?—
মহাশূন্যময়
অলক্ষ্য কালের চক্র আবর্তনে অহর্নিশ ঘুরে
অগণিত চক্রপুঞ্জ আর্তনাদে পূরে
এ বিশ্বের আদিঅন্তে
দণ্ডে-দণ্ডে—
বাঁধা। অন্তরে বাহিরে
যান্ত্রিক অভ্যাসে ফিরে ফিরে
আসে সেই পুরাতন—
সেই সূর্য, সেই তারা, দুঃখসুখ অক্লান্ত যতন
মায়াময় মরিচিকাতরে,
অবশেষে শূন্যতার বোধ, অবোধ অন্তরে
সর্গ আশা নরকের ভয়,
মৃত্যু, পরাজয়,
পরম বিস্মৃতি।

কবি কিম্বা কবিবর, কী গাও উদ্গীতি
নূতনের ? সেই পুরাতন আসে সেজে
চির নূতনের বেশে। সৃষ্টির মর্মে যে
প্রাণ নাই, প্রেম নাই, কোনো বোধ নাই,
ক্লান্তি তাই
তোমার আমার অনাহুত আগন্তুক প্রাণে,
এখানে সেখানে
জীর্ণতার দীর্ণতার দাগ,
বিচ্ছেদ, বিরাগ,
মূর্চ্ছা। তোমার আমার কোনো
চিহ্নলেশ থাকে না কখনো
জলে স্থলে অনলে অনিলে
নির্বিকার নীলশিলাপটে ঊর্ধ্বের। নহিলে
মিলনের বিচ্ছেদের বিষাদের গান
নিশিদিনমান
সূর্য শশী তারাই গাহিত ; তাহাদের হয়ে
তুমি গান রচিতে না।

এ যন্ত্র-আলয়ে
সকলি যান্ত্রিক যদি ; জন্মজরা,
ক্ষুৎপিপাসা, ইন্দ্রিয়-আবেগ, বাঁচামরা
বাস্তবিক বহু বিড়ম্বনা—
অকথ্য—উল্লেখ করিব না,
এমন-কি প্রেম ও বাসনা
ক্ষণ আশা আর দীর্ঘ নৈরাশ্যবেদনা,
অবোধ উৎসুক
হৃদয়ের সূক্ষ্মতম দুঃখ আর সুখ,
সকলি যান্ত্রিক যদি
নিরবধি
কেন এই ভান ?—
স্বসমুথ স্বতস্ফূর্ত জীবনের মিছে জয়গান ?

নিষ্করুণ প্রখর আলোকে
বিজ্ঞানের—দেখিলাম মোহমুক্ত চোখে
বাস্তবের দৃঢ়ভূমি বন্ধুর রক্তাক্ত পদতলে
কারো অশ্রুজলে
ভিজিবে না সেই নির্বিকার।

কিম্বা আপেক্ষিক সত্তা তার
চতুরস্র আয়তনে
অতর্ক্য অনূপ—মূর্তিমোহমুগ্ধ মনে
হেন শূন্য পরিহাস হানে,
প্রাণের এখানে
একান্ত প্রবাস। গৃহ কোথা ? গৃহ কোথা তবে ?

বিজ্ঞানে দর্শনে কেন টানি ? স্বতঃসিদ্ধ অনুভবে
জানি আমি এই
জীবনে যে কোন মুক্তি নেই
সব দিকে সীমা শুধু সীমা।
বনের সবুজ ওই অম্বরনীলিমা
দৃষ্টি অবরোধকর।
দৃষ্টি সেই নির্বোধ ভ্রমর
সুন্দরীর স্মিতমুখমুদিতকমলে
উড়ে উড়ে বৃথাই যে সাধে শত ছলে
প্রবেশপিয়াসে। শ্রুতি পায় নাই টের
অবচন প্রেমীহৃদয়ের
কভু কোনো কথা। মনে হয়
এ বিশ্বের পুষ্পপাখী রূপ সমুদয়
শশীতারা সুহৃদস্বজন সবই ধ্বনিময়—
ধ্বনি শুধু ; তারি ঐক্যতান

শ্রুতিমূলে-সমৎসুক প্রাণ
কভু শুনে নাই।
স্পর্শে বা আঘ্রাণে নাহি পাই
মুক্তিসুখে উড়িবার অসীম আকাশ।
নয়নে নয়ন মিলে যে মিলনে নিশ্বাসে নিশ্বাস,
অঙ্গে-অঙ্গে-আসঙ্গের সর্বনাশী ক্ষুধা সব করে গ্রাস,
হায় তারো রভসসুখের অবসাদে
স্বপ্নে প্রাণ স্মরে যে বিষাদে
বুঝি এক পলকের তরে
মেলেনি মেশেনি, তারা সুধাময় নাস্তিত্বসাগরে
একবিন্দু বারি স্পর্শিয়াছে কূল থেকে।
অস্তিত্বে কে
সুখ লভিয়াছে কবে ?—
জ্ঞানে—প্রেমে— ইন্দ্রিয়ানুভবে
সীমা হায়, সীমা শুধু, সীমা।

আত্মঘাতী—করি নাই এ জীবন বীমা
স্বর্গসুখ-আশে কিম্বা নরকের ভয়ে।
আশাশঙ্কা বিসর্জি উভয়ে
খুঁজি সেই চিরন্তন মৃত্যুঅন্ধকার
ক্ষণদ্যুতি জীবজন্মমরীচিকা যার
আদিঅন্ত জানে না রে।

মগ্ন হলে সেই মৃত্যুপ্রান্তরে-পাথারে
সুখদুঃখ আশানিরাশার দ্বন্দ্বশেষ চেতনার সাথে,
নিত্য প্রভাতে প্রভাতে
জাগিবার এ বিড়ম্বনার অবসান।

অথবা নির্বাণ
পূর্ণতার আস্বাদন ? সীমালুপ্ত এ সত্তা কেবল
লবণসমুদ্রে যেন লবণপুত্তল
মিলে যাবে মিশে যাবে চিরমর্ত্য লোকে
যেখানে যে কেহ আছে সকলেরি সুখে আর শোকে
এ-বিশ্বসংসারে-ব্যাপ্ত তার
পৃথক্ বিষাদহর্ষ আর
থাকিবে না ?

কিন্তু যদি অযাচিত অহেতুক জীবনের দেনা
এক জন্মে নাহি শোধ হয়,
কর্ম্মসূত্রে বাঁধা কর্ম্মময়
ফিরে আসি—দেহ লয়ে মন লয়ে
সংসার আলয়ে পুনর্বার'
মুক্তি কোথা মুক্তি কোথা তার
বন্ধন পীড়িত যেই প্রাণ
অপ্রতর্ক্য হে অদৃষ্ট ! অপ্রমাণ
মূক ভগবান !

কানাই সামন্ত

সোনালী রঙ

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
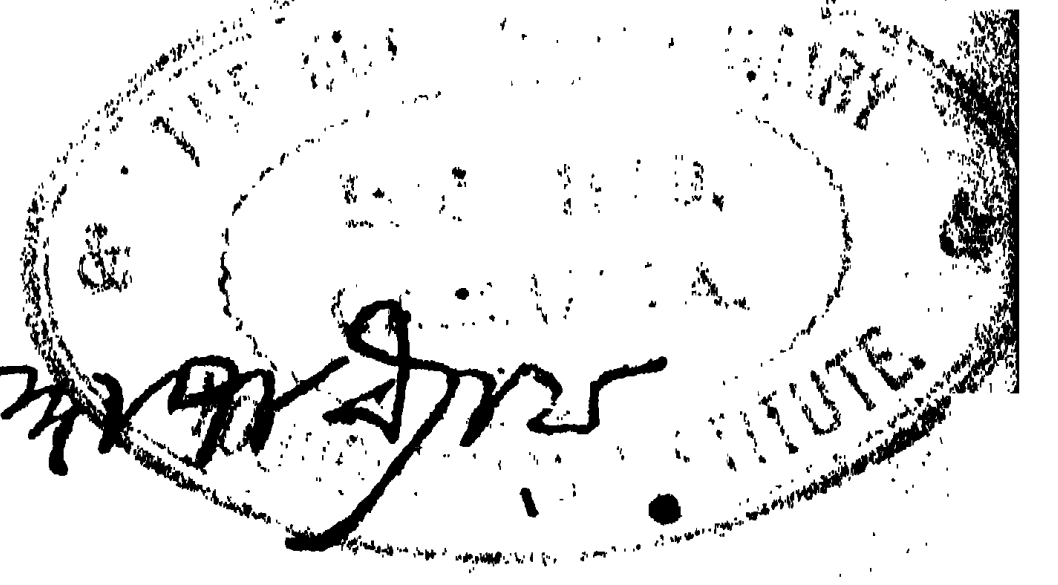
২০

বাসনার সহিত বন্ধন ছিন্ন ক'রে দিয়ে অমরেশ একেবারে গভীরভাবে ডুব দিলে তার গ্রন্থরাশির মধ্যে। জলের মাছ ডাঙ্গা থেকে জলে পড়লে প্রথমটা যেমন হয়, ব্যাপারটা হ'ল কতকটা সেই রকম। বাহিরের সহিত যখনই তার বিরোধ বাধে তখনই সে এইরূপে অধ্যয়নের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে আশ্রয় লাভ করে। অধ্যয়ন তার পক্ষে দ্বিতীয় জগৎ, যার আকাশের অচঞ্চল বায়ুমণ্ডলী বহির্জগতের তরঙ্গবিক্ষোভের দ্বারা সহজে আলোড়িত হয় না।

এবার কিন্তু ঠিক তা ঘটল না। এবারকার আঘাতটা এমন তীব্র অথচ অপরূপ যে, অধ্যয়নের দুর্গ মধ্যে প্রবেশ ক'রেও অমরেশ তার প্রভাব থেকে একেবারে মুক্তিলাভ করতে পারলে না। বিস্ময়ের হাত ধ'রে একটা অজানা আনন্দ, বঞ্চনার পাশে দাঁড়িয়ে একটা অযাচিত পরিতৃপ্তি, যেন তার মনকে বারম্বার কেন্দ্রচ্যুত করতে থাকে। বাসনার চিঠির কয়েকটা কথা থেকে-থেকে মনের মধ্যে উদয় হয় :—

'আমাদের সামান্য মনের ছোট ছোট যুক্তি আমাদের জীবনের খুব বড় বড় ব্যাপারে খাটাতে নেই। যা দেখতে পাচ্ছিনে, শুনতে পাচ্ছিনে, তা আমার পক্ষে নেই, অতএব প্রমাণের অভাবে ঈশ্বরও অসিদ্ধ, এরূপ যুক্তির দ্বারা আমরা ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রমাণ করিনে।'

মনে মনে মাথা নেড়ে অমরেশ প্রশ্ন করে, তাই যদি করিনে, তা হ'লে মহর্ষি কপিল তাঁর সাংখ্য দর্শনে কি এত পণ্ডশ্রম করলেন? সামনের অর্দ্ধ-পঠিত বইখানা বন্ধ ক'রে রেখে সে আলমারী থেকে তার সাংখ্য দর্শন বার ক'রে নিয়ে বসল। বহুবার অধীত গ্রন্থের মধ্যে একটা নূতন উদগ্র কৌতূহল নিয়ে নিমগ্ন হ'ল। নিরবচ্ছিন্ন আগ্রহের সহিত কয়েকদিন ধ'রে সে তন্ন-তন্ন ক'রে কপিল-দর্শন পাঠ করলে। শুধু প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব হেতু চার্বাক নিরীশ্বরবাদ প্রচার করেছেন। কপিল কিন্তু শুধু প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপরই নির্ভর করেন নি; প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ—এই ত্রিবিধ প্রমাণের বিচারের দ্বারাও তিনি ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। সুতরাং বাধ্য হ'য়ে তাঁকে বলতে হয়েছে, প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ। তবে?

অমরেশের মনে হ'ল, বাসনা যেন তার অন্তরের মধ্যে আবির্ভূত হ'য়ে বলছে, 'তবে আবার কি? এ থেকে মাত্র এইটুকু প্রমাণ হ'ল যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার মতো পাণ্ডিত্য এবং শক্তি মহর্ষি কপিলের ছিল না। যে জিনিস তিনি সপ্রমাণ করতে অসমর্থ হ'লেন, বস্তুত তার অস্তিত্বই নেই, কপিলের তর্ক-মীমাংসায় এতবড় বিশ্বাস স্থাপন করবার কারণ কি আছে শুনি?'

অমরেশ চিন্তিত হ'ল। এ কথাটা ইতিপূর্বে কোনদিন সে এমন ক'রে চিন্তা ক'রে দেখেনি। সৃষ্টি আছে অথচ স্রষ্টা নেই, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মতো এত বিরাট বিপুল একটা কার্য আছে অথচ তার আদি কারণ নেই,—এই দুর্বিশ্বাস্য মতবাদকে যথোপযুক্তরূপে সমর্থিত করবার মতো যুক্তির সারবত্তা সাংখ্য দর্শনের মধ্যে সত্য-সত্যই আছে কি-না, তদ্বিষয়ে সে মনে মনে বারংবার প্রশ্ন করলে। কপিল-কৃত যে-সকল সিদ্ধান্ত পূর্বে অকাট্য ব'লে মনে হয়েছে, আজ যেন তার মধ্যে সেই অখণ্ডনীয়তা অনুভব করতে মন সাহস পায় না। মনে হয়, দুর্জ্ঞেয়কে জানবার প্রণালী-সাধনের মধ্যে হয়ত কোথাও ভুল-ভ্রান্তি হ'য়ে গিয়েছে, তাই জানা যায় নি।

যে ঐশ্বরী কল্পনা সর্বকালে সর্বদেশে মানুষকে উন্নতির পথে টেনে নিয়ে গিয়েছে; অসংশয়িতরূপে যা মানবাত্মার কল্যাণ সাধন করেছে; শোকে যা দিয়েছে সান্ত্বনা; দুঃখে

সহনশীলতা ; ব্যর্থতায় যা মানুষের মনকে আশার দ্বারা সঞ্জীবিত করেছে ; পাপ হ'তে প্রলোভন হ'তে, অনাচার হ'তে দুর্নীতি হ'তে যা মানুষের মনকে নিয়ত রক্ষা করেছে ; নাস্তিকতাবাদের কোন্ বিচার পদ্ধতির দ্বারা কপিল এবং চার্বাক তার বিলোপ সাধন করবে ? অচিন্ত্য বিষয়-বস্তুর প্রতি তর্কের যোজনা ক'রে কোন সত্য আবিষ্কৃত হবে ? ঈশ্বর যদি মানুষকে সৃষ্টি না ক'রে থাকেন ত মানুষ ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং স্বর্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব না থাকলেও মানুষের কল্পনালোকে আছে। মৃত্তিকা বাস্তব পদার্থ, অতএব মৃত্তিকার মূল্য আছে ; কল্পনা অলীক বস্তু, সুতরাং কল্পনার মূল্য নেই,—এ বিচার পদ্ধতি কল্পনাজীবী মানুষের নয়। ইঁদুর ধরতে পারলে যদি কাঠের বেড়ালকে অগ্রাহ্য করা না যায়, তা হ'লে কল্পনার ঈশ্বরকেই বা অস্বীকার করা যায় কেমন ক'রে। সুতরাং বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর,—এ কথার সত্যতা স্বীকার করতে হয়। কি হবে তর্কের দ্বারা কাঁটাগাছের সৃষ্টি ক'রে, বিশ্বাসের দ্বারা যদি ফলপুষ্পময়ী লতিকা উৎপন্ন করা যায়।

অমরেশ চিন্তিত হ'ল। এই অভিনব চিন্তাভঙ্গী একেবারে অচিন্তিতপূর্ব বল্‌লেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। কল্পনার ঈশ্বরের দিক দিয়ে মানব জাতির এই গুরুতর সমস্যার কথা সে ঠিক এমন ভাবে কোনো দিন বিচার ক'রে দেখে নি। হঠাৎ মনে পড়ল বাসনার চিঠিতে লেখা সোনালী রঙের কথা। এ তবে সেই সোনালী রঙই শেষ পর্যন্ত হৃদয়ের মধ্যে রশ্মি বিকিরণ করলে না-কি! বাসনার অভিশাপ তা হ'লে ফলতে বেশি কিছু বিলম্ব হ'ল না! অমরেশের মুখে মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিলে। পরক্ষণেই মনের মধ্যে একটা সংশয় উপস্থিত হ'ল ; যুক্তি-বিচারের পথ হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে বিশ্বাসের পথে এই পদক্ষেপ বাসনার কাছে আত্মসমর্পণেরই রূপান্তর নয় ত ?…হয় ত' তাই! দুর্বলতার কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু দুঃখের কথা ব'লে ত' ঠিক মনে হয় না। মনে হয়, এই দুর্বলতার মধ্যস্থলে একটু যেন আনন্দের জ্যোতিও বর্তমান আছে। স্বচ্ছ স্ফটিকের মধ্যে লাগচে আভার মতো।

অমরেশ চিন্তিত হ'ল। মনে মনে মাথা নেড়ে বললে, 'এ কিন্তু ঠিক নয়, ঠিক নয়!' ঠিক হয় ত' নয়, কিন্তু মিথ্যাও ত নয়। বিবেকে যতটা বাধে, হৃদয়ে যে ততটা বাধে না! বিবেকের সহিত হৃদয়ের যেথানে এইরূপ বিরোধ সেইখানেই ত আসল ট্র্যাজেডির সূত্রপাত।

"দাদা!"

চকিত হ'য়ে অমরেশ পিছন ফিরে দেখলে পূরবী একেবারে নিকটে এসে দাঁড়িয়েছে ; বল্‌লে, "কি রে পূরবী, চা তৈরী না-কি ?"

পূরবী বললে, "তৈরী ক'রে ত কোনো লাভ নেই,—তুমি মাথা নীচু ক'রে বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকবে, আর টেবিলের উপর প'ড়ে পড়ে পেয়ালার মধ্যে চা সরবৎ হ'য়ে যাবে।"

মৃদু হাস্য ক'রে অমরেশ বললে, "আমার পড়া হ'য়ে গেছে। যা, তৈরী ক'রে নিয়ে আয়।"

মাথা নেড়ে পূরবী বললে, "না, এথানে নিয়ে আসব না, তোমাকে যেতে হবে।"

"কোথায় রে ?"

"রান্নাঘরের বারান্দায়। সেখানে তোমার জন্যে আসন পেতে এসেছি। তুমি গেলে মা খাবার দেবেন, আর আমি চা তৈরী ক'রে দোবো।"

সবিস্ময়ে অমরেশ বললে, "আজ আবার এ ব্যবস্থা কেন পূরবী ?"

পূরবী বললে, "এ ব্যবস্থা, তোমাকে ঘর থেকে টেনে বার করবার জন্যে। রাত নেই, দিন নেই, সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই,—পড়া, পড়া, সমস্ত দিন পড়া! কাল শেষ রাত্রে তিনটের সময় উঠে দেখি তোমার ঘরে আলো জ্বলছে। আচ্ছা, দাদা, শরীরটা একেবারে নষ্ট না ক'রে কি তুমি ছাড়বে না ?"

পূরবীর অনুযোগ শুনে অমরেশ হাসতে লাগল। বললে, "আর পড়া নয় পূরবী, পড়া আপাতত শেষ হয়েছে। এবার দিন রাত ঘাটে মাঠে শ্মশানে মন্দিরে হৈ হৈ ক'রে ঘুরে বেড়াব।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে পূরবী বললে, "ও মা! কেন ?"

"একটি ভদ্রলোকের খোঁজে।"

"ভদ্রলোকের খোঁজে? কে সে ভদ্রলোক?"

"সে ভদ্রলোক বহু দিন থেকে গা ঢাকা দিয়ে আছেন। কিছুতেই ধরা দিচ্ছেন না। নাম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।"

বিস্মিতকণ্ঠে পূরবী বললে, "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত? ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ত কবি ছিলেন, স্বর্গে গেছেন।"

অমরেশ বললে, "এ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও স্বর্গে থাকেন। স্বর্গে কিন্তু ইনি গুপ্ত নন; গুপ্ত ইনি আমাদের এই ধরাতলে।"

এবার রহস্য ভেদ করতে সমর্থ হয়ে পূরবী খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। বললে, "স্বর্গে ইনি গুপ্ত নন ত' কী তিনি সেখানে? সুপ্ত?"

পূরবীর কথা শুনে অমরেশ হেসে উঠল; দক্ষিণ হস্ত দিয়ে পূরবীর মাথাটা অল্প একটু নেড়ে দিয়ে বললে, "সাবাশ্ পূরবী, ঠিক বলেছিস! সুপ্তই তিনি সেখানে; তাই পৃথিবীতে এত বিশৃঙ্খলা। মর্ত্যলোকের আবেদন নিবেদন কান্নাকাটি কিছুই তাঁর কানে পৌঁছয় না।" তারপর এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা ক'রে ঈষৎ গভীরস্বরে বললে, "আচ্ছা পূরবী, তুই ঈশ্বর মানিস্?"

অবলীলার সহিত পূরবী বললে, "ওমা, মানিনে আবার!"

"ঈশ্বর আছেন ব'লে বিশ্বাস করিস?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় করি।"

একেবারে নির্বিকল্প অভিমত, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোথাও সামান্য মাত্র অবকাশ নেই।

অমরেশ বললে, "আচ্ছা, বিশ্বাস ত করিস, কিন্তু এ বিশ্বাসের হেতু কি? কোনো প্রমাণ দেখাতে পারিস?"

পূরবী বললে, "নিশ্চয় পারি। এই পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ তারকা,—এ সবই ত' ঈশ্বরের সৃষ্টি।"

"লজিক পড়িস পূরবী?"

"পড়ি বই কি।"

"তাও পড়িস!" হতাশার সুরে অমরেশ বললে, "কোনো আশা নেই তোকে নিয়ে!"

বিস্মিত কণ্ঠে পূরবী বললে, "কেন দাদা?"

অমরেশ বললে, "সে আর একদিন বুঝিয়ে বলব। আপাতত গুপ্ত মহাশয়ের বিষয়ে আলোচনা বন্ধ থাক। তুই গিয়ে চায়ের জল চড়িয়ে দে,—আমি এলাম ব'লে।"

যেতে যেতে পিছন ফিরে পূরবী বললে, "পাঁচ মিনিটের বেশি দেরী কোরোনা কিন্তু।"

অমরেশ বললে, "না, তা করব না।"

অল্পক্ষণের মধ্যে চা ও খাবার খেয়ে অমরেশ গৃহ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'ল। কয়েকদিন পারুলদের কোনো সংবাদ নেওয়া হয় নি। আশু মুখার্জি রোডে উপস্থিত হ'য়ে একটা দক্ষিণগামী চলন্ত বাসে উঠে বসল।

অনুমতি দেবীর গৃহে সে যখন উপস্থিত হ'ল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। সদর দরজা ভিতর হ'তে বন্ধ ছিল, কড়া নাড়তে চাঁপার মা এসে খুলে দিলে।

অমরেশকে দেখে চাঁপার মা সহাস্যমুখে বললে, "দাদা-বাবু! কতদিন আসনি গো তুমি! দিদিমণি তোমার জন্যে ভেবে ভেবে একেবারে সারা।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ ক'রে অমরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "মাসিমা কোথায় চাঁপার মা?"

দরজায় হুড়কা লাগিয়ে দিয়ে চাঁপার মা বললে, "মা কানাই পতিতুণ্ডীদের বাড়ি কথকতা শুনতে গেছেন। দিদিমণি ঠাকুর ঘরে আছেন।"

অমরেশ সবিস্ময়ে বললে, "ঠাকুর ঘরে আছে? ঠাকুর ঘরে সে কি করছে?"

চাঁপার মা বললে, "ওমা, দিদিমণি সবই ত' করলেন। ঘর নিকানো, পিদদীম দেওয়া, ধুপ-ধুনো দেওয়া, শাঁক বাজানো সব ত দিদিমণিই আজকাল করেন।"

"মাসিমা তা হ'লে কি করেন?"

"মা পুজো করেন।"

"দিদিমণি পুজো করে না?"

"না, পুজো করেন না; জপ করেন।"

বিস্মিত কণ্ঠে অমরেশ বললে, "জপ করে? জপ শেখালে কে তাকে?"

"কেন, মা!" ব'লে চাপার মা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল।

অমরেশ এসেছে সে কথা পারুল বুঝতে পেরেছিল। সে তাড়াতাড়ি কাজ সমাপন ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই চাঁপার মার সহিত কথা কইতে কইতে অমরেশ দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াল। পারুল তখন পঞ্চপ্রদীপটা সাজিয়ে রাখছিল, অমরেশকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "ভাল আছেন দাদা?"

স্মিতমুখে অমরেশ বললে, "আছি। তুমি কেমন আছ?"

"ভাল আছি।"

অমরেশ বললে, "তাড়াতাড়ি কোরো না পারুল, তোমার কাজকর্ম যা বাকি আছে সমস্ত ঠিক ক'রে সেরে নাও।"

পারুল বললে, "কাজ আমার শেষ হ'য়ে গেছে।"

"জপ ?"

এবার পারুলের মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল। নতনেত্রে মৃদুকণ্ঠে বললে, "আপনি ঘরে গিয়ে বসুন দাদা, আমি এখনি আসছি।" ব'লে উপবেশন ক'রে পঞ্চপ্রদীপের বাকি দুইটা প্রদীপে ঘৃত ও সলিতা দিতে নিরত হ'ল।

পারুলের ঘরে উপস্থিত হ'য়ে অমরেশ দেখলে দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের ধারে একখানা টেবিল ও খান তিনেক চেয়ার পড়েছে। টেবিলের উপর বই খাতা দোয়াত কলম প্রভৃতি লেখাপড়ার যাবতীয় উপকরণ। টেবিলের বাম পাশে একটা ছোট কাঠের র‍্যাকে রামায়ণ, মহাভারত, অভিধান, রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা, গান এবং অন্যান্য কতকগুলা বই।

টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে ব'সে চয়নিকাখানা নিয়ে অমরেশ পাতা ওল্টাচ্ছে এমন সময়ে ঘরে পারুল প্রবেশ করলে। অমরেশের নিকট উপস্থিত হ'য়ে নত হ'য়ে তার পদধূলি গ্রহণ ক'রে বললে, "একটু চা নিয়ে আসি দাদা ?"

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে অমরেশ বললে, "না, নিশ্চয়ই না। এক ঘণ্টাও হয়নি, চা আর খাবার এক পেট খেয়েছি, এরি মধ্যে আবার খেলে তোমাকে খুসি করা হ'লেও নিজেকে দণ্ড দেওয়া হবে। নাও, বোসো।" ব'লে পারুলের দিকে একটা চেয়ার ঠেলে দিলে। তাড়না খেয়ে পারুল উপবেশন করলে বই খাতাপত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বললে, "এ সব কি ব্যাপার পারুল ? রীতিমত স্কুলের ছাত্রী হ'য়ে উঠেছ দেখচি।"

স্মিতমুখে পারুল বললে, "মার কাণ্ড! শুধু কি এই ? রোজ ত' দু-তিন ঘণ্টা ক'রে আমাকে পড়াচ্ছেন, তার ওপর রোজ সকালে একজন নার্স এসে আমাকে সেবার কাজ শেখাচ্ছে!"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে অমরেশ বললে, "সেবার কাজ শেখাচ্ছে! তবে ত' রীতিমত সেবিকা হ'য়ে উঠছ পারুল! তার ওপর দেবসেবাও ত' চলছে ?"

এ কথার পারুল কোনো উত্তর দিলে না, চুপ ক'রে রইল।

অমরেশ বললে, "দেবতার সেবা ত' করছ পারুল, কিন্তু দেবতা মানো ?"

পারুল বললে, "মানি বই কি দাদা।"

"ঈশ্বর আছেন ব'লে বিশ্বাস করো ?"

"নিশ্চয় করি।"

"বিশ্বাস ত' করো, কিন্তু ঈশ্বর যে আছেন তার প্রমাণ কিছু দিতে পার ?"

অম্লানবদনে পারুল বললে, "পারি বই কি দাদা, আপনিই ত প্রমাণ।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে অমরেশ বললে, "কি সর্বনাশ! আমি কি ক'রে প্রমাণ হলাম পারুল ?"

পারুল বললে, "ঈশ্বর না থাকলে হরিদ্বারে আপনার দেখা পেয়েছিলাম কেমন ক'রে ?"

পারুলের কথা শুনে অমরেশ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল; বললে, "চমৎকার প্রমাণ ত! একেবারে অকাট্য! তা হ'লে হরিদ্বারে আমার দেখা পাবার আগে ঈশ্বর ছিলেন না ?"

পারুল বললে, "ছিলেন, কিন্তু প্রমাণ পাই নি।"

এবার আর অমরেশ হাস্‌তে পারলে না। বিশ্বাসের বিপুল মহিমা উপলব্ধি ক'রে সে নির্বাক হয়ে গেল। কত সান্ত্বনা, কত নির্ভরতা, কত পরিতৃপ্তি এই বহুনিন্দিত অন্ধ বিশ্বাসে! চক্ষুষ্মান হয়ে তা হ'লে কি লাভ!

গভীরস্বরে অমরেশ বললে, "ঠিক বলেছ পারুল, আমার দেখা পাওয়া নিশ্চয়ই একটা প্রমাণ।" তারপর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "আচ্ছা, আজ চললাম। বিশেষ কাজ আছে।"

ব্যস্ত হ'য়ে পারুল বললে, "সে কি দাদা! এতদিন পরে এসে এখনি আপনি চ'লে যাচ্ছেন!" তারপর গমনশীল অমরেশের পিছনে পিছনে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বললে, "দাদা, ক্রমশ কিন্তু আপনি আমাকে ছেড়ে দিচ্ছেন।"

পিছন ফিরে অমরেশ বললে, "ছেড়ে যে দিচ্ছিনে, তার প্রমাণও আমিই হব।" ব'লে দ্রুতবেগে প্রস্থান করলে।

পথে বেরিয়ে অমরেশ পদব্রজে উত্তর মুখে চলল। ক্রমশ সে চলতে চলতে কালীমন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হ'ল। সেদিন বোধহয় কোন তিথি-পর্বের যোগ ছিল। অগণিত নরনারী মন্দির প্রদক্ষিণ করছে, মন্দিরে প্রবেশ করছে, পূজা দিচ্ছে, ঘণ্টা বাজাচ্ছে। কোথায় কপিল, কোথায় চার্বাক, কোথায় তর্ক, কোথায় বিচার! অন্ধ ভক্তি সমস্ত নিমজ্জিত ক'রে বিপুল প্রবাহে ব'য়ে চলেছে!

নাটমন্দিরে উঠে একজন বৃদ্ধ সাধুর পিছনে স্থানাধিকার ক'রে অমরেশ সেই ভক্তিবিপ্লুত জনতার দিকে চেয়ে ব'সে রইল।

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বিশ্ব-রহস্য

(গত চৈত্র সংখ্যার প্রবন্ধের অনুবৃত্তি)

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম্-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন

২

পূর্ব প্রবন্ধে আমি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, সমগ্র বিশ্ব এরূপ বিরাট যে উহার ধারণা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। উহা একটী দেশ-কালাত্মক সত্তা যাহা অসংখ্য ছোট ছোট বিশ্বের দ্বারা অধ্যুষিত। ঐ ছোট ছোট বিশ্বগুলি পরস্পর হইতে সাধারণতঃ ১,০০০,০০০ আলোক-বৎসর * ব্যবধানে অবস্থিত। বস্তুদ্বারা অনধিকৃত আকাশ নিছক শূন্য। খোলা চক্ষে আমরা অসংখ্য নক্ষত্র-সমন্বিত মণ্ডলাকার আকাশের যতটা দশদিকে দেখিতে পাই, তাহা বিরাট বিশ্বের অতি সামান্য অংশ মাত্র। সমগ্র বিশ্বের তুলনায় এই অংশটী একটি কন্দুক হইতেও ক্ষুদ্র। আমাদের লোচনগ্রাহ্য এই স্থানীয় ক্ষুদ্র বিশ্বটীকে ইংরাজীতে **গ্যাল্যাক্সী** বলে। এই গ্যাল্যাক্সীর বাহিরেও দশ দিকে ইহার মত কোটী কোটী গ্যাল্যাক্সী বিদ্যমান। এই অসংখ্য ছোট ছোট বিশ্বগুলি **দ্বীপ-বিশ্ব** নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পৃথিবী হইতে এক একটী দ্বীপ-বিশ্ব শক্তিমান দূরবীক্ষণের সাহায্যে এক একটী নীহারিকা স্তূপ বলিয়া বোধ হয় এবং উহাদের দূরত্ব উহাদের ঔজ্জ্বল্য হইতে অনুমিত হয়। অতি দূরের নীহারিকাগুলি এক একটী নক্ষত্র বলিয়া বোধ হয়, অথচ উহারা প্রত্যেকে কোটী অপেক্ষাও অধিক নক্ষত্রের সমষ্টি। দূরত্বের আধিক্যবশতঃ উহারা এত ছোট দেখায়। পৃথিবী হইতে কোনো কোনোটীর দূরত্ব ১,০০০,০০০ আলোক বৎসর। যে আলোকের দ্বারা উহারা অনুভূত হয়, তাহা পৃথিবীতে পৌছিতে এক কোটী বৎসর লাগে।

প্রত্যেক দ্বীপ-বিশ্বের জীবনের বাল্য, যৌবন ও জরা আছে। এখন কোনোটীর বাল্য, কোনোটীর যৌবন এবং কোনোটীর জরা। বাল্যে তাহারা বর্তুলাকার। যেমন তাহাদের বয়স বাড়িতে থাকে, ক্রমশঃ তাহারা চেপ্টা হইতে থাকে এবং অবশেষে বার্ধক্যে উপনীত হইয়া তাহারা চক্রের ন্যায় পাৎলা আকার ধারণ করে। তাহাদের আলোকের বিশ্লেষণ দ্বারা বোঝা যায় যে, তাহাদের নক্ষত্রগণের ও সূর্যের আলোকের প্রকৃতিতে সাম্য আছে।

প্রত্যেক দ্বীপ-বিশ্বই নিজ মেরুকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে এবং কোনো না কোনো দিকে ধাবিত হইতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অধিকাংশই ঘণ্টায় অন্ততঃ দেড় কোটী মাইল বেগে পৃথিবী হইতে সরিয়া যাইতেছে। আমাদের স্থানীয় দ্বীপ-বিশ্বটী, অর্থাৎ গ্যাল্যাক্সী, প্রতি সেকেণ্ডে ২০০ মাইল বেগে এক দিকে দৌড়িতেছে।

আমাদের গ্যাল্যাক্সী অপরাপর দ্বীপ-বিশ্ব অপেক্ষা বহুগুণ বড়। ইহাতে ১০,০০০ কোটী নক্ষত্র আছে।

যে সকল নীহারিকাপুঞ্জ গ্যাল্যাক্সীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের রং সবুজ, কিন্তু গ্যাল্যাক্সীর বাহিরের নীহারিকাপুঞ্জ সমূহের রং সাদা। বর্ণের বিভিন্নতা হইতে বোঝা যায় কোন্‌টী ভিতরে এবং কোন্‌টী বাহিরে।

গ্যাল্যাক্সী-মধ্যস্থ নীহারিকাপুঞ্জগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—বর্তুলাকার ও ছড়ান। বর্তুলাকারগুলির সংখ্যা ১৫০। ইহাদের দেহ পাৎলা গ্যাসের দ্বারা গঠিত এবং ইহাদের প্রত্যেকের কেন্দ্রস্থলে একটী ক্ষীণপ্রভ নক্ষত্র বিদ্যমান। প্রত্যেকের ব্যাসের পরিমাণ ৭০০,০০০,০০০,০০০ মাইল। ইহারা সৌরজগৎ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক দেশব্যাপক, কিন্তু ইহাদের গুরুত্ব সূর্যাপেক্ষা অধিক নয়। কেন্দ্রীয় নক্ষত্রকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে ইহাদের ৫,০০০ বৎসর লাগে।

---

* আলোকের গতি এক সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল, অতএব এক বৎসরে ১৮৬০০০ × ৩৬৫ × ২৪ × ৬০ মাইল। এই দৈর্ঘ্যকে এক আলোক বৎসর বলা হয়।

ছাড়ান নীহারিকাপুঞ্জগুলি হয় উজ্জ্বল, নয় অন্ধকারময়, নয় কতকটা উজ্জ্বল ও কতকটা অন্ধকারময়। তাহারা অতি শীতল, এবং শীতল বলিয়াই তাহারা প্রভাহীন।

৩

নক্ষত্রগণ মিটমিট করে, কিন্তু গ্রহগণ মিটমিট করে না। ঔজ্জ্বল্যে উভয়েই সমান। গ্রহগণকে প্রত্যক্ষভাবে আকাশে সরিয়া সরিয়া যাইতে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নক্ষত্রগণ স্থির থাকে বলিয়া বোধ হয়। তাহারা সূর্য হইতে বহু দূরে অবস্থিত—সূর্যের আকর্ষণের বাহিরে। সেই কারণে তাহারা সূর্যের মধ্যে পড়িয়া যায় না, বা সূর্যের চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়ায় না। গ্রহগণ সূর্য হইতে প্রতিফলিত আলোক দ্বারা উজ্জ্বল, কিন্তু নক্ষত্রগণ সূর্যের ন্যায় বৃহৎ এবং স্বতঃ উজ্জ্বল।

কতকগুলি নক্ষত্র আকাশের আয়তনে পরস্পরের নিকটবর্তী থাকাতে নানা আকারে সজ্জিত বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিদ্‌গণ পৃথিবীর আকাশস্থ গতিপথে এইরূপে সজ্জিত বারোটী পুঞ্জে কতকগুলি পার্থিব জীব বা পদার্থের সাদৃশ্য অনুভব করিয়া ঐ পুঞ্জগুলির নাম দিয়াছিলেন—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। আবার, ঐ পথকে সাতাইশ ভাগে ভাগ করিয়া এক এক ভাগের নক্ষত্রপুঞ্জে পার্থিব বস্তুর কল্পনা করিয়া তাহাদের নাম দিয়াছিলেন—অশ্বিনী, ভরনী, কৃত্তিকা ইত্যাদি। ইহা ছাড়া আকাশের আরো বহু বহু নক্ষত্রপুঞ্জের নামকরণ হইয়াছে। নক্ষত্রপুঞ্জগুলি সূর্য হইতে কোটী কোটী মাইল দূরে অবস্থিত থাকাতে স্থির বলিয়া অনুভূত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা অতি বেগে ধাবমান।

আকাশে যত নক্ষত্র আছে, তাহাদের অর্ধেক যুগ্ম, কতকগুলি তিনটী নক্ষত্রের সমষ্টি, এবং কতকগুলি চারিটীর। কিন্তু তাই বলিয়া সমষ্টির অন্তর্গত নক্ষত্রগুলি [illegible]র সহিত সংলগ্ন নয়—পরস্পর হইতে বহু দূরে [illegible]স্থিত। তাহারা আমাদের দৃষ্টি-রেখার সহিত সমসূত্রে থাকে বলিয়া নিকটবর্তী বোধ হয়। দূরবীক্ষণ দ্বারা সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে তাহারা কখনো পরস্পরের নিকটবর্তী হইতেছে এবং কখনো পরস্পর হইতে দূরে অপসরণ করিতেছে। আবার, কখনো কখনো বোধ হয় যে উভয়ে উভয়কে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

নক্ষত্রগণ হইতে যে আলোক বিচ্ছুরিত হয়, তাহার পরীক্ষা দ্বারা জানা যায়—(১) উহাদের বহিঃপৃষ্ঠের উপাদান কি কি, (২) উহাদের উত্তাপের পরিমাণ কত, এবং উহাদের ঘনত্ব (density) কত। উহাদের বর্ণ হইতে উত্তাপ নির্ণীত হইতে পারে, তাহার কারণ এই যে তরঙ্গের আকারে তাপ বিকীর্ণ হয়। বিভিন্ন পরিমাণের তাপের তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন বলিয়া বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তাপের বর্ণ বিভিন্ন। লাল বর্ণের উত্তাপের পরিমাণ ২০০০° হইতে ৩০০০°c, কমলালেবুর বর্ণের উত্তাপের পরিমাণ ৪০০০°c, পীত বর্ণের উত্তাপের পরিমাণ ৫০০০°c হইতে ৬০০০°c, শ্বেতবর্ণের উত্তাপের পরিমাণ ৮০০০° হইতে ১১০০০°c, নীলাভ শ্বেত বর্ণের উত্তাপের পরিমাণ ১৫০০০°c। আমাদের সূর্যের বর্ণ পীত—অতএব উহার তাপের পরিমাণ ৫০০০° হইতে ৬০০০°c।

৪

সূর্য্যের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ এককালে সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, এবং সেই অবধি বিচ্ছিন্ন অংশগুলি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিভিন্ন বেগে ঘুরিতেছে—গতি অবিরত, বিরাম নাই। ঐ যে উহাদের সংখ্যাতীত নক্ষত্র সমূহ শূন্যে অবস্থান করিতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে, উহাদের সকলগুলিই কি আমাদের সূর্য্যের ন্যায় গ্রহসমন্বিত ? না, অধিকাংশই গ্রহ-বিহীন, উহারা অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, যাহাতে উহাদের গ্রহ উৎপন্ন হইতে পারে।

জীববাসের উপযুক্ত হইতে হইলে গ্রহগণের বায়ুমণ্ডল নাতিশীতোষ্ণ হওয়া আবশ্যক। শূন্য আকাশের দারুণ শৈত্যে জীব তিষ্ঠিতে পারে না। আবার সূর্য্য ও অন্যান্য নক্ষত্রগুলি যেন আকাশ মার্গে বিচরণশীল কতকগুলি বিরাট অগ্নিস্তূপ। উহাদের উত্তাপ এত অধিক যে সে রূপ উত্তাপে সকল বস্তুই বাষ্পে পরিণত হইয়া

যায়। গ্রহগুলি যখন সূর্য্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল, তখন তাহাদের তাপের অবস্থাও অনুরূপ ছিল। তাহারা ক্রমশঃ তাপ-বিমুক্ত হইতেছে, এবং আমাদের পৃথিবীর ন্যায় দু-একটী গ্রহের তাপের অবস্থা এখন এরূপ, যে সেখানে জীবের বাস সম্ভব।

পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ উত্তাপ এত কমিয়া গিয়াছে, যে যতটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহা প্রায় ধর্তব্যের মধ্যে নয়। জীব-বাসের উপযোগী উত্তাপ পৃথিবী সূর্য্য হইতে পায়, কারণ সূর্য্য গোলকের সকল দিক হইতেই উহার আভ্যন্তরীণ উত্তাপের স্রবণ বা বিকিরণ হইতেছে। যে পরিমাণ উত্তাপ সূর্য্য নিত্য পৃথিবীর উপর সঞ্চালিত করিয়া দিতেছে, তাহা দ্বারাই পৃথিবীর কাজ বেশ চলিয়া যাইতেছে, যখন পৃথিবীর উত্তাপ এত কমিয়া যাইবে যে, সূর্য্যের বিকিরণ হইতে প্রাপ্ত তাপেও তাহার শৈত্য দূর হইবে না, তখন সে চন্দ্রের ন্যায় জীববাসের অনুপযোগী হইয়া পড়িবে। আবার পৃথিবীর তাপের পরিমাণ এখন অপেক্ষা অধিক হইলেও উহাতে জীব থাকা অসম্ভব হইবে।

নক্ষত্রসমূহ ছাড়া বিশ্বের অবশিষ্ট অংশ, অর্থাৎ খালি আকাশ, এত শীতল যে, সেরূপ শৈত্যের আমরা ধারণাই করিতে পারি না। এক দিকে আকাশ অতি শীতল, অপর দিকে নক্ষত্রগণ অতি উষ্ণ। অতএব সূর্য্য বা কোনো নক্ষত্র হইতে কিছু দূরে অবস্থিত আকাশের যে অংশ নাতিশীতোষ্ণ, সেই অংশেই জীবগণ জীবন ধারণ করিতে পারে। ঐ অংশে যদি কোনো গ্রহ উৎপন্ন হইয়া পড়ে এবং সেই গ্রহে যদি তরল পদার্থ থাকা সম্ভব হয়, তবেই সেখানে জীবের বাস করা সম্ভব হইবে, কারণ তরল পদার্থ না পাইলে জীবন ধারণ করা অসম্ভব। বিশ্বের যে গণ্ডীর মধ্যে জীব বাঁচিতে পারে, সেই সীমার মধ্যেই আমাদের পৃথিবী।

বিশ্বের সামান্য অংশই জীববাসোপযোগী। অতএব যাঁহারা বলেন যে জীবের উপভোগের জন্যই এই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহাদের কথা কতদূর যুক্তিযুক্ত তাহা বিচার্য।

অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন যে, যেমন পৃথিবী ঘটনাক্রমে আকস্মিক ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, তেমনি পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তিও আকস্মিক। যে যে পদার্থ হইতে জীবদেহের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা সাধারণ রাসায়ণিক পরমাণু মাত্র, যথা (১) কয়লায় বা ভুসায় যে অঙ্গার থাকে তাহা (২) জলে যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকে তাহা, এবং বায়ুতে যে নাইট্রোজেন থাকে তাহা। জীবদেহের উপাদানভূত পরমাণু এই পৃথিবীতে পূর্ব হইতেই সঞ্চিত ছিল। সেই সব পরমাণু ঘটনাক্রমে এরূপ ভাবে সংযুক্ত ও বিন্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, যে-রূপ ভাবে বিন্যস্ত তাহারা অতি ক্ষুদ্র জীবাণুতে দেখিতে পাওয়া যায়।

আচ্ছা, পরমাণুগুলির ঐরূপ সংযোগ ও বিন্যাস হইলেই কি তাহারা জীবাণুতে পরিণত হইল? না, উহারা কতকগুলি পরমাণুর নির্জীব সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। পরমাণুর সমষ্টিগুলি জীবকোষে পরিণত হইতে গেলে উহাদের মধ্যে আরো কিছু থাকা আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন যাহা থাকা আবশ্যক তাহা ঐ রাসায়ণিক পরমাণু-গুচ্ছগুলির মধ্যে কালক্রমে উদ্ভূত হইয়াছিল—কি প্রকারে, কবে বা কেন তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, প্রথমে কয়েকটী রাসায়নিক পরমাণু সরল ভাবে সংযুক্ত হইয়া জীবনী-শক্তি সম্পন্ন এক একটী কোষে পরিণত হইয়াছিল। প্রথমে তাহাদের একমাত্র কাজ ছিল এক কোষ হইতে জীবন-বিশিষ্ট স্বতন্ত্র বহু কোষে বিভক্ত হওয়া। এই সামান্য আরম্ভ হইতে জটিল হইতে জটিলতর জীবদেহের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের শেষ পরিণতি এমন একটী জীবে হইয়াছে, যাহার জীবন নানা আবেগ, আকাংক্ষা, কল্পনা, সৌন্দর্য-পিপাসা ও ভগবদভক্তির কেন্দ্রস্থল হইয়া পড়িয়াছে।

উপরি কথিত জীবনী-শক্তি কোথা হইতে আসিল? এক সম্প্রদায়ের বৈজ্ঞানিকদের মতে উহা চুম্বক-শক্তি ও বিকিরণ-শক্তির ন্যায় স্বাভাবিক।

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমতী সুধা সেন এম-এ

তুমি শুধু কবি নহ, অমৃতের বার্ত্তাবহ ঋষি,
ধ্যানালোকে দীপ্ত তব পুণ্য সুর ভরিয়াছে দিশি ।
তুমি কবি আসিয়াছ এ ভারতে যুগ যুগ ধরি,
সাজায়ে অর্ঘ্যের থালি তোমারেই লইয়াছে বরি'
ভারতের নর নারী। নিত্য তুমি প্রতিদানে তার
রূপ রস গন্ধে ভরা শ্রেষ্ঠ ধন তব সাধনার
দিয়ে গেছ মানুষেরে—

যেইদিন পূর্ব্বতম কবি,
ব্যথিত বিক্ষুব্ধ চিত্ত হেরি ক্রৌঞ্চ মিথুনের ছবি,
সেইদিন অকস্মাৎ বিশ্বজনে চমকিত করি
সুগম্ভীর যে সঙ্গীত পুষ্প সম কণ্ঠ হ'তে ঝরি'
ছড়ায়ে পড়িল বিশ্বে, সেইদিন তুমি সেথা ছিলে
কবির অন্তরলোকে, তাঁরি সুরে মিশাইয়া দিলে
আপনার ছন্দ সুর! তারপরে কবি কালিদাস
আষাঢ়ের মেঘমন্দ্রে পাইলা যে বিরহ আভাস
তাহারি করুণ বার্ত্তা রামগিরি হ'তে হিমালয়ে
পাঠালেন সেথা হ'তে মেঘদূত যেই বাণী ব'য়ে
উত্তরিল যক্ষপুরে, সেইদিন সে বিরহ-বাণী,
তোমার আঁখির জলে আরও যে করুণ হোল জানি।
যেই দিন তপোরত শঙ্করের পদযুগতলে,
তাপসী কল্যাণী উমা প্রণমিয়া কহে আঁখিজলে
ভাব রস সিক্ত বাণী সেই বাণী কবি যেই দিন
আনিলেন মর্ত্ত্যলোকে, তুমি কি ছিলেনা সেই দিন
কবি সনে ? তুমি এ ধরার কবি তাই বারে বারে
পাইয়াছ আমন্ত্রণ—আঘাত পড়েছে তব দ্বারে
যুগে যুগে! কালের কণ্ঠের সনে কণ্ঠ আপনার
মিশায়েছ!

শ্রাবণের ঘন ঘোর নিশি অন্ধকার,
রিম ঝিম বরষণ দুর্গম সে অভিসার পথে,
চলিয়াছে যে তরুণী, একাকিনী কেহ নাহি সাথে
তাহারি করুণ গাথা যেই কবি করেছেন গান,
তাঁরও সাথে কবি তুমি মিশায়েছ তান।
যে প্রেম লভেছে সিদ্ধি সুন্দরের দীর্ঘ সাধনায়
সে প্রেম তোমার মাঝে নিত্য নব শত বাসনায়
দলিত খণ্ডিত করি, সেই এক চিরন্তন পানে
ফিরায়ে এনেছে তোমা, তাই কবি ছন্দে গানে গানে
করেছ আরতি তাঁর জ্বালাইয়া হোমানল শিখা,
অপার বিস্ময়ে কবি পড়িয়াছ যে লিখন লিখা
রহিয়াছে এ বিশ্বের পত্র পুষ্প গিরি নদী বনে,
মানুষের অন্তরেতে, মরু বুকে অনন্ত গগনে।
ভুবনে ভুবনে তুমি তাঁরি বাণী করিয়াছ দান
এ ধরার সন্তানেরে শুনায়েছ অমৃতের গান।
তুমি শুধু কবি নহ, অমৃতের বার্ত্তাবহ ঋষি,
ধ্যানালোকে দীপ্ত তব পুণ্য সুর ভরিয়াছে দিশি।

———

পূজনীয় গুরুদেবের অষ্টসপ্ততি বর্ষ পূর্ত্তির আনন্দ-উৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীসতীশ রায়

দেব,

মিলেছি হেথা সবাই আজ পূজিতে তব জন্মদিন,
আপন করে যতন ভরে বাঁধিলে যার হৃদয়-বীণ।
সে তার কারো মরিচা ধরা কাহারো ঢিলা, কেউ বা বাজে ;
সমান সবে তোমার কাছে কেউবা চেনা, কেউ অচিন্।

জগতে আজ দ্বন্দ দ্বেষ স্বার্থ নিয়ে পরস্পর,
সে কোলাহল ছাপিয়ে কবি উঠুক তব গীতস্বর।
মহা-মিলন মন্ত্রে তব বিরোধ, বাধা হউক পাত,
পাষাণ-তলে লুপ্ত যাহা ছুটাও কবি সে নির্ঝর।

মোদের নাই কামান, বোমা মহামারণ যন্ত্র সব
পরের ধন হরণ ক'রে তুলি না মোরা আর্ত্তরব।
রুদ্ধাবেগ ঝটিকা বুকে বেদনা ঢাকি দিয়ে দু'হাত,
হে কবি, তব জন্মদিনে আমরা করি জয়োৎসব।

সারাজীবন সাধন-বলে লভিলে বর মৃত্যুঞ্জয়।
অসীম ব্যোমে বিরামহীন ছুটাও রবি সপ্ত হয়।
বস্তুর ভীড়ে একাকী তুমি, প্রাকৃত মাঝে হে অভিজাত
অন্ধ কারা ভঙ্গ ক'রে তোমার চির অভ্যুদয়।

বদ্ধ যা'রা লক্ষ ডোরে এ নরমেধ যজ্ঞশালে
নীলাকাশের মুক্তিবাণী শোনাও তা'রে সন্ধ্যাকালে।
আনন্দেরি ঝর্ণা ঝ'রে উপল-বাধা হউক ক্ষয় ;
মানুষ হ'ল সবার বড় সকল যুগে, সকল কালে।

প্রণাম করি,	ইচ্ছে ক'রে	জড়িয়ে ধরি	বক্ষে মোর,
সখা কি গুরু	ভুল যে ঘটে	চক্ষে বয়	অশ্রু-লোর।
বয়স যেন	দুই জনেরি	চিরটি কাল	একসমান,
যাই পড়ি না,	হয় যে মনে	সন্ধ্যা যেন	সাজল ভোর।

বিনাশহীন	রাজ্য তব	রচিলে কবি	বিশ্ব-মাঝ,
মানুষ যেথা	দেবতা, আর	ধরণী ধরে	স্বর্গ-সাজ।
প্রেমের সুধা	পানে অমর,	নাইক জরা	মরণ-ভয়;
পূজার ফুল	এ পারিজাত	গ্রহণ কর,	হে মনোরাজ।

শ্রীসতীশ রায়

আশ্রমিক-সংঘ অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রজন্মোৎসব সভায় পঠিত।

রথ-যাত্রা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

উড়াইয়া জয়ধ্বজা মিলনের রাখীবন্ধে সবে—
পাকাইয়া প্রেম সূত্র পাশাপাশি বাঁধহ মানবে।
সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতা প্রচারিয়া কপিধ্বজ রথে
তদুপরি জগন্নাথ প্রতিষ্ঠিয়া বিশাল ভারতে,
তোলো বাঁধো টানো রথ সকলের সাথে একপ্রাণে
ব্রাহ্মণে চণ্ডালে মিলি অনার্য্যেরে আলিঙ্গন দানে,
বৌদ্ধ খৃষ্ট শিখ মিলি, রে মাতাল, প্রাণ মদিরায়
দেশ মহাপাত্রে ঢালি শুদ্ধ করি দুগ্ধ সমতায়,
কর দান, কর পান, নর-নারী অধরে অধরে
মারো টান রথচক্র অবিশ্রাম ছুটুক ঘর্ঘরে।

শরৎ-সাহিত্যে সহানুভূতি

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ, আই-সি-এস

বাংলা সাহিত্য কতদূর সত্যকার জীবনে বহুমুখী প্রকাশকে রূপ দিতেছে সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এবং প্রতি সাহিত্য সম্বন্ধেই তাহা থাকা স্বাভাবিক। বাংলা সম্বন্ধে একথা বিশেষ করিয়া মনে হয় যে আমাদের জীবনের প্রকৃত মূর্তি অপেক্ষা কল্পনার মুক্তিই সাহিত্যে বেশী প্রকাশ পাইয়াছে। অতীত যুগের সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিই, কারণ তাহার মধ্যে জীবনের প্রকাশ অপেক্ষা জীবনের প্রসারেরই অধিক প্রয়োজন ছিল। আমাদের সামান্য প্রাত্যহিক দিনযাপনের প্রাণধারণের গ্লানি ও বেদনা, আনন্দ ও কামনা লইয়া কথা-সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম অধ্যায় গঠন করিলে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক সহজে সাহিত্যানুরাগী হইয়া উঠিত কিনা সন্দেহ। সাহিত্য তখন প্রথম পাখা মেলিয়া উড়িতেছে, কল্পনার অসীম নীলাকাশেই তাহার বিস্তার; সে ছিল প্রথম বর্ষার বারিপাতের যুগ, মৃত্তিকার শ্যামশোভা লতাপল্লবের মনোহারিত্বের সময় নহে।

কিন্তু এখন শুধু বর্ষণের দিন নাই। মাটীর সংস্পর্শে আসিয়া পৃথিবীর সব কিছুকেই প্রকাশ করিতে হইবে। তাই বর্ত্তমান কথা-সাহিত্যে ক্রম-বর্দ্ধমানরূপে আমরা নিজ জীবনের প্রতিলিপি দেখিতে চাই; নিজেদের বাস্তব জীবনের রস-রূপের প্রত্যাশা করি। সাহিত্যের আভিজাত্যের দোহাই দিয়া ইউরোপের প্রতিচ্ছবি নায়ক নায়িকার সৌখীন সুখ দুঃখ ও প্রেম, অন্যদিকে বাস্তবতার দোহাই দিয়া রাশিয়ার অনুকরণে শ্রমিক সমস্যা, বা যৌবন পিপাসা লইয়া লিখিলেই সন্তুষ্ট হই না। প্রথম স্তরের সাহিত্যে দেখি যে এক একটী নায়ক নায়িকা প্রায় রূপকথার জগতের প্রতিবাসী অথবা সে জগৎ হইতে এখানে প্রবাসী; তাহাদের ভাববিলাস, শিক্ষা দীক্ষা, রুচি বিচার আমাদের জীবনের অনেক উর্দ্ধে। বঙ্কিমচন্দ্রের বাদশাজাদীর যে প্রেম তাহা দীন দুঃখীর জন্য নয়--যদিও বাদশাজাদী অবহেলায় বলিয়াছিলেন সে ভালবাসা দীন দুঃখীর জন্য, তাঁহার জন্য নয়। 'ঘরে বাইরের' নিখিলেশ রুচি নীতি ও আভিজাত্যে আমাদের সাধারণ জগতের আনন্দ বেদনা, আশা আকাঙ্ক্ষা ও পরিণতি হইতে অনেক দূরে। ইহারা আমাদিগকে একটী আদর্শ জগতের সন্ধান দেয়, কিন্তু আমাদের গৃহকোণের পরিচিত লোক নহে। ইহারা আমাদের জীবনস্বপ্ন রচনাতে সহায়তা করে, কল্পনাকে জাগাইয়া তুলে, মনকে দেয় সংসার হইতে মুক্তি।

ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে বাংলা সাহিত্য ক্রমশঃই বাস্তব জীবন প্রকাশের দিকে আসিতেছে। এবং এই মাপকাঠিতে বিচার করিলে শরৎচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ সমাজ-চিত্রকর। শুধু প্রধান চরিত্রগুলি নহে—অপ্রধান ও সাধারণ চরিত্র, ঘটনা ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও আমরা যে চিত্র পাই তাহা একান্তভাবে বাংলা দেশের, সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের নিজেদের পৃথিবীর। জন্মের প্রথম হইতে যে আশা ও ভীতি, বর্ত্তমানের সমস্যা ও ভবিষ্যতের ভাবনা আমাদের ঘিরিয়া রাখে তাহার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে কৈশোরের—বাঙ্গালী জীবনের শ্রেষ্ঠ ও পরিতাপজনক ভাবে স্বল্প সময়ের অসীম উৎসাহ ও কল্পনার ভিতর দিয়া দয়াহীন ধর্ম্মের, ক্ষমাহীন সমাজের, সৌকুমার্য্যহীন সংসারের কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণের মধ্যে আমাদের মনের সব ঐশ্বর্য্যের যে করুণ অবসান হয় তাহার পরিপূর্ণ ছবি পাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে। বাঙ্গালী-জীবনের প্রকৃত প্রতিরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাতায় পাতায় উঁকি মারে কত প্রতিদিনের সংসারের অতি পরিচিত মুখ—কল্পনাময় কিশোর, অরক্ষণীয়া কিশোরী, সংসারাভিজ্ঞ সমাজপতি, শ্বশুর-

গৃহক্লিষ্টা বধূ, অর্ত্তি সাধারণ মিস্ত্রী, দা ঠাকুরের হোটেলের দা' ঠাকুর, সংসার সংগ্রামে ক্লান্ত গৃহস্থ। আমাদের মানস-যাত্রা চলে শুধু বালিগঞ্জের যল্লীকুঞ্জের মোটরবিহারে নয়, তাহা সারা কলিকাতা মায় সহরতলী ঘুরিয়া শ্রান্ত দুঃখক্লান্ত গ্রামগুলি ঘুরিয়া সাধারণ বাঙ্গালীর সাধারণ চিন্তা ও অনুভূতিকে স্পর্শ করিয়া যায়। আর সে স্পর্শ কত স্নিগ্ধ ও সহানুভূতিময়।

এই সহানুভূতিই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকে বিশেষত্ব দিয়াছে এবং এই জন্যই বাঙ্গালীর অন্তরে তাঁহার চরিত্র-গুলি অমর হইয়া থাকিবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "তিনি বাঙ্গালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।" এই স্পর্শের কল্যাণে শরৎচন্দ্রের রচনায় পাই রক্তমাংসের অনুভবতপ্ত মানবসৃষ্টি; রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কৃষ্টিসম্পন্ন মানসসৃষ্টি নহে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমিক স্বামী অন্যাসক্ত সুপ্তিমগ্ন স্ত্রীকে নিশীথে সন্তর্পণে চুম্বন দিয়া ভাবেন যে পৃথিবীর কান্নাহাসির কত ইতিহাস লুপ্ত হইয়া যাইবে, তবু হয়ত এই চুম্বনটী তারার অক্ষরে অক্ষয় হইয়া কোথাও না কোথাও বিরাজ করিবে। তিনি প্রিয়ার নামের মধ্যে কত সাহানার বাঁশী, কত শরতের শেফালী, কত পূজার দীপ ধূপ অনুভব করেন, ব্যাকুলতম মুহূর্ত্তগুলি স্থির অচপল প্রেমে মহীয়ান্ হইয়া উঠে। অমিত রায়ের প্রিয়া

"তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান,
গ্রহণ করেছ যত, তত ঋণী করেছ আমায়।"

এই রসনিগূঢ়, অতীন্দ্রিয় লোকের কথা ভাবিয়া বিদায় নিতে পারেন অব্যক্ত বেদনায়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের চরিত্র প্রেম অনুভব করে মাটীর সংসারের মধ্যে, ভাবসমৃদ্ধ সত্তার মধ্যে নয়, এবং নিজের বেদনাকে লুকাইবার জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির অপরূপ সুন্দর সহায়তা পায় না। সে কখনো ব্রাউনিংএর প্রেমিকের মত যে মৃত প্রিয়ার প্রেম ইহ-জীবনে পাওয়া গেল না তার হাতের মুঠির মধ্যে একটা পাতা রাখিয়া জীবনমৃত্যুর স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কখনো তাহার সঙ্গে দেখা হইয়া যাইবে একথা ভাবিয়া স্থির থাকিতে পারে না। সে তাহার প্রিয়াকে চায় সব কিছুর মধ্য দিয়া এবং না পাইলে ইহজগতের শেষ সম্বল 'রাখেনা একটী চুম্বনকে,—সুন্দর কপালে একটী আঘাতের রক্ত অক্ষরে আপনার প্রেমকে আঁকিয়া দেয়।

যে প্রেমকে সমাজ করে না স্বীকার এবং মানুষ মনে করে দেহের বিকার তাহার মধ্যেও যে সত্যের অমৃত থাকিতে পারে তাহা শরৎচন্দ্র অসীম সাহস ও সহানুভূতির সহিত দেখাইয়াছেন।

"আমি জানি কিছুই অভয়ার কঠিন নয়, মৃত্যু সেও তার কাছে ছোটই। দেহের ক্ষুধা, যৌবনের পিপাসা এই সব প্রাচীন ও মামুলী বুলি দিয়া সেই অভয়ার জবাব হয় না। পৃথিবীতে কেবল মাত্র বাহিরের ঘটনাই পাশাপাশি লম্বা করিয়া সাজাইয়া সকল হৃদয়ের তল মাপা যায় না।"

শরৎচন্দ্রের পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের অননুমোদিত প্রেমের কাহিনীতে কঠোর আদর্শবাদ দেখাইয়াছেন। শৈবলিনীর প্রেম প্রতাপকে স্পর্শ করিয়াছে এবং প্রতাপ শৈবলিনীর মঙ্গলের জন্য আত্মদান করিয়াছেন। সে জন্য প্রতাপ যাইবেন সেই অনন্ত লোকে যেখানে "লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও ভালবাসিতে চাহিবে না।" অর্থাৎ শৈবলিনীর প্রেমে স্পন্দিত প্রতাপ-জীবনের ইহলোকেই শেষ হইয়া গেল। কর্ত্তব্য ও কামনা, সমাজ ও হৃদয়ের এই অতি প্রাচীন দ্বন্দ্বে বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যাহা আদর্শ, যাহা মানুষকে ধর্ম্ম পথে নিয়ন্ত্রণ করিবে। তিনি প্রেমের বেদনাকে স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু সমাজে বিপ্লবমূলক ব্যবস্থা অনুমোদন করেন নাই। "স্বামীতে" নরেন তাহার পরস্ত্রী প্রিয়াকে বলিতেছে

"কিন্তু তোমার কাছে এই আমার শেষ নিবেদন রইল, সদু, বেঁচে থাকতে যখন কিছুই পেলুম না, মরণের পরে যেন ঐ চোখের দু-ফোঁটা জল পাই। আত্মা বলে যদি কিছু থাকে তাতেই তার তৃপ্তি হবে।" বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতি প্রতাপকে বাসনাহীন স্বর্গলোকে লইয়া যায়; শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি নরেনের জন্য রাখিয়াছে বাসনাময় দু-ফোঁটা চোখের জল। ইহলোকেই শুধু যে সাধারণ মানুষের চোখে ফুটিয়া উঠে এই অশ্রুই তাহার স্বর্গ। এ সংসারে-সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী দুই-ই আছে এবং এ দুয়ের দ্বন্দ্ব

যেখানে অনিবার্য্য সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র সকল ভাল মন্দ ও দোষ গুণের প্রশ্নের অতীত ভাবে আনিয়াছেন আদর্শবাদ। তাঁহার জগতে সূর্য্যমুখীই নিয়ম, কুন্দনন্দিনী ব্যতিক্রম মাত্র। কিন্তু শরৎচন্দ্রের জগতে কুন্দনন্দিনীরও বিশিষ্ট স্থান আছে এবং তাঁহার মতে শক্তির প্রমাণ পতনের অভাবেই নহে, পতনের পরে উত্থানের প্রাণপণ চেষ্টায়। সুখের আরাম কেদারায় বসিয়া এইরূপ প্রবাদ সৃষ্টি সহজ কিন্তু তাঁহার চরিত্রগুলি দুঃখের অনলদাহে সে মতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী ও পিয়ারীর কাহিনী ও জীবন আলোচনা করিতে করিতে লেখক কত গভীর সহানুভূতিতে বলিতেছেন,—

"এই দুইটী নামের মধ্যে যে তাহার নারী জীবনের কত বড় ইঙ্গিত গোপন ছিল তাহা দেখিয়াও দেখি নাই বলিয়া মাঝে মাঝে সংশয়ে ভাবিয়াছি একের মধ্যে আর একজন এতকাল কেমন করিয়া বাঁচিয়াছিল? কিন্তু মানুষ যে এমনিই! তাই ত সে মানুষ!"

রাজলক্ষ্মী অপেক্ষা কিরণময়ীর চিত্রে সহানুভূতি বোধ হয় আরো বেশী ফুটিয়াছে; কারণ কিরণময়ীর চরিত্রে পুণ্য ও সমাজানুমোদিত ব্যবহার আরো কম। সে চরিত্রহীনা; এবং শৈবলিনীরই ন্যায় তাহার শাস্তি হইয়াছে প্রচুর ও কঠোর। কিন্তু বিশ্বের দরবারে তাহারও বলিবার অনেক কিছুই আছে।

"এ জীবনে এ দেহটা কি আর কিছুই চাইলে না, চাইলে শুধু ভালবাসা? এই কাঙাল বৃত্তি এর কি আমি কিছুতেই ঘোচাতে পারলুম না? আর পারবোই বা কি করে? আমার আমিকে তো আমি অতিক্রম করতে পারিনে?"

সাহিত্য সৃষ্টি কেবল ধর্ম্মের জয় ও পাপের পরাজয়ের কাহিনীর প্রচার নহে; সংশয় ও সংকটের মধ্যে পাপের ব্যর্থতার ইতিহাসও তাহার একটী বৃহৎ ও সার্থক অঙ্গ। পাপের অস্তিত্বকে স্বীকার করি, কিন্তু তাহার বেদনা ও ব্যর্থতার জন্যও একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে কুণ্ঠিত যেন না হই।

বর্ত্তমান যুগের নারী জাগরণের আন্দোলনের পশ্চাতে রহিয়াছে নারীর জীবনকে সার্থক করিবার ও অন্যায়কে দূর করিবার চেষ্টা। সমাজে যে নারীর স্থান নিম্নে ও পশ্চাতে এবং অত্যন্ত সীমাবদ্ধ তাহার কারণ নারীকে সমাজ দেবী বানাইতে গিয়া পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। আমরা যতই তাহাকে মুখে দেবী বলিয়াছি ততই সংসারে তাহার স্থান সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে। শরৎচন্দ্র নারীকে তাহার উপযুক্ত আসনে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; নারী কল্পনায় ও স্তুতিবলে দেবতা হইয়া উঠে নাই। জীবন্ত নারীর স্পর্শে আসিয়া ভৈরবী ষোড়শী নারী হইয়া ইহলোকে নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহার ফলে কোন সম্ভ্রম বা সার্থকতা একটুও হানি হয় নাই। শরৎচন্দ্রের নারীরা দোষে গুণে বিভিন্নভাবে সার্থকতা লাভ করিয়া একান্ত ভাবে নারী। তাহারা দেবী নহে, শুধু মানবী। তাহারা নির্ভয়ে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করে,—আঘাত ও অপমান মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া দেবী সাজিয়া নিষ্ফল ও পঙ্গু সহানুভূতি উদ্রেক করে না।

"বাঙ্গলীর ঘরে জন্মেছি বলেই যে তোমরা খুঁচে খুঁচে আমাকে তিল তিল করে মারবে, সে অধিকার তোমাদের আমি কিছুতে দেব না, তা' নিশ্চয় জেনো।

কিন্তু এ প্রতিবাদের পশ্চাতে কত নিগূঢ় বেদনা, কত অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা, কত করুণ কাহিনী।

"মনো দিদি, তুই মিছামিছি মাথায় সিঁদুর পরিস্। কাকে স্বামী বলে, তাই জানিস নে। তিনি আমার স্বামী না হলে, আমি এমন করে মরতে বস্তুম না।"

নারী যে প্রিয়ের জন্য, স্বামীর জন্য কি অনুভব করে তাহার একটী সম্পূর্ণ চিত্র। আর তাহার যে কত অসহায়তা তাহা একটী ছোট পংক্তিতে ধরা পড়ে।

"দেবদা, নদীতে কত জল! অত জলেও কি আমার কলঙ্ক চাপা পড়বে না!"

বাঙ্গালী বিধবার হৃদয় চিরকালের জন্য অথবা আমরণ রুদ্ধ থাকিবে ইহাই সামাজিক নিয়ম। সেজন্য যতই মানসিক অশান্তি বা বিদ্রোহ সৃষ্টি হউক না কেন। বিধবা কুন্দকে মরিতেই হইবে; সংসারে তাহার স্থান নাই, প্রতিষ্ঠা নাই, সান্ত্বনাও নাই। কিন্তু সে ভালবাসা "চোখের

ভালবাসা"—সকলেই মাটী খোঁড়ে, কোহিনুর একজনের কপালেই উঠে। সূর্য্যমুখী সেই কোহিনুর। কুন্দনন্দিনী কোন্ গুণে তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবে?" কিন্তু শরৎচন্দ্রের বিধবা ভালবাসিতে পারে—প্রেমের সত্যে সে সমাজের শাসনসত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত হইতে চায়। "যাহার হৃদয়ে ভালবাসা আছে, সে ভালবাসিতে জানে—সে ভালবাসিবেই! মাধবীলতা রসালবৃক্ষ অবলম্বন করে, ইহা জগতের রীতি—তুমি আমি কি করিতে পারি?" মনোরমার স্বামী মাধবীর (বড়দিদি) প্রেমের কথা শুনিয়া ভাবিতেছেন একটী লতার কথা যে আধক্রোশ ধরিয়া ভূমিতলে লতাইয়া লতাইয়া একটা বৃক্ষে জড়াইয়া কত পত্রপুষ্পপল্লবে সাজিয়া উঠিয়াছে।

আর সে নারীর জন্য লেখকের কত মর্ম্মব্যথা, কত সহানুভূতি। সে যে ভালবাসে ও ভালবাসিয়া বিপদে পড়ে, দুঃখ পায় ও জীবন ব্যর্থ হইয়া যায় তার জন্য কত সহৃদয় অনুভব।

"বিধাতাকে দোষ দিই—তিনি কিজন্য এত কোমল, এই জলের মত তরল পদার্থ দিয়া নারীর হৃদয় গড়িয়াছিলেন ·········তাঁহার চরণে প্রার্থনা, যেন এ হৃদয়গুলা একটু শক্ত করিয়া নির্ম্মাণ করা হয়।" না জানিয়া নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে ঠকাও ভাল, তবু লেখক বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হইতে প্রস্তুত নহেন। পাপের মানদণ্ডে স্ত্রী ও পুরুষে প্রভেদ করিতে তিনি চাহেন না—পুরুষসৃষ্ট সমাজ-ব্যবস্থায় এতটা সহানুভূতি সাহসের পরিচয়।

"দয়াল,—কিন্তু স্ত্রীলোকে সকলই সম্ভব।

কৈলাস—ছি, অমন কথা মুখে এনো না। মানুষ মাত্রেই পাপ পুণ্য করে থাকে এতে স্ত্রী পুরুষের কোন প্রভেদ দেখি না।"

অরক্ষণীয়া বাঙ্গালী বালিকার ব্যথায় দুঃখিত হওয়া এত স্বাভাবিক ও উচিত অথচ এত নূতন ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। নারীই যে নারীর বড় শত্রু, বড় সহানুভূতিহীন সে কথাও আমরা হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করি এবং করিয়া লজ্জিত দুঃখিত হই।

বাঙ্গালী জীবনে সুখ অপেক্ষা দুঃখ এবং সফলতা অপেক্ষা বিফলতাই অধিক, বার বার করিয়া তাহা লোকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলে সাহিত্য সৃষ্টি না হইয়া ক্রন্দনবৃষ্টি হওয়ারই সম্ভাবনা। তবু তাহাকে সৃষ্টির রসে সমুজ্জ্বল করিয়া তোলা হইয়াছে। যে নগণ্য, সাধারণ ও সকলের পশ্চাতে তাহাকেও অপরূপ গরিমায় সঞ্জীবিত করা হইয়াছে। বেলা আড়াইটার লোক্যালে একটী প্রৌঢ় কেরানী বাড়ী যাইবে। তাহার হাতে আছে দাঁড়শুদ্ধ একটী মাটীর পাখী; ভিড়ে ঠেলায় পড়িয়া তাহাকে মার খাইতে হইল ও মাটীর পাখী গেল ভাঙ্গিয়া। সে বেচারী প্রহারকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভাঙ্গা টুকরা কুড়াইতে কুড়াইতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। এই দীর্ঘ নিঃশ্বাসে কাঙ্গালী বাঙ্গালীর জীবনসংগ্রামের একটী পরিপূর্ণ চিত্র আমরা পাই। 'মহেশের' বৃদ্ধ চাষী ক্ষুধা দারিদ্র্য ও প্রবল ধনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার ক্ষমতা পায় না; কিন্তু আমরা তাহার দুঃখ দেখিয়া সে ক্ষমতা পাইতে চাই। সামান্য ডোমেদের সেই শয়তান মেয়েটাকে সকলেই ভুলিয়া যায়; কিন্তু শ্রীকান্তের মনের কোণে তার একটী সন্ধ্যার চোখের জলের ভিজা দাগ কিছুতেই মিলায় না। সে বেচারীর এক দিকে অন্য প্রলোভন ও কুৎসিত ষড়যন্ত্র; অন্য দিকে স্বামীর অত্যাচার কিন্তু শিক্ষিত ভদ্র বাঙ্গালী কি তাহার কথা ভাবিয়া সময় নষ্ট করিবে?

স্নেহপ্রবণ সহানুভূতিতে দ্রব বাঙ্গালী। কিন্তু সে যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত, শাস্ত্রকথিত, সমাজশাসিত নীতি সংস্কারের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যে পতিত বা অবনত তাহাকে অকপটে দরদ দেখাইতে, সেবা করিতে, আশীর্ব্বাদ করিতে সাহস রাখে না। সাহিত্যের বাহিরে বাস্তব জীবনেও আমরা তাহার শত দৃষ্টান্ত ও কুফল দেখিতেছি, কিন্তু সমাজ অচল শৈলসম স্থাণু। তাই পতিতা অভয়া ও অধঃপতিত দেবদাসের জন্য আমাদের কোন দুঃখ বা সহানুভূতি নাই। তাহাদের দুঃখে সমদুঃখভাগী হইতে হইলে সাহসের প্রয়োজন।

কিন্তু এই পৃথিবীতে যে বর্ত্তমানে কোন প্রতিকার নাই তাহা শরৎচন্দ্র জানিতেন। তাই সমাজের বিরুদ্ধে তাঁহার

সবল প্রতিবাদ "কল্যাণের ধনকেই চির অকল্যাণের মধ্যে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবার অপেক্ষা মানব-হৃদয়ের বৃহত্তর ধর্ম্ম আর নাই!" ইহ সংসারের বিচারই শেষ বা চরম বিচার নয় এবং তাহার পরও সুবিচারের আশা আছে এই বাণী তিনি সুস্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়াছেন।

"দয়াল—ক্ষতি নাই! জাত যাবে, ধর্ম্ম যাবে, পরকালে জবাব দিব কি?

কৈলাস—এই জবাব দিবে যে, একজন অনাথাকে আশ্রয় দিয়াছিলে।"

তিনি জানেন যে যে ক্ষমা চায়, তাকে ক্ষমা করিতেই হইবে। ভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতে গিয়া দুঃখীর মুখে বিশ্বাসের কথা আসিয়া পড়ে।

"যে অপরাধ আমার নিজের নয় তার জন্য কেন এত বড় শাস্তি ভোগ করব? লোকে ভগবান্ ভগবান্ করে, কিন্তু তিনি সত্যি থাকলে কি বিনা দোষে এত বড় সাজা আমাদের দিতেন?"

বাইবেলে বর্ণিত শত দৈবদুর্ব্বিপাকে জর্জ্জরিত ও অসহায় জোবের মত বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থাকে অনেক আধুনিক লেখক ব্যঙ্গ করিতেন; কিন্তু শরৎচন্দ্র সহানুভূতির প্রলেপ দিয়া ক্ষত স্থানকে স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। পতিতা বিজলীর মুখে শুনি—

"তিনি ভেঙ্গে দিয়ে যে কি ক'রে গড়ে দেন, কেড়ে নিয়ে যে কি করে ফিরিয়ে দেন, সে কথা আমার চেয়ে আজ কেউ জানে না বোন্।"

আমাদের শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকে বড় প্রয়োজন ছিল। শুধু দুঃখ দৈন্যের ভিতর দিয়া চলিয়া যাওয়াই বাঙ্গালী জীবনের কাম্য পরিণতি হওয়া উচিত নয়; সে দুঃখ দৈন্যকে ব্যঙ্গ করিলেই চলিত না; অন্য পক্ষে তাহাকে রূপে রসে সঞ্জীবিত করিয়া শুধু প্রকৃতরূপে দেখাইলেই সবটুকু হইত না। তাহার আবেদন অনেকাংশে নিষ্ফল। সেই চিত্রকে সহানুভূতির রংএ বিচিত্র করিয়া সরস সুন্দর করিয়া না দেখাইলে সে বাঁচিয়া থাকার বেদনার কাহিনী বাঙ্গালীকে বিরক্ত করিত, জাগরিত করিত না। পতিতের জীবনে যে শুধু পাপই নাই, জীবনের গ্লানির প্রতি আন্তরিক বিরাগ আছে, কালিমাই নাই, নির্ম্মলতার নীলিমাও অন্তরাকাশে কোন নিভৃত কোণে বিরাজ করিতেছে সে কথা এত দরদের সহিত বলা হইয়াছে বলিয়াই আমরা তাহা স্বীকার করিয়াছি। সেই স্বীকারই শরৎচন্দ্রের বাংলা-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ দান।*

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

* প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের গোহাটী অধিবেশনে পঠিত।

তুচ্ছ নয়

শ্রীসন্তোষ বসু

সুন্দর প্রভাত। জানলা দিয়েই সমুদ্রের এক ঝলক দৃষ্টি পাওয়া যাচ্ছে। সূর্য্য তখনো ওঠেনি। মৃদু আলো ও অন্ধকারে প্রদোষের সৃষ্টি করেছে।

ঘরের মধ্যে চেয়ারে বসে আছে সুলতা। পায়ের কাছে বসে আয়া জুতো পরিয়ে দিচ্ছে। একটী যুবক ঘরে ঢুকে বল্লে—"ইস্ আজ উঠ্‌তে বড় দেরী হয়ে গেল লতা। তুমি আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছো। শরীরটা আজ নিশ্চয়ই ভাল বোধ হচ্চে।"

সুলতা এর কোন জবাব না দিয়ে বল্‌লে—"চা খেয়ে নাও; জুড়িয়ে যাচ্ছে। কাল যে রাত্তিরে শুয়েছ, উঠতে দেরীই বা হবে না কেন?" বলে জানলার দিকে চেয়ে রইল।

যুবকটীর নাম অমূল্য। সুলতা তার স্ত্রী। এরই অসুখের জন্যে এখানে আস্‌তে হয়েছে। অসুখটি আর কিছুই নয়, চিরাচরিত থাইসিস্।

কিছুদিন থেকেই জ্বর হচ্ছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর রোগ ধরা পড়ল। ডাক্তার বল্‌লেন—"ফাষ্ট ষ্টেজেই ধরা পড়েছে। সেরে যাবে। কিন্তু হাওয়া বদ্‌লানো চাই; বিশেষতঃ সমুদ্রের ধার হলেই ভাল হয়।"

সুলতা অমূল্যকে বল্‌লে—"দেখ, পুরী, কী ওয়ালটেয়ার আমি যেতে চাইনে। ও জায়গাগুলো ভীষণ পুরাণো হয়ে গেছে। সমুদ্রের ধারে এমন জায়গায় যাবো, যেথানে লোক খুব কম আছে।"

সেই মত ওরা এসেছে এখানে। মান্দ্রাজের ভেতর সমুদ্রের ধারে এক ছোট গ্রাম। বাঙ্গালী মোটেই নেই। একঘর যা ছিলো, সম্প্রতি তা'ও চলে গেছে।

ভালো হতে লাগলো খুব তাড়াতাড়ি। এই দিন পনের হল ওরা এখানে এসেছে; তার মধ্যেই আশ্চর্য্য উন্নতি হ'য়েছে। রুগীর পক্ষে আগে বেশী হাঁটা ছিলো বারণ, আজকাল অমূল্যর কাঁধে হাত রেখে সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছে সকালে সন্ধ্যেয়।

কাল অনেক রাত পর্য্যন্ত সাধারণ একখানা বাংলা বই পড়ে শুনিয়েছে সুলতাকে। তাড়াতাড়ি চা খেয়ে দুজনে উঠে পড়ল। খানিকটা রাস্তা গিয়েই দুজনে এল সমুদ্রের ধারে।

সূর্য্য তখন জলের ভেতর থেকে একটু একটু করে মুখ বাড়িয়ে দেখচে আঁধার তখনো আছে কিনা। দেখতে দেখতে সূর্য্য জলের উপর উঠে পড়ল। শেষকালে মনে হচ্ছে, যেখানে আকাশ মেয়ে এসে জলের মধ্যে নাইতে নেমেছে, সেখানে একটী সোনার কলসী ভাস্‌ছে।

সুলতা বল্‌লে—"আজ পনের দিন হল এখানে এসেছি, এ দৃশ্য কী আমার কাছে পুরোণো হবে না? রোজ দেখচি, তবু মনে হয় এর আগে আর কোন দিন দেখিনি। আজই যেন নূতন দেখচি।"

অমূল্য প্রফেসর মানুষ। কথাটাকে গম্ভীর করে বল্‌লে—"তাই হয়। একটা ভাল কবিতা, কী একটা ভাল ছবি, যত দেখা যায়, যত পড়া যায়, কিছুতেই তা' পুরোণো হয় না। মনে হয় আর একটা নূতন আলো যেন চোখে ধরা পড়ল।"

চারদিকে কঠিন নিস্তব্ধতা। কেবল সমুদ্রের অশ্রান্ত কল্লোল। ভোরের বাতাস ধীরে ধীরে বয়ে যাচ্ছে। সুলতার বিবর্ণ চুলগুলো বাতাসে এলোমেলো হয়ে পড়ছে। বড় বড় চোখ দুটী সাগরের দিকে নিবদ্ধ। হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে বল্‌লে—"অনেক দিন থেকেই আমার ঐ পাশের গাঁয়ে যেতে ইচ্ছে করে। ঐ যে একটা কুঁড়ে দেখা যাচ্ছে। আশে পাশে তো আর কোন. ঘর দেখা যাচ্ছে না। কেমন করে

ওরা একলা থাকে ? আজ আমার শরীরটা খুব ভাল আছে, চল না যাই।”

অমূল্য বল্‌লে—যাবে বৈকি লতা, নিশ্চয়ই যাবে। আরও দিন কয়েক যাক্‌। কল্‌কাতায় ডাক্তারের কাছে রোজই তোমার শরীরের রিপোর্ট পাঠাতে হচ্চে। এত তাড়াতাড়ি উন্নতি হচ্চে দেখে ডাক্তারেরা খুব আশা পাচ্ছেন। কিন্তু সেদিনও চিঠি পেয়েছি : লিখেছেন যেন পরিশ্রম বেশী না হয়। এই যে তোমাকে সমুদ্রের ধারে দুবেলা বেড়াতে নিয়ে আসি, তাও বারণ বুঝলে না। কেবল আমি সাহস করে তোমাকে নিয়ে আসি। আরও দিন কয়েক যাক, শরীরটা আরো একটু ভালো হোক—।

সুলতা প্রতিবাদ করলে না। রক্তহীন মুখে একটু মৃদু হেসে বল্লে—“আচ্ছা। এস এইখানে একটু বসি।”

দুজনেই চুপ। বেলা বাড়ছে। সূর্য্যটা দেখতে দেখতে কতদূর উঠে পড়েছে। তার আলো হয়ে উঠেছে জোরালো। সমুদ্রের মধ্যে সরু সরু এক একটা ডিঙ্গি নিয়ে জেলেরা চলেছে মাছ ধরতে। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বালির পর, আবার সরে যাচ্ছে। দূরে বড় বড় ঢেউগুলো ভাঙতে ভাঙতে সরে আসছে তীরের দিকে। জেলের ডিঙ্গিগুলো ডুবে যাচ্ছে সেই ঢেউগুলোর মধ্যে, আশ্চর্য্য, আবার ভেসে উঠছে। এমনি করে ওরা লুকোচুরি খেল্‌ছে।

কতক্ষণ বসে দেখ্‌চে জানে না। চমক ভাঙলো অমূল্যর। বল্‌লে—“বাড়ী যাবে না সুলতা? তোমার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে যে।”

সুলতার আত্মবিস্মৃত মনটা বিরূপ হয়ে উঠল। মৃদু হেসে বল্‌লে—“আমি তো ভাল হয়েই গিয়েছি। ওষুধের শিশিপত্তরগুলো সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দিলে কেমন হয়? অন্য সময়ে এক রকম থাকি, যেই ওষুধ খাবার কথা শুনি, মনে হয় আমার অসুখ যেন এখনো সারে নি। আমি যেন এখনো রুগী আছি।”

অমূল্য কথাটাকে লঘু করবার জন্যে হো হো করে হেসে উঠল। বল্‌লে—“শুধু তুমি কেন—সকলেই ওষুধ খাবার সময় সেই কথাটাই মনে করে। কিন্তু ওষুধগুলোর ’পর তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তাদের এমন নির্দ্দয় ভাবে ভাসিয়ে দিলে তোমার কৃতঘ্নতার পরিচয় পাওয়া যাবে।”

সুলতার বিশীর্ণ মুখে একটু হাসির রেখা এল। বল্‌লে—“চল বাড়ী যাই। সেখানে গিয়ে কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিই গে।”

দুপুর বেলা কি জানি কি হল, সুলতা আব্দার ধরলে সে ওই কুঁড়ে ঘরটির দিকে বেড়াতে যাবে। এই কয় মাসের রোগে ভুগে সে যে শিশুর মত মনে প্রাণে দুর্ব্বল হয়ে গেছে, তা স্পষ্টই বোঝা গেল। অধীর হয়ে বললে—“আমার অসুখ তো সেরেই গেছে। আমি কাল সকালেই ওখানে বেড়াতে যাবো, বুঝলে তো।” অমূল্য কিছু বলবার আগেই সে বললে “না—না আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাইনে। তুমি না যাও আমি একাই চলে যাবো।”

অমূল্য নিরুপায়। একটা শিশুর সঙ্গে সে কী ভাবে ব্যবহার করবে। বললে—“আচ্ছা যেয়ো কাল সকালে। আর একাই বা যাবে কেন—আমি তোমার সঙ্গে যাবো।”

সুলতা আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল। যেন সে এখনই যেতে চায়। বললে—“দেখ—ওখার দেখা হয়ে গেলে পর্শু কিন্তু আমরা ওই পশ্চিম দিকে যে পাহাড় আছে, সেই দিকে বেড়াতে যাবো। হ্যাঁ, ভালো কথা, একদিন এখানকার কালী মন্দিরে যেতে হবে কিন্তু।”

সমুদ্রের অবিশ্রান্ত হাওয়া এসে ঘরে ঢুকছে। ইজি চেয়ারে শুয়ে অমূল্যর চোখের পাতা দুটো যেন জড়িয়ে আসছে। বললে—“সময়মত একদিন যাওয়া যাবে। এখন একটু বিশ্রাম করে নাও। আবার বিকেলে বেড়ানো আছে।”

সুলতা বিছানার সঙ্গে গা গড়িয়ে দিল।

আবার বিকালে ভ্রমণের আয়োজন। পশ্চিমের দিকে পাহাড়ের আড়ালে সূর্য্য পড়েছে ঢাকা। তখনো আলো যায় নি নষ্ট হয়ে। সমুদ্রের ধার দিয়ে সুলতা ও অমূল্য বেড়াতে লাগলো। সুলতার মন আজ অকারণ প্রফুল্ল। কত যে অসংলগ্ন কথা পর পর বলে যাচ্ছে তার সীমা নেই। অমূল্য শুনছে কী শুনছে না সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই।

আগের দিন গিয়েছে পূর্ণিমা। সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে, তথনো চাঁদ ওঠেনি। দূরে দূরে দু' একজন ছাড়া সমুদ্রতীরে আর লোক নেই। প্রদোষান্ধকারে চারদিক আবছা হয়ে এসেছে।

সুলতা বললে—"আজ একটু দেরী করে বাড়ী যাব। এস এইথানে একটু বসি।"

জোয়ারের ঢেউ তথনো আরম্ভ হয়নি। সুলতা বসে বল্‌লে—"এই জায়গাটার 'পর আমার এমন মায়া বসে গেছে যে যখন আমি সেরে কল্‌কাতায় চলে যাবো, তবুও একে ভুলতে পারবো না। কেন জানো? কারণ এথানে এসে যে আমি সেরে গেছি। প্রথমে ভেবেছিলেম থাইসিস হলে তো কেউ বাঁচে না: আমিও আর বাঁচবো না বোধ হয়। কী ভাগ্যি এথানে এসেছিলেম। আমি এথানে এসে পুনর্জ্জন্ম পেয়েছি বলেই একে ভুলতে পারবো না। কিন্তু এথানে এসে ভাল হবার আর একটা কারণ কি জানো? সে তুমি আমার সঙ্গে এসেছিলে বলে। তুমি ছাড়া আর কেউ এলে, আমি বোধহয় আর সারতেম না।"

অমূল্যর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। দুহাতে সুলতার কপালে বাতাসে এলোমেলো চুলগুলো সরিয়ে একটা গভীর চুমু দিল।

কিছুক্ষণ দুজনেই নিস্তব্ধ। শোঁ শোঁ করে কানের পাশ দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। সুলতার বিবর্ণ চুল এলোমেলো হয়ে অমূল্যর মুখে উড়ে উড়ে লাগছে। সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। জলের মধ্যে থেকে প্রতিপদের চাঁদ একটু একটু করে উঠতে আরম্ভ করেছে। সেই সকালেরই পুনরাবৃত্তি। তবে সকালে যেটা ছিল লাল রঙের উজ্জ্বল কলসি,—এ বেলা সেটা হয়েছে রূপোর।

স্তব্ধতা ভেঙ্গে সুলতা বল্‌লে—"যখন এদেশে চাঁদ উঠবে না, তার আগেই আমরা এখান থেকে চলে যাব। এথানে চাঁদ না থাকলে আমি থাকতে পারবো না। দেখ তো কী সুন্দর!' দুহাত দিয়ে বালু ঘাঁটতে ঘাঁটতে বললে—"বাংলা দেশের মেয়েরা এত থাইসিসে মরে কেন জানো?"

অমূল্য বললে—"ভালো আলো হাওয়া পায় না, ভালো থেতে পায় না, দুঃখ দারিদ্র্য বেশী, ছেলেমেয়ে বেশী হওয়া এই সমস্ত কারণেই হয়ে থাকে।"

সুলতা বললে—"তা তো বুঝলেম—কিন্তু থাইসিস হলে সারে না কেন জানো?" অমূল্যকে উত্তর না দিতে দিয়েই সে বললে—"তার সব চেয়ে বড় কারণ, তারা মনে আনন্দ পায় না। দেখনা, যেদিন থেকে এথানে এসে আমার সমুদ্র ভালো লেগেছে, ভালো লেগেছে পূর্ণিমার চাঁদ, ভালো লেগেছে এই সমুদ্রের তীর সেদিন থেকেই আমার অসুখ সারতে আরম্ভ করেছে। কোথায় পাবে তারা ভালো লাগার এত উপকরণ—যাতে তারা আনন্দ পাবে? তুমি যাই বল না—ওষুধ যদি আমি নাও থেতাম, শুধু এই সমুদ্র দেখেই আমার অসুখ সেরে যেত, এ আমি নিশ্চয় করে তোমাকে বলে দিলেম।"

অমূল্য বাধা দিল না। নিঃশব্দে শুনে গেল। সুলতার মনে যে ঢেউ আজ উঠেছে, তাকে বাধা দেবে না। যে বদ্ধ ঘরে মনের সমস্ত কথা এতদিন রুদ্ধ ছিলো, আজ যেন তাই ঠেলে বাইরে আসতে চাইছে।

একের পর একটি করে সুলতা অনেক কথা বলে চলল। সমুদ্রের তীর জনমানবশূন্য হয়ে গেছে। যেন সমুদ্র দস্যুর কোলের কাছে, সমস্ত তীর ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুলতা বললে—"দেথ সামনে সমুদ্র: প্রতিপদের চাঁদ উঠেছে: তুমি ও আমি পাশাপাশি বসে। যেন সব দিক দিয়েই একটা কবিত্বের সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে উপস্থিত থাকলে এমন একটা কবিতা লিখতেন, হয়তো সাহিত্যে তা' অমর হয়ে থাক্‌তো।" সুলতা অবিশ্রান্ত কাতর না হয়ে বলতে লাগলো, "রবীন্দ্রনাথের কবিতার 'পর আমার একটা বিশেষ মোহ আছে যে কেন তা' বলতে পারিনে। আমার মনে হয় ওঁর পর হয়তো বিশেষ শক্তিশালী একজন কবি উঠবেন কিন্তু আমি তাঁকে বড় বলে স্বীকার করতে পারবো না। কেন পারবো না তা বলতে পারিনে। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় কবি আর জন্মাবেও না।"

অমূল্য শুনেই চললো। "অসুখের কিছুদিন আগে থেকেই আমার কোন বই পড়তে ভালো লাগতো না।

এমন কি কবিতার বইও না। এখন মনে হয় ওটা অসুখ আসবারই একটা লক্ষণ। সৌন্দর্যকে, মন যখন নিতে চায় না তখনই জানা উচিত, মনের ভেতর কোথাও গলদ ঘটেছে। মন আর শরীরের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। তাই মনের অসুখ হলেই হয় শরীরের অসুখ।''

চাঁদ অনেকখানি উপরে উঠে গেছে। জোয়ার অনেকক্ষণ আরম্ভ হয়েছে। হঠাৎ একটা ঢেউ এসে দুজনের কাপড়-চোপড় ভিজিয়ে দিয়ে গেল। অমূল্য শঙ্কিত হয়ে উঠল। সুলতা উঠলো হো হো করে হেসে। বললে "একেই বলে আত্মবিস্মৃত হওয়ার ফল—ভগবান হাতে হাতে ঘটিয়ে দিলেন। স্বর্গের কল্পনা থেকে, মর্ত্ত্যের কঠিন বাস্তবে এসে পৌছুন গেল। রাত অনেক হয়েছে, চল বাড়ী যাই।"

আবার সেই নিত্য-নৈমিত্তিক প্রভাত। সেইরকম পাখীর কলরব, সমুদ্রের নিদ্রাহীন অশ্রান্ত গর্জ্জন, চঞ্চল হাওয়ার প্রলাপ, প্রভাত আলোর সমারোহ। সূর্য্য উঠতে আর দেরী নেই। সমুদ্রের তীর ধরে সুলতা ও অমূল্য চলেছে ভ্রমণে। সূর্য্য উঠে গেল। সোনালি আলো এসে দুজনের মুখের 'পর পড়েছে। অমূল্যর মন শঙ্কিত। খানিকদূর যাবার পর জিজ্ঞেস করলে—''ক্লান্ত হয়ে পড়নি তো? হলে কিন্তু জানিও।" সুলতা বাধা দিয়ে বললে—''তোমার ভাবনা করবার একটুও দরকার নেই। একটুও কষ্ট হচ্ছে না।'' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—''তুমি যেন স্বীকার কর্ত্তে চাও না যে আমি সম্পূর্ণ সেরে গেছি।"

"তা নয়। তবে কোনদিন তো আর এতখানি হাঁটা হয়নি"—অমূল্য বললে।

সুলতা কোন উত্তর দিল না।

কম করেও রাস্তাটা মাইল খানেক হবে। মাঝ পথেরও বেশী গিয়ে অমূল্য বললে—"আজ এই পর্য্যন্ত থাক।"

সুলতা চঞ্চল হয়ে বললে—"বারে—এতদূর যখন এসেছি আবার ফিরে যাবো!"

আবার নিঃশব্দে তারা চলতে লাগলো। সুলতা একবার বললে—"আজ যদি এখানে না আসতে পারি, তাহলে ওই পাহাড়ের দিকে কাল কেমন করে যাবো!"

এর উত্তর দেবার ছিল। কিন্তু অমূল্য চুপ করে চলতে লাগলো।

অমূল্যর এত উদ্বিগ্নতা, এত আশঙ্কা সত্ত্বেও নির্ব্বিঘ্নে দুজনে এসে ঠিক জায়গায় পৌছে গেল। একটা পাথর সমুদ্রের মধ্যে নেবে গেছে। ঢেউগুলো তারপর এসে আছড়ে পড়ে ছিটকে উঠছে। চারিদিকে মনোহর স্তব্ধতা। তার মাঝে নীল হতে কঠোরতর নীলসমুদ্রের উন্মত্ত অহঙ্কার।

এই পাথরের ধারে এসে দুজনে বসল। তীর থেকে কিছুদূরে, কতগুলো নারকেল গাছ বাতাসে আন্দোলিত। তার পাশে সেই কুটিরটি।

আশ্চর্য্য সমুদ্রের বাতাস। দুজনের মনে ভ্রমণের গ্লানি আর কিছুমাত্র নেই। সূর্য্যের আলো বাড়ছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। বাতাসের সঙ্গে মৃদু জলকণা এসে গায়ে মুখে পড়ছে। দুজনেই আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণ পরে সুলতা উঠে পড়ল। চললো সেই কুটিরের দিকে। উঠোনে একটী ছোট মেয়ে কাপড় কাচছে। সামনে একজন অপরিচিত বিদেশিনীকে দেখে মেয়েটী চঞ্চল হ'য়ে উঠল।

ঘরের ভেতর থেকে একটী লোক বেরিয়ে এল। সুলতা তাকে জিজ্ঞেস্ করলে এটা তার বাড়ী নাকি? সমুদ্রের ধার দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে সে এতদূর এসেছে।

লোকটী যদিও মাদ্রাজী, উত্তর দিল হিন্দিতে। সঙ্কুচিত হয়ে জানালে যে এটা তারই বাড়ী। এখানে সে তার রুগ্ন স্ত্রী, আর তার ঐ ছোট মেয়েটী থাকে।

সুলতা তাকে বললে যে সে তার স্ত্রীকে দেখতে চায়। লোকটী কুণ্ঠিত ভাবে সুলতাকে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল।

ঘরটি ছোট। একটা খাটিয়ার পর একটী দেহ পড়ে আছে। শুধু মুখখানি দেখা যাচ্ছে। গলা থেকে পা পর্য্যন্ত চাদর দিয়ে ঢাকা।

দেহটীর মুখের দিকে চেয়ে সুলতা ভয়ে পলকহীন হয়ে রইল। এই রুগীটিই ওর স্ত্রী! কী করে ও সহ্য করছে! এতদূর বীভৎস ও কুরূপ যে কোন মুখের কল্পনা হতে পারে, সুলতা এই প্রথম জানতে পারল। চোখ দুটো আশ্চর্য্য রকমের ফোলা। মাথার চুলগুলো জট পাকানো। মুখে

রক্তের এক ফোঁটা চিহ্ন নেই বিবর্ণ, বিশীর্ণ! বড় বড় দাঁতগুলো যেন একটা কঠিন বিভীষিকা!

সুলতা একটা চাটাইয়ের পর বসলে, লোকটী তাদের সাংসারিক খবর দিতে লাগলো। সুলতা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনে যেতে লাগলো। যা কিছু মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারল তার কতকটা এই রকম যে—আজ প্রায় দুই বছর হল তার স্ত্রীর রোগ হয়েছে। প্রথম প্রথম জ্বর হত; আজকাল আর হয় না। তবে সর্ব্বাঙ্গ পক্ষাঘাত হয়ে গিয়েছে। সংসারে আয় নেই। জাতে সে জেলে। ভোরে উঠে সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে যা পায় তাই নিয়ে মেয়েটি বিক্রি করতে যায় দূরে সহরে। যা বিক্রি হয় তাতে দু বেলা ভাল করে অন্নই জোটে না। তার পর সংসারের কাজ আছে। মাছ ধরা থেকে আরম্ভ করে সংসারের যাবতীয় কাজ তাকে করতে হয়। বিশেষতঃ এই রোগের সেবা করা যে কত কঠিন! সংসারে তাদের আর কোন আত্মীয় নেই। যা দুই একজন আছে, তারা নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করতে আসবে কেন?

আরও যে কত বলে গেল তার সীমা নেই। সুলতা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে যেতে লাগলো। সংসার ওদের কবে সুখের ছিলো। মেয়েটি যখন হয় তখন কত আনন্দ, কত উৎসব। তখন রোজগার করতে পারতো বেশী। শরীর ও মনে ছিলো শক্তি। তার পর থেকে এল দুঃখের দিন। তাদের আর একটী ছেলে হয়েছিল সেটী গেল মারা। রোজগার ক্রমশঃ কমে যেতে লাগলো। দুঃখে কষ্টে তার স্ত্রীর শরীর গেল ভেঙ্গে। ধরল তাকে কঠিন রোগে। যার ফলে আজ এই অবস্থা।

তার স্ত্রীর অসুখের পর অনেকে বলেছিল যে টান্ মেরে সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দিয়ে আর একটা বিয়ে করতে। কিন্তু ওপরে যে ভগবান আছেন। তার কাছে তো এই পাপ ঢাকা থাকবে না।

বাইরে থেকে কঠিন কণ্ঠে আওয়াজ এলো—"সুলতা"।

মন্ত্রমুগ্ধ সুলতা উঠল চমকে। চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—"যদি আসতে পারি তো আবার আসব।"

বাইরে থেকে এবার আরো জোরে কঠিন স্বর এলো—"সুলতা"।

সুলতা নির্ব্বিকার। কেউ যে বাইরে ডাকছে একথা ও যেন শুন্‌তে পেয়েও শুন্‌ছে না। সুলতা বলতে লাগলো—"তোমাদের ছেড়ে আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। তোমার বৌকে বলো যে আমি বলছি তার অসুখ ভালো হয়ে যাবে। তাকে আমার ভালবাসা জানিও। তোমার ছোট মেয়েটিকে আমার আশীর্ব্বাদ দিয়ো।" শান্ত চিত্তে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে এল।

অমূল্য বিরস স্বরে বললে—"নিজের শরীরের পর অত্যাচার করলে আমি আর কি করব বল? যা বারণ করা যাবে তাই হবে তোমার জেদ্। দেখ তো কত বেলা হয়ে গেছে। না খাওয়া হল ওষুধ, না পথ্য। ওখানে গিয়ে কি এমন বিরাট জিনিষ দেখলে যার জন্যে এত দেরী হল?"

সুলতা শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল—"যা দেখেছি তার তুলনা নেই।" বলে নিঃশব্দে চলতে লাগলো।

প্রায় মাঝামাঝি পথ এসে সুলতা বললে—"আমি আর চলতে পাচ্ছিনে—বুকের মধ্যে আবার সেই ব্যথাটা বোধ হচ্ছে।"

অমূল্য গরম হয়েই ছিলো, এবার হয়ে উঠল আগুন। কঠিন হয়ে বল্‌লে—"নাও বোঝ—। তখনি আমি এখানে বারে বারে আস্‌তে বারণ করেছিলাম। বুকের ব্যথার কী দোষ! আজ সারাদিনে যা অনিয়ম করলে—শরীর সারা এক মাস আরও পিছিয়ে গেল। এখন কিছু হলে দায়িত্ব আমার নয়।"

সুলতা অমূল্যের মনের নগ্ন পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তবু বল্‌লে—"এখানে একটু বসি। তারপরে বুকের ব্যথাটা কম্‌লে না হয় যাবো।"

অমূল্য একান্ত বিরক্ত হয়ে বললে—"এই মাঝ পথে তোমায় নিয়ে আমি কী করি বলতো? কয়েকদিন থেকে তুমি যে রকম বাড়াবাড়ি করতে আরম্ভ করেছ—তার ফল যে এ রকম সুযোগ বুঝেই আস্‌বে এ আমি জান্‌তেম। আমার বোকামি হয়েছে তোমাকে আলগা দেওয়া।"

বুকের ভেতর অসহ্য যন্ত্রণা—সুলতা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—"চল, আমার বুকের ব্যথা সেরে গেছে।"

অমূল্য বললে—"নাও, আমার কাঁধের 'পর মাথা দিয়ে চল।"

সুলতা বল্‌লে—"প্রয়োজন নেই।"

তারপর? তারপর অনেক দিন চলে গেছে। বছর তিনেক হবে।

জান্‌তে ইচ্ছে করে সুলতা কেমন আছে, কোথায় আছে? সেই মাদ্রাজী লোকটী ও তার রুগ্ন স্ত্রীটিই বা কেমন আছে?'

সুলতা আছে কল্‌কাতায়। অসুখ তার একেবারে সেরে গেছে। সে বিশীর্ণ, বিবর্ণ চেহারা আর নেই। এখন চঞ্চল রক্ত শরীরে প্রবহমান। একটী ছেলে হয়েছে, স্বাস্থ্য ও সুন্দর। অমূল্যর প্রফেসারিতে মাইনে গিয়েছে বেড়ে। বাঙ্গালী সংসারে যাকে বলে পরিপূর্ণ লক্ষ্মীশ্রী। আগে যে একদিন কখনো কোন অসুখের মেঘ এই সংসারের 'পর দিয়ে ভেসে গেছে তার চিহ্নও নেই।

কিন্তু তা হলে তো ভালো হোত। খুবই ভালো হোত। কিন্তু তাতো হয়নি। সুলতার অসুখ গিয়েছিল বেড়ে। এর আগে কোন দিন রক্ত ওঠেনি। এবার উঠ্‌তে লাগ্‌লো মুখ দিয়ে চাপ্‌চাপ্‌ রক্ত। কোথায় গেল তার এত চঞ্চলতা, নিঃসাড়ে শয্যায় পড়ে থাকে। বুকে বেদনা বোধ হলে মুখ গুঁজে থাকৃতো বালিসে—রক্ত উঠ্‌তে থাকলে মুখে দিত হাত চাপা। শরীর যন্ত্রণায় বাঁকা হয়ে আস্‌লে, হত নিঃশব্দ। না বল্‌ত কথা, না করত বেদনা যন্ত্রণায় চীৎকার।

এমনি করেই তার জীবন শেষ হয়েছিল একদিন। সেদিনও ছিল সেই রকম সুন্দর প্রভাত, পাখীর কলরব, সমুদ্রের চঞ্চলতা, সূর্য্যের আলোর সমারোহ। ঢেউয়ের পর লক্ষ মাণিকের ছড়াছড়ি। মোহময় বৈকাল, ছায়াময় প্রদোষান্ধকার। তবে সেদিন চাঁদ ছিলো না আকাশে এই তফাৎ।

তারপর যা হ'ল তা বল্‌বার প্রয়োজন নেই! সুন্দর ভাবে দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। দুঃখ বেদনার ইতিহাসে একটী পর্য্যায় লেখা হয়ে আছে। তারপর থেকেই সুখের সমারোহ। সুলতা মারা যাবার এক বছর না কাটতেই অমূল্য আর একটী বিবাহ করেছে। বিবাহ হয়েছে সুখের। কেনই বা হবে না, মানুষের মন তো? আরও সুখের কথা একটী ছেলে হয়েছে। সেই সঙ্গে মাইনে গিয়েছে বেড়ে।

এইখান থেকে আমার গল্পের আরম্ভ।

কলকাতার সকাল। তার মানে আটটা বেজে গিয়েছে। সূর্য্যের আলোর খানিকটা এসে পূব দিকের বাড়ীগুলোর 'পর এসে পড়েছে। অনেকের আপিসের সময় হয়ে গিয়েছে। বাজার করে ফিরে যাচ্ছে। কতজন কত কারণে এগিয়ে চলেছে, কে কার খোঁজ রাখে!

অমূল্য বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। তার কলেজের এখনো দেরী আছে। এই তো খানিক আগে ঘুম থেকেই উঠেছে। চা দিয়ে গেছে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই।

পাশের দরজায় একটু শব্দ হল। তার পরে সেটা গেল খুলে। ঘরের ভেতরে চার দিকে চেয়ে নির্ম্মলা তার ফুলের মত মুখখানি বের করে বল্‌লে—"চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে খেয়ে নাও।" নির্ম্মলা অমূল্যর স্ত্রী। কাগজ থেকে চোখ তুলে, মুখের দিকে চেয়ে হেসে বল্‌লে—"খাচ্ছি।" সেই দিকে চেয়ে একটা চঞ্চল কটাক্ষ করে নির্ম্মলা দরজা বন্ধ করে সরে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে একটী লোক এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। লোকটীর বয়স হয়েছে, বাঙালী বলে মনে হয় না।

অমূল্য বল্‌লে—"এই কে তুম্? কী চাও?"

লোকটি জানালে যে সে তাকেই চায়।

এ লোকটী সেই মাদ্রাজী যার সঙ্গে সুলতার পরিচয় হয়েছিল।

কিছুক্ষণ কথা বার্ত্তা হওয়ার পর অমূল্য তাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে এল। তার পর কত কথা যে হল তার সীমা নেই। কিসের কথা, কেন, বল্‌বার আজ আর সময় নেই। সে একটা জীবনের মাঝে লক্ষ লক্ষ সুখ বেদনার অসামান্য কাহিনী। তবে যা বল্‌লে তার কতকটা এই রকম

যে—সুলতা মারা যাবার পর অমূল্য এখানে চলে এল। সুলতার মৃত্যুতে তার স্ত্রী অত্যন্ত শোক পেয়েছিল। কি করা যাবে সমস্তই ভগবানের হাত। এদিকে তার স্ত্রীর রোগ সারেও না বাড়েও না। এমনি ভাবে ছিলো এক বছর। ইতিমধ্যে তার মেয়েটির বিয়ে দিতে হল। টাকা পয়সার সামর্থ্য ছিল না। তার চেয়েও গরীব এক জেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে হল। মেয়ে গেল স্বামীর ঘরে চলে। মনে হয় তার স্ত্রী, মেয়ের বিয়েটা দেখে যাবার জন্যেই এত দিন বেঁচে ছিলো। এরপর থেকে তার অসুখ উঠল বেড়ে। আবার জ্বর হতে লাগলো। অসাড় অঙ্গের মধ্যে যে কোথায় প্রাণটা আঁকড়ে বসে আছে তা বোঝা গেল না। মেয়ে চলে গেলে, তাকে মুস্কিলে পড়তে হল। মাছ ধরতে যাবার সময় রুগীর কাছেই বা থাকে কে, আর তা নিয়ে এলেও বা বিক্রী করে কে? তারই স্বজাতীয়া আত্মীয়ার হাতে পায়ে ধরে থাকৃতে রাজী করিয়েছিলো। কিন্তু বেশী দিন তাকে থাকৃতে হ'ল না। এর দিন পনের পরে এক কঠিন রাত্রে তার স্ত্রী মারা গেল। প্রথম থেকেই সে জান্‌তো যে মারা যাবে। কিন্তু এক এক সময় আশাও হত যে তার এত সেবা বৃথা যাবে না। সেরে উঠতে পারে। দিন জেগে, রাত জেগে সেবার পরিচয় পাওয়া গেল না।

তার স্ত্রী মারা যাবার পর এতদিন সে দেশে চাকৃরীর সন্ধান করেছে। কিন্তু যে দুদ্দিন পড়েছে তাতে চাকৃরী পাওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব হয়ে উঠেনি। তাই বাংলা মুল্লুকে চলে এসেছে চাকৃরীর সন্ধানে।

অমূল্য জিজ্ঞেস করলে সে বিবাহ করেছে কি না?

সে নত নেত্রে বল্‌লে—"না।"

আবার সেই সুন্দর মুখখানি দরজা ফাঁক করে বল্‌লে—"কলেজের সময় হয়ে গেল।"

সন্তোষ বসু

কবি ও শিল্পী

শ্রীঅমিয়কুমার রায়চৌধুরী

শিল্পী সে শুধু আঁকে প্রকৃতির ছবি—
অনুরাগ-রসে ডুবাইয়া তুলিখানি;
কল্পনাভরে আপন কাব্যে কবি,
ছন্দে গাঁথিয়া ভাষা দেয় তারে আনি'।

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

গদ্যসাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্র অলৌকিক প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছিলেন এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বও ছিল অসাধারণ। পরাধীন দেশে, গুরুতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাধীনভাব কিছুমাত্র নষ্ট হয় নাই। শৈশব হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। আত্মমর্যাদা প্রতিভাবান ব্যক্তির বিশেষত্ব, বঙ্কিমচন্দ্রের উহা এত বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল যে লোকে মধ্যে মধ্যে ভ্রম ক্রমে উহাকে আত্মশ্লাঘার পর্য্যায়ভুক্ত করিত। প্রতিভার কার্য্য নূতন সৃষ্টি। প্রতিভাশালী ব্যক্তি গতানুগতিক পথে চলিতে সর্ব্বদাই পরাঙ্মুখ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য ইহার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

যে যুগে বঙ্কিম জন্মগ্রহণ করেন, সে এক বিপ্লবের যুগ। ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাস তৎকালীন নব্যশিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকগণের অন্তরে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। তদ্বারা ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য সকল ক্ষেত্রে অভুতপূর্ব্ব ও অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ধর্ম্মে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাজসংস্কারে, রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি রাজনীতিতে এবং কবি মাইকেল মধুসূদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীন সেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ বহু মনীষী কাব্য ও সাহিত্যে দেশে এক নবজীবন সঞ্চার করেন। মরা গাঙ্গ সহসা জলোচ্ছাসে পূর্ণ হইল। আমাদের দেশের ইতিহাসে ঐরূপ গৌরবময় যুগ আর কখনও আসিয়াছে কিনা সন্দেহ! তবে এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে দেশাত্মবোধে বঙ্কিম-সাহিত্য সর্ব্বাগ্রগণ্য।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে হিন্দুকলেজে শিক্ষিত নব্যযুবক সম্প্রদায় ইংরাজীর প্রতি কিরূপ মোহাবিষ্ট ছিলেন। ঠিক তাহার পরবর্ত্তী সময়ে ঐ অন্ধ অনুরাগ প্রশমিত হইলেও একেবারে নিবারিত হয় নাই। ঐ প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথমে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কিন্তু মাইকেল মধুসূদনের অপেক্ষা অল্পকাল মধ্যে বঙ্কিম ঐ ভ্রম বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র মাইকেল মধুসূদনের Captive Lady প্রকাশের ন্যায় ইংরাজী ভাষায় "Rajmahon's wife" নামে একখানি উপন্যাস রচনা করেন। 'মাতৃকোষে রতনের রাজি' দেখিয়া ও মাতার আহ্বানবাণী শুনিয়া মাইকেলের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্র বাহির হইতে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসেন। শিক্ষিত লোকের মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে শূলের ন্যায় বিদ্ধ হয় এবং শিক্ষিত লোকদের অশিক্ষিত জনগণের প্রতি সমবেদনার অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করেন।

১২৭৮ সালের শেষভাগে 'বঙ্গদর্শন' প্রচারের জন্য যে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়, উহাতে ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য নব্য সম্প্রদায়ের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ লিখেন, "লেখাপড়ার কথা দূরে থাক, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজীতে। সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেকচার, এড্রেস, প্রোসিডিংস, সমুদায় ইংরাজীতে। যদি উভয়পক্ষ ইংরাজী জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজীতে হয়, কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজী কথোপকথন যাহাই হউক্ পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষে ইংরাজীর কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের

এমনও ভরসা আছে যে অর্গ্যানে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজীতে পঠিত হইবে।"

সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে সহৃদয়তার অভাব সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের প্রথম সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। "প্রধান কথা এই যে, এখানে আমাদিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ দরিদ্র লোকদের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা ধনবান এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক।......যদি শক্তিমন্ত লোকেরা অশক্তদিগের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী না হইল, তবে কে আর তাহাদিগকে উদ্ধৃত করিবে? আর যদি আপামর সাধারণ উদ্ধৃত না হইল, তবে যাঁহারা শক্তিমন্ত, তাঁহাদেরই উন্নতি কোথায়? এরূপ কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্রলোকদের অবিরাম শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। এবং যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজের উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তাসম্পন্ন। যতদিন এই ভাব ঘটে নাই—যতদিন উভয়ে পার্থক্য ছিল, উন্নতি ঘটে নাই। যখন উভয় সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য হইল, সেইদিন হইতে শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ।"

মাতৃভাষার গৌরব বৃদ্ধির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র একাকী যে গুরুভার লইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, কেবল অনুপস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্ব্বদা সম্মুখে বর্ত্তমান রাখিয়া সুলভ খ্যাতি-লাভের প্রলোভন সম্বরণ করিয়া, অশ্রান্ত যত্নে, অপ্রতিহত উদ্যমে, দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম্ম। চতুর্দ্দিকব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মত এমন গুরুভার আর কিছু নাই; তাহার নিয়ত ভারাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করিয়া উঠা যে কত নিরলস চেষ্টা ও বলের কর্ম্ম তাহা এখনকার সাহিত্য-ব্যবসায়ীরাও কতকটা বুঝিতে পারেন, তখন যে আরও কত কঠিন ছিল, তাহা কষ্টে অনুমান করিতে হয়। সর্ব্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্ব লোকের দ্বারাই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ আর এক স্থলে লিখিয়াছেন বঙ্কিম সাহিত্যে কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থির ভাবে পর্য্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল, সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল ও আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য, কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস, কি ধর্ম্মতত্ত্ব যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্ত্ত-স্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।"

বিদেশীয় ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া ঐ ভাষায় পুস্তক লিখিয়া যশস্বী হইতে পারিলেও দেশের সাহিত্যের দৈন্য ঘুচে না। বঙ্কিমচন্দ্র সংকল্প করেন ভাষাজননীর ঐ দৈন্য দশা ঘুচাইতে হইবে এবং রত্নবেদী মূলে মাতার রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি স্থাপিত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি স্বদেশীয় ও বিদেশীয়, জ্ঞানভাণ্ডার হইতে বিবিধ উপাদান আহরণ করিয়া মাতৃভাষায় গৌরবোজ্জ্বল মূর্ত্তি গঠনে মনোনিবেশ করিলেন। একান্ত ভাবে দেশের কল্যাণের জন্য নানা কর্ম্মের মধ্যেও সমাহিত চিত্ত হইয়া কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস কে জানে? পরাধীনতার তীব্র জ্বালা বৃশ্চিকের মত অহরহ তাঁহাকে দংশন করিত। জ্বালামুখী ভাষায় সেই ভাব নানা ভাবে তাঁহার রচনায় পরিস্ফুট হইয়াছে। স্বদেশ ও স্বজাতির চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্ত পূর্ণ ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ইহা আমাদের বুঝা আবশ্যক।

বঙ্কিমচন্দ্র চিরদিন আদর্শের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, যে. বাস্তবতা তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত ছিল। পরবর্ত্তী অনেক সুলেখকের উপন্যাসে বস্তুতন্ত্রের এতদূর প্রাধান্য দৃষ্ট হয় যে উহাতে আদর্শের কোন সন্ধানই মিলে না। এই কারণে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য সর্ব্বদা মনোযোগী ছিলেন। পাশ্চাত্য-শিক্ষার

কুফল কখনও তাঁহাকে ঐ লক্ষ্যপথ হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই।

একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক কোন উপন্যাস উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট ইহার বিচারের জন্য একটি সুন্দর মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে যে উপন্যাস পাঠশেষের সঙ্গে মন উন্নত না হয়, তাহার যত গুণই থাকুক উহা বর্জ্জনীয়। আর যে উপন্যাস পাঠে, মন এক স্বর্গীয় ভাবে উদ্দীপিত হয়, তাহাই গ্রহণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের যে কোন উপন্যাস পড়িলে এ কথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

উপন্যাস নীতিশাস্ত্র নহে, এ কথা সত্য। কিন্তু উপন্যাসে নীতির মর্য্যাদা রক্ষিত না হইলে, সে উপন্যাস প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস বলিয়া কখনও গণ্য হইতে পারে না। এ সহজ সত্য অস্বীকার করিলে, মানবের শ্রেষ্ঠত্ব চূর্ণ হইয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বাস্তবের সহিত আদর্শের অপরূপ সম্মিলনে সুনিপুণ শিল্পীর সূক্ষ্ম অনুভূতি সুস্পষ্ট! এমন সুন্দর, সুরুচিপূর্ণ ও সংযত উপন্যাস প্রকৃতই দুর্লভ। বঙ্কিম প্রতিভার ইহা একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

এ কথা বলিলে, কোনরূপ অতিশয়োক্তি হইবে না যে বঙ্কিমচন্দ্র একক সাহিত্যে দেশের জন্য যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, আর কেহ সেরূপ করিতে পারেন নাই। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা সাহিত্যের সকল দিক আলোকিত করিয়াছিল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ৩৪ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধ, উপন্যাস, সমালোচনা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, রহস্য-সন্দর্ভ, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি এমন বিষয় নাই, যাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের তুলনা করিয়া যথার্থই বলিয়াছেন, "আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মত একভাবে বাঁধা ছিল, কেবল সহজসুরে ধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক একটি তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্যসুর বাজিত, আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুপদ-অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।"

বঙ্কিম-সাহিত্য বুঝিতে হইলে বঙ্কিমকে জানা অপরিহার্য্য। তন্নিমিত্তই বঙ্কিমের কথা সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যসাহিত্যের নানাবিভাগে যে অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন, পরবর্ত্তী প্রবন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে উহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

মেঘদূত

শ্রীশক্তিব্রত সিংহ রায় এম্-এস্-সি

আষাঢ়ের প্রথম দিবস। এমনি এক দিনে, কবে কোন হাজার দু'হাজার বছর আগে, এক বিরহী মেঘকে তার বেদনা জানিয়ে প্রিয়ার কাছে বার্ত্তা নিয়ে যেতে অনুরোধ করে পথ বাৎলিয়ে দিল। এই নিয়ে সৃষ্টি হ'ল এক মহাকাব্য হাজার দু'হাজার বছর আগেকার মানুষের লক্ষ লক্ষ কীর্ত্তির কতটুকু অস্তিত্বই আর আছে। কিন্তু এই বিরহীর প্রাণের স্পন্দন, কালকে ছাপিয়ে অনন্তের সঙ্গে মিশে শাশ্বত হয়ে রইল। অদ্ভুত এর সত্ত্বা—রীতি, নীতি ধর্ম্মের বাঁধন মান্‌ল না। কত বিপর্য্যয় গেল মানব জাতির উপর দিয়ে, বাইরের এবং ভিতরের দিক দিয়ে—কিন্তু আজও মানুষ সে দু'হাজার বছর আগেকার কাহিনীতে খুঁজে পেলে ঠিক আপনার জনকে—আর মনের তন্ত্রীতে বেজে উঠল ঠিক একই সুর—একান্ত হয়ে মিশে গেল সেই সুরের সুষমা তারই সাথে—আর এই সম্মিলনে সৃষ্টি হ'ল আনন্দের। অসীম সে আনন্দ—যুগ যুগ ধরে বিলিয়ে গেলেও কণামাত্র তার হ্রাস নাই। এরূপ সম্পদ সৃষ্টির গৌরবেই মানুষের দাবী—সে অমৃতের বরপুত্র।

পূর্ব্বমেঘে অমর কবির তুলিতে রামগিরি পাহাড় ও অলকালয়ের মধ্যে সমস্ত নদ-নদী, স্থাবর জঙ্গম, গিরি উপত্যকা, নর নারী, পশু পক্ষী অনন্ত চেতনা লাভ করেছে। ধরিত্রীর প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে মানব মনের পরিচয়—ভৌগোলিক পরিচয় জ্ঞানের দিক থেকে—আর এ পরিচয়, ভাবের দিক থেকে। এ বৈজ্ঞানিক জানা নয়—এ উপলব্ধি। এতে করে পেয়েছি ধরিত্রীকে অতি নিবিড়ভাবে—প্রত্যেক বিভিন্ন চেতনার সঙ্গে স্বীয় চেতনার সংযোগের যে অনুভূতি —তাহাই আবার এক বিরাট চৈতন্যময়রূপ ধরলে কবির উত্তরমেঘে, তার প্রিয়াতে—প্রিয়ার চৈতন্যই যেন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে ধরণীর প্রত্যেক কণাতে। সেই চৈতন্যের পূর্ণ উপলব্ধি, উত্তর মেঘে। আমাদের মনকে তার জন্য তৈরী করার সোপান 'পূর্ব্ব মেঘ'। পূর্ব্ব মেঘের বিভিন্ন লীলার ভিতর দিয়ে গিয়ে প্রিয়া যেন এসে সমগ্র হয়ে ধরা দিলেন উত্তর মেঘে।

কবি ভাবের দূত করে পাঠালেন আষাঢ়ের নব মেঘকে। অগণিত বারিকণা ঝাঁক বেঁধে বাতাসে উড়ে বেড়ায়—ঠাণ্ডা লাগলে বারিপাত হয়। এই কি মেঘের সব পরিচয়—মানব মনের সঙ্গে মেঘের কত কি বিচিত্র নিকটতম সম্বন্ধ কবির তুলিতে তা মূর্ত্ত হয়ে উঠল। আকাশের পুঞ্জীভূত মেঘ উড়ে চলে—তার সঙ্গে আলোড়িত হয় আবাল-বৃদ্ধের মন—বিচিত্র ভঙ্গীতে নেচে উঠে ধরিত্রীর বুক—অতি জানা সুরে। জানিয়ে দেয় তার ভাবের বোঝা বইবার শক্তির চাইতে জলের বোঝা বইবার শক্তি কত তুচ্ছ। কবির দূতকে মন আপনাতেই গ্রহণ করে, অতি পরিচিত আপনার জন বলে। পরিচয় পত্রের আবশ্যক হয় না। সমগ্র কল্পনাটি এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি। এর যেন কোথাও একটু নড়তে চায় না—এ যেন সৃষ্টির নৈপুণ্যের চরম বিকাশ—শেষ সীমা। সাজাহানের তাজমহল দেখেছি। দিনের আলোতে তার কারুকার্য্য, তার স্থাপত্য মুগ্ধ করেছে কিন্তু মনের মধ্যে তেমন কিছু দাগ কাটেনি। আজ ১০।১২ বছর পরে সে স্মৃতি ম্লান হয়ে এসেছে—কিন্তু জ্যোৎস্না রাতের তাজ যাতে কারু-কার্য্যের বিন্যাস ধরা দেয় নি। ধরা দিয়েছিল তাজের সেই সমগ্র রূপটিকে—অদ্ভুত ভাবে সাড়া দিয়েছিল তাতে মন। ভুলে গিয়েছিলাম এ সাজাহানের তাজ—এক অভাবনীয় আনন্দরসে মন প্রাণ শরীরে শিহরণ তুলেছিল। আর সে স্মৃতি যেন মুছবার নয়। এ যেন জীবনের এক অক্ষয় সম্পদ হয়ে জমা হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে ভাবলাম, বুঝতে চেষ্টা করলাম কেন এমন

হ'ল। কোথা থেকে এর উদ্ভব। সাজাহানের পত্নীপ্রেম —তাজের রূপের সঙ্গে কাহিনী সংযোগে সৌন্দর্য্য উপাসকগণ যে রস-সাহিত্য সৃষ্টি করে রেখেছেন তার সঙ্গে পূর্ব্বেকার পরিচয়—লোকপরম্পরায় তাজের রূপ কীর্ত্তন—এক কল্পনার জাল বুনে মনকে গ্রহণ করতে তৈরী করে রেখেছিল সন্দেহ নাই—কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে সব ছিল সুপ্ত। জাগ্রত ছিল তাজের স্থাপত্যকলার চরম বিকাশের অনুভূতি —এরও যেন আর একটুও নড়চড় চলে না। একটু কিছু পরিবর্ত্তন ভাবতে গেলেই যেন সেই বিরাট সৌন্দর্য্যের উপর কুঠারাঘাত পড়ে। আর সে আঘাত যেন সওয়া দায়—এও যে চরম বিকাশ, আর এই অনুভূতিই প্লাবিত করে দেয় মনপ্রাণ আনন্দরসে। কবির প্রকাশ, শিল্পীর প্রকাশ এক হয়ে এসে মিশে যায়। সেই ঐক্যের সুরই বাজে আকাশে বাতাসে, পাথারে প্রান্তরে, পাখীর গানে ঝরণার তালে, শিশুর হাসিতে, মায়ের স্নেহে, প্রিয়ার অনুরাগে। সেই ঐক্যের তানে সামঞ্জস্য করে নিজেকে উপলব্ধি করতে শিখিয়ে দেয় শিল্পী, কবি। জীবনের দোকানদারির লাভ ক্ষতির হিসাবে যখন মন শ্রান্ত-- আশা নিরাশার উদ্বেগে যখন বুদ্ধি দিশেহারা—কবি, শিল্পী অভয়বাণী দিয়ে ডেকে বলে—জীবনের এ-ই সত্য নয়—আমি তোমাকে নিয়ে যাব মহাসত্যের পথে, শান্তির পথে, আনন্দের পথে—সুখ দুঃখের অতীতে। এ ডাককে মানুষ অস্বীকার করে নি। তাই দেখি আজও অমর কবির 'মেঘদূতের' সম্বর্দ্ধনার বিপুল আয়োজন।

শক্তিব্রত সিংহ রায়

কণা

শ্রীসুবোধ পুরকায়স্থ

হে মোর বকুল শোনো,
বিলাও তো বাস, ভুঁয়ে পড়ে বলে
না মেনো দৈন্য কোনো ॥

সন্ধ্যা শ্যামলী ; ভীরু প্রেম লয়ে, স্তিমিত-মলিন চোখে
বসে থাকে পথধারে।
সোনার রাগিণী আকাশে ছড়ায়ে যে-রাখাল গৃহে ফেরে,
শুধায় না কেন তারে ॥

সিসারোকথিত 'মধু ও গোলাপের দেশ'

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

পৃথিবীতে যে সব ক্ষুদ্রতম দ্বীপপুঞ্জ আছে, তাদের মধ্যে মাল্টা দ্বীপপুঞ্জ অন্যতম। এই পুঞ্জের প্রধান এবং উল্লেখযোগ্য দ্বীপ হচ্ছে মাল্টা—দৈর্ঘ্যে সাড়ে সতেরো মাইল এবং প্রস্থে নয় মাইল মাত্র। এখানে সাহারার উষ্ণ সিরকো বায়ু বয়ে যায় বলে' অতিশয় পীড়াদায়ক এবং এখানকার জমিও উর্ব্বর নহে।

সুদূর অতীত দিনে যখন মহাদেশগুলির দৈহিক গঠন বিভিন্ন রকমের ছিল এবং ভূমধ্যসাগর ছিল হ্রদ শ্রেণীতে রূপায়িত, তখন যে সকল স্থল সেতু আফ্রিকার সঙ্গে ইউরোপের মিলন ঘটিয়েছিল তাদেরই একটি সেতুর অবশিষ্টাংশ হচ্ছে মাল্টা, কোমিনো এবং গোজো। এদের অনূ্যন ১২০ বর্গ মাইল সম্মিলিত আয়তনের মধ্যে নদী বা হ্রদ নেই বলে' এখানকার লোকেরা উৎস থেকে জল এনে জীবন ধারণ করে।

ঐ সব স্থল সেতুর অন্যতম ভগ্নাংশ এই মাল্টা দ্বীপপুঞ্জ আজ পিল্লার মত দাঁড়িয়ে অতীতের সাক্ষ্য দিচ্ছে, আর এর সেই অতীত দিনের স্মৃতি-মধুর জীবন সঙ্গীত ভূমধ্যসাগরের সুরে সুরে ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে। ইউরোপের ক্রমবর্দ্ধিত তুষার ঝটিকায় বিতাড়িত হয়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের হিংস্র শ্বাপদ এবং রোমন্থক প্রাণীগণ অন্ধকারে দেশ অনুসন্ধান করতে করতে এই জীবিত সেতু-খণ্ডের ওপর দিয়ে আফ্রিকার উষ্ণ মণ্ডলে উপনীত হয়েছিল। সেই সব অতিকায় প্রাণীর মধ্যে কতিপয় মাত্র মাল্টার উত্তরণ মঞ্চে দীর্ঘকাল কাটিয়ে গেছে, আর দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তের কাছে ঘরদালানের গুহায় তাদের কঙ্কালগুলি রেখে গেছে। সেই সব কঙ্কাল আজ প্রস্তরীভূত। হস্তী এবং হিপোপোটেমাসের প্রস্তরীভূত কঙ্কালগুলি বৃহৎ গুহার মেঝের উপর স্তূপের নিম্নস্তরে অবস্থিত। তৎপরবর্তী মৃত্তিকার স্তরে বহু হরিণের দেহাবশেষ বিদ্যমান। মনে হয়, জলপ্লাবনে তাড়িত হয়ে এদের দেহ গুহামধ্যে প্রবেশ করেছিল।

কথিত আছে এর প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধিবাসী ছিল সাইক্লোপরা। রূপকথায় আমরা যে সব দৈত্যদানবের বর্ণনা পেয়েছি, তাদেরই মত ছিল এদের চেহারা। এদের প্রত্যেকেরই ললাটে ছিল একটি করে চোখ। কবে যে সাইক্লোপদের জীবনপ্রবাহ আদিম অন্ধকার যুগের স্রোতোধারা হতে বেরিয়ে এসেছিল আর কবে যে, সে প্রবাহ অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেল, সে সম্বন্ধে এখনও বিশেষ করে কিছু জানা যায় নি ; তবে স্থানীয় অধিবাসীরা টারসিনস্থ পাষাণের বুক চিরে এদের সমস্ত জীবন কাব্যের কতিপয় ছিন্ন অধ্যায় পেয়েছে, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে, এরা গৃহ নির্ম্মাণ করতে পারতো এবং শিল্পে সুদক্ষ ছিল, তীক্ষ্ণ চকমকি পাথরের সাহায্যে গঠন কার্য্য করতো, এবং ধাতুপদার্থ নিয়ে কাজ করতো না—পাথরই ছিল এদের যা কিছু সম্বল। টারসিনের ভিতর যে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ রয়েছে, লোকেরা বলে সাইক্লোপরাই তার স্রষ্টা।

সুদূর প্রস্তরযুগে মাল্টা এবং গোজোতে অট্টালিকা নির্ম্মাণের কলাকৌশল অজ্ঞাত ছিল না। সেই প্রস্তরযুগে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই ভাস্কর্য্য এবং স্থপতি শিল্পের সঙ্গে অপরিচিত ছিল কিন্তু সে সময়ে এই শিল্পের উৎকর্ষ দেখা গেছে কেবল মাল্টা দ্বীপপুঞ্জে। প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র বলে' মাল্টার কৌলিন্য মর্য্যাদা আজও অক্ষুন্ন রয়েছে।

ভূমধ্যসাগরের গর্ভ থেকে উঠে এই শৈলময় ক্ষুদ্র জড়পিণ্ড কেন ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে গুরুতর ভূমিকায় নেমেছে এবং কেনই বা আধুনিক জগতের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় এর পুষ্টিসাধন হয়েছে—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে প্রথমেই সিসিলি এবং উত্তর আফ্রিকার মধ্যস্থ এর সর্ব্বপ্রধান সমর

নীতি সম্বন্ধীয় সংস্থিতির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করতে হয়, তারপর দেখানো যেতে পারে পৃথিবীর সুন্দরতম পোতাশ্রয়গুলির মধ্যে কতিপয়ের উপর এর আধিপত্য। ইউরোপের মহাদেশ হ'তে একশত চল্লিশ মাইল এবং আফ্রিকা হ'তে ১৮০ মাইল ব্যবধানে দাঁড়িয়ে ভুমধ্যসাগর মধ্যবর্ত্তী মাল্টা দ্বীপপুঞ্জ মাথা তুলে জিব্রাল্টার এবং সুয়েজের ভিতর নৌ পথের পাহারা দিচ্ছে। কেবল মাত্র ৫৮ মাইল দূরে রয়েছে ইটালীর অধিকৃত দেশ—সিসিলির উপকুল। বিস্তৃত পোতাশ্রয়গুলি এবং অদ্ভুত ভৌগোলিক সংস্থিতির জন্য জগতের ইতিহাসে ক্ষুদ্র মাল্টা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে এবং নৌসামরিক ভিত্তিভূমি হয়ে আজ গ্রেটব্রিটেনের প্রাচ্য সাম্রাজ্য রক্ষার পথে সতর্ক প্রহরীরূপে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রিটেনের ভুমধ্যসাগরীয় রণতরীগুলিকে বক্ষে করে মাল্টার গ্রাণ্ড হারবার এম্নি সুদৃঢ়ভাবে শক্তিশালী হয়ে রয়েছে যে, সাগর পথ কিম্বা ব্যোম পথ হ'তে শত্রুপক্ষ আক্রমণ ক'রে একে বিধ্বস্ত করতে পারবে না। এতদিন শুধু নৌবহর নিয়েই মাল্টার সময় কেটেছে, কিন্তু আজ বিমান পথের দিকেও-এর খুব লক্ষ্য দেখা যাচ্ছে। উপকূলের শৈলোপরি ভ্যালেট্টার কতিপয় দুর্গ গঠিত হয়েছে। কোন একটি দুর্গে এখনও পুরাতন ঘণ্টা দুলছে। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে এই ঘণ্টা বাজানো হয়েছিল, যখন তুর্কীরা সহর অবরোধ করেছিল। গ্রাণ্ড হারবারের ধারে সারি সারি কামান পাতা রয়েছে। হাডসন এবং মার্সামাসকেট্টো হারবার দুইটীর মধ্যে ডেষ্ট্রয়ার ও ছোট ছোট জাহাজগুলি নোঙর করা আছে। জাহাজগুলি ইষ্ট রিভারের মধ্যে চলাফেরা করে থাকে। শৈলের উপর যেখানে লা ভ্যালেট্টি রাজধানী নির্ম্মাণ করেছিলেন, সেখানকার আকার মানহাট্টান দ্বীপের অনুরূপ। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ এতদঞ্চল আক্রমণ করেন এবং প্রায় ছয় মাস ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। অবশেষে অমানুষিক শক্তি বলে নাইটগণ এবং স্থানীয় অধিবাসীরা মহান্ সুলতান সোলেমানের সৈন্যদলকে তাড়িয়ে দেন। গ্রাণ্ড হারবারের চতুর্দ্দিকে নাইটদের যে সুন্দর ও সুদৃঢ় দুর্গশ্রেণী আছে, তা যে দুর্ভেদ্য, একথা অনেকেই বলেছেন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে গ্রাণ্ড মাষ্টার ছিলেন জিন প্যারিসট ডি লা ভ্যালেট্টি। ইনি নয় হাজারেরও ন্যূন যোদ্ধা নিয়ে সুলতান সোলেমানের ত্রিশ হাজার সৈন্য তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এঁর নামানুসারে মাল্টার ভ্যালেট্টা সহর হয়েছে এবং এঁর মর্ম্মর মূর্ত্তি আজও উক্ত সহরে বিদ্যমান।
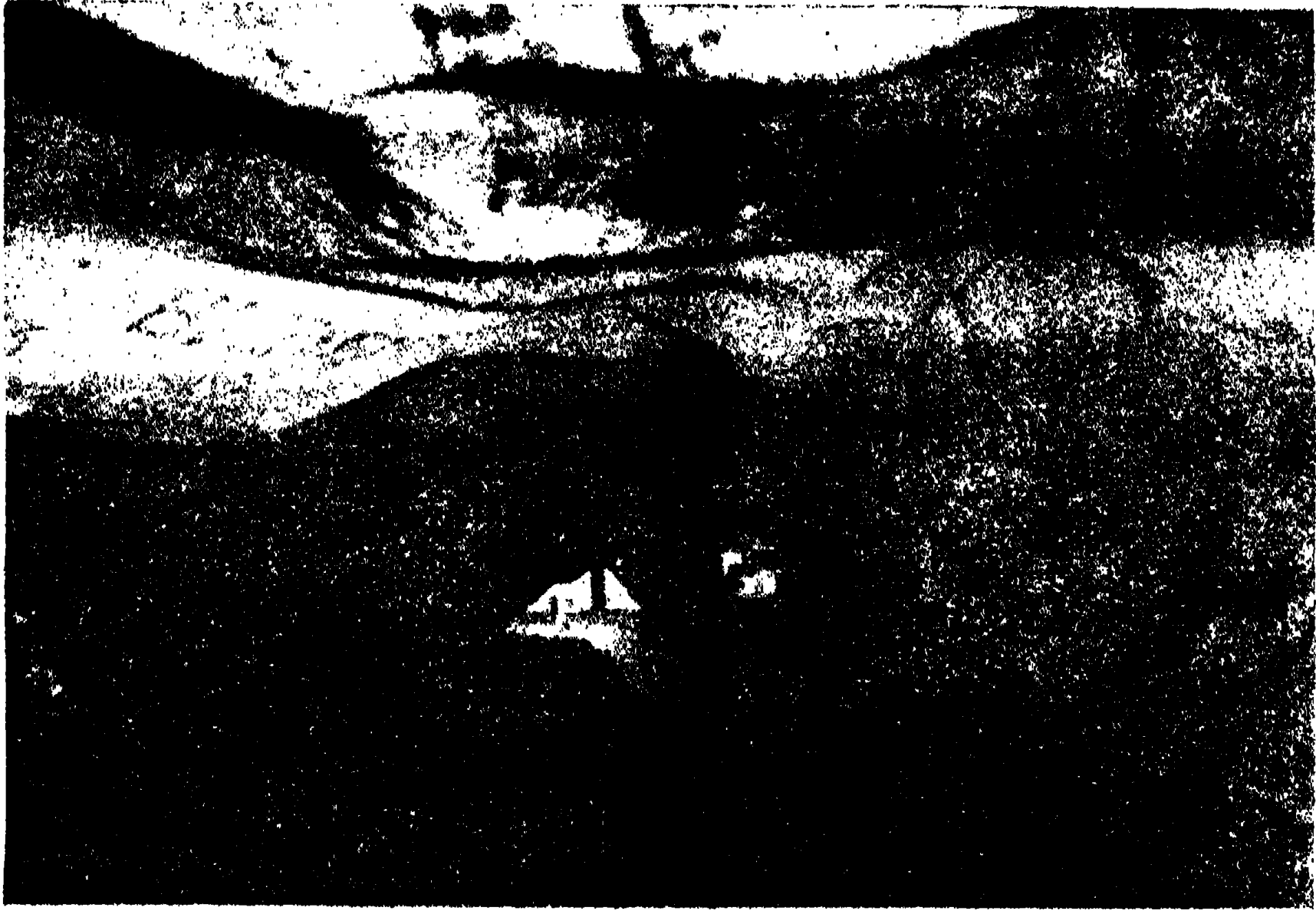
প্রাগৈতিহাসিক জীবের কঙ্কালপূর্ণ ঘরডালাম গুহা

শীতের সময় যে ঝটিকাবর্ত্ত (এই ঝটিকাবর্ত্তের নাম পূর্ব্বে ছিল 'ইউরোক্লাইডন', এখন এর নাম হয়েছে 'গ্রিগেল' অর্থাৎ গ্রীকবাত্যা। সারা শীতকাল ধরে এই বাত্যা মাণ্টাকে বিপর্য্যস্ত করে তোলে) মাণ্টাকে বিপন্ন করে, তারই প্রভাবে ৬২ খৃষ্টাব্দে ভ্যালেট্টা থেকে প্রায় সাত মাইল দূরবর্ত্তী উত্তর পশ্চিমদিকে মাল্টার আদর্শ সেণ্ট পল পোত-ধ্বংস দ্বারা পীড়িত হয়েছিলেন। তারপর ইনি দ্বীপে পদার্পণ-পূর্ব্বক এর প্রধান ব্যক্তি পাব্লিয়াসের পিতাকে রোগমুক্ত করেছিলেন এবং সমগ্র মাল্টায় খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ফরাসীরা এলেন, কিন্তু খুব বেশী দিন এঁদের হাতে মাল্টার কর্ত্তৃত্ব ছিল না— ফরাসীদের কাছ থেকেই ইংরাজরা এদেশ নিয়েছেন।

মাল্টা দ্বীপপুঞ্জের ভিতর গোজোর জনসংখ্যা ২৩,৭৯৬ এবং কমিনোর জনসংখ্যা ৪১ কিন্তু মাল্টায় প্রতি বর্গমাইলে দুই হাজারের উপর লোক দেখা যায়। নৌ, সামরিক এবং বিমানপোত বিভাগের সমস্ত লোক একত্র করলে মাল্টার জনসংখ্যা দাঁড়ায় ২৫৮,৪০০—এজন্য এ'কে পৃথিবীর অত্যন্ত ঘন বসতিপূর্ণ দ্বীপগুলির অন্যতম বলা যায়। যদি মাল্টার জনসংখ্যা কোনদিন ভবিষ্যতে বর্ত্তমান সংখ্যাপেক্ষা আড়াই লক্ষ বেশী হয়, তা' হলে দ্বীপের ক্ষুদ্রায়-তনের মধ্যে সকলের স্থান সঙ্কুলান হবে না।
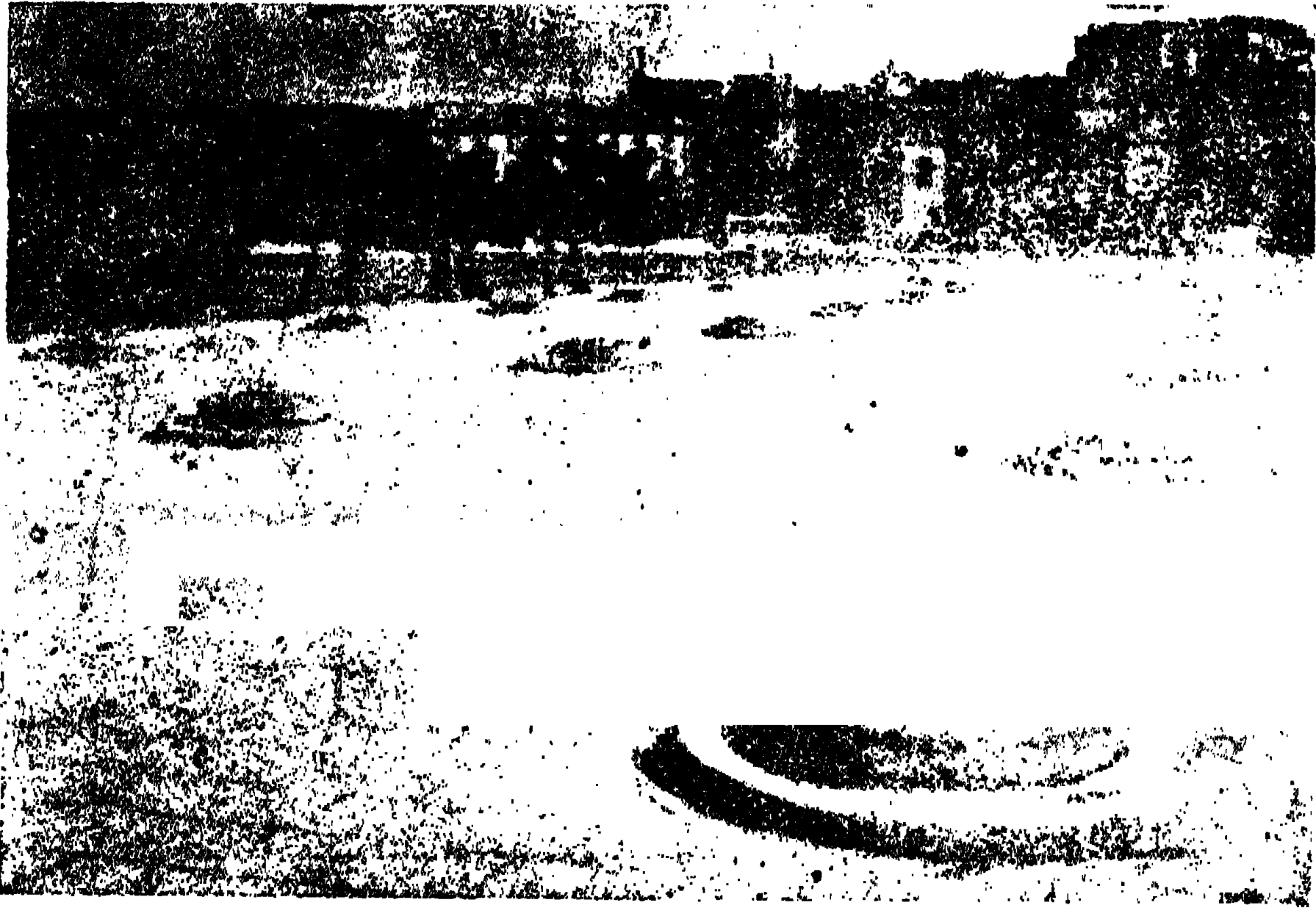
ভূগর্ভস্থ মরাই

মাল্টিজদের ভাগ্যলক্ষ্মী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে' বিভিন্ন জাতির অঙ্কশায়িনী হয়েছে। পৃথিবীর কত জাতি যে এদের প্রাণের ফসল আত্মসাৎ করেছে, তা হিসেব-করে ওঠা যায় না। প্রথমে মাল্টা ছিল ফিনিসিয়দের করতলগত। তারপর কার্থেজরা, রোমানরা, আরবরা, নর্ম্মানরা, আরাগণিজরা এবং ক্যাষ্টিলিয়ানরা দ্বীপপুঞ্জকে শাসন করেছিলেন, তারপর আড়াইশত বছর ধরে ইন্টারন্যাশানাল অর্ডার অব সেণ্ট জন অব জেরুজালেমের হস্তে এদেশের শাসনভার ন্যস্ত হয়। (অনেকে এই অর্ডারের কর্ত্তৃপক্ষগণকে বলেছেন—হস্-পিটালার্স অব রোডেস্ এবং নাইটস্ অব মাল্টা) তারপর

মাল্টার ইতিহাসে বিভিন্ন জাতির আধিপত্য দেখা গেলেও মাল্টিজরা তাদের প্রাচীন সেমিটীয় ভাবধারা ও ভাষাকে ত্যাগ করেনি। প্রাচীন মাল্টীজ ভাষায় নানা যুগে নানা ভাষার শব্দ প্রবেশ করেছে সত্য, কিন্তু সেগুলিকে মাল্টিজরা নিজেদের সেমিটীয় ভাবধারার মধ্যে আপনার করে নিয়েছে। বহুভাষাতত্ত্ববিদের অভিমত হচ্ছে, এ ভাষার ভাববিন্যাস এবং গঠনপ্রণালী ফিনিসীয়—ডিডো এবং হ্যানিবলের ভাষাই মালটিজদের ভাষা।

মালটিজরা পরাধীন হলেও আত্মবিস্মৃত জাতি নহে। এদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য, রীতিনীতি, ঐতিহাসিক সংস্থিতি, প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এবং চারিত্রিক সম্পদ প্রশংসনীয়। যে সব মালটিজ দেশত্যাগী হয়ে এসিয়া এবং আফ্রিকার উত্তর উপকূলে এসে বসবাস করেছে, তারা তাদের আরব ভাষাভাষী প্রতিবেশী-(বিশেষতঃ যারা প্যালেষ্টাইন এবং মোরোক্কোয় বাস করে) দিগের কথা সুন্দর বুঝতে পারে।

প্রস্তর যুগের পর অট্টালিকাদি নির্ম্মাণে নাইটরাই খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গ্রাণ্ড হারবারের একদিকে ভ্যালেট্টা এবং ফ্লোরিয়ানা, অপরদিকে ভিট্টোরিয়োসা, কসপিকিউয়া এবং সেংলিয়া সহর বিভিন্ন সৌধ, দুর্গ, প্রাসাদ এবং গির্জ্জায় পুঞ্জীভূত। এসব স্থানের শিল্প নিদর্শন দেখে বিস্ময়াভিভূত হ'তে হয়।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দ্বীপবাসীরা দুই চাকার পশুশকট ব্যবহার করে আস্‌ছে। এ সব শকট ছোট ছোট ঘোড়া বা গর্দ্দভে টেনে নিয়ে যায় পাথরের রাস্তার ওপর দিয়ে।

মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রাচীন নারীমূর্ত্তি

দ্বীপের প্রধান বন্দর ভ্যালেট্টায় একটি মূল্যবান যাদুঘর আছে। এই যাদুঘরে প্রস্তর এবং তাম্রযুগের বহু আশ্চর্য্য-প্রদ নিদর্শনী রয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিস্ময়কর অতিকায় দেবপ্রতিমাগুলি—মালটার নিওলিথিক ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব কলাকৌশল এসব প্রতিমায় দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন যুগান্তরের প্রাণীকঙ্কাল এখানে সংগৃহীত আছে। এদের আনুপৌর্ব্বিক পর্য্যায়ক্রম রেখেছেন মিউজিয়মের ডিরেক্টর সার থেমিস টোক্সিস জ্যামিট। ইনি বর্ত্তমানে মালটার প্রত্নতত্ত্ববিভাগে নিযুক্ত আছেন এবং ভূগর্ভ খনন করে অতীতের ঐশ্বর্য্য বাহির করতে এঁর অসীম উৎসাহ দেখা যায়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মাল্টাতে এই রকম শকটই চলতো। মাল্টার পাহাড়িয়া বুকে যে সব প্রাচীন পথ পড়ে আছে, তাতে' রয়েছে এখনও সেই অতীত দিনের পথ চলাদের গাড়ীর চক্রাঙ্ক—এই সব চাকার দাগ আট ইঞ্চি গভীর হয়ে গেছে। মাল্টা যখন ফিনিসীয়দের অধিকারে ছিল সে সময়ের দাগও এখন স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। প্রাচীন শকট চলাচলের রাস্তার প্রস্থ হচ্ছে চারি থেকে ছয় ইঞ্চি মাত্র।

প্রাচীন ভেনিসীয় গণ্ডোলার মত মাল্টার ছোট ছোট

ডিঙির আকার ক্রমশ সূক্ষ্মীভূত হয়েছে এবং অগ্রভাগ অস্ত্র ফলকের ন্যায় রূপ ধারণ করেছে। এই সব মনোরম ডিঙি গ্রাণ্ড হারবারের ধারে নেচে নেচে বেড়ায়। সেন্টদের নাম দিয়ে অনেক ডিঙির নামকরণ হয়েছে। এবং অনেক ডিঙিতে চোখ এঁকে দেওয়া আছে। এ রকম ডিঙি অন্য কোন দেশে দেখতে পাওয়া যায় না।

মাল্টাতে রোমান ক্যাথলিকদিগের উপবাস করবার পূর্ব্বকালীন আনন্দোৎসবে—'প্যারাটা' নৃত্য হয় প্যালেস স্কোয়ারে—কোন মুসলমান জলদস্যু কর্তৃক জনৈক মাল্টিজ নব-পরিণীতা হরণের চিহ্ন প্রয়োগ করা থাকে এই নৃত্যে। ২৯শে জুন তারিখে সেন্ট পিটার ও সেন্ট পলের ভোজে বর্ষে বর্ষে নানা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। দর্শকরা মেয়েদের ঘোমটা দেখে অবাক হয়ে যায়—এরূপ অদ্ভুত ঘোমটা কোন মহিলা সমাজে নাই। ঘোমটা দেখে মনে হয় একটা বিস্তৃত
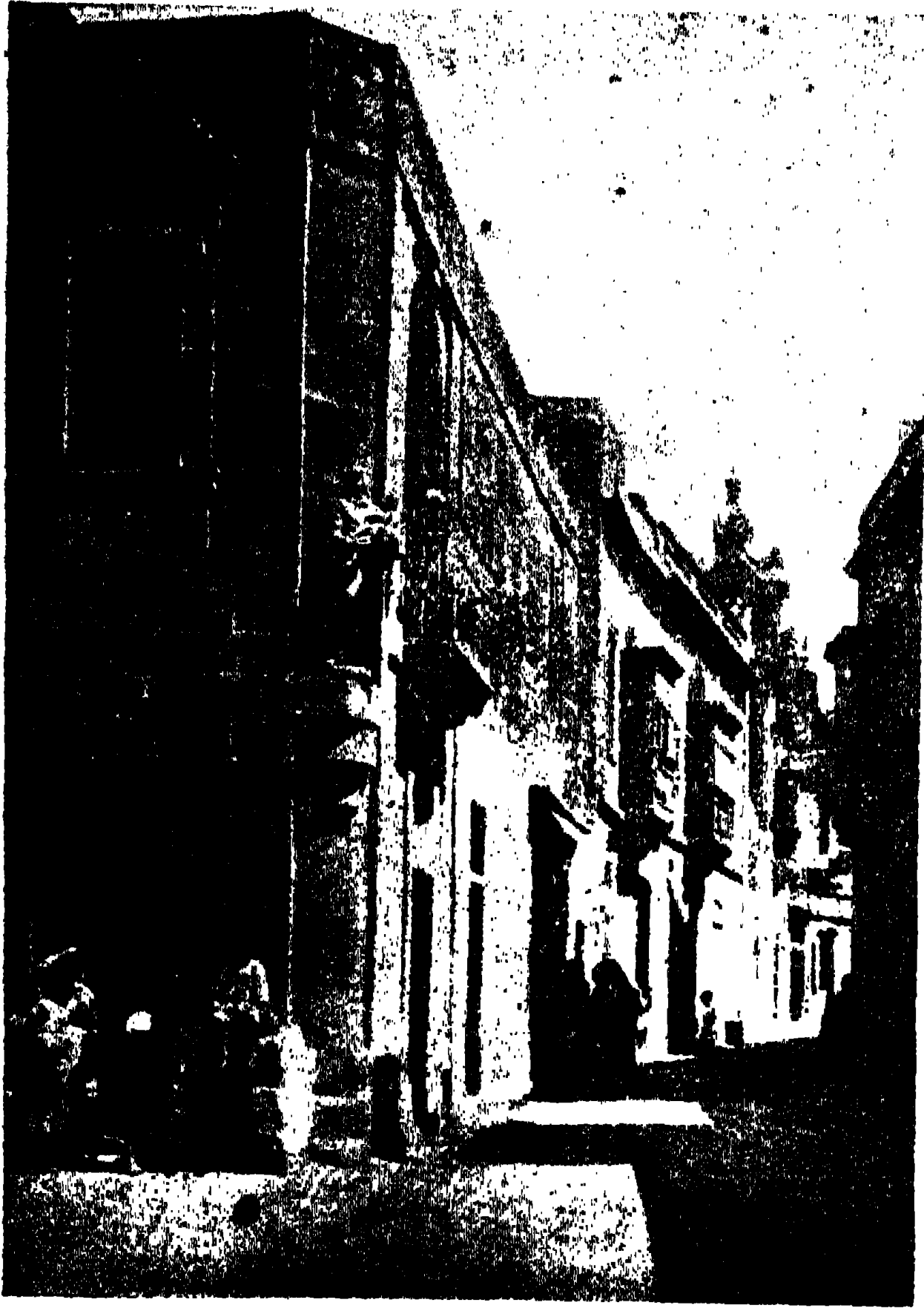
মাল্টার একটি রাজপথ

চাঁদোয়া—ফিটন গাড়ীর হুড বললেও চলে। এখানকার লোকেরা বলে বোনাপার্টের সৈন্যদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য মেয়েরা এই রকম ঘোমটা ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন নেপোলিয়নের সৈন্যরা মাল্টার বুকে সর্ব্বনাশের আগুন জ্বালিয়েছিল বলেই মেয়েরা শোকচিহ্ন-স্বরূপ এ রকম ঘোমটা টেনে দিয়ে থাকেন। মাল্টার রমণীরা ঘোমটা দিতে অভ্যস্ত এবং খুব অল্প কথা বার্ত্তা বলে থাকেন। ছেলেমেয়ের সংখ্যা বেশী। বাল্য-বিবাহও এ দেশে প্রচলিত আছে। পূর্ব্বতন শাসকদের ন্যায় গ্রেটব্রিটেন মাল্টার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার উপর কোন প্রকার সংস্কার আনেনি। মালটিজদের সামাজিক আচার ব্যবহার, ভাষা, পোষাক পরিচ্ছদ, পশু শকট প্রভৃতি যেমন ছিল মাল্টায় ইউনিয়ন জ্যাক উড়বার আগে, আজও তেমনি আছে। সর্ব্বত্র রাস্তাগুলি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। রাস্তায় ধূলা হ'লে লোকেরা ব্যারেলে করে জ'ল ছিটায়।

মাল্টার গ্রামগুলিকে ঠিক গ্রাম বলা চলে না, ছোট ছোট সহর বললেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রামকে মাল্টিজরা 'ক্যাসাল' বলে। ক্যাসালের চতুঃপার্শ্বে বড় বড় বাড়ী এবং সেগুলি ব্যারোক ষ্টাইলে নির্ম্মিত—সঙ্কীর্ণ রাস্তা নানা দিকে চলে গেছে। রাস্তায় দোকান পাটও আছে। গ্রামপ্রান্তে ব্যারোক ষ্টাইলের গির্জ্জা এবং উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা সম্ভ্রান্ত লোকের উদ্যান বাটিকা চিত্তাকর্ষক। মাল্টায় অভিজাত শ্রেণীও আছে—২৫ জনকে পিয়ারের মর্য্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। অভিজাতদের রাজদত্ত উপাধিগুলি বেশ আড়ম্বর-পূর্ণ যেমন—'মার্কুইস অব সেণ্টজর্জ্জ,' 'মার্কুইস টেষ্টাফ্যা-রাটা আলিডিয়ার,' 'ব্যারন অব ঘ্যারিকুজেম এণ্ড টেবিয়া' 'মার্কুইস অব বেন্থুয়ারাট', 'মার্কুইস অব গিয়েন ইস্ সুলতান' ইত্যাদি। মাল্টার গ্রাম্য গির্জ্জাটি মধ্যযুগে ক্লাসিক ষ্টাইলে নির্ম্মিত হয়েছিল। কায়িক ও আর্থিক সাহায্য দ্বারা গ্রামের লোকেরা এ গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। এর গম্বুজটী পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ গম্বুজ বলে উল্লেখযোগ্য হয়েছে। ইস্তাম্বুলের সেন্ট সোফিয়া এবং রোমের সেন্ট পিটারের গির্জ্জার সাদৃশ্য এর ভিতর আছে। রোমান প্যানথিয়নের

গম্বুজের অপেক্ষা এর গম্বুজের আভ্যন্তরীণ অংশ উচ্চতর এবং লণ্ডনের সেণ্টপল গির্জ্জার গম্বুজের ব্যাসরেখাপেক্ষা এর ব্যাসরেখা ষোল ফিট বেশী। মালটিজরা ধর্ম্মপ্রবণ। এরা নিয়মিত ভাবে গির্জ্জায় গিয়ে উপাসনা করে—প্রায় সকলেই রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। সমগ্র মাণ্টা প্রাসাদ এবং গির্জ্জায় পূর্ণ।

শেষ হয়েছে। দরবার কক্ষটী চিত্তাকর্ষক এবং আড়ম্বরপূর্ণ—মোটা পশমী বস্ত্রের উপর মাল্টা অবরোধের সময়ের নানা প্রকার ঘটনাচিত্র অঙ্কিত আছে।

প্রাসাদের একদিকে পাঠাগার—এই পাঠাগারে বহু পাণ্ডুলিপি, গ্রন্থ, রাজকীয় দলিল দস্তাবেজ, মানচিত্র, এবং দেশবিদেশের তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছে। গ্রীষ্মঋতু

মাল্টার অশ্বযান
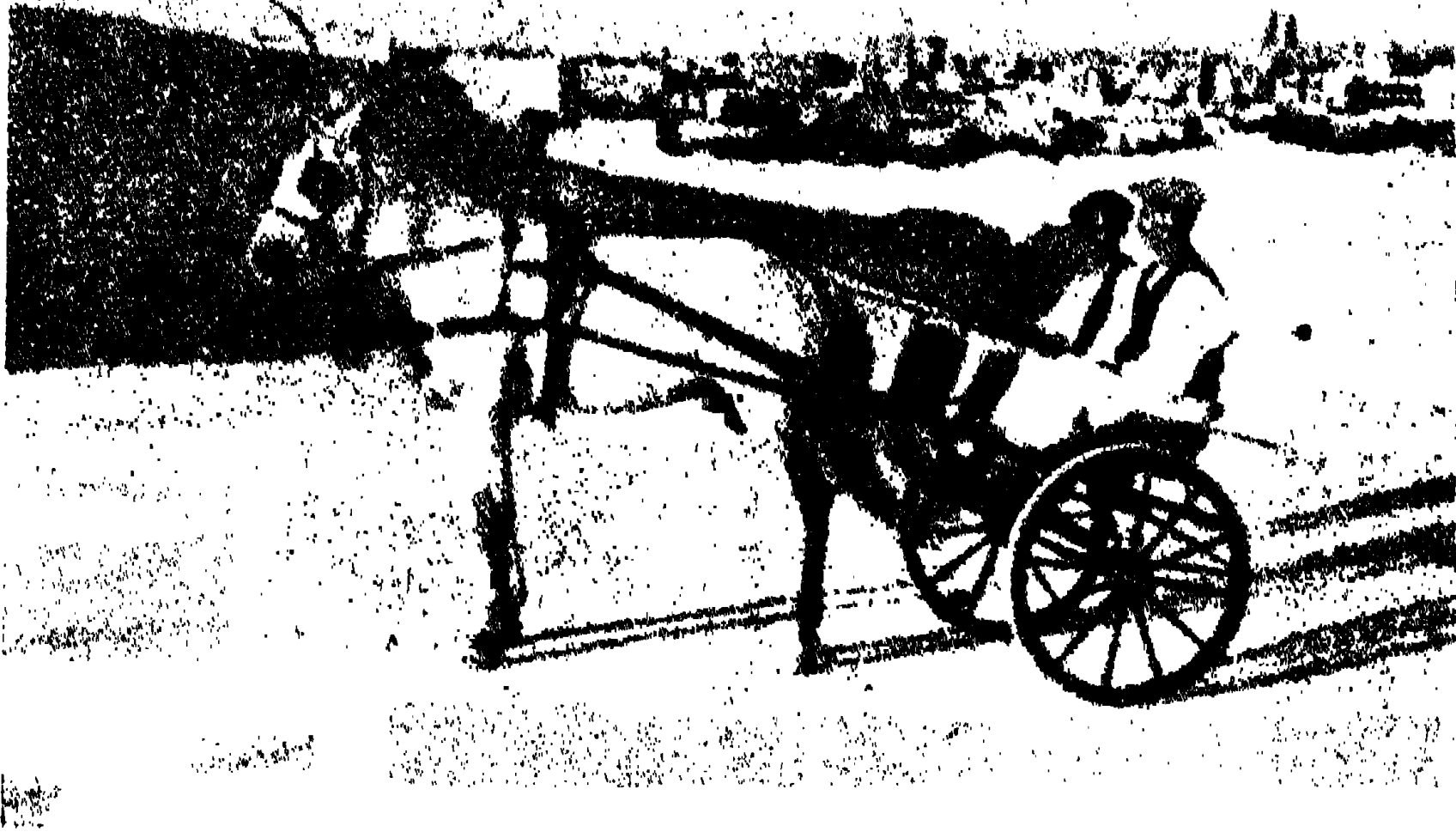
মাণ্টার শাসনকর্ত্তা যে প্রাসাদে থাকেন, সেরূপ রম্য প্রাসাদ অন্য কোন ঔপনিবেশিক শাসনকর্ত্তার ভাগ্যে লাভ হয়নি। ভ্যালেট্টায় মাণ্টার গভর্ণরের একটি বৃহদায়তনের প্রাসাদ আছে। এই প্রাসাদে বহু সুন্দর সুন্দর কক্ষ আছে। একটি কক্ষের ভিতর পৃথিবীতে যত প্রকার যুদ্ধাস্ত্র আছে, তাদেরই সংগ্রহ দেখা যায়। অপর একটি কক্ষে হাতে তোলা নানা রকমের চিত্রবিশিষ্ট পর্দ্দা আছে, তন্মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হচ্ছে বুটিদের গবেলিন তিরস্করণী। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে স্প্যানিশ গ্রাণ্ড মাষ্টার পেরিলোস এগুলি তৈয়ারী করিয়েছিলেন, (নাইটদিগের প্রধানকে চতুর্থ পোপ ইনোসেণ্ট ১২৫২ খৃষ্টাব্দে 'গ্রাণ্ডমাষ্টার' উপাধি দিয়েছিলেন।) কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেল, তবু এরা এখনও নূতন রয়েছে। মনে হয় বুঝি গতকল্য বুননের কাজ

ভিন্ন সব সময়েই সানএন্টোনিওর প্রাসাদে গভর্ণর থাকেন। প্রাসাদটী ভ্যালেট্টা এবং নোটেবাইলের মাঝখানে অবস্থিত। দ্বীপের দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত শাসনকর্ত্তার গ্রীষ্মাবাস। এটীকে ষোড়শ শতাব্দীর ফিউড্যাল ক্যাসল বলা যায়। মাল্টার গ্রাণ্ডমাষ্টার ভারডালা এর নির্ম্মাতা। ইনি যে সৌন্দর্য্যের পূজারী ছিলেন তা আবাসটী দেখলেই বেশ বুঝা যায়।

দ্বীপের প্রায় মধ্যভাগে শৈলময় ঢালুর উপর মধ্য ও রেনেসাঁস যুগের অবিকৃত সহরগুলির অন্যতম সুরক্ষিত বার্জ্জ দাঁড়িয়ে আছে। এর নাম হচ্ছে নোটেবাইল। এই নামকরণের রহস্য আছে। আরাগণের রাজা এলফ্যান্সো এর সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলেছিলেন—'আমার মুকুটে যতগুলি রত্ন আছে তার মধ্যে ইহাই উল্লেখযোগ্য।' নাইটদের আবির্ভাবের

পূর্ব্বে এই নগরী ছিল মাল্‌টার রাজধানী। কনভেণ্ট, গির্জ্জা, পরিখাবেষ্টিত অভিজাতগণের রাজোচিত ঐশ্বর্য্যপূর্ণ প্রাসাদ এবং প্রাচীর-মেখলায় সজ্জিত হয়ে এই নোটেবাইল অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করেছে। এর ছায়াচ্ছন্ন রাস্তাগুলি এতই সঙ্কীর্ণ যে, এদের মস্তকোপরি আকাশের দিকে চেয়ে মনে হয় আকাশটা যেন কতকগুলি নীলরঙের ডোরা মাত্র। নোটেবাইল প্রকৃতপক্ষে অতীতযুগের রত্ন বিশেষ এবং অতীতদিনের শান্তির তীর্থভূমি। সেণ্টপল ক্যাথেড্রলটী দাঁড়িয়ে আছে যেখানে পাব্লিয়াস বাস করতেন এবং সেণ্ট-পলের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই গির্জ্জার সন্নিকটে একটি কুঞ্জ আছে। যতদিন ঋষিবর পল মাল্‌টায় ছিলেন ততদিন তিনি এখানে বাস করেছেন। এর কাছে শৈলোপরি রয়েছে প্রাক্ খৃষ্টীয় যুগের ভূগর্ভস্থ সমাধিস্থান।

শাক-সব্জী প্রসিদ্ধ। এখানকার উৎপন্ন শস্যদ্রব্য হ'তে দেশবাসীর বার্ষিক খাদ্য শস্যের অভাব পূর্ণ হয় না বলে অন্যদেশ থেকে শস্যাদি আমদানী করা হয়ে থাকে।

ভ্যালেট্টা এবং ফ্লোরিয়ানার মাঝামাঝি মুক্ত স্থানে ভূমধ্যস্থ শস্যগোলা রয়েছে। নাইটরা এই সব শস্যগোলা সারি সারি নির্ম্মাণ করেছিলেন এবং এদের মধ্যে সমগ্র দ্বীপের শস্য মজুত রাখতেন দ্বীপবাসীদিগকে খাওয়াবার জন্য। এখনও পর্য্যন্ত এই সব গোলায় শস্য মজুত রাখা হয়। গোলার মুখ পাথরের গোল ঢাকনি দিয়ে ঢাকা থাকে এবং দেখতে ঠিক টুপির মত। গম এবং যব দ্বীপের দশ হাজার যোতের জমিতে উৎপন্ন হয় কিন্তু কিছু শস্য এই সব ভাণ্ডারে সংরক্ষিত থাকে। আবশ্যক না হ'লে, এ সব শস্য ভাণ্ডার থেকে গ্রহণ করা হয় না।
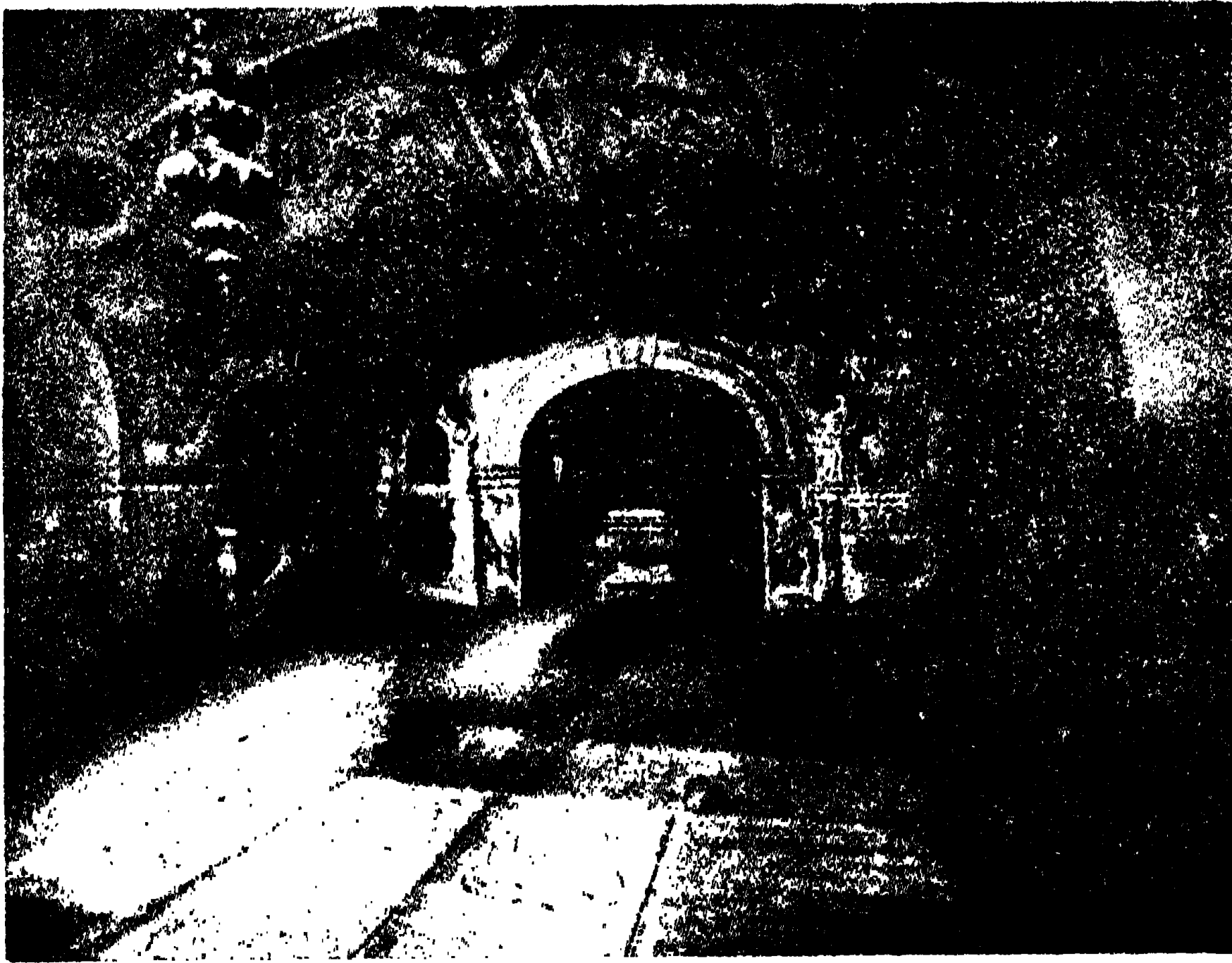
সেণ্ট জন ক্যাথিড্রালের অভ্যন্তরভাগ

মাল্টা দ্বীপপুঞ্জের প্রধান শিল্প হচ্ছে কৃষি এবং এখানকার জমিতে অজস্র পাথর থাকা সত্বেও, মালটিজরা কৃষি বিদ্যায় এরূপ পারদর্শী যে, জমি থেকে পাথর বের করে সুন্দরভাবে ফসল ফলিয়ে থাকে। কৃষিকার্য্যে এ দেশের প্রাচীন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হয়নি। মাল্টার আলু, কমলালেবু এবং

এ দেশের উৎপন্ন তুলা থেকে কাপড় তৈরী হয়। লেসের কাজের জন্য মাল্‌টা বিখ্যাত। শীত ঋতুতে মাল্‌টা এবং গোজো সুন্দরভাবে সবুজ রূপ ধারণ করে এবং মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে যখন ক্লোভার তৃণের ফুল ফোটা সুরু হয়, তখন এরা রাঙা রঙে বাউল সেজে থাকে। সিসারো

মাল্টার নাম দিয়েছেন 'মধু ও গোলাপের দেশ' এবং মালটিজরা তাদের দেশকে বিশ্ব-কুসুম বলেছে, কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য হয়ে যাই এই ভেবে, কেন এই সব নাম দিয়ে মাল্টার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং তরু-গুল্মাদির বর্দ্ধনশীল অবস্থা দেখে যদি এরূপ নাম দেওয়া হয়ে থাকে, তা হ'লে অতিশয়োক্তি ব্যতীত আর কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু এর ভূমধ্যসাগর-গর্ভে অবস্থান, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আব-হাওয়া, আচার ব্যবহার বা আকৃতি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মনোজ্ঞতা-বশতঃ এবং এর প্রতি স্নেহাকর্ষণ হেতু যদি এরূপ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে তা হ'লে—অন্যায় কিছু বলা হয়নি বলে স্বীকার্য্য। তবে এটা ঠিক যে, সিসারোর কথা আমাদের কাছে হেঁয়ালি হয়েই রইলো

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

কেন ?

শ্রীনরেন্দ্রকুমার পাল

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত অর্চ্চনার বিয়ে হোয়ে গেলো। বহু কষ্টে ও বহু চেষ্টার পর অর্চ্চনার দু'টী প্রত্যাশী ও দুর্ব্বল হাত স্থান পেলো দু'টী বলিষ্ঠ হাতের মধ্যে।

গোধূলিতেই বিয়ের লগ্ন ছিল। সন্ধ্যের একটু পরেই সব কিছু অনুষ্ঠান শেষ হোয়ে গেলো। বর-বধূ গিয়ে ঢুকলো বাসর-ঘরে। বিভিন্ন বয়সের ও বিচিত্র বর্ণের বহু মেয়ে ও মেয়ের মা'দের সমবেত কলকণ্ঠে সমস্ত ঘরটা যেন কলকলিত হোয়ে উঠলো।

এদিকে বাইরেও প্রায় সমস্ত নিস্তব্ধ হোয়ে এলো ধীরে ধীরে। নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগতদের যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়ন ও খাওয়া-দাওয়ার পালা শেষ হোয়ে গেছে। মাঝে মাঝে খালি ঝঙ্কৃত হোয়ে উঠছে ঝি-চাকরদের বিরক্তি-পূর্ণ-কণ্ঠস্বর—আর এখানে ওখানে গ্যাসের আলোগুলো জ্বলছে দপ্ দপ্ ক'রে। অর্চ্চনার মাও হয়ত সেই অবসরে নিরিবিলি কোথাও গিয়ে বসলেন, দুঃখে ও আনন্দে চোখের জল মুছতে।

সারা দিনের পর আমিও এইবার একটু নিশ্বাস ফেলবার সময় পেলাম। শ্রান্ত দেহ মনকে টেনে এনে একেবারে বাইরের খালি রকের ওপর এলিয়ে দিলাম।

শুক্লপক্ষের কোন তিথি ছিল হয়ত সেদিন। চাঁদ ঢ'লে পড়েছে আকাশের এক কোলে অতি ম্লান ভাবে। বাতাসের গতিও কেমন যেন মন্থর। রাস্তার ধারে উচ্ছিষ্ট এঁটো পাতার গাদার পাশে কুকুরগুলোও শুয়ে পড়েছে ক্লান্ত ভাবে। মাথার ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে উড়ে যাচ্ছে দু' একটা বাদুড়—ডানার শব্দে যেন জড়তার অলস আভাষ। অশত্থ গাছের ফোকর থেকে বিকট চীৎকার ক'রে উঠলো একটা পেঁচা। থেকে থেকে ভেসে আসছে বাসর-ঘরের কলরোলের ক্ষীণ শব্দ।

বেশ ভালো লাগছিল—সমস্ত দিনের ব্যস্ততা ও মুখরতার পর বেশ ভালো লাগছিল এই সব। আরামের মধুর জড়িমায় তন্দ্রা আসছিল নেমে।

হঠাৎ এক সময়ে মনে হ'লো সব কিছু যেন অত্যন্ত নিস্তব্ধ—অতি ভয়ানক ভাবে নিস্তব্ধ। আলোড়নের পর ক্ষুব্ধ বনানীর অবসাদগ্রস্থ নিস্তব্ধতা—হাতের মুঠোর মধ্যে ছোঁয়া যায় যে-নিস্তব্ধতা। আলোগুলোও যেন চেয়ে আছে কী রকম করুণ অসহায়ভাবে। চাঁদও নেমে গেছে আরও নীচে পাংশুতর হোয়ে।

জীবনেও তো আসে একদিন এই রকম নিস্তব্ধতা আর অবসাদ। চাঁদও তো এই রকম ঢ'লে পড়ে একদিন বিবর্ণ

হোয়ে। বাতাস হোয়ে ওঠে ভারী। শুধু গ্লানি আর অন্ধকার জড়িয়ে যায় কোষে কোষে। কিন্তু কেন এ রকম হয়? পৃথিবীর তো চলে ঠিক সেই একই পরিক্রমণ।

অর্চ্চনাকে—হ্যাঁ অর্চ্চনাকে একদিন তো আমি ভালো বেসেছিলাম। শৈশব থেকে কৈশোর পর্য্যন্ত প্রতিটী দিন পরিপূর্ণ হোয়ে উঠেছিল অর্চ্চনার নিবিড় সাহচর্য্যে আর প্রাণের ফেনিল উচ্ছ্বাসে। এবং সেই পরিপূর্ণতা থেকে জন্ম নিয়েছিল ভালো লাগা। তারপর একদিন যৌবনের রক্ত-পরশে সেই ভালো-লাগা রূপান্তরিত হ'লো ভালোবাসায়।

কিন্তু কী সার্থকতা এলো এই ভালোবাসায়? কী এবং কতটুকু পেলাম অর্চ্চনাকে ভালোবেসে? শুধু শ্রান্তি আর হতাশা আর স্মৃতির দুঃসহ বোঝা।

অর্চ্চনাকে দাবী করবার মত সমস্ত অধিকারই তো আমার ছিল। ছিল পরিচয়ের সরলতা, স্নেহের গাঢ়তা, প্রাণের ঐকান্তিকতা—সবই তো ছিল। অথচ সত্যের অধিকার হ'লো নিরর্থক ও মূল্যহীন—শুধু সমাজ ও সংস্কারের দাবী হ'লো বড়। যা' হোতে পারতো অতি সুন্দর ও সহজ তা'ই হোয়ে গেলো-চির গরমিল ও ছন্ন ছাড়া শুধু তুচ্ছ একটু সামাজিক পার্থক্যের জন্যে, মিথ্যার সামান্য একটা রেখার ব্যবধানে। সত্য হ'লো অবান্তর, সংস্কার হ'লো বড়।

চাঁদ ডুবে গেছে। নেমেছে অন্ধকার। নিঝুম, রাত্রি যেন মুখ লুকিয়ে কাঁদছে। আর কান্নার সেই মৌন প্রতি-ক্রিয়া নিয়ে অতীত যেন জমা হচ্ছে আমার মস্তিষ্কের মধ্যে। মস্তিষ্ক থেকে নেমে চোখের সামনে খুলছে তা'র রীলের পর রীল—

ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরার সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেহ ও দেহা-বরণ সম্বন্ধে হঠাৎ যেন একদিন অর্চ্চনা অত্যন্ত সচেতন হোয়ে উঠলো। দেহের রক্তের মধ্যেও হয়ত বা এলো তরলি-মার হাল্‌কা স্রোত। তাই তা'র গতির মধ্যে বেজে উঠলো তারল্যের লঘু ছন্দ, প্রতি পদক্ষেপ আর অঙ্গ সঞ্চালনে লীলায়িত তরঙ্গ। কণ্ঠে প্রথম ভাষা-পাওয়া নতুন পাখীর মত তা'রও কণ্ঠ যখন-তখন সময়ে-অসময়ে রণিত হোয়ে উঠত—'সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি'।

মাঝে মাঝে ঠাট্টা ক'রে বলতাম—এরই মধ্যে 'সুন্দর', 'মম গৃহ', 'পরমোৎসব রাতি' প্রভৃতি কথাগুলোর মানে বুঝে ফেল্লে অর্চ্চনা? নাঃ, তোমরা দেখছি সত্যিই অকালে পাকো।

কোন উত্তর না দিয়ে হাসতে হাসতে আগিয়ে চলতো তা'র সুরের লহর—'রেখেছি কনক-মন্দিরে কমল-আসন পাতি'।

অর্চ্চনার মা-ও মাঝে মাঝে অস্থির হোয়ে উঠতেন মেয়ের এই সুর ভাঁজার ঠেলায়। বিরক্ত হোয়ে বলতেন—পোড়ারমুখীর সংসারের একটা কাজ করা নেই, কিছু নেই, খালি প্রজাপতির মত ডানা মেলে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছেন—সুন্দর মম—সুন্দর মম। একটা কুটো ভেঙ্গে তো দু'খানা করবার ক্ষমতা নেই—টের পাবে বিয়ে হ'লে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে।

মা হয়ত তখন ভুলে গেছেন তাঁর জীবনে কবে এসেছিল প্রজাপতির মিছিল, হয়ত ভুলে গেছেন তা'দের ডানার বিচিত্র বর্ণ। প্রজাপতির দেবতা তাঁর চলে গেছে অনেক—অনেককাল আগে। তাই তিনি সময়ে সময়ে ক্রুদ্ধ হোয়ে উঠতেন মেয়ের ওপর। কিন্তু আমি তো জানতাম, হঠাৎ এক সময়ে কেন চঞ্চল হোয়ে ওঠে নদীর জল, তরুশিরে কী ধ্বনি বাজে দখিনের প্রথম পরশে। হাসতে হাসতে বলতাম—আহা থাক্ না মা, যে ক'টা দিন প্রজা-পতির মত উড়ে উড়ে কাটে সেইক্'টা দিনই ভালো। তা' ছাড়া যত কিছু কাজ-কর্ম্ম শিখে যত বড় পাকা গিন্নী হোয়েই যাক না কেন আপনার কাছ থেকে, অকেজো বদনাম বাঙালীর মেয়ের কোনদিনই ঘুচবে না শ্বশুরবাড়ী থেকে।

—তাই সারা দিন রাত মৌমাছির মত কেবল গুণ গুণ ক'রে বেড়াবে?

—গুণ গুণ ক'রে বেড়াবার এইত বয়স। এর পরে কী আর করবে? এমন কি তখন হাজার চেষ্টা ক'রলেও আপনি তার মুখ দিয়ে সুন্দরের 'সু' অক্ষরটাও বের করতে পারবেন না।

হ্যাঁ সত্যিই তখন অর্চ্চনার গুণ গুণ করবার বয়েস। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে—আলো ও আঁধারের মিলিত মোহনায় এসে দাঁড়িয়েছে তখন অর্চ্চনা। প্রভাতী তারার ছায়াচ্ছন্ন আলোর রেখা যদিও এসে পড়েছে তা'র ওপর, অস্পষ্টতার ধোঁয়াটে কুয়াসা তখনো অপসারিত হয়নি একেবারে? তাই আসন্ন প্রভাতের সুস্পষ্ট বাণীর শুধু ক্ষীণ আভাস জাগে তা'র সুরের ব্যঞ্জনায়—'সুন্দর মম.........'

কিন্তু কতক্ষণ থাকে ভোরের অস্পষ্টতা—ধরতে পেরেও ধরতে না পারার রহস্য? রাত্রি শেষের ধূম্র কুহেলি, সে আর কতটুকু অংশ জুড়ে থাকে জীবনের? ধীরে ধীরে আসে ভোরের বাতাস—চলে দেবতার মঙ্গল ব্যজন। পূবের তোরণদ্বারে পড়ে শুভ্র আলপনা। দেবতা আসেন বেরিয়ে —সূর্য্য আসে রক্ত রথে। সব কিছু তখন নগ্ন ও স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও দীপ্ত। দিক্ থেকে দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে আলোর বাণী। ব্যস্ত হোয়ে ওঠে সকলে জীবনের উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহে। দিঘীর বুকে আঁখি খোলে শতদল, মাটীর বুকে ঘোমটা খোলে সূর্য্যমুখী।

দেখতে দেখতে অর্চ্চনার দেহেও এলো যৌবন—শিরায় শিরায় এলো যৌবনের লাভাস্রোত। সমস্ত অবয়ব ঘিরে ফুটে উঠলো সৃষ্টির সেই আদিম ও অবাধ্য ইঙ্গিত। আঁখি-তারকায় এলো সুদূরের অনুসন্ধিৎসা। বুকের রোমাঞ্চ আবেশ গিয়ে এলো ভীরু আকুতি। সূর্য্য—হ্যাঁ সূর্য্য উঠলো তা'র নীল রহস্য-ভরা সমুদ্রের তলদেশ থেকে। জড়িত-তন্দ্রা ভেঙে দাঁড়ালো সে আলোকের রাজপথে। আলোকের সেই প্রকাশ্য প্রভায় চিনলো নিজেকে—না—ভালবাসলো নিজেকে, Narcissus যেমন ভালোবেসেছিল নিজেকে। তাই একটুও ইতস্তত না ক'রে আপনার কাছে আপনিই রইল—যা' তা'র প্রথম চাইবার। আর প্রথম চাওয়ার সেই বন্য উন্মাদনা সত্যই ভয়ঙ্কর।

স্কুল ছাড়িয়ে মা তা'কে বসিয়ে দিলেন ঘরে। অর্চ্চনাও যে তা'তে বিশেষ আপত্তি করল তা' নয়। নিজের দেহের কাছে সে নিজেই কেমন যেন সঙ্কুচিত হোয়ে পড়ত। তাই সদা-সর্ব্বদাই তা'র সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতো দেহ আর দেহের শাড়ীর ওপর। কণ্ঠও যখন তখন ঝঙ্কৃত হোয়ে উঠতো না। অনেক পীড়াপীড়ি করলে গান হয়ত একটা গাইত, কিন্তু তা'র সেই 'সুন্দর মম......'নয়, অন্ততঃ পাঁচজন লোকের সামনে ও গানটা আর সে মোটেই গাইত না। সংসারের খুচরো কাজ-কর্ম্মও যথেষ্ট আরম্ভ করল। সর্ব্বদাই চায় একটা কিছুর মধ্যে নিজেকে আটকে রাখতে। চলার মধ্যে থেকেও অন্তর্হিত হ'লো চটুল ভঙ্গী, বরং কেমন যেন একটু মন্থরতায় ভারী হোয়ে এলো—ব্যক্তিত্বভরা মন্থরতা। সেই কারণে মায়ের বিরক্তিও বড় একটা ঘটতো তা'র ওপর।

যাই হোক, মায়ের বিরক্তির কারণ বিশেষ কিছু না থাকলেও, চিন্তান্বিত তিনি যথেষ্ট হোয়ে পড়লেন অর্চ্চনার জন্যে। বিয়ে দিতে হবে মেয়ের। সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের মেয়ে কতদিন আর ঘরে রাখা যায়? তার ওপর সে রকম অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে নয় যে, পয়সার জোরে তাড়াতাড়ি একটা গতি হোয়ে যাবে। আপনার বলতেও সে রকম কেউ কোথাও নেই যে, একটু আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করবে। নিজেই যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন একে ওকে অনুরোধ করে। আমিও পাঁচজন বন্ধু বান্ধবদের ব'লে ক'য়ে দেখতাম। অবশ্য মা আশা করতেন না যে, তাঁর মেয়ে খুব বড় ঘরে পড়ুক এবং অপরিমিত সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাক্। সে রকম তিনি চাইতেনও না। তিনি শুধু চাইতেন, ছেলেটী স্বভাব, চরিত্রে এবং গুণে সুন্দর—ব্যস্, তা' হোলেই হ'লো। মনের দিক দিয়ে অর্চ্চনা যদি সুখে থাকে সেই যথেষ্ট—যে যদি খড়ের চালের মধ্যে একবেলা খেয়ে হয় সেও ভালো। তাঁর মতে, নিজের শক্তি এবং অবস্থা ছাড়িয়ে খেয়ালের বশে হঠাৎ একদিন ওপরে উঠে বসলে, পরে আসে শুধু ব্যথা আর গ্লানি আর হতাশা। পূজার বেদীতে যা'র স্থান সেকী কখনো সামঞ্জস্যপূর্ণ হ'তে পারে প্রসাধন-কক্ষের Flower Vase এর মধ্যে?

সময় গড়িয়ে চললো, আর সেই সঙ্গে বিফল চেষ্টার প্রতিক্রিয়া জাগতে থাকে অর্চ্চনার চোখে মুখে। মুখ ফুটে কিছু না বললেও অনেক সময় শুধু তা'কে দেখে বুঝতে

—কিন্তু সত্য যেখানে পরীক্ষিত ও প্রভাবিত, সেখানে?—করুণ জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে থাকতো আমার পানে।

এবং অবিশ্বাস্য। বিয়ে জিনিষটা তা'দের কাছে ব্যবসার রূপান্তর ছাড়া কিছুই নয়। শেষ পর্য্যন্ত অনেক ঘোরাঘুরি দেখা শোনা ক'রে যখন দেখলাম, আজও তথাকথিত শিক্ষিত ও ভদ্র সমাজের মধ্যে এই হীন বণিকী মনোবৃত্তি রীতিমত শিকড় গেড়ে আছে, তখন বুঝলাম রূপ ও গুণের দিক দিয়ে অর্চ্চনা যত বড়ই হোক না কেন, শুধু যথেষ্ট পয়সা না থাকার দরুণ বিয়ে হোতে তা'র বেশ বেগ পেতে হ'বে।

এদিকে নানারকম দুশ্চিন্তায় ও নিজের অসহায়ত্বে মায়ের শরীরও দিন দিন ভেঙে পড়তে লাগলো। চোখ মুখ বিবর্ণ হোয়ে উঠলো। কিন্তু কী-বা করা যায়? কিছুই ভেবে পেতাম না সান্ত্বনা বা আশ্বাস দিতেও ভরসা হোত না। অর্চ্চনাও বুঝতে পারতো সব কিছু। বুঝতে পারতো তা'কেই কেন্দ্র ক'রে কত বড় একটা বেদনার আলোড়ন সৃষ্টি হ'য়েছে। আড়ালে ব'সে তাই ফেলতো চোখের জল, আর নিজের ভাগ্যকে দিত অভিশাপ। মায়ের পাংশু অসহায় মুখের পানে চেয়ে কিছু বলতে পারতো না। মাঝে মাঝে খালি আমার সামনে এসে দাঁড়াতো, বলত—বিয়েটা না দিলেই কী চলত না অপুদা? কী দরকার এত হীনতা ও নীচতা স্বীকার করবার?

হাসতে হাসতে তাকে বুঝিয়ে বলতাম—না 'অর্চ্চনা, বিয়েটা না দিলেই চলে না। বিয়েতেই তোমাদের সার্থকতার আর এইটেই হচ্ছে সৃষ্টির আদিম সত্য।

কে যেন কেঁদে কেঁদে ব'লে উঠত—কী করব বলো অর্চ্চনা। সামান্য একটা মিথ্যা অন্তরায় যদি না থাকতো তোমার আমার মধ্যে, তা' হোলে অনেক দিন আগেই যে তোমার হাত দু'টী আমার হাতের মধ্যে নিয়ে বলতে পারতাম—এসো অর্চ্চনা, তুমি এসো আমার পাশে। মাকেও তো বলতে পারতাম নিশ্চিন্ত আরামের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে—অর্চ্চনাকে আমিই নিলাম মা। কিন্তু—কিন্তু—

রাত্রির মধুর স্পর্শে তারপরই ঘুম নেমেছিল কখন শ্রান্ত দেহ মন ঘিরে ভোরের শিরশিরে বাতাসে ঘুম ভেঙে গেলো।

একটু বেলা হোতেই বাড়ীর মধ্যে আবার খানিকটা ব্যস্ততা ও চাঞ্চল্যের সাড়া প'ড়ে গেলো। বর-বধূ যাত্রা করবে শুভ লগ্নে। অর্চ্চনা যা'বে তা'র নব-জীবনের সঙ্গে পরিচিত হোতে।

সকলে মিলে অর্চ্চনাকে সাজিয়ে দিল—যেন মহিয়সী রাণী, দীপ্তিময়ী নারী।

যাত্রার সময় যতই আসন্ন হোয়ে আসে, আমার মনের মধ্যেও ততই জ'মে উঠতে থাকে জলভরা মেঘ অর্চ্চনাকে তাই যথাসম্ভব এড়িয়ে বাইরে ঘুরছিলাম।

শেষে যাত্রার সব কিছু খুচরো অনুষ্ঠান সেরে অর্চ্চনা এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। দু' এক মিনিট রইলো মাথা নীচু ক'রে। মনে হ'লো, কী যেন বলতে এসেও

পারলো না। শুধু প্রসাধন-পুষ্ট গালের ওপর ভিজে দাগ কেটে হুহু ক'রে ব'য়ে চলেছে চোখের জল।

তারপর আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে বল্‌ল—চললাম অপুদা'। অনেক কষ্ট দিয়ে গেলাম তোমাকে, ক্ষমা ক'রো।

পেছন ফিরে চ'লে গিয়ে দু' এক পা আবার থম্‌কে দাঁড়ালো। আগিয়ে গিয়ে শুধোলাম—আর কিছু বলবে অর্চ্চনা?

ডান হাতখানা আমার চেপে ধ'রে বলল—আর আশীর্ব্বাদ ক'রো জীবনে যেন কোনদিন শক্তি ও সাহসের অভাব না হয়।

—কিন্তু আশীর্ব্বাদ করবার মত যোগ্যতা, সে ক্ষমতা কী আমার আছে অর্চ্চনা?—তার ভীরু হাতের কম্পিত পরশ আমায় মুক ক'রে দিলো।

ষ্টেশন পর্য্যন্ত গেলাম তাঁ'দের সঙ্গে। সব কিছু গোছগাছ ক'রে গাড়ীতে তুলে দিয়ে দাঁড়ালাম প্ল্যাটফর্ম্মের ওপর। গার্ডের শেষ বাঁশীর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ছাড়লো আস্তে আস্তে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অর্চ্চনা চেয়ে আছে আমার পানে। তা'র সেই মূর্চ্ছিত দৃষ্টি আর ঠোঁটের মৌন কম্পন যেন আকুল আবেদন জানিয়ে বলছে—ভুলো না অপুদা', ভুলো না তোমার অর্চ্চনাকে।

নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলাম না। প্রকাশ্য প্ল্যাটফর্ম্মের ওপর দাঁড়িয়েই ছেলেমানুসের মত চোখের জল পড়ল টপ্‌ টপ্‌ ক'রে গড়িয়ে—না না অর্চ্চনা, চিরদিনই প্রার্থনা করব তোমার জন্যে—সুখে থাকো।

ট্রেণ তখন অর্চ্চনাকে নিয়ে দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেছে।

* * * *

তারপর এক এক ক'রে অনেক, অনেকগুলো দিন গেছে গড়িয়ে। পুরো পাঁচ বছর গেছে কেটে। পরিবর্ত্তনশীল দুনিয়ায় এসেছে কত পরিবর্ত্তন। কত অসংখ্য জীবন এসেছে আর গেছে দুনিয়ায় ও দুনিয়া থেকে। কত হাসি কান্না জ'মে জ'মে গ'ড়ে উঠেছে কত নীহারিকাপুঞ্জ। কত গ্রহ উপগ্রহ হয়েছে কক্ষচ্যুত। কত আইস্‌ল্যাণ্ড আর কুইনস্‌ল্যাণ্ড জেগেছে সমুদ্রের তলদেশ থেকে। আবার কত য়্যাট্‌লান্‌টাসের বুকে জেগেছে য়্যাট্‌লান্টিক্‌।

পরিবর্ত্তনের এই ঘূর্ণিপাকে আমারও জীবন কতবার ডুবেছে আর জেগেছে। অর্চ্চনার মা-ত হারিয়ে গেছেন কবে। শুধু স্মৃতি তাঁর অক্ষয় হ'য়ে আছে আমার অন্তরে। অর্চ্চনাও ছিটকে প'ড়ে আছে পৃথিবীর কোন এক কোণে, কে জানে। আর এক কোণে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ওপর ভেসে চলেছে আমার ফুটো নৌকা।

অনাবৃত জীবনের উন্মুক্ত দিগন্তের পরে দাঁড়িয়ে দেখেছি কত সূর্য্যোদয় আর সূর্য্যাস্ত, কত প্রগলভ রাত আর নিষ্ঠুর দিন। কত ফাগুনে দেখেছি রূপ ও রসের মদির উচ্ছ্বাস, আবার কত বর্ষায় ব্যর্থতার সজল সমারোহ। দেশ ছেড়ে ঘুরেছি কত দেশান্তরে। কত সহর আর গ্রাম, কত মরু আর প্রান্তরে কেটেছে কত আশা ও নিরাশার দিন। জ্যোৎস্না-হসিত নিস্তব্ধ রাতে তাজমহলের পাদদেশে ব'সে শুনেছি কা'র পায়ের ধ্বনি, কে যেন ঘুরে ঘুরে কাতর স্ব ব'লে যাচ্ছে—'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া কাঞ্চনজংঘার অভ্রংলিহ শীর্ষের পানে তাকিয়ে ভেবে মানুষের অস্পষ্ট ও অবরুদ্ধ জীবনের প্রতি কী দারুণ অবজ্ঞা আবার যখন মানুষের মাঝে ঘুরেছি, পেয়েছি কত তথ্য তত্ত্বের পরিচয়। মানুষের মাঝেই দেখেছি দেবত্বের বিকা আবার পশুত্বের আবিলতা। ছন্দোহীন জীবনকে কতব চেষ্টা করেছি ছন্দোবদ্ধ করতে, কিন্তু পারিনি। পথের সা তাই পথেই ছড়িয়ে দিয়েছি বারে বারে।

তারপর একদিন আবার সব কিছু ফেলে ছে'ড়ে সব বি ত্যাগ ক'রে ফিরে এলাম দেশে। ভাবলাম—যে-ম থেকে পেয়েছি পরমায়ু, সেই মাটী থেকেই সংগ্রহ ক পাথেয়। তারপর একদিন মাটীর দান মাটীকেই ফিরি দিয়ে হ'ব ঋণমুক্ত।

হৃত জমিজমা কিছু পুনরুদ্ধার ক'রে, বাড়ীতে দ দুয়েক তাঁত বসিয়ে চলে যায় কোন রকমে। প্রয়োজনের প্রাচুর্য্য নেই, তাই অভাবের তাগিদও নেই। অবসর সময়ে পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসাই গল্পের আসর। কাগজ-পত্র থেকে প'ড়ে প'ড়ে শোনাই দেশ বিদেশের নতুন

কথা। বলি নিজেদের দেশের ও জাতির অতীত ও বর্ত্তমানের সুখ দুঃখের কাহিনী।

মাঝে মাঝে অর্চ্চনাদের বাড়ীটার দিকে তাকাই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুক থেকে, অলক্ষিতে কখনো কখনো চোখের জলও পড়ে গড়িয়ে। বাড়ীর ঘেরা পাঁচিলটা প'ড়ে গেছে বোধ হয় অনেকদিন আগেই, বর্ষার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে। ভাঙ্গা পাঁচিলের কোলে তুলসী মঞ্চটী কিন্তু এখনো ঠিক দাঁড়িয়ে আছে, শুধু অনেক দিনের অযত্নের জন্যে একটু মলিন। একদিন ছিল, যেদিন প্রত্যহ সন্ধ্যায় গঙ্গা জল আর প্রদীপের আলো আর সেই আলোয় প্রতিবিম্বিত একটী বিধবা নারীর পবিত্র শুভ্র ছায়া, এই সব মিলে তা'র বেদীমূলে রচিত হ'ত একটী মধুর ও মেদুর পটভূমিকা। কতদিন সন্ধ্যায় তফাতে দাঁড়িয়ে দেখেছি অর্চ্চনার মা'র প্রণাম করার সেই করুণ ভঙ্গীটী—কত কাতর, কত উদাস। চারিদিকে গঙ্গাজল ছিটিয়ে, তুলসী মূলে প্রদীপটী জ্বেলে, গলায় শুভ্র আঁচলটী জড়িয়ে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে করতেন তিনি প্রণাম—ঔদাস্য-নিমীলিত সজীবতার সকাতর মূর্ত্তি। মঞ্চের গায় হাত বুলিয়ে তাই মাঝে মাঝে আপন মনে বলি—তাঁকে মনে আছে তো বন্ধু?

তুলসী মঞ্চের পাশেই ছিল অর্চ্চনার খেলা ঘর। সে-ঘরের সে একলাই ছিল সর্ব্বময়ী গৃহিণী। অবসর তা'র এক দণ্ডও থাকত না, সর্ব্বদাই ব্যস্ততায় মুখর। প্রতিদিনই কত উৎসব, কত সমারোহ লেগে থাকত তা'র ঘরে। ওই ঘর থেকেই বড় মেয়ে তা'র বিয়ে হওয়ার পরই চলে গেছল শ্বশুরবাড়ী, আর মেয়েকে বিদায় দিয়ে অর্চ্চনার সে কী কান্না। তারপর একদিন ছোটছেলের বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ নিয়ে এসে তবে মেয়ের শূন্য স্থান পূর্ণ করে। প্রতি উৎসবে, সব কিছুতেই আমাকেও খাটতে হ'ত তা'র সঙ্গে সমান ভাবে, অস্বীকার করবার উপায় ছিল না—তা'র সংসারে আমারও অধিকার নাকি আপনা থেকেই জড়িয়ে থাকত ওতপ্রোতভাবে। তারপর এক সময়ে কাজের চাপ কমে গেলে খাবার নিয়ে আসত আমাকে খাওয়াতে—কচুপাতার ঘণ্ট, কুচো ইঁটের ডালনা, গঙ্গামাটীর পায়েস, আরও কত কী। পাশে ব'সে আদর ক'রে মাথার দিব্যি দিয়ে অনুরোধ করত সব কিছু খেয়ে ফেলতে, একটুও প'ড়ে থাকলে চলবে না। এখানে ওখানে এলোমেলো ছড়ানো ভাঙা ইঁটের মধ্যে খুঁজলে পরে আজও হয়ত এমন অনেকেরই সন্ধান পাওয়া যাবে, এতদিন যা'রা সেই খেলা ঘরের প্রহরী হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকত সারি বেঁধে। তাদের সেই মালিক—সে আজ কোথায়? কোন নতুন খেলাঘরে কেমন ক'রে কাটছে তা'র দিন?

বড় ঘরের পাশে ওই ফজলী আমের গাছটায় বাঁধা থাকত অর্চ্চনার দোলনা। কৈশোরের চঞ্চল রক্ত স্রোতে অস্থির হয়ে মাঝে মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ত ওই দোলনার ওপর, গাছটীও কেমন পরম স্নেহভরে তা'র সেই দুষ্টুমি-ভরা অত্যাচারকে করত গ্রহণ। বৃদ্ধ ঠাকুর্দ্দার মত তা'র সেই দোল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিত তাল, মচ্‌মচ্‌ শব্দ ক'রে। কত দিন বলেছি—অর্চ্চনা অত জোরে জোরে দোল খাও, কোন্ দিন দড়িটা ছিঁড়ে প'ড়ে যাবে দেখছি। হাত পা ভেঙ্গে গেলে কিন্তু আর বিয়ে হবে না। দুলতে দুলতেই বাতাসকে উদ্দেশ ক'রে বলত—বিয়ে তো আমি করব না। কিশোর মন হয়ত সেদিন কল্পনা করত এমনি দোল খেয়েই জীবনটা কেটে যাবে। কিন্তু স্বচ্ছ মনের সেই স্নিগ্ধ কল্পনা—বাস্তবের জটিলতায় তা'র স্থান কোথায়? প্রভাতী তারা হারিয়ে যায় মধ্যাহ্নের রৌদ্রে।

গাছটীর দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে তাই ভাবি—কী বন্ধু মনে আছে তো তা'কে—সেই ক্ষুদ্র অসম বন্ধুটীকে, একদিন যে অত্যাচার আর দুষ্টুমির কলরোলে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলত তোমায়?

কর্ম্ম-ক্লান্ত নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় ব'সে ব'সে ভাবি—প্রথম যেদিন জীবনের একমাত্র অবলম্বন মাকে হারিয়ে কক্ষচ্যুত গ্রহের মত মাটিতে ছিটকে পড়ি, সেদিন অর্চ্চনার মা-ই অতি আদরে ও স্নেহে কুড়িয়ে নিয়েছিলেন মাটি থেকে। আর সেই উত্তপ্ত ঘন পক্ষপুটের নীচে অর্চ্চনার সঙ্গে একই সাথে কেটেছিল জীবনের প্রথম অধ্যায়। প্রাণের যে সহজ ও সাবলীল ধারার ওপর পড়েছিল অর্চ্চনার ছায়া, জীবনের সব কিছু ছাপিয়ে সেই ছায়াই তো হ'ল বড়। ছেলে-বেলাকার ভুলে যাওয়া টুকরো টুকরো গানের সুরের মত

আজও যেন কানে আসে তা'র কণ্ঠস্বর। রাত্রির অবগুণ্ঠনে ঢাকা বহুদূর দিয়ে ব'য়ে যাওয়া নদীর ক্ষীন শব্দের মত ভেসে আসে তার হাসির ঝরণা-রোল। তা'কে তো পেয়েছিলাম—অথচ পেয়েও পেলাম না। এবং না-পাওয়ার কারণ—সে কত তুচ্ছ, কত অবান্তর। পরক্ষণেই কিন্তু আবার মনে হয়—যাক, এই বোধ হয় ভালো হয়েছে। স্থূল ব্যবহারিতার মধ্যে এনে তাকে আবিল ক'রে না তুলে, সে যে স্নিগ্ধ সৌরভের মত জড়িয়ে আছে মর্ম্মের মূলে—সে-ই বরং ভালো।

কিছুদিন কাটে এমনি ভাবে।

তারপর একদিন আবার মনের কোনের সুপ্ত বেদুঈন ওঠে জেগে, যাযাবর প্রবৃত্তিগুলো হ'য়ে ওঠে চন্‌চনে। নতুন পরিস্থিতি চাই—নতুন পারিপার্শ্বিকতা, নতুন আকাশ, নতুন আবহাওয়া। কোন কিছুতেই বেশীদিন স্থির থাকতে পারিনে। কেন? কতদিন আর চলবে এই উদ্‌ভ্রান্ত মনকে নিয়ে?

আবার বেরিয়ে পড়তে হয়।

একদিন যেমন বহুদিন পরে আচম্বিতে এসে ঢুকেছিলাম গাঁয়ের মধ্যে, আবার তেমনি আচম্‌কা একদিন বেরিয়ে যাই গাঁ থেকে। তবে, এবার আর হিমালয়ের তুষার ধবল লোভনীয়তার দিকে নয়, তাজমহলের স্বপ্ন-মর্ম্মর-মূলে নয়, ভৈরবী মেয়ে সমুদ্রের তীরেও নয়। শিলংয়ের সতী ফলস্‌, কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট, লাহোরের ইরাণ-বাগ—এসব এবার সঙ্কেতহীন। এমন কি অজন্তা, মহেঞ্জোদারোও এবার অর্থহীন। এবার হরিদ্বার—মহাপ্রস্থান-পথের প্রথম তোরণ-দ্বার।

মৃত মন যেন আবার স্নান ক'রে উঠলো অন্ধকার সমুদ্রের তলদেশ থেকে। ভবে জীবনের ওপর মায়া আর বিশেষ নেই। উপভোগ তা'কে আর করতে চাইনে—তাই মাঝে মাঝে শুধু আস্বাদ ক'রে ছেড়ে দেই।

থাকি এক আশ্রমে। আশ্রম ঠিক নয়, সেবা-সঙ্ঘ। অনাথ এবং আতুরের দল—রিক্ত এবং হৃত-সর্ব্বস্ব যারা, তা'রাই ভীড় ক'রে আছে। আমিও তাদের প্রায় সম-পর্য্যায়ভুক্ত ব'লে মিশে যেতে বিশেষ দেরী হল না। দু'দিনের পরিচয়ের পরই তাই নামলো প্রগাঢ়তা। কেন জানিনে মনে মনে বেশ খুসীই হ'লাম। ক্ষুধিতের মুখে তুলে দেবো অন্ন, পীড়িতের তপ্ত কপোলে হাত বুলিয়ে দেবো সান্ত্বনা, ব্যথিত ও শোকসন্তপ্তদের ক্ষত মুছিয়ে দেবো নিজের চোখের জলে, দুর্গত ও পতিতদের বিশ্বের সামনে তুলে ধ'রে গর্ব্বভরে বলব—দীন নহে হীন। অনন্ত জীবনের খণ্ড আবিলতাকে বড় করে দেখে জীবনের অপমান ক'রো না বন্ধু। তা'তে হয় তোমার অপরাধ, সমাজের অপরাধ, সমস্ত মনুষ্যজাতির অপরাধ। অবহেলিত ও পদদলিতদের বিবর্ণ প্রাণে দেবো নবযুগের বাণী, বলব—দাঁড়াও বন্ধু, মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াও। বিশ্বাস করো নিজেকে, তুচ্ছ তো তুমি নও—অসীম সম্ভাবনা যে জড়িয়ে রয়েছে তোমার মধ্যে রাতের আঁধারের মত। আপনার প্রমত্ত শক্তির ঘূর্ণি-বায়ু-বেগে উড়িয়ে নিয়ে যাও অত্যাচারী আর নিপীড়কদের। এই রকম সব ভাবতে ভাবতে বেশ উল্লাসের নেশা লাগত মস্তিষ্কের কোষে কোষে, ঝিমিয়ে পড়া শিরা উপশিরায়।

সকাল এবং সন্ধ্যায় আশ্রমের বড় গোঁসাইয়ের সঙ্গে বেরুতাম বেড়াতে। গঙ্গার ধারে ধারে দু'জনে চলে যেতাম অনেকদূর। তার পর এক জায়গায় ব'সে গোঁসাইজী গাইতেন গান—'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম……।' জীবনের ওপর কী দারুণ মায়া—তাই তা'র ব্যর্থতায় এমন হতাশ বৈরাগ্য, না-পাওয়ার দুঃখ তাই রূপ নেয় চোখের জলে। কোনদিন বলতেন জীবনের কথা, সৃষ্টির কথা—কোন্ এক বিস্মৃত দিবসে দু'টী তারা পড়ল খ'সে, আকাশ থেকে মাটীর 'পরে দু'টী তারা পড়ল খ'সে—একটী পুরুষ, আর একটী নারী। সমুদ্রের নীল জলে ভেসে এলো দু'টী ফুল, দু'টী পবিত্র তাজা ফুল—একটী হ'ল চম্পা, আর একটী হ'ল পারুল। আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের ঘূর্ণিপথে তা'রা এলো এগিয়ে—কত অসংখ্য দিন আর রাত্রি, কত সমুদ্র ও পাহাড় পার হ'য়ে এলো তা'রা। কিন্তু কী লাভ হ'ল? জীবনের যে-স্পন্দন, সৃষ্টির যে শুভলগ্ন আজও কী তা ঘৃণ্য কদর্য্যতায় মধ্যে লুকিয়ে নেই?—গল্পের ছলে গোঁসাইজী

এই রকম সব সমস্যার সৃষ্টি করতেন। আবার হঠাৎ এক সময়ে সমস্যা সৃষ্টি ক'রেই থেমে যেতেন, চেয়ে থাকতেন সামনের গঙ্গোত্রী ধারার দিকে। আবার এমনও কতদিন হয়েছে—হয়ত পূরো দু'তিন ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে, ব'সে; কিন্তু একটী কথাও বেরোয়নি কা'রও মুখ থেকে। গোঁসাইজীর চোখে থাকত যেন কীসের এক দুর্ভেদ্য রহস্য—আমারও বরং ভালো লাগত এইরকম মৌনতা। চেয়ে চেয়ে দেখতাম—যৌবন-মুগ্ধা পর্ব্বতদুহিতার নির্লজ্জ নগ্নতা। যৌবন—হ্যাঁ নগ্ন দুর্দ্দম যৌবন। উপলে উপলে বাধা পেয়ে ফেনিয়ে উঠেছে দুর্দ্দান্ত যৌবন। ভয় নেই, লজ্জা নেই—ভীষণ ও সুন্দর। আপনার অনন্ত প্রাণশীলতায় আপনি মুগ্ধ ও পরিপূর্ণ। দূরে, বহুদূরে ধূসর পাহাড় শ্রেণী—অস্পষ্ট স্বপ্নের ঝাপসা কুহেলি যেন। গঙ্গার দিকে চেয়ে মনে হ'ত—সে যেন পঙ্গু যৌবনকে উপহাস ক'রে বলছে—ছিঃ এত দুর্ব্বল তুমি? বিরাটের আশীর্ব্বাদকে তুচ্ছ ক'রে যা' ক্ষণিক তা'কেই সব চেয়ে বড় ক'রে দেখলে? ক্ষণিকার জন্যেই নিজেকে এমন অনর্থকভাবে অপচয় ক'রে ফেললে? মন কিন্তু আমার বিশেষ সাড়া দেয় না এ-আহ্বানে, লজ্জিতও হয় না। এর চেয়ে বরং লোভনীয় মনে হয় পাহাড়ের হাতছানি। নীল ও সবুজে মেশানো রেশমী আঁচল উড়িয়ে কে যেন আমায় ডাকছে, বলছে—ওগো অশান্ত, ওগো ব্যথিত, চলে এসো এখানে। চোখে তোমার চুম্বন দিয়ে এনে দেবো ঘুম, আমার আঁচলের রেশমী পরশে সঞ্জীবিত ক'রে তুলব তোমায়।—হ্যাঁ এই রকমই তো একদিন আমি মনে মনে আশা করেছিলাম—শান্ত নিভৃত একটু আশ্রয়, জীবনধারণের মোটামুটি উপাদান, আর পাশে অর্চ্চনার মত একটী মেয়ে—যে ভালোবাসবে, স্নেহ করবে; শান্তি দেবে, দেবে তৃপ্তি—পরম পরিতৃপ্তির তৃপ্তি

অতি প্রত্যূষে ধোঁয়াটে অন্ধকারের মধ্যেই স্নান সেরে ঘাটের ওপর উঠে বসতাম। চেয়ে থাকতাম পূব আকাশের দিকে, দেখতাম—আলোর আশীষ কেমন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে মাটীর ওপর। মনে হ'ত—জীবনের অস্পষ্টতাও তো একদিন এইরকম অপসৃত হ'য়ে যায়, সবকিছু হ'য়ে পড়ে প্রকাশিত। চিনতে না পারার রহস্য তখন পরিচয়ের নিবিড়তায় গাঢ় ও সজল হ'য়ে ওঠে। কোনদিন আবার পাশের পাথরের ঢিপিটার দিকে চেয়ে মনে হ'ত—বুঝি কোন সাগরিকা-মেয়ে এইমাত্র সমুদ্র স্নান সেরে মুক্ত-বাসে সজল এলো চুলে ব'সে আছে নির্লিপ্তের মত। 'শিথিল পীতবাস, মাটীর' পরে কুটীল রেখা লুটিল চারিপাশে'—সুন্দর, সুন্দর! পরম প্রত্যাশায় কত স্থির, কত গম্ভীর—কে যেন আসবে, এসে বলবে—'পূজার ফুল তুলিতে চাই তোমার ফুলবনে।' কিন্তু কী আশ্চর্য্য, ভোরের এই প্রহেলিকা দিনের আলোয় হ'য়ে পড়ত অত্যন্ত কুৎসিত ও অর্থহীন।

দিন আবার গড়িয়ে চলে—নিজের মনের সঙ্গে খেলা ক'রে, আর কতকগুলি বঞ্চিত নর-নারীর ব্যর্থ জীবনের পাঠোদ্ধার ক'রে।

তারপর একদিন—ভোরের আলো তখনো মাটী পর্য্যন্ত এসে পৌঁছায়নি, ঊষার মুখ তখনো অবগুণ্ঠনে ঢাকা কী একটা উপলক্ষ্যে স্নানার্থীদের ভীড় সেদিন একটু বেশী হ'বে ব'লে গোঁসাইজীও এসেছিলেন আমার সঙ্গে সকাল সকাল স্নান সেরে নেবার জন্যে। স্নান সেরে আমি আগেই ঘাটের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছি, গোঁসাইজী পেছনে পেছনে আসছেন গঙ্গা-স্তোত্র গাইতে গাইতে—এমন সময় একটী মেয়ে দ্রুতপদে আমার পাশ দিয়ে নেমে গেলো। সামনে গোঁসাইজীকে দেখে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে জলের দিকে আগিয়ে গেলো। গোঁসাইজী ওপরে এলে জিজ্ঞেস করলাম—মেয়েটী কে?

গোঁসাইজী উত্তর দিলেন—আমাদেরই সেবা-সঙ্ঘের একজন বিশিষ্টা সভ্যা।

পূব আকাশে তখন সবেমাত্র পড়েছে আলোর প্রথম আল্পনা। সেইদিকে তাকিয়ে গোঁসাইজী বললেন—দেখেছ ভাই, কী সুন্দর, যেন সৃষ্টির রোমাঞ্চিত আদিম লগ্ন—অবচেতন আর অচেতনের মিলিত মনোহর পারাবার। ইন্দ্রিয় ছাড়িয়েও যেন অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে ভুলছে সুরের ঝঙ্কার।

আচ্ছা—খানিক পথ আগিয়ে এসে হঠাৎ এক সময়ে গোঁসাইজী বললেন—আচ্ছা ভাই, সত্যিই কী মানুষ সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে আগিয়ে এসেছে ?

হঠাৎ অতীন্দ্রিয় চিন্তা ছেড়ে এমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অদ্ভুত প্রশ্নে আমি তাঁর মুখের পানে চাইলাম। দেখলাম চোখে মুখে যেন তাঁর কোন দুরূহ সমস্যার জটিল ছায়া।

তাই যদি হ'বে—গোঁসাইজী ব'লে যেতে লাগলেন—সত্যিই যদি মানুষ সেই বন্য যুগ ছাড়িয়ে আজ সভ্যতার এই আলোকোদ্ভাসিত বেদীমূলে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ক'রে থাকে, তা' হ'লে দুর্ব্বল ও অসহায় যা'রা, কেন তা'দের ওপর এত অত্যাচার, অবিচার? সামান্য একটু ভুল, এতটুকু একটু দৌর্ব্বল্যের জন্যে কেন তবে নিরালম্ব মানুষ নিক্ষিপ্ত হয় ব্যর্থতার বিষাক্ত গহ্বরে? দয়া, ক্ষমা, বিচার—কোন দামই কী নেই তা'দের কাছে ? তবে কীসের শিক্ষা, কীসের সভ্যতা ?—সব ভুল, সব ভুল। হ্যাঁ সত্যিই তাই—মনে ক'রো না নিছক ভাব-প্রবণতার বশে এইসব বলছি। আজ পর্য্যন্ত দেশে বিদেশে বহু জায়গাতেই ঘুরেছি—সবখানেই দেখেছি ওই একই রীতি, একই ধারা। একদিকে দেখেছি বঞ্চিত বুভুক্ষু আত্মার করুণ আর্ত্তনাদ, আর একদিকে দেখেছি নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্যের নির্লজ্জ নগ্নতা। একদিকে দেখেছি বিলাস ও ব্যসনের বিলোল তরঙ্গ, আর একদিকে দেখেছি অন্ধ গহ্বরে অসহায় নিপীড়িত নারীত্ব মাথা খুঁড়ে মরছে ব্যর্থতার হিম-শীলাতলে। কেন ?—অপ্রতুলতা তো তা'দের কিছুরই ছিল না। রক্তের মাঝে ছিল সোনালী সম্ভাবনা, অন্তরে ছিল সার্থক করবার শক্তি ও প্রেরণা। তবু যে ব্যর্থ হ'য়ে গেলো—অতি ঘৃণ্যভাবে ব্যর্থ হ'য়ে গেলো, সে কীসের জন্যে ? সে কী শুধু প্রতিকূলতার নির্ম্মম চাপে নয় ?

দারুণ উত্তেজনায় গোঁসাইজী তখন অস্থির হ'য়ে উঠেছেন। মিনিট থানেক থেমে আবার অনর্গল হ'য়ে উঠলেন—ঘাটের ওপর এইমাত্র ওই যে মেয়েটিকে দেখলে কত সুন্দর, কত সহজ—কিন্তু কেন জানো তার সব থাকা সত্ত্বেও সব কিছু হারিয়ে আজ এই অনাথ ও আতুরের দলে এসে মিশেছে ? তা'র প্রস্ফুটিত নারীত্বের গোলাপী সম্ভাবনা সব আজ এক মুঠো ঝরা ম্লান ফুল ছাড়া আর কিছুই নয়। অস্বাভাবিক বা অসম্ভব কামনা তো কিছুই করেনি—সাধারণ নারী যেমন চেয়ে থাকে, সে-ও ঠিক তেমনিই চেয়েছিল। চেয়েছিল ছোট্ট তকতকে একখানি ঘর—সমারোহ বা আড়ম্বরের প্রাচুর্য্য থাকবে না তা'র কোনদিকে, থাকবে শুধু প্রকৃতির শ্যামল দান। ভীরু হাতের ওপর থাকবে দু'খানি বলিষ্ঠ হাতের নির্ভীক উত্তপ্ত পরশ—আর কোলের ওপর থাকবে তা'দের দ্বৈত-জীবনের মিলিত সাধনার মূর্ত্ত ফল—ছোট্ট ফুটফুটে একটী শিশু। কিন্তু কিছুই যে সে হ'তে পারল না—শুধু হ'য়ে থাকলো নিজের একটা প্রেতায়িত ছবি—কেন ? এমন অনর্থকভাবে অপচয় হ'য়ে যাওয়ার কী কারণ ? কী দোষ ছিল তা'র ? কোন দোষই তো তা'র ছিল না। দোষের মধ্যে শুধু মাতাল ও চরিত্রহীন স্বামীকে সে ঘরে ধ'রে রাখতে পারত না—এই তা'র অপরাধ। চেষ্টা তো সে যথেষ্টই করিয়াছিল—কেঁদে-কেটে হাতে পায় ধ'রে, চোখে ঠোঁটে গণিকা-সুলভ চটুল রেখা টেনে, এমন কি জোর ক'রে নিজের দাবী জানিয়ে, অনেক উপায়েই তো সে চেষ্টা করেছিল ভ্রান্ত স্বামীকে আপনার স্নিগ্ধ নিবিড়তার মধ্যে টেনে আনতে। কিন্তু পারেনি—সে দোষ তো তা'র নয়। বাড়ীর লোকে কিন্তু এসব জানত না, বুঝত না। তা'রা ভাবত বৌয়ের মধ্যেও নিশ্চয় কোন গলদ আছে, হয়ত বা মন তা'র আগে থেকেই বাঁধা প'ড়ে আছে অন্য কোথাও, তাই নিজের চোখের সামনে স্বামীর এই অপমৃত্যু দেখেও এমন উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট। লাঞ্ছনা, গঞ্জনারও তাই শেষ ছিল না। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে অনেকের কাছ থেকে অনেক কিছুই শুনতে হ'ত, সহ্য করতে হ'ত। কিন্তু কী ক'রে সে বোঝাবে—ওগো তোমরাও অবিচার ক'রো না। কোন উপায়ই ছিল না—কোন উপায়ই ছিল না তা'দের বোঝাবার—একমাত্র নিরিবিলি ব'সে চোখের জল ফেলা আর সেই সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দেওয়া ছাড়া।

এমনি ভাবেই পুরো এক বছর কেটে গেলো। আর ব্যর্থ চেষ্টার বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ায় ক্রমে ক্রমে কেমন অকরুণ হ'য়ে উঠলো সে।

তারপর যেদিন অতি নির্ম্মমভাবে বুঝলো, উষর মরু 'পরে কুসুম কলিকা কোনদিনই ফুটবে না, এবং সেই সঙ্গে অত্যাচার ও লাঞ্ছনার মাত্রাও যেদিন সীমা ছাড়িয়ে গেলো, সেই দিন—সেইদিন অকুতোভয়ে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রীর মত নিদ্দয় ভাবে জানিয়ে দিল—সে-ও মানুষ, তা'রও আছে বাঁচবার অধিকার, তা'রও আছে একটা বিশিষ্ট সত্ত্বা, এবং সে-সত্ত্বাকে এমন অনর্থক ভাবে অপচয় করা মানে দেবতার অপমান করা। এতদিন ধ'রে যে-ভুল সে করেছে, তা'কেই জীবনের পরম পরিণতি ব'লে মেনে নিতে সে আর মোটেই রাজী নয়।

মানুষের অত্যাচার সেদিন তা'কে পাগল ক'রে দিয়েছে। তাই বিনা দ্বিধায় সকলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অতি স্পষ্টভাবে আরও জানিয়ে দিল—এতদিন ধ'রে ঘরের মধ্যে শুধু চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস সম্বল ক'রে প'ড়ে থাকলেও বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে একাকী পরিচিত হবার সাহস ও সেই দুনিয়ার পথে একাকী চলবার শক্তি তা'র যথেষ্টই আছে। সুতরাং—

সুতরাং কা'কেও কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই সব কিছু ফেলে ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়—ফিরেও চাইল না একবার পেছন পানে, সামনের দিকে একবার তাকিয়েও দেখল না!

প্রথমতঃ এসে উঠলো নিজের গাঁয়ে। ভেবেছিল যেখানেই হোক আশ্রয় একটু পাবেই। কিন্তু পেলো না, কোনখানেই আশ্রয় পেলো না। সংসারের একমাত্র শেষ অবলম্বন মা অনেক দিন আগেই চলে গেছেন। শ্বশুরবাড়ী থেকেই সে-সংবাদ পেয়েছিল, কিন্তু শেষ সময়ে চিরদিনের মত একবার দেখে যাবার অনুমতি পায়নি। তাই সেদিন বাড়ীটার পানে তাকিয়ে চোখের জল কোন মতেই আটকে রাখতে পারেনি। তারপর যখন শুনলো, পরম নিশ্চিন্তে যা'র ওপর নির্ভর ক'রে আজ পথের ওপর নেমে এসেছে সব কিছু অবহেলায় তুচ্ছ ক'রে, সেই শেষ আশ্রয় স্থলও শূন্য, কোন সংবাদই যখন কেউ তা'র দিতে পারল না, তখন সে যে কী অবস্থা—কোন মতেই নিজেকে আর সামলে রাখতে পারেনি, অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে পেঁছল পথেরই একধারে।

জ্ঞান যখন হ'ল, দেখল—নদীর চরে বালির ওপর কার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। কেমন ক'রে এখানে এলো, কে নিয়ে এলো, কা'র কোলেই-বা মাথা রেখে শুয়ে আছে—কোন কিছুই জানতে ইচ্ছে হ'ল না। কেমন যেন মূক অবসাদে সমস্ত দেহ মন ভ'রে গেছে। যেমন ছিল ঠিক তেমনি ভাবেই নীরবে আবার চোখ বুজলো।

শুধু শুনতে পেলো কাণের অতি সন্নিকটে মুখ নিয়ে এসে কে যেন মৃদু কণ্ঠে ডাকছে—'বৌদি'—

মুহূর্ত্তের জন্যে একবার চমকে উঠলো বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো—এ তা'র ছোট দেবর—তা'র লাঞ্ছিত জীবনের মাঝে সময়ে সময়ে যে এসে দাঁড়াতো সান্ত্বনা ও সহানুভূতির সৌরভ ছড়িয়ে। চোখ বন্ধ রেখেই ধীরে ধীরে বলল—তুমি কেন এলে ঠাকুরপো?

—সে যাই হোক, চলো—বাড়ী চলো এখন।

—না ভাই, আর পেছু হাঁটা নয়, এবার শুধু সামনের দিকে আগিয়ে যাওয়া—হয়ত আলোকোজ্জ্বল প্রভাত, নয়ত তিমিরঘেরা অতল রাত্রি। তুমি যাও ঠাকুরপো, আমার জন্যে ভেবো না। শুধু মাঝে মাঝে প্রার্থনা ক'রো একটি ঝ'রে পড়া ফুলের জন্যে।

—না, যাবো ব'লে এতখানি রাস্তা তোমার পেছনে পেছনে ছুটে আসিনি। যেতে যদি নেহাৎ হয়, এ-অবস্থায় তোমায় ফেলে কোনমতেই যেতে পারব না।

মেয়েটিও সেই মুহূর্ত্তে কেমন যেন দুর্ব্বল—অসহায়ভাবে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ল। একটু আগেই যে মানুষের ওপর দারুণ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে একাকী পথে নেমে এসেছিল, তখন সে আর কিছুতেই বলতে পারল না—ওগো না, তুমি যাও। কোন্ প্রয়োজন তোমার? বরং হাতের মুঠোর মধ্যে সেই সময়ে যা' পেলো তা'কেই আরও জোরে চেপে ধরল—কোন মতেই মুঠো আল্‌গা ক'রে ছেড়ে দিতে পারলো না।

দিন আবার গড়িয়ে চলে। সময়ের ব্যাপকতার মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বটুকুও বজায় রাখবার জন্যে দু'জনে মিলে বাঁধলো ঘর। দেখতে দেখতে পুরো দস্তুর গৃহস্থ হ'য়ে গেলো

তা'রা। অভিনবত্ব কিছু না থাকলেও অহেতুক কিছুই ছিল না। সংসারের অসংখ্য ছোট বড় খুঁটিনাটির মধ্যেই কাকলী ও কল্লোলে হ'য়ে থাকত মুখরিত। প্রভাত-সূর্য্যের পানে তাকিয়ে বলত—ওগো আলোর আশীষ যেন কোন দিনই কার্পণ্যে অপ্রতুল না হয়। অন্ধকার রাতে বাইরে দাঁড়িয়ে বলত—ওগো এসো দুর্য্যোগ, সমারোহ নিয়ে, বরণ ক'রে নেবো। তারপর—

হ্যাঁ তারপর সত্যিই একদিন নিরন্ধ্র আঁধার রাত্রি এলো দুর্য্যোগ-সমারোহ নিয়ে—

হঠাৎ ছেলেটি একদিন আবিষ্কার করল মেয়েটির দেহের অন্তরালে তরল রক্ত জমাট বেঁধে গাঢ় হয়েছে, জেগেছে মাতৃত্বের সম্ভাবনা। লজ্জা, ভয় ও সঙ্কোচে সে যেন প্রায় মৃত হ'য়ে উঠলো তখন। নীল আকাশের শুদ্ধ সীমায় যেন জ্ব'লে উঠলো আগুনের সহস্র শিখা—আর অহরহঃ সে দগ্ধ হ'তে থাকে লেলিহান শিখার সেই জ্বলন্ত উত্তাপে। কী যে করবে, কিছুই ঠিক করতে পারে না—খালি অস্থির হ'য়ে ওঠে, আপনার বিষাক্ত ফেণপুঞ্জতায় উন্মাদ হ'য়ে ওঠে।

শেষে অনন্যোপায় হ'য়ে একদিন গভীর রাত্রে মেয়েটীর নিশ্চিন্ত গাঢ় সুপ্তির সুযোগ নিয়ে সে পালিয়ে গেলো—কাপুরুষের মত পালিয়ে গেলো একটী অসহায় মেয়েকে মহাশূন্যে নিক্ষেপ ক'রে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মেয়েটী যখন দেখল, সে নেই—কেমন যেন ভীত হ'য়ে পড়ল। তারপর সারাদিন অপেক্ষা ক'রে, অনেক খোঁজাখুজি ক'রে শেষে নিঃসন্দেহে যখন বুঝল যা' হ'বার, যা' স্বাভাবিক তা'ই হয়েছে—সে আর ফিরবে না, তখন—কিন্তু কি আশ্চর্য্য ভাই, ছেলেটীর ওপর মোটেই সে রাগ বা অভিমান করল না—তখন নিজের ওপরই কেমন যেন মায়াহীন হ'য়ে পড়ল। নিজের নবোন্মেষিত দেহের পানে ভালো ক'রে তাকিয়ে সত্যিই আপনার ওপর মায়াহীন হ'য়ে পড়ল, ইচ্ছে হ'ল—এখুনিই নিজের টুঁটি চেপে ধ'রে প্রতিশোধ নেয় আপনার ওপর। দারুণ ঘৃণায় সমস্ত দেহ তা'র কুঁকড়ে উঠলো—ছিঃ এ কী করেছে সে? সামান্য একটা দুর্ব্বল অসতর্ক মুহূর্ত্তের ভুলে এমন নির্দ্দয় ভাবে হত্যা করেছে নিজেকে? এত দিনের সযত্ন রক্ষিত সুরপুরী তা'র লণ্ডভণ্ড হ'য়ে গেলো ক্ষণিকের অভিশাপে? সঙ্গে সঙ্গে নিজের মধ্যে থেকেই কে যেন ব'লে উঠলো—তবে আর কী লাভ বেঁচে থেকে? শুধু মৃতের ধ্বংসস্তূপ ব'য়ে?

এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই—রাত্রির সেই নিস্তব্ধ নিঝুম ক্ষণে উন্মাদের মত ছুটে এসেছিল আপনার সমস্ত কলঙ্ক স্তূপকে চিরদিনের মত নদীর জলে নিমজ্জিত ক'রে দিতে

কিন্তু ভাই, সংসারের দাবী না মিটিয়ে সংসার থেকে চ'লে যাওয়া কী এতই সোজা—সংসারেরও তো একটা দাবী আছে। সেদিন তার কাছে হয়ত সংসারের কোনো দানই ছিল না, কিন্তু তার কাছে সংসারের দাবী যে অনেক। তাই মরবার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হ'য়ে এসেও মরতে পারলো না। জলের ধারে অত রাত্রে আমাকে দেখেই কেমন থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলো, এগুতে পারলো না। আমারও দেরী হ'ল না, এক মুহূর্ত্তও দেরী হ'ল না তাকে বুঝে নিতে। আস্তে আস্তে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, দেখলাম প্লাবন নেমেছে তা'র দু' চোখ বেয়ে। ছোট্ট মেয়ের মত মা ব'লে সম্বোধন ক'রে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম সান্ত্বনা, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠের অসংলগ্ন অল্প ভাষাতেই বুঝে নিলাম তা'র জীবন-কাহিনী। নানা কথায় ভুলিয়ে নিয়ে এলাম এই আশ্রমে। শোনালাম নব জীবনের বাণী, গাইলাম দেহাতীত যে নির্ম্মল সত্ত্বা তা'রই জয়গান। এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, সে আজ বেঁচে গেছে—শুধু বেঁচে গেছে নয়, সে আজ নব জীবনে উদ্বুদ্ধ। মানবতার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সেবা-ধর্ম্মের গৈরিক উত্তরীয় নিয়ে চলেছে সে আজ সকলের আগে। আজ সে পরিপূর্ণ, পরিতুষ্ট। চাইবার তা'র আজ আর কিছুই নেই, শুধু দেওয়ারই মালিক।

তার ছেলে মেয়ে কিছু? গোঁসাইজীর কথার ফাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—হ্যাঁ একটী ছেলে তা'র, সে-ও থাকে এখানে। ভারী সুন্দর ভাই ছেলেটী—ঠিক ভালো বাসবার মত সুন্দর। যেন সর্ব্ব কামনার স্বর্গীয় প্রতিকৃতি।

ইস্—নিজের অজ্ঞাতসারেই কেমন যেন একটা ঘৃণা-সূচক শব্দ বেরিয়ে গেলো মুখ দিয়ে। প্রথমতঃ মেয়েটীর আত্মনির্ভরশীলতা ও বলদর্পীতা দেখে মনে মনে বেশ প্রশংসাই করছিলাম, কিন্তু শেষে যখন দেখলাম সে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হ'ল আপনার তুচ্ছ দেহের কাছে, তখন আপনা থেকেই মনটা কেমন যেন ঘৃণায় কুঞ্চিত হ'য়ে উঠলো—ইস্—

কাঁধে হাত রেখে হাসিমুখে গোঁসাইজী বললেন—কী তুমিও তা'কে ঘৃণা করছ? ছিঃ, মানুষকে ঘৃণা করতে নেই। তা'র বাইরের দিকে নজর রেখে তা'কে বিচার করবে না। মানুষের স্থূল যে বাহ্যিক রূপটা আমরা দেখি, সে তো মিথ্যা। দেহ ছাড়িয়ে দেহাতীত যে সত্তা—যে শাশ্বত নিষ্কলঙ্ক সত্তা সেই তো মানুষের আসল পরিচয়। আচ্ছা, কাল মেয়েটীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবো, তখন দেখবে তোমার ধারণা কত ভুল।

—কিন্তু নারীত্বের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যকে যে অবহেলায় কলুষিত করে, সে কী সেই সঙ্গে তা'র অপর সৌন্দর্য্যকেও কলুষিত করে না?

—না ভাই না, তা' হয় না। দেবতার পূজার শ্রেষ্ঠ উপাদান পাঁকের মধ্যেও জন্মে পঙ্কহীন। এ-ও যে ভাই তেমন পঙ্কজ।

গোঁসাইজীর কথার আর কোন উত্তর দিলাম না, ভাবলাম—এসব বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি ক'রে কোন লাভ নেই, তর্ক করে কোন ফল হবে না। সুতরাং চুপ ক'রে থাকাই ভালো। তবে মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা খোঁচ আটকে থাকলো, খালি খচ্ খচ্ করে।

পরদিন বৈকালে বেড়াতে বেরুবার আগেই বৃষ্টি এলো প্রবলভাবে। সুতরাং অনন্যোপায় হ'য়ে বসলাম ঘরের মধ্যে। দু'চার মিনিট বসার পরই গোঁসাইজী উঠে গেলেন ব্যস্তভাবে। যাবার সময় ব'লে গেলেন—তুমি একটু বসো ভাই, আমি মেয়েটীকে ডেকে নিয়ে আসি। তোমার সঙ্গে আজ আলাপ করিয়ে দেবো—জীবনের একটা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে যেতে পারবে।

বাইরে তখন জল আর ঝড়ের প্রলয়নাচন। এলোকেশী যেন চতুর্দ্দিকে নিবিড় কালো এলো কেশ ছড়িয়ে দুর্জ্জয় উল্লাসে মেতেছে তাণ্ডব লীলায়। সেই দিকে চেয়ে ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলাম—আমার সঙ্গে আজকের এই প্রকৃতির কোথায় যেন একটা মিল আছে। তাই আমারও মন আজ নেচে উঠেছে নটমল্লারের রাগে। বিদ্রোহী বাহিনীর মত সব কিছু ভেঙ্গে-চুরে চুরমার ক'রে দিয়ে চ'লে যাবো—কতক নিয়ে যাবো নিহতদের রক্ত-প্লাবনে ভাসিয়ে। তারপর হয়ত আসবে আবার নব সৃষ্টি, পুরাতন ধ্বংস-স্তূপের ওপর। নেহাৎ যদি কিছুই না আসে—থাকবে শুধু মরুভূমি—জ্বলন্ত ও প্রাণবন্ত। সে-ই বা মন্দ কী?

নিজের চিন্তাতেই বিভোর ছিলাম—এমন সময় দরজার গোড়ায় গোঁসাইজীর কলকণ্ঠ শোনা গেলো। আমাকে উদ্দেশ করে বলছেন—এই দেখো ভাই আমাদের সজ্ঘমিত্রা।

প্রথমতঃ গোঁসাইজীর দিকে তাকিয়ে তারপর চাইলাম মেয়েটীর দিকে। কিন্তু চোখের ছোঁয়া মেয়েটীর গায়ে মুখে ভালো ক'রে ছড়িয়ে পড়বার আগেই শরীরের সমস্ত রক্ত হঠাৎ যেন নিশ্চল হ'য়ে গেলো। বোবা কণ্ঠ নিষ্ফল চেষ্টায় ভেতরে ভেতরে শুধু গোম্‌রাতে লাগলো—একী? অর্চ্চনা?

পরক্ষণেই নিজের ওপর আবার কেমন অবিশ্বাস হয়—তা' কী কখনো হয়? রক্তকরবী কী কখনো হ'তে পারে দলিত ম্লান শেফালি? নিশ্চয় আমার প্রতিক্রিয়াশীল মন ও চোখের ভুল।

কিন্তু অর্চ্চনা নিজেই যখন তা'র প্রথম বিহ্বলতা কাটিয়ে, নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে সামনের দিকে আগিয়ে এসে স্মিতহাস্য সহকারে বলল—একী অপূর্ব্ব! তুমি এখানে? আমি যে কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি। কিন্তু এমন অবস্থা কেন বল তো? তখন নিজেকে আর ঠিক অবিশ্বাস করতে পারলাম না, ভাবলাম—সত্যিই কী তবে রক্ত-করবী আজ দলিত শেফালি? প্রভাত অরুণ সত্যিই কী আজ অসময়ে অস্তাচলগামী?

—কী কোন কথাই বলবে না?—আগিয়ে এসে অর্চ্চনা

আমার হাত দুটী চেপে ধরল। গোঁসাইজীর দিকে তাকিয়ে শিশু-সুলভ কণ্ঠে বলল—চেনেন না আপনি? এ যে অপুদা', আমার অপুদা'।

কোন কথা বলবার ক্ষমতা তখন আমার ছিল না। অর্চ্চনার হাতের পরশ যেন আমার হৃৎপিণ্ডকে সজোরে চেপে ধরেছে—কেন তুমি এলে অর্চ্চনা? কেন তুমি এমনভাবে এসে দাঁড়ালে আমার সামনে? আমি তো কোনদিনই বলিনি—তুমি এসো অর্চ্চনা, একবারটী এসে দাঁড়াও আমার সামনে। মহীয়সী সম্রাজ্ঞীর আসনে যা'কে বসতে দেখেছি, কেমন ক'রে সহ্য করব তা'কে এমন পথের ঘৃণ্য ভিখারিণীরূপে? দীপ্তিময়ী নারীত্বের আসনে যা'কে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রেখেছি, সে কিনা আজ পতিতা, পরিত্যক্তা—সমাজে তা'র স্থান নেই, সংসারে তা'র আদর নেই, সাধারণে সে উপেক্ষিতা? কেন তুমি এলে অর্চ্চনা আমার সামনে? কেন তুমি মরে যাওনি এতদিন?

সত্যি কোন কথাই বলবে না অপুদা'? অভিমান-ক্ষুব্ধ ব্যথিত কণ্ঠে অর্চ্চনা বলল—আচ্ছা, বেশ কোন কথা ব'ল না। স্বপ্নেও অবশ্য আমি কোনদিন আশা করিনি যে, এতদিন পরে এমনভাবে আবার দেখা হ'বে। তবে দেখা যখন নেহাৎ হ'ল আমার কাজ আমি ক'রে নেই—ব'লে নীচু হ'য়ে পা ছুঁয়ে করল প্রণাম।

প্রণাম ক'রে উঠে একপাশে স'রে দাঁড়িয়ে সজল সুরে বলল—তুমিও কী ভুল বুঝে যাবে অপুদা'? কোন মতেই কী ক্ষমা করতে পারবে না? আচ্ছা, একবার অন্ততঃ কল্পনা করো তো মনে মনে—আমি অর্চ্চনা, তোমারই অর্চ্চনা। তোমারই অর্চ্চনায় ভ'রে আছে আমার যুগ-যুগান্ত, জীবন জীবনান্তর। একই নীড়ের দুটী পাখী আমরা—নীড়-ভ্রষ্ট হ'য়ে ভেসে গেছি দুই বিভিন্ন দিকে।

এতক্ষণ বাদে এইবার তা'র চোখের দীপ্তি নিভে গিয়ে নামলো মেঘ—জলভরা মেঘ। অর্চ্চনা কেঁদে ঝরঝর ক'রে।

আমার চোখের সামনে তখন ভেসে উঠেছে—বিয়ের পর অর্চ্চনার সেই শেষ বিদায়ের দৃশ্য। সেদিন তা'র জন্যে প্রার্থনা ক'রে বলেছিলাম—সুখে থেকো। কিন্তু আজ? হ্যাঁ আজও তা'র জন্যে প্রার্থনা করব, তবে সুখের প্রার্থনা নয়, শান্তির প্রার্থনা নয়। আজ বলব—তুমি মরে যাও অর্চ্চনা, পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাও একেবারে। অতীতের কদর্য্য কঙ্কাল হ'য়ে ঘুরে বেড়িয়ে কোন লাভ নেই, কোন প্রয়োজন নেই।

গোঁসাইজী তখন চেয়ে আছেন সম্মোহিতের নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমার দিকে, আর একপাশে সর্ব্বহৃত ব্যাকুল চাউনি—কোনমতেই আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না। দুঃসহ বেদনার অস্থির নাচন লাগলো শিরায় শিরায়। সহসা উন্মাদের মত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম সেই দুর্য্যোগের মধ্যে। দিগ্বিদিক্-শূন্যের মত ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চললাম সামনের দিকে। শুধু কানে এলো একবার অর্চ্চনার ক্ষীণ আর্ত্তরব—অপুদা'—

তারপর কিছুদূর ছুটে এসে শান্তভাবে এলিয়ে পড়লাম এক গাছের তলায়। ঝড় আর জলে তখনো চলেছে পুরোদমে মাতামাতি—অতি নির্লজ্জ মাতামাতি। আর সামনে গঙ্গা ফেনায়িত উত্তাল হ'য়ে উঠেছে রোষ-গর্জ্জনে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চাইলাম আকাশের পানে—গাঢ় মেঘে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন। সেইদিকে চেয়ে এতক্ষণের অবরুদ্ধ বাষ্প ফেটে পড়ল শব্দাকারে—হে ঈশ্বর মৃত্যু দাও, মৃত্যু দাও অর্চ্চনাকে। মরণের নিরন্ধ্র আঁধারের মধ্যে ঢেকে দাও তাঁর সমস্ত কালিমা। দৃষ্টি নামিয়ে সম্মুখের বিক্ষুব্ধ গঙ্গার দিকে চেয়ে করজোড়ে বললাম—ওগো পতিতপাবনী, সর্ব্ব-কলুষনাশিনী গঙ্গা, তুমিও কী পারো না তোমার অতল তমিস্রা-তলে অর্চ্চনাকে টেনে নিতে?

নরেন্দ্রকুমার পাল

মেঘনাদবধ কাব্যে শিল্পকৌশল

শ্রীসন্তোষকুমার প্রতিহার এম্-এ

আখ্যায়িকা-নির্ম্মাণ

১

আদি কবি বাল্মীকির পুণ্য রাম কাহিনী যুগে যুগে শিল্পীদিগকে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রেরণা যোগাইয়াছে। হিমালয়-নিঃসৃত বারিধারা যেমন শত শত নদ নদী শাখানদী বাহিয়া সমগ্র ভারতভূমিকে হাস্যময়ী ও শস্যশ্যামলা করিয়াছে, রামায়ণের কাব্য সুধাধারাও সেইরূপ শত শত কবির শিল্প সৃষ্টির মধ্য দিয়া ভারতীয় চিত্তকে সরস, সুন্দর ও মধুময় করিয়া রাখিয়াছে। কোন দেশের কোন কাব্য দেশের পরবর্ত্তী সাহিত্যের উপর এই ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এরূপ উদাহরণ বিরল। মধুসূদনের পূর্ব্বে কোন কবি রাক্ষস পক্ষকে তাঁহার কাব্যের নায়করূপে চিত্রিত করেন নাই। বিষয়-নির্ব্বাচন কবির অপূর্ব্ব মৌলিকতা ও সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের পরিচায়ক। নিদাঘ-পীড়িতা, হীনপ্রানা স্বল্পতোয়া স্রোতস্বতী স্খলিতপদে চিরপরিচিত শীর্ণপথে বহিতে থাকে কিন্তু বর্ষাতরঙ্গিনী তাহার অপ্রতিহত জল-প্রবাহ লইয়া ভৈরব কল্লোলে কূল ছাপাইয়া নূতন স্রোতে প্রবাহিত হয়। পূর্ব্ব কবিগণ-অনুসৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া মধুসূদনের কবি প্রতিভা স্বকীয় গতিবেগপ্রাবল্যে নিজের গতিপথ রচনা করিয়া চলিয়াছে।

নায়ক নির্ব্বাচন ব্যাপারে কবি আপনাকে সবলে সর্ব্ববিধ ভ্রান্তধারণার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর নিকট পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, আধুনিক ও প্রাচীন সাহিত্যের সহিত নিবিড় পরিচয়ের ফলে তাঁহার সংস্কৃতিমান্ মুক্ত মন শিল্পের সত্যস্বরূপ সম্বন্ধে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে শিল্পী যদি অন্তরবাসী রসপুরুষের অনুশাসন ভিন্ন অন্য কোন নির্দ্দেশ মানিয়া চলেন তাহা হইলে তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবেন ; রসসৃষ্টিই কবির কাজ, আমাদের রসদৃষ্টির উন্মীলনই সাহিত্যের উদ্দেশ্য ; সাহিত্যের চরিত্র ও ঘটনা অনুকরণের বিষয় নয়, অনুভবের বস্তু। নীতিকারেরা বলেন যে-চরিত্র বা যে-ঘটনা নীতিবোধের দৃষ্টিতে অনিন্দিত তাহাই সাহিত্যের বিষয়, যাহা নিন্দনীয় তাহাই অবিষয়। মধুসূদন কিন্তু উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে সাহিত্যের চরিত্র বা ঘটনা কবি-মানসের রস-সম্পদের বাহন—যে-চরিত্র বা যে-ঘটনা আমাদের শিল্পবোধকে উদ্বোধিত করিতে পারিবে, রসাবেগকে কল্লোলিত করিয়া তুলিবে, আমাদের মরমে পশিয়া প্রাণকে আকুল করিবে, যাহার কথা আমরা যতই বার বার ভাবিব আমাদের মন ততই তীক্ষ্ণতর গভীরতর আনন্দ অনুভব করিবে, তাহাই সাহিত্যের বিষয়-বস্তু হইবার যোগ্য। রসবোধের মধ্যে যে-নীতিবোধ প্রচ্ছন্ন আছে, যে-শাশ্বত নীতিবোধ রসবোধকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহার অতিরিক্ত কোন নীতিবোধের শাসন স্বীকার করিলে কাব্যলক্ষ্মী আঘাত প্রাপ্ত হইবেন। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদনই সর্ব্বপ্রথম রসবোধের আত্মনিয়ন্ত্রণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

রামরাবনের যুদ্ধে অন্যায় সমরে লক্ষ্মণের হাতে ইন্দ্রজিতের নিধন আপাতদৃষ্টিতে একটি সুদীর্ঘ কাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে অপেক্ষাকৃত লঘু ও হীনপ্রভ মনে হয়। কিন্তু এই ঘটনা কবির কল্পনারসে সঞ্জীবিত হইয়া অপরূপ জীবন লাভ করিয়াছে। এই ঘটনা একটি খণ্ড, বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলিয়া কবির নিকট প্রতিভাত হয় নাই। তিনি তাঁহার সুতীক্ষ্ণ রসদৃষ্টির সাহায্যে আবিষ্কার করিয়াছেন যে জীবধাতুর মধ্যে যেরূপ একটি পূর্ণাবয়ব দেহীর দেহ গঠনের সকল উপাদান নিহিত থাকে সেইরূপ এই সামান্য ঘটনার মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ আখ্যায়িকার উপযোগী বিষয়বস্তু লুকান আছে ;

মধুসূদন তাঁহার সৃজনীপ্রতিভার সাহায্যে এই অন্তর্নিহিত সম্ভাবনীয়তাকে রূপ দিয়াছেন। তিনি এই ঘটনার চতুর্দ্দিকে একটি সুদূরপ্রসারী পারিমণ্ডল রচনা করিয়াছেন যেখানে নিরন্তর ঐশী, দৈবী, মানুষিক, আসুরিক শক্তির সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে, এবং সেই সকল শক্তির সঙ্গে এই ঘটনা কার্য্যকারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল ত্রিভুবনের বহু ঘটনার সহিত, অসংখ্য পাত্র পাত্রীর সহিত একটি অঙ্গাঙ্গী যোগসূত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় এই আখ্যায়িকা নিগূঢ় অর্থময়তায় ভরিয়া উঠিয়াছে। কবির জীবনের কত বিভিন্ন রসানুভূতি, তাহার কল্পনা ভাণ্ডারে অজস্র রসসম্পদ এখানে একটি মর্ম্মগত ঐক্যলাভ করায় এই আখ্যান ভাগে বিশ্বজীবকের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, মানব জীবনেরও বহিঃপ্রকৃতির গম্ভীর, ভীষণ, মহান্, সুন্দর, করুণ কত বিচিত্ররূপ এই আখ্যায়িকার দর্পণে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মেঘনাদবধ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া কবি তাঁহার কাব্যের যে আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন তাঁহার নির্ম্মাণ কৌশলের কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই নির্ম্মাণ-কৌশল পদার্থটিকে অনেকেই সুপটু বাজিকরের চমকপ্রদ, অর্থহীন নৈপুণ্য প্রদর্শনের সমদলভুক্ত মনে করেন। কিন্তু এই নির্ম্মাণ কৌশল বাহিরের জিনিষ নয়, ইহা কেবল অলস শিল্পকার্য্য নয়, সৃষ্টিকার্য্য। শিল্পকৌশলের সাহায্যেই কবিহৃদয়ের রসানুভূতি শিল্পরূপে রূপায়িত হয়। সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, পণ্ডিতকুলগৌরব, বিপুলমতি এরিষ্টটল আখ্যায়িকাকেই কাব্যের প্রাণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। রসদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত, রসসৃষ্টি করিতে অপারগ, কবিযশঃ-প্রার্থী সুচতুর সাহিত্য ব্যবসায়ী সাহিত্যের বহিরাবয়ব ও যান্ত্রিক অংশ আয়ত্ত করিয়া যে নিখুঁত আখ্যায়িকা রচনা করেন তাহা মূঢ় মনের বাহবা পাইতে পারে কিন্তু সত্যকারের সমঝদারকে ধোকা দিতে পারে না। মনকে ক্ষণিকের জন্য উত্তেজিত ও শুম্ভিত করে কিন্তু স্থায়ী আনন্দরস দিতে পারে না। কেহ কেহ মধুসূদনকে এই পর্য্যায়ভুক্ত করিতে চান। তাঁহারা বলেন দেশ-বিদেশের সাহিত্যের সঙ্গে মধুসূদনের পরিচয়ের পরিধি ছিল সুবিস্তৃত, তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ; তাঁহার মেধার তীক্ষ্ণতা ছিল অলোকসামান্য; তিনি মহাকবিদের কাব্য গ্রন্থাবলী হইতে মহাকাব্যের অস্থি, মাংস, চর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া একটি মহাকাব্যের কাঠামো খাড়া করিয়াছেন; এইজন্যই তাঁহার কাব্যে দেবদেবীর কথা, ভারতীর বন্দনা, স্বর্গ নরক বর্ণনা, যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, ঝড়, ঝঞ্ঝা, ভূকম্পন প্রভৃতির অভাব নাই, দুরূহ শব্দের ছড়াছড়িতে ভাষা আড়ষ্ট ও পীড়িত, উপমার আধিক্যে রচনা সহজ সৌন্দর্য্য হইতে বঞ্চিত ও পদে পদে কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের আখ্যান রচনা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে তিনি যেভাবে তাঁহার কাব্যের আখ্যায়িকা পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার অলৌকিক কবি-প্রতিভার নিদর্শন। বনস্পতির সবল, উন্নত কাণ্ড, বিশাল শাখা-প্রশাখার অপরিমিত ঐশ্বর্য্য, ফলফুল পল্লবের অজস্র সম্ভার যেরূপ তাহার অদম্য প্রাণশক্তির বহিঃপ্রকাশ তেমনি এই কাব্যের ঘটনা ও চরিত্রের লোকাতীত সীমাতীত ঐশ্বর্য্য কবিকল্পনার স্বতোৎসারিত দুর্নিবার রসাবেগের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি।

এরিষ্টটল বলেন যে কাব্যের আখ্যায়িকার মধ্যে একটি অখণ্ডতা ও সংহতি থাকা চাই; তাহা আপনার মধ্যে আপনি সম্পূর্ন হইবে; ঘটনাপ্রবাহের সম্যক উপলব্ধির পক্ষে যে সকল বিষয় অবশ্য জ্ঞাতব্য তাহা ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইবে; আখ্যায়িকার মধ্যে প্রারম্ভ, পরিণতি ও পরিসমাপ্তি থাকিবে। আরম্ভটি একটি নূতন ঘটনার আদি বলিয়া কল্পিত হইবে, তাহার এমন একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকিবে যে সে আমাদের অসাড় চেতনাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিবে, অসংশ্লিষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী সকল ঘটনার সহিত সকল গ্রন্থিগুলি ছিন্ন করিতে হইবে, নতুবা তাহারা আমাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া মূল বিষয়-বস্তুতে অখণ্ড মনোনিবেশে বাধা জন্মাইবে। আখ্যায়িকার ঘটনাবলীর প্রত্যেকটি পূর্ব্ব ঘটনা হইতে স্বাভাবিক নিয়মে উদ্ভূত হইয়া পরের ঘটনাকে সম্ভাবিত করিবে; ইতিহাসে ঘটনা সমূহের মধ্যে যে সংযোগ তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানগত ও কালগত কিন্তু কাব্যে যে সংযোগ তাহা মর্ম্মগত এই জন্যই কাব্যের আখ্যায়িকায় মানবজীবনের নিগূঢ় রহস্য প্রতিবিম্বিত হয়। আখ্যায়িকার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্ত প্রত্যাশার অবসান

হইবে। আখ্যায়িকার শেষে আমাদের মনে রস-পিপাসা পরিতৃপ্তি জনিত সুগভীর প্রসন্নতা বিরাজ করিবে। সহস্র জটিল গ্রন্থিতে সংযুক্ত কত ভিন্ন জাতীয় ঘটনার মধ্য হইতে সুকৌশলে তাঁহার কাব্যোক্ত ঘটনাকে সমূলে বিচ্ছিন্ন করিয়া, নূতন ঘটনার সহিত সুষ্ঠু যোগসূত্র রচনা করিয়া ঘটনাকে রূপান্তরিত করিয়া মধুসূদন তাঁহার আখ্যায়িকাকে যে অখণ্ড সুষমায় মণ্ডিত করিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচায়ক। গ্রীক্ সাহিত্যিকদিগের অনুসরণ করিয়া তিনি একটি সুদীর্ঘ ঘটনার শেষ ভাগকে তাঁহার কাব্যের বিষয় বস্তু নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। তিনি যে ভাবে আখ্যায়িকা পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে গ্রীক প্রথার সমধিক উপযোগিতা রহিয়াছে। লঙ্কাযুদ্ধের শেষাংশের আড়াই দিন তাঁহার কাব্যের বিষয়ীভূত। প্রথম দিনের ঘটনাকে প্রারম্ভ, প্রথম রাত্রির ঘটনাকে পরিণতি, অবশিষ্টাংশকে পরিসমাপ্তি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

লঙ্কা সমর অবসানপ্রায়, যুদ্ধের জয়পরাজয় একরূপ সুনিশ্চিত কালসর্পসম দয়াশূন্য পূর্ব্ব কর্ম্মফল দুরন্ত কৃতান্তের ন্যায় রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিতেছে। প্রলয়ের কাল-অগ্নি ভুবনমনোমোহিনী স্বর্ণলঙ্কাকে ভস্মীভূত করিতেছে। যে রক্ষঃকুলের শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা সংস্কৃতি, রীতিনীতি জগতে অতুলনীয়, যাহাদের কুলগৌরববোধ, দেশাত্মবোধ, স্বজাতি বাৎসল্য জগতে অদ্বিতীয়, যাহাদের শৌর্য্যবীর্য্য ত্রিভুবনজয়ী সেই রাক্ষসকুল সমূলে নির্ম্মূল হইতেছে। দেব-দৈত্যনরত্রাস সহস্র সহস্র রক্ষোবীরগণ এই কালসমরে নিহত হইয়াছে। শূলী শম্ভুনিভ কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে রাবন বুঝিয়াছেন যে যুদ্ধ বিক্রম অপেক্ষা বৃহত্তর শক্তি তাহাকে হীনবল করিতেছে। এই কালান্তক বিধিরোষকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা বৃথা, রাজকুলশেখর রাবন তাঁহার এই সর্ব্বনাশকে রাজোচিত ধৈর্য্য সহকারে অমোঘ বিধিলিপি বলিয়া বরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্নেহশীল পিতৃহৃদয় শতপুত্রশোকে অহর্নিশি হু হু করিয়া জ্বলিতেছে। এই অসহনীয় যন্ত্রণা জুড়াইবার জন্য তিনি কনক লঙ্কা ছাড়িয়া নিবিড় কাননে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন। অমরবৃন্দ যার ভুজবলে কাতর সেই বীরবাহু সামান্য মানবের হাতে নিহত হইয়াছে শুনিয়া রাবণের প্রতীতি দৃঢ়তর হইয়াছে যে গ্রহদোষে স্বর্ণলঙ্কা আজ ধ্রুব সর্ব্বনাশের মুখে প্রবেশ করিতেছে। পুত্রশোকে আজ তিনি ভগ্ন হৃদয়। শোক বিকল হৃদয়ে তিনি স্বয়ং যুদ্ধের জন্য সাজিতেছেন। কবি রক্ষঃ সেনা-বাহিনীর যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে লঙ্কার অগণিত বীরকুল কিরূপ উজাড় হইয়া গিয়াছে সেই শ্মশানচিত্রটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অক্ষম কবি এই সুযোগে লক্ষ লক্ষ ত্রিভুবনজয়ী বীরের বর্ণনা দিয়া পাতার পর পাতা বীররসের ফোয়ারা ছুটাইতেন। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের কবি তাঁহার অন্তরের ভাস্বর রসদৃষ্টির দ্বারা তাঁহার কাব্যরচনা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। রাবণের যুদ্ধসজ্জার কথা শুনিয়া চিররণজয়ী ইন্দ্রজিৎ রণে যাইবার উল্লাস প্রকাশ করেন। রাবণের কিন্তু একমাত্র প্রিয় পুত্রকে কালকুটেভরা কালসর্পের বিবরে পাঠাইতে মন সরিতেছে না। ইন্দ্রজিতের দুর্দ্দমনীয় যুদ্ধসাধ তিনি প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। বিশ্বের যে যৌবনশক্তি আপনার উদ্দাম বাসনার বলেই অসম্ভবকে সম্ভব করে, সীমাহীন আত্মপ্রত্যয়ের জোরে পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাবিঘ্নকে অলীক করিয়া তুলে, আঘাত, সংঘাত, বিপদ্, সঙ্কটের সম্ভাবনা যাহার শিরা উপশিরার প্রতি রক্তবিন্দুকে নাচাইয়া তুলে সেই দুর্নিবার যৌবনশক্তি ইন্দ্রজিতের মধ্যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ইন্দ্রজিতের সেনাপতিপদে অভিষেক আখ্যায়িকার প্রারম্ভ।

সর্ব্বশুচিবরে সর্ব্বজয়ী ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া যুদ্ধে যাত্রা করিবেন এই সংবাদে সারা লঙ্কায় আনন্দের ঢেউ বহিয়া গেল। যুগযুগান্তরের নৈরাশ্যের গুরুভার এক মুহূর্ত্তে খসিয়া গেল। মুমূর্ষুর কাছে অনন্তজীবন, অনন্ত-যৌবনের স্বপ্ন বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিল। লঙ্কার গৌরবরবি উদয়শিখরে তাহার দুঃখবিভাবরী প্রভাত হইল। আজ রক্ষো নর-নারী নৃত্যে গীতে, হাসি উচ্ছ্বাসে, আনন্দোৎসবে আত্ম-হারা। ত্রিভুবনজয়ী কনকলঙ্কার আশানৈরাশ্য, বিপদ্‌সম্পদের ফলাফল শুধু লঙ্কার মধ্যে আবদ্ধ নয়। ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিবেন এই সংবাদে ত্রিভুবনে প্রলয়ের কালমেঘের করালছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। অগ্নিদেবকে যজ্ঞে প্রসন্ন করিয়া মনোমত বরলাভ করিয়া ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধযাত্রা

করিলে রাক্ষসপক্ষের জয় ও রামচন্দ্রের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। রাক্ষসরাজ রাবণ পরম অধর্ম্মাচারী, সংসারমদমত্ত, দেবদ্রোহী, পরধন, পরদার হরণ তাঁহার নিত্য কর্ম্ম। কত প্রেমময়ী কুলবধূকে পশুবলে হরণ করিয়া কত গৃহের সুখের দীপ তিনি নিভাইয়াছেন; শত শত ঘরে নিরন্তর মর্ম্মভেদী হাহাকার ধ্বনি উঠিতেছে। তাঁহার পাপরাশির ভারে বসুধা অধীরা, অনন্ত ক্লান্ত। রাক্ষসপক্ষ জয়ী হইলে ধর্ম্মের মহিমা লুপ্ত হইবে; কলুষদ্বেষিণী ভবানন্দময়ী লক্ষ্মীদেবীর পাপপরিপূর্ণ লঙ্কাপুরীতে কারাবাস চিরস্থায়ী হইবে; চিরদুঃখিনী সতী-কুলরত্ন, পতিবিরহে শোকাকুলা সীতা চিরকালের জন্য পতিমুখদর্শনে বঞ্চিতা হইবেন ও হিংস্র বাঘিনীসদৃশ চেড়ীসহ পরিবৃত হইয়া তমোময় অশোককাননে চিরবন্দিনী রহিবেন। কিন্তু ইন্দ্রজিতের অপরাজেয় পরাক্রম প্রতিরোধ করিবে কে?

সদাধর্ম্মপথগামী রামচন্দ্র পিতৃসত্যরক্ষাহেতু বনবাসী, ধনহীন। তাঁহার রিক্ত জীবনের অমূল্য সম্পদ, ধর্ম্মের কণ্টকময় দুর্গমপথের সুখদুঃখের অংশভাগিনী জীবনসঙ্গিনী জনকতনয়া পাপপূর্ণ নির্দ্দয় লঙ্কাপুরীতে বন্দিনী। এই বন্দনীয় দম্পতীর মিলন সাধনের জন্য দেবকুল প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত কিন্তু দেবকুলসহ দেবেন্দ্র বিক্রমকেশরী মেঘনাদের হস্তে পরাস্ত। ইন্দ্রজিৎ কোনরূপে একবার নিহত হইলে তাঁহারা রাবনকে পরাজিত করিয়া চিরদুঃখিনী সীতাকে কারামুক্ত করিয়া রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিবেন একথা নিঃসন্দেহ। নিরুপায় দেবরাজ দেবাদিদেব মহাদেব ও বিশ্বজননী পার্ব্বতীকে ইন্দ্রজিৎ বধের জন্য অনুরোধ করেন। ভক্ত রাবনের দুর্দ্দশাতে শিব অত্যন্ত কাতর কিন্তু তিনি বুঝিয়াছেন লীলাময়ী বিধির অমোঘ নিয়মে রাবনের নিজ কর্ম্মফল ক্ষুধান্ধ রাক্ষসীর মত তাহাকে গ্রাস করিতেছে। তাহার এই সর্ব্বনাসকে প্রতিহত করা কোন দেবতা বা মানুষের শক্তির অতীত। মায়ার প্রসাদে লক্ষ্মণ ইন্দ্রাজিৎকে বধ করিবে। বধের জন্য নশ্বর দেব অস্ত্র রামচন্দ্রের নিকট প্রেরিত হইল। দেবীশ্বরী মায়া এই কাজের জন্য লঙ্কার উত্তর দ্বারে চণ্ডীর দেউলে আবির্ভূত হইলেন। সৌমিত্রিকেশরী মায়াবিভীষিকার সকল জাল অকাতরে ছিন্ন করিয়া অকুতোভয়ে দেবীর মন্দিরে বর লাভার্থ উপস্থিত হইলে আকাশবাণী হইল, "দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলি সৌমিত্রি, দেবকুলতুল্য তুই অমর হইলি।" দেবী লক্ষ্মণকে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিয়া পূজারত ইন্দ্রজিৎকে শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমণ করিয়া সহসা বিনাশ করিতে আদেশ করেন।

শত শত রথী মহারথী একত্রে যে দুর্ম্মদ রাক্ষসের হাতে জর্জ্জরিত, যাহার বিক্রমের কথা স্মরণ করিয়া দেবলোকে দেব, নরলোকে নর, নাগলোকে নাগ থর থর কম্পমান সেই ইন্দ্রজিতের সহিত লক্ষ্মণকে একাকী যুদ্ধের জন্য নগর মধ্যে পাঠাইতে রামচন্দ্র কিছুতেই সম্মত নহেন। কিন্তু লক্ষ্মণের বীরোন্মাদনা তিনি প্রতিরোধ করিতে পারিতেছিলেন না; তাহার উপর আকাশবাণী তাঁহার দেববাণী অবহেলাকে অনার্য্যসুষ্ট অভিহিত করায় তিনি কোন মতে সম্মতি প্রকাশ করেন। মহাতেজস্কর দেব অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া লক্ষ্মণ মায়ার বলে অদৃশ্য হইয়া যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন 'কুশাসনে ইন্দ্রজিৎ পূজে ইষ্টদেবে নিভৃতে; কোষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী, চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে।' রুদ্ধদ্বার গৃহে এই দেবাকৃতি জ্যোতির্ম্ময় রথীকে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ বিস্মিত হইলেন এবং লক্ষ্মণ বলিয়া চিনিতে পারিলে তাঁহাকে আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ করিয়া নিজে অস্ত্র সজ্জিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। লক্ষ্মণ ন্যায়যুদ্ধে অসম্মতি প্রকাশ করিলে কোন বীরকে জয়লাভে বীরের সদ্গতি হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারে এই চিন্তায় তাঁহার সমস্ত চিত্ত ব্যথিত হইল, এই নির্লজ্জ, কপটসমরী, বীরকুলগ্লানি ক্ষত্রিয়ের উপর তাঁহার অপরিসীম ঘৃণা জন্মিল, এবং এই হীনমতি তস্করকে সমুচিত শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু মায়ার কৌশলে অসহায় নিরস্ত্র অবস্থায় আনার মাঝারে সিংহের মত নিহত হইলেন। লঙ্কার পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে। ইন্দ্রজিৎনিধন পর্য্যন্ত আখ্যায়িকার পরিণতি।

নশ্বর দেব-অস্ত্রে সজ্জিত, মায়ার বরে অদৃশ্য লক্ষ্মণের হাতে নিরস্ত্র অসহায়, ধ্যানমগ্ন ইন্দ্রজিতের নিধন এই ঘটনা হইতে স্বতঃই করুণরস উৎসারিত হইয়া উঠে; এই জন্য ইহা করুণরসাত্মক কাব্য রচনার সবিশেষ উপযোগী।

যাহার জন্য শোক তাহার রূপগুণ আমাদের মনের মধ্যে যদি ফুটিয়া না উঠে, তবে সেই শোককে অবলম্বন করিয়া দীর্ঘ কাব্য রচনা করিলে করুণরসের মধ্যে বলিষ্ঠতার অভাব অনুভূত হয়, এবং এই করুণরস মেরুদণ্ডহীন দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির অশ্রুমোচন প্রবণতায় পর্য্যবসিত হয়। যেখানে আঘাত অপেক্ষা বেদনা বেশী, বেদনা অপেক্ষা কান্না বেশী সেই কান্না যেমন কাহারও অন্তর স্পর্শ করে না, তেমনি যে বীরের যুদ্ধবিক্রম আমাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে নাই তাহার বিনাশে যে শোক তাহা মনকে গভীর ভাবে নাড়া দিতে পারে না, এবং সেই বীরের রণহুঙ্কার, বীরোন্মাদনা ও সংগ্রামোল্লাস বিশ্রাম কক্ষে সবেগে অসিচালনার ন্যায় শূন্যগর্ভ। বীরত্বচিত্রটি অন্তরের মধ্যে দীপ্তিমান্ হইয়া না উঠিলে করুণরস ও বীররস উভয়ই হীনবল হইয়া পড়ে। মেঘনাদবধ ঘটনার মধ্যে কোথাও নায়কের বীরত্ব প্রদর্শনের সুযোগ নাই। কবি এই সুযোগের অভাবকেই সুকৌশলে একটি সুযোগে পরিণত করিয়াছেন। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যাহা সীমাতীত তাহাকে শিল্পরূপ দিতে হইলে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা পরোক্ষ উপায়ই অধিকতর ফলপ্রসূ কেন না তাহার যদি একটি ঘোরতর বস্তুতান্ত্রিক চিত্র দেওয়া যায় তাহা অনেক সময় একটি পরিহাসচিত্র হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু কবি যদি পাঠকের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া ক্ষান্ত হন এবং পাঠকের কল্পনা কবির আভাসে ইঙ্গিতে একটি বীরত্বের চিত্র নিজে নিজে অঙ্কন করে তবে কবির উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। ইন্দ্রজিতের বীরত্বের কোথাও প্রত্যক্ষ বর্ণনা নাই। তাঁহার অভিষেকে ত্রিভুবনময় সন্ত্রাস, তাঁহাকে নিরস্ত্র অবস্থায় নিধনের জন্য দেব ও মানবের ষড়যন্ত্রের ত্রিভুবনব্যাপিনী বিপুলতা, বধের কৌশল জানিবার জন্য লক্ষ্মণের অলৌকিক সাধনা এই সকল ঘটনার ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিতে আমাদের মন তাঁহার অপরিসীম বীরত্বের একটি সুমহীয়ান্ চিত্র কল্পনা করিয়া নেয়। ইন্দ্রজিৎ নামের অর্থবত্তা কবি এরূপ গভীর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাহা কাব্যের ছত্রে ছত্রে এরূপ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে যে ইহাই বীরত্বের চিত্রটি আরও উজ্জ্বলতর করিয়া তোলে।

অধর্ম্ম পক্ষকে নায়ক নির্ব্বাচন করিয়া, তাহাদের উপর অন্তরের সমস্ত সমবেদনা ও করুণা ঢালিয়া দিয়াও কবি যে কাব্যরস পরিবেশনে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহার এই সাফল্য নির্ভর করিতেছে আখ্যায়িকার বিশেষতঃ পরিসমাপ্তি অংশের পরিকল্পনার অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্বের উপর। ধর্ম্মবোধ ও কাব্যবোধ আমাদের মনের দুইটি স্বতন্ত্র বৃত্তি একথা যেমন সত্য, আমাদের সত্তার একটি অখণ্ড ঐক্যের জন্য তাহারা পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত এ কথাও সেইরূপ সত্য। লোক মতের দ্বারা যাহা ধর্ম্ম বলিয়া অভিনন্দিত কিন্তু কবির অন্তর যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে না তাহার উপর ব্যঙ্গ, উপহাস, বিদ্রূপ, অবজ্ঞা বর্ষণ করিয়া কাব্য রচিত হইতে পারে। যাহা নিত্যকালের সার্ব্বভৌম মানদণ্ডে ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত, যাহা ধর্ম্ম বলিয়া কবির অন্তরে পূজিত, সেই ধর্ম্মের পরাজয়কে সমর্থন করিয়া কাব্য রচনা করিয়া কোন কবি, তিনি যেরূপ প্রতিভাবান্ হউন, মানুষের চিত্ত জয় করিতে পারেন না। পাপের নিকট পুণ্যের পরাজয় কাব্যের বিষয়বস্তু হইতে পারে। সে কাব্যে কবি প্রতিপন্ন করেন জয় পরাজয় সম্পূর্ণ বাহিরের জিনিস, নিতান্তই তুচ্ছ, একেবারেই অলীক; মানব জীবনের একমাত্র সত্য বস্তু, নিত্য বস্তু, মানুষের ধর্ম্ম, মানুষের আত্মা। যে নপুংসক সেই শক্তিশালীর পদলেহন করে, যে কাপুরুষ সেই বিজয়ীর নিকট আত্মসমর্পণ করে; জয়পরাজয়, পরাক্রান্তের পরাক্রমের দর্প মানুষের বন্ধনহীন চিরবিজয়ী আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যেখানে ধর্ম্ম অধর্ম্মের হাতে উৎপীড়িত সেখানে অধর্ম্ম মানুষের সমবেদনা আকর্ষণ করিতে পারে না। মধুসূদনের কল্পনায় লঙ্কাযুদ্ধে মেঘনাদবধের যে গুরুত্ব রামায়ণে এই ঘটনার সে গুরুত্ব নাই। রামায়ণে ইন্দ্রজিৎবধে সীতা উদ্ধারের বিঘ্ন-সঙ্কুল পথের একটি প্রধান বিঘ্ন অপসারিত হইল। রূপকথার রাজপুত্র ডালিমকুমারের প্রাণ ছিল রাজপুষ্করিণীর রোহিৎ মৎস্যের মধ্যে, সেই রোহিৎ মৎস্য যেদিন ধরা পড়িল, রাজপুত্র সেইদিন প্রাণত্যাগ করিল। মেঘনাদবধ কাব্যে সেইরূপ ইন্দ্রজিতের বিনাশেই পুত্রগত প্রাণ রাবণের বিনাশ সাধিত হইয়াছে। রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ

বিনাশের পরও সীতার উদ্ধার সম্বন্ধে আমাদের মন সংশয়াচ্ছন্ন; যুদ্ধের ফলাফল জানিবার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে পাতার পর পাতা উল্টাইয়া যাই। মেঘনাদ বধ কাব্যে ইন্দ্রজিতের বিনাশে দেবকুল ভাবিলেন স্বর্গ অধর্ম্মাচারী রাবণের রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত হইল, রামচন্দ্র ভাবিলেন লক্ষণের অলৌকিক বীরত্ব ও ধর্ম্মপ্রিয় দেবকুলের আনুকূল্যের বলেই তিনি সীতা উদ্ধারে সমর্থ হইলেন, সীতা ভাবিলেন সত্য সত্যই অবশেষে তাঁহার কারাগার-দ্বার খুলিল। যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে সংশয়মুক্ত হওয়ায় আমাদের চিত্ত স্থির, ধর্ম্মরূপিনী সীতার বন্দিনীদশার অবসান সুনিশ্চিত জানিয়া আমাদের মন প্রসন্ন। এই জন্যই আমরা রাবণের দুর্দ্দশার দিকে আমাদের মন প্রসারিত করিতে পারি, আমাদের সমস্ত চিত্ত দিয়া পুত্রশোক কাতর রাবণের মর্ম্মভেদী বেদনা অনুভব করি।

ব্যাধের তীক্ষ্ণ শরের আঘাতে তরুশাখাসীন পাখী যেমন গতপ্রাণ হইয়া ধরাশায়ী হয় ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে রাজা রাবণও সেইরূপ সিংহাসন হইতে অচেতন হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। পুত্রশোকের প্রচণ্ড আঘাতে তিনি অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করিবেন এই আশঙ্কায় শিব তাঁহাকে রুদ্ররসে পূর্ণ করিয়া সচেতন করিলেন। পুত্রহন্তা কপটসমরী সেই সৌমিত্রিকে নিহত করিয়া তাঁহার নিদারুণ জ্বালা কিছু পরিমাণে জুড়াইবেন এই আশায় রাবণ সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে চলিলেন। পুত্রের অন্যায় নিধন প্রতিবিধান করিবার জন্য রাজা যে বীরত্ব প্রকাশ করিলেন তাহাতে দেবকুলরথীগণ ও রাঘব পক্ষীয় অন্যান্য মহারথীগণ জর্জ্জরিত হইয়া একে একে রণে ভঙ্গ দিলেন। অবশেষে পুত্রবরকে স্মরণ করিয়া সরোষে মহাতেজস্কর অস্ত্র মহাশক্তি নিক্ষেপে লক্ষ্মণকে ভূপতিত করিয়া রাজা গৃহে ফিরিলেন। পুত্রশোকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া রাবণ বিষাদে মাটিতে বসিয়া আছেন; তিনি প্রাতে শুনিলেন দেবের প্রসাদে লক্ষ্মণ পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে, শুনিয়া তিনি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন —'বুঝিনু নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে কর্ব্বুর-গৌরবরবি।' দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত স্বর্ণলঙ্কার ধ্বংসকে, ত্রিভুবনজয়ী রাক্ষসকুলের বিনাশকে তিনি পরম-সহিষ্ণুতার সহিত অদৃষ্টলিপি বলিয়া মানিয়া লইলেন। বিধিরোষকে প্রতিহত করিবার বাসনা তাঁহার অন্তর হইতে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। মহা-সর্ব্বনাশের সম্মুখীন হইয়াও রাজা রাবণের রাজমহিমা লুপ্ত হয় নাই। তিনি রাজোচিত মহানুভবতার সহিত বিজয়ী বীরের বীরত্বের প্রশংসা করেন। তাঁহার প্রতি কোন বিদ্বেষকে তিনি মনে স্থান দেন নাই। তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন চিরলীলাময়ী নিয়তির নির্দ্দেশেই রামচন্দ্র তাঁহার শত্রু ও আজ তিনি পরাজিত। পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন করিবার জন্য তিনি যুদ্ধবিরতি ভিক্ষা করেন। সিন্ধুতীরে পুত্র ও পুত্রবধূর সৎকার করিয়া সর্ব্বস্বহারা রাবণ শূন্য লঙ্কায় ফিরিয়া আসিলেন; 'সপ্ত-দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।'

এই সাতদিনের অবসানে রাবণ পুনরায় যুদ্ধে যাইবেন একথা আমরা ভাবিতেও পারি না। কবি কোথাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই যে ইন্দ্রজিত বধের সঙ্গে সঙ্গেই লঙ্কাযুদ্ধের অবসান হইয়াছে ও সীতার উদ্ধার সাধন করিয়া রামচন্দ্র লঙ্কা ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিলেন কিন্তু তাঁহার সমস্ত কাব্যই এই ইঙ্গিতে পূর্ণ। তিনি আখ্যায়িকা নির্ম্মাণ কৌশলের দ্বারা এরূপভাবে ক্রমে ক্রমে আমাদের মনকে প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছেন যে রাজা রাবণ সমস্ত প্রিয়জনকে হারাইয়া প্রিয়জন বিয়োগের ব্যথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন এবং তাঁহার পরম শত্রুকেও আজ তিনি এই ব্যথা দিতে সম্মত হইবেন না, তিনি স্বহস্তে কারাগার দ্বার খুলিয়া সীতাকে রামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিয়া বৃথা রাজ্যসুখে জলাঞ্জলি দিয়া নিবিড় কাননে প্রিয়পুত্রগণকে স্মরণ করিয়া অবিরল অশ্রুজল মোচন করিবেন। লঙ্কাযুদ্ধের এই জাতীয় অবসানের সুস্পষ্ট উল্লেখ চির-পরিচিত ঘটনা এরূপভাবে বিপর্য্যস্ত হইত যে আমাদের মন রূঢ় আঘাত পাইত কিন্তু কবি তাঁহার কাব্যের ঘটনা ও চরিত্রকে এভাবে বিকশিত করিয়াছেন যে এইরূপ অবসান এতই অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী যেন ইহার স্পষ্ট উল্লেখের পর্য্যন্ত আবশ্যক নাই, ইহার উল্লেখ যেন নিতান্তই বাহুল্যমাত্র।

সপ্তম সর্গে রাজা রাবণের যে বীরত্বের পরিচয় পাই তাহার তুলনা নাই। কিন্তু এই বীরত্বের মধ্যে কোথাও বীররস নাই। ইহার প্রাণশক্তি উৎসাহ নয়, ক্রোধ এবং ক্রোধ-শোকসঞ্জাত। রাবণের মধ্যে জয়োল্লাস দেখিতে পাই না, দেখিতে পাই কেবল একটা সুতীব্র বিষদিগ্ধ প্রতিশোধ-বাঞ্ছা। শত্রুপক্ষকে ছিন্নভিন্ন দলিত করিয়া লঙ্কার লক্ষ্মীশ্রী ফিরাইয়া আনিবার কোন প্রেরণাই তিনি অনুভব করেন নাই। তিনি সুস্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে তাহা একেবারেই অসম্ভব। তিনি কেবল চাহিয়াছিলেন অগ্নিময় শরজাল বর্ষণে কপটসমরী পুত্রহীনা সৌমিত্রিকে ভস্মীভূত করিয়া নিজের ক্ষতহৃদয়ে একটু স্নিগ্ধ প্রলেপ লাগাইবেন। ছলনাময় সমরনায়কদের ন্যায় তিনি রক্ষঃ-সেনাবাহিনীকে মিথ্যার আশার দ্বারা উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। লঙ্কার সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে এ কথা তিনি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। লঙ্কাবাসীর জীবন আজ স্বাদহীন, রসহীন, অর্থহীন। জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই অধিকতর বাঞ্ছিত। ইন্দ্রজিতের অন্যায় মৃত্যুর প্রতিশোধের চেষ্টায় প্রাণবিসর্জ্জন দিয়া জীবন সার্থক করিবার জন্য তিনি তাহাদের উৎসাহিত করেন। রাণী মন্দোদরীর নিকট তিনি রাজ্যসুখে জলাঞ্জলি দিয়া পুত্র-শোকে নিবিড় কাননে অহরহ বিলাপ করিবার যে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহা শোকপ্রকাশের শূন্যগর্ভ বাঁধাবুলি মাত্র নহে, তাহার মধ্যে তাঁহার অন্তরের দীপ্ত সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। লক্ষ্মণের পুনর্জীবন প্রাপ্তির কথা শুনিয়া রাজা শত্রুপক্ষ-বিনাস-উল্লাসে মদমত্ত গজপতির ন্যায় বীরনাদে স্বর্গ মর্ত্ত প্রকম্পিত করেন নাই। তিনি বুঝিলেন গণিত-শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে যুদ্ধবিক্রমে জয় পরাজয়, চেষ্টা ও ফলাফলের হিসাব নিকাশ চলে না। চিরলীলাময়ী নিয়তির নিগূঢ় নিয়মে জীবন নিয়ন্ত্রিত। মানবীয় শক্তি অপেক্ষা বৃহত্তর এক মহা রহস্যময় শক্তি অপ্রত্যাশিতভাবে জীবনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া মানুষের চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। তাই আজ তিনি পরাজিত। পরাজয়ের সম্মুখীন হইয়া তিনি হাত মোচড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া, বুক চাপড়াইয়া আপনার রাজমহিমা ক্ষুণ্ণ করেন নাই। কিন্তু তিনি রামচন্দ্রকে বিজয়ী বীর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাকেও নিয়তির হাতে ক্রীড়নক ভাবিয়া তাঁহার প্রতি সকল দ্বেষ, হিংসা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়াছেন। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতেই রাবণের পরাজয় ও রামচন্দ্রের জয় সাধিত হইয়াছে। এইজন্যেই বিশ্বরমা লক্ষ্মী ধর্ম্মরূপিণী সীতা, সদা-ধর্ম্মপথগামী রামচন্দ্র আমাদের মন হইতে মুছিয়া যান, জাগিয়া থাকে কেবল অনন্ত রত্নময়ী, অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী স্বর্ণলঙ্কার সকরুণ শ্মশানচিত্র আর মহামহিমময়ী রাজ-দম্পতীর পুত্রশোকের অরুন্তুদ চিরস্থায়ী বেদনা। (ক্রমশঃ)

শ্রীসন্তোষকুমার প্রতিহার
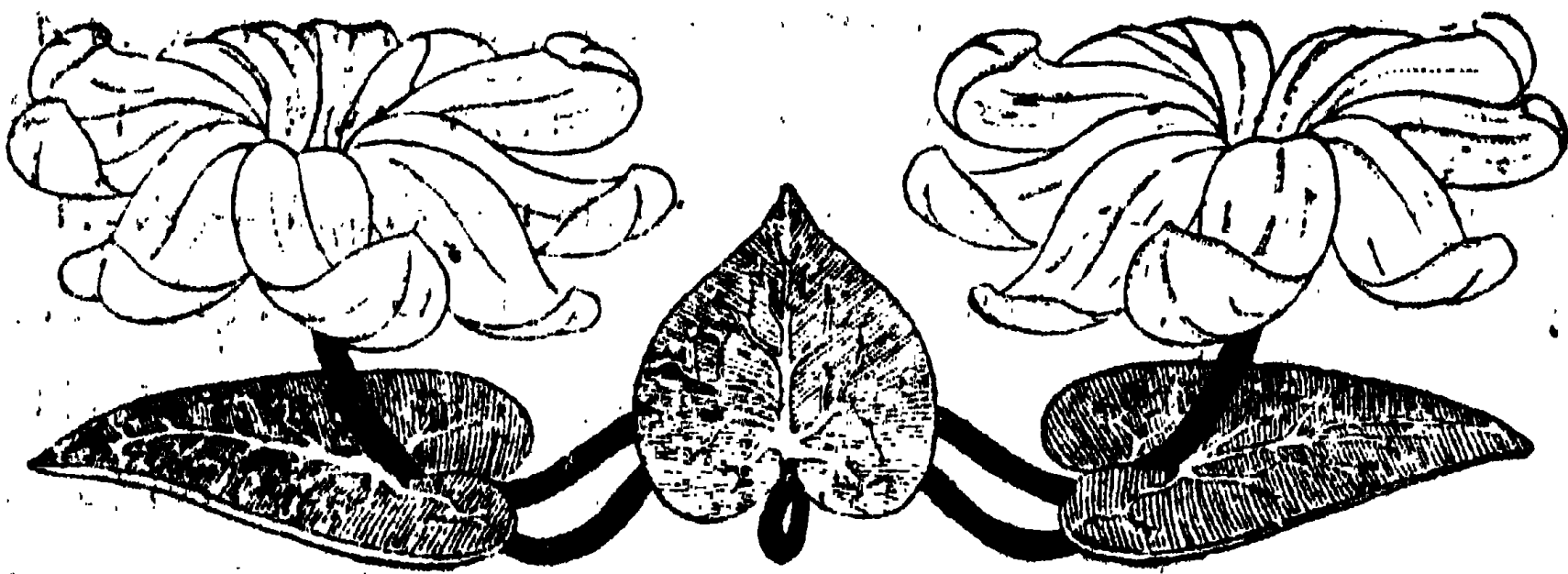
সঙ্গীতকুশল কুমিল্লা

নারায়ণ চৌধুরী

প্রায় বছর চারেক আগে পত্রান্তরে আমি কুমিল্লাকে সঙ্গীতজগতের আধুনিক বিষ্ণুপুর ব'লে আখ্যাত ক'রেছিলাম। সে-কথাটা হয়ত তখন তেমন ক'রে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি অথবা দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও কথাটার সার্থকতা কেউ তেমন তলিয়ে দেখে নি। তখনও হয়ত কুমিল্লার সাঙ্গীতিক প্রতিপত্তির কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েনি; কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যে এইদিক থেকে সে তার দাবীকে এমন ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে যে 'আধুনিক বিষ্ণুপুর' কথাটা যে তার ন্যায়সঙ্গত ভাবে প্রাপ্য সে-বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। কুমিল্লার সঙ্গীত-কুশলতার সঙ্গে যাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁরাই এ-কথা স্বীকার করবেন যে এযুগে কুমিল্লা বাংলা গানকে যতো দিক থেকে যে ভাবে সমৃদ্ধ করেছে তেমন আর কেউ পারেনি।

সকলেই জানেন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর একটি অতি প্রাচীন সঙ্গীত-কেন্দ্র। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এখানে ব্যাপকভাবে ধ্রুপদ গানের চর্চা হ'ত। ধ্রুপদ চর্চার জন্য সমগ্র ভারতে বিষ্ণুপুরের নাম প্রসিদ্ধ ছিল এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে শিক্ষার্থীমণ্ডলী ধ্রুপদ শিক্ষার মানসে বিষ্ণুপুরে সমবেত হ'তো। ধ্রুপদের এমন ব্যাপক চর্চা আর কোথাও হ'তো কিনা সন্দেহ। বিষ্ণুপুরের গোস্বামী ও বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার হিন্দুসঙ্গীতের এই সর্বোচ্চ শাখাটিকে এমন নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ছিলেন যে আজও সেই আগ্রহ একেবারে নষ্ট হয়ে যায়নি। এখনও বাংলাদেশে ধ্রুপদ চর্চা বলতে যাকে বোঝায় তার প্রায় ষোল আনা অংশই বিষ্ণুপুরের শিল্পীদের দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে।

বিষ্ণুপুর হিন্দু-সংস্কৃতির কেন্দ্র, সেইজন্তে বিষ্ণুপুরের শিল্পীরা রাগসঙ্গীতের আদিমতম এবং প্রধানতম রূপ ভাগবত সাধনার অঙ্গীভূত অতি পবিত্র ধ্রুপদ সঙ্গীতকেই গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন। তারদের অন্যান্য স্থানে মুসলমান শিল্পীদের হাতে খেয়াল দ্রুত প্রসার লাভ করছিলো এবং অনিবার্য পরিণতি হিসেবে ধ্রুপদের ভাগ্যে ঘটেছিলো অনাদর; কিন্তু বাংলার এই বিষ্ণুপুরে কথনও ধ্রুপদচর্চা শিথিলীকৃত হয়নি, পরিপার্শ্বের অপেক্ষাকৃত চটুল সাঙ্গীতিক আবহাওয়ার মধ্যেও সে তার প্রাচীন সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল।

বিষ্ণুপুরের কথা সবিস্তারে বললাম এটা দেখাতে যে যে কোন একটা বিশেষ জায়গার পক্ষে একটা গৌরবময় সংস্কৃতিকে এ ভাবে ধ'রে রাখা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতচর্চায় আংশিক ভাবে ভাটি পড়লেও নিরুৎসাহ হবার কারণ নেই, কেন না সেই সূত্র তুলে ধরেছে বাংলা দেশের অন্য প্রান্তের আরেকটি জায়গা আধুনিক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যার দানকে নানা দিক থেকে চিহ্নিত ক'রে রাখা কর্তব্য। আমি নিজে কুমিল্লাবাসী ব'লে এ-কথা বলছি তা নয়। এটা বলতে পারি, যে কোনো নিরপেক্ষ সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিই আমার এ কথায় সায় দেবেন যে বাংলা গানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে কুমিল্লার দোসর আবিষ্কার করা কঠিন।

স্বভাবতই সাধারণের মনে হবে, বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ আর কুমিল্লার বাংলা গানকে এক পর্যায়ভুক্ত করায় ঐ উভয় শ্রেণীর গানের মূল্য নিরূপণের ব্যাপারে আমি বিবেচনার পরিচয় দিতে পারিনি। কিন্তু এটা বলা দরকার ধ্রুপদ আর বাংলা গান এক পর্যায়ভুক্ত নয় জেনেও আমি কুমিল্লা-প্রচারিত বাংলা গানকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিতে চাই। বাংলা গানের আদর্শ কী হওয়া উচিত বিভিন্ন

প্রবন্ধে আমি সে কথা বলেছি এবং আমার মনে হয় এই দিক থেকে কুমিল্লা সে আদর্শের যতো কাছাকাছি পৌঁছয় আর কোনো জায়গা ততো নয়। বাংলা গানকে যাঁরা অতি মাত্রায় চটুল, বাণীসর্বস্ব সুররিক্ত গান ব'লে মনে করেন লেখক তাদের দলে নয়। এ কথা বার বার বলা হয়েছে যে, বাংলা গানের ভিত্তি যদি উচ্চাঙ্গের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের উপর না প্রতিষ্ঠিত থাকে তা হ'লে তাকে যথার্থ বাংলা গান আখ্যায় আখ্যাত করা উচিত নয়। বাংলা গানের প্রাণ প্রতিষ্ঠাকল্পে খাঁটী বাঙ্গালীত্বকেই আবাহন করতে হবে সে সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই, কিন্তু রাগসঙ্গীতের কাঠামোতে যদি তাকে ধ'রে না রাখা হয় তা হ'লে সে গান অধিক দিন স্থায়ী হ'তে পারে না। সুতরাং অনিবার্য ভাবে বাংলা গান রাগ সঙ্গীত চর্চার উদ্বোধন করতে বাধ্য।

কুমিল্লা বাংলা গানকে একটা নূতন বিশেষত্ব দান করেছে এ কথা বলার মানে এ নয় যে তার দৃষ্টি শুধু বাংলা গানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, বরং সেই বিশেষত্ব দান করতে গিয়ে তার দৃষ্টি বাংলা গানের সঙ্কীর্ণ সীমাকে ছাড়িয়ে সঙ্গীতের বিভিন্ন বহু ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে। রাগ সঙ্গীতের ব্যাপক চর্চা না করলে কখনও বাংলা গানকে বিশেষত্ব মণ্ডিত করা চলতে পারে না এটা যখন সত্য তখন এ-কথা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ যে কুমিল্লার বাংলা গান চর্চার সঙ্গে রাগসঙ্গীতের সাধনা ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। একটা আরেকটার উপস্থিতিকে সূচনা করে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কুমিল্লার রাগসঙ্গীত চর্চার ইতিহাস সংক্ষেপতঃ বিবৃত করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ত্রিপুরা জিলা বাংলা দেশের একেবারে পূর্ব সীমায় অবস্থিত, কুমিল্লা তারই সদর সহর। ত্রিপুরা জিলার আকাশে বাতাসে গানের বীজ আছে ছড়িয়ে; এর জল-মাটির গুণই এমন যে অতি মাত্রায় গদ্যময় জীবের পক্ষেও সেই সাঙ্গীতিক প্রভাবকে কাটিয়ে উঠা বিশেষ শক্ত। ত্রিপুরা জিলার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর, বক্র রেখায় প্রবাহিত বহু পার্বত্য নদী, প্রকৃতির অযাচিত দান-সমৃদ্ধ বিস্তীর্ণ শ্যামল শস্যক্ষেত্র, অনতিদূরে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের নাত্যুচ্চ পাহাড়ের শ্রেণী দেশটিকে এমন একটি শ্রী দিয়েছে যে সমভূমি বাংলার অন্যান্য জায়গার সঙ্গে তাকে এক ক'রে দেখা চলে না। এমন যে-দেশের শ্রী ও সৌন্দর্য তা যে সেই দেশের অধিবাসীদের সাধারণ জীবন যাত্রার মধ্যে একটা ছন্দের সুষমা এনে দেবে তা এমন কিছু আশ্চর্য নয়। এদেশের অতি নিম্নস্তরের লোকদের মধ্যেও সঙ্গীতপ্রবণতা এতো দূর স্পষ্ট ও প্রকট যে অনেক সময় এই অপূর্ব যোগাযোগের কারণ দর্শানো শক্ত হ'য়ে পড়ে।

ত্রিপুরা জেলার পাশেই হলো স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য। স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগড়তলা-ও সঙ্গীতচর্চায় বিশেষ প্রসিদ্ধ। আগড়তলার রাজপরিবারের শিল্পচর্চার বিভিন্ন শাখায়, বিশেষ করে সঙ্গীতে, অপূর্ব পারদর্শিতার কথা সর্বজনবিদিত। সেই রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত কুমার শচীন্দ্রদেব বর্মণ আজন্ম কুমিল্লার অধিবাসী। তিনি যে বাংলা গানকে কতো দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছেন তা ব'লে বোঝানো যায় না। তা ছাড়া, ত্রিপুরার নিজস্ব সম্পদ ভাটিয়ালিতে তিনি যে কলাকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তার থেকে এ-কথাটা আমাদের বিশেষ ভাবে মনে হয়েছে যে যাঁরা বলেন উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত চর্চাকারীরা ভাটিয়ালি প্রভৃতি পল্লী সঙ্গীতের মূল সুরটুকু ধরতে পারে না তাঁরা ভ্রান্ত। কেননা, কুমার শচীন্দ্রদেবই তার একটী উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। Classico-modern songs নামে যে বিশেষ ভঙ্গিমার বাংলা গান বর্তমানে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, কুমার শচীন্দ্রদেবই বলতে গেলে তার প্রবর্তক। বাংলা গানকে রাগ সঙ্গীতের ভিত্তির উপর স্থাপিত ক'রে তিনি তাকে এমন একটা অভিনবত্ব দান করেছেন যে শুধু সেই জন্যেই বাংলা গানের ইতিহাসে তাঁর নাম স্পষ্টাক্ষরে লেখা থাকা উচিত। বাংলা গানের খাঁটী জাতীয়ত্বকে বর্জন না ক'রে কী ভাবে তার ওপর, রাগ সঙ্গীতের ভর চাপানো যায় কুমার শচীন্দ্রদেবের গান তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাংলা গানের এই বিশেষত্বটুকুর উপর নজর রেখে তিনি বহু দিন যাবৎ কলিকাতার প্রসিদ্ধ ওস্তাদ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের নিকট উচ্চাঙ্গের হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শিক্ষা

করছেন। অথচ একাগ্র নিষ্ঠা ও সাধনার ফলে তাঁর কণ্ঠ আশ্চর্য রকম পরিমার্জিত ও বিশুদ্ধ হয়েছে ; সুরের স্থায়িত্বের প্রতিও তিনি অনুরূপ অবহিত। ভাটিয়ালি সঙ্গীতে অতিরিক্ত পরিমার্জিত কণ্ঠস্বর অনেকটা বাধা স্বরূপ, কেননা ভাটিয়ালির গ্রাম্য আমেজটুকু 'সাধা' গলায় প্রায় ক্ষেত্রেই ধরা পড়তে চায় না। গ্রামবাসীদের অমার্জিত বন্ধুর কণ্ঠেই বরং তার লীলা স্বতঃস্ফূর্ত ও সহজ হ'তে দেখা যায়, নাগরিকতার সংস্পর্শে এলেই যেন সে বড়ো ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়ে। কুমার শচীন্দ্রদেবের সাধা গলায় কিন্তু এর স্পষ্ট ব্যতিক্রম দেখা যায়। তাঁর কণ্ঠে গ্রাম্য আমেজটুকু এমন মধুর ভাবে এসে ধরা দেয় যে তার থেকেই প্রমাণ হয় ত্রিপুরাবাসীর অস্থি মজ্জার ভেতর এই 'ভাটিয়ালিত্ব'টুকু আছে লুকিয়ে, নাগরিকতার ধূলিধূসর স্পর্শ পর্যন্ত তাকে মলিন করতে পারে নি।

পল্লী সঙ্গীতে ত্রিপুরাবাসীর কৃতিত্বের কথা প'ড়ে অনেকেই হয়ত মনে করতে পারেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তার দান তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু তাঁদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, বাংলা দেশে বর্তমানে যিনি শ্রেষ্ঠ 'ওস্তাদ', শুধু বাংলা দেশে কেন, সমগ্র ভারতে যাঁর জুড়ি খুঁজে পাওয়া আজকের দিনে সত্যই দুষ্কর, সেই ওস্তাদপ্রবর প্রোফেসর আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের বাড়ি এই ত্রিপুরা জিলায়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত শিবপুর গ্রাম তাঁদের পৈতৃক নিবাস। 'নাগারচি' অর্থাৎ বাদ্যকরের বংশে প্রোফেসর আলাউদ্দীনের জন্ম, সুতরাং ছোট বেলা থেকেই সাঙ্গীতিক আবহের মধ্যে তিনি মানুষ হ'য়েছিলেন এবং যে-প্রতিভা ভবিষ্যতে বিরাট মহীরুহের আকারে চতুর্দিকে ডাল পালা মেলে ধরেছে তার বীজ প্রোফেসর আলাউদ্দীনের ভেতর উপ্ত হ'য়েছিল জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই। তাঁর দাদা আপ্‌তাবুদ্দিন সাহেবও খুব বড়ো বাজিয়ে ছিলেন। বাঁশী ও তবলায় তাঁর কৃতিত্বের কথা সর্বজন বিদিত। যদিও গভীর জ্ঞান ও কলানৈপুণ্যের দিক থেকে তিনি প্রোফেসর আলাউদ্দীন থেকে অনেক নিচে ছিলেন তা হ'লেও তিনি ছিলেন খাঁটী সাধকের ন্যায়। এইজন্যে লোকে তাঁকে ফকীর ব'লে ডাকতো। এঁরা দুজনেই মুসলমান হয়েও কালী-ভক্ত। ত্রিপুরা জেলার ধর্ম-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সাধক ভুবন রায় ও মনোমোহন দত্তের নাম খুব প্রসিদ্ধ, আপ্তাবুদ্দিন ফকীর সাহেব তাঁদের ভক্তিমূলক গানগুলোকে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচার করেছিলেন। আপ্‌তাবুদ্দিন খান সাহেবের শ্বশুর গুল মামুদও একজন বড়ো ওস্তাদ ও কালীভক্ত ছিলেন। প্রোফেসর আলাউদ্দীন খান সাহেবের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। উজীর খাঁর শিষ্যদের মধ্যে যে কজন আজও বেঁচে আছেন তিনি তাঁদের ভেতর সর্বাগ্রগণ্য। স্বরদে ও বেহালায় তাঁর পারদর্শিতার কথা আজ শুধু ভারতবর্ষ নয় সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি বহুদিন যাবৎ মাইহার রাজ্যের রাজকীয় সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে সেখানেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করছেন। আলাউদ্দীন খান সাহেবের ছোট ভাই আয়েত আলী খানও সেতার যন্ত্রে একজন বড় গুণী।

এ ছাড়া আরো অনেক ওস্তাদ ত্রিপুরা জেলার ইতঃস্ততঃ ছড়িয়ে আছেন; কিন্তু মুখ্যত কুমিল্লার কথা বলবো ব'লে অকারণ কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে তাঁদের কথা আর এখানে অবতারণা করতে চাই না।

বলেছি কুমিল্লার বাংলাগানের ভিত্তি classical। সুতরাং রাগসঙ্গীত চর্চায়ও কুমিল্লার দান অবশ্বীকার্য্য। কুমার শচীন্দ্রদেবের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তারপর আসে মহম্মদ খুরসীদের (খশ্রু মিঞা) কথা। তিনি নিজে একজন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক, রাগ-সঙ্গীতের সাধনায় তিনি তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছেন বলা যেতে পারে। তিনি কিছুদিন ভারতবিখ্যাত ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খাঁ সাহেবের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি রাজকার্য্যে অধিষ্ঠিত আছেন। খেয়াল, ঠুংরী ও গজলে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর শিষ্য কুমিল্লার সঙ্গীত-শিক্ষক সমরেন্দ্র পালও রাগসঙ্গীত চর্চায় সমস্ত মনপ্রাণ নিয়োজিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সুরযোজয়িতৃদের মধ্যে সুরসাগর হিমাংশুকুমার দত্তের নাম সকলেই জানেন। তাঁর সুরযোজনার বিশেষত্ব হ'ল এই যে রাগসঙ্গীতের উপর ভিত্তি ক'রে তিনি তাঁর গানগুলোতে সুর যোজনা করেন।

সুরমাধুর্য, লালিত্য, সূক্ষ্মকলাকারু, ছন্দ প্রভৃতি সকল দিক থেকেই তাঁর সুর-দেওয়া গানগুলো অতুলনীয়। তাঁর সম্বন্ধে এখানে আর বিস্তৃত আলোচনা করবো না। কেননা ইতিপূর্বে 'বিচিত্রা'র পৃষ্ঠাতেই সে সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হ'য়ে গেছে।* তবে এ ক্ষেত্রে এটা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে রবীন্দ্রপরবর্তী সুরকারদের মধ্যে তাঁর স্থান সকলের পুরোভাগে। রবীন্দ্রনাথ, দিলীপকুমার প্রভৃতি উচ্চস্তরের সঙ্গীতবেত্তারা তাঁর সুরযোজনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। হিমাংশুকুমারদের পরিবারে সঙ্গীতের ব্যাপক চর্চা হ'য়ে থাকে। হিমাংশুকুমারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত শচীন্দ্রকুমার দত্ত বি, এ, মহাশয় বহুদিন লক্ষ্ণৌতে শ্রেষ্ঠ ওস্তাদের কাছ থেকে সেতার বাদন শিক্ষা করেছেন। বর্ত্তমানে তিনি দিল্লীতে সঙ্গীত শিক্ষাদান কার্য্যে নিরত আছেন

তারপর জ্ঞান দত্ত। বাংলা গজল গানে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত তাঁর মেগাফোন রেকর্ডের গানগুলো বাংলাদেশের সকলের মুখে মুখে ফিরতো। তিনি বর্ত্তমানে বোম্বের কোন এক প্রসিদ্ধ ফিল্ম কোম্পানীতে প্রধান সঙ্গীত পরিচালকের কাজ করছেন। ত্রিপুরার আরো কয়েকজন সঙ্গীতবিদ্ কলিকাতায় সঙ্গীত পরিচালকের পদে বৃত আছেন তন্মধ্যে কোলাম্বিয়া ও রেডিওর শৈলেশ দত্ত গুপ্ত, সেনোলার বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শৈলেশবাবু পরলোকগত ওস্তাদ বাদল খাঁ সাহেবের নিকট সঙ্গীতবিদ্ শিক্ষা করতেন, বর্ত্তমানে তিনি বিখ্যাত ওস্তাদ দবীর খাঁ সাহেবের শিক্ষাধীনে আছেন। প্রোফেসার আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব সুদূর মাইহারে আছেন ব'লে বাঙ্গালী শিক্ষার্থী সেখানে কদাচিত যেতে পারে। বর্ত্তমানে একমাত্র কুমিল্লার নীহার চৌধুরী (পুতুল) সুদূর মাইহারে আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের তত্ত্বাবধানে থেকে স্বরদ শিক্ষা করছেন। আত্মীয় বন্ধু বিরহিতভাবে এতো দূর বিদেশে এবং মাইহারের ন্যায় জনবিরল স্থানে একা থেকে সঙ্গীত সাধনা করা যে কতোদূর দুরূহ ব্যাপার তা সহজেই অনুমেয়।

আমাদের দেশে বেশীর ভাগ মেয়েরাই গান শেখে, তবে সে কী ধরণের গান তা নিশ্চয় আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। সস্তা, চটুল, সুররিক্ত বাংলা গান শিক্ষাতেই মেয়েদের সমস্ত কৃতিত্ব নিঃশেষিত; উচ্চাঙ্গের রাগসঙ্গীত চর্চায় তাদের উৎসাহ স্পষ্ট, প্রকটভাবে অনুপস্থিত। বিয়ের বাজারে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কোন দাম নেই, তাই সম্ভবতঃ মেয়েরা অথবা মেয়েদের অভিভাবকস্থানীয় 'সুররসিক' ভদ্রলোকেরা সেদিকে বিশেষ নজর দেন না। কিন্তু সত্য সত্যই এমন দুএকটি মহিলা চোখে পড়ে যাঁদের ভেতর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চ্চার আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল। তাঁদের সে ইচ্ছা এতো খাঁটি যে তাকে দাবিয়ে রাখা অন্যায়। যদিও এই ধরণের ভদ্রমহিলার সংখ্যা হাতে গোনা যায় তা হ'লেও সঙ্গীত শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁদের দানকে স্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত ক'রে রাখা কর্তব্য। এইদিক থেকে কুমিল্লার মায়াদেবী, শৈলদেবী, মীরাদেব বর্মন, ও শোভনা রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

মায়াদেবী ও শৈলদেবী দুজনেই বিবাহিতা মহিলা। অথচ বিবাহিত জীবনের নানা বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে এঁরা দুজনে যেভাবে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শিক্ষা করছেন তাতে তাঁদের প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। মায়াদেবী কল্‌কাতায় প্রসিদ্ধ ওস্তাদ বৃদ্ধ গফুর খাঁ সাহেবের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করছেন; আর শৈলদেবী ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের শিক্ষাধীনে আছেন। কুমারী শোভনা রায় অনেকদিন পরলোকগত ওস্তাদ খলিফা বাদল খাঁ সাহেবের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন।

কুমিল্লার এইরূপ আরো অনেকে সঙ্গীত শিক্ষা ব্যপদেশে নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছেন, তাঁদের সকলের নাম এস্থলে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। অবশিষ্টদের মধ্যে যাদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁদের কথা এখানে সংক্ষেপে বল্‌বো। তবলা বাদনে কুমিল্লার উমেশচন্দ্র দাস বি, এ, মহাশয় এক সময়ে বাংলাদেশজোড়া নাম কিনেছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ ওস্তাদ খলিফা আবিদ হোসেন খাঁ সাহেবের নিকট কিছুকাল তবলা বাদন শিক্ষা করেছিলেন। বর্ত্তমানে কেষ্ট দাস ও রসিক চক্রবর্ত্তী প্রসিদ্ধ ওস্তাদ মজিদ খাঁ সাহেবের নিকট

---

*১৩৪৫ সালের চৈত্র সংখ্যা বিচিত্রায় লেখকের লিখিত "বাংলা গানের আদর্শ" দ্রষ্টব্য।

তবলা শিক্ষা করছেন। ত্রিপুরার বাঁশের বাঁশীর অনুপম মাধুর্য কে না সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছে! বাঁশের বাশীতে মনু রায়, গোপেন্দ্র নারায়ণ, মিহির সিংহ রায়, সুধীন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। এস্রাজে প্রোফেসর হরিহর রায়, বিপিন তানরাজ, রসিক চক্রবর্ত্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া ওস্তাদ হাফেজআলি খাঁ সাহেবের ছাত্র ভোলা দাস সেতারে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। গায়কদের মধ্যে সুরেশ চক্রবর্ত্তী বর্ত্তমানে ভীষ্মদেব বাবুর শিক্ষাধীনে আছেন।

সঙ্গীতকে 'তৌর্যত্রিক' এই নামে অভিহিত করা হয়। সেই হিসেবে গীত, বাদ্য এবং নর্ত্তন এই তিনটিকেই সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত করা চলে। সুতরাং সেই দিক থেকে নৃত্য-শিল্পীদের নাম এস্থলে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নৃত্যশিল্পে মণি বর্ধনের নাম সর্বজন পরিচিত। তিনি তাঁর নৃত্য-ছন্দের মধ্যে দিয়ে যে গভীর ভাবের দ্যোতনা সকলের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেন তাকে সোচ্চার প্রশংসার দ্বারা অভিনন্দন জানাতে হয়। ভাবদ্যোতক নৃত্যে তাঁর সমকক্ষ বাংলা দেশে আর কেউ বর্তমানে নেই। একমাত্র উদয়শঙ্কর ছাড়া নৃত্যে এরূপ পারদর্শিতা আর কেউ অর্জন করতে পারেননি। তা ছাড়া আছেন শান্তিনিকেতনের শান্তিদেব ঘোষ (চাঁদপুর), কুমিল্লার শান্তি-বর্ধন ও পরেশ সিংহ রায় (শান্তিনিকেতন)।

গীতিরচনার ক্ষেত্রেও কুমিল্লা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। রবীন্দ্রোত্তর গীতিকারদের মধ্যে যে কজন দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে অজয় ভট্টাচার্যকে সর্বাগ্রগণ্য বলা যেতে পারে। তাঁর গানের সৌকুমার্য, লালিত্য, ভাব সম্পদ কোনটাই উপেক্ষনীয় নয়। গ্রামোফোন, সিনেমা, রেডিওর কল্যাণে তাঁর গান আজ বাংলার জনসাধারণের মুখে মুখে ফিরছে। তা ছাড়া আছেন প্রসিদ্ধ গীতিকার সুবোধ পুরকায়স্থ, ভাবসমৃদ্ধির দিক থেকে যাঁর গানগুলোর একটি বিশেষ মূল্য আছে।

সংক্ষেপে কুমিল্লার সঙ্গীতকুশলতার পরিচয় প্রদান করা হ'ল। কুমিল্লা যে সঙ্গীতজগতে একটি বিশেষ গৌরবের স্থান অধিকার করেছে সে আমাদের পক্ষে রীতিমতো গর্বের বিষয়। ভগবৎ চরণে প্রার্থনা করি কুমিল্লা তার এই সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যকে যেন বাঁচিয়ে রাখতে পারে; আর যারা ভবিষ্যৎ কুমিল্লার অধিবাসী তারা যেন ব্যাপক চর্চার দ্বারা এই ঐতিহ্যকে আরো বেশি গৌরবমণ্ডিত করতে পারে এবং জীবনান্তে সংস্কৃত ও মার্জিত অবস্থায় তাকে তুলে দিয়ে যেতে পারে পরবর্তী বংশধরদের হাতে।

নারায়ণ চৌধুরী

সুমিত্রা

(নাটক)

শ্রীঅশোক সেন এম-এ

চরিত্র

সুমিত্রা—ব্যারিষ্টার সুশীল সেনের স্ত্রী। স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর বন্ধু অরুণ গুপ্তকে বিবাহ করেন।

অরুণ গুপ্ত—M.R.C.P. (Lond) সুমিত্রার বন্ধু। সুশীল সেনের মৃত্যুর পর সুমিত্রাকে বিবাহ করেন।

পবিত্র—সুশীল সুমিত্রার একমাত্র পুত্র।

রেবা—সুমিত্রা-অরুণের একমাত্র কন্যা।

জলধি—সুশীল সেনের পিতৃব্য।

মিঃ বসু—সুশীল সেনের বন্ধু।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[অরুণ গুপ্তের বসিবার ঘর। অরুণ গুপ্ত ও ব্যারিষ্টার মিঃ বসু।]

মিঃ বসু—সুশীল কাল রাত তিনটায় বুঝি মারা গেলো?

অরুণ—না, at about five.

মিঃ বসু—মরার সময়েও জ্ঞান হয় নি?

অরুণ—না। সেই চারটার সময়ে accident—বাসের সঙ্গে ধাক্কা। সেনের ড্রাইভার ত' then and there মারা যায়। সেনও তখনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে। Hospitalএ নিয়ে আসে অজ্ঞান অবস্থায়। তারপর আর জ্ঞান হয় নি।

মিঃ বসু—Most unfortunate incident. Barএ ত্বরা rise কোরতে আরম্ভ করেছিলো। এ বাবৎ যা রোজগার করেছে পৈত্রিক ধার শোধ করতেই তা' বোধ হয় খরচ হয়ে গেছে। কতোবার বলেছি—বাপের ধার শোধ করবার তোমার প্রয়োজন কি? বলতো—"ও, একটা সংস্কার ভাই। মনে মনে অনেক সময় ভাবি সত্যিই; বাবার ধার আমি কেন শোধ করবো, তবু কি রকম একটা খটকা লাগে মনে। আর তা' ছাড়া বেশী দিন দরকারও লাগবে না ও কটা টাকা শোধ দিতে। Practice যে রকম হচ্ছে আশা করি দু'চার বছরে ওই টাকা শোধ দিয়েও যথেষ্টই সঞ্চয় করতে পারবো।" আর কিছু না হোক এতে মনে মনে একটু vanityও হয় যে বাপের ধার শোধ দিচ্ছি।

অরুণ—গত বছর যখন ছেলে হলো তখন কি আনন্দ সুশীলের—এখন স্ত্রী এবং ছেলের যে কি দশা হবে বুঝি না।

মিঃ বসু—Let us not bother about that. ওসব unsolvable questions এর solution ত কোন কালেই পাওয়া যায় না। মাঝের থেকে ওসব বিষয়ে ভাবতে গেলে কেবল energy নষ্ট। যদি আমাদের দ্বারা সত্যিকার কিছু উপকার হতো আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা নিশ্চয় করতাম।

অরুণ—তোমার মত সব ব্যাপার ঠিক ওভাবে আমি নিতে পারি না বোস। জীবনের বেশীর ভাগ ব্যাপারই প্রথমতঃ কঠিন মনে হয়। ওই অবস্থায় যদি ভয় পেয়ে সরে আসো তবে কোন কাজেই সাফল্য পাবে না। বিশেষতঃ আমি ডাক্তার বলে এসব ব্যাপার আরও ভালো ভাবে বুঝি। পূর্ব্বেকার কত দুরারোগ্য ব্যাধি আজকাল cured হচ্ছে ওসকল বিষয়ে ক্রমাগত research করার জন্ম। তখন যদি ওসব রোগের থেকে দূরে সরে থাকা যেতো তবে ওসব রোগ কখনই সারতো না। আমার ত' মনে হয় আমাদের প্রত্যেকের এখন সুমিত্রার কাছে যাওয়া উচিত এবং সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত তাকে সাহায্য করবার।

মিঃ বসু—আমি তা' মনে করি না। এক্ষেত্রে নিছক মেয়েলী সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া প্রকৃত উপকার আমরা কি করতে পারি। তা' ছাড়া পৃথিবীতে প্রতিদিন কত লোক মারা যাচ্ছে এবং তাতে কত সংসার ছারখার হয়ে যাচ্ছে। এভাবে কটা লোকের উপকার আমরা করতে পারি—এবং পারলেই বা করবো কেন? আমার মনে হয় এসব ক্ষেত্রে

দূর থেকে সহানুভূতি করাই ভালো। কাছে গেলেই জড়িয়ে পড়বে।

অরুণ—তোমার মতো অত broadly ভাবতে শিখিনি। বন্ধুকে সংসারের অন্যান্য অপরিচিতের থেকে পৃথক ভাবেই দেখি। তার বিপদকে যতটা নিজের ভাবি পৃথিবীর অন্যান্য লোকের বিপদকে মোটেই সেভাবে দেখি না। আমি ভাবছি এখন একবার সুমিত্রার সঙ্গে দেখা করবো। জানি তুমি যাবে না, সেজন্য বৃথা অনুরোধও তোমাকে করছি না।

মিঃ বসু—Thanks—very sorry কিন্তু সত্যিই ওখানে যাওয়া আমার দ্বারা আর হবে না। তোমার funny ideas নিয়ে তুমিই থাকো—কিন্তু সত্যিই দেখো আমাদের friends circle এর অন্য কেউও যাবে না।

অরুণ—আমিও সে কথা জানি। বুঝি না কি দিয়ে গড়া তোমরা সব। অথচ শোনা যায় মড়া ঘাঁটতে ঘাঁটতে এবং ছুরি চালাতে চালাতে নাকি ডাক্তারদের মন হয় পাথর দিয়ে গড়া। অথচ তোমাদের মত পরের বিপদ দেখে কখনও এভাবে নিশ্চেষ্ট থাকতে পারি না। হয়ত' তোমার কথাই সত্যি, গিয়ে কোন লাভ হয় না। তবু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি? একশ'র মধ্যে এক জায়গাতেও যদি কিছু করা যায় সেই ত' যথেষ্ট।

মিঃ বসু—বিয়ে করনি এখন ওসব উদ্ভট ideas নিয়ে বেশ চলে যাচ্ছে। কিছুদিন যাক্, বিয়ে করো, সংসারের অন্যান্য নানা বন্ধন আসুক তখন কোথায় ভেসে যাবে এসব philanthropic ideas.

অরুণ—In that case I prefer to die a bachelor.

মিঃ বসু—দেখা যাক্, কতোদিন এ রকম মনোভাব থাকে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সুমিত্রা সেনের বাড়ী। একমাস পরের ঘটনা। অরুণ গুপ্ত ও সুমিত্রা সেন]

অরুণ—রোজই ভাবি আপনার কাছে আসবো কিন্তু কেমন যেন বাধো বাধো লাগে আসতে।

সুমিত্রা—আপনি তবু এলেন। আর কেউই ত' এলেন না একবারও। এমন বিপদেই পড়েছি। স্বামীর মৃত্যুতে একদিন যে ভাল করে কাঁদতে পাবো সে অবসর পর্য্যন্ত আমার নেই। এক পয়সা সঞ্চয় করে যান নি। একটা ছেলেকে মানুষ করে তুলতে হবে—কোনদিক কি করে সামলাবো সে পরামর্শ দেবার পর্য্যন্ত একটা লোক নেই।

অরুণ—আচ্ছা, সুশীলের কি আত্মীয়-স্বজন কেউই নেই?

সুমিত্রা—এক কাকা আছেন। কাকার অবস্থাও ভালো—স্ত্রী-পুত্রও কেউ নেই। আমরা ছাড়া তাঁর অন্য আত্মীয়ও নেই। কিন্তু আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর সব তো ছিলই না—উভয়ে উভয়কে ঘৃণা করতেন অন্তরের সঙ্গে।

অরুণ—এখন আপনাদের অবস্থা জানলে তাঁর মনের বিদ্বেষ চলে যাবে। একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করলে হয় না?

সুমিত্রা—হয়ত' আপনার কথাই সত্যি অরুণবাবু। কাছে গেলে তিনি হয়ত' আমাদের সমস্ত ভারই নেবেন। কিন্তু যখনই সে-কথা ভাবি মনে হয় স্বামী যেন বলছেন 'সুমিত্রা চেষ্টা করলে কি তুমি এত বড়ো humiliationএর হাত থেকে রেহাই পাও না?' আমার স্বামীকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন—তাঁর কাছ থেকে কোন মতেই সাহায্য নিতে আমি পারি না অরুণবাবু। ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভাবলে আমার চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে। স্বামী সব-সময়েই বলতেন পবিত্রকে ব্যারিষ্টার করে আনবো। ভবিষ্যতে দেখবে সবাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে—কে বড় ব্যারিষ্টার? বাপ না ছেলে? তুমি তখন কোন্‌দিকে যোগ দিবে সুমিত্রা? সে সব যেন স্বপ্নের মত মনে হয়। কোনদিন কি তিনি ভাবতেও পেরেছিলেন স্ত্রী-পুত্রের আজ এই দশা হবে।

অরুণ—(ইতস্তত করিয়া) যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি—

সুমিত্রা—না, তা' আমি পারবো না অরুণবাবু। যদিও আপনি আমার স্বামীর বন্ধু, তবু কারোরই দয়ার দান আমি কখনোই নিতে পারবো না। রূঢ় আচরণের জন্য মাপ

করবেন অরুণবাবু। কৃপাপ্রার্থী না হতে হয় এমন যদি কিছু দেখাতে পারেন তো চিরকৃতজ্ঞ থাকবো আপনার কাছে।

অরুণ—আপনি যে কারোর সাহায্য নিতে চাইবেন না তা আগেই ভেবেছিলাম। (কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকার পর) দেখুন Mrs. Sen, আপনার বিষয়ে অনেকদিন অনেক ভেবেও কিছু কুলকিনারা পাই নি। আপনার বিষয়ে বন্ধুদের সঙ্গেও আলোচনা করেছি অনেক। কোন এক বন্ধু ঠাট্টাচ্ছলে একদিন একটা কথা বলে। প্রথমে মনে বিরক্তও হয়েছিলাম। পরে যখন কথাটা ভেবে দেখলাম ভালোভাবে তখন তা একেবারে বাতুলের প্রলাপের মত মনে হলো না। ভাবলাম ব্যাপারটা আপনাকে জানালেই বা ক্ষতি কি?

সুমিত্রা—কি বলেছিলেন আপনার বন্ধু?

অরুণ—(আস্তে আস্তে) যা বলেছিলেন তা' ঠিক মুখে বলা যায় না। আমি সে কথা আপনাকে লিখে জানাবো। আপনার কাছে আমার একান্ত প্রার্থনা এবং অনুরোধ যা আপনাকে জানাবো, সে বিষয় খুব ধীরভাবে এবং স্থিরচিত্তে ভেবে দেখে আপনার মতামত জানাবেন। প্রথমে হয়ত' প্রস্তাবটা আপনার বিষের মত মনে হবে। কিন্তু ভেবে দেখলে দেখবেন আপাতঃদৃষ্টিতে যত বিসদৃশ মনে হয় ব্যাপারটা প্রকৃতপক্ষে তত অর্থশূন্য নয়।

সুমিত্রা—আত্মসম্মানের হানিকর যদি না হয় তবে যে কোন প্রস্তাবই আমার পক্ষে গ্রহণযোগ্য।

অরুণ—আমি চিঠিতে আপনাকে সব জানাবো। কিন্তু আপনাকে বারবার বলছি প্রথমেই শিউরে উঠবেন না। বারবার ভেবে দেখবেন আমার প্রস্তাবটা। অনেক রাত হয়ে গেলো। আজ তবে উঠি।

৪ দৃশ্য

[অরুণ গুপ্তের বাড়ী। মাস ছয় পরের ঘটনা।
অরুণ ও সুমিত্রা]

অরুণ—সুমিত্রা, তোমাকে সব সময়ে এত morose দেখি কেন?

সুমিত্রা—এত অল্প সময়েই নিজেকে সামলে নেওয়াটা কি সম্ভব?

অরুণ—আমাকে বিয়ে করে তুমি মোটেই সুখী হওনি, না সুমিত্রা?

সুমিত্রা—সুখী বা অসুখী হওয়ার কথা এতে নেই। সব সময়েই মনে পড়ে তার কথা। নিজেই আমি বুঝতে পারি না আমি ন্যায় করলাম না অন্যায় করলাম। বিয়ের প্রস্তাব করে যখন চিঠি পাঠালে, প্রথম কয়েক দিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারিনি। তারপর আস্তে আস্তে যখন সুস্থির হলাম তখন ভালোভাবে তোমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখলাম। মনে হলো ক্ষতি কি? যদি নিছক দৈহিক সুখের জন্য হতো তবে এ বিয়ে অসম্মানকর হতো। কিন্তু এর উপর নির্ভর করছে আমার সন্তানের ভবিষ্যত।

অরুণ—আচ্ছা সুমিত্রা, আমাকে কি কোনকালেই একটু ভালবাসতে পারবে না?

সুমিত্রা—দেখ তোমাকে বিয়ে করবার আগেই সে সব আমি অনেক ভেবেছি। সান্নিধ্যে ভালোবাসা না এনে পারে না। তবে এতো তাড়াতাড়ি সেটা সম্ভব নয়। এখন তোমাকে শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি সত্য কিন্তু ঠিক ভাল বাসতে পারি না। আশা করি তুমি আমার এ ত্রুটি ক্ষমা করবে।

অরুণ—তুমি তো সকল দোষ-ত্রুটির উপরে সুমিত্রা! যতো তোমাকে দেখি মুগ্ধ হয়ে যাই তোমার চরিত্র মাধুর্য্যে। সাধারণে হয়ত তোমাকে অসংযমী ভাবে। কিন্তু আর কেউ না জানুক আমি তো জানি কতো তেজস্বী তুমি—কতো মহান্ এবং উজ্জ্বল তোমার চরিত্র। কতো স্ত্রীলোক সন্তানের জননী হন কিন্তু তোমার মত মাতৃত্বের গৌরব তাঁদের ক'জন করতে পারেন জানি না। অথচ সাধারণে তোমার মাতৃত্বকে যে আসন দেবে তাও জানি।

সুমিত্রা—লোকের কথা ভেবে কোনদিন কোন কাজ করিনি, ভবিষ্যতেও করব না। যাকে সত্যি বলে মনে মনে জেনেছি তার পিছনেই ছুটেছি সব সময়ে। 'হয়ত' ভুলও করি সময় সময়, কিন্তু সে দোষ স্বেচ্ছাকৃত নয়। এ অপবাদ কেউ আমাকে দিতে পারবে না—দিলেও তার মত মিথ্যা আর কিছু হবে না।

অরুণ—সে কথা জানি সুমিত্রা। তোমাকে পেয়ে মনে হয় আমার ভেতরের যত গ্লানি, যত আবর্জ্জনা তোমার সংস্পর্শ গুণে সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। অজ্ঞানে হয়ত' অনেক অতিরিক্ত দাবীও করি তোমার উপর।

সুমিত্রা—যে স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা তোমার কাছে পাই তার জন্য তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। এখনও তোমাকে স্বামীর মতো ভালবাস্‌তে পারি না; কিন্তু একথা তোমাকে বল্‌ছি বিয়ে যখন তোমাকে করেছি তোমার প্রতি কোন অবিচারই আমি করব না। তোমার কাছে শুধু এই প্রার্থনা যে তুমি আমাকে একটু সময় দেবে।

অরুণ—চারটা বাজে প্রায়। তৈরী হয়ে নিই। আমার আবার পাঁচটায় একটা callএ যেতে হবে।

সুমিত্রা—আমিও চায়ের বন্দোবস্ত করি।

চতুর্থ দৃশ্য

[অরুণ গুপ্তের বাড়ী। সুমিত্রা ও সুমিত্রার খুড়শ্বশুর জলধিবাবু]

জলধি—তুমি শেষকালে এই কাণ্ড করে বস্‌লে—স্বপ্নেও ভাবিনি এতদূর অধঃপতন তোমার হবে। নিজের দোষ-স্খালনের জন্য এখন বলছো ছেলের ভবিষ্যতের জন্য তুমি একাজ করতে বাধ্য হয়েছো। এ ধরণের কথা নাটক নভেলেই শোনা যায়। বাস্তব জীবনে যে এ রকম সম্ভব এ আমার ধারণার অতীত ছিলো। মানলাম তোমার স্বামী কোন কিছু রেখে যায় নি। তার জন্য এ ভাবে আমাদের বংশে কলঙ্ক না এনে আমাকে একবার জানালেই ত' পারতে।

সুমিত্রা—আপনিও তো কখনও জানবার চেষ্টা করেন নি

জলধি—আমার সঙ্গে তোমরা ত' কোন সম্বন্ধই রাখতে না। সুশীলের মৃত্যু সংবাদটা পর্য্যন্ত আমাকে জানানো প্রয়োজন বোধ করো নি।

সুমিত্রা—বেঁচে থাকতেই যার কোন খোঁজ করলেন না, মরার পর তাঁর খোঁজে যে আপনার এত আগ্রহ হবে তা ভাবি নি।

জলধি—তার সঙ্গে মতবিরোধ থাকলেই যে তার মরার পরও সে সব মনে রাখতে হবে তার কি অর্থ আছে? তাছাড়া তোমাদের এই অসভ্য মডার্ণ চালচলনের জন্যই ত' তার সঙ্গে আমার বনতো না। সুশীলের আত্মা এখন বোধ হয় আমার মতেরই সমর্থন করবে। স্বামীর মৃত্যু হতে না হতেই এভাবে অন্য পুরুষকে বিবাহ—ছিঃ ছিঃ, আমি ভাবতেও পারি না। যাই হোক তোমার যা ইচ্ছা করো। তোমাকে আমি এখন থেকে মৃত মনে করবো। আমি এসেছি সুশীলের ছেলেকে নিয়ে যেতে। তুমি যখন অন্য লোককে বিয়ে করেছো, আমাদের বংশধরকে আমার হাতে দিতে বোধ করি তোমার কোন আপত্তি হবে না—বরং তোমার দিক থেকেও এতে সুবিধাই হবে আজ থেকে আমিই ওর সব ভার গ্রহণ করলাম। তবে ওর সঙ্গে তুমি আর কোন সম্বন্ধ রাখতে পারবে না এও বলে দিচ্ছি।

সুমিত্রা—যার ভবিষ্যতের জন্য এইভাবে আত্মবলি দিলাম সেই ছেলেকে আপনার হাতে আমি কিছুতেই দেব না। আপনি চিরকাল আমাদের ঘৃণা করতেন। আমার স্বামী আমাকে বল্‌তেন আপনার মতো সর্ব্বনেশে লোক তিনি দ্বিতীয় আর একটিও দেখেন নি। আপনি আমাকে এখন বোঝাতে এসেছেন মতের অমিল ছিলো বলেই আপনাদের মধ্যে বিরোধ?

জলধি—তবে—তবে—তুমি কি বল্‌তে চাও?

সুমিত্রা—আপনাদের জ্ঞাতি বিধবা বোন সুকুমার আপনি কি দশা করেছিলেন আশা করি তা এত শীঘ্র ভুলে যান নি?

জলধি—কি? কি? শ্বশুরকে চরিত্র নিয়ে অপবাদ! নিজের উচ্ছৃঙ্খলতাকে ঢাকবার জন্য আমার নামে এই সব জঘন্য অপবাদ?

সুমিত্রা—নিজের চরিত্রহীনতা ঢাকার জন্য মিথ্যা কথা বল্‌বেন না। আমার ছেলেকে আপনার মত লোকের তত্ত্বাবধানে রাখা আমি উপযুক্ত মনে করি না।

জলধি—তা' মনে করবে কেন? তোমার মত সতী মায়ের শিক্ষায় ভবিষ্যতে যে একটি কতো বড় বাঁদর হয়ে উঠ্‌বে তা এখন থেকেই বুঝতে পারছি।

সুমিত্রা—বৃথা বাজে কথা বলে লাভ নেই। আপনি

তুমি আপনার যা বলার ছিলো তা বলা হয়েছে? (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) আমার শেষ কথা আপনাকে বলে দিলাম, আমার ছেলেকে আপনি কিছুতেই পাবেন না। আমার অন্য কাজ আছে, আমি চললাম। (ভিতরে প্রস্থান)

জলধি—আচ্ছা, আমিও দেখে নেব এই ছেলেকে কতোদিন আঁকড়ে রাখতে পারো। এই ছেলেকে দিয়েই একদিন তোমায় কি শিক্ষা দিই দেখে নিও।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

[২০ বছর কাটিয়া গিয়াছে। অরুণের বাড়ী। অরুণ মৃদুস্বরে কবিতা পড়িতেছে। সুমিত্রা কাঁটা দিয়া নিবিষ্টমনে উল বুনিতেছে।]

অরুণ—(পাঠ)

We look before and after
And pine for what is not:
Our sincerest laughter
With some pain is fraught:
Our sweetest songs are thow that tell of saddest thought.

(বই মুড়িয়া) সুমিত্রা!

সুমিত্রা—(আস্তে আস্তে হাতের কাজ হইতে মুখ তুলিয়া) কিছু বলছো?

অরুণ—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো সুমিত্রা?

সুমিত্রা—বলো।

অরুণ—বছর তিনেক বাদে কাল পবিত্র ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরেছে। তোমার এতদিনের আশা সফল হতে চললো—আমি ভেবেছিলাম তোমাকে আরও বেশী আনন্দিত, আরও বেশী প্রফুল্ল দেখবো।

সুমিত্রা—কেন জানি না আমার আজ মনে তেমন একটা আনন্দের ভাব আসছে না। আমি নিজেও বুঝতে পারছি না কেন। কেমন যেন বুকের ভিতর একটা খালি খালি ভাব লাগছে। অবশ্য একটা গুরুকর্ত্তব্য শেষ করার পর যে একটা নিঃশ্বাস-ফেলে-বাচা ভাব আসে তা' বেশ অনুভব করছি। কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে সংসারে কাজ আমার ফুরিয়েছে। এখন যেন আমার বিশ্রামের প্রয়োজন। ইচ্ছে কচ্ছে খুব ঘুমোই। আর কোন কাজ করবার শক্তি যেন আমার নেই।

অরুণ। সংসার থেকে তুমি দুরে সরে গেলে আমি কি করে সব চালিয়ে নেব সুমিত্রা? তুমি তো জানো তোমার উপর কতোটা নির্ভরশীল আমি।

সুমিত্রা—সেকথা বোধ হয় তোমার থেকেও ভাল জানি আমি। দেখ, এ একটা ক্ষণিক অবসাদ। আজ একটা কথাই বারবার মনে হচ্ছে। কতো শুনেছি একজনকেই লোকে ভালবাসতে পারে। এ কথাটা যে কত বড় মিথ্যা তা আমার থেকে বেশী বোধ হয় অন্য কেউ উপলব্ধি করে নি। তাকেও যেমন ভালবাসি; তোমাকেও তার থেকে কম ভালবাসি না। সে আমাকে দিয়েছে পবিত্রকে, তুমি দিয়েছ রেবাকে। কারোর দানই আমার কাছে কম নয়।

[রেবার প্রবেশ। রেবা সুমিত্রা-অরুণের একমাত্র মেয়ে—বয়স সতের বৎসর]

অরুণ—সারাদিন তোমাকে দেখতে পাইনি কেন রেবা?

রেবা—এ কদিন কি আমার ফুরসুৎ আছে? দাদার সমস্ত জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখতেই সময় করে উঠতে পারি না। আজ দাদার শোবার ঘর আর Study roomটা ভাল করে সাজালাম। দাদার যদি বিলাত ঘুরে এসেও সেই অগোছাল ভাব না গিয়ে থাকে তবে আবার দুদিনে সব এলোমেলো করে ফেলবে।

অরুণ—তা' হলেই বা ক্ষতি কি? তোমার মতো একটা বোন থাকবে কি জন্যে? তুমি আবার ঠিক করে সব সাজিয়ে দিতে পারবে না?

রেবা—দাদাকে বলে দেবো যে আমার দ্বারা হবে না। বারবার যে তিনি সব উল্টেপাল্টে একেকার করবেন আর আমি সব গোছাতে বসবো আমাকে যেন সে রকম মেয়ে মনে না করেন। মা এরকম মুখ গোমড়া করে বসে আছো কেন? কাল দাদা আসবে, মনে যেন একটু স্ফূর্ত্তি আসে না।

সুমিত্রা—কাল দাদা আসবে বলে তোমার মতো আমা-কেও নাচতে হবে নাকি ?

রেবা—তা হলে তুমি বসে বসে কাঁদো, আমি একটু বেড়িয়ে আসি ততক্ষণ। (প্রস্থান)

অরুণ। শিশুর মত মন। তোমার তুটো দিক ওরা তুই ভাই বোনে পেয়েছে সুমিত্রা। রেবা যেমন তোমার মত কোমলহৃদয়া আবার পবিত্র হয়েছে ঠিক তোমার মতই তেজস্বী।

সুমিত্রা—ওদের দেখলে কেউ বলতেও পারবে না ওরা এক পিতার সন্তান নয়। ওদের এত ভাব দেখলে আমার যেন মাঝে মাঝে ভয় হয়। সব জানতে পারলেও ওদের কি এই রকম সুন্দর সম্বন্ধই থাকবে তোমার মনে হয় !

অরুণ—তা না থাকবার তো কোন কারণ দেখতে পাই না সুমিত্রা। তোমার ছেলেমেয়ে ওরা—তোমার মতই হবে। ওদের ভেতর কোন হীনতা বা নীচতা কখনও আসতে পারে বলে আমার তো মনে হয় না। সত্যিই কি অদ্ভুত জীবন তোমার। নিজের দিকে জীবনে কখনও তাকালে না। তুমি যেন পরের স্বার্থের জন্য সারাজীবন বলি দিয়ে এলে নিজেকে।

সুমিত্রা—দেখ, তুমি আমাকে ওভাবে প্রশংসা করো না। তাতে যেন মনে হয় আমাকে ব্যঙ্গ করছো। শুধু আমাদের বাঁচাতে গিয়ে তুমি যে কাজ করলে তার তুলনায় কতটুকু প্রতিদান পেয়েছো আমার কাছ থেকে ?

অরুণ—কি পেয়েছি তা আমি জানি সুমিত্রা—প্রকাশ করবার চেষ্টা করে তোমার অমর্য্যাদা আমি করব না।

(চাকরের প্রবেশ)

চাকর—বাবু, এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান।

অরুণ—চল্ যাই।

তৃতীয় অঙ্ক

[মাস তিনু পরের ঘটনা। অরুণ গুপ্তের বাড়ী।

সুমিত্রা ও পবিত্র। সময় তুপুরবেলা।]

সুমিত্রা—এই তুপুরবেলা চুল উস্কোখুস্কো করে পাগলের মত হয়ে কোথা থেকে এলে পবিত্র ? তুমি কি আজ কোর্টে যাওনি ? একি ! এ রকম করছো কেন ? কি হয়েছে আমাকে খুলে বলো পবিত্র।

পবিত্র—(কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর) শোন এখন বেশী কথা বলার আমার শক্তিও নেই ইচ্ছাও নেই। আজ কোর্টে জলধিবাবু বলে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করে কতকগুলি কথা বলেছেন। আমি শুধু জানতে চাই তার কথা সত্য কি না ?

সুমিত্রা—(বিহ্বলভাবে) কি ভীষণ প্রতিহিংসাপরায়ণ। ওই সর্ব্বনেশে লোকটা তোমার সঙ্গে দেখা করলো !

পবিত্র—জলধিবাবু কি ধরণের লোক তা দিয়ে আমার কিছু আসে যায় না। আমি শুধু জানতে চাই অরুণবাবুর সঙ্গে আমার প্রকৃত সম্পর্ক কি।

সুমিত্রা—তুমি আগে একটু স্থির হও পবিত্র, আমি সবই তোমাকে বলছি।

পবিত্র—অত কথা শোনবার আগ্রহ বা প্রবৃত্তি আমার নেই। তুমি ন্যায় করেছো কি অন্যায় করেছো তাও আমি তোমার কাছে শুনতে চাই না। আমি শুধু জানতে চাই তুমি আমার বাবার মৃত্যুর ছয় মাস পরেই এই গুপ্তকে বিয়ে করেছ কি না ?

(সুমিত্রা নিরুত্তর ভাবে হাতে মুখ ঢাকিলেন)

ওঃ বুঝেছি। আচ্ছা আর আমার কিছু জানবার দরকার নেই। এখন আমি চল্লাম—ভবিষ্যতে তোমার সঙ্গে আমার কোনই সম্পর্ক থাকবে না।

(প্রস্থানোদ্যত)

সুমিত্রা—(বেগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া পবিত্রের হাত ধরিয়া) না, না, যখন শুনেছ তখন সবটাই তোমাকে ভালোভাবে জেনে বিচার করতে হবে আমার কোথায় অপরাধ।

পবিত্র—(পুনর্ব্বার বসিয়া পড়িল) বেশ তোমার যা বলবার আছে বলো।

সুমিত্রা (বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর) শোন পবিত্র, তোমার বাবা যখন মারা যান এক পয়সা আমাদের জন্য রেখে যেতে পারেন নি। জলধি বাবু তোমার বাবার কাকা। তিনি তখন একবার খোঁজও নেন নি। তা ছাড়া তাঁর সঙ্গে তোমার বাবার কোন

মিলও সদ্ভাব ছিল না। যে কারণে তাঁদের মনোমালিন্য তাও তোমাকে বিশদভাবে বল্‌ছি। জলধিবাবু তাঁর বিধবা জ্ঞাতি সম্পর্কের এক বোনের সর্ব্বনাশ করে তাকে কুকুরের মত পরিত্যাগ করেন। সে আলোচনা তোমার সঙ্গে আর করতে চাই না। তাঁর কাছে সাহায্য নেওয়া মানেই তোমার বাবার মৃত আত্মাকে অসম্মান করা—আমি তখন এই ভেবেছিলাম। শুধু তখন কেন এখনও আমি মনে করি তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে গেলেই তোমার মৃত বাবাকে আমি অপমান করবো। কি করি ভেবে আমি তখন পাগল হয়ে উঠেছিলাম। পরের দয়া ভিক্ষা করতে পারি না। তোমাকে কি করে মানুষ করবো এই ভাবনাই আমাকে তখন অস্থির করে তুললো। তখন যদি আমি বিয়ে না করতাম আজ তোমাকে নিয়ে বোধ হয় পথে পথে ভিক্ষা করতে হতো। আবার বিয়ে করার পর একদিন জলধিবাবু এসে অযাচিতভাবে আমাকে নানা কথা শুনিয়ে গেলেন। তাঁর স্বরূপ তুমি জান না। আমার কথা শোন। তোমাকে এ ভাবে উত্তেজিত তিনি তোমার ভালোর জন্য করেন নি। আমাদের উপর হিংসার ভাব তাঁর এখনো কাটেনি। আমরা যে শান্তিতে কাল কাটাচ্ছিলাম এটা তাঁর সয়নি বলেই আজ এতোদিন পরে সে সব কথা তোমাকে এসে বলে গেছেন।

পবিত্র—বুঝলাম যেন তিনি খুব খারাপ লোক। তাঁর বিষয় আমি একটুও ভাবছি না। আমি খালি ভাবছি এর থেকে তুমি আমায় নিয়ে পথে পথে ভিক্ষা করলেও ভালো ছিলো। মায়ের দেহের বিনিময়ে এই যে উচ্চশিক্ষা পেয়ে, মাছ মাংস খেয়ে দিন কাটাচ্ছি এ কথা মনে হলে আমার মনে হয় এমন কোথাও যাই যেখানে জনপ্রাণী নেই, পশুপক্ষী নেই, আলো বাতাস নেই। এ তুমি আমার কি করেছ? আমার মনে হচ্ছে সমস্ত লোক যেন আমাকে এতোকাল ধরে উপহাসের চক্ষে, কৃপার চক্ষে, করুণার চক্ষে দেখে আসছে। এর থেকে আমায় গলা টিপে মেরে ফেল্‌লে না কেন? সেও যে শতগুণে ভালো ছিলো। যাক্‌, তুমি যা ভাল মনে করেছিলে তাই করেছো। কিন্তু আমি আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকবো না। আমি যাই।

সুমিত্রা—শোন পবিত্র, যাই বল্‌লেই তুমি যেতে পাবে না। তোমাকে মানুষ করে তোলার জন্য নিজের দিকে না চেয়ে, লোকের মতামতের কথা না ভেবে নিজের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করলাম—সে তোমাকে এভাবে ছেড়ে দেবার জন্য নয়। ওরে বিশ্বাস কর, বিয়ে করবার সময়ে শুধু তোর কথাই ভেবেছিলাম, নিজের দিকে তাকাইও নি। আর যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় তবে মেয়েমানুষ আমি বুদ্ধির দোষে যা করে ফেলেছি তা' ক্ষমা করে দে, দয়া কর্‌।

পবিত্র—জঘন্য দোষ করেও লোকে কি ভাবে তা ঢাক্‌বার চেষ্টা করে তোমার কথা শুন্‌লে তা' বোঝা যায়। আমার জন্য—শুধু আমার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে তুমি দ্বিতীয়বার বিয়ে করো—এই তুমি বল্‌তে চাও?

সুমিত্রা—তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো না?

পবিত্র—না।

সুমিত্রা—না? কেন না? তার কারণ তোমাকে দিতে হবে।

পবিত্র—ছেলে হয়ে মাকে সে কথা এতক্ষণ বল্‌তে চাই নি। তুমি যখন বল্‌তে বাধ্য কর্‌ছো তখন শোন বলি। তুমি যে আমার ভালোর জন্যই অরুণবাবুকে বিয়ে করেছো—নিজের দিকে একবারও তাকাওনি এ কথা অন্য লোককে বল্‌তে যেও না। তারা হাসবে। (শ্লেষের সহিত) রেবা যদি না থাক্‌তো ওকথা বল্‌লে একটা মানে হতো।

[সুমিত্রা শিহরিয়া উঠিয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ গুজিয়া ফোঁপাইতে লাগিলেন]

মদ খেয়ে টল্‌তে টল্‌তে যে বলে আমি মাতাল হইনি তাকে বিশ্বাস করা যেমন বোকামি, তোমাকে এ ক্ষেত্রে নির্দ্দোষ ভাবাও তার চেয়ে কম বোকামি নয়।

সুমিত্রা—(হাত হইতে মুখ তুলিয়া করুণভাবে) পবিত্র, না হয় তোর সব কথাই ঠিক—তবু আমি তোর মা। আমায় ক্ষমা কর্‌—তুই আমায় ছেড়ে গেলে কি নিয়ে আর বেঁচে থাক্‌বো!

পবিত্র—ওসব কথায় আমার মন গলে না। বাবা মারা

যাবার আগেও নিশ্চয় ভেবেছিলে বাবার অবর্ত্তমানে এক দিনও বাঁচবে না। বাবা মারা যাবার কয়েক দিন বাদেই সব সয়ে গেলো। আবার বিয়েও করলে। ক্রমশঃ সবই সয়ে যায়। আমি গেলেও দেখবে সয়ে যাবে। যাক্, আর মিছামিছি আমাকে রাখবার চেষ্টা কোরো না। কারণ আমাকে যেতেই হবে। মনে করো আমি মরে গেছি।

(দ্রুতবেগে প্রস্থান)

সুমিত্রা—(কিছুক্ষণ বিহ্বলভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। চোখে যেন দৃষ্টিশক্তি নাই, মুখ যেন রক্তশূন্য, দেহ যেন প্রাণহীন। মৃদুস্বরে—) চলে গেলো। পারলে এ ভাবে আমাকে একলা ফেলে যেতে? (হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন। হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে—) পবিত্র—পবিত্র……

(যবনিকা পতন)

অশোক সেন

প্রদীপ

(গান)

শ্রীস্নেহলতা চৌধুরী বি-এ

আরো দুখ দাও হে নাথ, আমারে
থেকোনা ভুলে,
বেদনার শিখা চিত্ত-প্রদীপে
উঠুক জ্বলে।
আঁধারেও মুখ তব হেরি না যে
নয়ন আমার কেঁদে মরে, লাজে,
আঁধার টুটিবে আলোক ফুটিবে
ব্যথায় ছুঁলে।
বেদনার শিখা চিত্ত-প্রদীপে
উঠুক জ্বলে।

আমার বাসনা বাস নাহি ঢালে
পরাণ লীনা।
বেদনা-বহ্নি পরশে বাজাও
গন্ধ-বীণা।
হৃদয় আমার পূজা থালি সম
গানে গানে ভরে রবে নিরুপম
জীবন নমিবে মরণের সাঁঝে
চরণ-মূলে।
বেদনার শিখা চিত্ত-প্রদীপে
উঠুক জ্বলে॥

প্রবাদ-প্রসঙ্গ

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন এম্-এ, বি-এল

প্রবাদ, প্রবচন প্রভৃতি বহুপ্রচলিত লোকোক্তিসমূহ বাংলা ভাষার এক অতুল সম্পদ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলা প্রবাদ প্রবচনের কোন উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ-গ্রন্থ নাই। তাহার ফলে অনেক 'বচন' লোপ পাইতে বসিয়াছে। আবার এমন অনেক 'বচন' আছে, কালের পরিবর্ত্তনে যাহাদের তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠা এখন কঠিন হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং সেগুলি কালক্রমে লোপ পাইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে।

বাংলা ভাষার এই অমূল্য সম্পদ রক্ষার উদ্দেশ্যে বিচিত্রায় 'প্রবাদ-প্রসঙ্গ' নাম দিয়া একটি পৃথক বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। এই বিভাগের দুইটি অংশ। প্রথমটি 'অর্থ বিচার'; ইহাতে বিশেষ বিশেষ প্রবাদের তাৎপর্য্য, উৎপত্তি, প্রয়োগবিধি প্রভৃতির আলোচনা হইবে। দ্বিতীয়টি 'সংগ্রহ'; ইহাতে এরূপ নূতন নূতন 'বচন' সংগৃহীত হইবে যাহার ব্যবহার সচরাচর দেখা যায় না, অথবা দেশের অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ হইয়া আছে।

'অর্থবিচার' অংশটিতে মাসে মাসে কয়েকটি প্রশ্ন সন্নিবেশিত হইবে। 'বিচিত্রা'র পাঠকপাঠিকাগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঐ সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর বা আলোচনা পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

'সংগ্রহ' অংশটির জন্য পাঠকপাঠিকাগণের নিকট অনুরোধ যেন তাঁহারা অবসর মত কিছু কিছু বচন সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া এই প্রচেষ্টার সাহায্য করিবেন।

অধ্যাপক মৌলভী মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এম-এ মহাশয়ের অভিমত

বাংলা দেশের প্রবাদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যাখ্যার জন্য 'বিচিত্রা' আবার যে আয়োজন করেছেন তাতে ভারী সুখী হয়েছি। বাংলা দেশের পক্ষে এটা একটা পরম সৌভাগ্যের বিষয় নিঃসন্দেহে বিবেচিত হবে। জীবন্মৃত সাহিত্য পরিষদ বাংলা দেশের পুরাতন বিবরণ সংগ্রহ বিষয়ে নিতান্ত ব্যর্থকাম হচ্ছেন। আধুনিককালে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত তাঁর প্রাণশক্তি ক্ষয়গ্রস্ত ও বিকল। হয়ত বাংলা দেশের সকল মনের এইমত দুর্দ্দশা, তাই আমাদের সাহিত্য প্রচেষ্টা, বিশেষতঃ প্রাচীন গ্রাম্য গান, উপাখ্যান এবং প্রবাদ প্রবচন প্রভৃতি সম্বন্ধে আদৌ কোন ভাল বই নেই, যা আছে তরুহীন দেশে এরণ্ডদ্রুম সদৃশ। লণ্ডনের Folklore Society এ সম্বন্ধে বিশেষ কাজ করছেন, তাঁদের একখানি প্রমাণ-পঞ্জী গ্রন্থে বাংলা দেশের একখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

মনীষী ডক্টর মুহম্মদ ইনামুল হক এম-এ; পি, এইচ, ডি, মহাশয় চট্টগ্রাম জেলার এক হাজার প্রবাদ সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন "চট্টগ্রামী বাংলা ভাষার রহস্য ভেদ" নামক গ্রন্থে। বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলা হতে এই রকম একখানা গ্রন্থ বের হ'লে বড়ই ভাল হয়। চন্দননগরের কৃতি সন্তান শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় বহু সহস্র বাংলা প্রবাদ সংগ্রহ করেছেন, তিনি অচিরেই তা' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবেন, এরূপ আশ্বাস দিয়েছেন।

অর্থ বিচার

(প্রশ্নাবলি)

(৩) অর্দ্ধেক সকল ঘর-গোষ্ঠী, তার অর্দ্ধেক মা ষষ্ঠী। এই মেয়েলী ছড়ার অর্থ কি?

(৪) অষ্টরম্ভা। 'কলা' বা 'কদলী' শব্দের অর্থ 'কিছু

না।' কিন্তু 'রম্ভা' শব্দ এরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। অথচ 'অষ্টরম্ভা' বলিলে আবার সেই অর্থই হয় কিরূপে ?

(৫) অসারে জলসার। অর্থ কি ?

(৬) আক ছেঁচতে কুকশিমের কথা। ইহার অর্থ 'অপ্রাসঙ্গিক কথা।' এই প্রকার অর্থের উৎপত্তি কিরূপে হইল ?

(১০) আলোচাল দেখলে ভেড়ার মুখ চুলকায়। আলোচাল কি ভেড়ার বিশেষ প্রিয় ? তাহার কারণ কি, প্রমাণই বা কি ?

(১২) উজানের কৈ। যে কৈ স্রোতের বিপরীত দিকে যায় বোধ হয় তাহাকে বুঝায়। কিন্তু এরূপ কৈ মাছের বিশেষত্ব কি এবং কি অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয় ?

(১৩) এ হাতটি সব জানে, মাছ থাকতে কাঁটা টানে। অর্থ কি ?

(১৪) ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে। অর্থ কি ?

(১৫) কাক উড়ে, চিল পড়ে; শঙ্খ চিলে বাসা করে। অর্থ কি ?

(উত্তর ও আলোচনা)

(১) অকাল কুষ্মাণ্ড। অসময়ের ফল মাত্রেরই আদর আছে। কিন্তু সময়ের ফলের গুণাবলি তাহাতে থাকে না। কুষ্মাণ্ড একটা বৃহদাকার ফল, কিন্তু অসময়ে ফলিলে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, বিশেষ কাজে লাগে না। সেইজন্য গুণহীন লোককে অকাল কুষ্মাণ্ড বলে। —শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দে, বাঁকুড়া।

(২) অক্কা পাওয়া। 'অক্কা' শব্দের অর্থ মাতা। সকল জীবের জননী পৃথিবী পঞ্চভূতের মধ্যে একটি। জীবের মৃত্যু হইলে তাহার দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, অর্থাৎ জননী ধরিত্রীর ক্রোড়ে ফিরিয়া যায়। এইরূপে 'অক্কা পাওয়ার' অর্থ মৃত্যু হইয়াছে। বোধ হয় শব্দটির বিচিত্র ধ্বনির জন্য হাস্যরসপ্রিয় বাঙালী কর্তৃক একটু লঘুভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। —শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কাব্যতীর্থ, বহরমপুর।

(৭) আদাজল খেয়ে লাগা। প্রাচীনকালে অবস্থাপন্ন পরিবারে গুড়, ছোলা এবং আদা খাইয়া প্রাতঃকালীন জলযোগ করা হইত। এমন কি রূপকথার রাজা এবং রাজপুত্রগণের জন্যেও এই ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যুষে এইরূপে জলযোগ করিয়াই কোন কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের পরিচায়ক।—শ্রীমতী নির্ম্মলা সেন, কলিকাতা।

(৮) আদায় কাঁচকলায়। কাঁচকলা সুপাচ্য, সুস্বাদু, স্নিগ্ধকর ও পুষ্টিকর;—ইহা রোগীর পথ্য। আদা কটু এবং উগ্রস্বভাব। সেজন্য এই দুইটি বিপরীত গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের একত্র ব্যবহার চলে না। তা ছাড়া, কাঁচকলা সিদ্ধ করিলে শীঘ্রই গলিয়া যায়, কিন্তু আদা একটুও নরম হয় না, সুতরাং একত্র রন্ধন করাও চলে না। —শ্রীমতী সুবর্ণপ্রভা বসু, কলিকাতা।

(৯) আমড়াগেছে করা। ইহার অর্থ তোষামোদ করা। এরূপ গল্প আছে যে কোন জমিদার বাবু পার্ষদগণ বেষ্টিত হইয়া আমড়ার গুণাগুণ আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি যখন বলিলেন, "আমড়া জিনিষটা বড় বেশী ঠাণ্ডা, খাইলে অসুখ করে।" তখন একজন তাঁহার কথা সমর্থন করিয়া বলিলেন, "আমড়ার কথা আর বল্‌বেন না হুজুর, —আমড়াতলা দিয়ে হেঁটে গেলেই নির্ঘাৎ বাতে ধরবে।" পরক্ষণেই জমিদার বাবু বলিলেন, 'যাইহোক, বড় মুখরোচক জিনিষ, বড় স্নিগ্ধকর।" অমনি উত্তর হইল, "আজ্ঞে যা বল্লেন! সেইজন্যেই তো অনেকে আমড়াতলায় বাস করে।" প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য এইরূপ চাটুবাক্য বলাকে 'আমড়াগেছে করা' বলে। —শ্রীযুক্ত অনলকুমার মিত্র, নৈহাটী, ২৪ পরগণা।

(১১) আস্‌কে খেয়েছ ফোঁড় গণোনি। চাল ও ডালের গুঁড়া, নারিকেল কোরা ইত্যাদি দিয়া আস্‌কে প্রস্তুত হয়। গোলাকে বেশ করিয়া ফেনাইয়া অল্প আঁচে যত্ন সহকারে ভাজিলে পিষ্টকে অসংখ্য ছিদ্র বা ফোঁড় জন্মে। তাহাতে পিষ্টক নরম ও সুস্বাদু হয়। কিন্তু যাহারা পিষ্টক খায় এই ছিদ্রগুলির প্রতি তাহাদের নজর পড়ে না। অর্থাৎ পিষ্টক প্রস্তুত করিতে কিরূপ অর্থ, শ্রম ও সময় ব্যয় হয় তাহা ভাবিয়া দেখে না। সেজন্য পরিবারস্থ যে সকল লোক সংসারের কোন খবর রাখে না, কোথা হইতে

অর্থ আসে, কিরূপে আহার জোটে তাহা কিছুই জানে না, বা জানিবার চেষ্টা করে না, এই বচন তাহাদিগের প্রতি প্রয়োগ করা হয়। —শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী দেবী, কলিকাতা।

সংগ্রহ

অধ্যাপক মৌলভী মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সাহেব লিখিয়াছেন :—নিম্নে যে কয়েকটী প্রবাদ প্রদত্ত হল তা পাবনা জেলার গ্রাম হতে সংগৃহীত, এবং একটী ব্যতিরেকে অপর কয়েকটী আমার স্ত্রীর কাছ থেকে নে'য়া।

১। কিবা ধানের কুণ
তাতে ভাঙল দোস্তের মন।
কুণ=অতি ক্ষুদ্র অংশ।

২। মুল্লুক ভরা যার গোলা
ভাতে মরে তার পোলা।

৩। শ'ল গজারের পোণা
যার যার তা তার তার আছে সোনা
পোণা=মৎস্য সন্তান।

৪। রূপ যৈবন পানের বোঁটা
গেল যৈবন, র'ল খোঁটা।
র'ল=রইল।

৫। ঘাড়ের 'পর শোয়ারী
কাঁন্ধা মরে খয়ারী।
খয়ারী—একটী সাধারণ মেয়ের নাম।

বাঙালী মুসলমানের গার্হস্থ জীবনে ব্যবহৃত আরও কিছু প্রবাদ বা 'মেয়েলী বচন' মৌলভী সাহেবের নিকট হইতে ভবিষ্যতে পাইবার আশা করা যায়।

শ্রীযুক্ত নন্দকুমার দে চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত কতকগুলি প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। সামান্য আক্ষরিক পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার মধ্যে কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। মাঝি ভাত খাইলে গাঙে জোয়ার আসে।

২। আট কামুয়ার ভাত নাই। আট কামুয়া—যে অনেক রকম কাজ অল্প-স্বল্প জানে।

৩। সকলে যদি ব্রত করে, নৈবেদ্য খাইবে কে ?

৪। লেগে থাকলে মেগে খায় না।

৫ রামচাঁদে তেঁতুল খেলে, শ্যামচাঁদের জ্বর।

৬ নিজে মরে জ্ঞাতির হাঁড়ি ফেলানো।

৭। বামুনে পয়সা পেলে ঢেঁকির নামেও চণ্ডী পড়ে।

৮। দাতায় দান করে, ভাঁড়ারি পেট ফেটে মরে।

৯। কানের সোণায় কান কাটে।

সত্যরঞ্জন সেন

কাগজ

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য

কাগজ একটি ক্রমোন্নতিশীল প্রাচীন শিল্প। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, বাণিজ্যে, ব্যবহারে প্রত্যেক কর্ম্মস্থানেই ইহা মনুষ্যের নিত্য সাথী। অতি শৈশব হইতেই মনুষ্য-সন্তানকে কাগজের সহিত পরিচিত হইতে হয়। ইহার অতিরিক্ত পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম :—

উত্তর ভারত—কাগজ।
তামিল—বরক।
পারস্য—কাগজ।
আরব—কর্ত্তাস।
দেন্মার্ক—পেপির।
ফ্রান্স—পেপিয়ার।
ইটালী ও প্রাচীন লাটিন—কার্টা বা চার্টা।
পর্ত্তুগীজ—পেপেল।
রুষিয়া—বুমাঙ্গনা।
জার্ম্মানী—পেপিয়ার।
স্পেন—পেপেল।
ইংলণ্ড—পেপার।
জাপান—কাদজ।

কাগজ আবিষ্কারের কোন যথার্থ ইতিহাস নাই ; আছে অপ্রতিহত গৌরব পূর্ব্ব দেশের। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সম্পদ সঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে প্রাচ্যখণ্ডই একদিন কাগজের অভাব প্রথম অনুভব করিল। তারপর কোন্ এক অজানিত শুভ মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিয়া, ইহা ধীরে ধীরে ক্রমাবর্ত্তের মধ্য দিয়া রূপান্তরিত হইতে হইতে অদ্যাবধি সভ্যতার সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

একমাত্র কাগজকে আশ্রয় করিয়াই জগতের কত সৃষ্টি কত সম্পদ গড়িয়া উঠিয়াছে। সকল পদার্থ, সকল প্রচেষ্টার সহিতই কাগজের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সহসা কাগজের লোপ সাধন হইলে সভ্যতার অগ্রগমন প্রতিহত হইয়া যায়। কয়েক শতাব্দী পিছনের অন্ধকার আসিয়া জগৎকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

জগতে কাগজের অভাব যেমন দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তেমনই ইহার প্রস্তুত প্রণালীর চাতুর্য্য এবং ভিন্ন ভিন্ন উপকরণের সাহচর্য্যও ক্রমশ ইহাকে উন্নততর করিয়া উত্তরোত্তর শ্রীমণ্ডিত করিতেছে। পাশ্চাত্য জগৎ কাগজের আদিরূপের উপর আধুনিক সৌষ্ঠব দান ও নির্ম্মাণে ক্ষিপ্রকারীতার জন্য অগ্রণী। তাই বলিয়া, প্রাচীন প্রণালীর হস্ত-নির্ম্মিত কাগজ ও তার প্রস্তুত প্রক্রিয়া একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। আজিও ভারত, পূর্ব্ব-উপদ্বীপ, চীন, জাপান, পারস্যে প্রাচীন পদ্ধতির হস্তনির্ম্মিত কাগজের যথেষ্ট সম্মান আছে।

ভারতের মধ্যে—বঙ্গ, বিহার, নেপাল, ভুটান, আমেদাবাদ, সুরাট, ধারবার, কোলাপুর, আরঙ্গাবাদ ও দৌলতাবাদের কাগজ শিল্প এককালে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আরঙ্গাবাদ, দৌলতাবাদ ও গৌড়ের কাগজের প্রাচীন ইতিহাস ঢাকাই মসলিনের মতই গৌরবময়।—তারপর ইউরোপের নিকট রাজনৈতিক পরাজয়ের ফলে, এদেশীয় বস্ত্র প্রভৃতি অন্যান্য শিল্পের ন্যায় কাগজ শিল্পও একদিন ভীষণভাবে অবনত হইয়া পড়িল।

ভারতে যে একদিন উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হইয়া দেশ বিদেশে রপ্তানী হইত একথা আজ রূপ-কথার মতনই অবিশ্বাস্য। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানোন্নতি এদেশীয় জনসমাজের মূর্খতায় বিশ্বাস স্থাপক। বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-চর্চ্চায় প্রাচ্য চিন্তার বিন্দুমাত্র সাহচর্য্যও বিলুপ্তপ্রায়।—সৌভাগ্যের বিষয়, বর্ত্তমানে জমিদার ও দেশীয় রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠ-

পোষকতায় ভারতের কাগজ শিল্প আবার গড়িয়া উঠিতেছে। দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং কংগ্রেস নেতাগণ অবধি দেশীয় হস্তনির্ম্মিত কাগজের ব্যবহারে অধিক আগ্রহ দেখাইতেছেন। নিখিল ভারত শিল্প সঙ্ঘ (All India Industries Association) এই উদ্দেশ্যে রীতিমত প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন।

ইয়ুরোপের পণ্ডিত সমাজ চীন দেশকেই কাগজের জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু, ভারতে তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই কাগজ প্রচলনের প্রমাণ আছে। আনুমানিক খৃষ্টীয় শকের প্রথম যুগ হইতেই চীন দেশে কাগজ প্রস্তুত আরম্ভ হয়। চীন সম্রাট কন্‌-ফুচির আমলেও দেখা যায় চীনারা বাঁশের আভ্যন্তরীন ছালের উপর তীক্ষ্ণাগ্র লেখনী আঁচড়াইয়া লিখিত। কথিত আছে, সম্রাট হো-তাই (Ho-ti) এর শাসনকালে তাঁহার একজন বিশিষ্ট কারীকর শাইলান (Tsi-Lun) একবার স্নেকড়া, মাছ ধরিবার জাল, বৃক্ষের আভ্যন্তরীণ ছাল ও পরিত্যক্ত রশির চটি জুতা (Hemp Sandels) হইতে কাগজের ন্যায় এক প্রকার লেখ্য উপকরণ প্রস্তুত করে। তাহাই ঐ দেশের আদি কাগজ বলিয়া পরিচিত। ১০৫ খৃষ্টাব্দে শাইলান তাহার এই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার-বার্ত্তা জনসমাজে প্রচার করিতে আরম্ভ করে। দেখিতে দেখিতে অল্প দিনের মধ্যেই তাহা সমগ্র চীন দেশে ছড়াইয়া পড়িল। ইহার প্রায় ৬০০ শত বৎসর পরে, চৈনীক কাগজ বৈদেশিক সংস্পর্শ লাভ করে।

কিন্তু, ভারতের ইতিবৃত্তে ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর যুগে কাগজ ব্যবহারের উল্লেখ আছে। পাঞ্জাব বিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডারের সেনাপতি নিয়ারকাস্‌ তাঁহার ভারত বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, তৎকালে ভারতে উত্তম মসৃণ, চিক্কণ ও দীর্ঘকাল স্থায়ী এক প্রকার তুলা চাপড়ান পদার্থের উপর বাণিজ্যাদির হিসাব নিকাশ লিখিবার বহুল প্রচলন ছিল। এই তুলা চাপড়ান অর্থে, তুলট কিম্বা সেই জাতীয় অপর কোন পদার্থকে ধরিয়া নেওয়া অসঙ্গত হইবে না। গ্রীক সম্রাটের ভারত আক্রমণ ৩১৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে। সুতরাং তাহারও পূর্ব্বে এদেশে কাগজ জাতীয় পদার্থ ব্যবহারের সূত্রপাত হইয়াছে।

এদেশীয় তন্ত্রে কাগজ শব্দের অর্থ-বাহী কাগদ শব্দের ব্যবহার আছে। সেকালে চীনদেশীয় একপ্রকার উৎকৃষ্ট কাগজকে ইংরাজেরা "India proof paper" নাম দিয়াছিল। ইহাদ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, তৎকালে সেই জাতীয় কাগজ চীনদেশে সেই সময়ই প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়, এবং তাহা ভারতীয় কাগজেরই অনুকরণে। নচেৎ চীনের কাগজের ঐরূপ আখ্যা হইবে কেন? তাহা হইলে ভারত হইতেও উৎকৃষ্টতর কাগজ চীনদেশে রপ্তানী হইত।

পূর্ব্বে মালদহ অঞ্চলে একপ্রকার উৎকৃষ্ট তুলট কাগজ প্রস্তুত হইত এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তাহার বিলক্ষণ চাহিদা ছিল। সম্ভবতঃ ঐ কাগজের অনুরূপ কাগজেরই "India Proof" নাম দেওয়া হইয়াছিল। আজিও অনেক প্রাচীন জমিদার ঘরে সাটিনের মত একপ্রকার উজ্জ্বল ও মসৃণ কাগজের উপর লিখিত সনন্দ, ছাড় প্রভৃতি দেখা যায়।

ভারতের মত উৎকৃষ্ট মূল্যবান কাগজ শুধু তৎকালে কেন, একালেও কোথাও দৃষ্ট হয় না। মুসলমান যুগেই ইহা সর্ব্বাধিক উন্নতিলাভ করে। মুসলমান তন্তুবায়কে যেমন জোলা, মৎস্যজীবীকে যেমন নিকারী, তেমনই মুসলমান কাগজপ্রস্তুতকারীকে কাগজী বলা হইত। এখনও ঢাকা মালদহ অঞ্চলের কাগজীদিগের বংশধরেরা একমাত্র কাগজ নির্ম্মাণ করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

এদেশে সাধারণতঃ তিন জাতীয় কাগজ প্রস্তুত হইত—

১। সাধারণের ব্যবহারের জন্য।

২। আমীর ওমরাহদের জন্য।

৩। ঘোঁটা কাগজ।

ঘোঁটা কাগজ আবার তিন প্রকারের।

(ক) শাদা। (কেবল কড়ি বা নুড়ি ঘষিয়া মসৃণ করা।)

(খ) জরফ্‌সান্‌। (রূপালী ও সোণালী ছিটা দেওয়া)

(গ) টিক্‌লিদার। (ছোট ছোট পাটালি আকারের রূপালী ও সোণালীপাত বসান।)

আরঙ্গাবাদের "আফ্‌গানি," দৌলতাবাদের "বাহাদুর খানি" ও "মানসিংহি" কাগজ সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া-

ছিল। ইহা প্রস্তুতের সময় মণ্ডের সহিত স্বর্ণের সূক্ষ্মপাত মিশাইয়া দেওয়া হইত। কখন কখন ইহার চারিধারে স্বর্ণ রৌপ্যের লতাপাতা, পদ্ম প্রভৃতি নানাবিধ নক্সা খচিত থাকিত। এই সকল কাগজ অতিশয় মূল্যবান। সাধারণের পক্ষে ব্যবহার একরূপ অসম্ভব ছিল। নবাব বাদসাহেরা ইহাতে সনন্দ, ছাড়, দলিল প্রভৃতি লিখিতেন। রাজ-পরিবারের যুবক যুবতীদের পত্র ব্যবহারও অনেক সময় ইহাতেই হইত। গৌড়ের সাটিনের ন্যায় কাগজের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে দেশীয় রাজন্যবর্গ এই সকল কাগজের বিলক্ষণ আদর করেন।

কাশ্মীরে একপ্রকার কাগজ প্রস্তুত হয় দেখিতে তেমন শাদা নহে; কিন্তু তেমন চিক্কণ ও দৃঢ় কাগজ এদেশে অতি অল্পই আছে। শুনা যায় অতি প্রাচীনকাল হইতেই নাকি তথায় উহা প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে।

নেপালে "মহাদেওকা ফুল" (Daphne Cannabia) নামক গাছ হইতে একপ্রকার কাগজ প্রস্তুত হয়, তাহা বিলাতি কাগজ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। একবার তাহার কিছু নমুনা পরীক্ষার জন্য বিলাতে পাঠান হইয়াছিল। বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে কাগজ প্রস্তুতের যাবতীয় উপকরণই ইহার মধ্যে বর্ত্তমান। ইহা অতিশয় মসৃণ ও ক্ষুদ্রাদপি অক্ষর ইহাতে এত উৎকৃষ্ট ছাপা হইতে পারে যাহা কোন বিলাতি কাগজেই সম্ভব নয়। এই কাগজ চামড়ার মত দৃঢ় ও দীর্ঘকাল স্থায়ী।

চীনদেশীয় এক প্রকার চিত্রিত হাতপাখা বাজারে পাওয়া যায়, বিশেষ শক্ত, টানিলে সহজে ছিঁড়ে না। তাহা ঐ জাতীয় বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত। ঐ বৃক্ষ ভোটরাজ্যে ও হিমালয়ের নিম্নদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। ফুলগুলি শাদা ও বেগুনী রংএর চোঙ্গের মত লম্বা, মুখের দিক সামান্য ছড়ান। গুল্মজাতীয় গাছ। ফল বিষাক্ত ও কণ্টকযুক্ত। এতদ্দেশে ঐ জাতীয় গাছকে, ধুস্তুর বা ধুতুরা বলে। গাছের ত্বক পিষিয়া মণ্ড করিয়া কাগজ প্রস্তুত হয়।

কলিকাতার বিগত আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীতে (১৮৮৩-৮৪) কয়েক প্রকার দেশীয় কাগজ প্রদর্শিত হয়। তন্মধ্যে কয়েক প্রকার পাটের কাগজ, ঢাকা মুন্সিগঞ্জের মেঘুকাগজীর প্রস্তুত এক প্রকার কাগজ, শাহাবাদ সাসেরাম হইতে চার প্রকার কাগজ, বহরমপুর কনহৌলি হইতে দুই প্রকার কাগজ ও ভুটান হইতে এক প্রকার বৃক্ষের ছালের কাগজ ছিল। ভুটিয়া কাগজে প্রায়ই পোকা লাগে না, দেখিতে খুব সুন্দর ও মসৃণ।

চীনদেশের কাগজ প্রস্তুতপ্রণালী তাহাদের প্রাচীন পদ্ধতিরই ক্রমবিকাশ মাত্র। বৈদেশীক বাণিজ্য প্রভাবে ইহাদের কাগজ-শিল্প কোনদিনই জখম হয় নাই। অভি-জ্ঞতার মধ্য দিয়া তাহারা বর্ত্তমানে এমন এক অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে যে, খড়, কুটা, কাঠ, পাতা, করাতের গুঁড়া যা পায় তাই দিয়াই কাগজ প্রস্তুত করিয়া লয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন উপকরণ হইতে কাগজ প্রস্তুত করে। যেই প্রদেশে যেই উপাদান সহজ প্রাপ্য সেই প্রদেশে সেই উপাদান হইতেই কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের কাগজ আবার ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

ভারত কাগজ বা "India paper"এ অতি সূক্ষ্ম-শিল্পের খোদিত বিষয় উৎকৃষ্ট ছাপা হয়।

হো-সি নামক খড়ের কাগজে দোকানদারেরা মোড়ক বাঁধে। এই কাগজ এত অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হয় যে, ইহার দ্বারা তাহারা শবদাহ পর্য্যন্ত সম্পন্ন করে। ইয়ুরোপে আধুনিক কাগজ প্রস্তুতের পূর্ব্বে এই খড়ের কাগজ যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত। নানাস্থানে ইহার কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হইয়া-ছিল। আজিও পাশ্চাত্যজগতে এই খড়ের কাগজের আদর বড় কম নহে। ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীর কাগজ-ব্যবসায়ী Mattihias koopsএর খড়ের কাগজে মুদ্রিত একখানি পুস্তক কলিকাতার রাজকীয় পাঠাগারে রক্ষিত আছে।*

*পুস্তকখানির নাম—"Historical Account of the substances which have been used to describe events and to convey ideas from the Earliest date to the Invention of paper." ইহা ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়া তৎকালীন ইংলণ্ডের রাজা ৩য় জর্জ্জকে উৎসর্গীত হইয়াছিল। রাজা ৩য় জর্জ্জ গ্রন্থকারকে অপেক্ষা-কৃত উন্নততর প্রণালীতে কাগজ প্রস্তুতের অনুমতি দেওয়ায় লেখক তাঁহার গ্রন্থ মারফৎ তাঁহাকে প্রাণভরা কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন।

কিংয়াসি প্রদেশে হোয়াংপিয়ান্ নামক কাগজেও শবদাহ সম্পন্ন করা হয়।

পিংস্‌জে নামক কাগজ তুঁতগাছের ছাল হইতে প্রস্তুত। হাঁসপাতালে, ডাক্তারখানায় ঘায়ের Lint বা পটি বাঁধিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই কাগজে চীনারা অনেক সময় ছেঁড়া কাপড়ের টুক্‌রা বা ন্যেকড়ার কাজ সারিয়া থাকে।

তা-সে ও চংসে নামক কাগজ লিখিবার খাতাপত্রের জন্য প্রশস্ত।

মপিয়েন ও লিয়েন-সি কাগজ দেখিতে খুব সুন্দর ও পাতলা। ইহাতে পুস্তকাদি মুদ্রণ ও চিত্রাদি বসাইবার ব্যবহারই অধিক।

কৈ-লিয়েন-সি কাগজ হরিদ্রা বর্ণের। ইহা ঔষধালয়ে চূর্ণ ওষধাদি মুড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ইহা ছাড়া, নৌকার বা ঘরের ছাদ ফুটা হইলে তাহারা এক প্রকার কাগজ দিয়া দাগরাজী করিয়া থাকে। আর এক প্রকার কাগজ দিয়া তাহারা জাহাজের মাস্তুলে তালি দেয়। এই কাগজ খুব শক্ত। দোকানদারেরা ইহা হইতে মোড়ক বাঁধিবার সুতলি প্রস্তুত করে। চীনারা কাগজে মোম ও শিরিষবৎ এক প্রকার পদার্থ মাখাইয়া তাহাকে জল সহনীয় করে, ইহাতে লিখিলে কালী চুপসায় না।

চীনের রেশমের কাগজ অতি পুরাতন ও জগদ্বিখ্যাত। চীনের নিকট হইতে ভারত, তাহার নিকট হইতে পারস্য এবং ক্রমে ইয়ুরোপ ইহা শিক্ষা করে। ভারতে এককালে এই কাগজের যথেষ্ট সম্মান ছিল। ইহার জৌলস প্রশংসনীয়।

জাপানে দৈনন্দিন ব্যবহারের বহু সামগ্রী কাগজ নির্ম্মিত। তাহারা কাঠের কাজ, লোহার কাজ, কাপড়ের কাজ অনেক সময় কাগজ দিয়াই সারিয়া লয়। পরদা, মশারী, টুপী, রুমাল, একজাতীয় পোযাক, গৃহ সজ্জা, আসবাব, দেওয়াল, চাকা, দড়ি, কাছি প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য কাগজ নির্ম্মিত। তাহারাও চীনদের মত নানাবিধ উপাদান হইতে কাগজ প্রস্তুত করে। তন্মধ্যে কাদজ গাছ ও কাদজি বা কাদজিয়া গাছের ছাল বিশেষ আবশ্যকীয়।

ইয়ুরোপীয় কাগজের ইতিহাস—চীনাদের নিকট হইতে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া আরবেরা ৭০৬ খৃষ্টাব্দে সমরখন্দ সহরে প্রথম কারখানা স্থাপন করে। প্রায় ৩০০ শত বৎসর পরে মিশর ও মরক্ক দেশীয় বণিকের সাহায্যে ইহা ইয়ুরোপে প্রচারিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে স্পেনদেশে তুলা হইতে কাগজ প্রস্তুতের একটি কারখানা স্থাপিত হয়। ইহাই পশ্চিম মহাদেশের কাগজ প্রস্তুতের প্রথম কারখানা। ইহার পরে ভেলেন্সিয়া প্রদেশের কৃজেটিভা (Xativa, Valencia) নগরে আর একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারখানার কাগজ তৎকালে সমগ্র ইয়ুরোপে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই সময় ইটালীয়গণ সিসিলি অধিবাসী আরবদের নিকট হইতে পূর্ব্বদেশীয় পদ্ধতির কাগজ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া কারখানা স্থাপিত করে। তাৎকালিক কাগজে লিখিত কয়েকখানি দলিল উত্তর সিরিয়ার গস্ নগরের মঠে ও ভিয়েনার যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে, তন্মধ্যে একখানি রোম সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের আদেশপত্র। ইহাতে ১২৪১ অব্দের তারিখ দেওয়া আছে। আর একখানা সিসিলির রাজা রোগারের লিখিত। ইহার তারিখ ১১০২ অব্দের। পাশ্চাত্য জগতের ইহাই প্রাচীনতম কাগজ। ইহা ছাড়া দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর কাগজে লিখিত আরও কয়েকখানি আইনাদি ইয়ুরোপীয় যাদুঘরে দেখা যায়।

১৪শ শতাব্দীতে শণ ও রেসম হইতে কাগজ প্রস্তুত আরম্ভ হয়। ইয়ুরোপের রেসম কাগজ বিশেষ শক্ত ও যথেষ্ট প্রসিদ্ধ। ১৩৯০ খৃঃঅব্দে ইংলণ্ডে একটি কারখানা স্থাপিত হয়। ইংলণ্ডের কাগজ ইতিহাসে ইহাই প্রথম কারখানা। ১৪শ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্ব্বেই সমগ্র ইয়ুরোপ কাগজের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়া উঠে।

বিলাতি কাগজের জলছাপ কাগজ প্রস্তুতের প্রথম অবস্থা হইতেই প্রচলিত। ভিন্ন ভিন্ন জলছাপ ভিন্ন ভিন্ন কারখানার বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন জলছাপের মধ্যে,—পাঞ্জা মার্কা, মদের গ্লাস, সিঙ্গা, ঢালের উপর রাজমুকুট, পুষ্প, অশ্বারোহীর টুপী প্রভৃতি প্রধান। অশ্বারোহীর টুপী (jokey cap) মার্কা কাগজে সেক্সপীয়রের পুস্তকাবলী

প্রথম ছাপা হইয়াছিল। তৎকালে আদালতের কার্য্যে অনেক সময় এই সকল জলছাপই একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইত।

ফুলস্কেপ কাগজের একটা ইতিহাস আছে। একবার ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস তাঁর কোষাগার শূন্য দেখিয়া কয়েকজন ব্যবসাদারকে বিশেষ বিশেষ বস্তুর একচেটিয়া ব্যবসার আদেশ দেন। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন সরকারী দপ্তরখানায় কাগজ সরবরাহের একচেটিয়া পায়। ইহারাই সর্ব্বপ্রথম ফুলস্কেপ কাগজের আকারে কাগজ তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করে। সেই সময় ঐ কাগজের জলছাপে রাজচিহ্ন অঙ্কিত থাকিত। পরে শাসনভার অলিভার ক্রমওয়েলের উপর ন্যস্ত হইলে, তিনি ইহাতে রাজচিহ্নের পরিবর্ত্তে গাধার টুপী (Fool's cap) ও ঘণ্টা চিহ্নের আদেশ দেন। শেষে রাম্প পার্লামেণ্ট রাজ্যভার গ্রহণ করিলে উক্ত গাধার টুপী ও ঘণ্টা ছাপ উঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু অদ্যাবধি, সেই আকারের কাগজ ও পার্লামেণ্টের জাবেদা খাতা পত্রের নাম ফুলস্কেপই (Fool's cap) আছে।

বর্ত্তমানে লিখন পঠন ব্যতিরেকেও কাগজের যথেষ্ট আবশ্যকতা লক্ষিত হয়। কিন্তু কাগজের একদিন জন্ম হইয়াছিল লেখ্য উপকরণের অভাব চিন্তা হইতেই। দেখা যাক্, কাগজ সৃষ্টির পূর্ব্বে মানুষ সেই অভাব পূরণ করিত কিসে?

প্রস্তর—প্রস্তরই মনুষ্যের প্রাচীনতম লেখ্য উপকরণ। মানুষ যেখানেই গমন করে সেইখানকারই পর্ব্বতগাত্রে অথবা বৃক্ষত্বকে কোন কিছু চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া আসা তাহার চিরন্তন স্বভাব। এই প্রবৃত্তি হইতেই লিখন প্রথার উৎপত্তি। পূর্ব্বে প্রায় সকল দেশই প্রস্তরের উপর লিখন কার্য্য সম্পন্ন করিত। আজিও মিশরের পিরামিডগাত্রে অনেক পর্ব্বত গুহায় প্রাচীন অক্ষরের লিখিত পদার্থের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে সমাধিশিলায় স্মৃতি-লিপি ও ফটকের পার্শ্বে নাম ও উপাধিলিপি সেই প্রাচীন পদ্ধতিরই অবতারণা করিতেছে।

কাষ্ঠ—বৃক্ষগাত্রে লিখিবার প্রথা পর্ব্বত গাত্রেরই সমসাময়িক। ইহা হইতেই কাষ্ঠপাতে লিখন প্রথার উদ্ভব। ইহার প্রচলন প্রায় সকল দেশেই ছিল। সোলনের বিখ্যাত জাতি-সংগঠক আইনগুলি প্রস্তর ও কাষ্ঠ ফলকে খোদিত হইয়াছিল। নেবু গাছের কাষ্ঠ এই কার্য্যের পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত। সেকালে রোমের আইন-কানুন ওক গাছের কাষ্ঠে লিখিত হইয়া সাধারণের পাঠের জন্য বাজারে (Forum) প্রদর্শিত হইত। আজিও এই নিয়মের হইয়া স্কুল, কলেজে কাষ্ঠপাতে (Black Board এ) লিখন কার্য্য চলিয়া আসিতেছে এ দেশের অনেক দোকানদার এখনও কাষ্ঠখণ্ডের উপর খড়িগোলা দিয়া হিসাব লিখিয়া প্রাচীন প্রথার সাক্ষ্য দেয়।

বৃক্ষত্বক—বৃক্ষত্বককে আধুনিক কাগজের পিতামহ বলা যাইতে পারে। মনুষ্যের বিজ্ঞান-চিন্তা কাষ্ঠফলক অপেক্ষা সুষ্ঠু ও চিক্কণ পদার্থের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া একদিন বৃক্ষ বল্কলকে চিনিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে কাষ্ঠের গুরুভার ও যন্ত্র সাহায্যে খোদিত করার গুরু পরিশ্রমেরও অবসান ঘটিল। সেই সময় লেখনীর সাহায্যে কালীজাতীয় তরল পদার্থের জন্য বৃক্ষের রস বা কস ব্যবহৃত হইত। বৃক্ষ বল্কল চাঁছিয়া ছুলিয়া উপর্য্যুপরি রাখিয়া গ্রন্থ রচনা চলিতে লাগিল। ভারত, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, তিব্বত প্রভৃতি দেশের অনেক মঠে, টোলে, পাঠাগারে বৃক্ষত্বকে লিখিত বহু প্রাচীন গ্রন্থ আছে। মালাবার উপকূলবাসী ও সুমাত্রা দ্বীপের বুট্টাজাতি এখনও বৃক্ষ বল্কলেই লেখাপড়া করে। মিশর দেশের প্যেপিরাস বৃক্ষের আভ্যন্তরীণ ছাল এককালে সমগ্র পশ্চিম এশিয়া ও ইয়ুরোপ লেখ্যরূপে ব্যবহার করিত। নীলনদের তটভূমি ছিল প্যেপিরাসের আবাদক্ষেত্র। গাছগুলি গুল্ম আকারের, শাখাবর্জ্জিত, সরল, মস্তকে বহু শীষযুক্ত একটি পুষ্প ফুটিত। সরু সরু কাণ্ডগুলি কলা-গাছের ন্যায় কেবলমাত্র বাকলে গঠিত। বাকলগুলি কাগজের মত পাতলা। ক্রমশঃ ভিতর দিকের বাকলগুলি অধিকতর পাতলা হইত। লেখাপড়ার জন্য কয়েকখানি ছাল পাশাপাশি জুড়িয়া কোষ্ঠিপত্রের মত পাকাইয়া রাখা হইত।

বুশ—পূর্ব্বকালে চীনদেশে বুশের অভ্যন্তরে লিখিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। পরে এই প্রণালীর উন্নতি

করিয়া চীনারা বাঁশের ছালকে এক পংক্তির উপযুক্ত প্রস্থ ও ৯।১০ ইঞ্চি দীর্ঘ করিয়া কাটিয়া লইত। তারপর পৃষ্ঠার পরে পৃষ্ঠা সজ্জিত করিয়া মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র করিয়া রেসম-সূত্রের দ্বারা বন্ধন করিত। চীনদেশে তৎকালে ঐরূপ পুস্তকের বিলক্ষণ চলন ছিল। ইহা অনেকটা আমাদের দেশের তালপাতার পুঁথির মত।

বৃক্ষপত্র—বৃক্ষত্বকের সহিত বৃক্ষপত্রও ক্রমে লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে লাগিল। সাইরাকিউসের জজেরা সে সময় জলপাই-পত্রে নির্ব্বাসন দণ্ডের আসামীদের নাম লিখিতেন। পূর্ব্বদেশে তালপত্রে গ্রন্থ মুদ্রণ ও ভূর্জ্জপত্রে কবচ, মন্ত্রাদি লিখিবার প্রথা আজিও বর্ত্তমান। পল্লীগ্রামের পাঠশালায় কলাপাতা, তালপাতায় এখনও লিখিবার নিয়ম আছে। বৃক্ষপত্রের ব্যবহার হইতেই বইএর পাতা পত্র বা leaf শব্দের উৎপত্তি।

ইষ্টক—প্রাচীন কলিয়াদগণ ইষ্টকের উপর তাহাদের জ্যোতিষসিদ্ধান্তের ফলাফল লিখিয়া রাখিত। কাঁচা ইটকে লিখিয়া পোড়াইলেই তাহা স্থায়ী করা যায়। কোন কোন পাশ্চাত্য যাদুঘরে অদ্যাপিও তাহার কিছু সংগ্রহ আছে। এ্যাসিরিয়া ও ব্যাবিলনে মাটির রোলার করিয়া (cylinder) তাহার গাত্রে সাহিত্য, জ্যোতিষ, ইতিহাস, জীবনী ঠিকুজী প্রভৃতি লিখিবার ব্যবস্থা ছিল। ঐ সকল রোলারের মধ্যে রাজা নেবুকাটনিজারের (Nebuchadnezzar) সপ্তগ্রহকে মন্দির উৎসর্গ কাহিনী সম্বলিত দুইটি রোলার পাওয়া গিয়াছে। তৎকালে গ্রীস ও মিশরীগণ মৃৎপাত্র ও টালির উপর বহু বিষয় লিখিয়া রাখিত। লণ্ডন যাদুঘরে প্রচুর পরিমাণে ঐরূপ টালি ও মৃত্তিকা-পাতের সংগ্রহ আছে। চীনদেশেও চীনামাটির বাসনের (Porcelain) গায়ে কবিতাদি লিখিয়া সাহিত্য চর্চ্চা হইত।

সীসা ও পিত্তল পাত—তারপর আসিল ধাতুযুগ। প্রস্তর মৃত্তিকা ও কাষ্ঠ সভ্যতার অবসান করিয়া লিখন কার্য্যে সীসা ও পিত্তলপাত ব্যবহৃত হইতে লাগিল। রোমনগরে এই সকল পাতে আইন দলিল পত্র প্রভৃতি লেখা হইত। রোম সম্রাট ভেস্পেসিয়ানের আমলে রাজধানী পুড়িয়া গেলে ৩০০০ পিত্তলপাত নষ্ট হয়। ভারত সিংহল ব্রহ্মদেশের তাম্রলিপিও ইহার অপর নিদর্শন।

দন্ত—ব্রহ্মদেশে মূল্যবান গ্রন্থাদি হস্তীদন্তের পাতের উপর সোনা রূপার অক্ষরে লিখা হইত। রোম রাজ্যে ঐরূপ পাতের উপর মোমের আচ্ছাদন দিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিত।

চর্ম্ম—কোন কোন দেশে ছাগল ভেড়া প্রভৃতি পশুচর্ম্মে লিখিবার প্রথা ছিল। প্রাচীন ইহুদীদিগের আইন সূক্ষ্ম চর্ম্মের উপর লিখিত হয়। কনষ্টান্টিনোপলের অগ্নিকাণ্ডে তোহারের "ইলিয়াড অডিসির" এক কপি পুড়িয়া যায়। উহা একজাতীয় সর্পের উদরের চর্ম্মে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল। পূর্ব্বে পারস্যে তুজ বা তুস্ নামক বৃক্ষের ত্বকের সহিত চামড়া মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হইত। সেই সময় পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব্ব ইয়ুরোপের বহুস্থানে এবং ভারতের পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। বর্ত্তমানযুগের পার্চ্চমেণ্ট কাগজ সেই জাতীয় কাগজেরই পরিণতি।

অস্থি—লিখন কার্য্যে এই সকল পদার্থের ব্যবহারের সহিত অস্থির ব্যবহারও দেখা যায়।

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বস্তুগুলি কাগজ প্রস্তুতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে—তুলা, পাট, শন, রেশম, পশম, খড়, তৃণ, কাঁটাগাছ, কাষ্ঠ, বাকল, বৃক্ষমূল, শেহালা, জলজ উদ্ভিদ্, ছোবড়া, নারিকেলের মালা, বৃক্ষপত্র, তুঁষ, চুল, চামড়া, কাপড়, বাদামের খোলা প্রভৃতি। বৃক্ষের মধ্যে:—বাবলা, তুঁত, ইক্ষু, বুশ, কলার খোলা, সুপারীর খোলা প্রভৃতি। পত্রের মধ্যে:—ঘৃত কুমারী, আনারস, ভূর্জ্জ তাল প্রভৃতি। এবং তৃণের মধ্যে:—শর, কুশ ও ঘাসই প্রশস্ত। বিশেষজ্ঞরা বলিয়া থাকেন, ভারতের যাবতীয় তৃণ হইতেই কাগজ প্রস্তুত সম্ভব।

কয়েকপ্রকার কাগজ প্রস্তুত প্রণালী:—

প্রথমে ছেঁড়া কাগজ, স্থেকড়া, কচি বাঁশ, তৃণ প্রভৃতি উপকরণগুলি উত্তমরূপে চূর্ণ করিতে হয়। পরে ৫।৭ দিন চুণ বা অন্য কোন ক্ষারের জলে ভিজাইয়া অগ্নি সংযোগ করিলেই মণ্ড প্রস্তুত হইবে। তখন তাহার সহিত ভাতের মাড় জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত করিয়া ছাঁচে ঢালিলেই কাগজ প্রস্তুত হইল। ইহার জলীয় অংশ বাহির করিতে উপর

হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত লোহার পাতের সাহায্যে চাপ দিতে হয়।

চীন দেশীয় বাঁশের কাগজ:—কচি বাঁশগুলিকে টুকরা টুকরা করিয়া ২।১ দিন জলে ভিজাইয়া রাখে, তারপর পুনরায় ৫।৭ দিন চুণের জলে ভিজাইয়া নরম করিয়া লয়। তখন উদুখলে উত্তমরূপে পিষিয়া জলে সিদ্ধ করিলেই মণ্ড প্রস্তুত হইল। এইবার ইচ্ছামত ছাঁচে ঢালিলেই কাগজ তৈয়ারী হয়। কোন কোন স্থানে ইহাকে জল সহনীয় করিবার জন্য মণ্ডের সহিত Sulphet of Iron (হীরাকস) বা Albumen (ডিম্বের শ্বেতসার) মিশ্রিত করে।

বঙ্গ দেশীয় তুলট কাগজ, তুলা চাপড়াইয়া অথবা তুঁত-গাছের ছাল চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত গঁদ ও তেঁতুল বীচির আঠা মাখাইয়া প্রস্তুত হইত। কেহ কেহ ভাতের ফেণও মাখাইত। এই কাগজ বিশেষ শক্ত। টানিলে সহজে ছিঁড়ে না।

বর্ত্তমানে কাগজ নির্ম্মাণের অভিনব যন্ত্র আবিস্কৃত হইয়া সমস্ত জগৎ ছাইয়া ফেলিয়াছে। তাহাতে কাগজ প্রস্তুতের যাবতীয় কার্য্যই অতি সহজে ও সুচারুভাবে সম্পন্ন হইতেছে। উপরিলিখিত নিয়মগুলি হস্তদ্বারা অল্পের মধ্যে সারিবার জন্যই দেওয়া হইল। উহাই কাগজ প্রস্তুতের আদি প্রণালী।

পেপার-মেশি (Paper-mache)—ছেঁড়া, বাতিল দেওয়া কাগজ হইতে একপ্রকার উৎকৃষ্ট শিল্প প্রস্তুত হয়। ইহা চীন দেশ হইতে বর্ত্তমানে ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় বিশেষ-ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বহু বেকার ইহার দ্বারা অন্ন সংস্থান করিতেছে।

প্রস্তুত প্রণালী:—প্রথমে কাগজগুলিকে সামান্য কুটিয়া উত্তমরূপে অগ্নিতে ফুটাইয়া মণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়। তারপর তাহাকে Embossing processএ ইচ্ছামত ছাঁচে ঢালিয়া সিগার কেস, নস্যের ডিবা, টি ট্রে, ব্রাকেট, খেলনা, পুতুল প্রভৃতি নানাবিধ বস্তু প্রস্তুত করা যায়। জিনিষ-গুলি খুব হাল্কা হয়, সহজে ভাঙ্গে না। ইহার সহিত Sulphet of Iron or Albumen মিশ্রিত করিয়া শক্ত ও জলসহনীয় করা যায়। শুকাইয়া গেলে ইহার উপর ২।৩ কোট জাপান বার্নিস বা এনামেল মাখাইয়া লইলে চমৎকার ব্যবসা চলিতে পারে।

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য

ভাষা যেইখানে ফুরোয় সেখানে ফুরিয়ে যায় না কথা

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

বাহিরের সনে যে কথা বোলেছি
সেকথা ফোটেনা মুখে,
সে কথা দুলেছে বিপুল আবেগে
শুধু আমাদেরি বুকে;
নয়নের ভাষা মিলনের দিনে
নয়নে কেবল নিতে পারে চিনে
হৃদয়ের ভাষা চঞ্চল হোয়ে
শুধু যে হৃদয়ে বাজে
সুদূরের বাণী সাড়া দেয় শুধু
আমারি প্রাণের মাঝে।
ভাষা যেইখানে ফুরোয় সেখানে
ফুরিয়ে যায় না কথা—
সব চেয়ে বড়ো কথা যে আমার—
পরাণের ব্যাকুলতা;
ভাষা নাই তার তবু আছে বাণী
চঞ্চল হিয়া দিয়ে শুধু জানি,
সেই জানা মোর জানাতে পারেকি,
বিফল কথার রাশী
অন্তর তলে সেই দোলা লাগে
সহসা নীরবে আসি।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে

শ্রীমনীন্দ্রচন্দ্র সাহা

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে……

আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে—ঝম্ ঝম্ ঝম্। সাঁ সাঁ করিয়া ট্রেণ চলিয়াছে তাহাই ভেদ করিয়া অবিরাম অবিশ্রান্ত গতিতে!

নিরালা গাড়ীর শূন্য কামরা দখল করিয়া বসিয়াছিল—কেশব। খোলা জানালা পথে তাহার উদাস দৃষ্টি ঐ বাদল ধারা বহিয়া বহিয়া কোথায় গিয়া সজল হইয়া আকাশভরা মেঘের সাথে একাকার হইয়া গিয়াছিল তাহা সেই জানে!

কি কুক্ষণে দেড় হাজার বছর আগে এমনি এক নবীন বরষার আষাঢ়ের প্রথম দিনে উজ্জয়িনীর প্রাসাদ শিখরে বসিয়া কবি কালিদাস রামগিরি নির্ব্বাসিত বিরহী যক্ষের অকরুন্তদ বেদনায় ব্যথিত হইয়া আকাশভরা মেঘের মুখে মুখে যক্ষের মর্ম্ম ব্যথা অলকায় তাহার বিরহিণীর কাছে পাঠাইয়াছিলেন! দেড় হাজার বছরের প্রতিটী বরষা ব্যাপিয়া সেই সজল বিলাপ আজিও বিরহী-বিরহিণীর বুকে অভিমানে কাঁদিয়া মরিতেছে!

বেচারা কেশব! তবুও বিবাহ করে নাই সে। না করিলে কি হয়? কালিদাসের আষাঢ়ের মেঘ তাহার বুকেও বাসা বাঁধিয়া আজ তিন বছর সমানে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে!

সহসা কেশব চঞ্চল হইয়া উঠিল। হাতের ঘড়ির দিকে চকিত দৃষ্টি ফেলিল; দেখিল চারটা পঁচিশ। আর পনের মিনিট—আসাম মেল তাহা হইলেই ঈশ্বরদী পৌছিবে। এইখানে তিন বছর আগে এমনি এক বাদল-সজল-আষাঢ়ের প্রথম দিনে কেশবের 'মেঘদূত' রচিত হ'য়েছিল।

ব্যাকুল চঞ্চলতার মধ্যে পনর মিনিট কাটিয়া গেল। গাড়ী আসিয়া ঈশ্বরদীতে থামিল।

কেশব আশঙ্কা উদ্বেলিত হৃদয়ে গাড়ীর দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িল,—তারপর বিরামের দশ মিনিটের প্রতিটি মুহূর্ত্ত ব্যাপিয়া তাহার দুইটী চোখের আকুল দৃষ্টি সেই অগণিত জনস্রোতের ভিতর হইতে তাহার মানসরাণীকে কি ব্যাকুলতায় যে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহা কেবল সেই জানে!

কিন্তু বিগত দুই বরষার বেদনা-সজল দিনের মতোই আজিকার দিনটাও তাহার শুধু ব্যর্থতার বেদনাই বহিয়া আনিল। তাহার মানসরাণী মেঘের মুখে মুখে তাহার অন্তরের মর্ম্ম ব্যথা জানিতে পারে নাই! হায় কালিদাস! আজ তুমি যদি থাকিতে? যক্ষের ব্যথায় তুমি অলকা পর্য্যন্ত মেঘ পাঠাইয়াছিলে, আর এই নরলোকেরই এক প্রান্তে কেশবের প্রিয়ার নিকট তাহার বুকফাটা সজল-ব্যথার কথা বলিতে কি আর একবার তোমার জলধরকে পাঠাইতে পারিতে না?

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। অবসন্ন দেহে ব্যর্থতার বেদনা বহিয়া কেশব গাড়ীতে উঠিয়া জানালার পাশে বসিল; তাহার দুইটী সিক্ত উদাস নয়নে শ্যামাঞ্জন বাদলের সজল সমারোহ নূতন করিয়া নামিয়া আসিল!

মনে পড়িল দুইটী বছর আগের এমনি এক বাদল-বেলার কথা!

সেদিনও ঠিক এমনি বৃষ্টি নামিয়াছিল। নূতন বরষার স্পর্শে সেদিনও লতা পল্লব এমনি শিহরিয়া উঠিয়াছিল। গহন অরণ্যতলে তাহার হৃদয় স্পন্দন অশান্ত দাদুরীর অবিরল ক্রন্দনে এমনি উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল!

সেই বাদল সমারোহের ভিতর ট্রেণখানি ঠিক এমনি ঈশ্বরদী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কেশব আনমনে বাহিরের দিকে তাকাইয়াছিল। গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িয়াছে—গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে, সহসা কেশবকে চকিত করিয়া সেই কামরায় উঠিল এক তরুণী—তাহার অঙ্গ-বাস বরষার বাদল

ধারায় ধুইয়া মুছিয়া তনু-লাবণ্যে লেপিয়া গিয়া এমনি অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে কেশব দৃষ্টি মাত্র মুগ্ধ হইয়া গেল। বিবাহ সে করে নাই—মন তাহার স্বপ্নে ভরা! কিন্তু সেই স্বপ্ন বহিয়া তাহার কল্পলোকের মানসরাণী যে এমন করিয়া আসিবে তাহা কে ভাবিয়াছিল? উৎফুল্ল আনন্দে কেশব মনে মনে তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া লইল।

গাড়ী তখন ছুটিয়া চলিয়াছে।

তরুণীটি একবস্ত্রা—হাতে ছোট একটা চামড়ার এটাচি-কেস্। বোধ করি পথের দরকারি সামান্য কিছু উহার ভিতর থাকিবে। ভুল করিয়া বোধ করি ছাতাটাও আনে নাই। তাহার ভিজা গা মাথা হইতে বিন্দু বিন্দু জল তখনও মেঝেয় ঝরিয়া পড়িতেছে। এতক্ষণ সে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া অতঃপর কি করিবে বোধ করি তাহাই ভাবিয়া বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে।

এই দিকে চোখ পড়িতেই কেশব চঞ্চল হইয়া উঠিল। মিনিট দুই ইতস্তত করিয়া অবশেষে কেশব কহিল, একটা কথা!

তরুণী কহিল, বলুন!

কেশবের গলা ধরিয়া আসিতেছিল—জোর করিয়া সহজ করিয়া লইয়া কহিল, যা' ভিজে গেছেন! কোথায় যাবেন জানিনে—কিন্তু এমন করে যদি পাঁচ মিনিটও থাকেন অসুখে পড়বেন নিশ্চয়!

তরুণী সুস্মিত মুখে বলিল, নিরুপায়! কি করি বলুন! এমন হবে মনে করিনি—দ্বিতীয় কাপড় তো দূরের কথা, ছাতাটাও ফেলে এসেছি!

কেশব মৃদু হাসিয়া কহিল, কিন্তু আমি ফেলে আসিনি! অনুমতি করুন—বের করে দিই! আমার বৌদির জন্য নিয়ে যাচ্ছি কিনে—হয়তো আপনার অসুবিধে হবে না......

তরুণী বলিল, আপনার দয়া! কিন্তু বাড়ীতে গিয়ে আপনার বৌদিকে কি জবাব দেবেন? এখনই তো আর এসব আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারবো না?

কেশব চঞ্চল-হাতে সুটকেশটা টানিয়া লইয়া খুলিতে খুলিতে কহিল, সে ভাবনা আমার, আপনার নয়! বৌদিকে আমি জানি; জবাবও আমি দিতে পারবো।

সে কহিল, তা হয়তো পারবেন। কিন্তু আমিই বা নেবো কোন হিসেবে বলুন?

কেশব সুটকেশটা ঠেলিয়া দিয়া কহিল, এ আপনাদের মেয়ে জাতের রোগ। রাগ করবেন না। কারুর কাছ থেকে কিছু নিতে সঙ্কোচ করেন। কিন্তু বিপদে নিয়মো নাস্তি এও তো জানেন?

তরুণী হাসিতে হাসিতে কহিল, জানি!

কেশব তেমনি বলিল, এও জানেন, গাড়ী ছাড়ার আধ ঘণ্টা হলো।

তরুণী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল ঠিক।

কেশব আবার বলিল, এই আধ ঘণ্টা নিয়ে আপনি প্রায় ঘণ্টা খানেক ভিজে জামা কাপড়ে আছেন, মানেন?

তরুণী নীরবে চোখের মৃদু তরঙ্গ নিক্ষেপে জানাইয়া দিল তাহাও মিথ্যা নয়।

কেশব উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, বলুন! আমিই না হয় পর—রোগ তো আর পর নয়?

তরুণী গম্ভীর হইয়া কহিল, কিন্তু আমার রোগে আপনারই বা কি?

কেশব ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কহিল, কিছু নয়। আমার অপরাধ হয়েছে, মাপ করবেন। বলিয়া জানালা পথে মুখ বাহিরে ঠেলিয়া দিল।

তরুণী চপল হাসিতে শূন্য কামরা ভরাইয়া দিয়া কহিল, আচ্ছা মানুষ তো আপনি! আমি আপনার কে বলুন তো যে একটুতেই ভয়ে অতো শিউরে উঠ্‌ছেন?......বলিয়া নিজেই কেশবের ব্যাগ টানিয়া লইয়া জামা কাপড় বাহির করিয়া লইয়া 'লেভেটারি'র ভিতরে চলিয়া গেল।

কয়েক মিনিট পরে ফিরিয়া ভিজা কাপড় জামা বাক্সের ওপর রাখিয়া দিয়া তরুণী হাসিয়া কহিল, মুখ ফিরান, আর রাগ করতে হবে না......দেখুন হয়েছে কিনা?

কেশব মুখ ফিরাইয়া হাস্যোজ্জ্বল কণ্ঠে কহিল, বলুন দেখি, এখন কেমন আরাম পাচ্ছেন?

তরুণী মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিয়া কৌতুক করিয়া কহিল, তা পাচ্ছি—কিছু না পেলেও চলতো!

কেশব অশান্ত কণ্ঠে কহিল, ঐ আপনাদের দোষ—

হারবেন তবুও নিজের গোঁ ছাড়তে চান না—বুঝি মর্য্যাদা-হানি হয়!

তরুণী তেমনি ভাবে কহিল, মিথ্যেও নয়! এই ধরুন আপনাকে যদি নাই পেতেম, এমনি থাকা ছাড়া আর কি উপায় ছিলো বলুন?

কেশব চটিয়া গেল, বেশ হতো! ভুল আমার সত্যি হয়ে গেছে! ভিজে ভিজে শীতে বুড়ির মতো থর্ থর্ করে যখন কাঁপছেন—আমার ভারি ভাল লাগতো! কি ভুলই করেছি!

ঝর্ণার গানের মতো হাসির ঝঙ্কার তুলিয়া তরুণী কহিল, বলুন না হয় সে ভুল ভেঙে দিই! ভিজে কাপড় জামা তো আর কেড়ে দিই নি?

কেশব মুখ ভার করিয়া বলিল, থাক, আর প্রমাণ করতে হবে না। আপনারা পারেন সবই।

বিশ্বাস করেন?

সম্পূর্ণ!

কথা প্রায় ফুরাইয়া আসিল। কেশব ভাবিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল—ইহার পর কি বলা যায়! তাহার পর খুঁজিয়া কিছু না পাইয়া অবশেষে বলিল, যাবেন কোথায়?

তরুণী দুই চোখের হাস্যবিচ্ছুরিত দৃষ্টি দিয়া কেশবকে মাতাল করিয়া দিয়া কহিল, কেন, তাড়াতে চান নাকি?

কেশব লাল হইয়া উঠিল; বলিল, তাই মনে করেন বুঝি?

তরুণী কণ্ঠস্বর সহসা উদাস গম্ভীর করিয়া কহিল, কি জানি! কাপড় জামার দখল বসিয়েছি, এর পরে যদি......

কেশব উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। স্বপ্ন দেখিতেছে না তো! মোহমুগ্ধ কণ্ঠে সে কহিল, সে সাহস আপনার নেই!

নেই?

না!

কেন বলুন তো?

কেশব বিহ্বল কণ্ঠে কহিল, সামান্য জামা কাপড়—দামই বা তার কতো! এই নিতেই যখন......

তরুণী হাসিল। সে হাসি কেশবের অপরিচিত। কিন্তু নেই নিঃশব্দ হাসির অলক্ষ্য গতি প্রবাহে বোধ করি বিদ্যুতের স্পর্শ ছিল। তাহারই নিঃশব্দ স্পর্শে কেশব অজ্ঞাতে নিজেকে হারাইয়া ফেলিল! বিভ্রান্ত কণ্ঠে কহিল, সত্যিই আপনার সে সাহস নেই!

তরুণী দুই চোখে বিদ্যুৎ বিকীর্ণ করিয়া কহিল, পরখ করুন!

কেশবের সর্ব্বাঙ্গ গোপনে রোমাঞ্চিত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল। উত্তেজনায় বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরিতে লাগিল। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সহসা এতো বাড়িয়া উঠিল যে কেশবের আশঙ্কা হইল বোধ করি নিজেকে সে আর গোপন করিতেও পারে না। তবুও উত্তেজনার আবেগে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, আমার ভার নিতে পারেন?

তরুণী একটু বিস্ময় বা বিচলিত না হইয়া তেমনি মধুর হাসিয়া কহিল, এ আর বেশী কি?

কেশব পাগল হইয়া গেল। সহসা তরুণীর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আবেশ-বিহ্বল কণ্ঠে কহিল, মিথ্যে কথা! এ আপনার শুধু বিদ্রূপ!

বিদ্রূপ! মিথ্যে কথা!—তরুণী হাসিল; কিন্তু এতেও কি আপনি বিশ্বেস করতে পারছেন না? সত্যিই যদি না হবে, আমার অঙ্গ স্পর্শ করতে দেবো আপনাকে কোন সাহসে?

কেশব উন্মত্ত নেশায় জ্ঞানহারা হইয়া পড়িল। কতটা যে সময় এমনি নির্ব্বাক অবচেতনায় কাটিয়া গেল বোধ করি কেশব তাহা টেরও পাইল না!

তরুণী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, পরখ তো হোলো! এখন বলুন আপনার কথা! নিতে পারবেন তো আমাকে? আমার কিছু জানতে পারবেন না—শুনতে পারবেন না—কোন পরিচয় পাবেন না! পাবেন শুধু আমাকে, এই যেমন দেখছেন—এই আমাকেই শুধু পাবেন! বলুন আপনার কথা?

কেশব বিভ্রান্ত-স্বরে কহিল, কেবল পরিচয়ই দেবে না?

তরুণী কহিল, প্রয়োজন কি বলুন? যেখানে দুইটি মনের কথাই যথেষ্ট, সেখানে পরিচয়ের জঞ্জাল টেনে নিয়ে এসে সহজ আবহাওয়াকে মিছিমিছি ভারাক্রান্ত করে কি হবে বলুন।

কেশব ভাবিতে লাগিল।

গাড়ীর গতি শ্লথ হইয়া আসিল।

তরুণী কহিল, এ আপনি পারেন না--সে শক্তি আপনার নেই! আমি কে না জেনে আপনি কি পারেন আমাকে ঘরে তুলে নিতে—আপনার ঘরণী বলে পরিচয় দিতে?

কেশবের কানে সে সব কথা গেল কিনা সন্দেহ। সে শুধু বলিল, একটি কথাও বলবে না?

তরুণী কহিল, না! আমায় দেখে যদি আমায় নিতে পারেন তবেই পাবেন—নইলে.........

কেশব সবলে তরুণীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, তাই হোক—তাই হোক! আজ থেকে আমাদের ভালবাসাই হোক সবচেয়ে বড়ো পরিচয়.........

তরুণী কেশবের আবেগে কোন চঞ্চলতা প্রকাশ করিল না, কোন বিরক্তি প্রকাশ করিল না। ধীরে ধীরে নিজকে কেশবের বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া কহিল, কিন্তু এ আপনার ভালবাসা নয়--মোহ, এ প্রণয় নয় —লালসা!

কেশব আচমকা ব্যাকুল হইয়া উঠিল, মোহ! লালসা!

তরুণী কহিল, তাই!

কেশব বলিল, আমায় বিশ্বেস করো না?

তরুণী কহিল, না!

কেশব সহসা তরুণীর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া মিনতি-ভরা কণ্ঠে কহিল, কিন্তু এ আমার প্রাণের কথা! বিশ্বাস না করো পরখ করো!

তরুণী নিস্পৃহকণ্ঠে কহিল, তাই হোক! তোমার ভালবাসা যদি এমনি সেদিনও থাকে, সার্থক হবে আমার জীবন! সেদিন তোমাকে আমার যা কিছু সব দিয়ে সত্যই আমি সুখী হবো—বিশ্বেস করো!

কেশব দুঃখভারকণ্ঠে কহিল, কিন্তু সেদিন কবে?

তরুণী কহিল, যেদিন তোমার পরীক্ষা শেষ হবে।

কেশব হতাশ, কাতরস্বরে বলিল, কিন্তু কি করে আমি তা জানবো বলো?

তরুণী অপকট হৃদয়ে কহিল, সেদিন যে আমি নিজেই আসবো—আমায় ডাকতে হবে না—খুঁজতে হবে না! আজকের মতো এমনি অনাহূত এসেই তোমার পায়ে শরণ নেবো!

কেশব তবুও মানিল না। ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, সে মিলন কোথায় হবে আমাদের?

তরুণী তেমনিভাবে কহিল, এই গাড়ীতে। আজকের স্মৃতির মূল্য সেদিন আমি দেবো! আজকের মতো এমনি এক আষাঢ়ের প্রথম দিনে যেখানে আজ উঠেছিলে—যেখানে আজ প্রথম তোমায় পেয়েছিলাম, তোমার পরীক্ষার শেষ দিনেও সেইখানেই হবে আমাদের পূর্ণ মিলন!......কিন্তু তোমার পরিচয়টা! এ কাপড় জামা তো ফেরৎ দিতে হবে?

কেশব বলিল, না! তারও প্রয়োজন নেই! এই একমাত্র চিহ্নটুকু তোমার কাছে থাক্! হয়তো এই দেখেও তুমি আমার কথা মনে করতে পারবে। এইটীর অধিকার আমায় দাও!

সে কহিল, তবে তাই হোক! কিন্তু আমি সত্যিই তোমায় ভুলবো না—তুমি যদি না ভোলো।

কেশব বলিল, ভুলবো আমি?

গাড়ী আসিয়া সান্তাহারে থামিল।

তরুণী দরজা খুলিয়া নামিতে লাগিল। কেশব পিছন হইতে বলিল, একটা কথা!

তরুণী নামিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া কপালে দুহাত ছোঁয়াইয়া সুস্মিতকণ্ঠে কহিল, আর না! আমাদের সব কথা শেষ হয়ে গেছে! এখন বিদায়—বিদায়—বিদায়......!

কেশব কি বলিতে চাহিল কিন্তু অন্তরের বিরহ ক্রন্দনের সজল বাষ্প তাহার কণ্ঠনালী সহসা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অনেক চেষ্টার পর যখন কণ্ঠ খুলিল, তখন তরুণী যে কোথায় জনস্রোতে মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে ব্যাকুল কেশবের আকুল দৃষ্টি আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না।

কেশব ফিরিয়া আসিয়া নিজের আসনে বসিল। অন্তর মন তাহার বাহিরের সজল-বাদল দিনের মতোই ক্রন্দনোজ্জ্বল!

গাড়ী আবার চলিল। মুখ বাহির করিয়া যতক্ষণ

ষ্টেশনটীর শেষ চিহ্নও দেখা গেল কেশবের সজল দৃষ্টি অপস্রিয়মান দূর দুরান্ত হইতে পিপাসার্ত্তের মতো উহার মিলিয়া যাওয়া অস্পষ্ট ছায়ায় ছায়ায় যেন কি খুঁজিয়া মরিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সর্ব্বহারা দৃষ্টির সামনে ষ্টেশনটীর ক্ষীণ ছায়াটুকুও এক সময় মিলাইয়া গেল। একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কেশব মুখ টানিয়া লইয়া ভিতরে চাহিতেই বাক্সের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তরুণীর ছাড়া ভিজা কাপড় জামা তখনও সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে—বোধকরি ভুল করিয়া সে লইয়া যায় নাই। মণিহারা ফণীর মতো কেশব ছুটিয়া আসিয়া উহা তুলিয়া লইয়া বারবার বুকের ওপর চাপিয়া ধরিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল,—তুমি ফাঁকি দিতে পারোনি—না দিয়েও তুমি সব দিয়ে গেছো! এরই সাহায্যে তোমাকে আমি আবার এমনি একদিন পাবোই………।

তরুণীর সেই জামা কাপড় আজও তাহার স্যুটকেসে সযত্নে আছে—এবং অনুক্ষণ এমনি সঙ্গে থাকেই।

তাহার পর দুইটী বাদলের মায়াকাজলমাখা আষাঢ়ের প্রথম দিন আসিয়াছে ও নিস্ফল বেদনায় চলিয়া গিয়াছে—বিরহী কেশব তবুও ভুলেনি! বিবাহ সে আজও করেনি! প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, করিবেও না! তরুণীর সেদিনের কথা সে অবিশ্বাস করে নাই এবং এই আষাঢ়ের প্রথম দিনে আজিও আরবারের মতো সব কাজ ফেলিয়া সে তাহার প্রিয়াকে খুঁজিতে মেঘকে না পাঠাইয়া নিজেই আসিয়াছিল। কিন্তু কে জানে কবে কোন আষাঢ়ের প্রথম দিনের বাদল ধারায় স্নান করিয়া বিরহী কেশবের বিরহিণী মানসরাণী আবার তাহার নিকট ফিরিয়া আসিবে? কেশব নিজেও তাহা জানে না। শুধু অন্ধের মতো অকপটে বিশ্বাস করে—সে আসিবেই।

শ্রীমনীন্দ্রচন্দ্র সাহা

বৈদ্যনাথের পথে

শ্রীঅনিলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ

সেদিন নিশীথে চলিতেছিলাম কোন বাষ্পীয় রথে
বৈদ্যনাথের পথে!
অলস-নয়ন-ঘুম-ভারে আসে নুয়ে;
নিখিল আঁধার ছুঁয়ে!
সহসা কী ধন দিল মোরে শর্ব্বরী
আজি তা স্মরণ করি'
হৃদয়ের শত রক্ত কণিকা মহা আনন্দে নাচে
উষ্ণতা লভি বাঁচে!
চঞ্চল এক ষোড়শী সে মেয়ে আসিল শকট-ঘরে
তুষ্ট যেন সে কোন্ বিধাতার বরে;
নয়নে, তাহার নাহি সঙ্কোচ, দৈন্যতা নাহি ঠোঁটে,
লক্ষ মধুপ গুঞ্জন তার অধরের তলে লোটে,

একটী কথায় মনে হ'ল যেন কত সে আমার চেনা,
পার্ব্বতী পূত-তপের প্রভাবে ধূর্জ্জটী র'ল কেনা ;
তাপসের রূঢ় আসন টলালো, নহে তবু উর্ব্বশী
একক চাঁদের হৃদয় লাগিয়া কাঁদে শুধু এ সরসী,
এ নহে রম্ভা, মেনকা, পতিতা নারী
এ মেয়ের প্রেম-বর্ণনা-ধারায় পৃথিবী হয়নি ভারী।
আমার মাঝারে দেখিল কী মেয়ে অনন্ত বিস্ময় ?
ঝটিকা-দীর্ণ, সে প্রাণ, বাহুতে খুঁজিল কী আশ্রয় ?
তাই যদি হয় হোক্—
পৃথিবীর গেহে প্রকৃতি দুলালী, মাণিক ভুলুক শোক !
মাণিক, তাহার চঞ্চল-পদ বদ্ধ হউক তবে,
আমার হৃদয়-কমল-দলের লালিত্য-গৌরবে !
ঝড়ের দুলালী, মাটির দুলালী এলো তাপসের ঘরে
ফিরে যেতে দিতে মন তাই নাহি সরে ;
শকট-গতির সনে দোঁহা-গতি এক সদা হোক্ লীন
পৃথিবী বাজাক বীণ ।
সহসা, এ কী-এ নামিছে দুলালী মেয়ে ;
ঘন-তমিস্রা, তারি কালো-পথ-বেয়ে ?
আঁধার মাঝারে হ'ল একি এক প্রভাত সূর্য্যোদয়
ঝর্ণাধারার উচ্ছল-গতি, ছড়ালো কী মরুময় ?
রাত্রির বাণী, নামিল কী তা'র চোখে—
বুঝিতে নারিনু ক্ষীণায়িত তারালোকে !
সরমে মরিয়া, বলিতে নারিনু—"ওগো মেয়ে তোমা জানি
তুমি যে আমার মানস বনের রাণী
মোর সাথে চলো, তীর্থের পথে হবে, হ'বে তব জয়
মোদের দোঁহার মাথার উপরে দেবতার বরাভয়—
নামিবে অপার স্নেহে
সারা মন, সারা দেহে !
যেওনা চপলা যেওনা ষোড়শী, শোনো এ প্রাণের বাঁশি
হাস্যের তলে দেখিয়াছে কবি তোমার কান্নারাশি,
যেওনা নিঠুরা বুক ভেঙে দিয়ে মন কেড়ে নিয়ে হায়
ক্ষণিক চাহিয়া মিলালো তরুণী কালো রজনীর গায় ।

শ্রীঅনিলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হাইন সপ্তক

এ, বি, এম, হবিবুল্লাহ এম্-এ, পি-এচই, ডি, (লণ্ডন)

(১)

বিদায়ের ক্ষণে বন্ধুরা ফেলে নিশ্বাস অবিষাদ,
সজল নয়নে প্রাণের রুদ্ধ বেদনা সংবাদ।
মোদের বিদায়ে অশ্রু ছিলনা, ছিলনা ব্যথিত মন।
পরে আসিয়াছে দীর্ঘ নিশাস, হৃদয়ের ক্রন্দন।

(২)

ভুলিয়াছ তব হৃদয়ে একদা ছিল মম অধিকার,
—তোমার ছোট্ট হৃদয়ে, মায়া ও মিথ্যায় একাকার।
প্রেম ও অশ্রু, দু'টি কথা, জানি, হয়েছ বিস্মরণ।
প্রেম না অশ্রু? কে বড়, জানিনা,
তুমি জিনেছিলে মন।

(৩)

তোমার আঁখিতে লীন হয়, প্রিয়া, ভাষা সব বেদনার,
অধরের রসে জীর্ণ এ তনু জীবন্ত পুনর্ব্বার।
তব বুকে বুক রাখি যবে হয় সুন্দর ধরাতল—
শুধু যবে বল 'ভালবাসি', সখি,
চোখ ফেটে আসে জল।

(৪)

মুখরা, তোমার দীর্ঘ লিপিতে অদ্ভুত বিস্ময়?
মোর তরে প্রেম মরিয়াছে তব? এ কথা নূতন নয়!
বারোটি পাতার এ কথা বলিতে, হয়েছিল প্রয়োজন
চতুরিকা! একি বিদায় না পুনর্মিলনের আবেদন?

(৫)

সবার আঘাতে আঘাতে আমার দেহ নীল, জর্জ্জর—
ঘৃণায় কেহবা, কেহ ভালবেসে, হানিয়াছে ফুলশর।
নিষ্ঠুরা! শুধু তোমার আঘাতে জ্বাল ও তীব্রতাই,
মোর তরে তব ঘৃণা ত' ছিল না,
ভাল কভু বাস নাই।

(৬)

ভুবন ভরিয়া মাধুরিমা, হ'ল আকাশ গভীর নীল,
সঙ্গীত দোলে বাতাসে বাতাসে, অপূর্ব্ব, অনাবিল।
সোণালি প্রভাতে কুসুমের মেলা, মানুষের কলরব।
মোর তরে? শীতল অন্ধ পাতালে
প্রেয়সীর মৃত শব।

(৭)

মোর গান শুধু জ্বালাময়? সখি কোথা পাব ঝঙ্কার?
প্রেমের গরলে জীবন হ'ল যে তিক্ত পুনর্ব্বার।
সঙ্গীত নহে এ, বিষের দহন-শিখা, নীল, লেলিহান—
তুমিই জান না, মোর বুকে তুমি জ্বলিছ অনির্ব্বাণ।

আফ্রিকার জঙ্গলে সাতহাজার মাইল

শ্রীহীরেণ বসু

টাঙ্গানিকা মহকুমার জন-সাধারণ যেমন নিরীহ আবার তেমনি বীর। এ জাতের নাম 'মাসাই'। এরা বোধকরি পৃথিবীর সবচেয়ে বীর। গারোঙ্গরোর পাহাড় ঘিরে এদের বসতি; এছাড়া আরূষা থেকে গারোঙ্গারোর পথেও এদের সাক্ষাৎ মেলে, এই মাসাই জাতের বীরত্ব গ্রীক্, রোমান, জার্ম্মাণদের মত জগৎবিখ্যাত। রাজপুতদের মত এদের নিষ্কলঙ্কচরিত্র। এদেশের স্ত্রীলোক তাঁদের স্বামীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে তখনই, যখন সেই স্বামী একটী সিংহ একাকী শীকার করে। তাই আজও এ দেশের পদ্ধতি যে একটী সিংহ শীকারের সমাপ্তি না হলে এদেশের পুরুষ বিয়ের অধিকারী হয় না।

বীরমাসাই

সকালে প্রাতকৃত্য সমাপন করে কিছু নাস্তা আহারাদির পর আমরা সারেঙ্গাটী প্রান্তরে অবতরণ কর্ব্বার আয়োজন করতে লাগলাম। এইবার ২৫০ মাইলের মধ্যে জলের নাম গন্ধও নেই; তাই লরি বোঝাই জলের ব্যবস্থা, খাবার দাবারের ব্যবস্থাও সেই রকমই হয়েছে। ক্রেটারের পাশ দিয়ে যে পথ নীচে নেমে গেছে তা চক্রাকারে সারা পাহাড় বেষ্টন করে ঘুরে ঘুরে নেমেছে। গাড়ী এই পথ বেয়ে নামতে লাগলো। সে কি ভীষণ ঘুর, যেখানে যত পাহাড় ছিলো যেন এই উপত্যকা ঘিরে বসে আছে; আর সারা পাহাড় ঘিরে এই বন্যপথ যার নেই সীমান্ত। পঞ্চাশ মাইল বেপে ঘুরপাক খেতে খেতে আমাদের গাড়ী সরেঙ্গাটী অভিমুখে ছুটে চল্‌লো।

মাইল দুই তিন নাম্‌বার পরই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো একদল সাম্বার হরিণের প্রতি। শীকারী বন্ধু মিঃ একম্যানকে জিজ্ঞাসা করায় শুনলাম ইংরাজীতে এগুলির নাম Wilde beast. এ প্রান্তরের হরিণ নানা প্রকার, উইল্‌ডে বিষ্ট (Wilde beast), হার্টী বিষ্ট (Hearte beast), থম্‌সন্ গ্যাজল (Thomsons Garel), ওয়াটশন গ্যাজল (Watson Garel), বাক্, ওয়াটার বাক, বুশবাক, টপিস (Toppy) ইত্যাদি। সংখ্যায় তারা লাখ লাখ। এমন কি চল্‌বার পথে মটরের সঙ্গেও ধাক্কা লাগে, এদের সাথে দলবদ্ধ হয়ে একত্রে বেড়ায় জেব্রার দল। এছাড়া হায়না, বুনো কুকুর, বুনো শূয়ার, শকুনি, গৃধিনীরও অভাব নেই। এদের পিছুতে আমাদের মটর ছুটে চলে; চারিপাশ থেকে এদের গণ্ডী দিয়ে আট্‌কে নিয়ে আমাদের ছবি তোলার ব্যবস্থা হয়েছিলো।

সারেঙ্গাটী প্রান্তর দুনিয়ার চিড়িয়াখানা নামেই,

অভিহিত। জগতের আর কোথাও এরকম একত্রিত পশুদের বাস নেই, তাই এই প্রান্তর গবর্ণমেণ্টের জঙ্গল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা সংরক্ষিত। রাশি রাশি ধূলা ও শুক্‌না ঘাস এই প্রান্তরকে ছেয়ে আছে। বনরেখার লেশমাত্র নেই, আছে কেবল বাবলার পাত্‌লা জঙ্গল। এই অসীম প্রান্তরের মাঝেও পাওয়া যায় পৃথিবীর অর্দ্ধ গোলাকৃতির রূপ, যা একবার পেয়েছিলাম সমুদ্র বক্ষে। মনে হয় এই মাঠেরও শূন্য সীমান্তে পৃথিবীর সমাপ্তি আর এরই নিম্ন দিকে বুঝিবা জগতের অপর বিভাগ। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর আমরা নীচে নেমে

দুনিয়ার চিড়িয়াখানা

এলাম। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হলো অদূরে অগাধ জলরাশি। মটর দাঁড় করিয়ে দেশীয় সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করলাম, "এখানে যে জল পাওয়া যায় না বল্লেন, কিন্তু এযে এক সমুদ্রজল?" দেশীয় বন্ধু হেসে উত্তর দিলেন "জল নয় মরীচিকা।" মরীচিকা! আমি আশ্চর্য্যে উচ্চারণ করলাম —"মরীচিকা, কি সর্ব্বনাশ!" সত্যই গাড়ীর এগিয়ে চলার সাথে সাথে সে মরীচিকা দেখ্‌তে দেখ্‌তে মিলিয়ে গেলো।

এবারে সুরু হলো আমাদের দুর্ভোগ। এখানকার মাটীর নাম হচ্ছে Black cotton soil অর্থাৎ কালো মাটী; বৃষ্টির সাথে তুলার মত আটকে ধরে আর রৌদ্রতাপে ভুরা বালির মত গাড়ীর চাকাকে বসিয়ে নেয়। আমার গাড়ীর হলো তাই। যত বেরোবার চেষ্টা করি ততই বালু সমুদ্রের তলায় তলিয়ে চলি। গাইডের গাড়ী ও লরি, যাতে সুইডিশ বন্ধু মিঃ একম্যান ছিলেন এগিয়ে চলে গেছে। পেছনে একটী বাস, যাতে আছেন আমাদের মতই অসহায় বন্ধুবর্গ। অতিকষ্টে তাঁদেরই সাহায্যে আমাদের গাড়ী Black Cotton Soil থেকে সে যাত্রা উদ্ধার হলো। কিন্তু সন্ধ্যার ঘন ছায়া সারা পৃথিবীকে

ব্ল্যাক কটন মাটীর মাঝে আমাদের দুর্গতি

তখন গ্রাস করছিল। দুনিয়ার চিড়িয়াখানার মাঝে দাঁড়িয়ে আমরা পথ হারালাম; তবুও গাড়ী ছুটিয়ে দিলাম, বালির উপর চাকার দাগের নিশানা ধরে। প্রায় চব্বিশ মাইল যাওয়ার পর অন্ধকার সারা মাঠ ছেয়ে নেমে এলো, তার মাঝে সুরু হলো সিংহের গর্জ্জন। সন্ধ্যার আবছায়ায় তাদের সান্ধ্য ভ্রমণে আমরা নিরুপায় হয়ে গাড়ী থামালাম। পেট্রোল পরীক্ষা করে দেখলাম, যে যেদিকেই যাই, আর মাত্র

চল্লিশ মাইল যেতে পারি। যদি সঠিক পথে চলে এসে থাকি তবেই রেহাই, নইলে এই সীমাহীন প্রান্তরে বিনা পেট্রোলে, বিনা জলে, বিনা খাদ্যে নিরুপায় হয়ে সিংহের উদরেই স্থান পেতে হবে। Towist Report এ পড়েছি এই প্রান্তরে এমন অনেকই হয়েছে। পথে পেয়েছিলাম গভর্ণমেণ্টের নিশানাবোর্ড যাতে লেখা ছিলো "This way to Loliondo" ও অপর দিকে বানাগী হিল্‌সের পথ, যার বোর্ড অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় ঝুলছিল। ভাবলাম যদি এই

যুক্ত রাস্তার কোলে

যুক্ত রাস্তায় অবস্থান করি হয়ত কোন না কোন মটর পাবই। কাজেই ফিরে চল্‌লাম। পথে পদে পদে মটর দাঁড়িয়ে পড়ে আর সামনে সিংহরাজ মটরের আলোয় করে দৃষ্টি বিনিময়। এই ভীষণ জীবন মরণের রণে আমরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম। জমাট অন্ধকারে হায়নাদের বিকট আর্ত্তনাদ আরম্ভ হলো। মটরের আলোয় শত চোখ জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলতে লাগল। এক অদ্ভুত বিভৎস অনুভূতিতে সারা প্রাণ ছেয়ে উঠল। দুখানি মটর প্রায় রাত দশটার সময় সেই বোর্ডের কাছে এসে পৌছল। দুটিকে মুখোমুখি এক করে সে রাত্রের মত সীমাহীন অনন্ত

প্রান্তরের বিরাট চিড়িয়াখানায় রাত্রি কাটালাম। ঘুম কারো চোখে নাই; সদাই শঙ্কিত-ত্রাসে মুখ চেয়ে রইলাম। সারারাত জীবন মরণ রণে বিজয়ী হয়ে ভোরের আলো দেখতে পেলাম। জল তেষ্টায় গলার কণ্ঠের নালী পর্য্যন্ত শুকনো, তাই জলের খোঁজে বার হলাম। মাঠের ফাটাল তারই মাঝে পেলাম লোনা জল। সেই জলও হলো অমৃত। ওটের (Oat) টিন সাথে ছিলো। বাবলার শুকনো ডাল জ্বালিয়ে লোনা জলে ওট্ (Oat) তৈয়ারী করে খাবার

বানাগী হিল্‌সের ক্যাম্প

সংস্থান হলো। দিন বয়ে যায় কারুর দেখা নেই, ছবি তোলার নেশা কেটে গিয়ে 'পটল' তোলার স্বপ্নই হলো প্রবল। বেলা প্রায় ৫টা—অদূরে রাশীকৃত ধূলোর ধূয়া দেখে মনে আনন্দ হলো, ভাবলাম এ যাত্রা বুঝি বা তাহলে বাঁচলাম। অবশেষে ভগবানের অসীম করুণাই ফিরিয়ে এনে দিলো আমাদের পরিত্যক্ত সাথীদের। প্রায় রাত্রি ১১টার সময় আমরা বানাগী হিল্‌সে গিয়ে পৌছিলাম।

পথিমধ্যে যাঁর দর্শন কৃপায় আমাদের গত রাত্রের দুর্য্যোগ তাঁর কথাই বলা হয়নি। তিনি হচ্ছেন একটি

প্রকাণ্ড স্থল-কচ্ছপ। শ্রীহরির এই কূর্ম্মরূপ দেখতে দেখতে এমনই আত্মহারা হলাম যে, তাঁকে সঙ্গের সাথী করে মটরের বাম্পারে বেঁধে নিয়ে আসছিলাম। এ অবতার সাথে থাকলে যে, কি কি দুর্দ্দশা হয় এবং হতে পারে, টেণ্টে বসে সে রাত্রে তাই আলোচনা হচ্ছিল। হঠাৎ হায়না-দের বিকট হাসিতে সব লাফিয়ে উঠলাম। মিঃ একম্যান টেণ্ট থেকে টর্চ্চ নিয়ে বার হলেন; হেসে বল্লেন, "ভয় পেয়েছেন নাকি!" তখনও টর্চ্চের আলোয় শত চক্ষু আমাদের ঘিরে পাহারা দিচ্ছিল; কাজেই ভয় পেয়েও কাষ্ঠ হাসি হেসে বললাম "কই না।" অন্তরাত্মা অন্তরে বিদ্রূপ অনুভব করল।

শ্রীহরির কূর্ম্মরূপ

বানাগী হিলের সীমানা ঘিরেই বাস করে এই সিংহের দল। পরদিন সকালে উঠে মিঃ একম্যান এখানকার জঙ্গল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত হতে বল্লেন। টেণ্টের বাইরে প্রাতঃকৃত্যের সময় এই ছোট বানাগী পাহাড়ের গায়ে এক অদ্ভুত জন্তু দেখলাম। সংখ্যায় তারা ২০০।২৫০, অনেকটা শূয়রের মত আকৃতি। মনে হলো এ বোধ হয় শ্রীহরির শূকররূপ। মিঃ একম্যানকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্‌লেন—ওগুলি হচ্ছে Rock Rat অর্থাৎ পাহাড়ী ইঁদুর—এরা নিরীহ, যেখানেই থাকে দলবদ্ধ হয়ে থাকে। আমাদের লরি Game warden মিঃ মুরের সাক্ষাতের আশায় পথ ধরলো। পথিমধ্যে পেলাম একটি ছোট খাদ; পগার বল্লেও অত্যুক্তি হয় না—লোনা জলে ভরা। সেটি পার হতেই পেলাম গাছের তলায় এক রাশি সিংহ; সংখ্যায় এরা সতেরটী, বুভুক্ষু দৃষ্টিতে আমাদের প্রতীক্ষা করছে। দূরত্বের ব্যবধান মাত্র ৪০।৫০ ফিট। এদের গ্রাহ্য না করে আমাদের মটর চালিয়ে দিলাম, কিন্তু আমাদের ত্রস্ত চোখ চেয়ে রইল সেই সিংহদের পানে। প্রায় আধ মাইলের মধ্যেই আর একটী

মিঃ মুরের সাক্ষাত

মটরের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হলো। তারই মধ্যে রয়েছেন Mr. Moore; আরুষা থেকে তার পেয়ে তিনি আমাদের তল্লাসে আসছিলেন। তিনি আমাদের অভিবাদন শেষ করে জিজ্ঞাসা করলেন, যে আমরা কোন সিংহ দেখেছি কিনা। আমরা পূর্ব্বোক্ত সিংহের দলের কথা বল্লাম। তিনি হেসে বল্লেন, "আপনাদের ভাগ্য ভাল, নইলে এই ১৭টী Groupএর যে মণ্ডল অর্থাৎ 'কালা সিম্বা'; কালো কালো

কেশর নিয়ে যিনি এই জঙ্গলের রাজা হয়ে বসে আছেন আজ প্রায় তিনমাস তিনি খোয়া গিয়েছিলেন, মাত্র সাত দিন হ'ল ফের এর দেখা পাওয়া গেছে ; এর শরীর খুবই খারাপ। পায়ে একটা আঘাত লেগেছে।" তিনি তাই দেখতেই চলেছেন, আমাদের সঙ্গে যেতেও অনুরোধ করলেন। একে সিংহদের সামনে নিজেদের অর্পণ করা তার উপর এই অত্যদ্ভুত উপাখ্যান শুনে ভয় পেলাম, কি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলাম তা বলতে পারি না। শুধু তাঁকে অনুসরণ করে গিয়ে দাঁড়ালাম সেই সিংহের দলের সাম্‌নে। তাঁর মটরখানি তিনি একেবারে কালা সিম্বার ৫ ফুটের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দরজা খুলে, এক অদ্ভুত ভাষায় তাকে অভিবাদন করতে আসে না, তারা আসে শুধু তাদের ভোজের ব্যবস্থা করতে। এর পর তিনি আদেশ পত্র দিয়ে বললেন "যান একটা জেব্রা মেরে এদের ভোজের ব্যবস্থা করুন।" তথাস্তু! জেব্রা মারা হলো, তাকে বয়ে এনে একটা গাছে দড়ি দিয়ে টানিয়ে দিলাম। মাত্র জেব্রাটার একটি ঠ্যাং কেটে, বাসে নিয়ে এই নিমন্ত্রিতদের আমন্ত্রণে যাত্রা করলাম। একটি দড়ির এক পাশে এই ঠ্যাংটি বাঁধা আর লরিতে অপরাংশ। মাংস খণ্ডটি তাদের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিতেই তারা লাফিয়ে পড়লো বিকট গর্জ্জন করে। লরির টানে সেই মাংসটুকরো এগিয়ে এলো লরির সাথে এবং ক্ষিপ্ত সিংহের দল পরস্পর পরস্পরকে ভুল বুঝে

বিরাট ভোজ

লাগলেন ; কালা সিম্বা গর্জ্জন করে পিছনের একটা পা উঁচু করে তুলে ধরলো আর Mr. Moore তাই মাথা নীচু করে দেখতে লাগলেন। বিস্ময়ে সর্ব্বশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম নচেৎ এ দৃশ্যের ছবিও সংকলন করা প্রতি 'ডিরেক্টারেরই' উচিত। তাদের কাছ থেকে ফিরে এসে কিছু দূরে জিজ্ঞাসা করলাম "এরা কেন কাউকে কিছু বলে না"? Mr. Moore বল্লেন ১৯১৯ সাল থেকে সুরু করে আজ ২০ বৎসর এ অঞ্চলের সিংহদের আমি প্রায় রোজ জেব্রা, হরিণ মেরে খেতে দিই। এদের সংখ্যায়, মোট ২৭।২৮টী, এরা ভাবে যে যারা কোট প্যাণ্ট পরে, তারা তাদের ক্ষতি করতে ঝগড়া সুরু করলে। সারা বন তাদের হুঙ্কারে কেঁপে উঠল। আবার মাংসের টুক্‌রো ছুঁড়েদি আবার তারা ঝগড়া করে ; এমনি করেই আমরা তাদের এগিয়ে নিয়ে এলাম,—বাঁধা জেব্রার কাছে। তারা সেই সামান্য টুক্‌রো ফেলে এবার এগিয়ে এলো জেব্রার দিকে। মুখে চোখে তাদের বিকট লালসা। দাঁতে দাঁতে তোলে ক্ষুব্ধ গর্জ্জন, বারবার চেয়ে দেখে আমাদের লরির দিকে। আমাদের ছাত খোলা মালবওয়া লরি, তারই উপর ক্যামেরা ও আমরা। ভয় পেলাম, অন্য লরিকে জেব্রার দড়ি খুলে দিতে ইসারা করলাম, দড়ি আলগা হলো, ১৭টী সিংহ

একসঙ্গে লাফিয়ে পড়লো সেই জেব্রার উপর। ফাল ফাল করে তার সারা অঙ্গ ছিঁড়ে তার বুকে, পিঠে ও পেটে-মুখ ঢুকিয়ে দিলে। জেব্রার গায়ের সারা রক্ত যতই চুষে বার করতে লাগল, আমাদের বুকের রক্তও ততই জল

কালা সিম্বা

হতে লাগলো। আমাদের ক্যামেরা কিন্তু চলেছে, কেন চলেছে, কি ভাবে চলেছে, কেমন করে চলেছে এ উপলব্ধি কারো নাই—Machine ঠিক Machine'এর মতই চলেছে; দৃষ্টি আমাদের ১৭জোড়া চোখের গতির উপরে। তারা যখন আমাদের দিকে তাদের সারা মাথা মুখ রক্তবর্ণ করে ফিরে ফিরে দেখছিলো, তখন আমাদের সারা দেহে যেন হিমানী প্রবাহ বইছিলো। কালা সিম্বা এলো সবচেয়ে পরে। সে শুধু আমাদের দিকে চেয়ে একটী গর্জ্জন দিলে। Cameraর jerkey panning আপনা হতেই হতে লাগল। হুঁসে কি বেহুঁসে এর সমাপ্তি হলো জানিনা। মিঃ একম্যান বল্লেন "এবার লরি ষ্টার্ট করো" হৃদকম্প থেমে গিয়ে বক্ষ দম্ভে স্ফীত হয়ে উঠলো। মনে হলো এ শুধু বিচিত্রতা নয় এ একটা বিরাট অনুভূতি, যা প্রকাশ করার ভাষা নেই! এ এক অত্যন্ত আনন্দ ও নির্ভীকতা, যার সংস্পর্শ মানুষকে নেশায় বশীভূত করে। এই বিরাট প্রান্তরের মাঝে এই বিরাট শক্তিকে জয় করার পর মনে হয়, মানুষ সত্যই জগতের শ্রেষ্ঠ জীব। তারা করতে পারে সব! বনের সিংহকে তারা করেছে বশ। যাঁরা প্রথম শিখিয়েছে এই বন্যজন্তুগুলিকে, যে যারা খাবার দেয় তাদের আঘাত করতে নেই, তাঁদের পায়ে সহস্র প্রণাম জানিয়ে আমরা সেদিনের মত টেণ্টে ফিরে গেলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহীরেণ বসু

পরাজয়

শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বি-এ

দেবতার রাজা হলেন মহারথী ইন্দ্র।
আর জমিদারের রাজা মোদের ইলসামারির দেবেন্দ্র॥

রামায়ণ, মহাভারত নয়, বাল্মীকি, ব্যাসও নন্‌, তথাপি কথা কয়টী এবং উহার রচয়িতা জলধর কবিদারের নাম ইলসামারির আবাল বৃদ্ধ বনিতা স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে।

পূর্ণিমার রাত্রি। বাউলী মাঠে প্রকাণ্ড ছাউনী পড়িয়াছে। লোকে লোকারণ্য।

অসম্ভব ঢাক ঢোলের বাদ্যের মাঝে জলধর আসরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিরাট জনতা, কিন্তু টুঁ শব্দটা পর্য্যন্ত হইল না।

আসরে ঢুকিয়া জলধর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া গুরুদেবকে স্মরণ করিল।

পরে জোড়হাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া নাচিয়া ভূমিকা গাহিল,—জমিদারের রাজা মোদের ইলসামারির দেবেন্দ্র।

শ্রোতারা সকলে উৎসাহভরে করতালিধ্বনির সহিত কোলাহল করিয়া উঠিল।

হঠাৎ আসরের মাঝে, একেবারে জলধরের গা'য়ের উপর একছড়া সোনার হার টুপ্‌ করিয়া আসিয়া পড়িল।

সকলে বিস্ময়ে দেখিল, জমিদার দেবেন্দ্র মিত্র স্বয়ং দূরে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

ব্যস্‌ ঐ পর্য্যন্তই। শেওলাখালির গোমস্তা হরিচরণ যাইয়া নিজের জমিদার মহেশ ঘোষকে সবিস্তারে কথাটা খুলিয়া বলিল।

রেষারেষি পূর্ব্ব হইতেই ছিল, এইবার সেটা বাড়িল মাত্র।

আড়ালে দেবেন্দ্র মিত্রকে লোকে বলিত, কলির দুর্ব্বাসা। লোকটাকে কেহ. কখনও হাসিতে দেখে নাই, এক বাউলী মাঠে সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। যেমন দেখিতে কুৎসিত, মনও তাহার সেইরূপ।

জমিদার বাড়ী লোকজনে ভর্ত্তি কিন্তু নিজের বলিতে একমাত্র পুত্র ছাড়া দেবেন্দ্রের আর কেহই ছিল না। আত্মীয় স্বজনরাই বাড়ী ভর্ত্তি করিয়া রাখিয়াছে।

ছেলের নাম, কল্যাণকুমার। কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে লেখাপড়া করে। ছেলের ইলসামারিতে আসিতে মানা, বাপ যাইয়া মাঝে মাঝে দেখাশুনা করিয়া আসেন।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া দেবেন্দ্র একটু দিবানিদ্রার আয়োজন করিতেছিলেন।

এমন সময় নায়েব আসিয়া দুয়ার গোড়ায় দাঁড়াইল।

দেবেন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, অসময়ে যে?

নায়েব বিনীত হইয়া উত্তেজিতস্বরে বলিল, শেওলাখালির রকমটা দেখছেন হুজুর, চারদিক ঢেঁড়া পিটিয়ে বলে বেড়াচ্ছে জলধরকে নাকি আপনি ঘুষ দিয়ে আত্মপ্রশংসা কুড়িয়েছেন।

দেবেন্দ্র শান্তস্বরে বলিলেন, তাতে দোষের কিছু নেই। জমিদারেরা ঘুষ দিয়েই প্রশংসা নিয়ে থাকেন, তারও সামর্থ্য যাদের থাকেনা তারা ক্লীব, পরের সুখ্যাতি শুন্‌লে তাদের হিংসা প্রবৃত্তির উৎসাহ বাড়ে।

নায়েব আরও কি বলিতে যাইতেছিল বাধা দিয়া দেবেন্দ্র বলিলেন, আমার বড় ঘুম পেয়েছে। আজ তুমি যাও কাঙ্গালী, বরং অবসর মত আর একদিন ওসব শুনবো।

কাঙ্গালী মাথা নীচু করিয়া বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু বাহিরে আসিয়া প্রবল বিক্রমে সহকর্ম্মীদের নিকট সে বলিল, হুজুর ত চটেই লাল। সে রাগ থামান কি আমার সাধ্যি, বাপরে। বল্লেন, শেওলাখালি ইলসামারির-এলাকায় না এলে আমার আর ঘুম নেই।

কথা শুনিয়া সকলেই উৎফুল্ল হইল।

কে একজন চেঁচাইয়া বলিল, পতঙ্গের পাখা উঠে মরিবার তরে।

কথাটী গড়াইতে গড়াইতে বৃহৎ হইয়া শেওলাখালিতে গিয়া পড়িল। তাহারাও লাফাইয়া উঠিল। কিন্তু দেবেন্দ্র কিছুই জানিলেন না।

শেওলাখালির জমিদারও দেবেন্দ্র হইতে কিছুতেই কম নহেন। কিন্তু দেবেন্দ্র তাঁহার পতঙ্গ কিংবা সফরী ভিন্ন অন্য কিছুর সহিত তুলনা করেন না। শেওলাখালির জমিদারকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন।

ইহার এক কারণ আছে। পিতা স্বর্গে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার কানে কানে বলিয়াছিলেন, পুত্র, শেওলাখালি যেন বড় না হইতে পারে। উহাদের উপর কোনকালে কোন কারণেই যেন মিত্রভাব না আসে।

দেবেন্দ্রের পিতামহও তাঁহার পিতাকে এই বলিয়া বিদায় লইয়াছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহও পিতামহকে এই আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

এই রকম ছয় পুরুষ ধরিয়া চলিতেছে কিন্তু কেহও কারণ বলিয়া যান নাই, কেহ জানিতেও চাহেন নাই।

দেবেন্দ্র পূর্ব্ব পুরুষের অবমাননা করিতে পারেন না। শেওলাখালির কথা উঠিলেই তিনি কানে আঙ্গুল দিয়া থাকেন। তিনিও ভাবিয়াছিলেন নিজের একমাত্র পুত্রকে পিতৃ-পুরুষের এই আশীর্ব্বাদ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া বিদায় লইবেন। কিন্তু ছেলে সিগারেট খায়, হাল্‌কা কথাবার্ত্তা বলে, বন্ধু-বান্ধবের সহিত হুজুগ তুলিয়া সিনেমা দেখে। সুতরাং পুত্র সম্বন্ধে তিনি ক্রমশই হতাশ হইয়া পড়িতেছিলেন। মনে করিতেছিলেন, উহাকে কলিকাতা হইতে আনাইয়া বাড়ীতে রাখিবেন এবং ভাল করিয়া জমিদারী নীতি বিষয়ে শিক্ষা দিবেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। সামনের প্রকাণ্ড দীঘির কিছুই দেখা যাইতেছে না, অসংখ্য জোনাকী পুকুরের মাঝে চিক্ চিক্ করিয়া জ্বলিতেছে। সমস্ত দিকে একটা ধোঁয়াটে ভাব। দেউড়ী হইতে দারোয়ানজী তাহার অদ্ভুত খিচুড়ী ভাষায় কাহাকে বকাবকি করিতেছে।

মুক্ত ছাদের উপর দেবেন্দ্র গম্ভীর হইয়া পায়চারী করিতেছিলেন।

পিছন হইতে ধীরে ধীরে একটী মেয়ে আসিয়া ডাকিল, দাদু!

দেবেন্দ্র চমকাইয়া উঠিলেন। পরে সংযত হইয়া বলিলেন, কে রাধা? কি দিদি?

তুমি কেন এত ভাব বলত?

রাধা তাঁহাকে ধরিয়া বসাইল এবং নিজেও তাঁহার পাশে বসিল।

দেবেন্দ্র বলিলেন, এত থেকেও আমার কিছু নেইরে, একেবারে ফকির। বাড়ী ভরা লোকজন, পাইক পেয়াদা, কিন্তু সত্যি ক'রে আমার নিজের কে?

একটু থামিয়া বলিলেন, কল্যাণ হতভাগা, কখন সে যে কি করে বসে সেই ভয়েই আমি মরি। এক সান্ত্বনা তুই আছিস, আছিস বলেই এ বাড়ীতে আমি টিকে আছি। আমার আর জন্মের মা!

রাধা রোষ ভরে বলিল, আর এ' জন্মে বুঝি কেউ না? কিসের তোমার অভাব শুনি? তোমার এই যা রইলো, ছেলেকে আসতে লিখে দাও, দুদিনেই সব ঠিক করে দেব।

রাধা দেবেন্দ্রের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। কিসের আশায় যেন দেবেন্দ্রের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

রাধা মিত্র পরিবারের কেহই নয়। বহু দূর সম্পর্কের এক ভাগ্নীর মেয়ে। দেবেন্দ্রকে সকলেই বদ মেজাজী, দুর্দ্দান্ত জমিদার বলিয়া জানিত কিন্তু এ সবার উর্দ্ধে যে নিঃস্ব মানুষটি দেবেন্দ্রের মাঝে ঝিমাইয়া পড়িয়াছে রাধার সহিত তাহার পরিচয়। এই বাড়ী ঢুকিয়াই এই নিঃসহায় মানুষটিকে সে ভাল করিয়াই চিনিয়াছিল এবং তাহার একনিষ্ঠ সেবা, যত্নে দেবেন্দ্রের সে বিশেষ প্রিয় পাত্রী হইয়া উঠিয়াছিল। কল্যাণের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া সংসারকে সুখী করিবেন, ইহাই ছিল দেবেন্দ্রের অন্তরের একান্ত আশা।

কল্যাণ আসিল, একা নয়, তিন চারজন বন্ধু-বান্ধব লইয়া। সকলেই এইবারে বি-এ পরীক্ষা দিয়াছে।

দেবেন্দ্র পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে এসেছ, দেখো যেন অমর্য্যাদা না হয়। মিত্তির বাড়ীর শত বদনাম থাকলেও, এ বদনাম অতি বড় শত্রুও দেবে না। মেয়েদের বলো খাওয়া দাওয়ার ভাল ব্যবস্থা করতে।

কল্যাণ বিনীত ভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া সরিয়া পড়িতেছিল।

দেবেন্দ্র পিছন হইতে ডাকিয়া বলিলেন, আর দেখ, ছুটি শেষ হলে বন্ধুরাই ফিরে যাবে, তুমি যাবে না।

বিস্মিত দৃষ্টিতে কল্যাণ পিতার মুখের দিকে তাকাইতেই তিনি বলিলেন, জমিদারী রক্ষা করতে অত লেখা পড়ার প্রয়োজন হবে না। এবারে সব দেখে শুনে নাও, আমি হাঁপিয়ে গেছি!

দেবেন্দ্র একটি ক্লান্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

কল্যাণ মাথা চুলকাইয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল, কিন্তু ইকনমিক্‌স্‌এ এম্‌-এ টা—

বাধা দিয়া দেবেন্দ্র বলিলেন, হ্যাঁ ইকনমিকসে পড়বে এম্‌-এ আর জমিদারীর ঘটাবে আন-ইকনমি। বড় জমিদারের পরিচয় বি-এ, এম-এ নয়,—বুকের পাটা, কব্জির জোর আর সিন্দুকের টাকা।

কল্যাণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দেবেন্দ্র বলিলেন, আমার কাছে এসে বস।

কল্যাণ তাহাই করিল।

দেবেন্দ্র বলিলেন, রাধাকে বিয়ে করবে।

কল্যাণ আঁতকাইয়া উঠিল। বলিল, রাধাকে?

দেবেন্দ্রের মুখপ্রান্তে একটু হাসি খেলিয়া গেল, বলিলেন, বড় দুঃসংবাদ, কিন্তু জমিদারী রক্ষা করা তোমার কর্ম্ম নয়, রাধা পারবে।

একটু থামিয়া বলিলেন, যাক, ভাবনার কিছু নেই। এখন বন্ধুদের নিয়ে গল্প কর গিয়ে।

কল্যাণ নীরবে চলিয়া গেল। মন বলিলেও মুখে সে যে পিতার বিরোদ্ধিতা করিতে পারে না।

কাঙ্গালী আর তাহার দল ছিদ্র খুঁজিতেই ব্যস্ত। হুজুগ তুলিয়া একটা গণ্ডোগোল বাধাইতে পারিলেই তাহাদের আনন্দ এবং লাভ।

ভোর না হইতেই কাঙ্গালী জমিদার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত।

দেবেন্দ্র ঘর হইতে বাহির হইবামাত্র কাঙ্গালী বলিল, জলধরকে শেষ অবধি মেরেই ফেল্লে।

বিস্মিত হইয়া দেবেন্দ্র বলিলেন, মারা গেল? কে মারলে?

কাঙ্গালী বলিল, মারা যায়নি, মারা যাবার উপক্রম হয়েছিল। পরে চোখে খানিকটা জল আনিয়া বলিল, কিন্তু হুজুর, শেওলাখালি ত' জলধরকে মারে নাই মেরেছে আপনাকে।

শেওলাখালির নাম উঠিতেই দেবেন্দ্রের মুখ বিকৃত হইল, মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, কত দিন না বলেছি সকাল বেলায় ঠাকুর দেবতার নাম নিতে হয়, পশুর নয়।

পরে সংযত হইয়া বলিলেন, অন্যায়কে সহ্য করতে নাই, আমার জমিদারীতে একথা নূতন নয়।

ঐ টুকুই যথেষ্ট, কাঙ্গালী উৎসাহভরে চলিয়া গেল।

পরের দিন ফুটনীগঞ্জের হাটে শেওলাখালির দুই জন হাটুরে হাট করিতে আসিয়া বেদম মার খাইয়া ফিরিয়া গেল।

শেওলাখালির জমিদার হুমকী ছাড়িল, কাঙ্গালীর দল লাফাইল, কিন্তু দেবেন্দ্রের মনে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য দেখা গেল না। খুন, জখম, রক্তপাত দেখিতে দেখিতে তাহার চুল পাকিয়া গিয়াছে।

কল্যাণের এক বন্ধুর নাম কুমার। সে একদিন বন্ধুদের ডাকিয়া বলিল, ওহে শেওলাখালিতে আমার এক পিসতুতো দিদির বাড়ী, চল বেড়িয়ে আসা যাক।

বন্ধুরা হুজুগ তুলিল।

কিন্তু শেওলাখালির নাম কল্যাণের অপরিচিত নয়, সে একটু ইতস্তত করিল। কিন্তু বিপদ হইল যে, ইহার কারণ সে ব্যক্ত করিতে পারে না; তাহা হইলে পিতার সম্মানে লাগিবে।

বন্ধুদের হুজুগে তাহার আপত্তি সামান্য তৃণবৎ ভাসিয়া গেল।

বৈকালের দিকে পিতার সম্পূর্ণ অগোচরে কল্যাণ বন্ধুদের সাথে শেওলাখালির দিকে রওনা হইল। শেওলা-খালি ইলসামারি হইতে দুই মাইলের পথ।

দিদি কৈ গো—

কুমার দলবল লইয়া ঘরে ঢুকিল কিন্তু সামনে এক অপরিচিতা তরুণীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সকলেই থমকিয়া দাঁড়াইল।

মেয়েটী কিন্তু বিন্দুমাত্র ইতস্তত করিল না, বলিল, আপনারা বসুন, আমি তাঁকে ঘাট থেকে ডেকে আন্‌ছি।

কুমার বলিল, এ বাড়ীতে কেউ আমাকে কোন দিন বসতে বলে ভদ্রতা করে নাই, বরং সবাইকে বসানোই আমার কাজ। আপনি যে কাব্যসুধা পান করছিলেন, তাই করুন। আমি নিজেই যাচ্ছি।

মেয়েটী হাসিয়া বসিয়া পড়িল।

কল্যাণরা মেয়েটীর দিকে পিছন করিয়া উর্দ্ধমুখে বসিয়া রহিল।

খানিক পরে দিদিকে লইয়া কুমার ঘরে ঢুকিল।

দিদি হাসিয়া বলিলেন, এস তোমাদের দীপার সাথে পরিচয় করিয়ে দি।

বাধা দিয়া কুমার বলিল, আমি করছি—

পরে দীপাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমি দিদির ভাই, এরা সবাই আমার বন্ধু মানে ভাই, সুতরাং দিদির ভাই। আপনি সম্ভবতঃ দিদির আত্মীয়া, সুতরাং আমাদের আত্মীয়া। সুতরাং কল্যাণ, তোমরা এদিকে মুখ ফেরাও, দীপা দেবী কাব্য রাখুন, দিদি মিষ্টি আন।

তাহার বলিবার ভঙ্গীতে সকলেই হাসিয়া উঠিল।

দীপা হাসিতে হাসিতে বলিল, অনেকে বলেন বর্ত্তমান শিক্ষা কার্য্যকরী নয়, কিন্তু আপনার বেলায় সে কথা খাটে না দেখছি।

দিদি বলিল, তোরা যে বন্ধুর বাড়ীতে উঠেছিস, কৈ তার পরিচয় ত দিলি না।

কুমার কল্যাণকে টানিয়া আনিয়া দিদির সামনে খাড়া করিয়া বলিল, আমাদের পদধূলিতে এই অধমের গৃহ ধন্য হয়েছে। নাম কল্যাণকুমার, ইলসামারির জমিদার ত নয়।

কল্যাণ তাহার এই পরিচয়ে একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

দিদি সবই জানে, বলিল, ওর বাবা আসতে দিলে? শেওলাখালির নাম শুনলেও নাকি তার গঙ্গাজল নিয়ে আচমন করতে হয়! বাপরে, ইলসামারি, শেওলাখালি যেন অহিনকুল।

বন্ধুরা একযোগে বলিয়া উঠিল, কল্যাণ ত একথা আমাদের কোন দিনই বলে নাই।

কল্যাণ লজ্জায় মাটির সহিত মিশিয়া গেল। এই ভয়ই সে করিতেছিল।

কিন্তু দীপা আবহাওয়াটি একটি অবস্থার মধ্যে আনিয়া ফেলিল। বলিল, জমিদারের সাথে জমিদারের বিবাদ, আমরা সামান্য চুনোপুটি, ও আমাদের অনধিকার চর্চ্চা। কল্যাণ বাবুর তবু আশা থাকতে পারে, আমার তাও নেই।

বলিয়া সে হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

কুমার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বলিল, তার মানে?

দিদি বলিল, উনিও শেওলাখালির জমিদার তনয়া।

পরে কল্যাণের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিল, কল্যাণ ভয় পেও না।

দীপা হাসিয়া বলিল, ভয় পেতে হয় ত' আমিই পাব সেজদি। কিন্তু এসব থাক।

পরে কল্যাণকে বলিল, জমিদারে জমিদারে বিরোধ হয়েই থাকে, আপনার আসার তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। আমাদের সম্পর্ক ত' নূতন রকমের হতে পারে।

বন্ধুরা বলিল, হিয়ার, হিয়ার।

দীপা বলিল, এঁরা খেতে চাইলেন মিষ্টি, তুমি সেজদি সব তেতো করে দিলে।

দিদি হাসিয়া বলিল, তেতোর পর মিষ্টি জমবে ভাল।

সমস্ত ব্যাপারটা এমন ভাবে হাল্কা হইয়া যাওয়ায় কল্যাণ বেশ একটা আনন্দ অনুভব করিল।

এইবার একটু কিছু বলিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না, বলিল, যেমন আঁধারের পর আলো।

কুমার তাহার পিট চাপড়াইয়া বলিল, জিতারহ তুকারাম! ইট ইজ দেন নর্ম্যাল ষ্টেজ, সুতরাং দিদি, আলো—আলো—

আনন্দ কোলাহলের মধ্য দিয়া সময়টি কাটিয়া গেল।

যাইবার সময় দিদি তাহাদের আর এক দিনের জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া দিল।

দীপা শেওলাখালির জমিদারের মেয়ে। জমিদারীর বাঁধা নিয়ম কানুন সে অপছন্দ করে। মনকে তাজা রাখিবার জন্ত তাহাদের বাড়ীর পাশে এই দিদির বাড়ী ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়া গল্প করে, কবিতা পড়ে। দিদির সহিত তাহার ছেলে বেলা হইতেই ভালবাসা আছে।

সেদিনকার ঐ চার পাঁচটি ছেলের মধ্যে কল্যাণই কিন্তু প্রশংসা পাইল বেশী। ঐ বাপের এমন ছেলে। দুর্দ্দান্ত জমিদারের ছেলে হইয়াও কি অ-জমিদারী সৌজন্ত, বিনয়।

দিদি প্রশংসায় শত মুখ হইলেন।

দীপা ভাবে, তাহার নিজের সহিত কল্যাণের কি সাদৃশ্য।

কল্যাণ কলিকাতায় পড়িত, তরুণীর ধ্যান সে করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু দীপা যে তাহাকে বিপদে ফেলিল। এমন করিয়া আর কেহ ত তাহাকে আকৃষ্ট করে নাই। রাধা—চন্দ্রের নিকট সামান্ত মোমবাতি।

তাহার পর একদিনের নাম করিয়া কতদিন শেওলাখালি যাওয়া আসা চলিয়াছে। গল্প, গান, আবৃত্তি সবই হইয়াছে। কল্যাণ ও দীপার মনেও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। ইহা টের পাইয়া বন্ধুরা কলিকাতায় যাওয়া স্থগিত রাখিয়াছে, পিছন হইতে দিদি উৎসাহ দিতেছে।

দেবেন্দ্র বাঁধান ঘাটে বসিয়া হাওয়া খাইতেছিলেন।

কাঙ্গালী আসিয়া প্রণাম করিল, জোড় হাতে বলিল, হুজুর অভয় দেন ত একটা কথা বলি।

দেবেন্দ্র বলিলেন, বল।

কাঙ্গালী বলিল, কল্যাণবাবু শেওলাখালিতে যাতায়াত করছেন।

ভয়ে দেবেন্দ্রের মুখ সাদা হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, শেষে ওখানকার মাটী ও মাড়াল।

কাঙ্গালী বলিল, শুধু মাটি নয় হুজুর, শুনলাম ওদের মেয়ে নাকি বিয়ে—

দেবেন্দ্র ধমক দিয়া উঠিলেন, চুপ, বিয়ে—বিয়ে, মিত্তির বাড়ী মরে গেছে—

বলিতে বলিতে তিনি দ্রুত অন্তঃপুরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

বারুদে আগুন দেওয়া হইয়াছে, কাঙ্গালীও সরিয়া পড়িল।

দেবেন্দ্রের অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখিয়া রাধা ভয় পাইয়া বলিল, আবার সেই জ্বরটা বুঝি এল ?

উত্তেজিত দেবেন্দ্র কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, লেঠেলদের খবর দিতে যাচ্ছি।

রাধা বুঝিতে পারিল না, হাসিয়া বলিল, ওমা, শেষে লেঠেল এনে জর খেদাতে হবে নাকি !

দেবেন্দ্র বলিলেন, তুই কালকের মেয়ে, তবু তুইও ত' সব জানিস। মিত্তির বাড়ীতে বাপের অমতে ছেলে করবে বিয়ে শত্রুর ঘরে, বংশের করবে ঘোরতর অপমান ? যা হয় হোক, ঘর দোর পুড়িয়ে ছারে খারে দেব, একটা মাথাও আজ আস্ত থাকবে না। পাঁচশো লেঠেল আমার কথায় প্রাণ দেবে।

রাধা কল্যাণের কথা সবই জানে। এইবার বুঝিতে পারিয়া শিহরিয়া উঠিল।

উত্তেজিত জমিদারকে জড়াইয়া ধরিয়া সে বলিল, তুমি কি পাগল হলে দাদু, ছেলের অপরাধ তুমি দেখবে না, তারাই করল দোষ ?

দেবেন্দ্র বলিলেন, তবে কল্যাণকেই আগে ডাক। সামনা সামনি আজ তাকে জিজ্ঞাসা করব, আমাকে অপমান করবার দুঃসাহস তার এল কোত্থেকে। তারপর—

রাধা বলিল, এ সবের কোন দরকার নাই দাদু। আমি সব জানি, আমি বলছি তোমার এতে অপমান হবে না। ছেলে যাকে ভালবাসে তাকেই বিয়ে করবে, নইলে যে কেলেঙ্কারী হ'বে তাতে তুমি, তোমার মিত্রবংশ সব ভেসে যাবে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিল, ছেলেকে সব

তুমি বুঝিয়ে দাও। সে এসে জমিদারীতে নূতন পরিবর্ত্তন আনুক, তোমার তাতে কিছু এসে যাবে না। তোমার জমিদারীতে অনাচার ঢুকেছে, সে কথা শত্রুও বলতে পারবে না।

দেবেন্দ্র চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার দুর্ব্বলতা এইখানে।

তাহার পর নেহাৎ শিশুর মত তিনি প্রশ্ন করিলেন, তাহলে লেঠেল যাবে না?

ছোট শিশুকে মা যেমন করিয়া শান্ত রাখে তেমন করিয়া বৃদ্ধের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে রাধা বলিল, না। তাহলে এর চেয়ে ক্ষোভের বিষয় আর কিছুই থাকবে না। লোকে বলবে, মিত্তির বাড়ীর অমুক জমিদার ছেলের বিয়েতে অমুকের মাথা ভেঙ্গেছে, ঘর পুড়িয়েছে। তার চেয়ে বিয়ে হোক, নূতন ...র্ক হোক,—তারা থাকুক। তুমি থাকবে নিরালায়, এক কোনে শুধু তুমি আর আমি।

দেবেন্দ্র কোন কথা বলিলেন না, তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

মহেশ বোস ঘুঘু লোক। দিদি এবং তাহার ভাই এরা যখন বিবাহের প্রস্তাব আনিল, তখন তিনি সানন্দে উহা গ্রহণ করিলেন। কারণ দেবেন্দ্রকে পরাস্ত করিবার ইহা ব্রহ্মাস্ত্র। কয়েক পুরুষ ধরিয়া তাহারা এই রকম একটি সুযোগই খুঁজিতেছিলেন। ধূমপান করিয়া তিনি কন্যার বিবাহ-বার্ত্তা চারিদিকে ঘোষণা করিলেন।

কল্যাণের অতিশয় পিতৃভক্তি আর বিনয় পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতে সাহসী করিয়াছিল। তাহার উপর ছিল বন্ধুদের ও দিদির উৎসাহ।

তথাপি সে একদিন চুপি চুপি যাইয়া রাধাকে প্রশ্ন করিল, বাবা তাহলে হাঙ্গামা বাধাবেন না রাধা?

"হাঙ্গামা" কথাটিতে রাধা রুষ্ট হইল, বলিল, তিনি ঠেঙ্গাড়ে নন, হাঙ্গামা বাধানই তাঁর ব্যবসা নয় কল্যাণ কাকা। তাঁর মতামতের প্রশ্ন কর না, তবে বিয়ে তুমি করবে, না হলে সবাই অসন্তুষ্ট হবে।

কল্যাণ ভাবিল, ইহাই যথেষ্ট। রাধা একবার হ্যাঁ বলিলে, বাবা না বলিবেনা, ইহা সে জানে। নিশ্চিন্ত মনে সে ফিরিয়া গেল।

সবাই ঘুমে অচেতন। কিন্তু দেবেন্দ্রের চোখে ঘুম নাই। দেওয়ালের চারিদিকে পূর্ব্ব পুরুষদের প্রতিকৃতি, তাঁহারা তাহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, আমাদের অসম্মান করিও না। রাধার কথা মনে পড়িল, নূতন মিত্রবংশ আরম্ভ হইবে। দেবেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, নিজে যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ বংশের অসম্মান হইবেনা। কিন্তু তাহার পর? কে যেন আলো জ্বালাইয়া পথ দেখাইয়া দিল।

দেবেন্দ্র সেই রাত্রেই নায়েবকে পত্র লিখিতে বসিলেন।

মিত্র বংশের ছেলের বিবাহ, বিশেষ করিয়া নূতন জমিদারের পরিণয়োৎসব। মিত্র পরিবারের গৌরব যেন বিন্দুমাত্রায় ক্ষুণ্ণ না হয়। সর্ব্ববিধ আড়ম্বর, আনন্দোৎসবের পূর্ব্বেকার মতই আয়োজন করিবে। লোকে জানিবে, মিত্র-পরিবারে এখন দুর্দ্দিন আসে নাই। সমস্ত কর্ম্মচারী প্রজাবৃন্দ উৎসবে যোগদান করিয়া নূতন প্রভুর কল্যাণ কামনা করিবে। এই বিরাট উৎসব জনসাধারণের মনে যেন বহু দিন পর্য্যন্ত অঙ্কিত থাকে। ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন।

স্বাঃ—দেবেন্দ্রনাথ মিত্র।

পত্র পাইয়া নায়েব বিস্মিত হইল। বিস্মিত হইল দুই কারণে, প্রথম এই অবাঞ্ছিত বিবাহে এত আয়োজন, দ্বিতীয় জমিদারের লিখিত আদেশ। দেবেন্দ্র চিরদিন সকল কথা মুখেই বলেন।

সন্ধ্যায় বরের শোভাযাত্রা বাহির হইবে। মিত্র বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য। নানপ্রকার দেশী বিদেশী বাদ্যযন্ত্র, প্রখর আলোকসজ্জা, বিভিন্ন কণ্ঠের বিভিন্ন কোলাহল এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

শুভ লগ্নে শোভাযাত্রা নানা কোলাহলে পূর্ণ হইয়া যাত্রা করিল।

দেবেন্দ্রের শরীর অসুস্থ। বিবাহে তিনি যান নাই।

রাধা কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও তাঁহাকে বৈঠকখানার ঘরে দেখিয়াছে।

প্রতিদিনই রাধা নিজে দেবেন্দ্রের খাবার লইয়া আসে। আজও আসিল কিন্তু বৈঠকখানায় তাঁহাকে দেখিল না। উপর নীচে প্রতি ঘরে ঘরে সে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল তথাপি তাঁহার সাড়া নাই।

অজানিত আশঙ্কায় রাধা ভাঙ্গিয়া পড়িল, উঠানের মাঝে নামিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া সে ডাকিয়া বলিল, ওগো তোমরা কেউ দাদুকে দেখেছ?

প্রকাণ্ড বাড়ী খাঁ খাঁ করিতেছে। সামান্য দুই চারিজন যাহারা ছিল ছুটিয়া আসিল।

আলো লইয়া চীৎকার করিয়া সকলে ছুটাছুটি করিল, পাতি পাতি করিয়া অন্বেষণ করিল কিন্তু দেবেন্দ্রকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বাংলার গ্রাম

শ্রীদধীচি মৈত্র

বাংলার গ্রাম বাঙ্গালীর গৌরবের বস্তু। কবির কবিতার উপাদান, হরিৎ সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি; অতুলনীয়, অনিন্দ্য, সুন্দর, অপূর্ব্ব।

যদি একবার চোখ বুজে কল্পনা করতে পারি বাংলার গ্রামের ছবি আর সৌন্দর্য্য তবে বুঝতে পারি বাংলার গ্রাম কি!

বাংলার ছোট ছোট গ্রামগুলি আনন্দে ভরপুর, কলকোলাহলে পরিপূর্ণ, স্বাস্থ্য সুখের আকর, আরও এমন একটা কিছু, যাতে আছে প্রাণ!

সকাল হ'তেই প্রকাশ পায় অপূর্ব্ব চঞ্চলতা। বাড়ীর মায়েরা, বোনেরা শয্যা ত্যাগ ক'রে মগ্ন হয় তাদের গৃহস্থালীতে। সকাল থেকেই সুরু হয় গোবর ছড়া দেওয়া, পুকুর ঘাটে ব'সে বাসন মাজা,—তারপর স্নান, পূজা, রান্না খাওয়ান এবং তারপর তাদের খাওয়ার পালা। পুরুষরা ঘুম থেকে উঠে কেউ দেখে সূর্য্য উঠেছে আর কেউ দেখে উঠেনি। তারা লেগে যায় নিজেদের কাজে। ছেলেরা উঠে, যাদের পড়বার বয়স, তারা গেল তাদের বই নিয়ে, আর যাদের অক্ষর পরিচয় হয় নাই, তারা চল্লো তাদের খেলাঘর সাজাতে। যতক্ষণ মায়েদের ডাক্ না আসে, ততক্ষণ তাদের মাটি নিয়ে খেলা, পুতুল নিয়ে খেলা আর ছড়ায় ছড়ায় গান। দুপুরটা সাধারণতঃ বিশ্রামের সময়। তারপর এলো বিকালের চঞ্চলতা। আবার ছেলেদের খেলা হ'ল সুরু। বাবুরা তামাক সেজে নিয়ে চল্লো মজুরদের কাজ তদারগ করতে। মেয়েরা বসে চুল বাঁধতে। সূর্য্যের রঙ লাল হ'তে সুরু হয়, গ্রামের মেয়েরা বেরোয় জল আনতে। দলে দলে মেয়েরা কল্সী কাঁকে যায় গ্রামের বাহিরে পুষ্করিণীতে। মেয়েরা জল আনবার পথে যেতে যেতে দু' পাশের বন থেকে বনফুল সংগ্রহ করে আর খোপায় গুঁজে রাখে। কেউ হয়তো লুকিয়ে দুটো ধুতরোর ফুল তুলে আনে, আর পেছন থেকে গুঁজে দেয় তার সইয়ের পিছনে খোপায়; আর সইয়ের পেছন দিকটা দেখে খিল্ খিল্ ক'রে হাসে আর গেয়ে উঠে,—"কাণে গুঁজি ধুতুরারি ফুল লো!"

এমনি তাদের নির্ম্মল আনন্দ! দেখতে দেখতে সূর্য্য মামা বিদায় লইল। আঁধারের আভা পৃথিবীর উপর এসে পড়তে থাকে; মেয়েরাও ফিরে আসে বাড়ীতে। রাখালেরা 'হেট্ হেট্' করতে করতে বাড়ী ফেরে, আর যদি হাটবার হয়, তবে

বাড়ীর পুরুষেরা ফেরে হাট করে। তুলসীর মঞ্চে প্রদীপ উঠে জ্বলে; শঙ্খে পড়ে ফুঁ। সেই গভীর শঙ্খ গৃহ হ'তে গৃহান্তরে তার মঙ্গল ধ্বনি প্রচার ক'রে মহাশূন্যে "ওঁকার" রবে বিলীন হ'য়ে যায়। শুধু ফিরে আসে নীরব নিস্তব্ধতা!

এমনি ভাবেই একটার পর একটা দিনের অবসান হয়। আর আসে নূতন নূতন দিন।

গ্রীষ্মকাল—সকাল থেকেই প্রচণ্ড রৌদ্র, কিন্তু গ্রামের লোকেদের কাজের ক্ষণিকের তরেও বিরাম নাই। কেউ তার বাগান নিয়ে ব্যস্ত, কেউ ছুটেছে ক্ষেতে, কেউ চলেছে জলে মাছ ধরবে বলে। বৈদ্য, কবিরাজ, হাকিম চলেছে তাদের নিজ নিজ কাজে, দোকানি খুলেচে দোকান, রাখালেরা যাচ্ছে মাঠে, সঙ্গে তাদের গরু আর হাতে তাদের বাঁশী, কাঁধে তাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যসকল। ক্রমে সূর্য্য আসে মাথার উপর, গ্রীষ্ম হ'য়ে উঠে প্রকট।

এমনি ক'রে গ্রীষ্মের দিনগুলো একের পর এক চলে যায়। সে ঠাঁই দখল করে বর্ষায়।

বর্ষার ঝম্ ঝমা ঝম্ বারিধারার মধ্যে চাষীরা চলে মাঠের দিকে। মাথায় তাদের তালপাতার টোকা, হাতে তাদের হুঁকো, আগুনের মালসা, সঙ্গে গরু। বেলা বাড়তে থাকে, তারা কাজ ক'রে আর তামাক খায়। বেলা এগারটা বারোটা বেজে যায়, বাড়ী থেকে ছেলে কি মেয়ে হয় পান্তা পেঁয়াজ নয় মুড়ি লঙ্কা নিয়ে যায় তাদের খাওয়াতে।

পুকুর, খাল, ডোবা, যেখানে একটু জায়গা থাকে, সেই-খানেই বৃষ্টির জল তার আধিপত্য বিস্তার ক'রে সুরু করে বাস করতে। তার বুকের উপর ভাস্তে থাকে শালুক ফুল, আর কলমি ফুলের হাসি। চতুর্দ্দিকে বন জঙ্গল থেকে বর্ষার ফুল ভেঁট, দোলন চাঁপা প্রভৃতির গন্ধ আসে ভেসে। দোপাটী আর ভুঁই চাঁপার হাসি মনকে তোলে পাগল করে। মনে হয় যেন ওদেরই মত ফুল হ'য়ে ফুটে থাকি। পুকুরের পাশে, ঝোপের আড়ালে ডাহুকের ডাক, গ্রামের পাশে বিলের ওপর শাদা বকের ঝাঁক প্রাণকে হরণ ক'রে নিয়ে যায় তাদের কাছে। আবার বর্ষাও দেখতে দেখতে হয়ে যায় শেষ। তার চির-চঞ্চল দিন কটার ফল স্বরূপ রেখে যায় সুদীর্ঘ হরিৎ ধান্যের ক্ষেত্র।

শরৎ এসে ভার নেয় বর্ষার কাজের। শরতের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যেন পায় নব প্রেরণা। বর্ষার উন্মত্ত জলধারার উন্মত্ত তাণ্ডব নৃত্য তখন যায় বন্ধ হয়ে; আসে সুন্দর সূর্য্য-করোজ্জ্বল নীল আকাশ, রাতের বিজলী বিচ্ছুরিত মেঘভরা আকাশে ফিরে আসে চন্দ্রাতপবিমণ্ডিত নীল শোভা, মাঝে মাঝে শাদা মেঘের টুকরো বিক্ষিপ্ত হ'য়ে ছুটে বেড়ায়। মাঠে পক্ক শস্যের সোনার হাসি দেখে মনে হয়—যে সব কৃষকের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর ফলে এর সৃষ্টি, এ যেন তাদেরই হাসি। শরতের দিন ঘনিয়ে আসে; ঘরে ঘরে জমা হয় পাকা ধানের বোঝা। মাঠে কৃষকরা আবার ছড়িয়ে দিয়ে আসে কলাই। শীতকালে আবার সেগুলো তুলবে।

গ্রামের হেমন্ত, শিশির-সমীরের খেলা, অপূর্ব্ব, অতুলনীয়, হেমন্তের প্রভাত-শিশির পাতায় পাতায় থাকে শুয়ে, ঘাসের মাথায় করে খেলা, পাকা ফলের গায়ে বসে তাকে করে আদর আর সদ্যোপ্রস্ফুটিত ফুলের মুখে এঁকে দেয় চুম্বনের ছাপ। এমনি ক'রে সারাটা ঋতু গ্রামগুলোকে যেন স্নেহের প্রলেপের তলে রেখে হঠাৎ একদিন বিদায় নিয়ে চলে যায়, বসিয়ে রেখে যায় শীতকে।

শীতের শাসন বড় কঠিন। দিনকে সে কেটে ছেঁটে ছোট করে, রাতকে দেয় বাড়িয়ে। সকাল থেকেই ধোঁয়ার মত কুয়াশা, কোন কোন দিন বেলা হ'য়ে যায় দশটা এগারটা, ঘড়ির কাঁটা তার পথ বেয়ে একটু একটু করে চলে এগিয়ে কিন্তু কুয়াশা শেষ হয় না। তারপর যখন কুয়াশার দুয়ার ঠেলে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে রোদের কিরণ তখন লোকও বেরিয়ে আসে প্রাণভরে রোদকে উপভোগ করতে। যেন জানাতে চায় শীত তাদের উপর অত্যাচার করেছে, রোদ তাদের নালিশ শুনে উঠে আগুন হয়ে, আবার শীতের সঙ্গে হয় তার অপোষ। সে সারা রাতের জন্য তার হাতে নিজের কাজের ভার দিয়ে চলে যায় বিশ্রাম করতে। এমনি করে হয় শীতের কাজ শেষ।

শীতের অত্যাচারের যন্ত্রণায় লোকেরা উৎপীড়িত হ'য়ে অপেক্ষা করে ঋতুরাজ বসন্তের পানে চেয়ে।

বসন্ত আসে, একদিন দু'দিন করে দিন কাটতে থাকে, জীবজগৎ তার অভিনন্দন জানায় অস্ফুট ভাষায়, বলে বেশ

সুখেই তাদের দিন কাটছে। শীতে গাছের পাতা ঝরে গিয়েছিল। আজ বসন্তের প্রভাবে তাদের গায়ে বেরিয়েছে নূতন পাতার কুঁড়ি। তারা সেই নবোদ্গত পত্রপুষ্পসুশোভিত ডাল নেড়ে নেড়ে আজ বোধ হয় ব্যক্ত করছে তাদের কৃতজ্ঞতা, বসন্তের কাছে। শীতের রাজত্বের দুটি মাস যেন একটি সরল রেখা—তার দৈর্ঘ্য আছে বিস্তার নাই, যেন নিরস, প্রাণ আছে, হৃদয় নাই, যেন নিষ্ঠুর, সুখের ধার ধারে না, কেবল দুঃখ দিতেই জানে। কিন্তু বসন্ত, তার যেমন দৈর্ঘ্য, তেমনি বিস্তার; তার প্রাণও আছে হৃদয়ও আছে। তার নিষ্ঠুরতা নাই, দুঃখ দিবার স্পৃহাও নাই। তার আনন্দের ধারা যেন প্রত্যেকটি পত্রে, প্রত্যেকটি ফলের গায়ে, প্রত্যেকটি ঘাসের আগায় এবং প্রত্যেকটি ফুলের মুখে আশীর্ব্বাদের মত বিরাজ করে। কচি পাতার অন্তরালে কোকিলের কুহু তান, মন ভোলান, প্রাণ মাতান, গন্ধভরা ফুলের রূপ কবির মনকে করে তোলে মাতোয়ারা। শিশুরা বাগানে বাগানে বেড়ায় খেলে। চাষারা মনের আনন্দে তামাক খায়, আর বাঁধে ঘরের চাল, নয়তো কাটে পুকুর, কিংবা কোপায় তরকারীর বাগান। বাবুরা হিসেব করে জমি জমার। আর কার্য্যান্তে গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে খেল্‌তে বসে দাবা কিংবা পাশা। মেয়েরা কাজের ফাঁকে যখনই সময় পায়, ছুটে যায় যার যার শিশুকে নিয়ে করে আদর। বালিশের তলা থেকে তেলমাখা ছেঁড়া পুঁথি বের করে' পড়ে; এমনি করে আনন্দের হিল্লোলে হিল্লোলে কেটে যায় তাদের দিন, আর ধন্যবাদ পায় বসন্ত।

এইভাবে ঋতুর পর ঋতু আসে, দেশে বয়ে যায় আনন্দের হিল্লোল। আর সেই আনন্দের সম্পূর্ণ ভাগ পায় গ্রামবাসীরা,—বাংলার গ্রাম্য লোকেরা। গ্রামবাসী ছাড়া বোধ করি এমন ভাবে আর কেউ উপভোগ করে না। একদিন এমন ছিল যেদিন পয়সাওয়ালা লোক বাস করতো এই সব গ্রামে আর তাদের চেষ্টায় এই সব গ্রামের অবস্থা ছিল দর্শনযোগ্য। বাসের পক্ষে তখনকার গ্রাম ছিল স্বর্গতুল্য। গ্রামের উন্নতিকল্পে তারা যে সমস্ত কূপ, পুষ্করিণী, পান্থশালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে গেছে ন তার স্মৃতি এখনও অনেক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। তাদের তৈরী দেবালয়সমূহের ভগ্নাবশেষ আজও প্রচার করছে তাদের পুরাতন গৌরবের কথা।

বর্ত্তমানে গ্রামের সে সুদিন আর নাই। পিতৃপিতামহদের কীর্ত্তিসমূহ ধ্বংস করে' পয়সাওয়ালা জমিদাররা এসে বাস করছেন কোলকাতার সহরে। তাঁদের বাটির হেফাজৎ একজন নায়েব বা সরকারের ওপোর দিয়ে তাঁরা কোলকাতাকে করছেন সজ্জিত তাঁদের নিজেদের মেঘচুম্বী হর্ম্ম্যমালার দ্বারা। আজ তাঁদের পৈতৃক ভিটায় উঠছে বট অশ্বত্থের চারা, পুষ্করিণী যাচ্ছে কচুরি পানায় ছেয়ে, কূপ যাচ্ছে শুকিয়ে, দেবালয়গুলো যাচ্ছে ভেঙ্গে, জমিতে জন্মাচ্ছে বন আর জঙ্গল। গ্রামময় মশা মাছির উপদ্রব, ম্যালেরিয়া আর কলেরার আক্রমণ গ্রামের গরীবদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে উৎসন্নের পথে। গ্রামের জমিদারদের চাঁদার সহযোগিতায় সহরের মিউনিসিপ্যালিটি, সহরের স্কুল, এবং বড় বড় প্রতিষ্ঠাগুলো গড়ে উঠছে, আর তাঁদেরই গ্রামে একটা স্কুল নাই, মিউনিসিপ্যালিটি নাই, লাইব্রেরী নাই, পল্লী-সংগঠন সমিতি নাই, টিউবওয়েল নাই, আছে শুধু রোগ আর দারিদ্র্যের যন্ত্রণা।

আগে গ্রামের সঙ্গে সহরের কোন সংযোগ ছিল না। তাই গ্রামের স্বাস্থ্য, গ্রামের সংস্কৃতি, সরলতা সবই ছিল তার খাঁটি এবং নিজস্ব। আজ সহর থেকে অসংখ্য রাস্তা, রেলপথ এসে গ্রামে মিশেছে, তাদের দৌলতে গ্রামের দুধ, মাছ, শাকশব্জি সবই যাচ্ছে গ্রামের বাইরে। তাই তাদের পেটে জোটে না দুমুটো পেটভরা ভাত। তাই তারা তাদের স্বাস্থ্যকে ফেলে হারিয়ে, যাদের পেটে নাই অন্ন, তারা কেমন করে বজায় রাখে তাদের স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি। দেশে ছিল না রাস্তা, তাই গ্রামের লোক ছিল গ্রামে। আজ রাস্তা বেয়ে তারা যেতে শিখেছে সহরের দিকে। তাই তাদের সরলতার মধ্যে যেন কেমন একটা অসত্য মিশ্রিত হ'য়েছে। যেন গ্রামের গাছের পাতার সবুজত্ব আর নাই। আজ গ্রামে গেলে গ্রামের সৌন্দর্য্য আর নজরে পড়ে না, পড়ে শুধু শুষ্ক বৃক্ষের সারি, প্লীহা যকৃৎবিশিষ্ট মানুষ। আজ অন্নের অভাবে আর রোগের কবলে পড়ে দলে দলে গ্রামবাসী অপ্রাপ্ত বয়সে মরণকে করছে

আলিঙ্গন। আর যারা বেঁচে আছে, তারা বেঁচেও মরার সমান। লোকে কথায় বলে,—"গ্রামের জল, গ্রামের হাওয়ার মত অমন পরিস্কার জল হাওয়া আর কোথাও পাওয়া যায় না," কিন্তু আজ হয়েছে তা সম্পূর্ণ বিপরীত। গ্রামের পুকুরে বর্ষাকালে একটু জল হয়, তাও কচুরি পানা আর আগাছায় ভরা। তাতেই বাসনমাজা, কাপড় কাচা, গরুর গা ধোয়ান। আবার যে পুকুরে মাছ আছে, সে পুকুরে হয় বাবলার ডাল নয় বাঁশের খুঁটি ফেলে রাখা হয়, এবং সেইগুলি পচে জলকে ক'রে তোলে অতি মাত্রায় দুষিত। গ্রীষ্মকালের কথাই আলাদা, তখন গ্রামের অধিকাংশ পুকুর যায় শুকিয়ে। কূপগুলোতে জন্মে পোকা। তারপর বাতাসের কথা, গ্রামে শিক্ষিত লোকের বাস নেই বল্লেই হয়, তাই কোন জন্তু জানোয়ার মরে গেলে লোকেরা তাকে এনে ফেলে দেয় রাস্তার পাশে; তারপর সেটা ধীরে ধীরে সুরু করে পচ্‌তে। তার গন্ধে বাতাসের কি দুরবস্থা হয়, তাতো বিলক্ষণই বোঝা যায়. সব দিক বিবেচনা করে বেশ স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্ছি গ্রামের আজ ভাঙ্গন ধরেছে। অন্য দিক বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাই, সহরের সংশ্রবে এসে গ্রামের উন্নতিও কিছু হ'য়েছে, জগতের আধুনিক সমস্ত সভ্যতার ছোঁয়াচেই তারা আসতে পারছে। বর্ত্তমান কুটিল জগতে বাঁচতে হ'লে মানুষের কি চাই, তা মানুষ বুঝতে পেরেছে।

বাংলার গ্রামের সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের গ্রামগুলোকে যদি তুলনামুলক ভাবে দেখতে যাই, তবে এখনও বাংলার গ্রামে যে সৌন্দর্য্য, যে মাধুর্য্য, যে নীলিমা দেখতে পাই, তা যেন অন্য কোনখানে দেখতে পাই না। গাছপালার আড়ালে চাষাদের কুঁড়েঘর গ্রামের মোড়লদের আটচালা আর চণ্ডীমণ্ডপ, শারদীয়া পূজার আনন্দ, ঢাকের শব্দ, পাখীদের কিচিরমিচির, গ্রাম্য মেয়েদের জল আনতে যাওয়া, শিশুদের ধূলোখেলা, কৃষকদের দেশের মাটির সেবার ঐকান্তিকতা, আর রাখালের বাঁশীর শব্দ, এ সব এখন যেন মনকে মাতিয়ে রাখে।

যদি আজও গ্রামের পয়সাওয়ালা লোকগণ গ্রামে ফিরে আসেন, আজও যদি তাঁরা তাঁদের গ্রামগুলোর সংস্কারের দিকে মন দেন, তবে আবার হয়তো এই গ্রামের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হতে পারে। তাঁদের কাজ অনেক। প্রথমতঃ কৃষক বা তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোক অর্থাৎ গরীব ব'লে যারা অবজ্ঞাত তাদের সেবা সবার প্রথম প্রয়োজন। তাদের ঘরের চালে খড় নাই, বর্ষার জল, গ্রীষ্মের রৌদ্র, চালের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারে। পেটে অন্ন নাই। তাদের হাহাকার আজ বিশ্বমানবের সম্মুখে এনে দিয়েছে এক চিন্তার ধারা। সুতরাং যদি পল্লীমায়ের এই নির্য্যাতিত সন্তানেরা একটু সুখে বা একটু নিশ্চিন্তে বাস করবার অধিকার পেত তাহলে হয়তো পল্লীর অর্দ্ধেক দুঃখ ঘুচে যেতো। তারপর জল, পথ, ঘাট প্রভৃতির সংস্কার তো আছেই। চাই গ্রামে গ্রামে স্কুল, চাই লাইব্রেরী, চাই পল্লীসংস্কারক সমিতি অর্থাৎ মোটামুটি কথা হচ্ছে, চাই তাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার। তাই যদি হয়, যদি আমাদের গ্রাম্য ভাইরা শিক্ষার পরিচয় পায় তবেই তাঁদের গ্রামগুলো হয়ে উঠ্‌বে সজীব এবং সুন্দর। তখন কচুরিপানা উঠে যেয়ে পুকুরে ফুটবে পদ্ম, আর শালুকের ফুল। বনজঙ্গল উঠে যাবে, মশামাছি পালিয়ে যাবে, আর সেসব জায়গায় ফুটবে কাটটগর ভুঁইচাঁপা আর হাসনাহানার হাসি। ছেলেমেয়েরা শিউলির আঁচলের ওপোরে দেবে গড়াগড়ি, বকুলের মালা গেঁথে পরবে গলায়—লতার দোলনায় চড়ে দুলবে দোদুল, আর ফুলের সাথে মেশাবে তাদের হাসি, এমনি করে একদিন একসাথে ফুটে উঠবে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নিয়ে মানুষের হাসি আর ফুলের হাসি। তখন বাংলার এই গ্রাম—বাংলার সৌন্দর্য্যের এই অপূর্ব্ব লীলাভূমি—যার কথা ভাসে কবির মনে মনে—ভাবুকের চোখের পাতায় পাতায়—তার প্রকৃত রূপ উঠবে ফুটে।

জগতের লোক কল্পনার নেত্রে চেয়ে দেখে এই বাংলার গ্রামের দিকে। যারা প্রকৃত দরদী, তারা দরদ দিয়ে কল্পনা করে এর দরিদ্র অধিবাসীদের দুঃখের সমাধানের কথা। যারা ভাবুক, তাদের মন এর অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে' খুঁজে বেড়ায় কবিতার উপাদান। যারা সৌন্দর্য্যপিপাসু তারা চেয়ে থাকে এর সৌন্দর্য্যের আবেষ্টনীর দিকে। যারা ভালবাসতে জানে, তারা ভালবাসে এর অধিবাসীদের সরলতা, এর রম্য প্রকৃতি, এমন কি প্রত্যেকটী ধূলিকণা।

শ্রীদধীচি মৈত্র

ছায়াপট

বাণীনাথ

নর-নারায়ণ ঃ

প্রযোজক—রাধা ফিল্ম কোম্পানী।

কাহিনী—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিচালনা—জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোক-শিল্পী—যতীন দাস।

শব্দ-যন্ত্রী - নৃপেন পাল ও ভূপেন ঘোষ।

চিত্র-পরিবেশক —প্রাইমা ফিল্মস্ লিমিটেড।

পাত্র-পাত্রী ঃ

সত্রাজিত—অহীন্দ্র চৌধুরী।
শ্রীকৃষ্ণ—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য।
জরাসন্ধ—মোহন ঘোষাল।
জাম্ববান—তুলসী চক্রবর্ত্তী।
অক্রুর—জহর গাঙ্গুলী।
প্রসেন—রবি রায়।
শতধন্বা—ভূমেন রায়।
সত্যভামা—শ্রীমতী লীলা হালদার।
জাম্ববতী—শ্রীমতী রেণুকা রায়।
জয়ন্তী —শ্রীমতী রাণীবালা।

সত্রাজিতের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে এবং জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় রাধা ফিল্ম কোম্পানীর নূতন পৌরাণিক চিত্র "নর-নারায়ণ" ৩০শে জুন রূপবাণী চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে। উৎকৃষ্ট পৌরাণিক ছবি তুলে রাধা ফিল্ম কোম্পানি বেশ খ্যাতি অর্জ্জন করেছে। 'নর-নারায়ণ' রাধার ষ্ট্যাণ্ডার্ডকে বজায় রেখেছে। পৌরাণিক ছবি নির্ম্মাণ করতে ষ্টুডিয়োর কর্ত্তৃপক্ষদের খরচের দিকটা বেশ একটু বাড়াতে হয়। তবে সুবিধা এই যে কোন সুন্দরী ও নামজাদা অভিনেত্রী বা অভিনেতা ছাড়াও উৎকৃষ্ট পৌরাণিক ছবি প্রস্তুত করা যায়। একটা ভাল সামাজিক ছবি নির্ম্মাণ করতে খরচ খুব বেশী হয় এবং মোটা মাহিনার অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের ছবিতে নাবাতে হয়। পৌরাণিক ছবিতে আমরা রঙ্গালয়ের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের বেশী দেখতে পাই এবং সেই-জন্যে হয়ত প্রত্যেক পৌরাণিক ছবিতে অভিনয়ের ধারারও কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। কোন টেকনিকের মারপ্যাচ সাধারণতঃ এই শ্রেণীর ছবিতে দেখা যায় না। বাংলার ভক্ত দর্শকরা ছবিতে রাম-সীতা বা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে হাততালির সঙ্গে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে সকলের অলক্ষ্যে সেই দেবতার শ্রীচরণে একবার ভক্তিপূর্ণ নমস্কার জানায়।

সুতরাং পৌরাণিক ছবির কদর এখনও বাংলার সহরে ও পল্লীতে আছে কেউ অস্বীকার করবে না। রাধা ফিল্ম কোম্পানি উৎকৃষ্ট পৌরাণিক ছবি দর্শকদের উপহার দিয়ে কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন। প্রবীন পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালনায় যথেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচয় না দিলেও ছবির ভাষায় সুন্দর করিয়া "নর-নারায়ণ" চিত্রখানিকে রূপালি পর্দ্দায় রূপ দিয়েছেন। দোষ ত্রুটি এই ছবিতে কম নেই, কিন্তু সেগুলি সর্ব্বশ্রেণীর দর্শকদের চোখকে পীড়া দেয় না। ঘটনাকে এক সূত্রে না বেঁধে পর পর জোড়াতালি দিয়ে সাজানর দরুণ ছবির সাসপেন্সের অভাব ঘটেছে। ছবির Continuity নেই। একটি স্যামন্তক মণিকে কেন্দ্র করে সমস্ত ছবিখানি তোলা হয়েছে, তাতে ছবির আগ্রহ বাড়িয়ে দিলেও ছবির টেম্পো বহু অনাবশ্যক দৃশ্যের জন্য বাধা পেয়েছে। পরিচালক যে সুবিধা ও সুযোগ পেয়েছিলেন চেষ্টা করলে হয়ত এই 'নর-নারায়ণ' চিত্রকে নূতনরূপে গড়ে চিত্রজগতে চাঞ্চল্য আনতে পারতেন। কিন্তু চিত্র-নাট্যের দোষে, নায়িকা সত্যভামা ও শতধন্বা বেশে শীলা হালদার ও ভূমেন রায়ের প্রাণহীন অভিনয় গুণে এবং স্থানে স্থানে পাত্র-পাত্রীদের অভিনয়ে রঙ্গালয়ের টেকনিক অনুসরণ করায় নর নারায়ণ প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে সম্মান পায় নি।

'নর-নারায়ণের' একটি দৃশ্যে অহীন্দ্র চৌধুরী ও জহর গাঙ্গুলী

ছবির কাহিনী হ'চ্ছে নিম্নলিখিতরূপ—রাজা সত্রাজিত দীর্ঘকাল তপস্যা ক'রে সূর্য্যদেবের কাছ হ'তে স্যামন্তক মণি উপহার পেলেন কিন্তু এই মণি তাঁর সর্ব্বনাশের মূল হলো। সকলের লোভ ছিল এই মণিটির উপর; এমন কি শ্রীকৃষ্ণও এসেছিলেন সূর্য্যপীঠে তপস্যা করতে এই মণিটি লাভ করবার জন্য। স্যামন্তক মনির বদলে শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিত-কন্যা সুন্দরী সত্যভামাকে দেখে ভালবাসায় পড়লেন।

নর-নারায়ণের একটি দৃশ্য

শ্রীকৃষ্ণ-বন্ধু অক্রূরের লোভ ছিল ঐ সত্যভামার উপর। অন্যদিকে মগধরাজ জরাসন্ধ রাজকন্যা জাম্ববতীকে প্রতিশ্রুতি দিলেন, যে স্যমন্তক মণি এনে তিনি তার বিবাহ রাত্রে জাম্ববতীকে উপহার দিবেন। স্যমন্তক মনিটি হস্তগত করবার জন্য তিনি রাজা কৃতবর্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শতধন্বার সাহায্য নিলেন। বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে শতধন্বা সত্রাজিৎকে আক্রমণ করল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এদের এই বিপদ মাঝে অনন্ত সূর্য্যদেবের জ্যোতি হতে অগ্নি বর্ষণ করে সেই বিপুলবাহিনী ধ্বংশ করেন এবং সত্রাজিৎ ও সত্যভামাকে দ্বারিকা রাজপ্রাসাদে আশ্রয় দেন। শ্রীকৃষ্ণকে স্যমন্তক মণি

লোভী ভেবে সত্রাজিত অনুজ প্রসেনের হাত দিয়ে মণিটি অন্যত্র স্থানান্তরিত করেন। ঘটনাচক্রে মণিটি এসে পড়ে অনার্য্য রাজা জাম্ববানের কাছে। শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববানের নিকট হ'তে ঐ মণিটি লাভ করেন এবং সেই সঙ্গে রাজকন্যা জাম্ববতীকে। শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার বিবাহোৎসব রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ-বন্ধু অক্রুর প্রলোভনে পড়ে দুর্ব্বৃত্ত শতধন্বা সত্রাজিৎকে হত্যা করবার জন্য সাহায্য করেন। তারপর সদ্য বিবাহিত সত্যভামাকে অপহরণ করে নিয়ে যাবার মুখে বলরাম কর্তৃক শতধন্বা নিহত হন এবং ভীত অক্রুর স্যমন্তক মণিটি শ্রীকৃষ্ণের হাতে দিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন। ছবিখানির এইখানেই শেষ।

এই স্যমন্তক মনি উপখ্যানকে কেন্দ্র করে কতকগুলি চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু একমাত্র সত্রাজিৎ, অক্রুর ও শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া বাকি চরিত্রগুলি ততো জীবন্ত হয়নি। রাজা জরাসন্ধ চরিত্রটির উপর পরিচালক একটু অবিচার করেছেন। হয়ত জরাসন্ধ ও শতধন্বাকে নূতন রূপে গড়ে পরিচালক এই কাহিনীকে আরো চিতাকর্ষক করতে পারতেন। বহু অর্থ ব্যায়ে রাধা ফিল্ম কোম্পানি 'নর-নারায়ণ' ছবিখানি তুলে দর্শকদের উপহার দিয়েছেন এবং এই ছবিতে বহু নামজাদা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মিলন ঘটিয়াছে। মনোরম সঙ্গীত, নট-নটীদের সুন্দর অভিনয়, চিত্তাকর্ষক কাহিনী ও সুন্দর দৃশ্যপটাদি নর-নারায়ণ ছবির শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

সু-অভিনয়ের দিক দিয়া সত্রাজিতের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর সুষ্ঠু অভিনয় সবচেয়ে উল্লেখযাগ্য।' সত্রাজিৎ চরিত্রের যা কিছু বিশেষত্ব তাঁর অভিনয়ে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে ধীরাজ ভট্টাচার্য্য ও অক্রুর চরিত্রে জহর গাঙ্গুলি ভালই অভিনয় করেছেন। প্রসেনের ছোট ভুমিকায় রবি রায় মন্দ অভিনয় করেননি। শতধন্বা ভুমিকায় ভূমেন রায়ের থিয়েটার ঢঙের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। জরাসন্ধের ভূমিকায় মোহন ঘোষালের অভিনয় প্রশংসনীয়। রাজা জাম্ববান চরিত্রে তুলসী চক্রবর্ত্তীর অভিনয় উল্লেখযোগ্য। ছবির প্রধান নায়িকা সত্যভামা বেশে শীলা হালদারকে বেশ মানিয়েছিল, তবে তিনি অপূর্ব্ব অভিনয় প্রদর্শন ক'রে আমাদের মুগ্ধ করতে পারেননি। শীলা হালদারের চালচলন, কথাবার্ত্তা বেশ Static এবং এই জন্য তিনি ভাল অভিনয়

নর-নারায়ণের অপর একটি দৃশ্য

করতে না পারলেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। জাম্ববতী বেশে শ্রীমতী রেণুকা রায় অভিনয় নিপুনতায় পরিচয় দিয়েছেন। জাম্ববতীর সখী হিসেবে অবতীর্ণা হয়েছিলেন নামজাদা অভিনেত্রী রাণীবালা। এই ছোট চরিত্রে তিনি মন্দ অভিনয় করেননি, তবে জয়ন্তীর হাস্ত-কৌতুক, কথাবার্ত্তা ও বৈষ্ণব সঙ্গীত প্রশংসনীয় নয়। ছবির নাচ গান প্রথম শ্রেণীর না হ'লেও বেশ দর্শনীয়। আলোক-শিল্পী যতীন দাস ফটোগ্রাফীর কাজে বেশ দক্ষতা দেখিয়েছেন। শব্দ-যন্ত্রীর কাজ উত্তম। সম্পাদনা আরো উন্নত হওয়া উচিৎ ছিল।

মাদার ইণ্ডিয়া :

কাহিনী—মোহনলাল দাভে
পরিচালক—গুঞ্জল
আলোক-শিল্পী—রুস্তম ইরানি
শব্দ-যন্ত্রী—রামগোপাল
চিত্র পরিবেশক—মানসাতা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স।

পাত্র-পাত্রী :

সবিতা—সরিফা
নলিনী—প্রমিলা
বিন্দু—সুশীলা
নিরঞ্জন—এম, খাঁন।
মহেন্দ্র—গোলাম মহম্মদ
নন্দকুমার—আসিফ হোসেন

বোম্বের সাইন পিকচার্সের নূতন রঙিন হিন্দি ছবি 'মাদার ইণ্ডিয়া' কলিকাতা প্রভাত সিনেমায় মুক্তিলাভ করিয়াছে। 'মাদার ইণ্ডিয়া' ভারতের দ্বিতীয় রঙিন ছবি এবং এই শ্রেণীর ছবি হিসেবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সহজে সক্ষম হয়েছে। এক মাত্র বোম্বাই নগরে ২৮শ সপ্তাহ ধরে ছবিখানি প্রদর্শিত হয়ে এক রেকর্ড করেছে। বোম্বাই ছবির সাধারণতঃ প্রধান দোষ, ছবির কাহিনী তেমন জীবন্ত হয় না। মোহনলাল দাভের সুন্দর কাহিনী অবলম্বনে পরিচালক গুঞ্জল সহজ ভাষায় ছবি-খানিকে রূপালি পর্দায় বুঝিয়েছেন। মাদার ইণ্ডিয়া ছবির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ইহার অনবদ্য সুন্দর কাহিনী। গল্পের মধ্যে এমন একটা করুণ রসের সন্ধান পাওয়া যায় যাতে সহজেই অন্তরকে স্পর্শ করে। মাদার ইণ্ডিয়ার গল্পে নূতনত্বের ছাপ না থাকলেও বিদেশী উপন্যাসকে

'জয়ন্তীর' ভূমিকায় রাণীবালা

অনুসরণ করে রচিত হয়নি। তবে বিদেশী শিক্ষা দেশের কি ক্ষতি করেছে তারই সত্যকার চিত্র দেখতে পাওয়া যায় এই ছবিতে। ছবিতে মমতাময়ী মাতা সবিতার অপূর্ব্ব ত্যাগ, সেবা ও কষ্টসহিষ্ণু এবং এই ভূমিকায় সরিফার আশ্চর্য্যকর অভিনয় 'মাদার ইণ্ডিয়া' ছবিখানিকে জীবন্ত করিয়াছে। ইংরেজী শিক্ষার ভাল ও মন্দ উভয়ের নমুনা পাই এই ছবিতে। অল্প কথায় ছবির কাহিনী হচ্ছে গ্রামের জমিদার-কন্যা সবিতার (সরিফা) সঙ্গে কোন কারণবশতঃ বিবাহ রাত্রে মহেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ ভেঙ্গে যায় এবং সবিতার সম্মান বাঁচায় মহেন্দ্রের বন্ধু নিরঞ্জন। সুরেন্দ্র

'সত্যভামার' ভূমিকায় শীলা হালদার

ফিল্ম কর্পোরেশনের 'রিক্তা' চিত্রে রমলা দেবী

এখন রেল কোম্পানীর বড় চাকুরে আর নিরঞ্জন মাত্র হরিপুর রেল ষ্টেশনের লাইন ইনস্পেক্টার। অফিসের কাজে মহেন্দ্র সস্ত্রীক হরিপুরে এলো। মিসেস্ মজুমদারের সভাপতিত্বে শিশুমঙ্গল সমিতিতে সবিতা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বর্ত্তমান ইংরেজী শিক্ষিতা ভারতীয় নারীদের কর্ত্তব্য জ্ঞানের সম্বন্ধে বেশ একটু কটুক্তি করেন। এর ফল হলো যে নিরঞ্জনের চাকরি গেল। অভাবের তাড়নায় নিরঞ্জনের স্বভাব নষ্ট হল এবং একদিন তিনি নিরুদ্দেশ হলেন। সবিতার তখন একমাত্র কাজ হ'ল একমাত্র পুত্র নন্দকুমারকে মানুষ করা। বহু দুঃখের পর সবিতার প্রিয়তম পুত্র নন্দকুমার আইন পাশ করে পাবলিক প্রসিকিউটার হলেন। এই নন্দকুমার মাকে সবচেয়ে দুঃখ দিলেন যখন সবিতা জানতে পারল যে, মহেন্দ্রের অতি আধুনিকা কন্যা নলিনীকে বিবাহ করতে সে রাজী হয়েছে। সবিতার ইচ্ছা ছিল তাঁহারি আশ্রিতা বিন্দুকে তিনি পুত্রবধূ করবেন। ঘটনাচক্রে সবিতা নন্দকুমার ও নলিনীর কাছে অপমানিত হয়ে ফিরে এলেন। নন্দকুমার একদিন আনন্দ উৎসবের মাঝে ভীষণ আহত হয়ে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। নলিনীর ভালবাসাও আর অন্ধ নন্দকুমারের প্রতি থাকে না। সে এখন মদনকে বিয়ে করতে চায়। ডাক্তার জানিয়ে গেল মহেন্দ্রকে যে, পাঁচ হাজার

টাকা হলে রেডিয়াম চিকিৎসা করালে হয়ত নন্দকুমার চোখ ফিরে পেতে পারে। সবিতা জানতে পেরে একদিন লুকিয়ে মহেন্দ্রের বাড়ী হতে পাঁচহাজার টাকা চুরী করে নন্দকুমারের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের হাতে দেয়, কিন্তু চুরী অপরাধে সে কাঠগড়ায় দাঁড়াল। ঘটনাচক্রে নলিনী তার পিতাকে খুন করে এবং নিজে আত্মহত্যা করে। নন্দকুমারের চোখ ভাল হয়েছে কিন্তু সে তখনও জানেনা যে মা বন্দীশালায় বন্দী। সবিতার মুক্তিদিবসে নন্দকুমার তার মাকে দেখতে পেয়ে মার চরণ ধরে ক্ষমাভিক্ষা চেয়ে তার গভীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করল।

সু-অভিনয়ের দিক দিয়ে সরিফা সবিতার ভূমিকায় চিত্তাকর্ষক অভিনয় করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নলিনী চরিত্রের দোষগুণ প্রমিলার সহজ অভিনয়ে বেশ রূপ নিয়েছে। বিন্দুর ভূমিকায় সুশীলার লজ্জা ভাবটি অভিনয়ে বেশ প্রকাশ হয়েছে। নিরঞ্জন ও মহেন্দ্রের ভূমিকায় এম, খাঁন ও গোলাম মহম্মদের সংযত অভিনয় প্রশংসনীয়। কৈলাস চরিত্রে গোলাম রসুল ভাল অভিনয় করেছেন। নন্দকুমারের ভূমিকায় আসিফ হোসেন প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। ছবির সুর সংযোজনা উত্তম। আলোক-শিল্পী ও শব্দ-যন্ত্রীর কাজ উল্লেখযোগ্য। সম্পাদনা আরোও উন্নত হওয়া উচিৎ ছিল।

'মাদার ইণ্ডিয়া' এবছরের একটি শ্রেষ্ঠ হিন্দি ছবি হিসেবে নিশ্চয় গণ্য হবে। সুন্দর কাহিনী, ভাল অভিনয়, সুদক্ষ পরিচালনা—এই ছবির বিশেষত্ব। পরিচালনায় গুঞ্জল বিশেষ কৃতিত্ব না দেখালেও একটি সুন্দর কাহিনী অবলম্বনে ছবিখানি ভাল করে প্রস্তুত করে "মাদার ইণ্ডিয়াকে" দর্শনীয় করেছেন। আশা করা যায়, বাঙ্গালী দর্শকরা এই ছবিখানি দেখে তৃপ্তিলাভ করবেন।

বাণীনাথ

মাদার ইণ্ডিয়ায় 'বিন্দুর' ভূমিকায় সুশীলা

ব্রাউনীং পঞ্চাশিকা *

শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র আই-ই-এস (রিটায়ার্ড) স্বনামে বিদেশী কবিতার তর্জ্জমা, সুরেশ্বর শর্ম্মা নামে মৌলিক কবিতা, স্মৃতিশেখর উপাধ্যায় নামে মৌলিক গদ্য-কবিতা এবং গুণেন্দ্র উপাধ্যায় নামে বিদেশী গদ্য-কবিতার তর্জ্জমা ক'রে থাকেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে শেলী, কীট্‌স্, ব্রাউনিং, এলিয়ট, লরেন্স, অ.ডন —এমন্ কি জাপানী কবি নোগুচি পর্য্যন্ত কিছুই তিনি বাকী রাখেন নি। বাংলা সাহিত্যে কদাচিৎ ভালো অনুবাদকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এবং আজকের দিনে অনুবাদের মূল্য কতোখানি, তা' আর নতুন করে কাউকে বোঝাতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ইংরেজি সাহিত্য যে এতো সমৃদ্ধ হয়েছে, তার মূলেও আছে অনুবাদ। এ ক্ষেত্রে যে বাংলা সাহিত্য কতো পিছিয়ে আছে, তা' ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। যদিও বা বিদেশী উপন্যাসের দু'একখানা বাংলা অনুবাদ মাঝে মাঝে চোখে পড়ে, কবিতার সম্বন্ধে সে-কথাও বলা চলে না। অবশ্য তার কারণও আছে। কবিতার তর্জ্জমা করা যে একখানা ইংরেজী-থেকে-বাংলা অভিধান নিয়ে বসলেই হয় না, তা' বলা বাহুল্য। এক আধটা ছোট বিদেশী কবিতার মাঝারি গোছের অনুবাদ হয়তো অনেকেই করেছেন, কিন্তু কোনো বড়ো কবির বিখ্যাত এবং দীর্ঘ কবিতার তর্জ্জমা করতে গেলে অনুবাদককেও পুরোপুরি কবি হতে হয়। মৈত্র মহাশয় নিজে সুকবি; তাই তিনি অনুবাদকের প্রাথমিক বাধা অনায়াসেই এড়িয়ে যেতে পেরেছেন। তাঁর মতো কবির অনুবাদে হাত না দিলেও চলত। কিন্তু তবু তাঁদের মতো কবিরই আবশ্যকতা আছে ব্রাউনিঙের মতো কবির রচনার সঙ্গে ইংরেজি-অনভিজ্ঞ বাঙালী পাঠকপাঠিকাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার। স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কতকগুলি বিদেশী কবিতা বাংলায় তর্জ্জমা করেছিলেন। তাঁর 'অনুবাদে ছন্দোনৈপুণ্যের সহজলীলা দেখা যায়।' কিন্তু মৈত্র মহাশয় 'অসাধ্য সাধন' করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি: "বিদেশী রসপণ্যের ভার নিয়ে তুমি একঘাট থেকে আর একঘাটে খেয়া দিয়েছ দুর্গমতম উজান পথে, দুঃসাহসিক নাবিকবৃত্তিতে এ রকম কৃতিত্ব দেখা যায় না।"

মৈত্র মহাশয় অনুবাদ করেছেন ব্রাউনিঙের পঞ্চাশটি কবিতা। ইংরেজি কবিদের মধ্যে ব্রাউনিঙের অনুবাদ করা বোধ করি কারুর চেয়ে সহজ নয়। কারণ, ব্রাউনিঙের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব তাঁর কাব্যের বহুদশারী ভাষার মধ্যে দিয়ে যে-ভাবে ফুটে উঠেছে, তার বাংলা রূপ দেওয়া একপ্রকার অসম্ভব বললেও চলে। কিন্তু মৈত্র মহাশয় এটা ঠিকই বুঝেছেন যে, "ইংরাজী ছন্দের সঙ্গে বাংলার ছন্দসুরের বড় একটা জাতিত্ব নাই। সুতরাং অনুবাদ করবার সময় কবিতাটির বিলাতী কাঠামোর দিকে দৃষ্টি রেখে বাঙলার অনুকরণ করবার চেষ্টা করলে অন্তর্নিহিত ভাবটি আড়ষ্ট হবার আশঙ্কা আছে। মূল কবিতায় ভাবের সঙ্গে ভাষার যে সহজ সামঞ্জস্য আছে, তাদের সমষ্টিগত গুরুত্ব ও আবেগটিকে বাঙলা ভাষায় কি রূপ দিতে পারলে ঠিক সংঘাতটি মনে লাগে এবং ঠিক সুরটি বাহির হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা ছাড়া অনুবাদের আর কোনো গূঢ় সঙ্কেত আছে কি না জানি না। এই নিয়মটি মেনে নিয়ে যথা সম্ভব মূল কবিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে কবির মর্ম্মোক্তি নিজের জবানীতে লেখবার চেষ্টা করেছি।" এবং তাতে যে তিনি কতোখানি সফল হয়েছেন, তা' আমরা তাঁর ব্রাউনিঙের অনুবাদ পড়ে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি। ব্রাউনিঙের কাব্যের

* ব্রাউনীং পঞ্চাশিকা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে দিয়ে যে vigour প্রকাশ পেয়েছে, সেই vigourকে বাংলা তর্জমার মধ্যে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে তিনি যে চলিত বাংলা কথা ব্যবহার না ক'রে সংস্কৃত শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাতে মৈত্র মহাশয়ের সুবিবেচনার পরিচয় পাই। উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করতে পারি Summum Bonum কবিতার চার লাইনের অনুবাদ:

"গন্ধ, সুষমা, দীপ্তি, কাজল ছায়
বিস্ময় আর ঋদ্ধির গরিমায়,
ফেলিয়া নিয়ে সুদূর উর্দ্ধলোকে
আবিঃ সম সত্য ভাতিছে চোখে।" (পুঞ্জীভূত)

ব্রাউনিং ভিক্টোরীয় যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। কারু কারুর মতে শেক্‌স্‌পীয়ারের পরেই তাঁর স্থান। কিন্তু তাঁর মতো কবিরও ত্রিশ বৎসর ধ'রে অক্লান্তভাবে লেখার পর তবে তাঁর প্রতিভা রসিকসমাজে স্বীকৃত হয়। এদিক্ দিয়ে ব্রাউনিঙের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যের অনেকটা মিল আছে। ব্রাউনিঙের রীতির দুর্ব্বোধ্যতার জন্যেই সমালোচকবৃন্দ তাঁকে বিদ্রূপবাণে জর্জ্জরিত করেছিলেন। কিন্তু ব্রাউনিঙের ভাবে এতোটুকু জড়তা বা দুর্ব্বোধ্যতা ছিল না। সুইনবার্ণ তাঁর সম্বন্ধে ঠিকই বলেছিলেন: "he is something too much the reverse of obscure: he is too brilliant and Subtle for the ready reader." তাঁর ভাব এতো তীক্ষ্ণ এবং সূক্ষ্ম ছিল যে ভাষার বন্ধনে যথাযথভাবে তাকে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব হ'য়ে পড়ত। ব্রাউনিঙের ভাষাতেই বলা যেতে পারে:

"Thoughts hardly to be packed.
Into a narrow act,
Fancies that broke through language and
escaped."

যদিও তাঁর কাব্যে রিফর্ম্‌ বিল বা তৎকালীন ইংলণ্ডের প্রভাব তেমন ভাবে প্রতিফলিত হয় নি, তবু আংশিকভাবে মধ্যযুগ এবং প্রায় পূর্ণভাবে ইতালীয় রিনেসেন্সের তিনি একজন সুযোগ্য ভাষ্যকার ছিলেন। রোমান্টিক রিভাইভ্যালের সময় কাব্যে তিনটি বিচ্ছিন্ন ধারা লক্ষ্য করা যায়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এবং কীট্‌স্ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং বিস্ময়কে প্রকাশ করেছেন; স্কটের কাব্যে অতীতের 'romantic and human interest' প্রকট হ'য়ে উঠেছিল; কোল্‌রিজ, বায়রণ এবং শেলী মানবের মধ্যে নতুন চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন। ব্রাউনিঙের কাব্যে এই ত্রিধারার সম্মিলন হ'লেও তৃতীয় ধারাটিই বিশেষ ক'রে পুষ্ট হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবই কোল্‌রিজ, বায়রণ এবং শেলীকে মানববন্দনায় অনুপ্রাণিত করে। তাঁদের কাব্যে সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ! তাঁরা প্রত্যেকেই সামাজিক মানুষের সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। কিন্তু ব্রাউনিঙের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল; তিনি মানুষকে ব্যষ্টি হিসেবে দেখেছেন! 'History of human soul' তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, নাটকীয় ভঙ্গি এবং বিশ্লেষণী প্রবৃত্তি রোমান্টিসিজম্‌এর প্রভাবাচ্ছন্ন যুগেও তাঁকে বুদ্ধিপ্রবণ বাস্তববাদীতে পরিণত করেছিল। তাঁর কাব্যের সব চেয়ে বড়ো বিশেষত্ব হ'লো তাঁর 'robust optimism.' বৃহত্তর জীবনে আত্মার পথকে তিনি প্রেমের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর কাব্যের বলিষ্ঠ প্রেমের রূপ অন্যান্য ইংরেজি কবিদের মধ্যে পাওয়া যায় না। মৈত্র মহাশয় এ সম্বন্ধে তাঁর ভূমিকায় অতি সুন্দর ক'রে বলেছেন: "তাঁর প্রেমে সেই অগ্নি ও উত্তাপ আছে যাতে জড়দেহ ভস্মীভূত হ'য়ে যায়, ইন্দ্রিয়ের তারে তারে অতীন্দ্রিয় সুর বেজে ওঠে। সীমার মধ্যে অসীমের অনুভূতি জাগে,—অনির্দ্দিষ্ট অসীমকে খুঁজতে গিয়ে নয়, অসীমের রূপ নিগূঢ়ভাবে উপলব্ধি করতে গিয়ে।" শেলীর সম্বন্ধে ব্রাউনিং যা' বলেছিলেন, তা' তাঁর নিজের সম্বন্ধেও এ ক্ষেত্রে সমভাবেই প্রযোজ্য: "His noblest and most predominant characteristic is his simultaneous perception of Power and Love in the absolute and of Beauty and Good in the concrete, while he throws from his poet's station between both, swifter, subtler and more numerous films for the connection of each with each than any other modern artificer."

এ হেন কবির রচনাকে যিনি বাংলায় সুষ্ঠুভাবে

রূপান্তরিত করেছেন, প্রথমেই এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্যে মৈত্র মহাশয়কে অভিনন্দন জানাই। তাঁর অনুবাদ যে কত স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল হয়েছে, তা' দেখবার জন্যে The Last Ride Together এবং Prospice থেকে মূল সমেত অনূদিত অংশ উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না :—

"Who knows what's fit for us ? Had fate
Proposed bliss here should sublimate
My being—had I signed the bond—
Still one must lead some life beyond,
Have a bliss to die with, dim descried.
This foot once planted on the goal,
This glory-garland round my soul,
Could I descry such ? Try and test !
I sink back shuddering from the quest,
Earth being so good, would heaven seem best ?
Now, heaven and she are beyond this ride."

(The Last Ride Together)

(অনুবাদ)

"কে বলিতে পারে,
কি যে শ্রেয় আমাদের তরে এ সংসারে !
এ জীবন হবে মোর সর্ব্ব-সুখাধার,
বিধি স্বাক্ষরিত যদি করিতেন হেন অঙ্গীকার,
বিধিলিপি শিরোধার্য্য করি' তবু জাগিত জিজ্ঞাসা
চিত্তে মোর,—আছে কিনা পরপারে নব সুখ আশা ?
স্বপ্নঘট বক্ষে ধরি' তাই,
বৈতরণী পার হ'তে চাই।
জীবনযাত্রার শেষে জয়মাল্য যদি আত্মা মোর
ধরিত আপন কণ্ঠে, তাহ'লে কি আনন্দ বিভোর
হ'ত সে নূতন সুখ আশে ?
পরখ করিতে সত্য কাঁপি যে সন্ত্রাসে !
'ধরা যদি সুখে ভরা হ'ত মোর তরে,
স্বর্গ শ্রেষ্ঠ সুখধাম বুঝিতাম কভু কি অন্তরে ?
স্বর্গ মোর, প্রিয়া মোর, তুরগ-বাহিত
এ যাত্রার সীমার অতীত।"

(শেষবার)

দেহ-

আপনি ওষুধ খেতে ভালবাসেন না, নিশ্চয়ই। তবু তথাকথিত পুষ্টি ও শক্তির জন্য কত ওষুধ আপনাকে খেতে হয়, ভেবে দেখেছেন কি ? স্বাস্থ্যের জন্য খাদ্য যতটা প্রয়োজন, ওষুধ তার কিছুই নয়,—এই কথাটা কত কম প্রচারিত হয় !

একশিশি ওষুধ যে দামে কিনবেন, তার চাইতে কম দামে, অনেক বেশী সুখাদ্য আপনি পেতে পারেন।

ওষুধের শিশিতে ক'রে ভিটামিন, প্রোটিন, ষ্টার্চ, কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি যাবতীয় জিনিষ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু ঐ সকল-গুণ সম্পন্ন বটিকা নিয়মিত খেলেও মানুষের দেহযন্ত্র চলবে না।

ঘড়ির কাঁটা চলছে অবিশ্রান্ত, জীবনের শ্বাস প্রশ্বাস তেমনি। ঘড়ির টিক্ টিক্ আওয়াজ ! আপনার বুকের মাঝেও আর একপ্রকার জীবন ঘড়ি তার কলকব্জা সমেত ধুক ধুক করছে।

এটি সম্ভব হয় খাদ্যের দ্বারা, এই খাদ্যকে আপনি যখন অবহেলা করেন, তখন মনে করেন না এ সকল কথা। ঘিতে আয়ু বাড়ে। ঘৃতং আয়ুঃ। এটা আজকের কথা নয়। কিন্তু কথাটা আজকেও সত্যি। ঘি বস্তু এমনই অপরিহার্য্য দেহের পক্ষে, যে জন্য ঋণ করেও ঘি সংগ্রহ করা দরকার বিবেচিত হয়েছিল। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেত ! আজকের দিনে ঋণ লওয়া হয়ত ঠিক হবে না, কিন্তু ঘিয়ের সারবত্তা ও প্রয়োজন কমেনি একটুও।

এই যে ঘিয়ের এত গুণ, তা কেবল খাঁটি ঘি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। তাই ঘি যখন খেতে হয়, খাঁটি বস্তুটিই চাই। 'শ্রী' ঘিয়ের প্রত্যেক টিনে ভারত গভর্ণমেন্টের খাঁটি ঘিয়ের চিহ্ন—'এগ্‌মার্ক' শীল দেখে নেবেন।

*　*　*　*

"I was ever a fighter, so—one fight more,
The best and the last!
I would hate that death bandaged my eyes, and farbare,
And bade me creep past.
No! let me taste the whole of it, fare like my peers
The heroes of old,
Bear the brunt, in a minute pay glad life's arrears
Of pain, darkness and cold.
For sudden the worst turns the best to the brave,
The black minute 's at end,
And the elements' rage, the fiend-voices that rave,
Shall dwindle, shall blend,
Shall change, shall become first a peace out of pain,
Then a light, then thy breast,
O thou soul of my soul! I shall clasp thee again
And with God be the rest!"

(Prospice)

(অনুবাদ)

"জন্মাবধি যোদ্ধা আমি, আজীবন যুঝিয়াছি রণে,
শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি অন্তিম লগনে।
দিব না মরণে কভু গুণ্ঠন বাঁধিতে চক্ষে মম,
পালাব না কভু ভীরু সম।
অতীতের শূরবৃন্দ সনে আমি করিব বরণ
স্ফীত বক্ষে বজ্র প্রহরণ।
সংঘাতে অটল র'ব, থাক্ দুঃখ তমিস্রা তুহিন,
আনন্দে শুধিব সর্ব্ব ঋণ।
অন্ধতম লহমার অবসানে নির্ভীকের তরে
দুঃখ গ্লানি দিব্যদ্যুতি ধরে।
নিসর্গের ক্রোধানল প্রেতকণ্ঠে উন্মত্ত গর্জ্জন
অচিরে লভিবে নির্ব্বাপণ।
সে বিক্ষোভ স্তব্ধ করি' বেদনা ফুটিবে প্রশান্তিতে।
প্রাণময়ি, তুমি আচম্বিতে
ধরা দিবে বক্ষে মোর, বাহুপাশে বাঁধিব তোমারে,
আর সব দিব বিধাতারে।"

(অন্তিমে)

প্রশ্নোত্তর (Apparitions), দৃষ্টি (Cristina), অভিসার—প্রাচীন পুরীতে (Love Among the Ruins) কিশোরী (Evelyn Hope), প্রেমের একপথ (One way of love), প্রেমের অন্য পথ (Another way of love), এইক্ষণে (Now), সূর্য্যমুখী (Rudel to Lady of Tripoli), বিনম্র (Humility), বিদায়িনী (The Lost Mistress), সহজিয়া যাদু (Natural Magic), যাদুকরী প্রকৃতি (Magical Nature), অস্মিমোক্তি (Confessions), James Lee's Wife থেকে (১) অগ্নিকুণ্ডের পাশে (By the Fire side), (২) দেহলিতে (In the Doorway), (৩) পাহাড়ের কোলে (On the Cliff), মুলেকি (Mulekhey), অমোঘ প্রণয় (Prophyria's Lover), লোকান্তরিতা (My Last Duchess) বীরবালক (Incident of the French Camp) এবং বিজ্ঞপ্তি (Epilogue to Asolando) আমাকে প্রচুর আনন্দ দিয়াছে। ব্রাউনিঙের অপরূপ অনুবাদের জন্যে বাংলা সাহিত্য মৈত্র মহাশয়ের কাছে ঋণী থাকবে। আমরা কামনা করি, তিনি এইভাবে বিদেশী কবিদের তর্জ্জমা ক'রে বাংলা সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করুন।

শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বাঙালী হ'য়েছে কাঙালী তবুও

শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

হলুদ চাঁপার ফুল ফোটে যেথা—স্নেহ-সিঞ্চিত মাটি,
আপনার হাতে সাজায় প্রকৃতি অপরূপ পরিপাটী—
শত বনফুল কর্ণের দুল, সুশ্যামল কটিবাস,
বিচিত্র কতো বন্দনা গানে বিহগেরা বারোমাস
সে কোন্ দেউলে আপনা হারায়—সবে রাখে সন্ধান,
কার পদ চুমি নটিনী তটিনী উচ্ছলে অফুরান ;
অতুলন রূপ মরি অপরূপ······শুভদে-বরদে বেশ,
কাঙালী বাঙালী, তবু আজো তা'র এহেন বাঙ্‌লা দেশ !

বিস্তৃত মাঠ মিতালি পাতায় অন্তবিহীন নভে,
চলে কানাকানি পবনে পবনে রাখালিয়া বেণু-রবে ;
প্রতি ধূলি-কণা বিলাইছে সোণা—বুকভরা স্নেহ কা'র,
পাষাণের বুকে দানে অনায়াসে সৃজনের অধিকার ?
কাহার ললাটে চন্দ্র-তিলক কুন্তলে তারা-ফুল,
সুজলা-সুফলা বঙ্গ-জননী নাহি তা'র সমতুল ।
তারে ঘিরি নিতি ফিরে ষড়ঋতু—বিরতির নাহি লেশ,
বাঙালী কাঙালী, তবু আজো তা'র এহেন বাঙ্‌লা দেশ !

আজো অঙ্গনে ভোরের বকুল দুকূল ছাপিয়া জাগে,
তেমনি উদয়-অচলে অরুণ উজলে রক্তরাগে ।—
ধর্ম্মের নামে আজো বাঙ্‌লার নরনারী উন্মাদ,
জানে না অন্ধ-ধর্ম্মপ্রিয়তা ঘটালো এ পরমাদ !
বুক ভরা মার সোনার ফসলে অধিকার নাই কোনো,
ভরা মালঞ্চে গুমরে বেদনা—কাণ পেতে তাই শোনো ;—
নিশ্বসি ওঠে সর্ব্বংসহা······নয়ন নির্ণিমেষ
বাঙালী হ'য়েছে কাঙালী তবুও আজো তার হেন দেশ !

বাংলা সাহিত্যে পারিশ্রমিক প্রসঙ্গ

শ্রীঅবনীনাথ রায়

একদা এই প্রশ্ন উঠেছিল যে পারিশ্রমিক না নিয়ে বাংলা লেখা ছাপানো যুক্তিযুক্ত কি না। একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক মত প্রকাশ ক'রেছিলেন যে লেখা ছাপা হ'লেই তার জন্য পারিশ্রমিক দাবি করা উচিত। এই দাবি করার জোর যাঁরা নিজেদের মধ্যে খুঁজে পান না তাঁদের সাহিত্য চর্চা করবার সখ পাণ্ডুলিপিতেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত—লেখাকে দিনের আলো দেখানোর দুঃসাহস তাঁদের হয় কেন? কথাটা তখন গ্রাহ্য করি নি—বরঞ্চ সন্দেহ ক'রেছিলুম যে উক্ত মতের মধ্যে বণিক সুলভ পাশ্চাত্য মনোভাবের প্রভাব আছে। কেননা আমার বিশ্বাস ছিল আমাদের দেশের মাসিক এবং সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক এবং পরিচালকবর্গ বাংলা সাহিত্যের সেবা এবং পরিপুষ্টি সাধন করবার মানসেই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন, ব্যবসায় বুদ্ধি প্রণোদিত হ'য়ে নয়। পয়সা খরচ ক'রে আমাদের দেশের লোক যখন এই সব কাগজপত্র কিনতে শেখেন নি তখন প্রকাশকেরা পারিশ্রমিক দেওয়ার কড়ি সংগ্রহ করবেন কোথা থেকে? কিন্তু ধারণা বদলাতে হয়েছে। দেখলুম আমার বিশ্বাস সব কাগজের পক্ষে সত্য নয়। অবশ্য এমন সংবাদপত্র নিঃসন্দেহ আছে যাঁদের আদর্শ হচ্চে একটি বিশিষ্ট পথ ধ'রে চলা—একটা বিশেষ কোন মতবাদ প্রচার করা। দেশের লোক যদি সেই মতবাদ গ্রহণ করবার পক্ষে তখনো উপযুক্ত না হ'য়ে থাকে তবে তাদের শিক্ষার জন্যে নিজেদের ক্ষতি স্বীকার ক'রেও সংবাদপত্র চালানোর প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু অধিকাংশ সাহিত্য পত্রের এমন কোন আদর্শের বা মতবাদের বালাই নেই। তাঁরা বোঝেন কাগজ বিক্রি। যে সুকৌশলে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে পারে তার প্রতি তাঁদের পরাঙ্মুখতা নেই। যেমন ধরা যাক মাসিক পত্রের ইতিহাস। অভিজ্ঞতা থেকে এটা দেখা গেছে যে মাসিকপত্রের ক্ষেত্রে নির্জলা সাহিত্যিক পত্রিকা চলে না, যেমন নির্জলা মদ্য সকলে গলাধঃকরণ করতে পারে না, কিন্তু খানিকটা জল মিশিয়ে নিলেই সেটা আপামর সাধারণের সুপেয় হ'য়ে ওঠে। সাহিত্যিক পত্রিকাতেও তেমনি খানিকটা খাদ মেশাতে হয়, তবে সে পত্র আপামর সাধারণের প্রেয় হয়। অন্ততঃ দু'খানি মাসিক পত্রের কথা জানি যার পরিচালকবর্গ এই শিক্ষা গ্রহণ করতে না পেরে কঠিন শাস্তি গ্রহণ করেচেন—তাঁদের কাগজ উঠে গেছে। একখানি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' আর একখানি শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশের 'কল্লোল'। বাংলা ভাষা এবং বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবার ইতিহাসে এই দুটি পত্রিকার দান কতখানি ভবিষ্যৎ সাহিত্য-সমালোচক তার বিচার করবেন কিন্তু আমরা আপাত দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্চি এঁদের অপরিসীম আর্থিক ক্ষতি হয়েচে। শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয়কে উক্ত পত্রিকা সম্পাদনের উপর নির্ভর ক'রে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতে হ'ত না তাই রক্ষে নচেৎ তাকেও কলকাতা ত্যাগ ক'রে পালাতে হ'ত।

সত্য মিথ্যা বিজ্ঞাপন দেওয়া সংবাদ পত্রের পক্ষে একটা আয়ের পথ কিন্তু চৌধুরী মশায় সেই যে প্রথম থেকেই ধ'রে বসলেন তিনি 'সবুজ পত্রে' বিজ্ঞাপন দেবেন না, কেবল সাহিত্য-রস পরিবেষণ করবেন, ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষতির অঙ্ক দেখেও তিনি নিজের মত পরিবর্ত্তন করলেন না। তাঁর সাহিত্যিক নিষ্ঠার প্রশংসা অনেকে করলেন, এখনো করেন কিন্তু তাঁর সত্যিকারের উপকার করতে কেউ যত্ন করলেন না অর্থাৎ তাঁর সম্পাদিত কাগজের গ্রাহক সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে উঠলো না। অবশেষে একদিন কাগজ চালানর দুশ্চেষ্টা তাঁকে ছাড়তে হ'ল। "কল্লোলের" প্রশংসা অনেকের মুখে শুনেছি, এখনো শুনি। দীনেশ-

রঞ্জনের রসগ্রাহিতার প্রশংসাও অনেকে করেন। কিন্তু যে দিন অর্থানুকুল্যের অভাবে 'কল্লোল' শুকিয়ে মরে গেল সেদিন তার গুণগ্রাহী ভক্তদের কেউ তাকে বাঁচানোর জন্যে সামান্য একটা আঙুলও উঁচু করলেন না। এই ত গেল একদিককার কথা। অপর দিকে যাঁদের ব্যবসায় বুদ্ধি আছে তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগালেন। তাঁরা দেখলেন পাঠকপাঠিকাবর্গ যা চান তাই পরিবেষণ করতে পারলে তবেই কাগজ বিক্রি হবে। পাঠকপাঠিকা-বর্গের অধিকাংশ চান হাল্কা সাহিত্য, যা লঘুপাক, ট্রেণে ট্রামে যেতে যেতে যা হজম করা চলে। তাঁরাও সানন্দে তাই বিতরণ করতে লাগলেন, যাকে বলা যায় সাহিত্যের হরির লুট। কেন না কোন আদর্শ স্থাপন করা বা রুচির সৃষ্টি করার দায়িত্ব তাঁদের নেই। বলা বাহুল্য তাঁদের ব্যবসায় বুদ্ধি যে জয়যুক্ত হয়েচে সেটা যাঁদের চোখ আছে তাঁরাই দেখতে পাচ্ছেন, আমি আর নাম করে দোষের ভাগী হ'তে চাই নে। এখন আমার বক্তব্য এই যে এই সকল ব্যবসায় বুদ্ধি পরিচালিত মাসিক পত্র লেখক লেখিকাদের পারিশ্রমিক দেবেন না কেন এর স্বপক্ষে কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না।

অপর পক্ষে ইংরাজি সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লেখার চিত্রের দিকে তাকালে এক বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতা চোখে পড়ে! সেখানে anything published is paid for পারিশ্রমিকের হারের হয়ত তারতম্য আছে কিন্তু একেবারে বঞ্চিত করবার রীতি নেই। ফলে এই হয় যে ইংরাজি সংবাদপত্রে লেখা একটা নির্ভরযোগ্য পেশা হিসাবে গ্রহণ করা চলে। আর পয়সা যখন উপার্জন করতে হবে তখন লেখকেরা রচনার গুণ বাড়ানোর জন্যে পড়াশোনা করতেও পরাঙ্মুখ হন না। কিন্তু অ্যামেচার লিখিয়েদের সে বালাই নেই। আর সম্পাদকেরা যখন পারিশ্রমিক দেন না তখন তাঁরাও লেখার ভালমন্দ গুণাগুণের উপর জোর দিতে পারেন না। সুতরাং সাহিত্যের সমৃদ্ধির উৎসমুখ এইভাবে রুদ্ধ হ'য়ে যায়।

এখানে কথা উঠতে পারে যে সাহিত্যকে জীবিকা উপার্জ্জনের বাহন করবো কেন? তার উত্তর হচ্ছে এই যে অন্য দশ রকম কাজ ক'রে উদ্বৃত্ত সময় সাহিত্যের জন্যে ব্যয় করলে সাহিত্য সেবা হয় না। সাহিত্যের দেবী হচ্ছেন jealous mistress সর্বতোভাবে নিজের সমস্ত সামর্থ্য তাঁর পায়ে নিবেদন ক'রে দিলে তবেই তাঁর মনতুষ্টি হয়। আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের দুর্দ্দশা কি আমরা চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি নে? কেউ গেছেন সিনেমায়, কেউ রেডিয়োয়, কেউ হয়েছেন সংবাদপত্রের প্রুফ রিডার ভাষান্তরে সম্পাদক—কিন্তু তারপর থেকে তাঁরা কি কেউ উল্লেখযোগ্য কোন সৃষ্টি করতে পেরেছেন? আসল কথা হচ্ছে এই যে সমস্ত দিন আপিসে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে কিম্বা খবরের কাগজের দপ্তরে নিশা অতিবাহিত ক'রে প্রভাতে সাহিত্যের নৈবেদ্য থালায় ক'রে উন্মুখ পাঠক-পাঠিকাবর্গের সামনে পরিবেষণ করা যায় না। আর সাহিত্যের আঙিনায় পয়সা কড়ির কথা যত স্থূল এবং যোগসূত্রহীন ব'লেই মনে হোক না কেন, আসলে কথাটার দাম আছে। কেননা সাহিত্যিক তাঁর লেখায় সূক্ষ্ম এবং মরমীয়াবাদের পক্ষপাতী হ'লেও পেটের জ্বালা নামক আধি-ভৌতিক উপদ্রবের তিনি অধীন এবং তার নির্বাণকল্পে তাঁকে আহার্য্য গ্রহণ করতে হয়।

পারিশ্রমিকের কথা বাদ দিলে দ্বিতীয় যে কথাটা মনে ওঠে সেটা হচ্ছে সৌজন্যবোধের কথা। এ বিষয়েও আমাদের বাংলা সাহিত্যের সম্পাদকবর্গ আদর্শস্থল। পারি-শ্রমিক ত দেনই না, অধিকাংশ স্থলেই চিঠিপত্রের উত্তরও দেন না। লেখাও ফেরত আসে না। যদি কখনো আসে তবে তার সঙ্গে কোন চিঠি থাকে না; যদি থাকে তবে তা ব্যক্তিগত কোন চিঠি নয়, নামধামবিহীন ছাপানো একখানা সাধারণ চিঠি। বলা বাহুল্য এতে করে লেখকদের মন আনন্দে নৃত্য ক'রে ওঠে না এবং লেখক আর সম্পা-দকের মধ্যে কোন সম্বন্ধ গড়ে ওঠার সুযোগ পায় না। নবীন লেখকদের এমন একরারনামাও লিখে দিতে হয় যে পারিশ্রমিক নেব না, তবে লেখা ছাপা হয়। এখনকার এত অপরিমিত সময় এবং অপরিসীম ধৈর্য্য আছে যে দিনের পর দিন লেখা পাঠিয়ে যাবে, পারিশ্রমিক পাবে না, লেখা ফিরে আসবে না, লেখা ছাপা হবে না, কোন চিঠির জবাব

আন্‌বে না, কিন্তু তবু সে সানন্দে সাহিত্য চর্চ্চা ক'রে যাবে? যদি কারোর এমন ধৈর্য্য থাকে তবে তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ইংরাজি সংবাদ-পত্রসেবীদের ব্যবহার অনুরূপক্ষেত্রে অনিন্দ্য। আমি জানি ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের এক বিশেষ সংখ্যার জন্যে আমার এক বন্ধুর কাছে তারা লেখা চেয়েছিল। বন্ধুর পুত্র তখন কঠিন পীড়ায় শয্যাগত। সেই কথা জানিয়ে তিনি চিঠির উত্তর দিলেন, বললেন, মনের এমন উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় প্রবন্ধাদি লেখা সম্ভব নয়, বরঞ্চ কিঞ্চিৎ আর্থিক আনুকূল্য পেলে এই সময়টায় কাজে লাগতো। পরের দিনই টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডারে একশত টাকা সম্পাদক পাঠিয়ে দিলেন। জানালেন টাকাটা অগ্রিম পাঠানো হ'ল, লেখা সুবিধামত দিলেই চলবে, ছেলে কেমন আছে জানাবেন। ছেলেটিকে অবশ্য বাচানো গেল না। সম্পাদক সেই খবর জান্‌তে পেরে সহানুভূতিপূর্ণ একখানি সুন্দর চিঠি লিখলেন। আমি তাই মনে মনে ভাবি যে আমাদের সম্পাদকবর্গের কাছ থেকে কি আমরা এতখানি ভদ্রতা আশা করতে পারতাম? অথচ এ কথা নিশ্চয় জানি যে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান ঐ ভদ্রতাটুকু দেখিয়ে ঠকেন নি, বরঞ্চ জিতেছেন। তিনি বন্ধুর মনখানিকে কিনে নিয়েছেন। তাঁদের একশো টাকা জলে পড়ে নি। আমরা কি ছাই ব্যবসায় করতেই জানি? সত্যিকারের ব্যবসায় যদি জান্‌তাম তবে বর্ত্তমানকে ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের গর্ভে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হতে পারতো।

তাই বলছিলুম বাংলা সাহিত্যে লেখার জন্যে উৎসাহ দেবার কেউ নেই। ওতে ক'রে জাতও যায়, পেটও ভরে না। অথচ প্রকাশকবর্গের কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতা নেই। তবু আশ্চর্য্য মানুষের মন! সমস্ত জেনেও বাংলা লেখা ছাড়তে মন সায় দেয় না। মনে হয় ও যে আমারই ভাষা, আমারই সাহিত্য। ইংরাজি সাহিত্যের সঙ্গে এ রকম একাত্মবোধ কল্পনাও করতে পারি নে।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

চাঁদের অভিসার

আনোয়ার হোসেন বি-এ

কল্পলোকের কবি আমার
মায়ালোকের চিত্রকর।
নীল আকাশের সোনার রাজা,
আলোর রাঙ্গা সওদাগর।

হরেক রাতে আমার ঘাটে,
লাগে ভেলা ঐ শীকারীর;
হরেক রাতে আমার বাটে,
হয় সে আসি মুসাফির।

কিসের আশে নিতুই আসে
ভাঙ্গা আমার কুটীর দ্বারে
কোন মায়ারি রাঙ্গা পরশ
ভুলিয়ে হেথায় আনে তারে।

আসে নিতুই আশায় কিগো
শুনতে গানে ঐ পাখীর
চুমতে কি ও চায় গো নিতি
শ্বেত কপোলে ঐ শেফালির

পাখীর গানে, ফুলের টানে
আসে কি ও ভুলে নিতি
ধার ধারেনা আমার কিছু
চায়না মোটে মোর পীরিতি

আমার বনে গাহে পাখী
আছে বাগে ফুলের বা'র
তাই বুঝি মোর ভাঙ্গা কুঁড়েয়
রাঙ্গা চাঁদের অভিসার।

পুস্তক-পরিচয়

১। হিন্দোলা (১৯১৩)
২। তুষার (১৯১৮)
৩। চিনার (জানুয়ারি ১৯৩৪)
৪। চৈতী (জুলাই ১৯৩৪)
৫। বৈকালী (আগষ্ট ১৯৩৪)
৬। বিদায় (১৯৩৭)
৭। বরুণা (১৯৩৮)

উপরের ৭খানি বই কাব্য-পুস্তক, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, এল,এল,ডি কর্ত্তৃক রচিত। প্রবাসী বাঙালী সমাজে ডাঃ সেনের নাম সুপরিচিত, কেননা তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ ছিলেন এবং এখনো একজন খ্যাতনামা ব্যবহারজীব। অপর পক্ষে তিনি স্বনামখ্যাত কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের অনুজ। কিন্তু অধিকাংশ লোকেই তাঁর বাহিরের ঐশ্বর্য্যের সংবাদ রাখেন, তাঁর মনের যে ঐশ্বর্য্য এই কবিতা-পুস্তকগুলির মধ্যে ছড়াইয়া আছে তার খবর অধিকাংশ সাংসারিক লোকের প্রয়োজন হয় না। বিশেষ তিনি কবিতা কোন মাসিকপত্রাদিতে ছাপাইতে ব্যস্ত নহেন। নিজের মনের আনন্দে কবিতা লিখিয়া যান, পরে সেগুলিকে একত্র করিয়া ছোট ভাই শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার সেন ইণ্ডিয়ান প্রেসের মারফৎ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

অজস্রতা কাব্যের প্রাণ। যিনি সত্যিকারের কবি হইবেন জগতের বিচিত্র ঘাত প্রতিঘাত তাঁর মনের বীণায় ঝঙ্কার তুলিবেই। সেই ঝঙ্কার কবিতার আকারে নিঃসৃত হইবে। ডাঃ সেনের কাব্যেও এই অজস্রতার পরিচয় পাই। তিনি তাঁর দীর্ঘজীবন ধরিয়া এই কাব্য-লক্ষ্মীর সাধনা করিয়া চলিয়াছেন।

কবিতা নিজেই নিজের পরিচয় প্রদান করে। তার অন্য পরিচয় দেওয়া দুরূহ। অতএব আমি ডাঃ সেনের প্রত্যেক বই হইতে কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করিয়া তাঁর কাব্যের পরিচয় দিব:—

"হেরিতাম সীমা মাঝে বাঁধা কোথা সীমাহীন,
হেরিতাম কোথা বাঁধা সুকোমল সুকঠিন।"

(হিন্দোলা-অন্তর-দেবতা)

"কোন্ দোল-পূর্ণিমার আবীরে, আ মরি!
আনন মণ্ডিত হ'ল লোহিতে লোহিতে?
কোন্ বাসন্তীর স্পর্শ-পুলকে শিহরি'
ফুটিল অশোক পুষ্প গুচ্ছে আচম্বিতে?"

(হিন্দোলা-ঘোমটা-খোলা)

"এতই রূপের তেজ, চোখ গেল তোর;
নীল চশমায় পাখি, ঢাক' রে নয়ন;"

(হিন্দোলা-চোখ গেল)

"নহে ও সিন্দুর বিন্দু! স্বামীর সোহাগ
হর্ষে রাঙা ফুটিয়াছে সীমন্ত উজলি'।
কোথায় অনলে দীপ্ত কনকের রাগ,
নীরদ-অলকে কোথা চপল বিজলি!"

(হিন্দোলা-সিন্দুর)

"কভু মোর মনে হয়, কভু মনে হয়
নহে তুমি মোর পক্ষে সমস্ত নূতন
হয়েছিল বহুবার বুঝি পরিচয়
যুগ-প্রান্তে—দোলে সেথা কালের কেতন।"

(তুষার)

"বিশ্বে চাহে কয়জন অযাচিত দান?
শেফালি ঝরিয়া যাক মাটির ধূলায়।
উঠুক তিয়াষাকুল বিহগীর গান,
শুখাক শিশির পাতি সোনালী উষায়।"

(চিনার)

"ক্ষীণ চাহে লীন হ'তে অনন্ত প্রভায়—
ব্যর্থ হিয়া বিলাপিয়া করে হায় হায়!"

(চিনার)

"যে গানের ভাষা নাই, সেই গান গাহিব
যে ধনের আশা নাই, সেই ধন চাহিব।"

(চৈতা)

"হবে যখন সাঙ্গ জীবন, বন্ধ ভবের মেলা
সিন্ধুধারে অন্ধকারে খুলিয়ে দিও ভেলা!
সমুখ ধারে পিছন ধারে :
আঁধার রবে ভারাভারে,
ঢেউ খেলিবে পারাবারে
আন্দোলিয়া ভেলা;
নিশ্চল সে স্তব্ধ রাতে
স্বপ্তি-রাখী বাঁধ্‌বে হাতে,
তুষার-শীতল দেহের পাতে
কাল মারিবে ঠেলা!
হে প্রবাসি! প্রবাস শেষে
চলেছ কি আপন দেশে?
অন্ধকারে এমন বেশে
ত্যজি ভবের খেলা?"

(বৈকালী)

"সে যে হ'ল অনেক দিনের কথা—
কি ফল হবে তাহার কথা তুলে?
দিন ছয়েকের পথিক এসেছিল,
সরল ভাবে ভালো বেসেছিল,
কোথা থেকে ভেসে এসেছিল
সে কথাটা বলে নিক' খুলে।
দেখা, প্রথম ঐ বাগানের কোণে—
শ্রান্ত রবি পড়ছে যখন ঢ্‌লে।
ছিল ঘরে শুধু দিনেক ছয়
খুলে কভু দেয় নি পরিচয়।

(বৈকালী)

"আমি কবি-প্রতিভার করি নাক দাবী,
আমি দীন, প্রভাহীন বাগানের মালী।
সভ্য সুন্দরের হাতে হৃদয়ের চাবী—
আমি আনি চয়নিয়া কুসুমের ডালি।"

(নিদাঘ)

"হে জননী! স্নেহভূমি, সর্ব্বতীর্থসার!
তুমি তোয়া ভাগীরথী, তুমি হরিদ্বার!"

(নিদাঘ)

"অজানারে জানিবারে জ্ঞান কেঁদে মরে,
অপ্রাপ্য পাইতে সদা হৃদয় কাতর,
নয়ন ভেদিতে চায় দিগন্তের পারে,
চরণ লঙ্ঘিতে চায় হিমাদ্রি-শিখর।"

(বরুণা)

"উদাস ধুতুরা তব কণ্ঠের বিলাস?
তুমি বিশ্বনাথ? একি ঘোর উপহাস!"

(বরুণা)

বাহুল্য ভয়ে আর বেশি উদ্ধৃত করিলাম না। আশা করি উপরের অংশগুলি হইতে কবির কাব্য সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের কিছু ধারণা হইবে এবং তাঁর কাব্য সাধারণের নিকট আদরণীয় হইবে।

কবি চতুর্দ্দশ পদী সনেটের বিশেষ অনুরাগী। 'তুষার', 'চিনার', 'নিদাঘ' এবং 'বরুণা' এইরূপ সনেটে পরিপূর্ণ—"হিন্দোলায়"ও এইরূপ বহু সনেট আছে।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

বুভুক্ষা—শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় অনুদিত। কলিকাতা ২২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ আর্য্য পাবলিশিং কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ—২৮৯ পৃষ্ঠা, দাম আড়াই টাকা।

পুস্তকখানি বিশ্ববিখ্যাত ইউরোপীয় সাহিত্যিক ক্নাট হামসুনের 'সুলট'-(হাঙ্গার)এর অনুবাদ। হামসুনের এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিবার কিছু নাই, কারণ এর যা বিষয় বস্তু তা বর্ত্তমান জগতের প্রায় সকল সভ্য দেশেরই এক প্রধান সমস্যা। এই পুস্তকে সেই সমস্যাই, ক্ষুধিত আত্মার সেই মর্ম্মন্তুদ কাহিনীটি, বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যাঁহারা মূল পুস্তক বা তার ইংরাজী অনুবাদ

পড়িবার সুযোগ সুবিধা নাই, তাঁরা এই পুস্তকখানির সাহায্যে মূলের বিষয় বস্তুর সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন, এবং সেই পরিচয়ের ফলে আনন্দিতই হইবেন। আলোচ্য পুস্তকখানি অনুবাদ পুস্তক হইলেও, ইহাতে কোথাও আড়ষ্টতা নাই, ভাষা স্বচ্ছ অবাধ গতি সম্পন্ন, অনুবাদ বলিয়া না দিলে অনুবাদ বলিয়া বোধ হইবে না। বঙ্গসাহিত্যে এইরূপ অনুবাদই আমরা দেখিতে আশা করি।

শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী

কাশ্মীরের কথা—হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীপ্রকাশ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মেসার্স সি এইচ আরান এণ্ড কোং ২৩৫।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। ১১′×৮½″ ৩০ পৃষ্ঠা। মূল্যের উল্লেখ নাই।

এই ভ্রমণ পুস্তকটি দেখিয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি। সুন্দর সাবলীল ভাষায় দেশ ও প্রকৃতি বর্ণন, তাহার সহিত পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় মনোরম চিত্রের সহযোগিতা। পুস্তকটির আয়তন মাত্র ত্রিশ পৃষ্ঠা হইলেও পৃষ্ঠার আকার বৃহৎ,—এবং এই ত্রিশ পৃষ্ঠার বহিতে রঙিন ও এক রঙা লইয়া ত্রিশটি ছবি। তন্মধ্যে একটি রঙিন ছবি এত বৃহৎ এবং সুন্দর যে, স্বতন্ত্রভাবে বাঁধাইয়া রাখিবার উপযুক্ত। একটা কথা বলার প্রয়োজন আছে। ত্রিশ পৃষ্ঠার প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা ভাষা পৃষ্ঠা। চিত্রগুলি স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য একজন শক্তিশালী সাহিত্যিক। তাঁহার শক্তির পরিচয় এই পুস্তকের লেখার মধ্যে যথেষ্ট। এ পুস্তকখানি বিদ্যালয়ে পুরস্কার পুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছে।

পুস্তকটির মুদ্রণ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ না করিলে পুস্তকটির প্রতি অবিচার করা হইবে। সমস্ত পুস্তকটির গঠন ব্যাপারের মধ্যে এমন একটা সুরুচি ও সৌষ্ঠবের পরিচয় আছে যাহা বাঙলা পুস্তকে এখনো খুব সুলভ নহে। বইটি আগাগোড়া আর্ট পেপারে মুদ্রিত।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বৃহত্তর সম্ভাবনা—শ্রীবরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। গল্পের বই। বারটি গল্প একসঙ্গে গ্রথিত হইয়াছে। ২৭, হ্যারিসন রোড শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

গল্পগুলিতে লেখক মানব মনের নিগূঢ় রহস্য—বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত অতি সহজ সরল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার অনুভূতির আলোকে উহা উজ্জ্বল হইয়াও উঠিয়াছে। বাঙ্গালার বিভিন্ন মাসিক ও সাময়িক পত্রিকাদিতে যে সকল গল্প অধুনা গজাইতে দেখিতেছি তাহার অধিকাংশ গল্পই পাঠকগণ শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া পড়িয়া শেষ করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং নিত্যকালের জন্য টিঁকিয়া থাকিবার দাবী তাহারা করিতে পারিতেছে না। বরেন বাবু মানব মনের যে সকল নূতন ভাবধারা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন তাঁহার অপূর্ব্ব লিখনভঙ্গীতে তাহা ফুটাইয়া তুলিতেও সমর্থ হইয়াছেন। কথা-সাহিত্য রচনায় লেখকের ক্ষমতা আছে একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। আমরা তাঁহার নিকট আরও অধিক কিছু পাইবার আশা করি।

অং

অলৌকিকা—শ্রীগোপাল বটব্যাল প্রণীত এবং শ্রীচিত্তরঞ্জন দে কর্ত্তৃক ভারত লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি গল্পের বই। আটটী গল্প একসঙ্গে গ্রথিত হইয়াছে। গল্পগুলি পড়িয়া আমাদের ভাল লাগিয়াছে। গল্পের ভাষা স্বচ্ছ অবাধগতি সম্পন্ন। কথা-সাহিত্য রচনায় লেখকের হাত আছে। আশাকরি বক্ষ্যমান গ্রন্থখানি সুধী-সমাজে সমাদৃত হইবে।

শ

নানাকথা

ফরওয়ার্ড ব্লক ও দক্ষিণপন্থী—

শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসুর ফরওয়ার্ড ব্লক ও কংগ্রেসে দক্ষিণ পন্থীর মধ্যে ক্রমশঃ যে বৈরিতা এবং রণোস্ফালনের ভাব জাগিয়া উঠিতেছে তাহাতে আমরা শঙ্কিত হইয়াছি। শঙ্কার কারণ আরও এইজন্য হইয়াছে যে, এই উভয় দলের মধ্যেই শক্তিশালী এবং অকপট ব্যক্তির অভাব নাই, সুতরাং বিরোধ যদি না শীঘ্র মিটিয়া যায় ত' দেশের সমূহ ক্ষতি না করিয়া তাহা নিরস্ত হইবে না। বিশ্ব আন্তর্জাতিক অবস্থার অনুরোধে যে সময়ে সর্ব সম্প্রদায়ের একতা একান্ত অপরিহার্য, সে সময়ে এই গৃহ বিবাদ অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে। ইহার কি কোনো উপায় নাই। একমাত্র যে ব্যক্তি এ অবস্থার নিরসন করিতে পারিতেন দুঃখের বিষয় তাঁহার আনুগত্য সকলে আর মানিয়া চলে না।

বাঙলার রাজনৈতিক শক্তি এখন মন্দা তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই দুর্বল দেহে নূতন রক্ত অনুপ্রবেশের কি কোনো আশাই নেই? একটি প্রবীণ ও একটি নবীন শক্তি কেন্দ্রের কথা আমাদের সময়ে সময়ে মনে হয়:—অধুনা অবসর প্রাপ্ত আইন সচীব শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সরকার এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। দেশ ইঁহাদের সমধিক সাহচর্য নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করিতে পারে।

বাঙালীর স্বাস্থ্য ও ইউ, এন্, ব্যানার্জি—

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা কর্পোরেশনের ব্যায়াম-শিক্ষক। সুদৃঢ় পেশি সংযুক্ত ইঁহার সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ দেখিলে মনে শ্রদ্ধা ও আনন্দের উদয় হয়।

হীন স্বাস্থ্য বাঙালী জাতি যাহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হয় তদুদ্দেশ্যে ইনি Barbell Exercise নামে একটি সচিত্র ব্যায়াম পুস্তক সঙ্কলিত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। যে সকল বারবেল ব্যায়ামের অনুশীলনের দ্বারা ইনি ইঁহার দেহকে বর্তমান অবস্থায় পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই পুস্তকে সেই সকল ব্যায়ামগুলি বহুল পরিমাণে চিত্রিত করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ব্যায়ামের ব্যাখ্যা এত প্রাঞ্জল এবং চিত্রগুলি এত সুস্পষ্ট যে এই পুস্তক দেখিয়া ব্যায়ামগুলির অনুশীলন করা একটুও কঠিন নহে। ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, প্রতিদিন মাত্র ১৫ হইতে ২০ মিনিট সময় এই ব্যায়ামগুলি করিলে

ব্যায়ামবীর ইউ, এন্, ব্যানার্জি

যে-কোনো যুবক তাঁর শরীরকে সুপরিণত করিতে পারেন। বহু চিত্র সম্বলিত পুরু আর্ট পেপারে মুদ্রিত এই পুস্তকখানির মূল্য মাত্র ১৷৷০ টাকা। পি ৮৫ বি গ্রে ষ্ট্রিটে ব্যানার্জিস্ পাবলিকেশন্স্-এ পাওয়া যায়।

দুর্বল বাঙালী জাতির শারীরিক উন্নতি সাধনের এই প্রচেষ্টা দেশের পক্ষে বিশেষ কল্যাণপ্রদ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দি ন্যাশনাল লিটারেচার কোম্পানী

সাহিত্য প্রকাশ এবং প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠানটি কিছুদিন হইল কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইঁহাদের প্রধান সঙ্কল্প আদ্য, মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলা গ্রন্থাদি সুচারুরূপে মুদ্রিত করিয়া সেট্ হিসাবে বিক্রয় করা। আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধীয় পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থাদিও সেট হিসাবে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প ইঁহাদের আছে।

ইঁহাদের প্রথম ক্রিয়াশীলতা বঙ্কিম সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের ৯ খণ্ডের পুনর্মুদ্রণ। দুই খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে,—বাকি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। উৎকৃষ্ট পুরু অ্যান্টিক কাগজে, ঝরঝরে নূতন পাইকা অক্ষরে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। বাঁধাইও প্রথম শ্রেণীর। সম্পূর্ণ সেটের নগদ মূল্য ২৭৲ টাকা; কিস্তি হিসাবে ২৯৲ টাকা। অর্ডার বুক করিবার কালে ৫৲ টাকা ও পরে মাসে মাসে ৩৲ টাকা করিয়া দিলে ৮ মাসে সমস্ত কিস্তির টাকা শোধ হইবে। লাইব্রেরী, কলেজ স্কুল প্রভৃতিকে নগদ এককালীন ২৫৲ টাকা মূল্যে সম্পূর্ণ সেট বিক্রয় করিবার ব্যবস্থাও ইঁহারা করিয়াছেন।

বাঙলা সাহিত্যে বঙ্গদর্শনের যথার্থ স্থান এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছু বলিতে যাওয়া আমরা বাহুল্য বলিয়া মনে করি। বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্যসাধারণ প্রতিভার অদ্ভুত কীর্ত্তি এই বঙ্গদর্শন। যে সময়ে বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র তরুগুল্মলতারও প্রাচুর্য ছিল না সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই বিরাট বনস্পতির সৃষ্টি ছিলেন। বঙ্গদর্শন জানার অর্থ বঙ্কিমকে জানা, ব[illegible] যুগকে জানা, বঙ্কিমমণ্ডলীর সাহিত্যিকদিগকে জানা। এই অধুনালুপ্ত বঙ্গদর্শনের পুনর্মুদ্রণ সাধিত করে ন্যাশনাল লিটারেচার কোম্পানী বাঙালী জাতির বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আধুনিক কথা-সাহিত্যের সঞ্চয়ন গ্রন্থাবলী প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থাও ইঁহারা করিতেছেন। কলিকাতা ৫৩ ষ্টিফেন হাউস, ৫নং ড্যালহাউসি স্কোয়ার ঈষ্টে ইঁহাদের কার্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

আগামী শারদীয়া পূজার সময়ে 'চিত্র-পত্রী' নামে ইঁহারা ছেলেমেয়েদের জন্য একটি সচিত্র বার্ষিকী প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বার্ষিকী সম্পাদনের ভার লইয়াছেন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আমরা এই নব-প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের পরিপূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যা শ্রীশ্রীগৌরীপুরী দেবী মাতাজীর ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং অপূর্ব্ব কর্ম্মশক্তির বলে ১৩০১ সালে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রমের উদ্দেশ্য: (১) হিন্দুধর্ম্ম এবং সমাজ অনুযায়ী স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার (২) সদ্বংশজাতা দুঃস্থা বালিকা এবং বিধবাদিগকে আশ্রয়দান, এবং (৩) নারীদিগকে আদর্শ জীবন-যাত্রার পথে সহায়তা করা। সেই সঙ্গে গৃহকর্ম ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার জন্য শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা থাকায় প্রতিষ্ঠানটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বর্ত্তমান আশ্রম-বাসিনীদের সংখ্যা প্রায় ৫০; ইঁহাদের অধিকাংশের যাবতীয় ব্যয়ভার আশ্রম, সাধারণের দানলব্ধ অর্থ হইতে গ্রহণ করেন। আশ্রম-সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা বর্ত্তমানে প্রায় ৩০০, শিক্ষা অবশ্য অবৈতনিক।

আশ্রম পরিচালক মণ্ডলীতে কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল, সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাক্তার আদিত্য-

নাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি, আই-ই-এস্, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, এম্-এ, এম, এল-এ, স্যার হরিশঙ্কর পাল, এম-এল-এ, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র, প্রভৃতি মহানুভব এবং বিচক্ষণ ভদ্রমহোদয়-গণ এবং শ্রীযুক্তা ননীবালা দেবী (লেডী ব্রহ্মচারী) শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দে (মিষ্টার পি, সি, দে, ডিষ্ট্রিক্ট এণ্ড সেসনস্ জজ মহাশয়ের পত্নী) প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত মহিলাগণ আছেন। শ্রীশ্রীমাতাজীর অক্লান্ত চেষ্টায় এবং দেশবাসীর সহৃদতায় কলিকাতায় ২৬নং মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীটে আশ্রমের নিজস্ব জমিতে ১৩৩১ সালে একটি ত্রিতল ভবন এবং মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহাতেও স্থানাভাব হইতেছে বলিয়া অনেক দুঃস্থা বালিকা ও বিধবাকে গ্রহণ করা সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং আশ্রমের আয়তন বৃদ্ধি করা অবিলম্বে প্রয়োজন। ইহাতে অন্যূন ৩০,০০০ টাকা আবশ্যক। আমাদের হিতৈষী, স্ত্রী-শিক্ষায় অনুরাগী এবং দুঃস্থা মেয়েদের দুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন সহৃদয় নরনারীর প্রতি আমাদের সনির্ব্বন্ধ নিবেদন যিনি যাহা পারেন আশ্রমের সাহায্যে তাহা দান করুন। অর্থ পাঠাইবার ঠিকানা: শ্রীযুক্তা দুর্গাপুরী দেবী, আশ্রম-সম্পাদিকা, ২৬নং মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

নিবেদন

বর্ত্তমান আষাঢ় সংখ্যার সহিত "বিচিত্রার" দ্বাদশ বর্ষ শেষ হইল। আগামী শ্রাবণ সংখ্যায় "বিচিত্রা" ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিবে। দ্বাদশ বর্ষকাল ধরিয়া "বিচিত্রা" পাঠক-পাঠিকাগোষ্ঠী ও সাহিত্যামোদী সুধীজনের তৃপ্তিসাধন করিয়া আসিয়াছে, আশা করি আগামী বর্ষেও তাহা করিতে সক্ষম হইবে। আগামী বর্ষে যাহাতে "বিচিত্রার" লেখার আদর্শ ক্ষুণ্ণ না হয় সে বিষয়ে আমরা সচেষ্ট থাকিব।

এই আষাঢ় সংখ্যার সহিত অনেকেরই বাৎসরিক মূল্য শেষ হইল। ভিঃ পিঃ অপেক্ষা মণি-অর্ডারে টাকা পাঠাইলে খরচ কম পড়ে। সুতরাং যাঁহারা মণি-অর্ডারে মূল্য পাঠাইবেন তাঁহারা এখন হইতে ১৫ দিনের মধ্যে টাকা পাঠাইয়া দিবেন। যদি একান্তই কোন কারণে কেহ আপাততঃ গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হন, তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া ১৫ দিনের মধ্যে তাহা আমাদিগকে জানাইয়া দেন। আমরা যাঁহাদিগের নিকট হইতে টাকা বা পত্রিকা প্রেরণের জন্য নিষেধাজ্ঞা পাইব না, তাঁহাদিগের নিকট যথানিয়মে আগামী ত্রয়োদশবর্ষের ১ম সংখ্যার বিচিত্রাখানি ভিঃ পিঃ করিব। আশা করি ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া কেহ আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

আমরা আশা করি, আপনাদের সহানুভূতি এবং সাহায্য লাভে "বিচিত্রা" আগামী বৎসরও বঞ্চিত হইবে না।

বিনীত—

শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী

ম্যানেজার

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং ৭নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, সাহিত্য-ভবন প্রেস হইতে শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রতি ...খোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।